বঙ্গশ্রী

দ্বিতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(শ্রাবণ হইতে পৌষ)

১৩৪১

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস, লিমিটেড

৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী

[২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, শ্রাবণ—পৌষ, ১৩৪১]

ষাণ্মাসিক লেখক-সূচী

ষাণ্মাসিক চিত্র-সূচী

রঙীন—পূর্ণ পৃষ্ঠা

একরঙা—পূর্ণ পৃষ্ঠা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চল্লিশ বৎসর হইল, পুণ্যশ্লোক ভূদেবের পরলোক-গমন হইয়াছে।—কোনও প্রভাবশীল ব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকিলে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া বা তাঁহার কৃতিত্বের পুরা পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল হইল, প্রবন্ধ দ্বারা এবং আপনার জীবনের আচরণ দ্বারা ভূদেব বাঙ্গালী হিন্দুর সমক্ষে একটি আদর্শ ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের কার্য্যকারিতা এবং তাহার মধ্যে নিহিত চিন্তাপ্রণালীর সারবত্তা বিচার করিয়া দেখিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভূদেব আর দশজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী থাকিয়াই, নিজেকে সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন রাখিয়াই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে যাহা কিছু ভাল এবং যাহা কিছু মন্দ আছে, ইহার মধ্যে গৌরবের এবং নিন্দার যাহা কিছু আছে, সেই ভাল-মন্দ এবং নিন্দা-গৌরব সমেত এই জীবনকে মানিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, নিজের জ্ঞান-গোচর-মত ও চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা-মত সেই জীবনকে পূত ও সংস্কৃত, সবল ও ঘাতসহ করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। নিজ জাতিকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার মৌলিক প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহার হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করা—এই ব্যাপারে তাঁহার একাধারে অসাধারণ স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও আত্মনির্ভরশীল বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

ভূদেবের জীবনে চটকদার ও চমকপ্রদ কিছুই ঘটে নাই। তিনি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের সন্তান ছিলেন, পৈতৃক ব্যবসায় ছিল যাজন ও অধ্যাপনা। শিক্ষা-সম্পর্কীয় কার্য্যেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার উপজীব্য ব্যবসায়ই দেশ ও সমাজসেবার ব্রতে তাঁহার মুখ্য সাধন স্বরূপ হইয়াছিল। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত যথার্থ ব্রাহ্মণ পিতার হাতে মানুষ হইয়া প্রতিভাশালী বালক ভূদেব বিদ্যা-অর্জ্জনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—আর পাঁচজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছেলেরই মত। কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাদের চেয়ে তাঁহার চরিত্রগত একটু বৈশিষ্ট্য, একটু লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাহার পরে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনার কার্য্য গ্রহণ করেন, ও তদনন্তর শিক্ষাবিভাগে পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে ভারতবাসীর ভাগ্যে যতটা উচ্চ পদ পাওয়া সম্ভব ছিল, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ পদ নিজ যোগ্যতা-বলে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-বিভাগের মুখ্য পরিচালক রূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথাও হইয়াছিল। কেবল উচ্চপদ হেতু তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, বাহ্যতঃ ততটুকু তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজ চারিত্র্যের প্রমাণ দ্বারা ও শিক্ষার দ্বারা তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহার দেশ ও সমাজ কাল-ধর্ম্মের ফেরে তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ যুগে, ইহার পরবর্ত্তী যুগের (অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম পাদ বা প্রথমার্দ্ধের) বাঙ্গালী জীবনের ধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। যে ভাবে সকলের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এই নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য ঘটে, তাহাতে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুই দিক্ দিয়া ভূদেব অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল মনীষীর হাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক বাঙ্গালীর (অতি আধুনিক তথাকথিত তরুণ বাঙ্গালীর নহে) চরিত্র ও চিন্তাধারা মুখ্যতঃ যাঁহাদের আদর্শে ও ভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ভূদেব তাঁহাদের অন্যতম। ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজনের নাম করিতে পারা যায়—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ।

* * *

ভূদেব বিলাতে যান নাই—সিভিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার

হইয়া আসেন নাই। Sensational অর্থাৎ রোমাঞ্চকর কিছু করিয়া বসেন নাই। নিজ সমাজের বা জাতির মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়া, বীররস দেখাইয়া নাট্যকে' কায়দায় স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের অভিশাপ আবাহন করেন নাই—রূপক-চ্ছলে বা বাস্তবরূপে পৈতা ছিঁড়িয়া সমাজের উপরে পদাঘাতপূর্ব্বক সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়া, অন্যত্র আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই। আবার সমাজ বা জাতির সম্বন্ধে একেবারে উদ্দেশ্যহীন হন নাই; কেবল ব্যক্তিত্বের দোহাই পাড়িয়া, cynic (শ্ব-বৃত্ত) অর্থাৎ সমদর্শীর ভাণে নিন্দা-বৃত্ত হইয়া, নিরপেক্ষ দর্শক বা বিচারকের উচ্চাসনে বসেন নাই, এবং কেবল বচন ও টিপ্পনী কাটিয়াই সমাজের প্রতি নিজ কর্ত্তব্যের সমাধা করেন নাই। সমাজ-ত্যাগী এবং স্বকীয় অধঃপতিত সমাজ সম্বন্ধে cynic, এই দুইটী বিপরীত চরিত্রের প্রথমটীতে যে বাহাদুরীর আভাস আছে, তদ্দর্শনে কখনও কখনও আমাদের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগে; দ্বিতীয়টীর সহিত পরিচয়ে, অনেক সময়ে উহার বাহিরের চটকের মোহে আমরা পড়িয়া যাই, আমাদের নিজেদের বোধ ও বিচারশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাই—cynic-এর মনোভাব সাধারণ জনতার মনোভাবের ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, ইহা আমাদের মনে একটা ভয় আনিয়া দিলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই দুই-প্রকারের চরিত্রের মধ্যে যে একটু সূক্ষ্ম vulgarity বা ইতরামি আছে তাহা বুঝা যায়। ভূদেবের জীবনে বা চরিত্রে এই দুই প্রকারে তাক্ লাগাইয়া দিবার কিছু ছিল না বলিয়া, এবং নিজের ও স্বীয় পরিজনের জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণের ফলে, কর্ম্মজীবনে তাঁহাকে কখনও অভাবগ্রস্ত হইতে হয় নাই বলিয়া, successful bourgeois অর্থাৎ "অর্থাগম ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় কৃতকার্য্য বুদ্ধিজীবী" এই আখ্যা দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চন পূর্ব্বক তুচ্ছতাপূর্ণ উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। ভূদেবের জীবন ও তাঁহার লেখার সহিত পরিচয়ের, তথা ভূদেবের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আলোচনার অভাবই এইরূপ অনুচিত এবং অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তির কারণ।

* * *

ভূদেবের কৈশোর ও যৌবনকাল বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিষম সময় ছিল। তখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম ধাক্কা বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই ধাক্কা অনেকেই সামলাইতে পারিতেছিল না। ইংরেজী শিখিয়া অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান, ইউরোপীয় সভ্যতা ও মনোভাবের কাছে যতটা না হউক, ইউরোপীয় রীতিনীতি ও আদব-কায়দার কাছে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই ভাবটা প্রবল ছিল। এই সময়ে কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় গুলির আব-হাওয়া বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ছিল না। একদিকে যেমন ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি বাঙ্গালীর মনে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং নবীন প্রেরণা আনিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি তাহার নূতন শিক্ষা তাহাকে নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছিল, এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসহীন করিয়া তুলিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এই সহায়হীনতার ভাব, এই জাতীয় মর্য্যাদাবোধের অভাব, বাঙ্গালীর পক্ষে সবচেয়ে বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা ছিল। ইংরেজের অধীনে আমরা; বুদ্ধিতে শক্তিতে ও সঙ্ঘবদ্ধতায় ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা উন্নত; ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আবার ইহার উপর সমগ্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও যদি ইংরেজের রীতিনীতি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর ও শোভনতর বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই, তাহা হইলে কিসের উপরে আমাদের জাত্যভিমান আত্মমর্য্যাদা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? জাত্যভিমানের অভাব—ইহার অর্থ হইতেছে, সমষ্টিগত ভাবে জাতির তাবৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মসম্মানের অভাব। নিজ জাতির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখি না বলিয়াই সেগুলি আমাদের কাছে uncouth বা অজ্ঞাত থাকে এবং কুৎসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিদেশী রীতিনীতির সমক্ষে সেগুলিকে হীন বলিয়া বোধ হয়—মনে মনে নিজ জাতির জন্য সদাই একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব, একটা inferiority complex আত্মলাঘবপূর্ণ ধারণা আসিয়া যায়। সত্যকার মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথে ইহা এক দুরপনেয় অন্তরায়। অনেকে এই কথাটী বুঝিতেন না। অথবা বুঝিয়া, তদনুসারে কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা পরিচালিত করিতে পারিতে

না। তাই ভারতীয় হিন্দুর মত একটী সুসভ্য ও সাত্মাভিমান জাতির যুবকেরা সবদিকের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করিত।

কিন্তু জাতির পক্ষে ইহা চরম রক্ষার কথা ছিল যে,সকলেই এই নবীন স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই;—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনুশীলন ও সমাজগত আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করিয়া থাকায় অনেকে বাহির হইতে আগত এই ভাববন্যায় অবগাহন করিয়া স্নান করিলেও, ইহার স্রোতে কুলভ্রষ্ট হইয়া বহিয়া যায় নাই, তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভূদেবেরও অবস্থা তাঁহার সতীর্থ বহু ছাত্রের ন্যায়ই হইত, কিন্তু তাঁহার পিতার ঔদার্য্য, পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা তাঁহাকে প্রথম হইতেই রক্ষা করিয়াছিল।

* * *

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ কতকটা ভগ্ন হইলেও একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই। ব ঙ্গ দ র্শ ন লইয়া বঙ্কিম দেখা দিলেন; প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার স্বপক্ষে হোরেস্ হেমান উইল্‌সন্, মাক্স্‌মূলর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দু'কথা বলিলেন, স্বদেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ও পরে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনস্বী পণ্ডিত বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় আত্মমর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্দ্ধমানের মহারাজা— ইঁহাদের চেষ্টায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের দুইটী অনুবাদ হইল। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মূল সংস্কৃত উৎস হইতে বাঙ্গালী প্রাণবারি সংগ্রহ করিতে লাগিল। টডের রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে হিন্দুর মধ্যযুগের বীরগাথা পড়িয়া বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাসও যেন কতকটা ফিরিয়া আসিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ও পাঠক্রম নির্দ্ধারিত হইল, সংস্কৃত ভাষা পাঠ্য-বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইল। কেবল ইংরেজী শিক্ষা হইলে যে একদেশদর্শিতা হইত, ইহার ফলে তাহার প্রতিষেধক মিলিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা; ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী ও ঋজুপাঠ লিখিয়া, সংস্কৃত চর্চ্চাকে সহজ করিয়া দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী হিন্দুর এক মহান্ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই সব আলোচনা ও অনুশীলন আসিয়া পড়ায়, বাঙ্গালী হিন্দু ইউরোপের সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে যে মোহ দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া উঠিল। ইরোপীয় রীতিনীতি ও মনোভাব যতটা তাহার জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইল ততটা সে আত্মসাৎ করিয়া লইল। কিন্তু এই আত্মসাৎকরণের মধ্যেই ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়া ইউরোপীয় শিক্ষার ক্রিয়ার বীজও উপ্ত রহিল।

এই সময়ে ভূদেবের কর্ম্মজীবন, তাঁহার প্রৌঢ় ও পরিণত জীবন। ভূদেব স্বয়ং প্রথম যুগের Young Bengal-এর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন; বংশমর্য্যাদাবোধ এবং পিতার চারিত্র্যের প্রতি ভক্তি,—এই দুইটী জিনিস তাঁহাকে আত্ম-বিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে, এবং রাজকার্য্যব্যপদেশে জাতীয় জীবনে, তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি প্রস্তাব ও প্রবন্ধের সাহায্যে দেশবাসি-গণকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলি নিপুণ ভাবে দেখিয়া, সেই সকল সমস্যা ও তাহাদের সমাধানও তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবে দেশবাসিগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে অনেকেরই চোখ ফুটিল,—অনেকের মনে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগিল। বঙ্কিম, ভূদেব, ও পরে বিবেকানন্দ, মুখ্যতঃ এই তিন জনের চেষ্টায় বাঙ্গালী হিন্দু অনেকটা আত্মস্থ হইতে পারিয়াছিল।

* * *

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ বাঙ্গালীর জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পরে একটা নূতন যুগ আবার আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগের প্রথম দশকের পর হইতে এবং বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপীয় প্রভাব আবার নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, এবং বাঙ্গালীর তথা অন্য ভারতবাসীর সভ্যতা ও জাতীয়তার সৌধের উপরে প্রবলবেগে আঘাত দিয়া ইহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ এই ১৯৩৪ সালে যদি বাঙ্গালীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, নানা বিষয় দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পঞ্চাশ

বৎসর ধরিয়া বহু নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে। পুরাতনের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া আসিতেছে ; এবং বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্যই হউক, বা অকল্যাণের জন্যই হউক বহু নূতন বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বোপরি নূতন ও বিচিত্র উপায়ে ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার দরজায় হানা দিতেছে।

নৈরাশ্যবাদীর মনোভাব অবলম্বন করিলে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষার যে খাল কাটা হইয়াছিল, সেই খালের মারফৎ প্রথম যুগে পণ্যসম্ভারপূর্ণ বহু অর্ণবপোত বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালীর জীবনের ঘাটে ভিড়িয়াছিল, এবং এখনও ভিড়িতেছে ; কিন্তু সেই খাল বহিয়া কুমীরও আসিয়া তাহার খিড়কীর ঘাটে হানা দিতেছে। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, গৃহে শ্রী নাই ; অন্নাভাবে তাহার সংসার ধর্ম্মের সংসার না থাকিয়া এখন পাপের সংসার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চারি পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যে পথে চলিতেছিল, এবং সম্প্রতি বাহ্য ও আভ্যন্তরীন নানা কারণে যে ভাবে বাঙ্গালীর জীবন প্রতিহত হইতেছে, তাহারই অপরিহার্য্য পরিণতি এখন আমরা দেখিতেছি।

* * *

পৃথিবীতে আশা-বাদী ও নৈরাশ্য-বাদী এই দুই প্রকারের মনোভাবের লোক আছে। আমি বিশ্বমানব বা সমগ্র মানব-সমাজ সম্বন্ধে আশা বাদী, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সঙ্কীর্ণ মানব-সমাজ সম্বন্ধে নৈরাশ্য-ভাব পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্যাপকভাবে, সুদূর ভবিষ্যৎ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে হয়তো বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিই ঘটিতেছে, উপস্থিত ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া মানুষ শেষে দেবত্বেই গিয়া পঁহুছিবে। কিন্তু এই দেবত্বে গিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বে, বহু প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ জাতির, তথা বহু অর্ব্বাচীন ও নিম্নস্তরের জাতির বিলোপ ঘটিবে। হয় তো বা আমাদের হিন্দু বা ভারতীয় জাতিরও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একটী জাতির বিলোপসাধন ২০০। ৫০০ বৎসরে হয় আবার ৫০।১০০ বৎসরেও হয়। উপস্থিত হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে যে, হিন্দু সমাজ ও হিন্দুজাতি (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সমাজ ও হিন্দুজাতি) সমষ্টিগত ভাবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছে, এবং রোগকে উপেক্ষা করিয়া এই সমাজ ও জাতি এখন মহোল্লাসে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান ইহাকে বাঁচাইতে পারেন—ইহার বিপরীত বুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া, ব্যাপকভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রণোদন করিয়া ইহাকে জীবনের পথে চালিত করিতে পারেন। এক্ষণে আমি আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির ও বিনাশোন্মুখতার নিদর্শনের তালিকা দিতে বসিব না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু যদি কেহ সত্য সত্যই দেখাইতে পারেন, আমাদের নৈরাশ্যের বোঝা হালকা করিতে সাহায্য করিলেন বলিয়া তাঁহার কথা আমরা মাথা পাতিয়া লইব।

বাঙ্গালীর জীবনে একটা প্রধান এবং লক্ষণীয় দৌর্ব্বল্য বা কলঙ্ক—অন্ধ স্বার্থপরতা। আমাদের সমাজগত জীবনে নানা ভাবে ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে উচ্চ নৈতিক আদর্শ সমূহ হইতে আমরা অহরহঃ ভ্রষ্ট হইতেছি —কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজগত বা সঙ্ঘগত জীবনে। এই স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে আগে কখনও দেখা দেয় নাই। পূর্ব্বে জীবনযাত্রা সরল ছিল, তাহাতে নীতিহীনতা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এখন আমাদের জীবন আরও অনেক জটিল, আরও অনেক ব্যাপক, ইহাতে স্বার্থান্ধতা আসিলে, তাহার কুফল আরও গভীর ও ব্যাপক ভাবেই ঘটে। যাহা হউক, নৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া নিজের ধৃষ্টতা বাড়াইতে চাহি না। এই স্বার্থপরতা-প্রমুখ আমাদের সমস্ত নৈতিক অবগুণ শেষে একটী প্রধান চরিত্রগত অবগুণে গিয়া ঠেকে—সেটী হইতেছে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে discipline বা দম-গুণের অভাব।

* * *

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোকনিয়ন্তৃগণ জীবনে পালন করিবার জন্য তিনটী বড় নীতির অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। এই তিনটী নীতিকে তাঁহারা "অমৃত পদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। এই তিনটী হইতেছে—"দম, ত্যাগ, ও অপ্রমাদ" ; অর্থাৎ self-discipline বা আত্মদমন, renunciation বা অনাসক্তি, এবং preserving intellectual clarity অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমত্ততা বা কলুষ হইতে মুক্ত রাখা। এই তিনটী অমৃতপদ অন্য

সমস্ত সদ্‌গুণের ও সদ্‌বৃত্তির আদি বা আধার। দুই হাজারের অধিক বৎসর পূর্ব্বে একজন সুসভ্য গ্রীক, যিনি ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজেকে "ভাগবত হেলিওদোর" বলিয়া পরিচিত করেন, তাঁহার নিকট এই "দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ"-এর আদর্শ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, এবং তিনি প্রকাশ্য লেখ-সংস্থাপন দ্বারা তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির ও মনোভাবের এক বিশিষ্ট প্রকাশ এই তিনটী অমৃতপদের প্রচারের দ্বারাই হইয়াছিল। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে এই তিনটীর মত কার্য্যকর নীতি আর কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের জীবনের কোনও দিকে আর এই "দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ" কার্য্যকর হইতেছে না। অথচ আত্মবিস্মৃত, ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত, সব দিক দিয়া বিপন্ন জাতির পক্ষে আত্মসমাহিত হওয়া, তিতিক্ষাবৃত্তি পালন করা, এবং চিন্তাশক্তিকে নিষ্কলুষ রাখা অপেক্ষা আশু আবশ্যক আর কি হইতে পারে?

যুগে যুগে যখনই ভারতের ধার্ম্মিক ও আত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ভারত বিপন্ন হইয়াছে, তখনই ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ ভারতের মহাপুরুষগণ এই একই উপদেশ নবীন ভাবে ঘোষিত করিয়াছেন। উপনিষদে "দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্‌" রূপে এই বাণীই ঘোষিত। বুদ্ধদেব সর্ব্বপাপ হইতে বিরতি, নিজচিত্তের উন্নতি ও সকলের কুশলে আত্মনিয়োগ—এই রূপে এই বাণী প্রচার করিয়া যান। অপ্রমাদকে তিনিও অমৃতপদ বলিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের জ্ঞানের সাধনা অপ্রমাদযুক্ত চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই হয়, দম ও ত্যাগ তো ইহার প্রথম সোপান। মধ্যযুগের ভক্তিবাদের মধ্যেও দম ও ত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধির, এবং অপ্রমাদের বা সত্যদৃষ্টির দ্বারা চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা বিদ্যমান।

ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের শিক্ষা এইই। তবে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য বিনয় বা মনঃশিক্ষার মধ্যে এই তিন গুণ অপেক্ষিত। বেদ, পুরাণ ও আগম—এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এমন একটী ভাবধারা বিদ্যমান, সে ভাবধারা হইতেছে ব্রাহ্মণ্যের ভাবধারা। বেদসংহিতার কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যুগে যুগে নানা ভাবে বিদ্যমান এই ব্রাহ্মণ্যের ধারার মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত—এই আদর্শ লইয়াই আমরা জগতের সমক্ষে মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইতে পারি।

*   *   *

ভূদেব আসিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুকে আবার নূতন করিয়া এই ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ দেখাইতে, তাহাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিতে। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের একটা বড় দিক এই যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহা সংসারকে একেবারে বর্জ্জন বা উপেক্ষা করিতে চাহে না। বুদ্ধদেবের প্রচারিত বৈরাগ্য লইয়া চলিলে জগৎ-সংসার বা মানব-সমাজ অচল হইয়া উঠে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের ফলে সমস্ত দেশ সংসারত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে ভরিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ—আশ্রম-চতুষ্টয়; ব্রাহ্মণ্যের উপাস্য—শ্রীপতি বিষ্ণু, গৃহী উমাপতি শিব। গৃহীর আশ্রম ব্রাহ্মণ্যের আদর্শে অবশ্য-পালনীয়। পরিবারকে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের ব্যবহারিক প্রচেষ্টা। ভূদেব ব্রাহ্মণ গৃহস্থের আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আধুনিক কালের ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রাচীন আদর্শ কি ভাবে কার্য্যকর হইতে পারে, ভূদেবের জীবন তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল।

দুইটী জিনিসের দ্বারা তাঁহার জীবনে এই আদর্শ যে সার্থক ভাবে পালিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। প্রথম—এই আদর্শ পালন দ্বারা বাড়ীর ভিতরে তিনি সকলেরই অনন্যলব্ধ ভক্তি ও স্নেহ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আত্মীয় ও পরিজন সকলেই তাঁহার এই আদর্শে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন;—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই আদর্শ সত্যরূপে পালিত হইতে বাধা হয় নাই। ইহা একটী উপেক্ষা করিবার মত কথা নহে। ভূদেবের পুত্র-কন্যাগণ ও অন্য স্নেহাস্পদগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কেবল কর্ত্তব্যবোধে এতটা হয় না। ভূদেবের যে সকল আত্মীয় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপে এ বিষয়টী পরিস্ফুট হয়। ইহা কেবল প্রাচ্যদেশসুলভ গতানুগতিক গুরুজনের প্রতি ভক্তি মাত্র নহে। কথায় আছে—"যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী, যার রান্না খাই নাই সে বড় রাঁধুনী।" দূর হইতে মানুষকে চেনা যায় না, কাহাকেও স্বরূপে বুঝিতে হইলে তাহার

সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করা চাই। আবার একথাও আছে—no one is a hero to his valet ; এ কথা অবশ্য hero-র আদর্শ হইতে খাটো হওয়ার কারণে যেমন সম্ভব হয়, আবার তেমনি valet-এর hero-কে বুঝিতে পারিবার শক্তির অভাবেও সম্ভব হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যাহারা আমার ভাল-মন্দ সর্ব্বদিকটা দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে যদি আমি বড়ই থাকি, তাহা হইলে আমার মহত্ত্ব কিছু পরিমাণ স্বীকার করিতেই হয়। বাড়ীর বা দলের কর্ত্তার মহত্ত্ব-প্রচার ব্যাপারে একটা dynastic বা domestic—একটা পারিবারিক বা ঘরোয়া বন্দোবস্ত থাকিতে পারে। এরূপও হইয়া থাকে যে, মহাপুরুষের আদর্শ জীবনে কার্য্যকর হইল না, আচারে ব্যবহারে সেই আদর্শের কেবল অবমাননাই হইল—অথচ মহাপুরুষের নামটুকু কেবল exploit করা হইল, তাহা হইতে কেবল পার্থিব বা সামাজিক সুবিধাটুকু গ্রহণ করা হইল। কিন্তু কেবল ঘরোয়া চালাকির দ্বারা এইরূপ দেশব্যাপী ও দীর্ঘকালব্যাপী মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বাহিরের লোকে আরও কিছু চায়। ভূদেবের নিকট হইতে বাহিরের লোকে তাহা পাইয়াছে। বাহিরের লোকে যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার আদর্শ-পরিপালনে সার্থকতার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

* * *

ভূদেব বড় চাকরী করিতেন, বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল চাকরী বজায় রাখেন নাই। তিনি তাঁহার চাকরীকে দেশসেবার একটি উপায় বলিয়াই ভাবিতেন। এদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাঠশালা ও ইস্কুলগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় ও তাহাদের কার্য্য পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করিতেন, গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন। তাঁহার কতকগুলি রিপোর্ট, আধুনিককালের উত্তর ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা যতটা পারা যায় ততটা প্রচার করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, পিতৃপুরুষগণ হইতে লব্ধ অমূল্য রিকথ, সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাতে অধীত ও সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য আন্তরিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, নিজ উপার্জ্জনের একটা বৃহৎ অংশ তদুপলক্ষে দান করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের হিন্দুদের সংস্কৃতি কেবল সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দী ভাষার সহায়তায় বাঁচিতে পারে, তজ্জন্য বহু পূর্ব্বে এবিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহার ও সংযুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে শতকরা ৯০-এর উপর অধিবাসী হিন্দু, অথচ তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত-কায়থী বা দেবনাগরী অক্ষর আদালতে গ্রাহ্য ছিল না ; ভূদেব এই অনুচিত ব্যাপারের সংশোধনের জন্য যত্ন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিহার অঞ্চলে "নাগরী-প্রচার" হয়, আদালতে কায়থী ও নাগরীর আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ; ভোজপুরিয়া গ্রাম্য কবি, দেহাতী বুলীতে ভূদেবের এই চেষ্টার সাধুবাদ করিয়া গান বাঁধিয়া গিয়াছেন, সে গান স্যর জারজ্ গ্রিয়ার্সন সংগ্রহ করিয়া আপনার ভোজপুরিয়া ব্যাকরণে ছাপাইয়া দিয়াছেন। দেশে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য ভূদেব যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রবহমাণ কালস্রোতের মধ্যে পড়িয়া কালক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের কথা আমরা সকলেই জানি, কারণ এই ব্যাপারের মধ্যে লোকচক্ষে একটা চমকপ্রদতা আছে ; কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে করিতে শিক্ষাসংস্কারের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃত ও অন্য বিদ্যা শিক্ষা কতটা সরল, সহজ ও কার্য্যকর হইয়াছে,—তাহার খবর কে রাখিত ? শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শ্রমশীল ঐতিহাসিক, পুরাতন নথীপত্র ঘাঁটিয়া সে সব কথা বাহির করিয়া আমাদের গোচরে না আনিলে আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞই থাকিয়া যাইতাম—সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের আড়ালে শিক্ষা-নেতা বিদ্যাসাগর চিরকালই গুপ্ত থাকিতেন। ভূদেব সম্বন্ধে এই সব কথার কিছু আভাস তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কর্ত্তৃক রচিত জীবনচরিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আবশ্যক।

শিক্ষা বিস্তার ও প্রাচীন বিদ্যার সংরক্ষণকল্পে ভূদেব যাহা করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মানুষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি যে দান, যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কল্যাণ-ব্রত ও তাঁহার আদর্শের উদ্‌যাপন ঘরের বাহিরেও কিভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কর্ম্মজীবনে দান—বিশেষতঃ

গোপন দান—একটী লক্ষণীয় আচরণ ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর সহযোগিতা উল্লেখ করিতে হয়। নিজ বাসস্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপার্জ্জন কেবল নিজের ও নিজের পরিজনের জন্য ছিল না ;—পরিবার-বহির্গত আর্ত্ত ও দুঃস্থেরও তাহাতে অধিকার আছে, এ বোধ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে তিনি পাইয়াছিলেন ; এবং ইহার দ্বারাই তাঁহার অর্থোপার্জ্জন করা সার্থক হইয়াছিল, অর্থোপার্জ্জন তাঁহার সম্মুখে সদা-বক্ষিত উচ্চ আদর্শের অনুসারীই ছিল।

* * *

ভূদেব যে আদর্শ নিজে পালন করিতেন ও নিজ লেখায় যাহাকে চিরস্থায়ী সাহিত্যিক রূপ দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের কয়েকটী বিশিষ্ট দিক্ বা লক্ষণ আলোচনা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই আদর্শ, উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর এই ভীষণ আপৎকালে, কতদূর পালিত হইতে পারে, এবং পালন করিলে তাহা কিভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

* * *

ভূদেবের আদর্শের মধ্যে একটী জিনিস সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে ঠেকে—সেটী হইতেছে তাঁহার অন্তর্নিহিত আত্মমর্য্যাদাবোধ। এই আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান ব্রাহ্মণ্যের একটী প্রধান বাহ্য প্রকাশ। ইহা সমীক্ষা এবং আত্মদমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা আভ্যন্তর সাধনার এবং শক্তির ও তেজের পরিচায়ক। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাবোধ মানুষকে মাথা তুলিয়া নিজ মহিমায় দাঁড়াইতে শিক্ষা দেয়, ইহার সমক্ষে inferiority complex বা আত্মলাঘব ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। যেখানে সত্যকার সাধনা ও কৃতিত্ব, সেইখানেই শক্তি, সেইখানেই সেই শক্তির সত্তায় নির্ভীকতা থাকে। ভূদেব নিজের জাতির সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন ; প্রথমতঃ তাঁহার পিতার প্রসাদে, ও পরে অনুশীলন দ্বারা হিন্দুজাতির কৃতিত্ব কোথায়, তাহা তিনি ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু প্রতীচ্য বিদ্বৎসভায় তিনি সহজেই তুল্য আসনে বসিতেন। এই আত্মমর্য্যাদার ফলে তিনি একটা urbanity বা মনঃসম্বন্ধীয় নাগরিকতা বা ভব্যতার অধিকারী হইয়াছিলেন—তাঁহার মধ্যে গ্রাম্য সঙ্কোচ বা অভব্যতা ঠাঁই পায় নাই। যেখানে বিদেশীর কৃতিত্ব, সেখানে সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই ; আবার যেখানে আমাদের যথার্থ গৌরব বা আমাদের সুবিবেচনার প্রমাণ আছে,—সেখানে বিদেশের একপত্রিগণের মত প্রতিকূলে হইলেও পরম আত্মনির্ভরতার সহিত তিনি স্থির থাকিতেন। "তেরা দরবার শাহানা, মেরা সুরৎ ফকীরানা"—এই বলিয়া ইউরোপের ঐশ্বর্য্য ও শক্তির ঔজ্জ্বল্যে আত্মহারা হইয়া, নিজের জাতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বিকাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূদেবের সমগ্র জীবনে, এবং তাঁহার সমগ্র লেখায়, এই গুণটী ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে শ্লেষ করিয়া বালক ভূদেবকে বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল—কিন্তু ভূদেব, তোমরা বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।"—সে শ্লেষপূর্ণ উক্তি ভূদেব মাথা পাতিয়া লন নাই—পিতার নিকট হইতে এ বিষয়ে হিন্দুজাতির প্রাচীন মত কি তাহা জানিয়া লইয়া, যথাকালে শিক্ষকের গোচরে আনিয়া তাঁহার ত্রুটী স্বীকার করাইয়া তবে স্থির হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার মধুসূদনের মত উদার-চরিত কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ;—জাতীয় মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে ভূদেবের বাল্য-জীবনের এই ঘটনা আকৃষ্ট করিবে।

হিন্দুজাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে ভূদেবের যে ধারণা ছিল, হয়তো সে ধারণার সঙ্গে এখন আমাদের সকলের ধারণার মিল হইবে না ; হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও ইহার আপেক্ষিক বয়ঃক্রম সম্বন্ধে এবং ইহার সৃজন ও পরিবর্দ্ধনে আর্য্য ও অনার্য্যের সাহচর্য্যের কথা লইয়া আমাদের কেহ কেহ হয়তো নবীন এবং ভূদেবের সময়ে অজ্ঞাত মত পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা হইলেও, একটী প্রাচীন ও সুসভ্য জাতি, যে জাতির সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া বংশ-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সেই জাতির ঘরের ছেলেরই মত তিনি আধিমানসিক বিষয়ে আচরণ করিতেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল, এখানে তাঁহার পক্ষে আত্মাভিমান-সম্পন্ন হওয়া বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক ছিল।

আজকাল আমরা এই আত্মমর্য্যাদাবোধ হারাইতে বসিয়াছি। জাতির প্রাচীন প্রতিষ্ঠাকে একেবারে বর্জ্জন করার ফলে, অথবা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বনের ফলেই বহু স্থলে এটা ঘটিতেছে। আমরা বাহ্য জীবনে থাকিবার ঘর যেমন ফিরিঙ্গীদের পরিত্যক্ত শস্তা আসবাবে ভর্ত্তি করি, নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, মনোজগতেও তেমনি ইউরোপের পরিত্যক্ত বুলি এবং ইউ-রোপের অসমাপ্ত প্রয়াস লইয়া, পরম ও চরম পদার্থ পাইয়াছি ভাবিয়া, অশোভন মাতামাতি করি,—একটু চিত্তস্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের সঙ্গে বস্তুটা বা অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করি না। এবিষয়ে ভূদেবের দৃষ্টান্ত ও তাঁহার শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আত্মমর্য্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্বাজাত্যবোধ এবং স্বজাতি-প্রীতি ভূদেবের চরিত্রের একটী বড় কথা। আজকাল একটু উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ভাগ্যবানদের মধ্যে দেখা যায় যায় যে, খাঁটী বাঙ্গালীভাবে, হিন্দুভাবে জীবনযাপন করা যেন লজ্জার কথা, ঘরের মধ্যেও তাঁহারা international হইতে চাহেন। যিনি যত বড়, তাঁহার চাল-চলন ততটা তাঁহার জাতি ও সমাজের বিশিষ্ট চাল-চলন হইতে পৃথক্। নিজের জাতির নিকট হইতে ও নিজের সমাজের পারিপার্শ্বিক হইতে পলাইয়া গিয়া যেন ইঁহারা বাঁচেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কলিকাতার ও অন্য কোন কোনও স্থলের সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী, দেশের বুকের মধ্যে বাস করিয়াও, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের দেশের মাটী হইতে আপনাদিগকে déraciné বা মূলোৎখাত করিয়া ফেলিয়াছেন ও ফেলিতে-ছেন। এই যে স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর লোকদিগকে কার্য্যতঃ বর্জ্জন করা, ইহার মধ্যে কতটা ভাবদৈন্য, কতটা প্রচ্ছন্ন আত্মাবনতি বিদ্যমান, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। আমাকে জনৈক ভিন্ন-প্রদেশীয় উচ্চপদস্থ হিন্দু ভদ্রব্যক্তি, আমাদেরই একজন বাঙ্গালী ভাগ্যবান্ হিন্দু গৃহস্থ-সন্তানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, একবার উক্ত বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের গৃহে আতিথ্যগ্রহণের সম্ভাবনা ঘটায় বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তানটী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—I hope you are not orthodox, because I do not keep any Hindu servants. অবশ্য অনেক superior বা উচ্চ-শ্রেণীর উদারচেতা ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পারিবারিক জীবনেও, জাতি এবং ধর্ম্মভেদের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। আমরা মাটী ছুঁইয়া চলি, আমাদের মধ্যে সে ঔদার্য্য আসিবে না। কিন্তু উক্ত বিভিন্ন প্রদেশীয় ভদ্রব্যক্তিটীর স্বরে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে আমার স্বজাতীয় ভাগ্যবান্ পুরুষদের কাহারও কাহারও আন্তর্জাতিকতার বহর এবং দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাকে অধোবদন হইতে হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া তো শিখিই না, ঠেকিয়াও শিখি না; এবং এমনই সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি যে ক্ষণিক সাশ্রয় হইবে বলিয়া নিজেদের বিকাইয়া বা বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত থাকি।

ভূদেবের মত স্বাজাত্যবোধ না আসিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভূদেবের এই শিক্ষাকে বিশ্বাসীর কাছে গুরুদত্ত উপদেশ বা দীক্ষামন্ত্র যেমন, সেইভাবে জীবনে কার্য্যকর করিয়া তুলিবার সময় এখন আসিয়াছে।

* * *

ভূদেবের আদর্শের দ্বিতীয় কথা—আচারনিষ্ঠতা। হিন্দুর জীবন বাহ্য বা ব্যবহারিক দিকে যে সকল চর্য্যা ও অনুষ্ঠান এবং বিধি ও নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আছে, ভূদেব সেগুলির উপযোগিতায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। দেশের জলবায়ু ও দেশের লোকের প্রকৃতি অনুসারে যে আচার দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতকর, ভূদেব বিশ্বাস করিতেন সেই আচারই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, এবং দেশের পুঞ্জীভূত, বহু সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ সেই সকল আচার অবলম্বন করিয়া, শাস্ত্রে নিহিত বিধিনিষেধ পালন করিয়া চলিলে, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়-বিধ মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। এখন সুবিধাবাদী আধুনিক জীবনের সঙ্গে আচারনিষ্ঠতা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না বলিয়াই প্রধানতঃ আমরা আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। এক প্রকার আচারের পরিবর্ত্তে অলক্ষ্যে আমরা বহু স্থলে আবার অন্য প্রকারের আচারের নিগড়ে আমাদের বদ্ধ করিয়া থাকি। একথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভূদেবের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, এখন তাহা বদলাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অন্য প্রকারের হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৪ সালে যে আচারনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল, ১৯৩৪ সালে

ভূদেব মুখোপাধ্যায়। [জন্ম ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী, মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে।

তাহা পূর্ণ ভাবে পালিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুগে যুগে সামাজিক বিধি-নিষেধ পরিবর্তিত হয়। আমাদেরও এবিষয়ে আবশ্যকমত পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভূদেব এখন জীবিত থাকিলে এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন। নিত্য-ধর্ম্ম তাঁহার কাছে লৌকিক-ধর্ম্ম অপেক্ষা বড়। আতিথ্যকে আচারনিষ্ঠতা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে লাভ করেন। হরিজন আন্দোলন ভূদেবের সময়ের কথা না হইলেও, তাঁহার পিতা এ বিষয়ে কতটা যে উদার ছিলেন, তাহা তাঁহার মুসলমান ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার ব্যবহারে বুঝা যায়। তাহারা বাড়ীতে আসিলে তিনি তাহাদের জলপানের জন্য পৃথক পিতলের গেলাস ও রেকাবী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য এই ভদ্রতার পিছনে ব্রাহ্মণের যে আচারনিষ্ঠা ও যে জাত্যভিমান বিদ্যমান ছিল, তাহা আজকালকার দিনে আমাদের পক্ষেও বুঝা কষ্টকর হয়, এবং তাহাতে সাত্মাভিমান মুসলমান বা অন্য অহিন্দু হয় তো তৃপ্ত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্রের সীমাকে অস্বীকার করিলে তো চলিবে না।

এখন হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে স্পর্শদোষের আতিশয্য আর থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দ ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতির গোঁড়ামি—বিশেষ ছোঁয়া-লেপায় এবং খাওয়া-দাওয়ায়—ধরিয়া রাখিতে গেলে, হিন্দুয়ানী এবং হিন্দু জাতি টিকে না; হয় জাতির গোঁড়ামি অর্থাৎ স্পর্শদোষ যাইবে,—নয় হিন্দু জাতি যাইবে, এবং উহার সহিত স্পর্শদোষেরও সহমরণ ঘটিবে। নানা ব্যাপার দেখিয়া ইহাই আমার মনে হয়। এখন ভূদেব বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার মত কি রূপ দাঁড়াইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার এবং তদনুসারে মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া, লোকাচার বা সমাজ দেখিয়া, শাস্ত্রও বদলাইতেছে।

* * *

ভূদেবের জীবনের প্রধান শিক্ষা তিনি তাঁহার পা রি বা রি ক প্র ব ন্ধে ও সা মা জি ক প্র ব ন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বইটীতে সমাজ-জীবনের ব্যষ্টি-স্বরূপ পরিবারের সুনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই; দ্বিতীয় বইটী জাতি ও সমাজের সমষ্টিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার ফল। যে পরিবারের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন, যাহার কথা তিনি মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছেন, সেটী হইতেছে বাঙ্গালা দেশের আত্মীয় ও কুটুম্ববহুল, চতুর্দ্দিকে প্রসারিত বাঙ্গালী হিন্দু যৌথ পরিবার। এই পরিবারের গড়নে এখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে—ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, পিতা মাতা পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পিতৃষ্বসা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি বহু-পরিজনময় যৌথ পরিবারের পরিবর্তে, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ভূদেব কিন্তু এই ভাঙ্গা যৌথ পরিবার, আধুনিক ধরণের শহরের ফ্ল্যাট-বাসী পরিবারের কথা ধরেন নাই। কিন্তু আমাদের আধুনিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিস্তর পরিবর্তন আসিয়া গেলেও, ভূদেবের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা পরিবারের পরিচালন বিষয়ে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় করিতে সহায়তা করিবার জন্য এই বইয়ের উপযোগিতা এখনও আছে, লোকচরিত্রের সহিত এবং পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের উদ্দেশ্য ও ভাবের সহিত ভূদেব এই বইয়ে গভীর পরিচয়ের নিদর্শন দিয়াছেন। পা রি বা রি ক প্র ব ন্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মূল্যবান প্রামাণিক বই; সাহিত্যের সহিত জীবনের বিশেষ সংযোগ আছে বলিয়া, এবং এই বইয়ে সত্যদর্শনের সঙ্গে জীবনেরই কথা আছে বলিয়া ইহা যথার্থ সাহিত্য পদবাচ্য।

পারিবারিক জীবনকে ভূদেব অতি পবিত্র বোধ করিতেন। সেই কারণে, এবং মুখ্যতঃ বোধ হয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুঘরের ছেলে বলিয়া, তিনি বিধবা বিবাহের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুঘরে এ বিষয়ে তাঁহার আপত্তি না থাকিলেও, তাঁহার মতে আভিজাত্যসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ঘরে বিধবা-বিবাহ হওয়া অনুচিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ছিল। এক্ষেত্রেও বলিতে হয়, ভূদেব পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতি এরূপ নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াছিলেন, যে নিম্নে পৃথিবীর উপরে কি হইতেছে বা হইতে পারে সেদিকে দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। ভূদেবের সময়ে বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজের একটা গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই। এখন হিন্দুসমাজের সমক্ষে নূতন অনেকগুলি সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। বিষয়কর্ম্মের

ও অর্থাগমের অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বহু শিক্ষিত যুবকের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করার সঙ্কল্প; নির্ম্মম হৃদয়হীনতার সহিত পণ প্রথার প্রসার; বহু পিতা কর্তৃক বাধ্য হইয়া কন্যাদের স্বীয় আজীবিকার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণের উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা; "সহশিক্ষা"-র প্রসার লাভ, অজ্ঞাতকুলশীল যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার ও "বন্ধুত্বে"র সুযোগ, এবং তাহার আনুষঙ্গিক নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা; পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ; ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে কোনও সমাধান বা ইঙ্গিত ভূদেবের রচনায় মিলিবে না, কারণ তাঁহার যুগে এগুলি বাঙ্গালীর জীবনে প্রকট হয় নাই। কিন্তু এই সব বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব (আজকালকার অনেকের মত) অন্ধভাবে যে রক্ষণশীল হইত না, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পা রি বা রি ক প্র ব ন্ধে ভূদেব যেমন আমাদের সমাজের ও ঘরের কথা বলিয়াছেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলার ক্ষেত্রে কোনও খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দেন নাই, সা মা জি ক প্র ব ন্ধে তিনি একটু ব্যাপক ভাবে বাহিরের কথা শুনাইয়াছেন। এই বইখানিও আমরা এখন পড়িয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, সামাজিক ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে ইহা হইতে কতকগুলি প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শন পাইতে পারি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তবে ভূদেবের ঈপ্সিত ভারতীয় জাতীয়তা (nationalism) সম্বন্ধে একটী কথা আমার মনে লাগে, এবং সেই কথাটী বিশেষ করিয়া প্রণিধানের যোগ্য। সংস্কৃতি বিষয়ে বাঙ্গালী ভূদেব হইতেছেন পূরাপূরি ভারতীয়,—আধুনিক একদল বাঙ্গালী লেখক সংস্কৃতি বিষয়ে "ভারত-বনাম-বাঙ্গালা"র যে বুলি ধরিয়াছেন, ভূদেব সে পথের পথিক ছিলেন না। আমাদের অনেকের কাছে, বিরাট বিশাল হিমাদ্রিবৎ ও মহাসাগরবৎ সুবিস্তৃত ভারতীয় সভ্যতা ও মনোভাবের সমক্ষে, তাহারই অংশীভূত এই বাঙ্গালীয়ানার বড়াই অত্যন্ত বিসদৃশ এবং অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া লাগে। ভারতের সনাতন আত্মা আমাদের হাজার কি সাত আট শত বৎসরের বাঙ্গালীত্বের চেয়ে অনেক বড় জিনিস। আমাদের বাঙ্গালীত্বের পিছনে পটভূমিকা স্বরূপে বিদ্যমান, ইহার আধার ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপে অবস্থিত প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) সংস্কৃতি ও সাধনা। বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানও যেন এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করিতেছে—বাঙ্গালা দেশ গঙ্গার দান, যে গঙ্গার উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের ক্রোড়মধ্যে গঙ্গোত্তরীতে—যে গঙ্গা উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। প্রয়াগে যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারার মিলন হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সেই যুক্ত ত্রিবেণী মুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার নদীবহুল সমতট ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি, উত্তর-ভারতের প্রাকৃত ভাষা—বাঙ্গালায় আসিয়া এখানকার জলবায়ুর গুণে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরন্তু তাহার ভারতীয় মূল প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে, বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে বা ভুলিতে পারি না। অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন আমরা বাঙ্গালার বাহিরের অন্য প্রদেশের লোকেদের হাতে নিজের ঘরের মধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি —তাহারা আসিয়া আমাদের বাড়া-ভাতে ভাগ বসাইতেছে। এখন বাহিরের লোকেদের শোষণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবেই; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। উত্তর-ভারত হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, "আমরা খাঁটী বাঙ্গালী, আমরা পৃথক্ 'আত্মবিস্মৃত' জাতি, আমাদের সব বিষয়েই ভারতের অন্য প্রদেশের জাতি-সমূহ হইতে একটা বৈশিষ্ট্য ও একটা শ্রেষ্ঠতা আছে"—ইত্যাদি চীৎকার, কতকটা ঘর সামলাইয়া লইবার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত, কতকটা ঘরের কুমীরের ভয়ে জাত, ইহা বুঝিতে দেরী লাগে না। ভূদেবের সময়ে এ সমস্ত কথা উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অনার্য্যবাদ আসে নাই, হিন্দু সন্তান মাত্রেই আর্য্যামির স্বপ্ন রচনা করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে আর্য্যগরিমার চিন্তায় বিভোর ছিল। এবং বাঙ্গালী তখন নিজ বাসভূমে পরবাসীও হয় নাই, তখন সামান্য দুইপাতা ইংরেজী পড়িয়া বাঙ্গালী ইংরেজের তল্পীদার সাজিয়া উত্তর-ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" (!)

সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত ছিল। বিচার করিয়া দেখিলে এই "বৃহত্তর বঙ্গ" সৃষ্টিতে তাহার কোনও গৌরব নাই। "অখণ্ড বা অখিল ভারত"—এই বোধ বঙ্কিম-ভূদেব-হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল-রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ ভাবুক ও মনীষীদের হাতে বিগত শতকের চতুর্থ পাদে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারত তথা বাঙ্গালার সংস্কৃতির দিক হইতে এই বোধ একটা বড় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে আমাদের স্বার্থকে বাহিরের বা অন্য প্রদেশের চাপের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না—প্রাণ দিয়া বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব; কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালা যাহার অংশ মাত্র, সেই ভারত—সেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না।

পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে রাষ্ট্র—এই সমস্ত বিষয়ে ভূদেব আমাদের শ্রোতব্য কথা শুনাইয়াছেন। বহুস্থানে ভূদেবের চিন্তা বা উক্তি এখন ভবিষ্যদ্বাণীর মত শুনায়। সা মা জি ক প্রবন্ধের বহু অংশ শ্রেষ্ঠ বিচার এবং বিবেচনার ফল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ছোট কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯২ সালের পূর্ব্বেই তিনি ভারতের একতার অন্যতম সাধন স্বরূপ হিন্দী ভাষার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন খুব কম লোকই এদিকে অবহিত হইয়াছিলেন।

নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ভূদেবের আদর্শ—অন্ততঃ ইহার কোন কোন অংশ—এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা আমাদের সমাজের পক্ষে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী ও তাঁহার পত্রাদি হইতেও কিছু কিছু চয়ন করিয়া, তাঁহার চত্বারিংশ শ্রাদ্ধ-বাসরের স্মারক স্বরূপ একটী ভূদেব-বাণীময় পুস্তক আধুনিক কালের তরুণ তরুণীদের পাঠের জন্য প্রকাশিত করিলে, এবং তাহা পাঠে ইহাদের প্ররোচিত করিলে ফল ভাল হইতে পারে।

বিবেকানন্দের মত তূর্য্যধ্বনি করিয়া সুপ্ত হিন্দুসমাজকে ভূদেব জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার ছিল বৃদ্ধ জ্ঞান-তাপসের স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠ। বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী এবং ভূদেবের বাণীর স্থির জ্যোতি—ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। ভূদেবের বাণী আমাদের বলিতেছে—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জান, নিজের প্রতি বিশ্বাস আন, নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ কর। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভূদেবের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের এই বড় দুর্দ্দিনে যেন কার্য্যকর হয়, যেন আমরা এই শিক্ষা পালন করিয়া জাতি-হিসাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। *

নিশান্ধকার অপগত, পূর্ব্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মর্ত্ত্যভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই। কালপুরুষ, সূর্য্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতিদেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই।

আমার নাম আশা। ঊষা আমার ভগিনী, আমি ঊষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম। —স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

সার্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদ রূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতিবিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

—সামাজিক প্রবন্ধ।

---

* চুঁচুড়া ভূদেব-স্মৃতিসভায় পঠিত (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)

এইবার সে ভিক্ষুদের ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতেছে। তারপর অনেক লোকজন আসিয়া সারিপুত্রকে সম্মান দেখাইলে পুত্রের গৌরবে মাতার চিত্ত পুত্রের প্রতি একটু নরম হইয়াছিল। অচিরে সারিপুত্রের মৃত্যুরোগ প্রকাশ পাইল, তিনি রক্তবমন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সারিপুত্র মাতাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা তিনি মাতার জন্মদান, লালনপালন ও শিক্ষাদানের উপকারের প্রতিদান করিলেন। তারপর সারিপুত্র তাঁহার শিষ্যদের

তপস্যাক্লিষ্ট বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি—গান্ধার শিল্পের নিদর্শন
ইহা এখন লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কাছে যদি কোন দোষ করিয়া থাকেন, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সারিপুত্রের মৃত্যুতে মাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রের উপযুক্ত সমাদর করেন নাই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রূপসারি অনেক ব্যয় করিয়া সারিপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করাইয়াছিলেন। সারিপুত্রের ভ্রাতা সারিপুত্রের পাত্র ও চীবর বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন—কোন ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে পাত্র ও চীবর তাহার গুরুর কাছে লইয়া আসার নিয়ম ছিল, জৈনদের মধ্যেও এই নিয়ম ছিল দেখিতে পাই। সারিপুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, তাঁহার পাত্রচীবর ভিক্ষুদের দেখাইয়া বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যিনি এই সেদিন পর্য্যন্ত তোমাদেরই সম্মুখে এত কাজ করিতেছিলেন, দেখ, তাঁহার এই মাত্র অবশেষ আছে।" বুদ্ধ সারিপুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "সারিপুত্র লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে জানিতেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তিনি আত্মসংযমী ও অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি দীর্ঘ কথা বলিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন ও বাদবিসম্বাদপ্রিয় ছিলেন না; ধর্ম্মের জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। আমার ধর্ম্মপ্রচারে সারিপুত্র পৃথিবীর মত ধৈর্য্য ও ভগ্নশৃঙ্গ বৃষের মত শক্তি দেখাইয়াছেন; তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করে।" বুদ্ধ যে সারিপুত্রের গুণে কত মুগ্ধ ছিলেন তাহা এ কথায় বুঝা যায়; সারিপুত্রের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। সারিপুত্রের মৃত্যুতে ও বুদ্ধের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া কোমলপ্রাণ আনন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তিনিও সারিপুত্রকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। বুদ্ধ সকল বস্তুর নশ্বরতা বুঝাইয়া আনন্দকে সান্ত্বনা দিলেন।

কোটিগ্রাম হইতে বুদ্ধ নাদিকদের গ্রামে গেলেন। এই স্থানে মৃত কয়েকজন ভিক্ষুর অবস্থা কি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আনন্দ প্রশ্ন করিলে, বুদ্ধ ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যু সকলেরই হইবে এবং এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া তথাগতকে প্রশ্ন করা অনুচিত। তারপর বুদ্ধ বৈশালীতে গিয়া আম্রপল্লীর আমবাগানে থাকিলেন। এই সময়ে, বুদ্ধের মৃত্যুর মাত্র সাত আট মাস পূর্ব্বে, আম্রপালী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সংঘকে আমবাগান দান করিয়াছিলেন, সে বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি। ভিক্ষুরা বৈশালীতেই থাকিল, কিন্তু বুদ্ধ একটু দূরে বেলুবগ্রামে গিয়া বর্ষাযাপন করিলেন। এই সময় বুদ্ধ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া সঙ্ঘের কাছে বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে অসুস্থতা প্রকাশ করেন নাই। বুদ্ধের অসুস্থতায় আনন্দ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, সঙ্ঘসম্বন্ধে বন্দোবস্ত না করিয়া তথাগতের নির্ব্বাণ লাভ করা উচিত নয়। বুদ্ধ বলিলেন, "সঙ্ঘ আমার কাছে কি প্রত্যাশা করেন? আমি ত' 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে কিছুই গোপন রাখিয়া বলি নাই; এ বিষয়ে তথাগত তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে কৃপণ গুরুর মত হন নাই। 'আমি সঙ্ঘ পরিচালনা করিব' 'সঙ্ঘ আমার অপেক্ষায় থাকে' এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারাই সঙ্ঘ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু তথাগত এরূপ মনে করেন না যে 'আমি সঙ্ঘ পরিচালন

করিব,' 'সঙ্ঘ আমার অপেক্ষায় থাকে' ; তবে কেন তথাগত সঙ্ঘ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবেন ? আনন্দ, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে, এখন আমার আশী বৎসর বয়স হইয়াছে ; পুরাতন জীর্ণ শকটের মত অনেক জোড়াতালি দিয়া এখন তথাগতের শরীর রক্ষা করিতে হয় ; এখন শুধু অনন্যচিত্ত ধ্যানের অবস্থাতে মাত্র তথাগতের শরীব সুস্থ বোধ করে। অতএব আনন্দ, এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের আশ্রয় হইয়া, শরণ হইয়া বিহার কর, অন্য কিছুর বা কাহারও শরণ লইও না ; তোমরা ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, ধর্ম্মের শরণ লইয়া বিহার কর, অন্য কিছুর বা কাহারও শরণ লইও না (অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা) ; আনন্দ এখন বা আমার মৃত্যুর পর যে জিজ্ঞাসু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া ধর্ম্মদ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে, সেই ভিক্ষুই অন্ধ-কারের পরপ্রান্তে পৌছিবে।"

পরদিন বুদ্ধ বৈশালীতে ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষান্তে তিনি ফিরিয়া আনন্দের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। বর্ণিত আছে, এই সময়ে তিনি কয়েকবার আনন্দকে বলিয়া-ছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে তিনি অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু আনন্দ একথার উত্তরে কিছু না বলায় বুদ্ধ তাঁহাকে বিদায় দিলে আনন্দ গিয়া একটি বৃক্ষতলে বসিলেন। তারপর ভূমিকম্পাদি হইল ; বুদ্ধ অনেক উপদেশ দিলেন ও তখন আনন্দ বুদ্ধকে এককল্প বাঁচিয়া থাকিতে অনুরোধ করিলে, বুদ্ধ তাঁহাকে পূর্ব্বে অনুরোধ না করার জন্য তিরস্কার করিলেন। শাস্ত্রলেখকরা বোধ হয় সাধারণ লোকের মত বুদ্ধেরও মৃত্যু হইয়াছিল, ইহাতে লজ্জিত বোধ করিয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বটে, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে নাও মরিতে পারিতেন। বুদ্ধ আনন্দের দ্বারা বৈশালীর ভিক্ষুদের ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বলিলেন, "এস ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের উপদেশ দিতেছি ; সকল বস্তুই বিনাশশীল, প্রমাদহীন হইয়া সচেষ্ট থাক ; অচিরেই তথাগত নির্ব্বাণলাভ করিবেন।" পরদিন আবার বৈশালীতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া ফিরিবার সময় তিনি শেষবারের মত বৈশালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিলেন। সংসারকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, বৈশালীর মত জনাকীর্ণ নগরকেও তিনি তাঁহার কর্ম্ম-স্থান মনে করিতেন। বেলুবগ্রাম হইতে বুদ্ধ ভণ্ডগ্রামে গিয়া উপদেশ দিলেন, তারপর সেখান হইতে হস্তিগাম, আম্রগ্রাম

এই পাত্রে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল, একথা পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপি হইতে জানা যায়।

ও জম্বুগ্রামের মধ্য দিয়া ভোগনগরে গিয়া কিছুদিন থাকিয়া উপদেশ দিলেন। সেখান হইতে পাবাগ্রামে গিয়া চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আমবাগানে থাকিলেন। এই পাবাগ্রামে মহাবীরের মৃত্যু হইয়াছিল।

পরদিন চুন্দ তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করিল। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস এবং বহু পরিমাণ 'সূকরমদ্দব' ছিল। বুদ্ধঘোষ ইহাতে 'নরম শূকরমাংস' বুঝিয়াছেন ; 'উদান' টীকাকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইহাতে শূকরপদপিষ্ট এক প্রকার গুল্ম, 'ব্যাঙের ছাতা' (পালিতে 'অহিছত্তক' সাপের ছাতা) বা একরকম মশলাও বুঝায়। শেষের গুলি পরবর্ত্তী-কালের মাংসভোজন দোষক্ষালনের জন্য কল্পিত বলিয়া মনে হয়। জৈনরাও মহাবীরের বিড়ালে মারা পায়রা খাওয়ায় লজ্জিত হইয়া বিড়াল ও পায়রা শব্দ দুইটির নিরামিষ অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্ধ এই আহার্য্যের দুষ্পাচ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং ইহা খাইবার পর তিনি রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার রক্তপাত হইল ও তিনি তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করিলেন। ইহা সহ্য করিয়া তিনি পাবা হইতে কুশীনগরে (কুসিনারা)

যাত্রা করিলেন। পথে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তিনি আনন্দকে একটি চীবর চার ভাঁজ করিয়া গাছের তলায় বসিবার জন্য বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বুদ্ধ পানীয় জল চাহিলেন। আনন্দ জল আনিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে গাড়ী পার হওয়ায় জল কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। বুদ্ধ আবার পিপাসায় কাতর হইয়া জল চাহিলেন, আনন্দকে আবার অনেক দূর হইতে জল আনিয়া দিতে হইল।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীতে সম্রাট অশোকের শিলা-স্তম্ভ-লিপি।

আলার কালামের শিষ্য পুক্কুস নামে একজন মল্লবংশীয় লোক আসিয়া বলিল যে, একবার আলার মুক্তস্থানে ধ্যানে বসিয়াছিলেন এবং যদিও জাগ্রত ও সজ্ঞান ছিলেন তবুও তাহার পাশ দিয়া অনেক গাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা মোটেই টের পান নাই। বুদ্ধ বলিলেন, তিনি যখন আতুমা নামক স্থানে ছিলেন তখন মুক্ত স্থানে ধ্যানে বসিয়াছিলেন, ধ্যানান্তে দেখিলেন, নিকটে অনেক লোক জড় হইয়াছে এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, প্রবল মেঘ গর্জ্জন হইয়া বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে ও বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষক ও চারটি বলদ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই টের পান নাই। পুক্কুস বুদ্ধকে বস্ত্রদান করিলে আনন্দ তাহা বুদ্ধকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর বুদ্ধ উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে ককুত্থা নদীতে পৌছিয়া তিনি স্নান ও জলপান করিলেন এবং একটি আম-বাগানের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন। চুন্দের প্রদত্ত ভোজ্য আহার করিয়া তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধি হইল বলিয়া কেহ যেন চুন্দকে দোষ না দেয়, আনন্দকে তিনি এই কথা জানাইলেন। তারপর হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের বহিঃস্থ শালবনে পৌছিয়া বেদনায় কাতর হইয়া বুদ্ধ আনন্দকে একটি শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিয়া শয়ন করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ শয়ন। বর্ণিত আছে যে, এ সময়ে বৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি (শাল গাছের ফুল স্বভাবতই ফুটিবামাত্র নীচে ঝরিয়া পড়ে) ও স্বর্গে গীতবাদ্য হইয়াছিল, এবং বুদ্ধ স্থবির উপবনকে সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, কারণ দেবতারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ও উপবন তাঁহাদের আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে আনন্দের যে প্রশ্নের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাও এইখানে উল্লিখিত আছে। মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, তথাগতের দেহাবশেষের আমরা কি ব্যবস্থা করিব?"

"আনন্দ, তথাগতের দেহাবশেষের প্রতি সম্মানাদি দেখাইবার কথা তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আনন্দ, আমি তোমাদের অনুরোধ করিতেছি, তোমরা নিজেদের যত্ন কর, নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা কর; নিজেদের জন্য উদ্যম কর, নিজেদের মঙ্গলের প্রতি যত্নশীল হও; যে উপাসকেরা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গৃহপতিরা তথাগতকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা তথাগতের দেহাবশেষের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।" বুদ্ধ আরও এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী ধর্ম্মশরণ হইয়া বিহার করে, যে সম্যক আচরণে যত্নবান হয়, যে ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে, সেই তথাগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা করে।"

তারপর একটি অতি করুণ দৃশ্য অভিনীত হইল। যে গুরুকে তিনি এত ভাল বাসিতেন, এত ভক্তি ও সেবা করিতেন, তাঁহার শেষ সময়ের অবস্থা আর সহিতে না পারিয়া আনন্দ দূরে সরিয়া গিয়া কুটিরের দরজার চৌকাঠে হাত রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি এখনও শিক্ষাধীন আছি. আমার এখনও অনেক বাকি থাকিল এবং যে ভগবান আমাকে এত স্নেহ করিতেন তিনি নির্ব্বাণলাভ করিতেছেন!" বুদ্ধ আনন্দকে ডাকিয়া পাঠাইয়া আনন্দ আসিলে বলিলেন, "না আনন্দ, অধীর হইও না, কাঁদিও না। আমি কি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার বলি নাই যে, যে সব বস্তু আমাদের অতি প্রিয় তাহাদের স্বভাবই এই যে, আমাদের তাহা ছাড়িতে হইবে, ত্যাগ করিতে হইবে? আনন্দ, যে জিনিষের জন্ম আছে, উৎপত্তি আছে ও যাহা অবশ্যই নাশ

হইবে, তাহার যে বিনাশ হইবে না, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? এরূপ হইতেই পারে না। আনন্দ, অনেকদিন ধরিয়া তুমি চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে আমার প্রতি প্রীতি দেখাইয়াছ ও আমার অন্তরঙ্গ ছিলে, তুমি আমার অনেক সেবা করিয়াছ, অনেক যত্ন লইয়াছ, ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই ও ইহা অতুলনীয়। আনন্দ, তুমি ভালই করিয়াছ ; সযত্নে প্রয়াস কর, তুমিও অচিরে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।"

তারপর বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত ; কখন তথাগতের সঙ্গে দেখা করিতে হয় তাহা আনন্দ জানিত, কখন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা, গুরুদের বা শিষ্যদের, রাজাদের বা মহামাত্যদের তথাগতের সঙ্গে দেখা করিবার উপযুক্ত সময় আনন্দ তাহাও জানিত ; আনন্দকে দেখিয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা পুলকিত হইত, আনন্দ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলে তাহারা তুষ্ট হইত, আনন্দ নীরব থাকিলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইত।" বুদ্ধ আনন্দকে আবার বলিলেন, "আনন্দ, তোমাদের মধ্যে কাহারও হয়ত এরূপ মনে হইতে পারে, 'ভগবানের কথা শেষ হইয়া গিয়াছে, আমাদের গুরু আর কেহ নাই।' কিন্তু আনন্দ, এরূপ মনে করা তোমাদের উচিত হইবে না। আমি যে সত্য প্রচার করিয়াছি ও সঙ্ঘের জন্য যে সব নিয়ম করিয়াছি আমার অভাবে সেইগুলি যেন তোমাদের উপদেষ্টা হয়।" ভিক্ষুরা তাঁহার অভাবে পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ পরস্পরকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহারও বিধান তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে এবং আনন্দ নাকি বুদ্ধকে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ আনন্দের মুখে মল্লবংশীয়দের আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। মল্লেরা সপরিবারে উপস্থিত হইলে এক এক করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধের কাছে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় আনন্দ এক এক পরিবারকে এক এক বারে লইয়া গিয়া বুদ্ধদর্শন করাইলেন। সেই স্থানের সুভদ্র নাম্নী একজন সন্ন্যাসী সংবাদ শুনিয়া বুদ্ধদর্শনে আসিয়াছিলেন। আনন্দ তাঁহাকে বুদ্ধের কাছে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া সুভদ্রকে আসিতে দিতে বলিলেন। অবশেষে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না। ভিক্ষুরা কেহই কিছু বলিল না এবং কাহারও যে কিছু সন্দেহ নাই ইহাতে আনন্দের সবিস্ময় হর্ষ হইল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের এই উপদেশ দিতেছি—সকল বস্তুই বিনাশশীল, অপ্রমাদ হইয়া প্রয়াস কর (বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা)।" ইহাই বুদ্ধের শেষ কথা।

তারপর বুদ্ধ ধ্যানের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দ স্থবির অনুরুদ্ধকে বলিলেন, "ভদন্ত অনুরুদ্ধ, ভগবান নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।"

"না আনন্দ, ভগবান নির্ব্বাণ লাভ করেন নাই, যে অবস্থায় চেতনা ও বেদনার অন্ত হয় তিনি সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।" তারপর বুদ্ধ আরও কয়েকবার উচ্চ হইতে নীচ ও নীচ হইতে উচ্চ – ধ্যানের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাত্রির তৃতীয় যামে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মায়ানির্মুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়া অন্য সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। সকল প্রিয় বস্তুরই পরিবর্ত্তন ও বিয়োগ আছে, ও উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই নাশধর্ম্মা – ভগবানের এই শিক্ষা স্মরণ করাইয়া স্থবির অনুরুদ্ধ সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। পরদিন অনিরুদ্ধ আনন্দের মুখে কুশীনগরের মল্লদের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন ও মল্লেরা গন্ধমাল্য বাদ্য ও বস্ত্রাদি লইয়া আসিলেন ; কয়েকদিন ধরিয়া নৃত্যগীত চলিল। মৃতদেহ নগরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। স্থবির মহাকাশ্যপ সে সময়ে পাবাগ্রামে ছিলেন। একজন আজীবক শ্রমণের মুখে বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের কথা শুনিয়া তিনিও পাবা হইতে যাত্রা করিলেন। সুভদ্র নামে মহাকাশ্যপের একজন শিষ্য বৃদ্ধ বয়সে সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিল। সে সকলকে বলিল, "আয়ুষ্মগণ, তোমরা শোক বা বিলাপ করিও না, মহাশ্রমণের হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইয়াছি ভালই হইয়াছে। 'ইহা তোমাদের উচিত', 'ইহা তোমাদের অনুচিত' বলিয়া প্রায়ই আমাদের ত্যক্ত করা হইত ; এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব, যাহা ইচ্ছা নয় তাহা করিব না।" মহাকাশ্যপ সুভদ্রকে নিরস্ত করিয়া ভিক্ষুদের সান্ত্বনা দিলেন। মহাকাশ্যপ না পৌছান পর্য্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থগিত রাখা হইল। রাজা অজাতশত্রু বলিয়া পাঠাইলেন,

"ভগবানও ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়; আমিও তাঁহার দেহাবশেষের অংশ পাইবার যোগ্য।" বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদীপের একজন ব্রাহ্মণ এবং পাবাগ্রামের মল্লগণও অংশ চাহিল। কিন্তু কুশীনগরের মল্লেরা সন্থাগারে মিলিত হইয়া ঘোষণা করিল, বুদ্ধ যখন তাহাদের রাজ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন তাহারা কাহাকেও অংশ দিবে না। ইহাতে বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় দেহাবশেষ আটভাগে ভাগ করিয়া সকলে এক এক ভাগ লইল। পিপ্‌ফলিবনের মোরিয়গণ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় অংশ না পাইয়া শুধু চিতাভস্ম গ্রহণ করিল।

বুদ্ধের অন্তিম সময়ে তাঁহার কাছে যে সব বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার মধ্যে ছন্ন নামক ভিক্ষুকে কৃতাপরাধের জন্য দণ্ডদানের বিষয় জিজ্ঞাসা ছিল। এই ছন্ন সিদ্ধার্থের সেই মহানিষ্ক্রমণের সঙ্গী ছন্দক। ছন্দকও সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বাল্যকাল হইতে বুদ্ধকে জানিত বলিয়া সঙ্ঘের কাহাকেও মানিত না এবং একটি অপরাধ করিয়া তাহার দণ্ডপালন করিতে অস্বীকৃত হয়। বুদ্ধ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাহার স্নেহাভিমানে আঘাত করেন নাই, ইহাতে তাঁহার মানুষভাবই সূচনা করে। তিনি অন্তিমশয়নে বলিয়া যান যে, ছন্দক যদি দণ্ডগ্রহণ না করে তবে যেন তাহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করা হয়।

লুম্বিনীতে সম্রাট অশোকের শিলাস্তম্ভ-লিপির পাঠ :—

"দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন আগচা মহীয়িতে, হিদ বুধে জাতে সক্যমুনীতি সিলা বিগডভীচা কালাপিতা সিলাথভে চ উসপাপিতে, হিদ ভগবং জাতেতি লুংমিনিগামে উবলিকেকটে অথভাগিয়েচ"—

"দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (অশোক) অভিষেকের পর বিংশতি বর্ষে স্বয়ং আসিয়া পূজা করিয়াছিলেন যেহেতু শাক্যমুনি বুদ্ধ এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেজন্য তিনি (অশোক) এখানে একটি বিরাট প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ ও প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, যেহেতু এখানে ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেজন্য লুম্বিনীগ্রাম ধর্ম্মকর মুক্ত করা হইল ও অষ্টমাংশ মাত্র রাজকর দিবে (ধার্য্য হইল)।"

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের অনেক কথা, অনেক উপদেশ আছে। তাহার মধ্য হইতে মিলিন্দ প্রশ্নে নাগসেনের নির্ব্বাণ ব্যাখ্যার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তি লাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা— এই নির্ব্বাণের অবস্থা।"

"যিনি স্বীয় জীবনকে পুণ্য পথে নিয়োজিত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করেন তিনি কি দেখেন? জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন - সকলই অস্থির— সর্ব্বত্রই অশান্তি। এই দৃশ্যে তাঁহার শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই। পুনঃপুনঃ জন্মভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত থাকেন ও সেই ভীতি বশতঃ আরোগ্যলাভে অসমর্থ। এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, এই জ্বালা যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যেখানে জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, বাসনার দংশন নাই, আসক্তিবিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই আমার সকল কামনা পূর্ণ হয়। সাধনা দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে জন্ম-ভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন, সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন, সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, অতএব মণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন।"

এই নির্ব্বাণ মুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয় স্থান। চীন, তাতার, কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধুপুরুষ বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আসক্তিবিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তঃপুর

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক

দ্বিতীয় ভাগ

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি নানা দেশায় স্ত্রীসকল যাহারা আপন ২ দেশের বিদ্যা শিখিতে অনাদর করেন তাঁহাদের প্রতি বিবি লোকের সবিনয় নিবেদন এই, যে তাঁহারা আপন খরচে কিম্বা ঐ বিবি লোকের সহায়তাতে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেন ॥

আগে যে সকল দেশ কহিয়াছি তাহার মধ্যে গৌড় দেশের স্ত্রীগণ আপন দেশের বিদ্যা রহিত হইয়া অতি দুঃখে কালক্ষেপণ করেন। ইহাতে স্ত্রীগণের অপরাধ নাই, কেননা তাঁহারা শিশুকালে যখন বাপ মায়ের বাটীতে থাকেন তখন তাঁহাদের পিতা মাতা পুত্রাদিকে বিদ্যা শিখিবার জন্যে পাঠশালায় পাঠান, কিন্তু লোকপরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া কেবল গৃহমার্জ্জনাদি কর্ম্ম শিক্ষা করান। স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ে দোষের লেশও নাই। ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রীসকলকে কেবল প্রায় পশুর মত করিয়া যাবজ্জীবন দুঃখভাগী করেন ॥

যদ্যপি স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনুসূয়া, বাস্পট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি পূর্ব্বকার স্ত্রী সকল নানা শাস্ত্র পড়িয়া সেই ২ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং এখনকার রাণী ভবানী, হঠীবিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, ইঁহারাও লেখা পড়া এবং নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাঁহাদের কোন রূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে ॥

বিদ্যা না থাকিলে মনের মধ্যে কেবল মন্দ চেষ্টা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং অনাথা কিম্বা বিধবাদি হইলে মনের কাতরতাতে নানা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলে পাপ কর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মে মতি হয়, এবং মন স্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞানরূপ ডাঙ্কশ দিয়া নিবারণ করিয়া আপন পদে ও জাতিতে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদের কাল যাপন হইতে পারে ॥

যদি বল স্ত্রী লোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতি শাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এ দেশের স্ত্রী লোকেদের পড়া শুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্র বিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাঁহারদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। এ দেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রী লোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান। স্ত্রী সকল গৃহকর্ম্মের কিছু অবকাশ পাইয়া বিনা উপদেশে কেবল আপন বুদ্ধিতে স্ত্রী নির্ম্মাণ আলিপনা সিন্দূর চুবড়ী গাঁথা কৌটা কাটা বুটা তোলা ও নানা প্রকার মিঠাই পাক করা খএরের গাছ কৌটা ইত্যাদি দ্রব্যের আকার গড়ন ও চুল বান্ধা। যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন। তবে কি তাঁহারা বালক কাল অবধি বিদ্যা শিখিতে অশক্ত হন এমত নহে ॥

যদি স্ত্রালোকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকিত তবে তাঁহারা স্বামির ও শ্বশুরের সেবা কি রূপে করিতে হয় ও স্বামির সেবাতে ও স্বামির বাক্য পালন করাতে কি ফল, তাহা জানিয়া শাস্ত্রের মত স্বামির সেবা করিতেন এবং স্বামির আজ্ঞানুসারিণী হইতেন। এখনকার স্ত্রীলোক প্রায় অজ্ঞান এই নিমিত্ত তাঁহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে। তাঁহাদের লেখা পড়া জ্ঞান যদি থাকিত তবে আপন ২ ঘরের কর্ম্ম ও পতির সেবার অবকাশে পুস্তকাদি পড়িয়া সুস্থির মনে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত ॥

এই বিষয়ের দৃঢ় প্রমাণের জন্যে ক্রমে ২ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে অতিশয় কঠিন এবং প্রায় অনেকের বুদ্ধির অগোচর যে ব্রহ্ম জ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন। সেই মহাসাধ্বী মৈত্রেয়ীর সুখ্যাতি চিরজীবিনী অদ্যাপি আছে এবং লৌকিক শাস্ত্রীয় বিষয়ে কিছু দোষ লেশ থাকিলে অতি জ্ঞানি যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রীকে জ্ঞান দান করিতেন না ॥

কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলা নামে একস্ত্রী তিনি নানা শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, এবং দুষ্মন্ত রাজা যে নামাক্ষরের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন তাহা আপনি পড়িয়া তাহার অর্থ আপন সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে বুঝাইয়াছিলেন ইহা কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাম নাটকে প্রমাণ আছে ॥

আর ব্রহ্মার পুত্র অত্রিমুনি তাঁহার স্ত্রী অনুসূয়া তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে নানা শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥

দ্রুপদ রাজার কন্যা পাণ্ডবেরদের স্ত্রী দ্রৌপদীর পাণ্ডিত্য ও নীতিজ্ঞতা ও বিবেচনা কি পর্য্যন্ত তাহা লিখিয়া কি জানাইব, তথাপি শাস্ত্রানুসারে কিছু লিখিতেছি। এক দিন পঞ্চপাণ্ডব যুদ্ধে শ্রমযুক্ত হইয়া কানাতের মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন এবং অন্য এক তাম্বুতে তাঁহারদের পাঁচ পুত্র নিদ্রিত ছিলেন, ইহার মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিকালে গোপনে সেইখানে আসিয়া পঞ্চপাণ্ডব জ্ঞানে ঐ পঞ্চপুত্রের মস্তক কাটিলে পর প্রাতঃকালে অর্জ্জুন তাহা

দেখিয়া পুত্রশোকে কাতর হইলেন ও অশ্বত্থামাকে সেই দিনের মধ্যেই মারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বান্ধিয়া আনিলেন ও মারিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী পুত্রশোকে কাতরা হইয়াও আপন বিদ্যার বলেতে কহিলেন, যে অশ্বত্থামা গুরুপুত্র তাঁহাকে বধ করা অনুপযুক্ত এবং আমার মত তাঁহার মাতা কাতরা হইবেন। দ্রৌপদীর এই উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন। যথা—

ব্রহ্মবন্ধুর্নহন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
মুণ্ডনংদ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনন্তথা।
এষোহি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধোনান্যোস্তি দৈহিকঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি আততায়ী হইলেও বধের যোগ্য নহে, মাথা মুড়ান ধন লওয়া স্থান হইতে দূরকরণ এই ব্রাহ্মণের বধ, তাঁহাদের শরীরের দণ্ড নাই।

এই নানাপ্রকার নীতি শিক্ষা করাইয়া দয়া প্রকাশ করিয়া অশ্বত্থামার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি দ্রৌপদীর বিদ্যা না থাকিত, তবে এমন নীতিজ্ঞতা তাঁহার হইতে পারিত না।

বিদ্যাস্বরূপা ভগবতীও বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, কুমারসম্ভব নামক গ্রন্থে তাহা বর্ণন আছে। যথা—

তাং হংসমালাঃ সরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীনক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশ কালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

অর্থাৎ প্রাক্তনজন্মবিদ্যার ন্যায় বিদ্যা উপদেশকালে ভগবতীকে পাইয়াছিলেন, যেমন হংসশ্রেণী শরৎকালে গঙ্গাকে পায় সেই প্রকার।

রুক্মিণী হরণ প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবেদব্যাস কহিয়াছিলেন, যে রুক্মিণী এক পত্র লিখিয়া সুদামা নামে এক ব্রাহ্মণের হস্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই পত্র পাইয়া ঐ সুদামা ব্রাহ্মণকে যথোচিত শিষ্টালাপ ও ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা সমাচার পাঠাইলেন, যে তোমার মনের ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিব, তাহাতে রুক্মিণী স্থির হইয়া থাকিলেন। অতএব রুক্মিণী যদি বিদ্যা না জানিতেন, তবে আপন মনের বাঞ্ছিত পত্র আপন প্রিয়তমের নিকট পাঠাইতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত না।

ঊষা হরণ প্রকরণে লিখিত আছে যে চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা অতি উত্তমরূপে ছিল, বিশেষ তাঁহার সমান চিত্রকারিণী প্রায় কেহ ছিল না।

উদয়নাচার্য্য যখন কাশীতে তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় শঙ্করাচার্য্য বিচার করিতে উদয়নাচার্য্যের নিকট আইলে তিনি কহিলেন যে আমার মরণ সময় উপস্থিত, এখন বিচার করিবার সময় নহে, অতএব আমার জামাতা মণ্ডন মিশ্র আছেন, তাঁহার সঙ্গে বিচার করহ। শঙ্করাচার্য্য এই কথা শুনিয়া ঐ মণ্ডন মিশ্রের নিকট গিয়া অতিশয় বিচার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যস্থ ঐ উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী ছিলেন। আর লীলাবতী রচিত অনেক গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে, তাহা পণ্ডিতেরা ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকারক ভাস্করাচার্য্যের কন্যা আর এক লীলাবতী ছিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নীচের লিখিত অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লীলাবতী আপন বিদ্যার বলেতে সকল জিজ্ঞাসার সুন্দর উত্তর করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নামে পাটী ও বীজ লীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। যথা—

অয়ে বালে লীলাবতী মতি মতি ব্রূহি সহিতান্
দ্বিপঞ্চ দ্বাত্রিংশত্ত্রিনবতি শতাষ্টাদশ দশ।
শতোপেতানে তানযুত বিযুতাংশ্চাপি বদ মে
যদিব্যক্তে যুক্তিব্যবকলিত মার্গেসি কুশল॥

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমতি লীলাবতী দুই পাঁচ বত্রিশ তিরানব্বই একশত আঠার দশ এই অঙ্কে একশত যোগ করিয়া দশহাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে, তাহা আমাকে কহ, যদি তুমি তেরিজ জমাখরচের পথ ভাল জান।

এবং বাস্বট কন্যার পাণ্ডিত্য কি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণন করা সাধ্য নহে। ঐ কন্যা যখনা কান্তা হইলে বাস্বটকে কহিয়াছিল, যে হে পিতঃ তুমি কান্দিও না, যে হেতুক কর্ম্মের গতি এই প্রকার, যেমন দুষধাতুর গুণ হইলে দোষ হয়, তেমন আমার বিদ্যা গুণ হইয়াও দোষ হইয়াছে। যথা—

তাত বাস্বট মা রোদীঃ কর্ম্মণোগতিরীদৃশী।
দুষধাতুরিবাস্মাকং দোষ সম্পত্তয়ে গুণঃ॥

আর রাজাধিরাজ কর্ণাটের রাণী নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কিছু বিবরণ লিখি। একদিন মহামহোপাধ্যায় কালিদাস কর্ণাট রাজার সভায় আসিয়া কবিতা দ্বারা রাজার ও রাজসভার নানা প্রকার বর্ণন করিয়া রাজাকে ও সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, পরে কর্ণাট রাজার মহিষী এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মা ও ব্যাসদেব ও বাল্মীকি মুনি এঁহারাই কবি, এবং ত্রিলোকের মান্য, ও তাঁহারদিগকে নমস্কার করি। তাহা বিনা এখনকার কেহ যদি গদ্য পদ্য দ্বারা মনের চমৎকার জন্মাইতে পারেন তবে ইঁহাদের বাম চরণ আমি মস্তকে ধারণ করি। এইরূপ মহা মহোপাধ্যায় কালীদাসের সহিত কর্ণাট রাজার মহিষীর বাদানুবাদ অনেকে প্রায় জ্ঞাত আছেন। যথা॥

এ কো ভূন্নলিনাৎ পরস্ত পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরে
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥

এইরূপ লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রীর বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে। এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে; এমন সময়ে লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী আপন শ্বশুরের ভোজনের জন্য স্থান মার্জ্জন করিতে২ অতি সাধ্বী স্বামিবিরহে কাতরা হইয়া মৃত্তিকাতে এই কবিতা লিখিলেন॥ যথা

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ নিরন্তর বৃষ্টি পড়িতেছে, এবং ময়ূর সকল হর্ষে নৃত্য করিতেছে ; অদ্য আমার দুঃখ দূরকর্ত্তা স্বামী কিম্বা যম হইবেন। পরে সেই স্থানে বল্লাল সেন আসিয়া ঐ শ্লোক পড়িয়া পুত্রবধূ বড় কাতর হইয়াছেন ইহা জানিয়া, সেইদিনই আপন পুত্রকে বাটী আনাইলেন ॥

এবং অতি সুখ্যাতিযুক্তা খনা নামে মিহিরাচার্য্যের স্ত্রী জ্যোতিষ শাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, তাঁহার বচন প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি ভাষায় অনেক জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ॥ যথা।

অনল বৈষ্ণব বেধ ব্রহ্ম শন্য গণি। বাণ একুশে ঋতু নব সাত উনিশে জানি ॥ বসু শক্র ফণি মৈত্র দিক্‌পঙ্গে মেলা। শিবা চাঁদে দিবাকরে পূষার সঙ্গে খেলা। কর ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সতভিসা। ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সপ্ত সলাক ভাষে ইত্যাদি ॥

তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এক দিবস সৈন্য সামন্ত সহিত মৃগ মারিতে কোন মহাবনে গিয়া সৈন্য সামন্ত রাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অতিশীঘ্র মৃগের পাছে ২ গিয়া আপন সেনাগণের অদৃশ্য হইলেন। অতি নিৰ্জ্জন বনে মৃগের অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, যে বনে চন্দ্রকলার মত চন্দ্রকলা নামে পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে। মাধব ঐ কন্যাকে দেখিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ বলাৎকার করিতে উদ্যত হইলে কন্যা কহিল, যে হে রাজপুত্র, রাজার শাসনে সকল লোক পাপ ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু শাসনকর্ত্তার এমন দুর্নীতি যদি হয়, তবে সকলেই পাপে প্রবৃত্ত হইবে। আর যদি নির্জ্জন ঠাঁই দেখিয়া আপনি এমত অসৎ কর্ম্ম করেন সে আপনার উচিত নহে ; যে হেতুক পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী তাঁহার অগোচর কিছুই নাই, অতএব পাপকর্ম্মে নিবৃত্ত হও। শুন, রাজকুমার, আমি বীরবাহু নামে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, জল লইতে আসিয়াছি, তাহাতে আপনি আপন কুলের উচিত কথা ছাড়িয়া মন্দ কথা কহিতেছেন, আপনকার বংশের রাজগণ পরস্ত্রী বিষয়ে নপুংসকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমি একাকিনী দুর্ব্বলা স্ত্রী, আপনি বীর পুরুষ আমাকে বলাৎকার করিলে কি যশ বাড়িবে ? পরস্ত্রী সংসর্গে এক ক্ষণমাত্র সুখ, কিন্তু অখ্যাতি ও পাপ কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া পুণ্য করা অতি উচিত, যে হেতু লোভে কাম, কামে পাপ, পাপে মৃত্যু, মৃত্যু হইলে নরক হয়, এবং মাংস মূত্র বিষ্ঠা অস্থিতে পূর্ণ অতি হেয় শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত নহে। দেখ যেমন মৎস্য সকল মাংসেতে আচ্ছাদিত বড়িশী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত খাইয়া বিপদে পড়ে, তেমনি তুমি জ্ঞানী হইয়া নারী স্বরূপ মাংসাচ্ছাদিত পাপ বড়িশী খাইও না। আর সম্পদের মূল বিবেক এবং আপদের মূল অবিবেক ইহা নিশ্চয় জানিও। শুন, প্লক্ষ দ্বীপে দীব্যন্তী নগরে পুণ্যাকর রাজার স্ত্রী সুশীলা নামে এক স্ত্রী আছেন, তাঁহার কন্যার সুলোচনার রূপ গুণশীল বিদ্যা এক মুখে বর্ণনা করা অসাধ্য। পূর্ব্বে আমি তাঁহার দাসী ছিলাম, সংপ্রতি এদেশে আসিয়াছি। সুলোচনার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নাই ; অতএব তাঁহাকে তুমি বিবাহ কর। যেমন সিংহ আপনার ক্রোড়গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া সুলোচনাকে বিবাহ কর। যদি তাঁহাকে বিবাহ কর, তবে রাজপুত্র ও রাজকন্যা এই দুয়ের মিলনে পরম সুখ হইবে।

মাধব চন্দ্রকলা হইতে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুলোচনার সঙ্গে বিবাহের জন্য দীব্যন্তী নগরীতে সমুদ্র পার হইয়া গিয়া সেখানকার সুগন্ধা নামে মালাকার স্ত্রী দ্বারা নিজ স্বর্ণাঙ্গুরীয় সহিত সুলোচনাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সে পত্রের অর্থ এই যে হে সুন্দরী, তোমার দাসী চন্দ্রকলার মুখে তোমার গুণ সকল ও সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ও সৌজন্য ও পাণ্ডিত্য শুনিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমার পুরীতে আসিয়াছি, অতএব এখন আমাকে স্বামীত্বে তুমি বরণ কর। যে হেতুক এ সংসারে আমি তোমার শরণাপন্ন। এবং পদ্মিনীর গুণ ভৃঙ্গই জানে, কিন্তু ভেক জানে না, এবং আকাশে শুক্র নামে এক তারার ও মেঘাদির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু কুমুদিনী চন্দ্র বিনা অন্যকে ভজে না। মালাকারের স্ত্রী সেই পত্র সুলোচনার নিকট শীঘ্র দিল। পরে অত্যন্ত পণ্ডিতা রাজকন্যা ঐ অঙ্গুরীয়ের সহিত পত্র দেখিয়া ও তাহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া, তাহার এইরূপ যথাযোগ্য উত্তর লিখিলেন। যে হে রাজপুত্র, আপনকার পত্র আমি পাঠ করিয়া আপনকার মনোগত সকল বৃত্তান্ত জানিলাম, কিন্তু আমার উচিত বাক্য শুন। অদ্য আমার অধিবাস, কল্য বিবাহ নিশ্চয়ই হইবে, অতএব পিতার সম্মত কার্য্যে পৃথিবীতে কে লঙ্ঘন করিতে পারে ? আর দুঃসাধ্য কার্য্যে পণ্ডিতের শ্রম করা উচিত নহে, কারণ যদি সিদ্ধি হয় তবে শ্রম সফল হয়, অসিদ্ধি হইলে কেবল শ্রমই থাকে। তথাপি আমার পাওনের উপায় আপনাকে কহি, যে হেতুক আপনি আমার নিমিত্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন। যখন আমি নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিদ্যাধর নামে বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার আগে যাইব ; হে বীর, তখন বাম হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিব,সেই সময় আমাকে ঐ হস্ত ধরিয়া যে লইতে পারে, সেই আমার স্বামী হইবে, ইহা আমি সত্য করিয়া এই পত্রে লিখিলাম। তাহা না হইলে সুদৃঢ় কার্য্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না। সুলোচনা এই উত্তর আপন হস্তে লিখিয়া ঐ মালাকার স্ত্রীর হস্তে পুনর্ব্বার মাধবের নিকট পাঠাইলেন। ইহা পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে মাধব সুলোচনার উপাখ্যানে লিখিত আছে। যথা—

ততঃ সা রাজতনয়া লিখনং সাঙ্গুরীয়কং।
বিলোক্য সকলামূলাৎপপাঠাত্যন্তপণ্ডিতা ॥
সাপি তৎ পত্র পৃষ্ঠেতু তদ্যোগ্যমুত্তরং ততঃ।
অলিখদ্বিস্মিতা কন্যা যথা তৎ সর্ব্বমুচ্যতে ॥
রাজপুত্র মহাবাহো ত্বদ্বাক্য মখিলং শ্রুতং।
শৃণু সত্যমবাক্যং মে যথোচিতমিদং পুনঃ ॥
অদ্যাধিবাসনং কর্ম্মশ্বো বিবাহো মম ধ্রুবং।
পিতৃযৎ সম্মতং কার্য্যং পৃথিব্যাং কৈর্বিলঙ্ঘ্যতে ॥
কার্য্যে তু দুঃখ সাধ্যে তু কার্য্যো নাতিশ্রমো বুধৈঃ।
কার্য্যে সিদ্ধে শ্রমান্তঃ স্যাদসিদ্ধে শ্রম এবহি ॥
তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি যেন প্রাপ্নোতি মাং ভবান্।
যতো মদর্থং ভবদা সমুদ্রোহপি বিলঙ্ঘিতঃ ॥

যদা প্রদক্ষিণী কৃত্য বরং বিদ্যাধরাহ্বয়ং।
তৎ পুরোগা ভবিষ্যামি নানাভরণভূষিতা॥
তদা বামভুজং বীর কৃতোর্দ্ধংস্থাপ্যতে ময়া।
যেন মাং শক্যতে নেতুং সমেন্তর্ত্তা ভবিষ্যতি॥
সত্যং সত্যমিদং সত্যং পত্রেস্মিঁল্লিখিতং ময়া।
অন্যথা সুদৃঢ়ং কার্য্যং লঙ্ঘিতুং নহি শক্যতে॥
এতম্বিলিখ্য সা কন্যা তস্যা এব করে দদৌ।

বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা তিনি ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিদ্যাবতী ছিলেন। এবং নানাদেশের পণ্ডিতেরদের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছিলেন॥

এখনকার স্ত্রীগণের মধ্যে মুরশিদাবাদে রাণী ভবানী ছিলেন, তিনি বালক কালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন স্বামীর মরণের পর রাজ্যের সকল বিষয় কর্ম্মের হিসাব উত্তমরূপে আপনি দেখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতেন, ও ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জানিতেন। তিনি দানশীলা ও দয়াশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে আর আর যে স্ত্রী সকল আছেন, তাঁহারাও লেখাপড়াতে নিপুণ এবং আপন আপন রাজ্যের অন্য অন্য বিষয়ের লেখাপড়া করিতেন। ইহাতে ঐ রাণী ভবানীর এমত সুখ্যাতি যে তাঁহাকে না জানে এমন লোক বাংলায় প্রায় নাই॥

আর রাঢীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি বালক কালে আপন আপন গৃহকার্য্যের অবকাশে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোক তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং তিনি সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন।

এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালিপাড় গ্রামের শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ছিলেন, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন॥

এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখাপড়া বিদিত আছেন।

আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তা বিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পণ্ডিতা হইয়াছিলেন ইহা সকলেই জানেন॥

মালতি মাধব নাটকে অতি স্পষ্ট লিখা আছে, যে মালতী পাঠশালায় থাকিয়া নানা বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন॥

এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেকেই বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন। কেহ বা পুরুষের ন্যায় তাবৎ রাজকার্য্য করেন ও সংস্কৃত বাক্য কহিয়া থাকেন এ প্রকার অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা-বাই নামে মহারাষ্ট্র দেশের কোন স্ত্রী যাহার অতিশয় সুখ্যাতি ও সংকীর্ত্তি কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থে এখনও আছে, তিনি সকল রাজকার্য্য আপনি করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য কহিতেন॥

এইক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বিবি লোকের আনুকূল্যে কন্যারদের পাঠের নিমিত্তে যে ২ পাঠশালা হইয়াছে, তাহাতে যে ২ কন্যা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা কেহ বা এক বৎসরে কেহ বা দেড় বৎসরে লেখা পড়া সুন্দর মতে শিক্ষা করিয়াছে। এবং ভাষা পুস্তক যাহা তাহারা কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে, যাহা বালকেরা অনেক বৎসরেও পারে না। ইহাতে অনুমান হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যা অভ্যাস করে, তবে পুরুষাপেক্ষা অতি শীঘ্র বিদ্যাবতী হয়। অতএব তাহারদিগকে যেমন ঘরের কার্য্যাদি শিক্ষা করান তেমন বালককালে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়। যদি তাহারা এই অল্পকালের মধ্যে সকল বিদ্যা শিখিতে না পারে তথাপি বর্ণজ্ঞান থাকিলে অধিক বয়সেও আপন ২ বাটীতে ঘরের কার্য্যের অবকাশে আগে যাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বাড়াইতে পারে। এবং আপন ২ কন্যা সন্তানদিগকে বিনা খরচে ও পাঠশালায় না পাঠাইয়া শিক্ষা করাইতে পারে। পরে ক্রমে ক্রমে এই ধারানুসারে সকল স্ত্রীলোকেরই ব্যবহারিক বিদ্যা হয়। এবং ব্যবহারিক বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীধন ও গৃহাদির আবশ্যক কর্ম্মে কোন ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতারণা করিতে পারে না। যে হেতুক নিজ আবশ্যক বিষয়ের হিসাব লিখিয়া রাখিয়া সেই হিসাবে লোককে বুঝাইতে এবং আপনিও বুঝিতে পারে; আর মনোভিলষিত পত্রাদি আপন প্রিয়ের নিকট পাঠাইয়া নিজ বিষয় তাহাকে জানাইতে পারে, এবং স্ত্রী পুরুষের বিদ্যাবত্তা থাকিলে পরস্পর কথা বার্ত্তা দ্বারা কি পর্য্যন্ত সুখোদয় হয়, তাহা লিপি বাহুল্য।

যদি তোমরা বল স্ত্রীলোকের পাঠব্যবহার সিদ্ধ নহে তাহার কারণ আমরা অনেক পুরাতন ও এখনকার স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছি, তাহাতেই ব্যবহার সিদ্ধ কিনা জ্ঞাত হইবা। যদি শাস্ত্রীয় দোষ কহিয়া স্ত্রীলোককে শিক্ষা না করাও সেও অনুচিত, কারণ যদি কোন শাস্ত্রে নিষেধ থাকিত তবে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ও অত্রিমুনি ও পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রুপদ রাজা ও কণ্ব রাজা ও অনিরুদ্ধ ও বাণ রাজা ও কর্ণাট দেশের রাজা ও প্লক্ষদ্বীপাধিপতি রাজা গুণাকর ও বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহ ও উদয়নাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য ও লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয় ব্যক্তি সকল সকল কদাচ শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া আপন ২ কন্যা ও স্ত্রীদিগকে বিদ্যা অভ্যাস করাইতেন না। এবং স্ত্রী সকলও পাঠ বিষয়ে অবশ্য নিরস্ত হইতেন।

আর কোন বেদে ও স্মৃতিতে স্ত্রীলোককে বিদ্যা অভ্যাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই। যদি কোন শাস্ত্রে মানা থাকিত, তবে সংগ্রহকর্ত্তারা নিষেধ করিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ রূপে বচন লিখিতেন, সুতরাং সেই মতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান যাইত না। কিন্তু কেবল সাবিত্রী ও প্রণব স্ত্রী-শূদ্রের পাঠ নিষেধ লিখিয়াছেন। যথা।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রোনাধীয়ীত ইত্যাদি॥

ইহাতে ব্যবহারিক বিদ্যা শিখিতে কোন দোষ নাই? আর যদি ঐ বচন স্ত্রীলোকের পাঠ করিতে নিষেধক হয়, তবে শূদ্রেরও বিদ্যা অভ্যাস করা ও ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা ঐ যুক্তিতে অনুচিত হয়। বরং বচনের বিশেষ পরতা প্রযুক্ত স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ে বিধিই হয়॥ যথা

যাদৃগ্জাতীয়স্যবিপ্রতিষেধো
বিধিরপিতাদৃগজাতীয়স্যেতি ॥

অর্থাৎ যে জাতীয়ের নিষেধ হয়, বিধিও সেই জাতীয়ের প্রতি হয়। যেমন বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে মৎস্য খায় যে সে ব্যক্তি পতিত হয়, এই বচন আছে, কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অনেকেই মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব স্ত্রীশূদ্রের গায়ত্রী ও বেদ পাঠ নিষেধ দ্বারা অন্য শাস্ত্র পড়িতে বিধি পাওয়া যায় ॥

এবং নীতিশাস্ত্রেও লেখা আছে যে স্ত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক ॥ যথা -

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া
শিক্ষণীয়েতি যত্নত ইত্যাদি ॥

ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্য কর্ত্তব্য হয় ॥ যখন হিন্দু রাজার অধিকার ছিল, তখন সকলে নির্ভয় হইয়া সর্ব্বত্র গতায়াত করিত, তাহাতে বিদ্যার আলোচনা হইত; এবং পূর্ব্বের রাজা সকল রাজ্যে অভিষেক সময়ে আপন স্ত্রীর সঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন ইহাতে তাহারদের কোন দোষ বুদ্ধি ছিল না। এখনও মহারাষ্ট্র দ্রবিড় তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু কেবল গৌড়ে আর হিন্দুস্থানের কতক দেশে বহুকাল জবনাধিকার হওয়াতে এবং তাহারদের দৌরাত্ম্যের নিমিত্তে লোক সকল মহাশঙ্কিত হইয়া আপন ২ পরিজনকে অতি সংগোপনে রাখিত। বিদ্যাতে কি সৌন্দর্য্যে কাহারও নাম প্রকাশ হইলে দুরাত্মা জবন তাহার উপর অত্যাচার করিত, এই ভয়ে আপন ২ পরিজনের নাম যাহাতে অপ্রকাশ থাকে, তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা করিত। সেই ধারানুসারে অদ্যাপি সেই মত ব্যবহার চলিতেছে। কিন্তু—সাহেব লোকের রাজত্ব হওয়া অবধি সে সকল দৌরাত্ম্য প্রায় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের সেইরূপ চলন অদ্যাপি আছে ॥

এই ক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন ২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাহার দিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান। এবং যাহারা নির্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান। যে হেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ যথা।

বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়োভবেৎ।

এবং ঐ বচনানুসারে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিলে সুন্দর সংস্কার হয়। কন্যারদিগের পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে ২ আছে, তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাল্যকালে কন্যাগণ পিতা মাতার বশীভূত হইয়া তাঁহারদের আজ্ঞানুসারে চলিবেন। এবং যৌবনাবস্থাতে পতিসেবা, ও পতির আজ্ঞানুসারে কার্য্য, এবং পতি শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, ও অতিথ্যাদি ভক্তি ও পাকপটুতা ও সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন। এবং বৃদ্ধাবস্থাতে সন্তানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া বিশেষ রূপে সৎ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেন।

স্ত্রীগণ স্বামি ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের প্রতি কামভাবে দৃষ্টি, ও যাত্রোৎসবে গমন, এবং অন্য পুরুষের সহিত বাস, ও বিদেশে একাকিনী গমন, এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবেন না, এই সকল স্ত্রীলোকের দোষ হয় ॥

আর গৃহ ব্যাপারে নিপুণা এবং পতিপ্রিয়া, ও প্রিয় ভাষিণী, ও অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জাবতী এবং পতিপরায়ণা, ও ধর্ম্মশীলা, ও পরমেশ্বরের নিত্য সেবাকারিণী যে স্ত্রী হয়, সে ইহকালে ও পরকালে অনন্ত সুখভাগিনী হয় ॥

আর যে স্ত্রীর গুণোৎকীর্ত্তন স্বামী না করেন এবং যাহাকে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়েন, সে স্ত্রীই নহে, স্বামী কর্ত্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্যপ্রাপ্তা হইয়া ও কোপ চক্ষুতে দৃষ্টা হইয়াও অম্লানবদনে ও অক্রোধে স্বামিসেবা যে করে, সেই স্ত্রী, ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয় ॥

স্বামী নগরস্থ কিম্বা বনস্থ অথবা পবিত্র ও অপবিত্র অথবা ভাগ্যবন্ত কিম্বা নির্ধন কি গুণবান্ কি নির্গুণ কি অট্টালিকাস্থ কি কুটীরস্থ সুশ্রী কি কুরূপই বা হউন, স্ত্রী লোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারই আজ্ঞানুসারিণী হয়েন। সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীই ভূষণ, অন্যালঙ্কারের অপেক্ষা নাই, ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে। অতএব হে বালিকে সকল, তোমরা স্ব ২ কার্য্যের অবকাশে বিদ্যানুশীলন করিয়া নীতিজ্ঞ হইলে বিদ্যাবত্তাতে ও নীতিজ্ঞানে স্বামি সেবার যে পরম সুখ তাহা অবশ্য জানিবা ॥

কেম্ব্রিজ উপসাগর: জলমগ্ন পর্ব্বতগাত্র তরঙ্গ ঘর্ষণে আল্পনার মত দেখাইতেছে। [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]
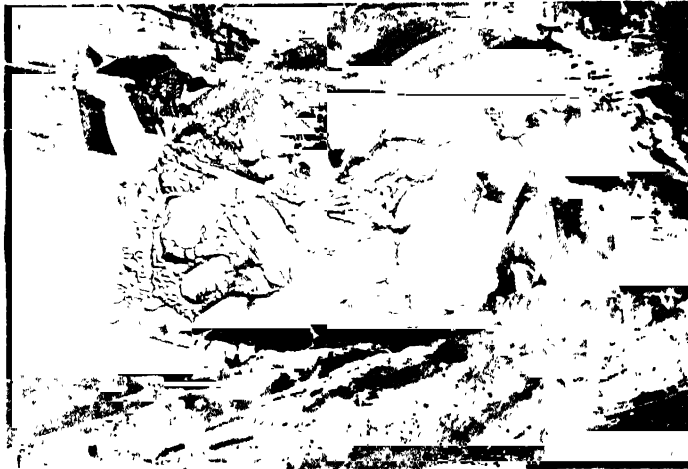
বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেপ্রি দ্বীপের পাখীর আড্ডা

The Story of San Michele নামক উৎকৃষ্ট বইখানা অনেকেই পড়েছেন। এই বইখানার লেখক ডাঃ এক্সল্ মুন্থি এক জন নরওয়েদেশীয় চিকিৎসক। বর্ত্তমানে তিনি জগদ্ব্যাপী যশের অধিকারী। অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তিনি প্যারিসে ডাক্তারী পড়ছিলেন, সে সময় Capri দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যে তিনি মুগ্ধ হন। সেই থেকে তাঁর জীবনের একটা সাধ ছিল, একদিন কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে এই সাগর-মেখলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরম্য দ্বীপে নির্জ্জনে বাস করবেন। কেপ্রিদ্বীপস্থ তাঁর বাস-ভবনের নাম সান্ মিকেল্—এবং কি করে সারাজীবন ধরে এখানে এই বাড়ী গড়া হোল, সেই সঙ্গে, তাঁর জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতারাজির বর্ণনা ডাক্তার মুন্থির বিখ্যাত বইখানাতে পাওয়া যাবে। ডাক্তার মুন্থি শুধু চিকিৎসক নন, সুনিপুণ কথাশিল্পীও বটে।

ডাঃ মুন্থি এখন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি অনেকদিনই দুটি চোখ হারিয়েছেন। তবুও এখনও বিনা অবলম্বনে তাঁর বাস-ভবনের জলপাইকুঞ্জে বেড়াতে পারেন—Old Tower-এর সাইপ্রেস গাছের শ্রেণীর মধ্যে বসে পাখীর ডাক শোনেন। তাঁর বইয়ে এই Old Tower-এর অদ্ভুত বর্ণনা আছে।

নানাদেশ থেকে ডাঃ মুন্থির নামে চিঠিপত্র আসে। তাঁর সেক্রেটারী সেগুলো তাঁকে পড়ে শোনায়, কোন্ খানার কি ভাবে উত্তর দিতে হবে তিনি বলে দেন। যশকে তিনি বড় ভয় করেন—লোকজনের সামনে যেতে তাঁর বড় আপত্তি। কত লোক জিজ্ঞাসা করে, আপনি এর পর কি বই লিখবেন? তিনি সে কথার কোনো স্পষ্ট জবাব দেন না।

ডাঃ মুন্থি পশুপক্ষী অত্যন্ত ভালবাসেন—বিশেষতঃ পাখী। তিনি তাঁর বইয়ের মধ্যে লিখেছেন—পাখী ভালবাসি বলেই এই নির্জ্জন দ্বীপে আমার জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছে। কেপ্রি দ্বীপে আগে পাখীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করা হোত—সমগ্র ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এই দ্বীপটি রোমানদের সময় থেকে ফাঁদ পেতে পাখী ধরবার একটা প্রধান স্থান ছিল। ডাঃ মুন্থির চেষ্টায় সেই বর্ব্বর ব্যাপারের অবসান হয়েছে। প্রথম যৌবনে তিনি যখন কেপ্রিদ্বীপে আসেন তখন থেকেই এই বর্ব্বর পক্ষীহনন ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ব্রত হয় এর উচ্ছেদ সাধন করা। বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয়ের পরে তিনি কৃতকার্য্য হন।

প্রতি বৎসরই বসন্তের প্রথমে নানা জাতীয় পাখী—থ্রাশ্, ঘুঘু, নাইটিঙ্গেল, চাতক, রবিন, ওরিওল আফ্রিকার দিক থেকে উড়ে উত্তর-ইউরোপের হিমপ্রধান স্থানে যায়, এবং সেখানে সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করে। শরতের প্রথমেই আবার উত্তর ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় উড়ে চলে যায়।

ইজিপ্ট ও কেপ্রিদ্বীপের মধ্যে দীর্ঘ সমুদ্রপথ—এই পথ পার হতে গিয়ে ক্ষুধায় পরিশ্রমে ক্লান্তপক্ষ কত পাখী ভূমধ্যসাগরের বুকে প্রাণ হারায়। এই সুদীর্ঘ আকাশ-পথে কোথাও বিশ্রামের অবকাশ বা স্থান নেই। আকাশে সিন্ধুশকুনের দল অনেক ছোট ছোট পাখীকে মেরে ফেলে, আবার জলের খুব নিকট দিয়েও ওড়বার উপায় নেই, ভূমধ্যসাগরের উড়নশীল মাছেরা অত্যন্ত হিংস্র, তারা লাফিয়ে পাখী ধরে।

প্রাচীন কাল থেকে কেপ্রিদ্বীপেই এই যাযাবর পাখীর দল বিশ্রাম করবার জন্যে নামে। এর প্রধান কারণ এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান। ইজিপ্ট থেকে উড়ে আসবার পথে ভূমধ্যসাগরের এপারে এই ক্ষুদ্র, সুন্দর দ্বীপটি প্রথমেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট পাহাড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনরাজি, শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ক্লান্ত পক্ষকে বিশ্রাম দেবার জন্য স্বভাবতঃই তাদের ইচ্ছা হয়।

ডাক্তার মুন্থি লিখছেন—

বারবারোসা দুর্গের এই ধ্বংসস্তূপ কেপ্রিদ্বীপের সর্বোচ্চ ভূমি—রাজ্যের পাখীর জাল এইখানে।

এর কারণ এই যে, কেপ্রিদ্বীপ দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু যাযাবর পাখীদের পক্ষে এটি মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। গ্রীক এবং রোমানদের সময় থেকে এই দ্বীপটি পক্ষীশিকারীর স্বর্গবিশেষ। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি বসন্তে এই পক্ষীকুল আসে, আর তাদের ফাঁদ পেতে ধরা হয়। কেপ্রিদ্বীপের সুন্দর বনানী-শোভিত পাহাড়ের মাথায় বড় বড় জাল পাতা—যেমন নামে, অমনি ফাঁদে পড়ে। সমস্ত রাত্রি ধরে তারা পালাবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে আরও ফাঁদে বেশী করে জড়িয়ে যায়। সকাল বেলায় তাদের কাঠের বাক্সে পোরা হয়—এবং এখান থেকে জাহাজে ইউরোপের বড় বড় সহরে প্রেরিত হয়—সেখানকার হোটেলে রেষ্টোরেন্টে সুখাদ্য হিসাবে এই সব পাখীর খুব আদর।

এই পাখীর ব্যবসা বহুকাল থেকে কেপ্রি দ্বীপের একটি প্রধান ব্যবসা বলে গণ্য। পাখীর ব্যবসার ওপর শুল্ক বসিয়ে কেপ্রি দ্বীপের পক্ষিব্যবসায়ীদের কাছে বিস্তর রাজস্ব

"প্রতিবারই বসন্তের প্রথমে পাখীরা দলে দলে আসে··· হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখী, ওদের সুদীর্ঘ সারির যেন শেষ নেই, ভূমধ্য-সাগরের এপার ওপার, ইটালি থেকে ইজিপ্ট ব্যাপী সারি আসছেই, আসছেই। সান মিকেলের বাগানে ডালে পালায় তাদের আনন্দকাকলী সারাদিন বসে শুনতাম।

কিন্তু এমন এক সময় এল যখন আমার মনে হোত ওরা না এলেই ভাল হয়। কেন ওরা এখানে আসে, এখানে নামে? কেপ্রিদ্বীপে না নেমে ওরা আরও উঁচু দিয়ে উড়ে চলে যাক। বন্য হাঁসের দলে মিশে—সুদূর নরওয়েতে যেখানে ওদের কোনো বিপদ ঘটবে না।"
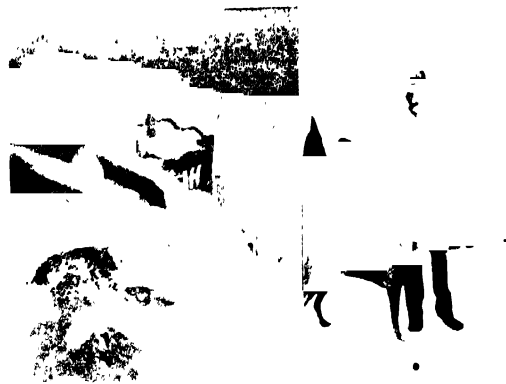
ডাঃ আক্সেল মুন্থির বিশ্ববিশ্রুত সান মিকেলের উদ্যান-বাটী। ডাহিনে ডাঃ মুন্থি তাঁহার পোষা কুকুর লিসাকে লইয়া দাঁড়াইয়া—হাতে গোম—আর একটি কুকুর, সুইডেন-রাজ ইহা ডাক্তারকে উপহার দেন।
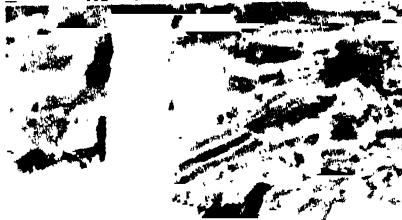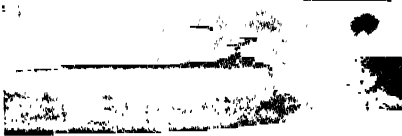
আদায় হয় গবর্ণমেণ্টের। ভারুই (quail) পাখীর ঝাঁক এসময়ে হাজারে হাজারে আসে—গ্রীক ও রোমানেরা ভারুই পাখী খেতে পছন্দ করত—এখনও ইউরোপে ভারুই পাখী সুখাদ্য বলে গণ্য। কেপ্রিদ্বীপ থেকে হাজার হাজার এই পাখী অন্য অন্য দেশে চালান হয়। এতে গবর্ণমেণ্টের ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের খুব লাভ অর্থের দিক থেকে। কাজেই এরা এই নিষ্ঠুর পক্ষিহননের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলে না। রোমানদের সময়ে এই দ্বীপ ছিল রোমান সম্রাটদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রোমান সম্রাট টাইবিরিয়াসের বিপুল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও এই দ্বীপে বর্ত্তমান। সে সময়ে এখানকার পাখী ধরে সম্রাটের আহারার্থ পাঠানো হোত—সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরে দ্বীপটি অপরের হাতে গিয়ে পড়ে। ব্যবসায়ী লোকে দ্বীপের পাহাড়গুলো ইজারা নিয়ে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে পাখী-চালান দেওয়ার ব্যবসা আরম্ভ করে।

পোপ যখন কেপ্রিদ্বীপে প্রথম বিশপ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে, বিশপের আয় নির্ভর করবে পাখীর

উপরের অংশে সান মিকেলের উদ্যান-বাটীর গির্জ্জার প্রবেশ পথ। নীচে কেপ্রির মোটামুটি দৃশ্য।

ব্যবসায়ের শুল্কের ওপর। বিশপের সহানুভূতি ও উৎসাহ পেয়ে পাখী-ধরা কাজ আরও বেড়ে গেল। সাধারণ লোকে ভাবতো তাদের দ্বীপে যে এত পাখী প্রতি বৎসর আসে, এ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ তাদের ওপর আছে বলেই—নইলে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত কি করে? গির্জ্জার ব্যয়নির্ব্বাহই বা হোত কি করে? ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের জনৈক অধিবাসী নেপ্‌লস্‌-এর রাজার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠাবার সময় তাতে লিখেছিল :—

"যীশু খৃষ্টের অসীম দয়ায় প্রতি বৎসর আমাদের দ্বীপে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসে, আমরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে দুর্গম পাহাড়ের ওপর জাল পেতে ওই সব পাখী ধরি। আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়ই এই।"

উপরে বারবারোসার প্রাচীন ঘণ্টাঘর। মাঝের ছবিতে ঘণ্টাটি দেখা যাইতেছে। নীচে উদ্যানের একাংশ।
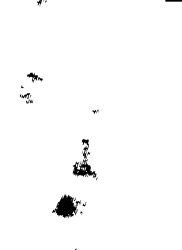
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ঃ ঝিনুক উপসাগরের এক অংশ।

নেপিয়ার ব্রুম উপসাগরে ধৃত ষ্টিং-রে [শঙ্কর জাতীয় মাছ]।

ভারুই পাখীকে ভুলিয়ে জালে আনবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, তা অত্যন্ত হৃদয়হীন। কতকগুলি পক্ষিণীর চোখ গরম সূঁচ বিধিয়ে নষ্ট করে অন্ধ করা হয়—বহুকাল থেকে ওদেশের লোকে জানে অন্ধ পাখীর ডাক থামে না—সে দিন রাত সমানভাবে ডাকবে। ভারুই পাখী পক্ষিণীর ডাক শুনে লুব্ধ হয়ে এসে জালে পড়ে। কি অদ্ভুত ট্র্যাজেডি!

অন্ধ করবার সময় কত পাখী যে মারা পড়ে! একশো পাখীর মধ্যে একটা এ অবস্থায় বাঁচে—এজন্যে অন্ধ পক্ষিণীর দাম বাজারে খুব বেশী।

ডাঃ মুন্থি এই সব বর্ব্বর প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্যে গত ত্রিশ বছর থেকে চেষ্টা করছেন। নেপ্‌ল্‌স্‌-এর শাসনকর্ত্তার কাছে আবেদন করেন প্রথমে, তা অগ্রাহ্য হয়। পরে তিনি রোমে গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাকে জানান যে কেপ্রিদ্বীপের ওই পাহাড়গুলি একজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে সেখানে যা খুসী করতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এতে হস্তক্ষেপ করবেন না।

ডাঃ মুন্থি কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হোতে পারলেন না। কতকগুলো কুকুর কিনে আনলেন, তারা সারা রাত ধরে চীৎকার করলে পাখী আর বারবারোসা দ্বীপের পাহাড়ে বসবে না—এই আশায় পাহাড়ের তলায় তাদের নিয়ে গিয়ে বাঁধলেন—যাদের পাহাড় তারা পুলিসে খবর দিলে, ডাক্তারের জরিমানা হোল।

অবশেষে ভগবান দিন দিলেন। পাহাড়ের মালিক ছিল একজন কসাই—তার শক্ত অসুখ হোল। স্থানীয় অন্য সব ডাক্তার কিছুই করতে পারলে না, অবশেষে ডাঃ মুন্থির ডাক পড়ল। ডাঃ মুন্থি এই সর্ত্তে তাকে আরোগ্য করতে রাজি হোলেন যে, সেরে উঠে সে বারবারোসা পাহাড় তাঁর কাছে বিক্রি করবে। সে সেরেও উঠল, পাহাড় ডাঃ মুন্থি কিনে নিলেন। সেই থেকে এই নিষ্ঠুর পক্ষীহনন ব্যাপার কেপ্রি-দ্বীপ থেকে উঠে গেল। সে আজ ২৯ বছর আগেকার কথা। তারপর ১৯২৩ সালে পাখীকে অন্ধ করবার নিষ্ঠুর প্রথা ইটালিয়ান গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা রদ করেছেন।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য্য জিনিস

পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দেশ—কি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য, কি খনিজ সম্পদের জন্য, কি অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ারের জন্য।

লম্বমান শঙ্কর মাছটির ওজন পাঁচ মণ।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্ত্তী সমুদ্র থেকে গত ১০ বৎসরের মধ্যে বহুকোটি টাকার ঝিনুক ও মুক্তা উত্তোলিত হয়েছে। ১৮৫০ সাল থেকে এদেশে মুক্তা উত্তোলনের ব্যবসা চলেছে—বেশীর ভাগই ইউরোপীয়দের হাতে, কিছু কিছু চীনা ও জাপানী আছে। ব্রুম সহর এর বড় কেন্দ্র। ব্রুম থেকে উইণ্ড্হাম পর্য্যন্ত সমস্ত সহরটি মুক্তা-ধরা জাহাজে ভর্ত্তি। ওদিকে আর লোকের বাস নাই—জলের ধারে শুধুই ম্যান্‌গ্রোভ গাছের বন।

এই সব ম্যান্‌গ্রোভের বনের তলায় লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক কাঁকড়া বাস করে—টক্‌টকে লালরঙেরও আছে, আবার

নীলরঙেরও আছে। আর একরকম কাঁকড়া আছে—তারা আকারে এদের চেয়ে বড়, প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া—তাদের রং হলদে। এই হলদে কাঁকড়ার নাম soldier crab, লড়ায়ে কাক্ড়া। এরা হাজারে হাজারে দল বেঁধে বালির উপরে চলে—এবং প্রত্যেক দলে একজন সর্দ্দার থাকে। এদের বিরক্ত করলে এরা দলবল নিয়ে আক্রমণ করে।

অতিকায় ডুগং। লম্বায় বারো ফুট। ওজন প্রায় ৭॥০ মণ। প্রায় তিমির মত বিরাট এই মাছের মাংস শাদা-কালো নির্ব্বিশেষে সকলেই ভক্ষণ করে।

কেম্ব্রিজ উপসাগরে যথেষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়। তারের একরকম ফাঁদ পেতে এই সব মাছ ধরে—কেম্ব্রিজ উপসাগর থেকে বহু টন মাছ প্রতিদিন চালান যায়।

ডুগং নামে একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তু এখানে অনেক পাওয়া যায়—তিমিজাতীয় জীব, কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ। নৌকা থেকে বর্শা ছুঁড়ে এদের শিকার করা হয়। ডুগং শিকার খুব সহজ কাজ নয়, এদের চামড়া অত্যন্ত পুরু, সহজে বর্শা গায়ে বেঁধে না। ডুগংএর চর্ব্বি ঔষধের জন্যে ব্যবহৃত হয় বলে ডুগং শিকার অত্যন্ত লাভজনক। ডুগংএর চামড়াও অনেক কাজে লাগে। সান্ডে দ্বীপের কাছে একটা ডুগং ধৃত হয়েছিল—তার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ওজন সাড়ে সাত মণ।

এখানে সমুদ্রের ধারে যথেষ্ট জঙ্গল দেখা যায় এবং এই সব জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় খাল—খালগুলি বড় বড় কুমীরে পরিপূর্ণ, অনেকটা আমাদের দেশের সুন্দরবনের মত। ডুগং জাতীয় আর এক প্রকার মাছ কেম্ব্রিজ উপসাগরে বহুল পরিমাণে ধৃত হয়, এদের sail fish বা পাল মাছ বলে। এদের ডানা পালের মত হাওয়া আটকায়, এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত অবস্থায় এই পালের আয়তন প্রায় ছয় বর্গফুট হতে দেখা যায়।

আর এক রকমের মাছকে বলে শোষক মাছ—এরা হাঙ্গর জাতীয়। কিন্তু এরা বড় নিরীহ। এদের একমাত্র সাধ এই যে, অন্য বড় মাছের শরীরের কোন স্থানে নিজেদের গলার নীচের একপ্রকার যন্ত্র-সাহায্যে আঁক্‌ড়ে ধরে অনেক দূর চলে যাওয়া। যেমন কল্‌কাতার রাস্তায় সাইকেল আরোহীদের অনেক সময় চলন্ত ট্রামগাড়ী ধরে যেতে দেখা যায়।

এই স্থানের সমস্ত সাগর উপসাগর প্রবালপুঞ্জে পরিপূর্ণ। নানা ধরণের, নানা রঙের বিচিত্র প্রবাল—মনে হয় যেন সমুদ্রের জলের মধ্যে রঙীন ফুলের বাগান সাজানো রয়েছে। Butcher inlet নামে সমুদ্রের খাড়ির প্রবাল উপনিবেশ সুপ্রসিদ্ধ।

ম্যানগ্রোভের ডোঙ্গায় দণ্ডায়মান পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মৎস্যশীকারী বর্শা সাহায্যে ইহারা অসাধ্য সাধন করে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম শাসতি।

লাক্রোজ দ্বীপে ধৃত কচ্ছপ, সংখ্যায় প্রায় এক শত। কেম্বি জ উপসাগর হইতে রাত্রিতে ডিম পাড়িতে ডাঙ্গায় উঠিলে ইহাদিগকে ধরা হইয়াছিল।

প্রায় কুড়ি বর্গমাইল স্থান বিপজ্জনক প্রবাল শৈলে ভর্তি—জোয়ারের সময় এদের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না, সে জন্য জাহাজের পক্ষে এগুলো বড় সমনেশে জিনিস। এ্যাড়-

কাছিমের বাসা। একসঙ্গে প্রায় দুই শত ডিম এক একটি বাসায় দেখা যায়। বালি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই সব বাসা বাহির করিতে হয়।
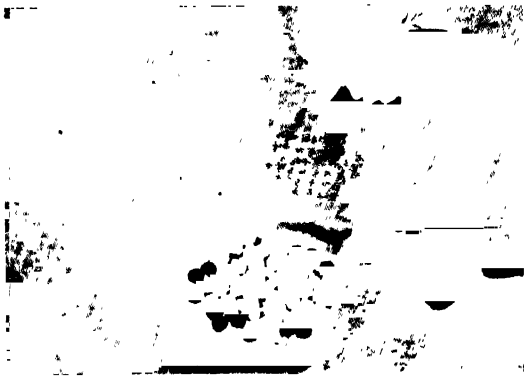
মিরাল্টি উপসাগর থেকে নেপিয়ার উপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এই রকম মগ্ন প্রবালশৈলে পরিপূর্ণ—কত জাহাজ যে আগে আগে মারা গিয়েছে এই পথে!

সমুদ্রের জলের ওপর এক প্রকার সামুদ্রিক সর্পকে প্রায়ই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রিত থাকতে দেখা যায়—এদের দৈর্ঘ্য বারো তেরো ফুট সচরাচর হয়ে থাকে এবং এরা অত্যন্ত বিষাক্ত।

নেপিয়ার উপসাগরের ধারে কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারী আছেন। এঁরা প্রায় একশো বিঘে জমিতে কলা, আনারস, পেপে, নারিকেল প্রভৃতির বাগান করেছেন ধান, তামাক ও আখের চাষও আছে। চারিপাশের আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত বর্ব্বর, প্রায়ই এঁদের বাসস্থান আক্রমণ করে—তখন দস্তুরমত যুদ্ধ না করলে তাদের তাড়ানো যায় না। মিশনারীদের শরীরের অনেকস্থানে এরূপ যুদ্ধের চিহ্ন স্বরূপ বর্শার আঘাতের দাগ আছে।

এদিকের জঙ্গলে এক প্রকার বন্যকুকুর আছে—এখানে তাদের বলে ডিঙ্গো। ডিঙ্গোরা দল বেঁধে বেড়ায়, এক এক দলে সত্তর আশীটা পর্য্যন্ত থাকে। এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, গরু ছাগল ভেড়া তো এদের উৎপাতে পালন করাই দায়, মানুষকে পর্য্যন্ত একা দেখতে পেলে অনেক সময় আক্রমণ করে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা প্রায়ই ডিঙ্গোর পালের সামনে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়, প্রাণও হারায়।

কেম্ব্রিজ উপসাগর ষ্টিং-রে (sting ray) নামক শঙ্কর জাতীয় মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। এক একটা পূর্ণবয়স্ক রে ওজনে সাত আট মণ পর্য্যন্ত হয়—এদের লেজের তলায় আর একটা হাড়ের লেজ আছে—সেটা আকৃতিতে ছোট, বর্শার মত সূচাগ্র ও অত্যন্ত বিষাক্ত। রে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে এই বর্শার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। এই অঞ্চলে অত্যন্ত বড় বড় হাঙ্গরও দেখা যায়—দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট হয়, এমন হাঙর যথেষ্ট।

কাছেই লাক্রোজ নামে একটা ছোট দ্বীপে বড় বড় সামুদ্রিক কচ্ছপের আড্ডা। সে দ্বীপে লোকের বসতি নেই—জলের ধারে শুধুই বৃহদাকার কচ্ছপ বালির উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, রোদ পোয়াচ্ছে। এদের ধরে চিৎ করে দিলেই আর এরা নড়তে পারে না, পালাতেও পারে না। সান্ডে দ্বীপের কয়েকটি কৃষ্ণকায় অধিবাসী এই উপায়ে এক রাত্রে তিরাশীটি বড় বড় কচ্ছপ ধরেছিল।

এই অঞ্চলের অসভ্য অধিবাসীরা পিঠের মাংস ঝিনুক দিয়ে কেটে নানারকম আঁকজোঁক কাটে। যার আঁকজোঁক যত বেশী থাকবে, সে তত সুশ্রী। ঝিনুক দিয়ে মাংস কেটে ম্যানগ্রোভ গাছের শিকড়ের গায়ে যে নোনা কাদা লেগে থাকে, তাই দিয়ে ক্ষত স্থান মর্দ্দন করতে থাকে—এতেই ওই সব ভয়ানক দাগের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্য মানবের সংস্পর্শে আদৌ আসে নি—অন্য আকৃতির মানুষ দেখলে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। বন্য পশুর মতই এদের প্রকৃতি।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী। পৃষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের শিকড়গাত্রের কর্দ্দমসাহায্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

সুরদাস

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের আলো দেখি নাই—মোর চির অমারাতি চোখে,
সুরের স্বর্গ সৃজন করেছি আপন মানসলোকে।
আমি বারো মাস সেথা করি বাস, আমি আর মোর প্রিয়,
নিত্যনূতন স্বপন-বসন—স্বপন-উত্তরীয়।
কল্পলতার কুঞ্জে সেথায় মন্দাকিনীর কূলে
চির-বসন্ত-গোধূলি-আলোকে সুরহিন্দোলা দুলে।
দুলে হিন্দোলা, শত বরণের হাসি অশ্রুর ডোর—
ভূলোকে দ্যুলোকে আমি দুলি আর দুলে সুন্দর মোর!
পুলকে ধরণী শিহরিয়া উঠে সে দোলার ছোঁয়া লেগে,
অন্ধ নয়ন-সম্পুটে কাঁপে প্রেমের মুক্তা জেগে।
বেদনা আমার 'মোতি' হ'য়ে জ্বলে সাধনার শুক্তিতে,
ভুল হ'য়ে যায় ঘুমে জাগরণে বন্ধনে মুক্তিতে।
ভুল হ'য়ে যায় সব কিছু শুধু এইটুকু থাকে মনে
এ দোলা আমার থামানো হবে না জীবন-বৃন্দাবনে।
শুধু কানে আসে পাশে বসি' মোর বন্ধু বাজায় বেণু,
আমার নিখিল উদ্বেলি ঝরে আলোর স্বর্ণরেণু।
ভিতরে যখন নাহি মিলে ঠাঁই বাহির সে তুলে ভরি'
গ্রহতারকায় উজলিয়া উঠে তোমাদের বিভাবরী।

তোমরা আমারে কৃপাচোখে দেখি ফেলোনা দীর্ঘশ্বাস,
আঁধারে আমার প্রিয়ের পরশ, আমি কবি সুরদাস।

রূপসিন্ধুর কূলে ভিড়িয়াছে আঁখির তরণী এসে।
দীপালোকে আজ কি আমার কাজ—সে চির-আলোর দেশে?
সে আলোক-লোকে হয় না পশিতে নয়ন-তোরণ খুলে;
সোনার কাঠির পরশে সে জাগে সহসা মর্ম্মমূলে।
সহসা নিমেষে মিটে মানুষের শত জনমের তৃষা
সহসা পোহায় অনাদি যুগের অন্ধ তামসী নিশা।
কেমনে সে হয়, কেন যে সে হয়—অ'তো বলিবারে নারি;
আমি সুরদাস, দূর হ'তে কিছু আভাষ পেয়েছি তারি।
সুরের প্রসাদে 'অরূপ রতন' দেখেছি স্বপনলোকে
তোমাদের আলো কেমন জানিনে, আমি 'আলো' বলি ওকে।
শুধু আলো নয়—সে আলোর রাজা, আলোর পরশমণি;
তা'রে লভিয়াছি, মোর চেয়ে আজ কে আছে কোথায় ধনী?

হাসো তুমি হাসো আলোকের জীব, অন্ধের কথা শুনে;
কেমন করিয়া দেখাব তোমারে আঁধারের এ আগুনে?
আমার আঁখির দুয়ার বন্ধ বন্ধুর মন্দিরে;
আমার ভাষার আশা ভেসে গেছে সুরের সিন্ধুনীরে।

আলো, আলো, আলো—শিশুকাল হ'তে শুনিয়াছি তা'র নাম,
সে নাকি মধুর,—সে নাকি উদার,—সে নাকি নয়নারাম?
প্রভাতে সে নাকি অপরূপ রূপে দাঁড়ায় উদয়াচলে
পূজাবলি নিতে মানবমানবী-আঁখির নীলোৎপলে।
শুনেছি তখন সেকি সমারোহ,—কত বিচিত্র কি যে!
কত রূপমায়া, কত ধূপ-ছায়া! দেখিনিতো কিছু নিজে।
আমিতো দেখিনি—কেমন করিয়া আষাঢ় ঘনায়ে আসে,
দিনের আকাশ বাঁধা পড়ে' যায় ঘননীল মেঘপাশে;
কেমন করিয়া ফুটে উঠে ফুল ফাল্গুনে বনে বনে;
কেমন করিয়া দুলে উঠে কাশ আশ্বিন-সমীরণে।
দেখিনি উষর দূর বালুচরে রূপালি জলের রেখা;
দেখিনি দীপ্ত হিমগিরিশিরে প্রভাত-স্বর্ণলেখা।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগরে দেখিনি পূর্ণচাঁদের মায়া,
দেখিনি আপন দেহের বরণ, দেখিনি আপন ছায়া।
যে মায়ের বুকে লুকায়ে কেঁদেছি চাহিনি তাহার মুখে,
বড় লোভ ছিল,—বড় ক্ষোভ ছিল,—বড় ব্যথা ছিল বুকে।
রূপের ভুবনে চলে উৎসব—কৃমিকীট নাহি বাকী ;
পাই নাই চিঠি,—নয়নের দিঠি,—আমি পড়িয়াছি ফাঁকি।

নীল নভোতলে নিশীথ জগৎ যেথা স্তব্ধ, যেথা সারা—
প্রহরী তাহারি দু'পারে দু'জন—শুকতারা, সাঁঝ-তারা।
আমার নিশীথে তা'রা তো ছিল না ; কিবা দিবা,—কিবা রাতি
কেবলি আঁধার,—অকূল আঁধারে অশ্রু কেবলি সাথী।
আমি বঞ্চিত, আমি অক্ষম, আমি দীন হ'তে দীন—
সঙ্গী স্বজন কর্ণকুহরে কহিয়াছে নিশিদিন।
সবাই বলেছে দুর্ভাগা মোরে আমি লইয়াছি মানি,
আমি বঞ্চিত, চির-সঞ্চিত ছিল মনে তা'রি গ্লানি।
চির-বিদ্বেষ হুতাশন জ্বালি' আহত মর্ম্মতলে
দূরে রাখিয়াছি, ঘৃণা করিয়াছি ভাগ্যবানের দলে।

মানবীর রূপ দেখি নাই চোখে, কাঁদিয়া তাহারি লাগি,
কত বিনিদ্র রজনী জেগেছি দেবতার কৃপা মাগি'।
মনে হ'লে আজ লাগে বিস্ময় করেছি কি ছেলেখেলা!
'পরশরতন' হেলায় ঠেলিয়া চেয়েছি মাটির ঢেলা।
ভুলে ছিনু—যা'র ছায়াছবি ফিরে বাহিরে ভুবন ব্যেপে
আপনি সে এসে ধরিয়াছে হেসে আমার নয়ন চেপে।
অনিমেষে চা'ব মুখে তা'র তাই দেয়নি নিমেষ চোখে,
নিজে হ'বে সাথী সাথীহারা তাই করেছে মর্ত্তলোকে।
আঁধারে জ্বালিয়া সুরের প্রদীপ দীর্ঘ বরষ মাস
অরূপের রূপ ধ্যানে ধরিয়াছি আমি কবি সুরদাস।

ভরে' গেছে মোর অন্ধ নয়ন,—ভরে' গেছে মোর বুক।
কেমন করিয়া বুঝাব তোমারে—সেকি জয়, সেকি সুখ!
কেমন করিয়া বুঝাব তোমারে তিমির-দেউলতলে
অতুল আলোর যে প্রতিমা জাগে আঁধার পদ্ম-দলে—
সে কি অপরূপ! সে কি সুমধুর! ভুবনভুলানো সে কি!
মুখের ভাষায় কি বুঝাব আজো আশা মিটিল না দেখি'।

মিটে নাই আশা পান করি সুধা, মিটে দেখি শোভা ;
জীবনে জীবনে জনমে জনমে মিটিবেনা হয় তো বা!

আজ তোমাদেরো ভালোবাসি আমি, তোমাদেরো ভালো চাই
মোর দেবতার প্রসাদী এনেছি সুরের পাত্রে তাই।
কম বলে' কিছু মনে করিয়ো না ভীরু কণ্ঠের গান—
পর্ণপুটের সাধ্য কি ধরে মোর দেবতার দান।
নয়নের দিঠি ছিল না এবার ফুরা'ল মুখের কথা,
তোমরা আমারে বাহিরে হেরিয়া পেয়ো না বন্ধু ব্যথা।
তোমাদের আলো তোমাদেরি থাক—কোনো ক্ষোভ মোর নাহি,
আমারে কেবল করুণা কোরোনা শুধু এই কৃপা চাহি। *

* কথিত আছে যে কবি সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন।

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মালতী মাটির প্রদীপ জেলে এনেছিল। মন্দিরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সে আরও একটি বৃহৎ প্রদীপ জেলে দিল। হেরম্ব উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। মন্দির প্রশস্ত, মেঝে লাল সিমেণ্ট করা। দেবতা শিশুগোপাল। ছোট একটি বেদীর উপর বাৎসল্যের আকর্ষণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। মালতী ছুটি নৈবেদ্য সাজাচ্ছিল। হেরম্ব দেবতাকে দেখছে, মুখ না ফিরিয়েই এটা সে কি করে টের পেল বলা যায় না।

'কি রকম ঠাকুর, হেরম্ব ?'

'বেশ, মালতী বৌদি।'

আনন্দ ওঠেনি। সেইখানে তেমনিভাবে বসে ছিল। হেরম্ব ফিরে গিয়ে তার কাছে বসল।

'তুমি দেবদাসী নাকি আনন্দ ?'

'আজ্ঞে না, আমি কারো দাসী নই।'

'তবে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে নাচো যে ?'

'ঠাকুরের সামনে বলে নয়। মন্দিরে জায়গা অনেক, মেঝেটাও বেশ মসৃণ। সবদিন মন্দিরে নাচি না। মাঝে মাঝে। আজ এইখানে নাচব, এই ঘাসের জমিটাতে। ঠাকুর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ভক্তের কাছে যা প্রণামী পান তাই দিয়ে ভরণপোষণ করেন। এটা হ'ল তাঁর কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য করার জন্য সামনে নাচব, নাচ আমার অত সস্তা নয়।'

'বোঝা যাচ্ছে দেবতাকে তুমি ভক্তি কর না।'

'ভক্তি করা উচিত নয়। বাবা বলেন, বেশী ভক্তি করলে দেবতা চটে যান। দেবতা কি বলেন, শুনবেন ? বলেন, ওরে হতভাগার দল! আমাকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোরা একটু আত্মচিন্তা করতো বাপু! আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবার জন্য তোদের আমি পৃথিবীতে পাঠাই নি। সবাই মিলে তোরা আমাকে এমন লজ্জা দিস্!'

হেরম্ব খুসী হয়ে বলল, 'তুমি তো বেশ বলতে পার আনন্দ!'

'আমি বলতে পারি ছাই। এসব বাবার কথা।'

'তোমার বাবা বুঝি খুব আত্মচিন্তা করেন ?'

'দিনরাত। বাবার আত্মচিন্তার কামাই নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আজ বোধহয় মন একটু বিচলিত হয়েছিল, এসেই আসনে বসেছেন। কখন উঠবেন তার ঠিক নেই। এক একদিন সারারাত আসনে বসেই কাটিয়ে দেন।'

মন্দিরের মধ্যে মালতী শুনতে পাবে বলে আনন্দ হেরম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'এই জন্য মা এত ঝগড়া করে। বলে বাড়ী বসে ধ্যান করা কেন, বনে গেলেই হয়! বাবা সত্যি সত্যি দিনের পর দিন যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। এত কম কথা বলেন যে মনে হয় বোবা বুঝি।'

হেরম্ব একথা জানে। অনাথ চিরদিন স্বল্পভাষী। সে-রকম স্বল্পভাষী নয়, বেশী কথা কইলে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যাবে বলে যারা চুপ করে থাকে। নিজেকে প্রকাশ করতে অনাথের ভাল লাগে না। তার কম কথা বলার কারণ তাই।

মন্দিরের মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ নেড়ে টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে মালতী এদিকে আরতি আরম্ভ করে দিয়েছিল। হেরম্ব বলল, 'প্রণামী দেবার ভক্ত কই আনন্দ ?'

'তারা সকালে আসে। দু'মাইল হেঁটে রাত করে কে এত-দূর আসবে! বিকালে আমাদের একটি পয়সা রোজগার নেই। আজ আপনি আছেন আপনি যদি কিছু দেন।'

'তুমি আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছ!'

'আমি আদায় করব কেন ? পুণ্য অর্জ্জনের জন্য আপনিই দেবেন। আমি শুধু আপনাকে উপায়টা বাৎলে দিলাম।' আনন্দ হাসল। মালতীর ঘণ্টা এই সময় নীরব হওয়ায় আবার হেরম্বের দিকে ঝুঁকে বলল, 'তাই বলে মা প্রণাম করতে ডাকলে প্রণামী দিয়ে বসবেন না যেন সত্যি সত্যি! মা তা'হলে ভয়ানক রেগে যাবে।'

'মাকে তুমি খুব ভয় কর নাকি আনন্দ ?'

'না, মাকে ভয় করি না। মার রাগকে ভয় করি।'

হেরম্ব এক টিপ নস্য নিল। সহজ আলাপের মধ্যে তার আত্মগ্লানি কমে গেছে।

'আমাকে? আমাকে তুমি ভয় কর না আনন্দ?'

'আপনাকে? আপনাকে আমি চিনি না, আপনার রাগ কি রকম জানি না। কাজেই বলতে পারলাম না।'

'আমাকে তুমি চেনোনা আনন্দ! আমি তোমার বন্ধু যে!'

আনন্দ অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলল, 'বাস্! শোন কথা! আপনি আবার বন্ধু হলেন কখন?'

'একটু আগে তুমি নিজেই বলেছ। মালতী বৌদি সাক্ষী আছে।'

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ভুল করে বলেছিলাম। আমি ছেলেমানুষ, আমার কথা ধরবেন না। কখন কি বলি না বলি ঠিক আছে কিছু!'

'এরকম অবস্থায় তোমার তবে কিছু না বলাই ভাল, আনন্দ।'

'কিছু বলছিও না আমি। কি বলেছি? চুপ করে বসে আছি। আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আমি বেশী কথা বলছি, আপনার ভুল মনে হয়েছে জানবেন।···ওই দেখুন, চাঁদ উঠেছে।'

আনন্দ মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হেরম্ব তাকায় তার মুখের দিকে। তার অবাধ্য বিশ্লেষণ-প্রিয় মন সঙ্গে সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করে তেজী আলোর চেয়ে জ্যোৎস্নার মত মৃদু আলোতে মানুষের মুখ আরও বেশী সুন্দর হয়ে ওঠে কেন। আলো অথবা মানুষের চোখ, কোথায় এ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়?

হেরম্বের ধারণা ছিল কাব্যকে, বিশেষ করে চাঁদের আলোর কাব্যকে সে বহুকাল পূর্ব্বেই কাটিয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নার একটি মাত্র গুণের মর্য্যাদাই তার কাছে আছে, যে এ আলো নিষ্প্রভ, এ আলোতে চোখ জ্বলে না। অথচ, আজ শুধু আনন্দের মুখে এসে পড়েছে বলেই তার মত 'সিনিকে'র কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

হেরম্বের বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব্ব সত্য আবিষ্কার করে তাকে নিদারুণ আঘাত করে। কবির খাতা ছাড়া পৃথিবীর কোথায়ও যে কবিতা নেই, কবির জীবনে পর্য্যন্ত নয়, তার এই জ্ঞান পুরানো। কিন্তু এই জ্ঞান আজও যে তার অভ্যাস হয়ে যায় নি, আজ হঠাৎ সেটা বোঝা গেছে। কাব্যকে অসুস্থ নার্ভের টঙ্কার বলে জেনেও আজ পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের কাব্যপিপাসা অব্যাহত রয়ে গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার কল্পনার যোগসূত্রটি আজও ছিঁড়ে যায় নি। রোমান্সে আজও তার অন্ধ বিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আজও তার কাছে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জ্যোৎস্না তার চোখের প্রিয়তম আলো। হৃদয়ের অন্ধ সত্য এতকাল তার মস্তিষ্কের নিশ্চিত সত্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। তার ফলে, জীবনে কোন-দিকে তার সামঞ্জস্য থাকেনি, একধার থেকে সে কেবল করে এসেছে ভুল। দুটি বিরুদ্ধ সত্যের একটিকে সজ্ঞানে আর একটিকে অজ্ঞাতসারে একসঙ্গে মর্য্যাদা দিয়ে এসে জীবনটা তার ভরে উঠেছে শুধু মিথ্যাতে। তার প্রকৃতির যে রহস্য, যে দুর্ব্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তির মত মেয়েদের আকর্ষণ করেছে, সুপ্রিয়ার ফিটের অসুখ আর উমার আত্মহত্যা সম্ভব করেছে, সে তবে এই? রূঢ় বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে হেরম্ব নিজেকে এই প্রশ্ন করে।

মিথ্যার প্রকাণ্ড একটা স্তূপ ছাড়া সে আর কিছুই নয়, নিজের কাছে এই জবাব সে পায়।

আনন্দের মুখ তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়। আত্মোপলব্ধির প্রথম প্রবল আঘাতে তার দেখবার অথবা শুনবার ক্ষমতা অসাড় হয়ে থাকে। এ সহজ কথা নয়। অন্তরের একটা পুরানো শবগন্ধী পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল, একটা নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের রাত্রি দিন হয়ে উঠল। এবং তা অতি অকস্মাৎ। এরকম সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত হেরম্বের জীবনে আর আসে নি। এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে দুজন হেরম্ব গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ করেছে, আজ আনন্দের মুখে লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় দেখা গেছে, শত্রুতা করে পরস্পরকে দুজনেই তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। হেরম্বের পরিচয়, ওদের লড়াই। আর কিছু নয়। ফুলের বেঁচে থাকার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংসপিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রাবীন্দ্রিক রূপকটাই ছিল এতকালের হেরম্ব।

সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে। চকমকির মত নিজের সঙ্গে

নিজেকে ঠুকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়িয়েছে আগুন! কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সেই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনী।

হেরম্ব নিঝুম হয়ে বসে থাকে। জীবনের এই প্রথম ও শেষ প্রকৃত আত্মচেতনাকে বুঝেও আরও ভাল করে বুঝবার চেষ্টায় জাল-টানা পচা পুকুরের উত্থিত বুদ্বুদের মত অসংখ্য প্রশ্ন, অন্তহীন স্মৃতি তার মনে ভেসে ওঠে।

আনন্দ দু'বার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তবে সে শুনতে পায়।

'কি ভাবছি? ভাবছি এক মজার কথা আনন্দ।'

'কি মজার কথা?'

'আমি অন্যায় করে এতদিন যত লোককে কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলে।'

এই হেঁয়ালীটি নিয়ে আনন্দ পরিহাস করল না।

'বুঝতে পারলাম না যে? বুঝিয়ে বলুন।'

'তুমি বুঝবে না আনন্দ।'

'বুঝব। আমি কি করেছি, আমি তা বুঝব। যত বোকা ভাবেন, আমি তত বোকা নই।'

হেরম্ব বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, 'তোমার বুদ্ধির দোষ দিই নি। কথাটা বুঝিয়ে বলার মত নয়। আমার এমন খারাপ লাগছে আনন্দ।'

আনন্দ সামনের দিকে তাকিয়ে নিরানন্দ স্বরে বলল, 'তার মানে আমার জন্য খারাপ লাগছে? আচ্ছা লোক যাহোক আপনি!'

হেরম্ব অনুযোগ দিয়ে বলল, 'আমার মন কত খারাপ হয়ে গেছে জানলে তুমি রাগ করতে না আনন্দ।'

আনন্দ বলল, 'মন বুঝি খালি আপনারই খারাপ হতে জানে? সংসারে আর কারো বুঝি মন নেই? হেঁয়ালী করা সহজ! কারণ তাতে বিবেচনা থাকে না। লোকের মনে কষ্ট দেওয়া পাপ। এমনিতেই মানুষের মনে কত দুঃখ থাকে।'

আনন্দের অভিমানে হেরম্বের হাসি এল।

'তোমার দুঃখ কিসের আনন্দ!'

'আপনারইবা মন খারাপ হওয়া কিসের? চাঁদ উঠেছে, এমন হাওয়া দিচ্ছে, এখুনি প্রসাদ খেতে পাবেন, তার পর আমার নাচ দেখবার আশা করে থাকবেন,--আপনারই তো ষোল আনা সুখ। দুঃখ হতে পারে আমার। আমি এত মন্দ যে লোককে মিছামিছি কখন শাস্তি দি' নিজে তা টেরও পাই না। আমার কাছে বসতে হলে লোকের এমনি বিশ্রী লাগে, আমি মিষ্টি মিষ্টি কথা কইলেও। হুঁঃ, আমার দুঃখের নাকি তুলনা আছে।'

হেরম্ব ভাবল, আজ নিজের কথা ভেবে লাভ নেই। নিজের কথা ভুল করে ভেবে এতদিন জীবনটা অপচয়িত হয়ে গেছে, এখন নির্ভুল করে ভাবতে গেলেও আজ রাত্রিটা তাই যাবে। আনন্দের অমৃতকে আত্মবিশ্লেষণের বিষে নষ্ট করে আগামী কালের অনুশোচনা বাড়ানো সঙ্গত হবে না।

'খারাপ লাগছে কেন, জান?'

'কি করে জানব? বলেছেন?' আনন্দ আশান্বিত হয়ে উঠল।

'তোমার কাছে বসে আছি বলে যে খারাপ লাগছে একথা মিথ্যা নয় আনন্দ।'

'তা জানি।'

'কিন্তু কেন জান?'

আনন্দ রেগে বলল, 'জানি, জানি। আমার সব জানা আছে। কেবল জান জান করে একটা কথাই একশবার শোনাবেন তো!'

'একটা কথা একশোবার আমি কারুকে শোনাই না। এমন কথা শোনাব, কখনো তুমি যা শোন নি।'

'থাক। না শুনলেও আমার চলবে। আপনি অনেক কথা বলেছেন, ফুসফুস হয়তো আপনার ব্যথা হয়ে গেছে। এইবার একটু চুপ করে বসুন।'

'আর তা হয় না আনন্দ। তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার কাছে বসে মনে হচ্ছে, এতকাল তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাই খারাপ লাগছে।'

আনন্দের নালিশ করার পর থেকে বিনা পরামর্শেই তাদের গলা নীচু হয়ে গিয়েছিল। নিজের কথা নিজের কানেই যেন শোনা চলবে না।

হেরম্ব নয়, সেই যেন মিথ্যা কথা বলছে এমনি ভাবে আনন্দ বলল, 'আপনি এমন বানিয়ে বলতে পারেন!'

* * *

আরতি শেষ করে আনন্দ আজ মন্দিরে নাচবে না শুনে মালতী মন্দিরের দরজায় তালা দিল।

'এসে থেকে ঠায় বসে আছ সিঁড়িতে। ঘরে চলো হেরম্ব। তুই এই বেলা কিছু খেয়ে নে না আনন্দ?'

বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করে আনন্দ বলল, 'প্রসাদ খেলাম যে?'

'প্রসাদ আবার খাওয়া কিলো ছুঁড়ি? আর কিছু খা। নাচবেন বলে মেয়ে আমার খাবেন না, ভারি নাচউলী হয়েছেন।'

আনন্দ তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'শোন মা, শোন। আজ যদি আমায় বক, সেদিনের মত হবে কিন্তু।'

হেরম্ব দেখে বিস্মিত হল যে একথায় মালতী সত্য সত্যই ভড়কে গেল।

'কে তোকে বকছে বাবু! শুধু বলছি, কিছু খা। খেতে বলাও দোষ!'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন কি হয়েছিল?'

আনন্দ বলল, 'বোলো না মা।'

মালতী বলল, 'আমি একটু বকেছিলাম। বলেছিলাম, উপোস করে থাকলে নাচতে পাবি না আনন্দ। এই শুধু বলেছি, আর কিছুই নয়। যেই বলা—'

আনন্দ বলল, 'যেই বলা! কতক্ষণ ধরে বকেছিলে মনে নেই বুঝি?'

মালতী বলল, 'হ্যাঁরে, হ্যাঁ, তোকে আমি সারাদিন ধরে বকছি। খেয়ে দেয়ে আমার আর কাজ নেই। তার পর মেয়ে আমার কি করল জান হেরম্ব? কান্না আরম্ভ করে দিল। সে কি কান্না হেরম্ব, বাপের জন্মে আমি অমন কান্না দেখিনি। কিছুতে কি থামে? লুটিয়ে লুটিয়ে মেয়ে আমার কাঁদছে তো কাঁদছেই। আমরা শেষে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আদর করি, উনি এসে কত বোঝান, মেয়ের কান্না তবু থামে না। দুজনে আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম।'

হেরম্ব ফিস ফিস করে মালতীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আনন্দ পাগল নয় তো, মালতী বৌদি?'

'কি জানি। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।'

আনন্দ কিছুমাত্র লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হ'ল না। সপ্রতিভ ভাবেই সে বলল, 'পাগল বৈকি! আমি অভিনয় করছিলাম, মজা দেখছিলাম।'

'চোখ দিয়ে জলও তুই অভিনয় করেই ফেলেছিলি, না রে আনন্দ?'

'চোখ দিয়ে জল ফেলা কিছু শক্ত নাকি! বল না, এখুনি মেঝেতে পুকুর করে দিচ্ছি! বসুন ওই চৌকিটাতে।'

হেরম্ব বসল। দু'টি ঘরের মাঝখানে সরু ফাঁক দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে অন্দরের বারান্দা হয়ে সে এই ঘরে পৌঁছেছে। বারান্দায় বোঝা গিয়েছিল, বাড়ীটা লম্বাটে ও ছুপেশে। লম্বা সারিতে বোধ হয় ঘর তিনখানা, অন্যপাশে একখানি মাত্র ঘর এবং তার সঙ্গে লাগানো নীচু একটা চালা। চালার নীচে দু'টি আবছা গরু হেরম্বের চোখে পড়েছিল। বাড়ীর আর দু'টি দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের মাথা ডিঙ্গিয়ে জ্যোৎস্নালোকে বনানীর মত নিবিড় একটি বাগান দেখা যায়।

এ ঘরখানা লম্বা সারির শেষে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার ঘর?'

আনন্দ বলল, 'আমার।'

চৌকীর বিছানা তবে আনন্দের? প্রতিরাত্রে আনন্দের অঙ্গের উত্তাপ এই শয্যায় সঞ্চিত হয়? বালিশে আনন্দের গালের স্পর্শ লাগে? হেরম্ব নিজেকে অত্যন্ত শ্রান্ত মনে করতে লাগল। জুতো খুলে বলল, 'আমি একটু শুলাম আনন্দ।'

'শুলেন? শুলেন কি রকম!' তার শয্যায় হেরম্ব শোবে শুনে আনন্দের বোধ হয় লজ্জা করে উঠল।

মালতী বলল, 'শোও না, শোও। একটা উঁচু বালিশ এনে দে আনন্দ। আমার ঘর থেকে তোর বাপের তাকিয়াটা এনে দে বরং। যে বালিশ তোর।'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলল, "বালিশ চাই না মালতী বৌদি। উঁচু বালিশে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।'

মালতী হেসে বলল, 'কি জানি বাবু, কি রকম ঘাড় তোমার। আমি উঁচু বালিশ নইলে মাথায় দিতে পারি না। আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি আমার কাজ করি গিয়ে। ওকে খেতে দিস্ আনন্দ।

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি কাজ করবে মা?'

'সাধনে বসব।'

'আজও তুমি ওই সব খাবে? একদিন না খেলে চলে না তোমার?'

মালতীর মধ্যেও হেরম্ব বোধ হয় কিছু পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল। রাগ না করে সে শান্ত ভাবেই বলল, 'কেন, আজ কী? হেরম্ব এসেছে বলে? আমি পাপ করি না আনন্দ যে

ওর কাছ থেকে লুকোতে হবে। হেরম্বও খাবে একটু।' আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ, খাবে বৈকি! অতিথিকে আর দলে টেনোনা।'

মালতী বলল, 'তুই ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিসনে, কেন কথা কইতে আসিস আনন্দ? হেরম্ব খাবে বৈকি। তোমাকে একটু কারণ এনে দি হেরম্ব?' বলে সে ব্যগ্র দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেরম্বের অনুমানশক্তি আজ আনন্দসংক্রান্ত কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ছিল। তবু নিজে কারণ পান করে একটা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা অর্জ্জন করার আগেই তাকে মদ খাওয়াবার জন্য মালতীর আগ্রহ দেখে সে একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ভাবল, মালতী বৌদি আমাকে পরীক্ষা করছে নাকি? আমি মদ খাই কিনা, নেশায় আমার আসক্তি কতখানি তাই যাচাই করে দেখছে?

মালতীর অস্বাভাবিক সারল্য এবং ভবিষ্যতে আসা যাওয়া বজায় রাখার জন্য তাকে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতায় বেঁধে ফেলার প্রাণপণ প্রয়াস স্মরণ করে হেরম্বের মনে হ'ল, মালতী যে সন্ধ্যা থেকে তার দুর্ব্বলতার সন্ধান করছে—একথা হয়ত মিথ্যা নয়। মালতীর মনের ইচ্ছাটা মোটামুটি অনুমান হেরম্ব অনেক আগেই করেছিল। যে গৃহ একদিন সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছে, মেয়ের জন্য তেমনি একটি গৃহ সৃষ্টি করতে চেয়ে মালতী ছটফট করছে। তারা চিরকাল বাঁচবে না, আনন্দের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু গৃহ যাদের একচেটিয়া তারা যে কতদূর নিয়মকানুনের অধীন সে খবর মালতী রাখে। কুড়ি বছরের পুরাতন গৃহত্যাগের ব্যাপারটা লুকিয়ে, অনাথ যে তার বিবাহিত স্বামী নয় এ খবর গোপন করে, মেয়ের বিয়ে দেবার সাহস মালতীর নেই। অথচ আনন্দ যে পুরুষের ভালবাসা পাবে না, ছেলে মেয়ে পাবে না, মেয়ে মানুষ হয়ে একথাটাও সে ভাবতে পারে না। আজ সে এসে দাঁড়ানো মাত্র মালতীর আশা হয়েছে। বারো বছর আগে মধুপুরে তার যে পরিচয় মালতী পেয়েছিল হয়ত সে তা ভোলে নি।

কিন্তু তবু সে যাচাই করে নিতে চায়। বুঝতে চায়, অনাথের শিষ্য কতখানি অনাথের মত হয়েছে।

হেরম্ব বলল, 'না, কারণ-টারণ আমার সইবে না মালতী বৌদি।'

'খাওনি বুঝি কখনো?'

কখনো খায়নি বললে মালতী বিশ্বাস করবে না মনে করে হেরম্ব বলল—'একদিন খেয়েছিলাম। আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর বাড়ীতে। একদিনেই সখ মিটে গেছে, মালতী বৌদি।'

সুপ্রিয়ার কথা হেরম্বের মনে পড়ছিল। একদিন একটুখানি মদ খেয়েছিল বলে তাকে সে ক্ষমা করে নি। আজ মিথ্যা বলে মালতীর কাছে তাকে আত্মসমর্থন করতে হচ্ছে।

মালতী খুসী হয়ে বলল, 'তা হলে তোমার না খাওয়াই ভাল। সাধনের জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে খেতে হয়, তাছাড়া ওতে আমার কোন ক্ষতিই হয় না হেরম্ব। কারণ পান করলে তোমার নেশা হবে, আমার শুধু একাগ্রতার সাহায্য হয়। প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রতন্ত্র আছে,—সে সব তুমি বুঝবে না হেরম্ব। বাবা বলেন, নেশার জন্য ওসব খাওয়া মহাপাপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাও, কোন দোষ নেই।'

আনন্দ মিনতি করে বলল, 'আজ থাক মা।'

মালতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে চলে গেল। ঘরের মাঝখানে লণ্ঠন জলছিল। কাঁচ পরিষ্কার, পলতে ভাল করে কাটা, আলো বেশ উজ্জ্বল। পূর্ণিমার প্রাথমিক জ্যোৎস্নার চেয়ে ঢের বেশী উজ্জ্বল। হেরম্বের মনে হ'ল, আনন্দের মুখ ম্লান দেখাচ্ছে।

আনন্দ বলল, 'মার দোষ নেই।'

'দোষ ধরিনি, আনন্দ।'

'দোষ না ধরলে কি হবে। মেয়েমানুষ মদ খায় একি সহজ দোষের কথা।'

সুপ্রিয়াকে মনে করে হেরম্ব চুপ করে রইল।

একটা জলচৌকী সামনে টেনে এনে আনন্দ তাতে বসল।

'কিন্তু মার সত্যি দোষ নেই। এসব বাবার জন্যে হয়েছে। জানেন, মার মনে একটা ভয়ানক কষ্ট আছে। একবার পাগল হয়ে যেতে বসেছিল, এই কষ্টের জন্যে।'

'কিসের কষ্ট?

আনন্দ বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে গোলাকার আলোর শিখাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'মা বাবাকে ভয়ানক ভালবাসে। বাবা যদি দুদিনের জন্যও কোথাও চলে যান, মা ভেবে ভেবে ঠিক পাগলের মত হয়ে থাকে। বাবা কিন্তু মাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে একদিন বাবাকে একটা মিষ্টি কথা বলতে শুনিনি।' হেরম্ব অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু মাষ্টারমশায় তো কড়া কথা বলবার লোক নন।'

'রেগে চেঁচামেচি করে না বললে বুঝি কড়া কথা বলা হয় না? আপনার সামনে মাকে আজ কিরকম অপদস্থ করলেন দেখলেন না? চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়ীতে থাকি, মার অবস্থা আমার কি আর বুঝতে বাকী আছে। এমনি মা অনেকটা শান্ত হয়ে থাকে। মদ খেলে আর রক্ষা নেই। গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দেবে। শুনতে পাবার ভয়ে আমি অবশ্য বাগানে পালিয়ে যাই, তবু দু'চারটে কথা কানে আসে তো। আমার মন এমন খারাপ হয়ে যায়।' ক্ষণিকের অবসর নিয়ে আনন্দ আবার বলল, 'বাবা এমন নিষ্ঠুর!'

কাত হয়ে আনন্দের বালিশে গাল রেখে হেরম্ব শুয়েছিল। বালিশে মৃগনাভির মৃদু গন্ধ আছে। মালতীর দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতেও সে স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল কস্তূরীগন্ধের সঙ্গে তার মনে কার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আনন্দের উচ্চারিত নিষ্ঠুর শব্দটা তার মনকে আনন্দের দিকে ফিরিয়ে দিল।

'নিষ্ঠুর ?'

'ভয়ানক নিষ্ঠুর। আজ বাবার কাছে একটু ভাল ব্যবহার পেলে মা মদ ছোঁন না। জেনেও বাবা উদাসীন হয়ে আছেন। এক এক সময় আমার মনে হয়, এর চেয়ে বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন তাও ভাল ছিল। মা বোধ-হয় তা হ'লে শান্তি পেত।'

বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন ! আনন্দও তাহলে প্রয়োজন উপস্থিত হলে নিষ্ঠুর চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে পারে? মালতীর দুঃখের চেয়ে আনন্দের এই নূতন পরিচয়টিই যেন হেরম্বের কাছে প্রধান হয়ে থাকে। তার নানা কথা মনে হয়। মালতীর অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তনকে আনন্দ যথোচিতভাবে বিচার করতে অক্ষম নয় জেনে সে সুখী হয়। মালতীর অধঃপতন রহিত করতে অনাথকে পর্য্যন্ত সে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করে, মালতীর দোষগুলি তার কাছে এতদূর বর্জ্জনীয়। মাতৃত্বের অধিকারে যা খুসী করার সমর্থন আনন্দের কাছে মালতী পায়নি। শুধু তাই নয়। আনন্দের আরও একটি অপূর্ব্ব পরিচয় তার মালতী সম্পর্কীয় মনোভাব এর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মালতীকে সে দোষী বলে জানে, কিন্তু সমালোচনা করে না, তাকে সংস্কৃত ও সংশোধিত করবার শতাধিক চেষ্টায় অশান্তির সৃষ্টি করে না। মালতীকে কিসে বদলে দিয়েছে আনন্দ তা জানে। কিন্তু জানার চেয়েও যা বড় কথা, মনোবেদনার এই বিকৃত অভিব্যক্তিকে সে বোঝে, অনুভব করে। জীবনের এই যুক্তি-হীন অংশটিতে যে অখণ্ড যুক্তি আছে, আনন্দের তা অজানা নয়। ওর বিষণ্ণ মুখখানি হেরম্বের কাছে তার প্রমাণ দিচ্ছে।

আনন্দ চুপ করে বসে আছে। তার এই নীরবতার সুযোগে তাকে সে কত দিক দিয়ে কতভাবে বুঝেছে হেরম্বের মনে তার চুলচেরা হিসাব চলতে থাকে। কিন্তু এক সময় হঠাৎ সে অনুভব করে এই প্রক্রিয়া তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আনন্দকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টায় তার মধ্যে কেমন একটা অনুত্তেজিত অবসন্ন জ্বালা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সম্মুখে পথ অফুরন্ত জেনে যাত্রার গোড়াতেই অশ্রান্ত পথিকের যেমন স্তিমিত হতাশা জাগে, একটা ভারবোধ তাকে দমিয়ে রাখে, সেও তেমনি একটা ঝিমানো চেপে-ধরা কষ্টের অধীন হয়ে পড়েছে। আনন্দের অন্তরঙ্গ প্রশ্রয়ে তার যেন সুখ নেই।

হেরম্ব বিছানায় উঠে বসে। লণ্ঠনের এত কাছে আনন্দ বসেছে যে তাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ম্ময়ী, আলো যেন লণ্ঠনের নয়। হেরম্ব অসহায় বিপন্নের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আরও একটি অভিনব আত্মচেতনা খুঁজে পায়। তার বিহ্বলতার সীমা থাকে না। সন্ধ্যা থেকে আনন্দকে সে যে কেন নানা দিক থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণে হেরম্ব সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। ঝ'ড়ো রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের মত অশান্ত অসংযত হৃদয়কে এমনি ভাবে সে সংযত করে রাখছে, আনন্দকে জানবার ও বুঝবার এই অপ্রমত্ত ছলনা দিয়ে। আনন্দ যেমনি হোক কি তার এসে যায়? সে বিচার পড়ে আছে সেই জগতে, যে জগতকে আনন্দের জন্যই তাকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। জীবনে ওর যত অনিয়ম যত অসঙ্গতিই থাক, কিসের সঙ্গে তুলনা করে সে তাদের যাচাই করবে? আনন্দকে সে যে স্তরে পেয়েছে সেখানে ওর অনিয়ম নিয়ম, ওর অসঙ্গতি সঙ্গতি। ওর অনিবার্য্য আকর্ষণ ছাড়া বিশ্বজগতে আজ আর দ্বিতীয় সত্য নেই; ওর হৃদয়মনের সহস্র পরিচয় সহস্রবার আবিষ্কার করে তার লাভ কি হবে? তার মোহকে সে চরম পরিপূর্ণতার স্তরে তুলে দিয়েছে, তাকে আবার গোড়া থেকে সুরু করে বাস্তবতার ধাপে ধাপে চিনে গিয়ে তিল তিল করে মুগ্ধ হবার মানে কি হয়? এ তারই হৃদয়মনের দুর্ব্বলতা। ঈশ্বরকে কৃপাময় বলে কল্পনা না করে যে দুর্ব্বলতার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে ভাল-বাসতে পারে না, এ সেই দুর্ব্বলতা। আনন্দকে আশ্রয় করে যে অপার্থিব অবোধ্য অনুভূতি নীহারিকালোকের রহস্য-সম্পদে তার চেতনাকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিতে চায়, পৃথিবীর মাটিতে প্রোথিত সহস্র শিকড়ের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ঊর্দ্ধায়তঃ জ্যোতিস্তরের মত, তাকে উত্তুঙ্গ আত্মপ্রকাশে সমাহিত করে ফেলতে চায়, সেই অব্যক্ত অনুভূতিকে ধারণ করবার শক্তি হৃদয়ের নেই বলে অভিজ্ঞতার অসংখ্য অনভিব্যক্তি দিয়ে তাকেই সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। আকাশকুসুমকে আকাশে উঠে সে চয়ন করতে পারে না। তাই অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে বাগানের মাটিতে তার চাষ করছে। হৃদয়ের একটিমাত্র অবাস্তব বন্ধনের সমকক্ষ লক্ষ বাস্তব বন্ধন সৃষ্টি করে সে আনন্দকে বাঁধতে চায়। সুখদুঃখের অতীত উপভোগকে সে পরিণত করতে চায় তার পরিচিত পুলক-বেদনায়। আজ সন্ধ্যা থেকে সে এই অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছে। (ক্রমশঃ)

তড়িৎ বিজ্ঞানের পরিভাষা

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কেবল মাত্র গল্প, কবিতা বা ভ্রমণ-কাহিনীপূর্ণ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে যে বিজ্ঞান বিষয়েও আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে—ইহা সুলক্ষণ। কারণ, কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস ও কবিতাই কোনও জাতিরই সম্পূর্ণ সাহিত্য হইতে পারে না। আর মানব-সভ্যতার সাহিত্যিক প্রসারের সহিত জাতীয়তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক চিরদিনই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লইয়া। সুনির্দ্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ অর্থ-দ্যোতক পরিভাষা ও সংজ্ঞার অভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা প্রত্যেক লেখকই জানেন। শুধু তাই নয়;—উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে প্রত্যেক লেখককেই পারিভাষিক শব্দ গঠন করিয়া লইতে হয়।—ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, বিভিন্ন লেখকের দ্বারা একই বিষয়ের বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ সৃষ্ট হইতেছে; এবং ইহার সবগুলিই নির্ভুল হইতেছে না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হইতেছে বেশী। ইহা ছাড়া আরও একটি দিকও বিবেচনার যোগ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে কোনও দুই ব্যক্তিই—একই শব্দ ঠিক একই অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং কোনও প্রবন্ধে লেখকের নিজের রচিত শব্দ বেশী সংখ্যায় থাকিলে, উহা স্বয়ং লেখক ব্যতীত অপর কাহারও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। এই জন্য পরিভাষা রচনায় লেখকগণের সমবেত ভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন; এবং নূতন রচিত পারিভাষিক শব্দের তালিকা মধ্যে মধ্যে সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত প্র কৃ তি পত্রিকায় বহুদিন হইতে এই চেষ্টা চলিতেছে; রাজশেখর বসু মহাশয়ও চ ল ন্তি কা-য় কিছু পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, এবং সর্ব্বত্র ইহা যথাযথও হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায়, কেবলমাত্র গ্রীক, ল্যাটিন বা ইংরেজী শব্দের এক-একটি সংস্কৃত-মূলক অনুবাদ দিলেই চলিবে না;—শব্দানুবাদ অপেক্ষা এক্ষেত্রে ভাবানুবাদই অধিক প্রয়োজন। "পরিমঙ্গলীয় পত্রক" "দ্বাম্লাঙ্গারক" "যবক্ষারজান" প্রভৃতি অপরূপ শব্দ এই প্রকার ব্যর্থ অনুবাদচেষ্টার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কখনই চলিবে না।

অনুবাদ যেখানে সরল হইয়াছে, সেখানেও পারিভাষিক শব্দ যথাযথ হয় নাই। যেমন, pole—ধ্রুব, matter—পদার্থ, tenacity—তানতা, ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা রচনা করিতে হইলে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। ইংরেজী field শব্দটির অর্থ—মাঠ, জমি ময়দান, ইত্যাদি। কিন্তু চুম্বক ও তড়িৎ বিজ্ঞানে ইহার অর্থ বিদ্যুৎশক্তির ও বিশেষ করিয়া চুম্বকশক্তির আকর্ষণ-ক্ষেত্র। ইহা হইতে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি চৌম্বক আকর্ষণরেখার * সমষ্টি, এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ এই শব্দটি তড়িৎ-চুম্বকের তার-কুণ্ডলী—অথবা এই এই তারের বিদ্যুৎ প্রবাহ পর্য্যন্ত বুঝাইতে সংক্ষেপে ব্যবহৃত হইতেছে। কাজেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ইহার যথাযথ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা অপরের পক্ষে সম্ভব নহে।

ইহা ছাড়া, তড়িৎ বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় আর একটি বিষয়েও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তড়িৎ বিজ্ঞানে, অনেক স্থানে বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতে একই অর্থ-সূচক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় এই সকল সমার্থক এক একটি শব্দ একটিই মাত্র নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে—ইহা স্বীকৃত থাকায়, কোনও অসুবিধা ঘটে না। বাঙ্গালা ভাষায়ও, লেখকগণ এই প্রকার সমার্থক বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থ না মানিয়া লইলে tragedy of errors, comedy of errors মোটেই নয়, ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্ত

* এই রেখাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব আছে।

স্বরূপ transformer ও convertor শব্দ দুইটি লওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী ভাষায় এই শব্দ দুইটি সমার্থক। কিন্তু তড়িৎ বিজ্ঞানে ইহারা দুইটি বিভিন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক যন্ত্র বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়;—ট্রান্সফর্মার—যে যন্ত্রের দ্বারা বিদ্যুৎ-চাপ বা প্রবাহের পরিমাণের তারতম্য করা যায়; এবং কনভার্টার—যাহার দ্বারা একাভিমুখী বিদ্যুৎ-চাপ বা প্রবাহকে (direct voltage or current) আন্দোলিত চাপ বা প্রবাহে (alternate voltage or current) পরিবর্ত্তিত করা হয়। Regulator ও controller অনুরূপ আর দুইটি শব্দ। Regulator কেবলমাত্র পাখার বেগ নিয়মিত করে; আর controller ট্রাম, কপিকল প্রভৃতির নিয়ন্ত্রক। সুতরাং দেখিতেছি, অনুরূপ সমার্থক বাঙ্গালা প্রতিশব্দগুলির মধ্যে রাম কোন্‌টিকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা যদি শ্যামের পূর্ব্ব হইতেই জানা না থাকে, তবে tragedy of errors ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। আবার কোনও কোনও স্থানে একটি বিশেষ শব্দ বহু ব্যবহারে এমন একটি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে, উহার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ঘটনা বা ব্যাপার সূচিত হয়,—যাহা সাধারণ ভাবে শব্দ-সমষ্টির (phrase) সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ইংরেজী charged শব্দটি ইহার উদাহরণ। তড়িৎ বিজ্ঞানে ইহা সর্ব্বদাই charged with electricity এই অর্থে ব্যবহার হয়। ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দটি "বিদ্যুৎ-পূর্ণ" না করিলে অর্থ সম্পূর্ণ হইবে না।

দুঃখের বিষয় তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন, তাঁহারা এই সকল বিষয়ে বিশেষ অবহিত নহেন। তাঁহাদের রচিত পারিভাষিক শব্দে উপরিলিখিত দোষ-গুলি অনেকক্ষেত্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পত্রিকায় একজন লেখক magnetic lines of force বুঝাইতে "বল-রেখা" ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা শব্দানুবাদ হইয়াছে মাত্র; প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক হয় নাই। "আকর্ষণ রেখা" বলিলে অর্থ আরও সুস্পষ্ট হয়, এবং বিষয়ানু-বর্ত্তিত হয়। বিজলী পত্রিকায় জনৈক লেখক Ohm's Lawএর অনুবাদ করিয়াছেন "ওম-আইন"! Amended Criminal Law নিশ্চয়ই "সংশোধিত ফৌজদারী আইন";—তাই বলিয়া Law of Gravitation কি মাধ্যাকর্ষণের আইন?—না Einstein's Law আইনষ্টাইনের আইন?—আর Laws of Motion? এই লেখকই অপর এক স্থানে hysteresisএর প্রতিশব্দ "দ্বিধা" করিয়াছেন। সাধারণ ছাত্রও জানে, এই শব্দটি গ্রীক 'হু্ষ্টেরেয়ো' শব্দটি হইতে সৃষ্ট;—যাহার অর্থ "পিছাইয়া পড়া"। কিন্তু লেখক ইহার অর্থ "দ্বিধা" করিতে একটুও দ্বিধা করেন নাই! ইহার যথাযথ প্রতিশব্দ "মন্থরতা" হওয়া উচিত। ঐ পত্রিকাতেই আর একজন লেখক dry cell অর্থে "অতরল কোষ" ব্যবহার করিয়াছেন। "অতরল" শব্দটি প্রথমে পড়িয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিলাম। অথচ 'শুষ্ক' 'নির্জ্জল' বা 'নীরস' শব্দ বাঙ্গালা দেশের নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে। এই পত্রিকারই আর এক সংখ্যায় density ও specific gravityর বাঙ্গালা করা হইয়াছে—'কাঠিন্য'! ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

তড়িৎ বিদ্যা—অর্থনীতি, গণিত, পদার্থ বিদ্যা বা রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহারিক বিজ্ঞান; এবং ইহার প্রয়োগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ইহার কারিকর ও মিস্ত্রী প্রভৃতিরা অনেক-ক্ষেত্রে অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত। এজন্য ইহার পরিভাষা রচনায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। পারিভাষিক শব্দ সরল, এবং যতদূর সম্ভব সুপ্রচলিত হওয়া দরকার। যে সকল শব্দের ইংরেজী রূপই বাঙলা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে,—যেমন পাম্প ইঞ্জিন, ইষ্টিশান, ট্রাম, মোটর (বৈদ্যুতিক) তাহাদের আর বদলাইবার চেষ্টা না করাই ভাল। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে যথাযথ পারিভাষিক শব্দ যদি সরল ও সংস্কৃত-মূলক সাধুভাষায়ও হয়,—তাহা হইলেও দোষ হইবে না। অল্প ব্যবহারেই উহা সুপ্রচলিত হইয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের পাঠশালার বালকদেরও অতি স্বাভাবিক ভাবেই "নলকূপ" শব্দটি ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়, নাগরিক-সভা, শাসন-পরিষদ প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

তড়িৎবিজ্ঞানের পরিভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, এবং হয়ত একেবারে নির্দ্দোষও নয়। এ বিষয়ে চিন্তাশীল লেখকগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

এই তালিকায় যে চলিত প্রতিশব্দগুলি উদ্ধারচিহ্নের ('—') মধ্যে দেওয়া হইল—এই গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভুল এবং যথার্থ পারিভাষিক শব্দ। এই শব্দগুলি প্রধানতঃ নিরক্ষর কারিকর বা মিস্ত্রী দ্বারা সঠিক বস্তুটি বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হয়।

Engineer—ইঞ্জিনীয়ার
Engineering—ইঞ্জিনীয়ারি
Electrician—'বিজলী-ওয়ালা'
Electrical Engineer—তড়িৎ-শিল্পী, 'বিজলী ইঞ্জিনীয়ার'
Illuminating Engineering—ব্যবহারিক আলোকবিজ্ঞান: 'রোশনী ইঞ্জিনীয়ারি'
Illumination—'রোশনাই', আলোক-সজ্জা
Colour Light—বর্ণ-আলোক
Colour filter—বর্ণপরিশোধক
Light projector—আলো-প্রক্ষেপক
Dimmer—পরিম্লানক
Back ground—পৃষ্ঠ-পট; 'জমি'
Submersive—জলতল-স্থায়ী, অন্তর্জলী, 'ডুবুরী'
Glare—'জলুস'
Spectra—বর্ণচ্ছটা
Ultra violet—অতি-বেগুনী
Blue—আশমানী
Indigo—নীল
Infra red—উপ-লাল
Colour effcet—বর্ণ-ব্যঞ্জনা
Foot-candle—ফুট-বাতি, (সংক্ষেপে 'বাতি')
Candle power—আলোক-শক্তি; 'বাতি'
Watt—ওয়াট
Ampere—অ্যাম্পিয়ার
Volt—ভোল্ট
Specification—নির্দ্দেশ
Incandescent—ভাস্বর
Series system—শ্রেণী-সজ্জা প্রণালী
in series—শ্রেণীবদ্ধ; 'পরপর'
Parallel—সমান্তর; 'পাশাপাশি'
Parallel system—সমান্তর-সজ্জা প্রণালী
Bulb—ডুম
Lamp—বাতি
Arc lamp—আর্ক-ল্যাম্প
Power Station—শক্তি-গৃহ; 'বিজলী ঘর'
Force—বল
Energy—শক্তি
Power (rate of energy)—ক্ষমতা
Work—কার্য্য
Horse Power—অশ্ব-শক্তি, 'ঘোড়ার জোর', (সংক্ষেপে 'ঘোড়া')
Efficient—কার্য্যকরী
Efficiency—কার্য্যকারিতা
Loss—ক্ষতি
Intensity of illumination—আলোকের তীব্রতা
Mantle—'জালি'
Globe—গোলক, 'হাঁড়ি'
Generator—জনক যন্ত্র, 'বিজলী কল'
Motor—মোটর, বিদ্যুৎ-কল
Voltage—বিদ্যুৎ-চাপ, ভোল্টেজ
Electro-Motive force—বিদ্যুৎ-চালক শক্তি
Potential—শক্যতা
Current—প্রবাহ, তড়িৎ-স্রোত
Constant current—সম-প্রবাহ, স্থির স্রোত
Direct current—অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহ, একমুখী স্রোত
Alternate current—আন্দোলিত প্রবাহ, দু'মুখী স্রোত
Eddy current—ঘূর্ণী স্রোত
Conductor—প্রবাহক, পরিচালক
Conductivity—পরিচালন ক্ষমতা
Resistance—প্রতিবন্ধক, বাধা
Insulated—প্রতিরুদ্ধ
Insulator—প্রতিরোধক
Dielectric—বিচ্ছেদক
Automatic—স্বয়ং-ক্রিয়
Transformer—ট্রান্সফর্মার, পরিবর্ত্তক
Converter—কনভার্টার, রূপান্তক
Circuit—চক্র; পথ; বেষ্টনী
Fault—দোষ
Search Light—সন্ধানী আলো
Filament—তন্তু, তার
Tension, Pressure—চাপ (বৈদ্যুতিক)
Charged—বিদ্যুৎ-পূর্ণ
Condenser—আধার, বিদ্যুতাধার
Capacity—ধারণ-শক্তি, সামর্থ্য
Electrified—বিদ্যুতান্বিত, বিদ্যুৎ-ময়

Electro-cuted—তড়িৎহত
Electroscope—বিদ্যুৎ-দর্শক
Meter—মিটার ; 'ঘড়ি'
Electrometer—বিদ্যুৎ-মান
Galvanometer—তড়িৎ-মান
Ammeter—অ্যাম্পিয়ার-মান
Voltmeter—ভোল্ট-মান
Wattmeter—ওয়াট-মান
Energymeter—শক্তি-মান
Watt-hour-meter—বিদ্যুৎ-মিটার, মিটার
Static Electricity—স্থির-বিদ্যুৎ
Magnetic field—চৌম্বক ক্ষেত্র
Field—ক্ষেত্র
Field Coil—চৌম্বক তার, চুম্বক-কুণ্ডলী
Coil—কুণ্ডলী
Strong—'জোর'
Weak—'নরম'
Electro-magnetism—তড়িৎ-চুম্বকত্ব
Hysteresis—মন্থরতা
Load—ভার
Terminal—প্রান্ত, 'ডগা'
Electrode—তড়িৎ-প্রান্ত, বিদ্যুৎ-দণ্ড
Switch—সুইচ ; চাবি
Pole—মেরু
Positive—ধনাত্মক, সংযোগী
Negative—ঋণাত্মক, বিয়োগী
Positive electricity—ধন-তড়িৎ, ধন-বিদ্যুৎ
Negative electricity—ঋণ-তড়িৎ, ঋণ-বিদ্যুৎ
Cell—তড়িৎ-কোষ
Battery—ব্যাটারী
Accumulator } সঞ্চায়ক, সঞ্চয়ী-কোষ
Storage Battery } বিদ্যুৎ ভাণ্ডার
Acid—অম্ল, দ্রাবক
Solution—রস, দ্রব-পদার্থ
Hardness—কাঠিন্য
Density—ঘনতা
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব ; তুলনীয় ওজন
Solid—নিরেট

Liquid—তরল
Gas—গ্যাস ; বায়ু
Lines of force—আকর্ষণ-রেখা
Flux—রেখা-গুচ্ছ
Attraction—আকর্ষণ
Repulsion—বিকর্ষণ
Analysis—বিশ্লেষণ
Synthesis—সংশ্লেষণ
Wire—তার
Telegraphy—তড়িৎ-বার্তা
Gramophone—গ্রামোফোন, 'কলের গান'
Telephony—তড়িৎ-বাণী
Wireless—বেতার
Radio—বেতার-বাণী
Television—দূর-দর্শক
Matter—বস্তু
Mass—বস্তুমান
Element—মূলবস্তু, রূঢ় পদার্থ
Compound—যৌগিক-বস্তু
Mixture—মিশ্রণ
Radio-active—তেজ বিকীরক
Live wire—'গরম তার'
Dead wire—'ঠাণ্ডা তার'
Positive wire (Lead)—'চলতি তার'
Negative wire (Return)—'ফিরতি তার'
Law—সূত্র ; নিয়ম
Theory—সিদ্ধান্ত ; তত্ত্ব, বাদ
Hypothesis—অনুমান
Strain—টান, মোচড়
Elasticity—স্থিতি-স্থাপকতা
Molecule—অণু
Atom—পরমাণু
Ether—ঈথার
Electrolysis—বৈদ্যুৎ-বিশ্লেষণ
Electron—তড়িৎ কণা
Proton—বিদ্যুতণু
Nucleus—কেন্দ্র-বিন্দু

ভবিষ্যতে এই তালিকা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

তানসেন

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আকবরের সভায় তানসেন ছিলেন গায়ক। তাঁহার মত গায়ক নাকি হাজার বৎসরের ভিতরে ভারতে জন্মায় নাই। এখনো গায়কদের মুখে মুখে তানসেনের সব গান চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনের কথা প্রায় কিছুই ঠিক করিয়া জানা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল মকরন্দ পাণ্ডে। মকরন্দ ছিলেন গৌড় ব্রাহ্মণ। আবার কেহ বলেন, তানসেনের পূর্ব্বনাম ছিল ভরত মিশ্র বা ত্রিলোচন মিশ্র। গোয়ালিয়রের মহারাজা রামনিরঞ্জন গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তানসেন উপাধি দেন। সেই নামেই এখন সকলে তাঁহাকে জানে।

বাল্যকালে তানসেন নাকি কিছুকাল বৈজু বাওরার কাছে গান শিক্ষা করেন। যাহা হউক, তাঁহার আসল গানের গুরু ভক্ত হরিদাস স্বামী। একটি প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় হরিদাস স্বামী বসিয়া তানপুরায় গান করিতেছেন; তানসেন পাশে মাটিতে বসিয়া আছেন আর আকবর আছেন এক পাশে দাঁড়াইয়া। প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় তানসেন ছিলেন শ্যামবর্ণ কৃশ মানুষ। গানই ছিল তাঁহার আসল রূপ। তাঁহার কণ্ঠের সুরে সবাই হইত মুগ্ধ।

হরিদাস স্বামীর কাছে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত ভাল করিয়া আয়ত্ত করেন। তারপর সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য তিনি গোয়ালিয়রের বিখ্যাত সূফী গায়ক মহম্মদ ঘৌসের নিকট যান। মহম্মদ ঘৌস ছিলেন অতি উচ্চ দরের গায়ক। তানসেনের গানে ঘৌস মুগ্ধ হইলেন। তাই তিনি তানসেনের জিহ্বায় আপন জিহ্বার স্পর্শ লাগাইয়া তাঁহার সকল গান-বিদ্যা তানসেনকে দান করিয়া গেলেন। তাই তানসেন মুসলমান হইয়া গেলেন। হয়ত গুরুভক্তি বশতঃই তিনি মুসলমান হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এক মুসলমানকন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হন। কি হিন্দু, কি মুসলমান তাঁহার সকল গুরুই দেখা যায় ভক্ত ও সাধক। কাজেই মনে হয় তানসেন সঙ্গীতকে ভক্তি ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া এত উচ্চ করিতে পারিয়াছিলেন।

বিখ্যাত সম্রাট শেরসাহের পুত্র দৌলতখাঁকে তানসেন অতিশয় ভালবাসিতেন। দৌলতখাঁর নামে তানসেনের রচিত অনেক গান আছে। দৌলতখাঁর মৃত্যুর পর রিওয়াঁ বাঘেলখণ্ডের রাজা, রাজা রামচাঁদ সিংহের দরবারে অতি সম্মানের সহিত তানসেন গৃহীত হইলেন। রামচাঁদ অতিশয় উদার ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তানসেন সেখানে বসিয়া পুরাতন রাগ-রাগিণীর যোগে নানাবিধ চমৎকার নূতন নূতন সুর রচনা করিতে লাগিলেন। তানসেনের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইব্রাহিম খাঁ সুর তানসেনকে আগ্রাতে তাঁহার দরবারে আসিয়া থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেও তানসেন গেলেন না। তাহার পর আকবর যখন তানসেনের কথা শুনিলেন, তখন তানসেনকে আনিবার জন্য তাঁহার ওমরাও জালালউদ্দীন কুরচীকে রাজা রামচাঁদের নিকট পাঠাইলেন। রামচাঁদ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আকবরের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করাতো তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই বড় দুঃখে বহু সম্মানের সহিত তানসেনকে তিনি বিদায় দিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

সামাজিক দৃষ্টিতে তানসেন মুসলমান হইলেও তাঁহার হৃদয় চিরদিন হিন্দু ভাবেই পূর্ণ ছিল। তাঁহার গানের ভাষা বৈষ্ণবদের পবিত্র ব্রজভাষা। তাঁহার গান হরিহর, গণপতি, দেবী সরস্বতী ও সূর্য্যের বন্দনায় ভরা। তাঁহার কিছু গানে আছে প্রকৃতির বর্ণনা; আর কিছু গানে আছে দেবতার বর্ণনা; আর কিছু গানে আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

পুরাতন সুর শিক্ষা করিয়া তানসেন অনেক অপরূপ সুর ও রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তবু তিনি বুঝিতেন যে, জগতের অধীশ্বর ভগবানকে ছাড়িয়া মানবের প্রভু বাদসাহের দরবারে থাকায় তাঁহার সমস্ত শক্তির বিকাশ হইতে পারে নাই।

আকবরের কাছে তানসেন তাঁহার গুরু হরিদাস স্বামীর অপূর্ব্ব গানের গল্প প্রায়ই করিতেন। আকবর বলিলেন,—**"আমাকে তাঁহার গান শুনাইতে পার?"**

তানসেন বলিলেন, "প্রভু, তিনি ভগবানের সেবক, তিনি তোমার কথায় আসিবেন কেন ?"

আকবর বলিলেন, "তিনি কেন আসিবেন! আমিই তাহার নিকট যাইব।"

আকবর তাঁহার রাজ-ঐশ্বর্য্য লোকজন সব দূরে রাখিয়া সাধারণ ভাবে তানসেনের সঙ্গে চলিলেন। যখন আকবর বৃন্দাবনে ভক্তের আশ্রমে হরিদাস স্বামীর গান শুনিলেন, তখন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তানসেনকে বলিলেন, "তোমারও তো শক্তি কম নয়, তবে কেন তুমি এমন ভাবে গান করিতে পার না ?"

তানসেন বলিলেন, "প্রভু, আমি গান করি জগতের রাজার কাছে, আর আমার গুরু গান করেন ত্রিভুবনের রাজার কাছে। তবে বল দেখি, কি করিয়া আমার গান তাঁর গানের সমান হয় ?"

তানসেন খুব উচ্চদরের কবিও ছিলেন। তাঁহার গানের সুর ও কথা তিনিই রচনা করিতেন। দুইই চমৎকার। বাদসাহ হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্র সকলকে গানে মুগ্ধ করিয়া তানসেন ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন।

গোয়ালিয়রে তাঁহার গুরু মহম্মদ ঘেটসের সমাধির পাশে এখনো তানসেনের সমাধি-স্থানটি রহিয়াছে। ভারতের সকল গায়কের দল সেখানে যাইয়া ভক্তি জানান এবং সমাধির পাশে যে একটি তেঁতুল গাছ আছে তাহার পাতা চিবাইয়া খান। তানসেনের মাহাত্ম্যে নাকি সেই তেঁতুল গাছের এমন মাহাত্ম্য যে, যে সেই গাছের পাতা খায় তাহারই কণ্ঠ মধুর হইয়া যায়।

হিন্দীতে ডর্থরীদের গানের সংগ্রহে তানসেন ও তাঁহার গুরুর গান গাহিবার শক্তির সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে। তাহাতেই বুঝিতে পারি রাজসভায় বসিয়া তানসেন সকলের মাননীয় ও বিখ্যাত হইলেও তাঁহার আশ্রমবাসী তপস্বী গুরুর গান গাহিবার শক্তি ছিল কত গভীর ও উচ্চদরের।

আকবর তানসেন সহ তখন আছেন তাঁহার নবনির্ম্মিত আদর্শ নগরী ফতহপুর সিকরীতে। তানসেনের গুরু জানিতেন না যে, তাঁহার পুরাতন প্রিয়তম শিষ্য সম্রাটের সভায় গায়ক হইয়া আছেন সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে। নানা ভক্তজনের স্থান দর্শন করিতে করিতে ও আপন প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য তানসেনের সন্ধানে গুরু একদিন ফতহপুরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। পর্ব্বতের মাঝে একা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সায়ংকালে তিনি তাঁহার বীণা বাজাইতে লাগিলেন। অমৃতমন্থনের পর দেবাসুরদের মোহিত করিয়া বিষ্ণু যে সুর বাজাইয়াছিলেন সেই সুর তাঁহার বীণায় বাজিতে লাগিল। নিকট দিয়া দাসী-সহ চলিয়াছিলেন সম্রাট আকবরের আট দশ বৎসরের এক বালিকা কন্যা। কিসের টানে বলা যায় না সকলেই আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই বৃদ্ধ সাধুর চারিদিকে।

বন হইতে একটি হরিণীও আসিয়া সকল ভয় শঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া দাঁড়াইল সেই কন্যাটির গা ঘেঁসিয়া। সবাই সেই বীণার সুরে তন্ময়। বীণার একটি সুর থামিয়া আর একটি সুর আরম্ভ হইল। গৌরীর তপস্যা, রাজার নন্দিনী, যোগী ভিখারীর ভাবরসে মনে মনে হইতেছেন সর্ব্বত্যাগী। সকলের হৃদয় অপূর্ব্ব বৈরাগ্য-রসে উঠিল ভরপুর হইয়া। সম্রাটকন্যা আপন গলায় নব-লক্ষ সুবর্ণমুদ্রার রত্নহার খুলিয়া পার্শ্বস্থ হরিণের গলায় দিলেন পরাইয়া। বীণা থামিল, হারের কথা কন্যার আর মনেও নাই, তাঁহার শিশু-হৃদয় বিভোর হইয়া আছে সাধুর বীণার অপূর্ব্ব ভাবরসে। সেই হার হরিণের গলায় পরাইতে কেহ দেখেনও নাই। বনের হরিণ পলাইল বনে। শিশু বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সকলে ফিরিয়া গেলেন যাঁহার যাঁহার স্থানে।

সম্রাটের অন্তঃপুরে দারুণ গণ্ডগোল। নব-লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রার সেই "নৌ-লখা" হার গেল কোথায় ? কন্যা কহিলেন, "আমি হরিণের গলায় পরাইয়া দিয়াছি।" দাসী কহিল, "হাঁ, সাধুর বীণায় বন হইতে একটি হরিণী আসিয়া নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছিল বটে কন্যার পাশে।" ক্রমে সব কথা আকবরের কানে গেল। তিনি বলিলেন, "তানসেন, সুরের টানে যে বনের হরিণ আসিয়াছিল সুরের আকর্ষণে তাহাকে বন হইতে আবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তুমি তো গানের অদ্বিতীয় গুণী, তোমার তা না পারিবার কথা নয়।"

পরদিন সায়ংকাল, তানসেন সেই স্থানে বসিয়াই অনেক করিলেন, হরিণ আসিল না। ব্যর্থ হইয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া গেলেন, রাত্রি গভীর হইল। কে একজন আসিয়া বলিল, "সেখানেই যেন সেই সাধুর বীণা শুনিতেছি।" তখন রাত্রি-কাল। তব ব্যাকুল হইয়া সকলে চলিলেন ছুটিয়া। আকবর

তানসেন সকলেই ছুটিয়া গেলেন সেখানে। কোথা হইতে সেই হরিণ আসিয়া উপস্থিত; গলায় সেই বহুমূল্য রত্নহার। নিঃসঙ্কোচে হরিণ দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল সাধুর বীণাধ্বনি, দাসী তাহার কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া লইল, হরিণ একটু নড়িলও না।

তানসেন চিনিলেন তাঁর গুরুকে। কিন্তু লজ্জায় কাছে আসিলেন না। লজ্জার কারণ তাঁর তপস্বী গুরুর পরিধানে শতচ্ছিন্ন কন্থা, আর লজ্জা, এমন অপূর্ব্ব বিদ্যা শিখিয়াও তিনি ভগবানকে ছাড়িয়া ঐশ্বর্য্যলোভে আসিয়াছেন সম্রাটের সেবায়। তানসেন আর কাছে আসিলেন না। গুরু এখানে আসিয়া লোকমুখে শুনিয়াছিলেন তানসেন নাকি আসিয়াছেন ফতেপুরে। গুরু ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বত্রই দেখেন, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য তানসেনকে দেখা যায় কিনা। সেখানেও তিনি সকলের মুখে চাহিয়া দেখিলেন, তানসেনকে দেখিতে পাইলেন না। তানসেন তখন দূরে সরিয়া অন্ধকারে আছেন লুকাইয়া।

আকবর আসিয়া সেই সাধুর চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু, কাল আমার পাষাণ-পুরীতে যাইয়া আপনার বীণা বাজাইতে হইবে।"

সাধু বলিলেন, "বাবা, আমার তো যাইতে কোনো আপত্তির হেতু থাকিতে পারে না, কারণ ধনী দরিদ্রে ভেদ করা তো আমার অকর্ত্তব্য। তবে আমাকে কি তোমরা সহ্য করিতে পারিবে?" আকবর আশ্বাস দিলে সাধু রাজী হইলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজপুরীতে বসিয়া সাধু বীণা বাজাইতে লাগিলেন। মহাদেবের যে সুরে বিষ্ণুপদবিগলিত সুর নদী হইয়া ঝরিয়া পড়িল এই মর্ত্ত্যালোকে, সেই সুর চলিল তাঁর বীণায়। সকলেই তন্ময়, সম্রাট দরবারের পাষাণ হইতেও কঠোর সব চিত্ত অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া চলিল ঝরিয়া, ঊর্দ্ধে জালায়নে রাজান্তঃপুরিকাদের ভোগ-বিলাসদগ্ধ চিত্তও হইয়া উঠিল উচ্ছ্বসিত। দূর হইতে তানসেন দেখিলেন, কিন্তু ছিন্নকন্থাসম্বল গুরুকে স্বীকার করিতে মনের মধ্যে আসিল দুর্নিবার লজ্জা।

সুরের সভায় তানসেনকেও আসিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি আছেন যতটা সম্ভব দূরে। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন যেন গুরু তাঁহাকে না দেখিতে পান। হঠাৎ একবার গুরুর চক্ষু পড়িল তাঁহার দিকে। তানসেন তাঁহাকে চিনিল না! তাঁহাকে ছুটিয়া আসিয়া ধরিল না। গুরুর মর্ম্মে শেল বিদ্ধ হইল, হাত হইতে তাঁহার বীণা মেজের পাথরে গেল পড়িয়া। গুরুর দিব্যসুরে সেখানকার পাথরও গলিয়া হইয়াছিল দ্রব, বীণাটি পড়িতেই তাহাতে কতক পরিমাণে গেল ডুবিয়া, সুর থামিয়াছিল কাজেই আবার সেই দ্রবীভূত পাষাণ হইয়া উঠিল কঠিন, গুরুর বীণা সেখানে রহিল আবদ্ধ হইয়া। গুরু কিছুই বলিলেন না, বিদায় লইলেন না, অভিযোগ করিলেন না, শুধু দূর বনে প্রবেশ করিয়া কোথায় হইয়া গেলেন নিরুদ্দেশ।

তাঁহার বদ্ধ বীণা রহিল পড়িয়া, আর পড়িয়া রহিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য তানসেন, যাঁহার হৃদয় ঐশ্বর্য্যের পরশে হইয়া উঠিয়াছে কঠিন। আকবর কহিলেন, "তানসেন, তুমি সুরের বলে এই পাষাণ দাও গলাইয়া, সাধুর বীণা উদ্ধার কর।" তানসেন অনেক চেষ্টা করিলেন, পাষাণ একটুও আর্দ্র হইল না। তানসেন লজ্জিত হইলেন। সভাসদরা কেহ কেহ টিটকারী দিতে লাগিল। সম্রাটের সভায় দেখিতে দেখিতে তানসেন লঘু হইয়া গেলেন।

হতমান ব্যথিত তানসেন রাজসভা ও পৌর জনতা হইতে ফিরেন দূরে দূরে। ক্রমে তানসেনের বুদ্ধি আসিল সহজ হইয়া, তিনি বুঝিলেন তাঁহার মনে অপরাধ হইয়াছে, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি গুরুকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন। বন হইতে বনে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে ক্রমাগত খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া তিনি দেখেন তাঁহার গুরু এক নির্ঝরের পাশে এক গুহার মধ্যে আছেন মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া। তানসেন আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "গুরুদেব, আমি মনে অপরাধী, আপন প্রেমগুণে আমাকে ক্ষমা কর।" গুরু কহিলেন, "বৎস তুমি আমার প্রাণের অধিক, তোমার প্রতি কি কখনও আমার অক্ষমা হইতে পারে? তবে সেদিন তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না বলিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম, তাই এমন করিয়া আসিলাম পলাইয়া। আজ তোমাকে বক্ষে ধরিয়া আমার হৃদয়ের সকল সন্তাপ গিয়াছে দূর হইয়া।" এই বলিয়া স্নেহভরে তাঁহার মৃত্যুখেদশীর্ণ স্নেহহস্ত বার বার তানসেনের মাথায় বুলাইতে লাগিলেন।

কিন্তু বড় আঘাত পাইয়াছিলেন সেই বৃদ্ধ। তাঁহার হৃদয় ক্ষমা করিলেও তাঁহার দেহ গিয়াছিল ভাঙ্গিয়া। স্নেহময়ী জননীর মত মৃত্যু ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার দেহের সকল খেদ করিয়া আনিতেছিল শান্ত। তানসেন প্রাণপণে গুরুর অন্তিম সেবা করিতে লাগিলেন ও গুরুর মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গুরু কহিলেন, "কিসের দুঃখ তানসেন? যে মৃত্যু তোমাকে আমার সঙ্গে মিলাইয়া দিল সেই মৃত্যুর অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে?" একটু থামিয়া গুরু আবার কহিলেন, "তানসেন, মনে হইতেছে তোমার যেন কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আমার তো আর সময় নাই, যাহা তোমার মনে আছে তাহা এই সময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেল।"

তানসেন কহিলেন, "গুরুদেব, সকল বিদ্যাই তো ওই চরণে পাইয়াছি, তবে বনের হরিণ কেন বন হইতে আনিতে পারিলাম না? পাষাণ কেন এই সুরে গলিল না, হৃদয়ের অভিমান কেন এখনো নিঃশেষে দূর হইল না?"

গুরু কহিলেন, "নৌকার সকল কাঠ একত্র হইলে তবে সাগরে যাত্রা করা চলে। তলের একখানা কাঠ বাকী থাকিলেও সেই নৌকা অকর্ম্মণ্য, দেখিতে যতই সুন্দর হউক তাহাকে তীরে রাখিয়া শোভা দেখা যায় মাত্র। সুরের তুমি মানব-অংশ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছ, তাহার ভাগবত অর্থাৎ অধ্যাত্ম অংশ তোমার পুরা হয় নাই। এই সুরের নৌকা তুমি রাজসভায় দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে পার বটে, কিন্তু অকূল অসীম জীবনসাগরে এই তরী ভাসাইয়া যাত্রা করা চলে না, সময় থাকিলে আমি তোমার সেই অভাবটুকু পূর্ণ করিতাম। কিন্তু সময় তো আর নাই। তুমি দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে দেখিবে দুই কন্যা দুই বোন, প্রতিদিন আসে দেবসেবার জন্য জল ভরিতে। তাহাদের দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিবে না যে, তাহারা গানের অনুপম গুণী। তাহাদের চরণ ধরিয়া সেই অংশ তুমি করিয়া লইও আয়ত্ত।"

গুরুর মৃত্যু হইল। দক্ষিণদেশে যাইবার যে পথ যে নিদর্শন গুরু তানসেনকে কহিয়া দিয়াছিলেন তাঁহা ধরিয়া তানসেন এক নির্জ্জন গ্রামে দেবসেবারতা সেই দুই ভগিনীর দেখা পাইলেন। তানসেন বহু অনুনয়ে তাঁহাদের প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অনধিগত বিদ্যা লইলেন সম্পূর্ণ করিয়া।

সম্রাট-সভায় যখন বহুদিন পরে তানসেন ফিরিলেন, তখন সেই তানসেন যেন আর নাই। এত যে বিদ্যা তিনি অধিগত করিয়া আসিয়াছেন তাহার অহঙ্কার আর তাঁহার একটুও নাই। সকলে বলিল, "কোথায় গিয়াছিলে তানসেন?"

তানসেন কহিলেন, "বড় অপরাধ করিয়াছিলাম, গিয়াছিলাম প্রায়শ্চিত্ত করিতে।"

সম্রাট কহিলেন, "সেই পাষাণে বদ্ধ বীণার কথা মনে আছে তানসেন? তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে?"

তানসেন কহিলেন, "প্রভু গুরুর বিদ্যা যে কঠিন পাষাণে আবদ্ধ হইয়া আছে তাহাকে বিগলিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাকে মুক্ত করিবার সাধনাতেই আমি এখন রত আছি, দেখি গুরুর কৃপায় তাহা সম্ভব হয় কি না।"

নিরভিমান তানসেন এবার যখন বসিলেন, তখন তাঁহার সুরে সেই পাষাণ গেল গলিত হইয়া, সেই বীণাকে প্রণাম করিয়া বীণাটি মাথায় লইয়া তানসেন যখন পাষাণপুরী হইতে বাহির হইতেছেন তখন আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই মহাপুরুষটি কে তানসেন?"

তানসেন কহিলেন, "তিনি আমার গুরু।"

কেহ কেহ বলেন এই মহাপুরুষই তানসেনের গুরু বিখ্যাত প্রেমী সাধক বৈজু বাওরা। "বাওরা" অর্থ বাউল, পাগল ক্ষ্যাপা। তিনি ছিলেন প্রেমের ভাবরসে নিত্যক্ষ্যাপা।

———

তানসেন। [শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের সৌজন্যে

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[২৩]

কবি অনন্ত-দাস অদ্বৈত-আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য্যের অপর এক শিষ্য ছিলেন অনন্ত-আচার্য্য, তাঁহার রচিত একটি বাঙ্গালা পদ বিদ্যমান আছে।[১] ইহা ছাড়া 'রায় অনন্ত' ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ পাওয়া যায়।[২] ইনি স্বতন্ত্র কবি হইবেন।

যাহা হউক অনন্ত-দাসের একুশটি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত পদটিই শ্রেষ্ঠ। পদটি শ্রেষ্ঠ ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে অন্যতম।

বিকচ-সরোজ ভান মুখমণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
কিযে মৃদু-মাধুরি হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥
বরনি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণি-কলনা।
অভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢরঢর
কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা ॥
কুঞ্চিত-কেশ বেশ কুসুমাবলি
শিরপর শোভে শিখি-চাঁদকি ছাঁদে।
অনন্তদাস-পঁহু অপরূপ-লাবনি
সকল যুবতি-মন পড়ি গেও ফাঁদে ॥৩

[২৪]

বলরাম-দাস নামে একাধিক পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য 'সঙ্গীতকারক' বলরামদাস বলিয়া দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান ছিল দোগাছিয়ায়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বলরাম-দাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্রজবুলি পদগুলি বাঙ্গালা পদের অপেক্ষা কাব্যাংশে হীন। 'বলরাম-দাস' ভণিতায় কতকগুলি 'চিত্র গীত' বা 'চিত্রপদ' আছে। সে-গুলিতে বিশেষ কিছু কবিত্বের পরিচয় নাই। সেগুলি পরবর্ত্তী কোন কবির রচনা হইতে পারে।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-গীতিকবিদিগের মধ্যে বলরাম-দাস অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। রূপানুরাগের ও রসোদ্গারের বর্ণনায় বলরাম অদ্বিতীয়। ইঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি-ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায় ॥
পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে কয় অবশ পরশে ॥৪

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে বলরামের ব্রজবুলি রচনার ও ছন্দে দক্ষতার নমুনা পাওয়া যাইবে।

মধুর সময় রজনি-শেষ
শোহই মধুর কানন-দেশ
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া।
মধুর মাধবী-কেলিনিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুরঁ মধুহি মাতিয়া ॥

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২২৮৫। ২। ঐ, পদসংখ্যা ২৩২৮, ২৩৩১। ৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৬৮।

৪। ঐ, পদসংখ্যা ১৪৬।

আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর-যুবতি নব-কিশোর।
মধুর বরজ-রঙ্গিণী মেলি
করত মধুর রভস-কেলি॥
মধুর পবন বহই মন্দ
কূজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর-রসহি শবদ-সুভগ
নদই বিহগ-পাঁতিয়া।
রবই মধুর শারী কীর
পঢ়ই ঐছন অমিয়া গীর
নটই মধুর মউর মউরী
রটই মধুর-ভাতিয়া॥
মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস-বিলাস
মদন হেরই ধরণী লুঠই
বেদন ফুটই ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম-চিতে ফুরউ নীত
দুহুঁক মধুর চরণ-সেবন
ভাবনে জনম যাতিয়া॥১

ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেবল বলরাম-দাসই বাৎসল্যরসের বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নিম্নে বলরামের একটি বাৎসল্যঘটিত পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তোসভারে।
বন কত অতি দুর নব-তৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দুরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব-তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পায়ে জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য২ মা বল্যা৩ শিঙ্গায় ডাক্য৪
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ জাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম-দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥৫

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪...। ২। রাখিথ-রাখিহ। ৩। বলিয়া।
৪। ডাইক—ডাকিহ।

[২৫]

জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি ব্রজবুলি পদই বেশী লিখিয়াছেন। প দ ক ল্প ত রু-ধৃত জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদের সংখ্যা এক-শতেরও অধিক। ইঁহার বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত পদগুলির অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। 'রূপানুরাগ', 'রসোদগার' এবং 'মাথুর'বিষয়ক পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিত্বের চরম নিদর্শন রহিয়াছে।

নিম্নে জ্ঞানদাসের দুইটি সুপরিচিত বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
চিত হরি কালিয়া নাগর নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধাঁধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বাঁধা॥
কটি পীতবসন রশন তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি বাঁধ বুক॥৬
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি করাছি মনে সেই সে করিব॥

৫। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১২১৮। ৬। ঐ, পদসংখ্যা ১২৩।

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি॥[১]

[২৬]

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য নয়নানন্দ-মিশ্র যতগুলি পদ লিখিয়াছেন সবগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদগুলির অধিকাংশেরই ভাষা এবং সুর-ঝঙ্কার অনবদ্য। নিম্নে নয়নানন্দের একটি বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম-সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥
গোরা মোরা হিমাদ্রি-শিখর।
তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গা বহে নিরন্তর॥
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু।
যার পদছায়ে জীব সুখে বাস করু॥
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারী-নর॥
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥[২]

[২৭]

পদকর্ত্তা জগন্নাথ-দাসের সময় ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ-গুলি বিচার করিলে অনুমান হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত অথবা অনুশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তদিগের মধ্যে একাধিক জগন্নাথ ছিল।

জগন্নাথ কবিত্বগুণে হীন ছিলেন না। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি বর্ণনার সৌন্দর্য্যে এবং ছন্দের গৌরবে অতুলনীয়।

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দীবরনয়নী বরজবধূ কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে॥
অসিত-অম্বুধর-অসিত-সরসিরুহ-
অতসী-কুসুম-অহিমকরসুতানীর-[৩]
ইন্দ্রনীলমণি-উদার-মরকত-
শ্রীনিন্দিত বপু-আভা রে।
শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা লম্বি নাসাতল
নবকিসলয়-অবতংস গোরোচনা-
অলকতিলক মুখ শোভা রে॥
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বামকর
কম্বুকণ্ঠে বনমালা মনোহর
ধাতুরাগ-বৈচিত্র্য কলেবর
চরণে চরণপরি শোভা রে।
গোধূলিধূসর বিশাল বক্ষথল
রঙ্গভূমি জিনি বিলাস নটবর
গোচাদন-রজু বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন-মনলোভা রে॥
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর
সো হরি কৌতুক ব্রজবালক সাথে
গোপনাগরী-অভিলাষা রে।
সো-পহুঁ-পদতল-পরাগ-ধূসর
মানস মম কারু আশ নিরন্তর
অভিনব-সৎকবি দাস জগন্নাথ
জননী-জঠর-ভয়-নাশা রে॥[৪]

[২৮]

সদাশিব-কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম-দাস। পিতা এবং পুত্র উভয়েই নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ছিলেন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল কুমারহট্ট। বৈ ষ্ণ ব ব ন্দ না-র কবি পদকর্ত্তা দেবকীনন্দন-দাস এই পুরুষোত্তমেরই শিষ্য ছিলেন। পুরুষোত্তমের রচিত দশ বারোটি পদ আছে। সবগুলিই রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। পদগুলি চলনসই পর্য্যায়ে পড়ে।

১। ঐ, পদসংখ্যা ৭৮৪। ২। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩১।

৩। 'অহিমকর' অর্থাৎ সূর্য্য, তাঁহার কন্যা অর্থাৎ যমুনা, তাহার নীর।
৪। পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা ১৩২৩।

[২৯]

মহাপ্রভুর ভক্ত পরমানন্দ-গুপ্ত একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। 'পরমানন্দ-দাস' ভণিতা পদগুলিকে সকলেই কবি-কর্ণপূরের লিখিত বলিয়া মনে করেন। কবি-কর্ণপূরের নাম ছিল পরমানন্দ সেন।[১] কিন্তু তিনি নিজেই গৌ র গ ণো দ্দে শ-দী পি কা-য়[২] পদকর্ত্তা পরমানন্দ-গুপ্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবি-কর্ণপূর বাঙ্গালায় বা ব্রজবুলিতে কিছু লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জয়ানন্দও শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য-ম ঙ্গ লে[২] পরমানন্দ-গুপ্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পরমানন্দের অধিকাংশ পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক। রচনাগত বিশেষত্ব পদগুলিতে বিশেষ কিছুই নাই।

[৩০]

ষোড়শ শতকের শেষভাগের পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নরোত্তম-দাস ঠাকুর-মহাশয়ের স্থান খুব উচ্চে। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নরোত্তমের জন্ম হয়। ইহার পিতা কৃষ্ণানন্দ-দত্ত আধুনিক রাজসাহী অঞ্চলের একজন রাজোপাধিক বড় জমিদার ছিলেন। নরোত্তমের মাতার নাম নারায়ণী। বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে খেতরী বা খেতুরী নামক স্থানে ইহাঁদের নিবাস ছিল। অল্প বয়স হইতেই নরোত্তম ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে খুল্লতাতপুত্র সন্তোষ-দত্তের হস্তে বিষয়কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়া ইনি বৃন্দাবন গমন করেন। ন রো ত্ত ম বি লা স গ্রন্থের মতে নরোত্তমের বৃন্দাবন গমনের সময় কৃষ্ণানন্দ জীবিত ছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এই খানেই ইনি শ্রীনিবাস-আচার্য্য এবং শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হন। এই মিলনের ফলে বাঙ্গালায় নূতন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছিল। রঘুনাথ-দাস গোস্বামীর মত নরোত্তম-দাসেরও চরিত্র দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত সাধন-ভজন ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস। প্রে ম বি লা স, ক র্ণা ন ন্দ, ভ ক্তি র ত্না ক র, ন রো ত্ত ম বি লা স, অ নু-রা গ ব ল্লী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহাঁর জীবনী সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

রসকীর্ত্তনের স্রষ্টা হিসাবে নরোত্তম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টীয় ১৫৮৩ সালের দিকে (কেহ কেহ এই ঘটনাকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লইয়া যাইতে চাহেন) নরোত্তম ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহগুলির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই বিখ্যাত খেতরীর মহোৎসব। এই মহোৎসবটি বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান দিগ্‌দর্শনী। এই মহোৎসবেই রসকীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়।

এথা সর্ব্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তমদ্বারে॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এহেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ॥
নরোত্তম-কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢে অনিবার॥[৩]

নরোত্তমের প্রার্থনা পদগুলির জোড়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। এই পদগুলি ছাড়া তিনি কয়েকটি ছোট ছোট ধর্ম্ম ও সাধন সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার একটি তালিকা পাওয়া যায় বল্লভদাসের একটি পদে।[৪] সহজিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তিকাও নরোত্তম-দাস ঠাকুরের নামে চলে। এগুলিকে নরোত্তমের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। দুই একটির মূলে নরোত্তমের রচনা থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার উপরে যে প্রলেপ পড়িয়াছে তাহাতে মূলটি লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

প্রার্থনা পদগুলিকে ছাড়িয়া দিলে, প্রে ম ভ ক্তি-চ ন্দ্রি কা - কে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিতে হয়। প্রে ম-ভ ক্তি চ ন্দ্রি কা একশত আঠারোটি ত্রিপদী শ্লোকাত্মক কবিতা। ভাষা ও ছন্দ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব সাধনাপদ্ধতির কতকগুলি মূল কথা কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তমের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজের স্ম র ণ দ র্প ণে-র আদর্শে প্রে ম ভ ক্তি চ ন্দ্রি কা রচিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর নরোত্তম প্রে ম ভ ক্তি-

১। পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী ॥১৯৯॥

২। সংক্ষেপে করিলেন তেঁহ পরমানন্দগুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ [পৃঃ ৩]

৩। নরোত্তমবিলাস, সপ্তম বিলাস।

৪। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৭৮-৪৭৯।

চন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে ইহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু
মোহে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎভোলে কামতিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ কর মোরে ত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈল ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
আমা সব নাহিক অধমা॥
পতিতপাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতীপতি॥
তুমি ত পরমদেবা নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করু অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হতচিত নাহি মানে নিজহিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুচুক সংসার নাম পতিতপাবন শ্যাম
নিজদাস কর গিরিধর॥
নরোত্তম বড় দুখী নাথ মোরে কর সুখী
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায় এই ত পরম ভয়
নিবেদন করি অনুক্ষণে॥

নরোত্তমের প্রার্থনা পদগুলি বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাধকের জন্য লিখিত হইলেও এই পদগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা আছে তাহা সকলকেই মুগ্ধ করে। সাধক কবির কাতর ব্যাকুলতা এই পদগুলির মধ্যে কতক পরিমাণে বন্দী রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে দুইটি প্রার্থনা পদ তুলিয়া দিতেছি।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝিব সে যুগলপিরীতি॥
রূপরঘুনাথপদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥[১]

হে গোবিন্দ গোপীনাথ, কৃপা করি রাখ নিজপথে।
কাম ক্রোধ ছয়জনে লৈয়া ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলা ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুন যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥[২]

[৩১]

ষোড়শ শতকে 'গোবিন্দ' নামে একাধিক পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পারিষদদিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন 'গোবিন্দ' পদকর্ত্তা ছিলেন, গোবিন্দ-ঘোষ এবং গোবিন্দ-আচার্য্য। গোবিন্দ-ঘোষের পদের মধ্যে 'গোবিন্দদাস' ভণিতা পাওয়া যায় না। গোবিন্দ-আচার্য্য নিজের রচিত পদে কি ভণিতা দিতেন তাহা জানা যায় না, কারণ গোবিন্দ-আচার্য্যের কোন সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় নাই। আচার্য্য যদি 'গোবিন্দদাস' ভণিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাঁহার পদগুলি অপর 'গোবিন্দদাস'-দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতকের শেষে 'গোবিন্দদাস' নামে দুইজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। দুইজনেই শ্রীনিবাস-আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন;

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৩০৪৬।
২। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৩০২৩।

ইহাঁদের নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দ-দাস চক্রবর্ত্তী। ইহাঁদের সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

[৩২]

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকের শেষের দিকে গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা এবং মাতামহের নাম দামোদর। দামোদর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। মাতুলালয় শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে দুই ভাই মাতামহাবাসে পরিবর্দ্ধিত হন। পরে পৈতৃক স্থান কুমারনগর এবং আরও পরে তথা হইতে তেলিয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। গোবিন্দের স্ত্রীর নাম মহামায়া এবং একমাত্র পুত্রের নাম দিব্য-সিংহ। ষটত্রিংশ বর্ষের বঙ্গীয় সা হি ত্য-প রি ষ ৎ-প ত্রি কায় একটি প্রবন্ধে আমি গোবিন্দদাসের জীবনী এবং কবিতা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কৌতুহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

চিরঞ্জীব শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর দামোদর ঘোর শাক্ত ছিলেন। মাতামহের প্রভাবে রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ দুইজনেই শাক্তধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে গোবিন্দ শ্রীনিবাস-আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে যে বর্ণনা প্রে ম বি লা স প্রভৃতিতে পাওয়া যায় তাহা উপন্যাসের কাহিনীর ন্যায় কৌতুহলোদ্দীপক। বৈষ্ণব হইয়া গোবিন্দ গুরুর আদেশে রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি রচনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব হওয়ার পূর্ব্বেও তিনি পদ লিখিতেন, তাহার একটির ভণিতা শ্লোকটি প্রে ম বি লা সে উদ্ধৃত আছে। সৌভাগ্যের বিষয় সম্পূর্ণ পদটি শ্রীখণ্ড হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত র স-নি র্ধ্যা স নামক একটি পদসংগ্রহের পুঁথিতে পাইয়াছি। পদটি ব ঙ্গ শ্রী পত্রিকায় প্রকাশও করিয়াছি। পদটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকার জন্য পুনরায় এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হেমহিমগিরি দুই তনু-ছিরি
আধনর আধনারী।
আধ উজর আধ কাজর
তিনই লোচনধারী॥
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকত [পূজিত] ভুবনবন্দিত
ভুবন সারতি তাত (?)॥
আধ-ফণিময় আধ-মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার।
আধ-বাঘাম্বর আধ-পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার॥
না দেব কামিনী [না] দেব কামুক
কেবল প্রেমপরকাশ।
গৌরীশঙ্কর- চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। 'গোবিন্দদাস' ভণিতাযুক্ত সকল বাঙ্গালা পদগুলিকে গোবিন্দদাস-চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে বটে, কিন্তু কবিদ্বয়ের নিজ নিজ পদসংগ্রহের পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলে ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিলে আরও ভুল করা হইতে পারে। গোবিন্দদাস কবিরাজের পদগুলির ভাষার এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহাতে পদগুলিকে সহজেই অন্য কবিদের রচনা হইতে পৃথক্ করা যায়। কবিরাজের পদগুলির ভাষা "বিশুদ্ধ" (অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কম বাঙ্গালা-পদবর্জ্জিত) ব্রজবুলি এবং তাঁহাতে তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম এবং অর্দ্ধতৎসম পদেরই আধিক্য। ইহাঁর লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাস ও উপমা এবং রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদকর্ত্তাই করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদলালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতিকবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিরাজের কবিতাগুলির ভাব অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা হইতে লওয়া। ইহাতে পদগুলির মধ্যে অর্থসংহতি হইয়াছে এবং পদাবলী সাহিত্যের একঘেয়েমি যথেষ্ট পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। তবে বলরামদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে যেরূপ আন্তরিকতা আছে কবিরাজের লেখার

মধ্যে সেরূপ আন্তরিকতার অধিকাংশ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেবল গোবিন্দদাস কবিরাজকেই মহাকবি বলিলে বলিতে পারা যায়। কবিরাজের কাব্যের বিশিষ্ট মাধুর্য্য কি তাহা কবিরাজেরই রচিত একটি পদের ভণিতা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারা যায়,

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

এইবার কতিপয় পদ উদ্ধৃত করিয়া কবিরাজের কাব্যের পরিচয় দিতেছি। নিম্নে উদ্ধৃত পদ দুইটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা।

নন্দনন্দন- চন্দ চন্দন-
গন্ধনিন্দিত-অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম- আকুল- গোপ গোকুল-
কুলজকামিনীকান্ত।[১]
কুসুমরঞ্জন- মঞ্জুবঞ্জুল-
কুঞ্জমন্দির সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল বলিতকুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব- তাল পণ্ডিত
বাহুদণ্ডিতদণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কমল- চরণ কিশলয়-[২]
নিলয় গোবিন্দদাস॥[৩]

অরুণিত চরণে রণিতমণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুলমিলিত ললিত বনমাল॥
ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম
রঙ্গিমভঙ্গিম নয়ননাচনিয়া॥
মাঝহি খীন পীন-উর অম্বর
প্রাতর-অরুণ-কিরণমণি রাজ।
কুঞ্জরকরভ- করহি করবন্ধন
মলয়জকঙ্কণবলয় বিরাজ॥

অধরসুধাঝর মুরলীতরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণীহৃদয়দুকুল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপলফুল॥
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেড়ল রমণীমনমধুকরমাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণতমাল॥[৪]

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি সখীর উক্তি। কৃষ্ণের প্রতি প্রেম সঞ্চার হওয়াতে রাধার যে অনির্ব্বচনীয় দুঃখ তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শুনইতে কানু- মুরলীরবমাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি, তৈখনে কহল মো তোয়।
ভরমহি তা সঞে নেহ বাড়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপলালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যামজলদরস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥[৫]

উপরিউদ্ধৃত পদটি অ ম রু শ ত কে-র নিম্নলিখিত শ্লোকটি অবলম্বনে রচিত বলিয়া মনে হয়।

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারা স্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে রাধার বর্ষাভিসারের ছবিটি চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে।

মন্দিরবাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥

১। 'কন্ত' পড়িতে হইবে। ২। 'কিশল' পড়িতে হইবে।
৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪১৯।
৪। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪২৪। ৫। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৪৩৫।

তহি অতিতরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানসসুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণমরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনীদহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনতার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥১

নিম্নের পদটিতে রাসারম্ভের বর্ণনা করা হইয়াছে।

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্তমধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চমতান
কুলবতীচিত চোরণি॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কললোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজররেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল দোলনি॥
শিথিলছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রশন চোলি
গলিতবেণি লোলনি।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস গায়নি॥২

কৃষ্ণের মিলনের জন্য রাধার ব্যাকুলতা নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাঁহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথিমাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ।
ঐছে মিলই যব শ্যামরচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথিমাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদুবাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চনগোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥৩

এই পদটি নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে রচিত।

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশান্ বিশন্তু স্ফুটং
ধাতস্ত্বাং শিরসা প্রণম্য কুরু মামিত্যস্য যাচে পুনঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মকুরে জ্যোতিস্তদীয়ালয়-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥৪

অনেকগুলি পদে গোবিন্দদাস ভণিতা শ্লোকে স্বীয় বান্ধবদিগের নাম করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটি চমৎকার পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। পদটিতে সন্দেহ অলঙ্কারের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুরপতিধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতীঝুরি কি বলাকিনী উড়ে॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু-আধখণ্ড।
করিবরকর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
ও কিয়ে শ্যাম নটরাজ।
জলদকলপতরু তরুণীসমাজ॥
করকিশলয় কিয়ে অরুণবিকাশ।
মুরলীখুরলি কিয়ে চাতকভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়ামকরন্দ।
হার কি তারকজ্যোতিক ছন্দ॥

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৮৭। ২। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১২৫৫।

৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৯৫৩।

৪। সুভাষিতাবলী, শ্লোকসংখ্যা ৩৫৫; পদ্যাবলী, শ্লোকসংখ্যা ৩৪০।

পদতল কি থলকমলঘনরাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥১

নয়টি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। পদামৃতসমুদ্র সংকলয়িতা রাধামোহন-ঠাকুরের মতে গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই পদগুলিতে তিনি নিজের এবং বিদ্যাপতির যুক্ত ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। রাধামোহন-ঠাকুরের এই মত সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয় যে, গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর স্বরূপ রচনা করিয়াছিলেন, এবং সেইগুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, বিদ্যাপতির দুই একটি পদে "নিকরুণ মাধব" এই উক্তি আছে। সম্ভবতঃ এই জাতীয় উক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

বিদ্যাপতি বহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥

কবির বন্ধুস্থানীয় 'বিদ্যাপতি' উপাধিক কোন কবির অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব নহে। শ্রীখণ্ডের এক কবির 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল [সপ্তত্রিংশ বর্ষের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]।

গোবিন্দদাস কবিরাজ সঙ্গীতমাধব নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাটকটি অধুনা লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গোবিন্দদাসের সহিত বৃন্দাবনস্থ শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র ব্যবহার হইত। এইরূপ একখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। ইহাঁর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব গোস্বামীই ইহাঁকে "কবিরাজ" বা "কবীন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন। [ক্রমশঃ]

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০৫০।

গড়াই

—শ্রীশান্তি পাল

গড়াই নদীর তীরে—
পদ্মা যেথায় চকিতে চাহিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে ফিরে,
ওই পারে চর, এই পারে চর, চারিদিকে ধু ধু বালি—
তারি মাঝখানে ছল ছল জল, গড়াই চলেছে খালি।
যুগ যুগ ধরি' একটানা চলে কোনো দিকে নাহি চায়,
যত উঠে ঢেউ, কূলে আছাড়িয়া ভেঙে যায় নিরুপায়!
মাস মাস আর বরষ বরষ, দিবস রজনী ধরি'
লুটিয়া টুটিয়া ছড়াইয়া হাসি গ'লে গ'লে যায় ঝরি'।
বাঁধ ভেঙে যেতে চায়,
দীরঘ দিনের বিরহ বেদনা বুক ভরে নিয়ে যায়!

মায়াবিনী নদী, তোমারে ছুঁইয়া ব'সে আছি আমি একা,
অচেনার মাঝে চেনা মুখখানি—যদি পাই তার দেখা।
প্রভাত হইল ওই,
ও-পার হইতে খেয়া দিয়ে তুমি আসিলে কি হেথা সই?
পূবালী মেঘের রঙ মাখি ঠোঁটে, সোনালি ছবিটি আঁকি',
ওগো মায়াবিনী, কেন এলে তুমি বনের গন্ধ মাখি'?
আমি তো তোমারে ডাকি নাই দেবী, সোনার বালুর চরে,
মেঘঢাকা মুখে সোনা ঝরে পড়া শুধু দেখিবার তরে!
বড় ব্যথা পেয়ে আসিয়াছি হেথা লুকাতে আঁধারে মুখ,
নির্ম্মম হয়ে দুই পায়ে দলে ভেঙে দিয়ে গেলে বুক!

এমনি করিয়া ভেঙেছিলে তুমি কিশোরের খেলাঘর,
বুক হতে মোর ছিনাইয়া নিয়া করিয়াছ তারে পর।
আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা, নিষ্ঠুর আচরণ,
তীব্র তাহার বিষের জ্বালায় পুড়িতেছি অনুখন!
তুমি চলে যাও দূর হতে দূরে ওই অসীমের পারে,
এই চরে আমি লুকাইব মুখ নিবিড় অন্ধকারে।

আলোকের দেখা পেয়ে,
গ্রাম ছেড়ে ওই আসিতেছে লোক গেঁয়ো পথখানি বেয়ে।
ভোরের বাতাসে পুলকে নাহিয়া কুহরিয়া উঠে পাখী,
ডাল হতে ডালে উড়িয়া বেড়ায় রূপালী মেঘেরে ডাকি।
খেয়া-ঘাটে দেখি মাঝি খেয়া দেয় পারের যাত্রী লয়ে,
ব্যাপারীরা দূরে পাল তুলে যায় পাটের নৌকা বয়ে।
কেহ দেখি ব'সে জাল বুনিতেছে গড়াই নদীর ঘাটে,
কেহ বা কিনারে বাঁশুই দিতেছে গরু-দাবড়ের মাঠে।
কেহ দেখি ব'সে বেড়ার গায়েতে আঁটন-ছাঁটন বাঁধে,
কেহবা বসিয়া মৎস্য ধরিছে দোয়াড় লইয়া কাঁধে।
রাখাল ছেলেরা একে একে জুটে বুড়া অশথের তলে,
গরুগুলো সেথা ছেড়ে দিয়ে সবে সাঁতারিতে যায় জলে।
দলে দলে তারা ভাসাইয়া ভেলা হইতেছে নদী পার,
আমি শুধু আজ নিরালায় ব'সে ঢেউগুলি গণি তার।

ওগো গরবিণী, যদি এলে কাছে মেঘের কুহেলি ছিঁড়ে
নিয়ে যাও তবে আমারি রচা এ-বেদনার গানটিরে।
বনলক্ষ্মীরে মোর কথা ব'লে ক'য় তুমি নিবেদন,
নিয়তির ডোরে আছি দোঁহে বাঁধা একটি তনু ও মন।

একবার ফিরে চাও,
আমার বুকের বেদনার বোঝা কিছু তুমি নিয়ে যাও।
কহিও তাহারে—"বড় ব্যথা পেয়ে ব'সে আছে একা তীরে,
ভাটির জলেতে উজাইয়া গেলে দেখিতে পাইবে ফিরে।
ব'সে ব'সে শুধু ভাসাইছে ফুল সারাদিনমান ধরি',
তোমার স্মৃতিটি বক্ষে লইয়া তোমারি মুখটি স্মরি'।
কতনা দীরঘ দিবস যামিনী সে ফুল পাবার তরে
বালকের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কূলে আছাড়িয়া পড়ে।"
কহিও তাহারে—"সেখানে যাইয়া যদি দেখা নাহি পাও,
কিনারে কিনারে পদ্মার বাঁকে বাহিও তোমার নাও।
দেখিবে সেথায় সে বসিয়া আছে সোনার বালুর চরে,
আনমনা কভু, অপলকে কভু, আশার হালটি ধরে।"
বুঝাইয়া তুমি বলিও তাহারে—"অপরাধ নাহি পায়,
মরণের আগে একবার যেন দেখা দিয়ে মোরে যায়।"
সে যে কভু মোর নিদয়া হবে না জানি আমি তাহা জানি,
শত অপরাধ ক্ষমিয়া আমারে বক্ষে লইবে টানি'।
আমি শুধু জানি তোমার কবিরে ভাল যদি বেসে থাক,
মোর দেওয়া যত ফুলগুলি তবে আঁচলে বাঁধিয়া রাখ।
এ-ফুলের বাস বরষ বরষ হইবে না কভু বাসি,
সৌরভ তার বিলাইবে তুমি নিত্য নিয়ত আসি'।

গড়াই নদীর ঘাটে,
এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া দীরঘ দিবস কাটে।
ধূসর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আসে শ্যামল বনের ছায়ে,
মঙ্গলদীপ, মঙ্গলশাঁখ মুখরিত হয় গাঁয়ে।
ওপার হইতে উড়ে উড়ে আসে শ্বেতবলাকার ঝাঁক,
গাঙশালিকেরা এ পার হইতে খেয়া দেয় লাখেলাখ।
আকাশ-বাতাসে খেয়া দেয় পাখী, নীচে খেয়া দেয় মাঝি,
হালখানি ধবে, মিহি সুরে গায়, ভাটিয়াল সুর ভাঁজি।

মহিষের পাল সাঁতারিয়া যায় নদীর অপর চরে,
গাঁয়ের বধূরা দলে দলে আসে সন্ধ্যা-স্নানের তরে!
এ-ঘাট ও-ঘাট সে-ঘাট করিয়া কলসী রাখিয়া তীরে
এক এক করে নামিল সকলে গড়াই নদীর নীরে।
কেহ মাথা ঘসে, কেহ চুল ঝাড়ে, কণ্ঠ ডুবায়ে জলে,
কেহবা সলিলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ভেসে থাকে কুতূহলে
কেহ চরে বসে বাসন মাজিছে—খোল মাখিতেছে গায়,
কেহবা বসিয়া উপলখণ্ডে ঝামা ঘসে দুটি পায়।
কুমারী মেয়েরা জল ছিটাইয়া হেসে হয় কুটি কুটি,
অমনি তাদের সোনামুখ হতে লাবণি পড়িছে টুটি।
নদীর কিনারে শত শত যেন ফুটিল কমলফুল,
মনে হেন লয় ভ্রমর হইয়া পাপড়িতে খাই দুল।
স্নান শেষ করে একে একে সব উঠিল বালুর চরে,
ভিজা চুলগুলি আলগোছে বেঁধে কলসী লইল ভরে।
লাজে নোয়াইয়া তনুলতাখানি ভিজা আবরণে ঢাকি,
চলে যায় তারা বালুর চরেতে মায়ার আথর আঁকি।
চরণে নূপুর বাজে রুণুঝুনু বাজিল তোড়ল মল,
অমনি তখনি কলসী হইতে সোহাগে পড়িল জল।
বুনোলতাগুলি বুঝি মায়াবশে পায়ে জড়াইয়া ধরে,
বিনাইয়া কহে,—"ওগো বনদেবী, যেওনা গাঁয়ের ঘরে।
তুমি এস সই, গেঁথে দিব মালা, কৃষ্ণচূড়াটি চুলে,
ওই দুটি পায়ে জড়াইয়া রব যুগ যুগ ধরি' ভুলে।
দূর-বন-ছায়ে সন্ধ্যা নামিছে, আকাশে তারকা ভাসে—
মাথার উপরে দ্বিতীয়ার চাঁদ উলসিয়া মৃদু হাসে—
ওই হাসি মাঝে কত খুঁজিলাম পুরাতন চেনা মুখ,
নিরাশার শুধু দগ্ধ হইয়া পাইলাম বড় দুখ।

দেখা যদি পাইতাম,
কোমল তাহার হাত দু'টি ধরে কত কথা বলিতাম।
বলিতাম, তুমি স্বর্ণলতা গো, তুমি দেবী, তুমি মণি,
তোমারে হারায়ে ঘুরে ঘুরে মরি মণিহারা আমি ফণী।
তুমি এস সই, আর কতকাল আমারে ছাড়িয়া রবে,
শিয়রে প্রদীপ নিভিয়া আসিছে তুমি জেলে দাও তবে।
এই পথ ধরি সোজাসুজি এস, কোন কিছু নাহি ভয়,
আষাঢ়ের দিনে বাঁধ ভেঙে যায়—জ্যৈষ্ঠের দিনে নয়।
তুমি শুধু জান, আমি শুধু জানি, আর জানেনাকো কেউ,
কোন গাঙে আজ উঠিয়াছে ঝড় কোন গাঙে ভাঙে ঢেউ।

নান্যঃ পন্থা

—শ্রীঅমলা দেবী

সহর নেহাৎ ছোট নয়, ভদ্রপল্লীতে স্থানেরও অভাব নাই—অথচ বনমালী পণ্ডিত সহরের একপ্রান্তে চতুর্দ্দিকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়োবাড়ীতে বাসা লইয়াছে। ইহার কারণ তাহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী সৌদামিনী। শুনিয়াছি অনেক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষ আনয়নের কিছুদিন পর হইতে অনুতাপ করেন—কিন্তু বনমালীর অনুশোচনা দ্বিতীয়ার গৃহাঙ্গণে পদার্পণের পর মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সৌদামিনী কুলীনের মেয়ে, বিবাহের সময়ে তাহার বয়স বোধ করি বিশের কোঠায় পড়িয়াছিল। সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে সংসারপ্রবেশে তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কিন্তু বনমালীর গৃহে প্রবেশ করিয়াই সৌদামিনী সে ক্ষতি সুদে ও আসলে পোষাইয়া লইতে লাগিল। নিরীহ বনমালীর আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় রহিল না।

বনমালী সহরের স্কুলে পণ্ডিতের কাজ করে। তাহার পুরা নাম, বনমালী চক্রবর্ত্তী, ছাত্রেরা ভক্তি করিয়া নাম দিয়াছে বন্ধু পণ্ডিত। সৌদামিনীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীর জীবিতাবস্থায়, বনমালী ভদ্রপল্লীতেই বাস করিত। পল্লীর সকলেই তাহাদের খুব স্নেহ করিত; প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণে, নিত্যনৈমিত্তিক শুভানুষ্ঠানে বনমালীর ডাক পড়িত। কোন দিন হয়তো একটি ছোট মেয়ে লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া কহিত, "কাকীমা! বনুকা' কোথায় গো?" লক্ষ্মী মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া, গাল টিপিয়া আদর করিয়া কহিত, "কেন গো রুনু মা?" কোন ছেলে হয়তো আসিয়া গৃহকর্ম্মনিরতা লক্ষ্মীকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া কহিত, "মাসীমা, মা আপনাকে আর মেসোমশাইকে এক্ষুনি যেতে বল্লেন"—বলিয়া ছেলেটি হয়তো তক্ষুনি বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইত। কিন্তু লক্ষ্মীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠ তখনই তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইত—"এই সন্তু! তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ যে বড়ো—শুনে যাও।" ছেলেটিকে কোলের কাছে বসাইয়া গৃহের যা' কিছু ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়াইয়া, তাহার সহিত ছেলেমানুষী গল্প করিয়া লক্ষ্মীর সাধ মিটিতে চাহিত না। লক্ষ্মীর অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই—তাই তাহার ক্ষুধিত মাতৃত্ব সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া এই পল্লীর শিশুগুলিকে বক্ষলগ্ন করিতে চাহিত।

অনেকদিন পরে লক্ষ্মী সন্তানসম্ভবা হইল। একদিন সলজ্জ হাসিতে মুখখানি সিঞ্চিত করিয়া নতনেত্রে বনমালীকে সেই সংবাদ জানাইল। বনমালীর প্রথমে বিশ্বাস হইল না—লক্ষ্মীর চিবুকটি ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া তাহার নিমীলিত চক্ষে, ওষ্ঠাধরে, লজ্জারুণ কপোলে এবং সরমস্নিগ্ধ মুখের রেখায় রেখায় আসন্ন মাতৃত্বের নিগূঢ় বার্ত্তা পাঠ করিবার চেষ্টা করিল, তারপর তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, "সত্যি?" তাহার বুকে মুখ রাখিয়া, ঘাড় নাড়িয়া লক্ষ্মী জানাইল—ইহা মিথ্যা নহে।

স্বামী ও স্ত্রীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। বনমালী প্রস্তাব করিল, "ছাখো—একটা ঠাকুর রাখা যাক্, এ অবস্থায় তোমার রান্না করা—" ইহার পূর্ব্বে এ কথা শুনিলে লক্ষ্মী অত্যন্ত আপত্তি করিত—ঘাড় নাড়িয়া কহিত, "আমার শরীরে কি আগুন ধরেছে নাকি যে তোমাকে দুমুঠো সেদ্ধ কোরে দিতে পারবো না—?" কিন্তু এখন একটু হাসিয়া সম্মতি দিল। অন্যান্য কাজ করিবার জন্য আর একজন ঝি বাহাল হইল এবং বনমালী ও পাড়ার গৃহিণীদের অনুরোধে ভাবী শিশুর আগমন-পথকে সুরক্ষিত করিবার জন্য লক্ষ্মীকে ডজনখানেক মাদুলী বাহুতে ও গলদেশে ধারণ করিতে হইল। বিধিনিষেধের সীমাপরিসীমা রহিল না; লক্ষ্মীর স্নান ও আহার, শয়ন ও উপবেশন ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যটির উপর বনমালীর সতর্ক দৃষ্টি প্রহরা দিতে লাগিল। যে বনমালী রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আড্ডা হইতে গৃহে ফিরিত না—সেইই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বাড়ী ঢুকিতে লাগিল এবং বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ভাবী শিশুর জন্য শয্যারচনানিরতা লক্ষ্মীর কানের কাছে আসন্নপ্রায় ভবিষ্যতের সুমধুর সম্ভাবনার নব নব কাহিনী গুঞ্জন করিতে লাগিল।

যথা সময়ে লক্ষ্মীর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিল। মেয়ে? তা হোক্—শিশুহীন সংসারে ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্ আদরের কোন তারতম্য হয় না। স্বামী ও স্ত্রী দুইজনে পরামর্শ করিয়া নাম রাখিল সাবিত্রী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে বন্ধন দশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল—এই শিশুটি তাহাতে একটি দৃঢ়তর ও মধুরতর গ্রন্থি সংযুক্ত করিল। কিন্তু লক্ষ্মীর এ সুখ বেশী দিন কপালে সহিল না। সাবিত্রীর জন্মের চারি বৎসর পরে সাবিত্রীকে বনমালীর হাতে তুলিয়া দিয়া অতি অনিচ্ছায় তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইল।

চারি বৎসরের মেয়েকে বুকে লইয়া বনমালী অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। মেয়ে তাহাকে ছাড়িতে চায় না, সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতে হয়। সন্ধ্যার পর মেয়েকে লইয়াই সান্ধ্য মজলিসে হাজিরা দেয়—রাত্রে ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে করিয়া বাড়ীতে ফেরে। শেষ রাত্রে সাবিত্রী জাগিয়া উঠিয়া মায়ের জন্য কাঁদিতে থাকে—বনমালী তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভুলায়, লক্ষ্মী আবার আসিবে; আরও সুন্দরী হইয়া, কত মণিমুক্তার গহনা পরিয়া; আসিবার সময়ে সাবিত্রীর জন্য কত রঙ্গীন খেলনা আনিবে! আসিবার খবর যে দিন আসিবে, বনমালী সাবিত্রীকে তাহার রঙ্গীন ডুরে শাড়ীটি পরাইয়া দিবে; মাথাটি আঁচড়াইয়া, মুখটি মুছিয়া, কপালে টিপ আঁকিয়া দিবে, তারপর

সাবিত্রীকে লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। মস্তবড় গাড়ীতে চড়িয়া লক্ষ্মী আসিবে, আসিয়াই সাবিত্রীকে বুকে করিয়া চুমু খাইবে; তারপরে আর কোথায়ও কখনও যাইবে না।—মেয়ে চুপ করে, বলে, "তাহাকে কোথাও আর যেতে দেব না তো, গেলে এবার আমি সঙ্গে যাবো।" বনমালী সাবিত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে থাকে, বলে, "আর কোথাও যাবে না তো। তোমার জন্তে তার কত মন কেমন করছে। তুমি যেমন কাঁদছ, তোমার মাও সেখানে কত কাঁদছে।" সাবিত্রী বলে, "বাবা মায়ের মন কেমন করছে? কাঁদছে? এতবড় গাড়ী রয়েছে তো এখনই চলে আসুক না—।" এমনই করিয়া মেয়ে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু বনমালীর চক্ষে আর ঘুম আসে না। মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার নিজেরই চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠে।

ক্রমে শোক শান্ত হইয়া আসে। মানুষ তো ভুলিতেই চায়! হয়তো লক্ষ্মীকে ভোলা বনমালীর পক্ষে সহজ নহে; তবু না ভুলিয়া উপায় কি? না ভুলিতে পারিলে জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। লক্ষ্মীর করচ্যুত সংসাররশ্মি বনমালী অপটু হস্তে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে, সংসারের ছোটখাট কাজে মন দিতে যায়; ঝিকে ডাকিয়া কহে, "হ্যাঁগা, ঘরগুলো কেমন হয়েছে দেখ দিকি? সে নেই তবু তোমাকে নিজে হোতে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়।" ঠাকুরকে ডাকিয়া বলে, "ঠাকুর সাবু-মা কি-সব খেতে ভালবাসে তা তো তুমি জানো; সেই সব দেখে শুনে রান্না কোরো বুঝলে? নিজে হোতে সব কোরে নিও—বলে দেবার লোক"—বলিতে বলিতে চোখে জল আসে—জলে বনমালীর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়।

পাড়ার দুই চারি জন গৃহিণী পরামর্শ দেয়। "ভাই, যা হবার হোয়েছে মেয়েকে তো মানুষ করতে হবে—একটি ডাগর-ডোগর দেখে মেয়ে বিয়ে করো—"

বনমালী সজোরে ঘাড় নাড়িয়া দুইহাত জোড় করিয়া জবাব দেয়, "আর না বৌঠান, সেইই যখন আমাকে ঠকিয়ে পালিয়েছে—আবার?" মজলিসে দুই চারিজন মন্তব্য করে, "ওহে পণ্ডিত, এ রকম মেয়ে কাঁধে করে কতদিন ঘুরবে, এ্যাঁ? আজ কাল সপ্তদশী, অষ্টাদশীর অভাব নেই—একটিকে দেখে শুনে ঘরে আনো ভায়া—সব ঠিক হোয়ে যাবে।" কেহ হয়তো বলে, "ওহে, ও সব কাব্যি আমাদের জন্তে নয়। ধরো, তুমিই না হয় মেয়েকে মানুষ করলে বে-থা দিলে—তারপর? তারপর বুড়ো বয়সে মুখে ভাতজল দেবে কে?" নাসিকাসহ সমস্ত মুখখানা সঙ্গীনের মতো উঁচাইয়া কহে, "রোগে সেবা করবে কে? এ্যাঁ? আখেরের কথা ভাবো ভায়া—জীবনের এখনও ঢের বাকী।" পাড়ার বোসজা মস্ত উকীল—সম্প্রতি তাঁহার তৃতীয় পক্ষ চলিতেছে—বলেন, "না হে, বনমালীর ও রকম করে মন ভেঙ্গে দিও না। বনমালী যা' স্থির কোরেছে খুব বড়ো জিনিস, নিজেরা না কোরতে পারো, অন্ততঃ তারিফ কর, সাহস দাও। সবাই যদি এক সঙ্গে নাক কাটো তো 'সব লাল হো যাগা'; দু একটা আদর্শ সাম্‌নে থাকা ভাল।"

কাব্য নহে, বনমালী সত্যই স্থির করিয়াছে, সে বিবাহ করিবে না। লক্ষ্মীর হাতে গড়া সংসারে আর কাহাকেও বসাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই গৃহের মধ্যে সে লক্ষ্মীর সাহচর্য্য অনুভব করে! সে মেয়েকে একলা মানুষ করিবে, বিবাহ দিবে, তারপর এ সংসারে থাকিবে না—সন্ন্যাস লইবে।

কিন্তু এই বনমালীই বৎসর খানেকের পর দেশে জমি-জায়গার বিলি বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সৌদামিনীকে যখন বিবাহ করিয়া আনিল—কেহ আশ্চর্য্য হইল না। আশ্চর্য্য হইবে কেন? স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাংলা দেশের কোন্ স্বামীই বা সন্ন্যাস লইবার জন্য মাতামাতি না করিয়াছে, আর কে-ই বা দুদিন যাইতে না যাইতে কোমর বাঁধিয়া বিবাহ করিতে না ছুটিয়াছে? তবু তো বনমালী—পূরা এক বৎসর চুপ করিয়া ছিল। অন্য লোক হইলে তো স্ত্রীর শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই হুঙ্কার ছাড়িয়া ফতোয়া জাহির করিত—বিবাহ না করিলে অসম্ভব। অতএব বনমালী কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই।

কিন্তু সৌদামিনীর আগমনের কিছুদিন পর হইতেই বনমালী বুঝিতে পারিল—সে ভাল কাজ করে নাই।

বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামের লোকেরা যখন সকলে বনমালীকে ধরাধরি করিয়া সৌদামিনীকে দেখিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তখন সে লজ্জায় তাহার দিকে তাকাইতে পারে নাই—কিন্তু সৌদামিনী তাহার দুই চক্ষের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলিয়া বনমালীকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছিল এবং বলা বাহুল্য দেখিয়া মোহিত হয় নাই। তথাপি সে বনমালীকে অপছন্দ করে নাই। বনমালী উপার্জ্জন করে, তাহার স্বাধীন সংসার আছে এবং সে সংসারে শাশুড়ী ও ননদের বালাই নাই। এক ফোঁটা মেয়েকে সে হিসাবের মধ্যেই আনিল না। সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, এই প্রৌঢ় বনমালীকে পতিত্বে বরণ করিলেই সে ইহার সংসারের একমাত্র অধীশ্বরী হইবে এবং এই গোবেচারী লোকটার তাহার পায়ে দাসখৎ লিখিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। তাই বনমালীর গৃহে আসিয়া সে প্রথমে বনমালী ও তাহার মেয়ের দিকে চাহিল না, সংসার লইয়া পড়িল। বনমালীর কাছ হইতে সে তাহার হাতবাক্সের চাবি চাহিয়া লইল এবং টাকাকড়ি গুণিয়া গাঁথিয়া লইয়া রিংশুদ্ধ চাবি অঞ্চলে বাঁধিল। ঝিয়ের কাছ হইতে ভাঁড়ারের চার্জ্জ বুঝিয়া লইল এবং রান্নাঘরে গিয়া তৈল ও মসলার বেহিসাবী খরচের জন্য পাচককে শাসন করিল। আফিসের নূতন বড়বাবু যেমন দৃঢ় ও দ্বিধাহীন হস্তে শাসনের সম্মার্জ্জনী চালাইয়া পূর্ব্বতন ব্যক্তির সমস্ত প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিতে চায়, ঠিক তেমনই করিয়া

সৌদামিনী এই সংসার হইতে তাহার পূর্ব্বগামিনীর সমস্ত চিহ্নকে নিষ্ঠুর হস্তে মুছিয়া দিতে লাগিল এবং এমন সম্পূর্ণ ভাবে যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে ছাড়া যে এ সংসারে আর কেহ কখনও প্রভুত্ব করিয়াছিল, বনমালী হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়ী ঝিটি পর্য্যন্ত কাহারও তাহা মনে করিবার উপায় রহিল না।

কিন্তু সংসারের কর্ত্তাটিকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সৌদামিনী একটু বাধা পাইল। বাহিরে বনমালী আত্ম-সমর্পণ করিল বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে এক ফোঁটা সাবিত্রী রক্ষা-কবচের মত সৌদামিনীর সমস্ত প্রভাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাই বাহিরের সংসারে সৌদামিনীর যখন একাধিপত্য চলিতে লাগিল, অন্তরের নিভৃতে শুদ্ধ সাবিত্রীকে লইয়া বনমালী একটি ক্ষুদ্র সংসার রচনা করিল; সৌদামিনীর শাসনদণ্ড তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সৌদামিনীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একদিন সে রাত্রে শুইতে গিয়া দুই চক্ষে বিরক্তির ঝিলিক্ হানিয়া কটুকণ্ঠে কহিল, "দ্যাখো! এই প্যান্‌পেনে মেয়েকে বিদেয় করো দেখি। সমস্ত দিন খেটে খুটে রাত্রে একটু ঘুমুতে চাই—দয়া করে বিয়ে করে এনেছ বলে পাথর হয়ে যাইনিতো।" বনমালীকে কোন ব্যবস্থা করিতে হইল না। পরদিন সে নিজেই ঝিকে ডাকিয়া আদেশ দিল, "খুকী আজ থেকে তোমার কাছে শোবে ঝি, বুঝলে? তার বিছানা তোমার কাছেই কোরো।' তারপর প্রতিদিন পলে পলে সৌদামিনী সাবিত্রীকে বনমালীর স্নেহরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিল। তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে লাগিল, বনমালীর কাছে ঘেঁসিতে দিল না। আহারের সময়ে বনমালী সাবিত্রীর খোঁজ করিলে সৌদামিনী নিষেধ করিয়া বলে, "না না, ডাকতে হবে না, এখুনি এসে বিরক্ত কোরবে, খেতে দেবে না।" দুই চোখে স্নেহের বান ডাকাইয়া বলে, "না খেয়ে খেয়ে কি রকম শরীর হোয়েছে, আরসী নিয়ে দেখ দিকি।" দৃষ্টি একটু ম্লান করিয়া বলে, "এ রকম কোরবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?" বনমালী নীরবে নত মস্তকে আহার করে। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বনমালী মেয়েকে দেখিতে চায়—তাহাকে বুকে করিয়া আদর করিতে তাহার ইচ্ছা হয়—কিন্তু সৌদামিনী তখন সাবিত্রীকে ঝিয়ের সঙ্গে বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। এমনই করিয়া সৌদামিনী বনমালী ও সাবিত্রীর মধ্যে একটি দুস্তর নদীর মতো নিষ্ঠুর বেগে বহিতে লাগিল। আর তাহার দুই পারে দাঁড়াইয়া পিতা ও কন্যা পরস্পরের দিকে নিরুপায় ভাবে তাকাইয়া রহিল।

শুধু সাবিত্রীর কাছ হইতে নয়, বাহিরের সম্পর্ক হইতেও সৌদামিনী বনমালীকে বিচ্ছিন্ন করিল। সান্ধ্য মজলিসে যাওয়া বন্ধ হইল; সৌদামিনীর সন্ধ্যার সময়ে একা থাকিতে ভয় করে। পূজাপার্ব্বণে কাহারও বাড়ী যাওয়ার উপরেও সৌদামিনীর কড়া হুকুম জাহির হইল। কেহ ডাকিতে আসিলে সৌদামিনী সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেয় যে, বনমালীর পুরুতগিরি করা ব্যবসা নহে। কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে সৌদামিনী শুনাইয়া দেয়, "ওঁর শরীর খারাপ; কারও বাড়ীর যা তা খাওয়া সহ্য হয় না।"

বৎসর দুই পরে সৌদামিনীর একটি পুত্র জন্মিল। বনমালীর বশীকরণ সম্বন্ধে সৌদামিনী নিশ্চিন্ত হইল। এই শিশু ও তৎসম্পর্কীয় প্রসঙ্গ দিয়া সৌদামিনী বনমালীর সমস্ত অবসর এমনি করিয়া ভরাট করিয়া তুলিল যে,তাহার সাবিত্রীর নাম পর্য্যন্ত করিবার অবকাশ রহিল না। "সাবিত্রী খেয়েছে?" প্রশ্ন করিলে সৌদামিনী জবাব দেয়, "খায়নি তো উপোস দিয়ে আছে নাকি? তুমি কি ভাবো, তোমার মেয়েকে খেতে না দিয়ে সব আমরাই গিলছি?" বনমালী অপ্রস্তুত হইয়া বলে, "না—তাতো বলিনি—এমনি—" সৌদামিনী ধমক দিয়া বলে, "বলনি আবার কি? আবার কেমন করে বলতে হবে?" বলিতে থাকে, "মেয়ের জন্যেই কেবল হেদিয়ে মরছেন, মেয়ে সগ্‌গে বাতি দেবে কিনা।" সাবিত্রীকে ডাক দেয়, "ওলো এই সাবি! শুনে যা।" কুণ্ঠিত পদে সাবিত্রী কাছে আসে। প্রশ্ন হয়, "খাস্‌নি?" সাবিত্রী ম্লান মুখখানি ম্লানতর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানায়, সে খাইয়াছে। সাবিত্রীকে যাইতে বলিয়া সৌদামিনী খোকার কথা পাড়ে। বলে, "খোকন্ খেয়েছে কিনা—তা তো কখনও জিজ্ঞাসা কর না? মেয়ে কখনও আপনার হয় না গো—ছেলেই হোলো সব।" বলে, "তোমার ঐ মেয়ে সামান্যি নয়, মিটমিটে সয়তান; খোকন্‌কে আমার আড়ালে মাবে, আজ একটু না দেখলে কূয়োতে ফেলে দিয়েছিল আর কি।" বনমালী শিহরিয়া উঠিয়া বলে, "সত্যি? আহা! ছেলেমানুষ, সাম্‌লাতে পারে না। ওর কোলে দিও না।" সৌদামিনী মুখভঙ্গী করিয়া বলে, "ছেলেমানুষ! ওর কথাতো শোননি? পাকা ঝুনো।"

এই শিশু অধিক দিন সঙ্গীবিহীন রহিল না। বৎসরান্তে আর একটি শিশুর আবির্ভাব হইল। এমনি করিয়া বছর কয়েকের মধ্যে বনমালীর গৃহ সম্মিলিত শিশুকণ্ঠের কর্ণভেদী কলধ্বনিতে দিবারাত্র মুখরিত হইতে লাগিল। যে বনমালী বংশহীন হইবার ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিত, সেইই বংশবৃদ্ধির বহর দেখিয়া ভয়ে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। সকালে ও সন্ধ্যায় টিউসানী করিতে লাগিল এবং আপনার আহার ও পরিধেয়ের স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর সম্ভব ছাঁটিয়া দিল—কিন্তু তথাপি ব্যয়ের অঙ্ককে আয়ের কোঠায় আনিবার জন্য তাহার চিন্তার অবধি রহিল না।

সাবিত্রী অনাদরে ও অর্দ্ধাশনে বড় হইতে থাকে। তাহার বয়স বাড়িতে দেখিয়া সৌদামিনী রোষে জ্বলিয়া উঠে। বলে, "এ পাপকে বিদেয় কর্‌গো গো, চোখে যে আর দেখা যায়

না !" বনমালী বলে, "চেষ্টা তো করছি। একটি ছেলে—" সৌদামিনী উত্তর দেয়, "ছেলে টেলে অতো দেখতে হবে না—দাও একটা ঘাটের মড়া ধরে। কুলীনের মেয়ে ; তার আবার অতো !"

সেই বৎসরই বনমালী সাবিত্রীকে লইয়া দেশে গেল এবং দেখিয়া শুনিয়া একটি ব্রাহ্মণ যুবকের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু বিবাহের খরচ নির্ব্বাহের জন্য যে তাহাকে তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ গোপনে বিক্রয় করিতে হইল, সে সংবাদ সৌদামিনীকে দিতে সাহস করিল না। বৎসর দুই মধ্যেই সাবিত্রী তাহার সীঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়া খোয়াইয়া নিরাভরণ দেহে গৃহে ফিরিয়া আসিল। বনমালী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সৌদামিনী লাফাইতে লাগিল ; কটু বিষাক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "এক চিতেয় শুতে পারলিনে হতভাগী—আমার হাড় জ্বালাতে আবার ফিরে এলি।" তাহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া পাড়ার কেহ বনমালী ও তাহার মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে আসিতে সাহস করিল না।

আমরণ সাবিত্রীর ভরণপোষণ করিতে হইবে ; অতএব সংসারের নূতন ব্যবস্থা হইল। পাচক ও ঝিকে ছাড়াইয়া দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ সাবিত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল। তবুও উঠিতে বসিতে গঞ্জনার সীমা থাকে না ; সৌদামিনীর তীক্ষ্ণধার রসনা কুৎসিত শ্লেষ ও ইঙ্গিতে নিরন্তর সাবিত্রীকে বিদ্ধ করিতে থাকে এবং কখনও বা নিষ্ঠুর রোষে সৌদামিনী হতভাগিনীকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে। দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সাবিত্রী প্রাণপণে ক্রন্দন রোধ করে। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি এই মর্ম্মান্তিক অত্যাচার পাড়ার সকলের অসহ্য হইয়া উঠে। কেহ হয়তো প্রতিবাদ করে, কিন্তু তাহা সৌদামিনীর নিষ্ঠুরতাকে বাড়াইয়া দেয় মাত্র। কোন প্রতিবেশী হয় তো বনমালীকে ডাকিয়া বলে, "আর তো সহ্য হয় না, বনমালী। এর একটা প্রতিকার করো।" বনমালী চুপ করিয়া থাকে। এক মরণ ছাড়া প্রতিকারের কোন উপায় সে দেখিতে পায় না। তাই একদা-প্রাণাধিকা প্রিয়তমা কন্যার মরণ-কামনায় বিধাতার কাছে রোধ করি নিরন্তর প্রার্থনা করে।

নিত্য অনুযোগ ও অভিযোগ সহ্য করিতে না পারিয়া বনমালী স্থির করিল—এ পল্লী ত্যাগ করিবে। তবু যে গৃহে এতদিন বাস করিয়াছে তাহার মায়া কাটাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সৌদামিনী এমন একটি নূতনতর উপদ্রবের সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে—শুধু এ গৃহে নয়, কোন ভদ্রপল্লীতে বাস করা বনমালী অসম্ভব মনে করিল।

সহসা সৌদামিনী অত্যধিক পরিমাণে শুচিতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার কাছে সমস্ত গৃহ, গৃহের সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, মায় গৃহের বাসিন্দাগুলি সদাসর্ব্বদা অপবিত্র বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রীকে দিয়া কূপ হইতে কলসী কলসী জল তোলাইয়া সমস্ত গৃহের মেজে, দেওয়াল, এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত স্বহস্তে ধৌত করিতে লাগিল ; গৃহের বাসন কোসন, কাপড় চোপড়, বিছানা বালিশ, মায় ছেলেগুলাকে পর্য্যন্ত দিনে পঞ্চাশবার করিয়া জলে ডুবাইয়া শুদ্ধ করিতে লাগিল ; এবং নিজে একখানা ভিজা গামছা পরিয়া রাস্তার ধারে জলের কলের নীচে মাথা রাখিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে লাগিল। লোকের কাছে বনমালীর মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে এ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সহরের একপ্রান্তে নামমাত্র ভাড়াতে একটা পোড়োবাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বাড়ীটার চারিদিক ঘিরিয়া আগাছার ঘন জঙ্গল ; নিকটে কোন বসতি নাই ; কেবল কিছুদূরে কতকগুলা মুসলমানের বাস। বাড়ীর পিছনে কিছুদূরে তালগাছে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড দীঘি। সব দিক দিয়া বাড়ীটি সৌদামিনীর মনের মতো হইল।

২

একদা পূর্ব্বাহ্ন। বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। টিউসানী সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বনমালী দেখিল সৌদামিনী পুকুরে গিয়াছে। সে চুপি চুপি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী রান্না করিতেছে। পূর্ব্বের দিন একাদশী গিয়াছে। একাদশীর দিন সাবিত্রী সমস্ত দিবারাত্র জলবিন্দু স্পর্শ করে না, ক্ষুৎপিপাসায় সমস্ত দেহ শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়, সকালে বিছানা হইতে উঠিতে কষ্ট হয়। তবু এ বাড়ীতে তাহার কোন দিন ছুটী মিলে না। আজও সে কোন্ ভোরে উঠিয়াছে, পুকুর হইতে কলসী কলসী জল আনিয়াছে, স্নান করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। এখনও সৌদামিনীর তরফ হইতে আহার্য্যের বরাদ্দ হয় নাই।

বনমালী সাবিত্রীর কাছে গিয়া চুপিচুপি ডাকিল, "মা ? কিছু মুখে দিয়েছিস ?" সাবিত্রী মুখ ফিরাইল না ; কড়ায় ফুটন্ত তরকারীর দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল। তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া বনমালীর বুকখানা ব্যথায় মুচড়াইয়া উঠিল ; সাবিত্রীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মা কোথায় ?" সাবিত্রী তেমনই শুষ্ক, ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, "পুকুরে"। বনমালী রান্নাঘর হইতে বাহির হইবা মাত্র দেখিল, সৌদামিনী দুইহস্তে ও দুইস্কন্ধে একরাশ ভিজা কাপড় ঝুলাইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বনমালী দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

কিছুক্ষণ পর শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বনমালী কহিল, "হ্যাগো—আমার স্কুলে যাবার কাপড়জামা কি হোল ?" সৌদামিনী একমনে ভিজা কাপড়গুলি শুকাইতে দিতেছিল ; বনমালীর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। বনমালী

একটু সুর চড়াইয়া কহিল, "শুনতে পাচ্ছো না, না কি? আমার কাপড়—" ইহার পর জবাব মিলিল—"হ্যাঁ—হাঁ শুনতে পাচ্ছি, কালা হইনি। কাপড় জামা সব কেচে দিয়েছি।" বনমালী বসিয়া পড়িল। আজ তাহার স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিবে; হেড্ মাষ্টার কড়া নোটিশ জারি করিয়াছেন—শিক্ষকেরা সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া স্কুলে আসিবেন।

আর সৌদামিনী কিনা—সব কাপড় জামা—মায় ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া আনিয়াছে! প্রশ্ন করিল—"এর মানে?" সৌদামিনী নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, "মানে ত দেখতেই পাচ্ছ।" বনমালী কহিল, "স্কুলে যাব কি করে?" সৌদামিনী বনমালীর কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না। রাগে বনমালীর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। বিগতযৌবনা সৌদামিনীর অর্দ্ধ-উলঙ্গ, কুৎসিত দেহ তাহার দুই চক্ষে হুল ফুটাইতে লাগিল; ইহার হীন আত্মসর্ব্বস্বতা, ভাগ্যহীনা সাবিত্রীর প্রতি ইহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হইল। কহিল, "তোমার লজ্জা করে না?" সৌদামিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার দুই চোখ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বনমালীর সম্মুখে আসিয়া মা-কালীর মতো দাঁড়াইয়া শাদা থ্যাস্‌থেসে হাতখানা বনমালীর মুখের কাছে খড়্গের মতো ঘুরাইয়া কহিল, "লজ্জা করে! বুড়ো মিন্‌সে তুমি, যুবতী মেয়ের কাছে ঘুর ঘুর্ কোরতে তোমার লজ্জা করে না; আমার করে; গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে।" বনমালীর মাথার মধ্যে যেন একটা তুবড়ী সশব্দে ফাটিয়া আগুন ছড়াইতে লাগিল; মুহূর্ত্তের জন্য ইচ্ছা হইল, পশুর মতো সৌদামিনীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুর আঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করে; যে জিহ্বা দ্বারা কন্যা ও পিতার সম্বন্ধে এই নির্লজ্জ উক্তি করিয়াছে, চিরদিনের জন্য সেই জিহ্বাকে নির্ব্বাক করিয়া দেয়। কিন্তু তাহা দমন করিয়া রুষ্ট-কণ্ঠে কহিল, "মুখ সাম্‌লে কথা বলো।" সৌদামিনী সমস্ত উঠানটা চরকির মতো এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, "কি? মুখ সামলে কথা বলব? কার ভয়ে? তোমার না তোমার ঐ আদরিণী মেয়ের?" রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়া কহিল, "ওলো ও বাপসোহাগী! আয়লো আয়, বাপের কাছে আয়। যুগল মিলন দেখে নয়ন সার্থক করি—" রান্নাঘরের মধ্যে দুই হাতে দুই কান সজোরে বন্ধ করিয়া সাবিত্রী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে; তাহার সমস্ত দেহ ও মন অপরিসীম লজ্জায় নিঃশব্দে ধিক্কার দিতে থাকে—ছিঃ ছিঃ।

নাচিতে নাচিতে সৌদামিনী বলে, "চোখের সাম্‌নে অসৈরন দেখলেই বলব।" বুক চাপড়াইয়া বলে, "কাউকে ভয় করব নাকি? কাকে ভয়?"

ক্রমবর্দ্ধমান ক্রোধে বনমালীর দিকে রুখিয়া আসিয়া বলে, "কি করবে তুমি? মারবে? মারো।" বনমালীর সামনে পিঠ পাতিয়া বলে, "মারো দেখি?" এই নির্ল্লজ্জ দৃশ্য বনমালীর অসহ্য হইয়া উঠিল; দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইয়া গেল; সৌদামিনীর ক্রোধ অসহায়া সাবিত্রীকে কিভাবে দগ্ধ করিবে তাহা অনুমান করিয়া তাহার আশঙ্কার সীমা রহিল না।

সৌদামিনী সমস্ত উঠান নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি একটা যেন মাড়াইয়া নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে এক পা তুলিয়া আর এক পায়ের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওলো—এই সাবি! শুনে যা—ওলো এই—" সাবিত্রী ধীর পদে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সৌদামিনী আদেশ করিল, "কি মাড়িয়েছি শুঁকে ছাখ।" সাবিত্রী জানু পাতিয়া বসিয়া সমস্ত পায়ের নীচটা শুঁকিয়া কহিল, "কিছু নয়তো মা।" সৌদামিনী মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "কিছু নয়তো মা, তোর কি কোন জ্ঞানগম্যি আছে যে কিছু টের পাবি?" গজ্ গজ্ করিয়া কহিতে লাগিল, "কিছু নয়তো মা—সতীনের কাঁটা—শুঁকেও উব্‌গার করে না।" বলিয়া উঠানের একদিকে যেখানে সাবিত্রী কলসী কলসী জল পুকুর হইতে আনিয়া একটা প্রকাণ্ড মাটীর জালা ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে, সেই দিকে চলিতে লাগিল। সাবিত্রী রান্নাঘরের দিকে চলিল। সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "পুকুরে চান করে এসে তবে রান্নাঘরে ঢুকবি। ঐ কাপড়ে হাঁড়ি হেঁসেল এক করে দিস্‌নে।"

সাবিত্রী ধীর পদে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিনের বেলা পুকুরে যাইতে আজ কাল সে পছন্দ করে না। তাই অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া সংসারের সমস্ত দিনের জল তুলিয়া আনিয়া রাখে। সে কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়াছে—একটা লোক এই পুকুরে আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুকুরের একধারে সে মাছ ধরার আয়োজন করিয়াছে; সেখানে সমস্ত সকাল ও দুপুর একটা ছিপ হাতে লইয়া বসিয়া থাকে; যখনই সাবিত্রী ঘাটে যায়, তখনই লোকটা নির্ল্লজ্জের মতো তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে; তাহার লোলুপ দৃষ্টি ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মতো লালাময় জিহ্বা দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন লেহন করে।

আজ তাই চারিদিক সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া সাবিত্রী ঘাটে আসিল। পাথরে বাঁধান প্রাচীন ঘাটটা কঙ্কাল বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। সিঁড়িগুলাতে শেওলা পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে—পা টিপিয়া না নামিলে পতন অনিবার্য্য। সিঁড়ির কোলে কালো জল টল টল করিতেছে। সাবিত্রী জলে নামিয়া আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া রহিল, অঞ্জলি ভরিয়া শীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর যেন জুড়াইয়া গেল; দুই চক্ষু অপরিসীম আরামে মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি এই দীঘির প্রশান্তিময় গভীর শীতল কোলে চিরদিনের মতো ঘুমাইতে পারিত!

সহসা চোখ মেলিয়া চাহিতেই সাবিত্রী দেখিল—একটা তালগাছের অন্তরাল হইতে কাহার জ্বালাময়, লোভাতুর দৃষ্টি তাহার অনাবৃত দেহের পানে একাগ্র হইয়া আছে। সে দৃষ্টি শুধু দেখিতেছে না, তাহার সর্ব্বদেহকে স্পর্শ করিতেছে, পীড়ন করিতেছে। সাবিত্রীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বুকের ভিতরটা এমনি দুলিতে লাগিল, যেন দম বন্ধ হইয়া আসে, অথচ মুহূর্ত্তের জন্য সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না; মনে হইল—কাহার কামনাময় চক্ষু তাহার জীবনের সীমাহীন গোপনতার মধ্যে সুদূরসন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া তাহার জরাগ্রস্ত শীর্ণ যৌবনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিরতিশয় লজ্জায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া মুখের উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া ধীর কম্পিত পদে জল হইতে উঠিয়া গেল।

বেলা বোধকরি দুইটা। বনমালী না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেছে। সৌদামিনী পুকুরে; তাহার প্রাতঃকৃত্য এখনও শেষ হয় নাই। ছেলেগুলাকে খাওয়াইয়া ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিয়া সাবিত্রী রান্নাঘরে সৌদামিনীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সমস্ত ঘরটা নিঃস্তব্ধ, শুধু একটা পতঙ্গ একটানা গুঞ্জন করিয়া একটা মাকড়সার জালের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঞ্চরমান পতঙ্গটাকে জালে বাঁধিবার জন্য মাকড়সাটার কি লুব্ধ ব্যগ্রতা! সাবিত্রীর মনে হইল তাহাকেও আয়ত্ত করিবার জন্য কে ঐ ক্ষুধার্ত্ত মাকড়সার মতো লোভশাণিত দৃষ্টি লইয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। কে সে? তাহার এই অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ, বিগতশ্রী দেহটার উপরে কেন তাহার এই দুরন্ত লোভ? দুষ্ট গ্রহের মত কেন সে তাহার জীবনকে ছন্নছাড়া করিতে চায়?

সৌদামিনী আসিতে সাবিত্রী কহিল, "বাবা তো খেতে আসেননি মা।" সৌদামিনী তিক্ত কণ্ঠে কহিল, "আসেননি তো আমি কি করবো? পারিস্‌তো ডেকে আন্‌গে যা।"

খাওয়া সারিয়া সৌদামিনী কহিল, "ভাত কোলে করে বসে থেকে মায়া দেখিয়ে কাজ নাই। খেয়ে নিগে যা। আর ছাখ্‌ ঐ ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দে—ওবেলায় গিল্‌বে অখন্‌।"

সাবিত্রী নিরুত্তর রহিল। বনমালীকে উপবাসী রাখিয়া সে খাইবে কি করিয়া? ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া কতকটা জল গিলিয়া, রান্নঘরে শিকল তুলিয়া দিল ও নিজের ঘরের মেজেতে শুইয়া ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল সৌদামিনীর চীৎকারে। "ওলো এই সাবি" —পা দিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "রাত দুপুর পর্য্যন্ত ষাঁড়ের মত ঘুমোচ্ছিস যে—কাজ কর্ম্ম নাই?" সাবিত্রী ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত দুই চক্ষু দুই হাত দিয়া মুছিয়া দেখিল অন্ধকারে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া গেছে। সৌদামিনী কহিতে লাগিল, "আর ঢং করে বসে থাকতে হবে না। ঘরে এক বিন্দু জল নাই; পুকুর থেকে জল আনগে যা।" আপন মনে গজ্‌ গজ্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, "সমস্ত দুপুর গুমোট গরমে লোকে চোখে পাতায় করতে পারে না, হতভাগীর কুম্ভকর্ণের মত ঘুম! পোড়া চোখে ঘুমও তো আসে।" সাবিত্রী ধীর পদে বাহির হইয়া আসিল। এই অন্ধকারে পুকুরে যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার ভয় করিতে লাগিল। সৌদামিনীর কাছে গিয়া কহিল, "মা ওবেলার জল কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে?" সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া কহিল, "নিজের চোখে দেখগে যা—বিশ্বেস না হয় তো।"

সাবিত্রী বুঝিতে পারিল তাহাকে পুকুরে যাইতেই হইবে। একবার মনে হইল বনমালীর বড়ছেলে পটলকে সঙ্গে লয়। এই বাড়ীর ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেইই তাহাকে একটু ভাল বাসে। কিন্তু সৌদামিনীর অনুমতি লইতে সাহস হইল না। একাকী কলসী কক্ষে লইয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল।

আস্‌শেওড়া ও বাবলাঝোপের মধ্য দিয়া পায়ে চলা সুঁড়িপথ অন্ধকারে হারাইয়া গেছে। সাবিত্রী অতি সন্তর্পণে পথ চলিতে থাকে। প্রতি অনিশ্চিত পদক্ষেপে কোন অজানিত বিপদে পা দিবে তাহা কল্পনা করিয়া তাহার আশঙ্কার সীমা থাকে না। কখনও তাহার মনে হয়, বাবলা বনের পাশ দিয়া, শুষ্কপাতার রাশিকে মর্ম্মরিত করিয়া কে যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। চলিতে চলিতে সে থমকিয়া দাঁড়ায়, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে তাকাইয়া থাকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। কখনও বা একটা রাত্রিচর সরীসৃপ সরসর করিয়া রাস্তার এ পাশ হইতে ও পাশে চলিয়া যায়। সাবিত্রীর পা আর চলিতে চাহে না, সমস্ত দেহের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি আঁধারে ঢাকা পথের উপরে ন্যস্ত করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া থাকে, আবার অগ্রসর হয়। নিজের ভয় দেখিয়া তাহার হাসিও পায়। জীবনে সুখের লেশ মাত্র নাই, নির্য্যাতন প্রতিদিন মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, অথচ মরণে কত ভয়?

দীঘির পাড়ে আসিয়া সাবিত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখের সামনে গাঢ় কৃষ্ণ আবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দীঘিটা যেন ঘুমাইয়া গেছে। চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া একটি সুগভীর, বিশাল স্তব্ধতা; চারিদিকের দীর্ঘ তরুশ্রেণী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে সেই স্তব্ধতাকে যেন প্রহরা দিতেছে।

সিঁড়ির নীচেই কালো সাপের দেহের মতো চক্‌চকে কালো জল; তারার চুমকি বসান এক টুকরা আকাশ জলের মধ্যে চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। সাবিত্রী পা টিপিয়া টিপিয়া জলের কাছে আসিয়া অতি সাবধানে কলসে জল ভরিয়া, কম্পিত পদে উঠিয়া আসিল। জলভরা ভারী কলসী, অনশনক্লিষ্ট দেহ যেন বহিতে চায় না; সাবিত্রী ধীরে ধীরে

চলিতে থাকে। ভাবে, 'বাবা এতক্ষণ আসিয়াছে বোধ হয়, বাবাই তাহাকে এখনও বোধ হয় একটু ভালবাসে, উঃ কী অন্ধকার! আকাশে কত বড় একটা তারা জ্বলিতেছে! লোকে বলে মানুষ মরিয়া তারা হয়, তবে ঐ অগণিত তারার মধ্যে তাহার মা কোন্‌টি? হয়তো ঐ ছোট তারাটি; তাহারই দুঃখে বোধ হয় উহার দীপ্তি ম্লান হইয়া গেছে, তাহার মাকে তাহার মনে পড়ে না তো? এই অন্ধকার রাত্রে মা যদি ঐ বাবলা গাছের নীচে ধব্‌ধবে রাঙ্গাপাড় শাড়ী পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? যদি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে? যদি···' সহসা কাহার দুই সবল বাহু পশ্চাৎ হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রীর হাত হইতে কলসটা মাটীতে পড়িয়া গেল, সে 'মাগো' বলিয়া আততায়ীর স্কন্ধেই মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

টিউসানী সারিয়া আসিয়া বাড়ীতে পা দিতেই পটল কহিল, "বাবা, দিদি কতক্ষণ জল আনতে গেছে, এখনও আসেনি।" বনমালী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "সে কিরে! তোরা খোঁজ করিস্‌নি?" পটল অনুযোগের সুরে কহিল, "মা যে বারণ কোরলে—দিদি আজ সারাদিন কিছু খায়নি বাবা।" বনমালী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "হায়! হায়! তবে মা আমার আর নাই রে। সবাই মিলে মাকে আমার মেরে দিলি।" বলিয়া বনমালী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন অনাহারে দেহ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে, তদুপরি এই অকস্মাৎ বিপদবার্ত্তায় বুকের ভিতরটা এমনি দুলিতেছে, যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, তবু তাহার চক্ষুর সম্মুখে হতভাগিনী, উৎপীড়িতা কন্যার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দীঘির পাড়ে আসিয়া বনমালী প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, "মাগো! সাবিত্রী!" কণ্ঠস্বর ওপার হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই স্তব্ধ অন্ধকার পুরী সচকিত করিয়া বনমালী পুনঃ পুনঃ বৃথা চীৎকার করিতে লাগিল, "মাগো ফিরে আয়!"

কেহ নাই। তবে কোথায় গেল? বনমালী ঘাট হইতে নামিয়া পথের উপরে থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, কলস পড়িয়া আছে, কতকটা মাটী জলে সিক্ত। তবে তো সাবিত্রী মরে নাই! বনমালী দীঘির চারিপাড়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; প্রত্যেক ঝোপ প্রত্যেক তরুতল তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল—হয়তো কোথাও সাবিত্রীর মূর্চ্ছিত দেহ পড়িয়া আছে। দীঘির নীচে ঘন জঙ্গল; পাগলের মতো বনমালী সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথরেখাহীন জঙ্গলের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কণ্টকময় ঝোপ প্রতি পদক্ষেপে বাধা দেয়; সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে; বিবরের মধ্যে সুপ্ত সর্প চকিত হইয়া দংশনোদ্যত ফণা বিস্তার করে। বনমালীর সেদিকে লক্ষ্য নাই; দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সমস্ত চেতনা স্থান ও কালকে অতিক্রম করিয়া ধ্যানাবিষ্ট যোগীর মতো কেবল এই মন্ত্র জপ করিতেছে, 'মাগো—ফিরে আয়।'

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া রাত্রি দিনের কিনারায় পৌছিল; পূর্ব্বাচল আসন্ন উষার অস্পষ্ট আভাসে স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং রাত্রিচর পাখীর দল কুলায়ের উদ্দেশ্যে ফিরিতে লাগিল। এমন সময়ে বনমালী দীঘির ঘাটে আবার ফিরিয়া আসিল। সেই শূন্য কলসটার কাছে, সেই সিক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া শিশুর মতো বনমালী কাঁদিতে লাগিল, "কোথায় গেলি মা গো!"

৩

সহরে হৈচৈ পড়িয়া গেল। মফস্বলবাসীদের ভাগ্যে পর-চর্চ্চার সুযোগ সচরাচর ঘটে না। কাজেই ভগবানের কৃপায় কিছু একটা ঘটিলে, সকলে ঝাঁক বাঁধিয়া সেই মধুভাণ্ডের চারিদিকে ভন্‌ ভন্‌ করিতে থাকে; কি ধনী ও দরিদ্র, কি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, কাহারও উৎসাহ এবং নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র তারতম্য দেখা যায় না। তাই, সাবিত্রীর গৃহত্যাগের সংবাদ অবিলম্বে সমস্ত সহরে প্রচারিত হইয়া গেল এবং ধনীর বৈঠকখানা হইতে আরম্ভ করিয়া চা-এর দোকান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইহার টীকাটিপ্পনীসম্বলিত সরস সমালোচনায় সরগরম হইয়া উঠিল। শুভার্থীদের দল এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া অবলীলাক্রমে বনমালীর গৃহে পৌছিতে লাগিল এবং সৎপরামর্শ দিবার জন্য বনমালীকে হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

সৌদামিনী সকাল হইতে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে—"মিট্‌মিটে ডান, ছেলে খাবার যম; হতভাগী ডুবে ডুবে জল খেতো"······"জানি গো জানি সব জানি, রাম না জন্মাতে রামায়ণ জানি, হতভাগী যে কুলে কালী দেবে তা আমি অনেক আগেই জানতাম।" হাত নাড়িয়া কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া বলে, "মেয়ে মেয়ে কোরে যে হেদিয়ে মরতে—ঐ মেয়েই তো মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল, এখন ঐ পোড়া মুখে সহরের লোক যে থুতু দেবে।" ক্রন্দনের ভঙ্গীতে বলে, "হতভাগী কি দুষ্‌মণী করলে মা! এখন ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে আমি কি করে দিই।"

বনমালী ঘরের মেঝেতে উপুড় হইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। সকলের ডাকাডাকিতে বাহির হইয়া আসিল। সকলে একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিয়া সংবাদটা সম্যকরূপে জানিতে চাহিল। দুই চারিজনের বোধ করি ভয় ছিল, পাছে খবরটা মিথ্যা হইয়া যায়—কিন্তু বনমালীর আকৃতি দেখিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হইল।

বনমালী সংক্ষেপে সংবাদ জানাইল। সকলে খুঁটিনাটী জানিবার জন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল; বনমালী সেই যে প্রথম হইতে ঘাড় হেঁট করিয়া মাটীর দিকে তাকাইয়া

বসিয়া রহিল, কাহারও দিকে মুখ তুলিল না বা কাহারও প্রশ্নের জবাব দিল না। পুনঃপুনঃ ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল, ইহার বেশী কিছু সে জানে না, কিছু জানাইবার নাইও। শ্রোতার দল নিরাশ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সকলের চক্ষে নেপথ্যস্থিত গূঢ়তত্ত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল অথচ বনমালীর বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর না দেখিয়া পরম শুভার্থীগণ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং অবশেষে পুনরায় আসিবার ভরসা দিয়া সকলে একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

সকলে পরামর্শ দিল, "পুলিসে খবর দাও, যে পাপিষ্ঠ এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে সরকার বাহাদুরের হস্তে তাহার শাস্তি হোক্।" সহরের যুবক-সমিতির পাণ্ডা মহাশয় আসিয়া বনমালীকে সাহস দিল, "কোন ভয় নাই; চারিদিকে ফৌজ পাঠান হইয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে আপনার কন্যাকে আনিয়া হাজির করা হইবে কিন্তু তারপর দুষ্টের দমনের জন্য প্রস্তুত হোন।" কলিকাতা হইতে নারীরক্ষা সমিতির সহকারী সম্পাদক মহাশয় সশরীরে সরজমীনে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বলন্ত ভাষায় এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেশবাসীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন এবং পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে কলিকাতা যাইবার জন্য বনমালীকে টানাটানি করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুত্তরে বনমালী কিছুই বলিল না; শুধু একটানা ঘাড় নাড়িয়া বোধ করি ইহাই জানাইতে লাগিল যে, সে কাহারও সাহায্য লইবে না, কাহারও কাছে যাইবে না; যে হতভাগিনী কন্যার গৃহবাস অসহ্য হইয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া গৃহে পুরিয়া রাখিবার মত নিষ্ঠুরতা তাহার নাই।

কিন্তু বনমালীর উৎসাহ না থাকিলেও অন্য সকলের উৎসাহের অভাব ছিল না। কাজেই ব্যাপারটাকে সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া গড়াইয়া লইয়া চলিল। সভা ও সমিতি বসিল; বক্তৃতা ও রেজল্যুশনের সীমা রহিল না; পুলিসের দারোগা আসিয়া বনমালীর গৃহের নক্সা, দরজা জানালা ও কড়ি বড়গার নির্ভুল হিসাব, বনমালীর বয়স ও ও বেতনের পরিমাণ ইত্যাদি সারবান তথ্যে ডাইরীর পাতা ভরিয়া তুলিল; এবং সহরের এত বাড়ী থাকিতে এই জঙ্গলের মধ্যে পোড়োবাড়ীতে বাস করিবার হেতু পুনঃ পুনঃ বনমালীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল না। পরম দুঃখের উপর বনমালীর উদ্বেগের শেষ রহিল না; প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় পুলিসের থানা ও উকীলের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিয়া সে হায়রান হইয়া পড়িল।

কিন্তু সাবিত্রীর খোঁজ হইল না। সকলের উৎসাহ তৈলহীন প্রদীপের মত ক্রমে নিস্তেজ হইয়া শেষে নির্ব্বাপিত হইল। এবং বৎসর খানেক পর সাবিত্রীর কথা হয়তো কাহারও বিন্দুবিসর্গ মনে রহিল না।

শুধু বনমালীর বুকের মধ্যে অনির্ব্বাণ চিতা জ্বলিতে থাকে। চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া সাবিত্রী যেন তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছে। নিদ্রায় ও জাগরণে, বিশ্রাম ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে সাবিত্রীর অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণমুখ, অশ্রু ছলছল দুটি চক্ষু সে ক্ষণমাত্রও ভুলিতে পারে না। তাই বাহিরে অকরুণ সমাজ যখন সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে সাবিত্রীর মৃত নারীত্বকে ক্ষতবিক্ষত করে, বনমালী সভয়ে দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া সকলকে এড়াইয়া চলিতে চায়। কাহারও সহিত কথা বলিতে তাহার সাহস হয় না; কেহ ডাকিলে সে চমকিয়া উঠে; কাহাকেও চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিলে ভাবে বুঝি সাবিত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছে। স্কুলে কাহার সহিত সে মিশে না; টিফিনের ছুটির সময়ে যখন শিক্ষকেরা একসঙ্গে জটলা করে, বনমালী সকলের অলক্ষ্যে সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া বাহিরে একলা ঘুরিয়া বেড়ায়; স্কুলের শেষে বাড়ী ফিরিতে তাহার ইচ্ছা করে না; এখানে সেখানে ফিরিয়া রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরে। সৌদামিনী ও তাহার পুত্রকন্যাদের উপর তাহার বিতৃষ্ণার অন্ত নাই; তাহাদের সাহচর্য্য যেন তাহার পরমায়ুকে ক্ষয় করে। সৌদামিনীর সমস্ত অত্যাচার এখন তাহার উপরেই পড়িয়াছে। কিন্তু সে নীরব ঔদাসীন্যের দ্বারা সমস্ত অত্যাচারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সৌদামিনী অসহ্য ক্রোধে মাতামাতি করিতে থাকে, কিন্তু বনমালীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

এমনি করিয়া বৎসর কয়েক কাটিল। একদিন রাত্রে বনমালী আহারে বসিয়াছে, এমন সময়ে সৌদামিনী কাছে আসিয়া বসিল। সচরাচর তাহাকে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখা যায় না; কাজেই ইহার পশ্চাতে কোন গূঢ় অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বনমালী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সৌদামিনী কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার কপাল ফিরেছে গো, আর পণ্ডিতী করে খেতে হবে না।" বনমালী সপ্রশ্ন ও সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। সৌদামিনী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমায় মেয়ে যে এই সহরেই ব্যবসা সুরু কোরেছে—" বনমালীর হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিয়া যেন গলায় আটকাইয়া গেল; কষ্টে ঢোক গিলিয়া কহিল, "কে বললে?" সৌদামিনী বলিল, "বলছিলো আমাদের ঝি, বাজারে নাকি কার কাছে শুনেছে—" প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বনমালীর মনে হইল, সৌদামিনী যেন একটা বীভৎস পিশাচীর মত রাশি রাশি বিষাক্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া ঘরটাকে ভরাইয়া দিতেছে।

সৌদামিনী কহিতে লাগিল, "তাই ভাবছিলাম, এমনি তো মন পাওয়া যায় না, তারপর আবার রোজগেরে রূপসী মেয়ে!

আমাদের কি আর মনে ধরবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে বোধ করি পথে পথে ভিক্ষে কোরতে হবে।"

বনমালী অর্থহীন ভাবে সৌদামিনীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত ঘরটা 'নাগর-দোলা'র মত ঘুরিতে লাগিল; দেহটা পাথরের মতো কঠিন ও নির্জ্জীব হইয়া আসিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের জন্য বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ রহিল না। আহারের স্পৃহা বাষ্পের মতো উড়িয়া গেল এবং অভুক্ত অন্ন ফেলিয়া দিয়া বনমালী টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল।

রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রাহীন চক্ষে বনমালী আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। একী অপরিসীম লজ্জা! তাহার কন্যা তাহারই চক্ষের সম্মুখে দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে, ইহা তাহাকে প্রতিদিন শুনিতে হইবে, হয় তো বা কোনদিন দেখিতে হইবে। নিষ্ঠুর শ্লেষ সুতীক্ষ্ণ শরের মতো সর্ব্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া অনুক্ষণ বিদ্ধ করিতে থাকিবে; আত্মমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা ধূলায় লুটাইতে থাকিবে; নীরবে নত মস্তকে সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যাহারা সাবিত্রীর দেহকে পণ্য বস্তুর মতো ভোগ করিবে, তাহারা তাহাকে সাবিত্রীর পিতা বলিয়া চিনিয়া নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিবে; হয়তো তাহাকে শোনাইয়া সাবিত্রীর রূপ ও যৌবনের তারিফ্ করিবে। নির্ব্বোধের মত অর্থহীন দূরদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে হইবে; কানের ভিতরটা পুড়িয়া খাঁক হইয়া গেলেও নির্ব্বিকার ভাবে তাহা শুনিতে হইবে। গগনস্পর্শী লজ্জার ভারে সমস্ত মাথাটা যখন নুইয়া পড়িয়া অন্ধকার গৃহকোটরে লুকাইতে চাহিবে, তখনও নিজের ও স্ত্রী পুত্রকন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দিবালোকে বাহির হইতে হইবে—নির্ল্লজ্জের মত মাথা তুলিয়া সকলের মাঝে চলাফেরা করিতে হইবে।

এই বিড়ম্বনাময় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ, লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ। অন্ধকারে দুই হাত জোড় করিয়া বনমালী ভগবানের নিকট মরণ প্রার্থনা করিল। সুখী জনের সখের মরণ প্রার্থনা নহে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, হে ভগবান আজিকার এই নিদ্রা হইতে যেন দিবালোকের মধ্যে আর জাগিয়া না উঠি।

বনমালী আবার ভাবিতে থাকে। দুই বৎসরের কচি শিশু সাবিত্রী তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে, অকলঙ্ক নিষ্পাপ শিশু—লক্ষ্মীর প্রাণাধিক—প্রিয়তমা কন্যা। স্বামী ও স্ত্রী পরামর্শ করিয়া নাম রাখিয়াছিল সাবিত্রী; অকালবৈধব্যে এবং তদুপরি দুর্গতির চরম সীমায় নামিয়া সাবিত্রী সেই নামকে ব্যর্থ করিয়াছে; সাবিত্রী আজ গণিকা, সহস্রভোগ্যা; পুরুষের বক্ষে লালসার বহ্নি জ্বালাইয়া পলে পলে আপনাকে দগ্ধ করিতেছে সেই সাবিত্রী।

কিন্তু শুধু কি সাবিত্রীই অপরাধিনী? তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই? তাহার গৃহে সাবিত্রী কি কষ্ট না পাইয়াছে? দাসীর মত খাটিয়াছে অথচ পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই; পাইয়াছে অহর্নিশি নির্য্যাতন। অবশ্য সে নিজে কোন অত্যাচার করে নাই, কিন্তু সাবিত্রীকে অত্যাচার হইতে রক্ষাও করে নাই। সাবিত্রীর কৃশ, ম্লান মুখখানি তাহার চক্ষের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিয়া যেন নীরবে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

সহসা বনমালীর ইচ্ছা হইল সে সাবিত্রীর কাছে যাইবে; তাহাকে বুকে করিয়া ফিরাইয়া আনিবে, বলিবে, 'মাগো! যে অপরাধ করিয়াছি তাহার শাস্তি খুব দিয়াছিস্, বুড়ো বাপ্‌কে ক্ষমা কর—ফিরিয়া আয়!'

পরদিন প্রভাত হইতে বনমালীর মনের মধ্যে আসন্ন প্রিয়-সমাগমের একটি আনন্দ ও বেদনাময় সুর বাজিতে লাগিল। সারাদিন সে কাহারও সহিত কথা কহিল না, কোন কাজে মন দিতে পারিল না। সাবিত্রীকে আজ দেখিতে পাইবে সেই চিন্তা আর সব কিছু চিন্তাকে ছাপাইয়া সমস্ত অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিল। মনে মনে অবিরাম এই কথা বলিতে লাগিল, 'সাবিত্রী যে দিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল সে দিন যেমন সেই নবজাত শিশুকে সমস্ত ক্লেদ ও গ্লানি হইতে নির্ব্বিচারে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলাম, আজিও তেমনই কোন দ্বিধা না করিয়া, কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া, তাহাকে সমস্ত পঙ্কিলতা হইতে অকুণ্ঠিত ভাবে বক্ষে তুলিয়া লইব।'

সহরের বড় রাস্তা হইতে একটি সরু গলি যেখান হইতে পতিতা পল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে বনমালী সেখানে উপস্থিত হইল। গলিটার মাথাতেই একটা দোকান; দোকানী একটা চৌকীর উপরে বসিয়া ফুলুরী ভাজিতেছে; বিশ্রী তেলের গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভরপুর; দোকানে একটা গ্যাসের আলো, সামনে ভিড় করিয়া কতক-গুলা স্ত্রী ও পুরুষ জটলা করিতেছে। বনমালী সেখানে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, কি যেন ভাবিল, তারপর দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল।

স্বল্পালোকিত অপরিসর পথ; দুই পাশে ছোট ছোট ঘরের শ্রেণী; অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া পচা জলের নর্দ্দামা অকাতরে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। অধিবাসিনীরা কেহ ঘরের মধ্যে প্রসাধনরতা, কেহ বা ঘরের সামনে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া বসিয়া রাস্তার অপর পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীর সহিত রসালাপ-মগ্না। কোনও ভাগ্যবতীর গৃহে ইহার মধ্যেই বিকিকিনি সুরু হইয়া গিয়াছে; অপটু কণ্ঠের কদর্য্য সঙ্গীত, নৃত্যচঞ্চল চরণের নুপুরনিকণ, মত্ত পুরুষের পরুষ কণ্ঠের চীৎকার ভাগ্যহীনা প্রতিবেশিনীর নিষ্ফল রূপসজ্জাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। বনমালী দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে তাহার সাবিত্রী কোথায়? কোথায় সে সর্ব্বাঙ্গে রূপের দীপালি

জ্বালিয়া নয়নে নিবিড় আবেশ রচিয়া কামার্ত্ত পুরুষের মনোহরণ করিতেছে? এ রাস্তায় আলোর বালাই নাই; অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসে; দুই চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া বনমালী চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়িগলি পঞ্জরাস্থির মত রাস্তা হইতে বাহির হইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সব গলিতে ঢুকিতে বনমালীর ভয় করে, যেন সর্পের বিবর; প্রবেশ করিলেই হিমশীতল ক্লেদাক্ত বন্ধন সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিবে। তবু বনমালী অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে থাকে; দুই পাশে ছোট ছোট খোলার ঘর; প্রতিদ্বারে কান পাতিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরকে খুঁজিয়া ফিরে। কখনও বা প্রতীক্ষমানা কোন বারবনিতার কাছে গিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কেহ উপহাস করে, কেহ গালাগালি দেয়, কোন কৌতুক-পরায়ণা হয় তো টানিয়া ঘরে ঢুকাইতে চায়। বনমালী দুই বিস্ময়পরিপূর্ণ চক্ষু চপলা রমণীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলে, "মাগো, তুই-ই কি আমার সাবিত্রী?" বারাঙ্গনা সলজ্জে জিভ কাটিয়া হাত ছাড়িয়া দেয়; প্রশ্ন করে, "সাবিত্রী কে ঠাকুর? সে কী তোমার মেয়ে?" বনমালী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, "হ্যাঁ মা, আমার মেয়ে, এখানে আছে।" রমণীর দুই হাত ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে, "মাগো, তুই জানিস কোথায় আমার সাবিত্রী?" মেয়েটি হয় তো সাবিত্রীকে চেনে না, তাহার সঙ্গে যায়, ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করে; কেহ হয় তো সংবাদ দিতে পারে না—বনমালী আগাইয়া চলে।

এমনি করিয়া বনমালী সাবিত্রীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। পরিশেষে অদূরে একটি মেয়েকে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা গলির মাথায় মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে; হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে; তাহার সামনে দাঁড়াইয়া একটা লোক, বোধ করি মাতাল। তাহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া মেয়েটি কথা কহিতেছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে বনমালীর মনে হইল, এই মেয়েটি হয়তো সাবিত্রী, তেমনি গঠন, তেমনি মুখের ডৌল। তবু সাবিত্রী বলিয়া ইহাকে চিনিতে বাধে। বনমালীর অন্তরের মধ্যে যে সাবিত্রী শান্ত, সকরুণ, সর্ব্বহারা মূর্ত্তিতে অহরহ বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত এই মেয়েটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহার মাথার চুলে, চোখে মুখে, বাহুতে, বক্ষে ও সর্ব্বদেহে ক্ষয়িষ্ণু যৌবনকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কি নির্লজ্জ প্রয়াস! সুকেশী নহে, অথচ কত যত্নে পরিপাটী করিয়া কবরী রচিয়াছে; চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে, হয় তো চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, তবু দুই চক্ষে সযত্নে কাজল-রেখা আঁকিয়াছে; শুষ্ক ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়াছে, লাবণ্যহীন শীর্ণ দেহকে রঙ্গীন বসনে ঢাকিয়াছে এবং অলক্তকরসে চরণ দুইটি রাঙ্গা টুকটুকে করিয়াছে। এই হাস্যচঞ্চলা, সুসজ্জিতা, ছলনাময়ী নারীর মধ্যে নিরাভরণা, লাজনম্রা, ম্লানমুখী সাবিত্রীর সন্ধান কোথায়! অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বনমালী সেই মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি তখনও হাসিতেছে; বোধ করি সে ভাবে হাসিলে তাহাকে ভাল দেখায়; লোকটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিতেছে, "ঘরে আয় না ভাই? রাস্তায় দাঁড়িয়ে মস্‌করা করিস কেন?" লোকটা ঘাড় নাড়িয়া স্খলিত কণ্ঠে বলে, "উঁহু না—ঘরে ঢুকছি না বাবা! আগে দরদস্তুর ঠিক হোয়ে যাক্।" মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, লোকটার গা ঘেঁসিয়া দাড়ায়, মুখের কাছে মুখ লইয়া আসে; আশা করে, তাহার কেশের সুরভি, সদ্যস্নাত দেহের স্নিগ্ধতা, অর্দ্ধাবৃত বক্ষের মাদকতা লোকটাকে মুগ্ধ করিবে। লোকটার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলে, "তুই যে ভারী হিসেবী হোয়েছিস্ রে?" লোকটা বিন্দুমাত্র কাবু হয় না, বেপরোয়া ভাবে বলে, "হিসেবী আর কি? বাজারে এসে দরদস্তুর কোরে জিনিস নেব না? যেমন যেমন জিনিস, তেমনি তেমনি দাম; সোনার দরে গিল্‌টি নেব কেন বাবা?" বলিয়া নিজের রসিকতায় হি হি করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে। মেয়েটির মুখ মুহূর্ত্তের জন্য কালো হইয়া উঠে; পর মুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলে, "চল্ ঘরে চল্—তোর সঙ্গে আবার দরদস্তুর কি ভাই?" হঠাৎ অন্ধকারে দণ্ডায়মান বনমালীর দিকে তাহার নজর পড়ে, বলে, "কে ভাই দাঁড়িয়ে, দেখ তো এগিয়ে?" লোকটা বনমালীর দিকে তাকাইয়া বলে, "কে বাবা, কুঞ্জের দ্বারে ঘুর্ ঘুর্ করছ?" বলে, "খসে পড় বাবা—এগিয়ে দেখ", বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলে, "এখানে আজ ঢু ঢু ইজ দি।"

বনমালী এতক্ষণ নিঃশব্দে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। মেয়েটি যে সাবিত্রী নহে এ সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গভীরতম পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও সাবিত্রীর সমস্ত চিত্ত মুক্তি-প্রত্যাশায় পঙ্কজিনীর মতো নির্ণিমেষে ঊর্দ্ধাকাশপানে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ মেয়েটির মধ্যে সে ব্যাকুল প্রত্যাশা কই? পূতিগন্ধি পারিপার্শ্বিকতার উপরে কোথায় তাহার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা? এ তো পঙ্কিল পল্বলের মধ্যে শূকরিণীর মতো পরম উল্লাসে গড়াগড়ি দিতেছে! তাহার সমস্ত অন্তর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, এ আমার সাবিত্রী নয়—হইতে পারে না"—বনমালী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মেয়েটি আগাইয়া কহিল, "আয় না রে, দেখ্ না।" লণ্ঠনটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "কে গো, এদিকে এগিয়ে এস না?" সেই লণ্ঠনের আলোকে তাহার মুখের চেহারা পরিপূর্ণ ভাবে বনমালী দেখিতে পাইল। কে যেন তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া তাহার কানের কাছে চীৎকার করিয়া কহিল, "দেখ্, দেখ্, এইই তোর সাবিত্রী।" অপরিসীম ব্যথায় বনমালী

চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবিত্রী"! দুই চোখ দুই হাত দিয়া সজোরে মুদ্রিত করিয়া, পিছন ফিরিয়া টলিতে টলিতে সে ছুটিতে লাগিল। বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "ছিঃ ছিঃ এই আমার সাবিত্রী!" লোকটা বেয়াড়া গলায় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "পাগল! চলে আয়।" সাবিত্রী প্রস্তর-প্রতিমার মত তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্ধকারে অপস্রিয়মাণ বনমালীর মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিল। •

বনমালী ছুটিতে লাগিল। চাহিতে সাহস করিল না—পাছে সাবিত্রী আবার চোখে পড়ে। তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথার মধ্যে জড়ো হইয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল এবং সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তবু জড়প্রায় পা দুইটা টানিয়া টানিয়া চলিতেই লাগিল এবং কখন যে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সম্বিৎলাভ করিয়া বনমালী বুঝিতে পারিল, সে একটা বেঞ্চির উপরে শুইয়া আছে। চোখ খুলিয়া দেখিল, মোড়ের সেই গ্যাসের বাতিওয়ালার দোকান, চারিদিকে লোকের ভিড়। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া কে একজন ভক্তিভরে কহিল, "প্রভো! ধ্যানভঙ্গ হোল কি?" দূরে কে কহিল, "আমাদের স্কুলের পণ্ডিত না? এ সব বিদ্যেও আছে নাকি?" কে উত্তর দিল, "দেখতে ভিজে বেড়ালটি হোলে কি হবে মশাই—ডুবে ডুবে জল খান।" একজন মাতাল ধমক দিয়া কহিল, "এ্যাই, চোপরাও! বেটা লোক চেন না? উনি সাধুলোক—আমার ইষ্টিগুরু, এ পাড়ার সকলের ইষ্টিগুরু। শিষ্যের কাছে নিন্দে কোরলে গলাটি টিপে মুচড়ে দেব," বনমালীর কাছে আসিয়া কহিল, "গুরুদেব, এক পাত্তর অমৃতের হুকুম হোক্"। বনমালী উঠিয়া বসিল, লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। দোকানী কহিল, "কি পণ্ডিত মশায়, হেঁটে যেতে পারবেন, না, গাড়ী ডেকে দেব?" বনমালী উঠিয়া দাঁড়াইল, টলিতে টলিতে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল; পিছনে কটু ইঙ্গিত মুখে মুখে ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও শুনিতে বাকী রহিল না যে, সহরের হাই-স্কুলের হেড পণ্ডিত বেশ্যাপল্লীতে মাতাল হইয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া ছিল, সকলে ধরাধরি করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াছে। সহরের লোক ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতের এই কাণ্ড! ভদ্রলোকেরা দল বাঁধিয়া স্কুলের সেক্রেটারী ও হেডমাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বৈঠক বসাইয়া স্থির করিল, বনমালীকে অবিলম্বে তাড়ানো হোক্, নচেৎ স্কুলের মঙ্গল নাই।

বনমালীর বাড়ীতে সৌদামিনীর কানে যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছিল। সৌদামিনী তুড়িলাফ খাইতে লাগিল। একটা চেলা কাঠ হাতে করিয়া সাধ্বী সতী স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। কিন্তু বনমালী সকালেই কোথায় বাহির হইয়া গেছে; তাহার দেখা মিলিল না। কাজেই বেচারী বনমালীর অভাবে ছেলেগুলাকে ঠেঙ্গাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে লাগিল।

বনমালী বাড়ীতে না ফিরিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। শিক্ষকেরা তাহাকে দেখিয়া কেহ মুচকিয়া হাসিল, কেহ বা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত দৈহিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ক্লাশে ঢুকিতেই বিদ্যুৎ-বার্ত্তার মতো কি ইঙ্গিত ছেলেদের চোখে খেলিয়া গেল। টিফিনের ছুটির সময়ে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সহকারী শিক্ষকদের লইয়া বনমালীর সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বনমালী রাস্তার পাশে একটা ঝাউ গাছের নীচে বসিয়া, শুষ্কমুখে সম্মুখে দিগন্তব্যাপী রৌদ্রদগ্ধ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। উপর ঝাউ গাছের পাতাগুলা অবিশ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বায়ু মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে খাইতে, ধুলা বালি খড় ও পাতা উড়াইতে উড়াইতে, ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে সুদূর আকাশ হইতে চিলের তীক্ষ্ণস্বর কানে আসিতে লাগিল। বনমালী স্তব্ধভাবে বসিয়া বসিয়া গত রাত্রির কথা ভাবিতে লাগিল—"কেন চলিয়া আসিলাম? আমি তো সাবিত্রীকে হীনতম গ্লানি হইতে অকুণ্ঠিত চিত্তে বুকে তুলিয়া লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম? তবে ভীরুর মত পালাইয়া আসিলাম কেন?" কাল রাত্রি হইতে আজ সারা সকাল সে এই কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াছে এবং এখনও সেই চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল।

স্কুলের ছুটির পর হেডমাষ্টার মহাশয় বনমালীকে আফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং যথারীতি দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধ সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ বনমালীকে শিক্ষকতা হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। বনমালী নির্ব্বিকার ভাবে এ সংবাদ শুনিল, বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, পুনর্ব্বিবেচনার জন্য একটিবারও অনুরোধ করিল না; জানাইল না যে, পরদিন হইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়া জীবিকার্জ্জনের আর কোন উপায় তাহার রহিল না। শুধু ভাবলেশহীন মুখে হেডমাষ্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হেডমাষ্টার মহাশয় তাহার হাতে নোটের একটি ছোট বাণ্ডিল দিয়া স্কুল হইতে তাহার সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিলেন। বনমালী তাহা পকেটে পুরিয়া এবং হেডমাষ্টার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছুপরে বনমালী সাবিত্রীর দরজায় পৌছিল। দরজা ঠেসান ছিল, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। সামনেই এক টুকরা ছোট উঠান, তাহা পার হইলেই ছোট বারান্দা-যুক্ত খড়ের চাল-ওয়ালা মাটীর ঘর। সমস্ত উঠানটা তরল অন্ধকারে ভরিয়া গেছে; এখনও আলো জ্বালা হয় নাই।

বনমালী উঠানে দাঁড়াইয়া দেখিল, সেই অন্ধকারে বারান্দায় মেঝের উপর সাবিত্রী উপুড় হইয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। কোথায় তাহার বেশভূষার পারিপাট্য! কোথায় তাহার হাস্যোজ্জ্বল লীলাকৌতুক! রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলা কতক পিঠে কতক মাটীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রিক্তাভরণ, শীর্ণ দেহ; মলিন বসনাঞ্চল মাটীতে লুটাইতেছে। আজ আর তাহাকে সাবিত্রী বলিয়া চিনিতে বাধে না। তাহার মাথার কাছে আসিয়া বনমালী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী মাথা তুলিল না। বনমালী ডাকিল, "সাবিত্রী!" সাবিত্রী মুখ তুলিল; কাল সারারাত্রি, আজ সমস্ত দিন সে কাঁদিয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মুখ চোখ ফুলিয়া গেছে। সাবিত্রী ডাকিল, "কে? বাবা?" তারপর দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবাগো! এতদিন পরে হতভাগীকে মনে পড়ল?" বনমালী সাবিত্রীর মাথার কাছে বসিয়া তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইল এবং একদা ক্রন্দনমানা শিশু সাবিত্রীকে যেমন করিয়া শান্ত করিত, আজও ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রীর মুখে, মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার কোলে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; বনমালীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নিঃশব্দে নামিয়া সাবিত্রীর মাথার চুলকে সিক্ত করিতে লাগিল। এমনি করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সাবিত্রী ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। বনমালী কহিল, "মা, আমি তোকে নিতে এসেছি।" সাবিত্রী কোন কথা বলিল না, তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। বনমালী কহিতে লাগিল, "সমাজ, সংসার, আমি কাউকে মানব না; তোকে নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব। আমার বয়স হয়েছে, বোধ করি মরণেরও বেশী দেরী নাই। তোর কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চাই, মা।" সাবিত্রী তেমনিভাবেই থাকিয়া কহিল, "মায়ের মত হয়েছে?" বনমালী কহিল, "তার মতের তো কোন প্রয়োজন নাই, মা। সে যখন আমাদের মুখের দিকে তাকায় নি, আমরাও তার মুখের দিকে তাকাব না।" সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, তা হয় না; তোমাকে ছন্নছাড়া করতে আমি পারব না। বাবা, তুমি ফিরে যাও। এক মরণ ছাড়া কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

বনমালী কহিল, "মা, তোর কোন ভাবনা নাই। তোর মা আর ছেলেদের সব ব্যবস্থা আমি করব। তোর সঙ্গে থাকতে চায় ভাল, না হয়, দেশে পাঠিয়ে দেব। তাদের কোন কষ্ট হবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাবিত্রী কহিল, "কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?" বনমালী কহিল, "যেখানে হোক্, শুধু এখানে আর নয়।" সাবিত্রী বোধ করি মৃদু হাসিল, কহিল, "বাবা, সমাজ কি শুধু এখানেই? সারা দেশ জুড়ে, সমস্ত মানুষের মনের মধ্যে সমাজ। এক পশুপক্ষী ছাড়া কে আমাকে ক্ষমা কোরবে? বাবা, তুমি এখনও তেমনি ছেলে-মানুষ আছ।" এই কয়েক বৎসরে সাবিত্রীর বয়স যে কত বাড়িয়াছে তাহা মূর্খ বনমালী জানিবে কি করিয়া?

সাবিত্রী উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে বনমালীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "বাবা, তুমি ভারী কাহিল হয়ে গেছ।" মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার জন্য খুব ভাবতে, না বাবা?" বনমালী কহিল, "আমার যে কি করে দিন কেটেছে তা আমিই জানি। তোকে আজ না নিয়ে আমি যাব না। আমি বুঝেছি মা তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।" সাবিত্রী বনমালীর আরও কাছে সরিয়া আসিল, কহিল, "বাবা! তোমাকে এমন করে আমি কখনও পাই নি; জানতাম তুমি আমায় স্নেহ করো। কিন্তু যে এতখানি স্নেহ কর তা কোন দিন ভাবিনি। এই হতভাগীর জন্যে তুমি নরকের মধ্যে এলে বাবা?" বনমালী সাবিত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। সাবিত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি আর বেশীদিন বাঁচব না। এই কয়দিনে অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি; অতি বড় শত্রুর জন্যও তা আমি কামনা করি না; শুধু তোমাকে দেখবার জন্যে আমার এখানে আসা। এই নরকের মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাব, কে আমায় বলে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু দেখা তো পেলাম। আর আমার কোন আশা নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।" বলিতে বলিতে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। বনমালী সাবিত্রীর শীর্ণ মুখখানি তুলিয়া কহিল, "মাগো! তোর কি হয়েছে? তোকে আমি নিয়েই যাব মা। অমত করিসনে। সাধ্য হয় বাঁচাবো—আর যদি মরিস্ তো আমার কোলেই মরবি।" অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাবিত্রী বলিতে লাগিল, "আমাকে তুমি নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। বিধাতা আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, নিজে জ্বলে পুড়ে মরছি। যার কাছে যাব তাকেও জ্বালিয়ে মারব। এজীবনে অনেক দুঃখ পেলাম, আর কারও অভিশাপ কুড়োতে চাইনে। বাবা! তুমি কিছু মনে কোরো না, অভাগীর উপরে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ রেখো না। যাবার উপায় থাকলে আমি যেতাম। তোমার সঙ্গে যেতে না পারা যে আমার কতবড় দুর্ভাগ্য তা যারা আমার মতো অভাগী তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা! তুমি ফিরে যাও, মনে কোরো সাবিত্রী মরে গেছে।"

বনমালী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "তা আমি যে মনে করতে পারি না মা—আমার সমস্ত বুক জুড়ে তুই যে বসে আছিস্।"

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতে লাগিল, সাবিত্রীকে কোনমতে সম্মত করিতে না পারিয়া বনমালী কহিল, "তবে আমি যাই মা, আর বোধ হয় দেখা হবে না—" সাবিত্রী উৎকণ্ঠিতা

হইয়া কহিল, "সে কি বাবা!" বনমালী কহিল, "তুই পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকালি না, আর কেন?" সাবিত্রী হাসিল, ছেলেকে অবুঝ দেখিয়া মা যেমন করিয়া হাসে ঠিক তেমনি হাসিল—অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইল না, উঠিয়া দরজার দিকে চলিল। সাবিত্রী পাছু পাছু চলিল। দরজায় দাঁড়াইয়া বনমালী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; কি যেন ভাবিল; তার পর স্কুল হইতে যে নোটের বাণ্ডিল পাইয়াছিল, তাহা সাবিত্রীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া সাবিত্রী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনমালী যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেছে, দ্বারে আঘাত করিয়া ডাক দিল, "দরজা খোল।" কাহারও নিদ্রাভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল না; পুনঃ পুনঃ ডাক দিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ হইল—বোধ করি, সৌদামিনী উঠিয়া শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিল। অনতিবিলম্বে সৌদামিনীর কণ্ঠধ্বনি বনমালীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। "কে?" বনমালী কহিল, "আমি। দরজাটা খুলে দাও।"

সৌদামিনী সেইখানে দাঁড়াইয়া কহিল, "এত রাত্রে এখানে মরতে এলে কেন? সারাদিন যে চুলোতে মরছিলে সেখানে জায়গা হোল না? বনমালী কহিল, "আগে দরজাটা খুলে দাও।"

বনমালীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সৌদামিনী কহিল, "দরজাটা খুলে দ্যাও"—কণ্ঠস্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া কহিল, "কে তোমার মাইনে করা বাঁদী আছে শুনি, যে রাত দুপুরে দরজা খুলে দেবার জন্যে বসে আছে?"

বনমালী নিরুত্তর, ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় তাহার ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত দেহ টলিতেছিল, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। সৌদামিনী হাঁক দিয়া কহিল, "হতচ্ছাড়া, বুড়ো মিন্‌সে! সারারাত্রি নটীর বাড়ীতে কাটিয়ে রাত দুপুরে ফিরে কেতার্থ করেছেন—ওঁকে দরজা খুলে দিতে হবে, পা ধুয়ে বাতাস করতে হবে"—ক্রোধ বাড়িয়া উঠে, দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহে, "দেব, মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব, ঝাটায় বিষ ঝেড়ে দেব। চলে যাও কে তোমার কোথায় আছে—রাত দুপুরে মাতলামী করতে হবে না।" বনমালী ডাকিয়া কহিল,—"ও ঝি, দরজাটা খুলে দাও তো?" সৌদামিনী ধমকাইয়া কহিল, "কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দেখি যে দরজা খুলে দ্যায়।" কহিল, "এখানে মাতালের যায়গা নয়—চলে যাও। ও মুখ আর দেখিও না—গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যাও—আমার হাড় জুড়োক্।"

আবার দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে আসিল। সৌদামিনী বোধ করি শুইয়া পড়িল। সব নিঃস্তব্ধ, দূরে একটা গাছের উপরে কতকগুলা পেচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল।

বনমালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে চলিয়া আসিল।

অন্ধকার রাত্রি, রাস্তা জনমানবশূন্য। শুধু মধ্যে মধ্যে রাস্তার পাশে দু একটা কুকুর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। বনমালীর পদশব্দ শুনিয়া তাহাদের কেহ কেহ ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বনমালী টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল। সমস্ত দিন কণামাত্র অন্ন, বিন্দুমাত্র জল পেটে যায় নাই, সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, পা দুইটা আর চলিতে চাহিতেছে না; মনে হইতেছে, পথের ধারেই কোথাও সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে, তবু চলিতে লাগিল। কোথায় যাইতে হইবে, জানা নাই। শুধু চলা আর ভাবা—পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই; স্ত্রী তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, সাবিত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সমাজ তাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া জানিয়াছে। এক মরণ ছাড়া তাহার আর কোন আশ্রয় নাই। সৌদামিনী বলিয়াছে, সে মরিলে তাহার হাড় জুড়াইবে।···হাঁা, সে মরিবে। বাঁচার কোন প্রয়োজন তো নাই! ছেলেপিলে? তা' সে বাঁচিয়া থাকিয়াই তাহাদের কি করিবে? তাহাদের দুর্দ্দশা চোখে দেখার চেয়ে মরণই তো ভাল।

বনমালীর ভাবনার অন্ত নাই। ক্ষুৎপিপাসার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে এবং গতি দ্রুততর হইয়া আসিতেছে। জীবনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই, সুখের আশাও নাই; লক্ষ্মীর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সুখ ও শান্তির শেষ হইয়াছে। লক্ষ্মীর কথা বনমালীর মনে পড়িল—সুন্দরী, কল্যাণময়ী লক্ষ্মী—রূপে, গুণে সার্থকনাম্নী লক্ষ্মী—তাহার যৌবন শ্রীমণ্ডিত, শান্ত, কোমল মূর্ত্তি বনমালীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বনমালী হাসিয়া কহিল, "আজ শেষের দিনে দেখা দিতে আসিয়াছ—এতদিন তো মনে পড়ে নাই"—ম্লান, করুণ হাসি হাসিয়া সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। বনমালী ভাবিতে লাগিল—মরিতেই হইবে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহাকে যেন দংশন করিতেছে। এতদিন কি করিয়া বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইল। ভাবিয়া দেখিল, তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কম নয়। এই পঞ্চাশ বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত্ত পার হইয়া তাহার হৃদয় রক্তাক্ত হইয়াছে; আর মুহূর্ত্তের বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছে না; যেখানে হোক্, যেমন করিয়া হোক্ এখনই তাহাকে মরিতে হইবে। সহসা তাহার মনে হইল, কে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে; কাহার পদশব্দ সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল। পিছনে তাকাইল, কে যেন সরিয়া গেল; আবার চলিতে লাগিল, আবার সেই পদ-শব্দ; খুব কাছে, ঠিক যেন তাহার পাশেই, তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস

তাহার গায়ে লাগিতেছে, কেশের সুরভি যেন নাকে আসিতেছে। বনমালী আর তাকাইল না—পাছে সে চলিয়া যায়। সে যেন এই অদৃশ্যচারিণীর সঙ্গ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, লক্ষ্মী আসিয়াছে—তাহাকে লইতে আসিয়াছে। ডাক দিল, "লক্ষ্মী!" কে যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বনমালীও হাসিয়া কহিল, "নিতে এসেছ? আমি জানি, তুমি আসবে। ভারী কষ্ট পেয়েছি, লক্ষ্মী।"

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণাদ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দিয়াছে। তাহার ম্লান আলোকে অন্ধকার একটু ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে; বনমালী একটা মাঠের মধ্যে একটা ভাঙ্গা ঘরের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "লক্ষ্মী, কি করে মরব?" লক্ষ্মী কহে, "কেন সৌদামিনী……" বলিতে হইল না। বনমালীর মনে পড়িল সৌদামিনী গলায় দড়ী দিয়া মরিতে বলিয়াছে। গলায় চাদর ছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিল। দেখিতে পাইল ভাঙ্গা ঘরের পাশেই একটা কি গাছ রহিয়াছে। বনমালী জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া মাটীতে রাখিল, পকেটে কয়েকটা পয়সা বোধকরি পড়িয়াছিল, ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বনমালী ভাঙ্গা দেওয়ালে পা দিয়া গাছে উঠিল; চাদরটা পাকাইয়া এক প্রান্ত গলায় বাঁধিল এবং অন্য প্রান্ত একটা ডালে বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে পথচারী পথিকেরা রাস্তা হইতে দেখিতে পাইল— অদূরে ভাঙ্গা ঘরের পাশে একটা গাছ হইতে, পিছন ফিরিয়া মাথাটা একপাশে কাৎ করিয়া কে একটা লোক ঝুলিতেছে। তাহাদেরই একজন জামাটার কাছে গিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল এবং জামাটার পকেট হাতড়াইয়া পয়সাগুলি বাহির করিয়া লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

জীবনকে অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীর সীমা পশ্চাতে ফেলিয়া কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রালোকিত লোকলোকান্তর বিসর্পী মরণপথে বনমালী তখন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত একটি বাঙ্গালা কবিতা

বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় মাধ্যন্দিনী শাখা যজুর্ব্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে একটি কবিতায় সামশ্রমী মহাশয় স্বীয় পরিচয় এবং গ্রন্থ রচনার কিঞ্চিৎ ইতিহাস দিয়াছেন। কবিতাটি কথাভাষা আশ্রয় করিয়া সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত। শুধু ছন্দের দিক দিয়া নহে বিষয়বস্তুর হিসাবেও কবিতাটির কিছু মূল্য থাকিতে পারে। কবিতাটির মধ্যে ভাষায় এবং ভাবে যে quaint humour বা বিদ্রূপাভাস পাওয়া যায় তাহা বেশ উপভোগ্য। বঙ্গশ্রী পত্রিকার মারফতে সাধারণের অপরিচিত এই কবিতাটির সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় করিয়া দিতেছি। কবিতাটি নিম্নে যথাযথভাবে মূলের অনুগত করিয়া উদ্ধৃত করা হইল।

অনুবাদকের সংক্ষেপ পরিচয়
(অষ্টক)

গৌড়ে, কাল্না-সুরধুনি-তটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো,
সেই স্থানে, নরগুরুকুলে, রামকান্তো ছিলেনো।
পাটনা জেলা জজিয়তি পদে মান্যযুক্তো হলেনো
তাঁরী পুত্রো বহুগুণযুতো রামদাসো পিতা নো ॥১
চাক্‌রী কত্তেন ধনজন সুখী কিন্তু ভাব্‌তেন কি শেষে?
নানাশাস্ত্রে করি বিচরণো আর্য্যশাস্ত্র প্রবেশে।
হিন্দুস্থানী বুধগণ-সনে দাক্ষিণাত্যেরি সঙ্গে,
ভট্টাচার্জ্জীরো বহু শুনি কথা, বাঁধিলা ধী-কুরঙ্গে ॥২
বিপ্রে শূদ্রে সম, মনু বলেন্, যেই বিদ্যার্ অভাবে,
ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদিত ভুবনে, আর্য্য, যাহার্ প্রভাবে।
আর্য্যাবর্ত্তে ছিল সব ঘরে, পূজ্য যাহা শুনীও,
কালপ্রাপ্তে নগর মথিলে, নাহি মেলে পুথীও ॥৩
বঙ্গে দেশে বহু বুধজনে বেদ মেলে, ন মানে,
যারা মানে, ঘট-কলশবৎ বেদ-বেদান্ত জানে।
সন্ধ্যায়্ হোমে কতিপয় ঋচা পাঠ্য আছে যদীও,
দেষ্টা প্রষ্টা সমমতি হলে ইষ্ট তাহা কিবাও ॥৪
দেখে, শুনে, স্থিরমতি হয়ে লোভ অর্থেরি ছাড়ি,
কাশীবাসী সপরিজন হন্ রাখিয়া দীর্ঘ দাড়ি।
বিদ্যা, বেদে, অবিতথ হবে কেমনে আত্মজেরি,
চিন্তা,—চেষ্টা সতত করিলা, খর্চিয়া অর্থ ভূরি ॥৫
বেদে, অঙ্গে ছিনু ঢ়বি, কলা-বর্ষ তাঁরি প্রযত্নে,
গ্রন্থে গ্রন্থে অথ-ইতি করী পাইনূপাধিরত্নে।
গঙ্গাদ্বারে জয় করি সভা জম্বুরাজেরি হর্ষে,
নানাতীর্থ, ভ্রমি, কুতূহলে এনু কাশী সহর্ষে ॥৬
দেশে দেশে প্রথন-মননে ছাপিয়া শাস্ত্র রাশি,
তাতাজ্ঞাতে দৃঢ় করি মনঃ, প্রত্ন-পত্রি প্রকাশি।
রাজেন্দ্রেরী অভিমত হয়ে আসিয়া কল্কাতাতে,
যুক্তো হৈলাম্ ইডিটরি-পদে এসিয়াটিক্ সভাতে ॥৭
একাশী দ্বাদশশতসনে, লাট লীটন্-দয়াতে,
আরম্ভীনূ প্রকট করিতে বেদ বাঙ্‌লা কথাতে।
বন্যা, বাত্যা, বিবিধ দুরিয়া ভাসি সত্য প্রবাহে,
ছেষাশীতে ইতি কসি, যজু., সত্য-সামশ্রমী: হে! ॥৮ *

সাধারণ পাঠকের বোধসৌকর্য্যের জন্য এখানে কবিতাটির কিছু টিপ্পনী করিয়া দিতেছি। আ-, ঈ-, ঊ-, এ- এবং ও-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে। ছন্দের খাতিরে হসন্ত এবং অ-কারান্ত শব্দ বা পদকে দরকার মত ও-কারান্ত করা হইয়াছে। তাতাজ্ঞাতে = তাত + আজ্ঞাতে; পাইনূপাধিরত্নে = পাইনু + উপাধিরত্নে। কল্কাতাতে = কল্‌কাতাতে, কলিকাতাতে। ধাইগাঁ বর্ত্তমান সময়ে (রেলওয়ের মাহাত্ম্যে) ধাত্রীগ্রাম নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতা নো = পিতা নঃ, আমাদের পিতা। বাঁধিলা ধী-কুরঙ্গে = স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। বঙ্গে দেশে = বঙ্গদেশে; ছন্দের খাতিরে 'বঙ্গ' পদ সংস্কৃতের মত সপ্তম্যন্ত করা হইয়াছে। ন মানে = মানে না। ঋচা = ঋক্ মন্ত্র। কলা-বর্ষ = ষোড়শ বৎসর। অথ-ইতি = আদ্যন্ত। প্রত্ন-পত্রি = প্রত্নকম্রনন্দিনী নামক বৈদিক পুরাতত্ত্বঘটিত সাময়িক পত্র। রাজেন্দ্রেরী = রাজেন্দ্রলাল।

সামশ্রমী মহাশয়ের রচনার পরিচয় ভবিষ্যতে দিবার বাসনা রহিল।

—শ্রীসুকুমার সেন

* মন্দাক্রান্তা ছন্দে পাঠ করিতে হইবে।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গোলাকার ডানাযুক্ত অভিনব এরোপ্লেন

কয়েকদিন পূর্ব্বে চিকাগো সহরে এক অদ্ভুত এরোপ্লেনের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনটির বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য এরোপ্লেনের মত ইহার লম্বা ডানা নাই। ডানার পরিবর্ত্তে একটি গোলাকার ছাদ সংযুক্ত আছে। গোলাকার ছাদটিই ডানা ও প্যারাশুট উভয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। এই অভিনব এরোপ্লেন ১১০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ওয়ার্ণার মোটরের সাহায্যে দুই জন লোক লইয়া ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে ছুটিতে পারে। এরোপ্লেনকে উপরে নীচে চালাইবার জন্য গোলাকার ডানার মধ্যেই চালকের আয়ত্তে 'এলিভেটরে'র ব্যবস্থা আছে। উপর হইতে ৬৫ ডিগ্রীতে নীচুদিকে মুখ করিয়া প্রায় ২৫ ফুট পাক দিয়া অতি সহজেই ভূমিতে অবতরণ করিতে পারে। পরীক্ষার সময় এরোপ্লেনটি খুব উঁচু হইতে প্যারাসুট অপেক্ষাও আস্তে আস্তে সোজাসুজি নীচে নামিয়াছিল। পাক দিয়া নামে নাই।

গোলাকার ডানাযুক্ত এরোপ্লেন।

ঘণ্টায় ৩০০ মাইল গতি শক্তিবিশিষ্ট মোটরগাড়ী

কিছুদিন পূর্ব্বে মোটরদৌড়ের জন্য বিখ্যাত ইংরেজ সার ম্যালকম্ ক্যাম্বেল তাঁহার নিজের পরিকল্পিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততম গতি শক্তিবিশিষ্ট 'ব্লু-বার্ড' নামক মোটরগাড়ীতে ঘণ্টায় ২৭২ মাইল ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কোন স্থলযানে এত অধিক বেগে ভ্রমণ করিতে পারেন নাই। নীচে তাঁহার মোটরগাড়ী 'ব্লু-বার্ডে'র ছবি দেওয়া হইল। সম্প্রতি সার ক্যাম্বেল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক শক্তিশালী বর্ত্তমান 'ষ্ট্রীমলাইনিং' প্রথায় আর একখানি অদ্ভুত মোটরগাড়ী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছেন। দ্বিতীয় চিত্রে এই গাড়ীর ছবি দেওয়া হইল। আগামী আগষ্ট মাসে উটা নামক স্থানের শুষ্ক লবণ-হ্রদের বালির উপর তিনি এই গাড়ীর গতিবেগ প্রদর্শন করিবার আশা করেন। গাড়ীখানি মিনিটে পাঁচ মাইল
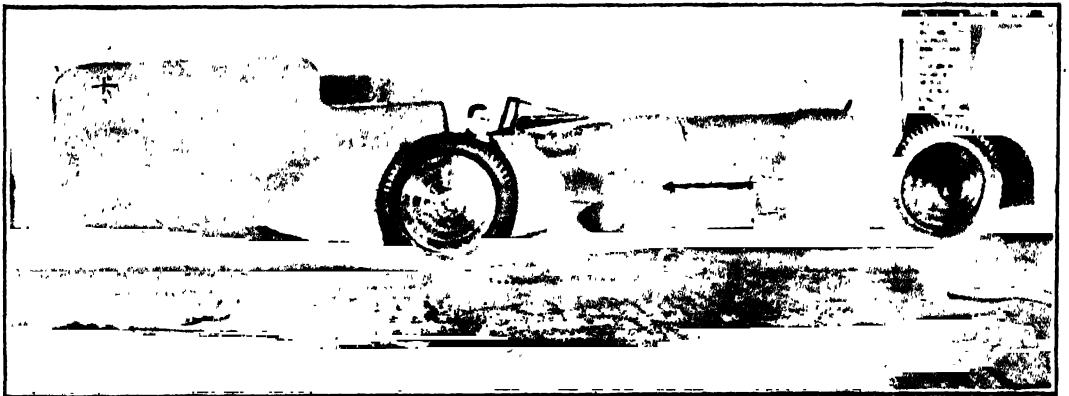
ক্যাপ্টেন ম্যাল্‌কলম্ ক্যাম্বেলের অতিদ্রুতগতি সম্পন্ন মোটর-কার "ব্লু-বার্ড"।

অথবা ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটিবে। ইহাতে ২০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হইয়াছে। গাড়ীর 'ককপিট' বা চালকের বসিবার স্থান

ক্যাপ্টেন ম্যালকলম ক্যাম্বেল পরিকল্পিত দ্বিতীয় মোটর-কার। এই গাড়ী ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটিবে।

ব্যতীত কোথাও একটু হাওয়া ঢুকিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবার উপায় নাই। হিসাবে দেখা গিয়াছে, ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটিলেও বাতাসের প্রতিবন্ধকতা অন্যান্য গাড়ীর তুলনায় অসম্ভবরূপে কম হইবে।

ইংল্যাণ্ডের আলবার্ট হলে স্থাপিত বিরাট স্বয়ং-ক্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

সর্ব্ববৃহৎ কলের বাদ্যযন্ত্র

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা প্রদর্শনীতে গ্যাস-ইঞ্জিন চালিত একটি প্রকাণ্ড কনসার্ট-বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ড্রাম, করতাল, জলতরঙ্গ ও অনেক প্রকার বাঁশীর সমবায়ে আপনা আপনি বিভিন্ন কনসার্ট বাদিত হইত। এক এক খানি নির্দ্দিষ্ট মাপের কাগজে এক একটি গান বা বাজনা অনুযায়ী কতকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। একটি ড্রামের গায়ে ছিদ্রযুক্ত একখানি কাগজ জড়াইয়া যন্ত্র চালাইয়া দিলে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঠিক তাল-মাফিক আপনা আপনিই বাজিতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডের আলবার্ট হলে এই ধরণের একটি পুরানো যন্ত্র ছিল। প্রায় ৩৯০০০০ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি এই যন্ত্রটি পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে ১৭৬টি 'ষ্টপ' এবং চারিটি বিভিন্ন 'কী-বোর্ড' আছে, যন্ত্রটিতে বাঁশীর সংখ্যাই হইবে সর্ব্বসমেত ১০,৪৯১টি। বিদ্যুৎচালিত মোটর-সাহায্যে হাওয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নীচে এই বিরাট বাদ্যযন্ত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল।

অস্ত্র-চিকিৎসার কৃতিত্ব

আগুনে পুড়িয়া, বন্দুকের গুলী লাগিয়া বা অন্য কোন আকস্মিক দৈব দুর্ব্বিপাকে আহত হইয়া মানুষের মুখ বা অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হইয়া গেলে তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এতদিন এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত। এতদ্ব্যতীত কুৎসিত চেহারাকে সুন্দর চেহারায় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও কৃত্রিম উপায়ে তাহা কার্য্যতঃ সফল করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত অস্ত্রপ্রয়োগে স্থায়ী এবং স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন করিবার প্রচেষ্টা অতি অল্প দিনই আরম্ভ হইয়াছে। অনেক কাল হইতেই মোম, রবার বা অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে গঠিত কৃত্রিম নাক, কান বা অপরাপর ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৌশলে জুড়িয়া বিনষ্ট অঙ্গের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেণ্ট লাউযিসের ডাঃ ব্রেয়ার, হলিউডের ডাঃ আপডিগ্রাফ এবং ডাঃ স্মিথ প্রভৃতি অস্ত্র-চিকিৎসকগণ দেহের কোন অংশ হইতে চামড়া কাটিয়া লইয়া অস্ত্র-প্রয়োগে তাহা মুখের বিকৃত অংশে বসাইয়া দিয়া চেহারার সৌন্দর্য্য বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অস্ত্রপ্রয়োগে বিকৃত চেহারার উন্নতি সাধন করিবার প্রচেষ্টা প্রধানতঃ মহাযুদ্ধের পর হইতেই সুরু হইয়াছিল। বিগত যুদ্ধে কামান বন্দুকের গোলাগুলীতে আহত হইয়া বহু লোকের চেহারা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারেরা অস্ত্র-চিকিৎসার সাহায্যে কাহারও চোয়াল, কাহারও হাড়, কাহারও বা আঙ্গুল প্রভৃতি জুড়িয়া কিয়ৎ পরিমাণে

বিনষ্ট অঙ্গের অভাবপূরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই চিকিৎসা-প্রণালী এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, অনেক সুস্থ সবল নরনারী কুৎসিত

বিখ্যাত কুস্তিগীর জ্যাক্ ডেম্প্সির প্রতিকৃতি। ডানদিকে অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বের এবং বামদিকে অস্ত্র প্রয়োগের পরের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে।
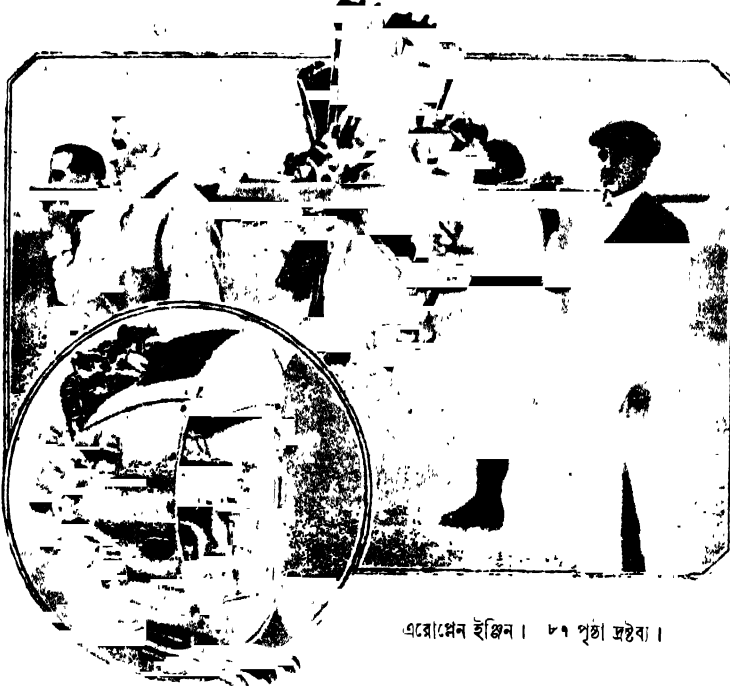
এরোপ্লেন ইঞ্জিন। ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চেহারার উন্নতিসাধনকল্পে আগ্রহসহকারে এই অস্ত্র-চিকিৎসা করাইয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করিতেছেন। এস্থলে বিখ্যাত ভারোত্তোলনকারী

জ্যাক ডেম্প্সির এই অস্ত্র-চিকিৎসার পূর্ব্বের ও পরের চেহারার দুইখানি ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। এই লোকটির নাকে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চামড়া জুড়িয়া দিয়া চেহারার বেমালুম পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে মোম দিয়া মুখের একখানি ছাঁচ তুলিয়া লইয়া সেই ছাঁচ হইতে একটি মুখোস তৈয়ারী করা হয়। কোথায় কতটা পুরু এবং লম্বা চামড়ার দরকার, মুখোস হইতে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া শরীরের কোনও অংশ হইতে সেই পরিমাণ চামড়া কাটিয়া লইয়া খুব সতর্কতার সহিত বসাইয়া দেওয়া হয়। নূতন চামড়া বসাইবার পর চার মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যেই চেহারার সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। কেবল চামড়া নয়, সময় সময় হাড় কাটিয়াও একস্থান হইতে অন্যস্থানে বসাইয়া দেওয়া হয়। ডাঃ স্মোর দেখিয়াছেন, চামড়া কাটিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যস্থানে বসাইয়া দিলে অনেক সময়েই ভাল ফল পাওয়া যায় না। কারণ চামড়া সতেজ থাকিলেও অনেক সময় স্নায়ুসূত্র, রক্তনালী আশেপাশের চামড়ার সঙ্গে একযোগে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে না। স্থানে স্থানে কতকটা যেন অসাড় মত হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি প্রথমে চামড়া কাটিয়া প্রায় সপ্তাহ তিনেক সেই স্থানেই সেলাই করিয়া রাখিয়া দেন। তাহাতে নূতন রক্তবহা নালী ও স্নায়ুসূত্র প্রভৃতি তৈয়ারী হইলে সেই চামড়া তুলিয়া লইয়া ঈপ্সিত স্থানে জোড় লাগাইয়া তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইবার পূর্ব্বে কর্ত্তিত চামড়াখানিকে বরফের মত ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হয়, তাহাতে চামড়ার কোন অংশ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। ডাঃ স্মিথ বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ৩০ মিলিমিটারে পারদের চাপ যতখানি, কর্ত্তিত চামড়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া তাহার উপর ততখানি চাপ দিয়া রাখিলে সুন্দর রূপে গজাইতে পারে। অস্ত্রোপচারের সময় এথিলীনের সঙ্গে অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রণ-প্রয়োগে রোগীকে অজ্ঞান করা হয় এবং শ্বাসনালীর মধ্যে রবার-টিউব প্রবেশ করাইয়া তাহার সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্যাস সোডা-লাইমের বোতলের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বলিয়া কিছু পরিমাণে উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং জলীয়-বাষ্পপরিশূন্য হওয়া থাকে। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন, শ্বাসযন্ত্র হইতে নির্গত কার্বনিক এসিড গ্যাসের বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

এই অভিনব অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্যে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ নির্ম্মূল করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা এই প্রকার অস্ত্র-চিকিৎসার সাহায্যে ক্যান্সার রোগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে সক্ষম

হইয়াছেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ খানিকটা জায়গা অস্ত্র-প্রয়োগে তুলিয়া ফেলিয়া সে স্থলে নূতন চামড়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ডাঃ ব্রেয়ার সম্প্রতি এরূপ একটি রোগীর মুখের প্রায় অর্দ্ধাংশ তুলিয়া ফেলিয়া, বুকের উপর হইতে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পুরু, ৭ ইঞ্চি চওড়া ও ১৫ ইঞ্চি লম্বা একখণ্ড চামড়া কাটিয়া লইয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই রোগীটি অস্ত্র-প্রয়োগের কয়েক মাস পরেই সম্পূর্ণ নূতন চেহারা ফিরিয়া পাইয়াছে, অধিকন্তু তাহার ব্যাধিও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়া গিয়াছে। রেচেষ্টারের মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ গর্ডন নিউ এবং ফ্রেড্ ফিজি কণ্ঠনালী ও চোয়ালের কতকাংশ ফেলিয়া দিয়া এবং নূতন চামড়ার সাহায্যে তাহা পুনর্ব্বার জুড়িয়া ক্যান্সার রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিউইয়র্কের ডাঃ ইষ্টম্যান সিহান নষ্ট নখের স্থানে সুস্থ নখের খানিকটা কর্ত্তিত অংশ লাগাইয়া সম্পূর্ণ নূতন নখ জন্মাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বিরাট প্রতিমূর্ত্তি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে ভারতের এক শ্রেণীর লোক (Tile makers) নাকি নূতন নাক জন্মাইবার জন্য এইরূপ এক প্রকার উপায় অবলম্বন করিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নষ্ট নাক পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইটালীদেশে একরূপ একপ্রকার অস্ত্রচিকিৎসার প্রচলন ছিল। তাহারা রোগীকে অচেতন না করিয়াই বাহু হইতে চামড়া কাটিয়া লইয়া ক্ষতস্থানে সেলাই করিয়া দিত। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে Tagliacozzi নামে এক ভদ্রলোক এই প্রকার অস্ত্র-চিকিৎসার সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম এক পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু ১৮১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ে কেহ কোন গুরুত্ব আরোপ বা কোনরূপ কৌতূহল প্রদর্শন করেন নাই। ১৮১২ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের Gentleman's Magazine এ বিষয়ে হিন্দুদের অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে রিভার্ডিন নামে জনৈক ভদ্রলোক শরীরের একস্থান হইতে ছোট ছোট চামড়ার টুক্‌রা কাটিয়া অন্যস্থানে জোড়া দিয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—ছোট চামড়ার টুক্‌রা যেরূপ জোড় খায়, বড় চামড়ার টুকরা সেরূপ জোড় খায় না। সম্প্রতি ডাঃ স্মিথ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বড় চামড়ার টুকরাও নির্দ্দিষ্ট চাপে বেমালুম জোড় খাইতে পারে। এই অস্ত্র চিকিৎসার বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোন জন্তু জানোয়ারের চামড়া মানুষের শরীরে জোড় খায় না, এমন কি একজনের চামড়া আর একজনের চামড়ার সঙ্গে জোড় ধরে না। প্রায় বছর দুই হইল এই নূতন অস্ত্র চিকিৎসার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত নিউইয়র্কে একটি চিকিৎসক-সমিতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্যতীত ৫০ জন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই সমিতির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। Dr. Jacques W. Mahmak এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পাহাড় খোদাই করিয়া বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে এক একটা গোটা পাহাড় খোদাই করিয়া মিশরের বিরাট স্ফিংক্‌স্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশরের পিরামিড যেমন বিস্ময়কর

বপ্ন, স্ফিঙ্কসগুলিও তদপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে। সাধারণ লোকেরা স্ফিঙ্কসগুলিকে বলিত - উষার দেবতা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বড় বড় পিরামিড নির্ম্মাণকর্ত্তা চিয়োপ্‌স্‌-এর পুত্র চেপ্রেণই না কি পিরামিডের রক্ষক হিসাবে পাহাড় খুঁদিয়া কয়েকটি বিরাট স্ফিঙ্কস্‌ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজও তাহা
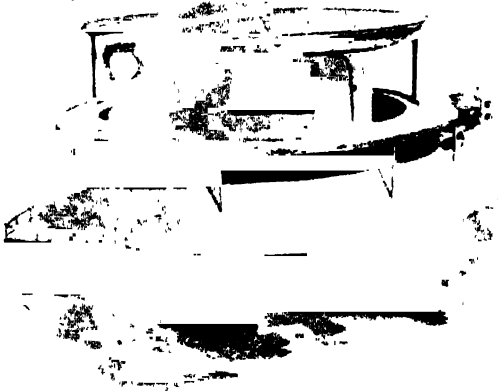
গোলাকার মোটর বোট।

জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় মার্কিন জাতি এই বিরাট কীর্ত্তির নিদর্শনে উদ্বোধিত হইয়াই পাহাড় খুঁদিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছে। Gutzon Borglum নামক সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর, ব্ল্যাক-হিল পার্ব্বত্য প্রদেশে রাসমোর নামক একটি গোটা পাহাড় খুঁদিয়া সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন। পাহাড়ের পাদদেশ খোদাই করিয়া দুইটি প্রকাণ্ড নমুনা-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মাপ হইতে ১,৭২৮ গুণ বড় করিয়া এই বিরাট প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হইতেছে। ছবির নিম্নদিকে নমুনা-মূর্ত্তিদ্বয় দেখা যাইতেছে, ইহাদের সম্মুখে

অদাহ্য ইন্ধনযোগে চালিত এরোপ্লেন।

মই-এর উপর মানুষটির তুলনা করিলেই নমুনা-মূর্ত্তির বিশালত্বও উপলব্ধি হইবে। প্রধান প্রতিমূর্ত্তির মাথার উপর কার্য্যনিরত ভাস্করকে দেখা যাইতেছে।

গোলাকার মোটরবোট

জি. ডি. রস্‌ নামে ফেয়ারমাউন্টের একজন ইঞ্জিনিয়ার অদ্ভুত এক মোটর-বোট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার চেহারা দেখিয়া হঠাৎ মনে হয় যেন দুইখানি প্রকাণ্ড গামলা উপর্য্যুপরি সজ্জিত রহিয়াছে। ১৭ জন যাত্রী লইয়া এই নব-নির্ম্মিত মোটরবোট অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া প্রথম পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। বোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে খুব ছোট একটু ত্রিকোণাকার স্থান বাহির হইয়া আছে। ডেকের নিম্নে ভাসমান আবদ্ধ কুঠুরী থাকায় এই বোটের জলমগ্ন হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। খোলের বাহিরের দিক ১৮ গেজী ইস্পাতের পাত দ্বারা আবৃত। পাশাপাশি ভাবে বাহিরের দিকে ইহার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট এবং ভিতরে ৬ ফুট। ভিতরে গোলাকার ভাবে বসিবার আসন সজ্জিত। মেঝের কতকাংশ প্রয়োজন মত উপরে তুলিয়া দিলেই

মিওসিন যুগের ম্যাষ্টোডন। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

টেবিল বা বিছানার কাজ চলিতে পারে। বোটের মধ্যে এক সপ্তাহের মত খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ঠাণ্ডা কুঠুরীর ব্যবস্থা আছে। ঝড়জল হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে নকল কাচের পর্দ্দা দিয়া ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোট চালাইবার জন্য পশ্চাদ্দিকস্থ ত্রিকোণ স্থানে একটি সাধারণ মোটর স্থাপিত আছে। অন্যান্য মোটরবোটের ন্যায় হাল ঘুরাইয়া চালক অনায়াসে বোটকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে।

এরোপ্লেন ইঞ্জিনের অদাহ্য তেল

মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের ন্যায় এরোপ্লেন-ইঞ্জিনেও পেট্রোল প্রভৃতি সহজ-দাহ্য তেল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এসব তেল, কোন রকমে সামান্য একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে। বহুবার এরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহুবিধ পরীক্ষার ফলে সম্প্রতি 'হাইড্রোজেনেসন' নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক প্রকার ইন্ধন প্রস্তুত হইয়াছে। নিউইয়র্কের রুজভেল্ট ফিল্ড নামক স্থানে এই নব আবিষ্কৃত ইন্ধনসাহায্যে এরোপ্লেন চালাইয়া বহুবিধ পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে। পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষ-জনক। তরলাবস্থায় এই তেলের মধ্যে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি

ফেলিয়া দিলেও জ্বলিয়া উঠিবে না, কিন্তু বায়বীয় অবস্থায় ইহা অত্যন্ত সহজ-দাহ্য। ইঞ্জিন চালাইবার সময়ে এই তরল পদার্থকে গ্যাসে পরিণত করিয়া সিলিণ্ডারে প্রেরণ করা হয়। তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি 'ভেপারাইজার' যন্ত্র ব্যতীত ইঞ্জিনে আর কোন যন্ত্র সংযোগ

আধুনিক হস্তী।

করিবার প্রয়োজন হয় না। এই 'ভেপারাইজার' বা গ্যাসপ্রস্তুতকারক কুঠুরীর সাহায্যে তেল শুষ্ক গ্যাসে পরিণত হইয়া সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়া ইঞ্জিন চলিয়া থাকে।

হস্তিদেহের ক্রমবিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

জগতের যাবতীয় প্রাণী বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাদের বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহণ করিয়াছে। বিবিধ গবেষণায় ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে এত নূতন তথ্য ও প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় হস্তী-ভ্রূণের অস্থি-সংগঠন পরীক্ষা করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যাষ্টোডন হইতে বর্ত্তমান হস্তীর ক্রমবিবর্ত্তনের ধারার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। যাবতীয় প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে বিভিন্ন বয়সে তাহাদের আদিপুরুষ হইতে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহণের ক্রমপরিণতির বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ম্যাষ্টোডনের ছবিতে দেখা যাইতেছে, উহার করোটির সম্মুখ ভাগ সামনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান হস্তীর করোটির সম্মুখ ভাগ প্রায় খাড়া ভাবে নিম্নাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। অথচ বর্ত্তমান হস্তীর ভ্রূণের করোটির সম্মুখ ভাগ তাহার পূর্ব্বপুরুষ ম্যাষ্টোডনের মত সামনের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের এই অস্থি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালের Anatomiche Anzeiger নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আধুনিক হস্তী-ভ্রূণের এক্স-রে ফটোগ্রাফ।

অস্ত্রচিকিৎসায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

গত ২রা জানুয়ারী হইতে জার্ম্মানীতে রোগগ্রস্ত মানুষের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবার বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল লোক পৈত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত বা দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত, অস্ত্রোপচারে তাহাদের প্রজনন শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। যাঁহারা রোগগ্রস্ত নহেন অথচ সন্তানের জনক জননী হইতে অনিচ্ছুক—ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও প্রজনন-শক্তি নষ্ট করাইতে পারেন। জার্ম্মানীর অধিবাসী ইহুদিদিগের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইনের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে এই সম্বন্ধে অনেক বাদপ্রতিবাদ হইতেছে। জাপানেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে আমেরিকার মিচিগান আইন-সভায় সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক জন্মনিরোধক আইনের খসড়া উপস্থাপিত হয়, কিন্তু বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তাহার কারণ সেই সময়ে অস্ত্রপ্রয়োগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ ছিল লোককে খোজা করিয়া দেওয়া। তাহার ফলে যৌন পরিতৃপ্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত। কাজেই ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিক ও নির্দ্দয় পন্থা বলিয়া তখনকার আইন-সভা এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তারপর ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের

আইন-সভায় এই আইন পাস হইবার পর, এ পর্য্যন্ত আমেরিকার প্রায় ২৭টি প্রদেশে জন্মনিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৯২৮ খৃঃ অব্দে আলবার্ট-

জন্ম নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ের অস্ত্র-প্রয়োগ প্রণালী।

(কানাডা), ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টন অব ভড্, ১৯৩২ খৃঃ অব্দে মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ এবং ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানীতে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান এই সন্তানজন্ম-নিরোধক Vasectomy এবং Salpingectomy নামক অস্ত্র চিকিৎসায় স্ত্রী অথবা পুরুষের প্রজনন-শক্তি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু যৌন তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে না।

কয়েক বছর পূর্ব্বে নারীহরণ ও নির্য্যাতন সমস্যার প্রতিকারকল্পে আদর্শ শাস্তিবিধানার্থ 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে, দুষ্কৃতকারীদের Vasectomy করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে Vasectomy বোধ হয় Castration অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এ দেশেও পুরুষকে castrate বা খোজা করিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। শোনা যায় মুসলমান সম্রাটদের আমলে অন্তঃপুররক্ষী তৈয়ারী করিবার জন্য পুরুষদিগকে খোজা করা হইত। বহু পূর্ব্বে এদেশ হইতে বালকদিগকে ক্রয় করিয়া পারস্য প্রভৃতি দেশে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুররক্ষী তৈয়ারী করিবার জন্য তাহাদিগকে খোজা করিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে অনেক বালকই মৃত্যুমুখে পতিত হইত, দুই একজন রক্ষা পাইত মাত্র। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন বৈষ্ণববিদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তা, ভিক্ষোপজীবী ভেকধারী বৈষ্ণব দেখিতে পাইলে তাহাকে জোর করিয়া খোজা করিয়া দিতেন। তাহাদের যৌন-সংসর্গের ক্ষমতা চিরতরে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ করা হইত। এই প্রকার খোজা করিবার বা castration প্রথায় পুরুষের বীর্য্যাধার দুইটিকে কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হইত। কিন্তু Vasectomy নামক অস্ত্র-চিকিৎসায় অতি সহজ উপায়ে পুরুষের বীর্য্যনলী বা Vas deferens দুইটি ছিন্ন করিয়া উপরের দিকে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহাতে শুক্র-কীট উক্ত নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। Salpingectomyও স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রায় অনুরূপ অস্ত্রোপচার। স্ত্রীলোকের ডিম্বনলী বা Oviduct কাটিয়া পরে উপরের দিক বাঁধিয়া দেওয়া হয়, কাজেই Ovums বা ডিম্ব জরায়ুতে প্রবেশ করিবার পথ পায় না বলিয়া গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। একটা দাঁত তুলিতে যতটা কষ্ট পাওয়া যায়, এই অস্ত্রোপচারের সময় তদপেক্ষা বেশী কষ্ট অনুভূত হয় না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এই অস্ত্র প্রয়োগের ফলে সুস্থ ও সবল দম্পতীর অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমাত্র স্বাস্থ্যোন্নতি ছাড়া আর কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

এরোপ্লেন-ইঞ্জিন
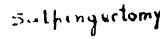
উড়ো-জাহাজ যেমন গ্যাস ব্যাগের সাহায্যে হাওয়ায় ভাসিয়া থাকিতে পারে, এরোপ্লেন তাহা পারে না। কারণ উড়ো-জাহাজ বাতাস অপেক্ষা হাল্কা এবং এরোপ্লেন বাতাস অপেক্ষা অনেক ভারী। এরোপ্লেনকে প্রোপেলারের টানে অনবরত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ডানার সাহায্যে বাতাসে ভাসিতে হয়; প্রোপেলার বন্ধ করিয়া নিম্নাভিমুখে সামান্য কোণ করিয়া খানিকক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে মাত্র। এই জন্য যতদূর সম্ভব হাল্কা জিনিসের দ্বারা এরোপ্লেন নির্ম্মিত হয়। প্রোপেলার চালাইবার জন্য সম্মুখের দিকে স্থাপিত ইঞ্জিনটি বেশী ভারী হইলেই বিপদ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অনেক রকমের হাল্কা অথচ শক্তিশালী ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এস্থলে অতি হাল্কা অথচ বিপুল শক্তিসম্পন্ন আধুনিক এরোপ্লেন-ইঞ্জিনের একটি ছবি প্রদত্ত হইল, এই ইঞ্জিনের কেন্দ্রীয় দণ্ড হইতে চারদিকে গোলাকার ভাবে সজ্জিত নয়টি সিলিণ্ডার আছে। নয়টি সিলিণ্ডার হইতে পিচকারীর দণ্ডের মত নয়টি 'রড' কেন্দ্রস্থিত ঘূর্ণন-দণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন। ইঞ্জিনটি ৪০০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন। প্রবল গতিশক্তিবিশিষ্ট প্রায় অধিকাংশ ইঞ্জিনেই— রেডিয়েটারের ভিতর জল দিয়া ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু এই ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল, রেডিয়েটার বা পাইপ কিছুরই ঝঞ্চাট নাই। চলিবার সময় হাওয়া লাগিয়া ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে গরম হাওয়ার মধ্যেও ইঞ্জিনের কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে না। ইঞ্জিনটির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা একদমে ৫০ ঘণ্টা চলিতে পারে। এই জাতীয় অন্যান্য ইঞ্জিন অপেক্ষা ইহা অত্যন্ত হাল্কা; ওজনে ৩ মণের কিছু বেশী। তেল খরচও খুব কম। চারজন লোক অনায়াসে ইহাকে বহন করিতে পারে। এরোপ্লেনের সম্মুখের দিকের সূচালো মুখটি বাক্সের ঢাকনার মত কব্জা দিয়া আঁটিয়া, তাহার সঙ্গে ইঞ্জিনটি জুড়িয়া দেওয়া হয়। কাজেই প্রয়োজন মত অতি সহজেই ডালা খুলিয়া ইঞ্জিন পরীক্ষা করা চলে। ৮৩ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য।

প্রাণীদেহের মাংসপেশীকে অদৃশ্য করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া

বাদুড় এবং হাতের ছবির দিকে তাকাইলে নিশ্চয়ই এগুলিকে এক্স-রে ফটোগ্রাফ বলিয়া মনে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি কিন্তু এক্স রে ফটোগ্রাফ নহে, উড্‌চেষ্টারের ডাঃ ষ্টিন তিন ভাগ Salicylic Methyl ester এবং এক ভাগ Benzyl benzoate মিশ্রিত করিয়া এক অদ্ভুত রাসায়নিক তরল পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তরল পদার্থের আলোক বক্রীকরণের এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, ইহার মধ্যে কোন মাংসপেশী ডুবাইয়া রাখিলে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ছবিতে প্রদর্শিত বাদুড়টি ও হাতখানিকে এই পদার্থের মধ্যে ডুবাইয়া সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে ফটো লওয়া হইয়াছে। মাংস ও এই তরল পদার্থের refractive index প্রায় সমান।

রাসায়নিক মিশ্রণে ডুবাইয়া বাদুড় ও হাতের ফটোগ্রাফ নেওয়া হইয়াছে।

এই তরল পদার্থে নিমজ্জিত কোন প্রাণীর মাংসপেশীর ভিতর দিয়া আলো বক্রীভূত না হইয়া সোজা চলিয়া যায়, কিন্তু হাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না, কাজেই মাংস প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরেকটুকু পরিষ্কার করা যাউক। একটি কাচের নল যদি খালি বাতাসের মধ্যে ধরা যায়, তবে পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ আলোক-রশ্মি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়া ছুটিয়া আসিয়া কাচের নলের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বক্রীভূত হয়; কিন্তু সেই নলটিকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলে তাহা আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। কারণ জল ও কাচের refractive index প্রায় সমান। আলোকরশ্মি জলের ভিতর দিয়া কাচের মধ্যে ঢুকিয়া সামান্যরূপে বক্রীভূত হইতে পারে, তাহার ফলে টিউবটি ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাণীদেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও অস্থিসংস্থান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থী ও গবেষকদিগের পক্ষে অধিকতর সরল ও সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হিমাদ্রি-কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ষ্টিনের উদ্ভাবিত মিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন Alizerine Preparation নামক এক প্রকার মিশ্রণের সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীদেহের মাংসপেশী স্বচ্ছ করিয়া পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রক্রিয়ায় হাড়গুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায় এবং মাংসপেশীসমূহ স্বচ্ছ হইয়া গেলেও শরীরের একটা আবছায়া চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের যে হাড়টি যে স্থলে যে ভাবে অবস্থিত আছে, তাহা অতি পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এই অভিনব প্রচেষ্টা, প্রাণীতত্ত্বানুসন্ধী বা সাধারণ দর্শক—প্রত্যেকের কাছেই অতীব শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতুহলোদ্দীপক।

চুড়িওয়ালা (মাদ্রাজ) [মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্

শিল্পী—জি. এইচ. রাও।

সেকালের যাত্রা

—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাড়ীর কাছে, বারোয়ারিতলায় যাত্রা হইতেছে। গিয়া দেখিলাম ভীষণ ভীড়। আমরা তখন বালক, বয়স তখন ১০।১২ বৎসর। ভীড় ঠেলিয়া কোন রকমে একেবারে আসরের নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—আমাদেরই মত একটি ছেলে রাধিকা সাজিয়াছে, ঘাঘরাপরা, বুকে কাঁচুলি আঁটা, একখানা জরির পাড়ওয়ালা লাল শালুর ওড়না মাথার উপর দিয়া আসিয়া দুই ধারে প্রায় পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হাতে অতি মলিন, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দুই একখানা পিত্তলের গহনা। ছেলেটি বোধ হয় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, চোখের কোণ বসিয়া কালি পড়িয়াছে, গাল দুটি ফুলো। ছেলেটি, অর্থাৎ শ্রীরাধিকা দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া অতি মিহি সুরে অথচ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।"

বলিয়া যেন ধুঁকিতে লাগিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রায় দুই মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার সেইরূপ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।" যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। কোথায় বা সখি, কেই বা সাড়া দেয়! বার বার তিন বার। শ্রীরাধিকা আবার একবার প্রাণপণে চিঁ-চিঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না সখি।"

এইবার বোধ হয় "সখি"র দয়া হইল। দেখিলাম বেশ লম্বাচওড়া একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি, মুখ হইতে তামাকুর ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারও পোষাক রাধিকারই মত, ঘাঘরা পরা, শালুর ওড়না, জরির পাড়, তবে প্রভেদ এই যে, রাধিকার পোষাক অত্যন্ত মলিন, "সখি"র পোষাকটা তত মলিন নহে, তাহার গহনাগুলা পিত্তলের হইলেও এখনও একটু উজ্জ্বল আছে। রাধার কপালে সীঁথি নাই, "সখি"র কপালে পিত্তলের সীঁথি এবং কানে দুইটা ঝুমকা।

সখি ধীর পদবিক্ষেপে গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে শ্রীরাধার কাছে গিয়া বজ্রনির্ঘোষে মোটা গলায় বলিল—"এমন প্রেম করেছিলে কেন?"

এই বলিয়াই সখী গান ধরিল :—

"প্রেম করা কি যারে তারে সাজে,
যারে সাজে, তারে সাজে,
অঙ্গের বুকেতে প্রেম বাজ যেন বাজে।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল বাজিতে লাগিল। বোধ হয় গানটা কীর্ত্তন অঙ্গের।

সে যাত্রার দলপতি কে তাহার নাম মনে নাই। তবে পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যিনি "সখী" সাজিয়াছিলেন—অর্থাৎ বৃন্দা সাজিয়াছিলেন, তিনিই দলপতি বা যাত্রার দলের অধিকারী।

আমার সেই প্রথম যাত্রা দেখা বা শুনা। তাহার পূর্ব্বে পিতার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, যাত্রা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

আমাদের বাল্যাবস্থায় চন্দননগরে অনেকগুলি ভাল ভাল যাত্রার দল ছিল; সে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক সময় চন্দননগর এই যাত্রার জন্য বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছিল। প্রথমে মদন মাষ্টার, তাহার পর তাঁহার সাকরেদ মহেশ চক্রবর্ত্তী, রাম বাঁড়ুয্যে, নবীন গুঁই, রামলাল চাটুয্যে প্রভৃতির নামে সেকালের লোকের মুখে লাল পড়িত। কলিকাতা বা মফস্বলে যে কোন ধনবানের বাটীতে বা বারোয়ারিতলায়, যদি উল্লিখিত যাত্রাওয়ালাদের কোন একজনের দলেরও "গাওনা" না হইত, তাহা হইলে সেই ধনী গৃহস্থ বা বারোয়ারী পাণ্ডারা আপনাদের জীবন বিফল বলিয়া মনে করিতেন। পূর্ব্ব বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গেও এই সকল দলের প্রতিপত্তি বড় অল্প ছিল না।

এ প্রবন্ধের প্রথমে যে কৃষ্ণযাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে প্রাক্ মদন মাষ্টারের যুগের যাত্রা বলিতে পারা যায়। মদন মাষ্টারের যাত্রার পূর্ব্বে এদেশে দুই শ্রেণীর যাত্রার প্রচলন ছিল—গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ও গোপাল উড়ের যাত্রা। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণলীলা ব্যতীত আর কোন [illegible] ছিল না। তিনি নিজে ভক্ত বৈষ্ণব, কবি ও গায়ক ছিলেন, [illegible] শুনিয়াছি সুকণ্ঠ ছিলেন না। তিনি যে সকল গান ও [illegible] রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। দাশরথী রায়ের

পাঁচালীর ন্যায় গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রার পালা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সম্পদ। দাশু রায়ের পাঁচালী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়াতে এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হওয়াতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন অতি প্রাচীনগণের মুখে —অর্থাৎ আমা অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধগণের মুখে গোবিন্দ অধিকারীর দুই একটা গান শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল বৃদ্ধের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দ অধিকারীর গানগুলিও বিলুপ্ত হইবে।

গোবিন্দ অধিকারীকে আমরা দেখি নাই, বোধ হয় আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান ও প্রিয় সাক্‌রেদ ৺ব্রজমোহন দাস অনেক দিন ধরিয়া গোবিন্দ অধিকারীর দল রাখিয়াছিলেন। ব্রজমোহন আমাদের চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বাল্যকালে দেখিয়াছি। তাঁহার দুই পুত্র বটুলাল এবং গোষ্ঠবিহারী এখনও জীবিত আছেন। বটুবাবুর বয়স বোধ হয় ৭৪।৭৫ বৎসর হইবে। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর লিলুয়া কারখানায় একাউন্টান্ট ছিলেন, প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি যখন "হিতবাদী"র সহকারী সম্পাদক ছিলাম, তখন একবার গোবিন্দ অধিকারীর "পালা"গুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমি ঐ পালাগুলি বটুবাবুর কাছে থাকিতে পারে, এই আশা করিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, পালাগুলি তাঁহার কাছে নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ঐ যাত্রার দলের এক ব্যক্তি কিছু দিন দল চালাইয়াছিলেন, এবং সময় সময় তিনি বটুবাবুর জননীকে মাঝে মাঝে কিছু টাকাও দিতেন। বটুবাবুর তখন বোধ হয় ছাত্রাবস্থা, তিনি যাত্রার দলের কোন সংবাদ রাখিতেন না। কিছুদিন পরে বটুবাবু সংবাদ পাইলেন যে, যিনি তাঁহার পিতার দল চালাইতেছিলেন, তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। গোবিন্দ অধিকারীর লিখিত পালাগুলির আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

গোপাল উড়ের যাত্রা প্রাক্ মদন মাষ্টার যুগের হইলেও এখনও উহা বিদ্যমান আছে। গোপাল উড়ের গান বা টপ্পাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দ অধিকারীর সমস্ত পালাই যেরূপ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক, গোপাল উড়েরও সমস্ত পালাই সেইরূপ মহাকবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক কাব্য অবলম্বনে রচিত। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালা আরম্ভের পূর্ব্বে ভিস্তিওয়ালা, মেথর, মেথরাণী প্রভৃতির সং দেওয়া হইত, বোধ হয় এখনও হয়। শুনিয়াছি গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায়ও প্রথমে ঐ রূপ সং দেওয়া হইত। যতক্ষণ সংএর পালা চলিত ততক্ষণ গোবিন্দ অধিকারী আসরে আসিতেন না; কৃষ্ণ, রাধিকা, গোপ-বালক ও গোপিকা প্রভৃতি একে একে আসরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া বসিত। তাহার পর গোবিন্দ অধিকারীর উপবেশনের জন্য বড় মোটা গালিচার আসন, আসরের ঠিক মধ্যভাগে পাতা হইত। তাহার পর অধিকারী মহাশয়ের রূপা-বাঁধান হুঁকা ও হুঁকার বৈঠক আসিত। এইরূপে সমস্ত আয়োজন শেষ হইতে সংএর পালা শেষ হইত। তখন অধিকারী মহাশয় স্বয়ং বৃন্দাদূতী বেশে আসরে দেখা দিতেন। তিনি আসরে অবতীর্ণ হইলেই যাত্রার পালা আরম্ভ হইত না। অধিকারী মহাশয় প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা ও ধ্যান করিতেন, তাহার পর "গাওনা" আরম্ভ হইত।

আমি প্রথমে যে কৃষ্ণযাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা গোবিন্দ অধিকারী বা ব্রজমোহনের যাত্রা নহে। গোবিন্দ অধিকারীর পালার অনুকরণে সেকালে আরও পাঁচ সাত জন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই অভিনীত হইত। অল্প টাকাতে ঐ সকল যাত্রার দল পাওয়া যাইত। গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়ের সময়, যাত্রাতে "প্যালা" বা পুরস্কার দিবার প্রথা ছিল। দর্শকগণ অভিনয় দর্শনে বা গান শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলে টাকাটা, সিকাটা, রুমালে বাঁধিয়া আসরে নিক্ষেপ করিতেন। যাত্রার দলের কোন লোক তাহা খুলিয়া লইয়া শূন্য রুমাল দাতাকে ফিরাইয়া দিত। অনেক সময় যাত্রার দলের একজন লোক একখানা থালা লইয়া দর্শকদের কাছে মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া আসিত। দর্শকগণ সাধ্যানুসারে সেই থালাতে দুই আনা, চারি আনা, "প্যালা" দিতেন। শুনিয়াছি, গোবিন্দ অধিকারী কোন কোন আসরে

শতাধিক টাকা "প্যালা" পাইতেন, ধনবানদিগের নিকট হইতে শালের জোড়া বখশিস পাইতেন এবং ধনী-গৃহিণীদিগের নিকট হইতে অলঙ্কারও পাইতেন। এইরূপ "প্যালা"র প্রথা এখনও চণ্ডীর গানে, রামায়ণ গানে ও কথকতাতে বিদ্যমান আছে।

আদি যুগের এই যাত্রার পূর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন—মদন মাষ্টার। মদনবাবু ব্রাহ্মণের সন্তান, সুশিক্ষিত ছিলেন। প্রথমে তিনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তিনি মদন মাষ্টার নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাত্রাতে কথোপকথন অতি অল্পই থাকিত, গানই বেশী থাকিত। মদন মাষ্টার গানের অংশ কমাইয়া কথোপকথনের অংশ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যাত্রার দলে "জুড়ি" ও "ছোকরা"র গান তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার যাত্রাতে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি পুরুষদিগের গান ধ্রুপদ অঙ্গের হইত; সঙ্গীতজ্ঞ "জুড়ি"রা সেই গান করিত। রমণী বা বালক-বালিকাদের গান খেয়াল বা টপ্পা অঙ্গের হইত, ছোকরারা সেই গান গাহিত। জুড়িদের পোষাক ছিল সাদা চোগা চাপকান, প্যাণ্টুলান ও মাথায় টুপি। ছোকরাদের পোষাক ছিল প্যাণ্টুলান, লম্বা কোট ও মাথায় জরির টুপি। ছোকরাদের পোষাক—মখমলের বা সাটিনের জরির কাজ করা বেশ ঝকমকে পোষাক। কথিত আছে, একবার এক জন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মফস্বল-পরিদর্শনকালে একটা গ্রামে গিয়াছিলেন। সেই সময় তথায় বারোয়ারীতলায় যাত্রা হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভ্যর্থনা করিয়া বারোয়ারী-তলায় লইয়া যাওয়া হইল এবং বসিবার জন্য একখানা চেয়ার দেওয়া হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট যাত্রা দেখিতেছেন, এমন সময় জুড়িরা উঠিয়া গান আরম্ভ করিল। এক একটা দলে চারিজন করিয়া জুড়ি থাকিত, তাহারা মুখে গান গাহিত আর হাতে তালি দিয়া তাল দিত। এক একজন জুড়ি এরূপ মুখভঙ্গী সহকারে গান করিত যে, দেখিলে ভয় হইত। ম্যাজিষ্ট্রেট যাত্রা শুনিতেছেন, জুড়িরা পরম উৎসাহে প্রাণপণ চীৎকারে হাততালি দিয়া গান আরম্ভ করিল। জুড়িদের সাদা প্যাণ্টুলান ও চোগা চাপকান দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মোক্তার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পাঁচ সাত মিনিট গান শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোক্তার লোককো বৈঠনে বোলো।"

মদন মাষ্টারের যাত্রার পূর্ব্বে যে সকল যাত্রা ছিল, তাহাতে কথোপকথন অপেক্ষা গান অধিক ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কথোপকথনে কেমন একটা অস্বাভাবিক টান ও সুর ছিল। দুই চারিটা কথা বলিয়াই অভিনেতা—তা সে নায়কই হউক বা নায়িকাই হউক—বলিত, "তবে প্রকাশ করিয়া বলি শ্রবণ কর।" এই বলিয়াই গান আরম্ভ করিত। অথবা বলিত, "প্রকাশ করে বল শ্রবণ করি"—এই কথা বলিয়াই সে হয়ত নিজেই গান আরম্ভ করিত। এই "প্রকাশ করিয়া বলা"র প্রথা গোপাল উড়ের যাত্রার কথায় কথায় ছিল। মালিনীর ফুলের মালা বা ফুল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে, বিদ্যা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমন সময় মালিনী ফুল লইয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বিদ্যা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, অনেক গালি দিল। তাহা শুনিয়া মালিনী বিদ্যাকে বলিল, "সে কেমন, প্রকাশ করে বল শ্রবণ করি", এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বিদ্যার গান আরম্ভ করিয়া দিল—

> "ওলো কাজ কিলো তোর ফুলে—
> মালিনী ও ধনী, দিবি বঁধুর গলে রাখগে তুলে।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে মালিনী নাচও আরম্ভ করিল। মদন-বাবু যাত্রার অভিনয়কালে এই "প্রকাশ করিয়া বলা"র পালা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কি সেকালে আর কি একালে, যাত্রা আরম্ভ হইবার অনতিপূর্ব্বে বাদকগণ স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র তানপুরা, বেহালা, ডুগী, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি আসরে লইয়া গিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিত এবং সুর মিলাইবার জন্য যন্ত্র বাঁধিতে আরম্ভ করিত। এইরূপ আসরে বসিয়া সুর মিলান এখনও হয়। কিন্তু শুনিয়াছি, যে মদন মাষ্টার তাঁহার দলে এই ব্যবস্থা রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নেপথ্যে অর্থাৎ সাজঘরে বাদকগণ বাদ্যযন্ত্র মিলাইয়া আসরে লইয়া যাইত, আসরে বসিয়া যন্ত্রের সুর বাঁধিত না। তাহাতে আর কিছু হউক বা না হউক, সমবেত শ্রোতৃবর্গের—বিশেষতঃ বালকগণের, ধৈর্য্যহানি ঘটিবার সুযোগ হইত না।

মদন মাষ্টারের আর একটা সংস্কারের কথাও উল্লেখযোগ্য। যাত্রা আরম্ভ হইলে তিনি একটা পেন্সিল ও কাগজ লইয়া আসরের একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। যখন কোন অভিনেতা অভিনয় করিত, তখন তিনি সেই অভিনেতার কথাগুলি

মনোযোগ সহকারে শুনিতেন এবং কেহ কোন শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। পরে সেই অভিনেতাদের ডাকিয়া তাহার উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া দিতেন। এরূপ করাতে, তাঁহার সময়ে, তাঁহার দলে সকল অভিনেতাই শুদ্ধ উচ্চারণ করিত।

যাত্রার দলের অভিনেতাদের মধ্যে, সেকালে অধিকাংশ হাড়ী, দুলে, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্নজাতীয় লোক হইত। দলের অধিকারী স্বয়ং এবং দুই চারিজন অভিনেতা হয়ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা নবশাখ হইতেন, কিন্তু মোটের উপর উচ্চবর্ণের "যাত্রাওয়ালা" সেকালে বড় অধিক দেখা যাইত না। তাহার কারণ যাত্রার দলে অভিনেতা অপেক্ষা গায়কের সংখ্যা অধিক হইত। গায়কদের মধ্যে সকলেই যে সুকণ্ঠ হইত, তাহা নহে। কাহারও বা সুরবোধ ছিল, কাহারও বা তালবোধ ছিল, কাহারও বা রাগ-রাগিণীবোধ ছিল এবং কেহবা সুকণ্ঠ ছিল। এক একটা দলে চারজন বা ছয় জন "জুড়ি" থাকিত, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাটজন পর্য্যন্ত "ছোকরা" থাকিত। ইহারা অভিনয় করিত না, কেবল গান গাহিত। ছোকরাদের বয়স ১২।১৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭।১৮ বৎসর পর্য্যন্ত হইত। এত অল্পবয়স্ক "ছোকরা" ভদ্র শ্রেণী হইতে পাওয়া যাইত না, সেই জন্য ইতর শ্রেণী হইতে ছোকরা এবং সুকণ্ঠ অভিনেতা সংগ্রহ করিতে হইত। কোন যাত্রার দল মফস্বলে গাওনা করিতে গিয়া দেখিল, একটি রাখাল-বালক মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গলা ছাড়িয়া দিয়া গান গাহিতেছে। তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলের অধিকারী তাহাকে দলভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার অভিভাবককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুই বেলা খোরাকী ও মাসিক পাঁচটাকা বা সাত টাকা বেতনে অভিভাবককে সম্মত করাইয়া সেই রাখাল-বালককে যাত্রার দলের "ছোকরা" করিয়া লওয়া হইল। রাখাল-বালক কৌপীনের পরিবর্ত্তে জরির কাজ করা পায়জামা, কোট, টুপি পরিয়া আসর আলো করিয়া দাঁড়াইল। এই প্রোমোশন হয়ত তাহার স্বপ্নেরও অতীত।

এই কারণে যাত্রার দলে, অল্পবয়স্ক অভিনেতাদের মধ্যে সুশ্রী, গৌরবর্ণ ও লাবণ্যশালী লোক বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। একটি ছোকরার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট বলিয়া তাহাকে "সখী"র ভূমিকা দেওয়া হইল, কারণ সখীকে অনেক গান গাহিতে হয়। কিন্তু সখীর চেহারা দেখিয়া হয়ত দর্শকগণের চক্ষু স্থির। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায়, গালের হাড় বাহির করা সখীকে দেখিলে মনে ঘৃণার উদয় হইত সত্য কিন্তু তাহার নৃত্য ও সঙ্গীত দর্শক ও শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিত। ছোকরাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে অভিনেতার শ্রেণীতে প্রোমোশন দেওয়া হইত, তাহাদের উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ হইত না ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত, বর্ণজ্ঞানহীন নীচজাতীয় রাখাল-বালককে যদি নায়িকা রাজকুমার বা সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে কেতাদুরস্ত করিবার জন্য যে বিশেষ বেগ পাইতে হয়, একথা বলাই বাহুল্য। মদন মাষ্টার প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন, পরে তিনি যাত্রার দল করিলেও সেই শিক্ষকতার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। ছোকরাদিগকে দুরস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে রীতিমত মাষ্টারি করিতে হইত।

তাঁহার এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। মদন মাষ্টারের দল বাঙ্গালায় যাত্রাভিনয়ে একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার প্রভাব সেকালের সকল যাত্রার দলেই পরিদৃষ্ট হইত। কেবল গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ও গোপাল উড়ের যাত্রা মদন মাষ্টারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই। ঐ দুই দলে সাবেক চাল অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল।

মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ অনেক দিন ধরিয়া শ্বশুরের দল চালাইয়াছিলেন। তিনি ভদ্র কুলবধূ, অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে শ্বশুরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি অসামান্য বুদ্ধিমতী ছিলেন। মাষ্টারের দলে কালী এবং কৃষ্ণ নামক দুই যমজ ভ্রাতা অভিনয় করিতেন। পরে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দলের পরিচালক হইয়াছিলেন। কালী ও কৃষ্ণ উভয়েই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। সাধারণতঃ তাঁহারা কৈকেয়ী ও কৌশল্যা অথবা কুন্তী ও মাদ্রী সাজিতেন। তাঁহারা যমজ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেজন্য তাঁহারা দুই জনে দুই সপত্নীর ভূমিকা কেন গ্রহণ করিতেন তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। সপত্নীযুগলের মধ্যে যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য

থাকা আবশ্যক, তাহা মনে হয় না। মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রবধূ যাত্রার দল চালাইতেন, তখন লোকে ঐ দলকে "বৌমাষ্টারের দল" বলিত।

মদন মাষ্টারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবীনচন্দ্র গুঁই প্রভৃতি কয়েকজন লোক "মাষ্টারের দল" ছাড়িয়া আপনারা এক একটি পৃথক পৃথক যাত্রার দল করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজনের দলই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মহেশ চক্রবর্ত্তী মদন মাষ্টারের দলে ঢোলক বাজাইতেন এবং রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "জুড়ি" সাজিতেন। যখন ইঁহাদের দলের খ্যাতি পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন কলিকাতায় মতিলাল রায়, লোকনাথ রজক প্রভৃতিও যাত্রা-দলের অধিকারী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শেষে মতিলাল রায়ই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। মতিলাল রায় সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। তিনি স্বরচিত নাটকের অভিনয় করিতেন। তাঁহার রচিত—

"মাতঃ শৈলেসুতে স্বপত্নী
শিবে শিব সীমন্তিনী।"

প্রভৃতি গান এখনও বহুকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। মতিলাল রায়ের দলকে চন্দননগরে অতি অল্প বারই "গাওনা" করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কারণ কলিকাতা হইতে ঐ দলকে লইয়া যাইতে হইলে অনেক টাকা খরচ হইত। মহেশ চক্রবর্ত্তী বা রাম বাঁড়ুয্যের দল স্থানীয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ঐ সকল দল পাওয়া যাইত। আমি মতি রায়ের যাত্রা কখনও দেখি নাই। লোকনাথ রজক বা "নোকা ধোপা"র দলের অভিনয় একবার দেখিয়াছিলাম। সেকালে নবীন ডাক্তারের দল, সাঁতরার দল, দাশরথী রায়ের দল প্রভৃতি আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট যাত্রার দল ছিল। দাশরথী রায় চন্দননগরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহার "আখড়া" বা কার্য্যালয় চন্দননগরে ছিল।

এই প্রসঙ্গে সেকালের আর একজন যাত্রাওয়ালার নাম না করিলে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। তাঁহার নাম ৺হরি-মোহন রায়। তিনি ভারতবরেণ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র এবং ৺রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। গঙ্গার ষ্টীমার লাইন খুলিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নিজ বাটীতে বাজার বসাইয়া এবং যাত্রার দল করিয়া তিনি বহু সহস্র টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি হোর মিলার কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কলিকাতা হইতে কালনা পর্য্যন্ত ষ্টীমার চালাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি হোর মিলার কোম্পানি অপেক্ষা ভাড়া কমাইয়া দিলেন, তাহা দেখিয়া হোর মিলার কোম্পানি আরও ভাড়া কমাইয়া দিলেন। হরিমোহন রায় তাহার অপেক্ষাও ভাড়া কমাইলেন, এইরূপে প্রতিযোগিতায় অবশেষে বিনা ভাড়ায় ষ্টীমার যাত্রী বহন করিতে লাগিল। অবশেষে হরিমোহন রায় প্রচার করিলেন, তাঁহার ষ্টীমারের যাত্রীদিগের ভাড়া ত' দিতেই হইবে না, অধিকন্তু প্রত্যেক যাত্রীকে বিনামূল্যে এক পোয়া করিয়া মিষ্টান্ন জলযোগের জন্য দেওয়া হইবে। এই প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হইল। হরিমোহন রায় সেই ক্ষতি সহ্য করিতে পারিলেন না, ষ্টীমার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাজারেরও অনুরূপ অবস্থা হইল। সুতরাং তাঁহার যাত্রার দলের পরিণাম যাহা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালে গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়ের দলে প্রথমে মেথর মেথরাণী ভিস্তিওয়ালা প্রভৃতির সং দিয়া পরে যাত্রার পালা আরম্ভ হইত। মদন মাষ্টারের যাত্রাতে বোধ হয় ঐরূপ কোন সং দেওয়া হইত না। যাহারা নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিত, তাহাদের মধ্যে বিদূষক প্রভৃতি অভিনয়কালেই হাস্যরসের অবতারণা করিত। পরবর্ত্তীকালে যাত্রার অভিনয়ের শেষে একটা করিয়া "ফার্স" বা হাস্যরসপ্রধান সং দেওয়া হইত। সেকালের অনেক যাত্রাতেই মাতালের সং দেওয়া হইত। আমাদের প্রতিবেশী ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের বাটীতে একবার হরিমোহন রায়ের যাত্রা হইয়াছিল, সে অনূ্যন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কিসের পালা হইয়াছিল, মনে নাই। অভিনয়ের শেষে মাতালের সং দেওয়া হইয়াছিল, একটা স্থূলকলেবর লোক মাতাল সাজিয়া এক হাতে একটা গ্লাস ও বগলে একটা বোতল লইয়া টলিতে টলিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। অন্য একজন লোক সেই মাতালের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময় মাতালটা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা বেয়াই, তুই শালাতো আমার পেটের ছেলে,

আয় দেখি দুজনে খুড়ো-ভগিনীপোতে মিলে একবার মায়ের নাম করি।" এই বলিয়াই টলিতে টলিতে গান ধরিল—

"শ্যামা মা, কে পারে শ্যামাকে চিন্তে
অনায়াসে বাসা বেঁধে ফেলে ধামা
কেবল পারে না তবলা ছাইতে॥"

মাতালের নৃত্যদর্শনে ও গানশ্রবণে আসরশুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির হইত। সেকালে আর একটা যাত্রার দলে মাতালের গান ছিল—

"ঘুম ভেঙ্গে বড় মজা হয়েছে,
একটা এঁড়ে গরু পিঁজরে ভেঙ্গে
খেজুর গাছে উঠেছে।
মাসীর মার কুটুম এসেছে,
ঠিক যেন ভাই গেরণ (গ্রহণ) লেগেছে,
আবার গিন্নি গেছে বনভোজনে
হাটে মাথা হারিয়েছে।"

এইরূপ প্রায় সকল যাত্রাতেই অভিনয়ান্তে "বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী" "লম্পটের দণ্ড" প্রভৃতির ফার্স দেওয়া হইত। মনে আছে, আমাদের পাড়ার বারোয়ারিতে একবার একটা যাত্রায় ফার্সে দেখিয়াছিলাম—এক পিতৃহীন বালক, তাহার জননীর নিকট পিতার সন্ধান জানিবার জন্য আব্দার করিতেছে। তাহার জননী তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া গান ধরিল—

"হাবা ছেলে বাবা ব'লে কাঁদিস নারে আর,
আমি থাকতে ভাবনা কিরে বাপেরই অভাব তোমার।
আমার বিয়ের আগে তুমি, জন্মেছ বাপ যাদুমণি
এমনই সতীলক্ষ্মী আমি, আমার পুণ্যে এ সংসার।"

এই গানের পরই যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সেকালের যাত্রাতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য পরচুলা ব্যবহৃত হইত না। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত, তাহারা বড় করিয়া চুল রাখিত ও গোঁফ দাড়ি কামাইত। সে জন্য আমরা—অর্থাৎ সেকালের বৃদ্ধেরা, এ কালের কবি-প্যাটার্ণের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশশালী, ক্ষৌরিত-গুম্ফশ্মশ্রু তরুণের দলকে দেখিয়া সহজেই যাত্রার দলের লোক বলিয়া ভ্রম করিয়া বসি।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সেমিজ বা সায়ার প্রচলন ছিল না। তখন যে সকল পুরুষ স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত, তাহারা শাড়ী ও কাঁচুলির সাহায্যে স্ত্রীলোক সাজিত। যাত্রার দলকে সর্ব্বদাই নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, অসময়ে স্নানাহার করিতে হইত, সেই জন্য যাত্রার দলের লোকদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শীর্ণকায় ছিল। তাহারা শাড়ী পরিয়া পিত্তলের গহনা দ্বারা সজ্জিত হইয়া যখন রাণী বা দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিত, তখন তাহাদিগকে দেখিতে কিরূপ হইত, তাহা পাঠকগণকে কল্পনানেত্রে দর্শন করিতে অনুরোধ করি। সেকালে পাউডার, লিপষ্টিক প্রভৃতি ছিল না। একালে যেমন যাত্রা বা থিয়েটারে "ড্রেসার" মুখে ঠোটে রং মাখাইয়া এবং সেমিজ, সায়া প্রভৃতি পরাইয়া, কৃষ্ণকায় শীর্ণ ব্যক্তিগণকেও একরূপ চলনসই স্ত্রীলোক সাজাইয়া দেয়, সেকালে তাহা ছিল না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই নায়িকাদিগের বিকট মূর্ত্তি দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যাইত না। মহেশ চক্রবর্ত্তীর দলে, মনোমোহন বসু প্রণীত "সতী নাটক", "হরিশ্চন্দ্র" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হইত। সতী নাটকের অভিনয়ে যে সতী সাজিত তাহারই মাথায় প্রথমে পরচুলা দেখি।

মহেশ চক্রবর্ত্তীর দলে বৈষ্ণবচরণ নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত। সে জাতিতে বাগ্দী ছিল, কিন্তু তাহার মত সুকণ্ঠ গায়ক ও সুদক্ষ অভিনেতা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহার অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক হইত। সে সতী নাটকে সতীর জননী এবং হরিশ্চন্দ্র নাটকে হরিশ্চন্দ্রের মহিষী শৈব্যা সাজিত। তাহার চেহারাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। শিবনিন্দা শ্রবণে মূর্চ্ছিতা সতীকে দেখিয়া প্রসূতি যখন সরোদনে গান ধরিত :—

"ধর ধরগো তোমরা ধরে তোল কি হ'ল হায় সতীর কি হ'ল,
পতিনিন্দা শুনে বুঝি সতী আমার প্রাণে ম'ল।"

অথবা শৈব্যার ভূমিকায় যখন সে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে কোলে করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া গান গাহিত—

"কোথা রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখ নয়নে,
প্রাণের রোহিত তোমার পড়ে শ্মশানে।"

তখন দর্শক বা শ্রোতাদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন একজনও লোক থাকিত না, যাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত না।

আমি যাত্রার দলের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, সুতরাং কোন্ দলের পর কোন্ দলের আবির্ভাব হইয়াছিল, অথবা কোন্ দলে কাহার রচিত গান গাওয়া হইত, যাত্রার পালা

কাহার দ্বারা রচিত হইত, সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা বাল্যকালে ও যৌবনে যেরূপ অভিনয় ও সাজ-সজ্জা যাত্রার দলে দেখিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিব। একালের থিয়েটার-বায়স্কোপ-টকিপ্রিয় তরুণ তরুণীর দল আমার এই বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের যাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন, এই আশাতে সেকালের যাত্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা যদি এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া না যাই, তাহা হইলে বোধ হয় আর পঁচিশ বৎসর পরে, তরুণ বাঙ্গালী কল্পনা করিতেই পারিবেন না যে, তাঁহাদের পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি কিরূপ অভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। শুধু আনন্দ লাভ নহে, যাত্রার প্রতি তাঁহাদের এত আসক্তি ছিল যে, মফস্বলে কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে তিন চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও দলে দলে লোক মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গিয়া যাত্রার স্থলে সমবেত হইতেন।

নবীন গুঁয়ের দলে প্রধানতঃ রাম-বনবাসের পালা হইত। হয়ত অন্য পালাও হইত, কিন্তু আমি অন্য কোন পালা দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না। নবীন গুঁই, মদন মাষ্টারের সাক্‌রেদ হইলেও মহেশ চক্রবর্ত্তী বা রাম বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি তাঁহাদের ওস্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতেন, বোধ হয় নবীন গুঁই সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার যাত্রা এক নূতন ধরণের হইয়াছিল। রাম-বনবাস অভিনয় হইতেছে, রাম গিয়া কৌশল্যার নিকট হইতে বনগমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, শুনিয়াই কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন :—

"ওরে রামশশী, হবি বনবাসী,
কে আমারে ডাকবে মা ব'লে।
ক্ষীর সর নবনী ল'যে
আমি দিব কার বদনকমলে,
ডাকবে মা ব'লে॥"

এ পর্য্যন্ত অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই, কিন্তু ইহার পরের বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকগণ বোধ হয় বিশ্বাস করিবেন না যে, সেকালে, অন্ততঃ এক কালে এরূপ অভিনয় হইত। কৌশল্যা যখন দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ গান করিতেছিলেন, তখন পুত্রশোকে বিগতপ্রাণ রাজা দশরথ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বেহালা লইয়া কৌশল্যার গানের সঙ্গে সুর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেকালে অধিকাংশ যাত্রাতে যখন নায়ক বা নায়িকা একাকী গান গাহিত, তখন বেহালা-বাদক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইত। নবীন গুঁয়ের দলে বেহালাবাদক দশরথ সাজিয়াছিল, সুতরাং তাহার মৃত থাকা চলে না, তাহাকে উঠিয়া বেহালা বাজাইতেই হইল। রাজা বেহালা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলে সুমিত্রা এবং উর্ম্মিলা দুই জনে উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ তালে তালে মন্দিরা বাজাইতেছেন। এই অবকাশে রাম বসিয়া একটা ছোট হুঁকাতে ধূম পান করিয়া লইলেন। সীতাদেবী রামের হুঁকা হইতে কলিকা তুলিয়া লইয়া রামের আড়ালে একটু কাত হইয়া (পাছে গুঁই মহাশয় দেখিতে পান) শোঁ শোঁ করিয়া কলিকায় দুই চারিটা টান দিয়া কলিকাটা অন্য লোকের হাতে দিলেন এবং হাতে তালি দিয়া "বা বেটী বা" বলিয়া বারংবার নৃত্যকারিণী সুমিত্রা ও উর্ম্মিলা দেবীকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক পাঠিকাগণ হাসিবেন না, এইরূপ অভিনয় আমি অনেক বার দেখিয়াছি।

রাম-বনবাসের পালা, রামের বনগমনেই শেষ হইত না, রাবণ-বধ পর্য্যন্ত হইয়া অবশেষে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে রামসীতাকে বসাইয়া তবে পালা শেষ হইত। রামের বন-গমনের পর সূর্পনখার নাসা-ছেদন। একজন সূর্পনখা সাজিয়া রাম ও লক্ষ্মণের কাছে প্রেমভিক্ষা করিতে আসিত। তাহাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার যখন আসিত, তখন নাসিকাহীন একটা মুখস পরিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া আসিত। তাহাকে দেখিবা মাত্র লক্ষ্মণ ধনুকের রজ্জু দ্বারা (কেননা লক্ষ্মণের ধনু ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র থাকিত না) সূর্পনখার নাক কাটিয়া ছাড়িয়া দিত। সূর্পনখা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সানুনাসিক স্বরে একটা গান গাহিয়া আসরে নৃত্য করিত। সে গানটা আমার মনে নাই। তাহার পর রাবণ আসিত, মন্দোদরী আসিত। সূর্পনখাকে দেখিয়া মন্দোদরী গান ধরিত :—

"ছি, ছি, ছি, কালামুখী হয়েছি অবাক্,
কোন বনেতে গিয়েছিলি কে কেটে দিয়েছে নাক।"

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দোদরী ও সূর্পনখা উভয়েই নৃত্য করিত। নাচের গানগুলো সাধারণতঃ খেমটা তালে হইত।

তাহার পর মায়ামৃগের পালা। একটা সোনালি পাতে-মোড়া পুরু কাগজের হরিণাকৃতি খোলের ভিতর একটা ছেলে ঢুকিয়া নাচিতে নাচিতে আসরে আসিত। সেই হরিণের গলদেশে দুইটা ছিদ্র থাকিত, যে হরিণ সাজিত, সে সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইত। হরিণ যখন আসরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত, তখন গান হইত :—

"ওমা মৃগ তুই কেন এলি বনে,
এই বনে তোর মৃত্যু হবে শ্রীরামের বাণে।"

এইবার হনুমানের পালা। রামযাত্রায় হনুমান না থাকিলে চলিত না। সেকালের হনুমানেরা একালের হনুমানদের মত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লম্বাচওড়া বক্তৃতা করিত না। তাহারা আসরে প্রবেশ করিয়াই হনুমানের মত "হুপ্" "হুপ্" শব্দ করিয়া লম্ফ প্রদান করিত এবং আসরের মেরাপ বা মঞ্চের উপর উঠিয়া হনুমানের মত দোল খাইত, নানা প্রকার কসরৎ দেখাইত। যদি কোন দর্শক হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া সুপক্ক কদলী নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে হনুমান সেটা লুফিয়া লইয়া খোলা সুদ্ধই কামড়াইয়া খাইয়া ফেলিত এবং মধ্যে মধ্যে দন্ত বিকাশ করিত। হনুমানের সজ্জা ছিল একটা ধূসর বর্ণের আপাদমস্তক ঢাকা পোষাক, একটা সুদীর্ঘ লাঙ্গুল। মুখে ও হাতে কালি মাখা। শুনিয়াছি যে, একবার একজন সাহেব যাত্রার হনুমান দেখিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই হনুমানকে দশ টাকা বকশিস দিয়াছিলেন। সেই সাহেবকে কোথায়ও যাত্রা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তিনি অগ্রে সংবাদ লইতেন যে, হনুমান আসিবে কি না। তিনি নাকি একবার যাত্রাতে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ পালা দেখিতে গিয়া জেদ ধরিয়াছিলেন—"মংকি বোলাও।" সাহেবের আগ্রহে একজন লোক হনুমান সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল।

নবীন গুঁয়ের এই রাম-বনবাসের পালায় দেখিয়াছি, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গিয়া দ্বার বন্ধ পূর্ব্বক ধরাসনে উপবিষ্ট : রাজা দশরথ ঐ সংবাদ শ্রবণে অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক মহিষীর অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু রাণী কিছুতেই দ্বার খুলিলেন না। তখন রাজা নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ওহে নগর-বাসিগণ—"

—যেন অযোধ্যানগরের সমস্ত অধিবাসী রাজার অন্তঃপুরে ক্রোধাগারের নিকট উপস্থিত। রাজার আহ্বান শ্রবণমাত্র —জুড়ি, ছোকরা, বাদকের দল ও অভিনেতা প্রভৃতি "নগর-বাসিগণ" একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"হুঁ। হুঁ।" রাজ-আহ্বানের যোগ্য সসম্মান উত্তর!

রাজা বলিলেন—"বড় রাণী যে ক্রোধালয়ে দ্বার বন্ধ করে বসে আছেন, কিছুতেই দ্বার খোলেন না, কি করি?"

নগরবাসীগণ পরামর্শ দিল—"মহারাজ পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ করুন।"

রাজা বলিলেন—"তবে পদাঘাতেই দ্বার ভঙ্গ করি, কি বল?"

নগরবাসীগণ বলিল—"হুঁ। মহারাজ, তাই করুন, পদাঘাতেই দ্বার ভঙ্গ করুন।"

রাজা তখন ভূমিতে এক পদাঘাত করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ঢোলক, ডুগী, তবলা, মন্দিরা প্রভৃতিতে একবার আঘাত করিয়া দ্বার ভাঙ্গার শব্দ করা হইল।

মহেশ চক্রবর্ত্তী বা রাম বাঁড়ুয্যের দলে এরূপ অস্বাভাবিক অভিনয় বা গান প্রভৃতি কখনও শুনি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দলে "সতী নাটক" ও "হরিশ্চন্দ্র নাটক" সাধারণতঃ অভিনীত হইত। রাম বাঁড়ুয্যের দলে "বিরাট পর্ব্ব" বা "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয় হইত। সেই পালাতে রামলাল চট্টোপাধ্যায় অর্জ্জুন বা বৃহন্নলা সাজিতেন। রাম বাঁড়ুয্যের দলে যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি অভিনেতাদের চেহারা একেবারে রাজার মত না হউক, ভদ্রলোকের মত ছিল; সুতরাং তাহারা রাজার পোষাক পরিলে মানাইত মন্দ নয়। একটু গোলমাল বাধিত রামলাল বাড়ুয্যের গোঁফ লইয়া। অর্জ্জুন বেশে কোন রূপ গোলযোগ হইত না, কিন্তু নপুংসক বৃহন্নলার নারীবেশে সগুম্ফ আসরে উপস্থিতিটা বড়ই অশোভন হইত। বৃহন্নলা সেই জন্য একখানা রুমাল দিয়া গোঁফ ও মুখ চাপা দিয়া থাকিতেন, পরে অর্জ্জুন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মুখ হইতে রুমাল নামাইতেন।

এই রামলাল চট্টোপাধ্যায় কিছু দিন রাম বাঁড়ুয্যের দলে থাকিয়া পরে পৃথক দল করিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন দলেও

"বিরাট পর্ব্ব" পালা হইত, কিন্তু তিনি তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। রামলাল চাটুয্যেই বোধ হয় প্রথমে যাত্রাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে যাত্রাতে আর কাহাকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করিতে শুনি নাই। তাঁহার বিরাট পর্ব্বে, গোধন উদ্ধার-কালে অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধে অসিভঙ্গ হইলে দুর্য্যোধন বলিলেন :—

"নিরস্ত্র হয়েছি এবে পেয়েছি সময়
বধ মোরে ধনঞ্জয়—"

উত্তরে ধনঞ্জয় বলিলেন :—

"ধনঞ্জয় তোর মত কাপুরুষ নয়,
ধর অস্ত্র, যোঝ পুনঃ মর কিম্বা মার"

প্রভৃতি অথবা "অভিমন্যু বধ" পালাতে, অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদে অর্জ্জুনের বিলাপোক্তি :—

"কি করে শুনিনু অহ ভীষণ বচন,
বামন হইয়া চন্দ্র করেতে স্পর্শিল
ডুবিল সামান্য বাতে দীর্ঘ জলযান—"

প্রভৃতি আমরা বাল্যকালে রামলাল চাটুয্যের স্বরচিত বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু পরে দেখিলাম যে, কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের একখানা নাটকে ঐ সকল কথা অবিকল আছে। যাহা হউক, সেকালের অভিনেতাদের মধ্যে রামলাল চাটুয্যেই এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এল-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, অন্য কাহারও বিদ্যা অতদূর অগ্রসর হয় নাই, এইরূপ একটা জনরব শুনিয়াছিলাম। মদন মাষ্টার বা নবীন ডাক্তারের বিদ্যা কতদূর ছিল, তাহা শুনি নাই। সেকালের যাত্রা ক্রমে ক্রমে কিরূপে ষ্টেজবিহীন থিয়েটারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আজকাল যে সকল যাত্রা শুনি, তাহা আসরে নামিলেই যাত্রা, ষ্টেজে উঠিলেই থিয়েটার।

আমার প্রবন্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সুতরাং সেকালের যাত্রা সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। আজকাল যেরূপ কলিকাতায় থিয়েটারের অনুকরণে প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এক একটা থিয়েটার পার্টি গজাইয়া উঠিয়াছে, সেকালেও মফস্বলে অনেক গ্রামেই সেরূপ সখের যাত্রার দল ছিল। সেই সকল যাত্রার গাওনা সন্নিহিত দুই চারিটি গ্রাম ব্যতীত দূরবর্ত্তী কোন স্থানে বা কোন সহরে হইত না। সহরে যাত্রার প্রয়োজন হইলে হয় কলিকাতা হইতে মতি রায়, নবীন ডাক্তার প্রভৃতির অথবা চন্দননগর হইতে মাষ্টারদের, মহেশ চক্রবর্ত্তীর বা রাম বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির "বায়না" হইত। পল্লীগ্রামের সখের দলগুলি সর্ব্বাংশেই স্থানীয় ছিল। ভিন্ন গ্রামের লোক সেই যাত্রায় যোগদান করিত না।

বড় বড় গ্রামে দুই তিনটা যাত্রার দল থাকিত, হয়ত এখনও আছে। উত্তরপাড়ার দল, দক্ষিণ পাড়ার দল, এমন কি দুলে পাড়ার দলের কথাও শুনিয়াছি। অনেক গ্রামে দুলে, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক-দিগেরও সখের যাত্রার দল ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর যাত্রাতে কিরূপ অভিনয় হইত তাহার একটু নমুনা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বর্দ্ধমান জেলায় কোন সুদূর পল্লীগ্রামের দুলে-পাড়ার যাত্রাতে "বেহুলা" পালা গাওনা হইতেছিল। মনসা, বেহুলা, লখীন্দর, চাঁদ সওদাগর প্রভৃতি সকলেই নিম্নশ্রেণীর লোক—দুলে, বাগ্দী প্রভৃতি। সকলেই ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ম্যালেরিয়ানিবন্ধন শীর্ণকায়। সকলেই দরিদ্র বলিয়া পরিচ্ছদের কোন পারিপাট্য নাই। অভিনেতারা সাধুভাষায় কথোপকথন করিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করে, কিন্তু ভাষাজ্ঞান কাহারও নাই। মনসা দেবী চাঁদ সওদাগরের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, লখীন্দরের সর্প-দংশনে মৃত্যু ঘটাইবেন, কিন্তু বেহুলা সতী জাগ্রৎ থাকিলে লখীন্দরের মৃত্যু হইবে না, তাই বেহুলাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য নিদ্রাকে আহ্বান করিলেন—"কোথায় হে নিদ্দে (নিদ্রে) কোথায়?" নিদ্রা বলিল—"এজ্ঞে আইচি" (আজ্ঞে আসিয়াছি)। মনসা বলিলেন—"বেহুলার কন্ধে ভর করগা গেয়ে।" নিদ্রা করযোড়ে বলিল, "এজ্ঞে চন্নাম" (আজ্ঞে চলিলাম)। বেহুলার স্কন্ধে নিদ্রা ভর করিল, বেহুলা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন মনসা দেবী স্বীয় অনুচর কালীয় নাগকে স্মরণ করিলেন—"কোথায় হে কালীয় নাগ?" কালীয় নাগ করযোড়ে বলিল—"এজ্ঞে আইচি।" "নখীন্দরকে ডংশাও (দংশন কর) গেয়ে।" কালীয় নাগও "এজ্ঞে চন্নাম" বলিয়া বিদায় লইল।

এই শ্রেণীর যাত্রা পল্লীগ্রামের সকল স্থানে না হউক, অনেক স্থানেই এখনও আছে।

ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়

প্রথম অভিব্যক্তি

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়াব যেমন কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তেমনই মহাপুরুষের—বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের—জীবনেরও একটা সুনির্দ্দিষ্ট কাঠামো আছে। এ-দুয়ের প্রথমগুলিকে না মানিয়া লইলে মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন লোকে উহাকে পূজার বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে না; দ্বিতীয়টির বাহিরে গেলে জীবনীকার যতই সত্যপরায়ণ হউন না কেন তাঁহাব উপর কালাপাহাড়ত্বের অপবাদ আরোপিত হইবেই হইবে। এই জনপ্রচলিত ধারণা অনুসারে ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনে কতকগুলি বিশেষ ঘটনা ও লক্ষণের সমাবেশ অবশ্যপ্রয়োজন। যেমন, তাঁহাকে হয় বংশপরম্পরা এমন কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে যেখানে তাঁহার সিদ্ধপুরুষ না হইয়া অন্য কিছু হইবার উপায় নাই, অথবা তাঁহাকে একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাল্যকালে তাঁহাকে সাধারণ বালকের মত খেলাধূলায় মত্ত না থাকিয়া অতিশয় অধ্যয়ন-পরায়ণ ও তত্ত্বান্বেষী হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কৈশোরে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে চাহিবেন, কিন্তু পিতা কোন সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া সে বৈরাগ্য অপনোদন করিবেন। চতুর্থতঃ, ইহাতেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ থাকিবেন না—ইত্যাদি।

রামমোহনের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। রামমোহন ইংরেজী যুগের বাঙালী; তাঁহাকে র‍্যাশনালিষ্ট বা যুক্তিবাদী বলা হয়; তিনি হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কাব ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন; তিনি যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা সে-সম্প্রদায়ও হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের কুসংস্কারকে হৃদয় মনের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও রামমোহনের জীবনচরিত হিন্দু সিদ্ধপুরুষের ছাঁচে ঢালা হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ রামমোহনেব ইংরেজী বা বাংলা যে-কোন জীবনী পড়িলেই পাওয়া যায়। এই সকল জীবনচরিত হইতে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা জানিতে পাবি যে তাঁহার জন্মেব মধ্যেই নিয়তির একটা ইঙ্গিত ছিল। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব, কিন্তু মাতৃকুল শাক্ত। একটি বিশেষ ঘটনার ফলে এই দুই বংশের কুটুম্বিতা ঘটে। ঘটনাটি এই—রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে যখন গঙ্গাতীরস্থ হন, তখন শ্রীরামপুরের নিকটে চাতরা গ্রামের শ্যাম ভট্টাচায্য তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য সম্ভ্রান্ত বংশের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ব্রজবিনোদ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভট্টাচায্য বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া এই আজ্ঞা করুন যে আপনার যে-কোন একটি পুত্রকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" শ্যাম ভট্টাচার্য্য শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন, সুতরাং ব্রজবিনোদ বিপদে পড়িলেন। কিন্তু কি করেন, ভাগীরথী-তীরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ভট্টাচায্যেব প্রার্থনা পূর্ণ কবিবেন। তখন তিনি এক-একজন করিয়া পুত্রদিগকে ডাকিয়া তাঁহার সত্য রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহাব সাত পুত্রের মধ্যে ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু পঞ্চম পুত্র রামকান্ত আহ্লাদের সহিত পিতৃসত্য পালন করিতে স্বীকার করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে তারিণী দেবীব গর্ভে রামমোহনের জন্ম হয়। *

জীবনীকারদের মতে এই ঘটনা হইতে রামমোহনেব জীবনের দুইটি ধারা সূচিত হয়। প্রথমতঃ, আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, রামকান্ত পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কার-স্বরূপ রামমোহনরূপ পুত্ররত্ন লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন, "Synthesis is the characteristic mark of Raja Rammohun Roy"—অর্থাৎ সমন্বয়ই রাজার বৈশিষ্ট্য এবং এই সমন্বয়ের সূচনা হয় রাজার জন্মে—"Siva and Vishnu both watched over his cradle as his ancestral tutelary deities on the maternal and paternal

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: জীবনী ৯ পৃ.; Collet, p. 2.

sides." ("Rammohun Roy: The Universal Man.")

ইহার পর রামমোহনের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তিনি যখন শিশু, তখন তাঁহার মাতা তারিণী দেবী তাঁহাকে লইয়া পিত্রালয়ে যান। সেই সময়ে একদিন মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার পূজার পর একটি বিল্বদল দৌহিত্রের হাতে দেন। কিছুক্ষণ পরে তারিণী দেবী আসিয়া দেখেন শিশু রামমোহন সেই বেলপাতা চিবাইতেছেন। ইহাতে বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিতা তারিণী দেবীর বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি পুত্রের মুখ ধোয়াইয়া দিয়া পিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কন্যা কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শ্যাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও কন্যাকে শাপ দিলেন, "তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পারিবি না। এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে।" পিতার এই অভিসম্পাত শুনিয়া তারিণী দেবী অত্যন্ত কাতর হইয়া শাপান্ত হইবার জন্য পিতার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমার বাক্য অব্যর্থ, তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে।" তারিণী দেবী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বামীকে এই শাপের কথা বলিলেন ও দুই জনেই আপনাদের বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী পুত্রকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

পরিণামে যে এই শিক্ষার কোন ফল হয় নাই তাহা সুবিদিত। কিন্তু কিছুদিনের মত রামমোহন প্রচলিত ধর্ম্মে খুব আস্থাবান হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি গৃহ-দেবতা রাধাগোবিন্দকে যারপরনাই ভক্তি করিতেন। তাঁহার এই কৃষ্ণভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তিনি বাড়িতে মানভঞ্জন পালা হইতে দিতেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পায়ে ধরিয়া কাঁদিবেন, শিখিপুচ্ছ পীতধড়া ধূলায় লুটিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এই সময়ে তিনি ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না-করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাইশ বার পুরশ্চরণ ব্রত করিয়াছিলেন। রামমোহনের জীবনের এই ভাগকে মিস্ কলেট তাঁহার 'হিন্দু পিরিয়ড' বলিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের হিন্দু পিরিয়ডের মত এই 'হিন্দু পিরিয়ড'ও চিরস্থায়ী হইল না। নয় বৎসর পার হইতে-না-হইতেই রামমোহনের 'মুসলমান পিরিয়ড' আরম্ভ হইল। আর্বী ও ফার্সীতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সেই বয়সেই রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। সেইখানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া রামমোহন আর্বীতে কোরাণ, আরিষ্টটল্, ইউক্লিড, প্লেটো ইত্যাদি পড়িলেন ও সুফী মতের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন।

দুই তিন বৎসরের মধ্যেই যখন তিনি আর্বী ফার্সী বিদ্যায় পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন, তখন "সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ করিবার জন্য" তাঁহার পিতা তাঁহাকে বারো বৎসর বয়সে পাটনা হইতে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেদাদি শাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সেখান হইতে তিনি আন্দাজ চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় হইতেই পিতাপুত্রের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ, তার পর প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান, এ-দুয়ের সন্ধান পাইয়া রামমোহন হিন্দুদিগের "উপধর্ম্মে" শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। এই সকল বিশ্বাস ও আচার লইয়া পিতাপুত্রে গভীর শাস্ত্রীয় তর্ক হইত। পুত্রের ভিন্ন মত দেখিয়া পিতা দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন, কিন্তু পুত্রকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। অবশেষে রামমোহন শুধু তর্কে সন্তুষ্ট না রহিয়া ষোল বৎসর বয়সে "হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। তখন রামকান্ত রায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রামমোহন প্রথমে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানেও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে লামা-পূজা দেখিয়া রামমোহন মর্ম্মাহত হইলেন। যে-রামমোহন পৌত্তলিকতা সহ্য করিতে না পারিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তিনি এই ভয়ানক কুসংস্কার সহ্য করেন কি করিয়া? সেখানেও তিনি তর্কবিতর্ক করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিতেন। একমাত্র তিব্বতী মেয়েদের স্নেহভাজন ছিলেন

বলিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সত্যসত্যই কোন সঙ্কটে পড়িতে হয় নাই।

চার বৎসর ভ্রমণের পর রামমোহন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা এদিকে তাঁহার খোঁজ করিবার জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আনন্দের সহিত পুত্রকে ঘরে ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু পুরাতন কলহ আবার দেখা দিল। রামমোহন প্রচলিত ধর্ম্ম, সতীদাহ-প্রথা প্রভৃতি লইয়া আবার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। তখন রামকান্ত রায় আবার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদায় দিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার পর রামমোহন যে কোথায় যান, প্রচলিত জীবনী হইতে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কিন্তু মিস্ কলেট্ অনুমান করেন, রামমোহন তখন আবার কাশী গিয়া সংস্কৃত পুঁথি লিখিয়া কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত যতগুলি রামমোহন-জীবনী আছে, তাহা হইতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু অর্থাৎ ১৮০৩ সন পর্যান্ত রামমোহন সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহার চুম্বক দেওয়া হইল। এই সময়ের পর তাঁহার জীবনীগুলিতে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অপেক্ষা ঐহিক ও আধিভৌতিক ঘটনার সমাবেশ বেশী। তবু রামমোহন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা প্রথম জীবনের এই কাহিনীর উপরই প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্মই রামমোহনের জীবনের বুনিয়াদ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধক বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি। এ-কথাটা বেশী তথ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরশ্চরণ ব্রতের উল্লেখ করিয়া রামমোহনকে mystic বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন,—"Rammohun's predecessors, Kabir, Nanak, Dadu and innumerable saints and seers of medieval India..." ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য এই সকল অভিমতের মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। রামমোহনের সমকালে এবং পরবর্ত্তী যুগেও অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সুখানন্দ স্বামী নামে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেন, "রামমোহন রায় অবধূত থা।" আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "তন্ত্রমতে সাধন করিয়া যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা হন, তাঁহাদিগকে তান্ত্রিকেরা অবধূত বলেন।"

২

প্রচলিত জীবনচরিত হইতে রামমোহনের প্রথম জীবনের এই যে চিত্র পাওয়া যায় উহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের গতানুগতিক চরিত্র-চিত্র। উহাতে রামমোহন যে-যুগে যে-দেশে জন্মিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্যের কোন সন্ধান পাই না, ঐতিহাসিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-ক্ষমতার লেশমাত্র পরিচয়ও ইহাতে নাই, উহা বাস্তব জীবনের আলো-ছায়া-বর্জ্জিত ভক্তের দ্বারা ভক্তের জন্য লিখিত অলৌকিক আখ্যায়িকা মাত্র। ঐতিহাসিকের নিকট এই আখ্যায়িকার কোন মূল্য নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই, উপাদানের অভাবে এই চিত্র ছাড়া অন্য কোন চিত্র পাঠকদের নিকট ধরা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন কখন কি-ভাবে হয়, তিনি কেন প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন, এই নূতনত্বের অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট কোথা হইতে আসে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে রামমোহনের জীবনী লেখার কোন সার্থকতা থাকে না। অথচ সন্তোষজনক প্রমাণসহ রামমোহনের ধর্ম্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আজিকার দিনে আর সম্ভব নয়।

কিন্তু কালানুক্রমিক সুসম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার আশা ছাড়িয়া দিলেও রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা একেবারে অসম্ভব—এ-কথা মনে করিবার কারণ এখনও হয় নাই। রামমোহনের বাল্য ও যৌবনের কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ আমাদের আছে। এগুলি হইতে তাঁহার মন ও কার্য্যকলাপের গতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গৌণ রীতি অবলম্বন করিয়াই রামমোহনের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করা হইবে এবং এই আলোচনা হইতে রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কারক বৃত্তি কখন কি ভাবে আরম্ভ হয় তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করা হইবে। প্রশ্নগুলি

এইরূপ, রামমোহনের প্রথম জীবনের আবেষ্টনী কিরূপ ছিল? বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? সত্যই ধর্ম্মমত লইয়া পিতার সহিত তাঁহার কোন মতান্তর হয় কিনা? তিনি সত্যসত্যই বাল্যে ও যৌবনে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ ও বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কি? তাঁহার দ্বারা ষোল বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক-রচনার যে উল্লেখ আছে তাহার মূলে সত্য কতটুকু? ইত্যাদি।

রামমোহনের প্রথম জীবনের আবেষ্টনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই মনে রাখা উচিত তিনি বিষয়ী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই আবেষ্টনী বর্ণনা করিবার আগে তাঁহার পিতা ও মাতার বিবাহ সম্বন্ধে যে-গল্প প্রচলিত আছে সে-সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া লইতে চাই। রামকান্ত রায় যে আসন্নমৃত্যু পিতা ভাগীরথী-তীরে সত্য করিয়াছেন বলিয়া পিতাকে সত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তারিণী দেবীকে বিবাহ করিয়া পিতৃভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ রামমোহনরূপ পুত্ররত্ন লাভ করেন নাই তাহা সুনিশ্চিত। কারণ এই কাহিনী সত্য হইতে হইলে ব্রজবিনোদ রায়ের মৃত্যু রামকান্ত রায় ও তারিণী দেবীর বিবাহের পূর্ব্বে এবং রামমোহনের জন্মের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল মানিতে হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণ কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সম্প্রতি আমার ব্রজবিনোদ রায়ের স্বাক্ষরিত একখানি দানপত্র দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। উহার তারিখ ১১৮৬ সালের ১৭ই বৈশাখ অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৭৯ সনের মে মাস (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রজবিনোদ রায় রামমোহনের জন্মের পাঁচ বা সাত বৎসর পরে ত নিশ্চয়ই, সম্ভবতঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

এখন বক্তব্যে ফিরিয়া আসা যাউক। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলার মুসলমান-সরকারে চাকুরী করিয়া রায়-রায়ান উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায়ও আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে চাকুরী করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য ইঁহাদিগকে মুসলমান আমলের বড় জমিদার বা রাজকর্ম্মচারী বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। রায়-পরিবার বর্দ্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবার মাত্র ছিল। এই ধরণের পরিবার তখন বাংলা দেশে মোটেই বিরল ছিল না। সে-যুগে অনেক বাঙালী মুসলমান-শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী লইতেন ও চাকুরীর দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া সম্পত্তি কিনিয়া স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেন। নিজেদের জমিজমার তত্ত্বাবধান করার ফলে খাজনা-আদায়ের কৌশল এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের খুব আয়ত্ত ছিল। ইঁহারা ফার্সী জানিতেন, রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনকানুনও ইঁহাদের নখ-দর্পণে থাকিত। সুতরাং ইঁহারা যে কেবলমাত্র প্রজার নিকট হইতেই খাজনা আদায় করিতে পারিতেন তাহাই নহে, সরকার বা জমিদারকে ফাঁকি দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিতেন। বিষয়কর্ম্মের জন্য যতটুকু লেখাপড়া জানা প্রয়োজন, উহার বেশী বিদ্যাচর্চ্চা ইঁহারা করিতেন না। ধর্ম্ম ইঁহাদের কাছে আচারনিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এমন কি শাস্ত্রচর্চ্চাকেও ইঁহারা যজন-যাজনকারী পুরোহিত ব্রাহ্মণের কাজ বলিয়া একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। অর্থোপার্জ্জন ও সম্পত্তিবৃদ্ধিই এই অর্দ্ধ-ভূস্বামী অর্দ্ধ-রাজকর্ম্মচারী শ্রেণীর প্রধান চিন্তা ছিল।

রামমোহনের পিতৃ-পিতামহ আত্মীয়স্বজন সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত বিষয়ী ভদ্রলোক ছিলেন। ইঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্রহ্মোত্তরই প্রধান ছিল। রায়-বংশের পারিবারিক দলিলপত্র হইতে জানা যায়, যে-কৃষ্ণচন্দ্র রায় মুসলমান-সরকারের নিকট হইতে রায়-রায়ান উপাধি পান বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, তিনিও বর্দ্ধমানের বৃত্তিভোগী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এবং ব্রজবিনোদ উভয়েই বর্দ্ধমানের মহারাজ জগৎচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে বহু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর পান। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও বর্দ্ধমানের বৃত্তিভোগী, ইজারাদার এবং কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহার উপর তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে একটি পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। এই সকল সম্পত্তি হইতে ন্যায্য উপায়ে অর্থলাভ করিয়াই রামকান্ত রায় সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তিনি পরে জমিদার ও কোম্পানীকে খাজনা ফাঁকি দিয়া এবং বর্দ্ধমানের রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়া মিথ্যা দলিলপত্র তৈয়ারী করিয়া পুত্রদিগকে অর্থ ও সম্পত্তি দিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা না-দেওয়ার জন্য

তাঁহাকে ফেরারী হইয়া থাকিতে হয় * এবং অবশেষে দুইবার দেওয়ানী জেলে যাইতে হয়। এই রামকান্ত সম্বন্ধে প্রচলিত জীবনচরিতে কথিত আছে, তিনি অত্যন্ত নিরীহ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন এবং পুত্রের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার এবং তুলসীমঞ্চে বসিয়া মালাজপ লইয়াই থাকিতেন।

এইরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে রামমোহনও যে বাল্য হইতেই বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন তাঁহার জন্ম হয় তখন পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় জীবিত এবং রাধানগরের পৈতৃক বাড়ি বহু পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্রে পরিপূর্ণ। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যে ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজবিনোদ বর্ত্তমান থাকিতেই রায়-পরিবারেও তাহা দেখা দিয়াছিল। সেজন্য ব্রজবিনোদ পুত্রদের মধ্যে তালগাছ তেঁতুলগাছ হইতে আরম্ভ করিয়া জমিজমা পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া দিয়া সকলের দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতেছিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া যেমন কলঙ্কের বিষয়, বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে জ্ঞাতির সহিত মামলা-মোকদ্দমায় পশ্চাৎপদ্ হওয়া ততোধিক লজ্জার কথা। রামমোহনের পরজীবনে জ্ঞাতির সহিত অবিরত মামলা-মোকদ্দমার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা ষোল-সতর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বহুপরিজন একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাসের ফল কিনা তাহা বিচার্য্য।

ইহা ছাড়া রামমোহনের বিষয়বুদ্ধির সাক্ষাৎ প্রমাণও অনেক আছে। বস্তুতঃ রামমোহনের বাল্য ও প্রথম যৌবন সম্বন্ধে যাহা কিছু সুনিশ্চিত সে-সকলই বিষয়কর্ম্ম-সম্পর্কিত—পিতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, পিতার নিকট হইতে সম্পত্তিলাভ, সিভিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া, নিলামী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তি বেনামী ইত্যাদি। এই সকল কার্য্যকলাপের বিস্তৃত পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়াছি।* এই সকল কাজে রামমোহন যে তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়া নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখেন তাহা নিশ্চয়ই শুধু স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিরই ফল নয়,—বহু বৎসর ব্যাপী বৈষয়িক শিক্ষারও ফল।

এই আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত রামমোহন বাল্যে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এই অনুমানের সপক্ষে অন্য যুক্তি আছে। এক এক করিয়া উহাদের বিচার করা যাক।

যৌবনে রামমোহনের ধর্ম্মমত কি ছিল এ-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ যাহা কিছু আছে তাহা হইতে দেখা যায় তিনি তখনও প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন। প্রথমতঃ, বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার বহন করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া ১৭৯৬ সনে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। এই দানপত্রে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর আছে। দ্বিতীয়তঃ, গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সহিত মোকদ্দমায় তিনি যে জবানবন্দী দেন তাহাতে তিনি বলেন যে ১৮০১ সন পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যয় নিয়মিত ভাবে দিয়াছিলেন। † তৃতীয়তঃ, এই মোকদ্দমাতেই

* "Ram Caunt Roy who holds the farm of pergunnahs Bhoorsheet and Gopebhoom under the security of his son having with him absconded to avoid the operation of some Decrees passed against him in the Adawlut, I beg leave to suggest the expediency of attaching the pergunnahs for altho' the revenues have been hitherto paid up regularly, there is no saying (as this is the season of the heavy collections and the last year of the Farmer's lease) whether from the above circumstances, the person left in charge by Ram Caunt Roy may not embezzle and misappropriate the revenues, to guard against which, I am induced to propose the above measure being adopted immediately, for if it is delayed, till after the month of Poose little if any assets can be expected from the pergunnahs. The jumma of the pergunnahs farmed by Ram Caunt Roy payable to Government is Sicca Rupees 1,54,902. 5.9.2 of which sum there has been paid to the end of Cautick Sicca Rupees 71,419."—Letter, dated Burdwan, 14 Nov, 1799, from the Collector of Burdwan to the Board of Revenue.

* ১৩৪০ সালের 'বঙ্গশ্রী'র আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† "...although this defendant and the said Juggomohun Roy from the time of the said partition until about the year of Christ one thousand eight hundred and one when the said Juggomohun Roy became so much embarrassed in his circumstances that he could not contribute to the support of his said mother did from their respective and several earnings profits or funds equally defray the expence of providing food for the families of this defendant and of the said Juggomohun Roy, who were under the superintendance and management of their said mother Tarini Devi in the said house at Nungoorparah and in like manner paid the expence of all religious ceremonies which were

তারিণী দেবীর জন্য যে প্রশ্নাবলী করা হয় তাহা হইতে জানা যায়, পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় একটি শ্রাদ্ধ করেন। যে-ব্যক্তি ষোল বৎসর বয়সে প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করে তাহার পক্ষে বাইশ বৎসর বয়সে বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার বহন করিবার অঙ্গীকার করিয়া পিতার সম্পত্তির অংশগ্রহণ সম্ভব নহে।

পিতার সহিত রামমোহনের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহাতেও এই অনুমানই সমর্থিত হয়। জীবনী-কারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের জন্য রামমোহন দুইবার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এই সকল কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ আমরা সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে রামমোহনও রামকান্ত রায়ের অন্য দুই পুত্রের মত পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রামমোহনের কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দ-প্রসাদ রায়ের মোকদ্দমার একজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে জানা যায় যে, সম্পত্তি-বিভাগের পরও রামমোহন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্দ্ধমান যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন তাহার প্রমাণও আমরা পাই তাঁহার নিজের লিখিত দুইখানি চিঠি হইতে।

এখন দেখা প্রয়োজন রামমোহন বাল্যকালে কাশী ও পাটনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে সত্য কতটুকু। দলিলপত্র হইতে দেখা যায় ১৭৯১ সন হইতে ১৮০০ সন পর্য্যন্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন জায়গায় রহিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ সন পর্য্যন্ত তিনি কখন কোথায় ছিলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। ১৭৯১ সনে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। একমাত্র মাঝের চার বৎসর তাঁহার কার্য্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামকান্ত রায়ের চরিত্র ও রামমোহনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাটনা ও কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা রামমোহনই ধর্ম্মবিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যই দেওয়া হইত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম্ম করিতেন তাঁহারা তখন ফার্সী শিখিতেন ও যাঁহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই দুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে পারিত। উহার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

আর একটি মাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন বাল্যকালেই হইয়াছিল কিনা সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়। তথাকথিত আত্মকথার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। এই আত্মকথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ উহা রামমোহনের স্বরচিত নহে মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পৌত্তলিকতা-বর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে-পুস্তক রচনা করেন উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ সনে প্রকাশিত *Second Appeal to the Christian Public* নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

> "Rammohun Roy…although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system."

এই পুস্তক যে 'তুহ্‌ফাৎ' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন ইহার পূর্ব্বে কোন পুস্তক রচনা বা প্রকাশ করিয়া থাকিলে উহার উল্লেখ এইস্থানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্‌ফাৎ' ১৮০৪ সনের কাছাকাছি প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্পদিন পূর্ব্বে রচিত হয়। এই পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে, "In order to avoid any future change in this book by copyists, I have had these few pages printed just

---

performed by or under the direction of the said Tarini Devi......"—Answer of the Defendant—Rammohun Roy—filed on 4th Octr. 1817.

after composition." সুতরাং রামমোহন যে ১৮০৩৪ সনের পূর্ব্বে বাংলা বা অন্য ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই তাহা প্রায় সুনিশ্চিত। তবে ১৮০০ সনে রামরাম বসু কেরীর অনুরোধে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন ও শ্রীরামপুরের মিশনরীরা উহা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক ভ্রমক্রমে রামমোহনে আরোপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

৩

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার দ্বারা অনেক প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত ব্যাপার যে কি তাহা জানা গেল না। তবে কি এ-বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণের কোন উপায়ই নাই? আমার মনে হয় আছে, কিন্তু সে তথ্যপ্রমাণের পরিমাণ খুব অল্প। এই-সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্তন ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রথমে পারিবারিক কলহ ও মতান্তরের কথাই ধরা যাউক। ধর্ম্মমত ও দেশাচার পালন লইয়া পিতার সহিত বিচ্ছেদ বা মনোমালিন্যের কোন প্রমাণ না-পাওয়া গেলেও মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮০৩ সনের মে-জুন মাসে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এমন কি তাহার পরেও, রামমোহন দেবসেবার খরচ দিয়া আসিতেছিলেন এবং ঝগড়ার ফলে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে হিন্দুমতে করেন।* সুতরাং শ্রাদ্ধের সময়ের কলহ ধর্ম্মমত লইয়া হওয়া সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে এই ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এবং ঘটনার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, দুই জনেই অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন পিতা বা ভ্রাতাকে সাহায্য করেন নাই, ইহা তাঁহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পারে।

এই ঘটনার পর এগার বৎসর রামমোহন বাড়ি ও পরিজন হইতে দূরে ছিলেন। সুতরাং এই কয় বৎসর কোন কলহ হইবার কথা নয় এবং তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনান্তর ও কলহের কাহিনী আবার আরম্ভ হয় রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি প্রকাশিত করিবার পর। ১৮১৬ সনে প্রকাশিত ***Translation of the Abridgment of the Vedanta*** গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন :—

> "By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system."

ইহার পর বৎসরই রামমোহনের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমায় রামমোহনের পক্ষ হইতে তারিণী দেবীকে জেরা করিবার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈয়ারী করা হয় তাহাতে আমরা পাই—

> "আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মোকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমা-পূজা ও হিন্দু-আচার ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই?

---

*"...do you not believe that a separate ceremony or sheraud was performed by the Defendant Rammohun at or near Calcutta to the memory of your late husband and that the expence of such last mentioned ceremony was entirely defrayed by the said Rammohun."—Cross-interrogatories prepared for Tarini Devi, if produced

ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন তাহা হইলে এই মোকদ্দমা হইত না—এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর মানিকতলার বাগানে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্ত্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?"

এই প্রশ্নগুলি হইতে স্পষ্টই মনে হয় প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠার অভাব লইয়া রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে বচসা হইত। রামমোহন ১৮১৪ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রংপুরে ছিলেন, সুতরাং এই সকল কলহ তাহার পূর্ব্বে হয় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে, রামমোহন কলিকাতা ফিরিয়াই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক-প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন। এই-সকল কারণে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের কালকে তাঁহার ধর্ম্মমত পূর্ণবিকশিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত পরিবর্ত্তনের সূচনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮০৩-০৪ সনে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন' গ্রন্থে।

১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকে রামমোহনের ধর্ম্মমত গঠিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার থাকে। প্রথমতঃ, রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তন কাহার প্রভাবে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোথায় ঘটে।

রামমোহনের জীবনে, বিশেষতঃ প্রথম জীবনে, মুসলমানী বিদ্যার প্রভাব সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু তিনি নিজে মানসিক বিকাশ ও উন্নতির জন্য ইংরেজ-সংসর্গকে কিরূপ মূল্যবান মনে করিতেন সে-সম্বন্ধে অনেকের হয়ত সুস্পষ্ট ধারণা নাই; সেজন্য তাঁহার রচনাবলী হইতে একটি মাত্র জায়গা উদ্ধৃত করিতেছি। এদেশে ইংরেজদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া সম্বন্ধে ১৮২৯ সনে কলিকাতায় একটি সভা হয়। সেই সভায় রামমোহন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে—

> "From my personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social, and political affairs; a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity; and a fact which I could to the best of my belief, declare on solemn oath before any assembly."

যে মুসলমান ও ইংরেজ সংসর্গ এবং তাহার ফলে মুসলমানী ও ইংরেজী বিদ্যার সহিত পরিচয় রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশের প্রধান কারণ, তাহা যে কলিকাতায় ঘটে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলিকাতা মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী, এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তখন বহু পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজরাও মুসলমানী ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। এমন কি ১৮০০ সনে মিশনরীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক জন বাঙালী হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই বাঙালীটির নাম রামরাম বসু। তিনি ১৮০১ সন হইতে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতা এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ আমরা পাই। ১৭৯৬ সনে রামমোহন পিতার নিকট হইতে কলিকাতায় একটি বাড়ি পান এবং ১৭৯৭ সনে তিনি কলিকাতায় আসিয়া অ্যাণ্ড্রু র‍্যামজে নামে একজন সিভিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ্জ দেন। ইহার পর দুই তিন বৎসর খুব সম্ভবতঃ

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের লিখিত একখানি পত্রের প্রতিলিপি। [শ্রীযুত সরোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

তিনি স্বগ্রামেই কাটান এবং ১৮০০ সনে কয়েক মাসের বা বৎসরখানেকের জন্য পশ্চিমে যান। কিন্তু ১৮০১ সনে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও তহবিলদার গোমস্তা প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া রীতিমত একটা গদি বা সেরেস্তা বসান। এই সময় হইতে দুই-তিন বৎসর যে তিনি কলিকাতাতেই ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন তিনি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পাই তাঁহার নিজের একখানা ও তাঁহার ইংরেজ বন্ধু ডিগবীর একখানা চিঠিতে। রামমোহন নিজে লিখিতেছেন,—

> "The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adalat and the College of Fort William...."

ডিগবী লিখিতেছেন,—

> "I now beg leave to refer the Board to the Qazi-ul-Quzat in the Sadar Dewani Adalat, to the Head Persian Munshi [Maulvi Allah Dad] of the College of Fort William, and to the other principal officers of those Departments for the character and qualifications of the man I have proposed."

ডিগবীর সহিত রামমোহনের পরিচয়ও কলিকাতাতেই ঘটে। সব দিক হইতেই রামমোহনের সহিত কলিকাতার সংস্রবের পরিচয় আমরা পাই।

৪

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা সন ও তারিখের বিচার মাত্র, দার্শনিক আলোচনা নহে। রামমোহনের ধর্ম্মমত কি ছিল, তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন্ মত দ্বারা কি-ভাবে প্রভাবান্বিত হন এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা এই প্রবন্ধে করা হয় নাই, তাঁহার ধর্ম্মসংক্রান্ত রচনাবলী বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করা হয় নাই। এই সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে দর্শন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমার নাই; কিন্তু ইহাও আমার মনে হয় যে, রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগৃহীত না-হওয়া পর্য্যন্ত এই-সকল সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের আলোচনার দ্বারা সত্য-নির্দ্ধারণের বিশেষ কোন সহায়তা হইবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। রামমোহনের রচিত একটি দুর্বোধ্য ফার্সী পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া অনেকে ইংরেজ ফরাসী বহু দার্শনিকের রচনা সম্বন্ধে রামমোহনের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন, অথচ এই সকল দার্শনিকের রচনা এদেশে থাকিয়া রামমোহনের পক্ষে পাওয়া বা পড়া সম্ভব ছিল কিনা, এমন কি যে-সকল ফরাসী দার্শনিকদের নাম করা হয় তাঁহাদের রচনা সে-যুগে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল কিনা, এই সামান্য গবেষণাও এ-পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। রামমোহনের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে তাহা পড়িয়া মনে হয় জন্ কোম্পানীর সিভিলিয়ানরা সে-যুগে বেইলের অভিধান হইতে আরম্ভ করিয়া 'এনসাইক্লোপিডিয়া' ও ভল্‌তেয়ারের দার্শনিক অভিধান পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থ পকেটে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, অথবা কলিকাতায় তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে এরূপ একটি লাইব্রেরী ছিল যাহা আলেক-জান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। একটু ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে দার্শনিক বিদ্যার চাপে বিচার-বুদ্ধি হয়ত এইরূপে ভারাক্রান্ত হইত না। আজকাল যেমন আমরা ওয়েন, ফুরিয়ে, স্যাঁ সিমোঁ, মার্কসের রচনাবলীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না রাখিয়াও সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিতে পারি, ১৮০০ সনের কাছাকাছি তেমনই অনেক ইংরেজের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'র‍্যাশনালিষ্ট ফিলসফি' সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা অসম্ভব ছিল না।

সে যাহা হউক এই সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ স্থূল ও সহজতর ঐতিহাসিক আলোচনা মাত্র। তবু ইহার দ্বারা রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে তিনটি মোটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রথমেই দেখিতে পাই, রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত বয়সে, এমন কি তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনও একান্ত শৈশবে হওয়া দূরে থাকুক, খুব সম্ভবতঃ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর হওয়া পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত সে-যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত-বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার ও প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে—কাজে দূরে থাকুক মনে মনেও—বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে এই সংশয় ও

বিদ্রোহের সূচনা হয় যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নূতন জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরে ইংরেজী প্রভাবে প্রায় পনর বৎসরে পূর্ণবিকশিত হয়।

মানুষ, কিন্তু অসাধারণ মানুষ। এক জন বাঙালী যুবক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়া, যৌবন পর্য্যন্ত বৈষয়িক ব্যাপারে নিমজ্জিত থাকিয়া, যেদিন একটা নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইল সেদিনই সাড়া দিয়া জীবন্ত মনের পরিচয় দিল এবং আজীবন সাধনা করিয়া এমন একটা নূতন পথ দেখাইয়া দিল,
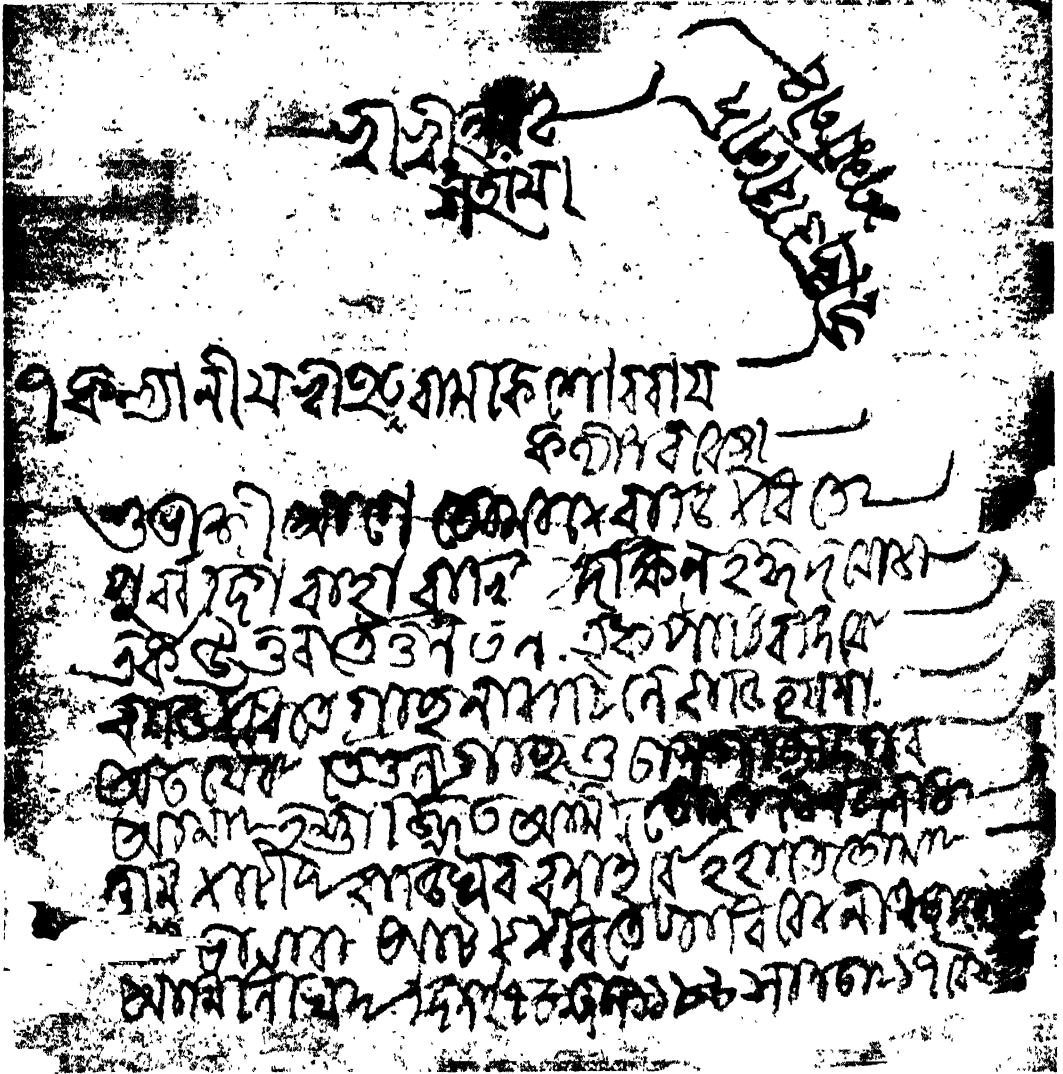
রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায়ের লিখিত একখানি পত্রের প্রতিলিপি। [শ্রীযুত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

এই সিদ্ধান্তে রামমোহনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল কেহ কেহ ইহা নিশ্চয়ই মনে করিবেন। কিন্তু শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়াই কি রামমোহনের শ্রেষ্ঠ গৌরব? ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে যে-রামমোহনকে আমরা পাই তিনি বাস্তব

যে পথ ধরিয়া, ঠিক হউক বা ভুল হউক, সমগ্র ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহার একটুও ধারণা আছে, তিনি অন্ততঃ এই কীর্ত্তিকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তবে

যেখানে ভক্তি ও ভক্তের প্রশ্ন সেখানে অলৌকিক কিছু না হইলে, ইতরজনের তৃপ্তি হয় না। তাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পুরুষ রামমোহনের জায়গায় আমরা দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত এক স্বয়ম্ভূ পুরুষকে খাড়া করিয়াছি।

এই গেল আমার প্রথম সিদ্ধান্ত। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, এই-সকল নূতন তথ্যের বলে রামমোহনের জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্থান সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টতর ধারণা করিতে পারি। এতদিন পর্য্যন্ত সকলে বলিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, রামমোহন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের ভিত্তি। তাঁহার বাল্য ও যৌবন সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাও এই বিশ্বাসের পরিপোষক। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি, আত্ম এবং পর, উভয়ের এবং প্রধানতঃ নিজের ঐহিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই রামমোহনের জীবনের বিশেষ একটি প্রেরণা ছিল। বৈষয়িক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত থাকার ফলে রামমোহন কখনই অর্থ, সম্পত্তি, মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করিতে শেখেন নাই। বিষয়-বাসনাই তাঁহার জীবনের বুনিয়াদ ছিল। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট অন্যান্য বহু জটিল সামাজিক প্রশ্নের মত একটা বিতর্কের সামগ্রী মাত্র ছিল। মনে রাখিতে হইবে, রামমোহন যে যুগের মানুষ সে যুগে সংসারের বাহিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর নিকট তৃণের অপেক্ষা সুনীচ হইলেও সংসারীর নিকট অর্থের উপরে কোন দেবতা ছিল না। রামমোহন এ-কথা জানিতেন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনি সংসারী হইয়াও ইউরোপীয় আদর্শে নিষ্কাম intellectual activityর প্রমাণ দিয়া দিয়াছেন। উহা আমাদের দেশে নূতন। বামমোহনের কীর্ত্তির বিচার করিতে হইলে এই intellectual activityই যথেষ্ট। বেকনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই তাঁহার ক্ষেত্রেও, চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির—character ও intellect-এর—সামঞ্জস্য সাধনের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন আমার শেষ কথাটা বলিয়া এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। রামমোহন বাল্যে পাটনা ও কাশীতে শিক্ষালাভ করেন বলিয়া তাঁহার মানসিক বিকাশ ও পরিণতির জন্য এই দুইটি স্থানকে প্রধানতঃ দায়ী করা হয়। আমরা দেখিয়াছি, রামমোহন কাশী বা পাটনায় শিক্ষালাভ করেন, এ সম্ভাবনা খুবই কম। প্রকৃতপ্রস্তাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দুইটি জায়গার স্থান কোথায়? বরঞ্চ দুইটিকেই মৃত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তখন সমগ্র ভারতবর্ষে একটি মাত্র জীবন্ত জায়গা ছিল। সে জায়গা কলিকাতা। রামমোহনও কলিকাতারই সন্তান। যে সমন্বয়কে রামমোহনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বলা হয়, তাহার সূত্রপাত হয় কলিকাতায় ইংরেজের নেতৃত্বে। রামমোহনও কলিকাতার প্রভাবেই এই ধারাকে পূর্ণতর করেন, এবং কলিকাতাকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘাত ও মিলনের ইতিহাস। এই দোটানার ইতিহাসে কলিকাতার সহিত রামমোহনের ও রামমোহনের সহিত কলিকাতার নাম চিরকাল সংযুক্ত থাকিবে।

পরিশিষ্ট

[মুদ্রিত পত্রের লিখিত বিষয়]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
সন ১১৯৮

শ্রীবরী

শ্রীরামকান্ত রায়

পরগণে ভুরসিট্ট মৌজে ধাউলা গ্রামের কর্ম্মচারি সুচরিতেষু লিখন [ং] কায়ঞ্চ আগে রাধানগর গ্রামের শ্রীরামকিশোর রাএর ব্রহ্মোত্তর জমী গ্রাম মজকুরে ৮ আট বিঘা সরোওা নাফি‘কর আছে তাহাতে সাবেক আমলে দুষ্টতা করিয়া ব্রহ্মোত্তর জমী মহল ফেরা করিয়াছিল এ জমীর তজবিজ করীবাতে ব্রহ্মোত্তর সাব্যস্ত হইল অতএব লিখা জায জমি মহল ফেরা জে হইআছে তাহা ব্রহ্মোত্তর মহলে লিখিবে জমির ফযল বির্ত্তি ভোগীর জি‘র্ম্মে করিয়া দিবে ইতি সন ১১৯৮ সাল তারিখ ২৭ ক[ার্ত্তিক]

শ্রীশ্রীহরি
সহায়

শ্রীব্রজবিনোদ শর্ম্মণঃ

কল্যাণীয় শ্রীজুত রামকিশোর রায়
কল্যাণবরেষু।—

শুভাশী আগে তোমাকে বাড়ি করিতে পূর্ব্বদিগ রাহা রাখি [য়া] দক্ষিণ হদ্দ দরোজা তক্ উত্তর তেঁতুলতলা তক্ পাচির দিবে বাড়ি করিতে গাছ না কাটিলে বাড়ি হয় না অতয়েব তেঁতুল গা[ছ] ও তাল গাছদিগর আমার হস্তার্জ্জিত আমী তোমাকে দিলাম জমি কাটীয়া বাড়িগর বনাইবে ইহাতে তোমার আর ভায়ারা আটক করিতে পারিবেক না এতদর্থে আমি লিখিয়া দিল ইতি সন ১১৮৬ সাল তাং ১৭ বৈশাখ।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বার্ণাড পালিসীর তপস্যা

(১)

বার্ণার্ড পালিসীর নাম তোমরা বোধ হয় শুনে থাকবে। মাটীর উপর এনামেলের কাজ করার বিদ্যা তিনি ফ্রান্সে প্রথম আবিষ্কার করেন। আজকে তাঁর জীবনের কাহিনী তোমাদের শোনাব।

এখানে তোমাদের দুএকটা কথা আগে থেকে বলে রাখতে চাই। বার্ণার্ড পালিসী একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক নন, এমন কি তাঁকে আবিষ্কর্তাও বলা চলে না। তার কারণ, তাঁর বহুপূর্ব্বে এনামেল করার বিদ্যা বহু মানুষ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিনি যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-সময় য়ুরোপে ইটালী এবং জার্ম্মাণীতে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন যাঁরা এই কাজ করতেন, তাঁরা কাউকেই এই বিদ্যা শেখাতেন না। এমন কি, নিজেদের মধ্যেও, যতদূর সম্ভব, কে কি ভাবে কাজ করে, কে কি জিনিষ ব্যবহার করে, তা গোপন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করতেন। পালিসী নিজে চেষ্টা করে এই বিদ্যা শিখেছিলেন। কিন্তু সে জন্যে পালিসীর জীবন আলোচনা করছি না এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে আজও যে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তার কারণ এ নয় যে, তিনি ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথম এনামেলের কাজ শিখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তিনি যে-ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, সারাজীবনব্যাপী পর্ব্বত-প্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছিলেন, সেই অপূর্ব্ব আত্মনিয়োগ, সেই জীবনমরণ-পণ সাধনা, সকল রকম বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সেই মানুষের মত সংগ্রাম করবার শক্তি, তাঁর নামকে জগৎ-বরেণ্য করে রেখেছে। তাঁর জীবন আলোচনায় মনে হয়, কোন নৈরাশ্যই নৈরাশ্য নয়—পথ অতিক্রম করে যাবার পণ সত্যিই যে গ্রহণ করেছে, তার কাছে পথের কোন বাধাই বাধা নয়—যে বলতে পেরেছে অন্ধকারকে বিশ্বাস করি না, সেই পেরেছে শশীসূর্য্য-হীন অন্ধকারে সহস্র দীপ জ্বালিয়ে যেতে। যে চলে, তারই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ।

বার্ণার্ড পালিসীর জীবন সেই পায়ের-তলায় পথকে-জাগিয়ে-যাবারই অপূর্ব্ব কাহিনী।

(২)

কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সঠিক তারিখ জানবার আজ আর কোনও উপায় নেই। তবে অনুমান ১৫০৯ কিম্বা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত পেরিগোর্ প্রদেশে পালিসী জন্মগ্রহণ করেন। পেরিগোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একটু বিচিত্র ধরণের, একদিকে নিত্য-শ্যামল কানন-ভূমি, অন্য দিকে শস্যহীন তৃণহীন রুক্ষ দীর্ঘ উদাস প্রান্তর—পালিসীর জীবনের দুই দিকের যেন দুখানি চিত্র।

তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা একদিন যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং সম্ভ্রমের মধ্যে জীবন-যাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের বংশমর্য্যাদা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকলেও সেই মর্য্যাদা-বোধকে বাঁচিয়ে রাখবার মত ঐশ্বর্য্য তখন আর ছিল না। অল্প টাকায় যাদের অনেকখানি সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে হয়, তাদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সাধারণ লোকে যে-ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে, পালিসী তা'থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করলেন। সেই সময় ফ্রান্সের ধনী লোকদের মধ্যে কাচের উপর রঙিন্ ছবি আঁকাবার খুব সখ ছিল। পালিসী সেই কাজই শিখলেন। ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে তাই তিনি স্থির করলেন যে, কাচের উপর ছবি এঁকেই তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করবেন।

কিন্তু ঘরে বসে এ কাজ করা তখনকার দিনে চলত না। খুব বড় লোক না হলে, এই ধরণের কাজ কেউ একটা বড় করাতেন না। সেইজন্যে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হত—কোথায় কোন্ প্রদেশে কোন্ ধনীর ছবি আঁকাবার বাসনা আছে কে বলতে পারে? ঘুরে বেড়াতে পালিসীর কোন অনিচ্ছাও ছিল না। ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগত—

নিত্য নতুন পথে, নিত্য নতুন দেশে। পথের ধারে প্রত্যেক তৃণফুলটি, গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রত্যেক প্রাণীটি তাঁর পরিচিত ছিল। তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন—প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে তিনি রীতিমত ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। এতখানি মন দিয়ে যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়াও যায়। পালিসী প্রকৃতিকে জানতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্সের প্রকৃতি তাই তার সমস্ত রহস্য সেদিন এই লোকটির সামনে আপনা থেকে যেন উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। পালিসী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ। গাছ-পালা, ফল ফুল, পশু-পক্ষী সম্বন্ধে তাঁর কথা শোনবার জন্যে একসময়ে ফ্রান্সের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বিদ্যা তিনি বই পড়ে অর্জ্জন করেন নি—যাদের কথা তিনি বলতেন, সেই সব গাছপালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী, তারাই তাঁকে শিখিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে কি বলতে হবে।

আঠারো বছর বয়সে পালিসী ঘর ছেড়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায়ও কোন গির্জ্জের জানালায়, কোথায়ও কোন ধনীর বিলাস-কক্ষে, যখন যেখানে কাজ যোগাড় করতে পারেন, সেইখানে পথ চলতে চলতে থেমে পড়েন। সেখানকার কাজ শেষ হলে আবার অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। কিছুদিন এইভাবে একরকম চলে যাওয়ার পর দেখা গেল যে, কাজ পাওয়া ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ মাইল গিয়ে যখন শোনা যায় যে সেখানে কোন কাজ পাওয়া যাবে না—তখন সেই পঞ্চাশ মাইল হাঁটবার কষ্ট-টা আরও বেশী করে লাগে।

প্রায় বার বৎসর এইভাবে কেটে গেল। এই বার বৎসর শুধু উদরান্ন সংস্থানের জন্যই অতিবাহিত হয় নি। এই বার বৎসর কাল তিনি তন্নতন্ন করে প্রকৃতির অনুশীলন করেছেন—দেখেছেন, নীরবে প্রকৃতির মধ্যে অহরহ কি বিরাট সব ব্যাপার ঘটে চলেছে, একটি ফুলকে ফোটাবার জন্যে সমস্ত অরণ্যব্যাপী সে কি বিরাট আয়োজন, একটি তৃণাঙ্কুরকে রক্ষা করবার জন্যে অরণ্যের সে কি আকুলতা! যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায়, এমনি ধারা আমাদের চারিদিকে মূক প্রকৃতির রাজ্যে কত ধৈর্য্য, কত প্রেম, কত ত্যাগ, কত অশ্রু-শিশির-বর্ষণ-অন্তে কত সূর্য্য-কিরণ-উন্মাদনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতির প্রত্যেক শ্যাম-পত্রে লেখা, ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

পালিসী বার বৎসর ধরে সে-ই লেখা পড়েছিলেন। যে-বাণী অরণ্য তার শ্যাম পত্রে লিখে রেখেছে, তারই প্রতিধ্বনি তাঁর ধমনীতে বেজে উঠত, ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

পালিসীর প্রতিমূর্ত্তি।

বার বৎসর পরে তিনি স্থির করলেন যে, আর ঘুরে বেড়ান নয়, এবার এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে হবে। স্যাঁতে বলে একটি ছোট্ট সহরে একখানি ছোট বাড়ী করে তিনি বসবাস স্থাপন করলেন। যাযাবর হল গৃহবাসী। যথারীতি

বিবাহ করে গৃহলক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে এলেন। পালিসী সেদিন কল্পনাও করতে পারতেন না যে, যে-বাড়ী তিনি গড়ে তুললেন, তারই কাঠ ভেঙ্গে একদিন আগুনে পোড়াতে হবে,—যে-নারী সেদিন সানন্দে বধূ-রূপে তাঁর ঘরে এলেন তিনিও সেদিন কল্পনা করতে পারতেন না যে, কি ভয়াবহ দুর্দ্দৈবের সঙ্গে তাঁর জীবন সেদিন সংযুক্ত হয়ে গেল। পালিসীর একজন জীবন-চরিত লেখক বলেছেন, বিয়ের দিন যদি পালিসীর স্ত্রী তাঁর

মজা দেখবার জন্যে প্রতিবেশীরা উঁকি ঝুঁকি মারছেন।

ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনের ছবি কোনও রকমে একবার দেখতে পেতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই গির্জ্জে থেকে ছুটে পালাতেন।

সাঁতেতে কয়েক বছর থাকার পর, পালিসী দেখলেন যে, কাজ-কর্ম্ম পাবার আর কোনও উপায় নেই। এ ধারে সংসারে তাঁর দুজন স্থায়ী আগন্তুক এসেছে। নিত্য সংসারে অনটন দেখা দিতে লাগল। পালিসী স্থির করলেন যে, অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করে উপার্জ্জন বাড়াতে হবে, শুধু ছবি আঁকার উপর নির্ভর করে থাকলে অনশনে মরতে হবে।

এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে এনামেল-করা একটা মাটীর পাত্র তাঁর হাতে এল। মাটীর উপর সেই এনামেলের কাজ দেখে পালিসী চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, "আমি চিত্রকর। ভগবান আমাকে কিছু ক্ষমতাও দিয়েছেন। নাই বা জানলুম মাটীর কাজ, কি করে এনামেল তৈরী করে আমাকে জানতেই হবে।" এই সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখে গিয়েছেন, "অন্ধকারে লোকে যেমন পথ হাতড়ে বেড়ায়, তেমনি ধারা আমিও এনামেল কি করে তৈরী করা যেতে পারে তাই খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।"

এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, সে-সময় য়ুরোপে প্রকৃত-পক্ষে রসায়ন-বিজ্ঞান জন্ম-গ্রহণ করে নি। তখন যে-দেশে যে-লোক যা কিছু জানত, প্রাণপণ চেষ্টা করে তা সংগোপনে রাখত। জার্ম্মাণী এবং ইতালীর জনকয়েক কারিকর ছাড়া য়ুরোপে তখন কেউ এনামেলের কাজ জানত না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিদ্যাকে অত্যন্ত সংগোপনে রাখতেন। রাজা-রাজড়া যাদের এনামেল করাবার সখ হত, তাঁদের সেই কয়েক-জনেরই মধ্যে একজনের দ্বারস্থ হতে হত।

পালিসী স্থির করলেন যে, যেমন করেই হক এনামেল তৈরী করার পদ্ধতি তিনি বার করবেনই। একবার তার সন্ধান পেলে, তাঁকে আর পায় কে? এনামেলের উপর এমন অপূর্ব্ব সব কাজ তিনি করবেন, যাতে জগৎ বিস্মিত হয়ে যাবে, য়ুরোপের রাজা-দের প্রাসাদে প্রাসাদে তাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে বেঁচে থাকবে।

সমস্ত কাজ ফেলে রেখে পালিসী এনামেল তৈরী করবার দিকে মনোনিবেশ করলেন। যত রকমের জিনিষের সংমিশ্রণে এমন পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, যা পোড়ালে শক্ত, শাদা আর ঝকঝকে হয়ে উঠবে, তাঁর ধারণা মত তাই সংগ্রহ করে

ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন কড়াতে আগুনের আঁচে চড়ালেন। রাশিকৃত মাটীর পাত্র কিনে নিয়ে এলেন। সেইগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে এক জায়গায় জড়ো করা হল। যত রকম মশলা তৈরী হয়, তার প্রত্যেকটা দিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। পালিসীর নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, "এ একেবারে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান!"

ছিলেন চিত্রকর, সমস্ত যৌবন আপনার খেয়ালে ঘুরে বেড়িয়েছেন পথ হতে পথে, হঠাৎ তিনি হলেন বৈজ্ঞানিক, যে বৈজ্ঞানিককে নিজে অনুশীলন করে তথ্য আবিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতির রূপ দেখে যে বেড়িয়েছিল, তার মনের গঠন ছিল এক রকম। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন দ্রব্যের অসংখ্য দ্রব-মূর্ত্তির মধ্যে থাকে আসল বস্তুটি বেছে নিতে হবে—তার সে মানসিক গঠন থাকলে চলে না। একবার একটু ভুল হয়ে যাওয়া মানে, আবার সমস্ত জিনিস গোড়া থেকে আরম্ভ করা! অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারে প্রথম প্রথম এমন সব ভুল হতে লাগল, যা সংশোধন করতে তাঁকে আবার নতুন করে সেই সব পরিশ্রমই করতে হয়েছে। শুধু পরিশ্রম নয়, একবারের ভুল শোধরাতে দুবারের মত খরচ হয়ে গেল, অথচ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, তাতেও কোন সুফল পাওয়া যায় নি।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখছেন, "প্রথম প্রথম কি ভুলই না করতাম! মশলা তৈরী হলে, বিভিন্ন কড়া থেকে নিয়ে বিভিন্ন পাত্রে লাগিয়ে আগুনে পোড়াতে দিতাম। কিন্তু তখন কোনও রকম বন্দোবস্ত করে পাত্রগুলো আগুনে দেবার কথা মনেই আসত না। কোন্ কড়া থেকে কোন্ মশলা কোন্ পাত্রে দিয়েছি, নিজেরই মনে নেই। সব ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে করি। সারাদিন উনুনের পর উনুন ভাঙছি আর গড়ছি—সারাদিন এটা গুঁড়োচ্ছি, ওটা গুঁড়োচ্ছি, এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে গরম করে গলিয়ে দেখছি, এমনি করে কখন দেখি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি!"

প্রথম প্রথম তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন যে, পালিসী শীগ্‌গিরই হয়ত এমন একটা কিছু তৈরী করে ফেলবেন, যার দ্বারা তাঁদের সমস্ত অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে। তাই তিনি স্বামীর কথায় ধৈর্য্য ধরে সেই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে পুত্রকন্যাদের আহার থেকে বঞ্চিত করে আগুনে পোড়াবার কাঠ কিনতে দেখে বিশেষ কষ্ট বোধ করেন নি। কিন্তু একমাস গেল, এক-বছর গেল। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর চলে যেতে লাগল, এ কোন্ উন্মাদ! দিনের পর দিন, বিরাম নেই,

কারাগারে তৃতীয় হেনরী ও পালিসী।

বিচ্ছেদ নেই, সেই উনুনের পর উনুন জ্বেলে জিনিসের পর জিনিস মিশিয়ে চলেছে! ছেলেদের দুবেলা পেট পুরে খাবার জোটে না, অথচ মার মন কি করে সহ্য করে, আগুনে পোড়াবার জন্যে কাঠ কেনা হচ্ছে!

ক্রমশঃ কাঠ কেনবার সামর্থ্য একেবারে চলে গেল। ছ' মাইল দূরে একটা কুমোরবাড়ী আছে। যৎসামান্য কিছু দিলে তারা তাদের উনুন ব্যবহার করতে দিতে পারে। পালিসী জিনিসপত্র যা ছিল একে একে বন্ধক দিতে লাগলেন। এক সঙ্গে তিনশো, চারশো পাত্র তৈরী করে কুমোরবাড়ীতে পাঠাতে লাগলেন। এক একবার করে বোঝা পাঠান, আর সারারাত জেগে বসে থাকেন, ভাবেন, কালই হয়ত দেখতে পাব, একটা পাত্রের গায়ে এনামেল লেগেছে, শাদা, শক্ত, চক্‌চকে! সারারাত বুক আশায় আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে। রাত্রে পালিসী ঘুমোতে পারেন না।

কিন্তু সকালে গিয়ে দেখেন, যা প্রত্যহ দেখছেন, আজও তাই। কোথায় এনামেলের সে রূপ!

এধারে সংসারের অবস্থা এ রকম শোচনীয় হয়ে উঠল যে, পালিসী বাধ্য হয়ে কিছুদিনের মত এনামেল তৈরী করা ছেড়ে দিয়ে আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। হাতে যৎ-সামান্য পয়সা যেই এল, অমনি আবার সুরু হল সেই উনুন তৈরী করা আর কাঠের আঁচে সারা দিনরাত ফুটন্ত কড়ার দিকে চেয়ে থাকা।

পালিসীর ধারণা হয়েছিল যে, যতখানি উত্তাপের প্রয়োজন, তাঁর উনুনে ততখানি উত্তাপ তৈরী করতে তিনি পারেন নি। আবার নতুন করে সব মশলা কেনা হল। যেখান থেকে শেষ করা হয়েছিল আবার সেখান থেকে আরম্ভ করা হল। তিন ডজন মাটীর পাত্র কিনে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে আবার তাতে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে তৈরী মশলা মাখান হল। এবার কিন্তু তিনি নিজে সেগুলো পুড়োবার চেষ্টা না করে, এক কাচ-ওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। কাচওয়ালাদের উনুনের আঁচ খুব বেশী— সেই জন্যে সেই খানেই বন্দোবস্ত করলেন।

আবার সেই উৎসুক আশঙ্কায় অপেক্ষা করে থাকা—আবার সেই তন্দ্রাহীন রজনী জেগে শুধু ভাবা, মাটীর গায়ে সেই শক্ত শাদা চক্চকে জিনিসটা এবার বোধ হয় ধরা দিয়েছে—

এবার যখন ভাঙ্গা পাত্রগুলো ফিরে এল, দেখেন দুএকটার গায়ে একটু একটু শক্ত মত কি যেন লেগেছে! সেইটুকুতেই পালিসী আনন্দ-উৎফুল্ল হয়ে স্ত্রীকে জানালেন, আর ভয় নেই, এবার বুঝি দুর্দিন কেটে গেল!

এরই মধ্যে দুটি ছেলে মারা গিয়েছিল—অসুখে উপযুক্ত পথ্যও পায় নি। পালিসীর স্ত্রী মুখ বুঁজে সমস্ত সহ্য করে চলেছিলেন। স্বামীর উল্লাস দেখে তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মনে হল এ তাঁর উন্মাদ হবার সূচনা!

হলও তাই। পালিসি আর বাড়ী থাকেন না। সেই কাচওয়ালার উনুনের ধারেই ঘুরে বেড়ান। এই রকম ভাবে আরও এক বছর কেটে গেল। এক বছর ধরে আবার দিনের পর দিন সেই পরীক্ষা চলল। কিন্তু তবুও কিছু হল না। অসহায় স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে তখন কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন; ঘরে এক কণা খাদ্য নেই, এধারে এ কি উন্মাদনা!

স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তিনি বল্লেন, এই শেষ বার।

কোন রকমে কিছু টাকা ধার করে তিনশ রকমের বিভিন্ন মশলা তৈরী করে তিনি কাচওয়ালার কারখানায় উপস্থিত হলেন। পর্য্যায়ক্রমে সেই তিনশ পাত্র আঁচে দিয়ে এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। আহার-নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করলেন।

একটার পর একটা পাত্র আগুন থেকে তোলেন, ঠাণ্ডা করেন, দেখেন মশলা গলে গায়ে লেগেছে কিনা! হঠাৎ একটাতে দেখলেন, মশলা পুরোপুরি গলে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে ঠাণ্ডা করে দেখেন, সমস্ত পাত্রের গায়ে সেগুলো শক্ত হয়ে লেগে গেল। তখন তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই। সেই অবস্থাতেই বাড়ী ছুটে এসে স্ত্রীকে দেখালেন, আর ভয় নেই।

কিন্তু ওধারে কাচওয়ালার উনুন বন্ধ হয়ে গেল। পালিসী স্থির করলেন নিজের বাড়ীতে তিনি বড় উনুন তৈরী করবেন। কিছু দূরে একগ্রামে একটা ইঁটখোলা ছিল। সেখান থেকে নিজে ঘাড়ে করে করে ইঁট বয়ে নিয়ে এলেন। বাড়ীর একধারে বিরাট উনুন তৈরী হল।

এত বড় উনুনের উপযুক্ত আঁচ তৈরী করতে হলে যে পরিমাণ কাঠ দরকার, তা কেনবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। লোকে আর ধার দিতেও নারাজ। বড় কষ্টে আবার কিছু ধার করে কাঠ কিনলেন। বাড়ীর একধারেই উনুন তৈরী হয়েছিল—তিনি সেখান থেকে আর নড়লেন না। এক দিন, দুদিন, তিন দিন চলে গেল। কই, আর তো মশলা গলে না! তবে কি এত বৎসরের এই অসাধ্যসাধনের পরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু কাঠ আর মেলে না। নাই বা মিলল। ঘরের আসবাব-পত্রে তো অনেক কাঠ আছে! উন্মাদ বাড়ীর দরজা জানালা ভেঙ্গে উনুনে ফেলতে লাগল। স্ত্রী আর থাকতে পারলেন না। উন্মাদিনীর মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে তিনি জানালেন, পালিসী পাগল হয়ে গিয়েছে, দরজা জানালা, সব আগুনে পোড়াচ্ছে!

গ্রামের চারদিক থেকে মজা দেখবার জন্যে লোকে পালি-সীর বাড়ীতে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ছেলে-বুড়ো

সকলে পাগল বলে তাঁকে ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করল। নিজের স্ত্রীও তাঁকে উন্মাদ বিবেচনা করে বাধা দিতে লাগলেন। উন্মাদ সব কথা নীরবে শোনেন,—আর শুধু চেয়ে থাকেন, আগুনের আঁচ নিভে আসে কি না!

কাঠ ফুরিয়ে গেলে বিছানা মাদুর যা হাতের কাছে পান, তাই আগুনে সমর্পণ করতে আরম্ভ করলেন। যারা টাকা পেত, পালিসী পাগল হয়ে গেছে শুনে বাড়ী এসে তাঁকে গালাগাল দিয়ে যেতে লাগল। কেউ কেউ এমন কথাও শুনিয়ে গেল, বদমায়েসী করে পাগল সেজেছে।

পালিসী কারুর কথাতেই কান দেন না। শরীর তাঁর কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। কি হবে শরীরে, যদি সাধনার ধন না মেলে? ছেলেমেয়েদের মুখ দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কি হবে সংসারের মায়ায়, যদি মন যায় মরে? পোষাক পরিচ্ছদ যা ছিল, সমস্ত বিক্রী করে ফেলেছেন। সামান্য একটি জীর্ণ পরিচ্ছদে দিন চলে যায়। কি হবে পরিচ্ছদে যদি জীবনই হয়ে যায় ব্যর্থ? লোকে উপহাস করে, গালাগাল দেয়। কি হবে লোকের প্রশংসায় যখন জীবনের চরম-ক্ষণে কেউ একবার পাশে এসে দাঁড়াও না। জীবনের শ্রেষ্ঠ মূহূর্ত্ত তো এমনি নিঃসঙ্গ। উন্মাদের শুধু এক চিন্তা, আগুনের শিখা না নিভে যায়!

যুগে যুগে এই তপস্যাই মাটীর পৃথিবীকে স্বর্গের মহিমা দান করেছে।

একদিন বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। কোনও রকমে একটা কাঠের ভাঙ্গা জানালা বন্ধ করে পালিসীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে আছেন। হঠাৎ দেখেন, অন্ধকারে ভূতের মতন কে এসে, দুটো শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সেই জানালাটাও খুলে নিয়ে গেল, উন্মাদ-ঝড়ো-হাওয়া ঘরকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। পালিসীর স্ত্রী আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

কে জানত সেদিন ফ্রান্সের এক নগণ্য শহরে এই যে তপস্বী এই ভাবে ষোল বৎসর ধরে তপস্যা করছিলেন সেই ষোল বৎসরের প্রত্যেক দিনটি সত্য!

কোন দিন কোন তপস্যা ব্যর্থ যায় না। পালিসীর তপস্যাও ব্যর্থ হয় নি। ষোল বৎসর পরে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন। এনামেলের উপর তাঁর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখে, দেশ-দেশান্তরে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল। রাজারা সমাদর করে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে তাঁকে কাজের ভার দিতে লাগলেন। জ্ঞানীরা তাঁর মুখে বিজ্ঞান-কথা শোনবার জন্যে দূর দুরান্তর থেকে সমবেত হতে লাগলেন। মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য অজস্র ধারায় আসতে লাগল।

দীর্ঘ উন-আশী বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন। পর পর প্রথম ফ্রান্সিস্, দ্বিতীয় হেনরী, নবম চার্লস্‌কে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসতে দেখেছেন। প্রত্যেক রাজা-ই তাঁকে ভালবাসতেন। পালিসীর বেঁচে থাকবার পক্ষে রাজাদের এই অনুগ্রহের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তার কারণ ফ্রান্সে তখন স্বাধীন ধর্ম্ম-মতের জন্যে মানুষকে জীবন-দান পর্য্যন্ত করতে হত! রাজা যে-ধর্ম্মের অনুমোদন করেন, সে-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত যারা পোষণ করতেন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হত। কোনও বিচার নেই, কোনও বিতর্ক নেই, হয় রাজ-অনুমোদিত ধর্ম্ম স্বীকার করতে হবে, নয় মৃত্যু-দণ্ডকে বরণ করতে হবে।

পালিসী রাজ-অনুদিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করতেন না। মানুষ তার ধর্ম্ম-মতের জন্য কারুর কাছে দায়ী নয়। কারুর কোনও ক্ষমতা নেই, মৃত্যু-দণ্ড দেখিয়ে বা অন্য কোনও ভয় দেখিয়ে, ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেবার। সেই যুগে পালিসীর ছিল এই মত। কিন্তু তবু যখনই তাঁর জীবনের উপর আক্রমণ হয়েছে, রাজ-অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক রাজাই তাঁকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করবার জন্যে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি কারুরই অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

নবম চার্লসের পর তৃতীয় হেনরী ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। পালিসীর তখন ৭৬ বৎসর বয়স। বার্দ্ধক্যে শরীর নুয়ে পড়েছে। সেই সময় একদিন সহসা রাজার সৈন্যরা এসে তাঁকে বন্দী করে ধরে নিয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেন।

তৃতীয় হেনরী তাঁকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করতে অনুরোধ করলেন। ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে অন্ধকার বায়ুহীন ভূ-গর্ভের কারাগারে প্রবেশ করলেন।

দু' বছর পরে রাজা তৃতীয় হেনরী একদা সেই কারাগারে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধকে আবার মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ কারান্ধকারে দাঁড়িয়ে সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। দুঃখিত হয়ে তৃতীয় হেনরী সেদিন বলেছিলেন, "আপনার জন্যে আমার দয়া হয়। ৪৫ বৎসর ধরে আপনি আমাদের কাজ করে এসেছেন। আমার আগে যারা সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা আপনাকে আগলে থেকে নির্য্যাতিত হতে দেন নি। কিন্তু আমি আর পারছি না। পাত্র-মিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি শেষবার আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, যদি আপনি মত পরিবর্ত্তন না করেন, তা হলে আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে!"

ফ্রান্সের সেই রাজার দিকে একবার চেয়ে তাপস-শ্রেষ্ঠ সেদিন সেই কারাগারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আপনার যা দণ্ড দেবার, আপনি তা দিন্। শুধু এই কথা বলবেন না যে, আমার জন্য আপনার অনুকম্পা বোধ হচ্ছে। আমি জগতে কারুর অনুকম্পার পাত্র নই। তার বদলে শুনে যান, আমিই আপনাকে অনুকম্পা করি, যে রাজা হয়ে একজন বন্দীর কাছে এসে বলে, আমি পাত্রমিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে এই কাজ করছি!"

তৃতীয় হেনরী ফিরে গেলেন।

পালিসী সেই অন্ধকার কারা-কক্ষেই রইলেন। তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার আদেশ তৃতীয় হেনরীকে আর দিতে হয় নি, কারণ তার পূর্ব্বেই সেই অন্ধকার কারাকক্ষে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

এই তপস্বীর জন্ম-ভূমি বলে, ফ্রান্সের ছেলে-মেয়েরা আজ নিজেদের ধন্য মনে করে, মনে করে তারা ধন্য যারা সেই মাটীতে জন্মেছে, যে মাটীতে একদিন পালিসী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

ত্রিপুরা বিজয়

হোসেন শাহের সময় ত্রিপুরা বিজয়ের চেষ্টা হয়। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জয় করিতে পারে নাই। ত্রিপুরা প্রাচীন কাল হইতে এক হিন্দু রাজবংশের অধীন ছিল। এক্ষণে সেই বংশের রাজারা একরূপ স্বাধীন নরপতি রূপে ত্রিপুরা শাসন করিতেছেন। হোসেন শাহের সময় মুসলমানেরা ত্রিপুরা অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পারিয়া উঠে নাই। এই সময়ে মহারাজ ধন্য-মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি রায় চয়চাগ-মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান সৈন্যেরা চারিবার ত্রিপুরা আক্রমণ করে। প্রথম তিনবারে তাহারা পরাজিত হয়। শেষবারে তাহারা জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাহার কতক অংশ মাত্র মুসলমানদের অধিকারে আসিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক অংশ রাজবংশীয়দিগের অধিকারচ্যুত হইলেও এখনও কতক অংশে তাঁহারা একরূপ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছেন।

হরিনামের বন্যা

হোসেন শাহের রাজত্বকাল বঙ্গদেশে এক স্মরণীয় যুগ হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হরিনামের বন্যায় নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষেও তাহার স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। শান্তিপুর নবদ্বীপ হইতে তাহার আরম্ভ বলিয়া "শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়" কথা প্রচলিত আছে। তাঁহার জন্মের শুভক্ষণে যে হরিধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহাই অবশেষে বাঙ্গালার ও ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া দিয়াছিল।

"চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রেরে গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥"

চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁর জন্ম হইয়াছিল, তাই সে সময়ে হরিধ্বনি উঠিতেছিল। সেই হরিধ্বনি যেন তাঁহার কানে পৌঁছিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন হরিনামে মাতাইয়া রাখিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা শ্রীহট্ট প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্য-দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীদেবীকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তখন নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়াছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে এখন পর্য্যন্তও নবদ্বীপ সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া আছে। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মে। প্রথম-টির নাম বিশ্বরূপ, দ্বিতীয়ের নাম বিশ্বম্ভর। একটু বয়স হইলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া যান। বিশ্বম্ভরকে বাল্যকালে সকলে নিমাই বলিয়া ডাকিত। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গও বলা হইত। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হয়। নিমাই যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নীর নাম লক্ষ্মীদেবী, দ্বিতীয়ার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং হরিনাম প্রচারে অভিলাষী হন। তিনি গয়ায় গিয়া ঈশ্বরপুরী নামে একজন সাধুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিনাম প্রচারে রত হন। তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী ও অদ্বৈত নামে বারেন্দ্র শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া হরিনাম প্রচার আরম্ভ করেন। অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে ছিল। নিত্যানন্দ পূর্ব্বে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে সন্ন্যাসী বা অবধূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে। ইঁহাদের হরিনাম প্রচারে সে সময়ে নবদ্বীপে খোল-করতালের সহিত হরিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইত না।

"মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি।"

নবদ্বীপে যে হরিধ্বনির বন্যা আসিল, তাহা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিল। ক্রমে ভারতবর্ষময় তাহা প্রবাহিত হইয়া গেল। এই সময়ে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। যাহারা একেবারে মুসলমান না হইত তাহাদের আচার-ব্যবহার অধিকাংশই মুসলমানের ন্যায় হইত। মুসলমানেরা এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অনেকে মুসলমান হইয়া যাইতেছিল। এই স্রোত নিবারণ করিবার জন্য চৈতন্যদেব সকলকে বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে হরিনাম প্রদান করিয়া ধর্ম্মপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতিও তাঁহাদের ভক্ত হইয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রধান কর্ম্মচারী রূপ ও সনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। হোসেনের পূর্ব্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ও ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কেবল হিন্দুদের মধ্যে বলিয়া নহে, তাঁহারা মুসলমানদের মধ্যেও হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। একজন মুসলমান পরম বৈষ্ণব হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম হইয়াছিল যবন হরিদাস। যে সকল হিন্দু অনাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব হইতে লাগিল। জগাই মাধাই নামে দুইজন অনাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান এইরূপে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

মুসলমানেরা তাঁহাদের এই হরিনাম প্রচারে বাধা দিবার চেষ্টা করে। নবদ্বীপের কাজী প্রথমে সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কিন্তু নিরস্ত হন। বাদশাহ হোসেন শাহ প্রথমে নাকি বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরে কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন।

"সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবনে॥"

এইরূপে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে নিমাই কেশব-ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাহার পর সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, রাজধানী গৌড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন সর্ব্বত্রই তিনি গমন করিয়াছিলেন।

"কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন।"

এইরূপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শেষজীবনে পুরীধামে অবস্থিতি করেন। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব পুরীতেই দেহ রক্ষা করিয়া দিব্যধামে চলিয়া যান।

চৈতন্যদেবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত বিস্তৃত ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজিও বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার অনুরক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া থাকেন।

বঙ্গসাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি

হোসেন শাহের রাজত্বকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি আরম্ভ হয়। রাজা গণেশের সময় হইতে যে ইহার সূচনা হইয়াছিল সে কথা তোমরা জানিয়াছ। কিন্তু হোসেন শাহের সময় হইতে ইহা উন্নতির পথে ধাবিত হয়। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ক্রমেই বাড়িয়া যায়। হোসেন শাহ তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার জন্য যে উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাহা সেকালের কবিগণের ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়। হোসেন শাহের সময় বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী নিবাসী কবি বিজয়গুপ্ত মনসা দেবীর বিবরণ লইয়া *মনসা-মঙ্গল* রচনা করেন। তাহার ভণিতা আছে—

"সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।"

পরাগল খাঁ নামে হোসেন শাহের এক সেনাপতির আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীকর নন্দীনামক কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ জানিতে পারা যায়—

"নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান্‌হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

শ্রীকর নন্দী পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচনা করেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—

"নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রগণ রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ তনয় সুমতি।
সামদান ভেদ দণ্ডে পালে বসুমতী।
তান্ এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান্।
ত্রিপুরা উপরে করিল সন্নিধান॥"

কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু সেই সময়ে ভাগবতের কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস তাঁহার *মনসা-মঙ্গলে* হোসেন শাহের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ।"

তোমরা দেখিতে পাইলে কত কবি হোসেন শাহের গুণগান করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা হইত এই সকল কবিতা হইতে তোমরা তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ।

বৈষ্ণব-সাহিত্য

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি হইতে থাকে। রাধাকৃষ্ণের লীলা এবং চৈতন্যদেবের লীলা প্রভৃতি লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল যে, তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। তোমরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের এবং তাঁহার সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ *গীতগোবিন্দের* কথা শুনিয়াছ। এই *গীতগোবিন্দই* প্রথমে রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করে। *গীতগোবিন্দ* সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার ভাষা সরল ও শুনিতে মধুর, তাই সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিত। তাহার পর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর কথাও শুনিয়াছ। এই সকল অবশ্য চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব

এবং তাঁহার অনুচরগণ এই সকলের আলোচনা করিতেন। তাহার পর চৈতন্যদেবের সময় হইতে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী ও গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা ও চৈতন্য দেবের লীলা লইয়া এত গীত ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে এই যুগের শতশত পদকর্ত্তা ও গীত-রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান কবিও আছেন। আর অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থকারের কথাও আমরা জানিতে পারি। তোমাদিগকে প্রধান প্রধান কয়েক জনের কথা শুনাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, মাধবী, গোবিন্দদাস ও সৈয়দ মর্ত্তুজা ইঁহাদেরই কথা বলিব। জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের অনুসরণ করিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

"রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

মাধবী একজন স্ত্রী-কবি। ইনি পুরীতে বাস করিতেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না। মাধবী দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেন। তাই তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধুড়ি গ্রামে গোবিন্দদাসের নিবাস ছিল।* ইনি গোবিন্দ কবিরাজ নামে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস নির্জ্জনে বসিয়া পদ রচনা করিতেন।

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥"

গোবিন্দদাসের সুমিষ্ট পদাবলী রাজা মহারাজ হইতে সাধারণ লোকে পর্য্যন্ত সকলেই আদর করিত। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার গানে প্রীতিলাভ করিতেন।

"প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত,
দাস গোবিন্দ গান।"

বৈষ্ণব কবিগণ গোবিন্দদাসের পদাবলীর যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি সমাজ,
কাব্য রস অমৃতের খনি।
বাক দেবী যাঁহার দ্বারে, দাসী ভাবে সদা ফিরে,
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥"

সৈয়দ মর্ত্তুজা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকট ছাপঘাটিতে অবস্থিতি করিতেন। তথায় ইঁহার সমাধি আছে। তিনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট পদ রচনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

"সৈয়দ মর্ত্তুজা ভনে কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি।"

ইহা যে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মর্ত্তুজার অনেকগুলি পদ প্রচলিত আছে।

চরিত-গ্রন্থ

আমরা বলিয়াছি যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা-ব্যতীত চৈতন্য-দেবের লীলা সম্বন্ধেও অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানির পরিচয় দিতেছি। চৈতন্য-চরিত লইয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত প্রথম। পূর্ব্বে ইহার নাম চৈতন্য-মঙ্গল ছিল, পরে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য-ভাগবত নাম দেন।

"আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি॥"

ইহার চৈতন্য-ভাগবত নামকরণ সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে।

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহন্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যকালে চৈতন্যদেব নবদ্বীপ হইতে চলিয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, সেইজন্য বৃন্দাবনদাস দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি

* বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম হয় ও তিনি সেইখানেই পরিবর্দ্ধিত হন। পরে পৈতৃক স্থান কুমারনগরে যান।
—বঃ সঃ

তাঁহাদের দুইজনেরই ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভণিতা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥"

চৈতন্য-ভক্তগণ এই গ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেও চৈতন্যদেবের ও তাঁহার অনুচরগণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। জয়ানন্দ নবদ্বীপের লোক। তিনিও ব্রাহ্মণ, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে তাঁহার জয়ানন্দ নাম হয়।

"জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে।"

কেহ কেহ বলেন জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের অনেক কার্য্য-কলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্য-লীলা সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। বৈষ্ণবগণ ইহার পরম সমাদর করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদাস বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুরে বাস করিতেন। কেহ তাঁহাকে বৈদ্য কেহ বা ব্রাহ্মণ বলেন। তিনি যৌবনে বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তগণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল বা চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্যদেবের শেষ লীলা ভাল করিয়া লিখিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী চৈতন্য ভক্তগণ কৃষ্ণদাসকেই শেষ লীলা লিখিতে অনুরোধ করায় চৈতন্য-চরিতামৃত লিখিত হয়।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥"

আদি মধ্য ও অন্ত খণ্ড নামে চৈতন্য-চরিতামৃতের তিনটি ভাগ আছে। ইহার ভণিতায় এইরূপ দেখা যায়।

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোকে ও ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলেও চৈতন্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার কো গ্রামে বৈদ্যকুলে লোচন-দাসের জন্ম হয়।

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস।"

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ আছে। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরিত্র সম্বন্ধেও কোন কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে অদ্বৈতের কথা আছে।

নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চ্চা

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান স্থান। কিন্তু যে সময় চৈতন্যদেব নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য বিশেষ রূপ বিখ্যাত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চাই প্রধান। এই ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্র বলে। তর্কের দ্বারা সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইতে পারা যায়, ন্যায়শাস্ত্রে তাহাই হইয়া থাকে। এই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা এই সময়ে নবদ্বীপকে বিখ্যাত করিয়া তুলে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে একজন বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতের নিকট চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচারে মন দেন। কিন্তু রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠ শেষ করিয়া মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। রঘুনাথ পক্ষধরকে তর্কে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া স্বাধীন ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তখন হইতে নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান হইয়া উঠে। নবদ্বীপের ন্যায় নব্যন্যায় নামে প্রসিদ্ধ। গৌতম ঋষি প্রাচীন ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই ন্যায়শাস্ত্রের নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করায় তাহার নব্যন্যায় নাম হয়। আমাদের রঘুনাথ শিরোমণি সেই ন্যায়কে আপনার প্রতিভা-

বলে আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া মিথিলা হইতে নব্যন্যায়ের আসন লইয়া আসেন। এখনও পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সেই নব্য-ন্যায়ের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে ছাত্রেরা নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসে। রঘুনাথের একটি মাত্র চক্ষু ছিল বলিয়া তাহাকে কানভট্টও বলে।

এই সময়ে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্কলন করিয়া আটাইশ খানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে হিন্দুদের পূজা, ব্রত, আচার, ব্যবহার এই সমস্ত লিখিত আছে। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ইহাতে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐ সময়ে মুসলমানদের প্রভাবে হিন্দুদের আচার-ব্যবহারে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সেইজন্য তাহার সংস্কারের প্রয়োজন হওয়ায় রঘুনন্দন আপনার স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সকলে রঘুনন্দনের নির্দ্দেশ অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের জন্য ইহার পর হ রি ভ ক্তি-বি লা স প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থের সঙ্কলন হইয়াছিল। চৈতন্যদেব, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন এই তিনজন তিন দিকে এ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইঁহাদের প্রতিভাকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি কবিতা প্রচলিত আছে। যদিও তাহা ব্যঙ্গপূর্ণ তথাপি তাহা হইতে তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"চৈযে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রগো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘর্টে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করিল মাত॥"

পর্ত্তুগীজগণের আগমন

ইউরোপের পর্ত্তুগাল-অধিবাসীদিগের পর্ত্তুগীজ বলে। ইহারাই প্রথমে ইউরোপ হইতে দেশবিদেশে যাইতে আরম্ভ করে। এই পর্ত্তুগালদেশীয় কলম্বাস প্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাহার পূর্ব্বে আমেরিকার কথা ইউরোপের লোকেরা জানিত না। পর্ত্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজেরা দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন আরম্ভ করে। অবশেষে ঐ প্রদেশের গোয়া নগরী তাহাদের প্রধান স্থান হয়। এই গোয়ায় একজন পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। হোসেন শাহের রাজত্বসময়ে পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় আসিতে আরম্ভ করে। কোয়েল হো নামে একজন পর্ত্তুগীজ প্রথমে চট্টগ্রামে আসেন। তাহার পর প্রতিবৎসর তাহাদের বাণিজ্যতরী বঙ্গদেশে আসিতে থাকে। হোসেন শাহের পুত্র মামুদ শাহের সময়ে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার আদেশে মেলো জুসার্ডে নামে একজন পর্ত্তুগীজ পাঁচখানি জাহাজে দুই শত পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। ইহাদের যে কেবল এদেশে বাণিজ্য করাই উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে, রাজ্যস্থাপন ও লুণ্ঠনাদি করাও অপর অভিপ্রায় ছিল। বাঙ্গালায় রাজ্যস্থাপন করিতে না পারিলেও ইহাদের দস্যুতা, লুণ্ঠনাদি ও অন্যান্য অত্যাচারে বঙ্গভূমি যে এককালে সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা এদেশে ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত হইত। ফিরিঙ্গী ও ব্রহ্মদেশের আরাকানের অধিবাসী মগদিগের অত্যাচারের কথা তোমরা পরে শুনিতে পাইবে।

মেলো জুসার্ডে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া কয়েকজন অনুচরকে সুলতান মামুদ শাহের নিকট গৌড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুলতান ইহাদের অনুরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়া সেই সকল লোককে বন্দী করিতে আদেশ দেন। তিনি মেলো জুসার্ডকেও বন্দী করিয়া গৌড়ে পাঠাইতে আদেশ প্রচার করেন। মেলো জুসার্ড বন্দী হইয়া গৌড়ে আসেন। তাহার পর শিলভা মেনেজেস নামে একজন পর্ত্তুগীজ গোয়ার শাসনকর্ত্তার আদেশে নয়খানি জাহাজে তিন শত পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। মেনেজেস সুলতানকে উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া পর্ত্তুগীজ বন্দীদিগকে উদ্ধার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু এদিকে চট্টগ্রাম ও সমুদ্রতীর-বর্ত্তী গ্রাম সকলও পোড়াইয়া দিতে আরম্ভ করেন। সুলতান সে সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন নাই। কিন্তু এই সময়ে শের খাঁ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিলে পর্ত্তুগীজেরা মামুদ শাহের সাহায্য করায় তাহারা পুরস্কারস্বরূপ পর্ত্তুগীজ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। এইবার তোমাদিগকে অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ শেরখাঁর কথা বলিতেছি। (ক্রমশঃ)

সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকটি

—ইভান বুনিন

—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

সানফ্রানসিস্কো থেকে সেই ভদ্রলোকটি (কাপ্রি বা নেপ্‌ল্‌সে তাঁর নাম কারো জানা নেই) চলেছিলেন ইউরোপের দিকে, তাঁর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে বছর দুয়ের জন্য দেশ পর্য্যটন করতে।

দীর্ঘ ছুটি নিয়ে লম্বা দেশ-ভ্রমণের বিলাসিতা করবার সামর্থ্য তাঁর যথেষ্টই ছিল। তিনি ধনী, আটান্ন বছর বয়স পার হয়ে এত দিনে তিনি সবে মাত্র জীবনকে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছেন। এতকাল তিনি জীবিত থেকেও যেন জীবন্ত ছিলেন না; কেবল দিনের পর দিন কেটে গেছে, জীবনের যত আশা ও আনন্দ শুধু ভবিষ্যতের জন্য তোলা ছিল। পরিশ্রমই করে গেছেন যথেষ্ট, তাঁর কারখানার হাজার হাজার মজুররা তা ভাল করেই জানে। এতদিনে তিনি বুঝলেন যে, জীবনে যা করবার ছিল তা প্রায় হয়ে গেছে, উন্নতির যে আদর্শ ছিল তার সীমায় এসে পৌঁছেছেন, সুতরাং এইবার হাফ ছেড়ে একটু বিশ্রাম নেবেন। তাঁর অবস্থার লোকেরা সুদূর ইউরোপ, ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণে বেরোয়, তিনিও এবার তাই করবেন। এত বৎসরের খাটুনির জন্য তাঁর এ পুরস্কার প্রাপ্য, তাঁর স্ত্রী-কন্যাকেও এর ভাগ দেওয়া উচিত। স্ত্রীর এখন যে বয়স হয়েছে, আমেরিকার মেয়েরা এ বয়সে বেড়াতে খুব ভালবাসে। আর মেয়েও নেহাৎ ছোট নয়, শরীরটাও তার তেমন ভাল নয়, বেড়ানো তার পক্ষে উপকারী। শরীরের কথা ছাড়াও দেশ-বিদেশ বেড়াতে বেড়াতে কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে যেতে পারে! হয় তো কোনো ক্রোরপতির সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবার সৌভাগ্য হতে পারে, দৈবাৎ কত রকমে ভাব জমে যেতে পারে!

ভদ্রলোক তখন এক ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করে ফেল্লেন। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে দক্ষিণ ইটালীর আবহাওয়ায় রৌদ্ররশ্মি উপভোগ করবেন, সেখানকার কীর্ত্তিস্তূপ দেখবেন, বিখ্যাত ট্যারান্টেলা নাচ দেখবেন, পথে পথে যে সব সুধাকণ্ঠী গায়িকার দল বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়, তাদের গান শুনবেন। আর সেখানে সবচেয়ে লোভনীয় যে সব তরুণী নিয়াপোলিটান সুন্দরীদের কথা প্রায় শোনা যায়, তাদের কথাও ভুলবেন না। উৎসবের সময়টা গ্রীসে ও মন্টিকার্লোতে কাটাতে হবে, সভ্য সমাজের শিরোমণি সকলেই সে সময় ঐখানে গিয়ে জমায়েৎ হয়, যারা সভ্যতার আদর্শ ভাঙ্গে গড়ে, পোষাকের ফ্যাসান বদলায়, যারা রাজার সিংহাসন টলাতে পারে, যুদ্ধ ঘটাতে পারে, যাদের উপস্থিতিতে হোটেলগুলির মর্য্যাদা বেড়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা মোটর-রেসে ও নৌবিহারে মত্ত হয়, কেউ বা জুয়াখেলায় মাতে, কেউ বা সুন্দরীদের সঙ্গে প্রেমের খেলা করে বেড়ায়, আর কেউ বা পাখী-শিকারে উন্মত্ত হয়; সবুজ মাঠ থেকে সাদা পায়রার ঝাঁক ওড়ে নীল আকাশের কোলে, আর বন্দুকের গুলিতে ঝপ্ ঝপ্ করে লুটিয়ে পড়ে।...... মার্চ্চ মাসে ফ্লোরেন্সে যাওয়া যাবে, সেখান থেকে রোমে; তার পর ভিনিস, প্যারিস,— সেভিলে গিয়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখা, টেম্‌স্ নদীতে গিয়ে স্নান করা, এমন কি এথেন্স, কনষ্টান্টিনোপল্, ঈজিপ্ট, জাপান পর্য্যন্ত, অবশ্য ফেরার পথে।..... যাত্রা সুরু করবার পর প্রথমটা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কেটে গেল।

তখন নবেম্বর মাসের শেষ। জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত সমুদ্র পথ কুয়াশার অন্ধকারে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে ঝড় তুফান ও তুষারপাত। জাহাজ কিন্তু বেশী দোলেনি, নির্ব্বিঘ্নেই চলেছে। যাত্রীতে জাহাজ ভরা, অনেকেই বড় বড় নামজাদা লোক। বিখ্যাত জাহাজ "অ্যাটলান্টিস" সম্পূর্ণ আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত যেন একটি উঁচুদরের ইউরোপীয় হোটেল; প্রশস্ত পানাগার, টার্কিশ স্নানাগার, জাহাজে ছাপা নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র; জাহাজের দিনগুলো বেশ সমারোহে কাটছিল। বিগ্‌লের আহ্বানে প্রত্যহ ভোরে যাত্রীদের ঘুম ভাঙে, সেই শ্যামধূসর বিশাল তরল মরুভূমিতে কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে দিনের আলো অতি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, ফ্লানেলের পাজামা পরা যাত্রীরা প্রথম পেয়ালা কাফি বা কোকো খেয়ে স্নানাগারে যায়, দেহমর্দ্দন ও অঙ্গসঞ্চালন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তার পর প্রসাধন শেষ করে প্রাতরাশে গিয়ে বসে। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত তারা উন্মুক্ত ডেকের

উপর হেসেখেলে ঘুরে বেড়ায় আর সমুদ্রের তাজা কনকনে হাওয়া উপভোগ করে; অনেকে ডেক-টেনিস খেলে ক্ষুধা বাড়িয়ে নেয়; এগারোটার খানা খেয়ে তারা আরাম করে নিজের নিজের খবরের কাগজ নিয়ে বসে যায় যতক্ষণ না লাঞ্চের সময় হয়। লাঞ্চ খাওয়ার পর দুঘণ্টা বিশ্রাম। ডেকের ওপর সারি সারি হেলান-দেওয়া ডেক-চেয়ার পাতা, যাত্রীরা এক একটি পশমী ঢিলা আস্তরণে দেহ আবৃত করে, চেয়ারে শুয়ে কুয়াশায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, কিংবা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় যে ফেণার রাশি ঝিক্ মিক্ করছে তার দিকে চেয়ে থাকে, কিংবা মধুর তন্দ্রাবেশে শুধুই ঢুলতে থাকে। পাঁচটা পর্য্যন্ত এমনি কাটে, তারপর আবার চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে, তখন সুগন্ধি চায়ের সঙ্গে সুমিষ্ট কেক আসে। সাতটার সময় আবার ডিনার খাবার বিগ্‌ল বাজে। সানফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোক তখন স্ফূর্ত্তিতে দুহাত ঘষতে ঘষতে তাঁর কেবিনে চলে যান পোষাক বদলাতে।

সন্ধ্যায় অ্যাটলান্টিসের দুই পাশ সহস্র সহস্র জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে অন্ধকারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আর জাহাজের মধ্যে রন্ধনশালায়, পানীয় ভাণ্ডারে, তৈজসাগারে রসুয়ে চাকরদের ভেতর ব্যস্ততার ধূম লেগে যায়।

ওদিকে সমুদ্রে প্রচণ্ড তোলপাড় চলেছে, কারো তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; এ সব ব্যাপারের ভাবনা কেবল কাপ্তেনের, সুতরাং সকলে নিশ্চিন্ত। কাপ্তেন মানুষটি গুরুভার বিশালদেহ, কটাচুল, নির্ব্বিকার চিত্ত; সোনার জরী দেওয়া কাপ্তেনের পোষাকে মনে হয় যেন তিনি আর মানুষই নন, একটি সচল সাজানো প্রতিমা যাত্রীদের দর্শন দিতে তাঁর রহস্যময় কেবিন-গুহার মধ্য থেকে কচিৎ এক আধ বার বেরিয়ে আসেন।...মিনিটে মিনিটে জাহাজের বাঁশী তীব্র সুরে বেজে ওঠে, কিন্তু ভোজনরত যাত্রীরা তা শুনতে পায় না; সেখানে অনবরত শ্রুতিমধুর ব্যাণ্ড বাজছে, তাতে সে শব্দ চাপা পড়ে গেছে। মার্ব্বেলমোড়া প্রকাণ্ড দোতলা হলঘরে মখমলের গালিচা পাতা, বেলোয়ারী ঝাড় ও স্ফটিক-গোলকের উজ্জ্বল আলোর চতুর্দ্দিকে ছড়াছড়ি;—সেখানে মণিমুক্তায় ঝলমল, নগ্নগ্রীব সুন্দরীদের ভীড়, পুরুষেরা সব ডিনারের পোষাকে সজ্জিত, জমকালো পোষাকে পরিবেশনকারীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে একজন, যে কেবল পানীয় সরবরাহ করে, তার গলায় লড-মেয়রের মত একছড়া চেন। ডিনারকোট ও নিভাঁজ পাজামাতে সানফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোককে অনেকটা অল্পবয়স্ক দেখাচ্ছিল। চেহারা খাটো, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন, সর্ব্বাঙ্গে চাকচিক্য ও চোখে দীপ্তি নিয়ে তিনি এই ঔজ্জ্বল্যের মাঝখানে বসেছেন, লাল যোহানেস্‌বার্গ মদিরার বোতলটি হাতে, সামনের টেবিলে সৌখীন কাঁচের নানা আকারের গ্লাস, মাঝে বিচিত্রবর্ণ একগুচ্ছ টাটকা ফুল। মুখে কতকটা মঙ্গোলীয় ছাঁদ, পাকা গোঁফ যত্ন করে ছাঁটা। সোনা বাধানো দাঁত মুখের মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে, নিটোল মাথার উপর গোল টাক পুরানো গজদন্তের মত চক্ চক্ করে। বহুমূল্য বয়সোচিত বেশভূষায় সেজে তাঁর লম্বাচওড়া গৃহিণী শান্তমূর্ত্তিতে পাশে এসে বসেছেন। হাল্কা হাওয়ার কাপড়ে নির্দ্দোষ নির্লজ্জতার আভাস দিয়ে সেজেছেন তাঁর সুন্দরী কন্যা, কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছ সযত্নে বেণীবদ্ধ, মুখের নিঃশ্বাসে টাটকা ভায়োলেটের সুগন্ধ, ছোট্ট একটি লাল তিল ঠোঁটের নীচে, আর একটি ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে—পাউডারের মধ্য থেকে ঈষৎ দীপ্যমান। ডিনার শেষ হতে দুঘণ্টা সময় লাগে, তার পর নাচঘরে গিয়ে নাচের পালা; সেখান থেকে সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোক অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে চলে যান পানাগারে, সকলে মিলে বসেন টেবিলের উপর পা তুলে; রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক আলোচনা, এক জাতির পর আর এক জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণ করা চলতে থাকে,—থেকে থেকে হাভানা চুরুটের ধূমপান ও মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সকলের মুখ লাল হয়ে ওঠে; লাল জ্যাকেট পরা নিগ্রোর দল তাদের পানীয় জোগায়, সিদ্ধ ডিমের খোলা ছাড়িয়ে ফেল্লে যেমন দেখতে হয় তেমনি সাদা তাদের চোখ।

ওদিকে বাইরে অকূলসমুদ্রে কালো পাহাড়ের মত উত্তাল তরঙ্গ উঠতে থাকে; তুষারের ঝাপটা জাহাজের দড়িদড়াকে নাড়া দিয়ে সোঁ সোঁ করে গর্জ্জে ওঠে; ঢেউয়ের সঙ্গে, ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সমস্ত জাহাজখানা থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে, মাথায় ফেনা নিয়ে ফেনশীর্ষ উত্তুঙ্গ অবরোধ একটার পর একটা সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে চূর্ণ করে দিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলে। কুয়াশায় রুদ্ধকণ্ঠ ষ্টীমের বাঁশী যেন ডুকরে ডুকরে ডাকে। জাহাজের মাথার অন্তিমপ্রান্তে প্রহরা-

ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতর্ক প্রহরী ঠাণ্ডায় জমে যায়, একাগ্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে পাগলের মত হয়ে যায়। জাহাজের খোলটা জলের মধ্যে ডুবে আছে; তার ভিতরটা যেন নরকের সর্ব্বনিম্ন স্তর, সেখানে একেবারে গুমোট আলো-আঁধারি; সেখানে বড় বড় আগুনের চুল্লী গর্জ্জন আর অট্টহাস্য করতে থাকে, জলন্ত মুখ ব্যাদান করে রাশি রাশি কয়লা উদরস্থ করতে থাকে আর খালাসীরা আগুনের মুখে অনবরত তার জোগান দেয়; তাদের দেহ কোমর পর্য্যন্ত নগ্ন, কালিমাখা ঘাম গা দিয়ে দর দর করে ঝরে, আগুনের গন্‌গনে আভায় তাদের চেহারা অতি ভীষণ দেখায়।

এদিকে পানাগারে উপরের লোকেরা পরম আরামে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে দিয়েছে; তাদের পেটেন্ট চামড়ার জুতার পালিশ চক্ চক্ করে, মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুগন্ধি চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে তারা মার্জ্জিত, চোস্ত বাক্যালাপ করতে থাকে। নাচ-ঘরে আলো, উত্তাপ আর আনন্দ একসঙ্গে ঘনীভূত; মেয়ে পুরুষ জোড়ে-জোড়ে নাচতে থাকে, তার সঙ্গে তালে তালে যে সঙ্গীত বাজে তা কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে, নিতান্ত নির্ল্লজ্জ সুরে বারে বারে কেবল একটি মাত্র কামনা জানায়, কোন একটি মাত্র সামগ্রীই যেন বারে বারে পেতে চায়। যাত্রীদের মধ্যে আছেন একজন গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ রাজ-প্রতিনিধি; একজন ক্রোরপতি, লম্বা, মধ্যবয়সী, গোঁফদাড়ী কামানো, পাদ্রীদের মত লম্বা কোটপরা; একজন খ্যাতনামা স্পেন দেশীয় লেখক; একটি নামজাদা সুন্দরী, একটু বয়স বেশী হলেও তাঁর রূপের খ্যাতি এখনও অক্ষুণ্ণ; আর এক প্রণয়ী দম্পতি, তাদের পরস্পরের যুগল দাম্পত্যের ভাব ও আকর্ষণ দেখে সকলেই কৌতূহলী; যুবকটি কেবল তার সঙ্গীনীকে নিয়েই নাচে, দুজনে একসঙ্গে গান গায়, তাদের এমন মিল দেখে সকলেই মোহিত হয়। কিন্তু এরা যে ষ্টীমার কোম্পানীর ভাড়া-করা দম্পতি, প্রেমের এই অভিনয় দেখাবার জন্যই মোটা মাহিনায় নিযুক্ত হয়েছে, এবং যাত্রীদের মুগ্ধ করার জন্যই যে তাদের জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াতে হয়, এ খবর কেউ জানে না, জানে কেবল কাপ্তেন।

জিব্রাল্টারে পৌঁছে সূর্য্যের মুখ দেখে সকলেই খুসী হল; সেখানে যেন হঠাৎ বসন্তের উদয় হয়েছে। এখান থেকে একজন বিশিষ্ট যাত্রী উঠলেন। এশিয়ার কোনো রাজ-পুত্র ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন; বেঁটে চেহারা, যেন কাঠে কোঁদা গড়ন, কিন্তু ভাবভঙ্গী চঞ্চল; চওড়া মুখ, চোখে সোনার চশমা, বড় বড় গোঁফ, দেখতে খুব মার্জ্জিত নয়, কিন্তু ব্যবহার বেশ সরল ও নম্র।

ভূমধ্য-সাগরে পড়ে আবার বেশ ঠাণ্ডা। স্বচ্ছ আকাশের নীচে বড় বড় ঢেউয়ের সারি ময়ূরপুচ্ছের মত ফুলে ফেঁপে ফেনায় সাদা হয়ে—প্রমত্ত হাওয়ার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের দিকে ছুটে আসতে লাগল। পরের দিন আকাশ মলিন হয়ে এল, দিগন্তে অস্পষ্ট কালো রেখা দেখা গেল, বোঝা গেল স্থল নিকটবর্ত্তী; দূরবীক্ষণ দিয়ে ইস্কিয়া ও কাপ্রি দ্বীপ নজরে এল, ক্রমে নেপ্‌ল্‌স্‌ও দৃষ্টিপথে এল, যেন একটা ধূসর স্তূপের গায়ে কতকগুলি চিনির দানা ছড়ানো; পিছনে তার বরফঢাকা বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা, যাত্রীরা ডেকে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, মেয়েরা ও পুরুষেরা অনেকে হালকা পোষাক পরেছে। জাহাজের চীনা-বয়রা গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা কুচ্‌কুচে কালো পাজামা পরে ছোট ছোট পায়ে নিঃশব্দে আসা যাওয়া করছে, এবং যাত্রীদের কাপড়, ছড়ি, ছাতা, কুমীর-চামড়ার হাতব্যাগ নিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ফিস্ ফিস্ করে কি বলাবলি করছে। সানফ্রান্‌সিস্কোর ভদ্রলোকের মেয়েটি সেই রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে,—গত সন্ধ্যায় দুজনের পরিচয় হয়ে গেছে। রাজপুত্র আঙুল বাড়িয়ে তাকে কি যেন দেখাচ্ছে আর চাপা গলায় কি সব বলছে, মেয়েটি একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে আছে। মাথায় খাটো বলে রাজপুত্রকে ছেলেমানুষের মত মনে হয়; দেখতে তেমন সুপুরুষ নন বরং একটু আজগুবী চেহারা; গোঁফগুলি খোঁচা খোঁচা ফাঁক ফাঁক, মুখের চামড়া যেন তৈলাক্ত। মেয়েটি তাঁর কথা শুনছে বটে, কিন্তু উত্তেজনায় তার কোন অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। রাজপুত্র যে কেবল তার সঙ্গেই কথা কইছে, এই উল্লাসেই তার বুক ভরে উঠেছে। রাজপুত্রের সমস্তই যেন অসাধারণ, তার হাতগুলি, তার সেই মসৃণ দেহ, যার মধ্যে আদিম রাজরক্ত প্রবাহিত, এমন কি তার ইউরোপীয় সাদাসিধা পোষাকটি পর্য্যন্ত; তার সব কিছুতেই যেন এমন একটা অচেনা মোহ লেগে আছে, যাতে তরুণ নারী-হৃদয়

সহজেই আকৃষ্ট হয়। সানফ্রান্‌সিস্কোর ভদ্রলোকটি সিল্কের পোষাক পরে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে দেখছেন নিকটস্থ সেই বিখ্যাত রূপসীকে ;—দীর্ঘ ঋজু দেহ, গোলাপী রং, চোখের ভ্রূ প্যারিসের হালফ্যাসানে রঞ্জিত, রূপার চেন দিয়ে একটি ছোট রোমবিহীন কুকুরকে ধরে আছে, অনবরত তারই সঙ্গে কথা কইছে। মেয়েটি এই সব দেখতে পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে এমন ভাবে দাঁড়াল যেন বাপকে সে দেখতে পায়নি।

বিদেশে বেরুলে আমেরিকানরা খুব মুক্তহস্ত হয় এ কথা সবাই জানে। সেই জন্য তারা সকলেই মনে করে এবং এ ভদ্রলোকও তাই মনে করলেন যে, সকল দেশের লোকই খুব বাধ্য ও বিশ্বাসী, তারা ঠিক মত খাদ্য ও পানীয় জোগায়, সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ফরমাস খাটে, সামান্য দরকারটুকু পর্য্যন্ত বুঝে নেয়, সুখসুবিধার নানারূপ বন্দোবস্ত করে দেয়, জিনিষপত্র সাবধানে নিয়ে যায়, গাড়ী ডেকে দেয়, মালপত্রের তদারক করে। সর্ব্বত্রই এমন, জাহাজেও যথেষ্ট খাতির পাওয়া গেছে, নেপল্‌সেও তাই হবে। ক্রমে নেপল্‌স্ নিকটবর্ত্তী হয়ে এল। ব্যাণ্ডের দল তাদের ঝকঝকে পিতলের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ডেকে সমবেত হয়েছে। হঠাৎ তুমুল ঐক্যতান তুলে তারা সকলের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। বিশালদেহ কাপ্তেন তাঁর পোষাক পরে জাহাজের ব্রিজে এসে দাঁড়ালেন এবং সাজানো পুতুলের মত দূর থেকে হাত নেড়ে যাত্রীদের অভিবাদন করতে লাগলেন। সকল যাত্রীরই মনে হতে লাগল যেন বিশেষ করে তাঁর সম্মানেই ব্যাণ্ড বাজছে এবং কাপ্তেন বুঝি তাঁকেই কেবল অভিবাদন করছে। অবশেষে আটলান্টিস্ যখন ঘাটে গিয়ে ভিড়ল এবং নীচে নামবার সিঁড়ি পেতে দেওয়া হল,—তখন সে কি কোলাহল! দলে দলে হোটেলের পোর্টার ও দালালেরা সোনার জলে হোটেলের নামলেখা টুপী মাথায় পরে হাজির ; নিকর্ম্মা ছোকরার দল, ছবির পোষ্টকার্ড হাতে গুণ্ডা-চেহারা গাইডের দল, সকলেই ঠেলাঠেলি করে ঘিরে দাঁড়াল। সানফ্রান্‌সিস্কোর ভদ্রলোকের কাজ করে দেওয়ার জন্য সকলেই ব্যস্ত! একটু হেসে এদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে যে হোটেলে রাজপুত্র উঠবেন শোনা গেল সেই হোটেলের মোটরে গিয়ে তিনি উঠলেন, ধীরে সুস্থে বেস হুকুম দিলেন,—"চালাও"।

নেপল্‌সে এসেও নিয়মিত ভাবে দিন কাটতে লাগল। ভোরে উঠে অস্পষ্ট-অন্ধকার ভোজন-গৃহে প্রাতরাশ সমাধা হয়, জানলা দিয়ে কন্‌কনে ভিজে হাওয়া গায়ে লাগে ; সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ভাবে দিন যাত্রা সুরু হয়, এদিকে নীচে গাইডের ভিড় জমতে থাকে ; কিছুক্ষণ পরে, ম্লান হাসি হেসে নিষ্প্রভ সূর্য্যোদয় হতে দেখা যায়, তখন উপরের বারান্দা থেকে বাষ্পাচ্ছন্ন সূর্য্য কিরণে স্নাত ভিসুভিয়াস পাহাড় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, আর জলরাশি পার হয়ে বহু দূর দিগন্তের কোলে কাপ্রি দ্বীপের আভাষ মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। কাছের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, উপকূলের বাঁধের উপর দিয়ে ছোট ছোট গাধা দুচাকার গাড়ী টেনে চলেছে, এখানে ওখানে এক একটা সৈনিকের দল ব্যাণ্ড বাজিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আগে ট্যাক্সির আড্ডায় যাওয়া হয়, তারপর গাড়ী ভাড়া করে মন্থর গতিতে জনবহুল পথে পথে দুধারে উঁচু উঁচু বাড়ীর মধ্য দিয়া ঘুরে বেড়ানো হয়। কাজের মধ্যে সমাধিস্থানের মত মিউজিয়মগুলি দেখতে যাওয়া, না হয় গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘোরা,—তার সব গুলোই প্রায় দেখতে এক রকম ; মস্ত এক তোরণ-দ্বার পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা, ভিতরে বিপুল নিস্তব্ধতা, বেদীর কাছে কতকগুলি মোমবাতি জ্বলছে ; হয়তো কোন গৃহপরিত্যক্তা বৃদ্ধা বেঞ্চির অন্ধকার কোণে একা বসে আছে ; একদিকে সেই "ক্রুশাবতরণের" চিরন্তন প্রতিকৃতি।...এই সব শেষ করে একটার সময় সান মার্টিনের বিখ্যাত হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাওয়া। সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে যায়। একদিন ভদ্রলোকের মেয়েটি সেখানে হঠাৎ রাজপুত্রকে যেন দেখলে মনে করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, যদিও এর আগে সে খবরের কাগজে পড়েছিল তিনি রোমে বেড়াতে গেছেন। আবার ঘুরে ফিরে পাঁচটার সময় নিজেদের হোটেলে পুরু কার্পেট পাতা ঘরে আগুনের পাশে গরম হয়ে বসে প্রত্যহ চা খাওয়া। তারপরই রাত্রে ডিনার হবে,—আবার সেই উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি হবে, আবার সেই উন্মুক্ত-গ্রীবা সুন্দরীর দল সারে সারে সিল্কের পোষাক খস্ খস্ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকবে এবং তাদের বহুবিধ রূপ সমুজ্জ্বলতর হয়ে চারিদিকের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে উঠবে, আবার সেই প্রশস্তদ্বার সুসজ্জিত ভোজনাগার,—মঞ্চের উপর লালকোর্ত্তাপরা বাদকের দল, কালো পোষাকে পরিবেশন-

কারীর দল ও মাঝে একজন সর্দ্দার নিপুণহস্তে স্থপ পরিবেশন রত। সমস্ত দিনের মধ্যে ডিনারটাই সকলের চেয়ে বিশিষ্ট ঘটনা। প্রত্যেকেই যেন বিবাহের বেশে সেজে আসত, এবং খাদ্য পানীয়, ফল মিষ্টান্নের এত বাহুল্য থাকত যে, রাত্রি এগারোটার পর প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পেটে লাগবার জন্য গরম জলের ব্যাগ দিয়ে আসবার প্রয়োজন হত।

সে বছর ডিসেম্বর মাসটা নেপ্‌ল্‌সে তেমন আমোদ জমলো না। দিনগুলো এমন খারাপ যাচ্ছিল যে, সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলে হোটেলের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যেন লজ্জিত হয়ে উঠত, ঘাড় নেড়ে অপরাধীর মত ম্লান হয়ে বলত, এমন বিশ্রী দিন তারা আর কোনো বছর দেখেছে বলে মনে পড়ে না; অবশ্য এই বছরটাই যে তারা এমন বলছে তা নয়, আরও অনেকবার তাদের মুখে ঐ কথাই শোনা গেছে —এবার বড় দুর্ব্বৎসর।......এ বছর রিভিয়ারাতে অসম্ভব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে, এথেন্সে বরফ পড়ছে, এটনাও বরফে একেবারে ঢেকে গেছে; স্বাস্থ্যান্বেষীর দল প্যালারমো থেকে পালিয়ে আসছে, এই সব নানা দুঃসংবাদ চারিদিকে...... প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্য নেপ্‌ল্‌সবাসীদের প্রতারিত করে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে, যত বেলা যায় ততই বৃষ্টির জোর বাড়তে থাকে এবং ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। হোটেলে প্রবেশের মুখে সাজানো পামগাছের ঝাড় জলে ভেজা টিনের মত চক্‌ চক্‌ করে; সমস্ত সহরটাই কেমন অপরিষ্কার, অপরিসর, কর্দ্দমাক্ত, মিউজিয়মগুলিতে লোকসমাগম নেই; ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানরা কানঢাকা বর্ষাতি টুপি মাথায় দেয়, হাওয়ায় সেগুলো লটপট করতে থাকে; তাদের হাতের পোড়া চুরুট থেকে তীব্র গন্ধ বেরোয়, নিস্তেজ ঘোড়াকে তাড়া দিতে তারা যে চাবুকের আওয়াজ করে, তাও যেন নিস্তেজ শোনায়; কেবল ট্রামরাস্তার পাহারা-ওয়ালাদের জুতার খট্‌ খট্‌ শব্দ সজোরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; অনাবৃত মাথায় মেয়েরা পিছল পথে কাপড় বাঁচিয়ে চলতে থাকে, দেখে তাদের বেজায় শ্রীহীন মনে হয়; সমুদ্রতীরে অনেক মরা মাছ ভেসে এসেছে, সেদিকে গেলেই পচা গন্ধ নাকে লাগে। সানফ্রান্‌সিস্কোর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা সকালে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকেন, তাঁদের মেয়েটি মাথাধরার দোহাই দিয়ে মুখ বিরক্ত করে ঘুরে বেড়ায়, কিছুক্ষণ বাদে আপনিই আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠে বেজায় হাসিখুসী করতে থাকে। বোধ হয় তার সেই খাটো মানুষটির কথা মনে পড়ে যায়, দেহে যার রাজরক্ত প্রবাহিত; তার অন্তরের সেই নূতন অনুভূতি অতি বিচিত্র কিন্তু মনোরম। তরুণীর মন যদি একবার জাগে—তখন যার ছোঁয়াতেই তা জেগে উঠুক, টাকাই হোক, বা খ্যাতিই হোক বা আভিজাত্যই হোক, তাতে কি বা যায় আসে?......সকলেই বলতে লাগল—সরেণ্টোতে বা কাপ্রিতে এমন দুর্যোগ নেই। সেখানে রৌদ্র পাওয়া যায়, লেবুর গাছগুলি ফুলে ভরা, সেখানকার মানুষরা সরল এবং পানীয়ও অজস্র। সুতরাং সানফ্রান্‌সিস্কো-পরিবার স্থির করলেন, তারা মোটঘাট বেঁধে কাপ্রিতেই যাবেন, তারপর সেখান থেকে সরেণ্টোতে গিয়ে ডেরা নেবেন; পথে টাইবেরিয়াসের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখবেন, ব্লু গ্রোটোর প্রাচীন গুহাগুলি দেখবেন, আব্রুজির বিখ্যাত বাঁশী শুনবেন।

নেপ্‌ল্‌স্‌ পরিত্যাগ করার দিনটা এদের পক্ষে স্মরণীয়। সেদিন সকালেও সূর্য্যের মুখ দেখা গেল না। ঘন কুয়াসায় ভিসুভিয়াস ঢাকা পড়ে গেছে, সমুদ্রবক্ষেও কুয়াসার আবরণ, আধ মাইল দূর থেকে কিছু দেখা যায় না, কাপ্রির কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। ছোট যে ষ্টীমারটি তাদের নিয়ে যাচ্ছে, সেটা এতই দোল খেতে লাগল যে, সানফ্রানসিস্কো-পরিবারের সকলেই সেলুনে সোফার উপর নিশ্চল পাথরের মত পড়ে রইল, মাথাও তুলতে পারলে না, চোখও চাইতে পারলে না। সকলের চেয়ে মহিলাটিরই সমুদ্রপীড়া বেশী, তাঁর মনে হতে লাগল এবার বুঝি তিনি মারা যেতেই বসেছেন। যে পরিচারিকা মধ্যে মধ্যে এসে তাঁর পরিচর্য্যা করছিল, সে বারোমাস এই ষ্টীমারে থাকে এবং নিত্য এমনি দোল খাওয়াই তার অভ্যাস, সেই কেবল অটল ছিল এবং হাসিমুখে অক্লান্ত ভাবে সকলকেই সেবা করে বেড়াচ্ছিল। কন্যাটি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে মুখে একখণ্ড লেবু নিয়ে পড়ে রইল। সরেণ্টোতে গেলে ক্রিষ্টমাসের সময় রাজপুত্রের সঙ্গে আবার দেখা হবে একথা ভেবেও তার মনে কোনো আনন্দ হচ্ছেনা। ভদ্রলোকটি ওভারকোট গায়ে ও টুপী মাথায় দিয়েই, বরাবর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন, সারাপথ একবারও দাঁতে

খড় কাটলেন না। তাঁর মুখখানা কালী হয়ে গেল, চুলগুলো সাদা হয়ে গেল, মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় কয়েকদিন আগের থেকে তাঁর পানের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হয়েছিল, দুএকবার সীমা লঙ্ঘনও করেছিল।······বৃষ্টির ঝাপটা কেবিনের খড়খড়িতে চড়্ চড়্ করে লাগছে, ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে এসে টপ্ টপ্ করে সোফায় পড়ছে, মাস্তুলে ঝড় লেগে সোঁ সোঁ শব্দ করছে, ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে এক একবার ষ্টীমার কাৎ হয়ে যাচ্ছে আর নীচের তলায় কোনো ভারী জিনিষ গড়্ গড়্ শব্দে এপাশ থেকে ওপাশে গড়াচ্ছে। এক একবার কোনো ঘাটে এসে যখন ষ্টীমার ভিড়ছে তখন কিছু নিষ্কৃতি! কিন্তু দোলার তবু বিরাম নেই, জানালা দিয়ে দেখা যায়, তীরের যত গাছ, বাগান, বাড়ী, ছোট ছোট পাহাড় ক্রমাগত উপর দিকে উঠে যাচ্ছে আবার নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে,—সব যেন নাগরদোলায় দুলছে। ঢেউয়ের চোটে ষ্টীমারের গায়ে নৌকাগুলোর ঠোকাঠুকি লাগছে, ষ্টীমারের লোকেরা সজোরে চীৎকার করছে, কোথায় একটি শিশু এমন জোরে কাঁদছে, যেন এখনি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দরজা দিয়ে ভিজে হাওয়া আসছে, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে "রয়্যাল্-হোটেল" নিশান-দেওয়া একখানা ডিঙ্গী ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছে, একটা লোক তাতে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে—"রয়্যাল হোটেল! রয়্যাল হোটেল!"—যাতে যাত্রীরা আকৃষ্ট হয়। হোটেলের নাম নিয়ে এ রকম চীৎকার করার ভঙ্গীতে সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকের উৎপীড়িত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে ভরে উঠল। মনে হল ইটালীয় মাত্রই এমনি অভদ্র, নির্ব্বোধ, লোভী। একবার ষ্টীমার থামলে তিনি মাথা তুলে চেয়ে দেখলেন, একেবারে জলের ধারে গুহার মত ছোট ছোট কতকগুলি পাথরের খোপ, একটার ওপর একটা, কোনো শ্রীছাঁদ নেই, ময়লা স্যাঁৎসেঁতে ছাতাধরা, অথচ মানুষ এতে বাস করে; চারিদিকে ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে, এদিকে-ওদিকে টিনের ভাঙ্গা কৌটা ছড়ানো, মাছধরা জাল শুকোচ্ছে; কি ইটালিই তিনি দেখতে এসেছেন—ভেবে মন হতাশায় ভরে গেল।···অবশেষে সন্ধ্যার সময় কাপ্রি দ্বীপের কালো ছায়া দেখা গেল, ছোট ছোট আলোকবিন্দু মাথায় নিয়ে যেন এইমাত্র সেটা জল থেকে ভেসে উঠল। ঝড়ের বেগ ঠাণ্ডা হয়ে এল, তরঙ্গ বিক্ষোভ শান্ত হল। তীরের আলোর সোনালি রশ্মি লম্বা হয়ে জলের উপর কাঁপতে লাগল।····· হঠাৎ নোঙর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক থেকে খালাসীরা কোলাহল করতে লাগল, তখন সকলেই যেন নিশ্চিন্ত বোধ করলে। কেবিনের আলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আবার মনে হতে লাগল।····· মিনিট দশেক পরে সানফ্রানসিস্কো পরিবার একটা বড় বোটে নেমে পড়ল, এবং অল্পক্ষণ পরেই মাটীতে পা দিয়ে ছোট রেলগাড়ীতে চড়ে বসল। পাহাড়ের গা বেয়ে রেলগাড়ী ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল—আঙুরের ক্ষেত, ফলন্ত কমলা লেবুর বাগানের পাশ দিয়ে, বৃষ্টিস্নাত সবুজ বনঝোপের পাশ দিয়ে।··বৃষ্টির পরে ইটালীর মাটীতে কি মিষ্ট সুগন্ধ, এ সৌরভটুকু এদেশেরই বুঝি একান্ত নিজস্ব !*

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আর একদিক

একশত বৎসর পূর্ব্বেও যুদ্ধকে পৃথিবীর লোকে তেমন ভীষণ কিছু বলিয়া ভাবিত, এমন মনে হয় না। তখনও সৈনিকদের স্ত্রীকন্যা শিশুপুত্র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পিছনে থাকিত। সম্প্রতি কর্পোরাল-মেজর আর জে টি. হিল্‌স্ সৈনিক-জীবনকাহিনীর এক পুস্তকে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। সৈনিকদের স্ত্রীপুত্রকে সরকার হইতে সৈন্যবাহিনীর একাংশ হিসাবেই ধরা হইত। বাহিনীর দক্ষিণাংশে অশ্বতর ও অন্যান্য জীবজন্তুর সহিত ইহাদিগকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হইত। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্য আহারের অর্দ্ধভাগ এবং শিশুর জন্য এক তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা ছিল। উল্‌ফের কোয়েবেক অভিযানে ৫৭৯টি এই রকম স্ত্রীলোক সংশ্লিষ্ট ছিল—এবং এ যুদ্ধে ইহাদের একজনের মৃত্যু হয় নাই।

---

* গত বৎসরের সাহিত্যের নোবেল-লরিয়েট বিখ্যাত রুশ কথা-সাহিত্যিক ইভান বুনিনের দি জেণ্টলম্যান ফ্রম সানফ্রান্সিস্কো, The Gentleman from San Francisco গল্প হইতে।

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

পাঁচ

তার মনে হল কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে।

পল চমকে উঠল, যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেছে। বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠল। একটা যেন কি গোলমেলে ভাব তার মনে হতে লাগল, যেন অনেক দূরে তাকে যাত্রা করতে হবে, অথচ বোধহয় খুব দেরী হয়ে গেছে। তখনই সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু দুর্বলতার বাড়িতে আবার বিছানায় বসে পড়তে বাধ্য হল। তার হাত-পা যেন আর চলছে না, তার মনে হল, যখন সে ঘুমুচ্ছিল তখন যেন সর্বাঙ্গে কে তাকে মুগুর-পেটা করেছে। মাথাটা বুকের ওপর ঠেকিয়ে একেবারে দুমড়ে পড়ে, দরজায় ধাক্কাকে সে মাথা নেড়ে সাড়া দিলে। তার মা কিন্তু সকালে ডেকে তুলে দিতে ভুলে যান নি, আগের রাত্রিতে সে যেমন বলে রেখেছিল। মা তাঁর নিজের সোজা পথেই চলেছেন। রাত্রে যে কি সব ঘটেছিল, তা তিনি মনে করে রাখেন নি, তাকে সকালে আজও ডেকেছেন, যেমন রোজ সকালে ডেকে থাকেন।

হ্যাঁ, ঠিক অন্য দিনের ভোরের মত। পল উঠল, পোষাক পরতে আরম্ভ করলে, ক্রমশ নিজেকে টেনে তুলে খাড়া করে, শক্ত হয়ে দাঁড়াল, পাদরীর চিহ্নিত পোষাকে। জানালাটা সে খুলে দিলে। রূপোর মত ঝকঝকে আকাশের ঝরঝরে আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল। পাহাড়ের গায়ের ঝোপগুলো ভোরের পাখীর গানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠে সুরে বাজতে লাগল। আর ভোরের সূর্যের আলোয় তারা যেন ঝকমক করছে। বাতাস এখন শান্ত, মুক্ত হাওয়ায় গির্জের ঘণ্টার শব্দ বেড়ে চলেছে।

গির্জের ঘণ্টা তাকে ডাকছে। বাইরের সব বস্তুই তার চোখ থেকে মিলিয়ে গেছে,—সে চায় যে তার ভেতরের সব এমনি মিলিয়ে যাক। ঘরের সেই সুগন্ধ তার দেহকে যেন কষ্ট দিতে লাগল, এর সঙ্গে যেসব স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তারা যেন জেগে উঠে তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত বিঁধল। গির্জের ঘণ্টা তাকে কেবলই ডাকছে, কিন্তু এই ঘর ছেড়ে যেতে সে কিছুতেই মন ঠিক করতে পারছে না। রাগে জ্বলে সে ঘরের চারদিক ছুটোছুটি করতে সুরু করলে। আরসির দিকে দেখলে, ফের মুখ ফেরালে। কিন্তু মুখ ফেরানোর চেষ্টা তার পক্ষে একেবারে বৃথা। সেই রমণীর মূর্তি, এ্যাগনিসের রূপ—তার মনে কেবল ফুটে উঠতে লাগল, যেমন আরসীতে দেখা যায়। সে এই আরসীখানাকে হাজার টুকরো করে ফেললেও তার প্রত্যেক টুকরোয় সেই মূর্তি ফুটে উঠবে, সমস্তটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে।

গির্জের দ্বিতীয় ঘণ্টা, সকালে উপদেশ ও প্রার্থনা করবার ঘণ্টা অবিরাম বেজে চলল। তাকে বার বার ডাকতে লাগল, তবু সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল, কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে টেবিলের কাছে বসে, কি লিখতে সুরু করলে। দুটো চরণ লিখল, "ছোট দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর" ইত্যাদি : তারপর সেটা কেটে দিয়ে, তার উল্টো পিঠে লিখলে—

'মিনতি করি আর আমার প্রত্যাশা রেখ না। আমরা দুজনে পরস্পরে একটা ছলনার জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছি। আর দেরী নয়, এ বাঁধন-কেটে আমাদের আলগা করতে হবে। না, আর দেরী নয়, যদি আমরা স্বাধীন হতে চাই, যদি এ থেকে রেহাই পেতে চাই, একেবারে পাতালে তলিয়ে না গিয়ে। আর আমি তোমার কাছে আসব না, আমাকে ভুলে যাও, আমাকে কোন চিঠিপত্র লিখো না, আমার সঙ্গে দেখা করার কোন চেষ্টাও আর কখন ক'র না।"

তার পর সে নীচে নেমে গেল। মাকে ডাকলে, তার কাছে গিয়ে চিঠিখানা তুলে ধরলে, তাঁর দিকে কিন্তু একেবারে না তাকিয়ে

"এখুনি, মা এখুনি এই চিঠিখানা তার কাছে নিয়ে যাও"—তার গলার সুর যেন ভাঙা কর্কশ,- "তার নিজের হাতে এ চিঠি দিয়ো, তার পর শীগ্‌গির চলে আসবে।"

তার মনে হ'ল যে চিঠিখানা যেন তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ল। সে দণ্ড বেরিয়ে পড়ল। সেই এক মুহূর্তের জন্যে যেন সে খানিকটা উঁচুতে উঠলে, আর মনে যেন কিছু শান্তিও পেলে।

গির্জের ঘণ্টা বাজছে। এই বার তিন বার। ভোরের রূপোলী আলোয় উপত্যকা যেন ধূসর রঙ মেখেছে, শান্ত গ্রামখানিকে ঘণ্টার জোর শব্দে জাগিয়ে দিয়েছে। উপত্যকার উৎরাই থেকে পাহাড়ে রাস্তায় উঠবার পথ দিয়ে লোকেরা চলেছে, তাদের হাতের কব্জীতে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা মোটা মোটা গাঁঠওয়ালা লাঠি ঝুলছে, মেয়েদের মাথায় বড় বড় রুমাল বাঁধা, তাদের ছোট দেহের পক্ষে ঢের বড় দেখাচ্ছে। যখন সবাই তারা গির্জেতে এল, বুড়োলোকেরা তাদের জায়গায় গিয়ে বসল, একেবারে বেদীর সামনের বেঞ্চির ধারে। জায়গাটা যেন চষা মাঠ ও মাটীর গন্ধে ভরে উঠল। গির্জার তরুণ ভাঁড়ারী, ছোকরা অ্যানটীয়োকাস খুব জোরে জোরে ধূপদানাটা দোলাতে লাগল, যে দিকে সেই বুড়োরা বসেছিল, সেই দিক পানে বেশী করে সেই সুগন্ধ ধোঁয়া দিয়ে তাদের চষা মাটীর বাদাড়ে-গন্ধ সে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। ক্রমে সুগন্ধ ধোঁয়া গাঢ় মেঘের মত গির্জের অন্য অন্য জায়গায় ছেয়ে সেই বেদীটাকে ঢেকে ফেলল। সাদা পোষাক পরা তামাটে-মুখ ভাঁড়ারী আর প্যাঁশুটে-রঙ পাদরী তার পোষাকের ওপর লাল পাড় বসান আস্তরণ পরে যেন সেই ধোঁয়ার শিশির-ভেজা কুয়াসার ভিতরে নড়াচড়া করছে। পল আর ওই ছোকরা দুজনেই এই ধোঁয়া আর সুগন্ধ বড় ভালবাসে, আর সেইজন্য গন্ধ পোড়ায়ও প্রচুর। রেলিঙের বাইরের দিকে ঘাড়

ফিরিয়ে বেদী থেকে পাদরী পল দেখতে পেল আধবোজা চোখ চেয়ে—ভুরু কুঁচকে দেখলে, যেন সেই ধোঁয়ার কুয়াসা তাকে পরিষ্কার করে দেখায় বাধা দিচ্ছে। অতি অল্প ভক্তের সমাবেশ দেখে মনটা ভাল লাগল না, আরো ভক্তের আসবার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কতকগুলো লোক এল, আর সব শেষে এলেন তার মা। মাকে দেখে পলের রক্ত জল হয়ে গেল, আর ঠোঁট মরার মত হয়ে গেল।

তাহলে চিঠিখানা তার হাতে দেওয়া হয়েছে ত্যাগ তবে সম্পূর্ণ হয়ে গেল! মরণ-ঘামে তার কপাল ঘেমে উঠল, যখন সে ভগবানের নাম করতে দুহাত তুললে, তখন মনে মনে প্রার্থনা করলে, যেন তার দেহ-মন রক্তমাংস সবই সে নিবেদন করে দিতে পারে। তার মনে হ'ল, সে দেখতে পাচ্ছে—সেই রমণী, এ্যাগনিস তার চিঠি পড়ছে, ওই মাথা ঘুরে মাটীতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন প্রার্থনা ও উপদেশ শেষ হল, তখন সে শান্ত হয়ে জানু পেতে একঘেয়ে সুরে লাটিন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল, ভক্তেরা তাতে যোগ দিলে। তার মনে হল যে, সে সব যেন স্বপ্নে দেখছে। বেদীর তলায় পড়ে, রাখালেরা যেমন পাহাড়ের গায়ে পড়ে ঘুমোয়, তেমনি ঘুমোতে তার ইচ্ছা হ'ল। সেই সুগন্ধ ধোঁয়ার মেঘের ভেতর দিয়ে সে সামনে দেখলে, গির্জ্জের কাঁচের দেয়ালের কোনে ঈশার মায়ের মূর্ত্তি, ম্যাডোনা। এ ম্যাডোনার মূর্ত্তিকে লোকে বলত জাগ্রত। একটা সোনার পদকের ওপর মণি বসালে যেমন কারুকার্য্যের বাহার হয়, এ যেন তেমনি সুন্দর। সে তার দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হ'ল এ মূর্ত্তি সে এই প্রথম দেখছে, অনেক কালের পরে। এত কাল তবে সে কোথায় ছিল? তার মনের ভেতর চিন্তাগুলো সব গুলিয়ে গেল। সে যেন আর কিছুই মনে করতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল; ফিরে তাকিয়ে, সেই জনতাকে লক্ষ্য করে সে বক্তৃতায় উপদেশ দিতে সুরু করলে। এ বক্তৃতা সে কখনো-সখনও দেয় বটে। চলতি ভাষায় আর কড়াসুরে সে বলে যেতে লাগল। ভাল করে শোনবার জন্যে যে বুড়োর দল গির্জ্জের ভেতরের থাম আর বেদীর রেলিঙের ফাঁকে মুখ রেখে, দাড়ি বাড়িয়ে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল, বক্তৃতায় তাদেরই বেশ ভাল করে সে যেন ধমকে দিলে। মেয়েরা যারা মাটীর দিকে ঘাড় নীচু করে ছিল, তারা ভয় ও কৌতূহলের দোলায় দুলতে দুলতে তাকিয়ে রইল। ছোকরা-কোঠারী গির্জ্জের প্রার্থনার হাজরী-বই হাতে তুলে, তার কাল কাল চোখের পাতার ভেতর দিয়ে পলের দিকে একবার তাকিয়ে জনতার দিকে ফিরে তাকালে। ঠাট্টার ভাবে সে মাথা নাড়লে। ভাবটা যেন হাজরী না দিলে ভাল হবে না।

পাদরী বলে যেতে লাগল, 'হাঁ, আজ দেখছি ক্রমেই গির্জ্জেয় উপাসনা করবার জন্যে হাজরী কমেই যাচ্ছে; তোমাদের মুখের দিকে তাকাতে আমার একেবারে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ঠিক যেন রাখাল তার ভেড়ার ছানা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু এক রবিবারেই দেখি যে, গির্জ্জেটা একটু ভক্তের ভিড়ে ভরে যায়। কিন্তু আমার ভয় হয়, তোমরা যে গির্জ্জেয় আস, এ তোমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের জোরে নয়, তোমরা আস শুধু পাছে কোন কথা ওঠে। দরকার বলে আস না ত, আস শুধু একটা অবেশের বশে। যেমন তোমরা পোষাক বদল করে বিশ্রাম কর, সেই রকমই প্রায়। এখন সময় হয়েছে, জেগে ওঠ। যারা অনেক ছেলের মা তাদের সম্বন্ধে আশা রাখিনে, তাদের অনেক কাজ সংসারে, কিম্বা যাদের ভোরের আগেই কাজে লাগতে হয়, তারা এখানে যে রোজ সকালে আসবে, এ আশাও করা যায় না। কিন্তু যারা বুড়ো, যারা যবতী, যারা ছেলে ছোকরা, যাদের আমি গির্জ্জে থেকে পথে বেরুলেই দেখতে পাই, ভোরের সূর্য্যের আলোয় বাড়ীর দরজায় জটলা করছে, তারা রোজ সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে উঠে ভগবানকে নিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করবে, তাঁর বাড়ীতে তাঁকে বন্দনা করবে এই জন্য যে, যে-পথে তারা চলতে যাবে, সেই চলার পথে যেন তারা তাঁর কাছ থেকে বল পায়।

যদি তোমরা এই রকম কর, যে-দারিদ্র্য তোমাদের কামড়ে ধরেছে, এত দুঃখ দিচ্ছে, সব দূরে পালিয়ে যাবে। মন্দ অভ্যাস যত, যত হীন কাজের প্রলোভন আর তোমাদের চেপে ধরতে পারবে না। এখন থেকে তোমরা খুব ভোরে উঠবে, দেহ পরিষ্কার করবে, পোষাক বদল করবে, শুধু রবিবারে নয়, প্রত্যেক দিনই তাই করবে। কাল ভোর থেকে আরম্ভ করে, আশা করি, কাল থেকে আমরা এক সঙ্গে প্রার্থনা করব, ভগবান যেন আমাদের আর আমাদের এই গ্রামকে ত্যাগ না করেন, তিনি যেমন অতি ছোট পাখীর বাসাকেও ত্যাগ করেন না;—যারা পীড়িত, রুগ্ন, অশক্ত, যারা উঠে এই ভগবানের বাড়ীতে আসতে পারছে না, তাদের জন্যেও আমরা প্রার্থনা করব, যেন তারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে ওঠে, রোগ থেকে মুক্তি পায়, আর এক সঙ্গে ভগবানের কাছে যাবার পথে অগ্রসর হয়।

সে তখন তাড়াতাড়ি ফিরে ভিতরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোঠারী-ছোকরাও গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে সমস্ত গির্জ্জে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতর ডুবে গেল। মনে হল, দূর পাহাড়ের পাথর কাটার শব্দও শোনা যাচ্ছে। একজন স্ত্রীলোক উঠে পাদরীর মায়ের কাছে এসে, তাঁর কাঁধের উপর একটি হাত রেখে, অতি চুপে চুপে তাকে বললে :

"আপনার ছেলেকে এখুনি আসতে হবে, কিং নিকোডিমাসের বড় বাড়া-বাড়ি, তার পাপ শুনে নিতে হবে।"

মা তার দারুণ দুঃখের চিন্তার ভেতর থেকে জেগে উঠলেন। স্ত্রীলোকটির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর মনে পড়ল যে, কিং নিকোডিমাস, এক জন অদ্ভুত রকমের শিকারী, বুড়ো, থাকে উঁচু পাহাড়ের ওপর একটা কুঁড়ে ঘরে। তাই মা জিজ্ঞাসা করলেন যে, পাপ শুনতে কি পলকে এখন ওই উঁচু পাহাড়ে যেতে হবে?

স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে বললে, "না, তার আত্মীয়েরা তাকে নীচে গ্রামে নিয়ে এসেছে।"

মা তখন পলের কাছে গিয়ে বললেন। পল তখন সেই গির্জ্জের ছোট ভাঁড়ারেই ছিল, সেইখানে আনটিগোকাস তার পোষাক খুলে দিচ্ছিল।

"তুমি আগে বাড়ীতে এসে কাফি খাবে, কেমন?"

পল মায়ের দিকে তাকাল না, কোন উত্তর দিল না, ভাব দেখালে যে, সে বড়ই ব্যস্ত, এখুনি তাকে সেই বুড়ো শিকারীর পাপ শুনতে যেতে হবে,

তার অন্যান্য বাড়াবাড়ি অবস্থা। মা ও ছেলে, দুজনের ভাবনা তখন একই রকমের, একই কথা দুজনে ভাবছে, সেই চিঠির কথা—যেখানা মা এ্যাগনিসকে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু কেউ-ই সে কথার কোন উল্লেখই করলে না। তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মা সেখানে আড়ষ্ট কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ভাঁড়ারী অ্যান্টিয়োকাস, কাপড় রাখবার জায়গায় পাদরীর পোষাকগুলো পাট-পাট করে গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত হ'ল।

মা বললেন, "নিকোডিমাসের কথাটা বাড়ী গিয়ে কাফি খাবার পর পলকে বললেই ভাল হ'ত।"

অ্যান্টিয়োকাস খুব গম্ভীর ভাবে বললে, "পাদরীকে সব বিষয়ে মানিয়ে চলতে হয়।" কাপড় রাখবার জায়গায় দরজার ভেতর মাথাটা গলিয়ে দিয়ে, তার ভেতরে যেন সব গোছাচ্ছে, এই ভাব দেখিয়ে সে আরো বলতে লাগল;

"পাদরী মশায় বোধহয় আমার ওপর রাগ করেছেন, তিনি বল্লেন যে, আমি বড় অন্যমনস্ক। তা একেবারেই সত্যি নয়। আমি বলছি তোমাকে যে, একেবারেই সত্যি নয়। শুধু যখন আমি ওই বুড়োদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন আমার বড় হাসি এসেছিল। তারা ওঁর উপদেশের একবর্ণও বুঝতে পারে নি। তারা ওখানে মুখ হাঁ করে শুনছিল, এক বর্ণও ওরা বুঝতে পারে নি। আমি তোমার কাছে বাজী রেখে বলতে পারি যে, ওই বুড়ো মার্কো-পানজা জানে যে, রোজ সকালে তার মুখ-হাত-পা ধোয়া উচিত, কিন্তু সে কখনও ঈষ্টার আর বড়দিন ছাড়া মুখ-হাত ধোয় না। তুমি দেখো, এখন থেকে তারা রোজ ভোরের বেলা গির্জ্জেয় আসবে। ওই যে তিনি বলেছেন এ করলে আর তাদের দারিদ্র্য থাকবে না, সব দুঃখু ঘুচে যাবে।"

মা তখনও সেখানে তাঁর কাপড়ের ভেতর হাত দুটো শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"আত্মার দারিদ্র্য" তিনি বললেন, যেন অ্যান্টিয়োকাসকে বোঝাতে চান, তিনি কথাগুলো বুঝেছেন। কিন্তু অ্যান্টিয়োকাস তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকালে, যেমন সে ওই বুড়োদের দিকে তাকিয়েছিল। খুব জোরে তার একটা হাসবার ইচ্ছে হ'ল। কারণ সে জানে যে, তার মতন এসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। সে এর মধ্যে বাইবেলের চারখানা ভাগই মুখস্থ করে ফেলেছে। সে ঠিক করে রেখেছে নিজে সে পাদরী হবে। কিন্তু তাতে অন্যান্য ছেলেদের মত নষ্টামি আর দুষ্টুমি করতে একটুও তার বাধা হয় না।

সব যখন তার সাজান-গোজান হয়ে গেছে, পাদরীর মা তখন চলে গেছেন।

অ্যান্টিয়োকাস ভাঁড়ার-ঘর বন্ধ করলে। গির্জ্জের গায়ের বাগানটা হেঁটে পেরিয়ে গেল। চারিদিকে শুধু প্রচুর রোজমেরি ফুলে ভরে গেছে, আর জায়গাটা যেন প'ড়ো গোরস্থানের মত দেখাচ্ছে। গ্রামের চৌমাথার কোনে যেখানে তার মার একখানা হোটেল আছে, সেইখানে তার বাড়ী, সেখানে কিন্তু সে ফিরে গেল না। সে দৌড়ে গেল গির্জ্জে-বাড়ীতে কিং নিকোডিমাসের টাটকা কোন খবর এসেছে কিনা জানতে। আর তা ছাড়া অন্য কারণও আছে।

"আমি উপদেশের সময় মন দিইনি বলে তোমার ছেলে আমাকে বকেছেন।" মা যখন পলের জন্য খাবার গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত সেই সময় মহা অশান্তির সঙ্গে ছোকরা এসে ওই কথা বারবার বললে। "হয়ত তিনি আর আমাকে গির্জ্জের কোঠারী রাখবেন না, হয়ত তিনি ইলারিয়ো-পানিজাকে সে কাজ দেবেন। কিন্তু ইলারিয়ো একটা অক্ষরও পড়তে পারে না, আর আমি এখন, এমন কি লাটিন পড়তে শিখেছি। তা' ছাড়া ইলারিও এমন নোংরা। তোমার কি মনে হয়, তিনি কি আমাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন?"

"তিনি চান যে তুমি শুধু মন দিয়ে কাজ কর, এই গির্জ্জের উপাসনা ও উপদেশের সময় হাসা কখন উচিত নয়।"

সে খুব গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে বললে,

"তিনি বড্ড রেগে গেছেন। বোধ হয় ঝড়ের জন্যে রাত্রে তাঁর ঘুম হয় নি একটুও। তুমি শুনেছিলে ঝড়ের কি রকম ডাক?"

মা কোন উত্তর করলেন না, খাবার-ঘরে গিয়ে, বার'জন শিশুর পেট ভরে যায় এমন রুটী আর বিস্কুট সাজিয়ে রাখলেন। সম্ভবতঃ পল এর একটা জিনিসও ছোঁবে না। কিন্তু পলের জন্যেই এই সব তৈরী করা, সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখা, এদিক-ওদিক করা, যেন সে আসছে পাহাড় থেকে রাখাল ছেলের মত আনন্দ আর ক্ষিধে নিয়ে—তাঁর এই যাতনা, এই বেদনাকে সেই হয় তো খানিক কমিয়ে দিতে পারে, হয়ত তাঁর বিবেকের যে গ্লানি তাও খানিক কমতে পারে—যে যাতনা, যে গ্লানি প্রতি মুহুর্ত্তেই তাঁকে তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে অহর্নিশি খোঁচা দিচ্ছে। সেই ছোকরার সেই কথা, "হয়ত তিনি বড় রেগে গেছেন, কারণ সারারাত তাঁর একেবারে ঘুম বোধ হয় হয়নি"—এই কথায় আরো তাঁর অশান্তি বাড়িয়ে দিলে। তিনি যতই এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর ভারি পায়ের জুতোর আওয়াজ নির্জ্জন ঘর শব্দে ভরে দিচ্ছিল। মনের সহজ ভাব থেকেই তিনি বুঝলেন, যদিও ওপর-ওপর দেখাচ্ছে, "সব শেষ হয়ে গেল", আকাশে কিন্তু এই আরম্ভ হ'ল। বেদী থেকে পল যখন উপদেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি সে কথা বেশ বুঝতে পাচ্ছিলেন যে, যে খুব ভোরে উঠবে, নিজেকে ধুয়ে পরিষ্কার করবে, সে সামনে এগিয়ে যাবে। তিনি মনে মনে কল্পনায় সেই ভাব মনে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন, ঘুরে ফিরে যে, সত্যই তিনি সামনে এগিয়ে চলেছেন। তিনি ওপরের ঘরে গেলেন, পলের নিজের ঘর সব ঠিক-ঠাক করে রাখতে—ঘরের ভিতরের সেই আরসী, আর সেই সব সুগন্ধ তাঁকে তখনও পর্য্যন্ত বিরক্ত করছিল। তিনি ভয় পেলেন। 'সব শেষ হয়ে গেল' এ ভরসা পেয়েও, সেই অভিশপ্ত আরসীর ভিতর থেকে পলের সেই আকাশে শক্ত মূর্ত্তি তিনি যেন তখনও দেখছেন। দেয়ালের গায়ে পলের সেই কোক ঝুলছে—মরার মতন সে যেন বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁর অন্তর যেন বিষম ভারি হয়ে উঠল, যেন ভিতরের কলকব্জা তাঁকে নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না।

এখনও পলের চোখের জলে বালিসের ওয়াড় ভিজে রয়েছে। তার সেই জ্বরের যাতনার মত যাতনা মার ভেতর পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে। বালিসের ওয়াড়টা বদলে আর একটা ওয়াড় পরিয়ে দিতে দিতে তাঁর মনে হল—এই প্রথম, আর কখনও এ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগেনি—

"কিন্তু কেন পাদরীদের বিয়ে করা একেবারে বারণ ?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হ'ল এ্যাগনিসের কত টাকা-কড়ি, কত বড় তার বাড়ী, ফলফুলের বাগান, গাছ, ক্ষেতখামার কত।

তখন তাঁর নিজেকে অতিবড় অপরাধী মনে হ'ল। এ সকল কথা তাঁরও মনে আসে। তাড়াতাড়ি বালিসের ওয়াড়টা সমান করে পরিয়ে দিয়ে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সামনে এগিয়ে যাও ? হাঁা, তিনি ত' ভোর থেকেই সামনে এগিয়ে চলেছেন, এখন শুধু সে পথের সবে আরম্ভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু যতদূরই যান, আবার ফিরে সেই আগের জায়গাতেই ফিরে আসছেন। নীচে নেমে গিয়ে তিনি আগুনের পাশে, যেখানে অ্যান্টিয়োকাস বসে আছে, সেই খানে গিয়ে বসলেন। সেখান থেকে সে নড়েনি। সে সেখানে সারাদিনই বসে থাকবে বলে স্থির করেছে। যদি দরকার হয়, তার ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতেই হবে। একটা পা আর একটা পায়ের উপর দিয়ে চুপ করে সে বসে আছে, দু'হাত দিয়ে হাঁটুটা চেপে ধরেছে। একটু তিরস্কারের সুরেই মাকে সে বললে,

"মেয়েদের পাপ শুনতে শুনতে দেরী হয়ে গেলে তুমি যেমন গির্জ্জেতেই তাঁর কাফি নিয়ে যেতে, তেমনি আজও নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয় ক্ষিধেয় তাঁর খুব কষ্ট হবে।"

"তা আমি কেমন করে জানব, এত তাড়াতাড়ি তার ডাক পড়বে, যে বুড়ো নিকোডিমাস হয়ত মারা যাবে ?" মা তাকে বললেন।

"আমার মনে হয় না যে সে কথা সত্যি। তার কিছু টাকা আছে কিনা, সেইজন্যে তার নাতিরা চায় যে বুড়ো মরুক। আমি সে বুড়োকে জানি। আমি বাবার সঙ্গে যখন একবার ওপরে পাহাড়ে গিয়েছিলাম, তখন একবার দেখেছি। পাহাড়ের ওপর রোদ্দুরে সে বসে রয়েছে, একটা কুকুর আর একটা পোষা ঈগল পাখী তার পাশে নিয়ে। চারধারে যত রকম মরা জানোয়ার। ভগবান বলেন নি মানুষকে এরকম করে বেঁচে থাকতে।"

"কি ভাবে বেঁচে থাকতে তিনি তবে বলেছেন ?"

"তিনি বলেছেন, মানুষের ভেতর আমাদের বাস করতে, জমি চাষ আবাদ করতে। আমাদের এ টাকাকড়ি লুকিয়ে জমাতে নয়, শুধু গরীব দুঃখীকে দেবার জন্যে।" সেই ছোকরা-কোঠারী, একজন বয়স্ক লোকের ভাব ও বিশ্বাসের সঙ্গে কথা কইছে দেখে পাদরীর মার মনে ভাল লাগল, তিনি একটু হাসলেন। অ্যান্টিয়োকাস যে এমন সব বুদ্ধি-বিবেচনার কথা বলতে পারে, তার কারণ তাঁরই পল যে তাকে সব শিখিয়েছে। তাঁরই পল সকলকে শিখিয়েছে সৎ হতে, বুদ্ধিমান হতে, জ্ঞানী হতে। আর যখন সে সত্যি সত্যি ইচ্ছা করেছে, তখন সে সব বুড়োলোক, যাদের মত ও অমত সব স্থির হয়ে গিয়েছে, তাদেরও সে সব কথা বিশ্বাস করাতে পেরেছে। এমন কি যারা নিতান্ত বালক, তাদেরও। মা একটা নিশ্বাস ফেলে, নীচু হয়ে, কাফির পাত্রটা, ছোট ছোট কাঠের জ্বলন্ত আগুনের ধারে টেনে এনে রাখলেন।

"অ্যান্টিয়োকাস, তুমি যেন একজন ছোটখাট মহাপুরুষের মত কথা বলছ। কিন্তু দেখা যাবে, তুমি যখন মানুষ হবে, তখন তোমার এই সব কথা ঠিক থাকে কিনা, তুমি সত্যি সত্যি তোমার সব টাকা-কড়ি গরীবদের দাও কিনা দেখা যাবে।"

"হাঁ! নিশ্চয়ই, আমি আমার সর্ব্বস্ব গরীবদের দেব। আমার ত' অনেক টাকা হবে। মা তাঁর হোটেল থেকে অনেক টাকা করেছেন, বাবা জঙ্গল ঠিকভাবে রাখার কর্ত্তা, তিনিও যথেষ্ট রোজগার করেন, তবে! আমি যা পাব তা সব গরীবদের দেব। ভগবান আমাদের তাই বলেছেন। তিনি নিজেই আমাদের প্রতিপালন করবেন। বাইবেলে আছে, পাখীতে জমিতে বীজ বপন করে না, তারা ফসল কেটে ঘরে তোলে না, তবুও তাদের খাবার ভগবানের কাছ থেকেই তারা পায়। উপত্যকায় যে ফুল ফোটে তাকে ভগবান রাজার চেয়ে আরো সুন্দর বেশ পরিয়ে দিয়েছেন।"

"হাঁ, কিন্তু অ্যান্টিয়োকাস, মানুষ যখন একলা থাকে, সে এসব করতে পারে, বলতে পারে। কিন্তু যদি তার ছেলে-পুলে থাকে, তখন ?"

"তাতে বড় বিশেষ কিছু যায় আসে না। আর আমার কখনও ছেলে-পুলে হবে না, পাদরীদের ছেলে হয় না।"

তার মুখখানা ভাল করে দেখবার জন্যে মা মুখ ফেরালেন তার দিকে। অ্যান্টিয়োকাসের মুখের আধখানা তাঁর দিকে ছিল, খোলা দরজার আলোর দিকে ছিল তার আর এক পাশ, বাইরে উঠান। সে আধখানা মুখ, অতি সুন্দর ও পবিত্র, জোরাল তুলির টানের রেখায় আঁকা, কালচে রং, ব্রোঞ্জের একটা গড়া পুতুলের মত, চোখের পাতা লম্বা, চোখের উপর আড়াল দিয়েছে তার চোখের বড় কাল তারা। ছেলেটির মুখের পানে চেয়ে মার চোখ জলে ভরে উঠল। কেন যে তা তিনি বুঝতে পারিলেন না।

"তুমি স্থির জান যে, তুমি পাদরী হবে ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হাঁ, ভগবানের যদি ইচ্ছে হয়।"

"পাদরীরা ত' বিয়ে করতে পারে না। ধর, তোমার যদি এর পর বিয়ে করবার ইচ্ছে হয় ? তখন ?"

"আমার বিয়ের দরকার হবে না, কারণ ভগবান তা নিষেধ করেছেন।"

"ভগবান ? না, পোপ নিষেধ করেছেন।" মা একটু থতমত খেয়ে, ছেলেটির কথায় চমকে গিয়ে বললেন।

"পোপ হলেন এই পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি।"

"কিন্তু আগে ত' পাদরীদের ছেলে-পেলে থাকত, স্ত্রী থাকত, সংসার ছিল। যেমন এখন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরীদের আছে।"

"সে হ'ল আলাদা কথা," বালক তর্কে একটু গরম হয়ে উঠল, বললে, "না, এ আমাদের থাকা উচিত নয়।"

"কিন্তু পুরাকালে পাদরীদের..." তিনি তবু বলতে গেলেন।

কিন্তু গির্জ্জের কোঠারী ছেলেটি, সে বিষয়ে সব খবর রেখেছে, বললে, "হাঁ, পুরাকালে পাদরীরা - কিন্তু তাঁরাই তারপর সভা করে এই বিয়ের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, আর যাঁরা তাদের মধ্যে ছোট ছিলেন, তাঁরাই এই বিয়ের বিরুদ্ধে সব চেয়ে জোর করে বলে গেছেন। এই হওয়া উচিত।"

"যারা ছেলেমানুষ।" কথাটা মা যেন নিজের কানের কাছেই বললেন। "কিন্তু যারা ত', সেই ছেলেমানুষরা ত' কিছু বলত না। তারা হয়ত পরে অনুতাপ করেছে, তারা হয়ত ভুল পথে পরে চলেছে। হয়ত তারা বিচার করে দেখলে পুরাকালের পাদরীদের মতেই মত দিত।"

মার সমস্ত শরীরটা একেবারে যেন কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ফিরে দেখতে গেলেন যে, সেই বুড়ো পাদরীর ভূতটা সেখানে এসে বসে নি ত'। তথাপি এই কথাগুলো বলে মনে মনে অনুশোচনা হল। তাঁর সত্যি সত্যি তাঁর এ বিষয়ে ভাববার কোন ইচ্ছাই ছিল না। আর বিশেষতঃ এই ব্যাপারের সম্পর্কে। এখন সব ত' শেষ হয়ে গেছে! অ্যান্টিয়োকাসের মুখ একেবারে এখন ভয়ানক ঘৃণায় ভরে উঠেছে।

"সে লোকটা নিশ্চয়ই পাদরী নয়, সে এ পৃথিবীতে নিশ্চয়ই শয়তানের ভাই হয়ে এসেছে। তার হাত থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। সব চেয়ে ভাল তার কথা না ভাবা, তাতে আমাদের কোন দরকার নেই।" সে তখন দুহাতে বুকে রেখে ক্রুশের চিহ্ন আঁকলে। তার পর নিজেকে শান্ত করে অ্যান্টিয়োকাস আবার বললে, "অনুতাপের কথা বলছ! তোমার কি মনে হয় যে, তিনি—তোমার ছেলে, অনুতাপের কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবেন?"

ছেলেটির মুখে এ কথা শুনে তাঁর মনে বড় আঘাত লাগল। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার দুঃখের কথা প্রকাশ করে বলবার জন্যে ছটফট করছিলেন। তাকে ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্যে বলবেন, মনে করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার কথা শুনে তাঁর মনে বড় আনন্দ হ'ল, যেন সেই নির্দ্দোষ বালকের বিবেক তাঁর বিবেকের কাছে কথা বলছে। তাঁকে নির্ভর করতে বলছে, তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছে।

"সে বলে? আমার ছেলে পল বলে যে, পাদরীদের পক্ষে বিয়ে না করাই ঠিক?" অতি শান্ত সুরে মা বললেন।

"তিনি যদি না বলেন যে, বিয়ে না করাই ঠিক, তবে কে আর বলবে? তোমাকে তিনি সেই কথাই কি বলেন নি? এ একটা বেশ মজার জিনিষ দেখতে যে, পাদরীর পাশে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে স্ত্রী, তার ঘাড়ে একটা ছেলে। যখন সকালে তাকে গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করতে হবে, তখন হয়ত ছেলেটা খুব কান্না জুড়ে দিয়েছে। কি মজার কথা! একবার কল্পনায় ভেবে নাও, তোমার পাদরী ছেলের ঘাড়ে একটা ছেলে, আর তার পাদরীর পোষাকে একটা ছেলে ঝুলছে।"

মা একটু ক্ষীণ হাসি হাসলেন। কিন্তু তাঁর চোখের সামনে স্বপ্নের খেলার মতন ভেসে গেল, বাড়ী ভরতি সুন্দর ছেলে-মেয়ে, ছুটোছুটী করে খেলাধূলো করে বেড়াচ্ছে। তাঁর বুকের ভেতরে একটা অসহ ব্যথা জেগে উঠল। অ্যান্টিয়োকাস খুব জোরে হেসে উঠল। তার সেই কাল চোখ, শাদা পরিষ্কার ছোট দাঁত, তামার মত মুখ বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল। কিন্তু সেই হাসির সুর একটা কঠিন নিষ্ঠুরতায় যেন ভরে আছে।

পাদরী সাহেবের স্ত্রী! বেশ মজার মতন কথা বটে। যখন তারা হাত ধরাধরি করে দুজনে বেড়াবে, পেছন থেকে দেখাবে যেন দুজনই স্ত্রীলোক। আর তারা যেখানে বাস করবে, সেখানে যদি আর অন্য কোন পাদরী না থাকে তাহলে সেই স্ত্রী কি যাবে নিজের পাদরী স্বামীর কাছে তার পাপ শোনাতে।"

"মা কি করে? কার কাছে আমি আমার পাপ শোনাই?"

"মায়ের কথা আলাদা। আচ্ছা, কাকে তোমার ছেলে বিয়ে করবে বল? ওই কিং নিকোডিমাসের নাতনীকে বোধ হয়?"

সে আবার খুব হাসতে লাগল। কেননা নিকোডিমাসের নাতনী গ্রামের ভেতর সব চেয়ে দুর্ভাগা, খোঁড়া আর বোকা। কিন্তু তখনি সে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। মা যেন তাকে বাধ্য হয়েই বললেন, তাঁর নিজের শক্তিতে ঠিক নয়, এ যেন আর একটা বল, তারই জোরে তিনি কথা বললেন,

"আচ্ছা সে কথা যদি বল, তবে আর একজন আছে, ওই ম্যাগনিস।" অ্যান্টিয়োকাস যেন ঈর্ষার জ্বালায় কথার প্রতিবাদ করে বললে,

"সে অতি কুৎসিত, আমি তাকে একেবারেই পছন্দ করিনে, আর তোমার ছেলে, তিনিও নিশ্চয় তাকে পছন্দ করেন না।"

মা তখন ম্যাগনিসের নানা রকম সুখ্যাতি করতে লাগলেন। খুব ফিস ফিস্ করে সে কথা বলতে লাগলেন, ভয় হচ্ছে, পাছে অ্যান্টিয়োকাস ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় তাঁর কথা। অ্যান্টিয়োকাস তখনও তার দুই হাতে হাটুটা ধরে বসে ছিল। খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে সে কি বলতে গেল, গলায় তার নাচেকার ঠোঁট বেরিয়ে পল, যেন পাকা চেরী ফল।

"না, না, আমি তাকে কিছুতেই পছন্দ করি নে—তুমি কি শুনতে পাওনি, এই যে আমি বললাম। সে অতি কুৎসিত, গহঙ্গাবী আবার বয়স হয়ে গেছে। আর না ছাড়া..."

ছোট হল-ঘরে কার যেন পায়ের শব্দ। দুজনে তখুনি একেবারে থেমে গেল, দাড়িয়ে উঠে যেন কার অপেক্ষায় রইল। (ক্রমশঃ)

| অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

চিঠিপত্র

শ্রীযুক্ত "বঙ্গশ্রী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ভদ্র * মহাশয় লিখিত আমার "টলারেশন" প্রবন্ধের প্রতিবাদ আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, সুতরাং আমি কি উত্তর দিব জানি না। কথার অর্থ লইয়া যদি তর্ক করিতে হয়—তাহা হইলে toleration এর নিম্নলিখিত অর্থ Webster দিয়াছেন—The allowance of that which is not wholly approved. সুতরাং প্রমোদরঞ্জন ভদ্র মহাশয় যে বলিয়াছেন "ইহার মধ্যে অননুমোদনের কথা কিছুই নাই" এটা ঠিক Webster এর অভিপ্রেত নহে। Toleration এর মধ্যে একটা condescension এর ভাব আছে সেইটাই আমার "অসহ্য"। ফরাসি আভিধানিক Littré: Tolerance এর অর্থ ই দিয়াছেন—Condescendence, indulgence pour ce qu'on ne peut pas ou ne veut pas empecher,—ইহার ইংরাজী তরজমা এই দেওয়া যায়—Toleration · condescention, forbearance for that which one cannot or does not like to prevent.

টলারেশন্ একটা "অস্থায়ী বোঝাপড়া" মাত্র। ইহার ভিতর যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ইতর বিশেষ করিবার ভাব আছে তাহাকে মুছিয়া ফেলিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবিয়া, দেশের কল্যাণকে একমাত্র কাম্য করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্মে তাহাকেই নিয়ামক করিয়া চলা উচিত ইহাই আমার বক্তব্য। ইহাতে প্রমোদরঞ্জন ভদ্র মহাশয়ের আপত্তি থাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। ইতি—

—চারুচন্দ্র রায়।

---

* ভ্রমক্রমে আষাঢ় সংখ্যায় 'ভদ্র' ছাপা হইয়াছে, 'ভড়' হইবে। বঃ সঃ।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র ও নায়ক

মহাত্মা গান্ধী

১০ই আষাঢ় সোমবার (২৫শে জুন) পুনা মিউনিসিপালিটির তরফ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে একটি মানপত্র দিবার আয়োজন করা হয়। সভা বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে একটা মোটর গাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। যে কারণেই হউক বোমা নিক্ষেপকারীদের ধারণা হইয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী উক্ত মোটরে ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ-হানির উদ্দেশ্যেই এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মাজী উক্ত মোটরে ছিলেন না। এই কার্য্য হরিজন-আন্দোলন-দমন-প্রয়াসী সনাতনীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন।

১৪ই আষাঢ় শুক্রবার পুনরায় মহাত্মাজীর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। কানসেট ষ্টেশনের নিকট গান্ধীজীর ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার প্রয়াস করা হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই চেষ্টাও সফল হয় নাই।

ইহা লইয়া প্রায় একমাসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর উপর তিনবার আক্রমণ হইল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বারবার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবনকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা হয় নাই। ধর্ম্মের গোঁড়ামির জন্য এই ভারতবর্ষের বুকে যত অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এগুলি তাহাদেরই পর্য্যায়ভুক্ত। গোঁড়া মুসলমান ও সনাতনী হিন্দু উভয়ের মনোবৃত্তিতে একই বস্তু কাজ করিতেছে—তাহা স্বর্গনরক, পাপপুণ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা। অত্যন্ত অশিক্ষিত লোকেই এই ধরণের অনাচার করিতে অগ্রসর হয়। এই সকল অজ্ঞলোকের দায়িত্ব ততটা নয়, ধর্ম্মনেতাজাতীয় যাঁহারা মিথ্যা প্রলোভনের লোভ দেখাইয়া ইহাদিগকে নৃশংস করিয়া তুলিতেছেন দায়ী তাঁহারাই। ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বংসহ এবং উদার বলিয়া যে খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে ইংরেজরাজত্ব চলিতেছে, হিন্দুতে হিন্দুতে বিরোধের ফলে তাহা আরও দৃঢ়মূল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নবপ্রবর্ত্তিত হরিজন-আন্দোলন এই বিরোধকে জাগ্রত করিবার জন্য কতখানি দায়ী তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায় যতদিন পর্য্যন্ত তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিয়া না দিতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মান্দোলনের কি সার্থকতা বুঝিতে পারি না। মহাত্মা গান্ধীও তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই।

যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় মহৎ লোকের প্রাণের মূল্য জাতির কাছে এখনও অনেক, তাঁহার প্রাণনাশে ভারতবর্ষের সমস্যার নিরসন হইবে না। মহাত্মা গান্ধী নিজে যেমন বুঝিতেছেন ঠিক সেইভাবেই দেশের ও দশের উপকারসাধনে ব্যাপৃত আছেন; সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার তিনি করিতেছেন, কোনও ক্লেশকেই তিনি ক্লেশ জ্ঞান করেন না। তাঁহার আত্মনিগ্রহের অন্ত নাই। পরের পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। লালনাথ নামক সনাতনী দলের এক গুণ্ডা গত কিছুকাল যাবৎ তাঁহার আন্দোলন পণ্ড করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিল। যশিডি বৈদ্যনাথ সর্ব্বত্রই এই দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে বাধা দিয়া আসিতেছিল। গত ৬ই জুলাই আজমীঢ়ের এক সভায় এই ব্যক্তি স্বদলবলে উপস্থিত হয়। হরিজন আন্দোলনের পক্ষের কয়েকজন লালনাথকে কিছু শিক্ষা দেন। তাহার কিঞ্চিৎ রক্তপাত হয়। সেই রক্তপাতের কথা অবগত হইয়া মহাত্মা গান্ধী এই সপ্তাহে সাতদিনের জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে তিনি কলিকাতায় আসিবেন। তিনি বারম্বার একটি কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

"আমি আত্মবলির জন্য অস্থির নহি, কিন্তু যাহা আমি আমার শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুও মনে করে, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যদি আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহা হইলে আমি মনে করিব যে, আত্মদানের গৌরব আমি ন্যায্য ভাবেই অর্জ্জন করিয়াছি।"

সেই কর্ত্তব্য—ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা নিবারণ।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

গত কিছুকাল যাবৎ পণ্ডিতজী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন, সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সমস্যার আলোচনা করিবার জন্য তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কোনও কার্য্যই অগ্রসর হইবে না।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

আড়াই বৎসর কারাবাসের পর রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিগত ১৪ই জুলাই তারিখে নাসিক জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার জন্য বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে।" তিনি কংগ্রেসকে মানিয়া চলিবেন স্থির করিয়াছেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

কারাগারে পণ্ডিত জহরলালের ওজন প্রতিদিন উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি বই লিখিতেছেন।

মৃত্যু

মাদাম ক্যুরি

বিগত ৪ঠা জুলাই ফ্রান্সের অন্তর্গত ভ্যালেন্স নামক স্থানে বিখ্যাত নারী-বৈজ্ঞানিক মাদাম ক্যুরির ৬৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। পোলাণ্ডের ওয়ার্স সহরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা অধ্যাপক স্ক্লাডাউস্কী নিজের গবেষণাগারে কন্যা মেরীর বিজ্ঞানশিক্ষার গোড়া পত্তন করেন। রুষিয়ার তদানীন্তন জারের বিরুদ্ধাচারী কোনও দলে যোগদান করার ফলে কুমারী মেরী স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় প্যারিসে উপস্থিত হইয়া বিখ্যাত অধ্যাপক গেব্রিয়েল লিপম্যানের সহায়তায় পেরী ক্যুরি নামক একজন প্রতিভাবান ছাত্রের সহিত একযোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পেরী ক্যুরিকে বিবাহ করিয়া তিনি মাদাম ক্যুরি হন। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত ক্যুরি-দম্পতির নানা গবেষণার ফলে পদার্থবিজ্ঞান জগতে যে সকল অদ্ভুত আবিষ্কার হইয়াছে তাহার বর্ণনার স্থান ইহা নহে। ১৮৯৮ সালে পিচ ব্লেণ্ড হইতে রেডিয়াম ও পলোনিয়াম ধাতুর আবিষ্কার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক বেকেরল ও ক্যুরি-দম্পতি একত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্ত
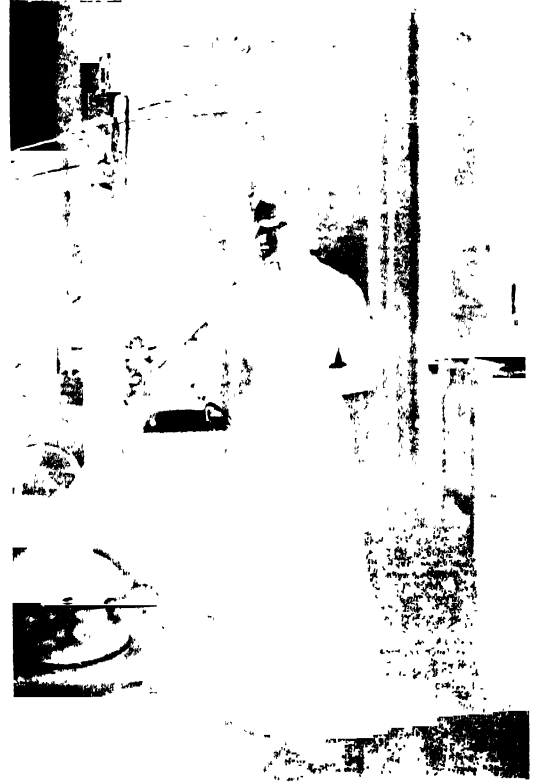
মাদাম ক্যুরী

হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক মোটর-দুর্ঘটনায় অধ্যাপক পেরী ক্যুরির মৃত্যু হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার নোবেল-প্রাইজ পান। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সোর্ব্বনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই তিনি পোলোনিয়াম ধাতু সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা শুনিবার জন্য লণ্ডনের সুবিখ্যাত লর্ড কেলভিন, স্যার উইলিয়ম র‍্যামসে, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি সোর্ব্বোনে উপস্থিত হন। পরে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটের ক্যুরি ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আচারে ব্যবহারে মাদাম ক্যুরি অতি-আধুনিকতার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের গবেষণায় যে নারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন তাঁহার পারিবারিক জীবন ও সহজ জীবন-যাত্রাপ্রণালী আলোচনা করিলে আধুনিক প্রগতিবাদী

মহিলারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। নিজে সত্যকার বৈজ্ঞানিক হওয়া—আর বিজ্ঞানের যুগের দোহাই পাড়িয়া প্রবৃত্তির বশে ছুটাছুটি করা এক কথা নহে।

মাদাম ক্যুরির মৃত্যুতে নারী-জগতে যে অভাব সংঘটিত হইল সহসা তাহার পূরণ হইরার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

কলিকাতার ৮২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান রেডিওলজিষ্ট এসোসিয়েশন এই প্রতিভাশালিনী নারীর পুণ্যস্মৃতি তর্পণ মানসে এক সভার অনুষ্ঠান করেন।

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি

৩রা জুলাই মঙ্গলবার রাত্রে কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ বা ন্যাশনাল আয়ুর্ব্বেদ কলেজ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার দানশীলতাও সর্ব্বজনবিদিত। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূল পুস্তক সমূহের বহু বিস্তৃত টীকা তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে তিনি কৃতবিদ্য ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক হারাইল।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠের নিজস্ব বিদ্যালয়-বাটী ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার বাসনায় তিনি সার্কুলার রোডের মহিলা-উদ্যানের দক্ষিণে অনেকখানি জমী পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহুদিনের বাসনা সফল হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী সকলে মিলিয়া তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

স্মৃতিতর্পণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

গত ১লা আষাঢ় (১৬ই জুন) শনিবার প্রাতঃকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কলিকাতা এবং সহরতলীর সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। ওই দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টায় কলিকাতা ময়দানের অক্টরলনী মনুমেণ্টের পাদদেশে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলবার্ট হলেও একটি সভা হইয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ২৯শে জুন প্রাতঃকালে মাইকেলের সমাধিপার্শ্বে সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্মৃতির

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং অপরাহ্ণে সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে তাঁহার দ্বিষষ্টিতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায় মহাশয় 'মাইকেলের জন্মতারিখ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ সহ দেখাইয়াছেন যে, মাইকেলের জন্মসাল ১৮২৪ নহে, ১৮২৩। মাইকেলের পৌত্র এবং দৌহিত্র এই সভায় এবং প্রাতে সমাধিপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

সমাধিপার্শ্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেন, যে, সাধারণ লোকের ধারণা মাইকেল বিদেশী কাব্য-সাহিত্য হইতে তাঁহার কাব্যের ভাব, উপমা ও ছন্দ ইত্যাদি আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই ধারণা ভ্রান্ত। মাইকেল কিছুই বিদেশ হইতে সংগ্রহ করেন নাই। এমন কি, ছন্দও নহে, অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ ছন্দ সংস্কৃততেই আছে, সংস্কৃত কোন ছন্দেই মিল নাই। ইত্যাদি।

মাইকেল নিজে কিন্তু বারম্বার পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট তাঁহার অপরিসীম ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। হোমার, ভার্জ্জিল ও মিলটন পড়িয়া পড়িয়া যিনি কান ঠিক করিলেন, বিদেশ হইতে যিনি মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র রচনা করিলেন, অকস্মাৎ এত বৎসর পরে তাঁহাকে খাঁটি স্বদেশী বানাইবার এই প্রয়াস কেন? সংস্কৃততেই যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দ লুক্কায়িত ছিল তাহা হইলে সেখান হইতে এই ছন্দ সংগ্রহ করিবার ভার মা সরস্বতী কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হাতে না দিয়া ম্লেচ্ছভাষাপারঙ্গম এই অনাচারীর হাতে দিলেন কেন? সমস্যা সন্দেহ নাই! আশা হয়, অনতিবিলম্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের কোনও কৃতী ছাত্র 'মাইকেলে বিদেশী প্রভাব পড়ে নাই' এবিষয়ে একটি থিসিস লিখিয়া ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

গত ২২শে জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ২৭তম স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, হিতবাদী পত্রিকার উদ্যোগে এই বৎসর এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছে।

কাব্যবিশারদ মহাশয় সাধারণতঃ তীব্র ব্যঙ্গ-কবিতার রচয়িতা হিসাবেই আমাদের নিকট পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'কে শ্লেষ করিয়া তিনি 'মিঠে কড়া' নামক যে ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন আমরা কেবল তাহারই খবর রাখি, তিনি বাংলা সংবাদপত্রের রাজ্যে একা যে অঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন তাহার খবর আমরা বড় একটা রাখি না। বর্ত্তমান সংবাদপত্রের যুগে তাঁহার ন্যায় কৃতী-পুরুষের জীবনীর আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। স্বদেশীর যুগে নানাভাবে ইনি স্বদেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সকল কথাও আলোচিত হওয়ার যোগ্য। ১৯০৭ সালে ৪ঠা জুলাই জাপান হইতে প্রত্যাগমনের পথে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ ২৭ বৎসর পরে তাঁহার কথা বিস্মরণশীল দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া এই সভার উদ্যোক্তাগণ সকলের কৃতজ্ঞাভাজন হইলেন।

নিয়োগ ও নির্ব্বাচন

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক

খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন সাহেবের পরিত্যক্ত মন্ত্রিত্বপদে খাঁ বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হককে নিযুক্ত করিয়া বাংলার
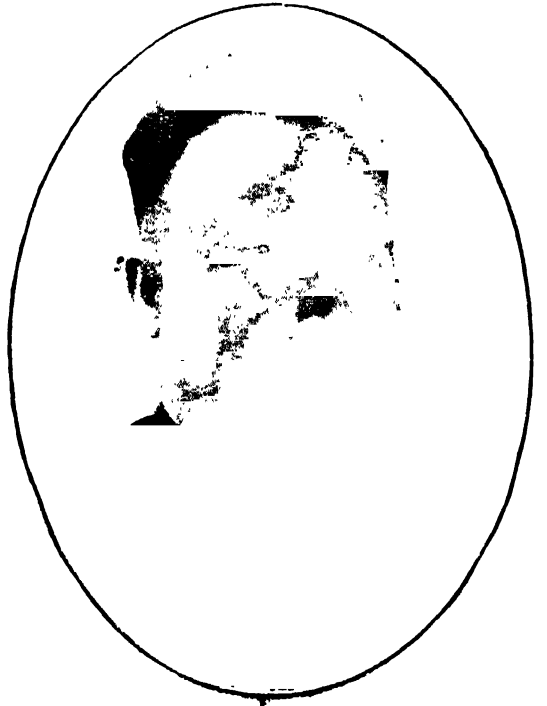
খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক

গবর্ণর বাহাদুর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীত্বের ভার ন্যস্ত হইতে পারিত না। খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের বয়স বেশী নহে, তিনি খুব বেশী দিনও রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে এই কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খাঁ বাহাদুর নদীয়া জিলার শান্তিপুরের অধিবাসী, তিনি কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কৃষি ও সমবায় বিভাগেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি যে পরিবারের সন্তান সেই পরিবার বহুদিন যাবৎ মাতৃভাষা বাংলার চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার আমলেই বাংলাকে শিক্ষার বাহন করা যায় কিনা এবিষয়ে আলোচনা হইবে। আশা করি, সকল দিক বিবেচনা করিয়া তিনি এবিষয়ে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

বিগত ১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই) বুধবার কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র-নির্ব্বাচন পর্ব্বের শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায়বলে অতি সাধারণ অবস্থা হইতে অনেক কাদা ঘাঁটিয়া ও ঠেলিয়া নলিনীরঞ্জন আজ কলিকাতা নগরের 'প্রথম নাগরিক' হইলেন। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি আরও অনেক দূর অগ্রসর হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নবনির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

বিবিধ প্রতিষ্ঠান-সংবাদ

ইণ্ডিয়ান সায়ান্স এসোসিয়েশন

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সায়ান্স এসোসিয়েশন স্যার সি. ভি. রামনের চক্রান্তে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায় একটি মাদ্রাজী প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় এমন সকল চাল চালা হইতেছিল যে, বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রতিষ্ঠান হইতে কোনই সুবিধা পাইতেছিলেন না। প্রধানতঃ ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিয়াছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। স্যার সি. ভি. রামন এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি ও ডাঃ কৃষ্ণণ স্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ইহাঁদের স্থলে যথাক্রমে স্যার নীলরতন সরকার সভাপতি ও ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। বাঙলা দেশের বুকে বসিয়া উচ্চ বিজ্ঞান চর্চ্চার নামে এই যে কলঙ্কের অভিনয় হইতেছিল যে, সকল বাঙালীর চেষ্টায় বাঙালীর এই কলঙ্কের ক্ষালন হইল, তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বার্ষিক অধিবেশন-দিবসে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বাঙালী মাত্রেই অনেক দিন স্মরণে রাখিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

গত ১৬ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণ একচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

সভাপতি—স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি (তাঁহার পরলোক গমনে পরবর্ত্তী সভায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।) ৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৪। রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। মফঃস্বলের পক্ষে ১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ২। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৩। স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার। ৪। শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী। সম্পাদক—শ্রীরাজশেখর বসু। সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমল হোম, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বসু—মূল পরিষদের পক্ষে, এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত মনীষীনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—শাখা পরিষদের পক্ষে। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস আজীবন সদস্য হইয়াছেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদই একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান নানাভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের, তথা সাহিত্যিকগণের সেবা, বহু লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের পুনরুদ্ধার, পরিভাষা সম্বন্ধে নানা গবেষণা এবং মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার্থ নানাবিধ প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। নানা বদান্য ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে পরিষদ গত চল্লিশ বৎসরে এমন অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলাসাহিত্যের যেগুলি অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশের লোকের নাড়ীর যোগ সংঘটিত হয় নাই, ইহা পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদের দোষ নিশ্চয়ই। ফলে এই প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে প্রায় মরিতে বসিয়াছে। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের উচিত পরিষদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল রাখা—তবেই এই প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিতে পারিবে। কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সান্ধ্য চিত্তবিনোদনের স্থান হইয়া থাকিলে পরিষদের মন্দির যাদুঘর হইয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে, প্রাণে বাঁচিবে না।

পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট

স্বর্গীয় আর. জি. ভাণ্ডারকরের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনা হয়। জনসাধারণের চেষ্টায়, গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতিতে এবং বিশেষ করিয়া টাটা পরিবারের ও জৈন সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্যে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় এবং ১৯১৭ সালের ৬ই জুলাই বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড উইলিংডন এই ইনষ্টিটিউটের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে এই প্রতিষ্ঠানের নানা সাহিত্য-প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই সময়ে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট ডেকান কলেজে রক্ষিত সমুদয় পুঁথির ভার ইনষ্টিটিউটের হাতে সমর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাহা-খরচা বাবদ ৩০০০ টাকা ইনষ্টিটিউট প্রাপ্ত হয়; পরে বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালার ভারও এই প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ১২০০০ টাকা গ্রাণ্ট সমেত পায়। 'দি খেৎসি খিয়াসি মানাসক্রপ্ট হল' ও 'রতন টাটা ইরানিয়ান এণ্ড সেমিটিক হল' ১৯২২ সালে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ হয়।

ইনষ্টিটিউটের আটটি বিভাগে এখন কাজ হইতেছে। বিভাগগুলি যথাক্রমে এই—১। পাণ্ডুলিপি বিভাগ—এই বিভাগে ন্যূনাধিক ২০ হাজার পুথি আছে। কতকগুলি সর্ত্তে ভারতবর্ষের সকল সত্যকারের পণ্ডিতকে এই সকল পুথি লইয়া কাজ করিতে দেওয়া হয়। ১৮৬৮ সাল হইতে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ব্যুলার, কীলহর্ণ, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই সকল পুথি সংগ্রহ করেন। যথারীতি তালিকাভুক্ত হইয়া কার্য্যকরী অবস্থায় এত অধিক সংখ্যক পুথি অন্যত্র দুর্ল্লভ। ২। ইরানিয়ান ও সেমিটিক বিভাগ—আবেস্তা, পেহ্‌লভি, পারস্য ও আরব্য পুথি ১৯২০ সাল হইতে এই বিভাগে সংগৃহীত হইতেছে। ৩। পুস্তক প্রকাশ বিভাগ। ৪। বিক্রয় বিভাগ। ৫। পত্রিকা বিভাগ। ৬। গ্রন্থাগার বিভাগ। ৭। গবেষণা বিভাগ ও ৮। মহাভারত বিভাগ—। মান্দ্রাজ আউন্ধের রাজা (chief) শ্রীমৎ বালাসাহেব পন্ত প্রতিনিধি ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের এক সাধারণ সভায় মহাভারতের এক পণ্ডিতী সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন ও নিজে এই কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইনষ্টিটিউট মহাভারতের একটি সুসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। বহু পণ্ডিত মিলিয়া গত ১৬ বৎসরের চেষ্টায় এই বিরাট কার্য্যটি অংশতঃ সফল করিয়াছেন। গত ৬ই জুলাই তারিখে ইনষ্টিটিউটের পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকার আউন্ধের এই বিদ্যোৎসাহী রাজাকে ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভি. এস. সুখথঙ্করের সম্পাদিত আদিপর্ব্বের একখণ্ড সমারোহের সহিত উপহার দেন।

বিখ্যাত ডক্টর ভিণ্টারনিৎস সভাপর্ব্বের সম্পাদন করিতেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় উদ্যোগ পর্ব্ব সম্পাদনার্থ শীঘ্রই পুনায় যাইতেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত দে মহাশয়কে এক বৎসরের ছুটি দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ সমূহের ইন্‌সপেক্টর ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে মোট আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। সম্প্রতি তিনি আরও দুই লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই মোট

সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচটি ট্রাষ্টের হাতে দেওয়া হইবে। যথা—১। দেড় লক্ষ টাকা লালচাঁদ মুখুজ্জ্যে (পিতা) ট্রাষ্টে—শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে কৃতী কয়েকটি ছাত্রকে মাসিক ২৫০ টাকা বৃত্তি। ২। এক লক্ষ টাকা প্রসন্নময়ী মুখুজ্জ্যে (মাতা) ট্রাষ্টে—আধুনিক বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভার্থী ছাত্রদের ৫০ ও ২০০ টাকা বৃত্তি। ৩। ৫০ হাজার টাকার একটি ট্রাষ্টে—কলকারখানায় শিক্ষালাভার্থীকে বৃত্তি। ৪। ৫০ হাজার টাকার ট্রাষ্টে—বি-এস-সি, বি-কম, এম-এস-সি, এম-কম ছাত্রদের বৃত্তি। ৫। এক লক্ষ টাকার একটি ট্রাষ্টে—সৈন্য, নাবিক, বৈমানিক ইত্যাদি হইবার জন্য যে সকল ভারতীয় ছাত্র বিদেশে যাইবে তাহাদিগকে বৃত্তি।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে খ্রীশ্চিয়ান। যদিও সংবাদপত্রের রিপোর্টে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই যে, তিনি এই বৃত্তি কেবল মাত্র খ্রীশ্চিয়ান ছাত্রদের জন্যই দিবেন, তথাপি স্মরণ হইতেছে এরূপই গুজব যেন শুনিয়াছিলাম। তিনি নিরামিষাশী এবং জপতপ করিয়া থাকেন। তাঁহার বৃত্তি যাহারা ভোগ করিবে তাহার একটি সর্ত্ত এই যে, তাহারা বাঙালী হইবে এবং তাহাদের মাতৃভাষা বাংলাই রাখিতে হইবে। বাঙালী এবং বাংলার প্রতি এই দরদ একদা ধর্ম্মের কোনও বাধা থাকিলেও তাহা দূর করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বিবিধ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষা

এসোসিয়েটেড প্রেসের ১লা আষাঢ়ের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলা ভাষায় সকল বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে বৈঠক হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই বসিবে। যে সকল বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে সে সকল বিষয়ে মীমাংসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ৬ জন ও সরকার পক্ষে ৬ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভবতঃ থাকিবেন, ভাইস-চ্যান্সেলার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর. ডব্লিউ. এস. আরকোহার্ট, শ্রীযুক্ত এস. সি. মহালনবিস ও রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ইহাঁদের বুদ্ধিবিচারের উপর দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে—আশা করি, ইহাঁরা যথাকর্ত্তব্য পালন করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন

এসোসিয়েটেড প্রেস আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলার বড় বড় আটটি জেলায় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ২২ হাজারের অধিক স্কুল উহার আমলে আসিয়াছে। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাবনা, দিনাজপুর ও বীরভূম জেলার জেলাস্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম চারি বৎসর জেলা-মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক বোর্ডের সভাপতি হইবেন, উহার পর কোনও বেসরকারী ব্যক্তি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। বোর্ড প্রথমে প্রত্যেক জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করিবেন, পরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। আটটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় আট লক্ষ টাকার অধিক হইবে। বাজেটে উহা বরাদ্দ হইয়াছে। বগুড়ায় ও ঢাকায় অবিলম্বে বোর্ড গঠিত হইবে।

আয়োজন যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন সত্ত্বেও ভগবান বুঝি আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেছেন!

হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা

ডক্টর বি. এস. মুঞ্জে বোম্বাই গিরগাঁওয়ের ব্রাহ্মণ-সভা-হলে একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,

"অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেরও রক্ষাকর্ত্তার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা এই প্রয়োজনীয় অভাব পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকেন।"

কিন্তু হিন্দু মহাসভারও যে একজন রক্ষাকর্ত্তার প্রয়োজন আছে ডক্টর মুঞ্জে সেই কথাটি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত আর. শ্রীনিবাসন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিল সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে গিয়া লিখিয়াছেন (মাদ্রাজ, ১৫ই জুন)—

"অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্ম হইতে সৃষ্টি হয় নাই: আর্য্যদের শাসননীতি অনুন্নত সম্প্রদায় মানিয়া লয় নাই বলিয়াই উহার উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ রাজনীতি হইতেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব, ধর্ম্ম হইতে নয়।"

একথা সত্য হইলে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, রাজনীতির দ্বারাই অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইবে, ধর্ম্মান্দোলনের দ্বারা নহে।

বিধাতার রোষ

এই দুর্ভাগ্য দেশ ও জাতির উপর বিধাতার রুদ্ররোষের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। প্রতি বৎসর, বৎসর কেন,

প্রতি মাসেই কোনও না কোনও দৈবদুর্ব্বিপাক লাগিয়াই আছে, হয় দুর্ভিক্ষ, নয় জলপ্লাবন, নয় মহামারী! বঙ্গদেশের অনেক জেলায় যখন সুবৃষ্টির অভাবে বীজধান নষ্ট হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে জলপ্লাবনে গৃহ ও প্রাণনাশের অবধি নাই। গোবিন্দগঞ্জ, কানাইঘাট ও বাজারগাওয়ের অধিবাসিরা প্রবল বারিপাতে গৃহহারা হইয়াছে। সুরমা নদীতে প্লাবন আসিয়া নওগাঁয়ের একাংশ সভ্য-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। নেত্রকোণা বিধ্বস্ত। কত লোক যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুর্গতদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে কে? অন্নহীন, বস্ত্রহীন বাঙালী এমনিতেই বিপন্ন। তবু যে সেবাকার্য্য চলিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য!

গয় ঘড় (ফরিদপুর) ব্যায়াম-সম্মিলনীর প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিণিগণ।

নূতন বাঙ্গালী

বহুদিন বাঙ্গালী তাহার মস্তিষ্কের বড়াই করিয়াছে। কিন্তু সকল ভাল-রই একটা মন্দ দিক আছে। সেই জন্যই গত কয়েক যুগের বাঙ্গালীর দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙ্গালী সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ-বাসীদের মনোগত ভাবের প্রতীক হিসাবে 'ভেতো বাঙ্গালী' কথাটি বাঙ্গালা ভাষাতেই বেশ চলিত হইয়া গিয়াছিল।

কিছুদিন হইল, বাঙ্গালী শরীরচর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, গত যুগের বাঙ্গালী যুবকদের অপেক্ষা এ যুগের বাঙ্গালী যুবকের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ব্যায়ামপুষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, এতদিন বাঙ্গালী-ছেলেরাই শরীরচর্চ্চাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী মেয়েরাও এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছে—কেবল কলিকাতা কিংবা বড় বড় শহরে নয়, সুদূর পল্লীতেও বালিকারা দৈহিক ব্যায়াম-ক্রীড়ায় যোগদান করিতেছে। পাশের ছবিটি ফরিদপুর জেলার গয়ঘড় গ্রামের এমনই একটি ব্যায়াম-সঙ্ঘের সহযোগিনীদের। আর একটি প্রতিকৃতি ঐ গ্রামের জনৈক যুবক শ্রীহেমচন্দ্র বসুর।

গয় ঘড় (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু ১৬"×৪"×১১/৪" বরগা বক্র করিতেছেন।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লেপচা মেয়ে
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

[স্যার হোপ্‌টন ষ্টোক্‌স্-এর সৌজন্যে

শ্রীকৃষ্ণ

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

নদীর পলিপড়া মাটি যেমন স্তরের পর স্তরে গঠিত, ভারতের সাধনাভূমিও তেমনি অনেক জানা ও না-জানা সাধনার স্তরে স্তরে গঠিত।

ভারতে যুগে যুগে দলের পর মানবের দল আসিয়াছে, আর আপন আপন সাধনা দিয়া ভারতীয় সাধনার প্রবাল-দ্বীপের একটি একটি স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই, যে, প্রবালকীট স্তর রচনা করিয়া মরিয়া যায় কিন্তু ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের দল যুগের পর যুগ আপন আপন সাধনা লইয়া এইখানেই জীবিত রহিয়া গিয়াছে।

বৈদিক আর্য্যেরা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই ভারতে দ্রবিড় সাধনা ছিল; তাহার পূর্ব্বেও বিচিত্র বহু বহু দ্রবিড়-পূর্ব্ব নানা জাতীয় সাধনা ছিল। বৈদিক আর্য্যদের পরে অবৈদিক আর্য্য ও আর্য্যেতর নানা শ্রেণী এখানে আসিয়াছে। কেহ কাহাকেও নষ্ট করে নাই। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে য়ুরোপীয়েরা যখন তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা লইয়া গেল তখন তাহারা সেই সেই দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম ও সভ্যতার কিছু অবশেষ রাখিল না। তাই সেই সব দেশে তাহাদের রাজ-নৈতিক সমস্যা একেবারেই জটিল নহে। "মায়া" "আজতেগ" প্রভৃতি মহা মহা সভ্যতার আজ আর চিহ্ন মাত্র নাই। তাই আজ সেখানে সমস্যাও কিছু নাই। আমেরিকাতে দাসত্ব-প্রথার অবশেষ যে-কিছু নিগ্রো রহিয়া গিয়াছে তাহাদের লইয়াই আমেরিকার আজ নিত্য জ্বালাতন।

সমস্যাকে এইরূপে সরল করিবার চেষ্টা ভারতে কখনও হয় নাই। তাই ভারতে বেদপূর্ব্ব, বৈদিক আর্য্য, অবৈদিক আর্য্য, নানা শ্রেণীর ও নানা মতের অনার্য্য, উচ্চনীচ, ভাল-মন্দ নানা সভ্যতা চিরদিন পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। কেহ কাহাকেও নিঃশেষ করে নাই। চিরদিন বহু প্রকারের মতবাদ এইরূপে পাশাপাশি বাস করাতে ভারতের চিত্ত দিনে দিনে পরমতসহিষ্ণু (accommodating) ও উদার হইয়া উঠিয়াছে।

বৈদিক আর্য্যদের ভারতে আসিবার পূর্ব্বে কত কত বড় বড় ধর্ম্মমত যে ভারতে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আজ বলা কঠিন। সবই আজ স্তর-বদ্ধ হইয়া এক ভারতীয় সাধনার ভূমি হইয়া গিয়াছে। বৈদিক আর্য্যদের পরেও অনেক অবৈদিক আর্য্যদল ভারতে আসিয়াছে। আর্য্যেতর অনেক বড় বড় মতবাদও ভারতে আসিয়াছে। তাহাদের সকলের সম্মিলিত ধর্ম্মই আজ ভারতের ধর্ম্ম; তাহাকে বৈদিক, অবৈদিক বা কোন দলবিশেষের নাম দেওয়া চলে না। বলিতে গেলে তাহাকে বলিতে হয়, "ভারতের" অর্থাৎ "হিন্দের" ধর্ম্ম অর্থাৎ "হিন্দু" ধর্ম্ম। দলের নামে নামকরণ অসম্ভব বলিয়া দেশের নামেই নামকরণ হইয়াছে। এমনটি জগতে আর কোথায়ও হয় নাই।

বেদের প্রধান কথা যজ্ঞ, কর্ম্ম-কাণ্ড। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র যজ্ঞভূমি; তাঁহাদের কাম্য স্বর্গ-সুখভোগ। জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, যোগ, বৈরাগ্য, নির্ব্বাণ, ভক্তিবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি শিলা-লিঙ্গাদির পূজা, নদী-বৃক্ষ তীর্থাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বড় বড় সব মতবাদ তো বেদের প্রথম দিক দিয়া দেখাই যায় না। ভারতের বাহিরে অন্যদেশীয় আর্য্যদের মধ্যেও কি এইসব কোথাও দেখা যায়? তবে ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে এগুলি আসিল কোথা হইতে? এই গুলিই এখন ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের ঐতিহাসিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সব মতবাদের মধ্যে অনেকগুলিই অবৈদিক তৈর্থিকদের। তৈর্থিক মত বেদবাহ্য। তীর্থে তীর্থে তৈর্থিকেরা একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী, আর্য্য বা আর্য্যেতর, যেমনই হউক, এই সব মতবাদই ভারতে পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। তাই প্রত্যেক সাধনাই আপনাকে অন্য সাধনার সংস্পর্শ হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই ভাবে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টার বিকৃত রূপই হইল অন্যকে দূরে ঠেকাইয়া

রাখিবার (exclusive) মনোবৃত্তি। এমন করিয়াই খুব সম্ভব অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির উৎপত্তি।

জাতি যতদিন অচল ততদিন এইরূপ নানা টুকরায় সাজান রথের বিচিত্র শোভায় সকলকে তাক লাগাইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু এইরূপ কারিগরীর জোড়াতাড়া দেওয়া রথ চালাইতে গেলেই শত খণ্ড হইয়া পড়ে, আরোহীর প্রাণসংশয় ঘটে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের জিজ্ঞাসুদের কাছে ভারতের বিচিত্র সাধনার ক্ষেত্র একটি মহাতীর্থ হইলেও ভারতের এইরূপ অবস্থা গতিশীল ও রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে সাংঘাতিক।

তাই নানা মতবাদের ভেদ-বিভেদই চিরদিন ছিল ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। বড় বড় যুদ্ধজয়ী বীরদের ভারত ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু যে সব যোগগুরুরা বিচ্ছিন্ন সব মানবদলকে আপন মাহাত্ম্যে এক করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা ভারতে চিরনমস্য।

পাশাপাশি আছি, জ্ঞানে তাহাকে জানি অথচ প্রেমে তাহাকে স্বীকার কবি নাই, এই ভাব প্রাণহীন অবস্থায় সাজে। কিন্তু যখনই প্রাণ জাগিয়া উঠে, যখনই জীবনের ক্রিয়া চলিতে সুরু করে, তখনই বুঝা যায় ইহার দুঃসহ বেদনা। প্রাণহীন সিন্দুকের মধ্যে কত রকমের "লটবহর" অনায়াসে পুরিয়া রাখা চলে, অথচ জীবন্ত মানবজঠরে যদি এমন এক গ্রাস খাদ্য থাকে, যাহাকে দেহ স্বীকার করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে বিষম তাহার যাতনা। রাজনৈতিক ও কালচার-গত জীবন কালে কালে যতই জীবন্ত হইয়া উঠিতে থাকে ততই এই দুঃখ হইতে থাকে অসহনীয়।

যখনই ভারতে এক একটি জীবন্ত মহাযুগ আসিয়াছে তখনই এক এক জন মহাপুরুষ এই সব বৈষম্যের মধ্যে যোগ স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। হইতে পারে এই সব মহা-পুরুষেরাও এক একটি নবযুগের স্রষ্টা।

এই রূপ একজন মহাপুরুষ ছিলেন শ্রীরাম। চণ্ডাল গুহক তাঁহার মিতা, শবরী তাঁহার আপন জন। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার মধ্যে রামচন্দ্র নিজেই ছিলেন যোগের সেতু। রামের যে সেতুবন্ধের কথা সকলে বিস্ময়ের সহিত শোনেন, সে তো শুধু দুইটি ভূখণ্ডের ভৌতিক যোগমাত্র। কিন্তু তাঁর যে সেতুবন্ধ বিচ্ছিন্ন সব মানব ও সাধনাকে যুক্ত করিয়াছে সেই চিন্ময় সেতুবন্ধই রামের অতুলনীয় সাধনা। মৃণ্ময় সেতুবন্ধের শিবদর্শন করিতে দলে দলে তীর্থ-যাত্রী যান। সাচ্চা চিন্ময় শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় সেখানেই প্রতিষ্ঠিত যেখানে মানবের সঙ্গে মানবের বিচ্ছেদের মধ্যে অন্তরের যোগ হইয়াছে স্থাপিত।

শ্রীরামের সেই সেতুবন্ধের গেল এক যুগ। পুরাণ তাহাকে বলিলেন ত্রেতা। তাহার পর আসিল দ্বাপর। "ভারত" তখন চাহিতেছে "মহাভারত" হইতে। সঙ্কটময় এই জীবন্ত যাত্রাপথ, কে তাহাকে চালাইবে? আসিলেন যোগগুরু শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার জীবনটাই অশেষবিধ যোগসাধনা। আপন জীবন দিয়া তিনি কত দিকে যে কত সেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তিনি জন্মিলেন ক্ষত্রিয় রাজবংশে, পালিত হইলেন ব্রজের গোপকুলে। একদিকে তাঁর সখা ব্রাহ্মণ সুদামা, অন্যদিকে দাসীর পুত্র বিদুর তাঁর অন্তরঙ্গ; তাঁর প্রণয়ের সখা ব্রজের যত গোপ-বালক। জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই গোপকুল তাঁহার বড় সহায়। তাই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি বলিতেছেন, "আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে খ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ আছে।[১] (মহাভারত, উদ্যোগ ৭,১৮)

গেল তাঁর শৈশব, আসিল তাঁর তারুণ্য। তখন রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ সাধনার ও ব্রজভূমির প্রেমলীলার মধ্যে করিলেন তিনি যোগস্থাপন। তাহার পরেও দেখা গেল তাঁহার তপস্যা ও প্রেমের মধ্যে যোগসাধনা। মহাপুরুষ ছাড়া কে এই দুঃসাধ্য সাধন সাধিতে পারে?

মহাভারতে তিনি কর্ম্মময়; গীতায় তিনি জ্ঞানময়; ভাগবতে তিনি প্রেমময়। এই তো জীবন্ত যুক্ত ত্রিবেণী। এখানে যদি মুক্তি না মেলে তবে মুক্তি আর কোথায়? এই তো যথার্থ যোগক্ষেত্র।

চারিদিকে চলিয়াছে যুদ্ধ, মনে হইতেছে জীবন ক্ষণভঙ্গুর। সেই যুদ্ধস্থলের মধ্যে বসিয়া তিনি দিলেন অনন্ত জ্ঞানের দৃষ্টি খুলিয়া; দেখাইলেন অসীম এই জীবন। এমন যোগগুরু আর কোথায়?

দর্শনাদি শাস্ত্রের এই তো মহাবিপদ যে, সত্য বলিতে

১। মৎসংহননতুল্যানাং গোপানামর্ব্বুদং মহৎ।
নারায়ণা ইতি খ্যাতাঃ সর্বে সংগ্রামযোধিনঃ॥

য়াও সে একদিকে না একদিকে না ঝুঁকিয়া পারে না। ইখানেই মহাগুরু মহামানবের প্রয়োজন; তিনি এই বৈষম্যের ধ্যই সাম্য ও যোগ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এইরূপ হাগুরু।

এক বিশ্বসত্যকে বহু তত্ত্বে বহু সংখ্যায় বিশ্লেষণ করিয়া খিতে চায় "সাংখ্য", নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে দেখিতে য় "যোগ"। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে এই দুই হইল একেবারে ন্ন পথ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বালকেরাই সাংখ্য ও াগকে পৃথক বলিয়া মনে করেন, পণ্ডিতেরা তো এইরূপ নন না।"[১] (গীতা, ৫,৪)

"জ্ঞানের যে গম্য পথে সাংখ্যের দ্বারা পৌঁছিবে যোগের রাও ঠিক সেইখানেই পৌঁছিবে। সাংখ্য ও যোগকে যে ক করিয়া দেখিয়াছে সে-ই যথার্থ দর্শী।"[২] (ঐ, ৫।৫)

কর্ম্মবাদীরা কর্ম্মকে বলেন প্রধান, জ্ঞানীরা আবার কর্ম্মকে রন নিন্দা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ম্মের মধ্যে যিনি অকর্ম্ম, কর্ম্মের মধ্যে যিনি কর্ম্ম দেখেন, মানবের মধ্যে তিনিই দ্ধমান্, তিনি যোগযুক্ত, তাঁহার কর্ম্মও একটি অখণ্ডতার ধনা।"[৩] (ঐ, ৪, ১৮)

কর্ম্ম মাত্রই তো সাধককে খণ্ডিত করে, তবে কর্ম্ম অখণ্ড কেমন করিয়া? কেমন করিয়াই বা কর্ম্মকে আশ্রয় করা ।? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যাঁহার সকল সমারম্ভ কামসঙ্কল্প-র্জ্জিত, জ্ঞানাগ্নিতে যাঁহার কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মগত সীমা ও ্ডতা) দগ্ধ, তাঁহাকেই সমঝদারেরা বলেন পণ্ডিত।"[৪] গীতা ৪, ১৯)

কর্ম্মের দোষ এই যে তাহাতে সাধকের "অহম্"কে নিত্য ত্র করিয়া জাগাইয়া রাখে। গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ খাইলেন কেমন করিয়া কর্ম্ম করিয়াও নিত্য আত্মনিবেদন করিয়া সাধনাকে সহজ করিয়া রাখিতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত বলিতেছেন,—"ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর, শরণাগত হও।"

গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সীমা ও অসীমের (ক্ষয় ও অক্ষয়) মধ্যে যোগস্থাপন করিয়াছেন।

গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিতে পাই আপনার ও বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে প্রভেদ ঘুচাইবার সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যিনি যোগযুক্তাত্মা ও সর্ব্বত্র সমদর্শন তিনিই আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখিতে পান।"[৫] (গীতা, ৬, ২৯)

বাল্যকালে ব্রজধামে প্রেমের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পশুতে ও মানুষে সমভাবে প্রীতি বিলাইয়াছেন। সেই কথাই গীতার মধ্যে তিনি জ্ঞানের দিক দিয়া বলিতেছেন। এই সমতা জ্ঞানের দৃষ্টির সমতা। "বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গোতে হস্তীতে কুকুরে চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী।"[৬] (গীতা, ৫,১৮)

তখনকার দিনে জাতিভেদ বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন এই কথা বলিতে পারা সহজ নহে। তাই বুঝিতে পারি, তাঁহার সাহস ছিল কত বড়, যখন তিনি অনায়াসে বলিলেন, "গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।"[৭] (গীতা, ৪, ১৩) কথাটা সত্য, কিন্তু সত্যকথা বলিতেও এক এক সময় অপরিমিত সাহসের দরকার।

শাস্ত্রের মত আচার ও সাধনাদিও একপাশ ঘেঁষা। তাই মুগ্ধ একঝোঁকা সাধক যখন সামঞ্জস্য হারাইয়া বিশেষ কোনো পদ্ধতির মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে নিক্ষেপ করে তখন সে হয় এক প্রকার সুমধুর আধ্যাত্মিক আত্মঘাত। যিনি এই মোহময় সুমধুর অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন তিনিই তো মহাগুরু। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"অতিভোজনশীলের মত একান্ত উপবাসীরও যোগ হয় না। যে সাধক যুক্তাহার-

---

১। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

২। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

৩। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

৪। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

৫। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

৬। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

৭। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ॥

বিহার, যে সকল কর্ম্মে যুক্তচেষ্ট, যাঁহার যুক্তনিদ্রা ও জাগরণ, যোগ তাহারই সকল দুঃখ দূর করে।"[১] বুদ্ধদেবের মধ্যমার্গও এই একই কথা। (গীতা, ৬, ১৬-১৭)

অনেক সময় দেখা যায় যাঁহারা লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী তাঁহারা নীতি ও সামাজিক আচারের প্রতি উদাসীন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এইরূপ পক্ষপাত দেখা যায় না। এই সব দিকেও তাঁহার কেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল গীতার ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় দেখিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ সাবধান করিতেছেন কর্ম্ম যেন কখনও একপাশ-ঘেঁষা না হয়।

গীতা পড়িলেই বুঝিতে পারি তিনি কেমন সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথার্থ ওজনটি রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সদা সাবধান করিয়াছেন। তাঁহার সাধনার এই ভারসামঞ্জস্যটি তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তেরাও সব সময় ঠিক মত বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সাধনার এক এক দিকে অসঙ্গত রকম বেশি ঝোঁক দিয়া গিয়াছেন। তাই আজ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারা এত কঠিন হইয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে জীবনের ওজনটি (balance) ঠিক মত রক্ষা করাই হইল আসল সাধনা। এই সাধনায় প্রধান সহায় হইল জ্ঞান। কর্ম্ম যখন একঝোঁকা হইয়া পড়ে, কামনা স্বার্থ ও ফলাকাঙ্ক্ষা যখন কর্ম্মের ওজনটি নষ্ট করিয়া দেয়, তখন জ্ঞানই একমাত্র সামঞ্জস্যবিধাতা। কামনাতে যে কর্ম্ম দুষ্ট ও মলিন তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। তখন আবার শুদ্ধতর নূতন কর্ম্ম করিবার অবসর ঘটে। পুরাতনের আবর্জ্জনার ভার যখন ভবিষ্যতের জীবনের পথ রোধ করে তখন তাহাকে দগ্ধ করা ছাড়া আর উপায় কি? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "জ্ঞানাগ্নিই সর্ব্বকর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।"[২] (গীতা, ৪, ৩৮)

এই জন্যই জ্ঞানের এত আদর। কর্ম্মের ও সংস্কারের পুরাতন পুঞ্জীভূত মলিনতা এই জ্ঞানাগ্নিতেই পবিত্র হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই।"[৩] (গীতা ৪, ৩৯)

লোভের আসক্তিতে, সিদ্ধির নেশায়, অসিদ্ধির ভয়ে এই ওজনটি নষ্ট হইতে চায়। যোগ হইল সকল বাধার মধ্য দিয়া এই ওজনটি রক্ষা করা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধি সব সমান করিয়া কর্ম্ম কর। কারণ সমতাই যোগ।"[৪] (গীতা ২, ৪৮)

সমতাই যোগ! কত বড় কথা। এই সমতাই আত্মজয়, বিশ্বজয়, ইহাই ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "এই সাম্য যে লাভ করিয়াছে সে আত্মজয়ী, সংসারজয়ী। এই নির্দ্দোষ সমতাই ব্রহ্ম, সমতাস্থিত লোক ব্রহ্মেই সংস্থিত।"[৫] (গীতা, ৫, ১৯)

সমতার মাহাত্ম্য কে কবে এমন করিয়া দেখাইয়াছেন? সমতাই যে যথার্থ যোগ, সমতাতে স্থিতিই যে যথার্থ ব্রহ্মবিহার তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাণীতেই বুঝা গেল।

"পরমেশ্বরকেও উপলব্ধি করিতে হইবে এই সমত্বেরই মধ্যে।"[৬] কারণ "সর্ব্বভূতে সমভাবে পরমেশ্বর বিরাজিত।" (গীতা, ১৩, ২৭)

"সেই ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে সমবস্থিত দেখিতে হইবে।"[৭] (গীতা ১৩, ২৮)

কাজেই দেখা যায় সকলকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে ওজন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতে উপদেশ দিতেন, নিজেও ঠিক সেইরূপ ভাবেই তিনি চলিতেন।

চলিতেন যে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ, তাঁহার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহার। সাধারণতঃ দেখা যায় যাহার চরিত্র ও বাক্য এক নয় তিনি দূরে দূরে সকলকে উপদেশ দিয়া বেড়াইলেও আপন পরিজনের কাছে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখি, রাজা যুধিষ্ঠির

১। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

২। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

৩। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে॥

৪। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

৫। ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

৬। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্॥

৭। সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্॥

তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিজন হইয়াও চিরদিন তাঁহার প্রতি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরকে সকলে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কাছে সায় না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

"হে কৃষ্ণ, কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষ উদ্ঘোষণ করেন না, কেহ বা স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয় তাহাকেই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্, এই পৃথিবীর মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক। সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কাজ করা যায় না, তুমি উক্ত দোষরহিত কামক্রোধের অতীত, অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।[১] (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৩ অধ্যায়, বঙ্গবাসী)।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন তাহা নহে, স্বয়ংও তাহা সাধন করিতেন। তিনি কেবল মাত্র "আদর্শ আওড়ান" (theorist) মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একেবারে "করিত-কর্ম্মা" (practical) সাধক। জরাসন্ধ যখন একশত ক্ষত্রিয় রাজাকে বলি দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনসহ তাঁহার পুরীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এমন দারুণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে বার বার অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি এই যুক্তি দিলেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত না করেন তবে সেই পাপে তিনিও পাপী হইবেন, কারণ সেই পাপনিবারণের মত শক্তি তাঁহার আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে বৃহদ্রথ-নন্দন (জরাসন্ধ), আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্ম-রক্ষণে সমর্থ।[২] (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২২ অধ্যায়, ১০)।

শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু পরের ও শত্রুর কাছেই কর্ত্তব্যের দাবী করিয়াছেন তাহা নহে, বন্ধুদের কাছেও তিনি কম দাবী করেন নাই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যাহাতে না হয় তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ না করিয়াছেন কি? তিনি ক্রমাগতই বলিয়াছেন, "যদি কুরুরাজ (কিছু ছাড়িয়া দিয়া) ন্যায়তঃ সন্ধি স্থাপন করে তবে আর কুরুপাণ্ডবগণের সৌভ্রাত্রনাশ ও কুলক্ষয় হয় না।"[৩] (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৫ অ, ৮)।

তবেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানে কর্ম্মে, মতে আচরণে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ ও সাচ্চা মহামানব। অন্যান্য ধর্ম্মগুরুরা প্রায়ই সন্ন্যাসী, গৃহস্থ-জীবন গ্রহণ করেন নাই। যে পরিমাণে তাঁহারা অনুবর্ত্তীদের উপদেশ দিয়াছেন, সে পরিমাণে নিজেরা সব পালন করিয়া দেখাইবার সুযোগ পান নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ নহেন; তিনি পরিপূর্ণ গৃহী হইয়া গার্হস্থ্যে, কর্ম্মী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে, সংসারী হইয়া সংসারে, বীর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র আপন করণীয় অক্ষুণ্ণ ভাবে সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মহত্ত্ব অতুলনীয়। অর্জ্জুনকে তিনি বলিতেছেন, "জনকাদি মহর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকসংগ্রহের জন্যও কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে।"[৪] (গীতা, ৩, ২০,)।

"আমি যদি অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম সাধনা না করি তবে সকলেই আমার পথই অনুসরণ করিবে।"[৫] (গীতা, ৩, ২৩,)

বীর সাধকের মতই শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন, "সাধনার দ্বারা নিজেই নিজের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে। অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না।" বুদ্ধদেবও উপদেশ করিয়াছিলেন, "আত্মদীপ হও, আপন আলোকে আপন পথ দেখ, অপরে কেমন করিয়া তোমাকে পথ দেখাইবে?" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও ঠিক তাই,—"আত্ম-শক্তিতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। আপনাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিলে

১। কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
স্বার্থহেতোস্তথৈবান্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যত॥
প্রিয়মেব পরীপ্সন্তে কেচিদাত্মনি যদ্ধিতম্।
এবম্প্রায়াশ্চ দৃশ্যন্তে জনবাদাঃ প্রয়োজনে॥
ত্বং তু হেতূনতীত্যৈতান কামং ক্রোধং ব্যুদস্য চ।
পরমং যৎ ক্ষমং লোকে যথাবৎ বক্তুমর্হসি॥

২। অস্মাংস্তদেনোপগচ্ছেৎ কৃতং বার্হদ্রথ ত্বয়া।
বয়ং শক্তা হি ধর্ম্মস্য রক্ষণে ধর্ম্মচারিণঃ॥

৩। যদি তাবচ্ছমং কুর্য্যান্ন্যায়েন কুরুপুঙ্গবঃ।
ন ভবেৎ কুরুপাণ্ডূনাং সৌভ্রাত্রেণ মহান্ ক্ষয়ঃ॥

৪। কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

৫। যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

চলিবে না। আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার রিপু।" (গীতা ৬, ৫,)[১]

"যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন তাঁহারই আত্মা তাঁহার বন্ধু, যিনি আপনাকে জয় করিতে পারেন নাই তাঁহার আত্মা শত্রুর মত নিত্য তাঁহার শত্রুতাচরণ করে।" (গীতা ৬, ৬)।[২]

"এইরূপ যোগযুক্ত অবস্থায় যিনি স্থিত তিনি মহাদুঃখেও বিচলিত হন না।" (গীতা ৬, ২২)[৩]

এই ভাবে আত্মজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বিশ্বের সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছেন। মানবত্বের এত বড় জয়সাধনা এত বড় মহিমাময় গান জগতে দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন, "আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই অন্ন, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, আমিই আহুতি।" (গীতা ৯, ১৬)[৪]

গীতার নবম অধ্যায়ে আগাগোড়াই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহা আত্মানুভূতি।

"এই মহামানব-স্বরূপকে যে সর্ব্ব বিশ্বচরাচরে উপলব্ধি করে ও সর্ব্ব বিশ্বচরাচরকে যে এই মহামানবের মধ্যে উপলব্ধি করে, সে নিত্যই মহামানবের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে, কখনও তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।"[৫] (গীতা ৬, ৩০)

আপনার এই মহামানব স্বরূপের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভক্তিতে সব কিছু নিবেদন (surrender) করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মানবত্বের মধ্যে মহামানবের অসীম স্বরূপের মহিমা, তাই তিনি আমাদের এত আপন, এত প্রিয়।

মহাভারতের প্রথম দিকটায় শ্রীকৃষ্ণ বেশ মানুষ ছিলেন, শেষের দিকটা ক্রমে তাঁহাকে দেবতা করিয়া তোলা হইল। কিন্তু গীতাতে দেখি তাঁহার প্রিয় যে বন্ধু ও নিত্য সহচর অর্জ্জুন তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই প্রীতি করিয়াছেন। মানুষ হইলেও তিনি পুরুষোত্তম, তাই যেমন তাঁহার মহিমা তেমনি বন্ধুর চিত্ত প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে চায়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" বলিয়াই সম্বোধন করিলেন। দশম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে অর্জ্জুন তাঁহাকে "দেবদেব জগৎপতি" বলিলেও প্রথমে "পুরুষোত্তম" বলিয়াই আরম্ভ করিলেন। দৈব সত্তাকে যখন মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখা যায়, তখন তাহার এক বিশেষ মহিমা বিশেষ রস। গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন মহামানব বলিয়াই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরস্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।"[৬] (গীতা, ১১, ৩)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমি ক্ষর-অক্ষরের (সীমাসীমের) অতীত বলিয়াই লোকে বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।"[৭] (গীতা ১৫, ১৮)

শুধু দেবতা বলিয়া তাঁহাকে জানিলে ঠিক ভাবে জানা হইল না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে-ই সর্ব্ববিৎ, সে-ই সর্ব্বভাবে আমার ভজনা করে।"[৮] (গীতা, ১৫, ১৯)

গীতাতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু তাঁহাকেই অসীম ও আধ্যাত্ম্য ভাবের মধ্যে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন তাহা নহে, তিনি অর্জ্জুনকেও এই অসীম অধ্যাত্ম ভাবের মধ্যে বার বার আত্মোপলব্ধি করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,"পুরুষের ক্ষর ও অক্ষর এই দুই স্বরূপই আছে।" (গীতা ১৫, ১৬)[৯]

তবু আপনাকে তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। (গীতা ১৫, ১৮)[১০]

১। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

২। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

৩। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

৪। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥

৫। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

৬। দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পরমেশ্বর॥

৭। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

৮। যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥

৯। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ॥

১০। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

"সেই পরম পুরুষ এই দেহেই বিরাজিত।" (গীতা, ১৩, ২২)।

দেহেস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০—৩০ শ্লোক ভরিয়া এই কথা।

এইরূপ অসীম স্বরূপে সকলকেই আত্মোপলব্ধি করিতে শ্রীকৃষ্ণ বার বার উপদেশ করিয়াছেন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আদিতে যে আমি ছিলাম না এমন নহে, তুমিও যে ছিলে না এমন নহে, এই রাজারাও যে ছিলেন না এমনও নহে, আবার পরেও যে আমরা কখনও থাকিব না, তাহাও নহে।" (গীতা, ২, ১২)[১]

এই মহা আত্মানুভূতি আমাদের মনের মধ্যে তবে কেন সর্ব্বদা থাকে না? ইহা বুঝাইতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ভূত সকল আদিতেও অব্যক্ত, নিধনেও অব্যক্ত, শুধু মধ্য ভাগের জীবনটুকুই তাহার ব্যক্ত।" (গীতা, ২, ২৮)[১]

এই কথা বুঝাইতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তোমার ও আমার উভয়েরই এইরূপ বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, তবে আমি সবগুলি জানি, তুমি তাহা জান না।" (গীতা, ৪, ৫)

এই জন্ম কর্ম্মের মধ্যে যে দিব্য ভাব আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী নবম শ্লোকে (৪ অধ্যায়) বলিতেছেন, "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্।"

গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সর্ব্বচরাচরের সব কিছুর শ্রেষ্ঠরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নবম, একাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ আপনার অধ্যাত্ম স্বরূপের কথাই বলিয়াছেন।

তাই সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, সীমা ও অসীম মানব ও দেবতা এই সব বিভেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগতই সেতু ও যোগ স্থাপন করিয়াছেন। যে দিকে বিচ্ছেদ সেই দিকেই চলিয়াছে তাঁহার যোগসেতুস্থাপনার পরম সাধনা। আকাশে যেমন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অগণিত গ্রহ-চন্দ্র-তারকা এক মহাশক্তিবলে বিধৃত হইয়া নিত্য মহাকালের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিরাট যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, তেমনি দ্বাপরে "ভারত" যখন "মহাভারত" হইতে চলিল, তখন সেই মহাভারতের মহাকাশের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বিরাট যাত্রার জন্য তিনি সর্ব্বদিকে সকলের মধ্যে যোগসেতু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের এত বড় যোগগুরু আর কোথায়?

তাঁহার দীক্ষার মন্ত্র আজও ভারতের সাধনাকাশে নিরাশ্রয় নিরবলম্ব হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এমন বীর সাধক আজ কে আছে, যে সেই অগ্নিময়ী মহাদীক্ষাকে জীবনের বেদীতে স্থাপন করিয়া নিত্য দহিয়া মরিতে প্রস্তুত? আজ ভারতের বুক জুড়িয়া শতধাবিচ্ছেদের দুঃসহ তীব্র ব্যথা, আজ তাঁর অমর যোগমন্ত্র গ্রহণ করিবার মত সাধক কি নাই?

এত বড় মহাগুরু থাকিতে মহাভারতের বিরাট সাধনা কেন হইয়া গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন?

তাহার কারণ, কুরুপাণ্ডব কেহই এই মহাসত্যকে অনাসক্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। উভয়েই ইতিহাসের এই মহাসত্যকে আপন আপন স্বার্থের দ্বারা ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া দেখিল। "মহাভারতের" বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাদের সব ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতি ও স্বার্থ তাহার মধ্যে আহুতি দিতে পারিল না। এই দুর্গতি নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুগে যুগেই দেখা গিয়াছে মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি হইতে, সাময়িক লাভ ক্ষতি হইতে, ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত অভিমান ও স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করা কত কঠিন।

এই জন্য রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে মানুষ সাময়িক সুবিধা বা ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে এমন অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া যায় যে, নিত্য-কল্যাণ সকল-মানব-কল্যাণ এমন কি আত্ম-কল্যাণ দেখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যখন "মহাভারতের" মহাসাধনার যুগ উপস্থিত, তখন কুরুপাণ্ডব প্রভৃতি পরম চতুর "ভারতেরা" আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অভিমান কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। "মহাভারত" তাই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে ভারতের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিরতরে প্রলয়-সাগরে নিমজ্জিত হইল। এই মহাপ্রলয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে নিবৃত্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণ কি চেষ্টাই না করিয়াছেন!

১। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ॥

২। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

তবু আর্য্য অনার্য্য বৈদিক বেদবাহ্য সর্ব্ববিধ বিচ্ছেদের বিলোপের জন্য যে মহাসাধনা তিনি করিয়া গিয়াছেন, ভারত কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ভারত যদি কখনও মহাজীবনের প্রার্থনা করে তবে তাঁহার তপস্যার বেদীমূলে তাহাকে প্রণত হইতেই হইবে। আর্য্য অনার্য্য সকলের প্রণম্য যোগগুরু শ্রীকৃষ্ণ। এই 'শ্রীকৃষ্ণ' নামটি কি তিনি অনার্য্যদের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন? স্বেচ্ছায় কি তিনি দীনহীন পতিতদের দলে গিয়া বসিয়াছিলেন?

আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেমন করিয়া? আজি তাঁহার জন্মদিনে একটু বাঁধা সহজ অনুষ্ঠান করিয়া? বিনাকষ্টে তাঁহার নাম একটু জপ করিয়া? এমন সস্তা উপায়ে কি আমাদের সাধনাকে ফাঁকি দিব? তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিব না, শুধু তাঁহার পূজা করিয়া নাম জপ করিয়া কাজ সারিব? অনায়াসে আরামে বসিয়া এইরূপ সস্তা সাধনায় কাহাকে প্রবঞ্চনা করিব?

গুরুকে নানা উপায়ে অস্বীকার করা চলে। কিন্তু ভক্তি ও পূজা দিয়া তাঁহার অগ্নিময়ী দীক্ষাটি চাপা দিয়া রাখা হইল সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও সস্তা উপায়। আসলে গুরুকে মানিলাম না, অথচ বার বার মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া সকলের চক্ষুতে ধূলি দিলাম। অন্যকে ফাঁকি দিলাম, নিজের মনকেও প্রবঞ্চিত করিলাম। অন্তরের মধ্যে সাধনায় ফাঁকি দিলেও, "ভাবের ঘরে চুরি" করিলেও, বাহিরে সর্ব্বত্র সাধু নাম রটিয়া গেল। কি চমৎকার এই উপায়!

এই উপায়টি প্রয়োগ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি হইল মানবগুরুকে দেবতা বানাইয়া দেওয়া, তখন পূজা করিলেই চলে, তাহাতেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হয়, তাঁহার সুকঠিন উপদেশ পালনের দারুণ অগ্নিময় পথে তাঁহাকে অনুবর্ত্তন করার দায় হইতে দিব্য নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মানবগুরুকে মহাপুরুষ করিয়া প্রায় দেবতার সামিল করিয়া তুলিলেও এই উপায়টি এক রকম চালান যায়। তখন বলিলেই হয়, "ওসব কথা মহাপুরুষদের সাজে, আমাদের পক্ষে তাহা চলিবে কেন? আমরা হইলাম সাধারণ লোক, কলির মানুষ, অন্নগত প্রাণ" ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবন্ত পিতা মাতাকে মানিতে গেলেও অনেক দায়িত্ব আছে, তাহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা, আজ্ঞানুবর্ত্তন প্রভৃতি করিতে হয়। কিন্তু স্বর্গগত পিতামাতার উদ্দেশ্যে সমারোহে একবার দানসাগর-শ্রাদ্ধ করিলেই সংসারশুদ্ধ লোককে তাক লাগাইয়া দেওয়া যায়। তাঁহাদের মৃত্যুটাকেও আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের একটা উপায়ে পরিণত করা কি যেমন তেমন বুদ্ধির কথা?

গো-খাদক হইলেও য়ুরোপে আমেরিকাতে গোরুকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ গোসেবা আমাদের দেশে কল্পনার অতীত। ফলও ঠিক অনুরূপ। সে দেশে একটি গোরুর যে পরিমাণ দুধ আমাদের দেশে গ্রামশুদ্ধ গোরুর সে পরিমাণ দুধ হয় না। সেখানে গোরুর কান্তি পুষ্টি স্বাস্থ্য কি! আর আমাদের দেশে? সে কথা তুলিয়া কাজ নাই, আমরা যে গোপূজা করি! গোরু যে আমাদের দেবতা! তাই আগাগোড়া ফাঁকি।

গুরুতে গভীর ভক্তি থাকা সাধনার জন্য প্রয়োজন, তাই সকল দেশেই গুরুকে ভক্তি করার পদ্ধতি আছে। কিন্তু ভক্তির যথার্থ দায়িত্ব এড়াইবার জন্য সেই ভক্তিটাকেই সুবিধা মত লাগাইয়া দেওয়া একটি চমৎকার জুজুৎসুর প্যাঁচ বটে! সাধনার ভিতরকারই একটি দিকের তত্ত্ব দিয়া আর একটি তত্ত্বকে একেবারে ফাঁকি দেওয়া গেল। এই আধ্যাত্মিক জুজুৎসু খেলার মধ্যে বাহাদুরী আছে!

এই ফাঁকিবাজি জগতের সর্ব্বত্র চলিয়াছে। খ্রীষ্টের যাহারা আজ অনুবর্ত্তী তাঁহারা তাঁহার দুঃসাধ্য প্রেম ও ক্ষমার ধর্ম্মপালন করিতে নারাজ। অস্ত্রে শস্ত্রে যুদ্ধোদ্যমে হিংসায় প্রতারণায় আজ তাঁহারা ভরপুর। অমানুষিক বর্ব্বরতাকে চমৎকার সভ্যতার আবরণে প্রচ্ছন্ন করিতে আজ তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। তবু তাঁহাদের মন্দিরে মন্দিরে চলিয়াছে খ্রীষ্টের নামগান, খ্রীষ্টের আরতি, খ্রীষ্টের পূজা! দেশেবিদেশে চলিয়াছে তাঁহাদের পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার!

বুদ্ধের শিষ্যও আজ তাঁহাদের কাছে ঐ সব নিদারুণ মন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। আজ সে সাম্রাজ্যবাদের রক্ত-পিপাসায় ব্যাঘ্রবৎ জিঘাংসু, অথচ মুখে তাহার বুদ্ধের সব মহাবাণী। ঘরে ঘরে তাহার বুদ্ধ পূজিত, মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের দল বুদ্ধের ও তাঁহার মৈত্রীর স্তবগানে রত!

বাংলা দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। সে কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া আজ

আমরা বিদ্যাসাগর-শ্রাদ্ধবাসরে অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া তাঁহার দয়ার মহিমা কীর্ত্তন করিতে বসি। সস্তা সহজ উপায়ে কাজ চুকাইয়া দিই।

কবীর তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "তথাকথিত আস্তিক হইতে নাস্তিক ভাল, কারণ তাহার মধ্যে প্রবঞ্চনা নাই। সে যে অস্বীকার করে তাহা সহজ ভাবেই করে; মানিবার ভাণ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে ফাঁকি দেয় না।"

এখন রীতিমত বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, রামমোহন, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাগুরুর সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ আচরণই চলিয়াছে কি না। দেখা দরকার, ক্রমে ক্রমে পূজা করিয়া ফাঁকি দিবার সুচতুর উপায়টা দিনে দিনে আমার জীবনের সকল সাধনাতেই আশ্রয় করিতেছি কি না। তাঁহাদের আদর্শ ও সাধনা হয় তো আকাশে আজ নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আর আমরা তাঁহাদের পবিত্র নাম ও বাণী মুখে আওড়াইয়া দিন-রাত্রি ক্ষুদ্র সব দলাদলি লইয়া দিন কাটাইতেছি। ইহার উপর আবার পাল্লা চলিয়াছে, কোন দল সেই সব মহাপুরুষদের নাম-জপের ও পূজার চাতুরীতে, স্তবে স্তুতিতে ও সাম্প্রদায়িকতার ভণ্ডামীতে অন্যদল হইতে বেশি নিপুণ!

আজ জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণের পুণ্যতিথি। এই দিনে নাকি তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতিথি নাই। ভক্তের অন্তরে যে তিনি চিরজীবন্ত। দেহের দিক দিয়া তাঁহার অবসান হইলেও চিন্ময়রূপে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন মৃত্যুহীন। তাঁহার জীবন তো তাঁহার রক্তমাংসের দেহে ছিল না। তাঁহার আদর্শ ও সাধনাই তাঁহার যথার্থ জীবন। তাঁহার ভক্ত সাধকের দল সাধনার দ্বারাই নিত্যকাল তাঁহাকে জীবন্ত রাখিবেন। মরিতে দিবেন কেন?

আজ তাঁহার রক্তমাংসের দেহ নাই। আমাদের সশ্রদ্ধ সাধনা ও তপস্যাই আজ তাঁহার চিন্ময় জীবনের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের সাচ্চা সাধনায় ও তপস্যায় কি সেই মহাগুরুকে আমরা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি? যদি আমাদের ক্ষুদ্রতা জড়তা ও অপরাধে তাঁহার সেই চিন্ময় আধ্যাত্মিক জীবনের অবসান হয় তবে আমরা গুরুঘাতী। এমন নিদারুণ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কোথায়ও আছে?

আজ এই পবিত্র তিথিতে যেন আমাদের চিরাভ্যস্ত পূজার চাতুরী ও বড় বড় কথার ছলনার দ্বারা নিজেকে ও সকলকে প্রবঞ্চিত না করি। সেই সব নীচ চাতুরী ও ছলনা হইতে মুক্ত হইবার দিন আজ এই পুণ্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মতিথি। এই দিনে যিনি জগতে আসিয়াছিলেন তিনি আসলে জন্মিয়াছিলেন মানবের সাধনার অধ্যাত্ম-লোকে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সাধনায় ও তপস্যায় যেন তাঁহাকে নিত্যকাল জীবন্ত রাখিতে পারি। আমাদের প্রকৃতিগত ক্ষুদ্রতা ও নীচতাবশতঃ যেন এমন মহা-গুরুকে আমরা বধ না করি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের অন্তরে নব জন্ম নব জীবন লাভ করিতে থাকুন। আমাদের অন্তরে নিত্য জন্মাষ্টমীর উৎসব চলুক।

হে গুরু, হে দীক্ষাদাতা, চারিদিক জুড়িয়া আজ ক্ষুদ্র স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও মিথ্যার স্তূপ। লোভ মোহ ক্লৈব্য চাতুরী সকল রকমের সঙ্কীর্ণ দলাদলি আজ আমাদের পৌরুষকে পিষিয়া মারিতে উদ্যত। এই দুর্গতি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

হে মহাগুরু, ভারতে আজ ভেদবিভেদের অন্ত নাই। তুমি যাঁহাদের এই দেশে জ্ঞানের সাধনায় ও প্রেমের যোগসূত্রে যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলে, তাঁহাদের পর আরও নানাবিধ সাধক ও মানবের দল ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি বিনা কে আজ তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করিবার দীক্ষা দিবে? আজ খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি নানাধর্ম্মের সাধক ভারতে উপস্থিত। রেল, ষ্টীমার ও বিমানপোতের বলে আজ ভৌগোলিক সকল বেড়া গিয়াছে ভাঙ্গিয়া। আজ জগৎ ভরিয়া মানুষের পাশে মানুষ, তাঁহাদের আমরা জ্ঞানে মাত্র জানি। প্রেমে তাঁহাদের তো আপন করিয়া লইতে পারি নাই। আপন যে করিয়া লইতে পারি নাই তাহার ব্যথাও আমাদের জীবনে বাজে না, এমন অসাড় হইয়া গেছে আমাদের অধ্যাত্ম জীবন! তাই নিত্য কেবল চলিয়াছে লোভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ, নিত্যই চলিয়াছে নীচ দ্বন্দ্ব আঘাত ও অনার্য্যোচিত সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলি। হে যোগগুরু, তোমার মহামন্ত্র দাও, দুঃসহ তোমার মহাদীক্ষা দাও, সকল বিচ্ছেদ বিদূরিত হউক, সকল মানব এক শুভ মৈত্রীর বুদ্ধিতে যুক্ত হউক।

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফার্ণ

আমাদের দেশে ফার্ণের তত আদর নেই। বিলাত বা আমেরিকার লোকে ফার্ণ বলতে অজ্ঞান। দু'একটা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় ফার্ণ সেখানে এত দামে বিক্রী হয় যে, আমরা তার কল্পনাই করতে পারি নে। সে দামে কলকাতায় একখানা বাড়ী কেনা যায়।

মাসাচুসেট্স: আর্নল্ড আবোরিটামের হেমলক-কুঞ্জচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধমান ফার্ণ।
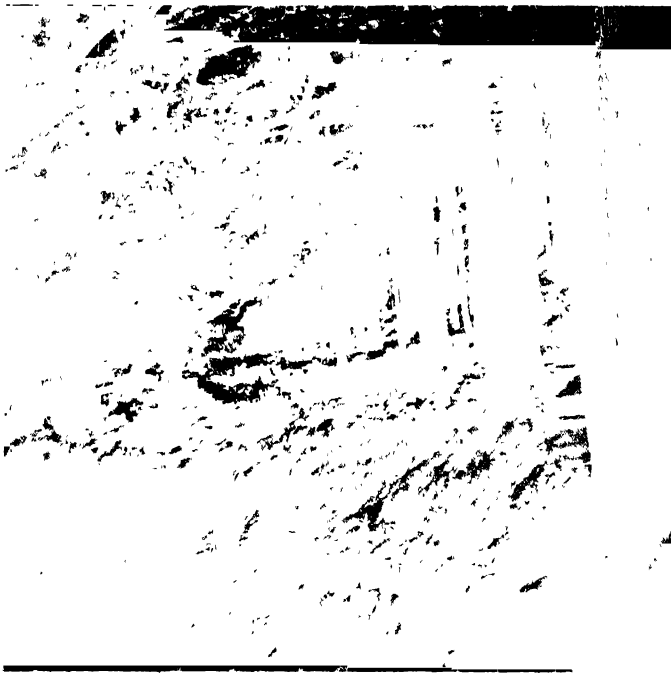
পাতার সৌন্দর্য্যে ফার্ণ আর সব গাছকে ছাড়িয়ে যায়। অত ছোট ছোট পাতা, অমন সুন্দর করে সাজানো আর কোন্ গাছের আছে! ঠিক যেন পাখীর পালক। কোনো দিকে একটু বেশী নেই, কোনো দিকে একটু কম নেই, ডাঁটার দুধারে অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সঙ্গে সাজানো। আমেরিকার লোকে বলে, একটা ভাঙা ফার্ণের ডাল সহরে বসে দেখলে তাদের বহুদূরের রকি-পর্ব্বতমালা, জ্যাস্পার-ন্যাশনাল-পার্কের কথা মনে পড়ে, সহরের কলকোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই জন্য এঁদো গলির মধ্যে, ছোট বাড়ীর জানালায়, ছোট মাটির কি পাঁচকড়ার টবে, ফার্ণ ঝুলিয়ে রেখে সেখানকার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অধিবাসীরা মুক্ত প্রকৃতির আনন্দ আস্বাদনের চেষ্টা করে।

অনেক রকমের ফার্ণ আছে। অনেক সময় ফার্ণের মত পাতা থাকলেই যে তা ফার্ণ হবে তা নয়। আমাদের দেশে যাকে 'বিস্তেপাতা' বলা হয় বা ফুলের তোড়া বাঁধবার সময় যে অ্যাসপেরেগাস ফার্ণ asparagus fern-এর ব্যবহার করা হয়—এরা কেউই প্রকৃত ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ নয়।

ফার্ণ কোথায় নেই? আর্কটিক সার্কল থেকে আরম্ভ করে উষ্ণমণ্ডলের ঘন অরণ্যানী, সমুদ্রের ধার, বড় বড় পর্ব্বতমালার গুহা ও শিখরপ্রদেশ, আফ্রিকার বাঁশবন, শ্যাম, যবদ্বীপ, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া— সর্ব্বত্রই বহুজাতীয় ফার্ণের রাজত্ব। ইংলণ্ডে ফার্ণ জন্মায় না বলে হট-হাউসে ফার্ণের চাষ করা হয়। বড় বড় বীজ-ব্যবসায়ীরা আজকাল ফ্রান্সে নানাজাতীয় ফার্ণ আমদানী করে পরীক্ষা করে দেখছে, তাদের দেশের মাটিতে, অন্ততঃ দক্ষিণ-ফ্রান্সে কোন্ ধরণের ফার্ণ জন্মায়। ফার্ণের ব্যবসায় ইউরোপের সর্ব্বত্রই অতি লাভ-জনক ব্যবসায়।

বহু প্রাচীনকালের অনেক ফার্ণ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অঙ্গার-যুগে ফার্ণ জাতীয় গাছের প্রাচুর্য্য ছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্র —তাদের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ এখন পাথুরে কয়লায় পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে আজকাল যে সব ফার্ণ দেখা যায়, তাদের উৎপত্তি মেসোজোইক্-যুগে অর্থাৎ যে যুগে পৃথিবীতে অতিকায় সরীসৃপদল বিচরণ করত। তবে সে

যুগে ছিল ফার্ণেরই রাজত্ব, বর্ত্তমান কালের প্রায় কোন গাছ-পালাই তখন আদৌ ছিল না। পরে তাদের উৎপত্তি সুরু হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ৮০০০ জাতীয় ফার্ণ পৃথিবীতে দেখা যায়। ইউরোপে বিচিত্র ধরণের ফার্ণ বেশী দেখা যায় না —যত দেখা যায় মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকায়। এক মেক্সিকোতেই আড়াই শো জাতির ফার্ণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উষ্ণমণ্ডলের ঘন আরণ্য প্রদেশেই কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জাতির ফার্ণ জন্মায় - প্রচুর বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ায় সমতার জন্য এই সব স্থানই এই জাতীয় উদ্ভিদের অনুকূল।

তবে ট্রপিক্যাল ফার্ণের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাদের অধিকাংশই জন্মায় বড় বড় গাছের কাণ্ডে, শাখা-

ভিক্টোরিয়া (অষ্ট্রেলিয়া) : ট্রী-ফার্ণ।
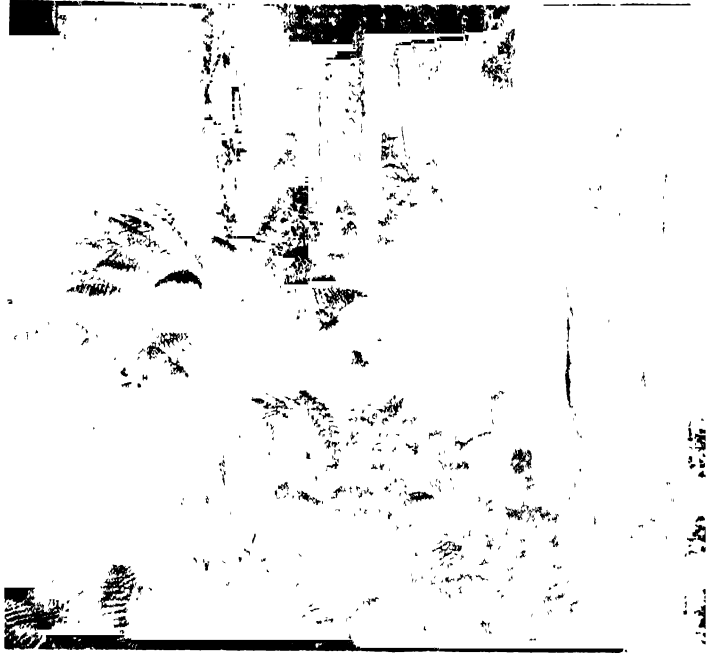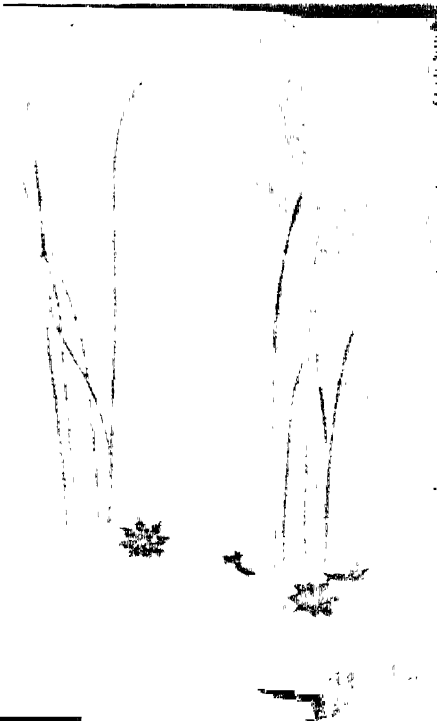
প্রশাখায়। অনেক সময় এত উঁচুতে এরা জন্মায় যে, ফার্ণ-সংগ্রহকারীকে বিশেষ বেগ পেতে হয় এদের সংগ্রহ করতে। গোটা গাছটা কেটে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। অনেক সময় এ কাজও অসম্ভব হয়ে পড়ে—তখন কোন সেই দেশী লোক যে ভাল গাছে চড়তে জানে, তাকে মজুরী দিয়ে ফার্ণ সংগ্রহে নিযুক্ত করতে হয়। যারা ফার্ণ ভালবাসে তারা এক একটা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় ফার্ণের জন্যে জীবন বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এ এমন একটা দারুণ বাতিক।

রয়াল ফার্ণ : ফুটন্ত ফুলগুলির নাম ষ্টার-ফ্লাওয়ার।

উষ্ণমণ্ডলের ফার্ণের বৈচিত্র্য শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে। যেখানে সারা ইউরোপের উত্তর অঞ্চল খুঁজলে হয় তো বড় জোর পঁচিশ ত্রিশ রকমের ফার্ণ পাওয়া যায়—সেখানে এক শুধু জ্যামেকা দ্বীপেই পাঁচশো রকমের ফার্ণ আছে—হেইতি দ্বীপে আরও কিছু বেশী। মেক্সিকো থেকে চিলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আন্দিজ পর্ব্বতমালার অরণ্যে কয়েক হাজার রকমের ফার্ণ পাওয়া যায়।

ট্রাপিক্যাল আমেরিকাতে ফার্ণের বৈচিত্র্য খুব বেশী নয়—এক ফ্লোরিডাতে ছাড়া। ফ্লোরিডার ফার্ণ ট্রপিক্যাল ও নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের ফার্ণের মাঝামাঝি—উভয় জাতির মধ্যে

এখানে যেন একটি সেতুপথ স্থাপিত হয়েছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী রিইউনিয়ন দ্বীপে নানা অদ্ভুত ও বিচিত্র ধরণের ফার্ণ দেখা যায়। মেডেনহেয়ার ফার্ণের জন্মস্থানই হল এই দ্বীপ। গ্রীষ্মের প্রথমে রিইউনিয়ন ও জ্যামেকার অরণ্যের মধ্যে তরুচ্ছায়ায় পুষ্পিত ফার্ণবনের সৌন্দর্য্য যে একবার দেখেছে—জীবনে সে কথনো ভুলতে পারবে না তার অবর্ণনীয় অপার্থিব রূপ।

ব্রহ্মদেশ: গাছের উপর পাখীর বাসার মত এক জাতীয় ফার্ণ দেখা যাইতেছে।

উত্তর-আমেরিকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক ধরণের ফার্ণ দেখা যায়, তার পাতা অনেকটা চামড়ার মত পুরু, কিন্তু রং অতি সুন্দর সবুজ। নিউ জার্সি অঞ্চলের পাইন বনে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য ফার্ণ পাওয়া যায়, পাতা কোঁকড়ানো বলে এর নাম কুঞ্চিত-পল্লব, curly grass ফার্ণ। ইংলণ্ডের হট-হাউসে এ ধরণের ফার্ণ নেই।

মরুভূমিতেও কয়েক প্রকার ফার্ণ আছে এবং তাদের জীবন-ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ। অন্যান্য ফার্ণ সাধারণতঃ বৃষ্টিবহুল স্থানে ভাল জন্মায় ও বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু মেক্সিকোর প্রত্যন্তদেশে অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালায়, যেখানে বৎসরের মধ্যে খুব কম বৃষ্টিপাত হয়—সেখানে কি করে ফার্ণ জন্মায় ও বাঁচে, তা উদ্ভিদের বিবর্ত্তন ও আত্ম-সংরক্ষণের অতি বিস্ময়কর কাহিনী। এখানে বারোমাস অনাবৃষ্টি; ছায়া বলে পদার্থ এ অঞ্চলে প্রায় অজ্ঞাত। এখানে পাহাড়ের সামান্য ফাটলে কিংবা যেখানে হয় তো পাহাড়ের চূড়ায় একটুখানি ছায়া পড়েছে—সেখানেই ফার্ণগাছ ঠেলে উঠেছে। এদের গায়ে আবার মোমের মত জিনিসের একটা আবরণ আপনিই গড়ে ওঠে—এর উদ্দেশ্য কাণ্ডস্থিত রসকে খররৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা করা। কত লক্ষ বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে তবে উদ্ভিদ এই অঙ্গাবরণটুকু তৈরী করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

আর এক ধরণের ফার্ণের নাম ষ্টার-ক্লোক্ ফার্ণ—উত্তর-মেক্সিকো ও সিলা নদীর তীরবর্ত্তী মরুদেশে এদের জন্ম। যখন সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন এর পাতা আপনা-আপনি মুড়ে যায়। যতদিন বৃষ্টি না পড়ে, ততদিন পাতা এই অবস্থায় থাকে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ গাছ শুকিয়ে গিয়েছে, এর আর জীবনীশক্তি নেই—কিন্তু যেই বৃষ্টি হতে সুরু হবে, অমনি এর শুষ্ক, সঙ্কুচিত পাতাগুলো একটু একটু করে খুলতে আরম্ভ করবে, প্রসারিত সর্ব্বদেহ দিয়ে জীবনদায়িনী বারিধারা পান করে আবার সবুজ, সতেজ ও সজীব হয়ে উঠবে।

সর্ব্বশেষে বৃক্ষজাতীয় ফার্ণের কথা বলা যেতে পারে। উষ্ণমণ্ডলের সে অরণ্য অরণ্যই নয়, যেখানে ট্রী-ফার্ণ, tree fern নেই। পোর্টোরিকো, হাওয়াই দ্বীপ, ও ফিলিপাইন দ্বীপ-

এক জাতীয় ফার্ণ (INTURRUPTED FERN)।
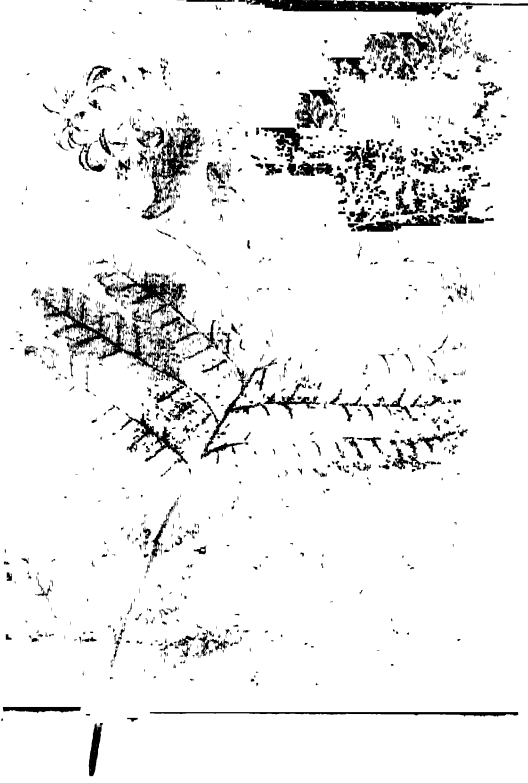
পুঞ্জের সমুদ্রোপকূল থেকে অভ্যন্তরভাগের উচ্চ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ট্রী-ফার্ণ, tree fern দেখা যায়। আমাদের দেশে হিমালয়ে, বিশেষ করে দার্জ্জিলিং, সিকিম ও ভুটান অঞ্চলে যথেষ্ট এ জাতীয় ফার্ণ দেখা যায়। এদের কাণ্ড অন্যান্য বৃক্ষকাণ্ডের মত সোজা ঠেলে ওঠে—উচ্চতায় বিশ ফুট থেকে আশি ফুট পর্য্যন্ত হয়।

বেলজিয়ামের খালপথে

মিঃ মেল্‌ভিল চেটারের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল :--

প্যারিসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ছোট একটা ডোঙা কিনে রওনা হওয়া গেল বেলজিয়মের প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত খালপথে বেড়াব বলে। এখানে-ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই এখনও বিগত মহাযুদ্ধের চিহ্ন বর্ত্তমান—শেলের গর্ত্ত, দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ড, ভাঙা গির্জ্জা। অবশেষে যথন বহুবিস্তৃত বিটপালংএর ক্ষেত দেখা গেল—তখন বুঝলাম বেলজিয়মে পৌঁছে গিয়েছি।

ব্রুজেস্‌-এ সেদিন কি একটা উৎসব। অতিকষ্টে বেল্‌-ফ্রাই স্কোয়ারের একটা হোটেলে দোতলায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া গেল, নইলে যে রকম ভিড়, বাইরে রাত কাটাতে হত, কারণ আমাদের ডোঙা এত ছোট, তাতে এক জনেরই শোয়ার জায়গা হয় না।

খাল দিয়ে ফুল ও কাগজের আলোকিত রঙীন লণ্ঠন ঝোলানো বড় বড় বজরা যাচ্ছে। বজরাতে নানারকম ঐতিহাসিক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। কোনখানার ওপরে বিরাট রাজসভাতে ডিউক ফিলিপ পাত্রমিত্রপরিবৃত হয়ে বসে। আর একখানায় হ্যান্‌সিয়াটিক লিগের কর্ত্তৃপক্ষগণ

ব্র্যাকেন (BRACKEN) : এই ফার্ণ মানুষ এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জোর করে তাঁদের নাগরিক সম্মানের দাবী করছেন। ঐ যে ওখানাতে মেরি অব্‌ বার্গাণ্ডি ও ব্যাভেরিয়ার ডিউক্‌ পাশাপাশি কৌচে শুয়ে আছেন—তাঁদের মধ্যে একখানা উন্মুক্ত

তরবারি, কারণ আর্কডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানের পক্ষ থেকে ব্যাভেরিয়ায় ডিউক প্রতিনিধিস্বরূপ বিবাহ করতে গিয়েছিলেন মেরীকে এবং বিবাহ করে নববধূ নিয়ে তিনি ম্যাক্সিমিলিয়ানকে পৌঁছে দিতে চলেছেন।

মরুভূমির ফার্ণ: উত্তাপাধিক্যে ইহার পাতাগুলি অধিকাংশ সময়ে কুঁকড়াইয়া থাকে। বর্ষাগমে দল মেলিলে এই ফটো তোলা হইয়াছে।

পরদিন বেলজিয়মের খালে আমাদের ডোঙা দেখে লোকে তো অবাক। একজন জিগ্যেস্ করলে, ও জিনিসটা কি? ওটা দিয়ে কি করবে তোমরা?

—ওটা ডোঙা। আমরা বেলজিয়ম পার হব ওতে করে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ভাবলে ঠাট্টা করছি। একজন একখানা ম্যাপে কি মাপজোঁক করে বললে—সে কতখানি পথ তোমাদের ধারণা আছে? প্রায় তিন শো কিলোমিটার—

আমরা গম্ভীর মুখে বললাম—আমরা জানি।

দুপুরের পরে ঘেণ্ট অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। খাল বেঁকে বেঁকে গিয়েচে, কেবলই বেঁকেছে, কেবলই বেঁকেছে। সারা বিকেল ধরে সেই বাঁকা খাল বেয়ে ডোঙা বাইলাম দুজনে। সন্ধ্যা হয়, এখনও ঘেণ্ট সহরের আলো কৈ? আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এল। এমন সময়ে আমার বন্ধু চীৎকার করে উঠল—ঐ যে সহরের আলো।

যাক্, এসে পড়েছি তা হলে। নেমে হোটেলের সন্ধানে ব্যাপৃত হলাম। বন্ধু বললে, প্রায় ত্রিশ মাইল পথ দাঁড় বেয়ে এসেছি, কি বল? হঠাৎ আমাদের দুজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। একটা বড় স্কোয়ারে ঢুকে চারধারে আমরা সন্দিগ্ধ চোখে চাইতে লাগলাম। একজন লোককে জিগ্যেস্ করলাম—এটা ঘেণ্ট তো?

সে বললে—ব্রুজেস্।

আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এটা ঘেণ্টই। সে বললে, ব্রুজেসে সে জন্মেছে, তার কি ভুল হবার যো আছে?

কি সর্ব্বনাশ! আমরা সারা বিকেল আর এই ঘণ্টাখানেক রাত পর্য্যন্ত ব্রুজেস্ সহরের চারধারে যে খাল আছে, তাতেই দাঁড় বেয়ে মরেছি নিরর্থক। আবার এসে পড়েছি ঠিক বেল্‌ফ্রাই স্কোয়ারে, আমাদের বাসার ঠিক সামনে।

পরদিন আবার ঘেণ্ট রওনা। এক জায়গায় খালের দুটো শাখা দুদিকে গিয়েছে—ডাঙায় একজন বৃদ্ধা বসেছিল, তাকে বললাম—কোন্ পথে ঘেণ্ট যাব?
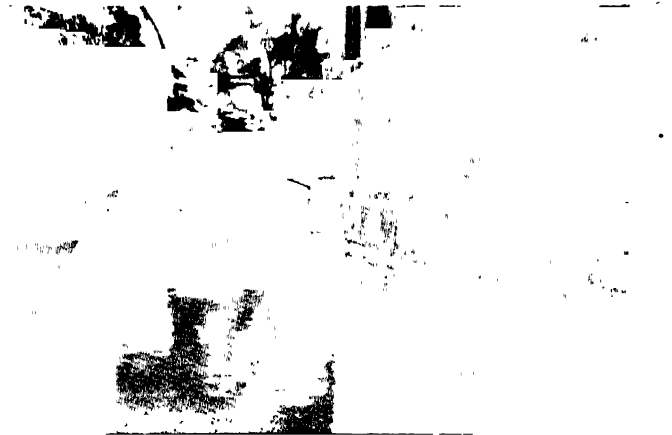
ব্রুজেস্: ইউরোপে ইহার নাম, উত্তর-ভিনিস। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ব্রুজেস্ ব্যবসায় জগতের নামকরা বাজার ছিল—এই সময়ে ইহার সমুদ্রে-যাতায়াতের পথ মাটি জমিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

কোনও উত্তর নেই।

কাছে এসে দেখলাম সেটা একটা পাথরের মূর্ত্তি।

জনৈক স্থানীয় অধিবাসী বললে, ও হল জুল্‌সের মা। ১৯১৪ সালে ওর ছেলে যুদ্ধে যখন গেল, ও বললে, বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকব তোমাকে

বেলজিয়ামের একমাত্র বন্দর আণ্টোয়ার্প—সমুদ্র হইতে ৫৫ মাইল দূরে।

এগিয়ে নেবার জন্যে। কিছুদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এল জুল্‌স্‌-এর কোন পাত্তা নেই। মা কিন্তু বিশ্বাস করলে না। তারপর খুব অসুখ হল জুল্‌স্‌-এর মায়ের। বিছানা থেকে উঠতে পারে না—তখন ওই পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে ওই খানে বসিয়ে রেখে দিলে, যদি ইতিমধ্যে ছেলে ফিরে আসে, এবং ছেলের সঙ্গে কথা ঠিক না থাকে।

এখন জুল্‌স্‌-এর মা মারা গিয়েছে। এবং জুল্‌স্‌-এর কোন পাত্তা এখনও পাওয়া যায় নি, সুতরাং তার মায়ের মূর্ত্তি ওই খালের ধারে বসে এখনও লিজ-এর দিকে চেয়ে আছে।

কেউ জানে না এই মা-টির কথা,—এই স্নেহান্ধ, অবুঝ পল্লীগ্রামের মা, ছেলের সঙ্গে কথা ঠিক রাখবার জন্যে মৃত্যুর পরও যিনি পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন।

ঘেণ্ট সহরে পৌঁছে আমরা রয়েল-ক্লাবে আমাদের ডোঙা রেখে একটা হোটেলের সন্ধানে গেলাম।

একটা বহু পুরোনো ধরণের বাড়ীর সামনে বসে লোকে দাড়ি কামাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে দেখে ঠিক করা গেল এটা ঠিক একটা হোটেল হবে।

বেলজিয়ামের খালে নৌকার উপর মাঝিরা কাপড় শুখাইতেছে।

একজনকে জিগ্যেস্ করলাম, এ সরাইটা অনেক পুরোনো, কি বলেন? সে বললে—খুব পুরোনো আর এমন কি? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাড়ীটা কোনো বড়লোকের বাড়ী ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আল্‌ব্রেক্ট্‌ ডুরার এখানে grocer's guild প্রতিষ্ঠিত করেন এই বাড়ীতেই। তারও পরে এটা সরাই হয়েছে—সুতরাং খুব পুরোনো কেমন করে বলি?

বেলজিয়ামের পল্লীদৃশ্য : মনে হয় একটি ছবি।

এখানকার লোকে বোধ হয় খুব ভোজনবিলাসী। রাস্তা, স্কোয়ার, গলিঘুঁজির নাম,—মাছ, মাখন, মুরগী, পেঁয়াজের অর্থসূচক। যেমন একটা রাস্তার নাম 'হারানো রুটীর

রাস্তা'। এই জন্যেই বোধ হয় ফ্রেমিশ্ চিত্রকরদের হাতে ভোজন-টেবিলের অত চমৎকার বাস্তব চিত্র ফুটেছে।

ব্রুসেল্‌সের খাল : দূরে বাষ্পচালিত নৌকাকে ঢেউ হইতে বাঁচাইবার জন্য ডোঙ্গা কূলে ভিড়ানো হইয়াছে।

ঘেণ্ট সহরে অনেক প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এক জনের নাম সর্ব্বাগ্রে করা দরকার। ইনি অলিভার মিন্‌জাউ, সেণ্ট নিকোলাস গির্জ্জার প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায় এঁর ছিল সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশটি সন্তান। একবার পঞ্চম চার্ল্‌স্ এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর সাম্‌নে দিয়ে একুশটি মিন্‌জাউ বালক কাওয়াজ করে চলে যাবার পর তাঁকে বলা হল, এগুলি সমস্ত ছেলেমেয়ের মাত্র ⅔ অংশ, তখন পঞ্চম চার্ল্‌স্ গাড়ী থামাতে আদেশ দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে।

ঘেণ্ট সহর দেখলে মনে হবে এখনও আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে আছি। সেই রকম পাথরবাঁধানো রাস্তা, ঘণ্টা-ঝোলানো বড় বড় গির্জ্জা, বিচিত্র রংএর পোষাকপরা নর-নারী। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্‌স্ হান্‌স্-এর মডেল যেন চারিদিকে ছড়ানো।

তারপর আমরা চললাম আণ্টোয়ার্পের দিকে। পথে পথে লাল টালিছাওয়া জেলেদের বাড়ী, চিমনি, বিচালির গাদা, গাজরের ক্ষেত, ছোটখাটো কারখানা। আণ্টোয়ার্প প্রকাণ্ড সহর। ইউরোপের মধ্যে বড় একটা হীরাকাটা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এখানকার বড় বড় আর্ট-গ্যালারি গুলো ঘুরে দেখতেই দশ বারোদিন কেটে যাবে। আপাততঃ আমরা এখানেই কিছুদিন থাকব।

অভয়ের কথা

আমি জাগরে মনে করি যে আমি ক্ষুদ্র অল্পশক্তি দীন হীন। শিব গড়িতে গেলে বানর হইয়া পড়ে। মরা বাঁচাইতে পারি না। অন্ধকে চক্ষু দিতে পারি না। প্রিয় পুত্রের ব্যাধি আরাম করিতে পারি না। বিধবাকে স্বামী দিতে পারি না। বিপত্নীককে যজ্ঞসাধন ভার্য্যা দিতে পারি না। কিন্তু আমার স্বপ্ন আমিই ত স্বয়ং নিজে সৃষ্টি করি, অপর কেহ করে না। স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার যে আমার শক্তি তাহা যে অপরিসীম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্র শিব গড়িতে ঠিক শিবই হয়, চন্দ্র, সূর্য্য, বাঘ, হাতী, পাহাড়, পর্ব্বত, এক রাত্রির স্বল্প সময়ে বহুবর্ষ ব্যাপী দীর্ঘতা, ক্ষুদ্র গৃহাবকাশে বিস্তৃত প্রান্তর জনপদ, আমি স্বপ্নে, বিনা আয়াসেই, প্রস্তুত করি। কোথায় লাগে দুচারটির চক্ষুদান, এক আধটা গোবর্দ্ধন-ধারণ, স্বপ্নে কটাক্ষ মাত্রে কত শত সহস্র জীব জন্তুর সৃজন সংহার করি। অথচ স্বপ্নকালে, ঠিক জাগর কালেরই মত, আমি আমিকে ক্ষুদ্র, স্বল্পৈকদেশ, স্বল্পশক্তি, দীন, হীন, মনে করি। দেখ আমিই আমিকে ক্ষুদ্র মনে করি, অথচ হিসাবে বুঝি যে আমি স্বপ্নস্রষ্টা, অপরিসীম শক্তিমান। স্বপ্নে আমারই অনুমতিতে বিশাল স্বপ্ন বর্ত্তমান। আমিই অল্প, আবার আমিই ত ভূমা। আমার অনুমতি নাই বলিয়া সুষুপ্তিতে কেহ থাকিতে পায় না, সকলেই সংহৃত হয়, তখন আমি সর্ব্বগ্রাস করিয়া থাকি। জাগরটাও একটা স্বপ্নতুল্য কিছু; স্বপ্নই। আমি মহামৎস্যবৎ জগৎ-নদীর কখন জাগর কূল দেখি, কখনও স্বপ্ন কূল দেখি, কখনও বা অকূল সুষুপ্তি-সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করি, যত্র জগৎ-নদী, নাম রূপ ত্যাগ করিয়াই অস্তগত। জাগর দর্শন কালে জাগর অভিমানী আমি, আমিকে ক্ষুদ্র হীন মনে করি, স্বপ্নদর্শন কালে উক্ত জাগর অভিমান সহজেই ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে নূতন একটা জাগরাভিমান লইয়া তত্র আমিকে ক্ষুদ্র হীন মনে করি, কিন্তু ভূমা আমি ত ক্ষুদ্র, দীন, হীন নহি। স্ফটিক যথা সহজেই জবাসন্নিধানে লাল হয় ও জবাতিরস্কারে ও অপরাজিতা পুরস্কারে সহজেই লাল ত্যাগ পূর্ব্বক সহজেই নীল হয়—অথচ স্ফটিক লালও হয় না, নীলও হয় না; তদ্বৎ আমি জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তিতে সদাই শুভ্র, মুক্ত। বন্ধন কদাপিই বাস্তবিক নাই বলিয়া মোক্ষটি প্রাপ্ত-প্রাপ্তি, কর্ণে কলম বা গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক প্রাপ্তিবৎ এবং মোক্ষটি পরিহৃত পরিহারও বটে, রজ্জুর সর্পাবরণ নিষেধবৎ। স্বপ্ন-স্রষ্টাও আমি, জাগর-স্রষ্টাও আমি। আমি কেও কেটা নহে, এক অদ্বিতীয় অসীম শক্তিমান, নিত্যমুক্ত। আমি লীলাচ্ছায়ে জগৎ সংহার করি সুষুপ্তিতে, এবং লীলা চ্ছায়েই জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেখি, অথবা দৃষ্টিদ্বারেই সৃষ্টি করি। জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য কোনও নিয়মের বশীভূত আমি নহি, নিয়মই আমার বশীভূত অর্থাৎ অনিয়মই আমার নিয়ম, আমার ইচ্ছাই নিয়ম। আমার ইচ্ছাতেই বৃক্ষচ্যুত ফল পড়ে, আমির ইচ্ছা হইলেই বৃক্ষচ্যুত ফল উড়িবে, পড়িবে না। আমিই তার-যোগে সংবাদ পাঠাই, আমি তার-বিনা সংবাদ পাঠাই। আমিই মানুষ হইয়া জলে ডুবিয়া মরি, আমিই মৎস্য হইয়া জলে ডুবিয়া বাঁচি, আমি সূর্য্য হইয়া অন্ধকারগতবস্তু প্রকট করি, আমিই সূর্য্য হইয়া প্রকট নক্ষত্রাদিকে গোপন করি। আমি হত্যা করিয়া ফাঁসী যাই, আমিই জহ্লাদ হইয়া হত্যা করিয়া বেতন পুরস্কার লই। আমি নর হইয়া নারীকে ভোগ করি, আমি নারী হইয়া নরকে ভোগ করি। আমিই মানুষ হইয়া মিঠাই ভোগ করি, আমি মিঠাই হইয়া মানুষকে ভোগ করি না।

— ৺ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

—শ্রীমাণিক গুপ্ত

এ যুগের নারী

বঙ্গশ্রী-সম্পাদক সমীপেষু,

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গশ্রীতে 'এ যুগের নারী' শীর্ষক যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সম্পাদকীয়তে তাহার উল্লেখ করিয়া আপনি লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীযুক্ত মাণিক গুপ্ত মহাশয় এ যুগের নারী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে যুগে যুগে পুরুষ কর্ত্তৃক নারী-নির্যাতনের এমন একটা ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সন্দেহ হয়, মাণিক গুপ্ত কোনও নারীরই হয়তো ছদ্মনাম। আশার কথা এই যে, অতীত সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণাই থাকুক, বর্ত্তমান সম্বন্ধে তিনি হতাশ নন এবং নারীর পক্ষে খুব সুখকর ভবিষ্যৎ তিনি কল্পনা করিয়া থাকেন।'

ইহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতে গিয়াও বাধিতেছে। কিন্তু আপনি একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধটি মূলতঃ একজন নারীর লিখিত প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ। লেখিকা নারীর স্বপক্ষে (?) এমন কথাই বলিয়াছেন, যাহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পড়িয়াও মনে হয় যে, সে-প্রবন্ধও নিশ্চয়ই নারীর লিখিত! নারী না হইয়াও যে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারেন, পুরুষদের এই সামান্য ঔদার্য্যেও কি আপনি বিশ্বাস হারাইয়াছেন? তাহা ছাড়া 'যুগে যুগে পুরুষ কর্ত্তৃক নারী-নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র' তো আমি আঁকি নাই, আমি কেবল উক্ত মহিলা লিখিত 'বর্ত্তমান যুগে ভারতনারীর কর্ত্তব্য কি'-র প্রতিবাদার্থে 'পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর স্থান' বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। সে আলোচনায় কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা ছিল, তদতিরিক্ত কিছু ছিল না। সেই বর্ণনা যদি আপনার নিকট 'পুরুষ কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের একটি ভয়াবহ চিত্র' হিসাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে আমার দোষ নাই, ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনার দোষ।

আমার সম্বন্ধে যে-আশা আপনি পোষণ করিয়াছেন, তাহাতেও আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অতীত সম্বন্ধে আমার 'যে ধারণা', ইতিহাস তাহা ভুল বলে না, এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমার হতাশা কিংবা আশাও খুব মূল্যবান ব্যাপার নয়। বর্ত্তমান যুগে নারী যে সামান্য মর্য্যাদার অধিকারিণী হইয়াছে, সে মর্য্যাদা নারী কর্ত্তৃকই কঠিন পরিশ্রমে অর্জ্জিত। পুরুষ সহজে তাহাকে কিছুই দেয় নাই। পার্লামেণ্টে সামান্য ভোট দিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে তাহাকে যে বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যুদ্ধও (যে যুদ্ধে আমাদের নায়ক দিনের পর দিন অনশন করিতেছেন এবং দলে দলে ছেলেদের জেলে বন্দী অবস্থায় দিন কাটিতেছে) খুব উচ্চ স্থান পায় না। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। ১৯০৬ সনের কথা। Women's Disabilities Bill তখন পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইয়াছে। দেশময় ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে। ক্রিষ্টাবেল প্যাংকহার্ষ্ট ও মিস আনি কেনির জরিমানা হইয়াছে। তৎপরে—

> A certain section of suffragists thereafter decided upon comprehensive opposition to the government of the day, until such time as one or other party should officially adopt a measure for the enfranchisement of women. This opposition took two forms, one of that conducting campaigns against government nominees (whether friendly or not) at bye elections, and the other that of committing breaches of the law with a view to drawing the widest possible attention to their cause and so forcing the authorities to fine or imprison them. Large numbers of women assembled while parliament was sitting, in contravention of the regulations, and on several occasions many arrests were made. Fines were imposed, but practically all refused to pay them and suffered imprisonment. At a later stage some

of the prisoners adopted the further cause of refusing food and were forcibly fed in the gaols. (*Vol. 28. 11th Ed.*)

কিন্তু এ সকল কথা কে না জানে! তবু ইহার উল্লেখ প্রয়োজন এই জন্য যে, সাধারণের স্মৃতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ। যাহা দৃষ্টিপথে পড়ে না, তৎসম্বন্ধে প্রায়ই তাহারা উদাসীন। আজ উহাদের দেশে নারীরা স্বকীয় মর্য্যাদার যে অতি সামান্যাংশ পুরুষের চোখে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য নারীকে অসামান্য মূল্য দিতে হইয়াছে।

সুতরাং বলিতেছিলাম, নারীর বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমার আশান্বিত বা হতাশ হওয়ায় কোন-কিছু যায় আসে না। বহু শতাব্দীর জড়তা ও আলস্যের পঙ্ক হইতে নারী আজ নিজেকে বাঁচাইতে পারিয়াছে—আমি তাহার সেই সাধনাকে যথোচিত মূল্য দিয়াছিলাম মাত্র, কোন উচ্ছ্বাস করি নাই।

বর্ত্তমান যুগে 'ভারত নারীর কর্ত্তব্য' কি সত্যই 'অতীত যুগে ভারত নারীর কর্ত্তব্য হইতে বিভিন্ন নহে'? এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? না, বিশ্বাস করেন যে, নারীর গৃহের বাহিরে কোন কাজ নাই?

কোন শিক্ষিত পুরুষই তাহা বিশ্বাস করে না, আমিও করি না।

'...নারী-প্রগতিবাদীদের এক শ্রেণীর মনের কথা বলিয়া' আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন লিখিয়াছেন। 'নারী-প্রগতি' এবং 'নর প্রগতি', প্রগতির এমন চুলচেরা কোনও বিভাগ সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না। সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে যাহা শুভ, আলোচনা সেই সম্পর্কে। একদিন ধনীরা মানুষ ক্রয় করিয়া সেই মানুষকে পশুর মত নিজের কাজে লাগাইত, তাহাতে নিজেদের শুভ অপেক্ষা অশুভ অধিক ছিল। অধিকতর সভ্যযুগে মানুষ সে বর্ব্বর প্রথা ত্যাগ করিয়াছে, ক্রীতদাসদের প্রগতি হইয়াছিল বলিয়া নয়, মানব-সমাজ ক্রীতদাস-প্রথার মধ্যে নিজের অশুভ লক্ষ্য করিয়াছিল। যারে তুমি রাখিছ পশ্চাতে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে,—ইহা মানুষ বুঝিয়াছিল।

অপেক্ষাকৃত সভ্য যুগে নারীর যে-অবস্থা ছিল, তাহা বর্ব্বর যুগের ক্রীতদাস-প্রথা অপেক্ষা অধিকতর আপত্তিজনক। ক্রীতদাস নিজের অবস্থা বুঝিত—অন্ততঃ তাহাকে না বুঝিতে দিবার জন্য কোনও চেষ্টা ছিল না। নারী সম্বন্ধে একটু মজা এই যে, মনুষ্য-সমাজ যত রকমে পারিয়াছে, তাহাকে বুঝিতে দিয়াছে যে, তাহার ভালর জন্যই সব-কিছু।

কিন্তু এ সবও অত্যন্ত পুরাতন কথা।

পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাৎসিদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া এদেশে যাঁহারা উল্লাস করিতেছেন, তাঁহাদের সে-উল্লাসের কারণ বুঝি না। নাৎসিরা যুদ্ধপন্থী, তাহাদের নিকট নরনারীর একমাত্র মূল্য যুদ্ধের ক্রীড়নক হিসাবে। ইহা খুব সহজ অবস্থার কথা নহে। এই অসহজ অবস্থার কোন ব্যবস্থাকে প্রামাণ্য হিসাবে টানিয়া আনাও নির্ব্বুদ্ধিতা।

পাশ্চাত্যের নারী-প্রগতির অনেক গলদ আছে। সেসব গলদ সহজে গলাধঃকরণ করা চলে না। কিন্তু সমাজের একাংশ অপরাংশ হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন যাপন করিবে, মনুষ্য-সভ্যতার গতি-পথের নিয়ম যদি ইহাই হয়—তাহা হইলে মনুষ্য-সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষ আশা-ভরসা করিবার আর কিছুই নাই। কেননা, পৃথিবীর পুরুষরা সকলে মিলিয়া সভ্য জগৎকে আজ যে-অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে, তাহা ঈর্ষ্যা করিবার মত অবস্থা নয়। আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে, এই অবস্থা হইতে একমাত্র মুক্তি পুরুষ-শক্তির সহিত নারীশক্তির মিলিত অভিযানে

কিন্তু সে-কথা এখানে অবান্তর।—ইতি শ্রীমাণিক গুপ্ত।

বাঙ্গালী বীরনারী

বাঙ্গালাদেশে জন্মাইয়া সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া আজ প্রায় স্বপ্নের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের। কিন্তু কিছুদিন আগেও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ছিল—অপরিমিত স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য মধ্যে মধ্যে কার্য্যকরীও হইত। নীচে ১৩১৮ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্ত' হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধটি একটি চণ্ডালিনী স্মরণে লিখিত। এই পুণ্যস্মৃতি চণ্ডালিনীর নাম ও কাহিনী আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার অপরিচিত। আশা করি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ নাম সহজে ভুলিবার নয়।

দ্রবময়ী চণ্ডালিনী

জগতে অনেকেই বড়লোকের বড় কথা লইয়া ব্যস্ত, ইতিহাসও বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু দুই একটা গরীব দুঃখী সামান্য লোকের কথা ইতিহাসে থাকিলে ক্ষতি কি? সমরু বেগমের ইতিহাস বা কাহিনী আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আজিও সর্দ্ধানায় গেলে মুসলমান-খ্রীষ্টান মণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমার দ্রবময়ীর পৌত্র বর্ত্তমান, সেই দ্রবময়ী ও তাহার শিশু পৌত্রের কথাই বলিতেছি। ইতিহাসে ক্ষুদ্রের স্মৃতিচিহ্ন থাকিলে ইতিহাসের কলঙ্ক হয় না।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা বিভাগের মধ্যে মহম্মদ আমিনপুর পরগণায় উট্‌রো বা আবজী দুর্গাপুর একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে কেবল মুসলমান ও চণ্ডালের বাস। গ্রামখানি আমাদের হুগলীজেলার ৩২০ নং তৌজির একখানি ছিটা মহল। ৩২০নং তৌজিতে আমার পত্তনী স্বত্ব। আমি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্তনী লই। সে আজি ২৩ বৎসরের কথা। আমাদের কাগজে ৺বৈকুণ্ঠ সর্দ্দারের নামে ২০।৴০ জমা এখনও চলিতেছে। বৈকুণ্ঠ সর্দ্দার চণ্ডাল। সে গ্রামের একজন খোদকস্ত প্রজা এবং চৌকীদার ছিল। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের পুত্র একটি শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোকগত হয়। ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, বৈকুণ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহাদের সংসারে রহিল—বৈকুণ্ঠের স্ত্রী দ্রবময়ী ও তাহার শিশু পৌত্র রঙ্গলাল। রঙ্গলাল এখনও জীবিত আছে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে দস্যু-তস্কর বিস্তর ছিল। বিশেষ আমাদের হুগলী জেলার উত্তরাংশ ও বর্দ্ধমানেব দক্ষিণাংশ একরূপ অরাজক ছিল বলিলেও চলে। চিতের মার পুকুর, সরালের দীঘী, উচালনের দীঘী, বাবরাকপুরের দীঘী এই সকল স্থানে দিনের বেলায় সামান্য লাভের লোভে দস্যুরা নরহত্যা করিত। তখন চৌকীদারি 'সত্যিকার' একটা কার্য্য ছিল। এখনকার দিনের মত সোমবারে সদরে হাজির দিয়াই চৌকীদারেরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

বৈকুণ্ঠ একজন নামডাকে পরিচিত সর্দ্দার ছিল। তাহার মৃত্যুতে কে তাহার কার্য্য করিবে? অপোগণ্ড শিশু রঙ্গলালের ও তাহার পিতামহীর কিসে ভরণপোষণ হইবে? দুর্গাপুর গ্রামখানি ছোট, কিন্তু পার্শ্বস্থ আর একখানি গ্রাম ও পটী লইয়া নিতান্ত ছোট নহে। চৌকীদারের এলাকা বড় কম নহে। দ্রবময়ীর স্বামী বর্ত্তমানে তাহার অসুখ-বিসুখ করিলে, মাঝে মাঝে কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে গ্রামের চৌকীদারি করিত। গ্রামের লোকেরা তাহা জানিত। তাহারা পরামর্শ দিল,"দ্রবময়ী, তুমি চৌকীদারির জন্য দরখাস্ত কর।" দ্রবময়ী শিশু রঙ্গলালকে ক্রোড়ে লইয়া, একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কালনায় গিয়া হাজির। কাল্‌নার কর্ত্তৃপক্ষেরা বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু দ্রবময়ীকে উপহাস করিলেন না বা তাড়াইয়া দিলেন না। এই ঘটনার ১০।১২ বৎসর পরে দ্রবময়ী আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল। তখনও সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। গোলমুখে গোল গোল ডাগর চক্ষু, কপালের উপর একরাশি চুল। বিধবার মলিন মোটা কাপড় পরিবার আদব-কায়দা বেশ। তা[illegible]ই মুখে তাহারই কাহিনী আমি শুনিয়াছিলাম।

কাল্‌নার কর্ত্তৃপক্ষেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রব, তুমি লাঠিখেলা জান?" দ্রবময়ী একটু সঙ্কোচে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে লাঠি-খেলা জানে। দরখাস্তের অনুকূলে অনেক কথা লিখিয়া, দ্রবময়ীর হস্তে সেই দরখাস্ত তাঁহারা বর্দ্ধমানে পোলিসের "বড় সাহেবে"র কাছে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, "তুমি তোমার পৌত্রটিকে লইয়া বর্দ্ধমানে যাও।"

"পোলিস্ সাহেব" দরখাস্ত পাইয়া মহা খুসী। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রের "সাহেবের" কাছে দৌড়িয়া গিয়া খবর দিলেন যে, এক বাঙ্গালি মেয়ে লাঠি-খেলায় পরীক্ষা দিয়া তাহার স্বামীর চৌকীদারি চাকরি লইতে আসিয়াছে। জেলায় মহাগোল উঠিল। দুই কর্ত্তা দু'খানা কেদারা আনাইয়া কাছারীর মাঠে বৈঠক করিলেন, আর দাঁড়াইয়া আহেলে-মামলা, কেরাণী-আমলা, সমগ্র লোক। সকলেই আজি মজা দেখিবে।

দ্রবময়ী এতক্ষণ একটি গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, আস্তে আস্তে দর্শকচক্র মধ্যে প্রবেশ করিল; কোলের

নাতিটিকে প্রতিবেশীর স্কন্ধে বসাইয়া দিল। কোমরে কাছে কাপড় বাধিয়া "সাহেবদের" সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, আভূমি নত হইয়া প্রণাম বা সেলাম করিল; চারিদিকে দর্শকমণ্ডলীকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল. তাহার পর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া "সাহেবকে" অতি বিনীত স্বরে বলিল, "হুজুর! একলা ত লাঠি খেলা হয় না। কে আমার সঙ্গে খেলিবে, আসুক্।" কেহই আসিতে চায় না। আওরতের সঙ্গে খেলিতে গিয়া কি সম্ভ্রম নষ্ট করিব? শেষে "পোলিস সাহেবের" সঙ্কেতে একজন কন্‌ষ্টেবল অগ্রসর হইল। ঠকাঠক্, ঠকাঠক্, – কন্‌ষ্টেবল বড় ধূর্ত্ত; কাণ্ডখানা একটা প্রহসনের মত করিয়া তুলিল। সর্দ্দারণী তাহা বুঝিল; বলিল,—"হুজুর! আমাকে কি সং সাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন? একি লাঠি-খেলা হইতেছে?" "পোলিস্ সাহেব" আবার আর এক রূপ সঙ্কেত করিলেন। ঘড়ী দেখিলেন—দশ মিনিট খেলা হইল,—সর্দ্দারণীর লাঠি কন্‌ষ্টেবলের পাগ্‌ড়ি স্পর্শ করিল। "সাহেব" খেলা বন্ধ করিয়া সর্দ্দারণীর প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন; সর্দ্দারণী কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট নহে; করযোড়ে বলিল—"খেলোয়াড় দুইজন আমাকে মারিতে আসুক; দেখুন আমি নিজেকে সাম্‌লাইতে পারি কিনা?" তাহাই হইল, দুই দিক্ হইতে দুইজনে আক্রমণ করিতে আসিল; দ্রব দুই গাছা লাঠি হাতে লইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে "সাহেব" খেলা বন্ধ করিলেন।

"সাহেব" দাঁড়াইয়া উঠিয়া সর্দ্দারণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমারা মরদ্ কি কাম্‌মে তুম্ বাহাল হুয়া।" জনতা আহ্লাদে হলহলা করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেরা পৈতা হাতে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। "সাহেব" বসিয়া ছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কি পরামর্শ করিয়া, আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তুমারা বক্‌সিস্ দশ রূপেয়া।" আর একজন বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"A *seer* of *methai* for the grandchild," ইহার পৌত্রটিকে একসের মিঠাই দিতে হইবে।

একসের মিঠাই লইয়া তাহারা সেই দিনই রওনা হইল। আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সে রাত্রি বর্দ্ধমানে থাকিলে জনতার জ্বালায় ঘুম হইবে না। দ্রবময়ী এখন স্বর্গের চণ্ডাললোকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রঙ্গলাল জীবিত, দুর্গাপুরে।

সর্দ্দারণী যখন বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে এই গল্প বিবৃত করে, তখন তাহার পদ্মপলাশ লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল; আমি আজি লিখিবার সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। কেন, তোমরা বলিতে পার?"

তাহার পর পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আধুনিক-রুচি বাঙ্গালীর নিকট এ কাহিনী কেমন লাগিবে জানি না—একটি চণ্ডালিনী লাঠি খেলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে স্বামীর চাকরিতে বহাল হইল। ইহা আর এমন কি ঘটনা!

কিন্তু এই মৃতপ্রায় জাতির কঙ্কালসার অস্তিত্বের পট-ভূমিকায় এই বীরনারীর যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি এই সামান্য কাহিনীর মধ্য হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল—তাহার অপেক্ষা রোম্যাণ্টিক-মূর্ত্তি কই সচরাচর তো নজরে পড়ে না।

কলেজের মেয়ে: ১৯৩৪ মডেল

'কারেণ্ট হিষ্ট্রি' পত্রিকায় আলজাদা কমষ্টক্ আমেরিকার বর্ত্তমান কলেজে-পড়া মেয়েদের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন—প্রবন্ধটির নাম The College Girl: 1934 Model. এখানে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল। আমাদের দেশের কলেজে-পড়া মেয়েদের বিষয়ে এই কথা বলা চলে কি?

...সকলের ধারণা যে, আগেও শিক্ষিতা মেয়েরা যাহা ছিল এ যুগের মেয়েরাও ঠিক তাহাই। এ কথা নিছক বাজে। সমস্ত পৃথিবীর যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ যুগের কলেজের মেয়েদেরও ঠিক তেমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অবশ্য এ-সব মেয়েদের নারীত্ব খানিকটা হ্রাস পাইয়াছে। নারী-সৌন্দর্য্যের মাধুরী বলিতে যাহা বোঝা যায়, চারিপাশে কলেজের মেয়েদের পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। পায়ে খেলিবার বুট, মোজা আছে কি নাই, টেনিস খেলিতে যে-পোষাক পরে পরিধানে সেই পোষাক, যেন গল্‌ফ খেলিবে এমন জামা গায়ে, তদুপরি এমন একটি

কোট, ইংরেজেরা যাহা দেখিয়া মনে করিবেন মানবস্ত্র। যাহাকে বলে, 'সমাজে বাহির হওয়া', তখন পোষাক হয় একটু অভিনব, মাথায় বাঁকানো টুপি আর পায়ে চক্‌চকে জুতা—চলিবার সময় সে জুতায় শব্দ হয়। পোষাক-পরিচ্ছদে খুব আড়ম্বর নাই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। ইহাদের মতে, যাহাদের বয়স বাড়িয়াছে, তাহারাই মুখে রুজ-পাউডার মাথে—মাখিয়া বন্ধুর বাড়িতে সারা বিকাল বসিয়া ব্রিজ খেলে। সে সময় কই ইহাদের?

১৯১৩ কিংবা ১৯১৭তে যে মেয়েরা কলেজে পড়িত, তাহারা সদাসর্ব্বদা জীবনের দার্শনিক সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করিত—আলোচনা করিত। ইহারা সেদিক দিয়াও যায় না। তখনকার মেয়েদের জীবনের সামাজিক সমস্যা (ব্যক্তিগতও বটে) ছিল, বিবাহ করিবে কিংবা জীবনে একটা ব্যবস্থা, যাহাকে বলে career, গ্রহণ করিবে। এই সমস্যার আলোচনায় রাত্রিতে কতক্ষণ যে-গ্যাস জ্বলিত! শেষ অবধি বিবাহের বিরুদ্ধে ভোট পাওয়া যাইত বেশী।

১৯২০তে দেশের অবস্থা একটু ভাল। তখন মেয়েদের যে-কেহ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের জন্য মোড় ফিরিতে না ফিরিতেই লক্ষপতি পাণি-প্রার্থীর সন্ধান মিলিতেছে। বিবাহান্তে ইউরোপে মধুমাস কাটাইবার চিন্তায় তাহারা ব্যস্ত। তখন জীবনে ব্যবস্থার জন্য কোন মেয়েই বিশেষ চিন্তা করিত না,—যাহারা শেষ অবধি বিবাহ না করিয়া একটা কিছুতে ঢুকিয়া পড়িত, তাহারাও এ বিষয়ে বিশেষ কথা কহিত না।

কিন্তু ১৯৩০ সালে আবার পুরাতন প্রশ্ন নূতন করিয়া উঠিয়াছে। কলেজে পড়া শেষ হইল, তারপর? অবশ্য বিবাহ হইলে ভাল-ই। কিন্তু ততদিন চলে কি করিয়া? ছোট ছোট ভাইবোন আছে, তাহাদের লেখাপড়ার কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে—নিজেদের পড়াশোনাতে কিছু ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চাকরি খুঁজিতে হয়। কিন্তু চাকরি জোটা দায়। জুটিলেও মাহিনা কম। তবু হাসিমুখে জীবন কাটে।

১৯৩৩ সালে যে-মেয়েরা কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের ক্বচিৎ চাকরি জুটিতেছে। কিন্তু জুটিলেও তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে খুব দম্ভ নাই—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলেজে-পড়া মেয়েদের তাহা ছিল। আজকালকার মেয়েরা জানে যে, কলেজে পড়িয়াছে বলিয়াই বাহিরের পৃথিবী তাহার মূল্য বাড়াইবে না, সুতরাং তাহারা একটু নম্র, বিনয়ী।

এই দুর্দ্দিনে যাহারা কলেজে পড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে একটি গভীরতা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের পরে এতদিনের মধ্যে এ গাম্ভীর্য্য মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় নাই। জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দায়িত্ববোধ আসিয়াছে। মনে হইতেছে, আমেরিকার বিলাসের দিন ফুরাইয়াছে। আজ আর মেয়েদের কলেজে পড়িয়া বুঝিতে হয় না যে, বাড়ির অবস্থা চরম—কলেজে পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই সে বাড়ির অবস্থা জানিয়া আসে।

পাঁচ বছর আগে ইংরেজি কাব্যে কিংবা কেমিষ্ট্রিতে মেয়েদের মধ্যে যে-সাড়া আনিত আজ তাহা তো বজায় আছেই, অধিকন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়াছে। এখন আর কলেজের প্রোফেসার যদি দেখেন যে, কলেজ-ক্লাসের বাহিরেও মেয়েরা বাড়তি-মুদ্রা (inflation) বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে চায়—এবং সে-ক্লাসে কাহাকেও উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ না জানাইলেও ভীড় বেশ-ই হয়, তবে তিনি বিস্মিত হন না।

১৯২০তে ছিল—যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা নিজেদের পালিশ করিতে কলেজে প্রবেশ করিত। কলেজে পড়া যেন একটি সামাজিক প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। মন থাকিত তাহাদের অন্যত্র শুষ্ক কর্ত্তব্য হিসাবে কলেজে পড়া চলিত। যেন শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য ছিল, মেয়েদের মনকে পাঠ্যবিষয়ে নিযুক্ত রাখা—যে-শিক্ষক তাহা পারিতেন না, তিনি অনুপযুক্ত বিবেচিত হইতেন। ছাত্রী কলেজের ক্লাসে আসিত, যেন কোন অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে—ভাল লাগিতেও পারে, নাও পারে। শুধু রুটিনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই কলেজে আসা, এই ছিল নিয়ম। যেমন লাগেজের উপর টিকিট আঁটা থাকে, এ লাগেজ এই এই ষ্টেশন ঘুরিয়া আসিয়াছে—কলেজের মেয়েদের মুখে তেমনি একটা ভাব সর্ব্বদা দেখা যাইত যে, সে অমুক অমুক ক্লাস করিয়া আসিয়াছে।

অবশ্য তখন আমাদের অবস্থা ছিল ভাল—আলস্যের অবসর ছিল। কলেজের বাহিরে জীবনযাপন খুব কষ্টসাধ্য ছিল না—সুতরাং মস্তিষ্কচর্চ্চার প্রয়োজন কেহ অনুভব করিত না।

লণ্ডনের চিঠি

লণ্ডন
মে, ১৯৩৮

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস,
সম্পাদক, "বঙ্গশ্রী" সমীপেষু,

২২শে এপ্রিল, বাংলা ৯ই বৈশাখ, রবিবার, ভোর রাত্রি দুটো (2a.m.) থেকে গ্রীনউইচ্-টাইমের (Greenwich) পরিবর্ত্তে এখানে সামার-টাইম্ (Summer time) আরম্ভ হয়েছে। তার মানে এদেশের সব ঘড়িগুলো এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার যাদের আটটা নাগাদ ওঠার অভ্যেস, এই রবিবার ভোরে আটটায় বিছানা ছেড়ে উঠে তারা দেখছে যে, নতুন সামার-টাইম অনুসারে তারা এদিন এক ঘণ্টা লেট হয়েছে, অর্থাৎ ৯টায় উঠেছে। এইভাবে ভোর দুটোর সময়ে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়ার ফলে,শনিবার রাত্রে থিয়েটার,বল-নাচ বা অন্য কোন আমোদ-প্রমোদে রাত জাগার যাদের অভ্যেস, তাদের একঘণ্টা ঘুমের অভাব হয়ে পড়ে, তবে তারা সে অভাব ইচ্ছামত পূরণ করে নিতে পারে, রবিবার সকালে বেশীক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে। আফিস, কাছারি, স্কুল-কলেজ, এ সবের তাড়াহুড়ো রবিবারে নেই—তাই সামার-টাইম আরম্ভ হয় সপ্তাহের অন্য কোন দিনে নয়, রবিবারে, অর্থাৎ শনিবারের রাত্রে। এ সওদাগর-জাতির ব্যবসায়-জীবনে এই সামার-টাইমের মূল্য অসীম। ইলেকট্রিক লাইট বাবদে খরচার মাত্রা যতদিন সামার-টাইম বাহাল থাকে, ততদিন খুবই কম পড়ে। তা ছাড়া দীর্ঘ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শান্তি, গোধূলির বর্ণ-বৈচিত্র্য, বসন্তের রমণীয়তা—এদের প্রভাব—বালক, বৃদ্ধ,যুবা সবাইকেই ঘর ছেড়ে বাইরে খেলা ধূলায় মত্ত থাকতে প্রলুব্ধ করে। সামার-টাইমের কল্যাণে সন্ধ্যা কতটা বেড়ে যায়, তা বুঝতে পারবেন রাস্তায় আলো জ্বালবার সময়ের দু'একটা উদাহরণ থেকে। যে রাত্রে সামার-টাইম আরম্ভ হয়েছে, সেই শনিবার, অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল, লাইটিং-আপ-টাইম ছিল ৭টা ৩০ গ্রীনউইচ-টাইম। তারপরের শনিবার লাইটিং-আপ-টাইম হয়েছে ৯টা ১৬ সামার-টাইম। ২১শে এপ্রিল আর ২৮শে এপ্রিল এই দুই শনিবারের মধ্যে দিন এতটা লম্বা হয়েছে, সন্ধ্যা এতটা দীর্ঘায়ত হয়েছে। লাইটিং-আপ-টাইম ৩০শে জুন হবে ১০টা ১৯ সামার-টাইম, তারপরে ক্রমশঃ একটু একটু করে আলো জ্বালবার সময় এগিয়ে যাবে। ফলে অক্টোবরের প্রথম শনিবারে আলো জ্বালবার সময় হবে ৭টা ২৬ মিনিট সন্ধ্যায়। ঐ রাত্রে সামার-টাইম বদলে গিয়ে আবার গ্রীনউইচ-টাইম আরম্ভ হবে। ফলে, ১৩ই অক্টোবরে আলো দেবার সময় হবে সন্ধ্যা ৫-৪০ মিনিট (গ্রীনউইচ-টাইম)।

লণ্ডনে এই মে মাসের মাধুর্য্য জনগণমনোহারিণী—বাঙ্গালী কবিরা যেমন বসন্তাগমে প্রতিভা-প্রাচুর্য্যে পুষ্পিত হন, লণ্ডনের কবিরা তেমনি মে-মাস-মত্ত। এখানে ক্যাথরিন ম্যাকিনটসের একটি কবিতা সম্প্রতি খুব সুখ্যাতি লাভ করেছে। কবিতাটিতে মে মাসের সৌন্দর্য্য কতকটা ফুটে উঠেছে। কবিতাটি শুনুন—

This is the country season : this is the time
When every footstep stirs to an English rhyme ;
—When all house-doors stand open and curtains fly,
And children tell the time by the cuckoo's cry.
This is the meadow season ; these are the eves
When moth-light lingers dewily under the leaves,
When grass smells live and cold, and streams bear petals,
And flowers like lilies spring out of stinging nettles.
This is the English season : this is the time
When dead men walk who were part of the English rhyme
Dan Chaucer laughs, 'bor Tusser drains the brook,
Grave Mr. Walton baits a hopeful hook :
And down in Warwick, drunk with English ale,
A boy called Shakspeare hears the nightingale.

লণ্ডনে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সংস্রব রাখা আর তার সান্নিধ্য পাওয়া খুব সোজা ব্যাপার নয়। ঘুরে না বেড়ালে প্রকৃতির হাসি দেখা যায় না। কিছুদিন আগে, ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের পশ্চিম প্রান্তে, ডেভনশায়ারে পেইন্‌টন (Paignton) নামে ছোট একটি সহরে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করেই মোটর কোচ বাহন বেছে নিয়েছিলাম, এভাবে সারাব্যাঙ্কে (Chara bank) পথ চলতে রেলের চাইতে সময় বেশী লাগে, কিন্তু এতে পয়সা-খরচ কম, আর দেশ দেখবারও সুবিধে অনেক পাওয়া যায়। বাংলার বসন্তের সমাগম আমের মুকুলের স্মৃতির সঙ্গে মনের নিভৃত কোণে বেশ ভাল ভাবে মাখানো রয়েছে, সেই স্মৃতিই সমস্ত হৃদয়-মনকে আলোড়িত, তরঙ্গায়িত করে তুলেছিল এই লণ্ডন-পেইনটন মোটরপথে। এ দেশে আমের গাছ নেই, আমের পল্লবের পরিবর্ত্তে এখানে এ্যাপেল-মঞ্জরী, চেরীর মুকুল। আমের মুকুলের যেমন মনমাতানো গন্ধ,এ্যাপেল আর চেরীমুকুলেরও তেমনি। ওদেশে কলকাতা সহরের অধিবাসীর পক্ষে যেমন আম্রমুকুলের সৌগন্ধ্য পাওয়া দুঃসাধ্য, লণ্ডন-অধিবাসীর পক্ষেও এখানে এ্যাপেল আর চেরীর গন্ধ পাওয়া তেমনি। লণ্ডনে বসে এ্যাপেলমঞ্জরী আর চেরীমুকুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ সম্ভব হয় না। প্রকৃতির উন্মুক্ত উদ্যানে না গেলে এই পুষ্পযুগের প্রণয়-উন্মেষক, তরঙ্গায়িত, ললিত নৃত্য উপভোগ করা যায় না। তাই যখনই সময় আসে আর সুযোগ পাওয়া যায়, প্রকৃতির পূজারী সব লণ্ডন সহর ছেড়ে গ্রাম্য কান্তারে ছুটে পালায়। লণ্ডন-পেইনটন মোটর-পথে ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের প্রাকৃতিক কমনীয়তা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণে শিহরণ জাগিয়েছে। সহরের অসামঞ্জস্য, কদাকার গৃহাবলি দেখতে অভ্যস্ত ও ক্লিষ্ট আঁখি, সবুজ ক্ষেত, সুদূর শ্যাম বনরাজি, আর সুনীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে জুড়িয়েছে।

আমাদের বাসের রাস্তা ছিল স্থানে স্থানে অসমতল, চড়াই-উৎরাই, কোথাও বা ছোট একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ চলেছে, কোথাও বা উপত্যকার মধ্য দিয়ে, কোথাও সরু একটি টানেলের ভিতর দিয়ে। ঘোড়া চাপা, বাইক্, মোটর-বাইক, মোটর, স্পিড্-বোট্, কোচ্, এরোপ্লেন এদের সবার

দোলানিরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটিতে একটি স্বতন্ত্র thrill অনুভব করা যায়। এই thrill পথের আর সব উপভোগের বস্তুকে—পাহাড়ের উপর দিয়ে চ'লে যাবার সময়,—নীচের গ্রামের সাধারণ উপরসা দৃশ্য, সমুখের, পশ্চাতের, ডাইনের, বাঁয়ের অনন্ত-বিস্তার, দিগন্ত-প্রসার দিক-চক্রবালের লুকোচুরি খেলা, সমস্তেরই আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। নানা শ্রেণীর ফুল ও পাতার বর্ণ বৈচিত্র্য, টীনের ঘর, শনের কুটীর, লাল টাইলের ছোট দালান, আইভিমণ্ডিত গির্জ্জা-মন্দির, পুষ্পের সম্ভার, সরু বাঁকা নদীর কালোজল, মেঘের পাল, লাল রঙের মাটী, আরও কত কি—চলতি বাস সমস্তগুলিকে রূপান্তরিত করে প্রতিদিনের পরিচিত জগৎকে মুহূর্ত্তে অপরিচয়ের আবেষ্টন পরিয়ে দেয়।

এদেশের মাটিতে রাস্তা তৈরী করা সহজ। এখানকার গভর্ণমেণ্ট বহুদিন থেকেই মোটর-যাত্রীদের সুবিধার দিকে নজর দিয়েছে। দেশের যাতায়াতের সুবিধার ওপর বাণিজ্যের প্রসার যে একান্তভাবে নির্ভর করে, এ সার তথ্য এ জাতি ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ রেভোলিউসনের যুগ থেকেই সমাক উপলব্ধি করেছে। এখানকার যাতায়াতের সুবিধা অসীম।

সহরের ভিতরকার পথ মাঠের ভিতরকার পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কোথাও বা পথের পাশেই মার্কেট-স্কয়ার ;·· ছোট্ট একটি মনুমেণ্ট, স্যাক্সন্, ট্যুডর বা এলিজাবেথান যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পথের দুই পাশে ঘর, বিশেষতঃ দোকানঘর। এই সব গেঁয়ো দোকানপাট আর লণ্ডনের দোকান-পাটে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এ পার্থক্য শুধু দৃশ্যে নয়, লোকেদের মধ্যেও, তাদের ব্যবহারে, তাদের কথাবার্ত্তায়, তাদের চালচলনে, তাদের অন্তর্নিহিত ভাবে।

কিন্তু লণ্ডনে বসে এসব কথা মনে আসে না। সেখানে অর্থনীতি, রাজনীতি আর মানুষের সৃষ্টি যত সব নীতিহীন নীতি—তারই প্রাধান্য। প্রকৃতির আনন্দ উপভোগের অবকাশ সেখানে কারুরই নেই। সে-ঘূর্ণীপাকে মানুষ স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। কিন্তু তবু মনে হয়, তারও একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে। সেই আনন্দের পরিচয় এখানে না এলে বোঝা কঠিন। এখানকার খবরের কাগজের কয়েকটি কাটিং পাঠাই—সেগুলো থেকে কিছু বুঝতে পারেন।

য়ুরোপে আজকাল 'ডিক্‌টেটরশিপে'র হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইছে। সে হাওয়ার চোট খানিকটা পার্লামেণ্টের এই মাতৃমন্দির ইংলণ্ডেও এসে পড়েছে। স্যার অস্‌ওয়াল্‌ড্ মোস্‌লে এ দেশের মুসোলিনি হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে কালো-কামিজ (black shirt) মুভ্‌মেণ্ট চালাতে আরম্ভ করেছেন। মাসখানেক আগে, এখানকার এ্যালবার্ট হলে এক বিরাট সভায় তিনি ফ্যাসিজমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন ; তাঁর ওজস্বিনী ভাষা, হিট্‌লারের মত বক্তৃতার আদব-কায়দা বহু যুবক-যুবতীকে তাঁর দলভুক্ত করতে সাহায্য করেছে। তবে এদেশের পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট চূর্ণ করে ডিক্‌টেটরশিপ কখনো যে ক্ষমতাশালী হতে পারবে এ আশঙ্কা আজ পর্য্যন্ত কেউই করে না। অন্যত্র ডিক্‌টেটরশিপ-এর প্রভাব কি ভাবে বাড়ছে সে সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আপনারা পান। কিন্তু সমস্ত পান না। গাজি মুস্তাফা কামাল পাশা এক অভূতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর উইল তৈরী করেছেন—ভারতবর্ষের কোন কাগজে বোধ করি তার উল্লেখ পান নি। তাঁর উইলের মর্ম্ম :—

> Ghazi Mustapha Kemal Pasha, first President of the Turkish Republic, has made his will, embodying his last instructions to his people.
>
> They are :—
>
> Steer clear of monarchy, Communism, foreign loans and foreign entanglements.
>
> Keep the army and navy at full strength.
>
> Never accept a military president and maintain civilian power supreme in Government.
>
> Work for the formation of a Balkan federation of peoples from the same Central Asian cradle.
>
> Reform their religion.
>
> Destroy every statue and memorial to his memory if ever Istanbul again becomes the capital of Turkey.
>
> (*Sunday Express.* May 20, 1934)

বুলগেরিয়া : রাজা বরিস ও তাঁহার রাজ্ঞী।

বুলগেরিয়ায় গত ১৯শে মে তারিখে যে-ঘটনা ঘটেছে আপনারা এর পরে সংবাদপত্রে তা জানবেন। এখানকার কাগজ থেকে তার দুএকখানা ছবি পাঠালাম।

বর্ত্তমানে এখানে রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ সমস্যার বিষয় যুদ্ধ-ঋণ, war debts. চান্সেলর চেম্বারলেন (Chancellor of the Exchequer, Mr. Neville Chamberlain) বাজেটে উদ্বৃত্ত (Surplus) দেখিয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। ফলে আমেরিকা সুর তুলেছে, "তোমরা অত টাকা উদ্বৃত্ত করেছ, তবে কেন আমাদের যে যুদ্ধ-ঋণ তা শোধ দেবে না ?" আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকার এই সুরের পেছনে যুক্তি আছে বলেই মনে হয়। তবে এরা বলছে, তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, বাজেটের এই উদ্বৃত্তের মূলে অনেক প্রয়োজনীয় খরচার কমতি করা হয়েছে। একটা পত্রিকার উদ্ধৃতাংশ দেখুন—

> Though a portion of the estimated surplus is to be devoted to reduction of Income Tax, that

Tax still remains at the cruelly high figure of 4s. 6d. in the £, with a still surtax on very large incomes — a much higher rate of Taxation than the Americans have to bear. The recent surplus in the British Budget is not in fact a matter which affects the problem of war debts" (per Harold Cox, in the *Sunday Times*, May 20, 1934.)

Great Britain's War Debt to U. S. A.
was...£920,000,000
We have since paid ... £293,200,000
Last year we paid two "token payments"... { £2,000,000 / £1,500,000
The amount still owing, including interest,
is £877,600,000

সোফিয়ার রাজপ্রাসাদ : গত ১৯শে মে এই প্রাসাদ সৈনিকদল অবরোধ করে—তাহাদের মধ্যে সেনাধ্যক্ষও অনেকে ছিলেন। তাঁহারা রাজা বরিসকে বুলগেরিয়ায় ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার্থে অনুরোধ জানান [ছবিখানি সাণ্ডে টাইম্‌স্ (২০শে মে) হইতে গৃহীত]

তারপর আইরিশ-ফ্রি ষ্টেট এবং ডি ভ্যালেরা। এ ভদ্রলোক অতি স্পষ্টবাদী, ইনি কি চান তা ইনি স্পষ্ট জানেন এবং যেভাবে হোক্ ইনি যা চান তা পাবার জন্য প্রাণপণে লেগে আছেন। ২৮শে মে তারিখের 'টাইম্‌স্' থেকে ডি ভ্যালেরার একটি বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করলাম—

Mr. De Valera wound up the debate with a remarkable speech. The British, he said, were always irritated because *the Irish would not submit to the system of Government given* to them, and thought that the Irish should be delighted to be united with Britain. His reply was, supposing *Germany had won the Great War and had annexed Britain to the German Empire, what would the British people have said.*

That in effect was what had happened to Ireland. Ireland had not yet independence. If she had, why was Cobh (Queenstown) being held, and why were the British maintaining parties of troops on Irish soil? Was it with the will of the Irish people that the six counties were cut off from the rest of the island? It was quite true that they were free to a very large extent. But there were certain things that they would not have if they were really free. If South Africa was satisfied with its status, that was the South African people's own affair. Ireland was a nation before South Africa was thought of. It was as old as the British nation.

He had been asked why he did not declare a republic. It was because when they declared it, they wanted their declaration to be effective: they did not want a debacle as they had in 1921. Their policy was that they were heirs to a certain position. Certain possibilities had been indicated in that position, and they were going to explore those possibilities to the very utmost in order to get the maximum amount of freedom out of it when they came to the end of their limit. They would ask themselves how long must the limit be borne. They had been quite frank about it to their own people and to the people across the water.

They regarded the whole position as a forced position, and they were animated by the same desire in their work as the Biritish would be if they had been conquered by the Germans. They had the right to be absolutely free, they had the right to determine their own Governmental institutions without any attempt from outside to tell them what they must have.

If they wanted a republic, they were entitled to have one. The majority of the people wanted a republic, but they had not got it. Why? The answer was that there were threats that were effective to-day. Let those threats be withdrawn and they would see how long they would be without a rebublic.

বর্ত্তমানে পত্রিকাগুলিতে আর একটি সংবাদ খুব পাওয়া যাচ্ছে—নিউজী-ল্যাণ্ডের উনিশ বছরের তরুণী জিন ব্যাটেনের অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে যাওয়া। ইনি শ্রীমতী অ্যামি মলিসনের রেকর্ড ভেঙেছেন। ২৪শে মে
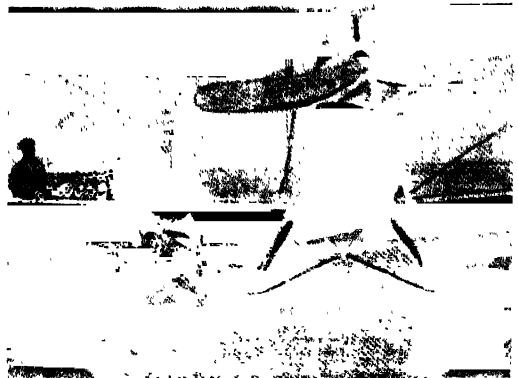
সাইপ্রাস দ্বীপের নিকোসিয়াতে তোলা এরোপ্লেনে অষ্ট্রেলিয়া-অভিমুখিনী জিন ব্যাটেন। [টাইম্‌স্ (২৪শে মে) হইতে গৃহীত]

তারিখের 'টাইম্‌স্' থেকে এঁর একটা ছবি পাঠালাম। মলিসন ১৯ দিনে যা সাঙ্গ করে সকলের বিস্ময়স্থল হয়েছিলেন, ব্যাটেন ১৫ দিনে তাই সাঙ্গ করেছেন। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজক

বুদ্ধ-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

উপসংহার

অনুমান ৪৮৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণের পর অল্পদিনের মধ্যেই ভিক্ষুরা মিলিত হইয়া তথাগতের বাণীসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। বাণীসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মহাকাশ্যপ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয়, ধর্ম্ম ও বিনয় সম্বন্ধে তখনই সংঘের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা ধর্ম্ম ও বিনয় তাহা গৃহীত না হইয়া যাহা ধর্ম্ম ও বিনয় নহে তাহা গ্রহণ ও পালনের সম্ভাবনা আছে এরূপ ভয়ের কারণ ছিল।

স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে এই জন্য যথারীতি জ্ঞপ্তিদ্বারা স্থবিরভিক্ষুদের অনেকে (শাস্ত্রে আছে পাঁচশত, বৌদ্ধেরা প্রায়ই 'অনেকে' বলিতে হইলে 'পাঁচশত' বলিতেন) নির্ব্বাচিত হইলেন। আনন্দকে প্রথমে নির্ব্বাচন করা হয় নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বুদ্ধের কাছে থাকিতেন বলিয়া সঠিক খবর দিতে পারিবেন, এই জন্য শেষে তাঁহাকেও নির্ব্বাচন করা হয়। স্থবিরেরা রাজগৃহে বর্ষাবাস করিয়া ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিবেন স্থির করিলেন। এই জন্য অন্য ভিক্ষুদের সে বর্ষা রাজগৃহে যাপন নিষিদ্ধ হইল, কারণ অত্যধিক লোক হইলে গৃহীদের ভিক্ষাদানে অসুবিধা হইবে। স্থবিরেরা বর্ষার প্রথম মাস সংস্কারকার্য্যে কাটাইয়া দ্বিতীয়মাস হইতে সংসদের কার্য্য(সংগীতি) আরম্ভ করিলেন। সংসদের অনুমতিক্রমে মহাকাশ্যপ ভিক্ষু উপালিকে এক এক করিয়া বিনয়ের নিয়মগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কোথায়, কি উপলক্ষে কোন্ নিয়ম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন উপালি তাহা সংসদকে জানাইলেন। তারপর এই ভাবে মহাকাশ্যপ আনন্দকে বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশগুলির কথা এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোথায় কি উপলক্ষে বুদ্ধ কোন্ উপদেশ দিয়াছিলেন আনন্দ তাহা সংসদকে জানাইলেন।

তারপর আনন্দ সংসদকে বলিলেন যে, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, সংঘ ইচ্ছা করিলে তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েকটি নিয়ম প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এই নিয়মগুলি কি কি সে সম্বন্ধে আনন্দ কি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?—স্থবিরের এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ বলিলেন, তিনি তাহা করেন নাই; তখন কোন্ কোন্ নিয়ম সম্বন্ধে বুদ্ধ সম্ভবতঃ এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা লইয়া স্থবিরদের মধ্যে তর্ক ও মতভেদ হইল। অবশেষে মহাকাশ্যপ বলিলেন যে, ভিক্ষুদের অনেক বিনয়নিয়মে গৃহীরাও সম্পৃক্ত আছেন, ভিক্ষুরা যদি এমন কোন বিনয়নিয়মের পরিবর্ত্তন করেন, যাহা গৃহীদের অনভিপ্রেত, তবে গৃহীরা ভিক্ষুদের শৈথিল্যের নিন্দা করিবে, অতএব যে নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল বটে, কিন্তু স্থবিরেরা নিরীহ আনন্দের উপর ঝাল ঝাড়িলেন, "আয়ুষ্মন্ আনন্দ, এ বিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি ভাল কর নাই; তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, আমি অনবধানতাবশতঃ ভগবানকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষ স্বীকার করিতেছি।"

"আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তুমি যে ভগবানের বর্ষাচীবর সেলাই করিবার সময় তাহা মাড়াইয়া ছিলে, তাহাও তোমার করা ভাল হয় নাই; তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, ভগবানের প্রতি ভক্তির কোন অভাববশতঃ যে আমি তাহা করিয়াছিলাম তাহা নয়; ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।"

"আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তুমি যে প্রথমে স্ত্রীলোকদিগকে ভগবানের দেহ বন্দনা করিতে দিয়াছিলে (এ কথা মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে নাই) তাহাও তোমার করা ভাল হয় নাই; তাহাদের ক্রন্দনে ভগবানের দেহ অশ্রুকলুষিত হইয়াছিল। তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, স্ত্রীলোকদের যাহাতে দেরি হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে আমি তাহা করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।"

তারপর বুদ্ধ যে ইচ্ছা করিলে বহুকাল বাঁচিতে পারেন, তিনি বহুবার এরূপ ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও আনন্দ যে তাঁহাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন নাই, এ জন্য আনন্দকে অপরাধী করা হইল। আনন্দ দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন, মারের দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহার এই ত্রুটি হইয়াছিল। স্থবিররা আবার বলিলেন, "আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তথাগতপ্রবেদিত ধর্ম্মবিনয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রব্রজ্যা গ্রহণে তুমি যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলে তাহাও তোমার ভাল হয় নাই; তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, আমি তাহা করিয়াছিলাম, ভগবানের মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর কথা ভাবিয়া; যিনি ভগবানকে লালন পালন ও দুগ্ধদান করিয়াছিলেন, যিনি ভগবানের প্রসবিত্রীর মৃত্যুর পর ভগবানকে স্বয়ং মাতার ন্যায় স্তন্যদান করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতেছি না; তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষ স্বীকার করিতেছি।"

অবশেষে ছন্দককে গুরুতর শাস্তিদানের সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন আনন্দ তাহা সংসদকে জানাইলেন ও সংসদ তাহাকে নির্দ্দেশপালনের অনুমতি দিলেন। এই সংসদের ব্যবস্থিত ধর্ম্মবিনয় বোধ হয় সংঘের সকলে স্বীকার করিয়া লন নাই, কারণ দক্ষিণাগিরি হইতে আগত ভিক্ষু পুরাণকে স্থবিররা ইহা গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্থবিররা ভালই করিয়াছেন কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধের কাছে যেরূপ জানিয়াছেন ও যেরূপ শুনিয়াছেন সেই রূপই পালন করিবেন। এই প্রথম সংসদকে পণ্ডিতেরা অনেকে অনৈতিহাসিক বলিয়াছেন; বোধ হয় ইহা কয়েকজন মাত্র স্থবিরকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। রাজগৃহের বৈভারগিরিতে সপ্তপর্ণী (সত্তপণ্ণি) গুহার কাছে এই সংগীতির অধিবেশন হয়।

মহানির্ব্বাণের প্রায় একশত বৎসর পরে অনুমান ৩৮৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বিনয়ের নিয়ম পর্য্যালোচনার জন্য বৈশালীতে দ্বিতীয় সংসদের অধিবেশন হয়। ইহার কারণ এইরূপ ঘটিয়াছিল যে, বৈশালীর বজ্জিবংশীয় ভিক্ষুরা কয়েকটি অশাস্ত্রীয় নিয়মের প্রচলন করিয়াছিলেন, যথা, শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে লবণ সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিবে, দ্বিপ্রহর অতীত হইবার পরও মধ্যাহ্নভোজন করা যাইতে পারিবে, মধ্যাহ্নভোজনের পরও দধিসেবন করা যাইতে পারিবে, স্বর্ণরৌপ্যদান গ্রহণ করা যাইতে পারিবে, ইত্যাদি। কাকণ্ডকপুত্র ভিক্ষু যশ বজ্জিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে আসিয়া মহাবনে কূঠাগারশালায় উঠিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এখানে ভিক্ষুরা গৃহী-উপাসকদের অর্থদান করিতে বলিতেছেন এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও গৃহীরা অর্থদান করিতেছেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে অর্থের ভাগ দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ভিক্ষুরা ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, যশের জন্য গৃহীরা ভিক্ষুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবেন এবং তাঁহারা স্থির করিলেন যে, যশকে ক্ষমাপ্রার্থনা (পটিসারনিয়কম্ম) করিতে হইবে। যশ নগরে গিয়া গৃহীদের কাছে সব কথা বলিলেন ও বুদ্ধের বচন ও ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভিক্ষুদের অর্থদানগ্রহণ অনুচিত। ইহাতে গৃহীরা ঘোষণা করিলেন যে, একমাত্র যশই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ, অন্য ভিক্ষুরা নহে; তাঁহারা যশকেই ভিক্ষা দিবেন, অন্যদের দিবেন না। বজ্জিভিক্ষুরা ইহাতে অপ্রসন্ন হইয়া যশকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত (উক্খেপনিয়-কম্ম) করিলেন, কিন্তু যশ প্রধান স্থবিরদের কাছে গিয়া এই বিনয়-ভঙ্গের বিচার করিতে বলিলেন। স্থবিররা যশকে রেবত নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও শীলবান ভিক্ষুর কাছে পাঠাইলেন এবং রেবত যশের সঙ্গে একমত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া বজ্জিভিক্ষুরাও রেবতের

কাছে আসিলেন। অনেক গোলযোগের পর সংসদের অধিবেশন হইল ও তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু সব্বকামী (ইনি আনন্দের শিষ্য ছিলেন) বজ্জিভিক্ষুদের আচারকে বিনয়বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ২৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সংসদের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্ম ও বিনয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করা হয়। সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চতুর্থ সংসদের অধিবেশন হয়। অশোক ও কনিষ্কের মধ্যবর্ত্তী যুগে মহাযান মতের উদ্ভব হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রথম হইতেই সংঘে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল। কালক্রমে ছোট হইতে বড় বিষয়ে মতদ্বৈধ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অবশেষে সংঘ "হীনযান" ও "মহাযান" এই দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িল। মহাযানের উদ্ভব ও প্রসার সম্বন্ধে এত কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় যে, সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে। ইহা বর্ত্তমান রচনার বিষয়বহির্ভূত। মহাযানিকেরা বুদ্ধের প্রাচীন নির্ব্বাণের আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই, সেই আদর্শের প্রসারণ ও পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে; শুধু নিজের জন্য নির্ব্বাণ লাভ করিলেই হইবে না, অপরের মঙ্গলের জন্য ও বহু লোকের কাছে প্রচারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে বুদ্ধত্বলাভও করিতে হইবে। এই আদর্শ যিনি অনুসরণ করেন তাঁহাকে মহাযানিকেরা "বোধিসত্ত্ব" বলিলেন। নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য, স্বর্গলাভের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে কোন একজনের বা একাধিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, একথাও প্রচলিত হইল। বোধিসত্ত্ববাদের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মে পূজা ও ভক্তিবাদ প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে বহু দেবদেবীও মহাযানে গৃহীত ও পূজিত হইতে লাগিলেন; সাধারণ লোকের কাছে নির্ব্বাণবাদ যেরূপ শুষ্ক বোধ হইত, তাহার তুলনায় বোধিসত্ত্ববাদ অনেক চমৎকার ও বোধগম্য মনে হইল।

মহাযানবাদের দার্শনিক চিন্তায় অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযানবাদের অনেক উন্নতিসাধন করেন ও শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক মতের সৃষ্টিদান করেন; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পণ্ডিত বসুবন্ধু যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের প্রবর্ত্তন করেন। শূন্যবাদের অর্থ সহজেই অনুমেয়; বিজ্ঞানবাদে চৈতন্য (বিজ্ঞান) ছাড়া অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে ইহা অস্বীকৃত হইত।

যে ধর্ম্মের দেশবিদেশে এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, এবং যাহার প্রভাবে ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনা দূর দূর দেশে বিস্তৃত হইয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের সভ্যতার আলোক দান করিল ও সভ্যজাতিদের সমাজে নবপ্রাণ সঞ্চার করিল, সে ধর্ম্ম জন্মভূমি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল কেন, অনেক ঐতিহাসিক তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হিন্দুরাজাদের অত্যাচারে বা শক্তিশালী ব্রাহ্মণদের নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশত্যাগী হইয়া গেল বা সমূলে উৎপাটিত হইল কি না, এ বিতণ্ডার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ অধিকাংশ আলোচকরা এ মত ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসলে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হয় নাই, কাল ও স্বভাববশে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

এই বিনাশের কয়েকটি কারণ দেখাইতে পারা যায়। "বয়ধম্মা সংখারা" অর্থাৎ "সকল উৎপত্তিশীল বস্তুই বিনাশশীল" এই যে তত্ত্ব বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের নিয়ত বুঝাইতেন, এ কথা ধর্ম্মসম্বন্ধেও খুব খাটে। হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম্মই ব্যক্তিবিশেষ-প্রবর্ত্তিত। দশের চিন্তা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলের সমষ্টিকরণ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মেরুদণ্ড ছিল। যতদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন এই বৃত্তির বলে সনাতন ধর্ম্ম যথাকাল অনুযায়ী পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছিল। বুদ্ধদেব যত বড়ই হউন না কেন তিনি বিনাশশীল মানুষ ছিলেন। সব মহাপুরুষদের বাণীরই দুইটি দিক থাকে—একটি কতকগুলি অক্ষয় সত্য উচ্চারণের দিক, আর একটি স্বীয় দেশকালের কতকগুলি প্রয়োজন সাধনের দিক। দুইটি দিকই পরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এক যুগে যাহা অক্ষয় সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, আর এক যুগে মহাসত্য বলিয়া মানিলেও একেবারে পূরাপুরি অক্ষয় বলিয়া আর তাহা গ্রাহ্য হয় না। দ্বিতীয় দিকটি আরও বেশী চঞ্চলস্বভাব—দেশ কালের প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়া গেলে তাহা ত্বরায় পরিত্যক্ত হয়। ঘোড়ার

গাড়ীর ব্যবহার যেখানে যেখানে প্রচলিত আছে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় ঘোড়া ঘোড়াই থাকে কিন্তু গাড়ীর রকমটা প্রায়ই বদলায়। আবার গাড়ীর রকমটা বদলাইলে ঘোড়ারও সংখ্যা বা তেজও বাড়াইতে কমাইতে হয়। কাল-ক্রমে ঘোড়ার জায়গায় ইঞ্জিন ও গাড়ীর জায়গায় 'বডি' বসাইয়া বড়লোকে মোটরকার ও গরীবলোকে মোটরবাস্ চড়ে, ঘোড়াগাড়ী একেবারেই সেকেলে হইয়া যায়। সেইরূপ সহস্রাধিক বৎসর দেশকালের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যদের প্রভাব স্বভাববশে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কয়েকটি যোগাযোগে এই বিলুপ্তির আনুকূল্য হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তিনি বেদ মানেন নাই, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন, এবং জাতি-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, নরদেবত্ব প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। যে দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী ধর্ম্ম সমাজের মজ্জা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই বিরুদ্ধাচারীকে বাস্তুছাড়া হইতে হয়। যীশু ইহুদী ধর্ম্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া ইহুদিদের চক্রান্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং খৃষ্টানধর্ম্ম সারা পশ্চিম পৃথিবীতে গৃহীত হইলেও ইহুদি-দের কাছে ত্যাজ্যই রহিয়া গেল। সনাতন ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতে যাহা ইচ্ছা তাহা করা গিয়াছে কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিয়া কেহ রক্ষা পায় নাই—এমন কি, যে আবর্জ্জনা ত্যাগ করিয়া শুধু কেবলমাত্র সারকেই স্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। মহাবীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মত অতটা প্রকাশ্য শত্রুতা না না করিলেও, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বেদবিদ্রোহের ভাব থাকার ফলে জৈনধর্ম্ম এখন জন্মক্ষেত্র মগধ ছাড়িয়া সরিতে সরিতে ভারতের পশ্চিম সাগরকূলে গুজরাট কাঠিয়াবাড়ে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে আপোষ করিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। যে সব বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদ হিন্দুসমাজের আশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে সাংখ্যদর্শনের মত বেদবিরোধী দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সাংখ্য বিদূরিত না হইয়া যে প্রতিপালিত হইল ইহার প্রধান কারণ সাংখ্যের চমৎকার চাতুরী। "সাংখ্য-সূত্রে"র সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে, সূত্রকার যেখানে বৈদিকধর্ম্মের সঙ্গে মতের মিল হইয়াছে, সেখানে শ্রুতির কেমন বাহবা দিয়াছেন, বশ্যতাস্বীকার করিয়াছেন এবং যেখানে বৈদিক মতের সঙ্গে মিল হয় নাই, সেখানে কেমন কৌশলে অল্প কথায় পাশ কাটাইয়া অতি মৃদু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বিরুদ্ধবাদ উপ-স্থাপিত করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রকারের এই কৌশলনীতি এমনই সূক্ষ্ম যে, একটি ঘোরতর অবৈদিক নিরীশ্বরবাদ যে সমাজে চলিয়া গেল ব্রাহ্মণেরা তাহা টেরই পাইলেন না। বোধ হয়, বেদবিরোধী বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অভিজ্ঞতা হইতে সাংখ্যসূত্রকার এই নীতি অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। যাহা হউক, সনাতন গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচার করায় বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের সহায়তা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে মানেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার "ধর্ম্মে"র যাহা আদর্শ, তাহাতে যাহা কিছু সুন্দর ও মহান ছিল তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। "নিব্বানে"র শান্ত সুন্দর অপাপবিদ্ধ আদর্শ আমাদের ব্রহ্মধারণায় আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বুদ্ধের লোকসেবা, লোকহিত, সুকর্ম্ম-চর্য্যা প্রভৃতির শিক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের আদর্শের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। "ধর্ম্ম" কথাটা সংস্কৃত হইলেও ইহাতে আমরা এখন যাহা বুঝি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুঝাইতে যে এই শব্দ ব্যবহার করি তাহা বুদ্ধের "ধর্ম্মে"রই প্রভাবে। কর্ম্মবাদ ও সর্ব্বজীবে অহিংসা এই যে দুইটি বিশাল স্রোতস্বিনী ভারতের দার্শনিক ও ধার্ম্মিক চিন্তাক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়াছে ইহার জন্য আমরা বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে ঋণী।

বুদ্ধদেবের বা তাঁহার শিষ্যদের প্রচারিত ধর্ম্মে ধ্বংসের কয়েকটি বীজ লুক্কায়িত ছিল। বুদ্ধপর কালের সমৃদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কতকগুলি ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা বুদ্ধদেব নিজে বলিয়া থাকুন বা না থাকুন, বৌদ্ধধর্ম্মকে বিনাশের পথে লইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সংসারত্যাগী সংসার-বিদ্বেষী "বিহার" ও "সঙ্ঘারাম"বাসী সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়া-ছিল। বুদ্ধ মহাবীরের সময়েও ব্রাহ্মণ্যসমাজে সন্ন্যাসী ছিল; কিন্তু গৃহাশ্রমে লোকে ভোগে উন্মত্ত থাকিত ধর্ম্মের কথা ভাবিত না, ধর্ম্মাচরণকে বার্দ্ধক্যাবস্থার জন্য রাখিয়া দিত—এই রকম একটা ভাব দেখিতে পাই। বৌদ্ধ জৈনরা ইহার প্রতিবাদে বলিলেন যে, ধর্ম্মাচরণ শুধু ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধের

জন্য নয়, সমাজের সকলেরই সকল অবস্থায় ইহার প্রয়োজন। যৌবনের ভোগোন্মাদের প্রতিক্রিয়ারূপে যৌবনেই "গৃহ ছাড়িয়া গৃহহীনের প্রব্রজ্যা" গ্রহণ আরম্ভ হইল, আবালবৃদ্ধ এমন কি বনিতারাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইল। হিন্দু সমাজ সন্ন্যাসীকে অনেক সম্মান করে ও ভক্তি করে, কিন্তু গৃহাশ্রমকেই সমাজের কেন্দ্র বলিয়া সন্ন্যাসীর জ্ঞানে এই আশ্রমকে শুদ্ধ-সংস্কৃত করে। হিন্দু সন্ন্যাসীরা সংসার হইতে দূরে থাকিতেন। বৌদ্ধেরা কিন্তু সহরের মাঝখানে বড় বড় সঙ্ঘারাম বানাইয়া নিজেদের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইলেন। সংসারের কোন বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা থাকিতেন না, সংসারের সুখদুঃখের খবর রাখিতেন না। সংসারের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল শুধু ভিক্ষাগ্রহণের। গৃহাশ্রমের এই অবমাননায় সন্ন্যাসীদের নিজেদের অস্বাভাবিক জীবনের শক্তি কমিয়া গেল, টবের গাছের মত জননী বসুন্ধরার সঙ্গে বিচ্ছিন্নযোগ হইয়া, কিছুদিন ফুল ফুটাইয়া এ গাছ মরিয়া গেল। আবার বৌদ্ধধর্ম্মে অনিত্যবাদ, দুঃখবাদ ও অনাত্মবাদ সবচেয়ে প্রধান ও গোড়ার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগতে সবই অনিত্য, সবই দুঃখময়, আত্মা ও ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই, নির্ব্বাণ মানে দেহমনের নিরবশেষ বিনাশ ও বিলোপ, এই শিক্ষায় মানুষের তৃপ্তি হয় না। বেদান্তের নিত্যসুখময় ব্রহ্মাত্মার চিন্তায় প্রত্যক্ষ জগৎ মায়াপ্রপঞ্চ হইলেও মানব একটা আশার কথা শান্তির কথা পাইয়াছিল। কিন্তু "অভিধর্ম্মে"র গুরুভারপ্রপীড়িত সঙ্ঘারামবাসী বৌদ্ধেরা দুঃখময় অনিত্য সংসার হইতে নিষ্কৃতির উপায় স্বরূপে যে নির্ব্বাণের নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাতে তাপক্লিষ্ট মানুষের প্রাণ আরও দমিয়া গেল। চিকিৎসক যদি রোগীকে দূষিত বদ্ধ বায়ু বদলাইয়া সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ে চেঞ্জে যাইবার পরামর্শ না দিয়া, বীর্য্যবান ঔষধ ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া, আরোগ্যলাভের ভরসা না দিয়া, কেবল বলেন যে, যেখানেই যাও, যাই খাও, এ রোগ সারার নয়, যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ভুগিতেই হইবে, যদি ভাল থাকিতে চাও তবে প্রাণের মায়া ছাড়, তবে রোগী যে সে চিকিৎসককে ত্যাগ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

পাশ্চাত্য সমালোচকরা আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও দর্শন চিন্তাকে দুঃখবাদী (পেসিমিস্‌টিক্) আখ্যা দিয়াছেন। আমরা সংসারের সুখের দিকটা দেখি না দুঃখের দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়া সংসারকে দুঃখময়, মানবজীবনকে দুঃখময় ভাবি এই কথা বলিয়াছেন। একথা অংশতঃ সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে।

ধর্ম্ম মাত্রকেই কিছু পরিমাণে দুঃখবাদী হইতে হয়। ধর্ম্মের কাজই হইতেছে জীবনকে পূর্ণতর, সত্যতর ও বৃহত্তর আদর্শের দিকে লইয়া যাওয়া। পূর্ণতা, সত্য ও বৃহতের প্রতি যার দৃষ্টি, অপূর্ণতা, মিথ্যা ও ক্ষুদ্রতা যে তাহাকে বেদনা দিবে ইহা স্বাভাবিক। আদর্শের পূর্ণতা যে চায় বাস্তব তো তাহার কাছে অপূর্ণ ঠেকিবেই। পাশ্চাত্য সমালোচকরা বলিয়াছেন, নিদারুণ গ্রীষ্মে, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে, মহামারীতে ভুগিয়া ভুগিয়া আমরা শক্তিহীন ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, প্রবল প্রকৃতির প্রকোপের প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদে আসিয়া ঠেকিয়াছি। ঐহিকপ্রধান পাশ্চাত্য জাতির কাছে বাহ্য প্রকৃতিটাই সবচেয়ে বড় কথা, বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামই তাহাদের সভ্যতার ইতিহাস এবং এই সংগ্রামে জয়ী হওয়াটাই তাহাদের কাছে চরম মনুষ্যত্ব। আমাদের দেশের সাধনায় কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিই সবচেয়ে বেশী ভাবিবার বিষয়। মানুষের মনই তাহার সুখ দুঃখের মূল। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া—সব জিনিষের আদিতে মন, মনই সকলের শ্রেষ্ঠ, জগৎ মনেরই সৃষ্টি।"

সংসারে যে দুঃখ আছে একথা কে অস্বীকার করিবে? জরাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই আরামে থাকে না, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি খুবই কষ্ট পায়, মৃত্যুতে কাহারও নিজের ইচ্ছা হয় না ও সকলেরই পরিজনবর্গের দুঃখ হয়—এসব তো সর্ব্বদাই যে কেহ দেখিতে পারে। কাজেই বুদ্ধ যখন বলিয়াছিলেন, "জরায় দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ" তখন তিনি অন্যায় কি বলিয়াছিলেন? "প্রিয়ের সহিত বিয়োগে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে দুঃখ" একথা কি অসত্য? স্বাধিকারপ্রমত্ত পাশ্চাত্য সমাজের লোকে একজনের দুঃখে আর একজন ভাবে না, যাহার দুঃখ তাহাকেই ভোগ করিতে হয়, দুঃখকে ইহারা গোপন রাখিতেই ভালবাসে। কিন্তু সমাজের সকলের সুখ-দুঃখের যে হিসাব রাখে সে দুঃখকে বাদ দিতে পারে না। যে ধনী সহরে বাস করে, সিমলা মুসুরিতে হাওয়া খাইতে যায় সে

হয়ত ভাবিতে পারে দেশে রোগ নাই। কিন্তু যে গ্রামে যাওয়া যাক সেখানেই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর দেখিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের লোকে যদি বলেন, বাংলাদেশে শতকরা নিরানব্বই জন লোক ম্যালেরিয়া কালাজরে ভোগে, তবে স্বাস্থ্যবিভাগকে রোগবাদী বলিব না সত্যবাদী বলিব? আর বাংলাদেশের যদি এই অবস্থা তবে বাংলাদেশকে রোগময় বলা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বুদ্ধও এই দৃষ্টিতে সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছিলেন। তিনি সংসারকে উপেক্ষা করেন নাই। "ইধমোদতি, পেচ্চ মোদতি, কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি,—ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই কৃতপুণ্য ব্যক্তি আনন্দ পায়," এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন তিনি ইহসংসারে আনন্দকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলা যায় না। বুদ্ধের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের অর্থ সংসার হইতে পলাইয়া যাওয়া ছিল না, তিনি "তেবিজ্জসুত্তে" বলিয়াছেন, মিথ্যা আনন্দের পিছনে ছুটিয়া দুঃখ পাইও না, নির্ব্বাণের পূর্ণতর আনন্দময় জীবন এই সংসারেই লাভ কর। কিন্তু আনন্দ বলিতে প্রাত্যহিক জীবনের ভোগ-কামনার পশ্চাতে ধাবমান সংসারের লোক যাহাকে আনন্দ বলে তিনি তাহা বুঝিতেন না। তিনি এই বাস্তব সংসারকে অশেষ দোষদুষ্ট দেখিয়া ইহার পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধ বলিতেন, মূর্খ সঙ্গী পাওয়ার চেয়ে একা থাকা ভাল কিন্তু একা থাকার চেয়ে ভাল সঙ্গী পাওয়া ভাল, বাজে কথা বলার চেয়ে চুপ করিয়া থাকা ভাল কিন্তু চুপ করিয়া থাকার চেয়ে ভাল কথা বলা ভাল। কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্টভোগের তিনি বহু নিন্দা করিয়াছেন। সংসারকে তিনি দুঃখময় দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু দুঃখেই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি একথা বলেন নাই। সুখ ও আনন্দই আমাদের কাম্য ও প্রাপ্য—ইহাই তিনি বলিতেন। সংসারের তুচ্ছ, বিনাশশীল, আদ্যন্তবান সুখ ছাড়িয়া নির্ব্বাণের অক্ষয় সুখই তিনি পাইবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন—"মর্ত্ত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিপুল সুখ দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিপুল সুখ দেখিয়া মর্ত্ত্যসুখ ত্যাগ করা উচিত।"

মত্তাসুখপরিচ্চাগা পস্সে চে বিপুলং সুখং
চজে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলং সুখং।

গীতাও এই "অন্তঃসুখ ও অন্তরারামে"র, এই "ব্রাহ্মী স্থিতি"র, এবং এই "আত্যন্তিক সুখে"র কথা বলিয়াছেন যে, "যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভ ইহার চেয়ে বড় বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরুদুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না।"—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

এই কথাগুলি স্মরণ করিলে মনে হয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচিন্তাকে দুঃখবাদী না বলিয়া দুঃখদ্বেষী, তুচ্ছ সুখত্যাগী পরম আনন্দবাদী বলাই উচিত। দুঃখ আমরা দেখিয়াছি বটে, তাহার করালমূর্ত্তি স্বীকারও করিয়াছি, কিন্তু আমাদের বুদ্ধদেব, আমাদের উপনিষদ গীতা দুঃখের কাছে পরাভব স্বীকার করেন নাই, দুঃখের উপরে অনন্ত সুখের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন ও এই সুখপ্রাপ্তির পথও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকটি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—ইভান বুনিন
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

মেঘে বৃষ্টিতে কাপ্রি দ্বীপও সেদিন অন্ধকার, কিন্তু ষ্টীমার আসবার সময় সর্ব্বত্র আলো জ্বালার দরুণ উপস্থিত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পাহাড়ের মাথায় ষ্টেসনের ধারে এই ভদ্রলোকেরই জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আরও অনেকে ট্রেণ থেকে নেমেছে, কিন্তু তারা কেউ উল্লেখযোগ্য নয়; কয়েক জন রুষীয়, তারা কাপ্রিতেই বাস করে, অতি সাধারণ বেশভূষা ও অন্যমনস্ক হাবভাব; আর কয়েকজন লম্বা-লম্বা জার্ম্মান যুবক, পিঠে মোট বাঁধা, কারো সাহায্যও চায় না, সিকি পয়সা খরচও করে না; সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সকলে তাঁকে দেখেই চিনে নিলে। তাড়াতাড়ি তারা মেয়েদের নাবিয়ে নিলে, তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাঁরা পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চললেন. নিষ্কর্ম্মা ছোকরার দল তাঁদের পিছু নিলে, বলিষ্ঠ কুলীরমণীরা তাঁদের মোট মাথায় নিয়ে আগে আগে চলল, বড় বড় ইলেকট্রিক আলোর নীচে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম থিয়েটারের ষ্টেজের মত দেখাচ্ছিল, কুলীরমণীদের কাঠের পাদুকা তাতে খট্ খট্ করে বাজছিল। ছোকরার দল সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকের চারিদিকে শীষ দিয়ে ডিগ্‌বাজি দেখাচ্ছিল, তিনি এসব ভ্রুক্ষেপ না করে, ষ্টেজের অভিনেতার মত দৃপ্ত চালে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলেন, পথের তোরণদ্বার পার হয়ে এবং নানা রকমের বাড়ীঘর, গলি পার হয়ে শেষে আলোকোজ্জ্বল হোটেলের দ্বারে এসে পৌঁছুলেন।...এখানে এসেই মনে হল এঁদের অভ্যর্থনার জন্যই বুঝি এই ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, হোটেলের অধিকারী যেন এঁদের পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং প্রকাণ্ড চীনা ঘড়িটা বুঝি এঁদের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল, যেমনি এঁরা ভিতরে প্রবেশ করলেন অমনি সেটা ঢং ঢং করে বেজে উঠল।

বিনয়প্রকাশে অভ্যস্ত ও সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ সেই অল্পবয়স্ক হোটেল-অধিকারীকে দেখেই সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোকটি চমকে উঠলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর মনে পড়ে গেল, গতরাত্রে অবিকল এই লোকটিকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, ঠিক এমনি পোষাক পরা,—এমনি চকচকে পাট-করা মাথার চুল, সব হুবহু মিলে যায়। আশ্চর্য্য হয়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য একটু থমকে দাঁড়িয়ে—ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে মানব-মনের যা কিছু বিশ্বাস বা দুর্ব্বলতা থাকে তা বহুকাল আগেই তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আশ্চর্য্য ভাবটা তখনই মিলিয়ে গেল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কেমন হঠাৎ মিল হয়ে যায়, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই তুচ্ছ ঘটনাটা হাসির ছলে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে বারান্দা পার হয়ে যাবার পথে বললেন। মেয়ে যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। তার প্রাণটা হঠাৎ কেমন করে উঠল, এই অচেনা বিদেশে হঠাৎ দেশের জন্য কান্না পেতে লাগল। কিন্তু মনের ভাব সেও চেপে গেল।

এই হোটেলে কোন একজন রাজা সম্প্রতি তিন সপ্তাহ কাটিয়ে গেছেন, তাঁর পরিত্যক্ত ঘরেই এঁদের স্থান হল। সকলের চেয়ে প্রিয়দর্শন ও কর্ম্ম-নিপুণ পরিচারিকা এঁদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হল, সব চেয়ে পুরানো চাকরটি এঁদের দেওয়া হল, আর লুইগি নামে এক ফাজিল ছোকরা ফরমাস খাটবার জন্য দরজার কাছে হাজির রইল। দুএক মিনিট পরেই রন্ধনশালার অধ্যক্ষ তাঁদের ঘরে জানতে এল তাঁরা ডিনার খাবেন কিনা এবং ডিনারের খাদ্য-তালিকা কি কি তাও জানিয়ে দিল। ষ্টীমারের দোলনের জের তখনও মেটে নি, ভদ্রলোকের পায়ের তলায় মেঝেটা তখনও যেন দুলছে। কিন্তু সেটা জানতে না দিয়ে আভিজাত্য বজায় রেখে সোজা দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন যে, ডিনার তাঁরা খাবেন, তাঁদের টেবিল যেন দরজার কাছ থেকে দূরে তৈরী রাখা হয় এবং তাঁরা স্থানীয় শ্যাম্পেন পান করবেন। প্রত্যেক কথায় অধ্যক্ষ ঘাড় নেড়ে জানালে তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। কথা শেষ হলে সে অতি নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "আর কিছু হুকুম আছে?"

"না," শুনে সে তখন বললে,—"আজ রাত্রে এখানে বিখ্যাত কার্মেলা ও ও জুসেপের ট্যারাণ্টেলা নৃত্য হবে।"

সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললেন—"ও, আমি তার ছবি দেখেছি। জুসেপে লোকটি তার স্বামী বুঝি?"

"আজ্ঞে, তার সম্পর্কে ভাই হয়।"

ভদ্রলোক চুপ করে কি যেন ভাবলেন, কিছু বললেন না, তারপর লোকটিকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি এমন ভাবে প্রস্তুত হতে লাগলেন, যেন বর সেজে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। ঘরের সব বাতিগুলি জ্বেলে দিলেন, দাড়ি কামালেন, হাত মুখ ধুলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে এটা-ওটা ফরমাস করতে লাগলেন। এদিকে পাশের ঘর থেকেও তাঁর স্ত্রী কন্যা নানা প্রয়োজনে বার বার ঘণ্টা বাজাচ্ছে, লুইগি পা টিপে টিপে দৌড়াদৌড়ি করছে. মুখভঙ্গী সহকারে এমন ব্যস্ততার ভাব দেখাচ্ছে যে, দাসীরা তা দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছে না, কলসীতে জল ভরে নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরের দরজায় এসে একটু টোকা দিয়ে নিতান্ত ভালমানুষটির মত যেন কত ভয়ে ভয়ে সাড়া নিচ্ছে—"আসি হুজুর?"

ভিতর থেকে জবাব হয়—"হাঁ, এসো।"

সেই সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তখন কি ভাবছিলেন, তাঁর মনের ভিতর কি ভাবের উদয় হয়েছিল? হয়তো এমন বিশেষ কিছু তিনি টের পান নি;—ঘটনার আগের থেকে কোনো কথাই জানা যায় না, আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবী সর্ব্বদাই নিত্য ও সহজ দেখায়। যদিও অন্তরে অন্তরে হয়ত আসন্ন কিছুর আভাস পেয়ে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গেই মনকে তিনি বুঝিয়ে থাকবেন যে, যদিই বা

কিছু হয়, সেটা হঠাৎ আজই, এখনি বোঝা যাবে না। তা ছাড়া অতটা সমুদ্র-পীড়ার পর তাঁর তখন অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, প্রত্যাশিত খাদ্যের প্রথম চামচ কখন মুখে তুলবেন, উৎফুল্ল হয়ে তাই ভাবছেন, তাড়াতাড়ি তাই পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছেন, এই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর অত কথা ভাববার সময় নেই।

ক্ষৌরাদি শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধানো দাঁতগুলি পরে নিলেন,—যা কিছু চুল ছিল বুরুষ ভিজিয়ে সেগুলি টাকের উপর টেনে বসিয়ে দিলেন। পা গলিয়ে দিয়ে সিল্কের আণ্ডারওয়ার স্থূল পেটের উপর টেনে নিলেন, তার উপর মোজা এঁটে পেটেণ্ট চামড়ার জুতা পরলেন। দুগ্ধ-ফেন সাদা সার্টের হাতায় বোতাম লাগিয়ে পরলেন, তার ওপর প্যাণ্টালুন টেনে দিয়ে, শেষকালে গলার শক্ত কলারে বোতাম লাগাতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। এদিকে পায়ের তলার মাটী তখনও দুলছে, বোতাম পরাতে আঙুলের ডগা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, বোতামে লেগে গলার লোল চামড়া মধ্যে মধ্যে চিমটে যাচ্ছে, তবু নিষ্কৃতি নেই; অবশেষে টাইট কলারের চাপে মুখ নীলবর্ণ হয়ে, চোখ ঠিক্‌রে গিয়ে এই দুরন্ত কার্য্য সমাধা হল, তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন. চারি দিকের আভূমিলম্বিত আয়নায় তাঁর সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটা বহুরূপে প্রতিফলিত হয়ে উঠল।

"কি মুস্কিল!"—মাথা নীচু করে অন্যমনস্ক ভাবে আপন মনে বললেন, "কি মুস্কিল!" মুস্কিলটা কোথায় বাস্তবিক তা কিছু ভেবে দেখেন নি। নিজের হাতের ছোট আঙুলগুলো আর বড় বড় নখগুলো একমনে নিরীক্ষণ করতে করতে আবার বললেন, "কি মুস্কিল।"

এই সময় চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করে হোটেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, গলার টাইটা টেনে কলারটা আরও টাইট করে দিলেন, ওয়েষ্টকোটের বোতামগুলো পেটের উপর টাইট করে এঁটে দিলেন, সার্টের কফগুলো টেনে ঠিক করে নিলেন, আর একবার আয়নার দিকে চেয়ে চেহারাটা দেখে নিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন, "সেই কার্ম্মেলাকে আজ দেখা যাবে, নিবিড়বর্ণা, মোহে ভরা চোখ দুটি, দোআঁশলা স্ফুর্ত্তিবাজ জংলী মেয়ের বেশে সজ্জিতা, নিশ্চয়ই চমৎকার নাচে—" খুসী মনে ঘর ছেড়ে তিনি মেয়েদের ঘরের দিকে গেলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন তারা প্রস্তুত কিনা।

"আর পাঁচ মিনিট বাবা,"—ভিতর থেকে তাঁর মেয়ের চপল গলা শোনা গেল—"এই চুলটা জড়িয়ে নিচ্ছি।"

"আচ্ছা. আচ্ছা" বলে তিনি ফিরলেন। মেয়ের লম্বা চুল মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে এই ছবিটা মনে করতে করতে ধীরে ধীরে বারেন্দা পার হয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন, একেবারে পাঠাগারের দিকে চললেন। হোটেলের চাকর-বাকরদের সামনে পড়তেই তারা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাঁকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে চলেছেন। এক বৃদ্ধা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, চুলগুলি সমস্ত দুধের মত সাদা—তবু সিল্কের পোষাকের বাহার কম নয়, ডিনারের দেরী হয়ে গেছে বলে অঙ্গভঙ্গীসহকারে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, ভদ্রলোক তার পাশ কাটিয়ে গেলেন। ভোজনাগারে তখন অনেকে খেতে বসে গেছে, তিনি সেখানে ঢুকে এক পাশের টেবিল থেকে একটা সিগার কিনে নিলেন। তারপর একটা জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা মৃদু হাওয়া এসে তাঁর মুখে লাগল, দূরে দেখা গেল একটা আবছায়া নারিকেল গাছ দৈত্যের মত নক্ষত্রমণ্ডলী ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পাশের ঘরে পাঠাগারে টেবিলের উপর সব আলোগুলিতে শেড দেওয়া, সেখানে একজন অসংযত চেহারার জার্ম্মান, চশমা চোখে অনেকটা ইবসেনের মত দেখতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছে। তার দিকে একবার অবজ্ঞার চোখে চেয়ে সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোক একপাশে একটা সবুজ ঢাকনি দেওয়া আলোর ধারে গদিআঁটা ইজিচেয়ারে বসে চশমাটি বের করে পরলেন, এবং গলা উঁচু করে (কলারের জন্য টাইট বোধ হচ্ছিল) একখানা খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমে একবার ওপরের হেডিংগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলেন, যুদ্ধের সংবাদটা একবার দেখে নিলেন, তারপর অভ্যাসমত পাতাটা উল্টে দিলেন,· হঠাৎ যেন লাইনগুলো চোখের সামনে ঝলসে উঠল, হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এল, চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল, চশমাটা নাক থেকে পড়ে গেল...তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, নিঃশ্বাস নেবার প্রবল চেষ্টায় একটা বিকট শব্দ করে উঠলেন। তাঁর চিবুকটা ঝুলে পড়ল, —সোনার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা একপাশে লটকে পড়ল—এবং সমস্ত শরীরটা যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর হাত ছাড়াবার জন্য ছটফট করতে করতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

জার্ম্মান লোকটি যদি সে ঘরে না থাকত তবে ব্যাপারটা এত জানাজানি হত না, এক রকম চাপা দেওয়া যেত, তখনই একপাশ দিয়ে ভদ্রলোকের দেহটা সরিয়ে ফেলা হত, আগন্তুকরা বড় কেউ জানতে পারত না। কিন্তু জার্ম্মান লোকটি চেঁচামেচি করে ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে সকলকে সচকিত করে তুললে। সকলেই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল, অনেকের চেয়ার উল্টে পড়ে গেল নিজ নিজ ভাষায় "কি হল, কি হল?" বলে সকলেই পাঠাগারের দিকে ঝুঁকে এল। ব্যাপারটা কেউ যেন বুঝলে না—ঠিক জবাব কেউ দিতে পারলে না,—আজও মানুষ মৃত্যুতে যত আশ্চর্য্য হয়ে যায় এমন আর কিছুতে না, সত্য বলে একে যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। হোটেলের মালিক—ব্যস্ত হয়ে একবার এর কাছে, একবার ওর কাছে গিয়ে খাবার জায়গায় সবাইকে ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল, বোঝাতে লাগল ব্যাপারটা কিছুই নয়, সানফ্রানসিস্কো থেকে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি হঠাৎ কি রকম অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। ·কিন্তু কেউ তার কথা শুনলে না—অনেকে মিলে দেখলে, হোটেলের চাকর-বাকররা তাঁর টাই-কলার টেনে ছিঁড়ে দিলে, কোট ওয়েষ্টকোট টেনে বের করে দিলে, এমন কি জুতাজোড়া পর্য্যন্ত পা থেকে খুলে দেবার জন্য সব ব্যস্ত। তিনি তখনও হাত পা ছুঁড়ছেন। মৃত্যুর সঙ্গে তখনও ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে, হঠাৎ এমন ভাবে আক্রমণ করে

… লায় ফেললেও যেন তিনি আত্মসমর্পণ করতে মোটেই রাজি নন। ঘন ঘন … চালাতে লাগলেন, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলেন, উন্মত্তের মত … দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁকে ধরাধরি করে যখন ৪৩ নম্বরে নীচেকার … টা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল তখন তাঁর কন্যা … পেয়ে অসম্বদ্ধ-বেণী, অনাবৃত-বক্ষ, অসম্বৃত বস্ত্রে আলুথালু হয়ে দৌড়ে … ল; তারপরই তাঁর স্ত্রী, বিপুলকায়া, বিস্রস্ত-সজ্জা, ভয়ে মুখ বীভৎস ও … দিত…কিন্তু ততক্ষণে মাথা চালাচালিও থেমে গেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই হোটেলের অবস্থা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হল—কিন্তু সন্ধ্যাটা একদম মাটি হয়ে গেল। আগন্তুকরা বিরক্তির ভাব নিয়ে গিয়ে কান রকমে খাওয়া শেষ করলেন, হোটেলের মালিক অপরাধীর মত মুখ করে সকলের কাছে ঘুরতে লাগল, বার বার করে বলতে লাগল—তাদের কতই অসুবিধা হল, এবং যতশীঘ্র এই জঞ্জাল দূর করতে পারে সে জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। নাচের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল, বাড়তি আলো নিভিয়ে দেওয়া হল, অতিথিরা পানাগারে চলে গেল,—সমস্ত বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল যে, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যায় হোটেলের কাকাতুয়াটা দুচারবার আপনা-আপনি ডেকে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোক এখন একটা ভাঙ্গা লোহার খাটে ময়লা কম্বলে ঢাকা পড়ে আছেন, ঘরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। মাথার উপর আইসব্যাগ চাপানো, মুখখানা মৃত্যুনীল, ঠাণ্ডা, মুখ দিয়ে নিশ্বাস পড়ায় ওষ্ঠপ্রান্তে যে বুদবুদ উঠবার শব্দ হচ্ছিল, তা কমে ক্ষীণ হয়ে গেছে, গলায় আর কোন শব্দ নেই। মানুষ এখন আর নেই—যা রয়েছে সে ভিন্ন পদার্থ। স্ত্রী, কন্যা, ডাক্তার এবং চাকরের দল চুপ করে তার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সকলে যা প্রত্যাশা করছিল তাই ঘটল, শব্দটুকুও থেমে গেল। তাদের চোখের সম্মুখেই অতি ধীরে একটা ম্লান পিঙ্গল ছায়া মুখের ওপর ছড়িয়ে গেল, মুখখানা যেন কিছু স্বচ্ছ ও শুভ্র দেখাতে লাগল এমন একটা সৌন্দর্য্যের আভাস, যা ছেলেবেলায় হয়তো মুখখানিতে বেশ মানাত।

হোটেলের মালিক এলেন। ডাক্তার কানে কানে বললে, "হয়ে গেছে"। শুনে সে একটু ঘাড় বাঁকানোর ভঙ্গী করলে, অর্থাৎ তার আর কি! স্ত্রীর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে, ম্যানেজারের কাছে এসে অতি মৃদুস্বরে বললেন, "ওঁকে এখন ওঁর নিজের ঘরে নেওয়া হোক।"

ম্যানেজার ফরাসী ভাষার একটু রুক্ষ ভাবে অথচ বিনয় দেখিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, "তাতো হতে পারে না, মাদাম।" এ পরিবারের কাছে এখন সামান্য টাকাই পাওয়া যাবে, সুতরাং এখন আর খাতির কি? "তা একেবারেই অসম্ভব।" সে বুঝিয়ে দিলে ঐ ঘরগুলির ভাড়া অনেক বেশী, তাঁর অনুরোধ রাখতে গেলে সে কথা সবাই জানবে, ভবিষ্যতে ও ঘর কেউ ভাড়া নেবে না।

কন্যাটি এতক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে ছিল, এইবার চেয়ারে বসে পড়ে মুখে রুমাল গুঁজে কেঁদে উঠল। স্ত্রীটির অশ্রু তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল, মুখটা লাল হয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে নিজের ভাষায় তিনি আর একবার আদেশ করলেন,—তাঁদের খাতির যে এত শীঘ্র কমে গেছে এটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু ম্যানেজার এক কথায় তাঁকে চুপ করিয়ে দিলে। "মাদামের যদি এ হোটেলের ব্যবস্থা পছন্দ না হয়, তাঁকে এখানে সে আর ধরে রাখতে চায় না।" তারপর পরিষ্কার বলে দিলে যে, ভোরবেলাই মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে: পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, এখনই তাদের লোক আসবে। মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি কোন রকম শবাধার পাওয়া যাবে?"

"না। এখন পাওয়া অসম্ভব। এখন ফরমাস দিয়ে তৈরী করানও চলে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। হাঁ, ঠিক কথা,—খুব বড় বড় বাক্স যাতে সোডাওয়াটার আসে, তারই একটা থেকে খুবরিগুলো খুলে নিলেই কাজ চলে যাবে।"

সমস্ত হোটেল সুপ্তিমগ্ন। ৪৩ নম্বরের বাগানের দিকের জানালা খোলা, বাগানের ওদিকে একটা পাথরের দেওয়াল, মাথায় কাচের ভাঙ্গা টুকরা বসানো, তার গা ঘেঁসে পাতাছেঁড়া একটা কলাগাছ। ঘরের ভিতরটা জনশূন্য, আলো নেভানো, দরজায় তালা দেওয়া—মৃতদেহ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে, কালো আকাশে নীলতারাগুলো জ্বলছে, দূরে একটা ঝিঁঝিঁপোকা একটানা সুরে ডাকছে। বাইরে বারান্দায় স্তিমিত আলোতে দুটি দাসী জানালার কাছে বসে কি সেলাই করছে। লুইগি একরাশ কাপড় হাতে নিয়ে সেখানে এল।

দরজার দিকে ইসারা করে দাসীদের বললে—"সব তৈয়ার?" মুখে গাম্ভীর্য্যের ভান করে পা টিপে টিপে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। তারপর দরজার দিকে হাত নেড়ে নেড়ে চেঁচিয়ে বলিলে—"গাড়ী ছোড়ো!" যেন ষ্টেসন থেকে ট্রেণ ছাড়ছে। দাসীরা হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে লুটিয়ে পড়ল। তলুইগি তখন আবার গম্ভীর হয়ে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মোলায়েম গলায় বললে, "আসি হুজুর?" বলেই গলার সুর বদলে নিয়ে ভারী আওয়াজে নিজেই তার জবাব দিলে—"হাঁ, এসো।.."

৪৩ নম্বরের জানালায় যখন ফর্সা আলো ঢুকছে, ভোরের হাওয়ায় কলাগাছটির জীর্ণ পাতাগুলো সব সব্ করছে, স্বচ্ছ প্রভাতী আকাশে যখন সোনালী রং ধরেছে, ইটালীর পাহাড়শ্রেণীর আড়াল থেকে সূর্য্যোদয়ের আভা আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যখন মজুরের দল পথ পরিষ্কার করতে বেরিয়েছে, তখন ৪৩ নম্বর ঘরে একটা লম্বা বাক্স আনা হল। তার কিছুক্ষণ পরেই বাক্সটা খুব ভারী হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল, একখানা এক-ঘোড়ার গাড়ী একজন চাকরের জিম্মায় এই বাক্সের বোঝা নিয়ে সমুদ্রোপকূলের দিকে রওনা হল। গাড়ীর গাড়োয়ানের চোখ দুটি রাঙা, খাটোহাতা কোট পরে সে চাবুক আস্ফালন করে গাড়ী হাঁকাচ্ছে; ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর দেওয়া, মাথায় পালকের চূড়া বাঁধা, চামড়ার সাজের উপর তাঁবার আংটা চক্ চক্ করছে। গাড়োয়ান বেচারা সমস্ত রাত জুয়া খেলেছে, এখনও তার মদের নেশা কাটে নি। গত রাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা মনে করে সে

বিমর্ষ হয়ে চুপ করে আছে। কাল বিস্তর রোজগার হয়েছিল, তার শেষ কপর্দকটি পর্য্যন্ত জুয়াতে খুইয়েছে। কিন্তু আজকের সকালটি বেশ ঝর্‌ঝরে। এমন তাজা সমুদ্রের বাতাস, এতে মানুষের মাথা ধরা ছেড়ে যায়, আপনিই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তার উপর এই সানফ্রানসিস্কোর কোন এক ভদ্রলোকের মৃতদেহ বইবার হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাড়াটা জুটে গেছে, মনটা তাই খুব খুসী। নেপ্‌লস্‌গামী ষ্টীমার ছাড়বার সময় হওয়াতে সমুদ্রের ধার থেকে বার বার বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দ্বীপের চারিদিক থেকে তখনি তার প্রতিধ্বনি বেজে উঠল। চতুর্দ্দিক এখন আলোকিত, তীর-ভূমির প্রত্যেক রেখাটি, প্রত্যেক পাথরটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আবছায়া কিছু নেই। গাড়ীর ভিতর থেকে চাকরটি দেখলে, তাদের সর্দ্দার একখানা মোটরে দ্রুতবেগে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল, সেই মোটরে মলিন মুখে ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা, কেঁদে কেঁদে রাত্রিজাগরণে তাদের চোখমুখ ফুলে উঠেছে। দশ মিনিটের মধ্যে জলরাশি আলোড়িত করে ষ্টীমার ছেড়ে দিলে, সেই ষ্টীমার সানফ্রানসিস্কো-পরিবারকে চিরদিনের জন্য কাপ্রি থেকে নিয়ে চলল। কাপ্রিদ্বীপে আবার নিশ্চিন্ত শান্তি ফিরে এল।

দুহাজার বছর আগে এই দ্বীপে একজন খেয়ালী রাজা রাজত্ব করতেন, লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর তাঁর আধিপত্য ছিল। অসীম প্রতাপে জ্ঞানহারা হয়ে তিনি এমন সব কাজ করে গেছেন, যাতে দেশের লোক তাঁর নাম আজও মনে করে রেখেছে; কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষ বহুজনের সম্মিলিত বুদ্ধিতে রাজত্ব করতে বসে যে সব কাজ করছে তাও ঐ রাজার মতই অমানুষিক ও অনধিগম্য। আজও মানুষ বহুদেশ থেকে দলে দলে দেখতে আসে এই দুর্গম পাহাড়ের উচ্চ শিখরে মর্ম্মরপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, এককালে ঐ একটি মানুষ যেখানে বাস করত। আজ সকালে যাত্রীর দল হোটেলে এখনো নিদ্রামগ্ন। তাদের প্রত্যাশায় অনেকগুলি টাট্টু ঘোড়া হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুম ভাঙলে রীতিমত খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরে সুস্থে তারা ঐ ঘোড়ায় চড়ে সেই টাইবেরিও পাহাড়ে উঠবে আর বৃদ্ধা ভিখারিণীর দল লাঠি ধরে তাঁদের পথ দেখিয়ে যাবে। সানফ্রানসিস্কোর সেই ভদ্রলোকেরও এদের সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। মাঝ থেকে এমন ভাবে মৃত্যু এসে পড়াতে সকলে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ষ্টীমারে এতক্ষণ শব চালান হয়ে গেছে জেনে সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছে। সমস্ত সহর এখনও অচঞ্চল, দোকানগুলি এখনও খোলে নি। বাজারে কেবল মাছ-তরকারী বেচা সুরু হয়েছে, সামান্য কয়েক জন লোক সেখানে এসে জুটেছে। তাদের মধ্যে অকাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে বৃদ্ধ মাঝি লোরেঞ্জো, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কিন্তু সুগঠিত দীর্ঘ দেহ, তার এই সুন্দর দেহের জন্য ইটালীর সর্ব্বত্রই সে সুপরিচিত, বহু শিল্পমূর্ত্তির সে মডেল। রাত্রে সে দুটি বড় চিংড়ী মাছ ধরেছিল, ইতিমধ্যে অল্প দামেই তা বেচে ফেলেছে। যে হোটেলে কাল রাত্রে এই দুর্ঘটনা হয়ে গেছে সেখানকারই একজন চাকরের কাপড়ে মাছ দুটি এখনো ধড়্‌ফড়্‌ করছে। এখন থেকে লোরেঞ্জো সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এমনি অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াবে, ছিন্ন বসনে বিম্পরোয়া ভাবে এদিক-ওদিক চাইবে, হাতে থাকবে চুরুটের পাইপ, আর মাথার একপাশে অবিন্যস্ত লাল টুপি। সকলেই জানে চেহারার সৌন্দর্য্যের জন্য সে সরকারের তরফ থেকে কিছু মাসহারাও পেয়ে থাকে।

সেদিন সকালে আক্রজি পাহাড় থেকে দুটি পাহাড়ী পথিক দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়ে নীচে নেমে আসছে, তাদের হাতে কাঠের বাঁশী। নীচেকার পৃথিবী সূর্য্যকিরণে ঝলমল করছে। তারা দেখলে, ছোট দ্বীপটি যেন সমুদ্রের নীল জলে সাঁতার দিচ্ছে। জল থেকে রৌদ্রস্নাত বাষ্প উঠছে; চারিদিক ঘিরে ইটালীর উঁচু নীচু পর্ব্বতমালা দূর থেকে গাঢ় নীল বর্ণে অস্পষ্ট রেখায় এমন দেখাচ্ছে, যেন পৃথিবীর এই প্রথম সূর্য্যোদয়···এ সৌন্দর্য্য কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না।···মধ্যপথে এসে তারা দেখলে, পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে এক গহ্বর কাটা, তার মধ্যে ম্যাডোনার একটি মূর্ত্তি, সূর্য্যকিরণ তার উপর পড়ে মূর্ত্তিটিকে শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিমণ্ডিত করেছে। মমতায় ভরা নিষ্পাপ চক্ষুদুটি শূন্যের দিকে নিমগ্ন, সেই দিকে বুঝি তাঁর মহামানব সন্তানের বাসভবন! বাঁশী-ওয়ালারা সেখানে দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে বাঁশী বাজাতে লাগল। পাহাড়ী বাঁশীর মধুর ধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল; আনন্দের স্তবগান বেজে উঠল যেন সূর্য্যের উদ্দেশে, যেন এই প্রভাতের উদ্দেশে, এই অপাপবিদ্ধা জননীর উদ্দেশে, যিনি এই ক্রূর ও সুন্দর পৃথিবীর দুঃখভার বহন করতে বারে বারে সন্তানকে জন্ম দিয়ে নিয়ে আসেন, আর সেই মহামানব যিনি জুডার দেশে এক দরিদ্র মেষপালকের কুটীরে এই জননীর গর্ভে একবার জন্ম নিয়েছিলেন তাঁরও উদ্দেশে।

সানফ্রানসিস্কোর ভদ্রলোকের মৃতদেহ পুরাতন পৃথিবী থেকে নূতন পৃথিবীতে তার আপন জন্মস্থানে ফিরে চলেছে। মানুষের কাছে অনেক অবহেলা অপমান লাভ করে, অনেক বিলম্বে, নানা বন্দরে ঘুরে ঘুরে অবশেষে সেই বিখ্যাত জাহাজেই তাকে চালান করা হয়েছে, যাতে কিছুদিন আগেই পরম সমাদরে তাকে জীবিতাবস্থায় পুরাতন পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এখন তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আলকাৎরা মাখা বাক্সে ভরে তাকে জাহাজের নীচেকার অন্ধকার খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আবার সেই জাহাজ সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দিয়ে চলেছে। রাত্রে যখন কাপ্রি দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ পার হয়ে গেল, তখন দ্বীপের অধি-বাসীরা দেখলে, জাহাজের ম্লান আলোকবিন্দুগুলি একবার দেখা দিয়ে সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু জাহাজের উপর প্রশস্ত হলঘরে উজ্জ্বল আলোতে উন্মত্ত আনন্দের নৃত্যলীলা চলেছে, নিত্য যেমন চলে থাকে।

দ্বিতীয় রাত্রি, তৃতীয় রাত্রি, প্রত্যহই এই নৃত্যলীলা চলে। এদিকে প্রচণ্ড তুফান সমুদ্রবক্ষ তোলপাড় করে গর্জ্জন করতে থাকে। ঝড়ের আঘাতে বিশাল ঢেউয়ের রাশি যেন শোকার্ত্তের অন্ধকার অন্তর থেকে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তার মাথায় মাথায় ফেনার রূপালি রেখা। দুই মহাদেশের তোরণদ্বার জিব্রাল্টার, সেখানকার পাষাণস্তম্ভ থেকে তুষার-ঝটিকার মধ্য দিয়ে জাহাজের আলোকচক্ষুগুলি অতি ক্ষীণভাবে দেখা যায়, আবার দুর্য্যোগ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্তম্ভের চূড়া যত বড়, জাহাজ তার চেয়ে অনেক বিশাল, বহু তল, বহু নলবিশিষ্ট — নূতন মানুষের প্রবীণ মন দিয়ে নিপুণ

...বে গড়া,—তুষারের ঝাপটা এসে তার প্রতি নলে ধাক্কা দিচ্ছে, বয়ফ লেগে জাহাজ সাদা একেবারে হয়ে গেছে, তবু সে চলেছে অটল গাম্ভীর্য্যে, দুরন্ত গতিতে। সবার উপরে ডেকে নির্জ্জন কেবিনে, গড়া পুতুলের মত জাহাজের কাপ্তেন বিপুল দেহ নিয়ে তন্দ্রায় মগ্ন। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে জাহাজের বাঁশীর তীক্ষ্ণ ধ্বনি ক্ষীণতর হয়ে কানে আসছে। তাঁর দেওয়ালের পাশে যে রহস্যময় কেবিন, তার ভিতর অমানুষিক শব্দ হচ্ছে। বৈদ্যুতিক নীল আলো ঝলকে ঝলকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছে, সেখানে ধাতুগঠিত বিচিত্র মুখোস পরে টেলিগ্রাফকর্ম্মচারী কান পেতে শুনছে শত শত মাইল দূরের অন্যান্য জাহাজ থেকে কি বার্ত্তা আসে। আটলান্টিসের জলতলস্থ খোলের ভিতর কেবল কলকব্জার ঠোকাঠুকি ও বাষ্পের আওয়াজ, বড় বড় হাজার টনের বয়লার ও এঞ্জিনের গায়ে তেলজলমাখা বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়াচ্ছে, নীচেকার এই প্রকাণ্ড রন্ধনশালার জ্বলন্ত চুল্লীতে যা পাক হচ্ছে তাই থেকে জাহাজের গতিবেগ সৃষ্ট হয়ে উঠছে। এই শক্তি এখানে পুঞ্জীভূত হয়ে বৃহৎ লৌহনালার মধ্য দিয়ে প্রেরিত হচ্ছে জাহাজের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্য্যন্ত, প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্য্যন্ত লম্বমান বিশাল লৌহদণ্ড সর্ব্বদাই তৈলাক্ত, জীবন্ত দৈত্যের মত ধীর অবিচল গতিতে সেটা সর্ব্বদাই ঘূর্ণ্যমান, কিছুতেই এর ব্যতিক্রম করবার জো নেই,—দেখলে মানুষ শিউরে ওঠে। আটলান্টিসের মধ্যভাগে বিলাসের আসবাব-ভরা বিচিত্র কেবিন, খাবার ঘর, হলঘর আলোর আনন্দে উজ্জ্বল,—সেখানে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের মেলা বসেছে, তাদের কথার গুঞ্জনে চতুর্দ্দিক মুখর, ফুলের সৌরভে ভরপুর, উচ্ছল বাদ্যসঙ্গীতে তরঙ্গায়িত। এই ভিড়ের মধ্যে, এই রেশম-পশম-হীরা-জহরতের প্রাচুর্য্যের মাঝে আবার এক ভাড়া-করা দম্পতি অতি কষ্টে প্রেমাভিনয়ের ভান করে মধ্যে মধ্যে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছে। মেয়েটি পোষাকপারিপাট্যে সুন্দর, চুলটি সহজভাবে বাঁধা, আর ছেলেটির চুল পাট করা, মুখে চোখে পাউডার মাখা, পায়ে চক্‌চকে জুতা, গায়ে লম্বা কোট, গলায় এমন ভাবে 'বো' বাঁধা যেন দেখতে সেটা জোঁকের মত। কেউ জানে না যে, এরা একবেয়ে প্রেমের অভিনয় ও নৃত্যাভিনয়ের অত্যাচারে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; আর এ কথাও কেউ জানে না জাহাজের খোলের সর্ব্বনিম্নতলে গভীর অন্ধকার অন্তস্তলের মধ্যে কি জিনিষ লুকানো রয়েছে, নিজের বিবরে তাই নিয়ে জাহাজ ঝড়তুফান ভেদ করে বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অন্তহীন মহাসমুদ্রে শুরু হয়ে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

আর এক দিক

আমেরিকার 'রোটেরিয়ান' পত্রিকায় 'ধনী হইবার সহজ উপায়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের অনুযোগ এই যে, এ যাবৎ মানুষ কেবল টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে, যাক্‌, ছেলে-মেয়েরা খাইয়া-পরিয়া এক রকম দিন কাটাইতে পারিবে। কিন্তু টাকাকড়ির ডানা আছে, কোন্ ফাঁকে যে খাঁচার দোর খোলা পাইয়া পাখীর মতই টাকা-কড়ি উড়িয়া পলাইয়া যায়, কেহ বলিতে পারে না। ১৮০০ সনে লেখকের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্যবসায় করিতেন—এই ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে আমেরিকার সর্ব্বত্র, ইউরোপ, আফ্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে চিঠিপত্র লিখিতে হইত। তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে এই ব্যবসায় চালাইতে সুরু করেন—তখনও চিঠিপত্র অনেক লেখা হয়। এবং এই ভাবে হাজার হাজার চিঠি পত্র জমে। কিন্তু ১৮৮০ সনে আবর্জ্জনা হিসাবে সকল চিঠি পত্র পুড়াইয়া ফেলা হয়। ভদ্রলোকের দুঃখ এই যে, এই সব চিঠিপত্রের ষ্ট্যাম্পগুলি যদি বৃদ্ধি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইত তবে লেখককে আজ খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া পেটের ভাত করিতে হইত না। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া যে সব ষ্ট্যাম্প জমিয়াছিল, তাহাদের কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই তিনি লক্ষপতি হইতে পারিতেন।

এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বর্ত্তমান যুগে একেবারে আবর্জ্জনার সামিল, কিন্তু কে জানে ভবিষ্যতে তাহার কি মূল্য হইবে! লেখক দুঃখ করিয়াছেন, যদি শৈশবে এই বুদ্ধি হইত, তবে সিগারেটের ছবি জমাইয়াই তিনি আজ বড়লোক হইতে পারিতেন,—শুধু সিগারেটের ছবি কেন, ক্যালেণ্ডার, বায়োস্কোপ, সার্কাসের হ্যাণ্ডবিল, দেশলায়ের বাক্স—যাহা কিছু আজ লোকে সম্পূর্ণ জঞ্জাল বলিয়া ভাবে, ভবিষ্যতে তাহাই অমূল্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং লেখকের মতে টাকা জমানোর চাইতে এই সব খুঁটিনাটি জিনিষ জমানো বেশী বুদ্ধির কাজ।

চীনা দেব-কাহিনী

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যে কয়টী জাতি স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট সভ্যতা উদ্ভাবন করিয়াছিল, চীনারা তাহাদের অন্যতম। বহু জাতির সভ্যতা পূরাপুরি তাহাদের নিজেদের কৃতিত্বের ফল নহে, তাহারা প্রাচীনতর অথবা সমসাময়িক নানা জাতির
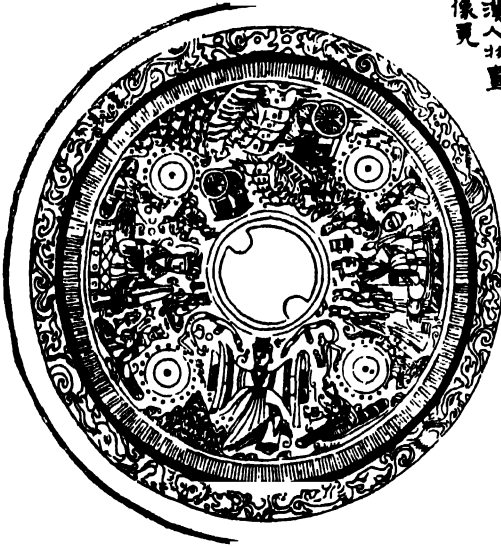
[ক] হান্-যুগের ধাতুময় আরসীর পৃষ্ঠ (সী-ওআং-মূ ও তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ মূর্ত্তি)।

সৃষ্ট সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, সেই সভ্যতাকে নূতন আকার দান করিয়াছিল মাত্র। স্বাধীন ভাবে সভ্যতা উদ্ভূত হয় মিসরে, মেসোপোতামিয়ায়, ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে, উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো ও যুকাতান প্রদেশে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু ও বলিভিয়ায়। অতি প্রাচীন কালেই অন্য জাতির সাহচর্য্য বা সহায়তা না লইয়া এই সব দেশে এক একটী বিশিষ্ট সভ্যতা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জগতের প্রাচীন ও আধুনিক যুগে যে বহু বিভিন্ন সভ্যতা বা সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রকটিত হয়, সেগুলি মুখ্যতঃ এই কয়টী আদিম ও স্বতন্ত্র সভ্যতার আধারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই আদিম সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি অধুনাতন কালে একেবারে লুপ্ত, কিংবা সম্পূর্ণরূপে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন বা আদিম রূপের সহিত অব্যাহত যোগ-সূত্র অতি অল্প দেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অথবা ভাষা, কিংবা এই দুইয়ের পরিবর্ত্তনের ফলে, যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রাচীন চিন্তা ও সভ্যতার ধারা প্রতিহত ও ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

যে সকল দেশে প্রাচীনের সহিত এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন যোগ দেখা যায়, সে সকল দেশের মধ্যে এখন কেবল ভারতবর্ষ ও চীনের নাম করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের অনার্য্য (কোল ও দ্রাবিড়) এবং আর্য্য জাতির সহযোগিতায় সৃষ্ট সভ্যতা, এবং চীনের প্রাচীন মোঙ্গোল জাতির সৃষ্ট সভ্যতা, উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও নানা বিষয়ে ইহাদের মধ্যে বৈষম্য লক্ষণীয়। একটী প্রধান বিষয়ে এই দুই দেশের সংস্কৃতিতে পার্থক্য বেশ দেখা যায়। ভারতীয় ও চীনা এই দুই জাতির মনোভাব উহাদের পৌরাণিক বা দেবতাবিষয়ক কাহিনীতে যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এই পার্থক্যটুকু বেশ ধরা যায়। একদিকে ভারতের দেব-কথায় কল্পনা ও romance অর্থাৎ 'রমন্যাস'-এর যে মনোহর বিকাশ দেখা যায়—যে বিকাশ অনন্যজাতিসাধারণ, মাত্র আর্য্য গ্রীক জাতি, কেল্‌টিক ও টিউটনিক জাতি এবং শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীতেই যাহার অনুরূপ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-বিন্যাস দেখা যায়,—অন্যদিকে চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক, সংস্কৃতে এবং দেশ-ভাষায় রচিত ইতিহাস ও পুরাণমধ্যে নিহিত আমাদের দেব-কথার মত কাব্যরসে ও মানবের চিরন্তন প্রিয় ভাবাবলীতে পূর্ণ দেবকথা বা ইতিকথা, ভারতের বাহিরের আর্য্য ও শেমীয় জগৎ ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের কাহিনী, সাগরমন্থন প্রভৃতি কথা, রামায়ণ মহাভারতের গাথা, সাবিত্রী-সত্যবান্, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি পৌরাণিক পাত্রপাত্রীদের উপাখ্যান, মধ্যযুগে সৃষ্ট নানা নবীন পৌরাণিক উপাখ্যান, ভক্তদের কথা—এরূপ জিনিস, বা এগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে এরূপ জিনিস, চীনদেশে একেবারে দুর্লভ। চীনাদের দেব-কাহিনীতে অদ্ভুত রস এবং মানবিকতা এই দুয়েরই অভাব। এ বিষয়ে জাপানীরা চীনাদের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর।

কিন্তু তাই বলিয়া চীনা দেবতালোকে দুই চারিটি চিত্তাকর্ষক কল্পনা ও কথা যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তাহা বলা চলে না। চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত (যেমন ফরাসী রোমান কাথলিক পাদরি Père Henri Doré আঁরি দোরে) আজ কালকার দিনে চীনাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, অনুষ্ঠান ও দেবতাবাদের আলোচনা Han হান্ (২২১ খ্রীঃ পূঃ-২০৬ খ্রীঃ), নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ (২০৬-৬১৮ খ্রীঃ), T'ang থাঙ্ (৬১৮-৯০৬), Sung সুঙ্ (৯৬০-১২৮০), Yuan য়ুয়ান (১২৮০-১৩৬৮), Ming মিঙ্ (১৩৬৮-১৬৪৪)—এই সব বিভিন্ন যুগ ধরিয়া চীনা সাহিত্য ও শিল্প মিলাইয়া চীনা দেব-কাহিনীর পরম্পরাগত ক্রমবিকাশ দেখাইবার কাজে কেহও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল হইল চীনা দেবতাবাদ সম্বন্ধে ইংরেজীতে দুইখানি

[খ] সী-ওআঙ-মু-র স্বর্গে রাজা মু-ওআঙ্ (হান্ যুগে খোদিত শিলাচিত্র)।

করিয়া, চীনা পটুয়াদের আঁকা ছবি সমেত বড় বড় কতকগুলি বই লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সব দেবতাদের উদ্ভব ও ইহাদের বিকাশ সম্বন্ধে ভাল-মত গবেষণা কেহও করেন নাই। বৈদিক, ব্রাহ্মণিক ও ঔপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন, মৌর্য্য, সুঙ্গ, যবন ও শক, অন্ধ্র ও কুষাণ, গুপ্ত, পল্লব ও তৎপরবর্ত্তী কাল—হিন্দু ইতিহাসের এই সমস্ত বিভিন্ন যুগ ধরিয়া হিন্দুশাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্প-কলা মিলাইয়া, ভারতীয় দেবতাবাদ ও দেব-কাহিনীর একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে; Muir মিউয়র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, Hopkins হপ্‌কিন্স্, কৃষ্ণশাস্ত্রী, গোপীনাথ রাও, আনন্দ কুমারস্বামী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। চীনদেশে কিন্তু Hsia শিয়া (২২০৫-১৭৬৭ খ্রীঃ পূঃ), Shang শাঙ্ (১৭৬৬-১১২২ খ্রীঃ পূঃ), Chou চোউ (১১২২-২৫৫ খ্রীঃ পূঃ), Ts'in ছিন্ ও বড় বড় বই প্রকাশিত হইয়াছে—E. T. C. Werner কৃত Myths and Legends of China (Harrap, 1922) এবং J. C. Ferguson কৃত Chinese Mythology (Mythology of all Races, Vol. VIII. Chinese, Japanese—Marshall Jones & Co. Boston, 1928)—কিন্তু দুই খানিই অত্যন্ত অনুপযোগী। ফরাসী চীনবিৎ Henri Maspero ১৯২৪ সালে Journal Asiatique পত্রে Legendes Mythologiques dans le Chou King অর্থাৎ 'শূ কিঙ্ নামক প্রাচীন চীনা ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত দেব-কাহিনী' নাম দিয়া যে একটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে চীন দেশের দেবকথা আলোচনার ঐতিহাসিক ও তুলনাত্মক একটী নূতন পদ্ধতি তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই পদ্ধতি ধরিয়া আলোচনা করিলে, আশা করা যায়, চীনাদের ধর্ম্ম ও দেবকাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক সংবাদ আমরা ক্রমে পাইব।

একটা মতবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে গৃহীত হইয়া যায় যে, আধুনিক কালে নরলোকে পূজিত দেবতারা প্রাচীন কালের মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। এইরূপ মতবাদ প্রাচীন গ্রীসেও Euhemeros 'এউহেমেরস' নামক একজন পণ্ডিত কর্তৃক খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে প্রচারিত হইয়াছিল—Euhemeros-এর নাম হইতে এই মতবাদকে ইউরোপে Euhemerism বলে। এই প্রকারের বিশ্বাস বা মতবাদ চীনদেশে আসিয়া যাওয়ায়, চীনা দেব-কাহিনীর আলোচনা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তিনটী কথা বা উপাখ্যান সব চেয়ে সুন্দর, এবং সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত।

প্রথমটীর মধ্যে আখ্যান বা কথা-বস্তু বিশেষ কিছু নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী দুইটীকে চীনা পুরাণের সবচেয়ে মনোজ্ঞ উপাখ্যান বলিতে পারা যায়। নিম্নে সেই তিনটী দেব-কাহিনী কথিত হইতেছে।

[১] চীনা পুরুষ ও প্রকৃতি

আমাদের দেশে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি, বা শিব ও শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার আছে, এই দুই ভাবের প্রতীক স্বরূপ যেমন বিশ্বপিতা শিব এবং জগন্মাতা উমার কল্পনা আছে, —অনুরূপ বিচার এবং কল্পনা চীনাদের মধ্যেও আছে। তবে চীনা দার্শনিক বিচার এবং দেবকল্পনা গভীরত্বে, ব্যাপকত্বে ও মনোহারিতায় আমাদের দেশের বিচার ও কল্পনার কাছেও পঁহুছিতে পারে না। পুরুষকে চীনারা Yang 'য়াঙ্' বলে, এবং প্রকৃতিকে বলে Yin 'য়িন্' ('য়িন' শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে yem 'য়ম্' ছিল)। শব্দ দুইটীর মৌলিক অর্থ যথাক্রমে 'রৌদ্র' ও 'ছায়া' বা 'আলো' ও 'আঁধার', Yang বা রৌদ্রের অন্য অর্থ ছিল 'দক্ষিণ দিক্', 'উত্তাপ,' 'সৃষ্টিশক্তি'; এবং

[গ] মেঘমণ্ডলে অবস্থিত স্বর্গে তুঙ্-ওয়াঙ্-কুঙ ও সী-ওআঙ্-মু (হান্-যুগের প্রস্তরে খোদিত চিত্র)।

Yin-এর অন্য অর্থ 'উত্তর', 'শীতল', 'রহস্যাবৃত'। চীনাদের বিশ্বাস এই যে, সমগ্র বিশ্ব-সংসার, বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, এই য়াঙ্ ও য়িন্-এর মিলনের ফল। আমাদের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মত য়াঙ্-গুণ ও য়িন্-গুণ মানব প্রকৃতিতে এবং বাহ্য প্রকৃতিতে কার্য্যকর হয়। চীনাদের মতে য়াঙ্ শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আধার।

য়াঙ্ ও য়িন্ ভিন্ন, চীনের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে, পরব্রহ্ম বা আদি কারণ রূপে 'দেবতা' (Thien থিয়েন্), নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম (Tao 'তাও'—অর্থ 'পথ'—যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে—পথ-বাচক Tao শব্দের নিকটতম সংস্কৃত অনুবাদ হইবে 'ঋত'—'ঋ' ধাতু (অর্ত্তি, ঋচ্ছতি), গমন-অর্থে—ঋ+ত='ঋত'=গত ; তুলনীয় 'সৃ' ধাতু গমন-

অর্থে—'সৃ+ত'='সৃত', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট, সড', তাহাতে স্বার্থে 'ক' বা 'ক্ক' প্রত্যয় যোগে 'সডক্ক', ভাষায় 'সড়ক'=পথ), স্রষ্টা পরমেশ্বর (Shang Ti শাঙ-তী), আদি বা মহামূল (Thai Chi থাই-চী), চিৎশক্তি বা নীতি (Li লী) প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আদি কারণ বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে জাত য়াঙ্ ও য়িন্, অর্থাৎ পুরুষ-গুণ ও প্রকৃতি-গুণ, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত বলিয়া স্বীকৃত।

য়াঙ্-য়িন্ হইল জগতের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যাপারের অন্তর্নিহিত শক্তি। চীনারা ইহাদের সাকার কল্পনাও করিয়াছে। য়াঙ্-য়িন্ সর্ব্বদা একত্র অবস্থিত। য়াঙ্-য়িন্-এর প্রতীক বা চিহ্ন চীনদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত—চীনাদের দেবালয়ে, বাসভবনে, আসবাব পত্রে, পরিচ্ছদে য়াঙ্-য়িন্-এর চিহ্ন লাঞ্ছন-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এই চিহ্ন প্রদর্শিত হইল। একটি বৃত্ত, মধ্যে একটি আবর্ত্ত রেখার দ্বারায় মৎস্য রূপানুকারী দুইটি অংশে বিভক্ত; এক অংশ শ্বেত, অন্য অংশ কৃষ্ণ, এবং প্রত্যেক অংশে চক্ষুর মত ক্ষুদ্র একটি করিয়া বিন্দু আছে।

এই চিহ্নের সহিত আমাদের শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছন তুলিত হইতে পারে—আমাদের পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছনকে 'ষট্‌কোণ' বলে—দুইটী সমকোণ ত্রিভুজ পরস্পরের সহিত গ্রথিত, একটী ত্রিভুজ উর্দ্ধমুখ, অন্যটী অধোমুখ, উর্দ্ধমুখ ত্রিভুজটী শিব বা পুরুষের প্রতীক—উহার তিনটী ভুজ ব্রহ্মের গুণ সৎ চিৎ ও আনন্দের জ্ঞাপক; অধোমুখ ত্রিভুজটী শক্তি বা প্রকৃতির প্রতীক, তিনটী ভুজ প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃকে নির্দ্দেশ করে।—
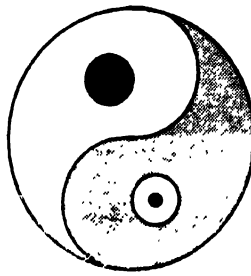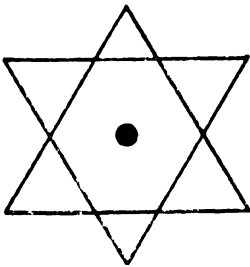
চীনাদের মতে, অনেক সময়ে জগতে য়াঙ্ ও য়িন্-এর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য হয়। তাহার ফলেই যত কিছু নৈসর্গিক ও মানুষের আভ্যন্তরীণ বিপত্তি ও অস্বস্তি ঘটে। য়াঙ্ ও য়িন্-এর সামঞ্জস্য হইলেই জগতে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। জগতে ও মানব-দেহে য়াঙ ও য়িন-এর সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য চীনা লৌকিক ধর্ম্ম ও চীনা বৈদ্যক শাস্ত্র নানা ভাবে চেষ্টিত।

য়াঙ্-য়িন্-এর সাকার কল্পনায়, য়াঙ্-এর মূর্ত্তি হইতেছে Tung Wang Kung তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ নামক দেব, এবং য়িন্-এর মূর্ত্তি হইতেছে Si Wang Mu সী ওআঙ্-মু (অথবা Hsi Wang Mu শী-ওআঙ্-মু) নাম্নী দেবী। এই দুই দেব-মূর্ত্তির কল্পনা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনাদের মধ্যে বিদ্যমান—চীনের প্রাচীনতম ভাস্কর্য্যের নিদর্শনে এই দুই দেবতার চিত্র পাওয়া যায়। এই দেবতাদ্বয়ের মধ্যে, প্রকৃতি-রূপিণী সী-ওআঙ্-মু (অর্থাৎ 'পশ্চিমের রাণী-মা'—Si বা Hsi অর্থে 'পশ্চিম', Wang অর্থে 'রাজা' বা 'রাজকীয়', Mu অর্থে 'মাতা') প্রাচীন চীনে বিশেষ প্রভাবান্বিতা দেবতা ছিলেন। তিনি এক হিসাবে বিশ্বমাতা; মানুষের প্রার্থনা তাহার কাছে পঁহুছায়, তিনি অমৃতময় স্বর্গীয় শফ্‌তালু বা peach পীচ-ফলের অধিকারিণী। এই পীচ ফল আহারে মানব অমরত্ব লাভ করে; কেবল দেবীরই কৃপায় ধার্ম্মিক মানুষ এই ফল লাভ করিতে পারে। সী-ওআঙ্-মু চীনাদের জাতীয় হৃদয় হইতে উদ্ভূতা দেবী, স্বাধীন বা বিশুদ্ধ চীনা কল্পনা হইতেই তাঁহার উদ্ভব। সী-ওআঙ-মু-র সম্বন্ধে সুপ্রাচীন যুগ হইতেই চীনারা কল্পনা করে যে, তিনি চীন দেশের পশ্চিমে K'un Lun খুন্ লুন পর্ব্বতের মধ্যে অতি রমণীয় প্রদেশে নিজ ধামে বিরাজ করেন—এই স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য,—যেমন আমাদের শিবের কৈলাস। খুন্-লুন পর্ব্বতেই তাঁহার স্বর্গ। এখানে এক অতি সুন্দর উদ্যান আছে—সেই উদ্যানে আমাদের স্বর্গের পারিজাতের মত অমৃতময় পীচ-ফলের বৃক্ষ বিদ্যমান। উদ্যানের মধ্যে এক রত্নময় জলাশয় আছে। দেবীর বাহন দেবলোকবাসী Feng ফ্যঙ্ বা phœnix 'ফিনিক্স' পাখী—ময়ূরের মত এই পাখী, পৃথিবীতে কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না, আমাদের লক্ষ্মীর পেচকের মত বা সরস্বতীর হংস বা ময়ূরের মত এই পাখী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে

সর্ব্বদা থাকে। দেবীর অনুচরগণও তাঁহার সেবায় নিকটে বিদ্যমান। দিব্যশক্তিসম্পন্ন দেবর্ষিগণ সী-ওআঙ্-মু-র স্বর্গে তাঁহার পারিষদ রূপে বাস করেন। অন্য দেবতারাও এই স্বর্গে আগমন করেন। দেবীর পুত্রকন্যাগণও এই স্বর্গে থাকেন।

[ঘ] দেবী সী ওআঙ্-মু-র স্বর্গ (প্রাচীন চীনা চিত্র)।

প্রতি তিন সহস্র বর্ষ অন্তর দিব্য পীচ-ফল ও অন্যান্য স্বর্গীয় খাদ্য আহার করিবার জন্য এই স্বর্গে সমস্ত দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হন। চীনারা প্রাণমন দিয়া এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া গিয়াছে—ছবিতে ইহার সৌন্দর্য্য ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, বর্ণনায় ইহাকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের আগমনের ফলে, চীনদেশে অমিতাভ বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের পূজা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে—পশ্চিম-দেশে অবস্থিত বুদ্ধ অমিতাভের স্বর্গ, চীনাদের ও জাপানীদের কল্পনাতে অপূর্ব্ব মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে পূরিত হইয়া উঠে, এবং ইহাদের চিত্তে এই স্বর্গ পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে আসিয়া পুরুষ হইতে স্ত্রী দেবীতে পরিচিত হইয়া যান—অবলোকিতেশ্বর Kuan-yin কুয়ান্-য়িন্ (জাপানীতে Kwannon কান্নোন্ বা খানোঙ) নামে করুণাময়ী মাতৃদেবীতে পরিণত হন, এবং চীন ও জাপানের চিত্তে এই রূপে তিনি এখন রাজত্ব করিতেছেন। এখন ইঁহাদের লোকপ্রিয়তার কারণে সী-ওআঙ্-মু-র প্রভাব চীনাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। সী-ওআঙ্-মু এখন কেবল পরীরাজ্যের রাণী মাত্র হইয়া গিয়াছেন—চীনাদের আকুল প্রার্থনার বিষয়ীভূত আর তিনি নন। চীন হইতে জাপানেও সী-ওআঙ্-মু-র মাহাত্ম্যের প্রচার হয়, জাপানে Seiobo 'সেই-ও-বো' নামে দেবীর বিশেষ আদর এখনও আছে।

সী-ওআঙ্-মু যেমন জীবন্ত দেবতা, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পুরুষ-ভাবের সাকার মূর্ত্তি স্বরূপ তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ দেব কিন্তু সেরূপ নহেন, দেবতা হিসাবে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয়, যেন শবরূপী শিব; যেন তাঁহাকে মাতৃ-শক্তি-স্বরূপিণী সী-ওআঙ্-মু-র পুরুষ প্রতিরূপ হিসাবেই কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। 'তুঙ-ওআঙ-কুঙ' নামের অর্থ, 'পূর্ব্ব-

দেবী সী-ওআং-মু।

চীনদেশীয় প্রবালময় মূর্ত্তি, (অষ্টাদশ শতক)

চীনদেশীয় প্রকৃতি ও পুরুষ।

সী-ওয়াঙ মূ (প্রতীচী-রাজ্ঞী মাতা) ও তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ (প্রাচী-রাজ-মহাভাগ)।

প্রাচীন চীনা চিত্র অনুসরণে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে অঙ্কিত ও শ্রীযুক্ত মঙ্গল ভাস্কর কর্ত্তৃক খোদিত।

[শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

শব্দের রাজা ও নেতা (অথবা মহাভাগ, বা মহাপুরুষ)'; Tung শব্দের অর্থ 'পূর্ব্বদিক,' Wang অর্থে 'রাজা' এবং Kung শব্দটী বহু-অর্থ-প্রকাশক—ইহার মৌলিক অর্থ 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায্য বিভাগ করণ' ও তাহা হইতে এই

[ঽ] হান্-যুগের প্রস্তরে খোদিত চিত্রে নক্ষত্রমণ্ডল ও সূর্য্য। বামে বুননিয়া কন্যার মূর্ত্তি ; মধ্যে কাক-লাঞ্ছন সূর্য্য, দক্ষিণে তারকা।

অর্থগুলি উদ্ভূত হয়—'লৌকিক বা সর্ব্বজন সাধারণ; নিরপেক্ষ; নেতা; সম্ভ্রান্তব্যক্তি; পুরুষ'। প্রকৃতি-দেবী হইলেন পশ্চিমে অবস্থিত স্বর্গের রাণী, এবং পুরুষ-দেব হইলেন পূর্ব্বদিকের অধিপতি লোকপাল বিশেষ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম—পরস্পরের বিরোধী; আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম জুড়িয়াই বিশ্ব। চীনা ভাষায় 'তুঙ্ সী' (পূর্ব্ব পশ্চিম), এই সমস্ত পদ, 'বিশ্ব-জগৎ' অথবা 'সমগ্র পদার্থ নিচয়' (things in general) এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

সী-ওআঙ্-মূ-র বহু নাম আছে। একটী নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ—Kin Mu 'কিন্-মূ' (বা Chin Mu চিন্-মূ) অর্থাৎ 'স্বর্ণ মাতা'। তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ও তদ্রূপ, Mu Kung 'মূ-কুঙ্' (বা Muk Kung 'মুক্-কুঙ') অর্থাৎ 'দারু পুরুষ' নামে খ্যাত।

সী-ওআঙ-মূ-র সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ সম্বন্ধে সেরূপ বিশেষ কিছু নাই। প্রাচী দিকে নীল মেঘময় প্রাচীরযুক্ত কুহেলিকাময় প্রাসাদে তাঁহার স্বর্গলোক। Hsion Thung বা 'অমৃতময় যুবা' এবং Yiu Niu বা 'মণিশিলা কুমারী' নামে তাঁহার দুই অনুচর আছে। দেবরূপে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ জগৎ সংসারের পরিচালনার কার্য্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন না। তবে তাঁহার সূক্ষ্ম রূপ Yang য়াঙ্ বা পুরুষ-ভাব বিশ্বমধ্যে সর্ব্বত্রই কার্য্যকর।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার হান্-যুগের প্রাচীন চীনা শিল্পে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ ও সী-ওআঙ্-মূর প্রস্তরের উপরে ও ধাতুময় মুকুরের পৃষ্ঠে খোদিত চিত্র পাওয়া যায়, এইরূপ তিন খানি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া গেল। [ক] চিত্রখানি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটী ধাতুময় আরসীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত। বাম দিকে সী-ওয়াঙ্-মূ ও ডান দিকে তুঙ্-ওয়াঙ্ কুঙ্ আসনে উপবিষ্ট—ইহাদের আশে-পাশে অনুচর ও অন্য দেবতাগণ। সী-ওয়াঙ্-মূ-র দুই পাশে পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা তঁহার পশ্চিম পর্ব্বতীয় স্বর্গের দ্যোতনা করিতেছে। একদিকে দিব্য অশ্বযুক্ত দুইটী স্বর্গরথ, রথের বিপরীত দিকে নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীতের দৃশ্য—স্বর্গের দেবতারা সী-ওআঙ্-মূ-র সভায় নৃত্য ও বাদ্য করিতেছে। [খ] চিত্রখানি খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতকে, প্রস্তরের উপরে খোদিত চিত্র। সী-ও আঙ্-মূ-র প্রাসাদের দৃশ্য। চীনা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসারে Chou চৌ-বংশীয় সম্রাট Mu Wang মূ-ওআঙ (খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৯৪৮ বর্ষে ইঁহার মৃত্যু হয়) বহু বৎসর ধরিয়া চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তে ভ্রমণ করেন, এবং অবশেষে তিনি সী-ওআঙ-মূ-র স্বর্গে সশরীরে উপনীত হন, ও সী-ওআঙ্-মূ কর্ত্তৃক সাদরে সৎকৃত হন। এই কাহিনী চীনা পুরাণে অতি বিখ্যাত। [খ] চিত্রে সী-ওয়াঙ্-মূর দ্বিতল প্রাসাদ দেখা যাইতেছে, উপরের তলে মুকুট মাথায় সী ওয়াঙ্-মূ বসিয়া আছেন, দুই পাশে তাঁহার অনুচরগণ উপচার-বস্তু লইয়া তাঁহার সেবার জন্য হাজির। দ্বিতলের ছাতের উপরে সী-ওআঙ্-মূ-র বাহন Feng ফাঙ্ বা ফীনিক্স পাখী এক জোড়া রহিয়াছে, ও বানর এবং অন্য পাখী দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের নিম্নতলে সম্রাট মূ-ওআঙ দেবীর অতিথিরূপে উপবিষ্ট, তাঁহারও সম্মুখে ও পশ্চাতে

[চ] শশক ও ভেক-লাঞ্ছন যুক্ত চন্দ্র এবং নক্ষত্রাবলী। হান্-যুগের প্রস্তর চিত্র।

সেবারত অনুচর। প্রসাদের সামনে প্রাঙ্গণে দেবীর স্বর্গের একটী দিব্য বৃক্ষ, তাঁহার নীচে দেব-অতিথির শকট ও মুক্ত অশ্ব এবং কুক্কুর। তলায় সম্রাটের অনুগামী রথারোহী, অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সেনার দল। [গ] চিত্রে তুঙ্-ওআঙ্-

কুঙ্-এর স্বর্গের দৃশ্য। এই স্বর্গ মেঘমণ্ডলে অবস্থিত। মেঘ-লোকে দিব্য-রথের সামনে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ দর্শকের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট; তাঁহার পিঠের দুই পাশ দিয়া দুইটী ডানা আছে; তাঁহার ডানদিকে রথের ঘোড়া, বাম দিকে কতকগুলি অনুচর, ও তাহাদের পরে সী-ওআঙ্-মূ পক্ষধারিণী রূপে মুকুট মাথায় আসীনা। তলদেশে মেঘমালা, মেঘলোকের দেবযোনি, দেবরথ, দেবানুচর।

[ছ] সূর্য্যদেব (হুন্-য়ী) ও চন্দ্রদেবী (হেঙ্-ঙো)। আধুনিক চীনা চিত্র।

সী-ওআঙ্-মূ-র পরবর্ত্তী কালে (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে) রচিত একটী প্রবালময় মূর্ত্তির প্রতিলিপি দেওয়া হইল। মূর্ত্তিটী চীনা ভাস্কর্য্য ও মণিকারীর অপূর্ব্ব সুন্দর নিদর্শন। সী-ওআঙ্-মূ এখানে দুইজন সেবকের সহিত দাঁড়াইয়া; তাঁহার বাহন Feng বা ফীনিক্স পাখীও রহিয়াছে। (১নং প্লেট)।

চীনা শিল্পের একখানি অতি প্রাচীন ছবি ও চীনের হান-যুগের ভাস্কর্য্য অবলম্বনে, তরুণ শিল্পী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নির্দ্দেশক্রমে পাথরের উপরে আমার জন্য সী-ওআঙ্-মূ ও তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্-এর দুইটী মুখ আঁকিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্কিত রেখা অনুসারে পাথরের কারিগরকে দিয়া মুখ দুইটী কাটাইয়া লইয়াছি। অর্দ্ধেন্দুবাবু অতি নিপুণভাবে এই দুইটী মূর্ত্তিতে চীনা ভাবটুকু বজায় রাখিয়াছেন। চীন দেশীয় পুরুষ-প্রকৃতির এই চিত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হইল। (২নং প্লেট)।

সী-ওআঙ্-মূ-র কল্পনা, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত সব চেয়ে মনোহর দেবকল্পনা।

[২] সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবী

প্রাচীনতম কালে চীনারা মনে করিত, সূর্য্য ও চন্দ্র এক একটী করিয়া নহে, বহু; বহু বিভিন্ন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে এক এক দিনে এক একটী সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্যগুলি অগ্নিময় পদ্মাকৃতি পিণ্ড বা গোলক বিশেষ। প্রত্যেক সূর্য্যের অগ্নিপিণ্ডের অভ্যন্তরে একটী করিয়া ত্রিপাদবিশিষ্ট দিব্য কাক বাস করে। প্রাচীন হান্-যুগের ভাস্কর্য্যে গোলকের মধ্যে অবস্থিত কাকই সূর্য্যের প্রতীক রূপে অঙ্কিত দেখা যায় (চিত্র [ঙ] দ্রষ্টব্য)। এই সকল সূর্য্যের একজন মাতা

আছেন, যে সূর্য্যের আলোক দিবার পালা, সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরিলে তিনি প্রতিদিন তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দেন।

সূর্য্যের অনুরূপ চন্দ্রও অনেকগুলি, এগুলি ধাতুনির্ম্মিত গোলক। চন্দ্রের সংখ্যা বারো। (আমাদের দেশের 'দ্বাদশ আদিত্য'র কথা মনে করাইয়া দেয়)। এই সব চন্দ্রের মধ্যে একটী করিয়া ভেক এবং একটী শশক (আমাদের দেশের অনুরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী চন্দ্রের নাম 'শশাঙ্ক' শব্দ তুলনীয়) বাস করে। প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য্যে এই ভেক ও শশকযুক্ত বৃত্ত চন্দ্রের প্রতীক (চিত্র [চ])।

বহু সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে ক্রমে চীনারা এক সূর্য্য ও এক চন্দ্রের কল্পনা বা ধারণায় উপনীত হইল। এবং সূর্য্য ও চন্দ্র-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দুই দেবতাও ক্রমে কল্পিত হইলেন। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রী। কি করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রলোক এই দেব ও দেবীর শাসনে আসিল, তদ্বিষয়ে যে প্রাচীন চীনা কাহিনীটি প্রচলিত আছে, সেটী বেশ কৌতুককর, এবং romantic অর্থাৎ আদি ও অদ্ভুত রসের সমন্বয়ে চিত্তাকর্ষক। এই আখ্যানে চীনা মানস সুলভ Euhemerism আসিয়া, দেবতাগণ মূলতঃ মানব মানবী এই বোধ বা বিচার আরোপিত হইয়া, আখ্যানটীর পাত্র পাত্রীগণকে দেশকালনিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং তাহাতে ইহার কাব্যাংশের হানি হইয়াছে, তবুও কাহিনীটী সুন্দর। নিম্নে যে কথা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা E. T. C. Werner-এর পুস্তক এবং Lewis Hodous কৃত Folk-ways in China (London, 1929) পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

সম্রাট Yao য়াও চীনদেশে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩৫০-এ রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের যুগ্ম দেবতা ঐ দুই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

সম্রাট য়াও একবার এক সুউচ্চ পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পর্ব্বতের দেবতার নিকট হইতে অমর জীবন লাভের উপায় শিখিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গে এক তরুণ-বয়স্ক অনুচর ছিলেন। এই যুবক রাজার প্রধান পূর্ত্তকার ও গৃহনির্ম্মাণশিল্পী ছিলেন। এই যুবকই ভবিষ্যৎ সূর্য্যের দেবতা। গিরিদেবতা ইঁহার প্রতি এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, ইঁহাকে পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া যাইতে দিলেন না। রাজা অমর জীবন লাভের রহস্য যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলেন ততটুকু করিয়া, এই যুবককে পর্ব্বতে রাখিয়া একা নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যুবক পর্ব্বতে গিরিদেবতার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে কেবল ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার দেহ দৈবী শক্তিতে পূর্ণ হইল, এবং অত্যন্ত লঘু হইল, ক্রমে তিনি দেবতার মত অলৌকিক শক্তি লাভ করিলেন। এই শক্তির মধ্যে বায়ুমার্গে বিচরণ করা ও বাণক্ষেপে অসাধারণ দক্ষতা, এই দুইটী অন্যতম।

পরে তিনি সম্রাট য়াও-এর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ধনুক ছিল লাল কাপড়ে জড়ানো। সম্রাটের সমক্ষে নবলব্ধ দৈবী শক্তির পরিচয় দিলেন। সম্মুখে এক পাহাড়ের উপরে এক সরল বৃক্ষ ছিল, যুবক গাছটী বাণবিদ্ধ করিলেন, এবং হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া গাছ হইতে সেই বাণটী টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আবার হাওয়ায় ভাসিয়া পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন, এবং যুবকের নূতন নামকরণ করিলেন—তাহার নাম দিলেন "দিব্য ধনুর্দ্ধর" (Shen-Yi শ্যন্-য়ী—প্রাচীন চীনায় Dz'yen Ngiei বা Dhien Ngiei)।

শ্যন্-য়ী সম্রাট য়াওএর সভায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার Feng-po বা Fei-Lien ফেঙ্-পো বা ফেই-লিএন্ (অর্থাৎ বায়ুদেব) ঝড়বৃষ্টি করিয়া দেশ ধ্বংস করিবার উপক্রম করেন। শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের আকারে বায়ুদেব, পরিধানে মাথায় লাল টুপী, গায়ে হল্‌দে রঙের আলখাল্লা, একটি হাওয়ায় ভরা থলি কাঁধে লইয়া থাকেন, যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে থলির মুখ ফিরাইয়া দিয়া ঝঞ্ঝাবাত করেন। শ্যন্-য়ী বায়ু-দেবকে পরাজিত করিয়া, ঝড়-বৃষ্টি ও অন্য উৎপাত দ্বারা রাজ্যধ্বংসের কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার নয়টী অদ্ভুত পাখী মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম উদগীরণ করিতে করিতে নয়টী সূর্য্যের মত দেশে উৎপাত জুড়িয়া দেয়। শ্যন্-য়ী বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই পাখীগুলি মারিয়া ফেলেন ও এই উৎপাত নিবারণ করেন। এই নয়টী অনৈসর্গিক পক্ষী যেখানে ছিল,

পরে দেখা গেল সেখানে নয় খণ্ড লাল রঙের পাথর পড়িয়া আছে।

পরে একটী নদীতে ভীষণ বন্যা হয়, বন্যায় নদীর জল কূল উপছাইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়। শুন্-য়ী-কে সেখানে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পাঠানো হয়। শুন্-য়ী দেখিতে পাইলেন, নদীর দেবতা Ho Po হো-পো, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া নিজ অনুচরদের সহিত নদীর জলের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহার ভগিনী Heng Ngo হেঙ্-ঙো। শুন্-য়ী তখনই হো-পোর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরে হো-পোর বাম চক্ষু বিঁধিয়া গেল। সদলে নদীর দেবতা পলাইয়া বাঁচিলেন, নদীর জল সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল। তখন শুন্-য়ী হেঙ্-ঙো-র চূড়াকার কবরী বাণ-বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দেবকুমারী হেঙ্-ঙো ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শুন্-য়ী তাঁহার অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। শুন্-য়ী এই দেব-তরুণীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পরে সম্রাট য়াও-এর অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই দেব-তরুণী হেঙ-ঙো পরে হইলেন চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

চীনদেশে সম্রাটের জীবৎকালে তাঁহার ব্যক্তিগত নাম কেহ উচ্চারণ করিত না। হান্ রাজবংশের সম্রাট Hiao Wen হিআও-ওএন্-এর ব্যক্তিগত নাম ছিল Heng হেঙ; এই নাম চন্দ্রদেবীর নামেও থাকায়, চন্দ্রদেবীর নাম বদলাইয়া Chhang-Ngo 'ছাঙ-ঙো'তে রূপান্তরিত করা হয়। সেই অবধি হেঙ্-ঙো এই নামেও পরিচিত।

ইতিপূর্ব্বে এক অতিকায় সর্প, এবং কতকগুলি বিশাল-দেহ বন্য বরাহ দেশের মধ্যে উৎপাত করিতেছিল, শুন্-য়ী যথাকালে তাহাদের বধ করিয়া প্রজাদের রক্ষা করিলেন। শুন্-য়ীর এই সমস্ত কার্য্য-কলাপ গ্রীক বীর হেরাক্লেসের কার্য্যাবলী মনে করাইয়া দেয়।

পশ্চিম-স্বর্গের দেবী, বিশ্বমাতা সী-ওআঙ্-মূ-র এক কন্যা, মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, dragon বা মহানাগের (চীনা ভাষায় Lin-এর) পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকাশমার্গ দিয়া নিজ বাসস্থান হইতে মাতার স্বর্গে আগমন করিলেন। মহানাগের বিচরণকালে গগনপথে একটী সুদীর্ঘ জ্যোতির রেখা রহিয়া গেল। রাজা য়াও নিজ প্রাসাদ হইতে দূরে আকাশে এই রেখা দেখিতে পাইলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ইহা কি তাহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল—তথ্য-উদ্ঘাটনের জন্য তিনি শুন্-য়ীকে অনুরোধ করিলেন।

শুন-য়ী হাওয়ায় উঠিয়া এই আলোকরেখা ধরিয়া তুষারাবৃত পর্ব্বতাবলীর মধ্যে সী-ওআঙ্-মূর স্বর্গের দ্বারে গিয়া পহুঁছিলেন। এক বিকটাকার কিম্পুরুষ তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাহিল—এক ঝাঁক বিরাটকায় ফীনিক্স ও অন্যান্য পক্ষী আসিয়া শুন্-য়ীকে আক্রমণ করিল। একবার ধনুকে টঙ্কার দিয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিতেই পাখীগুলি ভয়ে পলাইয়া গেল। তখন স্বর্গেব দ্বার খুলিল, এবং অনুচর-পরিবৃত দেবী সী-ওআঙ-মূ স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। শুন্-য়ী তাঁহাকে দেখিয়া সম্মানেব সহিত প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার প্রভু সম্রাট য়াও-এর নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি যে আকাশপথে অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিরেখার কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, একথা বলিলেন। তাহাতে সী-ও-আঙ-মূ ও তাঁহার অনুচরেরা সমাদবেব সহিত শুন-য়ীকে ভিতবে লইয়া গেলেন।

তাঁহার পরে শুন-য়ী দেবীকে প্রসন্না দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অমরত্বের বটিকা প্রার্থনা করিলেন—এই বটিকা-সেবনে মানুষ দেবতার মত অমরত্ব লাভ করে। তাহাতে দেবী তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন—"আগে আমার জন্য একটী দেবোচিত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দাও। গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে ও শিল্পে তোমার খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত।" তাহাতে শুন্-য়ী পশ্চিম পর্ব্বতের মধ্যে Pai Yu-Kuei Shan অর্থাৎ 'শ্বেত মণিশিলা-কূর্ম্ম পর্ব্বত' নামক রম্যস্থানে গিরিদেবতাদের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন—Jade বা হরিৎ মণিশিলার প্রাচীর, সুগন্ধি কাঠের চালের বাতা ও আবরণ, কাচের ছাত এবং agate আকীক পাথরের সিঁড়ি। এক পক্ষের মধ্যে ষোলটী প্রাসাদ পর্ব্বতের সানুদেশে প্রস্তুত হইয়া গেল। সী-ওআঙ-মূ প্রীত হইয়া শুন্-য়ীকে অমরত্বের বটিকা একটী দিলেন। এই বটিকার গুণে চিরজীবন লাভ করা যায়, এবং পাখীর মত হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ান যায়।

দেবী বলিয়া দিলেন—"এই বটিকা এখনই খাইও না। এক বৎসর ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া ও অন্য বিষয়ে তোমাকে নিয়ম পালন করিয়া থাকিতে হইবে—পরে তুমি এই বটিকা সেবনের উপযুক্ত অবস্থায় আসিবে।" দেবীর নির্দ্দেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া এই দেবদুর্ল্লভ বটিকা লইয়া শ্যন্-য়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যাত্রার কাহিনী সম্রাটের কাছে নিবেদন করিলেন। বটিকাটী এক বৎসর নিয়ম পালনের পরে খাইবেন স্থির করিয়া, এটীকে নিজ বাটীর ছাতের তলায় একটি বরগার বা চালের বাতার মাথায় লুকাইয়া রাখিলেন।

রাজার আদেশে শ্যন-য়ী-কে শীঘ্রই আবার রণসাজে যাইতে হইল। Tso Ch'ih ত্সো-ছিঃ অর্থাৎ 'ছেদনী-দন্ত' বা 'ছেনী দাঁত' নামে এক পাপ-প্রকৃতির ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য শ্যন্-য়ীকে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইল। ছেদনী-দন্ত এক গিরিগুহায় বাস করিত; তাহার চোখ ছিল ভাঁটার মত গোল, এবং একটী সুদীর্ঘ দ্রংষ্ট্রা ছিল। শ্যন্-য়ীর হাতে তাহার নিধন হইল; তাহার দীর্ঘ দাঁত বিজয়চিহ্ন স্বরূপ শ্যন্-য়ী কর্ত্তৃক রাজার নিকট উপহৃত হইল।

ইতিমধ্যে স্বামীর অবর্ত্তমানে হেঙ্-ঙো চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীর চালের বাতা হইতে একটী স্থির শুভ্র জ্যোতির রেখা বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য সৌরভে বাড়ীর সব ঘর ভরিয়া গিয়াছে। আলোকরেখা যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে মই লাগাইয়া উঠিয়া দেখিতেই এই আলো ও সৌরভের উৎপত্তি স্বরূপ অমরত্বের বটিকাটী তিনি পাইলেন। বটিকাটী লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া, ইহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সাত-পাচ না ভাবিয়া সেটী খাইয়া ফেলিলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল, শরীর অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উড়িয়া যাইতে পারিবেন।

এই অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হেঙ্-ঙো, Yu Huang য়ু-হুআঙ, নামে এক জ্যোতিষীর নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন। জ্যোতিষী তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ভবিষ্যতে এই ব্যাপার হেঙ্-ঙোর দেব-সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে। তখন তিনি হেঙ-ঙোকে বলিলেন—

"তরুণী বধূ! দ্রুত উড়িয়া যাও;
পশ্চিমের চাঁদের মধ্যে চলিয়া গিয়া নিরাপদ হও;
অন্ধকার এবং তমিস্রায় ভীত হইও না;
ভবিষ্যতে যুগে যুগে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে।"

হেঙ-ঙো তাহাতে উড়িয়া গিয়া চন্দ্রলোকে পঁহুছিলেন, এবং সেখানে ডোরাকাটা বেঙের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের একজন লেখক হেঙ্-ঙোর চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা ঐ রূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকের বর্ণনা আর একটু বিস্তৃত।

অমরত্বের বটিকা সেবনের পরে হেঙ-ঙো যখন উড়িবার শক্তি লাভ করিয়া উড়িয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী শ্যন্-য়ী আসিয়া উপস্থিত। বটিকা খুঁজিয়া না পাওয়ায় স্ত্রীকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে হেঙ-ঙো ভীত হইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া উড়িয়া পলাইয়া গেলেন। শ্যন্-য়ী তাঁহার ধনুর্ব্বাণ লইয়া পিছু ধাওয়া করিলেন। তখন রাত্রিকাল, পরিষ্কার আকাশে পূর্ণচন্দ্র। হেঙ-ঙো পূর্ণচন্দ্রের অভিমুখে উড়িয়া চলিলেন। শ্যন্-য়ী পূর্ণবেগে পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন কিন্তু স্ত্রীর কাছে পহুঁছিতে পারিলেন না—স্ত্রী শীঘ্রই দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া গেলেন—শেষে তাঁহাকে ভেকের মত ক্ষুদ্র আকারের দেখাইতে লাগিল। আরও জোরে শ্যন্-য়ী উড়িতে যাইবেন, এমন সময় খুব জোর হাওয়া আসিয়া শুখনা পাতার মত তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

হেঙ্-ঙো ক্রমে চন্দ্রলোকে গিয়া পহুঁছিলেন। বিরাট গোলাকার কাচের মত এই জগৎ, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ, অত্যন্ত শীতল। চন্দ্রলোকে একমাত্র দারুচিনি গাছ জন্মায়, আর কোনও গাছ-পালা নাই। জনমানবও দৃষ্ট হইল না। হেঙ-ঙো চন্দ্রলোকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া হঠাৎ কাশিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমরত্বের বটিকার উপরের আবরণটুকু উদ্গীরণ করিয়া মাটিতে ফেলিলেন, আর তাহা তখনই এক শ্বেতবর্ণ শশকের আকার ধারণ করিল। হেঙ-ঙো ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া শিশির ও দারুচিনি আহার করিলেন। অতঃপর চন্দ্রলোকেই বাস করিতে লাগিলেন।

শুন্-য়ী এদিকে প্রবল বাত্যা দ্বারা বাহিত হইয়া মেঘলোকে সী-ওআঙ ম-ব স্বামী তুঙ ওয়াঙ-কুঙ-এর প্রাসাদদ্বারে নীত হইলেন। তুঙ-ওআঙ-কুঙ তাঁহাকে বলিলেন—'এত দিনে তোমার শ্রমের অবসান হইবে। প্রবল বায়ুযোগে আমিই তোমায় এখানে আনিয়াছি। তোমার কার্য্যকলাপ দ্বারা তুমি দেবত্বের অধিকারী হইয়াছ। হেঙ-ঙো তোমার আহৃত বটিকা সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে—এখন সে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নয়টী মিথ্যা সূর্য্যকে বধ করিয়া তুমি সূর্য্যমণ্ডলের অধীশ্বর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হইবে—তোমাকে এই মণি দিতেছি এবং খাইবার জন্য এই লাল রঙ্গের পিষ্টক দিতেছি। ইহাদের বলে তুমি চন্দ্রলোকে যাইতে পারিবে - কিন্তু তোমার স্ত্রী সূর্য্যলোকে আসিতে পারিবে না।'

তুঙ-ওআঙ-কুঙ তারপর শুন্-য়ীকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। প্রতিদিন ভোরে সূর্য্যোদয় হয়, সে খেয়াল তাঁহাকে রাখিতে হইবে। ভোর যে হইতেছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বর্গে রক্ষিত কুক্কুট-পক্ষী তাঁহার সঙ্গে থাকা দরকার; কি করিয়া এই পক্ষী তাঁহার হস্তগত হয়, তাহার উপায় তিনি বলিয়া দিলেন।

শুন-য়ী এই কুক্কুট-পক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের সময়ে স্বর্গীয় কুক্কুট ডাক দেয়; পৃথিবীতে যত কুক্কুট আছে তাহারা ইহারই সন্তান, এই ডাক শুনিয়া তাহারাও ডাক দেয়।

কিছুকাল সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিবার পরে শুন-য়ীর মনে স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইল। সূর্য্য-রশ্মি অবলম্বন করিয়া তিনি চন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, দিঙমণ্ডল যেন বরফে জমা, এবং দারুচিনি-বনের মধ্যে হেঙ-ঙো একা বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া হেঙ-ঙোর আবার ভয় হইল। কিন্তু শুন-য়ী তাঁহাকে বলিলেন—'তোমাকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য আমি সূর্য্যলোক হইতে এখানে আসিয়াছি।' শুন-য়ী দারুচিনি গাছের কাঠ দিয়া নিজেদের জন্য চন্দ্রলোকে একটী প্রাসাদ তৈয়ারী করিলেন। সেই হইতে প্রতি পূর্ণিমায় আসিয়া তিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হন; য়াঙ বা পুরুষগুণান্বিত সূর্য্যদেবের সঙ্গে পূর্ণিমার রাত্রে য়িন বা প্রকৃতি-গুণান্বিত চন্দ্রদেবীর মিলন হয় বলিয়া, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের জ্যোতি এত উজ্জ্বল হয়।

এই কাহিনীর আর একটী সংক্ষিপ্ত রূপ আছে। হেঙ্-ঙো চলিয়া যাইবার পরে শুন-য়ী বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন ও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরে একদিন একজন কিশোর আসিয়া তাঁহাকে বলিল—'আমি আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি আপনার বিরহ-দুঃখের কথা জানেন। কিন্তু নিজ ইচ্ছামত তিনি আসিতে পারিবেন না। কেবল পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আকারের গোল পিঠা তৈয়ারী করিয়া আপনার বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে রাখিয়া স্ত্রীকে আহ্বান করিবেন। তাহা হইলে তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া চন্দ্র হইতে নামিয়া আসিবেন।' শুন্-য়ী এই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করেন, এবং স্ত্রীর সহিত এইরূপে তাঁহার মিলন হয়।

অতঃপর চন্দ্র ও সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পত্নী হেঙ-ঙো ও পতি শুন-য়ী বিরাজ করিতে লাগিলেন।

[৩] রাখাল ও বুননিয়া কন্যা

রাখাল ও বুনুনে মেয়ের উপাখ্যান চীনদেশে সুপরিচিত। Shi King শী কিঙ্ (Shih Ching শিঃ-চিঙ্) বা চীনা ঋগ্বেদে এই আখ্যানের উল্লেখ আছে; এই বইয়ে প্রাচীন চীনা লোকগাথা সংগৃহীত আছে, চীনা চিন্তা-নেতা Khung-Fu-Tsze খুঙ-ফূ-ৎসে (বা Confucius কন্‌ফুশিউস্) প্রাচীন গীতিকবিতা হইতে সংগ্রহ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে এই পুস্তক সঙ্কলিত করেন। হান যুগের (২০৬ খ্রীঃ পূঃ—২২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাস্কর্য্যেও এই কাহিনীর চিত্র অঙ্কিত আছে (চিত্র [ঙ] দ্রষ্টব্য)। বহু চীনা শিল্পী ও কবি আপনাদের চিত্রে ও কবিতাময় রচনায় এই দুই স্বর্গীয় প্রেমিকের কাহিনীর জয়গান করিয়াছেন। এখনও চীনাদের মধ্যে এই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বৎসরে একদিন উৎসব হয়। চীনদেশের তাবৎ দেব-কাহিনীর মধ্যে এইটী সব চেয়ে সুন্দর। বুনুনে মেয়ে (আধুনিক চীনায় Tsi-Nue বা Chih-Niue, প্রাচীন চীনায় Tsiek Nz'ywo, জাপানীতে Shoku-jo) ও রাখাল (আধুনিক চীনায় Khien-Niu বা Chhien Niu,

প্রাচীন চীনায় Khyæn Ngyow, জাপানীতে Keng-yu)—এই দুই দেবতা হইতেছেন আকাশ-মণ্ডলের কতকগুলি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুনুনে মেয়ে Vega নক্ষত্রে এবং Lyra নক্ষত্রমণ্ডলের দুইটী নক্ষত্রে অধিষ্ঠিতা, ও রাখাল Aquila নক্ষত্রমণ্ডলের তিনটী নক্ষত্রে অবস্থিত। শী-কিঙ্‌ গ্রন্থের দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম কবিতায় এই নক্ষত্রগুলির সহিত বুনুনে মেয়ে এবং গোরু-লইয়া-বেড়ান রাখালের সংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রূপালী নক্ষত্রের স্বর্ণদী প্রবাহিত; এই স্বর্গীয় নদীকে আমরা ছায়াপথ বলি। ইহার ধারে দেবতাদের রাখাল গোরু চরাইত। সূর্য্যদেবের প্রাসাদে তাঁত লইয়া বস্ত্রবয়নরতা কন্যাকে দেখিয়া রাখাল ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সূর্য্যদেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রাখাল এবং বুননিয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, কন্যা স্বামীর ঘরে গেল। স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল। আর সে কাপড় বুনে না, কোনও

[জ] বিরহ—বুননিয়া কন্যা ও রাখাল, মধ্যে ছায়াপথ। 'ল্যাকার' বা গালার কাজে অঙ্কিত জাপানী চিত্র।

বুনুনে মেয়ে সূর্য্যদেব শুন্‌-মীর কন্যা। ছেলেবেলা হইতেই এই কন্যা কাপড় বুনিতে এত ভাল বাসিত যে, আর কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। অন্যান্য দেবকন্যারা যেরূপ খেলাধুলা করিয়া বেড়াইত, ইহার সেদিকে আদৌ প্রীতি ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেবল কাপড় বুনিয়া যাইতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। তাহার হাতের বোনা এই কাপড় হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেবতারা পরিতেন।

কন্যা ক্রমে সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিল। সূর্য্যদেব দেখিলেন, এখন ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা হইলে হয় তো স্বামীর প্রেমের গুণে কাপড় বোনার প্রতি তাহার এতটা আকর্ষণ কমিবে। সূর্য্যদেবের প্রাসাদের পাশেই

কাজ করে না, কেবল নক্ষত্রময় নদীর তীরে স্বামীর সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহও তাহাকে তাঁতে বসাইতে পারিল না।

ইহাতে সূর্য্যদেব চটিয়া গেলেন। দুইজনের উপরে তাঁহার রাগ হইল। পতিপত্নীর প্রেমের এতটা আতিশয্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি রাখালকে হুকুম দিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া স্বর্ণনদীর অপর পারে গিয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। সূর্য্যদেব সর্ব্বশক্তিমান্‌, তাঁহার কথা অবহেলা করে কাহার সাধ্য? তাহাকে যাইতেই হইবে। তবুও সূর্য্যদেবকে সে বলিল—'আমায় কি চিরনির্ব্বাসন দিতেছেন? স্ত্রীর সঙ্গে কখনও দেখা হইবে না?'

সূর্য্যদেবের একটু দয়া হইল। তিনি বলিলেন—'বছরে একদিন করিয়া তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে। বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে।'

[ঝ] মিলন—রাখাল ও বুননিয়া কন্যা (প্রাচীন জাপানী শিল্পী হোকুসাই কর্তৃক কাঠে খোদাই করা চিত্র)।

তারপরে সূর্য্যদেবের হুকুমে শালিখ পাখীর মত বিস্তর পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিল, এবং পাখীগুলি মিলিয়া ডানা মেলিয়া স্বর্গীয় নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত এক সেতু প্রস্তুত করিল। স্বর্গনদী গভীর এবং প্রশস্ত, এইরূপ সেতু না হইলে পারাপারের উপায় ছিল না। রাখাল স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইল—স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। তারপরে পাখীদের পিঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেল। পাখীরা তখন উড়িয়া গেল।

বুনুনে মেয়ে তখন অক্লান্ত পরিশ্রমে কাপড় বোনা আরম্ভ করিল, রাখাল পূর্ব্বের ন্যায় মন দিয়া গোরু চরাইতে লাগিল। কিন্তু দুইজনের লক্ষ্যস্থল, কবে সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে উভয়ের মিলন হইবে (চিত্র [জ]।

পরে প্রার্থিত দিন আসে; মেয়ে ও রাখাল দুই জনেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাটায় —যদি ঐ দিন স্বর্গে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের নদীতে জল উপছাইয়া যাইবে, পাখীর ডানার সাঁকো আর সম্ভবপর হইবে না—উভয়ের মিলন আর এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে। দেবতাদের কাছে দুই জনে প্রার্থনা করে —যেন ঐ দিন বৃষ্টি না হয়। বৃষ্টি না হইলে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, শালিখপাখীরা যথাস্থান হইতে আসিয়া ডানা জড়াইয়া সাঁকো বানাইয়া দেয়, রাখালের স্ত্রী দ্রুতগতিতে নদী পার হইয়া স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয় (চিত্র [ঝ])। তার পরের দিনই তাহাকে এক বৎসরের জন্য বিদায় লইতে হয়।

এই ভাবে স্বর্গের এই প্রেমিক যুগলের মিলন ও বিরহের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিবসে পৃথিবীর নরনারীরাও তাহাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেয়, ঐ দিন যেন বৃষ্টি না হয়, তাহাদের মিলনে যেন বাধা না পড়ে। এবং ঐ দিন বৃষ্টি না হইলে, চীনদেশের নরনারী স্বর্গীয় প্রেমিক যুগলের মিলনে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে।

আর এক দিক

স্পেনের ২ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর ১ কোটি লিখিতে পড়িতে পারে না। প্রাইমো দে রিভেরা এই নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থ বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করেন। তন্মধ্যে 'শিশুদের উদ্যান-পাঠাগার' এই কল্পে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। উদ্যানটি মদ্রিদে অবস্থিত, বেলা ৯টায় উদ্যানের দ্বার খোলা হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ করা হয়। উদ্যানের গাছের ছায়ায় সারি সারি বেঞ্চি আছে; হাজারে হাজারে ছেলে সকাল হইতে সেখানে বসিয়া যত রকমের বই সমস্ত পড়িতে পায়। স্পেনের সর্ব্বত্র এই ধরণের উদ্যান-পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীসুকুমার সেন

[৩৩]

গোবিন্দদাস-চক্রবর্ত্তীও শ্রীনিবাস-আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ভগবৎপ্রেমিকতার জন্য ইনি 'ভাবক-চক্রবর্ত্তী' নামে আখ্যাত হইতেন। ইহাঁর বাসস্থান ছিল বোরাকুলি গ্রাম। ইহাঁর পত্নীর নাম ছিল সুচরিতা, এবং তিন পুত্রের নাম ছিল যথাক্রমে রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ এবং কিশোরী-দাস।

রসকল্পবল্লী-র রচয়িতা গোপাল-দাসের মতে, পদকল্পতরু-ধৃত ১৭০৪ সংখ্যক পদটি চক্রবর্ত্তীর রচনা এবং পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন-ঠাকুরের মতে, পদকল্পতরু-ধৃত ১৩৩, ২৬৭, ২১৭ এবং ১৯৫৬ সংখ্যক পদগুলিও চক্রবর্ত্তীর রচিত। পদকল্পতরু-র সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের মতে একটি বারমাস্যা কবিতার [পদকল্পতরু, ১৮০২-১৮১৩] শেষ ছয়টি পদ গোবিন্দদাস-চক্রবর্ত্তীর রচনা। চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনা করিতেন। 'গোবিন্দদাস' এবং 'গোবিন্দ-দাসিয়া' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদগুলি প্রায় সবই চক্রবর্ত্তীর উপর আরোপিত হইয়া থাকে। তবে এরূপ পদ কতকগুলি গোবিন্দ-আচার্য্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। নিম্নে এইরূপ দুইটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি কৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতিকালে রাধার বিরহবেদনার বর্ণনা; দ্বিতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার বা গোপীদের নিকুঞ্জে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ।
এইখানে করিত কেলি নাগররাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কহে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥*

শুনিঞা মধুর মুরলী তান
সহিল নহিল রসের প্রাণ
অন্তরে ভেদল মদন-বাণ
চলল নিকুঞ্জ মাঝে রে।
অঙ্গে পহির ১ জলদবাস
বিধির অবধি লাসবিলাস
প্রেম ঢলঢল ঈষত হাস
শ্যামমোহিনী সাজে রে। ২
কুটিল কুন্তলে ৩ কবরী রাজ
রতনজড়িত থোপার সাজ ৪
কনকচম্পক ৫ মাঝহি মাঝ
মল্লিকা মালতী ঘেরিয়া।
জিনি সরোরুহ চরণদ্বন্দ্ব ৬
নখমণি তাহে বিধুকে নিন্দ
রসের আবেশে গমন মন্দ
মদন কান্দয়ে হেরিঞা॥
রচিঞা মঙ্গলকেলি-সুসাজ
চৌদিকে বেড়িঞা নাগরিরাজ ৭
প্রবেশ করল নিকুঞ্জ মাঝ
মিলল৮ শ্যামরায় রে।

---

* পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৬৫৫।

১। 'পহিল' সজনীবাবুর পুঁথি, 'পহিরল' সঙ্কীর্ত্তনামৃত।

২। 'মধুর মধুর কোমল হাস
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে রে॥' সঙ্কীর্ত্তনামৃত।

৩। 'চাচর চিকুরে' সঙ্কীর্ত্তনামৃত।

৪। 'রতনে বেড়িত অপন সাজ' সজনীবাবুর পুঁথি।

৫। 'কুন্দ কনয়' সঙ্কীর্ত্তনামৃত।

৬। 'চরণচন্দ' সজনীবাবুর পুঁথি।

৭। 'রচিঞা মণ্ডল কেলি সুসার চৌদিক গোপিনি মাঝে বাজার প্রবেশিল্যা কুঞ্জকানন মাঝ' সজনীবাবুর পুঁথি।

৮। 'মিলল তহি' সঙ্কীর্ত্তনামৃত।

নয়নে নয়নে মীলল কাহ্নু
উপজল কত রসের বান
ও রসসাগরে গোবিন্দ ডুবল ১
কি দিব উপমা তায় রে ॥২

[৩৪]

ষোড়শ শতকের শেষভাগের পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে রায় বসন্ত, কবিরঞ্জন এবং রায় শেখরের নাম করিতে হয়। কবিরঞ্জনের ভাল ভাল পদগুলি সব বিদ্যাপতির নামেই চলিতেছে। কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এবং রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল।[৩] রায় বসন্ত নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। রায় শেখর রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। ইনি 'রায় শেখর' 'কবিশেখর', 'কবি শেখর রায়,' 'শেখর রায়', 'শেখর', 'দুখিয়া শেখর', 'পাপিয়া শেখর', 'শেখরদাস' ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। ভাল, মন্দ এবং মাঝারি রকমের বিস্তর পদ রায় শেখর রচনা করিয়া ছিলেন। গো পা ল বি জ য় নামক একখানি 'শ্রী কৃ ষ্ণ-ম ঙ্গ ল' জাতীয় কাব্যও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজবুলি কবিতা রচনার দক্ষতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিরঞ্জন এবং রায় শেখরের নাম করিতে হয়। রায় শেখরেরও অনেক ভাল ভাল ব্রজবুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সুবিখ্যাত পদটি পীতাম্বর-দাসের অ ষ্ট র স ব্যা খ্যা য় এবং প দ র ত্না ক রে শেখরের ভণিতাতেই পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেখরের ভণিতাযুক্ত ছত্রটিই সঙ্গততর পাঠ বলিয়া মনে হয়।

এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাতমোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর কৈছে নিরবহ৪
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥৫

শেখরের রচিত আর একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশবদ পদগতি চললিহ থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নবযৌবনভার॥
কমলিনী মাঝা খিনি উচ কুচজোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা।
নব-অনুরাগিণী নবরসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥৬

[৩৫]

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবগুলিতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রধান প্রধান পদকর্ত্তাদের পরিচয় দিয়াছি। অপ্রধান পদকর্ত্তা অর্থাৎ যাঁহারা অনধিক পাঁচ ছয়টি পদ রচনা করিয়াছিলেন (অথবা যাঁহাদের ঐরূপ সংখ্যার পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে) তাঁহারা সংখ্যায় সুপ্রচুর। এই সকল পদকর্ত্তাদের কোন

১। 'সে রসে হিলোলে গোবিন্দদাস' সজনীবাবুর পুঁথি।

২। সজনীবাবুর পুঁথি; সঙ্কীর্ত্তনামৃত, পদসংখ্যা ৩২৯।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩।

৪। 'বঞ্চব' পাঠান্তর।

৫। সাধারণ প্রচলিত ভণিতা হইতেছে 'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' প দ ক ল্প ত রু, পদসংখ্যা ১৭৩৫। এখানে দিনের কথা আসে না শুদ্ধ রাত্রির উল্লেখই যুক্তিযুক্ত।

৬। প দ ক ল্প ত রু, পদসংখ্যা ২৭০৬।

কোন পদ অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য পদকর্ত্তাদের পদের তুলনায় হীন নহে। এই কারণে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম করিতেই হয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে ষোড়শ শতকের পদকর্ত্তাদের (পূর্ব্বে যাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে ছাড়া) পরিচয় খুব সংক্ষেপেই দেওয়া যাইতেছে।

মহাপ্রভুর সঙ্গী ও ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। মুরারি-গুপ্ত, নরহরি-সরকার, রামানন্দ-বসু, বাসুদেব-ঘোষ, মাধব-ঘোষ, গোবিন্দ-ঘোষ, বংশীবদন—ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাসুদেব-দত্তকে শ্রীচৈতন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।[১] 'শিবানন্দ' ভণিতা-যুক্ত পদগুলির মধ্যে একটি মাত্র পদকে[২] শিবানন্দ সেনের রচিত বলিতে পারা যায়: বাকীগুলি প্রায় সবই গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর শিবানন্দ-আচার্য্য বা শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দ-আচার্য্য নামে মহাপ্রভুর এক ভক্ত বড় পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।[৩] দুইটি পয়ার শ্লোক "শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য ঠাকুর"-এর রচনা বলিয়া রসকল্পবল্লী-তে উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] ইনি ধারাবাহিক ভাবে বৃন্দাবন লীলাবিষয়ে পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।[৩] সম্ভবতঃ ইনি 'গোবিন্দদাস' অথবা 'গোবিন্দদাসিয়া' এই ভণিতা ব্যবহার করিতেন। এই কারণেই বোধ হয় যে ইঁহার পদ পরবর্ত্তী গোবিন্দদাস-দ্বয়ের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কতকগুলি পদ গোবিন্দ-আচার্য্যের রচনা বলিয়া ধরা পড়ে। এখানে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। একটি গৌরচন্দ্রিকা পদের ভণিতা শ্লোকটি এইরূপ,

এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পুড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাতী হৈনু॥[৫]

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পদকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং এই পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজ কিংবা গোবিন্দদাস-চক্রবর্ত্তীর রচনা হইতে পারে না। পদকল্পতরু, সংকীর্ত্তনামৃত এবং অন্যান্য পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় দানলীলাসংক্রান্ত কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অল্প কয়েকটি পদে[৬] দেখা যায় যে, রাধাপ্রমুখ গোপীরা স্বর্ণঘটে করিয়া দাসীর সাহায্যে যজ্ঞার্থ ঘৃত লইয়া যাইতেছেন এবং এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণকে সঙ্গে লইয়া দানছলে রাধাকে অবরোধ করিয়াছেন। দানলীলার এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, এই পদগুলি শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলীকৌমুদী ইত্যাদি গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা। অপর পদগুলি সংখ্যায় বেশী; সেগুলিতে দেখা যায় যে, রাধাপ্রমুখ গোপীরা দধি দুগ্ধ ঘৃত মাথায় করিয়া মথুরায় বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। দানলীলার এই রূপটিই প্রাচীন এবং সঙ্গত। যদিও এই রূপ ভাবের দানলীলার বর্ণনা ষোড়শ শতকের পরবর্ত্তী কালে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, তথাপি একথা স্বীকার করিলে বিশেষ ভুল হইবে না যে, এইরূপ পদগুলি প্রায়শঃই ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল। 'গোবিন্দদাস' ভণিতাযুক্ত এইরূপ একটি প্রাচীনগন্ধি দানলীলার পদের সম্বন্ধে একটু মজার ব্যাপার আছে। পদকল্পতরু-তে[৭] যে পাঠ মুদ্রিত আছে তাহার মধ্যে এই ছত্রটি আছে, "সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার": পদরত্নাকর,

১। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদসংখ্যা ২১৭। বটতলা সংস্করণে শুদ্ধ বাসুদেবের ভণিতা আছে। পদকল্পতরু-তে [২৯২৫] পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

২। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৮২।

৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-য় কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন,

পৌর্ণমাসী ব্রজে যাসীদ্ গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্যশ্রীলগোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ ॥ ৪১ ॥

মাধব দাসের বৈষ্ণববন্দনা-য় আছে,

গোবিন্দ-আচার্য্য পদ করিল বন্দন।
রাধাকৃষ্ণরহস্য যে করিল বর্ণন ॥ [পৃঃ ২০] ॥

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা-য় আছে,

গোবিন্দ-আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী ॥

৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃ: ১১৫।

৫। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী।

৬। যথা, পদকল্পতরু, ১৩৭৩। ৭। পদসংখ্যা ২৩০৯।

সংকীর্ত্তনামৃত এবং পদামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে ঘৃতের স্থলে "দধির" পাঠ আছে এবং অতিরিক্ত এই পয়ারটিও আছে,

সবে১ আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি।
ইহাতে পাইবে কোন সিধি।

পদকল্পতরু-তে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পয়ারটি বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং 'দধির' এই পাঠ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পদটি এবং এই জাতীয় কতকগুলি পদ আমি গোবিন্দ-আচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে করি।

নিত্যানন্দ-প্রভু, অদ্বৈত-প্রভু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যান্য পারিষদ এবং শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি ছোটখাট পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন-দাস কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'বৃন্দাবনদাস' ভণিতার অনেকগুলি পদ এক পরবর্ত্তী কবির রচনা। একটি ভাল ব্রজবুলি পদ[২] বৃন্দাবন-দাসের লেখা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। এই পদটি কিন্তু কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী-তে গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম-দাসের একটি পদের সহিতও এই পদটির কিছু সাদৃশ্য আছে। চন্দ্র-শেখর-আচার্য্যরত্ন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ব্যক্তি, নাম 'আচার্য্য চন্দ্র' নিত্যানন্দ-প্রভুর পারিষদ ছিলেন। ইঁহার রচিত একটি নিত্যানন্দবন্দনার পদ শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পুঁথিতে এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত একটি পুঁথিতে পাইয়াছি। 'পরমেশ্বরদাস' ভণিতায় একটি পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পদটির রচয়িতা নিত্যানন্দ-প্রভুর ভক্ত পরমেশ্বর-দাস বা পরমেশ্বরী-দাস কি না বলা কঠিন। দ্বিজ হরিদাসের নামসঙ্কীর্ত্তন শীর্ষক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নামসংবলিত কবিতাটি ছাড়াও কতকগুলি পদ প্রচলিত আছে। ইনি মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব-আচার্য্য অদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য ছিলেন। মাধবদাস ভণিতায় কোন পদ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইনিই যে 'মাধবদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। নিত্যানন্দ-প্রভুর জামাতা এক মাধব আচার্য্য ছিলেন। তিনি পদকর্ত্তা ছিলেন কিনা জানা নাই।

'মাধবীদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে প্রায় সকলেই উড়িয়া মহিলা মাধবী মাহিতীর রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা যুক্তিলেশহীন অনুমান মাত্র। 'মাধবী-দাস' ভণিতার একটি পদ[৩] হইতে অনুমান হয় যে, পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর বিশিষ্ট পারিষদ জগদানন্দ-পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি পদের ভণিতায় 'মাধুরীদাস' এই পাঠান্তর পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা কানুদাস সদাশিব-কবিরাজের পৌত্র এবং পুরুষোত্তম-গুপ্তের পুত্র ছিলেন। কানুদাসও নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত এবং অনুচর ছিলেন।[৪] পুরুষোত্তম-গুপ্তের শিষ্য দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় এবং বৈষ্ণব অভিধানের রচয়িতা। ইনি কতিপয় পদও লিখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-দাস ভণিতায় যে পদগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলি না হউক অন্ততঃ বেশীর ভাগই বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের রচনা। 'শিবানন্দ' 'শিবাই' ভণিতার অধিকাংশ পদ গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শিবানন্দ-চক্রবর্ত্তীর রচনা। গদাধরদাসের শিষ্য যদুনন্দন-চক্রবর্ত্তী একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন; ইঁহার পদগুলির অধিকাংশই পরবর্ত্তী কবি বৈদ্য যদুনন্দনের পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কবিকর্ণ-পূরের এক শিষ্য ছিলেন উদ্ধবদাস নামে, ইনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার অধিকাংশ পদ পরবর্ত্তী উদ্ধবদাস-এর পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী উদ্ধবদাস অষ্টাদশ শতকের লোক। ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ-সেন ওরফে বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণকান্ত-মজুমদার। উভয় বন্ধুই হরি-আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন-ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'আত্মারাম' বা 'আত্মারামদাস' ভণিতায় দুই একটি পদ পাওয়া যায়। এই আত্মারাম সম্ভবতঃ প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের পিতা ছিলেন। এই নিত্যানন্দ দাসের রচিত কয়েকটি পদ কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু-তে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি এবং পদকল্পতরু-তে 'গুপ্তদাস' ভণিতায় একটি পদ আছে। পদটি নিত্যানন্দ বন্দনা। অনুরূপ শেষচরণযুক্ত আর একটি পদ পাওয়া গিয়াছে।[৫] এই পদটি নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম মুখ্য পারিষদ

১। 'তাহে' পাঠান্তর। ২। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৪৬৮।

৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৮৫৩। ৪। ঐ, পদসংখ্যা ২৩২১ দ্রষ্টব্য। ৫। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৯৮২ সংখ্যক পুঁথি।

অভিরাম-দাসের বন্দনা। সুতরাং 'গুপ্তদাস' মুরারিগুপ্ত হইতে পারেন না; ইনি অভিরাম-দাসের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

'যদুনাথ' ভণিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। যদুনন্দন-চক্রবর্ত্তী এবং বৈদ্য যদুনন্দন ইঁহারা উভয়েই ছন্দের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে যদুনন্দনের স্থলে 'যদুনাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যদুনাথ নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। কতকগুলি পদদৃষ্টে ইঁহাকে ষোড়শ শতকের লোক বলিয়া মনে হয়। ইনিই নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুচর যদুনাথ কবিচন্দ্র ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু ইঁহার রচিত কোন নিত্যানন্দ বন্দনা পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি পদ কোন অর্ব্বাচীন যদুনাথের রচিত বলিয়া অনুমান হয়।

পদকল্পতরু-তে চন্দ্রশেখর ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে তাহা শশীশেখরের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচিত। পদ তিনটির মধ্যে দুইটি গৌরচন্দ্রিকা; এই দুইটি পদ পাঠ করিলে অনুমান হয় যে কবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। মহাপ্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্নই এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই সাধারণের ধারণা। আমার কিন্তু মনে হয় এই পদকর্ত্তা নরহরি-সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্য চন্দ্রশেখর[১] ভিন্ন আর কেহই নহেন। পদকল্পতরু-ধৃত তৃতীয় পদটি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ইনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পরিষদ চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্ন হইতে পারেন না। সঙ্কীর্ত্তনামৃতে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতায় যে দুইটি ব্রজবুলি পদ আছে, তাহাও এই শ্রীখণ্ডীয় চন্দ্রশেখরের রচনা বলিয়া অনুমান করি। পদকল্পতরুতে 'লক্ষ্মীকান্ত-দাস' ভণিতায় একটি গৌরচন্দ্রিকা পদ আছে। ইনি নরহরি-সরকার ঠাকুরের শাখা "লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর পূজারী"[২] বলিয়া বোধ হয়। পদকল্পতরু-স্থিত 'বিজয়ানন্দদাস' ভণিতার পদটি মহাপ্রভুর আঁখরিয়া বিজয়-দাসের রচনা বলিয়া সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে। ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, কারণ ঐ গৌরচন্দ্রিকা পদটি পাঠ করিলে বোধ হয় যে পদকর্ত্তা মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন।

পদকল্পতরুতে 'গৌরীদাস' ভণিতায় দুইটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রথম পদটি কোন কোন পুঁথিতে 'গৌরদাস' ভণিতায় এবং কীর্ত্তনানন্দে ভণিতাহীন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদটি নিত্যানন্দ প্রভুর কোন অনুচরের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ইনি গৌরীদাস-পণ্ডিতও হইতে পারেন, গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়াও হইতে পারেন। ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি-তে 'শঙ্কর-ঘোষ' ভণিতার একটি ব্রজবুলি এবং একটি বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায়। ব্রজবুলি পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে 'মুকুন্দদাস' ভণিতায় দুইবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আর বাঙ্গালা পদটি পদকল্পতরুতে বৃন্দাবন-দাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পদ দুইটি যদি যথার্থই শঙ্কর-ঘোষের হয়, তবে প্রমাণান্তরের অভাবে তাঁহাকে মহা-প্রভুর সমক্ষে যিনি শিবের গান গাহিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা অনুচিত নহে। 'দাস' স্থলে 'ঘোষ' ভণিতা হইতে বুঝা যায় যে, ইনি ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধের লোক। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে 'মহেশ বসু' ভণিতার ব্রজবুলি পদটি পদরসসারে রামানন্দ-বসুর ভণিতায় পাওয়া যায়।[৩] পদটি যদি সত্যই মহেশ বসুর রচনা হয় তাহা হইলে 'বসু' এই পদবীযুক্ত ভণিতাদৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, ইনি ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু-তে 'গোপীকান্ত-বসু' ভণিতায় একটি বাঙ্গালা পদ পাইয়াছি। ইনিও ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধের লোক হইবেন।

পদকল্পতরু-তে 'কৃষ্ণদাস' ভণিতার পদ তিনটি[৪] এবং 'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতায় মিশ্র ব্রজভাষায় রচিত পদটি[৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচনা হইতে পারে। 'দীন কৃষ্ণদাস' 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' এবং 'দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতার পদ তিনটি[৬] শ্যামানন্দের রচনা হওয়াই সম্ভব। শ্যামানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুশিষ্য, আর এই পদ তিনটিতে গৌরীদাসের প্রতি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগ্রহ বর্ণনা করা হইয়াছে। গৌরীদাস-পণ্ডিতের এক ভ্রাতার নাম ছিল কৃষ্ণদাস। তিনিও এই পদগুলির রচয়িতা হইতে

১। রামগোপাল-দাস প্রণীত শাখানির্ণয়, পৃঃ ৬-৭ দ্রষ্টব্য।
২। ঐ, পৃঃ ৭।

৩। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পদসংখ্যা ৪১৩। ৪। পদ-সংখ্যা ২৮৫৯, ২৮৬০। ৫। ঐ, ১০৮৫। ৬। ঐ, ২৩৫৮-২৩৬০।

পারেন। গোপাল ভট্টের রচিত তিনটি ব্রজ ভাষায় রচিত পদ[১] পদকল্পতরু-তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

[৩৬]

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের রচিত গুটিপাঁচেক পদ পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে লোচন-দাসের প্রভাব থাকিলেও পদটিকে প্রশংসা করিতে হয়। কর্ণানন্দ [ষষ্ঠ নির্য্যাস] এবং পদকল্পতরু-স্থিত [৭৯০] পাঠ মিলাইয়া নিম্নের পাঠ স্থির করা হইয়াছে। শ্লোকের পর্য্যায় দুইটি পুস্তকে পৃথক্ রকম। আমি কর্ণানন্দের পর্য্যায়ই গ্রহণ করিতেছি।

বদনচাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কেনা কুন্দিলে দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥
রতন কাটিয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোনায় মড়িত তার পাশে।
বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥২
মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিনু গো
এই বড় মরমের ব্যথা॥
অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥
করভের কর যিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশরস মাগে॥
অমিয়া-মাথল কিবা চন্দন তিলক গো
কপালে সাজিয়া দিল কে।
নিরখিয়া চাঁদমুখ কেমনে ধরিব বুক
পরাণে কেমনে জীয়ে সে॥৩

চরণে নূপুরধ্বনি খঞ্জনরব জিনি
গমন মন্থর গজমাতা।
অমিয়া রসের ভাসে ডুবল শ্রীনিবাসে ৪
প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ৫

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের বিষয় পরে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের কবিদিগের সহিত একত্রে আলোচনা করা যাইবে। গোবিন্দ-দাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রধান কতিপয় পদকর্ত্তাদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

[৩৭]

শ্রীচৈতন্যের জীবনী গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করিয়া এক নবতর সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝাইত তাহার উপজীব্য বিষয় ছিল পৌরাণিক ও ছদ্ম পৌরাণিক কাহিনী এবং লোকসমাজে প্রচলিত সামান্য দেবদেবীর তুচ্ছ রাগদ্বেষ এবং সন্তুষ্টির আখ্যান। এইরূপ সঙ্কীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়া মানুষের শাশ্বত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল। যোগীপাল মহীপালের গীত আমরা পাই নাই, তথাপি একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়া সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন কোন কিছু রচিত হয় নাই। ষোড়শ শতকের প্রথম দশক হইতে গীতি কবিতায় এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দশক হইতে জীবনীকাব্যে শুধু ঐতিহাসিক নহে, একজন সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই সময়ের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালীর মন তথা সাহিত্য এক বৃহত্তর মুক্তির আস্বাদ ও আনন্দ লাভ করিল। এইখানেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার বীজ উপ্ত হইল।

ষোড়শ শতকের প্রথম দশক হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্র অবলম্বনে গীতি-কবিতার রচনা সুরু হয়। তাহার পরে জীবনীকাব্য রচনা হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্যটি সংস্কৃতে রচিত। ইহার নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত; তবে সাধারণতঃ ইহা মুরারিগুপ্তের কড়চা নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা আনুমানিক ১৫২০

১। ঐ, ১০৮৮, ২৮৩৩, ২৯৬৬।

২। ইহার পরে কর্ণানন্দে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে,

সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি॥

৩। এই শ্লোকটি পদকল্পতরুতে নাই।

৪। 'ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো' কর্ণানন্দের পাঠ।

৫। পদকল্পতরুতে এই শ্লোকটির পাঠ এই রকম,

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাসদাস কয় লখিলে লখিল নয়
প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥

খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত হইয়াছিল। তাহার পরে যে সকল জীবনী রচিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সবগুলিই বাঙ্গালায় লেখা। কেবল কবিকর্ণপূরের শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ ন্দ্রো দ য় নাটক এবং শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত মহাকাব্য সংস্কৃতে রচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এই জীবনী কাব্য রচনার রীতি বৈষ্ণব কবিরা কোথা হইতে শিখিলেন? কেহ কেহ ইহার মধ্যে বিদেশী প্রভাব দেখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ সমালোচকদিগের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের নাই, অপিচ সাধারণ লোকে তথ্যযুক্তি চায়, আপ্ত উক্তি চায় না। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ অচল। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে এই যে চরিতকাব্য-রীতি, ইহার মূলে সংস্কৃত সাহিত্যেরই প্রভাব রহিয়াছে। নামে 'চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল' হইলেও এই জীবনীকাব্য গুলিতে 'মঙ্গল'-কাব্যের যে বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা কিছুই নাই। 'মঙ্গল'-কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে দেবদেবীর কারণে অকারণে মানবের বা ভক্তের উপর ক্রোধ, তাহার পর তাহাকে বিধিমত নিগ্রহ করিয়া তাহার নিকট হইতে পূজা আদায় করা। 'চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল' কাব্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তু। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে সংস্কৃত ভাষায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা মহাপুরুষদিগের জীবনী লইয়া কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে হ র্ষ চ রি ত, শ ঙ্ক র বি জ য়, ন ব সা হ সা ঙ্ক চ রি ত, রা ম চ রি ত ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করিতে পারা যায়। এই জাতীয় কাব্যের অনুকরণেই মুরারি-গুপ্ত তাঁহার কড়চা রচনা করেন, এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বৃন্দাবনদাস এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কবিরা চৈতন্যচরিত কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি করেন। বাস্তবতঃও 'মঙ্গল'-কাব্যের সহিত চৈতন্যচরিত সাহিত্যের কোন মিল নাই। 'মঙ্গল'-কাব্য কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত হয় নাই, অথচ চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি সবই পরিচ্ছেদাদিতে বিভক্ত। চৈতন্যচরিত সাহিত্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রধান প্রধান ভক্তদিগের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলিও বুঝিতে হইবে। সপ্তদশ শতকের প্রথম হইতেই এই আদর্শে গৌড়ীয় মহান্তদিগের (বিশেষ করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্য এবং তাঁহার সহকর্ম্মী নরোত্তম-ঠাকুর এবং শ্যামানন্দের) জীবনী ও মাহাত্ম্য বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। এই গ্রন্থগুলি আধুনিকপূর্ব্ব ইতিহাসের অনেকটা অভাব পূরণ করে।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন পারসীক হইতে

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ইন্দ্রের অশনি তুমি তরল করিয়া
তুফান-জাগানো চোখে এনেছ ভরিয়া
হে সুন্দরি! সমুদ্রের দুরন্ত জোয়ার
ইঙ্গিতে স্তম্ভিত করি রেখেছ তোমার
নয়নের উপকূলে। কালবৈশাখীর
বঙ্কিম ভ্রূকুটি তব ভ্রূলতায় স্থির।
সূর্য্যাস্তের মেঘ-চাপা দুঃসহ রঙ্গিমা
কবরীর করবীতে খুঁজিছে প্রতিমা।

অয়ি মোর অদৃষ্টের অকালবৈশাখী
কুসুমে বিষম তুমি ইন্দ্রের আয়ুধ।
আকাশে ভাসালে লক্ষ অশ্রুর বুদ্বুদ
দুঃখ দ্রাক্ষা নির্য্যাসিত সৌভাগ্যের সাকী।
ঝঞ্ঝার দিগন্ত হ'তে বজ্র দাও হানি
সমস্ত অস্তিত্ব মোর উঠুক তুফানি'॥

কৌলজ্ঞাননির্ণয়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি

সুহৃদ্বরেষু—

তুমি যে মৎস্যেন্দ্রনাথের একখানি পুঁথি নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছ, আর সে পুঁথির হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষরে পরিণত করছ, সে সংবাদ আমি গত চৈত্র মাসের উদয়ন পত্রিকার মারফৎ আর পাঁচজনকে দিই। *

পুঁথি পড়া শুনতে পাই বিশেষ কষ্টসাধ্য। এ কথায় আমি বিশ্বাস করি, কারণ আমি অনেকের লেখা বাঙলা চিঠিই পড়তে পারিনে; সুতরাং সংস্কৃত পুঁথি পড়া যে সকলের পক্ষেই কষ্টসাধ্য, তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। বিশেষতঃ যে অক্ষরে পুঁথি লেখা হয়, তারও যুগে যুগে রূপ-পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং দেবনাগরী অক্ষরের অপরিচিত রূপের অন্তরে তার পরিচিত রূপ আবিষ্কার করা শুধু পরিশ্রমসাধ্য নয়, অনেকটা জ্ঞানসাপেক্ষ। **Paleography** নামক যে শাস্ত্রের নাম শুনে আমরা ভয় পাই, সে শাস্ত্রের উপর অধিকার না থাকলে পুরোনো লেখা পড়াই অসম্ভব, তার অর্থ উদ্ধার করা ত অসাধ্য।

এ সব শাস্ত্রে যে তোমার অধিকার আছে, তা আমি জানি। কোন পুরোনো পুঁথিকে তুমি পুস্তকে রূপান্তরিত করলে, তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি। সুতরাং মৎস্যেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত পুঁথি, আমাদের পরিচিত রূপে প্রকাশিত হলে যে, তা শুধু কাগজের উপর কালীর আঁচড় হবে না, তা আমি জানতুম। সে জন্য উক্ত গ্রন্থ যে তুমি প্রকাশ করছ. এ সংবাদকে আমি সুসংবাদ মনে করি,— এবং সেই কারণে সে সংবাদ আর পাঁচজনকে দিই।

অতঃপর মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলজ্ঞাননির্ণয় ছাপাখানা থেকে বেরিয়েছে, এবং আমার হস্তগত হয়েছে। এখন উক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে দু'চার কথা আমি বলতে চাই—অপণ্ডিত হিসেবে।

আমি উদয়নে লিখেছিলুম যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি দুটি প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে থেকে আশা করি। প্রথম প্রশ্ন এই যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধ না হিন্দু? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তিনি বাঙালী না নেপালী? প্রথম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, কেননা ও প্রশ্নের কোনও সার্থকতা নেই।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের ভিতর এমন কিছু প্রভেদ নেই যে, ও দুটিকে একই বৃন্তের দুটি ফুল না বলা যেতে পারে। আদিতে হয়ত বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে স্পষ্ট প্রভেদ ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে প্রভেদ অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছিল। আজকের দিনে বাঙলা-দেশে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি, তা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। আর যে মনোভাব থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত হয়েছে, সে মনোভাব এ দেশের লোকের পক্ষে সনাতন। অন্ততঃ আমার ধারণা এইরূপ।

এখন তন্ত্রশাস্ত্রের কথায় ফিরে আসা যাক্। এ শাস্ত্রের অন্তরে শিব ও বুদ্ধ মিলিত হয়ে গেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের পিছনে যদি কোনও দর্শন থাকে, তাহলে সে দর্শন যে কতটা শূন্যবাদ ও কতটা শক্তিবাদ, বিশেষজ্ঞেরাই বলতে পাবেন। আমার কাছে ত উক্ত দর্শন Nihilism এবং Pantheismএর খিচুড়ি বলে মনে হয়। সর্ব্বাস্তিবাদ যে তর্কের ঠেলায় শূন্যবাদে পরিণত হয়, তার প্রমাণ বৌদ্ধ-দর্শন। সর্ব্ব-নাস্তির মূলে আছে সর্ব্ব অস্তি। কিন্তু কোনও দার্শনিক মতবাদ থেকে তন্ত্রশাস্ত্র উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশে যে কটি দর্শন গণ্য ও মান্য, সে সব দর্শনের কথা ত তান্ত্রিক সাধকেরা মিথ্যাবাদ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এর পরিচয় তোমার প্রকাশিত অকুলবীর তন্ত্রে পাবে আর কুলার্ণবে ও পাবে। যে সাধনার উদ্দেশ্য ভুক্তি মুক্তি দুই লাভ করা, সে সাধনা মোক্ষশাস্ত্রের দিকে আধা পিঠ ফেরাতে বাধ্য। তন্ত্রশাস্ত্র আমার মতে কি, তা পরে বলব; কিন্তু সে সব কথার ভিতর দার্শনিক আলোচনা থাকবে না। তোমার প্রকাশিত কৌলজ্ঞাননির্ণয় থেকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙালী কি নেপালী, তা জানবার উপায় নেই। এমন কি তিনি কোন্ যুগের লোক তাও জানবার উপায় নেই। মৎস্যেন্দ্রনাথের কালনির্ণয় বাহ্য প্রমাণের সাহায্যে করতে হয়। এমন কি, তাঁর যথার্থ নাম মচ্ছেন্দ্রনাথ কিম্বা মৎস্যেন্দ্র-নাথ তা বলা অসম্ভব; যেমন তিনি দ্বিজ ছিলেন কিম্বা কৈবর্ত্ত ছিলেন, তাও স্থির করা অসম্ভব। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের

---

* পুস্তকখানি সম্প্রতি মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ক্যালকাটা স্যানস্‌ক্রিট সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে। মূল্য ৬৲।

কথামত তিনি আসলে ছিলেন দ্বিজ, কিন্তু মাছ ধরতেন বলে কৈবর্ত্ত বলে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৈবর্ত্তের ঘরে, পরে তান্ত্রিক সাধনার বলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ; এবং সেই সময়ে মচ্ছেন্দ্রনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ রূপ সংস্কৃত আকার প্রাপ্ত হয়।

আমার মনে হয় মৎস্যেন্দ্রনাথ একটি symbolic নাম—কারও পিতৃদত্ত নাম নয়। এর প্রমাণ, কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য়ের প্রায় দু'শ বৎসর পূর্ব্বে অভিনবগুপ্ত উক্ত নামের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেবার যো নেই। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রে মৎস্য একটি পারিভাষিক শব্দ।

গঙ্গাযমুনায়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ।

উক্ত শ্লোকের অর্থ হচ্ছে গঙ্গা ও যমুনা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা, আর মৎস্যদুটি হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস। যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করেন, তিনিই সাধক। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন বলেই তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হন। তবে অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা আমরা গ্রাহ্য করি আর না করি, এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই অদ্ভুত নামের অর্থ লোকসমাজকে বুঝিয়ে দেবার খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই প্রয়োজন হয়েছিল। আর তথাকথিত মৎস্যেন্দ্রনাথ তোমার মতে অভিনবগুপ্তের এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভূভারতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত, সুতরাং ইতিমধ্যে এই সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগীর সম্বন্ধে যে একাধিক কিম্বদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তারই একটি কিম্বদন্তির পরিচয় আমরা এ পুঁথিতে পাই।

কিন্তু এ কিম্বদন্তির অন্তরে যে কোনরূপ ঐতিহাসিক মালমসলা নেই, তা বলাই বাহুল্য। এমন কি মৎস্যেন্দ্রনাথের অবতারিত এই গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথকে একটি পূর্ব্বসিদ্ধ বলে উল্লেখ আছে। অবশ্য অবতারিত মানে লিখিত নয়, কেননা কৌলশাস্ত্র যে কর্ণাৎ কর্ণমাগতম, সেকথা কৌ ল জ্ঞা ন-নি র্ণ য়েই আছে।

এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও অপরিচিত লোকের পরিচয় লাভ করতে হলে, আমরা প্রথমেই তাঁর নামধাম জাতির সন্ধান নিতুম। মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম আমার বিশ্বাস তাঁর পিতৃদত্ত নয়, তাঁর ভক্তবৃন্দের দত্ত ; আর তাঁর জাতি অজ্ঞাত।

এখন দেখা যাক তাঁর ধামের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় কি না। কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য়ে তাঁকে বার বার চন্দ্রদ্বীপ-বিনির্গত বলা হয়েছে। বিনির্গত শব্দের যে অর্থই হোক, জাত নয়। সুতরাং তিনি যে চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমন কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় না।

তুমি বাঙলার জিওগ্রাফিতে চন্দ্রদ্বীপের অনেক সন্ধান করেছ, কিন্তু সে দ্বীপকে যে খুঁজে পেয়েছ এমন কথা তুমিও বলনি। তুমি অনুমান করেছ মাত্র, কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি যে, সোন্ দ্বীপ হচ্ছে চন্দ্রদ্বীপ। এখন আমার বিশ্বাস যে, চন্দ্রদ্বীপও হচ্ছে বৌদ্ধদের একটি মনঃকল্পিত দ্বীপ। অবলোকিতেশ্বর ও তারা, এই দুই দেবতা মিলে চন্দ্রগোমিনকে রক্ষা করবার জন্য এই দ্বীপের সৃষ্টি করেছিল। এ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তারানাথ লিখেছেন—

"Le roi son beau-pere, pour le punir de ces scrupules qu'il jugeait offensants, le fit enfermer dans un coffre et jeter au Gange. Mais grace a saprotectrice Tara il aborda dans une isle cree tout express a son intention pres de l' embouchure de Fleuve et qui prit de lui le nom de Chandradvipa" (Iconographie Bouddhique, p. 137)*

চন্দ্রগোমিন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক, এবং তাঁর জন্যই এই অদ্ভুত দ্বীপ সৃষ্ট হয়েছিল। এই প্রমাণে এ দ্বীপ বৌদ্ধদের মনগড়া। মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রকৃত নাম আমরা জানিনে, ধামও আমরা জানিনে। বুদ্ধদেবের যে প্রকৃত নাম বুদ্ধ নয় তা আমরা জানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধকেও আমরা জনৈক historical person বলে গ্রাহ্য করি ; যদিচ বুদ্ধদেবের জন্মমৃত্যুর বিবরণ স্পষ্ট myth-জড়িত।

* তাঁহার শ্বশুর রাজা তাঁহার এই সমস্ত মত, যে গুলিকে তিনি পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তৎ কারণ তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাকে একটি সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গাবক্ষে ফেলিয়া দিলেন ; কিন্তু তাঁহার রক্ষয়িত্রী তারাদেবীর প্রসাদে তিনি একটি দ্বীপে গিয়া উঠিলেন—এই দ্বীপটি তখনই তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গানদীর মোহনার নিকটে সৃষ্ট হয় এবং দ্বীপটির নাম তাঁহার নাম অনুসারে চন্দ্রদ্বীপ হইল।

মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সব myth চলিত আছে, সে সব myths and legends ছেঁটে ফেললেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগী ছিলেন, যিনি তান্ত্রিকসম্প্রদায়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত। আর তাঁর ধাম হচ্ছে বাঙলা দেশে। এ অনুমান করছি এই জন্যে যে, বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগোমিনের জন্মস্থান যে সমতট অর্থাৎ বাংলার একটি প্রদেশ, এমন কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে। চন্দ্রদ্বীপ একটি কল্পনাপ্রসূত দ্বীপ হলেও, বৌদ্ধরা সে দ্বীপকে সমতটেই স্থান দিয়েছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তান্ত্রিক সাধনার ফল ও উপায় সম্বন্ধে তাঁর মতামত বাঙালী মন থেকেই উদ্ভূত।

অবশ্য যে সব মনোভাবের উপরে তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে সব মনোভাব বহু পুরাতন। আর যুগে যুগে তা নতুন নতুন শাস্ত্র আকারে দেখা দেয়। তুমি অনুমান কর যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ-অবতারিত শাস্ত্র এ দেশে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রচারিত হয়েছিল। আর এ শাস্ত্র গুরুপরম্পরায় লোকসমাজের মন অধিকার করে। অবশ্য যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ তুমি উদ্ধার করেছ, সে সব "মীন-ভাষিত।" সুতরাং কৌলজ্ঞাননির্ণয়, একাদশ শতাব্দীতে লিখিত হলেও, তান্ত্রিক মত যে পুরাতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তন্ত্রশাস্ত্রের মূলে যে মনোভাব ও বিশ্বাস আছে, সে মনোভাব অতি পুরাতন। অথর্ব্ববেদকেই তন্ত্রশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বলা যেতে পারে। মূল অথর্ব্ববেদ আমি কখনো চোখেও দেখিনি। তবে উক্ত বেদ যে অভিচারবহুল অতএব অগ্রাহ্য, এ কথা আমি মনুভাষ্যকার মেধাতিথির মুখে শুনেছি। তারপর ফরাসী পণ্ডিত Victor Henri র "Magie dans l'Inde antique" নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে, যা নিয়ে তান্ত্রিকদের কারবার যথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণ, আত্মরক্ষার জন্য কবচ ধারণ ও মাদুলি তাবিজ প্রভৃতির গুণাগুণ, উক্ত বেদে এ সকলই উল্লিখিত হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্র এইরকম দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রগুণের ব্যাখ্যায় যে পরিপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, এ জাতীয় মনোভাব শাস্ত্র আকার ধারণ করবার পূর্ব্বেও লোকসমাজের মনের উপর প্রভুত্ব করত। ইংরাজেরা যাকে বলে superstition, আজ পর্যান্ত আমাদের সকলেরই মন অল্প-বিস্তর তার অধীন; আর পুরাকালে যে লৌকিক মন এই সব অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত ছিল, এ অনুমান আমরা সহজেই করতে পারি।

ইউরোপে যাকে magic বলে, একালে বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে নানারূপ মত প্রকাশ করেছেন। Magicএর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস আদিম মানবের মনে সহজেই শিকড় গাড়ে। এ বিশ্বাস নাকি মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহোদর। এই সব পণ্ডিতি মতের বিচার করে Bergson রায় দিয়েছেন যে, অদ্যাবধি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই magic হতে মুক্ত নয়। বাঙলাদেশের হিন্দুদের পূজাপদ্ধতি যে তান্ত্রিক রীতি থেকে মুক্ত নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

Magicএ বিশ্বাস লোকসমাজে সনাতন হলেও, সে বিশ্বাসের উপর ক্রমে শাস্ত্র গড়ে উঠে এবং সে শাস্ত্র প্রাধান্য লাভ করে এক একটি বিশেষ যুগে।

আমার বিশ্বাস তান্ত্রিক মত প্রথমে প্রাধান্য লাভ করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, অর্থাৎ সেই যুগে যখন মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছিল। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের যুগে যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রকট হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক সাধকের সাক্ষাৎ আমরা বাণভট্টের হর্ষচরিত্রেও পাই, কাদম্বরীতেও পাই। তারপর ভবভূতির মালতীমাধবেও পাই, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতেও পাই। কিন্তু এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিকদের একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখেছেন, শ্রদ্ধার চোখে নয়। রাজশেখর ত স্পষ্টই তান্ত্রিকদের বুজরুকির উপর বিদ্রূপ করেছেন। এর কারণ বোধ হয় অব্রাহ্মণ সমাজেই এ ধর্ম্ম ধরাছোঁয়ার মত একটা বিশিষ্ট রূপ পায়; কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে পূর্ব্ব সিদ্ধদের নামের একটা ফর্দ্দ আছে। সে সব নাম শুনলেই মনে হয় যে, এর একটি নামও ব্রাহ্মণের নাম নয়। একজন মহাসিদ্ধর নাম ত শবর-পাদ।

অপরপক্ষে এই যুগেই মহাবৌদ্ধ হিয়ান-সাং বৌদ্ধসমাজে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির পরিচয় পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে গিয়েছেন। আমি এখানে Rene Groussetর বই থেকে কটি বাক্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

Hiuan-tsang mentionne lui-meme que les gens de l'Uddiyana sont partages entre le Mahayana et l'Hindouisme. Mais visiblement le Mahayana qu'ils pratiquaient exicte chez lui une sympathi mediocre. Il nous en donne d'ailleurs la raison. Ils se livrent surtout a la doctrine du dhyana ou l' extase. Ils aiment a lire, les textes de cette doctrine, mais ils ne cherchent point a en approfondir le sens et l'esprit. L' etude des formules magique en est leur principale occupation. (Sur les traces du Bouddha, p. 103)*

তন্ত্র-শাস্ত্রে চারটি মহাপীঠের উল্লেখ আছে। সে চারটি হচ্ছে ওড়িয়ান, জালন্ধর, কামরূপ ও পূর্ণগিরি। কৌলজ্ঞাননির্ণয় থেকে মহানির্ব্বাণ পর্য্যন্ত এই চারটি পীঠের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

এখন যার নাম ওড়িয়ান, এর নামই উড্ডিয়ান। বর্ত্তমান Swat Valleyতে এ পীঠ অবস্থিত ছিল। জালন্ধর পাঞ্জাবে। কামরূপ আসামে। কিন্তু পূর্ণগিরি অথবা পূর্ণ শৈল যে কোথায়, তা আমি জানিনে। এ পাহাড় নাকি ডাহল দেশে অবস্থিত। কিন্তু ডাহল দেশ কোন দেশে? হিউয়ান সাংয়ের কথা থেকে বোঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে উড্ডিয়ান তান্ত্রিকধর্ম্মের একটি প্রধান আড্ডা হয়ে উঠেছিল। এর কারণ বোধহয় হূণদের আক্রমণে ওড়িয়ান বিধ্বস্ত হয়েছিল ও বৌদ্ধ মঠ মন্দির স্তূপ চৈত্য সব বিনষ্ট হয়েছিল। Rene Grousset আরও বলেন—

C'est en effet vers cette epoque, dans l'Uddiyana et dans les autres districts himalaiens, qu'au voisinage de sectes sivaites une certaine forme du bouddhisme mahayaniste etait en train de tourner a la demonologie, a la magic et tout a ces pratiques anormales que l'on englobe sousl a designation generale de tantrisme. †

এমন কি তিব্বতী ভাষায় নাকি উড্ডিয়ান বলতে তান্ত্রিক মতই বোঝায়।

এর থেকে বোঝা যায় যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মের অন্ততঃ দু'শ বৎসর পূর্ব্বে Swat Valleyতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম কলেবর ধারণ করে। এর পরে অবশ্য বাঙলা দেশেও মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম, শৈবধর্ম্মের সঙ্গে মিশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম হয়ে ওঠে।

তুমি নানারূপ বাহ্যপ্রমাণের সাহায্যে স্থির করেছ যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক নন। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তান্ত্রিক মত ও তান্ত্রিক আচার যে উড্ডিয়ানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তার পরিচয় আমরা হিউয়ান সাংএর নিকটেই পাই।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে তাঁকে সুধু যোগিনীকৌলের প্রবর্ত্তক বলা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাপর মহাকৌলের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কৌলধর্ম্মেরও আদি অবতারক নন।

এখন এই কৌল শব্দটার অর্থ কি? প্রথমেই মনে হয়, কৌল হচ্ছে কুল নামক বিশেষ্যের বিশেষণ। কিন্তু এমনও হতে পারে যে কৌল শব্দ থেকেই কুল শব্দ derived—কৌল হচ্ছে একটি সম্প্রদায়বিশেষের নাম। এবং তাদের আচরিত ধর্ম্মই কুলধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়েছে।

এ সন্দেহ যে আমার মনে উদয় হয়েছে, তার কারণ নানা তন্ত্রে কুল শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যে সব ব্যাখ্যা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। এমন কি, মহাতান্ত্রিক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর মন্ত্রশিষ্য রাজা রামমোহন রায় কুলধর্ম্মের বক্ষ্যমানরূপ ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন: "কুলাচার সর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান মূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কারবিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয়—একমেব পরঃব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময় ধ্রুবং। অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য। কুলার্চ্চনাদীপিকাধৃত তন্ত্র বচন—'কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং

---

* হিউএনৎসাঙ্ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন যে, উড্ডীয়ানের অধিবাসিগণ মহাযান ও হিন্দুধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে বিভক্ত, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইহারা যে মহাযান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, সেই মহাযান ধর্ম্ম তাঁহার মনে খুব কমই শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল; অন্যত্র তিনি ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার লোকেরা মুখ্যতঃ ধ্যানবাদ বা ভাবোন্মাদনা অনুসরণ করিত, ইহারা এই মতবাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, কিন্তু এই শাস্ত্রের অর্থ এবং ইহার ভাব গভীর ভাবে বুঝিবার জন্য ইহারা মোটেই চেষ্টা করিত না। যাদু-টোনা মন্ত্রের আলোচনা ইহাদের প্রধান কাজ ছিল।

† বস্তুতঃ এই যুগের দিকে, উড্ডীয়ান এবং আর কতকগুলি হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্য স্থানে, শৈব সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি বিশেষ শাখা ভূতপ্রেতের আরাধনা, যাদুবিদ্যায় এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এই সাধারণ নামে যে সমস্ত অস্বাভাবিক আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়, সে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তত্ত্বচ্যতে।' (পথ্য প্রদান) এ ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় তা হলে কৌল মানে ব্রহ্মজ্ঞানী।"

রামমোহন রায়ের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কৌলধর্ম্মের কোনও প্রভেদ থাকে না; কিন্তু এ দুই ধর্ম্ম যে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম, তা সকলেই জানেন।

অর্ব্বাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের উপর বেদান্ত দর্শনের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি, তার পরিচয় ম হা নি র্ব্বা ণ ত ন্ত্রে ই পাওয়া যায়। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, তন্ত্রের মূল কথা দর্শন নয়, সাধনা। তন্ত্র আর যাই হোক, নিষ্কাম ধর্ম্ম নয়। সুতরাং কোন্ তন্ত্রে কোন্ দার্শনিক মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা আমাদের উপেক্ষা করতে হবে।

বৈদান্তিক মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু এই জগৎকে মুখের কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বৈদান্তিকদের মতে যা মায়া, তান্ত্রিকদের মতে তাই শক্তি। অতএব এই জগতের মূলে আছে ক্রিয়াশক্তি। আর এই শক্তির সাধনা করলেই তন্ত্রমতে সিদ্ধ হওয়া যায়। এক কথায় তান্ত্রিক মাত্রেই শাক্ত। একথা শুনে তুমি আমি চমকে উঠব না, কারণ আমরা উভয়েই শাক্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি।

এই শক্তি নামক abstractionটি পরে কালী নামক দেবতায় পরিণত হয়েছিল। অথবা কালীনামক স্ত্রীদেবতাই শক্তির আধার স্বরূপে গণ্য হয়েছিলেন। কালীনামক দেবতাটিও বহুপ্রাচীন। তিনি বাঙলাতে জন্মগ্রহণ করেন নি, আর কৌলরাও তাঁকে সৃষ্টি করেনি। কালিদাসের কাব্যেই আমি তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। উমার বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সব দেবতা ও উপদেবতারা শিবের সঙ্গে 'বরযাত্র' গিয়েছিলেন, কালীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। কালিদাস বলেছেন -

"তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।"

(কুমার ৬)

এ কালী আমাদের পরিচিত কালী, কেননা তিনি, ঘোরকৃষ্ণবর্ণা উপরন্তু কপালাভরণা। অতএব দাঁড়াল এই যে, কৌল সম্প্রদায় হচ্ছে কালীর উপাসক—সংক্ষেপে শাক্ত।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আদি যোগিনীকৌল। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—যোগিনী কোন্ জাতীয় জীব? কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য় বলেছেন—

"ষড় মৃথক মহাকাল কালিকা যোগিনী তথা।
বিজয়া তু মহাভাগা ষড়যোগিন্যস্ত মাতরাঃ॥"

এর থেকে কি বুঝতে হবে যে, শিবের সঙ্গে যাঁরা বরযাত্র গিয়েছিলেন, সেই কালী ও মাতৃকার দলই যোগিনী?

তারপর তিনি বলেছেন যে—

"কামরূপে ইমং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে"

এর থেকে মনে হয় যে, যোগিনীরা সব মানবী। কথাসরিৎসাগরে বহু যোগিনীর যাদুবিদ্যার কুকীর্ত্তির বর্ণনা আছে। কিন্তু সে সব যোগিনীই মানবী। এই নব কাশ্মীরী যোগিনীরা মানুষকে বাঁদর করতেন, আর আসামী যোগিনীরা মানুষকে করতেন ভেড়া। এ জাতীয় যোগিনীদের ইংরাজরা বলে witch! এদের বর্ণনা Macbeth-এ আছে, Tempest-এও আছে। এ জাতীয় যোগিনীদের রূপগুণের বর্ণনা, এ হেন অলক্ষ্মী যোগিনীদের সাক্ষাৎ তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ম হা-নি র্ব্বা ণ ত ন্ত্রে এদের উল্লেখ আছে যথা—

অলক্ষ্মীঃ কানকর্নী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্তিাভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতা॥

(দশম উল্লাস ১৭৭ শ্লোক)

কিন্তু এ শ্রেণীর যোগিনীদের সঙ্গে সঙ্গমের জন্য বীরাচারীরা যে কঠোর সাধনা করতেন, তা ত মনে হয় না।

কারণ মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যোগিনীচক্র—

"দুর্লভস্ত ইমং চক্রং নাস্তি যোগ ইমস্বরম্।"

এ যোগের ফলে সাধক :—

দিব্যকন্যা অনেকাঞ্চ আকৃষ্য ভুঞ্জতে প্রিয়ে।"

আমার বিশ্বাস এই দিব্যকন্যারাই যোগিনী, আর তাদের সঙ্গই তাঁরা চাইতেন।

তুমি জানো যে, ইহুদিগের মধ্যে একটি শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, যার নাম Cabbala—যে শাস্ত্রের তাঁরা এককালে অনেকে চর্চ্চা করতেন। এ শাস্ত্রকে ইহুদি তন্ত্রশাস্ত্র বলা যায়। কারণ এ শাস্ত্রও ছিল পরমগুহ্য, আর তার শিক্ষা কানে কানে দেওয়া হত। Prospero বোধহয় এই শিক্ষা অর্জ্জন করে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। এ শাস্ত্রেও এক জাতের যোগিনী অথবা দিব্যকন্যার পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের নাম Salamander—আর তাদেরও মন্ত্রবলে আকর্ষণ করে সাধকেরা ভোগ করতে পারতেন। Anatole France এর Rotisserie de la Reine Pedanque পড়ে দেখো

—তাতে Salamanderএর রূপগুণ চরিত্র ও সাধকদের ক্রিয়ার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আছে।

এখন তোমার প্রকাশিত কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য় পড়ে আমি খুব খুসী হয়েছি। আমি অবশ্য তান্ত্রিক নই, এবং তান্ত্রিক সাধনায় ব্রতী হবার, কি দেহে কি মনে কোনরূপ প্রবৃত্তিও আমার নেই। তবে আজকালকার ভাষায় যাকে বলে ঐতিহাসিক কৌতূহল, আমার তা যথেষ্ট আছে। কৌ ল-জ্ঞা ন নি র্ণ য় সে কৌতূহলের অনেকটা খোরাক যোগায়।

এ বইখানি তন্ত্রশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ না হলেও যে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। বাঙলাদেশে অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ আছে, আর সে সব গ্রন্থ সম্ভবতঃ বাঙালীরই লেখা। এর থেকে প্রমাণ হয় না যে, এ শাস্ত্রমত বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছে। কামরূপ অবশ্য তান্ত্রিকদের একটি প্রধান পীঠ। এবং সম্ভবতঃ যোগিনীকৌলদের সেকালে কামরূপই একটি প্রধান আড্ডা ছিল। আমার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে শৈবধর্ম্ম মিলে মিশে এই কৌলধর্ম্মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন ওড়িয়ানের বৌদ্ধরা সব নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল, তখন আসামের রাজা ছিলেন ভাস্কর-বর্ম্মণ এবং তিনি ছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ নন। হিউয়ান সাংও উক্ত রাজার অনুরোধে তাঁর রাজ্যে গিয়েছিলেন, কিন্তু কৌল-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করেন নি। সে যাই হোক, তন্ত্রশাস্ত্রের ধারাটা যে বাঙলায় বহুকাল চলে আস্‌ছে, তার প্রমাণ অর্ব্বাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের—যথা কু লা র্ণ ব ম হা নি র্ব্বা ণ প্রভৃতির—কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য়ে র সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ। এ সব তন্ত্রগ্রন্থে একই মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আর একই কথার। এ শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাদের সাক্ষাৎ অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। উপরন্তু তান্ত্রিকরা বহু উপদেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাস করতেন, যাদের নাম কৌ ল জ্ঞা ন নি র্ণ য়ে-ও পাওয়া যায়, কু লা র্ণ বেও পাওয়া যায়, ম হা নি র্ব্বা ণেও পাওয়া যায়, যদিও ম হা নি র্ব্বা ণ শৈবতন্ত্র নয়, ব্রাহ্মতন্ত্র।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পূবে হাওয়ার দমকা ফুঁয়ে আকাশভরা তারার যত আলো
　　নিব্‌ল দেখ একটি নিমেষেই ;
তোমার ঘরের প্রদীপটিরে ওগো বধূ, কেনই মিছে জালো,
　　আজকে বসো একটু আঁধারেই।
স্তব্ধ আঁধার, বাইরে ঝরে বিরামবিহীন বাদল জলধার—
　　বিরহিণীর অঝোর আঁখিনীর,
সৃষ্টি আপন মুখ ঢেকেছে কালো কাজল অঞ্চলেতে তার,
　　বনানী আজ স্তব্ধ নতশির।
প্রদীপ জ্বালা নাই বা হল আজিকার এই বাদল রজনীতে,
　　অঙ্গ ঘিরে রহুক্ যত কালো।
মনের খেয়া সজল বায়ে ভাসাও আজি মৃদু বাদল গীতে
　　এমন দিনে সেই ত বধূ ভালো।

আনমনেতে নয়নকোণে অশ্রুকণা একটু দোলে যদি
　　দুলুক্ নাকো, মুছবে মিছে কেন ?
বক্ষে আমার দু'এক ফোঁটা পড়বে ঝরে, সেই ত মধুর অতি,
　　মনের কোণে গোপন কথা যেন !
ভিজে মাটির গন্ধ বহি' বাদল বায়ু সজল পথে আসে,
　　স্পর্শে তাহার অঙ্গ ওঠে কাঁপি',
ভাবনা আমার দিশাহারা যায় ভেসে যায় কেবল তোমার পাশে,
　　কেমন করে রাখব তারে চাপি !
আকাশ বলে ধরার কানে প্রাণের কথা বাদলঝরা সুরে,
　　গুমরে কাঁদে মেঘের গুরু ডাকে।
তোমার বুকের গোপন কথা কেনই রাখ লুকিয়ে হৃদয়পুরে,
　　দূর করে দাও মিথ্যা সরমটাকে।

আজকে দোঁহে অন্ধকারে বসব মোরা দুজন পাশাপাশি
　　নিশ্বাস মম মিলবে তোমার সনে।
ঘেরুক মম অঙ্গ তব বাঁধনহারা আকুল কেশরাশি
　　সব ব্যবধান ঘুচাও শুভক্ষণে।

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পুবায় প্রশ্ন করলে।

'কি ভাবছেন ?'

'অনেক কথাই ভাবছি আনন্দ। তার মধ্যে প্রধান কথাটা এই, আমার কি হয়েছে।'

'কি হয়েছে ?'

'কি রকম একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে।'

আনন্দ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, 'আমারও হয়। নাচবার আগে আমারও ওরকম হয়।'

হেরম্ব উৎসুক হয়ে বললে, 'তোমার কি রকম লাগে ?'

'কি রকম লাগে ?' আনন্দ একটু ভাবলে 'তা বলতে পারব না। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত—।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পারছি আনন্দ।'

'আমিও আপনারটা বুঝতে পারছি।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা হেসে ফেললে।

আনন্দ বললে, 'আপনার খিদে পায়নি ? কিছু খান।'

হেরম্ব বললে, 'দাও। বেশী দিও না।'

একটি নিঃশব্দ সঙ্কেতের মত আনন্দ যতবার ঘরে আনাগোনা করলে, জানালার পাটগুলি ভাল করে খুলে দিতে গিয়ে যতক্ষণ সে জানালার সামনে দাঁড়ালে, ঠিক সম্মুখে এসে যতবার সে চোখ তুলে সোজা তার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলে—তার প্রত্যেকটির মধ্যে হেরম্ব তার আত্মার পরাজয়কে ভুলে যাবার প্রেরণা আবিষ্কার করলে। তার ক্রমে ক্রমে মনে হল, হয়ত এ পরাজয়ের গ্লানি মিথ্যা। বিচারে হয়ত ভুল আছে। হয়ত জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

হেরম্বের মন যখন এই আশ্বাসকে খুঁজে পেয়েও সন্দিগ্ধ পরীক্ষকের মত বিচার করে না দেখে গ্রহণ করতে পারছে না, আনন্দ তার চিন্তায় বাধা দিলে। আনন্দের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, সিঁড়িতে বসে হেরম্বকে একটা কথা বলবে মনে করেও বলা হয়নি। কথাটা আর কিছুই নয়। প্রেম যে একটা অস্থায়ী জোরালো নেশা মাত্র হেরম্ব এ খবর পেলে কোথায়! একটু আগেও একথাটা জিজ্ঞাসা করতে আনন্দের লজ্জা হচ্ছিল। 'কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখুন হেরম্ববাবু,' এখন তার একটুও লজ্জা করছে না।

'আপনাকে সত্যি কথাটা বলি। সন্ধ্যার সময় আপনাকে যে বন্ধু বলেছিলাম, সেটা বানানো কথা। এতক্ষণে আপনাকে বন্ধু মনে হচ্ছে।'

'এখন কত রাত্রি ?'

'কি জানি। দশটা সাড়ে দশটা হবে। ঘড়ী দেখে আসব ?'

'থাক। আমার কাছে ঘড়ী আছে। দশটা বাজতে এখনো তেরো মিনিট বাকী।'

আনন্দ বিস্মিতা হয়ে বললে, 'ঘড়ী আছে, সময় জিজ্ঞাসা করলেন যে ?'

হেরম্ব হেসে বললে, 'তুমি ঘড়ী দেখতে জান কিনা পরখ করছিলাম। মালতীবৌদির সাড়াশব্দ যে পাচ্ছি না ?'

আনন্দও হাসলে। বললে, 'অত বোকা নই, বুঝলেন ? এমনি করে আমার কথাটা এড়িয়ে যাবেন,—তা হবে না। রোমিও জুলিয়েট বেঁচে থাকলে তাদের প্রেম অল্পদিনের মধ্যে মরে যেত, আপনি কি করে জানলেন বলুন।'

হেরম্ব এটা আশা করে নি। লজ্জা না করার অভিনয় করতে আনন্দের যে প্রাণান্ত হচ্ছে, এটুকু ধরতে না পারার মত শিশুচোখ হেরম্বের নয়। একবার মরিয়া হয়ে সে এ প্রশ্ন করেছে, তার সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত প্রশ্নটা। তার এ সাহস অতুলনীয়। কিন্তু প্রশ্নটা চাপা দিয়েও আনন্দের সরমতিক্ত অনুসন্ধিৎসাকে চাপা দেওয়া গেল না দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে রইল।

'বুদ্ধি দিয়ে জানলাম।' হেরম্ব এই জবাব দিলে। ভাবলে, ইঙ্গিতের উত্তর ইঙ্গিতেই চলুক। কাজ কি এই ছলটুকুকে বিনষ্ট করে!

'শুধু বুদ্ধি দিয়ে ?'

'শুধু বুদ্ধি দিয়ে, আনন্দ। বিশ্লেষণ করে।' আনন্দের বালিশ থেকে সদ্য-আবিষ্কৃত লম্বা চুলটির একপ্রান্ত আঙুল

দিয়ে চেপে ধরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে সেটিকে হেরম্ব সোজা করে রাখলে।

'জল খেয়ে আসি।' বলে আনন্দ গেল পালিয়ে।

হেরম্ব তখন আবার ভাবতে আরম্ভ করলে যে কোন্ অজ্ঞাত সত্যকে আবিষ্কার করতে পারলে তার হৃদয়ের চিরন্তন পরাজয়, জয়-পরাজয়ের স্তরচ্যুত হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশের অতীত হয়ে যেতে পারে। চোখ দিয়ে দেখে, স্পর্শ দিয়ে অনুভব করে, বুদ্ধি দিয়ে চিনে ও হৃদয় দিয়ে কামনা করে, মর্ত্ত্যলোকের যে-আত্মীয়তা আনন্দের সঙ্গে তার স্থাপিত হওয়া সম্ভব, আত্মার অতীন্দ্রিয় উদাত্ত আত্মীয়তার সঙ্গে তার তুলনা কোথায় রহিত হয়ে গেছে। কোন দ্বন্দ্ব যুক্তি, সীমারেখার মত, এই দুটি মহাসত্যকে এমন ভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে, তাদের অস্তিত্ব আর পরস্পরবিরোধী হয়ে নেই, তাদের একটি অপরটিকে কলঙ্কিত করে দেয়নি।

আনন্দের ফিরে আসতে দেরী হয়। হেরম্বের ব্যাকুল অন্বেষণ তার দেহকে অস্থির করে দেয়। বিছানা থেকে নেমে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করে। এদিকের দেয়াল থেকে ওদিকের দেয়াল পর্য্যন্ত হেঁটে যায়। থমকে দাঁড়ায় এবং প্রত্যাবর্ত্তন করে। তিনটি খোলা জানালা প্রত্যেকবার তার চোখের সামনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পৃথিবীকে মেলে ধরে। কিন্তু হেরম্বের এখন উপেক্ষা অসীম। সম্মুখের সুদূর সাদা দেয়ালটির আধহাতের মধ্যে এসে সে গতি-বেগ সংযত করে, আর কিছুই দেখতে পায় না। মেঝেতে আনন্দের পরিত্যক্ত একটি ফুল তার পায়ের চাপে পিষে যায়।

হেরম্ব জানে, আলো এই অন্ধকারে জ্বলবে। তাকে চমকে না দিয়ে, বিনা আড়ম্বরে তার হৃদয়ে পরম সত্যটির আবির্ভাব হবে। তার সমস্ত অধীরতা অপমৃত্যু লাভ করবে না, ঘুমিয়ে পড়বে। জীবনের চরম জ্ঞানকে সুলভ ও সহজ বলে জেনে সে তখন ক্ষুণ্ণ অথবা বিস্মিত পর্য্যন্ত হবে না। কিন্তু তার দেরী কত?

ফিরে এসে তার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আনন্দ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কথা বললে না। বিছানার একপাশে বসে তার অস্থির পাদচারণাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে লাগলে। হেরম্ব বহুদিন হয় তার চুলের যত্ন নিতে ভুলে গেছে। তবু তার চুলে এতক্ষণ যেন একটা শৃঙ্খলা ছিল। এখন তাও নেই। তাকে পাগলের মত চিন্তাশীল দেখাচ্ছে। আনন্দের সামনে এমনিভাবে সে যেন কতযুগ ধরে ক্ষ্যাপার মত অসংলগ্ন পদবিক্ষেপে হেঁটে হেঁটে শুধু ভেবে গিয়েছে। পৃথিবীতে বাস করার অভ্যাস যেন তার নেই। প্রবাসে আপনার অনির্ব্বচনীয় একাকীত্বের বেদনায় এমনি প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে সর্ব্বদা স্বদেশের স্বপ্ন দেখে।

আনন্দের আবির্ভাব হেরম্ব টের পেয়েছিল। কিন্তু সে যে মানসিক অবস্থায় ছিল তাতে এই আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য মূল্যহীন হয়ে থাকতে বাধ্য।

হেরম্ব হঠাৎ তার সামনে দাঁড়ালে।

'ব্যায়াম করছি আনন্দ।'

'ব্যায়াম শেষ হয়ে থাকলে বসে বিশ্রাম করুন।'

হেরম্ব তৎক্ষণাৎ বসলে। বললে 'তুমি বার বার মুখ ধুয়ে আসছ কেন?'

'মুখে ধুলো লাগে যে।' আনন্দ হাসবার চেষ্টা করে।

তাদের অদ্ভুত নিরবলম্ব অসহায় অবস্থাটা হেরম্বর কাছে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে যায়। তাদের কথা বলা অর্থহীন, তাদের চুপ করে থাকা ভয়ঙ্কর। পায়ের তলা থেকে তাদের মাটি প্রায় সরে গেছে, তাদের আশ্রয় নেই। মানুষের বহুযুগের গবেষণাপ্রসূত সভ্যতা আর তারা ব্যবহার করতে পারছে না। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্ম, এমন কি, ঈশ্বরকে নিয়ে পর্য্যন্ত তাদের আলাপ আলোচনা অচল, এতদূর অচল যে, পাঁচ মিনিট ও সব বিষয়ে চেষ্টা করে কথা চালালে নিজেদের বিশ্রী অভিনয়ের লজ্জায় তারা কণ্টকিত হয়ে উঠবে। এই কক্ষের বাইরে স্থান নেই, সমস্যা নেই, প্রয়োজনীয় কিছু নেই, —মানুষ পর্য্যন্ত নেই। তাদের কাছে বাইরের জগৎ মুছে গেছে, আর তাকে কোন ছলেই এঘরে টেনে আনা যাবে না। একান্ত ব্যক্তিগত কথা ছাড়া তাদের আর বলবার কিছু নেই। অথচ, এই সীমাবদ্ধ আলাপেও যে কথাগুলি তারা বলতে পারছে সেগুলি বাজে, অবান্তর। বোমার মত ফেটে পড়তে চেয়ে তাদের তুড়ি দিয়ে খুসী থাকতে হচ্ছে।

এ অবস্থা যে সুখের নয়, কাম্য নয়, হেরম্বকে তা স্বীকার করতে হল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ যে এই অসুবিধাকে ছাপিয়ে আছে একথা জানতেও তার বাকী ছিল না। পরস্পরের কত অনুচ্চারিত চিন্তাকে তারা শুনতে পাচ্ছে। তাদের কত প্রশ্ন

ভাষায় রূপ না নিয়েও নিঃশব্দ জবাব পাচ্ছে। সাড়ীর প্রান্ত টেনে নামিয়ে পায়ের পাতা ঢেকে দিয়ে সে বলছে, 'পা দুটি তার অত করে দেখবার মত নয়; আঁচলের তলে হাতদুটি আড়াল করে বলছে, 'পা দেখতে দিলাম না বলে তুমি অমন করে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তা হবে না।' সে তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিচ্ছে: 'এবার তুমি মুখ ঢাকো কি করে দেখি!' আনন্দের মৃদু রোমাঞ্চ ও আরক্ত মুখ প্রতিবাদ করে বলছে, 'আমাকে এমন করে হার মানানো তোমার উচিত নয়।' দরজার দিকে চেয়ে আনন্দ ভয় দেখাচ্ছে, 'আমি ইচ্ছে করলেই উঠে চলে যেতে পারি।'

হঠাৎ তার মুখে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসছে। তার চোখ ছলছল করে উঠছে। চোখের পলকে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এও ভাষা, সুস্পষ্ট বাণী। কিন্তু এর অর্থ অতল, গভীর, রহস্যময়। তার কত ভয়, কত প্রশ্ন, নিজের কাছে হঠাৎ নিজেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠে তার কি নিদারুণ কষ্ট, হেরম্ব কি তা জানে? তার মন কতদূর উতলা হয়ে উঠেছে হেরম্ব কি তার সন্ধান রাখে? একটা বিপুল সম্ভাবনা গুহা-নিরুদ্ধ নদীর মত তাকে যে ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছে, হেরম্ব তাও কি জানে? হয়ত আজ থেকেই তার চিরকালের জন্য দুঃখের দিন সুরু হল, এ আশঙ্কা যে তার মনে জ্বালার মত জেগে আছে, হেরম্ব কি তা কল্পনাও করতে পারে?

নিঃশব্দ নির্ম্মম হাসির সঙ্গে উদাসীন চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে সে জবাব দিচ্ছে: 'দুঃখকে ভয় করো না। দুঃখ মানুষের দুর্লভতম সম্পদ! তাছাড়া, আমি আছি। আমি!'

কথার অভাবে তাদের দীর্ঘতম নীরবতার শেষে আনন্দ বললে, 'চলুন, নাচ দেখবেন।'

আনন্দের নাচ যে বাকী আছে সে কথা হেরম্বের মনে ছিল না।

'চল। বেশ পরিবর্ত্তন করবে না?'

'করব। আপনি একটু বাইরে যান।'

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনাথের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেলে, এককোণে মেরুদণ্ড টান করে নিস্পন্দ হয়ে সে বসে আছে। জীবনে বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। কত বিচিত্র উপায়ে মানুষ এ প্রয়োজন মেটায়!

বাড়ীর বাইরে গিয়ে মন্দিরের সামনে ফাঁকা যায়গায় হেরম্ব দাঁড়ালে। ইতিমধ্যে এখানে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। তা যদি না হয়ে থাকে, তবে হেরম্বের চোখেরই পরিবর্ত্তন হয়েছে নিশ্চয়। মন্দির ও বাড়ীর শ্যাওলার আবরণ এক প্রস্থ ছায়ার আস্তরণের মত দেখাচ্ছে। বাগানে তরুতলের রহস্য আরও ঘন আরও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আনন্দ যে-ঘাসের জমিতে নাচবে সেখানে জ্যোৎস্না পড়েছে আর পড়েছে দেবদারু গাছটার ছায়া। সমুদ্রের কলরব ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। রাত্রি আরও বাড়লে, চারিদিক আরও স্তব্ধ হয়ে এলে, আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাবে।

পৃথিবীতে চিরদিন এই সঙ্কেত ও সঙ্গীত ছিল, চিরদিন থাকবে। মাঝখানে শুধু কয়েকটা বছরের জন্য নিজেকে উদাসীন করে রেখেছিল। সে মরেনি, ঘুমিয়ে পড়েছিল মাত্র। ঘুম ভেঙ্গে, দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপকে অতিক্রম করে সে আবার স্তরে স্তরে সাজানো সুন্দর রহস্যময় জীবনের দেখা পেয়েছে। যে স্পন্দিত বেদনা প্রাণ ও চেতনার একমাত্র পরিচয়, আজ আর হেরম্বের তার কোন অভাব নেই।

হেরম্ব মন্দিরের সিঁড়িতে বসলে।

আনন্দের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বাড়ীর দরজায় সে চোখ পেতে রাখলে না। আনন্দ বেশ পরিবর্ত্তন করে, বাইরে এসে তাকে নাচ দেখাবে, চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। এই সংক্ষিপ্ত বিরহটুকু তার বরং ভালই লাগছে। আনন্দ যদি আসতে দেরীও করে সে ক্ষুণ্ণ হবে না।

আনন্দ দেরী না করেই এল। চাঁদের আলোয় তাকে পরীক্ষা করে দেখে হেরম্ব বললে, 'তুমি তো কাপড় বদলাও নি আনন্দ।'

'না। শুধু জামা বদলে এলাম। কাপড়ও অন্যরকম করে পরেছি বুঝতে পারছেন না?'

'বুঝতে পারছি।'

'কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে?'

'বেশ।'

হেরম্ব সিঁড়ির উপরের ধাপে বসে ছিল। তার পায়ের নীচে সকলের নীচের ধাপে আনন্দ বসতেই সেও নেমে এল। আনন্দ চেয়ে না দেখেই একটু হাসলে।

হেরম্ব কোন কথা বললে না। আনন্দের এখন নীরবতা দরকার এটা সে অনুমান করেছিল। হাঁটুর সামনে দুটি হাতকে একত্র বেঁধে আনন্দ বসেছে। তার ছড়ানো বাবড়ি চুল কান ঢেকে গাল পর্য্যন্ত ঘিরে এসেছে। তার ছোট ছোট নিশ্বাস নেবার প্রক্রিয়া চোখে দেখা যায়।

আনন্দ এক সময়ে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জামা-কাপড়! কি ছোট মন আমাদের!'

'আমাদের, আনন্দ।'

'না, আমাদের। পরে বলব।'

নিঃশব্দে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারা চুপ করে বসে থাকে। আনন্দকে চমকে দেবার ভয়ে হেরম্ব নড়তে সাহস পায় না। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে চেপে যায়। আকাশে চাঁদ গতিহীন। আনন্দের নাচের প্রতীক্ষায় হেরম্বের মনেও সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারপর এক সময় আনন্দ উঠে গেল। ঘাসে ঢাকা জমিতে গিয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে সে হাঁটু পেতে বসলে। প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা মাটিতে নামিয়ে দুহাত সম্মুখে প্রসারিত করে স্থির হয়ে রইল।

আনন্দ কতক্ষণ নৃত্য করলে হেরম্বের সে খেয়াল ছিল না।

চাঁদের আলো তার চোখে নিভে নিভে ম্লান হয়ে এসেছিল নাচের গোড়াতেই। এটা তার কল্পনা অথবা আকাশের চাঁদকে মেঘে তখন আড়াল করেছিল, হেরম্ব বলতে পারবে না। কিন্তু আনন্দের নৃত্য, শ্লথ, মন্থর গতিছন্দ থেকে চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাও যে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল একথা হেরম্ব নিঃসংশয়ে বলতে পারে। হয়ত চোখে তার ধাঁধা লেগেছিল। হয়ত চন্দ্রকলা-নৃত্যের শোনা ব্যাখ্যাটি তার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূর্ণিমা থেকে আনন্দ কিন্তু অমাবস্যায় ফিরে যেতে পারেনি।

নৃত্য যখন তার চরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তার সর্ব্বাঙ্গের আলোড়িত সঞ্চালন এক ঝলক আলোর মত প্রখর দ্রুততায় হেরম্বের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সামনে চমক সৃষ্টি করছে, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ সে থেমে গেল।

ঘাসের উপর বসে তাকে হাঁপাতে দেখে হেরম্ব তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেল।

'কি হল, আনন্দ?'

'ভয় করছে।' আনন্দ বললে। রুদ্ধস্বরে, কান্নার মত করে।

সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ আরক্ত, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। তার দুচোখে উত্তেজিত অসংযত চাহনি। চুলগুলি তার মুখে এসে পড়ে ঘামে জড়িয়ে গিয়েছিল। চুল পিছনে সরিয়ে হেরম্ব তার কানের পাশে আটকে দিলে। তাকে দম নেবার সময় দিয়ে বললে, 'ভয় করছে? কেন ভয় করছে, আনন্দ?'

আনন্দ বললে, 'কি জানি। হঠাৎ সমস্ত শরীর আমার কেমন করে উঠল! মনে হল, এইবার আমি মরে যাব। মরে যেতে আমার কখনও ভয় হয়নি। আজ কেন যে এরকম করে উঠল। অন্যদিন নাচের পর ঘুম আসে। আজ শরীর জ্বালা করছে।'

'গরম লাগছে?'

'না। ঝাঁঝের মত জ্বালা করছে,—হাড়ের মধ্যে। আমি এখন কি করি! কেন এরকম হল?'

'একটু বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে। শোবে আনন্দ? শুয়ে পড়লে হয়ত—'

আনন্দ হেরম্বের কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লে। তার নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সরল হয়ে আসছে, কিন্তু মুখের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব একটুও কমে নি। হেরম্বের চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতেই তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

'এরকম হল কেন আজ? তোমার জন্যে?'

'হতে পারে। আমি তো সহজ লোক নই। পৃথিবীতে আমার জন্যে অনেক কিছুই হয়েছে।'

অন্ধ যে ভাবে আশ্রয় খোঁজে, আনন্দ তেমনি ভাবে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিলে। হেরম্বের হাতের নাগাল পেতেই শক্ত করে চেপে ধরে সে যেন একটু স্বস্তি পেলে।

'মনে হচ্ছে আমার এ কষ্ট আর কিছুই নয়। এক মুহূর্ত্তে তোমাকে যে আপন করে পেলাম, এ তার প্রেরণা। আমি যেন সৃষ্টি করছি। ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আরও যেন কত কি দুঃখ একসঙ্গে ভোগ করছি। আচ্ছা তুমি তো কবি, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ?'

'আমি কবি নই, আনন্দ। আমি মানুষ।'

আনন্দ তার এই সবিনয় অস্বীকারের প্রতিবাদ করলে।

'তুমি আমার কবি। কবি না হলে কেউ এমন ঠাণ্ডা হয় ? সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। তুমি না থাকলে আমি এখন এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে নাচের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরে যেতাম।'

'জ্বালা কমেনি, আনন্দ ?'

'কমেছে।'

'নাচ শেষ করবে ?'

'না। নাচ শেষ করে ঘুমোবে কে ? তার চেয়ে এ কষ্টও ভাল। ঘুম তো মরে যাওয়ার সমান, শুধু সময় নষ্ট।'

আনন্দ হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে বললে, 'কটা বাজল ? অনেক দূরে থানায় ঘণ্টা বাজছে। কটা বাজল শুনলে ?'

হেরম্ব বললে, 'ও ঘণ্টা ভুল, আনন্দ। এখন ঠিক মাঝরাত্রি।'

আনন্দ বললে, 'তাই হবে, চাঁদটা আকাশের ঠিক মাঝখানে এসেছে।'

এইখানে, আকাশের চাঁদের কাছে পৌঁছে, আনন্দ একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেল। হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরও নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিষ্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলে।

হেরম্ব এখন তাও জানে। নিজেকে দান করে নিজের দেহটিকে দুর্ল্লভ করার সস্তা কাব্য আনন্দ নিজের অজ্ঞাতেই পরিত্যাগ করেছে। তাই তার গালের উত্তেজনা, তার চিবুকের মনোরম কুঞ্চন, তার স্বপ্নাতুর চোখের কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য মিথ্যা নয়। তার ওষ্ঠে তাই শুধু স্পর্শই নয়, জ্যোৎস্নাও আছে। ওর মুখের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা আর তাই অর্থহীন নয়। এমন একটি মুখকে তিল তিল করে মনের মধ্যে সঞ্চয় করায় আর অপরাধ নেই, সময়ের অপচয় নেই।

এতকাল হেরম্ব এক মুহূর্ত্ত বিশ্লেষণ ছাড়া থাকতে পারেনি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে এসে এবার তার বিশ্লেষণলব্ধ সত্য সূক্ষ্মতার সীমায় পৌঁছেছে। আর তার কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু হেরম্বের আপশোষ তা নয় : এই অক্ষমতার পরিচয় তার অজানা নয় : তাই তার চরম জ্ঞান। সে বিজ্ঞান মানে, আজ বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে কাব্যকে মানলে। চোখ যখন আছে, চোখ দেখুক। দেহ যখন আছে, দেহে রোমাঞ্চ হোক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে না। অনাবৃত আনন্দের দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ আজ কিসে ঘোচাতে পারবে ? লক্ষ আলিঙ্গনও নয়, কোটি চুম্বনও নয়।

'আছেন' বললে ঈশ্বর অস্তিত্ব পান এবং সে অস্তিত্ব মিথ্যা নয়, কারণ 'আছেন' বলাটাই স্ব-সম্পূর্ণ সত্য, আর কোন প্রমাণসাপেক্ষ সত্যের উপর নির্ভরশীল নয়। হেরম্বের প্রেমও শুধু আছে বলেই সত্য। কল্পনার সীমা আছে বলে নয়, যে অনুভূতির স্রোত তার জীবন তার ঐতিহাসিকতায় নেই বলে নয়, নিজের সমগ্র সচেতন আমিত্ব দিয়ে আয়ত্ত করতে পারছে না বলে নয় : প্রেম আছে বলে প্রেম আছে। কাম-পঙ্কের পদ্ম এর উপমা নয়। মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না,—সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম্ম।

আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দুহাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুসী হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে সে ভাবলে, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালই করেছে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কয়ার ফড়িং-এর আকৃতিবিশিষ্ট মনোপ্লেন

বিলাতের গ্রিভ্‌সেণ্ড্‌ কারখানায় সম্প্রতি এক অদ্ভুত মনোপ্লেন নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে এক চালক ছাড়া অন্য লোক চড়িবার স্থান নাই। চালকের বসিবার স্থান বা 'কক্‌-পিট' মনোপ্লেনের প্রায় লেজের দিকে অবস্থিত। ছবিতে ইহার চেহারা দেখিয়া অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট একটা বিরাট কয়ার ফড়িং-এর কথা মনে হওয়া বিচিত্র নহে। প্রথম পরীক্ষা দেখাইবার সময়েই এই অপূর্ব্ব মনোপ্লেন ঘণ্টায় ২০০ মাইলের বেশী উড়িতে সমর্থ হইয়াছে। এইটিই হইবে বিলাতের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মনোপ্লেন। ইহার আরেকটি সুবিধা এই যে, একবার তেল লইয়া ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত ইহা উড়িতে পারে।

কয়ার-ফড়িংএর আকৃতি বিশিষ্ট মনোপ্লেন।

প্রকৃতির খেয়াল

উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন এক একটা খামখেয়ালী ব্যাপার ঘটিয়া থাকে যে, তাহার কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করা দুষ্কর। বৈজ্ঞানিকেরাও তাহার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না। কাজেই এই সব ব্যাপার গুলিকে আমরা প্রকৃতির খেয়াল বলিয়াই নিরস্ত থাকি। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রকৃতির রাজ্যে খেয়ালের কোন স্থান নাই। যাহা ঘটে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। তবে সে নিয়ম কি—তাহা আমরা জানি না। যতগুলি নিয়ম জানা আছে—এ জাতীয় খামখেয়ালী তাহার মধ্যে পড়ে না। অথবা পড়িলেও তাহা আমরা মিলাইয়া লইতে পারিতেছি না। এই নিয়ম কি তাহা জানিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ এইচ. কে. মুখোপাধ্যায় প্রকৃতির খেয়ালের কতকগুলি অদ্ভুত নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার সংগৃহীত দুইটি জোড়া গরুর মাথার নমুনা প্রদত্ত হইল।

প্রকৃতির খেয়াল : দুইটি বিভিন্ন দ্বি-মস্তক বাছুরের প্রতিকৃতি।

পরমাণু ভাঙ্গিবার জন্য বিরাট বৈদ্যুতিক যন্ত্র

পরমাণুর উপাদান ও তাহার গঠন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে খাঁটি খবর জানিবার জন্য বর্ত্তমান পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন,—
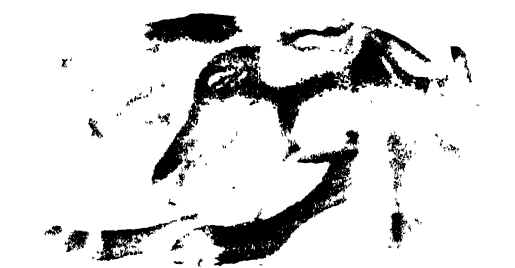
বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই এ সম্বন্ধে যে কত গবেষণা ও বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পরমাণু বিচূর্ণ করিয়া তাহার চরম উপাদান কি জানিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে ওয়াশিংটনের কার্ণেগী ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকেরা এক বিরাট বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বা 'জেনারেটর' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্র হইতে ১,৩০০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে। তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের উপরি-ভাগে এল্যুমিনিয়াম-নির্ম্মিত ৬ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড এক গোলাকার কুঠুরী আছে। নিম্নস্থিত একটি আলাদা মোটরের সাহায্যে রেশম-নির্ম্মিত চওড়া 'বেল্ট' এই এল্যুমিনিয়াম কুঠুরীর মধ্যে বিশেষ ভাবে স্থাপিত কপিকলের উপর দিয়া ঘুরিয়া বিপুল চাপের তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করে।

পরমাণু ভাঙ্গিবার বিরাট বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

আর্গন পরমাণু নিয়ন পরমাণু
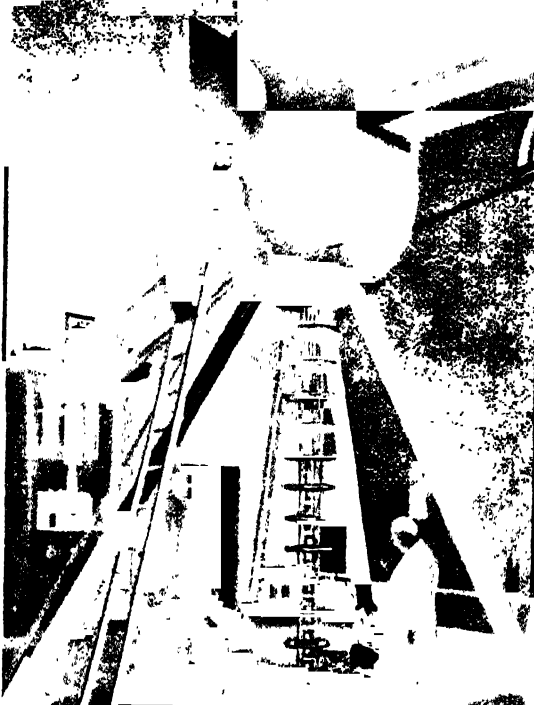
উৎপাদিত তড়িৎ শক্তি কুঠুরীর মধ্যেই সঞ্চিত থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কতকগুলি বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত অদ্ভুতাকৃতি একটা বিরাট কাচনল ঐ কুঠুরী হইতে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে, এই বিরাট নলটিকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্যে বিপুল চাপের এই তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা লিথিয়াম এবং বোরোনের পরমাণু চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই পরীক্ষার ফলে এক মৌলিক পদার্থকে অপর মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিবার এবং পরমাণুর মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, তাহা কাজে লাগাইবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মাসাচুসেট্‌স্ টেক্‌নোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে নির্ম্মিত ১০,০০০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইবে। এপর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার সাহায্যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কারণ পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, দৃশ্যমান আলোকের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যও ইহার অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ। কিন্তু এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হওয়ায় বিশেষ ব্যবস্থার ফলে ইহা দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। বিখ্যাত পদার্থবিৎ আর্থার কম্পটন এক্স-রের সাহায্যে কতকটা ঘোরালো ভাবে ফটোগ্রাফির প্লেটে পরমাণুর প্রতিকৃতি তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন মৌলিক পদার্থের এক্স-রে ফটোগ্রাফ লইলে ফটোপ্লেটের উপর যে ছায়া পড়ে তাহা হইতে পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা আঁচ করা যাইতে পারে। এক্স রে ফটোগ্রাফ হইতেই কম্পটন গণিতের সাহায্য লইয়া হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নমুনা অথবা অনুকৃতি গঠন করিয়া সেগুলিকে ক্যামেরার সম্মুখে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত করাইয়া ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। এই উপায়ে তোলা পরমাণুর ছবিগুলিকে আলো বিচ্ছুরণকারী সাদা বলের মত দেখায়। যদিও অনেক ঘোরপ্যাঁচ করিয়া এই ছবিগুলি লওয়া হইয়াছে তথাপি প্রকৃত পরমাণুর বহিরাবরণের ২০০,০০০,০০০ গুণ বর্দ্ধিত আকৃতির সঙ্গে ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উল্লিখিত যন্ত্রসাহায্যে পরমাণুর স্বরূপ ও তাহাদের উপাদান সম্বন্ধে অনেক অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

একটি মাত্র রেলের উপর চালিত জোড়া উভচর গাড়ী

তুর্কীস্থানের খনিজ সম্পদ আহরণের নিমিত্ত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এক প্রকার অদ্ভুত গাড়ী ব্যবহারের সংকল্প করিয়াছে। এই অদ্ভুত যানটি দেখিতে হইবে ঠিক পাশাপাশি সংলগ্ন একজোড়া গমন্ত এরোপ্লেনের মত। ইহা ট্রেনের মত রেল-লাইনের উপর ঝুলিয়া চলিবে, আবার প্রয়োজন হইলে জলের

উপর ভাসিয়াও চলিতে পারিবে। এই উভচর গাড়ী মরুভূমির মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত একটি মাত্র রেল-লাইনের উপর ঝুলিয়া ঘণ্টায় ১৮০ মাইল বেগে ছুটিতে পারিবে। খুব কম খরচে মরুভূমির উপর দিয়া কংক্রিটের গাঁথুনির উপর প্রায় ৩৩২ মাইল লাইন পাতা হইবে। ডিজেল ইলেকট্রিক মোটরে কিছুই নহে। এই জানোয়ারটি যাহারই নয়নগোচর হইয়াছে, তিনিই দেখিয়াছেন, যেন একটি বিপুলকায় সাপ মাথা তুলিয়া জল কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে। জলের উপর মাথা উঁচু করিয়া চলে ঐতিহাসিক যুগে এরূপ বিরাটকায় সামুদ্রিক জানোয়ারের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই সকলে ইহার উপর

উভচর রেলের গাড়ী।

এরোপ্লেনের মত প্রোপেলারের সাহায্যে গাড়ী চলিবে। উভয় দিকের গাড়ী মোট ৮০ জন যাত্রী অথবা সেই পরিমাণ মাল বহন করিতে পারিবে। এই রেল-লাইনের যেখানে প্রায় সওয়া মাইল চওড়া আমুদরিয়া নদী পড়ে, সেখানে এই উভচর গাড়ী লাইন পরিত্যাগ করিয়া নৌকার মত ভাসিয়া পার হইবে। মস্কৌতে এই গাড়ীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট নাকি ইতিমধ্যেই এই গাড়ীর জন্য রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

লথ নেস্ হ্রদের বিরাটকায় জানোয়ার।

লথ্‌নেস্ হ্রদের অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তু

কিছুদিন হইতে স্কটল্যাণ্ডের লথ নেস্ হ্রদের অতিকায় জলজন্তু সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অতিকায় দানবের অতি সামান্য অংশও যাহার নজরে পড়িয়াছিল, তিনিই স্কেচ আঁকিয়া, কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অতিকায় সামুদ্রিক সর্প অথবা তদনুরূপ কোন জন্তুর বংশধর ছাড়া আর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে Dr. Robert K. Wilson নামে একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক এই অতিকায় জানোয়ারের ফটো তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অতিকায় জন্তুটি যে একপ্রকার হিংস্র তিমি ছাড়া আর কিছুই নহে এই ফটোগ্রাফ হইতে তাহা

প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয় হিংস্র তিমির পিঠের উপরের পাখনাটি একটু বাঁকানো ভাবে খাড়া হইয়া থাকে। জলের উপরে সাপের মত এই পাখনাটি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। ডাঃ এণ্ড্রুজ এবং অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এই ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন

সাঁতার কাটিবার অভিনব ব্যবস্থা।

যে, জানোয়ারটি একটি বৃহৎ তিমি ছাড়া আর কিছুই নহে, কোন গতিকে হয় তো ইহা সরু খাঁড়ি দিয়া সমুদ্র হইতে হ্রদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ আরেকটি জলজন্তুর মৃতদেহ ফ্রান্সের উপকূলে ভাসিয়া আসিয়াছিল। ঢেউএর আঘাতে সেটা এতদূর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে লোকে উহাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অদ্ভুত জানোয়ার বলিয়া ভুল করিয়াছিল। পরে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, ইহা একটি বিরাট তিমির দেহাবশেষ।
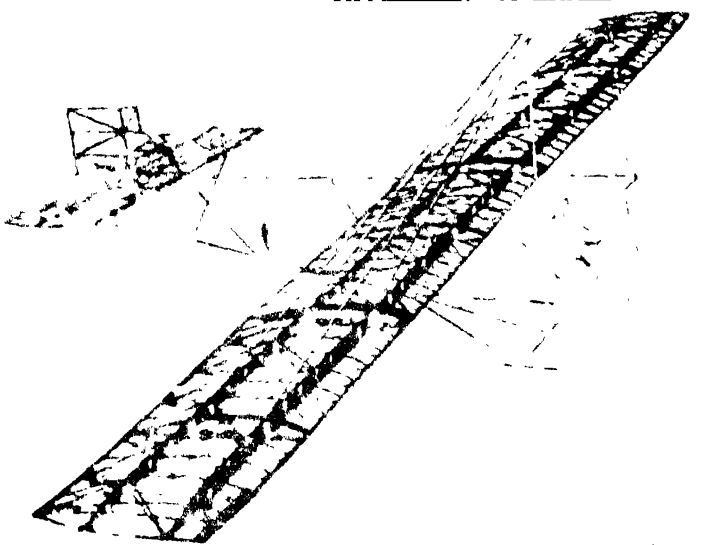
জোরে সাঁতার কাটিবার অভিনব ব্যবস্থা

শরীরের আয়তন অনুযায়ী জলের বিপুল বাধা অতিক্রম করিয়া হাতে পায়ে জল ঠেলিয়া খুব জোরে অগ্রসর হওয়া যায় না। সাঁতার কাটিবার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক প্রকার অভিনব ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক প্রকার স্যাণ্ডেলের তলার সঙ্গে পাখ্‌নার মত দুইদিকে দুইখানি খুব হাল্কা 'প্যাডেল' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্যাণ্ডেলের সঙ্গে পাখ্‌না দুইখানা কব্জার কৌশলে এরূপভাবে সংলগ্ন যে, জলের মধ্যে পা পিছনের দিকে অথবা নীচের দিকে ঠেলিলে উহারা ডানার মত ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু উপরের দিকে বা সাম্‌নের দিকে পা টানিয়া লইলেই পাখ্‌না দুইটি জুড়িয়া যায় কাজেই তখন জলের বাধা কিছুই থাকে না। এই পাখ্‌না-যুক্ত স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া অল্পায়াসে সাঁতার কাটিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া যায়।

আকাশে উড়িবার পায়ে চালিত 'গ্লাইডার'

মোটর, ইঞ্জিন বা অন্য কোন রকমের শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেই 'গ্লাইডার' খানিক দূর পর্য্যন্ত হাওয়ায় ভাসিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। জার্ম্মানীতে এক প্রকার নূতন ধরণের 'গ্লাইডার' নির্ম্মিত হইতেছে, উপরে তাহার অসম্পূর্ণ অবস্থার চিত্র সন্নিবেশিত হইল। এই 'গ্লাইডারে' চালকের বসিবার আসনের নীচেই বাই-সাইকেলের মত পা-দান সন্নিবেশিত হইয়াছে। চালক আসনে বসিয়া পা দিয়া 'প্যাডেল' বা পা-দান ঘুরাইলে প্রোপেলার ঘুরিতে থাকে, তখন প্রোপেলারের টানে 'গ্লাইডার' সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশ্য প্রথমে উঁচুস্থান হইতে 'গ্লাইডার'কে উড়াইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে পায়ে চালিত শক্তিবলে 'গ্লাইডার' অতি সহজে অনেকক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে এবং অনেকদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

পায়ে চালিত 'গ্লাইডার'।

অকর্ম্মণ্য ঘড়ির 'স্প্রিং' কাজে লাগাইবার উপায়

ঘড়ির অকর্ম্মণ্য পুরাতন মেন-স্প্রিং প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা করিয়া ভাঙ্গিয়া একটু পোড়াইয়া লইয়া একদিকে ধার দিয়া লইতে হইবে। তারপর দুই প্রান্ত লাল করিয়া পোড়াইয়া দুইটি ছিদ্র করিয়া তাহাকে চিত্রানুযায়ী বাঁকাইয়া একটি হাতলের সঙ্গে পেরেক দিয়া জুড়িয়া দিলে মাছের আঁইশ ছাড়াইবার অতি সুন্দর যন্ত্র তৈয়ারী হইবে। হাতল ধরিয়া লেজের দিক হইতে মাছের গায়ে চাপিয়া সামনের

দিকে জোর করিয়া টানিয়া লইলেই অতি অল্প সময়ে পরিষ্কার ভাবে সমস্ত আঁইশ তুলিয়া ফেলা যাইবে। পরে সোজাসুজি ভাবে পেট চিরিয়া এই যন্ত্র
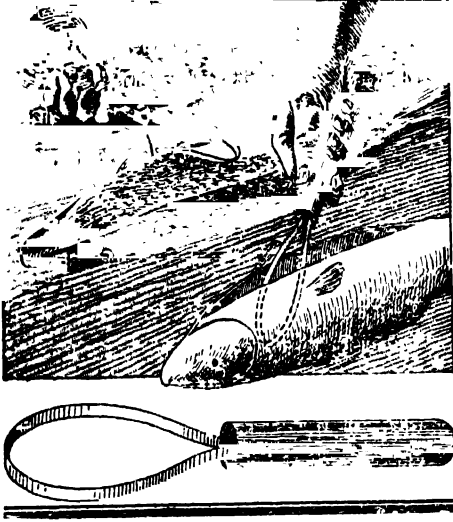
মাছের আঁইশ ছাড়াইবার যন্ত্র।

ভিতরে ঢুকাইয়া এক টানেই ভিতরের নাড়ীভুঁড়ি পরিষ্কার ভাবে বাহির করিয়া ফেলিতে কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রে বিপরীত দিকগামী জাহাজকে পরস্পর সংঘর্ষ হইতে বাঁচাইবার অভিনব যন্ত্র

গভীর কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রে ভাসমান বরফস্তূপে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজডুবি হইয়া অনেকবার অনেক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই ভাসমান বরফ স্তূপ হইতে জাহাজরক্ষার নিমিত্ত অদৃশ্য লোহিতাতীত রশ্মিসাহায্যে অনেক দিন পূর্ব্বেই বিভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। কুয়াসার মধ্যে পরস্পর বিপরীত দিকে ধাবিত জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে 'ক্যাথোড্-রশ্মি' সাহায্যে ঘটিকা যন্ত্রের মত এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিপরীত দিক হইতে দুইখানি জাহাজ এক লাইনে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রত্যেক জাহাজেই কম্পাসের ডায়েল-প্লেটের উপর ঘড়ির কাঁটার মত একটি বিপদসূচক উজ্জ্বল আলোরেখা ফুটিয়া ওঠে। সেই আলোর কাঁটা দেখিয়াই জাহাজের কর্ম্মচারীরা জাহাজের গতি অথবা দিক পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। বিলাতের সরকারী রেডিও-রিসার্চ ষ্টেশনের কয়েকজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মিলিয়া ক্যাথোড্-রশ্মি সহযোগে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রত্যেক জাহাজ হইতেই কুয়াসার সময় ১৫।২০ সেকেণ্ড অন্তরে মুহূর্ত্তের জন্য ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে হয়। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণের দিক্‌নির্দ্দেশক যন্ত্রের প্রণালীতে দুইটি আকাশ-তার বা 'এরিয়েল', অপর জাহাজ হইতে প্রেরিত বৈদ্যুতিক সঙ্কেত সংগ্রহ করিয়া দিক্‌নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া চৌম্বক তারকুণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হয় এবং প্রেরক জাহাজের অবস্থিতির দিগনুযায়ী যন্ত্রমধ্যে অবস্থিত ক্যাথোড্-রশ্মির স্থান পরিবর্ত্তন ঘটায়। এই যন্ত্রের ডায়েল প্লেটটি স্বদীপন পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত। কাজেই ক্যাথোড-রশ্মি যখন যেস্থানে পড়ে তৎক্ষণাৎ সেইস্থান আলোকিত হইয়া ওঠে, রশ্মিটি একটি সরু লম্বা ছিদ্রপথে বাহির হয় বলিয়া ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত দেখায়। জাহাজ দুইটি পরস্পর যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এই আলোরেখার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ তত বাড়িতে থাকে। এই উপায়ে কোন অদৃশ্য জাহাজের চলিবার রাস্তা অনায়াসে অঙ্কিত করা যাইতে পারে। আলোরেখা যখন একদিকে একই ভাবে থাকিয়া ক্রমশঃ দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে জাহাজের দিক পরিবর্ত্তন না করিলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এই যন্ত্র লইয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, দশ মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ থাকিলে তাহা অনায়াসে টের পাওয়া যায়।

জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য বিপদ-জ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্র।

এরোপ্লেনের বাষ্পীয় ইঞ্জিন

বাষ্পীয় শক্তি বলে এরোপ্লেন চালাইবার জন্য একজন জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার অসীম শক্তিশালী এক প্রকার ষ্টীম-টারবাইন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ইঞ্জিনটি ২৫০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এবং ইহার সাহায্যে এরোপ্লেন ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে চলিবে। তিনি
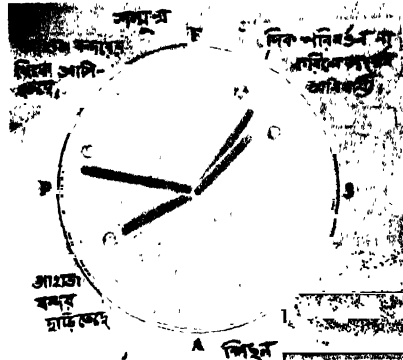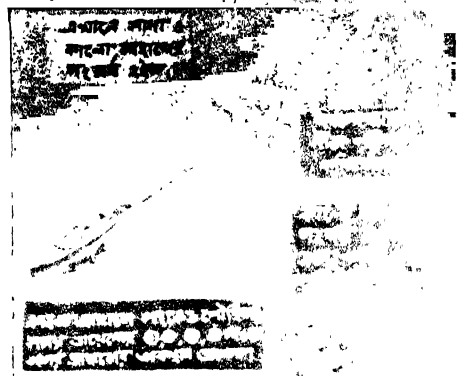
বাষ্প তৈয়ারী করিবার জন্য এক প্রকার ঘূর্ণায়মান বয়লারও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে আমেরিকাতে সর্ব্ব প্রথম বাষ্পচালিত এরোপ্লেন আকাশে উড়িয়াছিল।

এরোপ্লেন চালাইবার জন্য গোলাকার বাষ্পীয় ইঞ্জিন (টারবাইন)।

ভূগর্ভস্থ নলের সাহায্যে বিমান ঘাঁটী হইতে সহরে ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা

বিমান-ঘাঁটী যেস্থলে সহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সে স্থলে মুহূর্ত্তমধ্যে **বিমান-ডাকের** চিঠিপত্র সহরের পোষ্ট-অফিসে প্রেরণের জন্য ভূগর্ভস্থ বায়ু

ভূগর্ভস্থ নলের সাহায্যে বিমান-ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা।

নলের ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে কিনা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ডাকবাহী এরোপ্লেন এক ঘাঁটী হইতে আরেক ঘাঁটীতে যাইবার সময় চিঠিপত্র বহিয়া টর্পেডোর আকৃতিবিশিষ্ট চোঙের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া রাখা হইবে। এরোপ্লেন ঘাঁটীতে অবতরণ করিলে এই চিঠিপত্র পরিপূর্ণ চোঙ, বায়ু-নলের নির্দ্দিষ্ট মুখে ছাড়িয়া দিবা মাত্রই বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত পাত্রমধ্যে অত্যধিক চাপের বাতাসের সাহায্যে সবেগে ছুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পোষ্ট-অফিসে স্থাপিত নলের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইবে। এরোপ্লেন ঘাঁটীতে অবতরণ না করিয়া উপর হইতে চোঙটি জালের উপর ছাড়িয়া দিলেও চলিতে পারে।

ইলেকট্রিক 'প্রোবে'র সাহায্যে উদ্ভিদের ভূম্যাকর্ষণ-অনুভূতিসম্পন্ন স্তরের সন্ধান

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূম্যাকর্ষণ-অনুভূতিসম্পন্ন—ইহা পরীক্ষিত সত্য। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের কতগুলি বিশেষ কোষ এই আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু এই অনুভূতিসম্পন্ন কোষগুলি বৃক্ষদেহে ইতস্ততঃ অবস্থিত, না কোন নির্দ্দিষ্ট স্তর অধিকার করিয়া আছে—তাহা কি ভাবে জানা যাইতে পারে? অনুভূতিসম্পন্ন বৃক্ষাংশকে খুব সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে দেখা গিয়াছে যে, কতগুলি বিশেষ বিশেষ কোষের মধ্যস্থিত পদার্থসমূহই উদ্ভিদের ভূম্যাকর্ষণজনিত উত্তেজনা জাগাইয়া দেয়। প্রাণীদেহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকা সমূহ প্রোটোপ্লাজমের উপর ক্রিয়া করিয়া, কোন দিক হইতে আকর্ষণ হইতেছে তাহার অনুভূতি জন্মায়। হ্যাভারল্যাণ্ড, নেমেক প্রভৃতি বিখ্যাত উদ্ভিদবেত্তাগণ প্রাণীদেহের মত বৃক্ষদেহেও 'ষ্টার্চ্চ'-কণিকা সমূহের অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃক্ষদেহকে জীবন্ত অবস্থায় রাখিয়াই আচার্য্য বসু মহাশয় ইলেকট্রিক 'প্রোব' নামে নিজের উদ্ভাবিত এক অদ্ভুত যন্ত্র সহযোগে এই আকর্ষণ অনুভূতি-সম্পন্ন স্তরের অবস্থান এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র সুগম করিয়া দিয়াছেন। খুব সূক্ষ্ম সূচালো মুখবিশিষ্ট একটি কাচনলের মধ্য দিয়া প্রায় ০'০৬ মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি প্লাটিনাম তারের মুখ বাহির হইয়া আছে। তারের এই সূক্ষ্ম মুখ ছাড়া বাকী সমস্ত অংশই তড়িৎ-অপরিচালক কাচে আবৃত। এই সূচালো মুখের দৈর্ঘ্যও ৬ মিলিমিটারের বেশী নহে—যেন আড়াআড়িভাবে বৃক্ষদেহের একদিক হইতে আরেক দিক পৌঁছিতে পারে। প্লাটিনাম তারের অপর প্রান্ত কাচের নলের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া গ্যালভেনোমিটারের এক তড়িৎ-প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়। গ্যালভেনোমিটারের অপর তড়িৎ-প্রান্ত হইতে আরেকটি তার লইয়া গাছের যে কোন এক নিরপেক্ষ স্থানে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এখন 'প্রোব'টি চিত্রানুযায়ী মাইক্রোমিটার স্ক্রু সাহায্যে আস্তে আস্তে ঘুরাইলেই প্লাটিনামের সরু মুখটি ক্রমশঃ ভিতরে প্রবিষ্ট হইবে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহার সাহায্যে প্রয়োজনানুযায়ী একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট কোষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিতেও কোন অসুবিধা ঘটে না। 'প্রোব' আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে ভূম্যাকর্ষণ-অনুভূতিসম্পন্ন স্তরে উপস্থিত

হইলেই তাহার বিশেষত্বজ্ঞাপক তড়িৎপ্রবাহ গ্যালভেনোমিটারসংলগ্ন দর্পণকে স্থানচ্যুত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুসহস্রগুণে বর্দ্ধিত প্রতিফলিত আলোক-বিন্দুও স্থানচ্যুত হয়। এতদ্ব্যতীত বৃক্ষদেহের রস-শোষণ প্রক্রিয়া ও অন্যান্য
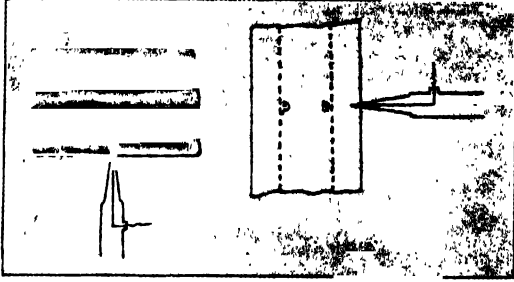
ইলেকট্রিক 'প্রোব'।

অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধানে এই যন্ত্রের অপরিসীম কার্য্যকারিতা দেখা গিয়াছে।

চোখের পর্দ্দায় মুদ্রিত প্রতিকৃতির সাহায্যে অপরাধীর সন্ধান

জার্ম্মেনী হইতে ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় এক অভিনব উদ্ভাবনার খবর পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে মানুষকে খুন করিয়া অপরাধীরা বেমালুম সরিয়া পড়ে, তাহাদের সন্ধান করিবার কোন চিহ্নই মিলে না। সে সব ক্ষেত্রে অপরাধীর সন্ধান পাইবার পক্ষে ফটোগ্রাফীর এই অভিনব আবিষ্কার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীদের চিনিয়া লইয়া হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিবার সুবিধা হইবে। ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়া ছবি যেমন উল্টা ভাবে ফটো-প্লেটের উপর পড়ে—এবং যতদিন পরেই হউক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ডেভেলপ্' করিলে 'নেগেটিভে'র ছবি ফুটিয়া ওঠে—সেইরূপ আমাদের চক্ষুর 'রেটিনা'র উপর পরিদৃশ্যমান বস্তুর প্রতিকৃতি উল্টাভাবে প্রতিফলিত হইয়া আলোক-অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ু-প্রান্তভাগ উত্তেজিত করিয়া আলোক-অনুভূতি জন্মায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন বস্তু বা দৃশ্য চোখের উপর পড়িলে অক্ষিপর্দ্দা বা 'রেটিনা'র উপর তাহার ছাপ থাকিয়া যায়। অপ্রকাশিত কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে অক্ষিপর্দ্দার এই ছাপকে ডেভেলপ করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমে মৃত ব্যক্তির চোখ বিস্ফারিত করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষে 'ডেভেলপ্' করিয়া অক্ষি-পর্দ্দার উপর অঙ্কিত অদৃশ্য ছবির ছাপ ফুটাইয়া তুলিয়া 'রেটিনোগ্রাফ' নামক অভিনব যন্ত্রসাহায্যে তাহার ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। পরে অক্ষি-পর্দ্দার এই 'ফটো-নেগেটিভ'কে 'রেডিওষ্ট্যাটোগ্রাফ' নামক যন্ত্রে স্থাপিত করিয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছবির খুঁটিনাটি ফুটাইয়া তোলা হয়। তৎপরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে ইহার পরিবর্দ্ধিত ফটোগ্রাফ তুলিয়া লওয়া হয়।

স্বয়ং-ক্রিয় ক্ষুর

জার্ম্মেনীতে এক প্রকার অদ্ভুত স্বয়ং-ক্রিয় ক্ষুর উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক সাধারণ একটি সেফটি-রেজরের মত। হ্যাণ্ডেলের মধ্যে সাধারণ টর্চ্চ-লাইটের ব্যাটারীর মত একটি ব্যাটারী ভরিয়া চাবি টিপিলেই অতি ক্ষুদ্র মোটরের সাহায্যে ক্ষুরের ফলাটি অতি দ্রুত গতিতে উপরে নীচে কাঁপিতে থাকে। তাহাতেই অতি পরিষ্কার ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কামাইবার সময় ক্ষুরের ফলাটিকে গালের উপর আলতো ভাবে ধরিয়া রাখিলেই চলে। ফলা সহজেই বদ্লান যায়। ব্যাটারী এবং

স্বয়ং-ক্রিয় ক্ষুর।

মোটর রাখিবার স্থান দুইটি সম্পূর্ণরূপে জলপ্রবেশশূন্য ; কাজেই ইহা কলের নীচে ধরিয়া পরিষ্কার করিবার কোনই অসুবিধা নাই।

ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ

বৃক্ষদেহের বৃদ্ধি এত কম যে, তাহা খোলা চোখে দেখা দূরের কথা সাধারণ কোন পরিবর্দ্ধক যন্ত্র সাহায্যেও টের পাওয়া অসম্ভব। গাছের লম্বালম্বি বৃদ্ধির

ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ।
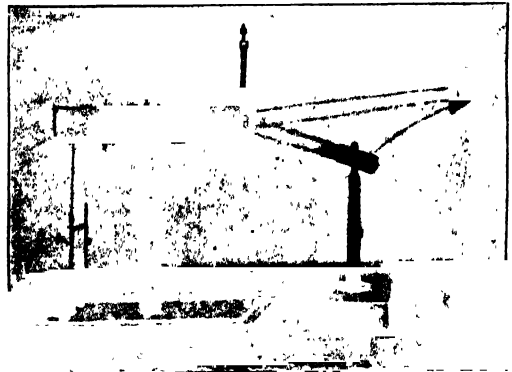
পরিমাণ গড়পড়তা সেকেণ্ডে প্রায় এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র অর্থাৎ সোডিয়াম আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক। ইতিপূর্ব্বে যে সকল পরিবর্দ্ধন যন্ত্র বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বৃক্ষ-দেহের বৃদ্ধির কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। এত সময় ধরিয়া বৃক্ষদেহের

বৃদ্ধি মাপিতে হইলে অনেক অসুবিধা ঘটে এবং বৃদ্ধির পরিমাণ মাপিতে পারিলেও তাহা নির্ভুল হইতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আচার্য্য জগদীশ 'ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ' নামে বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির পরিমাপক এক অদ্ভুত পরিবর্দ্ধক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একটি চৌম্বক-শলাকা, উপরে নীচে নড়াচড়া করিতে পারে এরূপে শয়ানভাবে লাগানো আছে। একটি একচতুর্থাংশ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দর্পণের পিছনে অর্দ্ধগোলাকৃতি দুইটি চুম্বক বৃত্তাকারে সংযুক্ত করিয়া, শয়ান চুম্বক-শলাকার সূক্ষ্মমুখের খুব কাছে - সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। শয়ান চুম্বক-শলাকার

বায়স্কোপের ছবি উঁচু নীচু দেখাইবার পর্দ্দা।

স্থূলমুখের প্রায় প্রান্তভাগে গাছকে সূক্ষ্ম রেশমসূত্রদ্বারা সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। শলাকাটিকে এমনভাবে দুইদিকে সমভারযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়, যেন গাছ একটু বাড়িলেই চুম্বক-শলাকার সূক্ষ্মমুখ একটু স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মমুখ শলাকা একটু চঞ্চল হইলেই অর্দ্ধগোলাকার চুম্বকসমন্বিত দর্পণখানি অনেক দূর ঘুরিয়া যাইবে। বৃদ্ধির পরিমাণানুযায়ী এই ঘূর্ণনের তারতম্য হয়। একটি আলোকাধার হইতে আলোকরশ্মি ঐ দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং প্রায় ৫ কোটী গুণ বর্দ্ধিত হইয়া দূরস্থিত স্কেল অথবা দেওয়ালের উপর পতিত হয়। কাজেই এই যন্ত্রসাহায্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে গাছ কতটা বর্দ্ধিত হইল তাহাও জানিতে পারা যায়। এই অদ্ভুত পরিবর্দ্ধন-যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হইয়াছে।

নিম্ন-পৃষ্ঠ পর্দ্দার উপর বায়স্কোপের ছবি উঁচু-নীচু দেখাইবার ব্যবস্থা

শাদা কাপড়ের পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত করিয়া বায়স্কোপের ছবি দেখান হয়। কিন্তু তাহাতে ছবি সাধারণ কাগজে মুদ্রিত ফটোগ্রাফের মতই প্রায় সমতল দেখায়—খুব স্বাভাবিক ভাবে উঁচু-নীচু দেখায় না, পর্দ্দার উপর ছবি উঁচু-নীচু বা সামনে পিছনে দেখাইবার জন্য অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ষ্ট্রাটফোর্ড নামে বিয়াট্রিসের এক ভদ্রলোক বায়স্কোপের ছবি উঁচু-নীচু বা Stereoscopic করিবার জন্য অতি সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহাতে নূতন রকমের কোন ফিল্মের প্রয়োজন নাই, কেবল কাপড়ের সমতল পর্দ্দার পরিবর্ত্তে কোন ধাতব বা অন্য কোন কঠিন পদার্থের নিম্ন পৃষ্ঠ পর্দ্দার ব্যবহার করিতে হয়। এই ধাতব পর্দ্দা উপরের চিত্রানুযায়ী 'লেদে' বাঁধিয়া দিতে হয়। 'লেদে'র tail-stockএর সঙ্গে একটি চেন আটকাইয়া তাহার সহিত বাটালী ধরিয়া কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে পর্দ্দাখানিকে খুঁদিয়া আনিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় পর্দ্দার ভিতরের দিক নিখুঁৎভাবে বৃত্তাকার হইয়া আসিবে। আলো-প্রক্ষেপকারী যন্ত্র হইতে পর্দ্দা যত দূরে রাখিয়া ছবি দেখান হয়, চেনটিও ঠিক ততখানি লম্বা রাখিয়া তাহার সঙ্গে বাটালী ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই পর্দ্দার নিম্ন-পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্দ্ধ, বায়স্কোপের আলো-প্রক্ষেপকারী লেন্স হইতে পর্দ্দার দূরত্বের সমান হইবে। এই ব্যাসার্দ্ধ ও দূরত্ব সমান না হইলে ছবি stereoscopic দেখাইবে না। পাশের চিত্রে বৃত্তাকার নিম্নতল বিশিষ্ট পর্দ্দার উপর ছবি প্রক্ষেপ করিয়া দেখান হইতেছে।

আর এক দিক

'ল্যান্সেট' পত্রিকা সংবাদ দিতেছে : একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, কয়েক বছর ধরিয়া তাঁহার পাকস্থলীতে বেদনা বোধ করেন, খাওয়ার পর এই বেদনার বৃদ্ধি হয়। এই ভদ্রলোক সস্ত্রীক বায়োস্কোপে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে বায়োস্কোপ দেখিতে দেখিতে যেমন সকলের হয়, তাঁহারও তেমনই সিগারেট খাইবার বাসনা হইল। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইলেন। অমনই বারুদে আগুন লাগার মত 'ফট্' করিয়া শব্দ হইল ; অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তের আলোতে ঘর ভরিয়া গেল—সকলে চকিত হইয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকের মুখের সিগারেট দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। গোঁফ পুড়িয়া গেল, আঙুল ঝলসাইয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ রোগের দরুণ এই ভদ্রলোকের পাকস্থলীতে বিশেষ একপ্রকার গ্যাস জন্মায়, তাহাই নিশ্বাসের সহিত বাহিরে আসিয়াছে এবং তাহাতে অগ্নি সংযোগ হইয়াই এই দুর্ঘটনা।

অভিশপ্ত

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মোদের প্রেমের 'পরে
কঠিন ভ্রুকুটিভরে
নাহি জানি, চাহি' আছে কার অভিশাপ।
নাহি হেরি আলো-রেখা,
শুধু ঘোর তমোলেখা
হৃদয়-গগনে শুনি করুণ বিলাপ।
নাহি সেথা ফুল-দোল,
হাসির হিল্লোল-রোল,
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য ব্যথার সাগর;
তারি 'পরে কম্পমান
মূর্চ্ছাতুর দুটি প্রাণ,
এ উহারে আঁকড়িয়া ভয়ে থর থর।
যেদিন মিলন-রাতে
হাতখানি তুলি' হাতে,
চেয়েছিনু মুখপানে কৌতূহলভরে,
স্বপন-কল্পনারাশি
দোলা দিয়েছিল আসি,
ফুটেছিল স্বর্ণ-পুষ্প থরে থরে থরে।
ভাবি নাই ভবিষ্যতে
দুঃখের আঁধার পথে
মোদের চলিতে হবে দুর্য্যোগের দিনে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাব,
পথ কোথা নাহি পাব,
কেহ না করিবে দয়া দুটি পথহীনে।
শুধু একবার প্রিয়া
কেঁপে উঠেছিল হিয়া
মিলনের শুভরাত্রে মেঘ-গরজনে,
দুলে উঠেছিল বুক—
এত আশা, এত সুখ
সহিবে কি অভাগার আঁধার জীবনে?
বাসর-শয্যার 'পরে
অসীম বিস্ময়ভরে
ঘুমন্ত আনন হতে আবরণখানি
প্রশান্ত নিষুপ্ত রাতে
দ্বিধায় কম্পিত হাতে
ধীরে ধীরে উন্মোচিয়া ফেলিলাম টানি';
মুহূর্ত্তেকে হল মনে,
ফুটিল যে এ জীবনে
আলোক-পিয়াসী এই সোনার কমল,
কোথায় রাখিব ধরি'?
বুকে করি'? প্রাণে করি'?
এ জীবনে কোথা আলো? আঁধার কেবল।
এতদিনে সে কমলে
প্রতি পর্ণে, প্রতি দলে
লাগিয়াছে বিষাদের গাঢ় ম্লান ছায়া,
মুছে যায় স্বপ্নছবি,
নাহি চন্দ্র, নাহি রবি,
ক্রন্দনে গঠিত যেন মোরা দুই কায়া।
রুগ্ন তব দেহখানি
বক্ষে মোর টেনে আনি,
আগ্রহে বাঁধিয়া ধরি, পাছে বা হারাই,
তুমিও আমার পানে
চেয়ে শঙ্কাতুর প্রাণে,
কি হেরিছ ভয়ে ভয়ে, বুঝি সরে যাই!
ছাড়িব না কেহ কারে
এ জীবন-পারাবারে,
মৃত্যুর তরঙ্গমালা ঘিরিয়া চৌদিকে,
ভীষণ কল্লোলে মাতি'
আশঙ্কা-দুঃস্বপ্ন গাঁথি'
জীবন দুর্ব্বহ করি' তুলিছে নিমিখে।
এসো সখি, এসো কাছে,
ঐ দেখ ঘিরে আছে
সঘন আঁধার রচি' কার অভিশাপ,
আলো নাই, আলো নাই,
বুঝি পাই—নাহি পাই—
মর্ম্মময় নিদারুণ কাতর বিলাপ।

বাঙ্গালার পাট ও আর্থিক দুর্গতি

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালা দেশে পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আর্থিক সম্পদ বিলীনপ্রায় হইয়া যাইতেছে এবং চারিদিকের দৈন্য ও বেকার-সমস্যা যেন ভবিষ্যতকে ক্রমশঃ জটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালার আর্থিক মঙ্গল একমাত্র পাটরপ্তানীর উপর অনেকখানি নির্ভর করে। প্রতি বৎসরের সমগ্র রপ্তানীর মূল্যস্বরূপ যে টাকা বাঙ্গালীর ঘরে আসে, পূর্ব্বে তাহার অর্দ্ধেকের বেশীই আসিত পাট হইতে। ১৯২০ সন হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ শুধু পাটের দরুণ গড়ে প্রতি বৎসর লাভ করিয়াছে ৩৫·৭২ কোটি টাকা। সে স্থলে ১৯৩১ সনে পাওয়া গিয়াছে ১৭·৬০ কোটি, ১৯৩২ সনে ১০·২৯ কোটি এবং ১৯৩৩ সনে মাত্র ৮·৬২ কোটি। এই ভাবে বাঙ্গালীর আর্থিক আয় গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪৫ টাকা কমিয়া গিয়াছে। জনপ্রতি যে স্থলে একমাত্র পাটের দরুণ বাৎসরিক আয় ছিল আট টাকার মত, সে স্থলে এখন আয় দাঁড়াইয়াছে দুই টাকারও কম। এই অবস্থাটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে বাঙ্গালা দেশের চাষীদের এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের আর্থিক দুর্দ্দশা কত দূর গড়াইয়াছে, তাহার কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি। কেন এই অবস্থা হইল, কেনই বা পাটের আদর ও চাহিদা এমন ভাবে হঠাৎ কমিয়া গেল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত গৃহশিল্প হিসাবে পাটের প্রয়োজনীয়তা বাঙ্গালা দেশে খুব বেশী ছিল। তখন বিদেশে যে পাটশিল্প রপ্তানী হইত তাহার পরিমাণও কম ছিল না। কিন্তু ১৮৩৫ সনে ডাণ্ডীতে পাটকল স্থাপিত হইবার পর এবং ১৮৫৫ সন হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতায় গঙ্গার তীর ছাইয়া একটির পর একটি করিয়া যখন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া বাঙ্গালার গৃহশিল্প পারিয়া উঠিল না। ফলে গৃহশিল্পের পতন ঘটিতে লাগিল। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেও দেখা যায় যে, পাটশিল্পের আদর তখনও বিদেশে অতি সামান্য ছিল না। সেই বৎসরে মোট রপ্তানী ১ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকারই বাঙ্গালী-গৃহের তৈয়ারী পাটদ্রব্য ছিল। এই ভাবে গৃহশিল্পের অধঃপতন হওয়ার দরুণ একদিক দিয়া ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু অন্য দিক দিয়া বাঙ্গালার অর্থসম্পদ বৃদ্ধি হইবার রাস্তাও পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। বিদেশে রপ্তানী-দ্রব্য হিসাবে পাটের আদর যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পাটের চাষ বাঙ্গালায় ততই বেশী হইতে লাগিল। যে স্থলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মাত্র ২১ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইত, সে স্থলে ১৯২৬ সনে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৮ লক্ষ একরেরও বেশী। সঙ্গে সঙ্গে বেশী অর্থও বাঙ্গালীর ঘরে আসিয়া জুটিতে লাগিল। ঐ ১৯২৬ সনেই বাঙ্গালা দেশ পাটের রপ্তানীতে সবচেয়ে বেশী টাকা লাভ করিয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, সে বৎসরে ছেলেবুড়ো মিলাইয়া জনপ্রতি ১৫৲ টাকা হিসাবে উপার্জ্জন হইয়াছিল।

এ ভাবে পাটের মর্য্যাদা বাড়িয়া যাওয়ায় কতকগুলি কুফল-সৃষ্টির রাস্তাও পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালার কৃষিসম্পদের মূল্যস্বরূপ যে-টাকা পাট হইতে পাওয়া যাইতেছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে বাঙ্গালার কৃষিজীবীদের এই একটি শস্যের উপরেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইল। যে সব ক্ষেতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলিতে ক্রমশঃ পাটের চাষ আরম্ভ হইল। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইল এবং ফলে অন্য প্রদেশের খাদ্যশস্যের আমদানীর উপর বাঙ্গালীরা নির্ভর করিতে শিখিল, অন্য দিক দিয়া তেমনি ভবিষ্যৎ আর্থিক দুর্ঘটের বীজও উপ্ত হইল। এরূপ বাণিজ্যমন্দার দিন যে কখনও আসিতে পারে—তাহা অদূরদর্শী কৃষকেরা তো জানিতই না, এমন কি প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য—ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা—বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে কখনও ভাবিয়া দেখিলেন না। অন্যান্য দেশে কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন, বিবিধ শিল্পসৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ একটি কর্ম্মপদ্ধতি থাকে; চাহিদা অনুসারে দ্রব্যের উৎপাদন, কি ভাবে আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিয়া বেশী লাভ হয়,

বিদেশে কিরূপে স্বদেশজাত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করা যায়, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কমিটি থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি-উৎপাদনে কোন উদ্দেশ্য এবং প্ল্যান ছিল না। ফলে কৃষকেরা নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে পাটের চাষ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল। তাহার চাহিদা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের আবহাওয়া অনুসারে যে হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে—তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। কাজেই ১৯৩০ সনে যখন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্ঘট আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল, উৎপাদিত কাঁচা পাট ও পাটশিল্পের পরিমাণ চাহিদার অপেক্ষা ঢের বেশী হইয়া গিয়াছে। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৩০ সনে বাজারে ১০ লক্ষ বেল পাট বেশী আমদানী হইয়াছিল। এই পাট লইবার লোক ছিল না; আর্থিক মন্দার জন্য চাউল, গম, তুলা, তৈল-বীজ প্রভৃতির চাহিদা যেমন হ্রাস পাইয়াছিল পাটের চাহিদাও ততোধিক কমিয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাণিজ্য দ্রব্য প্যাকিং করিবার জন্যই পাটশিল্পের বেশী দরকার, কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যই যখন হ্রাস পাইল তখন স্বভাবতঃই পাটের প্রয়োজনও অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। পাটের চাহিদার হ্রাস, কিন্তু উৎপাদনের বৃদ্ধি—এই দুই কারণে পাটের দামও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। প্রথমতঃ পাটশিল্পের মূল্য একটু বেশী কমিল, কিন্তু পাটকলের মালিকগণ সংঘবদ্ধ বলিয়া সত্বরেই তাহাদের মিলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিল; ফলে পাটশিল্পের মূল্যহ্রাস তেমন হইতে পারিল না, কিন্তু অন্যপক্ষে চাষীরা দেশের চারিদিকে ছড়ানো থাকায় তাহাদের পক্ষ হইতে ঐক্যবদ্ধ কোন প্রচেষ্টা সফল হইতে পারিল না। এই সব কারণে কাঁচা পাটের দাম পাটশিল্পের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইল। বাঙ্গালার পাট অবিক্রীত থাকিল বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হইল; চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিল। ১৯২৮ সনের তুলনায় ১৯৩৩ সনে পাটশিল্পের দাম কমিল শতকরা ৬২ টাকা, সে স্থলে কাঁচা পাটের দাম কমিল শতকরা ৫৫ টাকা। এই সময় তুলা শতকরা ৪৮ টাকা, এবং চা ৪০ টাকা কমিয়াছিল। ইহাতে এই প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে আসে—কাঁচা পাটের দাম সবচেয়ে বেশী কমিবার কারণ কি? নিশ্চয়ই কোন জায়গায় এমন একটি ত্রুটি বা বাধা রহিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য বাঙ্গালার আর্থিক শক্তির প্রতীক পাট এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পাটের উৎপাদন-হ্রাসের জন্য একেবারে যে চেষ্টা হয় নাই তাহা নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কিছু প্রচারকার্য্যের জন্য ১৯৩১-৩২ সনে পাটচাষ কিছু হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। কেননা ইহার একমাত্র কারণ ছিল যে, পাটের চাহিদা অসম্ভবরূপে কমিয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বতন কয়েক বৎসরের অবিক্রীত পাট অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রে মজুত ছিল। বর্ত্তমানেও প্রচারকার্য্য দ্বারা পাটচাষ কমাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান বৎসরের পাটচাষের পরিমাণের হিসাব দেখিয়া মনে হয় যে, এবারও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর পাটচাষ করিয়া কৃষকেরা নিজেদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না; তথাপি কেন যে তাহারা পাটের চাষ কমাইতেছে না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে যে আর্থিক দুর্দ্দশা কতখানি করুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে ঋণে জড়িত এবং সেই জন্যই তাহারা কিছু নগদ অর্থের আশায় ক্ষতি দিয়াও পাটচাষ করিয়া চলিয়াছে। সংসার-যাত্রানির্ব্বাহের জন্যও তাহাদের ঋণ না করিয়া উপায় নাই। যে স্থলে সমস্ত হিসাব করিয়া তাহাদের প্রতি মণ পাট উৎপাদন করিতে ৫ টাকা হইতে ৬ টাকা খরচ পড়ে, সে স্থলে তাহাদের যদি প্রতি মণ মাত্র ৩.৪ টাকায় বিক্রয় করিতে হয়, তবে তাহাদের জীবনযাত্রার জন্য অন্যের দ্বারে হাত না পাতিয়া উপায় কি? আমাদের কৃষিসম্পদ বিদেশে বিক্রয়ের দরুণ যত টাকা পাওয়া যাইত, তন্মধ্যে একমাত্র পাট হইতেই ১৯২৬-২৭ সনে শতকরা ৬৫ টাকা এবং ১৯২৯-৩০ সনে ৫১ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সে স্থলে এখন যদি মাত্র ২৬ টাকা পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের দরুণ উপার্জ্জনের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া থাকে, তবে বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা যে কত দূর হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, পাটের বাণিজ্য এরূপভাবে হ্রাস পাইবার কারণ তিনটি। প্রথমতঃ পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্ঘটের জন্য বাণিজ্যমন্দা, দ্বিতীয়তঃ সেই জন্য চাহিদাহ্রাস এবং তৃতীয়তঃ চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন। মোটামুটি এই

কয়টি কারণ হইলেও উপযুক্ত পাটের মূল্য পাওয়ার পক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায় হইল—চাষীদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার অভাব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, পাটকলওয়ালাদের মধ্যে যেরূপ সংঘবদ্ধতা আছে, পাটচাষীদের মধ্যে তাহা নাই। সেই জন্য তাহাদের উৎপাদিত শস্যের লাভের অংশ ও পরিশ্রমের পুরস্কার ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি লোক কাড়িয়া লয়। সংঘবদ্ধভাবে পাট বাজারে আমদানী করা এবং উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া পর্যান্ত তাহা গুদামঘরে মজুদ রাখা—এসবই নির্ভর করে চাষীদের একতাবদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতির উপর।

বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট পাটের দুরবস্থার কারণগুলি অনুসন্ধান করিবার এবং সম্ভব হইলে তাহার প্রতীকারের উপায় আবিষ্কারের জন্য ১৯৩২ সনের প্রারম্ভে একটি পাটতদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সভ্য ছিলেন সরকারী ও বেসরকারী লোক। বাঙ্গালার বিভিন্ন বণিকসংঘের প্রতিনিধিও তাহাতে স্থান পাইয়াছিল। কয়মাস হইল এই কমিটির রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রস্তাবগুলির উপর নির্ভর করিয়া কোন পন্থাবলম্বন করিতে পারেন নাই, শুধু জানাইয়াছেন যে, যেহেতু তদন্ত কমিটির সভ্যদের মধ্যে পাটের উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থলে গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি কোন বিশেষ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা বাঙ্গালার চাষীদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ তাহারা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাদের আর অপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রধানতঃ দুইদল দুইভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। একদল—যাঁহারা সংখ্যায় বেশী, পাটচাষের নিয়ন্ত্রণ, পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং স্থায়ী পাটকমিটির উদ্দেশ্য ও সংগঠন ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপক কর্ম্মপদ্ধতির জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা শুধু সাময়িক ত্রুটি ও দোষগুলিকে দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য দল—যাঁহারা সংখ্যায় কম—পাটসমস্যা সমাধানের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবনে অধিকতর কার্য্যকরী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। অতি সত্বর আইন করিয়া পাটচাষের নিয়ন্ত্রণ কোন পক্ষই অনুমোদন করেন না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আরও বিস্তৃত ও অভিজ্ঞ প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আইন করিয়া পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু শুধু প্রচারকার্য্যে কতখানি কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে তাহা অতীতের ফল দেখিয়া অনুমান করা যায় না। তবে নূতন উপায় অবলম্বন এবং যোগ্যতর প্রচার দ্বারা চাহিদার চেয়ে বেশী পাট উৎপাদনের কুফলগুলি চাষীদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

স্থায়ী পাট কমিটির কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের দল বিশেষ কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা পাটকমিটির কর্ম্মসীমা সম্বন্ধে শুধু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের বাহিরে পাটের পরিবর্ত্তে যে সব রাসায়নিক বা অনুরূপ দ্রব্য আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আমাদের পক্ষে পাটের নূতন নূতন ব্যবহার ও নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। এইভাবে তাঁহারা পাটব্যবসায়ের বাহিরের উন্নতির দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন। কিন্তু পাটতদন্ত কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠের দল মনে করেন যে, ভারতের বাহিরে যে সব কারণে পাটের বাণিজ্য হ্রাস পাইতেছে, তাহাদের উপর আমাদের অধিকার অপেক্ষাকৃত অল্প। কাজেই প্রথমে অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে ঘরের দিকেই তাকাইতে হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে যে, পাটের চাষ, পাটের আমদানী, রপ্তানী প্রভৃতি ব্যাপারে কোনরূপ গলদ আছে কি না। প্রকৃত প্রস্তাবে পাটচাষ ও পাটের বাজারের মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য পাটের দুর্দ্দশা এরূপ হইতে পারিয়াছে। আমাদের দেশের মধ্যেই কাঁচাপাট ও পাটশিল্পের মধ্যে যে মূল্যের অত্যধিক বৈষম্য থাকিয়া যায়, তাহা যদি উপযুক্ত আইন ও পাটের বাজার সংগঠন দ্বারা দূরীভূত করা যায়, তবে পাটের ব্যবসায় পুনর্জীবিত হইতে পারে। পাটশিল্পের উৎপাদন-ব্যয় আমাদের দেশে এতটা বেশী হয় যে, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতায় তাহা টিকিতে পারে না। এ কথা বলিলে আশ্চর্য্য শুনাইবে যে, পাট ভারতের একচেটিয়া হইলেও ভারতের পাটশিল্প অতি সামান্য। অথচ জাপানে ১২০০টি, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে ৮৫০০টি, জার্ম্মেনীতে ৯৬০০টি এবং আমেরিকায় ২৮৫০টি তাঁত চলে। তাহারা আমাদের দেশ হইতে কাঁচাপাট লইয়া সেই

পাটের নানাবিধ জিনিষ তৈরী করিয়া অনেকভাবে আমাদের দেশেই রপ্তানী করে। আমাদের পাটকলগুলিতে উৎপাদন-ব্যয় এতটা বেশী যে, উহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের পাটশিল্প পারিয়া উঠে না। তাহার উপর আমাদের দেশে বিভিন্ন পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠানও অতি অল্প।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে যে কৃষি কমিশন বসিয়াছিল, তাহাও এইরূপ ব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য একটি স্থায়ী পাটকমিটি সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছিল। এরূপ একটি পাটকমিটির যে কত দরকার তাহা কেন্দ্রীয় তুলা-কমিটির (Central Cotton Committee) কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই অনুভব করা যায়। এই কমিটির কাজ হইবে পাটব্যবসায়ীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন। কয়েক মাস পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেল বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়া একটি কনফারেন্স করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতের কৃষিদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে লাভ করা যায় সেই বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাটসমস্যা সমাধানের জন্য যে একটি কমিটি সংগঠনের একান্ত দরকার, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। পাট যে গভর্ণমেণ্টের যথোপযুক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই তাহা এই হইতেই প্রমাণ হয়। ভারতের কৃষি-দ্রব্যগুলির চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাটের কোন স্থান নাই। ১৯৩০ সনে অনিয়ন্ত্রিত পাটচাষের জন্য তাহার কি দুরবস্থা হইয়াছিল সে ব্যাপার আমরা সকলেই অবগত আছি। কাজেই পাটচাষের নিয়ন্ত্রণের কথা নূতন করিয়া প্রচার করিবার যে কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল তাহা স্বীকার করা যায় না। তাহার পর মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টার জন্য তাহাদের প্রদেশে ধান ও গম উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের যে সব প্রতিনিধি সিমলা-বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেন যে পাটের কথা উল্লেখও করিলেন না তাহাই আশ্চর্য্য। ইহাই পরিতাপের বিষয় যে, পাটের অত্যধিক উৎপাদন, অনিয়ন্ত্রিত বাজার এবং পাট ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার অর্থাগমের এই উপায়টিকে নির্ব্বিঘ্ন ও সহজ করিবার চেষ্টা করিলেন না। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া; সে হিসাবে পাটশস্যের নিয়ন্ত্রণ যতটা সহজসাধ্য হইবে তাহা অন্য কোন শস্য সম্বন্ধে হইবে না। অন্যান্য দেশে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় শস্যের পিছনে বিশেষ বিশেষ কমিটি বা প্রতিষ্ঠান থাকিয়া তাহার উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী ও বাজার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ফলে বাণিজ্যের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসব কৃষিদ্রব্যের ভাগ্য-বিপর্য্যয় এত দ্রুত হইতে পারে না। বাঙ্গালার আর্থিক মঙ্গলের জন্য এই রূপ একটি কমিটি সংগঠনের যে কত প্রয়োজন তাহা বলিবার আবশ্যক করে না।

আর এক দিক

১৯৩১ সালের সেন্সাসের হিসাব হইতে সঙ্কলিত ৬৮০ পৃষ্ঠার একখানি বই সম্প্রতি বৃটিশ ষ্টেসনারি আফিস প্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডনের জনসংখ্যাকে এই বইয়ে পেশা হিসাবে বিভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে। তিন বৎসরের পুরানো হইলেও এই হিসাবে অনেক উল্লেখযোগ্য সংবাদ মিলিবে। বর্ত্তমান কালে নারীরা যে কত রকম পুরুষালি কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। ১৯২১ সন হইতে দশ বৎসরের গণনায় দেখা যায় যে, ২১৮ জন স্ত্রীলোক ক্রেন ও ইঞ্জিনের ড্রাইভারের কাজ করিতেছে, ৫জন বয়লারের মিস্ত্রী এবং ৯৩ জন ইলেকট্রিক ও মোটরের মিস্ত্রীগিরি করিতেছে। ৬০০০ বিবাহিতা স্ত্রীলোক চাষবাস করে—১ জন দিনমজুরীও করিতেছে। ৩৪৭ জন বিবাহিতা নারী কামারের কাজ করিতেছে। জন চারেক গাড়োয়ান-কোচম্যানও পাওয়া যাইবে; ৮২১ জন রাস্তা মেরামতি, প্লাম্বার, পয়েন্টসম্যান ইত্যাদির কাজ করিতেছে। ৫ জন বিবাহিতা স্ত্রীলোক পুলিশ কনষ্টেবল, ইনস্পেক্টার ইত্যাদির কাজ করিতেছে। ৬১ জন জুয়াড়িও মিলিবে।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অদৃশ্য প্রাণী-জগৎ

একলা ঘরে তুমি বসে আছ। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ঘরে তুমি একলা বসে আছ—আর কোনও প্রাণী সেখানে নেই। কিন্তু সেই একলা ঘরে হয়ত তখন লক্ষ লক্ষ প্রাণী ঠিক তোমারই মত নিশ্চিন্তে অবস্থান করছে। একটা আধটা প্রাণী নয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণী তোমাকে ঘিরে সেই ঘরে ঘুরছে, ফিরছে, তাদের বাসনা ও শক্তি অনুযায়ী চলা-ফেরা করছে। যে-সূর্য্যের

লিউয়েনহুক।

আলোটুকু জানালার ফাঁক দিয়ে তোমার গায়ে এসে পড়েছে, তাতেই হয়ত লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিচরণ করছে। জগতের কোনখানেই তুমি একলা নও।

লক্ষ লক্ষ প্রাণী আমার ঘরের মধ্যে যে বিচরণ করছে, কই তাদের তো দেখতে পাইনা! শুধু চোখে তাদের দেখা যায় না। এবং শুধু চোখে তাদের দেখা যায় না বলে, মনে কর না যে তারা নেই। এই যে বাতাস বয়ে চলেছে, এই যে জলের গেলাস তোমার সামনে রয়েছে, এই জানালায় ঠিক যেখানটিতে হাত দিয়ে তুমি বসে আছ, সর্ব্বত্র এই সব প্রাণীরা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি মরু-প্রদেশের সেই চির-তুহিনের মধ্যেও তাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইংরেজীতে এদের অনেক নাম, microbes, bacteria, germs ইত্যাদি। সাধারণতঃ এদের germs বলা হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর গবেষণা করে সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলেন যে, এই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর প্রাণীই আমাদের বহু ব্যাধির জন্য দায়ী। তাদের নাম তিনি দিয়েছিলেন, microbes. আসলে microbes মানে হল—অতিক্ষুদ্র জীবিত প্রাণী।

এই সমস্ত জীবাণু এত ছোট যে, শুধু-চোখে এদের দেখা যায় না। যতদিন না অনুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এদের অস্তিত্বের কোন সংবাদই মানুষ জানত না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এই সব জীবাণুর দল অদৃশ্য থেকে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে—তার জীবন-মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ তার পাশে পাশে চলে এসেছে—তবুও মানুষ এদের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারে নি। অতীত ইতিহাসে বড় বড় মড়কের কথা আমরা পড়ি। হাজারে হাজারে লোক এক এক মড়কে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ভীত হয়ে মানুষ মন্দিরে পূজো দিয়েছে, গির্জ্জেয় গির্জ্জেয় উপাসনা করেছে, রোগ-শান্তির জন্যে। ভেবেছে, তাদের কোন পাপের জন্যেই ভগবান স্বয়ং এই ব্যাধি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভগবান এই সব ব্যাধি যে পাঠিয়ে দিয়েছেন, মানুষের পাপের শাস্তিস্বরূপ কিনা, তা কেউ-ই বলতে পারে না—তবে বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে গবেষণা করে দেখলেন যে, ব্যাধি যিনিই পাঠিয়ে দিন না কেন, মানুষের দেহে ব্যাধি প্রকট হয় সেই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের আশ্রয় করে। জীবাণুরাই এই জগতে মড়ক এবং মহামারী এনেছে। আজ নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সাহায্যে মানুষ সর্ব্বদাই সতর্ক হয়ে আছে, যাতে অতর্কিতে এই অদৃশ্য শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হতে পারে।

শুধু শত্রু নয়, এত বড় ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নেই। এক একটা গ্রামকে যারা শ্মশানে পরিণত করার শক্তি রাখে, তাদের যদি আবার চোখে না দেখা যায়, তা হলে যে কি ভয়ানক অবস্থা হয়, তা আমরা মড়কের সময় বুঝতে পারি। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুদের জন্যেই সমস্ত মনুষ্য-সমাজ মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

মিত্র-জীবাণু। প্রথম বৃত্তের মাইক্রোবে ভিনিগার এবং দ্বিতীয় বৃত্তে পনীর হয়।

শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে, তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রথম জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাকে দেখতে কেমন, সে কি ভাবে থাকে, কোথায় থাকে, কি খেয়ে বাঁচে, কি ভাবে মরে, ইত্যাদি সমস্ত খবর তখনই নেওয়া সম্ভব হতে পারে, যখন তাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আনা যায়। যতদিন না অনুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের অদৃশ্য থেকে এরা পরম নিশ্চিন্ত মনে মানব-সমাজে রোগ-শোকের বীজ ছড়িয়ে চলেছিল। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে, সব জীবাণুই রোগবহ অথবা মানুষের শত্রু নয়, মানুষের পরম মিত্র স্বরূপ বহু বীজাণুও আছে, তাদের কথা পরে বলছি।

জগতে সর্ব্ব-প্রথম যে মানুষটি এই সব অদৃশ্য প্রাণীদের সাক্ষাৎ লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন, তাঁর নাম হল লিউয়েনহুক। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট্‌ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশগত ব্যবসা ছিল, ঝুড়ি, চুপড়ী ইত্যাদি তৈরী করা। বহু কৃতী পুরুষের মত তাঁরও জীবন আরম্ভ হয় অতি সামান্য আয়োজনের মধ্যে। ডেল্‌ফ্‌ট্‌ নগরের টাউন-হলের তিনি দ্বার-রক্ষী ছিলেন। সারাক্ষণই তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে হত। সময় কাটাবার জন্যে তিনি সাধারণ কাঁচ ঘসে ঘসে তাকে আতস কাঁচে অর্থাৎ যে কাঁচে ছোট জিনিস বড় দেখায়, পরিণত করবার চেষ্টা করতেন। এই ছিল তাঁর অবসর-বিনোদন। কুড়ি বছর ধরে এই ভাবে কাঁচ ঘসতে ঘসতে তাঁর মাথায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করবার কল্পনা জাগে। এবং তিনিই জগতে প্রথম কার্য্যকরী অনুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করেন। প্রথম যেদিন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি সাধারণ দৃষ্টির অগোচর সেই রহস্যময় জগতের সাক্ষাৎ-লাভ করেছিলেন, সেদিন জীবনের সেই কল্পনাতীত বিচিত্র লীলা দেখে তিনি উন্মত্তের মত হয়ে গিয়েছিলেন। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের নতুন চোখ দিয়ে যেদিকে ফিরে চান, সেই দিকেই অদৃশ্য-পূর্ব্ব নতুন জগৎ তাঁর চোখে পড়তে লাগল। কল্পনার অতীত সব জিনিস তিনি দেখতে লাগলেন। জগতে তাঁর আগে এবং সেই সময় পর্য্যন্ত আর কেউ-ই সেই অপূর্ব্ব রহস্য-লোক চোখে দেখেন নি। যে সব জিনিস চোখে দেখা যায় না, লিউয়েনহুক সেই সব জিনিস বেশ বড় বড় করে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। মশার মাথা, মাছির পাখা, মৌমাছির হুল, ফড়িংএর পা এই সব অতি ছোট ছোট জিনিস তিনি এত স্পষ্ট ও এত সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে পেলেন যে, তার যথাযথ বর্ণনা যখন লিখতে লাগলেন তখন লোকে বিস্মিত হয়ে গেল। সেই সব সামান্য কীট-পতঙ্গের অবয়বের মধ্যে সে-কি অপূর্ব্ব গঠন-কৌশল ! সঙ্গে সঙ্গে কীটপতঙ্গাদির বিষয়ে বহু অজ্ঞাত এবং ভ্রান্ত ধারণাও তিরোহিত হতে লাগল।

সমগ্র জগতে তখন মাত্র সেই একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং তার দর্শক একমাত্র লিউয়েনহুক।

মিত্র-জীবাণু। প্রথম বৃত্তের উপরের মাইক্রোব দই এবং নীচের গুলি মাথমের, দ্বিতীয় বৃত্তের জীবাণুগুলিতে সুরাসার তৈয়ারী হয়।

যন্ত্রটিকে তিনি নিজের অঙ্গের চেয়েও বেশী ভাল-বাসতেন। কিছুদিন পরে দেখলেন যে, এক একটা জিনিসকে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখতে অনেক দিন সময় লাগে। প্রত্যেক জিনিসটিই তাঁর কাছে এমন রহস্যময় লাগতে লাগল যে,

সেটাকে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে আবার সেই যায়গায় আর একটা জিনিস নিয়ে দেখতে তাঁর মন সরছিল না। সেইজন্যে তিনি আরও অনেক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন। এবং প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা জিনিস দিনের পর দিন

লুই পাস্তার।

পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এমনি চেয়ে দেখার এক অপূর্ব্ব নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। আজও অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে যখন সাধারণ দৃষ্টির অতীত সেই অদৃশ্য জগতের একটি কণাও চোখে পড়ে, বিস্ময়ে তখন আর চোখ ফেরাতে পারা যায় না। জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বন্ধুবর ডাঃ বলাই মুখোপাধ্যায়ের ল্যাবরেটরীতে বেড়াতে গিয়ে জীবনে সর্ব্ব প্রথম অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভের সৌভাগ্য ঘটে। সেদিনের বিস্ময় এবং আনন্দ জীবনে ভোলবার নয়। সে বিস্ময় বর্ণনার অতীত! এক ফোঁটা দ্রব্যের অতি সামান্য অংশে দেখি, হাজার হাজার প্রাণী, প্রত্যেকটি আলাদা, ব্যাকুল গতিতে পরস্পর পরস্পরকে পরিক্রমণ করছে, ঘুরছে, ফিরছে। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করে তারা মরতে লাগল। কয়েক ঘণ্টার পর আবার সেই অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখি, এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, হাজার হাজার সৈন্য মরে পড়ে রয়েছে, মৃতদেহের স্তূপ কাটিয়ে অতি মন্থর গতিতে তখনও একটি কি দুটি ধীরে ধীরে, অতি ধীরে চলেছে। তারপরে তাদেরও গতি থেমে গেল। চেয়ে দেখি, লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে, জীবনে সেই প্রথম দেখলাম, এক সঙ্গে এত প্রাণী আমারই দৃষ্টি-সীমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দনে নৃত্য করে চলেছে—এত বড় প্রাণীবহুল জগৎ এর পূর্ব্বে এক সঙ্গে আর কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নি। আবার কয়েক ঘণ্টা পরে জীবনে সেই প্রথম দেখলাম, এক বিরাট শ্মশান, এত মৃতদেহ ভরা শ্মশান জীবনে আর দেখি নি, দেখা সম্ভবও নয়।

আজ লিউয়েনহুকের কথা বলতে গিয়ে নিতান্ত ব্যক্তিগত এই কথাটি উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কারণ সে, বিস্ময়ের স্পন্দন জীবনে ভুলতে পারি না। চরম সৌভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ সেদিনটা স্বভাবতই চিহ্নিত হয়ে আছে।

লিউয়েনহুক তখন জগতে প্রথম একা সেই অদৃশ্য জগৎ দেখেছিলেন। অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ছিল তার দৃষ্টিশক্তি এবং তিনি যে ভাবে মানুষের অদেখা সেই সব জিনিসের বর্ণনা লিখতে আরম্ভ করলেন, তাতে সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে সচকিত হয়ে উঠল।

একদিন এক ফোঁটা বৃষ্টির জল তিনি অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখতে গিয়ে দেখেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা থেকে এই এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে এল অসংখ্য সব প্রাণী! সেই প্রথম তিনি মাইক্রোবদের দেখা পেলেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি যে সব জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন, সে-সব জিনিসের সকল সংবাদ মানুষের জানা না থাকলেও, সে জিনিসগুলির সংবাদ মানুষের অজানা ছিল না। কিন্তু এবার সহসা তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। নানা রকমের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর দেখেন, এ কি বিরাট প্রাণীময় জগৎ আমাদের পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে।

সেই সময় পণ্ডিত লোকেরা ল্যাটিন ভাষায় লিখতেন। লিউয়েনহুক ল্যাটিন ভাষা জানতেন না। তিনি তাঁর মাতৃ-ভাষাতেই ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল-সোসাইটীতে এই

আবিষ্কার সম্পর্কে চিঠি লিখতে লাগলেন। তাঁর এই সংবাদে সমস্ত বৈজ্ঞানিক মহল সচকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু না দেখা পর্য্যন্ত কেউই একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এক ফোঁটা জলে হাজার হাজার প্রাণী রীতিমত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একি হতে পারে?

রয়েল-সোসাইটী দুজন বড় বৈজ্ঞানিককে তাঁর কাছে পাঠালেন, কিন্তু তাঁর লেন্‌স তৈরী করবার কায়দা তিনি কিছুতেই তাঁদের জানালেন না। লিয়েনহুক তাঁর অনুবীক্ষণ-যন্ত্রটি কাউকে ছুঁতে পর্য্যন্ত দিতেন না। তাঁর সেই যন্ত্রাগারে কৌতুহলাবিষ্ট হয়ে পিটার দি গ্রেট, ইংলণ্ডের রাণী অদৃশ্য জগতের স্বরূপ দেখতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাউকে তাঁর যন্ত্র ব্যবহার করতে দেন নি।

লিউয়েনহুক ৯০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বৈজ্ঞানিক মহলে এই নবাবিষ্কৃত জীবাণু-জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল ধীরে ধীরে কমে এল, যদিও তখন দেশে দেশে অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকরা তখন কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এই সব অদৃশ্য প্রাণীদের সঙ্গে মানব জীবনের কোনও গূঢ় সম্পর্ক থাকতে পারে। সেইজন্য সেদিকে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে নি।

যে বছর লিউয়েনহুক মারা যান, তার দু বছর পরে ইতালীতে একজন জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি আবার দৃষ্টির অগোচর সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর নাম হল, স্পালান্‌জানি।

একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। ধর, একটা ইঁদুর মরে পড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলে যে সেই ইঁদুরের গায়ে কোথা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে পোকা-মাকড় সব জমায়েত হয়েছে। স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ এই সব পোকা-মাকড় কোথা থেকে এল?

আগে লোকের ধারণা ছিল যে, আপনা থেকেই কিংবা কোন প্রাণীর মৃত দেহ থেকে হঠাৎ প্রাণী জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই বিশ্বাসকে ইংরেজীতে বলে **spontaneous generation**, বাংলায় আমরা বলব স্বতোজনন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অজৈব পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি হতে পারে। এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে আগেকার বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যেও নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা সব প্রচলিত ছিল। এরিষ্টটলের মত পণ্ডিত লোকও লিখে গিয়েছেন যে, শুকনো কাপড় যদি অনেকক্ষণ ভিজে অবস্থায় থাকে কিংবা ভিজে কাপড় যদি শুকনো করা হয়, তাহলে সেই ব্যাপার থেকে জীবোৎপত্তি হতে পারে। আর একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক প্রচার করলেন যে, একটা কলসীতে কিছু গম রেখে তার ভেতর ময়লা ন্যাকড়া ঠেসে একুশ দিন রাখলে গমগুলো স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতীয় ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ফাদার নিড্‌হাম বলে একজন পাদ্রী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে এই স্বতোজননবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলেন। ইতালী থেকে স্পালানজানি তাঁর প্রতিবাদ করলেন এবং তিনিই এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে এই তথ্য প্রচার করলেন যে, যেখানে জীবন নেই, সেখান থেকে জীবনের উদ্ভব হতে পারে না। জীবাণুরা কি করে আপনা থেকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, সে কথাও তিনিই প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু স্বতোজনন সম্বন্ধে চরম প্রমাণ স্পালানজানিও দিয়ে যেতে পারেন নি। এক শ্রেণীর জীবাণু দৃষ্টির অন্তরালে থেকে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। লুই পাস্তুর এসে সেই নতুন ধরণের জীবাণু, যাকে তাপের প্রভাবেও বিনষ্ট করা যায় না, তার সন্ধান বার করে পরে স্বতোজননবাদের ভ্রান্তি দূর করেন।

স্পালান্‌জানির মৃত্যুর পর আবার জীবাণু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। তখন বাষ্প আর বিদ্যুৎ নিয়ে দেশে-দেশান্তরে বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্ত। বাষ্প আর বিদ্যুতের মায়া-স্পর্শে তখন জগতে যাদুর খেলা চলেছে। লুই পাস্তুর এসে জীবাণু-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন।

স্পালান্‌জানির মৃত্যুর ৩২ বছর পরে ফ্রান্সের এক সামান্য পল্লীতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। লুই পাস্তুরের জন্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতায় একটা নতুন অধ্যায়ের সংযোগ হয়ে গেল। যে অদৃশ্য শত্রু মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সীমার বাইরে থেকে এত কাল ধরে নিঃশব্দে মানুষের জীবনকে পদে পদে ব্যাহত করে এসেছে, লুই পাস্তুর সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত মানব-সভ্যতার

চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়ে যান এবং তাঁরই অসামান্য বিজ্ঞান-প্রতিভার সাধনায় জগতে জীবাণু-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি প্রথমে রসায়নবিদ্যা চর্চ্চা করতেন। এবং রাসায়নিক হিসাবেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম জীবনে জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনও কৌতূহল ছিল না।

স্ফটিকের দানা নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। হঠাৎ একটা ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি সেই অদৃশ্য প্রাণীজগতের উপর এসে পড়ল।

সেই সময় রাসায়নিক হিসাবে তিনি এতদূর কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন যে, ৩২ বছর বয়সেই তিনি লিলিনগরে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হন। বিট, গম এবং শর্করা থেকে গাঁজন ক্রিয়া দ্বারা সুরাসার তৈরী করার জন্যে এই প্রদেশ বিখ্যাত।

হঠাৎ বিশেষ কি কারণে, যাঁরা এই সুরাসার অর্থাৎ এ্যাল্‌কোহল্ তৈরী করার ব্যবসায় করতেন, তাঁরা দেখলেন, যে-পাত্রে তাঁরা সুরাসার তৈরী করছিলেন, সেই পাত্র ব্যবহার করলেই, সুরা টকে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে তাঁদের বহু টাকা অনবরত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁরা এর কারণ নির্ণয় করবার জন্যে পাস্ত্যরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। তিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন, এক রকমের অদৃশ্য প্রাণী, তারা গোপনে এক রকমের এসিড উৎপন্ন করে মানুষের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি তাদের নাম দিলেন, ল্যাক্‌টিক্ এসিড ব্যাক্‌টিরিয়া (ব্যাক্‌টিরিয়া জীবাণুদেরই আর একটি নাম।)। জীবাণুর সঙ্গে পাস্ত্যরের সেই হল প্রথম পরিচয়।

এই ব্যাক্‌টিরিয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাস্ত্যরের ধারণা হল যে, নিশ্চয়ই আরও এই ধরণের বিভিন্ন রকমের জীবাণু আছে, যারা ঠিক এমনি দৃষ্টির অগোচর থেকে মানুষের ভয়াবহ সব ক্ষতি করছে। কে জানে তাদের কি চরিত্র, কে জানেই বা তাদের কি শক্তি!

তিনি ছিলেন রাসায়নিক। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁকে নতুন করে পড়াশোনা আরম্ভ করতে হল। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে যে-নিষ্ঠা, যে-একাগ্রতা, যে-পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তা সত্যই অনন্য-সাধারণ। শুধু যুগান্তকারী আবিষ্কারক বলে নয়, জগতে আদর্শ-চরিত্র হিসাবেও পাস্ত্যরের নাম চিরকাল জগৎ-বরেণ্য হয়ে থাকবে। লোককে আমরা রহস্য করি, কিন্তু পাস্ত্যর সত্যিই তাঁর নিজের বিয়ের দিন ভুলে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত বন্ধুরা গির্জ্জেয় এসে দেখেন, পাস্ত্যরের খোঁজ নেই। চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল যে,তিনি তখন তাঁর ল্যাবরেটরীতে এক মনে গবেষণা করছেন।

স্পালানজানির অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করলেন যে, আপনা থেকে, শূন্য হতে জীবাণু জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এক রকম জীবাণু আছে, যাদের তাপের প্রভাবে বিনষ্ট করা যায় না। এই জীবাণুগুলি আগেকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিদ্যমান থেকে, স্বতোজননবাদের সম্বন্ধে বিতর্ককে ঘোরাল করে তুলেছিল। তিনি দেখালেন যে, জল, বাতাস, ধূলো, ময়লা এই সব জিনিষকে আশ্রয় করে, নিত্য এই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুর দল এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে যাতায়াত করছে, এক মানুষের দেহ থেকে আর এক মানুষের দেহে যাচ্ছে। সেই দিন থেকে চিকিৎসা-জগতে এক নব-যুগের সূচনা হল। এবং তার আদি-প্রবর্ত্তক হলেন লুই পাস্ত্যর।

সেই সময় অস্ত্র-চিকিৎসার নামে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। হাসপাতালে লোকে আসতে চাইত না। তার কারণ, অস্ত্র-চিকিৎসার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে উঠত এবং তার ফলে হতভাগ্য রোগীকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে মরতে হত। ধোয়াবার জলে, হাতের আঙুলে, বাতাসে, যে-ছুরি ব্যবহার করা হচ্ছে তারই ডগায় যে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে, তারা গিয়ে সেই ক্ষতস্থানকে দূষিত করে দিচ্ছে—এ ব্যাপার মানুষ পাস্ত্যরের আবিষ্কারের আগে ভাবতেই পারে নি।

পাস্ত্যর যখন ফ্রান্সে জীবাণু সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা করছিলেন, সেই সময় ইংলণ্ডে লিষ্টার নামে একজন ডাক্তার রোগীদের সেই অসহ্য যন্ত্রণা দিনের পর দিন দেখে ব্যাকুলভাবে তার প্রতিকারের পথ খুঁজছিলেন। পাস্ত্যরের আবিষ্কার তাঁর অন্ধকার পথে সহসা আলো জেলে দিল। লিষ্টার স্থির করলেন, এই সব জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে যদি

ক্ষতস্থানটি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে আর ক্ষত দূষিত হতে পারে না। এবং এই ভাবে লিষ্টার অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যাপারে যুগান্তর নিয়ে এলেন। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় ডাক্তাররা কি রকম সতর্কতার সঙ্গে যে-সব জিনিষ ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে আসবে, তাদের শোধন করে নেন। এই শোধন করার মানেই, সেই সব জিনিষে যদি কোন জীবাণু থাকে, তা নষ্ট করে ফেলা। একজন বড় ইতিহাস-কার লিখেছেন যে, জগতে মানুষ যুদ্ধ করে যত লোককে মেরে ফেলেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে পাস্তুর আর লিষ্টার বাঁচিয়েছেন।

জীবাণুদের নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির মূলে রয়েছে এই সব জীবাণু। তিনি ডাক্তারী জানতেন না। নিজের দুজন ছাত্রের কাছে তিনি তা শিখতে আরম্ভ করলেন। সেই সময় ফ্রান্সে এবং জার্ম্মানীতে গৃহপালিত পশু এবং বিশেষ করে ভেড়ার পালে ভয়াবহ মড়ক দেখা দিল। এনথ্রাক্স নামে পশু-রোগে দলে দলে পশু মারা যেতে লাগল। বহু ডাক্তার বহু ভাবে এই রোগ নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেন না। পাস্তুর এই সম্পর্কে বহু গবেষণা করে চিকিৎসা-জগতে আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। বীজাণুরা দেহে প্রবেশ করে রক্তে এক রকম বিষ সঞ্জাত করে। এই বিষই হল আবার সেই রোগের ওষুধ। রুগ্ন দেহ থেকে এই বিষ সংগ্রহ করে যদি প্রতিষেধক টীকা দেওয়া যায়, তাহলে এই রোগের আক্রমণ থেকে পশুরা বাঁচতে পারে। অবশ্য তাঁর বহু পূর্ব্বে জেনার এই সূত্র অনুসারেই মানুষের দেহের জন্যে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই চিকিৎসা-প্রণালীর ফলে জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সের পশু-ব্যবসায়ীরা রক্ষা পেলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বছরে ৩৪০০০০০ ভেড়াকে এবং ৪৩৮০০০ গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ফলে, মৃত্যুহার যথাক্রমে শতকরা ১টি এবং অন্যান্য পশুর পক্ষে হাজারে ৩টীতে এসে দাঁড়ায়।

তারপর তিনি আর একটি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ক্ষিপ্ত পশুর দংশনে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসারও তিনি প্রবর্ত্তক। আজ দেশে দেশে পাস্তুর-চিকিৎসাশালা স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতি বছরে হাজার হাজার রোগী তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে এই ভয়াবহ রোগের কবল থেকে মুক্তি লাভ করছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করে প্রথম যে বালকটির তিনি চিকিৎসা করেন, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে কুকুরদষ্ট বালকটির একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি ফ্রান্সে নির্ম্মিত হয়েছে।

পাস্তুরের প্রথম রোগী, কুকুর-দষ্ট বালকটির প্রতিমূর্ত্তি।

পাস্তুরের সময় থেকেই জীবাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যেতে লাগল। এক দিন সমুদ্র-পথে দেশ-দেশান্তর থেকে দুঃসাহসী নাবিকরা যেমন দলের পর দল বেরিয়েছিলেন, সমুদ্র তরঙ্গের পরপারে অজানা সব দেশ আবিষ্কারের জন্য, তেমনি পাস্তুরের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশে দেশান্তরে বৈজ্ঞানিকরা এক বিরাট অনির্দ্দেশ্য অভিযানে দলের পর দল চলেছেন, সেই অদৃশ্য প্রাণীজগতের রহস্য ভেদ করার জন্যে।

জীবাণু-তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে পাস্তুরের পরেই বিখ্যাত জার্ম্মান ডাক্তার কখ্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই

এই তথ্য প্রচার করেন যে, বিভিন্ন ব্যাধির জন্য বিভিন্ন জীবাণু আছে। জীবাণুদের জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ও গবেষণা উক্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কলেরা এবং টিউবারকুলোসিস, এই দুই কালব্যাধির উৎপত্তি এবং প্রসারের কারণ মানুষের অজানা ছিল। কথ্-ই বহু গবেষণার পর দেখালেন যে, এই দুই ব্যাধির দুই বিভিন্ন জীবাণু আছে। এই জীবাণুরাই এই ব্যাধির প্রসারের কারণ। এই আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ এই দুই কাল-মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির প্রধানতম হেতু, তেমনি বহু জীবাণু আছে যারা মানুষের, মানুষের পৃথিবীর পরম বন্ধু। আমরা নিত্য যে সব দূষিত পচা মরা জিনিষ ফেলে দিই, এই সব জীবাণুরাই তাদের রূপান্তরিত করে পৃথিবীর অতি প্রয়োজনীয় সারে পরিণত করে চলেছে। সেই জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুদের আর একটি নাম দিয়েছেন scavengers of the world, পৃথিবীর যত ময়লা তারাই প্রতিমুহূর্তে পরিষ্কার করছে। দুধ থেকে যে মাখম তৈরী হয়, ঈস্ট থেকে যে সুবাসার তৈরী হয়, তার মূলে এই জীবাণু।

রবার্ট কথ্।

জীবাণুরা যে পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করতে পারে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উপযুক্ত খাদ্য পেলে একটি জীবাণু বারো ঘণ্টার মধ্যে এক কোটী আশী লক্ষ জীবাণুতে পরিণত হতে পারে। যে সমস্ত জীবাণু রোগবহ তাদের একটি কি দুটি আমাদের দেহে একবার প্রবেশ লাভ করতে পারলে দেহের মধ্যে অতি অল্প সময়ের ভিতর তারা লাখে লাখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যাদের চোখে দেখা যায়, তাদেরই মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করা দুরূহ। যাদের চোখে দেখা যায় না, তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করবার উপায় সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তাই সাধারণ মানুষকে যতদূর সম্ভব জীবাণুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকতে হয়।

ব্যাধির চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে। প্লেগের নাম শুনলে আজও হেন লোক নেই যে, ভীত হয়ে ওঠে না। লাখে লাখে লোক এই রোগের আক্রমণে মরেছে কিন্তু এই রোগের মূল কোথায় তা মানুষের জানা ছিল না। ইয়ারসিন এবং কিতাসাতু নামে দুজন জাপানী ডাক্তার এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই ভাবে জীবাণুদের চরিত্র অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ বহু কালব্যাধির হাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পেয়েছে। এবং সে অনুসন্ধান আজও পর্য্যন্ত চলছে।

আগে বলেছি যে, সব জীবাণুই রোগবহ নয়। সব জীবাণুই মানুষের শত্রু নয়। যেমন এক শ্রেণীর জীবাণু

এফেল টাওয়ার

ফ্রান্সের এফেল টাওয়ারের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। গুস্তাব এফেল বলে একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার এই সু-উচ্চ লৌহ-ভবনটি তৈরী করেন। সেই জন্য এর নাম হয়েছে এফেল টাওয়ার।

এই লৌহ-ভবনটি তৈরী করে গুস্তাব এফেল জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার রূপে পরিগণিত হয়েছেন। এফেল

টাওয়ারের গড়নের বাহাদুরী এবং কায়দা দেখে জগতের বড় বড় ইঞ্জিনীয়াররা আজও পর্য্যন্ত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে কৃতার্থ হন।

এফেল টাওয়ারের সর্ব্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরে একখানি খাতা আছে। জগতের যত বড় বড় লোক এই টাওয়ার দেখতে আসেন, তাঁরা সেই খাতায় ইচ্ছে করলে কিছু লিখে যেতে পারেন। একবার জগৎ-খ্যাত এডিসন এফেল টাওয়ার দেখতে এসেছিলেন। চলে যাওয়ার সময় তিনি সেই খাতায় গুস্তাব এফেলকে স্মরণ করে গুটিকতক কথা লিখে রেখে আসেন। তিনি লিখে রেখে এসেছিলেন,

To the Engineer Eiffel, the courageous builder of this gigantic and original specimen of modern construction, from one who has the highest respect and admiration for all engineers, including the greatest one, le Bon Dieu."

"যিনি এই বিরাট এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের লৌহ-ভবনটি তৈরী করেছিলেন, সেই এঞ্জিনীয়ার এফেলকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। জগতের শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারকে আমি অন্তরের আনন্দ-সম্মত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, সেই সঙ্গে সেই এঞ্জিনীয়ারকেও ভুলি না—যিনি এই বিরাট বিশ্বভুবন গড়ে তুলেছেন।"

বিশ বছর বয়সে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে গুস্তাব তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে ভিনিগার তৈরী করার ব্যবসায়ে যোগদান করলেন। হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে খুড়ো-ভাইপোতে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ভিনিগার তৈরী
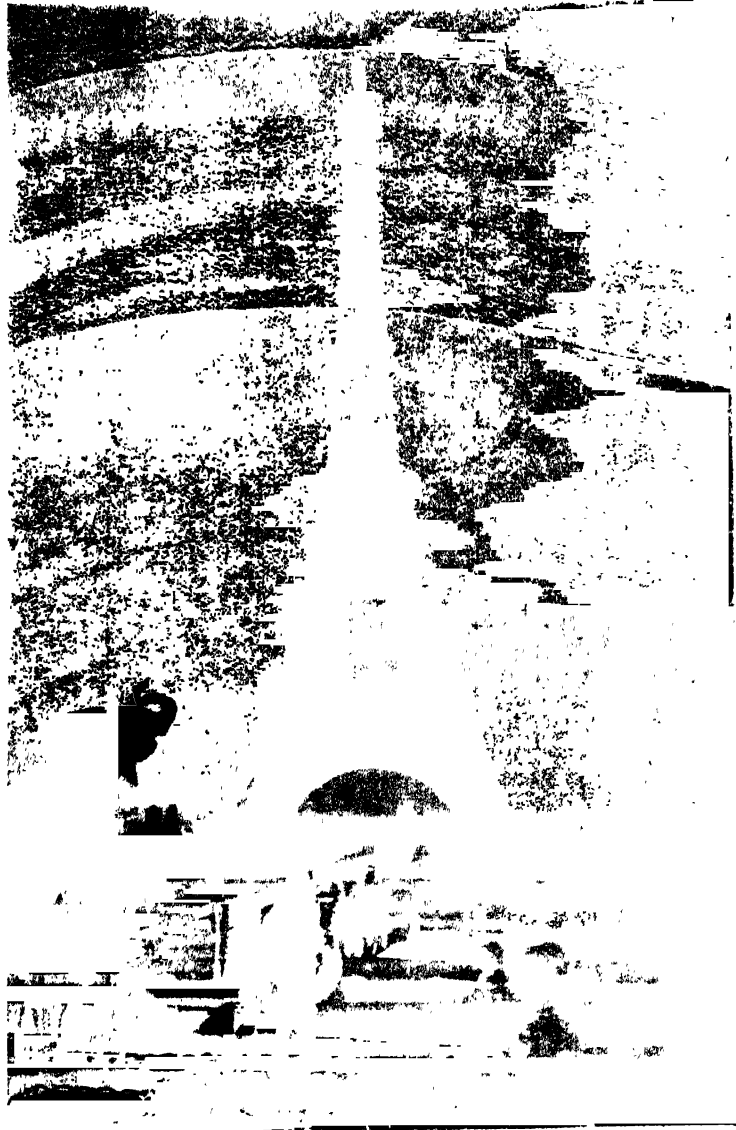
এফেল টাওয়ার।

করার কাজ ছেড়ে দিয়ে গুস্তাব এঞ্জিনীয়ারিং কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কাজও জুটে গেল। দু'তিনটে বড় বড় এঞ্জিনীয়ারিং

ফার্মে তিনি রীতিমত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেন। একটা বড় পোল তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরী হল। ভাল কবিতা সৃষ্টি করে কবি যে আনন্দ পায়, শিল্পী একটি মূর্ত্তি সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলে যে আনন্দ পায়, গুস্তাব সেই আনন্দ অন্তরে অনুভব করলেন। নতুন নতুন ধরণের পোল তৈরী করবার দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

সেই সময় লোহার ব্যবহার সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। গুস্তাব স্থির করলেন, লোহা দিয়ে নতুন ধরণের পোল তৈরী করতে হবে। সেই জন্যে তিনি লোহা সম্পর্কে কারখানায় নানা রকমের গবেষণা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে লোহার কাজে ফ্রান্সে তিনি সব চেয়ে দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে উঠলেন। যেখানে পোল তৈরী করবার দরকার হয়, সেইখান থেকেই গুস্তাবের ডাক আসতে লাগল। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে এফেলের নাম সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস সহরে এক বিরাট মেলা বসে। জগতের প্রত্যেক দেশ থেকে বিখ্যাত ব্যবসায়ীরা এই মেলায় যোগদান করেন। সেই সময়কার জগতের সমস্ত বিখ্যাত লোক, রাজা-রাজড়া সকলে এই মেলার উৎসবে যোগদান করেন।

এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একজিবিশনের প্রবেশ-দ্বার তৈরী করবার জন্যে প্রত্যেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে নক্সা চেয়ে পাঠান হল। এফেল জানালেন যে, এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তিনি লোহা দিয়ে হাজার ফুট উঁচু একটা বিরাট টাওয়ার তৈরী করে দেবেন। বর্ত্তমান জগতের সে হবে এক বিস্ময়।

কিন্তু তাঁর এই বাসনার কথা শুনে, সমস্ত প্যারী শহর একযোগে সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে উঠল। শহরের তিনশ বড় বড় শিল্পী সকলে সমবেত হয়ে এক প্রতিবাদ-পত্র স্বাক্ষর করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠালেন। সেই প্রতিবাদ-পত্রে তাঁরা লিখলেন,—

"আমরা কি একটা লোহার মনুমেণ্ট তৈরী করে এই সুন্দরী নগরীর বুকে চিরকালের মত একটা কুৎসিত দাগ রেখে যেতে চাই? একজন লোহা-লক্কড়-ওয়ালার ব্যবসাদারী বুদ্ধির পাল্লায় পড়ে আমরা কি ফরাসী জাতির সৌন্দর্য্যবোধকে অপমানিত করতে চাই?"

একজিবিসনের গেট তৈরী করার ভার এফেলকে দেওয়া হল না বটে, কিন্তু সাজ্ঞ মারতে এফেল তাঁর বাসনা অনুযায়ী টাওয়ার তৈরী করবার অনুমতি পেলেন এবং সেইখানে বিখ্যাত এফেল টাওয়ার গড়ে উঠল।

যখন গুস্তাব এই টাওয়ার তৈরী করছিলেন, তখন ফ্রান্সের খবরের কাগজওয়ালারা, সাহিত্যিকরা এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর নামে নানা রকমের ছড়া বার করে, তাঁকে উদ্বাস্ত করে তুলেছিল। সকলেই বলতে লাগল, এত বড় একটা লোহার টাওয়ার তৈরী করে কি হবে?

টাওয়ার তৈরী শেষ হয়ে গেল, এফেল তার সর্ব্বোচ্চ তলায় একটা ঘর তৈরী করে, বিজ্ঞানের গবেষণায় বসলেন। আকাশ-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার পক্ষে এই ল্যাবরেটরীর অবস্থান থেকে নানা রকমের সুবিধা তিনি পেলেন, যে সব সুবিধা নীচের সাধারণ ল্যাবরেটরী ঘরে কখনই পাওয়া যেত না। এই ল্যাবরেটরী থেকে তিনি বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া সম্পর্কে নানা রকমের গবেষণা করতে লাগলেন। এবং আজ এফেল টাওয়ারের এই ল্যাবরেটরীর দরুণ ফ্রান্স বেতার-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

পুরাকালে লোকে টাওয়ার তৈরী করত যুদ্ধের জন্যে, তারও পরের যুগে মানুষ টাওয়ার তৈরী করেছে, শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্যে, বর্ত্তমান কালে এফেল এই টাওয়ার তৈরী করে গিয়েছেন, বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

অধ্যবসায়ী বীর পুরুষ

শেরখাঁ একজন অধ্যবসায়ী বীর পুরুষ। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের অধ্যবসায়বলে ক্রমে ক্রমে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়া দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। শেরখাঁর নাম ফরীদ, তিনি একদা এক প্রকাণ্ড বাঘ মারিয়া শেরখাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ফারসী ভাষায় বাঘকে শের বলে। ফরীদের পূর্ব্বপুরুষেরা আফগানিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা সুরবংশীয়। ফরীদের পিতামহ ইব্রাহিম খাঁ সুর প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। ফরীদের পিতা হসন খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জামাল খাঁর নিকট হইতে বিহারের সাসেরাম প্রভৃতি তিনটি পরগণা জায়গীর পাইয়াছিলেন। সৈন্যদিগের ভরণপোষণের জন্য জায়গীর দেওয়া হইত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জায়গীর-প্রদাতাকে সাহায্য করিবার জন্য জায়গীরদারকে ঐ সকল সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইতে হইত। হসন খাঁ ফরীদের বিমাতার জন্য তাঁহাকে সেরূপ ভালবাসিতেন না। ফরীদ পিতার নিকট হইতে উপযুক্তরূপ সাহায্যও পাইতেন না। সেই জন্য তিনি পিতার নিকট হইতে জৌনপুরে জমাল খাঁর নিকট চলিয়া যান। হসন তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে ফরীদকে দুইটি পরগণার শাসনভার প্রদান করেন। ফরীদ সুশাসন দ্বারা পরগণা দুইটির রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হসন আবার ফরীদের বিমাতার অনুরোধে তাঁহার হস্ত হইতে পরগণা দুইটি ফিরাইয়া লন। ফরীদ আবার গৃহত্যাগ করিয়া কানপুরে গমন করেন। তথা হইতে কোন কোন আত্মীয়ের সহিত আগরার বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর দরবারে উপস্থিত হন। সে সময়ে আগরা দিল্লীর বাদশাহদিগের রাজধানী ছিল। এই সময়ে হসন খাঁর মৃত্যু হওয়ায় ফরীদ বাদশাহ-দরবার হইতে পিতার প্রাপ্ত জায়গীরলাভের আদেশপত্র লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ইহার পরেই ভারতবর্ষের সিংহাসন লইয়া পানিপথ-ক্ষেত্রে মোগল-পাঠানে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে মোগলেরা জয়লাভ করে ও ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। পাঠানেরা আফগানিস্থানের আর মোগলেরা মোঙ্গলিয়া প্রদেশের অধিবাসী। মোগলবীর বাবর শাহ আফগানিস্থানের কাবুল প্রভৃতি অধিকার করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং পানিপথ-ক্ষেত্রে পাঠান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যুর পর ফরীদ বিহারের শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। এই সময়েই তিনি শিকারে একাকী একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বধ করিয়া শেরখাঁ উপাধি লাভ করেন। শেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের অনুরোধে তাঁহাদের আত্মীয় মহম্মদ খাঁ সুর শেরখাঁর জায়গীর অধিকার করিয়া লন। শেরখাঁ কড়ামাণিকপুরের শাসনকর্ত্তার সাহায্যে নিজ জায়গীর পুনরাধিকার করিয়া, মহম্মদ খাঁ সুরের জায়গীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। পরে তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দেন।

শেরখাঁ আবার আগরায় গমন করিয়া মোগল বাদশাহ বাবর শাহের দরবারে উপস্থিত হন এবং মোগলদিগের রীতি-নীতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসেন। সাসেরামে ফিরিয়া আসিয়া শেরখাঁ আবার সুলতান মহম্মদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতানের অল্পবয়স্ক পুত্র জলালখাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। জলালখাঁর আত্মীয়-গণ কিন্তু শেরখাঁর বিরোধী হইয়া উঠেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে জলালখাঁ গৌড়রাজ্য আক্রমণের ছলে বিহার পরিত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বর সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহের নিকট গমন করেন। তখন শেরখাঁ বিনা যুদ্ধেই বিহার প্রদেশের অধীশ্বর হন। তাহার পর গৌড়েশ্বর মামুদ শাহ অনেক সৈন্যসামন্তসহ সেনাপতি ইব্রাহিমখাঁকে শেরখাঁর বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। শেরখাঁর সহিত যুদ্ধে ইব্রাহিমখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। শেরখাঁ গৌড় রাজ্যের কতক অংশ অধিকার করিয়াও লন। তাঁহার আদেশে তাঁহার পুত্র জলালখাঁ অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যসহ গৌড় অধিকার করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলে

মামুদ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া গৌড় নগরের প্রাচীর ও পরিখার মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইয়া দেন।

হুমায়ুন বাবর শাহের পুত্র। বাবরের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিলেন। শেরখাঁ কাশীর নিকট চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া লন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহা অধিকার করেন। ওদিকে শেরখাঁ রোহতাশ নামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ রাজা হরেকৃষ্ণ বীরকেশরীর নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন। শেরখাঁর সেনাপতিগণ গৌড় নগরও অধিকার করেন। গৌড়ের সুলতান মামুদশাহ দক্ষিণ বঙ্গে পলাইয়া যান। তাঁহার পুত্রগণকে শেরখাঁর পুত্র জলালখাঁ বন্দী করেন। শেরখাঁ মামুদ শাহের পিছনে পিছনে গমন করিলে, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে মামুদ-শাহ পরাজিত ও আহত হন। হুমায়ুন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলে শেরখাঁ রোহতাশ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামুদ-শাহ পথিমধ্যে হুমায়ুনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে শেরখাঁর পুত্র জলালখাঁর আদেশে মামুদ শাহের দুই পুত্র নিহত হইলে, মামুদ শাহ তাহা শুনিয়া শোকে ও দুঃখে পথি-মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। হুমায়ুন তখন গৌড়ে উপস্থিত হন। তাহার পূর্ব্বে শেরখাঁ গৌড় নগর হইতে লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তি রোহতাশ দুর্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হুমায়ুন গৌড় অধিকার করিয়া তাহার 'জন্নতাবাদ' নাম দিয়াছিলেন। তাহার পর তথায় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাইয়া হুমায়ুন আগরার দিকে অগ্রসর হইলে শেরখাঁ রোহতাশ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া হুমায়ুনকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেরখাঁ একদিন রাত্রি শেষে সহসা মোগলশিবির আক্রমণ করিয়া বসিলে, মোগলেরা পরাজিত হয়। হুমায়ুন প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহার বেগম ও অন্যান্য রমণীগণ বন্দী হইয়া রোহতাশ দুর্গে যাইতে বাধ্য হন। শেরখাঁ অবশেষে কিন্তু তাঁহাদিগকে সসম্মানে হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এদিকে গৌড়ের মোগল শাসনকর্ত্তা শেরখাঁর সেনাপতি-গণের নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। শেরখাঁ গৌড় অধিকার করিয়া ফরীদউদ্দীন শেরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার পর তিনি বাদশাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুমায়ুন আগরা হইতে অগ্রসর হইয়া কনোজের নিকট উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া আগরায় পলায়ন করেন। শেরশাহ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আগরায় গমন করিলেন। হুমায়ুন আগরা হইতে লাহোরে, পরে তথা হইতে পলায়ন করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি অনেক দেশ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে কালঞ্জর নামক দুর্গ জয় করিতে গিয়া সহসা বোমার আগুনে দগ্ধ হইয়া শেরশাহ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া সাসেরামে সমাহিত করা হয়। তথায় তাঁহার সমাধি আজিও রহিয়াছে। শেরশাহের পর তাঁহার পুত্র জলালখাঁ ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইসলাম শাহের পর সুরবংশীয়েরা আর অধিক দিন রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এদিকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তারাও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

দেড় হাজার ক্রোশ পথ

শেরশাহ যে কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর স্থির করিয়া তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার পর আকবর বাদশাহের সময় সে বন্দোবস্ত সম্পূর্ণভাবেই হইয়াছিল। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। শেরশাহ বাঙ্গলা দেশকে অনেকভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য এক একজন আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের উপর একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। শেরশাহ অনেক মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোরাণপাঠের সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত কীর্ত্তি, সুবর্ণগ্রাম হইতে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার ক্রোশ দীর্ঘ এক রাজপথ। এই রাজপথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপিত হইয়া পথিকগণকে ফল ও ছায়া দান করিত। এক এক ক্রোশ অন্তর হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এক একটি সরাই ও কূপের

বন্দোবস্ত করিয়া পথিকগণের বিশ্রামের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রতি সরাইয়ে সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য দুইজন অশ্বারোহী ও কয়েকজন পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে অশ্বারোহী দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল না। এই অশ্বারোহী দ্বারা সংবাদ লইয়া যাওয়াকে 'ঘোড়ার ডাক' বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেরশাহের সময় দেশে দস্যুতস্করের ভয় নিবারিত হইয়াছিল। শেরশাহ এরূপ ন্যায়পর ছিলেন যে, নিজের পুত্র অপরাধ করিলে তাহাকেও সামান্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ড দিতেন।

কোচবিহার রাজ্য

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, হোসেন শাহ আসামের কামতাপুর রাজ্য জয় করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার কতক অংশ তাঁহার অধিকারে আসে। এই কামতাপুর রাজ্যের পতনের পর উত্তর-বঙ্গে একটি হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কোচ জাতীয় বিশ্বসিংহ বা বিশু সিংহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কোচবিহার রাজ্য। এই কোচবিহার রাজ্য এখনও পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে স্বাধীনভাবে শাসিত হইয়া থাকে। বিশ্বসিংহের পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণের সময় তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বহুদূর পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কামরূপ, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি জয় করিয়া এই সকল প্রদেশের রাজাদিগকেও বশে আনিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া জয়ন্তিয়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন।

সোলেমান খাঁ কররাণীর শাসনকালে নরনারায়ণ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় শুক্লধ্বজকে পরাজিত করিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। সোলেমান খাঁ কোচ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদখাঁর বিরুদ্ধে নরনারায়ণ দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, দায়ুদখাঁর পরাজয়ের পর তাঁহার রাজ্য আকবর ও নরনারায়ণ উভয়ে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় শুক্লধ্বজ পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র রঘুদেব তাহার পর কোচ সৈন্যের নায়ক হইয়াছিলেন।

নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের সময় কোচবিহার রাজ্য অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহার অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তী ও রণতরী ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বাঙ্গালার মোগল সুবেদার রাজা মানসিংহের সাহায্যে তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ কোচবিহারের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

কালাপাহাড়

সোলেমান খাঁ কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই কালাপাহাড়ের কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি। প্রথমে সোলেমান কররাণীর কথাই বলিতেছি। শেরশাহ ও তাঁহার বংশধরেরা দিল্লীর বাদশাহ হইলে গৌড়ে তাঁহাদের অধীনে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ সুর স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময়ে সোলেমান খাঁ কররাণী বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিও স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহম্মদ খাঁ সুরের পুত্রপৌত্রের রাজত্বের অবসান হইলে সোলেমান খাঁ কররাণী গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। কালাপাহাড় তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই কালাপাহাড়ের নাম রাজু। শুনা যায়, তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে একটি মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হন। কিন্তু তিনি আফগান জাতীয় ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কালাপাহাড় অত্যন্ত হিন্দু-দেবতাদ্বেষী ছিলেন। বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের অনেক মন্দির ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। অনেকস্থলে অঙ্গহীন হিন্দু দেবদেবী কালাপাহাড়ের ভাঙ্গা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কালাপাহাড়ের নাম বাঙ্গালার হিন্দুদিগের নিকট আজও ভীতিজনক হইয়া আছে।

কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিয়া সোলেমান কররাণীর অধীনে আনিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া লন। তাহার পরে সোলেমান খাঁ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা অধিকার করিতে পাঠাইয়া দেন। মুকুন্দদেব একজন বিদ্রোহী সামন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে কালাপাহাড় বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাহারা যুদ্ধে নিহতও হয়। কালাপাহাড় তখন উড়িষ্যা অধিকার করেন। তিনি এই সময়ে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদখাঁর সময়ে কালাপাহাড় মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সোলেমানের সময় হইতে উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যের অবসান হয় এবং তাহা মুসলমানদিগের অধিকারে আসে।

মোগল বিজয়

সোলেমান কররাণী মোগল-বাদশাহ আকবরশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দায়ুদ-খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে আফগান সর্দ্দারেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া সোলেমানের কনিষ্ঠপুত্র দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করেন। সে সময়ে টাঁড়ানগরী বাঙ্গলার রাজধানী হইয়াছিল। সোলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। সিংহাসনে বসিয়া দায়ুদখাঁ আপনার সহস্র সহস্র অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য, অসংখ্য কামান হস্তী এবং পরিপূর্ণ রাজ-কোষ দেখিয়া স্বাধীন হইবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি আপনাকে বাঙ্গলার স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া মোগল-বাদশাহ আকবরশাহের রাজ্যমধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে লাগিলেন। তখন মোগল সেনাপতি মুনিমখাঁ তাহার বিরুদ্ধে আসিলেন। দায়ুদের সেনাপতি লোদীখাঁ মুনিম-খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে আকবর বা দায়ুদ কেহই সন্তুষ্ট হন নাই। এই সময়ে কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় ভ্রান্ত হইয়া দায়ুদ লোদীখাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তাহার পর আবার তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুনিমখাঁ ও রাজা তোড়ড়মল্ল দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, দায়ুদ রাজধানী টাঁড়ায় গিয়া আশ্রয় লন। মোগল সৈন্য টাঁড়ার দিকে অগ্রসর হইল দায়ুদ আপনার ধনসম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া যান। প্রথমে রাজা তোড়ড়মল্ল, পরে মুনিমখাঁও তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের নিকটস্থ মোগলমারী নামক স্থানে যুদ্ধে দায়ুদকে পরাস্ত করেন। দায়ুদ আবার সন্ধি করিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া লন। তাঁহাকে কেবল উড়িষ্যা প্রদেশ মাত্র ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুনিমখাঁ ফিরিয়া আসিয়া টাঁড়া হইতে আবার গৌড়ে রাজধানী লইয়া আসেন। কিন্তু সেই সময়ে, গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহাতেই মুনিমখাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। দায়ুদ আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং রাজধানী টাঁড়া অধিকার করিয়া লন। তিনি বিহার প্রদেশ পর্য্যন্তও ধাবিত হইয়াছিলেন। আকবরশাহ তখন সেনাপতি খাঁজাহানকে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। খাঁজাহান ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজমহলে উপস্থিত হন। তথায় দায়ুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও ধৃত হন। অবশেষে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ড বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দায়ুদের সহিত বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বেরও অবসান ঘটে।

গৌড়ে মহামারী

তোমরা শুনিয়াছ যে, দায়ুদখাঁর সহিত যুদ্ধের সময় মোগল সেনাপতি মুনিমখাঁ গৌড়ের মহামারীতে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা এক্ষণে সেই ভীষণ মহামারীর কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সোলেমান কররাণী বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। গৌড় একটি প্রাচীন নগর, অনেক দিন হইতে ইহার স্বাস্থ্য খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেইজন্য সোলেমান সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। মুনিমখাঁ কিন্তু গৌড়ের অবস্থান ও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ সকল দেখিয়া আবার গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিতে অভিপ্রায় করেন। তিনি সৈন্যসামন্ত ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে টাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ দেন।

সে সময়ে বর্ষাকাল। চারিদিক জলে ভাসিতেছিল। গৌড় অনেক দিন হইতে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাতে জল জমিয়া ভূমি অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠিল। পানীয় জল কাদায় ভরিয়া গেল। বাতাস শীতল হইয়া বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নানারূপ পীড়া আসিয়া দেখা দিল। তখন সেখানে এক মহামারী উপস্থিত হইল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মরিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে দাহ করা বা কবর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাতে জল দূষিত হওয়ায় মড়ক দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। অনেক আমীর-ওমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অবশেষে সেনাপতি মুনিমখাঁও তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। এবং তাঁহাকেও চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল। সেই মহামারীর পর হইতে গৌড় নগর একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। এখন তাহা ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গল পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রাচীন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

বাঙ্গালার স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক উদ্যোগ

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের পরিচয়।

গৌরমোহনের বংশ-পরিচয় দিতে পারিলাম না। স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে (১৮১৭-১৮) দেখিতে পাই—

Gour mohon Pundit for his services. Rs. 60-0-

দ্বিতীয় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে (১৮১৮-১৯)

Gour mohon Pundit 5 months salary as Corrector of the Press to 1st Aug 1819—100—0—0

তৃতীয় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে (১৮১৯-২০)

Gour mohon Pundit, corrector of press at Rs 20/- 240—0—0

গৌরমোহন কোন সালে স্কুল বুক সোসাইটির কার্য্যে প্রবিষ্ট হন তাহা ঠিক বলা যায় না; সম্ভবত ১৮১৮ সালেই ছাপাখানার প্রুফ-রীডার রূপে কার্য্যারম্ভ করেন বলিয়াই মনে হয়।

উক্ত সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৮-১৯) আছে—

"The Society's Pundit was instructed to visit every Bengali school within the Marhatta Ditch & to furnish a list of masters, with a statement of their residence caste, number of scholars, whether gratuitous or otherwise."

১৮১৯ সালের ১৩ই মার্চ্চ তারিখের "সমাচার দর্পণে" আছে, "কলিকাতা সহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে।"

২

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের রচিত পুস্তকাবলির পরিচয় প্রধানতঃ আমার "Card Index of Printed Bengali Books" হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

(ক) স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার কৃত, রাধাকান্ত দেবের সহায়তায়।

প্রথম সংস্করণ—২৪ পৃষ্ঠা, ৮ পেজী সাইজ, ১৮২২ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত, ১০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য ছয় আনা। (B. M*)

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮২৩ সালে প্রকাশিত, ৫০০ কপি ছাপা হয়।

তৃতীয় সংস্করণ—একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। নামকরণে আছে—"স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, অর্থাৎ পুরাতন ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন।" গ্রন্থকারের নাম নাই, ৪৫ পৃঃ ৮ পেজী, কলিকাতা। ১৮২৪ মূল্য পাঁচ আনা (I L) (I. O) (B. M.) এই সংস্করণের নামান্তর—Defence of native female education.

চতুর্থ সংস্করণ—১৮৫২ সালে ছাপা হয় ৪৫ পৃঃ ১২ পেজী মূল্য দুই আনা, নামান্তর Female education advocated. (I. O.).

পঞ্চম সংস্করণ—৪৭ পৃঃ, ১২ পেজী, কলিকাতা, ১৮৫৭ (I. O.) (B. M.)

স্কুল বুক সোসাইটীর ৬ষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) এই মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ আছে—

"Gour mohon's treatise on female education has been reprinted, the 2nd. ed. of 500 copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size & has improved it by simplifying the language & by suiting it, to the capacity of those for whose use it is intended.

এই পুস্তক ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাগরী ভাষায় ছাপা হয়, ৪০০ কপি।

"About this time (1820) Raja Radhacant offered the Society (Calcutta Juvenile Society for the support of Female Bengali Schools) the manuscript of a pamphlet in Bengali the *Stri Siksha Vidhayak* on the subject of female education object of which was to show that female education was customary among the higher classes of the Hindus, that the names of many Hindu female celebrated for their attainments were known, and that female education 'if encouraged will be productive of the most beneficial effects.' The committee of the Calcutta Juvenile Society received the manuscript & determined on printing it"—(A Biographical Sketch of David Hare by Peary chand Mittra—[(1877) page 55]

উক্ত কথাগুলি প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ Calcutta Juvenile Societyর চেষ্টায় ছাপা হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক ছাপা হয়। দ্বিতীয়তঃ ২০৲ টাকা বেতনভোগী গৌরমোহনের এই প্রথম পুস্তকখানি ছাপার বিষয়ে অর্থবান রাধাকান্ত দেবের সহায়তার প্রয়োজন হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ প্রথম সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় অংশমাত্র সন্নিবেশিত ছিল। কথোপকথন অংশ তৃতীয় সংস্করণেই লিপিবদ্ধ হয়। "সমাচার দর্পণে" এই পুস্তকের পরিচয় দেওয়া আছে, তাহাতে কথোপকথন অংশটি তখন ছিলনা বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

পুস্তকখানি পাঠ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হইত—In June 1824, a General Examination of the first & second classes of all the female schools took place at the mission

* আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলা পুস্তকের তালিকায় কিন্তু এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের উল্লেখ পাইলাম না।—বঃ সঃ

House at Mirzapur....The first classes were able to read with ease. "The tract on female education" by a learned pundit, rather a difficult book, for the number of Sanskrit phrases in it.

পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইত এবং প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিত। এই কার্য্যে পুস্তকখানির বিশেষ উপযুক্ততা এই ছিল যে, উহা একজন গোঁড়া পণ্ডিতের লেখা, হিন্দু লোকমতগঠনে সহায়তা করিবার উপযোগী। প্রথম সংস্করণে রাধাকান্ত দেবের সহায়তা ছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে সে কথার উল্লেখ নাই। তৃতীয় সংস্করণে যে "কথোপকথন" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, মিশনারীদিগের ফরমায়েস মতই উহা লিখিত হয়।

(খ) কবিতামৃতকূপ—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার কৃত—নির্ব্বাচিত সংস্কৃত শ্লোকনিচয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ। ৫, ৪৪ পৃষ্ঠা ১২পেজী কলিকাতায় ছাপা, ১৮২৬ (B. M.)

(গ) স্কুল বুক সোসাইটীর ৫ম রিপোর্টে (১৮২৩) উল্লেখ আছে 'Gourmohan's Shunscrit Grmmer in Bengali, in the press"

(I. O.), (B. M.), (I. L.) এই সঙ্কেতের অর্থ যথাক্রমে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী, বৃটিশ মিউজিয়ম্, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ঐ ঐ স্থানে চিহ্নিত পুস্তকগুলি সঞ্চিত আছে।

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয় তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পুস্তকখানির নাম 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক'। উহারই তৃতীয় সংস্করণ 'বঙ্গশ্রী'র "অন্তঃপুর"-বিভাগে আমূল পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সে যুগে বইখানির যে সমাদর হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ অল্পদিনের মধ্যেই উহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পরে আরও দুইটি সংস্করণ হয়। নিম্নে পুস্তকখানির রচয়িতা ও বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা কে ?

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির কোন সংস্করণেই গ্রন্থকারের নাম নাই। অনেকের ধারণা, রাজা রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও তাঁহার নবপ্রকাশিত *Western Influence in Bengali Literature* পুস্তকের ৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"It was, however, from the pen of a leader of the orthodox camp, Raja Radha Kanta Deb, that the first book for the education of women—*Stri-Shiksharidhayak*—came out."

সেন-মহাশয় কোথা হইতে এই সংবাদটি পাইলেন তাহার কোন সন্ধান আমাদের দেন নাই। সে যাহা হউক, এই পুস্তকের লেখক যে রাধাকান্ত দেব নহেন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে সে-যুগের এক জন গোঁড়া পণ্ডিত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই গৌরমোহন কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির হেড-পণ্ডিত ছিলেন। তবে গৌরমোহন যে এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশ ব্যাপারে সোসাইটির নেটিব সেক্রেটারী রাধাকান্ত দেবের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে আছে—

"He [Radhakant Deb] assisted the late Gauramohana Vidyalankara the Head Pandita of the School Society in the preparation and publication of a Pamphlet called the *Stri-Siksha Vidhayaka*, on the importance of female education and its concordance with the dictates of the Sastras,..." (*A Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deva Bahadur*,...By the Editors of the Raja's Sabdakalpadruma. 1859.)

পাদরি লং সাহেবের বাংলা পুস্তকের তালিকা ও 'হ্যাণ্ডবুক অফ্ বেঙ্গল মিশনস্' নামক গ্রন্থেও 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গৌরমোহনের রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দুইটি কার্য্যবিবরণীতেও 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা হিসাবে গৌরমোহনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই চারিটি প্রমাণই বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্য স্থলে উদ্ধৃত হইল। সুতরাং গৌরমোহনই যে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক'-প্রণেতা সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তক আমি এখনও কোথাও দেখি নাই, বা কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন যে এই পুস্তক কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮১৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

Female Education Gaur Mohan's Defence of, *Stri Shikhya Bishayak*. 1st ed.. 1818, 4th ed., 1854, S. B. S. 2 as. Gives in simple language evidence in favor of the Education of Hindu females from the examples of illustrious ones both ancient and modern, and particularly of Indian females, such as...(Long's *Descriptive Catalogue o Bengali Works*, p. 11.)

এই বিবরণে তিনটি ভুল আছে। প্রথমতঃ, 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' স্থলে ভ্রমক্রমে 'স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক' ছাপা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালটি ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ, পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। স্কুলবুক-সোসাইটি যে

পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশ করেন, সে-কথা পরে বলা হইবে। তাহার পুর্ব্বে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ও প্রকাশক সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

যে-লং উপরি উদ্ধৃত অংশে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র প্রথম সংস্করণের প্রকাশের তারিখ ১৮১৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

> In 1822, Gaur Mohan, a pandit, composed a tract in Bengali, advocating female education; in it he quotes many examples of Hindu women who could read. (*Hand-Book of Bengal Missions* —Rev. James Long. London, 1848, p. 347.)

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৮২২ সন তাহার অন্য প্রমাণ দিতেছি। ১৮২২ সনের ৬ই এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি দেওয়া হয় :

> স্ত্রীশিক্ষা।—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে। ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৯)

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' ১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ খুব সম্ভব গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রাধাকান্ত দেবের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির কোন সংস্রব ছিল না, কারণ স্কুলবুক-সোসাইটির পঞ্চম কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, সোসাইটি 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশ করেন ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল

উপরে যে কার্য্যবিবরণীর কথা বলা হইল তাহাতে আছে :—

> The following is a list of the books published by the Society since the last General Meeting :—
> Gormohon on Female Education,...received Aug. 1822.
> Gormohon on Female Education, Nagree character,...received Feb. 1823.
> (The Fifth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifth and Sixth Years, 1822-23.)

১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র এই সংস্করণটি যে 'সমাচার দর্পণে' উল্লিখিত প্রথম সংস্করণ হইতে বিভিন্ন ও কয়েক মাস পরে প্রকাশিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দ্বিতীয় সংস্করণ। স্কুলবুক-সোসাইটির পরবর্ত্তী অর্থাৎ ৬ষ্ঠ কার্য্যবিবরণীতে আছে :—

> Gourmohan's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been rapidly distributed. (The Sixth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Sixth and Seventh Years, 1824-25.)

কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইলসন) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করেন।

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ যে ১৮২২ সনে মুদ্রিত হয় তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। ব্রিটিশ-মিউজিয়মে দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' আছে। ব্রিটিশ-মিউজিয়মের বাংলা-পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ২৫) ব্লুমহার্ট তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

> স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত। [by G. V., assisted by Radhakanta Deva.] 2nd edition, pp. 24. *Calcutta*, 1822.

বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে কতদূর সফলতা লাভ করা যাইবে, এ-সম্বন্ধে কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির কি অভিমত ছিল — এই প্রসঙ্গে তাহার একটু উল্লেখ করিলে বোধ করি অবান্তর হইবে না।

১৮২১ সনের শেষভাগে মিস কুক নামে এক জন মহিলা কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির অধীনে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে সোসাইটি মিস কুকের আনুকূল্য করিতে পারেন নাই। সোসাইটির নেটিব সেক্রেটারী রাধাকান্ত দেব ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীকে এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> The Rev. W. H. PEARCE
> etc. etc. etc.
>
> My dear Sir,
>
> I beg leave to observe that the British and Foreign School Society, bearing in the mind the usages and customs of the Hindoos, have sent out Miss Cooke to educate Hindoo females, and that I fear none of the good and respectable Hindoo families will give her access to their Women's Apartment, nor send their females to her school if organized. They may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee, by their domestic schoolmasters, as some families do, before such female children are married, or arrived to the age of 9 or 10 years at farthest. For these reasons, I am humbly of opinion that we need not have a Meeting to discuss on the subject of the education of Hindoo females by Miss Cooke, who may render her services (if required) to the schools lately established by the Missionaries for the tuition of the poor classes of Native females.
>
> Yours very faithfully
> Sd. Radhakant Deb
> 10th December 1821.

কিন্তু স্কুল-সোসাইটি মিস কুককে সাহায্যদান না করিলেও চার্চ মিশনরী সোসাইটি মিস কুকের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সম্মত হন। সোসাইটির ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে এ-কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

> To Revd. W. H. PEARCE
> etc. etc. etc.
>
> My dear Sir,
>
> I am very happy to learn that Miss Cooke is engaged by the Church Missionary Society, and have to add that the Hindoos cannot but feel

themselves grateful if her laudable intentions to teach the Hindoo Ladies in European works of art, both manual and mechanical, prevail upon her to instruct for the present some poor women of good cast, that when these have acquired a degree of skilfulness under her benevolent instructions may hereafter be retained in the families of respectable Hindoos, and knowledge thereby diffused among Native females generally without interfering with their immemorial customs and usages.

Yours very faithfully,
Sd. Radhakant Deb.
12th December 1821.

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই বিতরিত হইয়া যায়। পুস্তকখানির সমাদর দেখিয়া স্কুলবুক-সোসাইটি ১৮২৪ সনে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে পুস্তকখানির আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৪, তৃতীয় সংস্করণে বাড়িয়া ৪৫ হয়। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ষষ্ঠ কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায়:—

> Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500[?] copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language, and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

গৌরমোহন তৃতীয় সংস্করণে তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষাগত পরিবর্ত্তন এবং "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অংশটি যোজনা করেন। তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:—

> স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের / শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল / বাং সন ১২৩১।
>
> An Apology / for / Hindoo Female Education ; / Containing / Evidence in Favour / of the / Education of Hindoo Females, / From the Examples of illustrious Women, / Both Ancient and Modern. / Third Edition, Enlarged. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, 11, / Circular Road. / 1824.

তৃতীয় সংস্করণ 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

> কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না, এইজন্যে কিছুদিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।

এই 'যুবনাইল পাঠশালা' সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল থাকিতে পারে। লশিংটন সাহেবের গ্রন্থে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে; তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

> *Calcutta Female Juvenile Society* for the establishment and support of Bengalee Female Schools—......Shortly [after April 1819] then, the Association was formed by the young ladies of the Seminary [of Mrs. Lawson and Pearce]...
>
> The Society propose to publish an Edition of a small Pamphlet, written in Bengallee by a Native, whose design is to prove that female education was formerly prevalent among the Hindoos, especially the higher classes, and that such instruction, so far from being, as is generally supposed, disgraceful or injurious, is calculated to produce the most beneficial effects.*

এই বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, 'যুবনাইল পাঠশালার' কর্ত্তৃপক্ষ গৌরমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশ করিবার কল্পনা-জল্পনা করিতেছিলেন। এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানটির ও মিস্ কুক-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সম্ভবতঃ গৌরমোহন তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত করেন। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ' অধ্যায়ের গোড়ায় আছে:—

> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি নানা দেশীয় স্ত্রীসকল যাঁহারা আপন২ দেশের বিদ্যা শিখিতে অনাদর করেণ তাঁহারদের প্রতি বিবি লোকের সবিনয় নিবেদন এই, যে তাঁহারা আপন খরচে কিম্বা ঐ বিবি লোকের সহায়তাতে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেন।

এই অংশটি পাঠ করিলে মনে হয় যেন পুস্তকটি এদেশবাসী স্ত্রীলোকদের প্রতি বিবিলোকদের নিবেদন। প্রকৃতপক্ষে মিশনরীদের ফরমাশ-মতই গৌরমোহন এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

১৮২৪ সনের মার্চ্চ মাসে লেডীস্ সোসাইটি অফ্ ফিমেল্স্ স্থাপিত হয়; পরবর্ত্তী জুন মাসে মিস্ কুকের বালিকা-বিদ্যালয়গুলিও এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের সেন্‌ট্রেল স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তক পড়ান হইত।

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৫৪ সনে স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার চতুর্থ, এবং ১৮৫৯ সনে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। শেষোক্ত সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে।

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* Chas. Lushington's *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions*, Decr. 1824, pp. 187-88.

এই পুস্তকের ১৯১ পৃষ্ঠার পাদটীকাটিও উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Since the above was sent to the Press, the Writer has been informed that the Female Juvenile Society was incorporated a few months ago, with another Institution denominated the Bengal Christian School Society, established at the end of the year 1822, whose object is the promotion especially, of religious knowledge, and more particularly among the Native Females of India."

নিভৃত বনানী
শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্র দত্ত

বেকার

—শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রায় মাসখানেক হল চাকরীটি খুইয়েছি। দোষ ছিল অবশ্য আমারই। ওরা লোক কমাচ্ছিল, ব্যবসার বাজারে জগত জুড়ে মন্দা, তায় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন, গান্ধীর হাঙ্গামা—বাধ্য হয়ে ওরা লোক কমাচ্ছিল। ওদের কোনও দোষ ছিল না। যতদূর সম্ভব সুবিচার করছিল, লোক ছাড়াবার সময়। অপিসের বড়বাবু যার আপনার লোক, তাকে বাদ দিচ্ছিল। পাঁচ বছরের চাকরী যাদের, অর্থাৎ চাকরীবৃত্তি যাদের মজ্জার ভেতরে ঘুণের মত ধরে গিয়েছে তাদেরও বাদ, আবার তিরিশ টাকার উপরে যাদের মাইনে, তাদেরও বাদ।

আমার চাকরী মাত্র চার বছর দশ মাস হয়েছিল, আর মাইনে হয়েছিল উনত্রিশ টাকা, সেই দোষে চাকরী খোয়ালাম।

স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ছিলাম, কলেজের সব ক্লাশ গুলোই শেষ করতাম, কিন্তু বয়স বেজায় বেড়ে যাচ্ছিল, তাই এম-এ একজামিনটা না দিয়েই তেইশ বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকি—আটাশ টাকা মাইনে। এ কয় বছরে আরও খানিকটা বয়স বাড়ালাম, কিন্তু মাইনে বাড়াতে পারলাম না, সেই অপরাধে চাকরীটা খোয়ালাম।

সস্তায় একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী কিনেছিলাম, সেটা গায়ে দিয়ে সাহেবের কাছে আপীল করতে যেতে সাহস হল না। বড়বাবু বললেন, "তোমার ভাবনা কি ছোকরা? এম-এ পড়েছ। জীবনটা গড়ে ফেলবার কত সুযোগ পাবে। বিশেষতঃ বুদ্ধি করে এখনও যখন বিয়ে-থা করনি—সংসারের ভার এখনও কাঁধে পড়েনি।"

তিন বছর হল তাঁর ম্যাট্রিক-পাশ জামাতাটি কাজে ঢুকেছে—মেয়ের ভার সামলাবার জন্যে তার চাকরী বজায় রইল, আর আমি জীবনটা গড়ে তোলবার জন্যে ছাড়া পেয়ে গেলাম।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সন্ধ্যে; বেলেঘাটার বাসায় কুঠরীতে একা-একা বসে ভাল লাগছিল না। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে অন্ধকার নাশ করতে চেষ্টা করলাম। পেরে উঠলাম না। লণ্ঠনে কেরোসিন নেই। মধ্যে থেকে দেশলাই-এর শেষ কাঠিটি শুধু-শুধু নষ্ট হল।

জানালা খুলে খানিকটা পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঘরে ঢোকালে মন্দ কি? কিন্তু বেলেঘাটার কয়লার ডিপোগুলোর পশ্চিমা স্বত্বাধিকারীর দল এক বিষয়ে দলের নিয়ম চমৎকার মেনে চলে, সন্ধ্যে হলেই এ তল্লাটে কাঁচা কয়লার ছোট্ট ছোট্ট গাদা তৈয়েরী করে তারা এক জোটে আগুন ধরিয়ে দেয়। ডাল-রোটীর চুলায় পোড়া-কয়লা জ্বালাতে হয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে সেই আগুনের ধোঁয়া প্রচুর পরিমাণে জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল, কার্ত্তিক মাসের কোয়াসাও খানিকটা।

দুপুর বেলা খাওয়া হয়নি ভাল করে—হোটেলে ঝি খেঁদির বাক্যবাণ আর সহ্য হয় না। বছর তিনেক ধরে খেয়েছি, মাত্র কয়দিন হল হোটেলের পাওনা বাকি পড়েছে। খেঁদির মুখাবয়বের যে স্থানটা নাকের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, সেখানে ছুটো গহ্বর। লোকে বলে, এই ঝি-বৃত্তির আগে তার একটি সহজ বৃত্তি ছিল, সে-বৃত্তি বেচারী বেশী দিন চালাতে পারে নি; রোগে পড়েছিল; সেই রোগের মূল্য স্বরূপ নাকটি দিয়েছে।

কিন্তু পরিবর্ত্তে পেয়েছে, তার বাক্যে এক অপরূপ ঝঙ্কার। এ বেলা আর সে ঝঙ্কার উপভোগ করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

কোয়াসা আর ধোঁয়ার সঙ্গে পাশের একটা বাড়ী থেকে সুরে-বাঁধা ক্রন্দনের বেশ ভেসে এসে আমার ঘরটিতে ঢুকছিল। কতদিন মহল্লা দিলে ক্রন্দনে এমন সুর আয়ত্ত করা যায়!—

"ওরে—আমার বাবারে—আমাদের কার কাছে ফেলে গেলিরে!—"

প্রয়োজনমত দ্রুত অথবা টেনে-টেনে ক্রন্দন-রতা বৃদ্ধাটি তাঁর ক্রন্দন-রাগিণী নানা অলঙ্কারে সাজাচ্ছিলেন।

প্রায় প্রত্যহই শঙ্খ-ধ্বনির পরিবর্ত্তে এমনিধারা সন্ধ্যা-বন্দনা ঐ বাড়ীটি থেকে ওঠে। গত বৎসর পুজোর সময় জামাই মারা গিয়েছে টাইফয়েডে। আপিস থেকে এসে

আমিও তার শব নিমতলাঘাটে বহন করেছিলাম। সকলে একই সঙ্গে আপিসে বেরুতাম, বাসের জন্যে অপেক্ষা করার সম্পর্কে পরিচয়ও ছিল। সে বেচারীই উপার্জ্জন করে মা-মেয়েকে খাওয়াত। এখন তার অন্তর্ধান প্রতি সন্ধ্যায় মা এমন ভাবে স্মরণ করেন।

কোন কোন দিন কানে আসে, মেয়ে রন্ধন শেষ করে মাকে ডাকে, "ভাত বেড়েছি"—তারপর ক্রমশঃ ক্রন্দন নীরব হয়ে আসে।

আজও নীরব হল। বুঝলাম, ওদের বাড়ীতে রান্না শেষ হয়েছে।

প্রাণটা ঘরের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। হোটেলে যাবার সময় হয়েছে—কিন্তু আজ আর উঠানের কলতলার আঁস্তাকুড় থেকে খেঁদির অভিনন্দনে রুচি হচ্ছিল না, "এই যে বাবু এয়েছেন!"

দুপুর বেলাও ভাল করে খাওয়া হয়নি, তাই হোটেলের টানে প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

ঘরে চাবি দিয়ে কলে দাঁড়িয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেলাম, পেটটা ভরে গেল। বেশ আরাম করে পেটে বার তিনেক হাত বুললাম। পেটে হাত বুলানো, ক্ষুধার ভারী চমৎকার ঔষধ।

ভাবলাম, হোটেলে ভাত খেতে না গিয়ে এমন পূর্ণিমার চাঁদনী রাতে গড়ের মাঠে খানিকটা হাওয়া খেতে যাওয়া যাক।

বেলেঘাটা রোড শিয়ালদার পথে কুব্জ হয়ে বিশাল উষ্ট্র-পৃষ্ঠের মত ওভারব্রিজে ই-বি-আর-এর রেল-ইয়ার্ড পার হয়েছে।

ধোঁয়া আর কোয়াসায় সন্ধ্যার হাওয়া বিশিষ্ট আহার্য্যের মত স্বাদু হয়ে উঠেছিল, একটা মুসলমানী হোটেলে চুল্লীর উপর লোহার শিকে বেঁধা খানিকটা মাংস-পিণ্ড ঝল্‌সে ঝল্‌সে শিক-কাবাবে পরিণত হচ্ছিল,—চা আর মাংসের ঝোলের ছোপধরা একখানা টেবিলের সামনে বসে তিনজন কাবুলীওয়ালা দুধের সর মিশানো চা পান করতে করতে ফিরে ফিরে চুল্লীর দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের বিশাল বদনমণ্ডল শ্মশ্রুর অন্তরালেও শুধু বুঝি চুল্লার আলোকেই দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এই কাবুলীওয়ালারা কোন্ সুদূর পার্ব্বত্য আফগানিস্থান থেকে কলকাতায় এসে "করে খাচ্ছে"—আর আমি বাঙ্গালী!

মনে পড়ল, সেদিন কোন সুদৃশ্য মাসিকপত্রে একটা জোরালো গোছের প্রবন্ধ পড়েছিলাম, "বেকার সমস্যার প্রতিকার", এমনি একটা নাম। ব্যবসায়, আলস্য-বিসর্জ্জন এমনি ধারা পরামর্শে প্রবন্ধটি ভরা। সত্যি, চাকরী না করে, আলস্যবর্জ্জন করে যদি ব্যবসায়ে নামতাম ত' আজ হয়ত খেঁদির ভয়ে হোটেল-বিমুখ হতে হত না। হয়ত এই বাঙ্গালীর ছেলেই আফগানিস্থানের হিরাট, কাবুল, অথবা পারস্যের ইস্পাহানে কোনও পথের ধারের হিন্দু-হোটেলে বসে মাছের ঝোল ভাত খেতে পেত!

কলকাতায় কত শত পানের দোকান হয়েছে। সত্যি, অল্প মূলধনে এমন সহজ ব্যবসায় আর নেই।

রাস্তার ওপাশের পানের দোকানটিতে ঈর্ষ্যান্বিত নয়নে তাকালাম—আমার ঘরের লণ্ঠনে কেরোসিন নেই, এ দোকানটিতে কেমন উজ্জ্বল পেট্রোমাক্স জ্বলছে।

কয়লার ডিপোর একজন পশ্চিমা ব্যবসায়ী তার সান্ধ্য ডালরোটী নিঃশেষ করে পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বপুখানির সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি বেশ বোঝা যাচ্ছিল ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দেওয়ার বহর দেখে। আরা বা গয়া জেলার সুদূর পল্লীতে পরিণীতাটিকে রেখে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এখানে এসেছে, পানের আস্বাদ নিতে নিতে কোথায় যেন কেমন একটু খুঁৎ সে মনে মনে অনুভব করছিল। 'আউর থোড়া চুণা দেঁয়াও"—বলে গুণ্-গুণ্ করে একটি গানের পদ মাথা নেড়ে নেড়ে গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে ওপাশটায় তাকাচ্ছিল।

ওপাশটিতে খোলার বস্তির সরু গলিটা চলে গিয়েছে, তারই মাথায় দাঁড়িয়েছে বাসবদত্তার বহুধাবিভিন্ন সংস্করণের জন-কয়েক।

তাদের একজনের মুখে একটু হাসি খেলে গেল, কালো মুখখানিকে খড়ি আর আল্‌তা মেখে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করেছে, কাজলে নয়ন দুটি টেনে আঁকতেও ভোলে নি। খোঁপায় বেলফুলের গোড়ে কী সুন্দর মানিয়েছে, তাও একবার

দেখাতে ভুলল না—নাকের পশ্চিমা-বিমোহন বেসর দুলিয়ে সে চটুল গতিতে দোকানের কাছে এগিয়ে এল।

এই কয়লার ব্যবসায়ী টাকা বাট্‌খারার উপরে দশবার বাজিয়ে নেয়, এর কাছে মেকি চালানো শক্ত। ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিতে সে রমণীর দেহসজ্জা পেট্রোমাক্সের আলোয় ভাল করে নিরিখ করতে লাগল। দেহ-ব্যবসায়িনীর মুখ-খানিতে আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোছায়া চকিতে বার বার খেলে গেল। সে জানে, কয় আনা পয়সা আনলে তবে বাড়ীওয়ালী ভাতের কাঁসির সামনে বসতে দেবে।

পানওয়ালা অপর খরিদ্দারের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট ধ্যানে পান সাজছিল, এমন সময় মুসলমানী হোটেলে কাবুলীত্রয় "আরে আরে আরে" করে চীৎকার করে উঠল।

ব্যাপার এমন কিছুই নয়, একজন মুটে বহুকাল ধরে কাবুলীদের কাছে কয়টি টাকা ধারে, বহুদিন ধরে সুদও দিয়ে আসছিল, ইদানীং কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা শিক-কাবাবের আস্বাদ নিতে নিতে অকস্মাৎ তাকে পথে দেখতে পেয়েছে—মহাজনী ব্যবসায়ে চোখ সর্ব্বদা খোলা রাখতে হয়।

ওভারব্রিজ থেকে রেলইয়ার্ডে কাতারে কাতারে সাজানো মালগাড়ী দেখে আজ আর তেমন তাক লাগছিল না। বাণিজ্যের প্রসার যেন বক্ষের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

সেদিন এ পাড়ায় একটা ছোট মুদির দোকানে গিয়ে-ছিলাম কি কিনতে—মুদি তখন তার খুচরা বিক্রয় শেষ করেছে, পয়সা গুণে সারি সারি সাজিয়ে খাতায় অঙ্কপাত করছে। আজ চকিতে বুঝে ফেললাম, এই বিশাল রেলওয়ে-তেও তাক লাগবার এমন কিছু নেই—এও এক দোকানদারী, কেনাবেচা, টাকা গোণা, খাতাপত্রে হিসেব রাখার সমষ্টি। কোন কোন খদ্দের ফার্ষ্ট ক্লাসের গদি অপছন্দ করে নাক সিঁটকাতেও ছাড়ে না—অবশ্য পয়সার জোরে যার গোঁফে চাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। এই উপলব্ধিতে কেন জানিনে আমার বুকখানা প্রসারিত হয়ে উঠল।

বাণিজ্যের প্রসারিত ক্ষেত্রের কথা ভাবতে ভাবতে কখন মৌলালীর মোড়ে এসে পড়েছি—ছুটন্ত ট্রাম-বাসগুলো আমার চোখে আজ শুধু একজনের হাতে দাঁড়ি-পাল্লার সওদা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা একটানা বাদ্যের শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি, ফুটপাথের পাশে অন্ধ ভিখারী একজন প্রাণপণে ছোট একটি ঢোলক অক্লান্তে বাজাচ্ছে, অবশ্য আমার মত পথিকের কর্ণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। চোখদুটি তার কবে মা-শীতলা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছেন, কাজেই এই ভিক্ষার ব্যবসায় ছাড়া জীবনটা গড়ে তোলবার বেচারার আর এ জীবনে উপায়ান্তর নেই। ভিক্ষা করে নিয়ে না এলে তার আত্মীয়-স্বজন দুমুঠো খেতে দেয় না হয়ত। আজ সারাদিনে কত উপার্জ্জন করতে পেরেছে কে জানে, আজকের উপার্জ্জন তার আত্মীয়দের মনঃপূত হবে কিনা, তাই বা কে জানে!

অনুকম্পায় পকেটে হাত দিলাম, একটি আধলা ছিল। আজ সকালে দেড় পয়সার মুড়ি আর বেগুনি দিয়ে চা খেয়ে-ছিলাম, কি জানি কোন্ খেয়ালে এ আধলাটি সঞ্চয় করে-ছিলাম। অন্য দিন হলে দুটি পয়সাই হয়ত প্রাতরাশে ব্যয় করি।

মনে পড়ল, এই আধলাটিই উপস্থিত আমার শেষ সম্বল, বাড়ীতে চিঠি লিখেছি, যতক্ষণ না মনি-অর্ডারে টাকা আসছে অন্ততঃ ততক্ষণ এই আধলাটি ছাড়া আর আমার কিছুই নেই। মা কিছু না কিছু বাঁধা রেখে দুচার টাকা পাঠাবেনই।

আধ পয়সা রেখেই বা কি হবে? আমার বর্ত্তমান চরম দরিদ্র্য আধ পয়সার ব্যবধানে একটুও ইতরবিশেষ হবে না—আধ পয়সা রাখার চেয়ে নিঃস্ব হওয়াই ভাল।

মনে পড়ে গেল, আমাদেরই এই ভারতবর্ষে রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়েছিলেন—আধলাটি ভিখারীকে দিয়ে দিলাম। প্রাণটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, কয় মিনিট ধরে হরিশ্চন্দ্রের গরিমায় আমার হৃদয় আপ্লুত হয়ে রইল।

বহুক্ষণ ধরে ঢোলক বাজিয়ে অন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, নিরস্ত হয়ে সম্মুখের পুঁটুলি থেকে একটি সঞ্চিত আধপোড়া সিগারেট বার করে মুখে দিল, ধূমপান করে বেচারী শ্রমোপনোদন করতে লাগল। ধূমপানের তৃপ্তিতে তার শান্ত নিশ্চিন্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কলকাতার বিশাল সৌধশ্রেণী আমায় মানুষের কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে, এই গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিকের আলো! আজ বুঝতে পারছিলাম, এ সবই সম্ভব হয়েছে শুধু বাণিজ্যের জন্য। বাণিজ্যই বেকার-সমস্যার একমাত্র প্রতিকার।

চাঁদনীর বাজারটি বাণিজ্যের যেন একটি চপলা বালিকা-মূর্ত্তি, বেচা-কেনার নিরবচ্ছিন্ন চঞ্চলতা চারপাশে অহরহ ছড়িয়ে পড়ছে।

পৃথিবীতে এমন সহজ সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে বাঙ্গালী-সন্তান কেন যে ইস্কুলে কলেজে বিদ্যার্জ্জন করতে ব্যস্ত হয়েছে!

সেক্সপিয়র টেনিসন পড়ে তার লাভটা কি? মনে পড়ল, যেদিন সতেরো বছর বয়স, রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার একটি পাতায় পড়েছিলাম—

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহেনা ত' অপমান—"

আমার অপমান আর আমার প্রেমের অপমানের মধ্যেকার তফাৎটুকুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পেরে সেদিন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম—

সেদিন সেই নবজাগ্রত হৃদয় প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল, আর যাই করি প্রেমের অপমান কখনও করছি না।

আর শরৎচন্দ্রের অবক্ষণীয়া বেচারী গেনি—সেদিনও অনুকম্পার অনুশীলনে হৃদয় প্রসারিত হচ্ছিল।

দুঃখের বিষয়, আজ স্বীকার করতে হচ্ছিল, এসব কাল্‌চার-আহরণ বাণিজ্যের পথের পাথেয় নয়। এত কষ্ট করে ইংরেজি শেখা, "purgery. forgery. chickeney are the weapons offensive and defensive of the people of the Lower Ganges"—এ সব সুগঠিত বাক্য কত আগ্রহে মুখস্থ করেছি, শুধু যত্ন করে ইংরেজি শিখব বলে।

কিন্তু এই যে চাঁদনীর বাজারে লুঙ্গি-পরা ছোকরাটি মেমসাহেবকে অদ্ভুত ইংরেজিতে ডেকে বলছে জিনিস নিতে, মেমসাহেবের কই তা বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না ত'!

আজ ব্যবসা করতে যদি নামি, এমন বোধগম্য ইংরেজি কি আমি বলতে পাবব?

মহাবণিক জাতি জাপানীদের কোন এক প্রধান মন্ত্রী মোটেই ইংরেজি জানতেন না—

জীবনে ধিক্কার আসছিল, জীবনটা অপব্যয় করে বিদ্যে আয়ত্ত করলাম, শুধু সোজা পথের উল্‌টো দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে!

"চাই নাকি?"—একটি মহা-ব্যস্তবাগীশ লোক একখানা চিঠির খাম এনে সামনে ধরলে। তার মুখে যে হাসিটি ফুটেছিল, সে শুধু আমায় কৃতার্থ করবার জন্যে।

চট করে খামখানি খুলে ভিতরের বস্তু দেখাল—নারীর যে মূর্ত্তি সচরাচর পথে ঘাটে দেখা যায় না তারই ফটো।

ঘাড় নেড়ে জানালাম, আমার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ......বলতে যাচ্ছিলাম, অসাধারণ বস্তু-সংগ্রহ হিসাবে, ওতে আমায় কিঞ্চিত লোভ থাকলেও বর্ত্তমানে পকেট শূন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই লোকটি "বেশ, বেশ" বলে আমায় আর একবার সুমিষ্ট হাস্যে চরিতার্থ করে চলে গেল।

এস্‌প্লানেডের মোড়ে পাহারাওয়ালা হাত তুলেছে,—এদিককার রাস্তা রিলের ফিতার মত মোটরের ট্রামের চাকার তলায় সড়্ সড়্ করে সরছিল, হঠাৎ থেমে গেল; ওদিককার রিল ঘুরতে আরম্ভ করেছে। লোকটা তার অসাধারণ বস্তু বিক্রয় করতে ওদিকে নূতন ক্রেতার সন্ধানে গেল।

সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটার পিছনে আর একটা। জমকালো একটা সিডানবডির মোটরে নামাবলী গায়ে পুরুতঠাকুর বসে আছেন, সঙ্গে নৈবেদ্য। কোন যজমান-বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো সেরে বাড়ী ফিরছেন। পিছনে আর একটি গাড়ীতে বিশালকায় এক সন্ন্যাসী।

হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বাবয়ব-সমন্বয়ের চিহ্নস্বরূপ এই দুই মূর্ত্তি কোন্ অচিন্তিতপূর্ব্ব যোগাযোগে এখানে এসে পরে পরে দাঁড়িয়েছে।

সন্ন্যাসীর নামের পিছনে নিশ্চয়ই "আনন্দ" জোড়া, তারই মারফতে ইনি সকল সমস্যার সমাধান করেছেন, আনন্দের এঁর আর অভাব নেই। কোন ধনী মাড়োয়ারী চেলার বাড়ী থেকে বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে ফিরছেন বোধ হয়।

তখন কলেজ পড়ি, কি খেয়াল হয়েছিল, এ নশ্বর জীবনে অবিনশ্বরের সন্ধান করতে লেগেছিলাম।

কোথায় যেন একদিন পড়লাম, "অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গীতার দু' অধ্যায়, স্থান—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

চার ঘটিকায় ক্লাস শেষ করে বহু দূরে পদব্রজে বাসায় ফিরে আবার গীতায় তু' অধ্যায়ে পৌছাতে বিলম্ব হয়ে যাবে, তাই কলেজ থেকে সটান স্থানটিতে গিয়ে পৌছোলাম।

চারতলা বাড়ী, আগাগোড়া নানাবয়সী গেরুয়াধারীতে ভরা আনন্দ-মঠ। যাঁদের বয়েস হয়েছে, তাঁরা নিরঙ্কুশ আনন্দধারী, আর যারা এখনও অল্পবয়সী, তাদের আনন্দের শাবক বলে অভিহিত করা যেতে পারে—সত্যিই গেরুয়ায় আর মুণ্ডিত মস্তকে অল্পবয়সীদের যে ছুটাছুটি তাতেও আনন্দের কোনও অভাব ছিল না, সংযত ব্রহ্মচর্য্যের আনন্দ।

বাসায় না ফিরে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম—ব্রহ্মচারীদের তখন বৈকালীন দধি-চিপিটকের সংযত ফলাহারের প্রচুর আয়োজন চলেছে, আমিও প্রসাদ পেয়ে গেলাম।

যথা সময়ে "গীতার তু' অধ্যায়" আরম্ভ হল, মোহাতুর অর্জ্জুনকে সখা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে সুপ্ত হস্তী জাগরিত করছেন—গৈরিক রেশমের কানঢাকা টুপি মাথায় ও তৎসম মোজাপায়ে এক সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, সন্ন্যাসের পীড়নে তাঁর গাত্রচর্ম্মের অন্তরালে বসাজাতীয় পদার্থ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই মত কেমন তিনি আলাস্কার স্বর্ণখনির মালিকদের হিন্দুর যোগবল বুঝিয়েছিলেন। একথা স্বপ্ন নয়, ওই আলাস্কার পথে ম্যাপে আঁকা সরু প্রণালীটি পার হয়ে হিন্দুত্ব কামাস্কাটকায় প্রবেশ করে সারা সাইবিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, সেখান থেকে ম্লেচ্ছ, নাস্তিক রুশিয়া, ইউরোপ সারা পৃথিবীতে……।

রঞ্জিত সিং যেমন ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটুখানি লোহিতবর্ণ দেখে বলতে পেরেছিলেন "সব লাল হো যাগা," আমিও মানসচক্ষে দেখতে পেলাম, পৃথিবীর মানচিত্রে তর্ তর্ করে ভারতবর্ষের হিন্দুয়ানী বিস্তারিত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে গীতার তু' অধ্যায়ের আনুষঙ্গিক ফণ্ডে কিঞ্চিৎ রজতবৃষ্টি হয়ে গেল।

সেদিন মনে মনে সংকল্প করেছিলাম, হিন্দু ধর্ম্মের এই মহিমময় প্রশস্ত পথ অবলম্বন করে আমিও আনন্দ লাভ করব।

বৃদ্ধা বিধবা মায়ের মুখ চেয়ে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে পারি নি। শুধু তুটি অন্নের জন্তে কলেজের পড়াটাও শেষ করা হয় নি, চাকরীতে ঢুকে পড়েছিলাম। আজ বুঝতে পারছি সেটাও ভুল করেছিলাম, উচিত ছিল ব্যবসায়ে নামা। পুঁজি না ছিল ত' স্বল্পব্যয়ে পানের দোকান দিয়ে আরম্ভ করতে পারতাম।

বড়বাবু পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, জীবনটা গড়ে তোলবার জন্ম আমি প্রচুর অবকাশ পেয়ে গিয়েছি।

সত্যি, আর চাকরীর উমেদারি না করে অদূরভবিষ্যতে এই ব্যবসার পথেই আমি নেমে পড়ব।

হয় ত' আর কিছুকাল পরে কান্দাহারের চালের আড়তে বসে থাকব। নৈশভোজনান্তে নিত্য নব কোন্ আফ্রিদিনন্দিনী আমার লীলাসঙ্গিনী হবে!

কয় বছর ধরে মা বিবাহ দেবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছেন, অফিসে মাইনে বাড়ছিল না, মনের ভিতরে বিবাহের ইচ্ছা সংগোপনে থাকলেও যাবজ্জীবন কৌমার্য্যের ধনুর্ভঙ্গ পণ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

পাহারাওয়ালা এদিককার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে—মোটর গুলো ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে চলতে আরম্ভ করেছে।

একটি তৃতীয়-জন-স্থান-নিষিদ্ধ-মোটর একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক চালাচ্ছে, তার সঙ্গিনী শ্বেতকন্যা তাকে মোটরের মন্থর গতির অবসরে প্রেম নিবেদন করছে, বিড়ালনয়নী বালার কাণ্ড দেখে এ কালা বেচারীর প্রাণটা হঠাৎ ছ্যাঁক করে উতলা হয়ে উঠল।

মনে মনে ঠিক করলাম, একটা কোনও ব্যবসায়ে নেমে মাকে জানিয়ে দেব, কৌমার্য্যপণ ভাঙ্গতে রাজী আছি।

পায়ে-পায়ে কর্জ্জন-পার্কের ধারে এসে দাঁড়ালাম—ময়দান জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছে, ময়দানের ভিতরকার রাস্তা-গুলিতে গ্যাসের আলোর মালা কী মনোরম! দূরে গঙ্গার উপরে জাহাজের মাস্তলে মাস্তলে বিজলীবাতি সুদূর দেশগুলি থেকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বুঝলাম, এ প্রসারিতক্ষেত্র বাণিজ্যের আহ্বান।

আর জ্যোৎস্না-ধৌত অকটরলোনি মনুমেণ্ট!

বোঁ করে পুরুত মশায়ের নৈবেদ্যসুদ্ধ মোটরখানা মোড় ঘুরে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নৈবেদ্যের থালাখানার সঙ্গে হোটেলের ভাতের থালার কি সম্পর্ক?—কিন্তু জঠরে আমার ক্ষুধার দাবানল জ্বলে উঠল।

পথের ধারে জলের কলও নেই যে, ঢক্ ঢক্ করে আবার খানিকটা জল খেয়ে সে আগুন নির্ব্বাপিত করি।

খালিপেটে তিনবার কেন ছ'বার হাত বুলালেও ক্ষুধা মরে না—

ময়দানের খোলা হাওয়া খেতে আর রুচি হচ্ছিল না, খানিকটা ধূমপান করে বাসায় ফেরা যাক্!

গান্ধীর প্ররোচনায় পড়ে চাকরী ছাড়বার বহুপূর্ব্বেই সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছিলাম, তারই একটা পকেট থেকে বার করে মুখে দিলাম। কিন্তু বিড়িটি ধরাতে গিয়ে মনে পড়ল দেশলাই নেই। শেষ কাঠিটি সন্ধ্যার বাতি জ্বালাতে গিয়ে নষ্ট করেছি।

পথের ধারের দোকান থেকে যে কিনে নেব, তারও উপায় নেই, শেষ আধলাটি অন্ধ ভিখারীকে দিয়েছি।

ধূমপায়ী ওই ভদ্রলোটির কাছে একটি দেশলাই কাঠি চাইতে গিয়ে দ্বিধা এল। মনে পড়ল, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এক মাত্র চাওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় উপায় নেই।

বাসায় যদি দেশলাই ফেলে আসতাম কিংবা পকেটে যদি পয়সা থাকত, চাইতে হয়ত দ্বিধা হত না।

অন্ধ ভিখারী ভিক্ষা সেরে বাড়ী ফিরে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে নিদ্রামগ্ন হয়েছে—

বারবিলাসিনাটি উঁচু পিঁড়ায় উঁচু হয়ে এক কাঁসি ভাতের সামনে বসেছে হয়ত—

খেঁদি ঝি হোটেলে এখনও দু একজন শেষ খদ্দেরের তদ্বির করছে—

জামাতা-শোকাচ্ছন্না বৃদ্ধা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে জপের মালায় দানাগুলি একটানা গুণে চলেছে। তার জামাতার জীবনবীমার টাকাগুলো যতদিন শেষ না হয়, তত-দিন এমনিধারা দিন তাদের কেটে যাবে—

কয়লাওয়ালা সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি সেরে ডিপোয় ফিরে বাঁশের খাটিয়ায় নাসিকাধ্বনি করছে। সেই ফটোওয়ালাও বাসায় ফিরে বিশ্রামাবকাশে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে হয়ত' আদর করে চুমু খাচ্ছে—

আর পুরুত ঠাকুর তাঁর ধনী যজমানগৃহিণীকে কোজাগরী রজনী জাগিয়ে রেখে এসে নিজে নৈবেদ্য থেকে মণ্ডাগুলি বেছে আলাদা করছেন হয়ত। ধনীগৃহিণী আরও, আরও সোনার দানার কল্পনায় বিভোর—

ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসের আলো ও জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত কলকাতা সহর আমার কাছে ডাইনী বুড়ীর মত নিষ্ঠুর হাসি হাসছে মনে হল!

মনুমেন্ট-বুড়ী যেন বিদ্রূপ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে!

আর এক দিক

আলেকজাণ্ডার উলকট 'হোয়াএল রোম বার্ণস' (While Rome Burns)-এ লিখিতেছেন:—বার্ণার্ড শ'র তখন বয়স কম; একটি সাইকেল মাত্র সম্বল, সাইকেলটি হইতে পড়িয়া ক্রমাগত হাত-পা ভাঙ্গেন। এই অবস্থায় বিড়ালাক্ষী আইরিশ ধনী-কন্যা পত্নী! মিস্ টাউনশেণ্ডের প্রেমে পড়িলেন। একদিন সাইকেল হইতে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গা অবস্থায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। শুশ্রূষাকারিণী স্বয়ং গৃহস্বামিনী। শ'য়ের কেবল ভয়, পাছে এই অসহায় অবস্থায় ভদ্রমহিলার পাণি প্রার্থনা করিয়া বসেন। তাই একটু সারিবার মুখে আসিতেই একদিন লুকাইয়া চম্পট দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এবারে সিঁড়ি হইতেই একেবারে ধরণীতলে—আবার কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। ইহার মধ্যে যেদিন একটু জ্ঞান ফিরিল, সেদিন চোখ মেলিয়াই শ' প্রথম কথা বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিবে?'—মেয়েটি বলিল, 'হাঁ।' শ' মূর্চ্ছিত হইলেন।

বিচিত্র সে বর্ণলেখা

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

যামিনীর শেষ যাম, তারাগুলি জ্বলিছে আকাশে –
বিচ্ছিন্ন গ্রহের দল, কেহ মৃত কারো আছে প্রাণ
অন্ধ নিয়তির বেগে সীমাহীন পরিক্রমা-পথে
ঘুরিতেছে অন্তহীন কালে। আজ তারা শান্ত যেন।
বহুদূরে ট্রেণের ঘর্ঘর ; থেমে গেল বংশীধ্বনি—
পিশাচের তীব্র আর্ত্তনাদ—শতাব্দীর বিভীষিকা,
জ্বালামুখী যন্ত্রের গর্জ্জন। থেমে গেল প্রাণ-স্পন্দ,
সুপ্তিমগ্ন রাজপুরী—ভোগময়ী বিধাত্রী ভাগ্যের !
মানবের দেহযন্ত্র ক্ষণকাল লভিল বিশ্রাম।
শুনি জল-কলধ্বনি মোর গৃহ-বাতায়ন-পাশে।

ভালো লাগিল না চোখে নিত্যকার ঘুম আর ঘুম,
রুটিনের বাঁধাপথে চক্রগতি দ্রুত আবর্ত্তন,
আপিসের বাঁধামন, প্রাণহীন মূঢ় চাটুবাদ
ভালো লাগিল না আজ। জাগিয়াছে অন্তর-নিবাসী
অনাদৃত, লাঞ্ছিত সে কবি, ঘুম আসিল না চোখে—
অলস পশুর ঘুম আসিবে না আজ রজনীতে।
আজ কবি একেশ্বর, প্রাণে তার জন্ম লভে আজ
নূতন জ্যোতিষ্কদল ভাবনার নীহারিকা হতে,
যেমন লভিছে জন্ম তীব্রদুঃখে নারীগর্ভ হতে
রক্তলিপ্ত মানবক—পৃথিবীর কিশোর কুসুম।

নাসাপথে বহে শ্বাস—উৎকলীয় পাচক ঘুমায়,
গভীর গর্জ্জন করে তার দেহে নিদ্রা-প্রেতিনীর
অদৃশ্য সঙ্গিনী যত, মৃত মানবের যত ক্ষুধা,
মানবের উদ্ভাবিত যত ক্রূর ছলনা-বন্ধন,
যত চৌর্য্য, যত গ্লানি, যত হীন শঠতা ধিক্কার
আজ সব প্রেতরূপী—ঘেরিয়াছে ঘুমন্ত শরীর,
শকুনি যেমন ঘেরে শ্মশানের গলিত শরীর
তারা ঘেরিয়াছে আজ, চেয়ে আছে জ্বলন্ত আঁখিতে
দেহহীন কামনা-বন্ধন। তাই আজ ঘুমা'ব না—
ঘুমাবে নিখিল পৃথ্বী—কবি একা জাগিবে ধরায়।

একাকী জাগিবে কবি, আর জাগে শিশির-নির্ম্মল
মানবীর গূঢ় প্রেম বাসনার রক্ত আচ্ছাদনে।
যে প্রেম ধারণ-ক্ষম, ধরিয়াছে যে প্রেম পৃথ্বীরে
অদৃশ্য তন্তুর জালে বাঁধিয়াছে মানুষের মন,
পশু-মানুষের মন বাঁধিয়াছে যে প্রেম গোপনে
লালসার নিগূঢ় ইঙ্গিতে, তর্জ্জনী-হেলনে যার
ছুটিয়াছে স্থূল পশু, তীব্র তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক-নখরে
আর মূঢ় বাহু বলে প্লাবিয়াছে রুধির-সাগরে
জয় করিয়াছে মহী,—সে প্রেমেরে করিনু প্রণাম।
বিচিত্র সে বর্ণলেখা—সে কাহিনী রয়েছে উজ্জ্বল।

কিন্তু নারী—কোথা তুমি ? যেথা তুমি হয়েছ দুর্ভর,
যেথা তুমি বন্দী আছ বিক্ষুব্ধ ভোগের আয়তনে
অথবা মুছিয়া গেছ পুরুষের তপ্ত চিত্ত হতে
দগ্ধ হয়ে হয়েছ অঙ্গার—মৃত নক্ষত্রের মত
ঘুরিতেছে প্রাণহীন পুরুষের পাশে শ্রান্তিহীনা—
যেথা প্রেম অর্থহীন অবাঞ্ছিত সন্তান-জনন,
জীবনের গলগ্রহ, বিধাতার অসীম আক্রোশ
উদ্যত বজ্রের মত দীর্ণ করে নিষ্ফল জীবন—
হে রমনী, সেথা তব পূর্ণতা কোথায় ? কবি জাগে,
সে প্রেম জাগে না আজ—জাগে প্রেম, অক্ষয় অমর।

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

ছয়

পল এসে টেবিলের কাছে বসল, টেবিলের উপর সকালের খাবার সাজান হয়েছিল। তার পাশের চেয়ারে টুপিটা খুলে রাখলে। তার মা যখন তাকে কফি ঢেলে দিতে গেলেন, সেই সময়ে সে আস্তে আস্তে খুব নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, সে চিঠিখানা দেওয়া হয়েছে?"

মা মাথা নেড়ে, ইসারায় রান্নাঘরের দিকে দেখালেন, ভয়, পাছে অ্যান্টিয়োকাস শুনে ফেলে সব কথা।

"কে ওখানে?"

"অ্যান্টিয়োকাস"।

পল ডাকলে, "অ্যান্টিয়োকাস"। এক লাফে বালক তার টুপিটা হাতে করে, তার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন একজন ছোট সৈনিক, আদেশ শোনবার অপেক্ষায়। "শোন অ্যান্টিয়োকাস, তুমি এখনি গির্জ্জেয় ফিরে গিয়ে, সব ঠিক-ঠাক করে নাওগে, শেষ সময়ের জন্য যা-কিছু দরকার তা নিয়ে যাবে।

আহ্লাদে অ্যান্টিয়োকাসের একেবারে কথা যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। আর তাহলে তিনি তার ওপর রাগ করে নেই। আমাকে ছাড়িয়ে আর আমার জায়গায়, অন্য কোন ছেলেকে তিনি তা'হলে নেবেন না।

"একটু দাঁড়াও, তুমি কিছু খেয়ে নিয়েছ?"

"সে কিছুতেই খাবে না, ওই খানে বসে ছিল, কিছুই খাবে না।"

পল আদেশ করলে, "বোস এখানে, নিশ্চয় খাবে। মা ওকে কিছু খেতে দাওত।"

অ্যান্টিয়োকাস এই প্রথম যে পাদরী সাহেবের টেবিলে বসে একসঙ্গে খাচ্ছে, তা নয়। কোন রকম লজ্জা না করে সে একেবারে বসে পড়ল, যদিও তার বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছিল। সে যেন বুঝতে পারছিল, মনে মনে জানতে পারছিল যে, তার অবস্থার কিছু বদল হয়ে গেল। পাদরী সাহেব ঠিক আগের মত কথা বলছেন না, একটু যেন তফাৎ মনে হচ্ছে। কেমন করে, বা কেন যে তা হচ্ছে, তা সে ঠিক ধরতে পারছে না, কিন্তু কিছু বদল যে হয়েছে, এটা সে বুঝতে পারছে, একটা ভয় ও আনন্দের সঙ্গে সে পলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার মনে হল, সে যেন পলকে এই প্রথম দেখছে। ভয় ও আনন্দ, তার সঙ্গে নতুন কত ভাব জড়ো হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞতা, আশা, গর্ব্ব, কত কি ভাবে তার বুক ভরে উঠল, যেন একটা বাসা-ভর্ত্তি নতুন পাখীর ছানা এই সবে ডানা ছাড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে।

"তারপর ছুটোর সময় তোমার পড়া নেবার জন্য আসবে। ল্যাটিন ভাষার জন্যে এখন থেকে ভাল করে তৈরী হতে হবে। একখানা নতুন ল্যাটিন ব্যাকরণের জন্যে আমি লিখে পাঠাব, আমার সেখানা একেবারে একশ বছরের পুরোনো।"

অ্যান্টিয়োকাসের খাওয়া থেমে গেল। তার মুখ যেন লাল হয়ে উঠল। কেন বা কি কারণে তার কোন খোঁজ না নিয়েই সে কাজ করবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করলে। পাদরী সাহেব তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর মুখখানা জানালার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে গাছগুলো হাওয়ায় দুলে উঠছে। তার মন ও চিন্তা তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

অ্যান্টিয়োকাসের হঠাৎ মনে হল, যেন তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মনটা একেবারে যেন দমে গেল। টেবিলের ওপরের কাপড় থেকে রুটীর গুঁড়ো গুলো ঝেড়ে ফেলে দিলে, ঝাড়নখানা ভাল করে পাট করে রেখে, সে পেয়ালাগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল। সেগুলো ধুয়ে ঠিক করে রাখতে সে প্রস্তুত, আর সে কাজ সে ভালই পারত, কেননা তার মায়ের মদের দোকানে সে গেলাস ধুয়ে-মুছে রাখতে বেশ অভ্যস্ত ছিল: কিন্তু পাদরী সাহেবের মা তা কিছুতেই করতে দেবেন না।

তাকে ঠেলে দিয়ে, চুপি চুপি মা বললেন, "তুমি এখন গির্জ্জেয় যাও আর ঠিক করে নাওগে।" সে তখনি বেরিয়ে গেল, কিন্তু গির্জ্জেয় যাবার আগে সে ছুটে বাড়ী গিয়ে তার মায়ের কাছে বললে বাড়ীঘর সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে—পাদরী সাহেব আসছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

এর মধ্যে পাদরীর মা আবার ঘরে ফিরে গেলেন। একখানা খবরের কাগজ সামনে ধরে পল তখন পর্য্যন্ত বসে ছিল। সাধারণতঃ সে যখন বাড়ীতে থাকে তখন নিজের ঘরেই থাকে, কিন্তু আজ সকালে সে ঘরে যেতে যেন মনে মনে তার ভয় হচ্ছে। সে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল বটে, কিন্তু তার মন ছিল একেবারে অন্যদিকে। সে সেই বুড়ো মর-মর যে শিকারী তার কথা ভাবছিল, পাপদেষণার সময়ে সে তার কাছে স্বীকার করেছে যে, সে যে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, তার কারণ, 'মানুষ হ'ল একেবারে মূর্ত্তিমান পাপ'। লোকে তাকে রহস্য করে বলত রাজা, যেমন ইহুদীরা ঠাট্টা করে ঈশাকে বলত ইহুদীদের রাজা। কিন্তু পলের সে বুড়ো মানুষের পাপদেষণার ওপর বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না; তার চিন্তা খানিকটা ফিরে গিয়েছিল অ্যান্টিয়োকাসের দিকে, তার বাপ-মার দিকে। সে মনে করছিল যে, সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা সত্যি মনে বিচার করে দেখেছে কিনা। তারা যে অ্যান্টিয়োকাসকে তার খেয়ালমত চলতে দিচ্ছে, তার এই না ভেবে-চিন্তে পাদরী হবার যে ঝোঁক, তাতে তারা রাজী হচ্ছে কি ভেবে। কিন্তু এ অতি সামান্য তুচ্ছ কথা: আসল কথা হচ্ছে পল চাইছে যে, সে তার নিজের চিন্তা থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছুতে মন দেয়। যখন তার মা ঘরে এলেন, সে ঘাড়টা নীচু করে

খবরের কাগজ দেখতে লাগল। কেননা পল ঠিক জানে যে, তার মা-ই শুধু জানেন, তার মনে কি হচ্ছে।

সে সেখানে মাথা হেঁট করে বসে ছিল, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তরের জন্য এতক্ষণ তার প্রাণ ছটফট করে উঠছে, সে প্রশ্নকে সে ঠোঁটের ডগায় না আনতে চেষ্টা করছে। চিঠিখানা তা হলে দেওয়া হয়ে গেছে! আর বেশী কি তার এ সম্বন্ধে জানবার আছে? গোরের মুখ চাপা দেবার পাথর গড়িয়ে মুখ চাপা দেওয়া ত' হয়ে গেছে। তবে? কি ভীষণ ভারই না বোঝার মতন তাকে চেপে ধরেছে। কি রকম নিজেকে যেন মনে হচ্ছে। যেন একখানা বড় ভারি পাথরের নীচে নিজেকে গোর দেওয়া হয়ে গেছে।

তার মা টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন। সব জিনিস এক এক করে গুছিয়ে বাসন রাখার জায়গায় রাখলেন। এমন নিস্তব্ধ, এমন শান্ত যে, ঝোপের ভেতর পাখীরা কিচির-মিচির করছে শোনা যায়, পথের ধারে মজুরেরা পাথর ভাঙছে, ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যায়। মনে হচ্ছে যেন: পৃথিবীর শেষ হয়ে এল। এই ছোট সাদা ঘরে মানুষের বুঝি আজই শেষ বাস করা। ঘরের সেকেলে, পুরোনো কালো-হয়ে-যাওয়া আসবাবে, তার টালিপাতা মেঝেতে, উঁচু জানালা দিয়ে সবুজ ও সোনালি রঙের আলো এসে পড়েছে। দেখাচ্ছে যেন, জলের ওপর আলো কাঁপছে। সবটা•করে তুলেছে যেন একটা অন্ধকার কেল্লার ভেতরে একটা কারাকক্ষ।

পল কফি পান করলে, বিস্কুট খেলে—যেমন খায়। তারপর সে দূর পৃথিবীর খবর কাগজে পড়তে লাগল। বাইরে থেকে এটা মনেই হয় না যে, আজকের এ দিনটা অন্য দিনের থেকে কিছু তফাৎ। কিন্তু তার মা চান যে, সে আগের মত তার ঘরে চলে যায় এবং দরজা বন্ধ করে। তবে কেন? সে যে এখানে এখনও বসে রয়েছে, সে কি জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কি খবর? কাকে তিনি চিঠিখানা দিয়ে এলেন? একটা পেয়ালা হাতে করে তিনি রান্নাঘরের দরজার কাছে গেলেন, আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন।

"পল, আমি নিজে হাতে করে সে চিঠি তাকে দিয়ে এসেছি। সে তখন উঠে, কাপড়-চোপড় পরা শেষ করে, বাগানে এসেছিল।"

খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই পল বললে, "বেশ ভাল।"

কিন্তু তিনি ত' তাকে ছেড়ে যেতে পারেন না, তিনি মনে করলেন, তাঁকে কথা কইতেই যে হবে। তাঁর নিজের ইচ্ছার চেয়েও একটা জোরাল ইচ্ছা তাঁকে বাধ্য করলে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি যে পেয়ালাটা হাতে করে ধরেছিলেন, তাতে যে একটা জাপানী ছবি আঁকা ছিল, তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। রঙে খানিক দাগ ধরে গেছে। কফির রঙ কালো হয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁর গল্প বলতে সুরু করলেন।

"সে তখন বাগানেই ছিল, সে খুব সকাল-সকালই ঘুম থেকে ওঠে। আমি সোজা গিয়ে বরাবর, তার হাতেই চিঠিখানা দিলাম, কেউ দেখতে পায় নি। সে চিঠিখানা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমার দিকে ফিরে দেখলে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে চিঠিখানা খোলে নি। আমি বললাম, 'কোন জবাব নেই?' 'আমি ফিরে আসছি', সে বললে, 'একটু অপেক্ষা করুন'। সে চিঠিখানা খুলে দেখলে, যেন আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তার মুখ সাদা কাগজখানার মত সাদা হয়েই গেল। তারপর সে আমায় বললে, "আপনি যান, ভগবান আপনার সঙ্গে থাকুন!"

"যথেষ্ট হয়েছে, থাক" সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। তখনও কাগজ থেকে মুখ তুললে না। মা কিন্তু বেশ দেখতে পেলেন যে, তার চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ নীচু করে আছে, তার মুখখানাও এ্যাগনিসের মুখের মত সাদা হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁর মনে হল, পল বোধ হয় ভিরমি গেল, ধীরে ধীরে তার মুখে আবার রক্তের আভা ফুটে উঠল। মা তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এ সব অতি ভয়ানক মুহূর্ত্ত। তা বলে কি হবে। সাহসের সঙ্গে এদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তিনি মুখ খুলে কিছু যেন বলতে গেলেন, অন্তত এটুকু বলতে চাইলেন, "দেখ তোমার কাজ, কি করেছ তুমি। কি পরিমাণ আঘাত তুমি নিজে পেলে আর তাকে দিলে।" সেই মুহূর্ত্তে সে মুখ তুলে তাকালে। ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পিছনের দিকে নিয়ে গেল, যেন মনের পাপ-ইচ্ছাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। রাগে আগুনের মত তাকিয়ে, অতি রূঢ় ভাবে তার মাকে বললে—"যথেষ্ট হয়েছে। শুনতে পাচ্ছ তুমি? যথেষ্ট হয়ে গেছে, এ সম্বন্ধে আমি আর কোন কথাই শুনতে চাইনে। তা যদি না হয়, তবে কাল রাত্তিরে তুমি আমাকে যে ভয় দেখিয়েছিলে, আমি তাই করব; আমি চলে যাব।"

তারপর সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। নিজের ঘরে না গিয়ে একদম আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তার মা রান্নাঘরে চলে গেলেন, পেয়ালাটা তাঁর হাতে তখনও কাঁপছে; টেবিলের ওপর সেটাকে রাখলেন। আগুনের জায়গাটার কোণে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একেবারে যেন ভেঙে পড়েছেন।

তিনি জানেন, বুঝতে পারলেন, তাঁর ছেলে জন্মের মতই চলে গেল। যদি সে আবার ফিরেও আসে, সে আর তাঁর আগের পল থাকবে না। থাকবে একটা হতভাগ্য প্রাণী, পাপ-কামনার দায়ে জর্জ্জরিত, তার কামনার পথে এসে যে দাঁড়াচ্ছে তার দিকে রক্ত চোখে তাকাচ্ছে—যেন একটা চোর, চুরির জন্যে চুপ করে অপেক্ষা করছে।

পলও যেন সত্যি ঠিক তেমনি ভয় পেয়ে তার বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। পাছে তার নিজের ঘরে যেতে হয় বলে, সে একেবারে ছুটে বেরুল। কারণ তার মাথার ভেতর এই ভাব জেগে উঠল যে, হয়ত এ্যাগনিস চুপি চুপি লুকিয়ে তার ঘরে ঢুকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে, তার সেই সাদা ফ্যাকাসে মুখ, তার হাতে সেই পলের চিঠি। সে বাড়ী থেকে সরে গেল, তার কারণ সে নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চাইছিল। ঝড় যেমন গত রাত্রে তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল, আজ তাকে তার পাপ-কামনা ঝড়ের চেয়েও জোরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

কোন বিশেষ লক্ষ্য না রেখে সে ছুটে মাঠটা পেরিয়ে গেল। যেন সে একটা জড় পদার্থ, পাথরের সামিল, এ্যাগনিসের বাড়ীর দেয়ালে তাকে তার

দেহশুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেই জোরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ধাক্কা খেয়ে ফিরে ছিট্‌কে এসে পড়েছে এত দূরে, এই গির্জ্জের চৌমাথার মোড়ে, যেখানে বুড়োরা, ছেলেরা, আর ভিখিরীরা নীচু পাঁচিলের ধারে সারাদিন বসে থাকে। সে ঠিক জানে না যে কি করে সে এখানে এসে পড়ল। পল সেখানে একটু দাঁড়াল, তাদের কথায় কোন কান না দিয়েই, তাদের সঙ্গে শুধু দুচারটে কথা কয়ে, সোজা খাড়া রাস্তায় নেমে গেল—গ্রাম থেকে যে পথটা উপত্যকার দিকে চলে গেছে। যে পথে সে যাচ্ছিল, তার কিছুই দেখলে না, উপত্যকার দৃশ্য তার চোখে পড়ল না। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একেবারে উল্টো হয়ে গেছে। সব যেন কতকগুলো পাহাড় আর ধ্বংসস্তূপে একাকার, যার ওপরে দাঁড়িয়ে সে দেখছে—যেমন বালকেরা পাহাড়ের চূড়োর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে নীচের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখে।

সে ফিরল, আবার ফিরে গির্জ্জের যাবার পথে উঠল। গ্রামখানা থেকে সবাই যেন চলে গেছে, এখানে-সেখানে দুএকটা পীচ ফলের গাছ, একটা বাগানের পাঁচিলের ধারে ধারে তার পাকা ফল ঝুলছে দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা সাদা মেঘের টুকরো শরতের আকাশের বুকে ভেসে ভেসে চলেছে, যেন একপাল শান্ত ভেড়া। একটা বাড়ীতে একটা ছেলে কাঁদছে, আর একটা বাড়ী থেকে তাঁত বোনার মাকুর শব্দ সমান তালে শোনা যাচ্ছে। গ্রামের যে রক্ষক, অর্দ্ধেক রক্ষক, অর্দ্ধেক পুলিশ, যার হাতে গ্রামের শান্তির ভার দেওয়া, সে জায়গায় শুধু সেই একমাত্র সরকারী কাজের লোক, বেড়াতে বেড়াতে সেই পথ দিয়ে আসছে, সঙ্গে তার সেই প্রকাণ্ড কুকুর, চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা, হাতে ধরে রয়েছে। তার পোষাকটা পাঁচ-মিশালি। একটা রঙ-জ্বলে-যাওয়া মখমলের সঙ্গে নীল মখমলের শিকারী জ্যাকেট, সরকারী উর্দ্দীর লাল ডোরাকাটা পায়জামা, আর তার কুকুরটা একটা অতি প্রকাণ্ড কাল-আর-লাল-মেশান রঙের জানোয়ার, চোখগুলো রক্তের মতন টকটকে, খানিকটা নেকড়ে বাঘ, খানিকটা যেন সিংহ। সবাই সে কুকুরটাকে জানে, সবাই সেটাকে ভয় করে, গ্রামের লোকেরা ও চাষারা, রাখালরা ও শিকারীরা, চোরেরা ও ছেলেরা—সবাই। রক্ষক সে কুকুরটাকে দিবারাত্র কাছেই রেখে দেয়, তার বিশেষ ভয় পাছে কেউ তাকে বিষ খাইয়ে দেয়। পাদরী সাহেবকে দেখে কুকুরটা একবার গোঁ-গোঁ করে গর্জ্জে উঠল। কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে সাড়া পেয়ে, সে মাথাটা নীচু করে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

পাদরী সাহেবের সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। সৈনিকের মত কুর্ণিশ করলে. তারপর গম্ভীর ভাবে বললে,—"আমি খুব ভোরে সেই রোগীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার গায়ের তাপ চল্লিশ, আর নাড়ীর গতি একশ কুড়ি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হল যে, তার মেরুদণ্ডের নীচেটা আউরে উঠেছে, তার নাতনী আমায় বললে যে, কুইনাইন দাও।" গ্রামের জন্য যে সব ওষুধ-পত্তর যোগান হয়, রক্ষকের হাতে তার ভারও থাকে। সে নিজে ঘুরে গ্রামের রোগীদের দেখে আসে, তার নিজের যে সব কাজ আছে, এ কাজ তার বাড়তি। সেই জন্যে সে নিজেকে খুব একটা কেজো দরকারী লোক বলে মনে করে। গ্রামে যে ডাক্তার আসে, সে ত' শুধু সপ্তাহে দুবার করে আসে। রক্ষক মনে করে, যে সে সেই ডাক্তারের জায়গাই এক রকম অধিকার করে আছে।—"কিন্তু আমি তাকে বললাম, "শান্ত হও মা, আমার বোধ হচ্ছে, তার কুইনাইনের কোন দরকার নেই, দরকার তার অন্য ওষুধ। মেয়েটা কাঁদতে লাগল, কিন্তু তার চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও পড়ল না। আমি যদি ভুল বিচার করি, তবে এখুনি যেন আমার মরণ হয়। সে চায় যে, আমি ছুটে গিয়ে এখুনি ডাক্তারকে ডেকে আনি। কিন্তু আমি বললাম, ডাক্তার ত' কাল সকালেই গ্রামে আসছে, কাল রবিবার, আর যদি তোমার এতই তাড়া বলে মনে হয়, তবে তুমি নিজে একজন লোককে পাঠাও। রোগীর টাকা আছে, সে স্বচ্ছন্দে ডাক্তারের টাকা দিয়ে মরতে পারে, সে ত' জীবনে কখনও একটা পয়সা খরচ করে নি। আমি ঠিক বলেছি, বলিনি ঠিক ?"

রক্ষক এই কথা বলে পাদরী সাহেবের সম্মতির জন্যে গম্ভীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু পল শুধু কুকুরটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার প্রভুর আদেশে সে একেবারে শান্ত আর নিরীহভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে নিজের মনে নিজেই ভাবতে লাগল।

"এমনি করে যদি আমরা আমার পাপকামনাকে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখতে পারতাম।" তারপর সে বেশ জোর গলায় বললে, কিন্তু একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে, "হ্যাঁ! হ্যাঁ, নিশ্চয়। কাল সকালে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তার বড় বাড়াবাড়ি অসুখ, তা আর কি।"

"ভাল, তাহলে, সত্যি সত্যিই যদি তার বড় বাড়াবাড়ি অসুখ হয়ে থাকে—রক্ষক গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে জেদের সঙ্গে বলতে লাগল। পাদরীর একথায় যে একটু শ্লেষ সে না করলে তা নয়। বললে, "তাহলে একজন লোক এখুনি ডাক্তারকে ডেকে আসুক, তা হলেই ত ভাল হয়। সে বুড়ো যখন টাকা খরচ করতে পারে, সে ত' ভিখিরী নয়। কিন্তু তার নাতনী আমার কথা একেবারে অমান্য করলে, আমি নিজে হাতে ওষুধ তৈরী করে দিয়ে সেখানে রেখে এলাম, সে তাকে সে ওষুধ খাওয়ালে না।"

"সব আগে তার ধর্ম্ম-উপদেশ নেওয়া কর্ত্তব্য", পল বললে।

"কিন্তু আপনি ত বলেছেন যে রুগ্ন লোক উপবাস না করেও ধর্ম্ম-উপদেশ নিতে পারে।"

পল শেষে একেবারে ধৈর্য্য হারালে। বললে—"ভাল মনে হচ্ছে, তা হলে সেবুড়োর ওষুধের কোন দরকারই নেই। সে তার দাঁত কড়মড় করছিল, এখনও দাঁত তার খুব শক্ত রয়েছে। এমন শক্ত করে কামড়ে ধরছিল, যেন তার কিছুই হয় নি।"

"আর তার নাত্‌নী, আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে"—রক্ষক অবজ্ঞার সঙ্গে বলে যেতে লাগল—"তার নাত্‌নীর কোন অধিকার নেই. আমাকে হুকুম করার। আমি একজন সরকারী নোকর, ডাক্তারের জন্যে ছুটে যাব, আমি যেন তার চাকর। এটা কিছু একটা হঠাৎ কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা নয় যে, ডাক্তারের সেখানে থাকা একেবারে নিতান্তই দরকার, আর আমার ত'

আরো সব কাজ আছে। আমাকে এখুনি পার হয়ে নদীর দিকে যেতে হবে, আমার কাছে খবর এসেছে যে, কে একজন সেখানে জলের তলায় ডিনামাইট পুতেছে, কাতলা মাছ মারবার জন্যে। আমি চললাম, নমস্কার।"

সে আবার সেই সৈনিকদের মত একটা কুর্ণিশ করে, কুকুরের গলার চামড়ায় এক টান দিয়ে নিয়ে, ধাঁ করে চলে গেল। কুকুরটা তার প্রভুর চাপা ঘৃণার ভাগ নিয়ে, তার সেই ভয়ানক ল্যাজ নেড়ে এগিয়ে চলে গেল। পাদরী সাহেবের দিকে চেয়ে আর গোঁ-গোঁ করলে না বটে, শুধু একবার, তার জ্বলজ্বলা চোখের বীভৎস চাহনি দিয়ে বিদায়ের দৃষ্টি হেন গেল।

ওদিকে বুড়ো লোকটার জন্যে চরম-কালে মাথাবার সুগন্ধ তেল ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে সব তোড় জোড় শেষ করে, অ্যান্টিয়োকাস ঝাউগাছের তলায় চৌমাথার ধারে পাঁচিলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাদরী সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছে। যখন দেখতে পেলে যে, পাদরী সাহেব আসছেন, তখন দৌড়ে একেবারে গির্জ্জের ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে পাদরীর পোষাক বার করে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দুজনে কয়েক মিনিটের ভিতরই প্রস্তুত হয়ে চলল। পল তার পাদরীর পোষাক আর গলা থেকে ঝোলান পৃষ্ঠ-বস্ত্র পরে, দুটো হাতল-দেওয়া রূপোর পাত্রে তেল নিয়ে, আর অ্যান্টিয়োকাস মাথা থেকে পা অবধি ঝোলা লাল পোষাকে একটা সোণার ঝালর দেওয়া সোনার পাড় বসান ছাতা পলের মাথায় ধরে পথ দিয়ে চলল। পল আর তার রূপোর পাত্র রইল ছায়ায় ঢাকা, আর রোদের আলোয় বালকটিকে দেখাতে লাগল খুব ঝকমকে। পাদরী সাহেবের সাদা রঙ আর কাল পোষাকের পাশে আলো ও ছায়ার খেলা বেশ ফুটে উঠল। অ্যান্টিয়োকাসের মুখখানা দুঃখের মাধুর্য্যে যেন গম্ভীর, কেননা সে নিজের ওজনটা খুব বেশী অনুভব করছিল, যেন সেই হল এই পবিত্র তেলের রক্ষক। এসব সত্ত্বেও যখন সেই ছোট শবযাত্রা পথ দিয়ে চলল, তখন বুড়ো লোকেদের সেই হুড়মুড় করে পাঁচিল থেকে গড়িয়ে পড়া দেখে, অ্যান্টিয়োকাস তার দাঁতবার-করা হাসি থামাতে পারেনি। ছেলেরা হাঁটু গেড়ে পড়ল দেওয়ালের দিকে মুখ করে, পাদরীর দিকে ফিরে নয়। ছোঁড়ারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তার পিছু-পিছু চলল। অ্যান্টিয়োকাস প্রত্যেক বাড়ীর দরজার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাদের সাবধান করে দেবার জন্যে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলল। কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করছে। তাঁত বোনার শব্দ থেমে গেল, মেয়েরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এল, সারাটা গ্রাম যেন একটা মহা রহস্যের উত্তেজনায় নেচে উঠেছে।

একটি স্ত্রীলোক ঝরণা থেকে কলস করে জল নিয়ে আসছিল, পথে জলের কলসী নামিয়ে, তার পাশে হাঁটু গেড়ে রইল। পাদরী সাহেব একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন, কেন না তিনি চিনতে পারলেন, এ এ্যাগ্‌নিসের চাকরাণী। একটা অজানা ভয় যেন তাকে আঁকড়ে ধরলে। অজানতে সে সেই হাতলওয়ালা রূপোর পাত্রটা জোরে চেপে ধরলে, তার দু-হাত দিয়ে, যেন সেখানেই একটা ঠেকনা তার চাই, নইলে হয়ত যায় বুঝি পড়ে।

ক্রমে যতই তারা সেই পুরোনো শিকারীর বাড়ীর কাছে আসতে লাগল, ততই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের দল ভারি হতে লাগল। এটা একটা দোতালা বাড়ী, এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়ে গাঁথা, বাড়ীটা রাস্তা থেকে একটু তফাতে উপত্যকা ঘেঁসে। বাড়ীটায় শুধু একটা কোয়া-কাঠের জানালা', সামনে একটা মেঠো উঠান, ছোট নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা একেবারে খোলা। পাদরী সাহেব জানতেন যে, বুড়ো মানুষটা পুরো পোষাক পরে নীচের ঘরের মাদুরে শুয়ে আছে। কাজেই তিনি রোগীকে শোনাবার জন্য প্রার্থনা করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। অ্যান্টিয়োকাস ছাতা বন্ধ করে খুব জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগল, ছেলেদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে, তারা যেন সব মাছি। কিন্তু ঘর ত' খালি পড়ে, মাদুরেও ত কেউ শুয়ে নেই। হয়ত বুড়ো মানুষ শেষ অবস্থায় বিছানায় গিয়ে শুতে রাজী হয়েছে, অথবা মরণ কাছে দেখে তাকে বিছানায় তুলে শোয়ান হয়েছে। পাদরী একটা দরজা ঠেলে ভিতরের ঘরে গেল। একি, সে ঘরও খালি! সেখান থেকে দেখতে পেলে যে, বুড়োর নাতনী খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তা দিয়ে আসছে, তার হাতে একটা কিসের শিশি। সে ওষুধ আনতে গিয়েছিল।

মেয়েটি বাড়ীতে ঢোকবার সময় বুকে দুহাত দিয়ে ক্রুশের ভঙ্গী করলে। পল জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ঠাকুরদাদা কোথায়?"

সে সেই খালি মাদুরের দিকে তাকিয়ে, ভীষণ চীৎকার করে উঠল। যত সব কৌতূহলী ছেলের দল ঝাঁকের মত একেবারে পাঁচিলের ধারে উড়ে এল। দরজার কাছে এসে, তারা অ্যান্টিয়োকাসের সঙ্গে হাতাহাতি বাধিয়ে দিলে। কেননা সে তাদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল। পল তখন তাদের এক ধমক দিতে তবে তারা সরে গেল।

"কোথায় তিনি? কোথায় তিনি?" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এ ঘর থেকে ও-ঘরে মেয়েটি ছুটোছুটি করতে লাগল। একটি ছেলে তখন এগিয়ে এল, সে সবার শেষে এসেছে, দুটো হাত তার জামার পকেটে রেখে বললে,

"তুমি কি রাজাকে খুঁজছ? সেত ওই নীচে নেমে চলে গেছে।"

"নীচে কোথায়?"

"নীচে হোথায়।" বলে তার নাক এগিয়ে দিয়ে উপত্যকার দিকে দেখিয়ে দিলে।

মেয়েটি সেই খাড়াই পথে ছুটে গেল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার পিছনে ছুটল ছেলের দল। পাদরী সাহেব অ্যান্টিয়োকাসকে হুকুম দিলেন, ছাতা খুলতে। তখন নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে তারা দুজনে গির্জ্জেয় ফিরে এল। গ্রামের লোকেরা দলে দলে এক এক জায়গায় জটলা করতে লাগল। লোকের মুখে মুখে এই রোগীর পালানর কথা চারিধারে ছড়িয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক:—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

পুলিশ

—শ্রীসুবোধ বসু

সীতেশবাবু কলেজের অধ্যাপক। গো-বেচারী মানুষ, কারুর সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে সে অত্যন্ত নিরামিষ প্রকৃতির লোক, হৈ-চৈ হল্লা পছন্দ করে না, ঝগড়ায় রুচি নাই, এবং সে যেটা বোঝে সেটাই যে নির্ভুল, আশ্চর্য্য বলিতে হইবে, এমন ধারণাও তার নাই। নিজে পড়ে, ছাত্রদের পড়ায়, খায়, বেড়াইতে যায়, স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে দুদণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করে, তার কার্য্য-তালিকার এইখানেই ইতি। অত্যন্ত সহজ এবং সচ্ছন্দ-গতিতে তার জীবন-প্রবাহ চলিয়াছে। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, উত্তেজনা, আশঙ্কা ও উদ্বেগ এসব আসিয়া কোনো রূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই।

বাড়ি ফিরিতে সীতেশবাবুর সেদিন সন্ধ্যা হইল। সেটা স্বাভাবিক নয়,—বিকাল-বিকাল সে বাড়ি ফেরে। তারপর চা পান করিয়া কখনো কখনো ময়দানে হাওয়া খাইতে যায়। আজ আসিয়াই সে কাপড়-জামা না ছাড়িয়া ডেক্-চেয়ারটায় এলাইয়া পড়িল। চক্ষু বুজিয়া রহিল এবং কিছু যে ভাবিতেছে সেটার সম্বন্ধে তার কপালের রেখা দেখিয়া আর সন্দেহ রহিল না।

স্ত্রী সুষমা আসিয়া কহিল, আজ এত দেরি যে? হাত পা ধুয়ে এস, চা নিয়ে আসছি।

তবু সাড়া নাই।

সুষমা ভুরুদুটি আকুঞ্চিত ও পক্ষ্ম ঊর্দ্ধায়িত করিয়া কহিল, আবার কি হল আজকে?

এবার সীতেশ চোখ মেলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু তবু নিরুত্তর।

পরিহাসতরল কণ্ঠে সুষমা কহিতে লাগিল, কি গো, ব্যাপার যে রীতিমত গুরুতর মনে হচ্ছে। রিট্রেঞ্চ্‌মেণ্ট? মাইনে রিডাক্‌শান্? তর্কে পরাজয়? ছেলেদের দৌরাত্ম্য, বাস্-কণ্ডাক্টরের দুর্ব্যবহার, পকেট-কাটা, প্রেমে পড়া, না—

সীতেশ গম্ভীরস্বরে কহিল, আঃ, কি যে বলছ!

"তবে, তবে কি? চোখ আবার খারাপ হয়েছে নাকি?"

"দেখ, পরিহাসের বিষয় নয়—"

"তা ক্রমেই বুঝতে পারছি, কিন্তু বিষয়টা কি?"

সীতেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দু-তিনবার চোখ বুজিয়া চিন্তা করিয়া, নিঃশব্দে কখনো বা আঙুল দিয়া চেয়ারের হাতল বাজাইয়া, সহসা একবার সশঙ্কভাবে প্রশ্ন করিল,—দেখ, ওই রাস্তার মোড়ে—বুঝতে পেরেছ—কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ?

সুষমা কহিল, হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি, রাস্তার মোড়ে গণ্ডা-গণ্ডা লোক দাঁড়িয়ে থাকে।

হতাশ হইয়া সীতেশবাবু কহিল, আঃ তা নয়। বলি, এ-বাড়ির দিকে নজর রাখছে বলে কাউকে মনে হয়েছে?

"নজর? কেন, এ বাড়ির ওপর আবার নজর রাখতে যাবে কেন? বাইরে থেকে ভেতরে অনেক টাকা আছে বলে মনে হয় নাকি?"

গম্ভীর হইয়া সীতেশ কহিল, শুনছ, এ পরিহাস করার বিষয় নয়। এই মাত্র বড় খারাপ খবর শুনে এলাম।

সুষমা কহিল, খবরটাই শুনি না। ডাকাতি-টাকাতির খবর নাকি? পাড়ার এক বাড়িতে বেনামী চিঠি এসেছিল, শুনেছিলাম।

সীতেশ কহিল, ডাকাত নয়।

"তবে?"

সীতেশ একবার চারিদিক সভয়ে চাহিয়া দেখিয়া গলার সুর নামাইয়া কহিল, পুলিশ!—এ-বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

সুষমা কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না। পুলিশের কাছে আদরণীয় হইতে পারে এমন কিছুই সে তাদের বাড়িতে খুঁজিয়া পাইল না,—এমন কি বড় দেখিতে একটা ছেলেও এ-বাড়িতে নাই। কিন্তু তা হইলে কি হয়,—সীতেশ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। তার এতক্ষণে মনে পড়িয়াছে, সন্দেহ-জনক দেখিতে একটা লোক কলেজে যাইবার সময় ও-বাড়ির নিকট হইতে তার পিছু নেয়, এই মাত্র বাড়ি ঢুকিবার সময় একটা কুলপি-বরফ-আলাকে অহেতুক বার বার বাড়ির চারপাশে ঘুরিতে দেখিতে পায়। তাছাড়া তাকে দেখাইয়া

একটা ভদ্রচেহারার লোক একটা নোঙরা দেখিতে মানুষকে চোখে ইসারা করিয়াছিল। সীতেশবাবুর সন্দেহ ক্রমেই গাঢ় হইতে লাগিল।

সুষমা কহিল, কি যে বল, পুলিশের আর কাজ নেই, তোমার ওপর নজর রাখতে গেল।

সীতেশ বিজ্ঞের মত কহিল, জান না তো, ওরা সবই পারে।

"ওম্‌নি যার তার পেছনে লাগে, না। ছাই করে,"

সীতেশ কহিল, ওদের কি, একটু গন্ধ পেলেই হয়। গেল মাসে স্বদেশী-প্রদর্শনী খোলবার সময় দিশী জিনিষ পরতে সবাইকে উপদেশ দিয়েছিলাম।

সুষমা কহিল, তার কি ?

সীতেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, আরে কী মুস্কিল, বলছি ওতেই ওদের যথেষ্ট।

সহসা সীতেশ উঠিয়া পড়িয়া জানালার গরাদের ফাঁকে নাক বাহির করিয়া গভীর মনোযোগে রাস্তার মোড়ে কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর সুষমাকে সহসা ডাকিয়া কহিল, দেখে যাও তো, ঐ বড় জটা-আলা লোকটাকে কেমন কেমন মনে হচ্ছে না ?

সুষমা আগাইয়া গেল। কহিল, কোন্‌টা আবার ?

"ঐ যো, জটা..."

"ওঃ, ও তো আমাদের মুদির বড় ভাই,—একটু মাথা-পাগলা গোছের লোক।"

"হাঃ, মুদির ভাইকে আর আমি চিনি না", বলিয়া সীতেশ গিয়া আবার ডেক্-চেয়ারে এলাইয়া পড়িল।

সুষমা একটুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল, যত আজগুবি কাণ্ড, নিজের বয়েস ভুলে গেছ বুঝি ? পুলিশের সন্দেহের যোগ্য হতে হলে বয়স আরো ঢের কমাতে হবে। বস তুমি, আমি চা নিয়ে আসছি, কেমন ?

সীতেশ শুধু কহিল, নীচের দরজা বন্ধ আছে ?

"নীচের ঘরে যে ছেলেরা পড়ছে বসে।"

"তা হোক, রামাকে ডেকে বলে দাও, নীচের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিক্। ছেলেরা সব আজ ওপরেই এসে পড়ুক।"

উপায়ান্তর নাই। নীচের ঘরের দরজা বন্ধ হইল এবং ছেলেরা ওপরের শুইবার ঘরে আসিয়া সশব্দে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল।

সুষমা পাশের ঘরে কলে জামা সেলাই করিতেছিল। সীতেশ এ-ঘরে বসিয়া নিঃশব্দে ভাবিতেছিল। ডাকিয়া কহিল, ওগো শুন্‌ছ ?

ও-ঘর হইতে জবাব আসিল, কি, বল।

প্রায় বিরক্তির সুরেই সীতেশ কহিল, বলি সেলাইটা আজ রাখই না ছাই।

স্মিত মুখে সুষমা আসিয়া উপস্থিত হইল। সীতেশ তাকে কোন রকম সম্ভাষণ করিল না। চুপ করিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। তারপর একবার অত্যন্ত সহসা প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ, দেখ, সেবার দার্জ্জিলিং থেকে যে-কুক্‌রীটা কেনা হয়েছিল, কোথায় সেটা ?

"রান্না ঘরে,—ওটা দিয়েই তো পেঁয়াজ কাটা হয়।"

"দেখ, ওটা বাড়িতে রাখা আর আমি কোনমতেই নিরাপদ মনে করছি না।"

সুষমা না হাসিয়া পারিল না। কহিল, ওটাতে যে মর্‌চে ধরে গেছে,—পেঁয়াজই যে ভালো করে কাটে না !

সীতেশ কহিল, তা হোক্,—যাও তো, চট্ করে নিয়ে এস তো সেটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেঁয়াজ কাটিবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রটা বাড়ি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সুষমা ভাবনায় পড়িল, এবং সীতেশ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু তৃপ্তি বেশিক্ষণের নয়,—সীতেশ আবার জানালার কাছে আগাইয়া গেল। এবার একটা লোককে নাকি সন্দেহজনক ভাবে বাড়ির দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখা গেল। কাজে কাজেই হুকুম হইল, রাস্তার দিকের সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক্।

সুষমা কহিল, কি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ,—ছেলেমানুষের মতন।

সীতেশ কহিল, ক্রমেই বুঝতে পারবে, একেবারে ছেলে-মানুষের মত নয়। হয়তো আজ রাত্রেই সার্চ্চ হবে বাড়ি। তারপর প্রায় স্বগতের মত করিয়া কহিল, না ভেবে-টেবে যা-তা করে বসি, তারপর পস্তাই। সেদিন স্বদেশী-প্রদর্শনীতে ও-সব অতটা,—অথচ,—যাক্‌গে ছাই। সীতেশ আর এক বার উঠিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিল।

"দেখ।"

"বল ?"

"তোমার খদ্দরের শাড়িগুলো কোন্ বাক্সটায় ?"

"সে আবার কেন ?"

"একেবারে দু'তিনটে খদ্দরের শাড়ি থাকা সেফ্ নয়। কখনো তো পর না, তবু সবার দেখাদেখি খদ্দর কেনা চাই।"

সুষমা হাসিবে কি বিলাপ করিবে বুঝতে না পারিয়া কহিল, তুমি একেবারে অবাক করলে।

সীতেশ কহিল, ক্রমেই বুঝতে পারবে, তা নয়। হ্যাঁ, দেখ, কাপড়গুলো বের করে আন তো।

সবিস্ময়ে সুষমা কহিল, কেন, পুড়িয়ে ফেলবে না কি ?

"তাতে যদি তুমি রাজী নাই হও, না হয় রামাকে দিয়ে একটা ডাইয়িং-ক্লিনিঙ-এ পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।"

"সেগুলি যে একদম ধোপফেরত।"

"তা হলই বা, দেবার সময় একটু ধূলো, না হয় কয়লার ছাই মাখিয়ে দিলেই খানিক রঙ ফিরবে।"

ফর্শা সাড়িগুলি অনতিবিলম্বেই পিছনের রাস্তা দিয়া এক ধোপাশালায় গিয়ে পৌছিল। কিছুটা নিরাপদ হইয়াছে ভাবিয়া সীতেশ আবার ডেকচেয়ারে গিয়া হেলান দিল। সুষমা খাইতে ডাকিলে সীতেশ কহিল যে, তার মোটেই ক্ষুধা পাইতেছে না—আজ রাত্রে উপোস দেওয়াই সে ঠিক করিয়াছে, অক্ষুধার মধ্যে খাওয়া কিছু নয়।

সুষমা কহিল, আঃ কি করছ বলতো। কে বাড়ির ওপর নজর রাখছে না রাখছে তার জন্য বাড়ির কর্ত্তা খাওয়াই ছেড়ে দিলেন।

গম্ভীরভাবে সীতেশ কহিল, সেজন্য নয়।

"তবে ?"

"হ্যাঁ, দেখ, ব্যায়াম ও কুস্তি সম্বন্ধে কি একটা বই ছিল না? সেটা তো কই দেখতে পাচ্ছি না ?"

"আছে, ঐ ছোট দেরাজটার ওপরে।"

"ওটা বাড়িতে রাখা আমি আর উচিত মনে করছি না।"

সুষমা কহিল, তুমি অবাক করলে।

সীতেশ কহিল, এ বুঝি তুমি জান না যে ডন্-ব্যায়াম এসব পুলিশ খুব সুনজরে দেখে না। উনুনে আগুন আছে তো ?

"আছে, কেন ?"

"পুরানো কতগুলি পলিটিক্সের বইও আছে—বি-এতে পাঠ্য ছিল, একই সঙ্গে...। আর ওসব বই আমার কাজেও লাগছে না, জঞ্জাল যত কমান যায়, ততই ভাল।"

রান্নাঘরের উনুনের অগ্নি পুস্তক ইন্ধন পাইয়া অনেকদিন পরে মুখ বদলাইল। ব্যায়ামের বই, রাজনীতিপুস্তক, আনন্দমঠ, ষ্টাটিক্স ও ডিনামিক্স, দেশের অর্থ, বাঙ্গালীর বল সবগুলিকে ছাইয়ে রূপান্তরিত করিয়া সীতেশ ঠাণ্ডা হইল।

সুষমা কহিল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই। ডাক্তার বাবুকে ডাকাব ?

সীতেশ শুধু অবজ্ঞাভরে একটু তাকাইল, কিছু বলিল না। ভাবখানা এই যে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি আর কত হইবে। এই রকম একটা আসন্ন বিপদে পূর্ব্বাহ্নে না ভাবিলে মূর্খতাই প্রকাশ করা হয়। সীতেশ কিছুতেই খাইতে রাজী হইল না। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, পুলিশের চোখে আপত্তিজনক ঠেকিতে পারে এমন কিছু চোখে পড়ে কি না। বাড়ির চাকর রামার পাকানো লাঠিটা দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, তার চিত্তবিনোদনের জন্য পাঁচ সাতটা কল্‌কে ছিল, শুধু একটা রাখিয়া বাকী সবগুলি সীতেশ রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিল। অগ্নিসম্পর্কীয় জিনিষ যতটা কমান যায়!

এতক্ষণ পরে সীতেশের আর এক কথা মনে পড়িল। দেশী খবরের কাগজ তার বাড়িতে রাখা হয়, পুরাতন কাগজের স্তূপ হয়তো ছাদের চিলে-কোঠায় জমিয়া আছে।

ডাকিল, রামা।

রামা উপস্থিত হইলে তাকে উপদেশ দেওয়া হইল, এই মুহূর্ত্তে কাগজগুলি মুদিকে দিয়া আসা হোক্।

সুষমা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, সব দিয়ে আসবে কি, ছেলেপিলের বাড়িতে কাগজের দরকার লাগে যে। তাছাড়া অমনি কাগজ দিয়ে আসবে কেন, পয়সা দিয়ে লোক এসে কিনে নিয়ে যায়।

সীতেশ কহিল, না না, পয়সার দরকার নেই। ওগুলি বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি। দেখ্, পেছনের রাস্তাটা দিয়ে নিয়ে যাবি, বোকার মতন আবার সদর রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাস্ না।

এত করিয়াও রাত্রে সীতেশের ঘুম আসিতেছে না। একটু হয়তো তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া জাগিয়া

উঠিতেছে। সুষমার মৃদু তিরস্কার, তার অভয়দান, কিছুই কাজে আসিতেছে না।

সুষমা এক সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সীতেশ সন্তর্পণে বাহির হইয়া যাইতেছে। কহিল, কোথায় যাচ্ছ আবার?

চমকাইয়া সীতেশ সশঙ্কস্বরে কহিল, সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে,—আর সন্দেহ নাই। তবু আগে একটু জানলা দিয়েই দেখে নিই।

সুষমাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

সীতেশ একটু থামিয়া কহিল, দেখ, রাধা-কেষ্টর ছবিটা খুলে তার ফ্রেমটাতে যে লাটসাহেবের সেই রঙীন ছবিটা ভরে রেখেছিলাম, সেটা খাটের মাথায় দিককার পেরেকে তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে দাও তো।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার আজ্ঞা পালিত হইল, ততক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া পাশের ঘরে যাইয়া একটা জানালা বহু সতর্কতার সঙ্গে অতি সামান্য একটু খুলিয়া বাহিরে উঁকি দিল।

কাছে আসিয়া সুষমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কে, সত্যি পুলিশ নাকি?

দরজা বন্ধ করিয়া, কোন জবাব না দিয়া নীরবে সীতেশ আসিয়া আবার বিছানায় শুইল।

ভুল শুনিয়াছিল। অবশ্য যে কোন মুহূর্ত্তে সেটা যখন সংঘটিত হইতে পারে, তখন তার ঐরূপ অনুমান করায় কিছুমাত্র অন্যায় হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে না।

একটু তন্দ্রনে ঘুমাইল, তবে সম্পূর্ণই একটু। দুম্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া সীতেশ উঠিয়া পড়িল। প্রাণপণে সুষমাকে ঠেলিতে ঠেলিতে জড়িত অস্ফুট ভাষায় কহিয়া উঠিল, ওগো শুনছ, এসেছে, একদম এসে পড়েছে। শুনছ, দরজা—দরজা ভাঙার শব্দ। কেমন, হল তো!

সুষমাও চমকিয়া উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল, ঠিক পুলিশ নয়,—বিড়াল। পানদানীটা ফেলিয়া শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সুষমা অনুযোগ করিয়া কহিল, আচ্ছা, কি আরম্ভ করেছ বলতো? পুলিশ পুলিশ বলে একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। সার্চ্চ করবে বলে মাঝরাত্রে এসে উপস্থিত হবে নাকি?

সীতেশ কহিল, মাঝরাত্রি আগ-রাত্রি বলে কোন কথা আছে নাকি ওদের? এ কি বিলেত?

"হয়েছে, হয়েছে, নাও, শোও এসে," বলিয়া সুষমা তাকে বিছানাতে প্রায় ঠেলিয়া দিল। কিন্তু সীতেশের অনুরোধে তাকে একবার যাইয়া বাহিরটা দেখিয়া আসিতে হইল। রাত এখন তিনটার কাছাকাছি।

শুইয়া শুইয়া প্রায় স্বগতের মত সীতেশ বলিতে লাগিল, যদি শেষ রাত্রেও আসে, তবে আর ঘণ্টাখানেক আছে বড় জোর।

এইবার সীতেশের ঘুম বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। সুষমার ডাকে তার ঘুম ভাঙিল। এদিকে রাত্রি অবসান হইয়া বেলা যে আটটার ঊর্দ্ধে গিয়াছে তা সীতেশের মোটেই মনে হইল না। প্রত্যেকটি জানালা বন্ধ থাকাতে ঘরটাতে এখনো গভীর রাত্রি বন্দী রহিয়াছে। কাজেই এই সুগভীর নিশীথে ঘুম হইতে ডাকিয়া জাগানোর দরুণ, এবং সুষমার মুখে একটা উদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়া সীতেশের চক্ষু কপালে উঠিল।

সুষমা কহিল, শুনছ, কে যেন নীচে ডাকছে।

তিনবার ঢোক গিলিয়া, চারবার চোখ বুজিয়া ও চাহিয়া বিকৃত গলায় সীতেশ কহিল, এই সময়? ডাকছে? বেশ, সমস্তটাই স্পষ্ট বোঝা গেল। বলেছিলাম, মাঝ-রাত্রেও...

সুষমা কহিল, মাঝ-রাত্রি? বল কি? বেলা যে আটটার পরে সাড়ে আটটার দিকে এগিয়ে চলছে।

প্রথমটায় সীতেশের মনে হইল তাহাকে নিতান্ত পরিহাস করা হইতেছে। এবং এই গুরুতর বিপদের সময়ে এমন তরলতায় সে বিষম রাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুষমা যাইয়া জানালা দুটা খুলিয়া দিল। তখন আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

আশ্বস্ত হইয়া সীতেশ কহিল, কে ডাকছে?

সুষমা মশারি উঠাইতে উঠাইতে কহিল, আমি জানি কি? এই রামা,—কে ডাকছে রে?

রামা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। দরজার কাছে আগাইয়া আসিয়া বিনীতভাবে কহিল, এজ্ঞে, উনি পুলিসের জমাদার।

ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা-বিস্ফোরণ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সীতেশের চোখ আবার কপালে উঠিয়াছে। এবং শুধু সীতেশেরই নয়, সুষমার মুখও পাংশু হইয়া উঠিল। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর হইতে চাকরটার যে চলিয়া যাওয়া দরকার, এতটা বোধ সুষমার তখনো ছিল। রামাকে কহিল, যা তুই বল্‌গে, বাবু আসছেন।

সুষমার দিকে করুণ মুখ তুলিয়া সীতেশ কহিল, আর কেন!

সুষমারও উৎসাহ আর বজায় নাই। তবু জোর করিয়া সে কহিল, দেখেই এস আগে, কি চায়! জানাশোনা কোন অপরাধের খবরই তো আমাদের জানা নাই।

গম্ভীরস্বরে সীতেশ কহিল, আর কেন,—সার্চ্চ-টার্চ্চ আর না,—সরাসরই নিয়ে যাবে। তা যাক্,—তবে দুঃখ এই, সেই জেলেই গেলাম,তবু যদি দেশের একটু কাজ-টাজ করে যেতাম,—নাম-টাম একটু হত।

সীতেশের দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। সুষমাও চোখের জল আর গোপন করিতে পারিতেছে না। তার শান্তির নীড়ে এ কি বিঘ্ন আসিয়া দেখা দিল। হায় রে, এ কি বিষম সর্ব্বনাশের কথা!

অনেকটাই দেরি হইয়া গেল। নীচে না গেলে আর চলে না। দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিবার জন্য ফাঁসির কয়েদী যেমন করিয়া মঞ্চের দিকে আগাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সীতেশ উঠিয়া বাহিরে চলিল। অশ্রুরুদ্ধ গলায় কহিল, হয়তো একটু সময় দেবে—হয়তো নিয়ে যাবার আগে একটিবার ভেতরে আসতে দিতে পারে। সুষমা কেঁদ না,—মনে জোর কর।

নীচে সিঁড়ির ধারে সুষমা প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিল, তবু সীতেশের বাড়ির ভিতরে পুনরায় আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এমন কি, বাহিরের ঘর হইতে এখন আর কোন সাড়াশব্দও আসিতেছে না। গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যে বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, এমন কি কখনো কখনো বাড়ির আহার পর্য্যন্ত খাইয়া যাইতে দেয়, তাহা সুষমা দুএকবার দেখিয়াছে। কিন্তু আজই কি তার ব্যতিক্রম হইল? সন্দেহ নাই, তাকে ভিতরে আসিয়া বিদায় লইবার অবসর পর্য্যন্ত দিল না,—সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেছে। কান্নার বন্যা ছুটিয়া আসিয়াছে। স্বামী তার কাল বিকাল হইতে কিছু খায় নাই। একটা নিরপরাধ লোককে,—উঃ,—

পাগলের মত ছুটিয়া সুষমা বাহিরের ঘরে গেল। ঐতো একটা পুলিশের লালপাগ্‌ড়ী রাস্তার দূরে দেখা যায়। সামনেই হয়তো, কান্না মুছিতে মুছিতে জানালার দিকে ছুটিয়া যাইতেই—হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া,—'তুমি'?

সীতেশ দুইহাতে মুখ লুকাইয়া অদম্য হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্পূর্ণ পারিতেছে না,—সদ্যভাঙা সোডার বোতলের মত বজবজ করিয়া কিছুটা হাসি বাহির হইয়া পড়িতেছে।

অবাক হইয়া সুষমা কহিল, ব্যাপার কি?

"পুলিশ।"

"তবে?"

"জেলে নিলে না, জুরির লিষ্টে নাম পড়েছে, খবর দিয়ে গেল।"

আর এক দিক

আমেরিকায় ১৮৭৫ হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত যে-সমস্ত বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইয়াছে (best-seller), আটলান্টিক মান্থলি-তে এডোয়ার্ড উইক্‌স্ তাহাদের একটি তালিকা দিয়াছেন। ২০ খানি বই ১০ লক্ষের বেশী বিক্রয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইয়াছে, ১৮৯৯ সনে প্রকাশিত চার্লস্ মনরো শেলডনের 'ইন হিজ ষ্টেপ্‌স্' (In his steps)—৮০ লক্ষ কপি। তৎপরে ১৯০৪ সনে প্রকাশিত জেনি ষ্ট্রাটন পোর্টারের 'ফ্রেক্‌লস্' (Freckles)—২০ লক্ষ। ১০ লক্ষের অধিক যে-সব বই বিক্রয় হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটির নাম :—

টম সইয়ার—মার্ক টোয়েন (১৮৭৫), হাকলবেরি ফিন্—মার্ক টোয়েন (১৮৮৪), বেন হুর—লিউ ওয়ালেস (১৮৮০), ট্রেজার আইলাণ্ড—ষ্টিভেনসন্ (১৮৯৪), দি কল অব দি ওয়াইল্ড—জ্যাক লণ্ডন (১৯০৩), ষ্টোরি অব দি বাইবেল—জে. সি. লাইম্যান- হালবার্ট (১৯০৪), পলিয়ানা—ইলিনোর ষ্টুয়ার্ট (১৯১৩)।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা গত দুইমাসে সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই পুস্তকগুলি এবং ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত যে সকল পুস্তকের সমালোচনা আমরা এখন পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই, আগামী আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে সকলগুলিই সমালোচিত হইবে। —সম্পাদক, বঙ্গশ্রী]

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ—১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড। শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত। অনুবাদক, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। খাদি প্রতিষ্ঠান। কাগজের মলাট। প্রতি খণ্ড ৸০।

রামচরিত-মানস—গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত। খাদি প্রতিষ্ঠান। বাঁধাই ২।০।

গীতি-গাথা—কবিতা পুস্তক। ৺ইন্দিরা দেবী প্রণীত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড। ১৲।

Mirabai—Anath Nath Basu. George Allen & Unwin Ltd. 2/6 d.

Abhinaya Durpanam—নন্দিকেশ্বর বিরচিতম্। Edited by Monomohon Ghosh. Metropolitan Printing & Publishing House Ltd. Rs 5/-

নবজ্যোতি—কাব্য। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, ২৬নং গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা। ১৷০।

চিন্তারেখা—প্রবন্ধ। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ১৲।

সোজনবাদিয়ার ঘাট—কাব্য। জসীমউদ্দীন প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৷০।

ত্রিগুণবাদ শ্রীমদ্ভগবদগীতা—১ম খণ্ড। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি সম্পাদিত। শ্রীসত্যহরিদাস কর্ত্তৃক ৩৮।৭৯নং হাউস কাট্‌রা, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। ৷৶০ আনা।

রাগ ভিন্ন ষড়্‌জ—পণ্ডিত কেশবগণেশ ঢেক্‌নে প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার, ৭নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা। ।✓০।

পরাজয়—গল্পের বই। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৷০।

কুটীরের গান—কাব্য। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —১৷০।

অনুচ্চারিত—শ্রীঅবনীনাথ রায়—১৲।

মানবের শত্রু নারী—শ্রীসুবোধ বসু—১০।

বিবর্ত্তন—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—১৲।

যে শাখে ফুল ফোটে না—শ্রীতারাপদ রাহা —১৷০।

একদা—শ্রীসুশীল রায়—১৷০।

মানসী—শ্রীমতী আশালতা দেবী—১৷০।

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র—৷০।

—পি-সি-সরকার এণ্ড কোং, কলিকাতা।

নরবাঁধ—শ্রীমনোজ বসু। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, দক্ষিণ কলিকাতা। ১৷০।

রঙের পরশ—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২৷০।

যৌবন-পূরবী—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। 'হুওর ওন্ হোম'—২১, বাহির মির্জ্জাপুর রোড। ৷০।

চলার গান—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। প্রফুল্ল লাইব্রেরী, ৭১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৸০।

রহস্যজাল—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক, গ্রন্থকার, ২।২-এ, জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড, কলিকাতা। ১৲।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর। এড্‌ভান্স অফিস, কলিকাতা। ৩৲।

The Padyavali of Rupa Goswami—Edited by Sushil Kumar De. The University of Dacca.

প্রাক্তনী, লীলায়িতা—কবিতা। শ্রীসুশীলকুমার দে ; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। ২৲ ও ১৲।

মেঘদূত—কাব্য। পণ্ডিত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য অনূদিত। প্রকাশক, প্রবাসী কার্য্যালয়। মূল্য তিন টাকা।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত মেঘদূত কাব্যের বহু অনুবাদ আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ; প্রায় পনরটি বিভিন্ন অনুবাদ আমাদের

কাছে রহিয়াছে, সেগুলি লইয়া অল্পবিস্তর নাড়াচাড়াও করিয়াছি, কিন্তু কোনও অনুবাদই মনের উপর কোনও ছাপ রাখিয়া যায় নাই; ক্ষণকালের জন্য কালিদাসকে বিস্মৃত হইয়া অনুবাদকের শব্দযোজনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে, কোনও অনুবাদকেরই ততটা কৃতিত্ব নাই। কালিদাসেরই কথাগুলি একটু অদলবদল করিয়া একটা বাঁধাধরা ছন্দের কাঠামোর মধ্যে সেগুলিকে বাঁধিয়া একটা কিছু খাড়া করাই দেখিতেছি মেঘদূত অনুবাদের প্রচলিত রীতি। অথচ এই পুস্তকগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখি উপক্রমণিকায় এবং ভূমিকায় নানা কথার আড়ম্বরে কালিদাসকে পিছনে রাখিয়া অনুবাদকেই আসল কাব্যের গৌরব দান করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়; অনুবাদকও কবি হিসাবে কালিদাসের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার গর্ব্ব মনে মনে অনুভব করিয়া ভাবস্তিমিত এবং করুণাবিগলিত নেত্রে দীর্ঘ ভূমিকার অন্তরাল হইতে বিপন্ন পাঠকবৃন্দকে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টিসহকারে অবলোকন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় এরূপ কিছুই করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে মহাকবি কালিদাসকেই পুরোভাগে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন; স্বামী মূলকাব্যের পাশে পাশে মুদ্রিত পত্নী অনুবাদ-কাব্যটিকে ছায়ার মত অনুগত মনে হইতেছে বলিয়াই অত্যন্ত নয়নাভিরাম ও সুশোভন ঠেকিতেছে। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় আধুনিক কাব্যগর্ব্বে প্রাচীন কালিদাসকে ডিঙাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই, তাই তাঁহার অনুবাদ এতটা মূলানুগ ও সহজবোধ্য হইয়াছে। মেঘদূতের অনুবাদ স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে মূলের সমান গৌরব তখনই অর্জ্জন করিতে পারে, যখন কালিদাসের সমান অথবা কালিদাস অপেক্ষা প্রতিভাবান্ কোনও কবি এই অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। তাহা যখন সহসা সম্ভব নহে তখন বিনীতভাবে মহাকবিকেই অনুসরণ করিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ভাষায় যথাযথ কালিদাসকেই আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, কোথাও কবি হইবার চেষ্টা করেন নাই। যে ভাষা ও ছন্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। অনেক প্রয়োজনীয় কথা ভূমিকাতে দেওয়া হইয়াছে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও ছবি সুন্দর ও ভদ্র হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—শ্রীসুকুমার সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই পুস্তকের অধিকাংশ বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, সুতরাং বঙ্গশ্রীর পাঠকগণের সহিত ইহার পরিচয় আছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে করিতে অধ্যাপক সেন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার গদ্যের উৎপত্তি ও পরিণতির একটা ক্রমিক ইতিহাসের অভাব অনুভব করিয়াই এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য লইয়া যাঁহারা কারবার করেন এই পুস্তকটি তাঁহাদের অবশ্যব্যবহার্য্য হইবে।

'সংযোজনী' লইয়া এই পুস্তকখানি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১ম পরিচ্ছেদে খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তির কথা। বাঙ্গালা পয়ারে রচিত বৈষ্ণব জীবনী এবং শূন্যপুরাণাদি হইতে কেমন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের এক ধারার প্রবর্ত্তন হইল, পোর্ত্তুগীস পাদ্রিদের চেষ্টায় কেমন করিয়া অন্য একটি ধারা আসিয়া এই ধারায় মিলিত হইয়া, বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের গোড়াপত্তন করিল, এই পরিচ্ছেদে তাহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মকালে বাঙ্গালা গদ্যের রূপ কি ছিল, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যই বা কি ছিল তাহাও সুকুমার বাবু দেখাইয়াছেন এবং পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ব্যাকরণগত ও ভাষাগত পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়াতে নিছক ভাষা-বিজ্ঞানের ছাত্রেরা ছাড়া সাধারণ পাঠকেরাও এই ইতিহাস পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' কি, দোম আন্তনিও কে, এই সকল সংবাদ আমরা অনেকেই অবগত নহি, অথচ এগুলি জানা যে অত্যাবশ্যক, এই পুস্তকপাঠে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ২য় পরিচ্ছেদে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, কেরী, মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনকে লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কেরির কথোপকথন ও ইতিহাসমালা, গোলোকনাথ শর্ম্মার হিতোপদেশ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলী, হিতোপদেশ ও প্রবোধচন্দ্রিকা, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা এবং রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থ এবং বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের আবির্ভাব এই পরিচ্ছেদের বিষয়। ৩য় পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর, ৪র্থ পরিচ্ছেদে অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৫ম পরিচ্ছেদে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভূদেব, মধুসূদন (হেক্টর বধ), ৭ম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র ৮ম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও শিষ্যস্থানীয় সাহিত্যিক বর্গ, ৯ম ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ও ১২শ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণের ভাষা যথাক্রমে এবং সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা লইয়া এই ধরণের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই।

সেন মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান জন্মে এবং এইটুকু জ্ঞান বাঙ্গালী মাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। সুকুমার বাবুর লেখার প্রধান গুণ হইতেছে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তিনি যতটুকু জানেন ততটুকুই গুছাইয়া লিখিয়াছেন, কোথায়ও নিজের কল্পিত থিওরী প্রতিপন্ন করিবার জন্য কল্পনাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই এবং এই কল্পনা-বিলাসই বাঙ্গালা সাহিত্যের অপরাপর ইতিহাস-রচকদের একটা প্রধান দোষ। অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়াই সুকুমার বাবুর পুস্তকখানি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পুস্তকখানি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিদ্যাসুন্দর—কাব্য। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য, বারো আনা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'প্রাচীন আসামী হইতে' পাঠ করিয়া যাঁহারা

প্রেম কাব্যের স্নিগ্ধতায় মোহিত হইয়াছেন, বিদ্যাসুন্দর পাঠে তাঁহারাই তাঁহার প্রেম-কাব্যের উগ্রতায় বিস্মিত হইবেন। যে কবি এক নিশ্বাসে এমন শৈত্য ও তপ্ততা বর্ষণ করিতে পারেন তিনি ক্ষমতাবান, সন্দেহ নাই।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যখানি বিদ্যাসুন্দরের প্রাচীন উপাখ্যান লইয়া রচিত নহে। আধুনিক সুন্দর তাঁহার কল্পিত নায়িকা বিদ্যাকে লইয়া এই অপরূপ কাব্যখানি রচনা করিয়াছে। কবি কীট্‌স-এর বিখ্যাত 'সেণ্ট অ্যাগনিজ ঈভে'র ছায়া-পাতে কাব্যখানি অপূর্ব্বতর হইয়াছে। এই কাব্যে অনেক আধুনিক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়াছে, কবির পানপাত্রে দ্রাক্ষাগুচ্ছের নির্য্যাস টলটল করিতেছে, সম্মুখে সজ্জিত থালায় বিদীর্ণ ডালিম এবং কর্ত্তিত তরমুজ। কবির মন সুড়ঙ্গপথে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই থামিয়া যায় নাই, বরঞ্চ বারংবার বলিয়াছে,

> 'যাব যেথা হিমাদ্রির কুণ্ডলিত কুহেলি নিঃশ্বাসে
> দিগন্তের নীলনেত্রে মুহুর্মুহু ছায়াছানি পড়ে;
> যাব যেথা উচ্চকিত পাগলিয়া পুঞ্জিত লতাশে
> স্রস্ত কেশ তিস্তা হ'তে রাশি রাশি ফেনপুষ্প ঝরে।
> আপন ছায়ায় ভীত মৃগদল ধায় যেথা ডরে,
> দিবসে জোনাক-জ্বালা, শ্বাপদের আঁখি-দীপ্ত পথে
> নিঃশঙ্কে চলিব দোঁহে শব্দবেদী তটরেখা ধরে'
> ব্রহ্মপুত্র স্রোতবীর!'

সুতরাং, আশা হইতেছে বর্ত্তমান উদ্দাম গতির যুগের সুন্দরেরা এই কাব্যপাঠে তৃপ্ত হইবেন।

মনের খেলা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। গুপ্ত ফ্রেণ্ড্‌স্ এণ্ড কোং। মূল্য এক টাকা।

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কাব্যের ধূম্রমার্গ পরিত্যাগ করিয়া মনের অলিতে-গলিতেও যে স্বচ্ছন্দ বিহার করিতে পারেন 'মনের খেলা'য় তাহার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলাম। চেতন ও অবচেতন, Dissociation ও Repression, স্বপ্ন, Complex ও Sublimation প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয় লইয়া তিনি এমন লঘু গতিতে চলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা এই প্রশ্ন করিবার সময়ই পাইনা, এত তিনি শিখিলেন কখন? ভূমিকাতে তিনি বলিতেছেন, "ইংরাজি না জানা এই লক্ষ লক্ষ মানুষের তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের বেদনা যদি আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, তবে বাঙ্গালা ভাষা নব নব জ্ঞানের সম্পদে আরও ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিত; জনসাধারণের মনের অন্ধকার বহুল পরিমাণে ঘুচিয়া যাইত। 'মনের খেলা' তাঁহাদেরই জন্য লিখিত হইল যাঁহারা ইংরাজি জানেন না ..."

পুস্তকটি সুলিখিত কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

Russia Today—Nityanarayan Banerjee. Published by K. N. Chatterjee, 120-2 Upper Circular Road, Calcutta, Price 3/-.

পুশকিন, গোগাল, টুর্গেনিভ, ডষ্টয়এভ্‌স্কি, শেখভ, টলষ্টয় ও গর্কির কল্যাণে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার সহিত অনুবাদের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর যে পরিচয় হইয়াছে তাহার প্রভাব যে কারণেই হউক বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। এই সকল 'দানব'-সৃষ্টিকর্ত্তাদের নাম এবং আর্ট-মাহাত্ম্যই বাঙ্গালীর মনে রহিয়া গিয়াছে, রাসিয়ার সহিত তাহার পরিচয়ের যোগ স্থায়ী হয় নাই। তারপর, বিপ্লববিলাসী বাঙ্গালী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগের সোভিয়েট ও রেড বিপ্লবের ধাক্কায় চমকিত হইয়া রাশিয়ার নামে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দুই একজন বাঙ্গালী যুবক কম্যুনিষ্টবাদী বলিয়া নিজেদের জাহির করিবার লোভে রাশিয়ার তরুণ আন্দোলনের নূতন মতবাদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রচার করিতেও সুরু করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তরুণ বিপ্লবী রাশিয়ার মনের কথাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই চেষ্টায় সুদূর মস্কো অবধি ধাওয়া করিয়াছিলেন, এবং এই পুস্তকখানি তাঁহার রাশিয়ার সহিত স্বল্প কয়েক দিনের পরিচয়ের ফল। রাশিয়ার সহিত যাঁহাদের অন্যভাবে পরিচয় আছে তাঁহারা বুঝিবেন, এই পরিচয় যে কারণেই হউক গভীর হয় নাই। ফেবিয়ান সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত Twelve Studies, ফুলেপ-মিলারের Mind and Face of Bolshevism এবং মরিস হিণ্ডাসের Broken Earth, Red Bread ও Humanity Uprooted প্রভৃতি পুস্তকের মারফতে আধুনিক রাশিয়াকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তীর্থযাত্রাও কতক পরিমাণে বিফল হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া নবীন রাশিয়াকে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার এই পুস্তকখানি আমাদের অনেক কাজে লাগিবে। আপাতদৃষ্টিতে নবীন রাশিয়াকে দেখিয়া একজন তরুণ বাঙ্গালীর কি মনে হয় এই পুস্তকে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাছাড়া ভ্রমণকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পথঘাট, রেল, হোটেল ইত্যাদির খবরও আছে। পুস্তকখানি সুলিখিত, সুচিত্রিত হওয়াতে ইহার মূল্য কিছু বাড়িয়াছে।

Modern Agriculture—Nityanarayan Banerjee. Published by Chackraverty Chatterjee & Co. Price 12 annas.

ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া কৃষিকার্য্য ও পশুপালন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লেখক অর্জ্জন করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহারই ফল। Danish Farming, Small Holdings in Denmark, Cooperation in Denmark, Agriculture in Russia, Mussolini & Italian Agriculture, Dutch Dairy Industry, Agriculture in England ও Problem of our Agriculture এই আটটি প্রবন্ধ আছে।

মন্দির—কবিতা-পুস্তক। শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনসেফ ডাঙা, পুরুলিয়া। মূল্য দুই টাকা।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশস্তি লইয়া যে কাব্য-পুস্তক তিন তিনটি সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার নূতন পরিচয়ের কোনও অপেক্ষা রাখে না। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে কবি আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। সে আসন চিরকাল অটল থাকিবে। বাঙ্গালী কবির কাব্যের তিনটি সংস্করণ হইয়াছে ইহাতেও অনেকে আশান্বিত হইবেন।

পরিক্রমা

মাসিকপত্রিকাক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে 'রসশ্রী' এবং ঢাকা হইতে 'পূর্ব্বাচলে'র আবির্ভাব দুই সম্পূর্ণ পৃথক কারণে বিচিত্র। দুইটিই গত শ্রাবণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রসশ্রী' রসকলা, কারুশিল্প ও ফটোগ্রাফি বিষয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সুষমা ও সংযমই ইহার মূল কথা; 'পূর্ব্বাচল' সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা, সকল প্রকার বাঁধাবাঁধি এবং সংযমের বিরুদ্ধেই ইহার অভিযান। যুগপ্রভাব যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে 'পূর্ব্বাচলে'র অনেক কিছু ভরসা আছে। অস্তাচলের ধারে আসিয়া রবীন্দ্রনাথও হয় তো পূর্ব্বাচলের পানে একবার তাকাইবেন!

'রসশ্রী'—চিত্রশিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় সম্পাদিত, ১৪নং বাদুড়বাগান লেন; কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲।

বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় 'রসশ্রী'র পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীরের ভাস্কর্য্যশিল্পের কথা বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের দুইখানি পটচিত্র 'মাতা' ও 'কন্যা'র সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 'রোমান্টিষ্ট নন্দলালে'র কথা শুনাইয়াছেন। চামড়ার উপর কাজের প্রাথমিক উপদেশও এই সংখ্যায় আছে। হাতে-কলমে শিল্পশিক্ষা দিবার কোনও পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। সুপরিচালিত হইলে এই পত্রিকা বাংলাদেশের একটা অভাব দূর করিবে।

'পূর্ব্বাচলে'র সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ ও শ্রীতারা মিত্র। সম্পাদকীয় 'মাসিকী' বিভাগে সম্পাদক ভূপেন্দ্র বর্ম্মণ বলিতেছেন—

"কেন কাগজ বের করেছি? আমাদিগকে এ প্রশ্ন করা আর এরোপ্লেন কেন আবিষ্কৃত হয়েছে, কেন New World আবিষ্কৃত হয়েছে? কেন মঙ্গল গ্রহে এবং গৌরীশৃঙ্গে যাবার চেষ্টা হচ্ছে? কেন সেক্সপীয়ার—রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন? একথা জিজ্ঞেস করাও এক।"

সুতরাং যে জন্যে এরোপ্লেন, New World আবিষ্কৃত হয়েছে—যে জন্যে মঙ্গলগ্রহে এবং গৌরীশৃঙ্গে যাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং যে জন্যে সেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন ঠিক সেই জন্যেই "পূর্ব্বাচল বেড়িয়েছে (!)।"

আমরা এক পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের কথা জানিতাম। কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একদা তিনি নিজ বাড়ির ছাদের আলিসার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার আগমনে তত্র উপবিষ্ট দুইটি পারাবত পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেল। তাঁহার মনেও উপরোক্ত চিরন্তন প্রশ্নগুলির মত একটি প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন উড়িতে পারিবে না? প্রশ্নটি মনে যেই জাগা, অমনি তিনি ডানার মত দুই বাহু বিস্তার করিয়া উড়িবার চেষ্টা করেন। এগার দিন পরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হয়। এতগুলি প্রশ্নে পাঠকসম্প্রদায়কে বিচলিত না করিয়া সম্পাদক মহাশয় স্বচ্ছন্দেই এই প্রশ্ন তুলিতে পারিতেন, মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? দেখিতেছি এক নম্বর সম্পাদক সরল নহেন।

সরল যে নহেন তাহার আরও প্রমাণ, তিনি কিছু পরেই বলিতেছেন--

"রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই খাটো হয়ে গেছি একথা বিশ্বাস কোরবার মত দুর্ব্বলতা আমাদের নেই। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সময় জন্মগ্রহণ করলেও হয়তঃ (?) আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মত অমর হয়ে থাকতেন। একথা আর কেহ বিশ্বাস না করলেও আমরা করি।...সুতরাং রবীন্দ্র এবং রবীন্দ্র পরবর্ত্তী যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমাদের সাহিত্যও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র পরবর্ত্তী যুগকে ছাড়িয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মগ্রহণ ক'রে ইহাই আমাদের অহঙ্কার।"

অন্যতর জাতীয় জীব ক্রমবিবর্ত্তনে পরে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যজাতীয় জীবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে কিনা এক নম্বর সম্পাদক মহাশয় সরাসরি তাহার বিচার না করিয়া গায়ের জোরে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আর যাহাই হউক, অন্ততঃ সরলতার পরিচায়ক নহে।

ইহার পরই সেই চিরন্তন পদ্মাপারের কথা, এ কথাগুলিও সরল নহে।

"জন্ম পদ্মাপারে বলে আজন্ম পদ্মাপারেই থেকে যাবো। যদিও জানি পদ্মাপারের উপরে কোন কোন মিশনারী দল বড় খাপ্পা। কারণ পদ্মার ঢেউয়ে নাকি তাদের ব্রহ্মচর্য্য ভেঙে যায়।

ভাঙে ভাঙুক। পদ্মা যদি বেচে (?) থাকে ঢেউ তাতে উঠবেই। তাতে যদি কারও ব্রহ্মচর্য্য ভেঙে পড়ে পড়ুক।

সম্প্রতি পদ্মার পারে (?) ভাঙন দেখে তারা আনন্দিত হচ্ছেন। আমরা তাতে দুঃখিত নই। কারণ আমরা জানি এক নদীর পার (?) ভেঙে আর এক নদীর পার (?) গজায়। পদ্মার পার (?) ভেঙে ভেঙে গঙ্গা পারে একটা নূতন পার (?) গজাচ্ছে। আমরা তা দেখেছি।"

আমরাও তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু লেখক ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব অথবা ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি কাহার কথা বলিতেছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শুধু বলিতেছেন—

"সুতরাং পদ্মায়ও ঢেউ উঠবে আর আমাদের হাতের কলমও চলবে।" ভয় পাইয়া ভাবিতেছি, এ মকোদ্দমার ব্রীফ্ ইঁহাদের হাতে দিল কে?

দুই নম্বর সম্পাদক শ্রীতারা মিত্র মহাশয় সরাসরি কথা বলিতে ভালবাসেন। প্রথম সম্পাদক লিখিত ও এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গল্পের নিম্নলিখিত স্থানটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"শুধু মেয়েদের কথা 'ভাবন' আর মেয়ের ছবি 'দেখন'। বৌদি যাইবে রান্নাঘরে, বৌদি যাইবে বাপের বাড়ী তার সঙ্গে সঙ্গে 'যাওয়ন'। কিন্তু শুধু 'যাওয়ন'ই তার সার। শুধু শুধু সময় নষ্ট স্বাস্থ্য নষ্ট মন নষ্ট 'করণ'। আর অযথাই মেয়েগুলির দর বাড়াইয়া 'দেওয়ন'। ফলে চন্দ্রলোকের জীব বলিয়া মেয়েদের মনে মনে 'ভাবন'।

"(উপরোক্ত অংশ) পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এবং কথাগুলোও বেশ জোড়ালো (?)। এমন বোলবার ভঙ্গি বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর আমাদের চোখে পড়েনি।"

চোখে আমাদেরও পড়ে নাই। যাক্ এতদিনে তবু, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি জোরালো শব্দের খাঁটি অর্থ পাওয়া গেল!

এই নগণ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রলাপ লইয়া এতখানি আলোচনা করিতে হইল, ইহা, এই যুগের তরুণেরা যে মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাহারই একটি প্রকাশ বলিয়া। কলিকাতার পুস্তক-প্রকাশক ভোলানাথ সেন মহাশয়কে যাহারা হত্যা করিয়াছিল তাহারাও এই ব্যাধিতেই ভুগিতেছিল। এবং সম্প্রতি এই ব্যাধি বিস্তার লাভ করিতেছে। এই উন্মত্ততার ঢেউ পদ্মারও নয়, গঙ্গারও নয়, ইহা আধুনিক সভ্যতায়, আধুনিক যুগের একটি বীভৎস ব্যাধির প্রকোপ মাত্র। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাঁহারা এখন হইতে সাবধান না হইলে এই ব্যাধি জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া জাতির সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। তাহারই সূচনা চারিদিকে দেখা যাইতেছে।

সম্পাদকীয়

হিণ্ডেনবুর্গ

গত ২রা আগষ্ট সাতাশী বৎসর বয়সে জার্ম্মেনীর প্রসিডেন্ট ও বিখ্যাত সেনানায়ক হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধের সময়ে যে-সকল সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতা খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাঁহাদের অনেকেরই যশ ও প্রতিষ্ঠা পরবর্ত্তী যুগে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, এমন কি অনেকের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিণ্ডেনবুর্গকে জনপূজার এই জোয়ার-ভাঁটা স্পর্শ করে নাই। যুদ্ধের সময়ে জার্ম্মেনীর ত্রাতা বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে পূজা করিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৬ হইতে ১৯১৮ সন পর্য্যন্ত তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মী জেনারেল লুডেনডর্ফ জার্ম্মেনীর প্রকৃত শাসক ছিলেন; ইঁহাদের ক্ষমতার সহিত স্বয়ং সম্রাটের ক্ষমতারও তুলনা করা যাইত না। যুদ্ধবিরতির সময়ে লুডেনডর্ফ যখন পরাজয়ের গ্লানিভাগী হইবার আশঙ্কায় সেনাপতিত্ব ত্যাগ করেন তখন হিণ্ডেনবুর্গ অবিচলিত থাকিয়া বিরাট জার্ম্মান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হইতে না দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রাইনের পরপারে ফিরাইয়া লইয়া যান। তিনি এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় না দিলে জার্ম্মান সেনা এইভাবে জার্ম্মানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আবার যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে জার্ম্মান গণতন্ত্রের প্রথম প্রসিডেন্ট সোশ্যালিষ্ট এবার্টের যখন মৃত্যু হইল তখন প্রসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়া হিণ্ডেনবুর্গ সেই একই কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন। ১৯২৫ সনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের উপাসক জাতীয়দলভুক্ত বৃদ্ধ প্রুসিয়ান সেনাপতি যখন বিপ্লববাদী চর্ম্মকার পুত্রের স্থানে জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রনেতা হইলেন তখন অনেকে মনে করিয়াছিল এইবারে আবার পুরাতন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম আরম্ভ হইবে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এমন কি সম্রাট, সম্রাটের পুত্র বা পৌত্র পরিত্যক্ত সিংহাসনে ফিরিয়া আসিবেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ সকলের কিছুই ঘটিল না। যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সরলতার সহিত হিণ্ডেনবুর্গ সম্রাটের সেবা করিয়াছিলেন, জার্ম্মান রিপাব্লিকের সেবায়ও সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সরলতার পরিচয় দিলেন। ইহার ফলে শুধু জার্ম্মেনীতেই নয় পৃথিবীর সকল দেশেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইত। এই শ্রদ্ধার পরিচয় তাঁহার মৃত্যুর পর অগণিত শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে পাওয়া যায়।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে-বয়সে হিণ্ডেনবুর্গের এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় সেই বয়সে অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সনে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৬৬ সনে অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রুসিয়ার যে যুদ্ধ হয় এবং ১৮৭০ সনে ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যে যুদ্ধ হয়, উভয় যুদ্ধেই তিনি সেনানায়ক হিসাবে কাজ করেন। তাহার পর সাধারণ প্রুসিয়ান সামরিক কর্ম্মচারীর মত নানা কাজ করিয়া ১৯১১ সনে নিম্নপদস্থ জেনারেল রূপে অবসর গ্রহণ করেন; তখন তাঁহার বয়স ৬৪। এই সময়ে যদি তাঁহার মৃত্যু হইত তাহা হইলে পৃথিবী তাঁহার নামও শুনিতে পাইত না। কিন্তু ইহার তিন বৎসর পরেই মহাযুদ্ধ বাধিল। অন্ধ স্তাবকতা হিণ্ডেনবুর্গের চরিত্র-বিরুদ্ধ ছিল। সেজন্য তিনি সম্রাটের সেনা-পরিচালনার সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার স্পষ্ট একটু সমালোচনার জন্য তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। এই জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক যুদ্ধের প্রথম ভাগে হিণ্ডেনবুর্গের ডাক আসিল না। কিন্তু আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে যখন রুশ-বাহিনী পূর্ব্ব জার্ম্মেনী আক্রমণ করিল তখন এই প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া হিণ্ডেনবুর্গকে পূর্ব্ব সীমান্তের একটি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল এবং তাঁহার সহকারী হইলেন লুডেনডর্ফ। ইহার কয়েক দিন পরেই টানেনবার্গের বিখ্যাত যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়া রুশ-বাহিনী জার্ম্মান সীমান্ত হইতে বিতাড়িত হয়। এই যুদ্ধই হিণ্ডেনবুর্গের অসাধারণ সামরিক যশের ভিত্তি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে হিণ্ডেনবুর্গ সামরিক নেতা বা রাষ্ট্রনেতা হিসাবে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। যে টানেনবার্গ ও মাসুরিয়ান হ্রদের যুদ্ধ তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া গণ্য হয় তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী

তাঁহার "চিফ্ অফ দি ষ্টাফ্ লুডেনডর্ফ" এবং আরও কয়েকজন অধস্তন সেনানায়ক। এমন কি যে সৈন্য-পরিচালনার ফলে টানেনবার্গের যুদ্ধ ঘটে তাহার আরম্ভও হিণ্ডেনবুর্গ ও লুডেনডর্ফ পূর্ব্ব সীমান্তে পৌছিবার পূর্ব্বেই হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তের পরবর্ত্তী যুদ্ধ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। ইহার পর হিণ্ডেনবুর্গ যখন প্রেসিডেণ্ট হন তখন রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন ডাঃ অটো মাইসনার। রাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধে ডাঃ মাইসনারের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ইঁহার উপদেশে, নিজের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, অনেক ব্যবস্থায় হিণ্ডেনবুর্গ সম্মতি দিতেন। সুতরাং হিণ্ডেনবুর্গের রাজনৈতিক কৃতিত্বের অনেকটা মাইসনেরের প্রাপ্য।

তবু হিণ্ডেনবুর্গ তাঁহার উপদেষ্টাদের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন—প্রতিভায় নয়, চরিত্রে। লুডেনডর্ফ রণকৌশলে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহার অপেক্ষা হীন ছিলেন। মানুষের চরিত্রের প্রধান পরীক্ষা হয় দুর্দ্দিনে। লুডেনডর্ফ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, হিণ্ডেনবুর্গ হইয়াছিলেন। ১৯২৫ সনে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময়ে তিনি একটি সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। বলিতে বলিতে হঠাৎ লিখিত বক্তৃতা ফেলিয়া দিয়া সম্মুখের টেবিলে বিরাট মুষ্টির আঘাত করিয়া বজ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "I am a man who is accustomed to do his duty." ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সেজন্য তাঁহার স্থান নেপোলিয়নের সঙ্গে না হইলেও আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে চিরকাল থাকিবে।

হিমালয় আরোহণ

গত মাসে হিমালয়ের নাঙ্গা পর্ব্বত-শৃঙ্গ আরোহণ করিতে গিয়া জার্ম্মাণ অভিযানের নায়ক হেয়ার মার্কল্ এবং তাঁহার সঙ্গী হেয়ার ভিলাণ্ড ও ভেল্‌ট্‌সেনবাথ প্রাণ হারাইয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে কয়েকজন বাহকেরও মৃত্যু হইয়াছে। হেয়ার মার্কল্ ইতিপূর্ব্বে ১৯৩২ সনে নাঙ্গা পর্ব্বত আরোহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই এবারে আরও নিখুঁত আয়োজন করিয়া আবার প্রচেষ্টা করিতে আসিয়াছিলেন। হয়ত দুএকদিন সময় পাইলেই তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইত, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও তাহার ফলে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। হিমালয় লঙ্ঘনের ইতিহাসে দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে যে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু একবারে এত জনের মৃত্যু কখনও হয় নাই। সেজন্য হিমালয় আরোহণ বা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা হেয়ার মার্কল্ ও তাঁহার সঙ্গীদের এবং অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক শেরপা ও ভুটিয়া বাহকদের মৃত্যুকে অত্যন্ত নিরুৎসাহকর ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছেন।

নাঙ্গা পর্ব্বতের দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এভারেষ্ট আরোহণ করিতে গিয়া একজন একক ইংরেজের মৃত্যুর সংবাদ জানা গিয়াছে। তাহার কিছুদিন পরে দৈনিক কাগজে আবার দুইজন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কাশ্মীরের নুন-কুন শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। হিমালয় আরোহণের এতগুলি সংবাদ এক সঙ্গে প্রকাশিত হওয়াতে লোকের মন স্বভাবতই এই বিষয়ে একটু কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। বরফে ঢাকা গিরিশৃঙ্গে উঠিতে গিয়া নিজের ও পরের প্রাণ বিপন্ন করাকে সাধারণ বুদ্ধিতে নিতান্তই পাগলের খেয়াল বলিয়া মনে হইতে পারে। একজন তিব্বতী লামা নাকি তাঁহার রচিত এক ইতিহাসে ১৯২৪ সনে এভারেষ্ট আরোহণ করিতে গিয়া ম্যালরী ও আর্ভিনের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "লোকগুলি নিরর্থক প্রাণ হারাইল।" কথাগুলি এক দিকে যেমন সত্য অন্যদিকে আবার তেমনই অর্থহীন। শক্তিমান পুরুষ মাত্রেই শক্তির পরীক্ষা না করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এই পরীক্ষা যত কঠিন তাহার আনন্দও তত বেশী। প্রাকৃতিক শক্তি বরাবরই জীবকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছে। একমাত্র মানুষই তাহাকে পদে পদে পরাজিত করিতেছে। পর্ব্বত আরোহণও মানবজাতির বিজয় অভিযানের একটা দিক। ইহার দ্বারাও শারীরিক ও নৈতিক শক্তির উৎকর্ষই লাভ হয়।

ইহা ছাড়া এই সকল চেষ্টার একটা বৈজ্ঞানিক দিকও আছে। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা এখনও অনেক পরিমাণে অজ্ঞাত। এই সকল অভিযানের দ্বারা প্রতিবারেই আমাদের এই জ্ঞান বাড়িতেছে।

হিমালয় আরোহণের ভারতীয় প্রচেষ্টা

এই স্থানে আমাদের দেশের লোকের দ্বারা হিমালয় আরোহণ ও ভ্রমণ সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

এখনও আমরা এই সকল ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহের পরিচয় দিই নাই। আমাদের দেশের বহু ধর্ম্মপ্রাণ বা কৌতূহলী স্ত্রীপুরুষ হয়ত কৈলাস, কেদারবদরী, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, অমরনাথ, মুক্তিনাথ বা পশুপতিনাথ গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত সাধারণতঃ অত্যন্ত মামুলী রোজনামচা, ইহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য খুব বেশী নয়। নূতনত্ব করিতে গিয়া কোন কোন কল্পনাপ্রবণ নবীন সাহিত্যিক পর্য্যটক আবার কেদারবদরী যাত্রাকে প্রায় মেরু-অভিযানের মত রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা গতানুগতিক রোজনামচার তুলনায় 'প্রোগ্রেস্' বটে কিন্তু বাঞ্ছনীয় 'প্রোগ্রেস' নয়। আসল হিমালয় আরোহণ বা পর্য্যটনের জন্য যে কষ্ট সহ্য করিতে হয় তীর্থযাত্রীর পথে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিমালয় পর্য্যটনে সত্যকার কৃতিত্ব দেখাইতে হইলে আমাদিগকে তীর্থযাত্রীর পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাইতে হইবে। এখনও হিমালয়ে অনেক অংশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বাংশ (অর্থাৎ সিকিম হইতে ব্রহ্মদেশের উত্তর পর্য্যন্ত) প্রায় অজানাই বলা চলে। এই অঞ্চল পর্য্যটন করিয়া আমাদের দেশের কেহ যদি একটি বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রকাশ করেন, তবে যে কেবলমাত্র নিজেই খ্যাতি অর্জ্জন করিবেন তাহা নহে, বিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করিবেন।

তবে শৃঙ্গ আরোহণ সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের মধ্যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর কয়েকজন উৎসাহী পর্য্যটক কৈলাস আরোহণের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। তিব্বতের গভর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বিদেশীকে তাঁহাদের অধিকারে ঢুকিতে দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। এই কারণে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় অভিযানকে তিব্বত যাইতে অনুমতি দেন নাই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই অনুমতি সাধারণতঃ ইউরোপীয়দিগকেও দেওয়া হয় না, এমন কি ১৯০৬ সনে বিখ্যাত পর্য্যটক সুয়েন হেডিনও ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইবার অনুমতি পান নাই। সুতরাং এই নিষেধ এ দেশের লোকের প্রতিই বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করা হইল তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। আমাদের পর্য্যটকেরা সম্প্রতি বাহিরের কোন শৃঙ্গ-আরোহণের চেষ্টা না করিয়া ভারতবর্ষের অধিকারভুক্ত কোন একটি শৃঙ্গ বাছিয়া লইলেই ভাল করিবেন। হিমালয়ে পঁচিশ হাজার ফুটের অপেক্ষা উচ্চ প্রায় পঞ্চাশটি শৃঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে মাত্র একটি এ পর্য্যন্ত লঙ্ঘিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়া ও শক্তিবর্গ

১৯১৪ সনের জুন মাসের শেষে অষ্ট্রীয়ায় একটি হত্যাকাণ্ড হয়। তাহার ফলে মহাযুদ্ধ বাধে। তাহার কুড়ি বৎসর পরে অষ্ট্রীয়ায় আবার একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিল। ইহার ফলেও পৃথিবীব্যাপী আর একটি বিরাট যুদ্ধ বাধিতে পারিত। বাধে নাই কেবলমাত্র জার্ম্মেনীর শক্তিহীনতার জন্য।

গত যুদ্ধের পর ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের যে-অংশটুকু অষ্ট্রীয়া বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহার অধিবাসীরা জাতি ও ভাষায় জার্ম্মান। সুতরাং ইহাদের জার্ম্মেনীর প্রতি ও জার্ম্মেনীর ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। ইহার উপর আবার নূতন অষ্ট্রীয়ান রাষ্ট্রের অত্যন্ত অর্থাভাব থাকায় আর্থিক দিক হইতেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাহার পক্ষে সহজ নহে। এই সকল কারণে ১৯১৯ সনের সন্ধির পর হইতেই অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মেনীর সহিত মিলিত হইয়া যাইবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। এই জল্পনা-কল্পনার ফলে আর্থিক ব্যাপারে জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়ার একটা মিলনের বন্দোবস্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ফ্রান্সের প্রবল আপত্তির জন্য উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু জার্ম্মেনীতে নাৎসি দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই আন্দোলন আবার অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জার্ম্মান জাতির ঐক্য-সাধন নাৎসি রাষ্ট্রীয় চিন্তার একটি মূল মন্ত্র। এই ঐক্য শুধু জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান সীমার মধ্যে পূর্ণতালাভ করিলেই চলিবে না, অন্য রাষ্ট্রে যে-সকল জার্ম্মান আছে তাহাদিগকেও জার্ম্মেনীর মধ্যে আনিয়া একটা বৃহত্তর জার্ম্মেনী সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই নাৎসিদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু অষ্ট্রীয়ার ক্ষেত্রে নাৎসিদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পথে দুইটি প্রবল বাধা ছিল। প্রথমতঃ, অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর ডাঃ ডলফুস্ অষ্ট্রীয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং সেজন্যে তিনি অষ্ট্রীয়ার নাৎসিদিগকে কঠিন শাসনে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইটালী, ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের মিত্রশক্তি চেকোস্লোভাকিয়া ও ইউ-

গোস্লাভিয়া জার্ম্মেনীর সহিত অষ্ট্রীয়ার মিলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এই শক্তিবর্গ জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়ার মিলন রোধ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের শত্রুতার ভয়ে আপাততঃ-শক্তিহীন জার্ম্মেনীর প্রকাশ্যে কিছু করিবার উপায় ছিল না। সেইজন্য জার্ম্মেনীর গভর্ণমেণ্ট বা নাৎসি দল প্রকাশ্যভাবে ডাঃ ডলফুসের শত্রুতাচরণ না করিয়া গুপ্তভাবে অষ্ট্রীয়ার মধ্যে বিপ্লব করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যে ষড়যন্ত্রের ফলে ডাঃ ডলফুস নিহত হন, উহা যে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত ছিল না তাহার অনেক আভাস পরে পাওয়া গিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের জন্য জার্ম্মেনীর নাৎসিদলই যে অষ্ট্রীয়ার নাৎসিদিগকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ষড়যন্ত্রকারীরা কৃতকার্য্য হইলে অষ্ট্রীয়ায় নাৎসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত ও পরিণামে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মেনীর সহিত মিলিত হইয়া যাইত। কিন্তু শক্তিবর্গের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইহা হইতে পারে নাই।

জার্ম্মেনীর গভর্ণমেণ্ট শক্তিবর্গের এই বিরুদ্ধাচরণের জন্য আগেই প্রস্তুত ছিলেন কি-না জানা নাই। কিন্তু ডাঃ ডলফুসের হত্যার পর ইটালী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার পরিচয় পাইয়াই সুর ঘুরাইয়া লইয়াছেন। তবু অশান্তি এখনও ঘুচে নাই। অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে জার্ম্মেনীর প্রকৃত অভিসন্ধি কি এ-বিষয়ে শক্তিবর্গ এখনও বিশেষ সন্দিগ্ধ। বর্ত্তমানে ক্ষমতার অভাবের জন্য কিছু করিতে সাহস না করিলেও ভবিষ্যতে জার্ম্মেনী যে অষ্ট্রীয়াকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে না তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

ভারতের জীবিত গৌরব যাঁহারা

ইউনাইটেড প্রেস করাচী হইতে ৫ই আগষ্টের এক সংবাদে জানাইতেছেন যে, হাঙ্গেরীর বিখ্যাত ব্যঙ্গরসিক ও বেহালাবাদক লাসলো শোয়ার্টজ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া তাঁহাদের এক প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন,

"পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী মনোহরণ দেশ। ভারতের মঙ্গলের উপরই সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ভারতের আকাশে মহাত্মা গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রনাথ এই দুই ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মনোরাজ্যের দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত প্রাসাদে বাস করেন এবং পুষ্পে পুষ্পে ও স্রোতস্বিনীর ঊর্ম্মিশিলায় বিচরণ করেন। তিনি বাস্তব জগতের অধিবাসী নহেন, এই জগতের নহেন; তিনি আদর্শবাদী, ভারতের বাগ্দেবীর মূর্ত্ত প্রতীক।

"মহাত্মা গান্ধী যিশুখৃষ্টের সমতুল্য···অন্যের পাপে তিনি প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মনিগ্রহ করিয়া থাকেন।··যিশুখৃষ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীও সেই ভুল করিতেছেন·····"

*

১২ই আগষ্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে মহাসমারোহে 'বৃক্ষরোপণ' ও হলকর্ষণ' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে কবির নূতন নাটক 'শ্রাবণধারা' অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃত্যে ও সঙ্গীতে আলোক ও বিভিন্নবর্ণের সমাবেশে অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার খানবাহাদুর আরসাদ আলি উপস্থিত ছিলেন, রামপুরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন।

*

হরিজন সফরে প্রায় আটলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা গান্ধী নির্দ্ধারিত সাতদিনের অনশন সমাপ্ত করিয়াছেন। এই টাকা হইতে কাহাকেও বেতন দেওয়া বা প্রচার কার্য্যের জন্য কিছুই খরচ করা হইবে না। হরিজনদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য এই টাকা দুই বৎসরে ব্যয় হইবে।

*

এসোসিয়েটেড প্রেস করাচী হইতে (৩১শে জুলাই) খবর দিয়াছেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও শ্রীযুক্ত আনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিয়া ন্যাশ-নালিষ্ট পার্টি নামে একটি নূতন দল গঠন করিতেছেন। বঙ্গ-দেশের তরফ হইতে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় পণ্ডিতজীকে অন্তরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী গতকল্য প্রাতে কলিকাতা পৌছাইয়াছেন। রামমোহন লাইব্রেরিতে অদ্য এবং আগামী কল্য তাঁহাদের নূতন গঠিত দলের সভা বসিবে।

*

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরু প্লুরিসিরোগে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হওয়াতে পণ্ডিত জহরলালকে কয়েক দিনের জন্য বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি এলাহাবাদে আনন্দভবনে পীড়িতা পত্নীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত আছেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রনৈতিক কোনও ব্যাপারে মতামত দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে কংগ্রেসের মধ্যে দলা-দলিতে তিনি দুঃখিত।

*

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১১ই আগষ্ট তারিখে মান্দ্রাজে ভারতীয় নারীমণ্ডলের সভানেত্রী হিসাবে বলিয়াছেন,

"কেবল খদ্দর পরিলেই 'স্বদেশী' প্রতিপালিত হয় না। স্বদেশীর যে সকল শিল্প, বৃত্তি এবং অতীতের যে সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্য বর্ত্তমানে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।"

*

ভেনিসের আন্তর্জ্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কণি ও ইতালীর স্বরাষ্ট্রসচিব তারযোগে স্যার সি. ভি. রামনকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

*

কংগ্রেসের মর্য্যাদাহানির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত এবং সাম্প্রদায়িকতা ও গুণ্ডামিরূপ দানবের সহিত সংগ্রাম চালাইবার জন্য যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ডাক্তার কিচলু অমৃতসরে সাতদিন অনশনব্রত পালন করিয়াছেন।

লোকান্তরিতদের স্মৃতিপূজা

গত ১৩ই শ্রাবণ রবিবার স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ত্রিচত্বারিংশৎ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪ই শ্রাবণ সোমবার এই উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটান স্কুলেও উক্ত দুই দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ হয়।

*

১১ই শ্রাবণ শুক্রবার বেলিয়াঘাটা সুবার্দ্ধন রিডিং ক্লাবে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সভা হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডি, আর, ভাণ্ডারকর সভাপতির আসন গ্রহন করেন। এই মহাপুরুষের যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয়, স্যার দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাহার সভাপতি হন।

*

গত ২১শে শ্রাবণ সোমবার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভবনে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ পরলোকগত রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। অনরেবল স্যার বিজয়-প্রসাদ সিংহ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

*

১৬ই শ্রাবণ বুধবার বড়বাজার হিন্দুসভার উদ্যোগে তারাসুন্দরী পার্কে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে একটি জনসভা হইয়াছিল। প্রথমে পণ্ডিত নন্দলাল অটল ও পরে শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

*

২৪শে জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের ৫০ তম স্মৃতিবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

*

৬ই শ্রাবণ রবিবার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়াছে। টাউনহলে একটি বিরাট জনসভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বৎসরে বৎসরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহাপুরুষগণের স্মৃতিপূজার কোনই অর্থ হয় না, যদি আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবার চেষ্টা না করি। এই সকল পুরুষের আদর্শ যদি বিফল হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইঁহাদের মৃত্যুতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—আমাদের মধ্যে ইঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যর্থই হইয়াছে। সেই অবস্থায় এই সকল শ্রাদ্ধবার্ষিকী অনুষ্ঠান না করিলেই এই সকল ব্যক্তির যথার্থ সম্মান করা হয়।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশ এখন মন্বন্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে নিরাশাবাদীরা বলিতেছেন, নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। চতুর্দ্দিকে যে সকল বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, বাঁচিতে হইলে এখন আমাদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতেই বাঁচিতে হইবে। চিন্তায় ও কর্ম্মে আমরা অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িয়াছি; মূঢ়তা এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়তা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত জ্ঞানবীর, সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, কৃষ্ণদাস পাল ও যতীন্দ্রমোহনের মত কর্ম্মবীরের জীবন ও কর্ম্মের আলোচনায় সুফল হইতে পারে এবং সেই হিসাবেই এই স্মৃতিবার্ষিকীগুলি সার্থক অনুষ্ঠান।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় অতিশয় দৃঢ় ছিলেন। তাঁহার তুল্য সময়ের মর্য্যাদাবোধ সেই কালে আর কোনও বাঙ্গালীর ছিল না। তিনি সমস্ত কাজে কঠোর শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই জীবনে এত কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাবকে ইয়োরোপীয়ও বলা চলিতে পারে। সময়ানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শকে অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা এমন অবসাদগ্রস্ত ও ক্লীব হইয়া পড়িয়াছি যে, অধিকদিন এভাবে চলিলে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন আজিও সেগুলি প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে। তাঁহার বিবিধার্থ সংগ্রহ ও বাংলা সাহিত্যে

বিজ্ঞানাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচেনার একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানান্বেষীদের তুলনায় এই দুই মহাপুরুষের জ্ঞানসাধনা যে কত বিপুল ছিল তাহা তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায়।

বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্র-নায়কগণের রাষ্ট্র-সাধনার সহিত স্যর সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-সাধনার তুলনা করিলেও বুঝিতে পারি, তিনি কত বড় বিরাট পুরুষ ছিলেন; উঁইঢিবির তুলনায় তাঁহাকে হিমালয় বলিতে পারি। তাঁহার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহাই একনিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। বর্ত্তমান যুগের নেতাদের মত তাঁহার মুখে এক, মনে আর ছিল না। রাষ্ট্র-আন্দোলনে যে সকল ব্যক্তি সম্প্রতি সরফরাজি করিতেছেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তায়, বক্তৃতায় মাঝে মাঝে তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে যে, রাষ্ট্রসাধনায় তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া বহু দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। মুখের কথায় কিছুই আসে যায় না, ফলাফল দেখিয়া বুঝিতে পারি, আমরা পিছাইয়াই পড়িতেছি, অগ্রসর হই নাই। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ভিত্তি ছিল দৃঢ়। বর্ত্তমান নেতাদের তাহা নয়।

বাংলার শেষ সত্যকার সাধক যতীন্দ্রমোহনও মাতৃভূমির সেবায় একাগ্র ও একনিষ্ঠ ছিলেন।

বাংলা দেশে এই সততা, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার অভাব হইয়াছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত

গত ১৯শে জুলাইয়ের একটি গবর্ণমেণ্ট সার্কুলারে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি কে. টি. ও. বি ই. মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, বার-এট-লকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্যর আশুতোষের দ্বিতীয় পুত্র, তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার আর কাহারও হস্তে অর্পিত হয় নাই। ১৯২৪ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্য থাকিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগ পরিচালনায় এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়া কৃতিত্বের সহিত এই কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকল ছিদ্রের প্রতিই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। তরুণেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং ঝুনারাও বরাবর যে কারণেই হউক তাঁহার কথায় সায় দিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রথম রাজত্বকাল যে গৌরবময় হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

•

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান লইয়া এতকাল যে আন্দোলন চলিতেছিল, গত মঙ্গলবার, ১৪ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ আজিজুল হক মহোদয়ের বাড়ীতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য এক বৈঠক বসিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিবর্গ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইহা সত্য হইলে ভাষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকদের অবহিত হইবার সময় হইয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বহুবিষয়ে সহজবোধ্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক নাই। এই গুলি যাহাতে সুযোগ্য লোকের দ্বারা লিখিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন হইতে সে বিষয়ে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করাও প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত

পঞ্জিকায় দেখা যায়, পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে নানাগ্রহের যোগাযোগে নানাবিধ বিপর্য্যয়ের ভয় দেখাইয়া থাকেন। এক সঙ্গে ভূমিকম্প, মড়ক, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিয়া আমরা সেই সেই সময়ে আতঙ্কিত হইয়া থাকি। এইরূপ দুঃসময় সাধারণতঃ আসে না, কিন্তু এই বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে দেখিতেছি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে মহামারী সুরু হইয়াছে সম্ভবতঃ পঞ্জিকাকারেরাও এতাবৎকাল সকল গ্রহের যোগাযোগেও তাদৃশ বিপর্য্যয় কল্পনা করেন নাই। ভূমিকম্প, প্লাবন, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, গ্রীষ্মাধিক্য, ধূলিমেঘ ইত্যাদি ভয়াবহ সমস্ত ব্যাপার, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এত ঘন ঘন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মনে হয় প্রলয়ের আর বাকী নাই। ইহার উপর আবার অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বেকার-সমস্যা। তারপর, চুরী ডাকাতি রাহাজানি, নারীহরণ!

বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা, ভূমিকম্প, প্লাবন, চুরিডাকাতি ও নারীহরণ ছাড়া আর তিনটি মহাভয় লাগিয়াই আছে—ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি ও কচুরীপানা। ম্যালেরিয়া আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বেরিবেরির অত্যধিক বিস্তারে আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে কচুরিপানাও যেভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে বাংলাদেশ অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা মানুষ সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করেন, তাঁহারা বলিতেছেন, হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিলে ভূমিকম্পের বিপদ অনেকটা কম করিয়া আনা যায়; রাজায় প্রজায় সম্প্রীতি হইলে এবং মানুষের অভাব কিছু পরিমাণ দূর হইলে চুরিডাকাতি, নারী-হরণও বন্ধ করা যায়: হিন্দু মুসলমান উভয়কেই পরমত-সহিষ্ণু করিয়া তুলিতে পারিলে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গাও রদ করা যায়; এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ও প্রজাদের সহায়তায় প্লাবন, ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি ও কচুরিপানার বিস্তারও বন্ধ করা কঠিন নহে।

কিন্তু এ সকল অতি-আশাবাদীর কথা। আমরা চোখ চাহিয়া বসিয়া আছি আর দেখিতেছি, আমরা প্রতিদিন মরিয়া যাইতেছি, কোনও দুর্দ্দশারই প্রতীকার হইতেছে না। কোনও দিন প্রতিকার হইবে বলিয়াও ভরসা পাওয়া যাইতেছে না।

*

এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থাতেও দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'ম্যালেরিয়া নিবারণের অভিনব উপায়' 'কচুরীপানা ধ্বংসের পন্থা' 'বেরিবেরি মহামারী ও তাহার প্রতিকার' ইত্যাদি শিরোনামা দেখিলেও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। এই তিনটি শিরোনামাই গত মাসের ১লা, ২৯শে ও ২৭শে তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে যথাক্রমে দেখিয়াছি ও আশান্বিত হইয়াছি। নিম্নে উপরোক্ত তিনটি সংবাদেরই সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

ম্যালেরিয়া

যেহেতু মশা (এনোফিলিশ জাতীয়) অসুস্থ লোকের শরীর হইতে রোগ-জীবাণু লইয়া সুস্থ লোকের শরীরে সঞ্চারিত করিয়া ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটায়, সেজন্য ম্যালেরিয়া নিবারণকার্য্য, মশা ধ্বংস করা ও রোগীকে কুইনাইন প্রয়োগে আরোগ্য করা— এই দুই কার্য্যেই এতদিন বদ্ধ ছিল। কিন্তু যে দেশের প্রতি গ্রামে প্রায় সকল স্থানেই মশা জন্মাইতে পারে- বাঙ্গলার ন্যায় এরূপ জলা-দেশে—সম্পূর্ণ ভাবে মশা দূর করা যে কোন গবর্ণমেণ্ট বা জনসাধারণের সাধ্যাতীত। ম্যালেরিয়া রোগীর শরীর হইতে মশা যে রোগ-জীবাণু সংগ্রহ করে, এই তত্ত্ববিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞ অনেক দিন হইতে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এতদিন কুইনাইন ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। অবশ্য কুইনাইন প্রয়োগে যে, রোগীর জ্বর বন্ধ করা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই- কিন্তু যে প্রকারের জীবাণু মানুষের শরীর হইতে মশার শরীরে গিয়া বাড়ে—যদিও সেই প্রকারের জীবাণু থাকার ফলে মানুষের জ্বর না হইতে পারে—কুইনাইন মানবদেহের এই জীবাণু নষ্ট করিতে পারে না।

অল্পদিন হইল "প্লাসমোচিন" নামক একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে —এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, কুইনাইন যে কাজ করিতে পারে না, তাহা সাধিত হয়। কুইনাইনের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর জ্বর বন্ধ হইবে এবং তাহার শরীরে এমন রোগ-জীবাণু থাকিবে না, যাহা লইয়া মশা রোগ ছড়াইতে পারে। ইহার দ্বারা ম্যালেরিয়ার রোগ-জীবাণু সমূলে বিনষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে; ফলে, মশা যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকিলেও রোগবিস্তার ও নিবারণ করা সম্ভব হইবে। ডাক্তারখানায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সমগ্র দেশে ইহার প্রচলন করিবার পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগফল পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বর্দ্ধমান জেলার মেমারী থানার এই পরীক্ষাক্ষেত্রের পরিসর ৪৪বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৯৭টি গ্রামে মোট ২১ হাজার লোক বাস করে। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে এইখানে ৭টি ডাক্তারকে নিয়োগ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল—

১। ম্যালেরিয়া রোগীদের অতি সত্বর আরোগ্য করা,

২। তাহাদের অসুস্থতা কমানো,

৩। বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের দিন—জ্বরে পড়িয়া থাকার কাল, যতদূর সম্ভব কমানো এবং (৪) ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার নিবারণ।

সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রচারকগণ তিনমাস ধরিয়া এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রের প্রত্যেক গ্রামে একাধিকবার যাইয়া ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়স্কোপের সাহায্যে গ্রামবাসিগণকে ম্যালেরিয়া ও তাহার নিবারণ-বিধি বিষয়ে বুঝাইয়াছেন; মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় স্বয়ং ঐ স্থানে গিয়া ৯ই জুন তারিখে আমাদপুরে এবং ১০ই জুন তারিখে সাতগাছিয়া গ্রামে সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি দেশবাসীকে এই পরীক্ষায় সাহায্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, গ্রামবাসিগণও যথোচিত উত্তরদানে কর্ম্মীবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

প্রথম তিনমাস কাল ডাক্তারেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জ্বরের সম্বন্ধে তদন্ত করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে ২০,৪৫০ জনকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। জুলাই মাসে বিভিন্ন গ্রামে ৩০টি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়, গ্রামস্থ লোকেরা যাহাতে সেখানে নির্দ্দিষ্ট দিবসে গিয়া ঔষধ লইতে পারে। এই সময়ে যাহাতে বাড়ী বাড়ী ঔষধ দেওয়ার বন্দোবস্ত বন্ধ না হয় সেজন্য বর্ত্তমানের সুযোগ্য জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১২জন স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গ্রামে গ্রামে ঔষধ বিতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাকেন্দ্রের কাজ চলিতে থাকে। বাকী ৯ মাসে ঐ সকল কেন্দ্রে মোট ৬,৯৬৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

পরীক্ষাক্ষেত্রের ঠিক বাহিরে বসন্তপুর গ্রামে ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, ঐ মাসের মধ্যে শতকরা ৫০ জন জ্বরে ভুগিয়াছে। ঐ মাসে পরীক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্গত গ্রামে শতকরা মাত্র ১৬ জন লোক জ্বরে ভুগিয়াছিল।

পরীক্ষাক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ দুইটি হাসপাতালের রোগীর হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে সর্ব্বসমেত রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৩৬৬, সেই সংখ্যা ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসে বাড়িয়া ২,৫৬৩ হইয়াছিল—কিন্তু পরীক্ষাক্ষেত্রের হিসাবে জুলায়ের ১,০৫৮ জন কমিয়া নভেম্বর মাসে ৯৬৬ জনে দাঁড়াইল। নভেম্বর মাসে যে সময়ে সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেই সময় এই ঔষধপ্রয়োগের ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রে রোগীর সংখ্যা না বাড়িয়া কমিয়া গেল। বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে যখন পরীক্ষাক্ষেত্রে একশতের মধ্যে মাত্র ১৭ জনের শরীরে ম্যালেরিয়া-জীবাণু পাওয়া গিয়াছে তখন অন্যত্র বালক-বালিকাদের মধ্যে ৩৩ জনের শরীরে পাওয়া গিয়াছিল। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে malignant tertian জাতীয় রোগ-বীজাণু বিশেষ কমিয়া গিয়াছে।

- উপরোক্ত এবং অন্যান্য হিসাবে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে পরীক্ষাক্ষেত্রে কেবল যে কম সংখ্যক লোক জ্বরে ভুগিয়াছে তাহা নয়, উপরন্তু যাহারা বৎসরে ৫।৬ বার জ্বরে ভোগে তাহারা মাত্র ২।৩ বার ভুগিয়াছে এবং যখন অন্যত্র লোক প্রতি-আক্রমণে ৬ হইতে ৮ দিন ভুগিয়াছে তখন এই স্থানে ঔষধপ্রয়োগের ফলে কোন ক্ষেত্রেই ২।৩ দিনের বেশী ভুগিতে হয় নাই;

ফলে জ্বরভোগের কাল কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকার কালও অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। যদি এই হিসাবে ধরা যায় তবে এক অক্টোবর মাসেই শতকরা (৫০-১৬)=৩৪ জন জ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যদি বিনা চিকিৎসায় লোকে প্রতিবার ৮ দিন ভোগে এবং চিকিৎসার ফলে যদি মাত্র ৪ দিন ভোগে তবে প্রতি রোগীর প্রতিকারের জ্বরের অন্ততঃ ৪ দিন বাঁচিয়াছে। সুতরাং ১০০ লোকের মধ্যে ৫০ জন জ্বরাক্রান্ত হইলে যদি প্রতিজনের ৮ দিন নষ্ট হয় তবে মোট ৪০০ দিন অপব্যয় হয়। সেই ক্ষেত্রে মাত্র ১৬ জন ৪ দিন করিয়া জ্বরে ভুগিলে মাত্র ৬৪ দিন অপব্যয় হয়, বাঁচে ৩৩৬ দিন। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৩৫ জন কর্ম্মক্ষম ধরিলে তাহারা এই ৩৩৬ দিনের মধ্যে তাহাদের ভাগের ১২৬ দিন কাজ করিতে পারে। যদি দিন আয় চারি আনা হিসাবেও ধরা যায় তবে প্রতি ১০০ লোকের মধ্যে ২৯৲ টাকা আয় বাড়িয়া গিয়াছে।

এই অনুপাতে সমগ্র পরীক্ষাক্ষেত্রের ২১,০০০ লোকের মধ্যে জ্বর আংশিক নিবারণ হওয়ায় জ্বরে পড়িয়া না থাকিয়া কাজ করিতে পারার ফলে এক অক্টোবর মাসেই মোট ৬০৯০৲ টাকা লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র বৎসরের ঔষধের ব্যয় হইয়াছে মাত্র ৭,৫০০ টাকা।

ইহার জন্য শুধু গবর্ণমেণ্ট খরচ করিলেই ফল পাওয়া যাইবে না—সাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগ একান্ত প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও জ্বর হইলে যেন সত্বর চিকিৎসা হয় এবং একটি লোকও যেন অচিকিৎসিত না থাকে। সত্বর ঔষধ ব্যবহার করিয়া ম্যালেরিয়া রোগীকে রোগ-জীবাণু হইতে মুক্ত করিতে পারিলে আর রোগসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। অন্যথা একটি মাত্র লোকও রোগ-জীবাণু বহন করিলে মশা তাহার শরীর হইতে জীবাণু গ্রহণ করিয়া অপর অনেককে পীড়া দিবে। জনসাধারণের সহযোগ ও চেষ্টার উপর এই কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

কচুরীপানা

ঢাকা (১০ই আগষ্ট—

শ্রীযুত সুবিমল বসু কচুরীপানা ধ্বংসের নিমিত্ত যে ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের উদ্যোগে তিনি ঢাকা সহরের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতে থাকায় শ্রীযুক্ত বসু যদিও ঔষধ সিঞ্চনের সম্পূর্ণ ফল পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করেন নাই তথাপি উহা বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কেনিথ মাকলিয়ান সমস্ত স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীযুত বসুর আবিষ্কৃত ঔষধ-সিঞ্চনের ফল দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুত বসু আগামী অক্টোবর মাসে ঢাকায় ও ঢাকা জিলার অন্যান্য স্থানে তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধ-সিঞ্চনের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অনুমিত হয়।

বেরিবেরি

শ্রীসুধীর চন্দ্র সুর, এম-বি লিখিয়াছেন—

এ ব্যাধি প্রধানতঃ বর্ষাকালে অন্নভোজীদের ভিতর দেখা যায়। সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবার ২।৫ দিন আগে অনেক ক্ষেত্রেই উদরাময় পেটের গোলযোগ ও খাদ্যে অরুচি দেখা যায়। তাহার পরই পেটের অসুখ একটু উপশমিত হইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্রমশঃ পায়ের উপর চেটো ফুলা আরম্ভ হয় ও ক্রমশঃ হাঁটুর দিকে বিস্তার করে; সমস্ত রাত্রি বিশ্রামের পর প্রাতঃকালে ফুলা কম থাকে বা থাকেই না ও বিকালে বেশী হয়। শারীরিক দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ও চলিতে ফিরিতে হাঁপ লাগে ও কাহার কাহারও বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে। পায়ের ভিতর ঝিনঝিন, বা কন্ কন্ করে। মানসিক প্রফুল্লতা কমিয়া যায়। ব্যারামটি সচরাচর বহুদিন স্থায়ী হয় ও ইহার বৃদ্ধি অনুসারে আরও নানারূপ উপসর্গ আসে, ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে বা ব্যারাম নিরাময় হইলেও হৃদপিণ্ডের ব্যাধি চিরস্থায়ী ভাবে অল্পবিস্তর থাকিয়া যাইতে পারে।

অধিকাংশ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস, কলের চাউল পালিশ হওয়ায় চাউলের উপরের 'ভিটামিন'-যুক্ত ছালটি উঠিয়া যায়। ফলে ভিটামিন অভাবে বেরিবেরি হয়। ঢেঁকী ছাটা বা বিনাপালিশের চাউলে ভিটামিন থাকে ও উহা ব্যবহারে বেরিবেরি হয় না, কিন্তু আমি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করে ও ঢেঁকিতে প্রস্তুত চাউল ব্যবহার করে, তাহাদের ভিতরও বেরিবেরি হয়। তাহাদের চাউলের ভিটামিনধারী ছালটি উঠিয়া যায় না, তাহারা সদ্যপ্রস্তুত চাউল ব্যবহার করে। ছাঁটা চাউল অযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া চাউলের উপরের ভিটামিন নষ্ট হইতে দেয় না। এই সমস্ত পল্লীবাসীদের শোথ বা ফুলা ব্যাধিকে কেহ কেহ বেরিবেরি না বলিয়া বলেন 'এপিডেমিক ড্রপসী'। কিন্তু আমি এই সমস্ত রোগীদের ভিতর অনেক সময় প্রকৃত বেরিবেরি দেখিয়াছি। হইতে পারে যে, ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটিবার আগে মড়াইয়ে ধান অনেক দিন সঞ্চয় করিয়া রাখা কালে বা অযত্নে সঞ্চয় করার দরুণ ধানের মধ্যেই চাউলের ভিটামিন কোনও প্রকারে নষ্ট হইয়া যায় বা উক্ত ভিটামিন কার্য্যকরী অবস্থায় থাকে না ও উক্ত চাউল ব্যবহারে বেরিবেরি হয়। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঢেঁকী ছাঁটা চাউলেও বেরিবেরি হইতে পারে—উক্ত চাউলে ভিটামিনধারী চাল বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ভিটামিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা কার্য্যকরী অবস্থায় নাই। সুতরাং যাহারা বেরিবেরির ভয়ে ঢেঁকী ছাটা চাউল নিষিদ্ধভাবে ব্যবহার করেন, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ নহেন। চাউল কিনিবার সময় কোন চাউলে ভিটামিন বর্ত্তমান ও কোন চাউলে বর্ত্তমান নাই, তাহা সাধারণে নির্দ্ধারণ বা বিচার করিতে অক্ষম। অতএব আমার মতে সকল পরিবারের প্রত্যহ ব্যবহারের পরিমাণে চাউল নিত্য নূতন দোকান হইতে খুচরা ক্রয় করিবেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন অঞ্চল বা বাজার হইতে ক্রয় করিতে পারিলে ভাল হয়। পুরাতন চাউল অপেক্ষা নূতন চাউল অনেকটা নিরাপদ। দৈনিক ব্যবহারোপযোগী চাউল প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে দৈনিক সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি বার মাস এইরূপ করিতে বলিতেছি না। কেবলমাত্র বর্ষার সময় করা দরকার।

এতদ্ব্যতীত নিত্য সূর্য্যতাপ ও রশ্মি ও নির্ম্মল বায়ু সেবন, প্রচুর বা অবস্থানুযায়ী দধি দুগ্ধ সেবন ও নানারূপ মিশ্র শাকসব্জী ও তরকারী আহার ইত্যাদি ব্যবস্থা করিলে এই ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ আশা করা যাইতে পারে। ব্যাধি আক্রমণ করিলে অন্যান্য ব্যবস্থা দরকার। ব্যারামটি ভয়ঙ্কর, তাহার অনুপাতে তাহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা কোন মতেই কঠোর নহে।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট.

কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গশ্রী

কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ

—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সম্প্রতি "কমিউনিজম" * নামে যে একখানি বাংলা বই বাহির হইয়াছে তাহাতে লেখক কমিউনিজম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গতঃ গান্ধীবাদের সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন। এই দুইটি মত লইয়া আমাদের দেশে প্রচুর আলোচনার প্রয়োজন আছে। লেখক যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বল্পপরিসর গ্রন্থে যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। হইলে ভাল হইত; কেন না, তিনি উভয় মতের বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে তাঁহার কিছু কিছু সাক্ষাৎ পরিচয়ও আছে। যাহাই হউক, বইখানি পড়িবার সময়ে গান্ধীবাদ ও কমিউনিজমের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যে সকল প্রভেদের কথা মনে হইয়াছিল তাহাই উপস্থিত বলিবার চেষ্টা করিব।

লেখক ঠিকই বলিয়াছেন যে, উভয় মতের "আদর্শ এক," কিন্তু ইহাতে সমস্ত কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় নাই। একথা সত্য যে শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টগণ এবং গান্ধীজি উভয়েই চান যে, সকল লোক জীবনধারণের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজি আপাততঃ ইহার বিরোধী মতও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অবশ্য একবার স্বরাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিবে তাহাদেরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু কার্যতঃ করাচী প্রস্তাবে তিনি তাঁহার সে মতকে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হন নাই। ইহা অকৃতকার্য্যতা হইতে পারে, কিন্তু যেখানে তিনি চিন্তায় এবং মতেও পূর্ব্বোক্ত আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এখানে তাহারই কথা বলিতেছি।

কমিউনিষ্ট মতে ধনী এবং নির্ধনের স্বার্থকে পরস্পরবিরোধী বলা হয়। একের স্বার্থে অপরের হানি, ইহা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া ধরা হয়। গান্ধীজি কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে শেষ পর্য্যন্ত ধনী এবং নির্ধন উভয়ের স্বার্থ এক। সমগ্র মানবের কল্যাণে যখন ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তখন উভয়ের স্বার্থ সমান। যেখানে তাহা পরস্পরবিরোধী সেখানে সাম্য আনিয়া সেই বিরোধকে মোচন করিতে হইবে। কিন্তু কথা হইল, যে, শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ধনী নির্ধনের ভেদাভেদ যে থাকিবে না, একথা কি গান্ধীজি ভাবিয়া দেখেন নাই? নির্ধনের পরিশ্রমের উচিত মূল্য না দিয়াই ত' ধনী ধনসঞ্চয় করে, ইহা কি গান্ধীজি স্বীকার করেন না? হয়ত গান্ধীজি কখনও কখনও একথা ভাবিয়াছেন।* বিলাতে বক্তৃতাকালে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল যে, দেশের রাষ্ট্র জনগণের (the masses as opposed to the classes) মঙ্গলের জন্যই পরিচালিত হইবে। অন্য যে কোন স্বার্থ

* শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

* Nature produces enough for our wants from day to day, and if only everybody took enough for himself and no more, there will be no poverty in the world, and there will be no man dying of starvation in the world.—"*Selection from Gandhi*". p 63.

You could not raise palaces but by starving millions. Look at New Delhi which tells the same tale Look at the grand improvements in the first and second class carriages on railways. The whole trend is to think of the privileged few and to neglect the poor. If this is not satanic what is it? If I must tell you the truth I can say nothing less. I have no quarrel with those who conceived the system. They cou'd not do otherwise. How is an elephant to think for an ant? They think in terms of the privileged few. We must think in terms of the teeming millions.—*Young India*, 10. 2. 1927.

অথচ তিনি ইহাও বলিয়াছেন—

I cannot picture to myself a time when no man shall be richer than another. But I do picture to myself a time when the rich will spurn to enrich themselves at the expense of the poor and the poor will cease to envy the rich. *Young India*, 7. 10. 1926

I am for the establishment of right relations between capital and labour etc. I do not wish for the supremacy of the one over the other. I do not think there is any natural antagonism between the two. *Young India*, 8. 1. 1925

"Every interest that is hostile to their interest, must be revised or must subside, if it is not capable of revision."

জনগণের স্বার্থের বিরোধী হইবে, তাহা নষ্ট করিতে হইবে, অথবা তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

তিনি একবার একথাও বলিয়াছিলেন যে, "প্রকৃতিদেবী দিনের পর দিন মানুষের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উৎপাদন করেন এবং সেই জন্য একজন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করিলেই অপরকে বঞ্চিত হইতে হয়।" ইহাই যদি তাঁহার চূড়ান্ত মত হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত ধনী-নির্ধন বলিয়া কোন ভেদ ত' থাকিতে পারে না। যতদিন তাহা থাকিবে ততদিন সর্ব্বমানবের কল্যাণ ত' কখনও সম্ভব নহে। গান্ধীজির স্বরাজের আদর্শে যেখানে সকলকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে, যেখানে কেহ অভাবের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিতে ঘৃণা বোধ করিবে, সেখানে ধনী, নির্ধন এই দুই জাতি কেমন করিয়া থাকিতে পারে? অথচ ভবিষ্যতে যে দুই জাতিই বর্ত্তমান থাকিবে তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। কেমন করিয়া থাকিবে—জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, কেহ হয়ত ভাল জমি পাইবে, কাহারও বা জমি অনুর্ব্বর হইবে, এই কারণে ধনবৈষম্য হইবে। অথচ সেই প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, যাহারা অধিক ধনসঞ্চয় করিবে, রাষ্ট্রশক্তি তাহাদের সেই ধনের আধিক্য সংগ্রহ করিয়া সমাজের সেবায় নিয়োগ করিবে। যৌথ-পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের মধ্যে তারতম্য থাকিলেও যেমন সকলের আয় যৌথ-ভাণ্ডারে সম্মিলিত হয়, ও একত্র ব্যয় হয়, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রেও, তাঁহার ইচ্ছা যে, তাহাই হইবে।

যে সমাজ-ব্যবস্থা চলিতেছে, গান্ধীজির এই সকল উক্তির মধ্যে তাহার প্রতি আমরা একটা স্নেহের ভাব দেখিতে পাই। যদি তাঁহার সকল যুক্তি ও দরিদ্রের প্রতি তাঁহার নিবিড় প্রেম স্পষ্টভাবে বলে যে, ইহা অমঙ্গলের নিদান, ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অতএব ইহাকে বিনাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে তিনি সে কথা স্পষ্টভাবে বলেন না কেন? ধনীকে একথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল, যে, "ভগবান তোমাকে অর্থ দিয়াছেন, তুমি দরিদ্রের ন্যাসী হইয়া তাহা ব্যয় কর?" যে লোভের জন্য ধনী ধনসঞ্চয় করে তাহাকে এমন ক্ষমার চক্ষে দেখিবার প্রয়োজন কি? দরিদ্র যখন অত্যাচারের বশে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে তখনই বা আমরা তাহার ক্রোধকে ক্ষমার চক্ষে দেখিব না কেন? নিন্দনীয় হইলে লোভ এবং ক্রোধ উভয়কেই নিন্দনীয় বলিতে হয়। উভয়ের মধ্যে তারতম্য করিবার ত' কোনও কারণ নাই। অথচ গান্ধীজি ক্ষেত্রবিশেষে তাহা করেন, ইহা দেখা গিয়াছে। এই জন্য বলিতে হয়, যে, সমাজের শেষ লক্ষ্যের সম্বন্ধে গান্ধীজির ধারণা স্পষ্ট হইলেও মধ্যপথের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট নহে; নয়ত বলিতে হয়, তিনি সাম্যবাদীগণকে ধাপ্পা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৈষম্য বজায় রাখিতে চান, অথবা তিনি ধনীকে হাতে রাখিবার জন্য তাহার সম্মুখে এক কথা বলেন, আবার দরিদ্রের সম্মুখে গিয়া নিজের মনের কথাটি খুলিয়া বলেন। গান্ধীজির উপর যাঁহার যেমন শ্রদ্ধা, তিনি তেমনি ভাবে উপরোক্ত উক্তিগুলির এবং তাঁহার আচরণের ব্যাখ্যা করিবেন।

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, যে, গান্ধীজির নিজের মনে আদর্শ-সিদ্ধির পূর্ব্বাবস্থার সম্বন্ধে চিন্তার অস্পষ্টতা আছে। এবং ইহার জন্য দায়ী তাঁহার মধ্যে অভিমানের একান্ত অভাব এবং তৎসঙ্গে তাঁহার অন্তর্নিহিত পুরাতনের প্রতি প্রেমের সংস্কার। সত্যকে পাইয়াছি, দৃঢ়ভাবে গান্ধীজি একথা কখনও বলেন না। যে কোনও মতের সহিত তাঁহার বিরোধ হউক না কেন, তিনি তাহার প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, এবং সেইজন্য নিজের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া শুধু নিজের মতকেই সাধারণের উপর চাপাইতে চেষ্টা করেন না। সত্যের অপরিমেয়ত্বের উপর তাঁহার একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই এরূপ হয়।* যাহার সহিত তাঁহার মতের বিরোধ হয়, তাহার মতের প্রতি তিনি চেষ্টা করিয়া মনে বেশী শ্রদ্ধা আনেন, তাহার দিকটা বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই কারণে তিনি ধনীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়াও যে পুরাতনের প্রতি তাঁহার মনে প্রেমের একটি সহজাত সংস্কার আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যাহা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে তাহাকে তিনি সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, যখন তাহাকে আর রাখা যায় না তখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে রাজী

---

* Satyagraha is literally holding on to Truth, It excludes the use of violence, because man is not capable of knowing the absolute truth and therefore not competent to punish—*Speeches & Writings of Mahatma Gandhi* Gandhi, 4th ed. G. A, Natesan & Co. P. 506

হন, নয়ত নয়। এই উভয় কারণের জন্য গান্ধীজির মনে ধনী নির্ধনের প্রশ্নের সম্বন্ধে একটি অস্পষ্টতা থাকিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সঞ্চয়-বৃত্তি পরিহার করিয়াছেন, শারীরিক পরিশ্রমকে যজ্ঞের মত প্রয়োজনীয় মনে করেন ; ইহাতে শেষ লক্ষ্যের সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যত গোল বাধিয়াছে মাঝের অবস্থাগুলি লইয়া।

কাশী পৌছিতে হইলে যেমন পথে কোন্ কোন্ ষ্টেশন পড়িবে, কোথায় গাড়ী কতক্ষণ থামিবে, তাহা টাইম টেবল্ খুলিলেই পাওয়া যায়, সমধনযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় কখন কোথায় কি ঘটিবে, কমিউনিষ্টগণের লেখার মধ্যে তাহার সম্বন্ধে তেমনই স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সে নির্দ্দেশ সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ঐ বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহারা যত বেশী চিন্তা করিয়াছেন, গান্ধীজি স্বরাজের সীমা ও সংজ্ঞানির্দ্দেশে তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও পরিশ্রম করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বরাজ শব্দের অর্থ আমি স্থির করিবার কে? দেশের অভিজ্ঞতা যেমন বাড়িবে স্বরাজের অন্তর্নিহিত অর্থ তেমন তেমন পরিবর্ত্তিত হইবে।"

কমিউনিষ্টগণ তাঁহাদের পথের সুদূর এবং আসন্ন লক্ষ্যকে স্পষ্ট করিয়া তাহার প্রত্যেক অবস্থা আনয়নের জন্য নির্ব্বিচারে সকল উপায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা দেখেন, কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ভঙ্গ করিবার প্রয়াস করিতেছেন, তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত সমযোগে কাজ করেন, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাঁহাদের যতই বিরোধ থাকুক না কেন। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকল উপায়ই তাঁহারা গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের ছুঁৎমার্গ নাই। কেবল একটি বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন যেন তাঁহাদের লক্ষ্য, অর্থাৎ ধনী নির্ধনের ভেদ দূর করা, তাহা কখনও ভ্রষ্ট না হইয়া যায়।

গান্ধীজির আচরণ কিন্তু এইখানে উল্টা। তিনি একবার ঐ কাশীযাত্রার কথা বলিয়াই তাহার পর যাত্রীর পোষাক কেমন হইবে, তাহার পায়ের গতি কিরূপ হইবে, পথে শ্রান্তি আসিলে কি করিবে, এই সব বর্ণনা করিতেই ব্যস্ত। বস্তুতঃ তিনি সাধনার উপর যত বেশী মনোনিয়োগ করেন, সাধ্যের বিভিন্ন অবস্থার উপর তত নহে। একবার নহে, কয়েকবার তিনি একথা বলিয়াছেন যে, সাধনাই তাঁহার সাধ্য।* সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, অথবা উদাসীন হইবার চেষ্টা করেন। ভগবানের হাতে ফল ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। কেবল নিজের লক্ষ্য রাখেন ইহারই উপর যেন তাঁহার সাধনোপায় মানুষের প্রতি প্রেম ভিন্ন অপর কোনও ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়। সাধনার পরিশুদ্ধির উপরেই তাঁহার সকল লক্ষ্য, সাধ্যের বিভিন্নাবস্থার উপর নহে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইল ভগবানের উপর আত্মসমর্পণের ভাব সম্পূর্ণ করা এবং রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, মূলতঃ তাহাও সেই আত্মসমর্পণব্রতের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন।† সেইজন্য সাধনার পরিশুদ্ধির উপর তাঁহার এত লক্ষ্য এবং সেইজন্যই আপাততঃ তিনি ভারতের রাষ্ট্রগুরুর স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মগুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ইহাই হইল কমিউনিজম এবং গান্ধীবাদের মধ্যে লক্ষ্য এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের প্রভেদ। ইহাদের উভয়ের সাধন-পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে এইবার তাহার আলোচনা করা যাইবে। যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কমিউনিষ্টগণ সময় ও অবস্থা বিশেষে নানাবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবু তাঁহাদের সাধনপদ্ধতির একটি বিশেষ ধারা, একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। কমিউনিষ্টদল বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চেষ্টা নিন্দনীয় ত নহেই, বরং তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের আপত্তি যত বাড়িবে, তাহার পরিবর্ত্তনের যুগও তত ঘনাইয়া আসিবে। সেইজন্য তাঁহারা সেই ক্রোধ এবং অশান্তিকে না কমাইয়া বরং বাড়া'ন'র চেষ্টা করেন এবং মূলতঃ মানুষের মঙ্গলের জন্যই ইহা প্রয়োজন বলিয়া এই ক্রোধ এবং হিংসাকে অন্যায় বলিয়া মনে করেন না।

---

* It seems to me that the attempt made to win *Swaraj* is *Swaraj* itself. The faster we run towards it, the longer seems to be the distance to be traversed. The same is the case with all ideals.—*ibid.* p. 685

† Government over self is the truest Swaraj, it is synonymous with *Moksha* or salvation.—*Young India.* 8. 12. 1920

কমিউনিজমের মতে যুদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রের অধিকার একটি বিশেষ দল দরিদ্র এবং বঞ্চিতদের পক্ষ হইতে হস্তগত করিবে। যে সময়ে সংগ্রাম চলিবে তখন তাহাদের বাহুতে যদি যুদ্ধের ক্ষমতা থাকে, তবে তাহারা জয়ী হইবে, এবং যদি না থাকে তবে তাহারা পরাজিত হইবে এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে। জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে আর মধ্যপন্থা কিছু নাই। কিন্তু গান্ধীজির পথে সাধনার বিশেষত্ব হইল ইহাই, যে, তাহা ব্যক্তির আত্মগত বলের তারতম্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যদি কাহারও মনের বল কম হয়, সে শুধু শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া জেলে যাইবে। যাহার বল আরও বেশী, সে খাজানা বন্ধ করিয়া নিঃস্ব হইবে। যাহার আরও বেশী, সে কঠিনতম নিষেধকে অমান্য করিয়া চূড়ান্ত শাস্তিকে (মৃত্যু) বরণ করিবে। গান্ধীজি দেশকে এই সাধনপথে লইয়া যাইতে চান। ইহাই তাঁহার পথের সহিত কমিউনিজমের প্রদর্শিত পথের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর পার্থক্য। কেহ কেহ বলেন, গান্ধী বিপ্লবী নহেন, কারণ তিনি বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থাকে সর্ব্বাংশে ভাঙ্গিতে চান না। কিন্তু গান্ধীজি নিজে বলেন যে, তিনি ক্রমবিকাশমান বিপ্লবের (evolutionary revolution) পক্ষপাতী, এবং শেষ পর্য্যন্ত "there is no revolution greater than death"—মৃত্যুর বাড়া বিপ্লব আর নাই। সত্যাগ্রহ যখন তাহারই জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে, তখন তাহা বিপ্লব ভিন্ন আর কি আনিতে পারে? বিপ্লবের পরে সমাজের কি রূপ সাধিত হইবে, মানুষের ভয়হীন, বিজয়ী আত্মা কোন্ সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রেমকে বিধিবদ্ধ করিবে, গান্ধীজি তাহার সম্বন্ধে কতকটা উদাসীন। একবার তিনি নিজের সম্বন্ধে এই সত্য কথাটি বলিয়াছিলেন, যে, "ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রূপ কেমন হইবে তাহা বিবেচনা করা আমার কাজ নহে। আমার কাজ হইল, কোন্ শুদ্ধ উপায়ের দ্বারা দেশ অন্তরে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিবে তাহা আবিষ্কার করা এবং দেশকে উত্তরোত্তর সেই পথে পরিচালিত করা। অন্তরে শক্তির অনুভূতি হইলে দেশ আপন রাষ্ট্রব্যবস্থা আপনিই বাছিয়া লইবে।" ইহাই বোধ হয় তাঁহার সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় সত্য। তিনি বিসমার্ক অথবা ষ্টালিনের মত রাষ্ট্রকে কোনও বিশেষ রূপ দিতে আসেন নাই, বরং রণক্লান্ত মানবকে প্রেমের দ্বারা পরিশুদ্ধ নূতন একটি রণকৌশল শিখাইবার জন্য আসিয়াছেন। প্রেমের পথেও যে সংগ্রাম সম্ভব এই শিক্ষাই বর্ত্তমান যুগের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠতম দান। সেই সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্র এবং সমাজ রূপান্তরিত হইতে পারে কিনা, তাহা শুধু ভবিষ্যতের মানুষ বলিতে পারিবে, আমরা নহে।

[গান্ধীজি স্বীয় পথে মানুষকে যে আসন দিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির উপর যতটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কমিউনিজমে তাহা করা হয় না।] অবশ্য গান্ধীজির মধ্যে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধির সম্বন্ধে বাকুনিনের মত অন্ধ বিশ্বাস নাই। তিনি মনে করেন না, যে, একবার বর্ত্তমান বৈষম্যময় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে হঠাৎ কোনও উপায়ে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই মানুষের প্রেমবুদ্ধি আপনই বিকশিত হইবে। তিনি বলেন, প্রেমও সাধনসাপেক্ষ। মানুষের জীবনে প্রেম ভিন্ন স্বার্থবুদ্ধি আছে বলিয়াই আজকার বৈষম্যময় প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া আছে। অন্তরের এই পাপের উপর তাহারা পা রাখিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এত জোর। স্থায়ীভাবে বৈষম্য দূর করিতে হইলে তিলে তিলে মানুষের পাশব সংস্কারকে খর্ব্ব করিতে হইবে, নয়ত মানুষের জীবনে স্থায়ীভাবে প্রেমের আসন কখনও রচনা করা যাইবে না। প্রেমের এই যোগসাধনে তিনি কিন্তু বাহিরের কোনও বস্তুর বিশেষ আশ্রয় লইতে চান না। [কমিউনিজমের মতে মানুষ অন্তরে দুর্ব্বল। সেই জন্য কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছলে বলে কৌশলে কোনও উপায়ে একবার রাষ্ট্রের অধিকার হস্তগত করিয়া লইতে পারিলেই সেই শক্তিকে মানুষের মন পরিবর্ত্তন করিবার কাজে নিয়োগ করিবে। শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা তাহারা মানুষকে সাম্যের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে; কিন্তু যদি মানুষ তাহাতে আপত্তি করে তবে রাষ্ট্রের সকল শক্তি ব্যয় করিয়া তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে খর্ব্ব করিতে হইবে। শাসনের দ্বারা, ভয়প্রদর্শনের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা তাই কমিউনিজম মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়োজিত করিতে চায়। শিক্ষা কার্য্যকরী না হইলে রাষ্ট্রের শাসনের উপরেই তাহা অধিক আস্থা স্থাপন করে। ইহাকেই কমিউনিজম আপাততঃ একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

গান্ধীজি কিন্তু মূলতঃ ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, যদি ভয়ের দ্বারাই মানুষকে পরিচালিত করিতে হইল, তবে সেই

প্রতিষ্ঠান, সেই সামাজিক ব্যবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। মানুষকে ভয়শূন্য করাই, আত্মার বলে উন্নত করাই যখন শেষ লক্ষ্য, তখন কোন অবস্থাতেই তাহাকে ভোলা যায় না, বাহিরের রূপকে অন্তরের চরিত্রের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। যে প্রতিষ্ঠান রূপকে বজায় রাখিতে গিয়া মানুষকেই খর্ব্ব করিল, তাহাকে তিনি কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহা যে মানুষকে বড় করিতে পারিবে একথা তিনি কোন দিনই স্বীকার করেন না।

মানুষের অন্তরের প্রতি এই গভীর অনুরাগ, প্রথম হইতেই তাহার অন্তরকে শক্তিশালী করিবার একনিষ্ঠ চেষ্টা গান্ধীজিকে কমিউনিষ্টগণ হইতে অনেকখানি তফাৎ করিয়া দিয়াছে। সাধনার বহিরঙ্গের উপর তাঁহার আস্থা কম। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা বাহিরের আবরণকে ভেদ করিয়া অন্তরের চরিত্রের, তাহার গতির উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। কমিউনিজম তাহার পরিবর্ত্তে ভয় এবং সাহসে মেশানো মানবচরিত্রের স্থায়িত্বের উপর বিশ্বাস করে। সেই জন্য কখনও ইহা সেই ভয়কে, কখনও বা প্রেমকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে দেখিতে একটি সুঠাম রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ম্মাণ করে; এই ভরসায় যে, সাম্যতন্ত্রের সেই বেড়াজালের মধ্যে পড়িলে মানুষ আর স্বার্থের বশে কিছু করিবার সুযোগ পাইবে না, বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রেমের পথ ধরিতে হইবে।

কমিউনিজমের লক্ষ্য যেমন স্পষ্ট এবং সাধনা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আমরা তেমনই দেখিলাম যে গান্ধীবাদের সুদূর লক্ষ্য নক্ষত্রের আলোর মত স্পষ্ট হইলেও তাহা মাটির যে পথের উপর দিয়া মানুষ যাতায়াত করে তাহার উপর তেমন আলোকপাত করিতে পারে না, সে পথের অন্ধ-তমসা শুধু একান্ত সাধকের দৃষ্টিই ভেদ করিতে পারে। অপরের পক্ষে তাহা বিপদসঙ্কুল। প্রেমের বশে দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়ার এই পথ তরবারির সীমারেখার মত সুস্পষ্ট হইলেও তেমনই সঙ্কীর্ণ, তেমনই নিষ্ঠুর। কাপালিকের সাধনার মত তাহা সাধকের জন্য নিজস্ব আর কিছুই রাখিয়া যায় না, তাহার সকল সত্তাকে প্রেমের যজ্ঞে নির্ম্মমভাবে দহন করে।

ইহার তুলনায় কমিউনিজমের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। জ্ঞানের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের দুঃখকে দূর করিতে পারিবে, এই অভিমানের উপরেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজির পথে যে বীরত্বের প্রয়োজন হয় তাহা ক্ষণিকের জন্য হয়ত পাশের যাত্রীর পায়ের আওয়াজ হইতে বল পায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা একাকীচলার পথ, যে পথে ক্রোধের মাদকতাকে পরিহার করিতে হয়, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একাকী বিচরণ করিবার সাহসের প্রয়োজন হয়। ইহার তুলনায় লেনিনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং সেই জন্যই শক্তি ও দুর্ব্বলতায় জড়ান সাধারণ মানুষের কাছে তাহা এত প্রিয়, এমন আশার সম্পদ। সেখানে একা যাইবার বালাই নাই, বহু লোকের পথ চলার কোলাহলের মধ্যে নিজের আন্তরিক দুর্ব্বলতাকে বিস্মৃত হইবার সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

সাত্ত্বিক ও রাজসিক ধর্ম্মের মধ্যে যে প্রভেদ গান্ধী এবং লেনিনের পথের মধ্যেও ঠিক সেই প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উভয়েই মানুষের প্রতি প্রেমের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে। কেবল একজন দুঃখের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, মানুষকে চিরদিন যে অন্তরের আবেগে অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে, ইহাকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে; এবং অপরজন মানুষ যে ইচ্ছার বশে জ্ঞানের দ্বারা, বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের রূপকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে এই বিশ্বাসের, এই অভিমানের উপরেই তাহার সকল আশা রচনা করিয়াছে; ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে চরম পার্থক্য।

অন্ধতমিস্র রজনীর আকাশতলে লেনিন কর্ম্মকারের বেশে লৌহের উপরে প্রদীপ্ত লৌহখণ্ড রাখিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতেছেন। সম্মুখে প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু উপরে রাত্রির যে অন্ধকার ঘেরিয়া আছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার অন্তরের বিক্ষুব্ধ আশা, বাহুর বিপুল শক্তি, কর্ম্মের প্রচণ্ড উন্মাদনা সবই নক্ষত্রের নিশ্চল কঠোর আলোর স্পর্শে পরাহত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে যেমন প্রভেদ নাই, মানুষের এই ক্ষুদ্র সুখদুঃখের লীলারও তেমনই কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। আর অপর পক্ষে গান্ধী নিথর, নীরব রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর নক্ষত্রালোকের দিকে চিরদিনের যাত্রীর মত বহিয়া চলিয়াছেন। সে যাত্রার কোনদিনই শেষ হইবে না জানিয়াই তিনি তাঁহার সকল শক্তি সকল দৃষ্টি শুধু পায়ের তলের উপরেই নিবদ্ধ করিয়াছেন, পথে চলার ভুল হইলে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের নিশানা ঠিক করিয়া লইতেছেন।* বিগত কাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে বর্ত্তমানের যে মহামুহূর্ত্ত বিরাজ করিতেছে, তাহারই উপর তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সকল প্রাণকে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার বিশেষত্ব, ইহা হইতেই তিনি জীবনের সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

* I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.—*Young India*, 26-15-1924.

রেখাচিত্র।

[শিল্পী—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বজ্র-আশীর্ব্বাদ

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

হান বজ্র, বজ্র হান মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্ম্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি,—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিলবিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে যাহা পাই মুঠি ভার উড়াই ফুৎকারে,
অনন্তকালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস !

এর মাঝে তোমাদের কোথা স্থান, হে বাসব,
তোমরা অমরলোকবাসী—
নন্দনের পারিজাত-মাল্য শোভে গলে তোমাদের,
নিশিশেষে মালা না শুখায়—
নৃত্যরতা উর্ব্বশীর নগ্নতা বীভৎস নাহি হয়।
স্খলে না চরণ তার, থামে না সে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
কামনা-জড়িত কণ্ঠে তীব্র স্বরে উঠে না ঝঙ্কারি।
তোমরা চাহিয়া থাক নিত্যকাল অপলক আঁখি,
ঘুমঘোরে নাহি পড় ঢুলে,
কাম-কণ্টকিত দেহে আছাড়ি পড় না কোনো অপ্সরা-চরণে,
ব্যর্থতার অশ্রু কভু গড়ায় না দুই চোখ বেয়ে।
কামহীন মৃত্যুহীন অবিরহী হে দেবতাকুল,
আমরা কাঁদিয়া মরি তোমাদের ভাগ্যহীনতায়—
আমাদের মাঝখানে তোমাদের কোথা দিব স্থান ?

তোমরা উর্দ্ধেতে থাক, হে দেবতা নন্দননিবাসী—
উর্দ্ধ হতে আমাদেরে কর কর বজ্র-আশীর্ব্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমিষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতিব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুনঃ
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙেচুরে চলে যাই নিঃশঙ্ক গর্ব্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে,
রক্তস্রোতে করি স্নান, পান করি সুতপ্ত রুধির—
নির্ম্মম কুঠার হানি সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খল খল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।

চোখে পুনঃ লাগে রঙ, ধরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায় পুনঃ আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা,
পড়ে পাষাণের লেখা, গণে মর-জীবনের ঢেউ ?
কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা কত মিশিল ধূলায়—
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্ম্মর-মূর্ত্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত সীমায়।

বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়,
মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশযাত্রা কামনার ডানা ঝাঁপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমাচল-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার—
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরু-পথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি !
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত ?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান—
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতিলুব্ধ মানবসন্তানে,
আমারে করেছ ক্ষমা ?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্ব্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা, ঊর্দ্ধে থাকি প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্দ্ধা মোর ভাসায়েছ কত বার প্রলয়-প্লাবনে,
ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী রূপে !
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব ? এরি মাঝখানে,
আমার প্রচণ্ড দন্ত বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে,
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন—
মুহুর্মুহু গর্জ্জিল কামান,
বিষবাষ্প ছড়াল চৌদিকে—
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি ?
কর না কি বজ্র-আশীর্ব্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল হুঙ্কারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে !
আর কত বজ্র আছে, হে বাসব, ওহে বজ্রপাণি,
কত অস্থি, কত দধীচির ?
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
তোমাদেরে করি না স্বীকার—
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে,
বজ্র হান, হে বাসব।

ভারতীয় সেনার পরিচয়

—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

[সামরিক ব্যয়ভার ও দেশীয় অফিসার লওয়ার প্রসঙ্গে দৈনিক পত্রে আজকাল প্রায়ই ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী সম্বন্ধে নানা সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোন আলোচনা না হওয়াতে অনেক সময় এই সকল সংবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে অসুবিধা হয়। এই অভাব অন্ততঃ আংশিক ভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল। সৈন্যদল সম্বন্ধে নানাদিক হইতে নানাভাবে লেখা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র সৈন্যদলে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ জাতিকে ভর্ত্তি করা হয় তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। যদি পাঠকগণের কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাপারের আলোচনাও ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।—সম্পাদক, বঙ্গশ্রী]

১

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম স্বভাবপ্রভব গুণের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। সম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম; শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং প্রভুত্বের ভাব এই কয়টি ক্ষত্রিয় জাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম; কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম; শূদ্র জাতির স্বভাবজ কর্ম্ম পরিচর্য্যা। মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত হইয়া সংসিদ্ধি লাভ করে।" যে-সকল বিচক্ষণ ইংরেজ সেনানী ভারতবর্ষের সৈন্যদলের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা তাঁহারা গীতার ধর্ম্মে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না, হয়ত গীতা কোনদিন পড়েনও নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে তাঁহারা অতিশয় আস্থাবান, কতদূর আস্থাবান তাহা যাঁহারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার নিয়মাবলীর একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁহারা অতি ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন ভারতীয় সেনার সবটুকু দেশী নয় এবং উহাতে দেশী লোকের অধিকার গোরাদের সমান নয়। প্রথমতঃ, এই বাহিনীর নায়কত্ব করেন ব্রিটিশ সেনানীরা; উহাতে মুষ্টিমেয় (হাজার সাতেকের মধ্যে আন্দাজ একশত ষাট জন) ভারতীয় সেনানী থাকিলেও উহারা সংখ্যায়, ক্ষমতায় ও পদগৌরবে এখনও উপেক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সেনার সকল অঙ্গে* এখনও দেশী সৈন্যের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্বে এই বাধা খুবই প্রবল ছিল, সম্প্রতি উহা আংশিকভাবে উঠাইয়া দিয়া একটি খাঁটি দেশী গোলন্দাজ ব্রিগেড গঠন করিবার আয়োজন চলিতেছে।

এই ত গেল সৈন্যদলে যে-সকল দেশী লোক লওয়া হয় তাহাদের অসুবিধার কথা। কিন্তু উহার চেয়েও একটা বড়

পঞ্জাবী মুসলমান: ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজকাল যে যে জাতির লোক ভর্ত্তি করা হয় তাহাদের মধ্যে পঞ্জাবী মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উহারা প্রধানতঃ পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম হইতে আসে। চিত্রের পঞ্জাবী মুসলমানটি আবন জাতির।

কথা আছে। সে-কথাটা এই যে, সাহসে ও শারীরিক সামর্থ্যে যোগ্য হইলেও ভারতবাসী মাত্রেরই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেনাদলে ঢুকিবার অধিকার নাই। এ-বিষয়ে ভারতবর্ষের

* 'অঙ্গে'র ইংরেজী প্রতিশব্দ 'আর্ম'। প্রাচীন ভারতবর্ষে সেনার হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথ এই চারিটি অঙ্গ থাকিত বলিয়া উহাকে চতুরঙ্গ সেনা বলা হইত। বর্ত্তমানে ভারতীয় সেনার ছয়টি অঙ্গ—অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, আর্ম্মারড্ কার', 'স্যাপার্স', 'সিগ্‌ন্যালস্' ও পদাতিক। এরোপ্লেন স্থলসৈন্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও নৌবাহিনীর মত স্বতন্ত্র বাহিনী।

সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাদের স্মার্ত্তদের অপেক্ষাও গোঁড়া। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যেমন বর্ণবিশেষে জন্মগ্রহণ না করিলে কাহারও সে-বর্ণের কৃত্যে অধিকার আছে বলিয়া মানেন না, ব্রিটিশ সেনাপতিরাও তেমনই তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত 'ক্ষাত্র' কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে কোন ভারতীয়কে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে দেন না। বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে এ অধিকার সম্পূর্ণ জন্মগত, পুরুষকারের দ্বারা অর্জ্জন করিবার নয়। ভারতবর্ষের যে যে স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় সেখানে সৈন্যসংগ্রহের আপিসও আছে। এই আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট জাতিকুল, গ্রাম, থানা প্রভৃতির বিস্তৃত হিসাব দিয়া তবে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে পারা যায়। এই পরীক্ষা এত দুরূহ যে ফাঁকি চলে না। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙালী ভদ্রলোক নিজেকে মৈনপুরী জেলার রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া এক অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে ঢুকিয়াছিলেন। এখন আর সেরূপ হইবার উপায় নাই, কারণ আজকাল সামরিক ব্যবস্থা আরও পাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায়ই গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং এখন যে আর কেহ জাতি ভাঁড়াইয়া কর্ণের মত পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবেন বা 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমায়ত্তং হি পৌরুষং' বলিয়া বিদেশী সেনানীদের বাঙ্গ উপেক্ষা করিবেন সে সম্ভাবনা খুবই কম। *

ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকবল সংগ্রহের সকল ব্যবস্থাই এই জন্মগত অধিকারভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বিধি-ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) যোগ্যাযোগ্য নিরূপণ অর্থাৎ কোন প্রদেশ, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ বা গোত্রের লোক লওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করা; (২) সংখ্যানির্দ্দেশ অর্থাৎ কোন শ্রেণীর লোক সংখ্যায় ও অনুপাতে কত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া; (৩) সন্নিবেশবিধি অর্থাৎ কোন শ্রেণীর লোক কোন দলে রাখা হইবে তাহা স্থির করা। এই প্রত্যেকটি বিষয়ই সুচিন্তিত নিয়মাবলীর দ্বারা বাঁধা। প্রথমে কে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই দেখা যাক।

২

ভারতবর্ষে ছোট বড় মিলাইয়া চৌদ্দটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ আছে, তাহা ছাড়া ছোট বড় দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও কয়েক শত। ইহাদের মধ্যে বাংলাদেশই লোকসংখ্যায় গরিষ্ঠ (আন্দাজ পাঁচকোটি অধিবাসী)। কিন্তু বাংলা হইতে একটি লোকও সৈন্যদলে লওয়া হয় না। আসাম, বিহার-উড়িষ্যা, এবং মধ্যপ্রদেশের অবস্থাও তাই। এ-কয়টি প্রদেশের উপরের ধাপেই ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-এর স্থান। এই কয়টি প্রদেশ হইতেই কিছু কিছু সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, তবে লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের পরিমাণ খুবই কম। ইহাদের উপরে সংযুক্তপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতানা এবং কাশ্মীর, এবং সর্ব্বোপরি নেপাল ও পঞ্জাব। প্রকৃতপ্রস্তাবে শেষোক্ত জায়গা দুইটিই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান অবলম্বন। এ-দুয়ের মধ্যেও আবার পঞ্জাবের স্থান অনেক উচ্চে। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বাংলাদেশের অর্দ্ধেকের কিছু কম (প্রায় আড়াই কোটি)। কিন্তু দেশী সৈন্যদের মধ্যে পঞ্জাবীর সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী। সুতরাং পঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শুধু মেরুদণ্ড নয়, পেশীও বলা যাইতে পারে। ঠিক এই কারণেই গভর্ণমেণ্টও পঞ্জাবের কৃষকের সুখ-সাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে এত সচেতন। কৃষির উন্নতির জন্য, জল-সেচনের জন্য পঞ্জাবে যে ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আর কোথাও সেরূপ নাই। এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া একজন ইংরেজ সাংবাদিক লিখিয়াছিলেন যে, উহার যথাযথ কারণ আছে পঞ্জাব ভারত গভর্ণমেণ্টের সৈন্য এবং ঘোড়া সরবরাহ করে।

কিন্তু সেনাদলে পঞ্জাব ও পঞ্জাবীর বিশিষ্ট স্থান দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন পঞ্জাবের অধিবাসী মাত্রেরই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার অধিকার আছে, তবে তিনি একটা অত্যন্ত বড়

* এই নব্য সামরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রসঙ্গে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব কোয়ার্টার মাষ্টার-জেনারেল, জেনারেল স্যর জর্জ্জ ম্যাকমানের কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। বাঙালীদের সৈন্য হইবার তেমন যোগ্যতা নাই, এই কথা বলিয়া স্যর জর্জ্জ ম্যাকম্যান বলিতেছেন,—"However they are making far more important contributions to the world's science. Every man to his last, and Abul Huq Rafique does not aim at tracing the nervous reactions of plant life, Mr. Bhose does." অর্থাৎ পঞ্জাবী মুসলমান আচার্য্য জগদীশ বসুর মত 'প্লাণ্ট ফিজিওলজি' সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যায় না, সুতরাং বাঙালীরও পঞ্জাবী মুসলমানের মত যুদ্ধ করিতে যাওয়া উচিত নয়—প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কর্ম্ম আছে। খুবই সত্য কথা, কিন্তু যোগ্যতা যখন ব্যক্তিগত না হইয়া সম্প্রদায় বা বংশগত হয় তখনই বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয়।

রকমের ভুল করিয়া বসিবেন। পঞ্জাবীদের ক্ষেত্রেও জাতি ধর্ম্ম জেলা বিচার করিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীকে সৈন্যদলে

গুর্খা: সেনাবাহিনীতে পঞ্জাবী মুসলমানের পরেই গুর্খার স্থান। গুর্খারা সাহস ও যুদ্ধ-নিপুণতার জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমানে সৈন্যদলে দশ রেজিমেণ্ট গুর্খা আছে। ইহাদের মধ্যেও নানা জাতি আছে। চিত্রটি একজন গুরুং জাতীয় গুর্খা অফিসারের।

ঢুকিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। পঞ্জাবী হিন্দুও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের মত নানা জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ডোগরা, কানেট, আহির, জাঠ ও গুজারদিগকে সৈন্যদলে লওয়া হয়।* মুসলমানদের বেলায়ও ঠিক এই একই নিয়ম। আয়তনে ক্ষুদ্র সিমলা জেলাকে ছাড়িয়া দিলে পঞ্জাবে সর্ব্বশুদ্ধ আটাশটি জেলা আছে। উহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলির মত মুসলমানপ্রধান। কিন্তু এই আটাশটির মধ্যে মাত্র ছয়টি জেলার মুসলমানদিগকে প্রধানতঃ সৈন্যদলে লওয়া হয়, চৌদ্দটি জেলা হইতে অতি অল্প লওয়া হয়, এবং বাকী আটটি জেলা হইতে মোটেই লওয়া হয় না। প্রথমোক্ত জেলাগুলির হিসাব লইলে দেখা যায় উহাদের সবগুলিই পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত—যেমন, আটক, রাওলপিণ্ডি, ঝিলম, শাহপুর, গুজরাট ও মিঞাওয়ালী। ইহাদের মধ্যেও আবার ঝিলমের পরপারের জেলাগুলির উপরই সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ঝোঁক বেশী।*

পঞ্জাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্য প্রদেশ সম্বন্ধেও তাহা খাটে। সংযুক্তপ্রদেশ হইতে কয়েক হাজার লোক সৈন্যদলে লওয়া হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাংশে

শিখ: সৈনিক হিসাবে শিখদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বিগত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত সৈন্যদলে উহাদের স্থান প্রথম ছিল। এখন নানা কারণে শিখদের সংখ্যা কমিয়া গিয়া তৃতীয় স্থানে দাঁড়াইয়াছে।

* এখানে খালি হিন্দু গুজারদের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্জাবের গুজারের মধ্যে মুসলমানই বেশী।

* সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলা ও কাশ্মীরের মজফরাবাদ, পুঞ্চ ও মীরপুর জেলার শ্রেণীবিশেষের মুসলমানকেও পঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে ধরা হয়। এই কয়টি জেলাই রাওলপিণ্ডি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট।

যে-সকল জেলা আছে তাহার কোন অধিবাসী নাই, পশ্চিম দিক হইতেও মুষ্টিমেয় রাজপুত, জাঠ এবং আহির ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু নাই। সংযুক্তপ্রদেশের মুসলমান-দিগকে বর্ত্তমানে আর সৈন্যদলে লওয়া হয় না—সামান্য একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। একমাত্র ১ম, ২য় ও ৩য় অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে এখনও কিছু হিন্দুস্থানী মুসলমান আছে। উহাদের মোট সংখ্যা দুইশত আড়াই শতের বেশী নয়। এইরূপে সমস্ত প্রদেশেই বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি শ্রেণীকে 'ক্ষাত্র' জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান দেশ, কিন্তু প্রকৃত কাশ্মীরি মুসলমানরা ক্ষাত্র জাতি নয়, ক্ষাত্র জাতি জম্মুর অধিবাসী ডোগরা রাজপুত। বোম্বাই-এর ক্ষাত্র জাতি মারাঠা, গুজরাটি সিন্ধি বাদ পড়িয়াছে। ব্রহ্মের ক্ষাত্র জাতি চিন, কারেন ও কাচিন—বর্ম্মীরা বা শানরা নয়; ইত্যাদি।

৩

এইখানেই যদি ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলেও কোন কথা ছিল না। কিন্তু সামরিক জাতিভেদকে এত স্থূল মনে করিলে চলিবে কেন? সৈন্যদলের কর্ত্তারা বলেন, 'ক্ষাত্র' জাতির মধ্যেও জন্মস্থান, বাসস্থান, বংশ, গোত্র ইত্যাদি অনুসারে গুণের তারতম্য হইতে পারে। পঞ্জাবী মুসলমান বা শিখ ক্ষাত্র জাতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সব পঞ্জাবী মুসলমান বা শিখই যে সমান তাহা নয়। একই জেলার পঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে 'আবন,' 'তিবানা' বা 'গাকার' ভাল হইতে পারে, 'চিব' ভাল না হইতে পারে। আবার শিখদের মধ্যেও মালবাই বা শতদ্রুর এ-পারের শিখের গুণ একপ্রকারের মাঞ্‌ঝা বা শতদ্রুর ওপারের শিখের গুণই অন্য প্রকারের। শতদ্রুর ওপারের শিখদের মধ্যেও আবার জাঠ শিখদের উৎকর্ষ একদিকে, রাজপুত শিখদের উৎকর্ষ আর একদিকে। ব্যাপারটি যে কত সূক্ষ্ম তাহা একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিশদ হইবে না। গুর্খারা একটি অবিসম্বাদিত ক্ষাত্র জাতি, উহাদের সাহস ও সামরিক কৃতিত্ব বিখ্যাত। কিন্তু উহাদিগকেও সৈন্যদলের কর্ত্তৃপক্ষ কি ভাবে যাচাই করিয়া লন তাহা তলাইয়া দেখিবার মত।

গুর্খা বলিতে আমরা খর্ব্বনাসা, তির্য্যকচক্ষু, কুকরি-ঝুলানো নেপালের অধিবাসী বুঝিয়া থাকি। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুর্খা কোন জাতির নাম নয়। পূর্ব্বে গুর্খা বলিতে কেবলমাত্র নেপালে গুর্খা নামে যে উপরাজ্য ছিল তাহার অধিবাসী-দিগকেই বুঝাইত। বর্ত্তমানে শব্দটি আরও ব্যাপক ভাবে সমগ্র নেপালের অধিবাসী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। এই নূতন প্রয়োগ অনুসারে নেপাল রাজ্যের যে-সকল ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা ভাষী জাতিকে গুর্খা বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাদের সাতটি হইতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক হইতে নেপালকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—পশ্চিম নেপাল বা কর্ণালীর দ্বারা বিধৌত অংশ; মধ্য নেপাল বা গণ্ডকী ও বাঘমতীর দ্বারা বিধৌত অংশ; পূর্ব্ব নেপাল বা কোশীর দ্বারা বিধৌত অংশ। দোতিয়াল জাতি পশ্চিম নেপালের অধিবাসী; ঠাকুর, ছত্রি বা খাস্‌, মগর, গুরুং ও নেওয়ার জাতি মধ্য নেপালে বাস করে; রায়, লিম্বু, সুন্‌বার, তামাং প্রভৃতি পূর্ব্ব নেপালে বাস করে। বলা বাহুল্য নেপালে আরও অনেক জাতি আছে, এগুলি প্রধান জাতি মাত্র। ইহাদের মধ্যে শুধু ঠাকুর, ছত্রি বা খাস, মগর, গুরুং, রায়, লিম্বু ও অল্পসংখ্যক সুনবারকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশও আবার গুরুং এবং মগর।

ইহার পরও হিসাব আছে। এই প্রত্যেকটি জাতিরই বহু বংশ এবং গোত্র আছে, নানা বাসস্থান আছে। সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন, বংশ ও বাসস্থান অনুসারে ক্ষাত্র গুর্খাদেরও গুণের তারতম্য হয়। যেমন, ঠাকুরদের মধ্যে বাইশটি বংশ আছে, উহাদের মধ্যে সাহী ঠাকুর শ্রেষ্ঠ। ছত্রি বা খাসদের মধ্যে আঠারটি বংশ, উহাদের মধ্যে মতবালা ছত্রি একেবারে অপদার্থ। মগরদের মধ্যে সাতটি বংশ, উহাদের মধ্যে অলে শ্রেষ্ঠ। গুরুংদের মধ্যে দুইটি প্রধান ভাগ, চারিটি বংশ ও তিনশত তেত্রিশটি গোত্র, উহাদের 'চারজাত' শ্রেণীর ঘলে বংশের গুরুং শ্রেষ্ঠ। 'চারজাত' শ্রেণীর ঘলে বংশের গুরুংদের উনিশটি গোত্রের মধ্যে আবার সামরি গোত্রের গুরুং সৈন্যদলে বেশী। এইবারে বাসস্থানভেদে গুরুংদের গুণের কি তারতম্য হয় দেখা যাক। কাশীর ল্যাংড়া আম যেমন বাংলাদেশের মাটিতে ফলিলে টক হইয়া যায়, পূর্ব্ব নেপালের গুরুংএর মধ্যে অথবা ভারতবর্ষে যে গুরুং-এর জন্ম হইয়াছে ও ভারতবর্ষে যে

গুরুং বড় হইয়াছে তাহার মধ্যেও তেমনই মধ্য নেপালের গুরুং-এর সামরিক গুণ থাকে না। মধ্য নেপালের গুরুং-এর
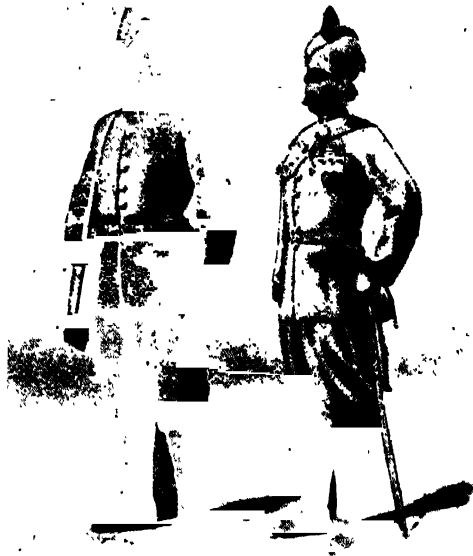
পাঠান: পাঠানরা সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ও আফগানদের অতি নিকট জ্ঞাতি। ইহাদের মাতৃভাষা পস্তো। পাঠানদের মধ্যে বহু জাতি উপজাতি আছে। এই সকল জাতি উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র ওয়াকজাই, ইউসফজাই, খাট্টাক, বাঙ্গাশ, মহমুদ, ওয়াজিরি ও আদমখেল আফ্রিদিদিগকে সৈন্যদলে লওয়া হয়। চিত্রের দুইটি সৈনিকের মধ্যে ডানদিকেরটি খাট্টাক, বামদিকেরটি আদমখেল আফ্রিদি।

মধ্যেও আবার বাসস্থান অনুসারে উত্তম, মধ্যম, চলনসই গুরুং আছে। কিন্তু সে কথার ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রবন্ধ অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়।

৩

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সৈন্যদলে লোকসংগ্রহের মূল সূত্রের কথা বলা হইল। ইহা হইতে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ব্যাপারটা কুলীনের বিবাহের অপেক্ষাও জটিল এবং সূক্ষ্ম। এখন দেখা প্রয়োজন কাহাদিগকে এই বিচারের ফলে সামরিক কুলীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

তথাকথিত ক্ষাত্র জাতির হিসাব লইতে হইলে সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া লইলে সুবিধা হইবে। প্রথম—উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ অর্থাৎ পঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। দ্বিতীয়—হিমালয়ের সানুদেশ ও উপত্যকা সমূহ অর্থাৎ নেপাল রাজ্য ও কুমায়ূঁ বিভাগ। তৃতীয়—হিন্দুস্থান অর্থাৎ পঞ্জাব ইত্যাদি ও হিমালয়ের সানুদেশ বর্জ্জিত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত। চতুর্থ—দাক্ষিণাত্য। পঞ্চম—ব্রহ্মদেশ। এই প্রত্যেকটি জায়গারই বিশিষ্ট সামরিক জাতি আছে। সুতরাং ইহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র দুয়েকটি জাতি একাধিক জায়গায় বর্ত্তমান—যেমন জাঠ বা আহির, বা মুসলমান রাজপুত। জাঠ পঞ্জাবেও আছে, সংযুক্তপ্রদেশে এবং রাজপুতানায়ও আছে। কিন্তু ইহাদের দরুণ মোটামুটি বিবরণের কোন ইতরবিশেষ হইবে না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সামরিক জাতিগুলির মধ্যে পঞ্জাবী মুসলমানই প্রধান। সমস্ত সেনাদলে যত দেশী সৈন্য আছে, বর্ত্তমানে তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ পঞ্জাবী মুসলমান।

ডোগরা: পঞ্জাবের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে সকল পার্ব্বত্য অঞ্চল আছে তাহাদের হিন্দু অধিবাসীদিগকে ডোগরা বলা হয়। সৈন্যদলের ডোগরারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, জাঠ ও প্রধানতঃ রাজপুত। ডোগরা রাজপুত বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ী হইলেও উহারা অশ্বারোহণে নিপুণ। উহাদিগকে অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় সৈন্যদলেই লওয়া হয়। চিত্রটি একজন ডোগরা অশ্বারোহীর।

অন্য কোন জাতেরই এত সংখ্যক লোক সেনাবাহিনীতে নাই। ইহারা অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ সব সেনাদলেই ভর্ত্তি হইয়া থাকে। ইহারা কোন কোন জেলা হইতে প্রধানতঃ আসে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পঞ্জাবের সামরিক জাতির মধ্যে পঞ্জাবী মুসলমানের পরেই শিখের স্থান। সমস্ত সেনাবাহিনীতে পূর্ব্বে ইহাদের স্থান প্রথম ছিল, এখন তৃতীয়। শিখদের মধ্যে ছোঁয়া খাওয়ার বাধা না থাকিলেও নানা জাতি আছে। যে-সকল জাঠ শিখের আচার গ্রহণ করে তাহাদিগকে জাঠ শিখ বলা হয়, রাজপুত-গণকে রাজপুত শিখ। এইরূপে লোবানা, সাইনি, রামদাসিয়া, মাঝবি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর শিখ আছে। সেনাবাহিনীতে ইহাদের বরাবরই স্বতন্ত্র স্থান ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু নানা জাতি থাকিলেও সকল শিখকেই কয়েকটি আচার পালন ও কয়েকটি জিনিষ ধারণ করিতে হয়। শেষোক্ত জিনিষগুলি সংখ্যায় পাঁচ ও 'ক' অক্ষরে আরম্ভ বলিয়া উহাদিগকে পঞ্চ ক-কার বলা হয়। জিনিষ কয়টি এই—কেশ (অর্থাৎ চুল, শিখদের কেশ কর্ত্তন বা শ্মশ্রু মোচন নিষিদ্ধ), কারা (হাতের লোহার বালা), কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুনী), কচ্ (বা কৌপীন)।

পঞ্জাবের সামরিক শ্রেণীর মধ্যে শিখদের পরই ডোগরাদের নাম করিতে হয়। ডোগরা কোন জাতি বা বর্ণ বিশেষের নাম নয়। পঞ্জাবের পূর্ব্বোত্তর কোণে ও উত্তরে হিমালয়ের উপত্যকায় যে সকল হিন্দু বাস করে তাহাদের প্রায় সকলকেই ডোগরা বলা হয়। উহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, তবে সৈন্যদলে যাহাদিগকে লওয়া হয় তাহারা ডোগরা ব্রাহ্মণ, ডোগরা জাঠ ও, প্রধানতঃ, ডোগরা রাজপুত। ডোগরা রাজপুত বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। একজন উচ্চপদস্থ সেনানী বলিয়াছেন, সিপাহীদিগকে সহবৎ শিক্ষা দিবার জন্যই ডোগরাদিগকে সৈন্যদলে লওয়া হয়। সৈন্যদলের ডোগরা পঞ্জাবের কাঙ্গড়া, হোসিয়ারপুর, ও গুরুদাসপুর জেলা এবং কাশ্মীরের জম্মু হইতে আসে। পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখদের মত ইহারাও অশ্বারোহণে নিপুণ।

এইবার পাঠানদের কথা। আমরা বাঙালীরা গোঁফ-ধারী হিন্দুস্তানী ভাষী লম্বা চওড়া মুসলমান মাত্রকেই পাঠান বলিয়া থাকি। প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠান কাবুলীওয়ালার অতিশয় নিকট জ্ঞাতি, উহারা সীমান্ত প্রদেশের পাহাড় পর্ব্বতে গরু মেষ চরাইয়া ও লুটতরাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং উহাদের মাতৃভাষা পশ্‌তো। পাঠানরা বহু জাতি উপজাতিতে বিভক্ত, কিন্তু এই সকল জাতি উপজাতির মধ্যে ওয়াজিরি, আফ্রিদি ও মহমান্দই প্রধান। এই জাতি উপজাতিরও আবার বহু শাখা আছে। সৈন্যদলে যে-সকল পাঠান জাতিকে লওয়া হয় উহাদের নাম, ওরাকজাই, ইউসফজাই, খাট্টাক, বাঙ্গাশ, আদমখেল আফ্রিদি ও মহমুদ-ওয়াজিরি। ইহাদের মধ্যেও আবার সংখ্যায় খাট্টাকই বেশী। খাট্টাকরা কোহাট অঞ্চলে বাস করে।

পঞ্জাবী মুসলমান, শিখ, ডোগরা ও পাঠান এই কয়টিই উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের প্রধান সামরিক জাতি। কিন্তু এ-গুলি ছাড়া পঞ্জাব হইতে আরও চারিটি জাতিকে সৈন্যদলে লওয়া হয়। উহারা—জাঠ, গুজার, আহির ও কানেট। সৈন্যদলে জাঠদের স্থান নগণ্য নয় ডোগরাদের পরেই এবং পাঠানদের উপরে। তবে জাঠ একমাত্র পঞ্জাব হইতেই আসে না, সংযুক্ত প্রদেশের মীরাট অঞ্চল ও রাজপুতানা হইতেও সংগ্রহ করা হয়। গুজার ও আহিররা গোপালক জাতি। কানেটরা ডোগরাদের সহিত সংশ্লিষ্ট।

এখন সংযুক্তপ্রদেশের উত্তরে যে পার্ব্বত্য অঞ্চল আছে তাহার হিসাব লওয়া যাইতে পারে। এই অঞ্চলের তিনটি ভাগ—(১) টেহ্‌রী গঢ়বাল রাজ্য, (২) সংযুক্তপ্রদেশের কুমায়ূঁ বিভাগ, ও (৩) নেপাল। ইহাদের মধ্যে ব্রিটিশ গঢ়বাল ও টেহ্‌রী হইতে গঢ়বালী সৈন্যেরা আসে, প্রধানতঃ আলমোড়া জেলা হইতে কুমায়ূনীরা আসে ও নেপাল হইতে গুর্খারা আসে। গুর্খাদের কথা পূর্ব্বে বিস্তারিত বলা হইয়াছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৈন্যদলে পঞ্জাবী মুসলমানের পরেই গুর্খাদের স্থান। গঢ়বালী সৈন্য যুদ্ধে কিরূপ হইবে সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধে উহাদের যোগ্যতা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে-সকল ভারতীয় সিপাহী সর্ব্বাগ্রে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পায় তাহাদের মধ্যে গঢ়বালী সিপাহী নায়ক দরবান্ সিং নেগী একজন। এই গঢ়বালীদেরই কয়েকজন ১৯৩০ সনে পেশোয়ারের হাঙ্গামার সময়ে আদেশ পালন না করিবার অপরাধে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষকে ইতিপূর্ব্বে যে পাঁচটি বড় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান উত্তর-পশ্চিম ও হিমালয়ের সানুদেশ বর্জ্জিত আর্য্যাবর্ত্তের। এই অঞ্চলের প্রধান ক্ষাত্র জাতি রাজপুত। রাজপুত অর্থে রাজপুতানার অধিবাসী বুঝায় না, আগ্রা-অযোধ্যা ও রাজপুতানার ক্ষত্রিয় মাত্র বুঝায়। রাজপুত বিহারের সাহাবাদ জেলাতেও আছে, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যেও আছে। উহাদিগকে ছত্রি (ক্ষত্রি নয়) বা ঠাকুরও বলা হয়। তবে সৈন্যদলে যে-সকল রাজপুত আছে, তাহাদের অর্দ্ধেক আসে সংযুক্তপ্রদেশের পশ্চিম দিক হইতে অর্দ্ধেক আসে রাজপুতানা হইতে। এই অঞ্চল হইতে কিছু কিছু জাঠ, আহির, রণঘার, কাইমখানী, মেও এবং মিনাও সেনাবাহিনীতে লওয়া হয়। রণঘার ও কাইমখানিরা মুসলমান রাজপুত, মেও মিনা রাজপুতানার মুসলমান।

ভারতবর্ষের আর যে দুইটি অঞ্চল বাকী রহিল উহাদের ক্ষাত্র জাতির কথা সংক্ষেপেই সারা যাইতে পারে। মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের প্রধান সামরিক জাতি। উহারা কোঁকন অঞ্চল হইতে আসে। উহাদের পরিশ্রমের ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ। দাক্ষিণাত্য হইতে মারাঠা ছাড়া কিছু মান্দ্রাজীও সৈন্যদলে লওয়া হয়, কিন্তু উহাদের সংখ্যা খুবই কম।

ব্রহ্মের সামরিক জাতি কাচিন, চিন ও কারেন। ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমান্তে সভ্যতা হইতে বহুদূরে কাচিনদের বাস। উহারা অর্দ্ধবর্ব্বর। চিনদের বাস লুসাই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে। উহারাও অর্দ্ধবর্ব্বর। কিন্তু কারেনরা অপেক্ষাকৃত সভ্য, শ্যাম দেশের অধিবাসীদের জ্ঞাতি ও অনেক ক্ষেত্রে খৃষ্টান।

৪

সর্ব্বশেষে সংখ্যানির্দ্দেশ ও সন্নিবেশের কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যাহাদিগকে 'ক্ষাত্র' জাতি বলিয়া মানেন—যাহাদের মোটামুটি তালিকা এই মাত্র দেওয়া গেল—তাহাদের পক্ষেও সংখ্যায় যতখুসী ও যেখানে খুসী সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া সম্ভব নয়। ইহাদের কোনটিকে কত পরিমাণে, কি অনুপাতে, কোন সৈন্যদলে লওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধি আছে। এই বিধি সৈন্যদলের কোন কর্ম্মচারীর লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দেশী সৈন্যের গোলন্দাজ বাহিনী আছে, 'স্যাপারস্ এণ্ড মাইনারস্' বা ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী আছে, 'সিগ্‌ন্যাল কোর' বা টেলিগ্রাফ-টেলিফোনকারী বাহিনী আছে, অশ্বারোহী বাহিনী আছে, পদাতিক বাহিনী আছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক গোরা পদাতিক রেজিমেণ্টের ও প্রত্যেকটি গোরা তোপখানার সঙ্গেও কিছু কিছু দেশী সৈন্য থাকে। ইহাদের প্রতিটিতে কোন জাতির সৈন্য কত থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন, ব্রিটিশ ফিল্ড আর্টিলারীর তৃতীয় ব্রিগেডে যে দেশীয় সৈন্য লওয়া হয় তাহাদের জাতি ও অনুপাত এইরূপ - একটি ব্যাটারী, শতকরা পঞ্চাশজন ঝিলমের ওপারের পঞ্জাবী মুসলমান ও পঞ্চাশজন ঝিলমের এপারের পঞ্জাবী মুসলমান; দুইটি ব্যাটারী, সংযুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, উত্তর রাজপুতানা ও পঞ্জাবের আহির; একটি ব্যাটারী, সংযুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীর জাঠ। দেশী ১৬নং মব মাউন্টেন

গঢ়বালী: সংযুক্ত প্রদেশের গঢ়বাল জেলা ও টেহ্‌রী রাজ্য হইতে গঢ়বালী সৈন্যেরা আসে। উহাদিগকে গুর্খা বলিয়া ভুল করা উচিত নয়। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধে গঢ়বালীরা খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। যে সকল ভারতীয় সিপাহী সর্ব্বপ্রথমে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পায়, একজন গঢ়বালী সৈনিক তাহাদের অন্যতম।

ব্যাটারীর অনুপাত—অর্দ্ধেক পঞ্জাবী মুসলমান, অর্দ্ধেক জাঠ শিখ ভিন্ন অন্য শিখ। 'কিং জর্জেস্ ওন্ বেঙ্গল স্যাপারস্ এণ্ড মাইনারস্' রেজিমেণ্টের অনুপাত—৩১ ও ৫৫নং ফিল্ড ট্রুপ্ মুসলমান ; ১নং ফিল্ড কোম্পানী অর্দ্ধেক হিন্দু, এক-চতুর্থাংশ শিখ, ও এক-চতুর্থাংশ মুসলমান ; ২, ৩ ও ৫ নং ফিল্ড কোম্পানী অর্দ্ধেক শিখ, এক-চতুর্থাংশ মুসলমান, এক-চতুর্থাংশ হিন্দু ; ৪ নং ফিল্ড কোম্পানী অর্দ্ধেক পাঠান, এক-চতুর্থাংশ হিন্দু, এক-চতুর্থাংশ শিখ ; ৬ ও ৮ নং আর্মি ট্রুপ্স্ কোম্পানীর অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান ; ৫১ নং প্রিণ্টিং সেক্শনের অর্দ্ধেক পাঠান পঞ্জাবী মুসলমান ও মেও, অর্দ্ধেক হিন্দু, হিন্দুর অর্দ্ধেক আবার গড়বালী রাজপুত ভিন্ন অন্য গড়বালী হইতে পারে। অশ্বারোহীদের মধ্যে ১০ নং 'গাইডস্ ক্যাভালরি' রেজিমেণ্টের অনুপাত—এক স্কোয়াড্রন ডোগ্রা, এক স্কোয়াড্রন পঞ্জাবী মুসলমান, এক স্কোয়াড্রন শিখ। পদাতিকের মধ্যে ১২ নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের অনুপাত—তিনটি রাইফল্ কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত বারোটি প্লাটুনের তিনটি পঞ্জাবী মুসলমান, তিনটি শিখ, তিনটি ডোগরা, একটি ওরাকজাই পাঠান, একটি খাট্টাক পাঠান ও একটি ইয়ুসফজাই পাঠান। এইভাবে সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি দলেই সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা আছে।

রাজপুত : রাজপুত বলিতে রাজপুতানার অধিবাসী বুঝায় না. পশ্চিম বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতির ক্ষত্রিয় বুঝায়। সৈন্যদলে যে সকল রাজপুত লওয়া হয়, তাহাদের অর্দ্ধেক আসে সংযুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চল হইতে, অর্দ্ধেক আসে রাজপুতানা হইতে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় একটি রাজপুত পল্টন আছে।

এই ভাগবাটোয়ারার মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, মোটামুটি এই ভাগবাটোয়ারা এরূপভাবে করা হইয়াছে যাহাতে কোন রেজিমেণ্ট, ব্যাটালিয়ন বা ব্রিগেড একটি মাত্র জাতির দ্বারা গঠিত না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক জাতিগুলিকে পরস্পর মিশিতে না দিয়া দলবিশেষে আবদ্ধ রাখাতে উহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও বজায় রহিতেছে। একমাত্র পদাতিক সৈন্যের ক্ষেত্রেই এই নিয়মের আংশিক ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেশী পদাতিক বাহিনীর মধ্যে নানাজাতির মিশ্রিত ব্যাটালিয়নও আছে, এক জাতির ব্যাটালিয়নও আছে। যেমন, এখন কলিকাতায় যে দেশী ব্যাটালিয়ন বা পল্টন আছে (৭নং রাজপুত রেজিমেণ্টের ২য় ব্যাটালিয়ন) উহা পঞ্জাবী মুসলমান ও সংযুক্তপ্রদেশের রাজপুত দ্বারা গঠিত, কিন্তু মেদিনীপুরে যে পল্টন আছে (১৮নং গড়বালী রাইফল্সের ৩য় ব্যাটালিয়ন) উহা সম্পূর্ণ গড়বালী। আবার কুমিল্লায় যে পল্টন আছে (৯নং গুর্খা রাইফল্সের ১ম ব্যাটালিয়ন) উহা কেবল গুর্খা দ্বারা গঠিত, কিন্তু ময়মনসিংহে যে পল্টন আছে (৯নং জাঠ রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটালিয়ন) উহাতে জাঠ, পঞ্জাবী মুসলমান ও রণঘার আছে। এই মিশ্রণেরও একটা নিয়ম আছে। প্রত্যেকটি পদাতিক পল্টন একটি হেড কোয়ার্টার উইং ও চারিটি কোম্পানীতে বিভক্ত—প্রত্যেক কোম্পানীর মধ্যে আবার চারিটি করিয়া

প্লাটুন। যে পদাতিক পল্টনে নানাজাতির সৈন্য থাকে তাহার বিভিন্ন জাতিগুলিকে সাধারণতঃ বিভিন্ন কোম্পানী বা প্লাটুনে আবদ্ধ রাখা হয়।

এই দুই প্রকারের পদাতিক পল্টনের মধ্যে মিশ্রিত পল্টনগুলিকে কথনও কথনও 'ক্লাস কোম্পানী রেজিমেণ্ট' বলা হয়, একজাতির পল্টনগুলিকে 'ক্লাস রেজিমেণ্ট' বলা হয়। সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সর্ব্বসুদ্ধ উনিশটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট ও দশটি গুর্খা রেজিমেণ্ট আছে। উনিশটি ভারতীয় রেজিমেণ্টের প্রত্যেকটিতে দুই হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত ব্যাটালিয়ন ও মোট আটানব্বুইটি ব্যাটালিয়ন আছে। প্রত্যেক গুর্খা রেজিমেণ্টে দুইটি করিয়া ব্যাটালিয়ন আছে ও মোট কুড়িটি ব্যাটালিয়ন। ইহাদের মধ্যে সবগুলি গুর্খা পল্টনই 'ক্লাস রেজিমেণ্ট' বা কেবলমাত্র গুর্খার দ্বারা গঠিত। তবে যদি নানা জাতির গুর্খার মধ্যে পার্থক্য করা যায় তাহা হইলে এই রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে কিছু কিছু মিশ্রণ আছে বলা যাইতে পারে। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম গুর্খা রেজিমেণ্টে সমানভাবে গুরুং ও মগর গুর্খা লওয়া হইয়া থাকে; ৯ম গুর্খা রেজিমেণ্টে ঠাকুর ও ছত্রি গুর্খা লওয়া হয়; এবং ৭ম ও ১০ম গুর্খা রেজিমেণ্টে রায়, লিম্বু ও সামান্য সুনবার গুর্খা লওয়া হয়। ভারতীয় রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে ৫ম মারাঠা, ১৭শ ডোগরা ও ১৮শ গঢ়বালী সম্পূর্ণ ভাবে এবং ১১শ শিখ আংশিক ভাবে ক্লাস রেজিমেণ্ট। বাকী সবগুলি রেজিমেণ্টই ভারতবর্ষের নানা স্থানের নানা ক্ষাত্র জাতির সংমিশ্রণে গঠিত।

[দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি ম্যাকমান ও লভেট প্রণীত "দি আর্মিজ অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। এই পুস্তক ১৯১১ সনে প্রকাশিত হয়। সুতরাং চিত্রগুলিতে যে ইউনিফর্ম ও অস্ত্রাদি দেখান হইয়াছে সে-সকলই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার।]

জলাঙ্গী

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

'ফিরিব না কভু আর'—বলেছিনু একদা উন্মনা
ভাবমূঢ় চেতনায় হেরেছিনু অস্পষ্ট লেখায়
আমারি জীবন-কথা। তব তীরে আর ফিরিব না—
অরুণ-সিন্দুর তব সীমাহীন সীমন্ত-রেখায়
দেখিবে না তব কবি হে জলাঙ্গী, গোধূলি-আঁধারে;
তারকা আসিবে নামি' সন্ধ্যা-স্নানে তব জল-তলে
সুনির্জ্জন বনভূমে তীব্র দীর্ঘ করুণ চীৎকারে
কাঁদিবে ঝিল্লির দল, শিশিরাশ্রু নবীন শাদ্বলে
শোভিবে মুক্তার মত; দূরতম স্রোতের কিনারে
ভাসিবে নিঃসঙ্গ তরী, ফিরিবে না উদয়-অচলে!

ওগো নিত্যগতিময়ী, তুমি জান তব পরিণাম
তাই ত যৌবন তব উচ্ছ্বসিত একলক্ষ্য পানে
আনন্দের সৌন্দর্য্য-পসরা। আর, যার নাহি গান,
আর যার যৌবনের নিষ্পেষণ জীবন-তুফানে
মৌন তার যন্ত্রণায় কোথা গতি কোথা বা উদ্দেশ
হে জলাঙ্গী, পার কি বলিতে? তুমি ধ্রুব মহিমায়
সলিল-মুকুরে তব হেরিতেছ উল্লসিত বেশ,
বক্ষ তব দুলে ওঠে আকাশের সুনীল ছায়ায়
দুর্ব্বার যৌবন তব উপেক্ষিল কালের নিমেষ,
কি কঠিন নর-ভাগ্য, জান তার সন্ধান কোথায়?

শ্যামলী, তুমি ত ভাঙো, ক্ষুরধার তরঙ্গে তোমার
মৃত্তিকার গূঢ়গ্রন্থি ছিন্ন কর বিজয়-উল্লাসে,
সে তব সংহার-মূর্ত্তি, সৃষ্টি জাগে ভরি' পর-পার
হিল্লোলিত কাশ-গুচ্ছ মিশে যায় সুদূর আকাশে।
হে সুন্দরী, দৃষ্টি মোর বিনাশের পায় না সন্ধান—
কোথা আদি, অন্ত তার—দেখি শুধু নিঃশব্দ ভাঙন!
এ নদীর প্রান্ত হতে শুনি শুধু বাজিছে বিষাণ,
প্রলয়-ডম্বরু-রোল। অবিরল নামিছে শ্রাবণ
মিশে যায় তট-রেখা, কণ্ঠে আসি থেমে যায় গান—
ফিরিব না কভু আর,—ঝিল্লিরবে কাঁদিবে কানন।

বেকার-সমস্যা

—শ্রীশান্তা দেবী

মা বলিলেন, "হ্যাঁরে শিবু, ছেলেদের গায়ে শীতের কাপড় নেই, মেয়েটাকে তিন বছরে একবার শ্বশুরবাড়ী থেকে আনতে পারলাম না, অসুখে-বিসুখে কারুর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারি না, চিরটা কাল এমনি করেই কি কাটবে?"

ছেলে শিবরাম মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া বলিল, "ভাগ্যে যদি তাই থাকে ত কে খণ্ডাতে পারে?"

মা ছেলের পাতে একহাতা গরম ডাল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "অবাক্ করলি বাছা তুই! সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোকে যে এম-এ পাস করালাম সে কি ভাগ্যি মানাবার জন্যে? যে টাকা তোর পিছনে ষোল বচ্ছর ঢেলেছি তার সিকিও যদি এই দু বছরে তুলে দিতে পারতিস ত আমার সংসারের এমন দুর্দ্দশা হত না। দু বেলা খাবি দাবি, জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবি, এই কি তোর উচিত কাজ? টাকা-পয়সা আনবার জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্তির করতে হয় না?"

শিবরাম রাগ করিয়া পাত ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "আবার কি রকম করে চেষ্টা-চরিত্তির করতে হবে? পা উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটব? তোমার কি ধারণা যে দু বেলা জামা গায়ে দিয়ে আমি বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখে বেড়াই? চেষ্টা করতেই ত যাই।"

মা বলিলেন, "আমি আর কি করব বাছা? যা বোঝ তাই কর।" তিনি হতাশ হইয়া ডালের হাতা ও কাঁশিটা তুলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। শিবরাম বৈঠকখানা ঘরে গিয়া সতরঞ্চি-ঢাকা তক্তাপোষটার উপর খবরের কাগজগুলি লইয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বাড়ীতে খবরের কাগজ কিনিবার পয়সা তাহাকে কেহ দিত না। দিবেই বা কে? বিধবা মায়ের সামান্য পুঁজি-পাটার উপর তাহারই উপার্জ্জিত মাসিক ত্রিশ টাকা যোগ করিয়া সংসার কায়ক্লেশে চলে। তাই যে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী রোজ সকালে সে ছেলে পড়াইতে যায়, তাঁহাদেরই আগের দিনের পড়া ষ্টেট্‌সম্যান কাগজখানা সে চাহিয়া পড়িতে আনে। পরের দিন আবার ফিরাইয়া দেয়। বড়রাস্তার উপরের 'খদ্দর-ভাণ্ডার' হইতে একখানা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও বলিয়া-কহিয়া সংগ্রহ করে। দুপুরে ভাত খাইবার পর এই কাগজ দুইখানির 'ওয়াণ্টেড' কলম মুখস্থ করিয়া ফেলা তাহার কাজ। দরখাস্তও সে কাগজ দেখিয়া কম করে নাই, কিন্তু বেশীর ভাগেরই কোন উত্তর পায় নাই। জবাব পাইয়া অদৃষ্টপরীক্ষার আশায় যে দুইচার জায়গায় বুক বাঁধিয়া গিয়াছিল সর্ব্বত্রই হতাশার কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

শিবরাম পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিল তাহার মত ইতিহাসে এম-এ পাশ উমেদারের জন্য কোন চাহিদা নাই। দেশশুদ্ধ লোকেই জীবনবীমা কোম্পানী খুলিয়াছে এবং সকলেই এজেণ্ট চায়। বীমা-কোম্পানীর এজেণ্ট হইতে তাহার যে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল তাহা নয়। কিন্তু এ উপায়ে রাতারাতি বড়লোক হইবার আশা যে তাহার একেবারেই নাই তাহা শিবরাম জানিত! শিবরাম চোখ বুজিয়া একবার নিজের পরিচিত সব লোকের মুখ ভাবিয়া লইল। তাহার ভিতর বীমা করিবার মত টাকা শতকরা নব্বই জনের নাই। দুই দশ জনের যাও বা কিছু টাকা-পয়সা আছে, তাহা বাহির করা যাইবে না, কারণ তাহারা নিজেরাই প্রায় প্রত্যেকে এক একটা বীমা-কোম্পানীর এজেণ্ট। বাকি থাকে তাহার মনিব ব্যারিষ্টার মুকুন্দরাম গোস্বামী আর তাহার অধ্যাপক মিঃ সেন। দুই জনেরই বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের এজেণ্টরা কি আর এতদিন তাঁহাদের পাকড়াও করিতে ভুলিয়া আছে? শিবরাম আশা ছাড়িয়া দিল। তাহার দ্বারা একাজ হইবে না। অচেনা লোকের দরজায় দরজায় সে ঘুরিতে পারিবে না। কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করিবে তাহাই সে ভাবিয়া পায় না।

বাকি আছে জনকয়েক ধাত্রী ও গৃহশিক্ষকের পদ। প্রথম কাজটা লাভজনক ব্যবসায় বটে, কারণ ধাত্রীদের মত গহনা সে বড়লোকের গৃহিণীদেরও পরিতে দেখে নাই। কিন্তু ও কাজটা এজন্মেও তাহার দ্বারা হইবে না। অনেক তপস্যার ফলে যে পুরুষ-জন্ম পাইয়াছে, আগামী জীবনে তাহা নাকচ করিতে পারিলে ভাবিয়া দেখা যাইবে। আর গৃহ-

শিক্ষকের কাজ দুই বেলা ত দুইটা সে করিতেছেই, ইহার উপর আর খাটিবার তাহার ক্ষমতা নাই।

শিবরাম অমৃতবাজার খানা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ষ্টেটস-ম্যানটা খুলিল। হায় রে অদৃষ্ট! ধাত্রী, নর্স, লেডি ডাক্তার ও সুন্দরী তরুণী ইউরোপীয়ান মহিলা ছাড়া আর কাহারও কি এ মর-জগতে বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই?

একটা বিড়ি টানিতে টানিতে বন্ধু নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকিল। শিবরামের ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কি রে শিবু, ক'টা চাকরী যোগাড় করলি?"

শিবু এ কাগজখানাও টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আর চাকরী! একি তোর সত্যযুগের পৃথিবী! এখন চাকরী পেতে হলে মুখে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক আর গায়ে সেণ্ট মেখে ঘাঘরা পরে বেরোতে হয়। আমার বিয়ে হলে ভাই, দুবেলা কন্যাকামনা করব আর সব ক'টা মেয়ের নাম রাখব মেরী, কেটি আর ডলি। একে পুরুষ তার শিবরাম, আমাদের অদৃষ্টে সুখ হবে কোথা থেকে? অথচ টাকা রোজগার করি না বলে মা ত প্রায় ঘর থেকে খেদিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।"

নিত্যানন্দ শিবুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "মনের দুঃখে তাই বলে কেঁদে ফেলিস্ না। এ স্বাবলম্বনের যুগ, চাকরী নাই করলি। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা ফাঁদ না, আমিও তোর সঙ্গে ঝুলে পড়তে রাজি আছি। কষ্ট করলেই কেষ্ট পাওয়া যায়, জানিস্ ত! খাটলে আমাদের টাকা মারে কে?"

শিবু বলিল, "অত অপ্‌টিমিষ্ট হ'স নেরে নিতু। টাকায় টাকা টানে। শুধু হাতে ব্যবসা কি অমনি মুখের কথা?"

নিতু বলিল, "আচ্ছা ধর, একটা চপকাটলেটের দোকান করলে হয় না? ওতে ত আর বেশী টাকা ঢালবার দরকার নেই। রোজ বিক্রী করে রোজকার টাকা ফিরে পাবি, তাইতেই মূলধন ক্রমে বাড়বে।"

শিবু হাসিয়া উঠিল। "রোজ যে সব বিক্রী হবে তার গ্যারাণ্টি তোকে কে দিলে? পরের দোকান থেকে চপ-কাটলেট কিনে খেতে বেশ লাগে, কিন্তু যখন নিজের দোকানের চপ-কাটলেট রাত্রিবেলা ট্রেশুদ্ধ ঘরে নিয়ে আসতে হবে, তখন সেগুলো গিলতেও গলায় আটকাবে, ফেলতেও চোখে বান ডাকবে। আর তোর মূলধন দিনকার দিনই শূন্যের দিকে নামতে থাকবে।"

নিতু বলিল, "দূর ভীরু কোথাকার। পুরুষ-বাচ্ছার একটু সাহস না থাকলে কাজ হয়? ঐ যে সংস্কৃতে কি বলে—'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং' সে কথাও কি ভুলে গেছিস?"

শিবু বলিল, "কি জানি বাবা, সেই কবে ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃত পড়েছি সিংহ-টিংহ মনে নেই। 'বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সংপ্রাপ্তঃ পথিকঃ সমৃতো যথা' এইটুকু মনে আছে, তাও হয়ত সবটাই ব্যাকরণ ভুল।"

নিতু হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা যেখানে বাঘ-ভালুক কিছুর ভয় নেই সেই রকম একটা নিরাপদ ব্যবসা করা যায় না? এক পয়সাও মূলধন নেই এক পয়সা লোকসানও নেই। শুধু একটা গেরুয়া পাগড়ী আর একখানা হাত দেখার বই।"

শিবু বলিল, "নিরাপদই বটে! কি না কি বলে বসব লোককে, তার পর না ফললে মার খেয়ে বেঘোরে পৈতৃক প্রাণটা যাক। তাছাড়া কলকাতার সহরে কোনখানে তুমি লুকিয়ে থাকবে শুনি? যত সব কলেজের ছোঁড়াগুলোর কাছে একবার যদি ধরা পড়ে যাই ত লোকসমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

নিতু বলিল, "ওরে আমার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! হাত দেখা কি এমন মহাপাপ যে তুই মুখ দেখাতে পারবি না?"

শিবু বলিল, "বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলব আর লোকের কাছ থেকে পয়সা নেব তবু পাপ যদি না হয় তাহলে মানুষ খুন ছাড়া কিছুই পাপ নয়।"

নিতু বলিল, "ব্যবসাদার মাত্রই মিথ্যেকথা বলে। উকিল, ব্যারিষ্টার, গুরু, পুরুত, স্যাকরা, ধোপা, নাপিত যে যা বলে সব বেদবাক্য তুই বলতে চাস?"

শিবু বলিল, "আমি কিছু বলতেও চাই না, তোর সঙ্গে আর তর্কও করছি না। এইবার আমি চুপ করলাম। বাইরে টহল দিয়ে কিছু প্রেরণা পাওয়া যায় কি না দেখি।"

নিত্যানন্দ আর একটা বিড়ি ধরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

শিবরাম গায়ে সার্টটা চড়াইয়া উল্‌টাপথে বাহির হইল। রাস্তার দুইধারের যত ডাইং এণ্ড ক্লিনিং কোম্পানী আর হেয়ার ড্রেসিং সেলুনগুলির দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে তাকাইয়া

রহিল। এখানে মূলধনের বেশী বালাই নাই, সন্দেশ কিম্বা চপ পচিয়া নষ্ট হয় না, নিরাপদ ব্যবসায় বটে। কিন্তু কাপড় কাচিতে অথবা চুল কাটিতে ত সে নিজে পারিবে না, ধোপা নাপিতকে মাস পোহাইলে মাহিনা দিতে হইবে, তাছাড়া আছে ঘরভাড়া। যদি খদ্দের না জুটাইতে পারে তখন এই কয়টা টাকাই বা সে কোথা হইতে দিবে? নাপিতের দোকানে লুকাইয়া কিছুদিন এপ্রেন্টিস থাকিলে হইত। তারপর সুট পরিয়া হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে চুলকাটার ব্যবসা সুরু করিলে তাকে ঠাট্টা করিবার সাহস আর কাহারও হইবে না। কিন্তু কলিকাতায় অজ্ঞাতবাস যে বড়ই কঠিন ব্যাপার। মান খোয়াইবার ভয় শিবরামের বড় বেশী।

সন্ধ্যাবেলা দ্বিতীয় টুইশনিটা একেবারে সারিয়া কেশ তৈল, দাদের মলম, জ্বরের মহৌষধ প্রভৃতি অর্থ সৃষ্টির নানা প্রচলিত পন্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ী ফিরিল। জিনিষগুলি করা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু যাহাকেই জিজ্ঞাসা করে সেই বলে, "জয়ঢাক ঘাড়ে করে সারা বাংলা বেড়াতে পারলে তবে বিক্রী হবে। নইলে ঘরের শোভাবর্দ্ধন ছাড়া আর কোনও কাজ হবে না।"

বাড়ীতে ঢুকিয়া সে দেখিল, এই সন্ধ্যাবেলা কাজের সময় মার রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া মস্ত সভা বসিয়া গিয়াছে, পাড়ার যতগুলি সন্তানহীনা বিধবা ও পেনসান্-প্রাপ্ত গৃহিণী কি একটা সুসমাচার লইয়া উদ্গ্রীব হইয়া শিবরামের মাকে শুনাইতেছেন। মা খুন্তি হাতে একবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া কড়ার তরকারিটা নাড়িয়া দিয়া আসিতেছেন, আবার বারান্দায় আসিয়া একটু দূরে আলগোছে দাঁড়াইয়া মহিলাদের বক্তব্য ও উপদেশ শুনিতেছেন। দেয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙানো হ্যারিকেনের আলোয় কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে পাড়ার এই বর্ষিয়সী অভিভাবিকারা শিবুর এতই পরিচিত যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও দেহের আয়তন দেখিয়াই কোন জন যে কে তাহা সে অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারে।

বৈঠকখানা ঘরে শিবরামের পদশব্দ পাইতেই মহিলাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলে প্রায় একসঙ্গেই হাতের উপর ভর দিয়া দেহভারকে সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দলের নেত্রী পাড়ার তারিণী দিদি নেড়া মাথায় থান কাপড়ের ঘোমটাটা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া কোমর বাঁকাইয়া কোন প্রকারে শিবুর মার কাছে অগ্রসর হইয়া গলার স্বরটা নীচু করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে ঘরে এসেছে, খেতে ধুতে দাওগে যাও। কিন্তু কথাটা ভুলো না, ভেবে চিন্তে দেখ। কাল আমি আবার খবর নিয়ে যাব।"

শিবুর মা খুন্তি হাতে সাবধানে একটু পিছু হাঁটিয়া বলিলেন, "তোমরা সুখে দুঃখে সব তাতে আছ, তোমাদের কথা কি ভুলতে পারি ভাই!"

খিড়কীর দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে চলমান সভার কথা চলিতে লাগিল। একেবারে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের শেষ কথা বলিয়া লইয়া মহিলারা পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শিবুর মা কনুইএর গুঁতা দিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিলেন, "ও শিবু, হাত পা ধুয়ে এসে বোস। গরম গরম যা হয়েছে, চাট্টি খেয়ে নে। ঠাণ্ডা হলে এ ঘাসপাতা কি আর মুখে রুচবে?"

শিবু আসিয়া পিঁড়ির উপর বসিয়া দেখিল, মার মেজাজটা এবেলা অনেক নরম।

গরম রুটি, খোসা চচ্চড়ি ও মাছের ঝোল কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "ঘেটের কোলে পঁচিশ বছরেরটি ত হলি, এবার বিয়ে-থা তোর একটা দিতে হবে।"

শিবু বলিল, "কেন, সকাল বেলা হিসেব করে বুঝি দেখলে যে তোমার টাকা ক'টা আমরা খেয়ে উঠতে পারছি না? ভাগীদার না হলে এ কুবেরের ঐশ্বর্য্য শেষ করা যাবে না।"

মা বলিলেন, "থাক্ থাক্, সব কথায় কথার প্যাঁচ কসতে হবে না। বয়সকালে বিয়ে না করে কোন্ মানুষ থাকে? যখনকার যা তখনকার তা। যা আজকাল দিন কাল, পায়ে শেকল না দিয়ে রাখলে কোন্ ছেলে যে কি করে বসেন তার ঠিক আছে?"

শিবু বলিল, "তুমি যদি খেতে পরতে দিতে পার ত আমার আর কি? দিব্যি চতুর্দ্দোলা চড়ে বিয়ে করে আসব।"

মা বলিলেন, "খেতে দেবার যোগ্যতা তোর কি কারুর চেয়ে কম করে ছেড়েছি! কলেজের কোন্ ডিগ্রিটা বাকি আছে? কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা হলেও মা লক্ষ্মী তাকালেন কই?"

তাহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাতার গৌরববোধ দেখিয়া শিবু মনে মনে হাসিল। হায়রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, মা সরস্বতী সকলের পাত চাটিতে শিখাইলেন কিন্তু অন্ন সংগ্রহ করিবার সামর্থ্যটুকু কাড়িয়া লইলেন !

শিবুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "সম্বন্ধ অনেক আসে, কিন্তু এবার যেটি এসেছে সে মেয়ে নয়ত রাজ-রাজেন্দ্রাণী। ছেলেবেলা তাকে আমি নিজেও দেখেছি, বড় হবার পর কে কোথায় ছড়িয়ে যায়, আর চোখে পড়ে নি। কিন্তু তারিণী দিদি বললে সতের বছরের মেয়ে, লম্বা-চওড়া গোলগাল, হাত পা যেন মোমের বাতি, রং একেবারে ইহুদি মেয়েদের মত। ওপরের মুখে কোথাও খুঁৎ নেই, একরাশ চুল, ছোট্ট গড়ানে কপাল, টিকোলো নাক, পানের মত পুরন্ত মুখের কাট। শুধু নীচের মুখে একটু খুঁৎ আছে, ডান পাশের একটা দাঁত উঁচু, ঠোঁটের উপর এসে পড়ে।"

শিবরাম এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়ে নাই, তবু তাহার মনে হইল সুন্দর মুখে এক পাশের একটি দাঁত অল্প একটু উঁচু হইলে বড় চমৎকার মানায়।

শিবরাম বলিল, "তারিণী মাসীর মত কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে মেয়ে এত ভাল উৎরেছে তাকে ত বিয়ে করাই উচিত। কিন্তু মা, তোমার ছেলেরও যে নীচের মুখে একটা খুঁৎ আছে।"

মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ওরে আমার রে ? ব্যাটা ছেলের আবার খুঁৎ ! অমন পড়ে গিয়ে দাড়িটা একটু কাটা অনেক লোকের থাকে।"

শিবু বলিল, "না, না, এযে তার চেয়ে বড় খুঁৎ। তোমার ছেলের খাবার মুখটা বড্ড বড়, চার বেলা না খেতে দিলে তার জাবর কাটার সুবিধা হয় না।"

মা বলিলেন, "বাপ মরে গেছে তাই তোমাদের সাধতে আসছে, নইলে ও মেয়ে বড় বড় ঘর থেকে লুফে নিয়ে যেত। মার সঙ্গে ফাজলামি না করে বিয়ে করবি কিনা সোজা কথায় বল।"

"পরে বলব এখন", বলিয়া শিবু কোন রকমে আহার সমাপন করিয়া পলায়ন করিল।

বিবাহও যে বাংলা দেশে অর্থ উপার্জ্জনের একটা পথ, সে কথা শিবরাম এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। সুন্দরী কন্যাটি পিতৃহীন শুনিয়াই তাহার সে কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল—বাংলা দেশের সুন্দরী ত ! দুই দশ বৎসর পরে কোলে কাঁখে ছেলে ঝুলাইয়া গোবর-কালি মাখিয়া সুন্দরী অসুন্দরী সব সমান হইয়া যাইবে। তাহার চেয়ে যেখানে বিবাহ করিলে ক্যাশবাক্স কিছু ভারী হয় এমন কনে খোঁজাই ত ভাল। বিশেষত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি ডিগ্রি অনুসারে উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছেলেদের না বাড়িলেও ভাবী শ্বশুরের নিকট টাকা আদায়ের হুকুমনামাটা বদলাইতে থাকে ইহা একটা মস্ত সান্ত্বনার বিষয়। কোথায় কাহার কিরূপ কুরূপা কি গুণহীনা কন্যাকে বিবাহ করিলে টাকার থলি বেশ ভারী হইয়া উঠিতে পারে, রাত্রে শুইয়া শুইয়া শিবরাম তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সকালে উঠিয়াই পকেটে একটা টাকা লইয়া সে হাঁটিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" আপিসে চলিল। কাগজে 'ম্যাট্রিমোনিয়াল' কলমে বিবাহপ্রার্থীরূপে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

২

বিজ্ঞাপন দিয়া জবাবের আশায় শিবু প্রত্যহ ডাকের পথ চাহিয়া থাকে। এক টাকা যে মূলধন খরচ করিল তাহা কি আগাগোড়াই জলে যাইবে ? দিন চারেক পরে শিবুকে আশ্বস্ত করিয়া একটি কন্যার ফোটোসমেত একখানি পত্র আসিল। শিবুর মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু মাকে ও নিত্যানন্দকে কোন রকমে লুকাইয়া ব্যাপারটা না সারিতে পারিলে বিফল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অযথা স্থানে হাসিটা সে প্রাণপণে চাপিয়া চলিত এবং অন্নচিন্তায় আহার নিদ্রা বিবাহ সবই যে সে ভুলিতে বাধ্য হইতেছে মাকে ও নিতুকে দেখা হইলেই এই কথা বুঝাইত।

চিঠির যখন উত্তর আসিয়াছে তখন দেখা করিতে ত যাইতেই হইবে। শিবরাম জরুরী তলব দিয়া কাপড়-চোপড় কাচাইয়া তৈরী হইল।

ভবানীপুরের একটা গলির ভিতর বাড়ী। রাস্তার ধারে দরজা দেখিলে মনে হয় ঢুকিয়া পড়িলেই বাড়ীর সন্ধান মিলিবে। দেয়ালের গায়ে তিন চারটা পেরেক মারিয়া সাইন-

বোর্ড টাঙ্গানো, কিন্তু গলির ভিতর ঢুকিয়া শিবু দেখিল, প্রায় কুড়ি পঁচিশ গজ পর্য্যন্ত দরজাহীন ঘরের দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কারাপ্রাচীরের মত দেয়াল পার হইতেই দেখা গেল, একটি কলতলা ও চৌবাচ্চা। সেখানে একটি উলঙ্গ বালক স্নানে রত। শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মদনবাবুর বাড়ী কোন্‌টা ?"

সে খানিকক্ষণ শিবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "সোজা চলে যান্।"

আরও গোটা দুই চৌবাচ্চা ও কলতলা পার হইয়া শিবু অবশেষে যেখানে পৌঁছিল সেখানে দেয়ালের গায়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি হাত আঁকা ; হাতের নীচে কাষ্ঠফলকে লেখা—মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রী শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী গুহ। অঙ্কিত অঙ্গুলির দিকের দরজায় ঢুকিয়া শিবু দেখিল দেড়মানুষ চওড়া খাড়া একটা সিঁড়ি। বাহিরে কি ভিতরে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই দেখিয়া শিবু সোজা দোতালায় উঠিয়া গেল। সিঁড়ির একপাশে বড় বড় সাদা চন্দ্রমল্লিকা ছাপ দেওয়া একটা লাল পর্দ্দা টাঙানো। বোঝা গেল এদিকে প্রবেশ নিষেধ। অন্য দিকে একটি ছোট কুঠরীতে দুইখানা বেঞ্চি, একটি কাঠের চেয়ার ও একটি বেতের টেবিল অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য ধূলিধূসরিত পড়িয়া আছে। শিবু খোলা দরজার কড়াটাই সজোরে নাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

দুই এক মিনিট পরে কালো ছিটের কোট গায়ে অতি ক্ষীণকায় একজন ভদ্রলোক আটহাত কালো পেড়ে ধুতি পরিয়া ঘরে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। শিবু কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কাঁচুমাঁচু মুখ ও নির্ব্বাক অবস্থা দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি কেসবাড়ী থেকে আস্‌ছেন ?" কেসবাড়ী ? শিবু আকাশ হইতে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, "ধাত্রী দরকার আছে ?" শিবুর এতক্ষণে সাইনবোর্ডের কথা মনে হইল। সে লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমি মদনবাবুর কাছে এসেছি। তিনি আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়ে আমায় দেখা করতে বলেছিলেন।"

মদনবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি ! আমিই মদনবাবু, আপনাকে চিনতে পারিনি মাপ করবেন। ভাল হয়ে বসুন, আপনি বরপক্ষের কে হন জিজ্ঞাসা করলে অপরাধ নেবেন না। ইতিপূর্ব্বে জানাশোনা নেই কি না।"

শিবু মহা ফাঁপরে পড়িল। অনেক ঘামিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমিই বিবাহার্থী। আমার পিতার অবর্ত্তমানে আমাকে নিজেই আসতে হল, কিছু মনে করবেন না।"

স্মিত হাস্য করিয়া মদনবাবু বলিলেন, "তা বেশ, তা বেশ। তাতে আর কি হয়েছে ? সাবালক ছেলে নিজে দেখে শুনে করাই ত ভাল। জ্ঞাতব্য যা কিছু তা আপনার কাছেই ত জানা যাবে ?"

শিবু মহোৎসাহে বলিল, "হ্যাঁ নিশ্চয়। তবে আমি দুবছর হল এম্-এ, পাস করেছি, এ ছাড়া আমার সম্বন্ধে খুব আশাপ্রদ সংবাদ আর কিছু নেই। সে কথা ত বিজ্ঞাপনে আমি জানিয়েই ছিলাম।"

অতঃপর পিতার নাম, পিতামহের নাম, জাতি, কুল দেশ, পেশা, ঘরবাড়ী, সম্পত্তি সকলের খোঁজই মদনবাবু করিলেন। কন্যাপক্ষের সকল কথা হইয়া যাইবার পর শিবুর প্রশ্নের পালা। এ সব কাজে শিবুর একেবারে কাঁচা হাত, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিল, "দেখুন আমি অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র কন্যাসন্তানকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, এ কথা বিজ্ঞাপনে আগেই লিখে দিয়েছিলাম, এখন আর জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় না। তবু সামনাসামনি একবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনার সন্তানসন্ততি কয়টি ?"

মদনবাবু গোঁফে একবার চাড়া দিয়া বলিলেন, "আমার সন্তান বলতে একটিমাত্র কন্যা।"

শিবু খুসী হইয়া বলিল, "অবস্থা বোধ হয় আপনার ভালই। পেশা কি ?"

মদনববাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ খাই-দাই, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকি যখন তখন অবস্থা ভালই বলতে হবে। তবে আমার নিজস্ব পেশা ঠিক কি তা বলা কঠিন। আমার গৃহিণী ধাত্রীর কাজ করেন। তাঁরই টাকা নিয়ে আমি একটা লোন-আপিস খুলেছি, আয় মন্দ হয় না।"

সর্ব্বাঙ্গে সত্তর কি আশী ভরির নিরেট স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়া বলিতে বলিতে উঠিতেছিলেন, "হ্যাঁগা আজ যে যুগীপাড়ার সুদ আদায়ের দিন তা কি ভুলে গিয়েছ ?"

ঘরের ভিতর শিবরামকে দেখিয়া তিনি কথার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া স্বামী ও অতিথি উভয়কেই অবজ্ঞা করিয়া পর্দ্দার অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

শিবরাম তাঁহার দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিল, 'ধাত্রীদের অবস্থা যে ভালই হয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।' মুখে বলিল, "বাড়ীঘর কিছু করেছেন?"

মদনবাবু বলিলেন, "করা ঠিক হয়নি। তবে রাস্তার ধার থেকে গলি দিয়ে আসতে আসতে যে চারটে কলতলা দেখলেন এই সারি সারি চারখানা বাড়ীই গিন্নী কিনেছেন। তিন খানা ভাড়া খাটে আর শেষটায় আমরা থাকি।"

শিবরাম অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সকলের পিছনে থাকেন, আপনার স্ত্রীর প্র্যাকটিসের ক্ষতি হয় না?"

মদনবাবু বলিলেন, "সদর রাস্তার উপরেই ত সাইনবোর্ড দিয়েছি, তাকিয়ে দেখেননি বুঝি? ক্ষতি কেন হবে? ভাড়াটেরা ত আমাদেরই দরোয়ানের মত সারাক্ষণ পথ বলে দিচ্ছে। তাছাড়া সামনের বাড়ীগুলোতে ভাড়া বেশী পাওয়া যায়। তিনখানা বাড়ীতে মাসে দেড় শ টাকা ভাড়া।"

শিবরাম ভাবিতেছিল, কন্যা যেমনই হউক এ বিবাহ না করিয়া সে ছাড়িবে না। বসিয়া বসিয়া মাসে দেড় শ টাকা বাড়ী ভাড়া পাওয়া কি মুখের কথা? তাহার উপর নগদ টাকা-পয়সা, থাকিবার বাড়ী, অলঙ্কার আসবাব সবই ত আছে।

মদনবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আপনাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। তারপর—" শিবু তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাকে আর অত 'আপনি, আজ্ঞে' করছেন কেন? তাছাড়া—তাছাড়া—এই আমি গিয়ে আজই মেয়ে দেখে যেতে চাই।"

মদনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একবার বাড়ীর ভেতর খোঁজ নিয়ে আসি।"

তিনি চলিয়া যাইতেই শিবুর মাথায় যত ভাবনা ভাঙিয়া পড়িল। না জানি কন্যা কেমন হইবে? সুন্দরী যদি হয় তবে সোনায় সোহাগা, আর তা যদি নিতান্তই না হয় ত মায়ের বর্ণিতা কন্যার মত ফর্সা মুখে ঠোঁটের উপর একটি মুক্তার মত দাঁত ঈষৎ দেখা যাইতেছে এমন হইলেও মন্দ হয় না। অথবা শ্যামরূপেই দুটি আয়ত গভীর চোখ ও দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি দেখিতে কিছু অশোভন দেখায় না। খাঁড়ার মত কি বাঁশীর মত নাক না হইলেও শুধু চোখের দৃষ্টিতে সমস্ত মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে।

দাসীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "এই যে এখ্খুনি আসি মা ঠাকরুণ" বলিয়া পরদাটা পাকাইয়া উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সে ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিতে গুঁজিতে সিঁড়ি দিয়া দৌড় দিল।

শিবরামের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। ঐ বুঝি মেয়ে আসিয়া পড়িল। যদি একেবারে হিড়িম্বা কি তাড়কার মত দেখিতে হয় তাহা হইলে কি হইবে? এত দূর অগ্রসর হইয়া না বলিবার সাহস শিবুর নাই। তাহার চেয়ে এই বেলা উঠিয়া চোঁ-চাঁ দৌড় দেওয়া ভাল। কিন্তু চারখানা বাড়ী, একটা লোন-আপিস আর তাহাকে কে দিবে? শিবরাম দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, যাইবে, কি থাকিবে।

সিঁড়ির ও পাশেই শাড়ীর খস্ খস্, চুড়ির রিনিঠিনি, মৃদু ভর্ৎসনা শোনা যাইতে লাগিল। শিবরাম সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

খাবারের থালা হাতে করিয়া ঝি ও রূপার পানের ডিবা হাতে মদনবাবুর কন্যা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, মদনবাবু কন্যার পাশে পাশেই ছিলেন। শিবরাম চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। একজোড়া জড়ির চটি ও গোলাপী রঙের একখানা বেনারসী ছাড়া এতক্ষণ তাহার চোখে কিছুই পড়ে নাই।

মদনবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "শিবরাম বাবু, এই যে আমার কন্যা তরঙ্গিণী, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে এলাম।" অগত্যা শিবরাম চোখ তুলিয়া চাহিয়া নমস্কার করিল। যাক্ একেবারে তাড়কা নয়, বাঁচা গিয়াছে। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় শিবুর মুক্তাদন্তের প্রতি পক্ষপাত জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। তরঙ্গিণীর উপরের পাটির সব কয়টা দাঁতই নীচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। অনেক কষ্টে দাঁত দিয়া উপরের ঠোঁট কামড়াইয়া সে তাহার মুক্তাদন্তের কিরণ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। মেয়ের গায়ের রং একেবারে কুচকুচে কালো নয়, শ্যামবর্ণ। দেহের আয়তনে মাতার সঙ্গে কোনোই সাদৃশ্য নাই, পিতার মতই ক্ষীণ দেহ।

মদনবাবু বলিলেন, "কিছু জিগগেস করুন।" শিবু সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "আপনি কোথায় পড়েন?"

তরঙ্গিণী দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "বেলতলার ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ি।" বলিয়াই মুখ আবার টিপিয়া বন্ধ করিল।

অতঃপর কথাবার্ত্তা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। শিবরাম বড় বড় ক্ষীরমোহন লবঙ্গলতিকা ও 'আবার খাব' সন্দেশ খাইয়া পান চিবাইয়া যাত্রার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কন্যা তখন অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে। মদনবাবু বলিলেন, "একটা কিছু বলে যান।" শিবু বলিল, "মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি বিবাহের আয়োজন করতে পারেন।"

মদনবাবু হাসিয়া দুই হাত কচলাইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ; কিন্তু আশীর্ব্বাদ-টাশীর্ব্বাদ ত আছে। আপনার মাতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে তবে আমি একবার দেখা করতে যাব।" শিবু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, সে সবে কিছু দরকার নেই। মা আবার সেকালের তন্ত্রের মানুষ কিনা। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা পছন্দ করেন না। বলবেন যে, ধাত্রীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না।"

কথাটা বলিতে শিবরামের অত্যন্তই সঙ্কোচ হইতেছিল, কিন্তু মা পাছে তাহার এমন বিবাহে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ান এই ভয়ে সে কথাটা বলিয়া ফেলিল।

মদনবাবু কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করিলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁ, সেকালের বিধবা মানুষ, ওকথা বলতেই ত পারেন।" গোপনেই বিবাহ হইয়া গেল। মাকে শিবু কিছুই বলে নাই। কন্যাকর্ত্তা শিবুকে হীরার আংটি, সোনার রিষ্টওয়াচ, বেনারসীজোড়, রূপার বাসন কিছু দিতেই বাকি রাখিলেন না। তরঙ্গিণীরও সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। আজকালকার সোনার বাজার যে রকম গরম তাহাতে তাহার মূল্যও অন্তত হাজার দুই টাকা হইবে। আসবাবপত্রও যে কিছু ছিল না তাহা নহে। শিবু মনে মনে ভাবিল, হাজার তিনেক টাকা এমন করিয়া অকারণ গহনাগাঁটিতে আটক না রাখিয়া লোন-আপিসে ইহা খাটাইলে এক বছরেই শ'চারেক টাকা লাভ হইতে পারিত। কিন্তু সে নূতন জামাই, বিবাহ-সভার ত কিছু বলিতে পারে না।

বিবাহে খুব কিছু প্রাচীন রীতি মানিয়া চলা হইল না। কাজেই বিবাহরাত্রিতেই তরঙ্গিণীর সঙ্গে শিবরাম নিভৃতে কথা বলিতে পাইল।

ঘরে যখন আর কেহ নাই, তরঙ্গিণী শ্রান্ত মাথাটা দুই হাতে ধরিয়া একটু বিশ্রামের চেষ্টা করিতেছে, তখন শিবরাম যথাসাধ্য মোলায়েম ও সরস গলা করিয়া বলিল, "তরু, মার জন্যে তোমার মন কেমন করছে? আমি ত তোমাকে এখন মার কাছ থেকে নিয়ে যাব না।"

তরু একটু থামিয়া বলিল, "আমার মা কোথায় যে, মার জন্যে মন কেমন করবে?"

শিবু চক্ষু বাহির করিয়া বলিল, "কেন মদনবাবুর স্ত্রী রাধাবিনোদিনী গুহ। তুমি ত মদনবাবুরই কন্যা?"

তরঙ্গিনী বলিল, "হ্যাঁ আমি মদনবাবুর মেয়ে বটে, কিন্তু রাধাবিনোদিনী আমার সৎ মা।"

শিবুর গলা অত্যন্ত মিহি হইয়া গেল। সে মরিয়া হইয়া বলিল, "সৎমা তোমায় ভালবাসেন ত? তাঁর ত আর কোন ছেলেপিলে হয়নি শুনেছি।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এবারে আর হয়নি বটে, আমার বাবার আমিই এক মেয়ে। কিন্তু মার প্রথম পক্ষের দুই ছেলে আছে। মা বাবা সব কথা চাপা দিয়ে বিয়ে দিলেন বলে তারা রাগ করে বিয়েতে আসেনি।"

শিবরাম দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরব হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী বেচারী আপনা হইতে বলিল, "আমি নিজে বাবাকে বারণ করেছিলাম। তাতে বাবা বললেন—আমি বরের সঙ্গে একটাও মিথ্যা কথা বলব না, দেবো-থোব খুব ভাল। তা ছাড়া পুজোর সময় এমন তত্ত্ব করব যে দেখে জামাই খুসী না হয়ে পারবে না।"

শিবরাম ভাবিল—সত্যই ত মদনবাবু একটাও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার নামে মোকর্দ্দমা করা চলে না। তাহারই অদৃষ্টে সব মন্দ হইল। আচ্ছা দেখা যাক লোন-আপিসে একটা চাকরী পাওয়া যায় কি না।

সাহিত্য

—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

বৃষ্টি কখন ছাড়িয়া গিয়াছে লক্ষ্য করি নাই, কারণ বৃষ্টি দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছিল বহুদিন পূর্ব্বে শোনা শপোঁ (Chopin)-র **Jardin sous la pluie.** * আমি ছিলাম বরাবর বাখ্ (Bach)-এর ভক্ত,শপোঁকে'ডিকাডেন্ট' (decadent) বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতাম। শপোঁর প্রতি আমার এই অশ্রদ্ধা দূর করিবার জন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ আমার এক বন্ধুপত্নী একদিন আমাকে তাঁহার নিপুণ হস্তে এই Jardin sous la pluie বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন। সেদিন স্বীকার করিতেই হইয়াছিল বাখ্ অতি মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু শপোঁর সুষমারও জোড়া মেলে না। জীবনে সেই একবার মাত্র শোনা শপোঁর এই বৃষ্টির গান, তাও কত বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু সুর তাহার চিরদিনের জন্য অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে। বৃষ্টির আঘাতে মনের বীণায় সেই সুরই শুধু বাজিয়া উঠে, বৃষ্টি শেষ হইলেও সে সুরের রেশ মেটে না।

ঠিক তেমনি জাগিয়া উঠে মনে সেগান্তিনি (Segantini)-র একটি ছবির কথা। ইউরোপের কোন্ চিত্রশালায় ছবিটি দেখিয়াছিলাম তাহা আর মনে নাই, কিন্তু ছবিটির প্রত্যেকটি রেখা এখনও স্পষ্ট স্মরণ আছে। ছবিটির বিষয়বস্তু আর কিছুই নয়—প্রত্যূষে একটি কৃষক লাঙ্গল চালাইয়া জমি চাষ করিতেছে। ছবিতে কৃষকের পৃষ্ঠদেশই শুধু দেখা যায়, মুখ দেখা যায় না। পাহাড়ে জমির কঠিন পৃষ্ঠ ছবিতেও যেন অনুভব করা যায়। বালসূর্য্যের অরুণ কিরণে দৃশ্যপটটি উদ্ভাসিত। মাত্র একদিন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য ছবিটি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যতবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছি ততবারই এই ছবিটি আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিলেও ছবির এই স্নিগ্ধ রংয়ের ছটায় চিত্ত স্তিমিত করিয়া রাখিয়াছে।

তেমনই সকল কাজে আজও মনে আসিয়া পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে শোনা রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সুষমাময় অমর কবিতা, "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।" কৃষ্ণকলি যে কালো নয় তাহাও তখন জানা ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহাতে কালো চোখের কত স্বপ্ন রচনা করিয়াছে।

শপোঁ, সেগান্তিনি ও রবীন্দ্রনাথ, এই ত্রিবিধ তিনটি রূপস্রষ্টার রচনার মধ্যে একটি সাধারণ গুণ বর্ত্তমান। প্রত্যেকেরই রচনা একটি বিশেষ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া আছে এবং সেই বিষয়বস্তুটি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে-রসরচনার সৃষ্টি হইয়াছে সেটি কোথাও সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নয়। একটি মাত্র বৃষ্টিতে শপোঁর গানের সার্থকতা নিঃশেষিত হইয়া যায় না, প্রতি বৃষ্টিতেই তাহার সুর বাজিয়া উঠে। কারণ, আসলে শপোঁর রচনা বৃষ্টির গান নয়, ইহা বৃষ্টিধর্ম্মী জগতের সুরাত্মক পরিচয়-পত্র। সেগান্তিনির প্রভাতচিত্রও সেইরূপ শিল্পীর অনন্ত প্রয়াসের বাহন স্বরূপ মাত্র, চিত্রের আখ্যানবস্তু সেখানে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণকলির কালো চোখে যে মুহূর্ত্তে বিশ্বের অনন্ত সুষমা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল সেই মুহূর্ত্তেই কবির সহিত তাহার দেখা, তাই এ কবিতা এমন অপরূপ সুষমাময়।

সাহিত্যের ইহাই মূল কথা। সাহিত্য কি সে-সম্বন্ধে পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আলোচনার অন্ত নাই, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, কারণ সাধারণতঃ সাহিত্যের সংজ্ঞা লইয়াই কথা কাটাকাটি, তাহার স্বরূপ কি সে প্রশ্নই অনেকে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সকল বিষয়ে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই মানুষ আপনার সুবিধার জন্যই কেবল সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই জন্যই সংজ্ঞা কোথাও তথ্যসংযুক্ত হয় নাই। সাহিত্যের মধ্যে সত্য যাহা তাহা ইঙ্গিতে মাত্র বুঝিতে হইবে, তথ্যনির্দ্দেশে তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করাও ভুল, কারণ তাহাতে ক্ষুদ্র তথ্যটি অনন্ত সত্যের স্থান আধিকার করিয়া বসিবে।

আর্ট বা সাহিত্য সম্বন্ধে সকল আলোচনাই সোক্রাটেস্-(Socrates)-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি হইতে আরম্ভ হয় এবং এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেওয়ার কোন কারণ নাই, কারণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ কথা। প্রাচীন গ্রীক মনীষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বোসাঙ্কেট (Bosanquet) ও ক্রোচে (Croce)

* The garden in the rains, বৃষ্টিস্নাত উদ্যান।

পর্য্যন্ত কেহই সোক্রাটেসের সেই ভীষণ আক্রমণ হইতে সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। সাহিত্য বা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সকলেই যেন নিজকে একটু অপরাধী বোধ করেন।

এক কথায় বলিতে গেলে সোক্রাটেসের কথা দাঁড়ায় এই যে, কোন বিষয়েই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ মানুষের সত্তা সর্ব্বত্রই আপন গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং এই গণ্ডীর ভিতরে যাহা না পড়ে তাহার সম্যক উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে বার্গস (Bergeon) অন্ততঃ পরোক্ষভাবে এই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে উপলব্ধি সমবিস্তৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে চিরন্তন সত্যের আভাষ দেওয়াই যদি সাহিত্যের মর্ম্মকথা হয় তবে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইবে কিরূপে? চিন্তা, যুক্তি বা উপলব্ধির দ্বারা যে তাহা সম্ভব নয় একথা স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ এগুলি গণ্ডীবদ্ধ মানুষের সচেতন সত্তার বিশেষণ মাত্র, মানুষ আপনিই যেখানে আপনার পথে বিঘ্নস্বরূপ সেখানে বিঘ্ননিরোধের উপায় কি? একমাত্র উপায় আপনার স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির বিলোপসাধন, এবং সে বিলোপসাধন সম্ভব একমাত্র কল্পনা দ্বারা। হ্বাসারমান (Wassermann) সত্যই বলিয়াছেন, "Phantasie, das ist ein grosses wort!" * এক কথায় কল্পনাই সাহিত্য এবং সাহিত্যই কল্পনা। এখন প্রশ্ন উঠিবে—তর্কে, যুক্তিতে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যে সত্য ধরা পড়ে না তাহা কি ধরা পড়িবে শুধু কল্পনায়? কথাটি শুনিতে আশ্চর্য্যই লাগে বটে—উত্তরে পাণ্ডিত্যবিজৃম্ভিত নানা কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ উত্তর রামকৃষ্ণ দেবের একটি উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে মনে করি, যে, কৃপার বাতাস ত বহিতেছেই, মানুষের শুধু পাল তুলিয়া দিবার অপেক্ষা। বিশ্বজগৎ যে ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে এক মানুষের প্রাণেই কেবল তাহার সাড়া মেলে না ইহা সম্ভব নয়। সৃষ্টিছাড়া হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই। মানুষ শুধু স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিতে কঠিন হইয়া এই ছন্দের উপর পাথর হইয়া বসিয়া আছে। এই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলোপসাধন কল্পনার দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু তাহার বিস্মৃতিসাধন কল্পনা দ্বারা সম্ভব, এবং এই বিস্মৃতিসাধনেই কল্পনার সার্থকতা। এই বিস্মৃতির মুহূর্ত্তেই মানুষ দ্রষ্টা, কবি হইয়া উঠে, বিশ্ববৈদগ্ধ্য তাহার চিত্তে প্রতিফলিত হয়।

বর্ষায় নবীন ধান্যের শোভা দেখিয়া কবি আপনার স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, প্রকৃতির রূপ কবির চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, তখন কবির স্ফূর্ত্ত বাক্য সাহিত্য না হইয়া পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথের অতি অনাড়ম্বর দুইটি ছত্র—

"নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান"—

চিরদিনই সাহিত্যে স্থান পাইবে। কবির এখানে আত্ম-পরিচয় দিবার কোন চেষ্টা নাই, কারণ তাঁহার আপন ব্যক্তিত্ব তখন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছে। এইরূপ বাক্য সম্বন্ধেই নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament)-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রযুজ্য, যে, ek tou perisseumatou tes kardias to stoma lalei, "হৃদয় যখন পরিপূর্ণ তখনই মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়।"

কিন্তু স্ফূর্ত্ত বাক্য মাত্রেই সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে কি? অবশ্যই নহে, কারণ তাহা হইলে অবশেষে খনার বচনকেও সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে হয়। এই খানেই আসিয়া পড়ে 'ফর্ম' (form) বা রূপের কথা। ক্রোচে ত বলেন আর্টে ও সাহিত্যে 'ফর্ম'ই সব।

'ফর্ম'ই সব বলিলেই যেন মনে হয় 'ফর্ম'এর সহিত কল্পনার একটা প্রকৃতিগত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য আছে। সাহিত্য-বিচারে এই ভ্রান্ত ধারণাই যত অনর্থের মূল। আসলে কিন্তু 'ফর্ম' হইতে কল্পনাকে অথবা কল্পনা হইতে 'ফর্ম'কে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। এ দুইয়ের সম্বন্ধ ঠিক সেই নৈয়ায়িক-প্রোক্ত তৈল ও পাত্রের সম্বন্ধের মত। তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল, এ প্রশ্নের সুমীমাংসা আজও হয় নাই, কখনও যে হইবে সে আশাও নাই। কিন্তু এটুকু বুঝা যায় যে, অন্ততঃ মানুষের নিকট একটি নহিলে অপরটির পূর্ণ পরিচয় সম্ভব হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রে 'ফর্ম'ই পাত্র এবং কল্পনা তৈল।

সত্য শাশ্বত ও অনন্ত। সাহিত্যস্রষ্টা যিনি তিনি কল্পনার সাহায্যে এই অনন্ত সত্যের স্পর্শ লাভ করিতে

* phantasy, that is a great word.

পারেন। কিন্তু তাহা অপরের গোচর করিবে কে? এই খানেই 'ফর্ম'এর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। কবির উপলব্ধ সত্যকে পাঠকের অনুভূতিগোচর করিতে হইলে তাহাকে একটি বিশেষ 'ফর্ম'এ সাজাইতে হইবে। কাজেই আসলে ক্রোচে ও হ্বাসারম্যান-এর মধ্যে মতবৈষম্য কিছুই নাই। হ্বাসারম্যান কবির পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, কল্পনাই সাহিত্যের প্রাণ; ক্রোচে কিন্তু পাঠকের কথা স্মরণ করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে 'ফর্ম'ই সাহিত্য।

কল্পনাযোগে কবির চিত্তে ব্যষ্টিমাত্রের বিশ্বরূপ প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তাহাতে আপন মনের মাধুরী না মিশাইয়া কবি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই আপন মনের মাধুরী মিশানর নামই 'ফর্ম' দেওয়া। এই 'ফর্ম' দেখিয়াই কবির পরিচয় পাওয়া যায়, বস্তু দেখিয়া নহে। তাহা যে শাশ্বত, লোকোত্তর, যে-সত্য কবির চিত্ত আশ্রয় করিয়াছে প্রকাশের পূর্ব্বে কবিচিত্তের সহিত তাহার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবে। সত্যস্ফূর্ত্তির মুহূর্ত্তে কবির স্বাতন্ত্র্যবৃত্তি বিলীন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সত্য প্রকাশের পূর্ব্বে আবার জাগিয়া উঠিবে, ব্যক্তির যে বিশেষত্ব তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠিবে। এইরূপে সীমার মাঝে অসীম আসিয়া ধরা দিবে।

আধুনিক যুগে 'ফর্ম' কি তাহা লইয়া অনন্ত তর্ক চলিয়াছে, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল, কারণ "তার্কিক"গণ সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন, 'ফর্ম' যেন সত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা বস্তু। আসলে কিন্তু সত্যেরই এক একটা বিভিন্ন অবস্থার নাম 'ফর্ম', সাহিত্য-বিচারে এই কথাটি সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। ডষ্টয়েভ্‌স্কি (Dostoievski) ও আনাতোল ফ্রাঁস-(Anatole France)-এর সমালোচনায় এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ডষ্টয়েভ্‌স্কি ও আনাতোল ফ্রাঁস দু'জনেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য ও বৈষম্য এতই বিরাট যে, একজনকে সাহিত্যিক বলিলে অপরকে সে আখ্যা দেওয়াই চলে না। আনাতোল ফ্রাঁস নিজে ডষ্টয়েভ্‌স্কির যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ডষ্টয়েভ্‌স্কি মানবাকারে একটি দানব বিশেষ। সুখের বিষয় আনাতোল ফ্রাঁসকে কখনও ডষ্টয়েভ্‌স্কির হাতে পড়িতে হয় নাই, নহিলে তাঁহার কি দশা হইত তাহা কল্পনা করাও শক্ত। কারণ কি? কারণ, সাধারণতঃ যাহাকে 'ফর্ম' বলা হয়, ডষ্টয়েভ্‌স্কি তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নীট্‌সের (Nietzsche) মত রক্ত দিয়া আপন অনুভূতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আর আনাতোল ফ্রাঁস 'ফর্ম'-এ-ই তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি বিষয়ে উভয়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। ডষ্টয়েভ্‌স্কি এবং আনাতোল ফ্রাঁস উভয়ের কেহই জাগতিক কোন ব্যাপার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ভাল, মন্দ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধেই ডষ্টয়েভ্‌স্কির সমান সহানুভূতি ও ভালবাসা; অতি ঘৃণ্য জীবকেও ডষ্টয়েভ্‌স্কি যে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ডষ্টয়েভ্‌স্কির শ্রেষ্ঠ চরিত্র ষ্টাভ্রোগিন (Stavrogin), সকল ভালমন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের উপরে। ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় এই চরিত্রে এমন ভাবে মিলিয়া আছে যে, কিছুতেই মনে হয় না গ্রন্থকার কখনও এ দুইয়ের ভেদ স্বীকার করিতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বার্গস্‌ঁ প্রোক্ত সমবিস্তৃতি বা সহানুভূতির ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তথাকথিত 'লিটারারি ফর্ম'-(literary form)-এর চিহ্নমাত্র ডষ্টয়েভ্‌স্কিতে নাই, কিন্তু "আপন মনের মাধুরী মিশান" যদি 'ফর্ম' দেওয়া হয় তবে ডষ্টয়েভ্‌স্কিতে যে অপরূপ 'ফর্ম' প্রকাশ পাইয়াছে বিশ্বসাহিত্যে তাহার জোড়া মিলিবে না। রূপদক্ষ আনাতোল ফ্রাঁস সকলের উপর বিচারকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, ডষ্টয়েভ্‌স্কির মত আপনাকে তিনি সাধারণ শ্রেণীতে আনিয়া ফেলিতে পারেন নাই একথাও সত্য। সম্ভবতঃ এ চেষ্টাও তিনি কখনও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্থান ছিল পৃথিবীর জনসাধারণ হইতে এত উচ্চে যে, সেখান হইতে জগতের সকলই তাঁহার সমান বোধ হইত। থাইস-(Thais)-এর নিকট পাফ্‌নুশিয়াস্-(Paphnutius)-এর পরাজয় এবং পন্টিয়ুস পিলাটুস্-(Pontius Pilatus)-এর খৃষ্টকথা-বিস্মৃতি একমাত্র আনাতোল ফ্রাঁসই বোধ হয় কল্পনা করিতে পারিতেন।

অতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে সেইজন্য লরেন্স-(Lawrence)-এর 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার' (Lady

Chatterly's Lover) এবং হেমিংওয়ে (Hemingway)র 'ফিয়েস্তা'-(Fiesta)ও সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবে, কিন্তু হাক্সলি-(Huxley)-র 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' (Point Counter Point) ঠিক সেই অর্থে সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। কারণ, হাক্সলি সমস্ত মানবজাতিকে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সে বিচারে সহানুভূতির কণামাত্র কোথাও দেখা যায় না। লরেন্স ও হেমিংওয়ে তাঁহাদের রচনায় মানুষের এমন একটি দিকের আলোচনা করিয়াছেন, যেজন্য মানুষ সর্ব্বদাই আপনার নিকট সঙ্কুচিত ও লজ্জিত থাকে। কিন্তু এই সঙ্কোচ ও লজ্জা আসলে বিনয় নহে, ঔদ্ধত্য ; সৃষ্টির একটা দিক সভ্য মানুষ যেন জগৎ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। ইহা অবশ্যই বাতুলতা। সৃষ্টির সকল অংশের মত মানুষের এই দিকটারও একটা বিশ্বরূপ আছে। লরেন্স ও হেমিংওয়ের রচনায় সেই বিশ্বরূপ বাস্তবিকই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই তাঁহাদের রচনা প্রকৃত সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

কল্পনা ও 'ফর্ম'-এর ভিতর দিয়া এইরূপে সত্য ও সুন্দরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া থাকে। এই সামঞ্জস্যই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ইহাতে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমরত্ব লাভ করে। এই প্রকার সাহিত্য সম্বন্ধেই সাহিত্য-সম্রাট আনাতোল ফ্রাঁস-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রযুজ্য, সে পথ যদি কুসুমাকীর্ণ হয় তবে কেন মিথ্যা চিন্তা করা কোথায় সে পথ গিয়াছে। সাহিত্যবিষয়ক এত বড় কথা আর কেহ কখনও বলে নাই। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, অন্ততঃ সাহিত্য-জীবনে এইরূপ অনুভূতি প্রকৃতই যাহার একবার ঘটিয়াছে তাঁহার নিকট সকল পথই সমভাবে কুসুমাকীর্ণ বোধ হইবে, পথের কাঁটা বাছিবার কথা তাঁহার মনেও আসিবে না।

বিনিদ্র

—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

বসিয়া বিরলে
শিহরিয়া উঠি ক্ষণে ক্ষণে,
হেরি তারকার আলো
আকাশের সুদূর বিস্তারে,
বেদনায় উঠি কাঁপি।

অনন্তের অন্তরালে
কে আছে বন্দিনী,
যুগ হতে যুগান্তরে
আমারই মিলন-প্রতীক্ষায়
শূন্যের অলিন্দে বসি
জ্বালায় প্রদীপ।

আমারে চিনাবে পথ—
আজি হোক, আজি হতে লক্ষ যুগ পরে
অনিমেষ চোখে তার পড়িবে নিমেষ,
আমার ঘনিষ্ঠ ছায়াপাতে।

দেখিব নিঃসীম নীল করি সন্তরণ,
অতিক্রমি দীর্ঘ ছায়াপথ,
আরও দূরে অনন্তের অসহ্য আঁধারে
স্তিমিত প্রদীপশিখা,
অপলক চাহনি প্রিয়ার।

যুগব্যাপী বিরহের অবসানলোভে
জেগে আছি চিরতরে,
চিরকাল রহিব জাগিয়া।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাযন্ত্র-আবিষ্কারের আদি-কাহিনী

১

এক সময়ে একখানি পুঁথি পড়বার জন্য লোককে হাজার মাইল পথ হাঁটতে হত, একথা আজ আমাদের মনেই হয় না। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় আজ আমরা ঘরে বসে দেশ-দশান্তরের যে কোনও বই অতি অল্প খরচে আনিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র এবং আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে বিদ্যা সংগ্রহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

লরেন্স কষ্টার: মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তারূপে গুটেনবার্গের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এখন কেউ বই লিখলে, শুধু তার একখানি বা দুখানি হাতে লেখা নকল থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একখানি বই-এর হাজার হাজার কপি ছাপা হয়ে যায়। এবং কেউই সামান্য খরচ করে সে বই কিনে পড়তে পারে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে যিনি যে-বই লিখতেন তার পুঁথি তাঁর কাছেই থাকত। তিনি যদি মিসরের লোক হতেন, তাহলে মিসরে তাঁর কাছে গিয়ে সেই পুঁথি পড়ে আসতে হত, কিম্বা যদি তিনি নকল করতে অনুমতি দিতেন, তাহলে নকল করে আনা হত। সেই একখানি পুঁথি হারিয়ে গেলেই, গ্রন্থকারের সমস্ত জ্ঞান-সাধনাও সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেত। এই ভাবে প্রাচীন জগতের কত জ্ঞান-সাধনা যে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন জগতের কত বড় বড় গ্রন্থের নাম আর বিবরণ শুধু আমরা জানি, কিন্তু সেই সব গ্রন্থের প্রকৃত বিষয়বস্তু কি ছিল, তা জানবার কোনও উপায় আজ আমাদের নেই। বড় বড় সংস্কৃত বইতে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, গ্রন্থকার তাঁর বহু পূর্ব্ব-আচার্য্যদের নাম উল্লেখ করছেন, তাঁদের নানা গ্রন্থের কথা উত্থাপন করছেন, কিন্তু সেই সব পুঁথি হারিয়ে যাওয়ার দরুণ আজ তাদের বিষয়বস্তু আমাদের কোনও উপকারেই লাগে না। ছাপাখানায় এখন অনায়াসে হাজার হাজার কপি ছাপা যায় কিন্তু তখন একখানি পুঁথির হয়ত সর্ব্বশুদ্ধ দশখানার বেশী নকলই হত না।

এই জন্যই মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে শিক্ষা গ্রহণ এবং দান খুব সীমাবদ্ধ ছিল। অতি অল্পসংখ্যক লোকই পুঁথির কাছে গিয়ে পৌছতে পারত। আজকাল যতই অর্থ থাক, লেখাপড়া না জানা একটা লজ্জার কথা। কিন্তু পুরাকালের ধনীরা লিখতে বা পড়তে না জানাকে আদৌ লজ্জাকর মনে করতেন না। য়ুরোপের অনেক বড় বড় জমিদার এবং রাজা নিজেদের নাম সই করতে পর্য্যন্ত জানতেন না। তাঁদের হয়ে নাম সই করবার জন্যে তাঁরা মাইনে-করা লোক রাখতেন।

স্বভাবতই অতি মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোকের উপর গ্রন্থ-রচনার ভার গিয়ে পড়ত। সেই জন্য প্রত্যেক দেশের সাহিত্য এবং সাধনা সেই মুষ্টিমেয় লোকদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হত। তাঁদের যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি বা তাঁদের যা প্রবৃত্তি, সেই অনুসারেই তাঁরা লিখতেন এবং অধিকাংশ লোক যেখানে

নিরক্ষর সেখানে লিখিত কথার মাহাত্ম্য আপনা থেকেই প্রাধান্য লাভ করত। এই কারণে মধ্যযুগে পাদ্রীদের হাতে পড়ে য়ুরোপে এত ডাইনী আর ভূত-প্রেত বেড়ে উঠেছিল যে, তাদের উৎপাতে গ্যালিলিওকে বৃদ্ধ বয়সে কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল, ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, জোয়ান অফ আর্ককে চিতায় উঠতে হয়েছিল।

গ্রীস বা রোমের প্রাচীন পুঁথি যা অবশিষ্ট ছিল তার এক একখানি বই সংগ্রহ করা মানে, একটা সম্পত্তি বিক্রী করার সামিল ছিল। ইতালীর মধ্যযুগের ইতিহাসে এই রকম একটি ঘটনা আছে। ফ্লোরেন্সের এক ভদ্রলোকের বাসনা হয় যে, তিনি কিছু জমি-জমা কিনে বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁর অনুরূপ অর্থসঙ্গতি ছিল না। তাঁর কাছে একখানি প্রাচীন বইএর পুঁথি ছিল। একজন বিদেশীকে তিনি সেই পুঁথি বিক্রী করে জমি-জমা কিনলেন। যে-ভদ্রলোকটি সেই পুঁথিখানি কিনলেন, তাঁকেও অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁর জমির কিছু অংশ বিক্রী করতে হল। মুদ্রা-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে বই এমনই দুর্ম্মূল্য ছিল। পাছে হারিয়ে যায় বা কেউ নিয়ে যায়, এইজন্য বড়লোকের বাড়ীতে বা গির্জ্জায় বই লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হত।

মুদ্রাযন্ত্র এসে জগতে জ্ঞান-বিতরণের এক নব-যুগ এনে দিল। আধুনিক জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তা এই মুদ্রা-যন্ত্রেরই সৃষ্টি। কাগজ, ছাপাবার যন্ত্র আর প্রত্যেক অক্ষরের জন্য ধাতুনির্ম্মিত স্বতন্ত্র টাইপ--এই তিনটি জিনিষকে ভিত্তি করে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত আয়োজন গড়ে উঠেছে। বৃটিশ মিউজিয়মের জগৎ-খ্যাত রিডিং-রুমে প্রত্যেক পাঠকের দৃষ্টি-গোচর করবার জন্য এই অমূল্য কথাগুলি লেখা আছে,—

"Take care of the thing you hold in your hand : it is more precious than gold. Civilization must fall to bits if paper goes.

It is the bridge between barbarism and learning, between anarchy and government, tyranny and liberty. Without it we should lose the inspiration that stirs the hearts of men and leads them to do great things."

মুদ্রাযন্ত্র এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই সকলের স্মরণে রাখা উচিত—বর্ব্বরতা আর সভ্যতার মধ্যে এরাই হল সেতু।

২

মুদ্রাযন্ত্র কে বা কারা জগতে প্রথম আবিষ্কার করে পণ্ডিত-মহলে এই নিয়ে নানা বিচার-বিতর্ক আছে। তবে তাঁদের সমস্ত বিচার-বিতর্কের মধ্য হতে পাঁচটি সিদ্ধান্ত আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি—

(ক) চীনারা প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তবে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র এবং চীনাদের ব্যবহৃত মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। তাঁরা কাঠ-খোদাই করে ব্লক তৈরী করতেন —সেই ব্লক থেকে কালির সাহায্যে যন্ত্রের চাপে তাঁরা কাগজ ছাপতেন।

(খ) আগে লোকের ধারণা ছিল যে, যে-পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমান কালে ছাপা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরের জন্য স্বতন্ত্র টাইপ ব্যবহার করা—যে-সব টাইপ ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদা ভাবে নাড়া-চাড়া করা যায়—তা য়ুরোপের সৃষ্টি। কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে,

গুটেনবার্গ : য়ুরোপে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা।

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনদেশে এই ধরণের স্বতন্ত্র টাইপ ব্যবহার করে ছাপানোর রীতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত টাইপ প্রথম প্রথম মাটীর তৈরী হত। তারপর তাঁরা

মাটীর বদলে কাঠ ব্যবহার করতেন এবং তারপরে কাঠের পরিবর্ত্তে তাঁরা টিনের টাইপও ব্যবহার করতেন।

(গ) মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন চীনারাই মুদ্রণ ব্যাপারের অপরিহার্য্য অঙ্গ কাগজও প্রথম তৈরী করেন। যিশু-খৃষ্টের মৃত্যুর পর ৮০০ বছর পর্য্যন্ত য়ুরোপে এক টুকরো কাগজ ছিল না। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দের আরবী

জন ফাউষ্ট: গুটেনবার্গকে তিনি অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

শাসনকর্ত্তা চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে একদল চীনা কাগজ-প্রস্তুত-কারককে বন্দী করে আনেন। সেই বন্দী চীনাদের নিকট হতে আরবীরা কাগজ তৈরী করার প্রণালী শেখেন। আরবীদের নিকট য়ুরোপ আবার এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

(ঘ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীর মাইনটস্ সহরে গুটেনবার্গ সর্ব্বপ্রথমপ্রত্যেক অক্ষরের জন্য বিভিন্ন টাইপ ব্যবহার করে বর্ত্তমান মুদ্রা-যন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

(ঙ) কেউ কেউ বলেন যে, হলাণ্ডের লরেন্স কষ্টার হলেন বর্ত্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারের আদি-জনক। তাঁরই পদ্ধতি জার্ম্মান গুটেনবার্গ সফল করে তোলেন। কোলোন ক্রণিকেল (Cologne Chronicle) বলে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে লেখা একখানি বই আছে। এই বইখানিই হল এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে এই ক্রনিকেলে লেখা আছে—

"Although this art was invented at Mainz, as far as regards the manner in which it is now commonly used, yet the first prefiguration was invented in Holland."

এবং ক্রনিকেলের এই উক্তির প্রমাণে হলাণ্ডবাসীরা তাঁদের দেশের লরেন্স কষ্টারকেই বর্ত্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারের আদি-জনক বলে ঘোষণা করে থাকেন।

মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিকগণ মুদ্রা-যন্ত্রের আদি-আবিষ্কারের কাহিনী সম্বন্ধে যে-সব বিচার-বিতর্কের উত্থাপন করেন, তা থেকে আমরা উপরের এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

৩

চীনদেশে যিনি সর্ব্বপ্রথম কাঠ-খোদাই করে মুদ্রণরীতি আবিষ্কার করেন, তাঁর নাম ফেঙ্ টাও। ফেঙ্ টাও চীনের একজন রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। কিন্তু চীনা ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ফেঙ টাও জন্মগ্রহণ করবার প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে চীনে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয়।

জগৎ-বিখ্যাত আবিষ্কারক এবং ঐতিহাসিক স্যর অরেল ষ্টাইন্ মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির তলদেশে বিলুপ্ত সভ্যতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে মাটীর তলা থেকে কতকগুলি মুদ্রিত চীনা-কাগজ পেয়েছেন। তার মধ্যে চারটি কাগজে তারিখ দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটির তারিখ সব চেয়ে প্রাচীন, সেটি হচ্ছে ৮৬৮ খৃষ্টাব্দের। যোল ফিট লম্বা একটা কাগজ—তাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র ছাপান। সেই কাগজটিতে একটি ছবিও মুদ্রিত আছে। ছবির নিখুঁত মুদ্রণ দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে অন্ততঃ আরও এক শতাব্দী কাল যে লেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে এক জায়গায় এক বিবরণ আছে যে, ৭৭০ খৃষ্টাব্দে চীন থেকে দশলক্ষ মুদ্রিত মন্ত্র জাপানে আসে। এই সব মন্ত্র ছোট ছোট কাগজে মুদ্রিত হত। এবং ঐ সময়কার এই ধরণের মন্ত্র-লেখা মুদ্রিত একখানি কাগজ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত সেইটিই হল প্রথম মুদ্রিত কাগজ।

৪

হারলেম্ বলে হলাণ্ডে খুব প্রাচীন একটি শহর আছে। দেখলেই মনে হয় খুব প্রাচীন শহর, সেই জন্য ইংরেজীতেও এই শহর সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয়, sleepy old town of Haarlem.

এই সুপ্রাচীন শহরে প্রায় ছ'শো বছর আগে লরেন্স কষ্টার নামে এক বৃদ্ধ বাস করতেন। যৌবনে তাঁর নিজের একটি সরাইখানা ছিল, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি গ্রামের গির্জ্জার তদারক করে জীবিকা অর্জ্জন করতেন। গির্জ্জার গ্রন্থাগারে যে-সব পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত ছিল, তাই পড়ে তিনি অবসর বিনোদন করতেন।

তাঁর তিনটি ছোট ছোট নাতনী ছিল, তাদের সেই সব পুঁথির গল্প বলতেন। সেই ছেলে তিনটিকে লেখাপড়া শেখাবার তাঁর বড়ই বাসনা হয়, কিন্তু বই কোথায় পাবেন? রাস্তায় বেড়াবার সময় দোকানে যে-সব সাইন-বোর্ড লেখা থাকত তাই থেকে তিনি তাদের অক্ষর পরিচয় করাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে কবরের স্মৃতি-ফলকে যে-সব লেখা থাকত, তাই দেখিয়ে তিনি তাদের অক্ষর পরিচয় করাতেন। বাড়ীতে পোড়া কাঠ দিয়ে সেই সব লিখে আবার তাদের দেখাতেন।

একদিন বাগান বসে, খেলার ছলে তিনি গাছের ছাল কেটে কেটে একটা অক্ষর তৈরী করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে, এই ভাবে গাছের ছাল কেটে তিনি সব অক্ষরগুলিই তো তৈরী করতে পারেন।

নাতনীদের কিছু না বলে গোপনে তিনি গাছের ছাল কেটে সমস্ত অক্ষর তৈরী করে পার্চ্চমেণ্ট কাগজে মুড়ে বাড়ী নিয়ে এলেন। বাড়ী এসে কাগজ খুলতেই দেখেন, পার্চ্চমেণ্টের গায়ে কাঁচা গাছের ছালের রসে এক একটা অক্ষরের স্পষ্ট ছাপ বসে গিয়েছে, তবে অক্ষরগুলোর উল্টো ছাপ পড়েছে।

তখন কষ্টারের মনে হল যে, গাছের ছালে যদি অক্ষর তৈরী করবার সময় তিনি উল্টো করে লেখেন, তা হলে তাঁর ছাপ যখন পড়বে তখন অক্ষরগুলো নিশ্চয়ই সব সোজা দেখাবে। পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সত্যই তাই।

তখন তিনি মতলব করে কাঠের উপরে এক একটা অক্ষর উঁচু করে খোদাই করতে লাগলেন এবং তার ছাপ নিয়ে দেখলেন, বেশ স্পষ্ট সব অক্ষর ফুটে উঠেছে।

খেলতে খেলতে এই ভাবে হঠাৎ একদিন লরেন্স কষ্টার টাইপ তৈরী করবার পথ খুঁজে পেলেন। সেই দিন থেকেই প্রত্যেক অক্ষরের জন্য স্বতন্ত্র টাইপ তৈরী করে হাতে-লেখার বদলে ছাপার অক্ষরে বই নকল করার পথও মানুষ খুঁজে পেল।

৫

সেই সময় জার্ম্মানীতে গুটেনবার্গ বলে একজন লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁকে বর্ত্তমান মুদ্রা-যন্ত্র এবং মুদ্রণ-পদ্ধতির আদি-জনক বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সঙ্গে লরেন্স কষ্টারের দেখা হয়েছিল এবং লরেন্স কষ্টারের নিকটই

আলডুস্ মানুশিয়াস্ : প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যকে যিনি বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি টাইপ তৈরী করে ছাপাবার পদ্ধতি শেখেন; কেউ কেউ বলেন যে, তিনি আপনা থেকেই এই মুদ্রণ-বিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গের উদ্ভাবনা করেন। তবে এ-কথা ঠিক যে, য়ুরোপে তিনিই প্রথম ধাতুনির্ম্মিত টাইপ ব্যবহার করে বই মুদ্রিত করেন।

১৯০০ সালে সমগ্র জার্ম্মানী তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। পাঁচশো বছর

আগে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর মাইনট্‌স্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর মায়ের নাম অনুসারে তাঁর নাম গুটেনবুর্গ হয়। যৌবনে তিনি আয়না তৈরী করার ব্যবসায় করতেন, তাতে তাঁর বেশ দুপয়সা আসতে থাকে। সেই সময় আয়্-লা-শাপেল্ শহরে বিরাট এক মেলা হয়। সেই মেলায় বিক্রী করবার জন্যে তিনি আগে থাকতে অনেক আয়না তৈরী করেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে মেলায় যাওয়া তাঁর ঘটে ওঠেনি এবং তার ফলে সমস্ত আয়না ঘরে জমা হয়ে থাকে। এ ব্যবসা তাঁকে অতি অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করে দিতে হয়।

তাঁর এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর আমাদের জানা নেই। তিনি মাঝে মাঝে টাকা ধার করতেন এবং গোপনে কি সব বিষয়ে পরীক্ষা করতেন। এই সময়েই তিনি টাইপের সাহায্যে মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদন করবার অভিনব পন্থা সম্বন্ধে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করতে থাকেন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে তিনি তাঁহার জন্ম-নগরে ফিরে গেলেন। স্থির করলেন যে, সেইখান থেকেই তিনি এই অভিনব ব্যবসায় আরম্ভ করবেন।

কিন্তু ছাপার কল, টাইপ ইত্যাদি তৈরী করবার মতন অর্থ-সঙ্গতি তাঁর ছিল না। জন ফাউষ্ট বলে একজন সুচতুর স্বর্ণকারের কাছে তিনি টাকা ধার পেলেন, এই সর্ত্তে যে, টাকা শোধ দিতে না পারলে, ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত জিনিষ-পত্র জন ফাউষ্টের হয়ে যাবে এবং ব্যবসায়ের লাভের অর্দ্ধেক অংশ তিনি পাবেন।

গুটেনবুর্গ নিজে ধাতুর কাজ ভাল রকম জানতেন না। অনুসন্ধানের পর তিনি পিটার স্কফার বলে একজন কারিকরকে পেলেন। ধাতুর কাজে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। স্কফারের সাহায্যে তিনি ছাঁচ তৈরী করে ধাতু-নির্ম্মিত টাইপ তৈরী করালেন।

টাইপ এবং ছাপার কল তৈরী করে গুটেনবুর্গ স্থির করলেন যে, তিনি বাইবেল ছাপবেন। ল্যাটিন ভাষায় সেই বাইবেল হল য়ুরোপের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। বিশেষজ্ঞরা সেই বইএর ছাপা সম্বন্ধে বলেন যে. "That first book printed in Europe remains to this day one of the best printed books in the world."

এই বাইবেলের মাত্র ৩৬খানি এখন সমগ্র জগতে বর্ত্তমান আছে। যাঁরা পুরাতন বই সংগ্রহ করেন তাঁদের কাছে গুটেনবুর্গের ছাপা এই বাইবেল এক মহা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গুটেনবুর্গের একখানি বাইবেল ৩৯০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হয়।

এইভাবে য়ুরোপে প্রথম ছাপাখানা দেখা দিল। কিন্তু নানা প্রাথমিক খরচের জন্যে প্রথম প্রথম এই ছাপাখানা থেকে বিশেষ কোনও লাভ হত না। অথচ তখন নিত্য টাকার দরকার। ধূর্ত্ত ফাউষ্ট এই সময় মতলব করলেন যে, বারবার তাঁকেই যখন টাকা দিতে হচ্ছে, তখন তিনি কেন অর্দ্ধেক অংশীদার হয়ে থাকেন! ইচ্ছে করলে তো সমস্ত ছাপাখানাটাই তিনি দখল করে নিতে পারেন।

ফাউষ্ট জানতেন যে, তিনি যে টাকা ধার দিয়েছেন, তা ফিরে চাইলে, গুটেনবুর্গ এখন দিতে পারবেন না। কাল-বিলম্ব না করে ফাউষ্ট গুটেনবুর্গের কাছে তাঁর সমস্ত টাকা ফেরত চাইলেন। গুটেনবুর্গ টাকা পাবেন কোথায়?

ফাউষ্ট আদালতে নালিশ করে, ঋণের সর্ত্ত অনুযায়ী গুটেনবুর্গের সমস্ত ছাপাখানা দখল করে নিলেন।

জীবনের শেষ লগ্নে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করে, গুটেনবুর্গ যখন জগতে অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবার জন্য তৈরী হলেন, ঠিক সেই সময়ই ভাগ্যের বিড়ম্বনায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে তাঁকে পথে দাঁড়াতে হল।

ডাঃ হোমারী বলে একজন লোক নতুন প্রেস করবার জন্য তাঁকে কিছু টাকা ধার দেন। কিন্তু সেই অল্প টাকায় তিনি আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। প্রতিদিন তাঁর অবস্থা শোচনীয়তর হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে মাইনট্‌স্-এর ধনী আর্কবিশপ তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পেন্‌সন্ স্বরূপ দিতেন। তাতেই কোন রকমে তাঁর দিন চলে যেত। সংসারের বোঝা তাঁর বেশী ছিল না, কারণ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর মৃত্যু-শয্যায় কেউ-ই উপস্থিত ছিল না। একান্ত বন্ধুহীন অবস্থায় নীরবে নিতান্ত অপরিচিতের মত তাঁকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

এই ঘটনার প্রায় চারশো বছর পরে মাইনট্‌স্ শহরে

সমগ্র জার্ম্মান জাতি সমবেত হয়ে তাঁর বিরাট এক প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু তখন গুটেনবুর্গের নাম জার্ম্মানীর মাইনট্‌স্ শহরের সীমানা ত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

৬

নিতান্ত অবজ্ঞাত এবং অপরিচিত অবস্থায় গুটেনবুর্গকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হল বটে, কিন্তু তিনি যে-যন্ত্র সেদিন তাঁহার জন্ম-নগরীতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, দেখতে দেখতে জার্ম্মানীর প্রত্যেক প্রধান নগরে, জার্ম্মানীর সীমানা ছাড়িয়ে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশে দেশে, তা ছড়িয়ে পড়ল। এত দিনের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন এক নিমেষে সূর্য্য জেগে উঠল। চারিদিকের অন্ধকার দূর হয়ে যেতে লাগল। সাধারণ মানুষের ঘরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এসে পৌঁছল।

ক্যাক্‌স্টন্: চতুর্থ উইলিয়ামকে তাঁহার ছাপাখানা দেখাইতেছেন।

য়ুরোপের কোন্ দেশে কোন্ সময় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, নীচের তালিকায় তা দেওয়া হল,—

জার্ম্মানী	...	১৪৫৪ খৃষ্টাব্দ
ইতালী	...	১৪৬৫ "
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	...	১৪৬৮ "
ফ্রান্স	...	১৪৭০ "
হলাণ্ড	...	১৪৭৩ "
বেলজিয়াম ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	...	১৪৭৩ "
স্পেন	...	১৪৭৪ "
ইংলণ্ড	...	১৪৭৭ "
ডেনমার্ক	...	১৪৮২ "
সুইডেন	...	১৪৮৩ "
পর্ত্তুগাল	...	১৪৮৭ "

মেক্‌সিকো-বাসী একজন স্পানিয়ার্ডের চেষ্টায় আমেরিকায় প্রথম ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকায় ইংরেজি ভাষায় প্রথম বই ছাপান হয় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ড কলেজ থেকে। এই হার্ভার্ড কলেজই এখনকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

মুদ্রাযন্ত্রের গোড়ার দিকে যে কয়েকজন লোক এই অভিনব অবিষ্কারকে মানবের জ্ঞান-বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করেন তাঁদের মধ্যে ইতালীর জেন্‌সন্ এবং ইংলণ্ডের ক্যাক্‌স্টনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়ে এক দেশ আর এক দেশকে জানছে, ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়েই অতীত এবং বর্ত্তমানের যোগসূত্র বজায় রয়েছে। জেন্‌সন্ ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্ শহরে ছাপাখানা করেন। ছাপাখানা তৈরী করবার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রক্ষা করা। সেদিন জেন্‌সন্ যদি তৎপর না হতেন, তাহলে গ্রীস ও রোমের বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ, যা আমরা আজ অতি সামান্য খরচে ঘরে বসে পড়তে পাই, তাদের দেখাও পেতাম না। অন্য বহু বিলুপ্ত পুঁথির মত তারাও হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেত। অতীত কালের সাধনাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই জেন্‌সন্ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁথির লেখার আর একটা বিপদ আছে। প্রত্যেক বার নকল করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি-লেখকের ইচ্ছা-অনুযায়ী অনেক সময় মূল লেখার অদল-বদল হয়ে যায়। মূল

বইতে যে-সব কথা থাকে না, এমন সব কথা বা কাহিনী ধীরে ধীরে পুঁথিতে ঢুকে যায়। এই ভাবে শত শত বছর চলে আসার পর আসল পুঁথি বহুভাবে বিকৃত হয়ে পড়ে। জেন্‌সন্ স্থির করলেন যে, যে-সব পুঁথি এখনও পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে পাঠোদ্ধার করা প্রয়োজন। আজকাল প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের যে-সব সুপ্রাচীন গ্রন্থ আমরা পড়ি, তার অধিকাংশ পাঠই জেন্‌সনের নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্যে তিনি কাউণ্ট পালাটিন উপাধি পান। পুস্তক-প্রকাশকের পক্ষে রাজ-সম্মান জগতে সেই প্রথম।

জেন্‌সন্ যে-কাজের সূত্রপাত করে দিয়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আলডুস্ মান্থুটিয়াস্ তাকে আরও ব্যাপকভাবে সার্থক করে তুললেন। তিনি সেই সময়কার একজন বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের সাধনাকে সংরক্ষণ করবার জন্যে জেন্‌সনের মত তিনিও জীবন-পণ করেন। আজকাল ইংরেজী বইতে আঁকাবাঁকা যে-ধরণের অক্ষর আমরা দেখতে পাই, যাকে ইংরেজীতে 'ইটালিক্' টাইপ বলে, তা আলডুসেরই সৃষ্টি।

ইংলণ্ডে উইলিয়াম ক্যাক্‌স্‌টন্ প্রথম মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কেণ্ট প্রদেশে জন্ম-গ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য তিনি বেলজিয়ামের ব্রুজেস্ শহরে গিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এবং সেই শহরে তিনি ত্রিশ বছর ধরে বাস করেন। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্যবসায়ে তিনি এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ড তাঁকে ঐ অঞ্চলের বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের রাজদূত পদবী দান করেন।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে কোলার্ড ম্যান্‌সিয়ন্ বলে একজন লোক ব্রুজেস্ শহরে একটা ছাপাখানা খোলেন। ক্যাক্‌স্‌টন কাজ-কর্ম্মের অবসরে প্রায়ই কোলার্ডের ছাপাখানায় বেড়াতে যেতেন। এটা-ওটা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতেন। এই ভাবে প্রথম প্রথম সময় কাটাবার জন্যেই তিনি ম্যান্‌সিয়নের ছাপাখানায় যাতায়াত করতেন। কিন্তু এইভাবে যাতায়াত করতে করতে ছাপাখানার কাজ নিঃশব্দে তিনি বুঝে নিলেন।

অবসর সময়ে তিনি মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চ্চা করতেন। এইভাবে তিনি ফরাসী ভাষা থেকে ট্রয়ের ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদখানিকে ছাপাবার তাঁর বাসনা হয় এবং কোলার্ডের প্রেস থেকেই তিনি বইখানি ছাপান। ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত সেই হল প্রথম বই। তারপরে The game and playe of chesse বলে সতরঞ্চ খেলার আর একখানি বই ফরাসীভাষা থেকে অনুবাদ করেন। সেখানিও কোলার্ডের প্রেসে ছাপা হয়।

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্‌স্‌টন ব্রুজেস্ ত্যাগ করে লণ্ডনে ফিরে এলেন। স্থির করলেন, লণ্ডনে তিনি নিজেই ছাপাখানা খুলবেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি "The Dictes and Sayings of the Philosophers" বলে একখানি বই মুদ্রিত করলেন। ইংরেজী ভাষায় ইংলণ্ডে মুদ্রিত সেই হল প্রথম বই।

অবশ্য ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের আগে অর্থাৎ ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে (যে বছরে প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়) ক্যাক্‌স্‌টনের ছাপাখানা থেকে সামান্য সামান্য ছাপার কাজ হয়েছিল।

জেন্‌সন এবং মান্থুটিয়াস্ গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য সম্বন্ধে যা করেছিলেন, ক্যাক্‌স্‌টন ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে ঠিক তাই করতে লাগলেন। যে-সাহিত্য এবং ভাষা এত দিন বিদেশী নরম্যানদের প্রভাবে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল, সেই ভাষা এবং সাহিত্যকে তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার ভার নিলেন। পুঁথির দাম এত বেশী ছিল যে, জনসাধারণ পুঁথির কাছে পৌঁছতে পারত না। যে বছরে জার্ম্মানীতে গুটেনবুর্গ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেই বছরে ইংরেজী ভাষার প্রথম মহাকবি চসার দেহত্যাগ করেন। তখন ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকেরা ফরাসী ভাষায় লেখাপড়ার কাজ করতেন, কারণ রাজ-দরবারে তখন ফরাসীদেরই প্রাধান্য ছিল। দেশের লোকের মুখের ভাষা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে ছিল। চসার এসে ইংরেজী ভাষার সেই হীন অবস্থা দূর করবার জন্যে দেশের ভাষাতেই দেশের জন-সাধারণের জন্যে কাব্য লিখলেন। কিন্তু তখন ছাপাখানা ছিল না। চসার এবং তাঁর সময়কার ইংরেজী সাহিত্যিকদের লেখা পুঁথিতে প্রচলিত ছিল। ক্যাক্‌স্‌টন এসে চসারের সাধনাকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই খানেই ক্যাক্‌সটনের মহত্ব। তাঁর প্রেস থেকে তিনি চসারের "Canterbury Tales," ম্যালোরীর "Le morte de Arthur" ছাপালেন।

ইংরাজী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্যে তিনি বিদেশের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সব গ্রন্থ অনুবাদ করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের তিনি প্রথম অনুবাদক এবং জগতের অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। মুদ্রণ ব্যাপারের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক D. B. Updike ক্যাক্‌স্‌টন সম্বন্ধে বলেছেন,

"His services to literature in general and particularly to English literature, as a translator and publisher, would have made him a commanding figure if he had never printed a single page."

জগতের এই সব প্রথম মুদ্রাকর এবং পুস্তক-প্রকাশকদের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহিত্যের উন্নতির এবং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁদের কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগ। জেন্‌সন্‌, মাহুটিয়াস্‌, ক্যাক্‌স্‌টন প্রভৃতির দ্বারাই গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইংরেজী সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাপাখানাকে যখন মানুষ শুধু দু'পয়সা রোজগার করবার জন্য অপব্যবহার করে, তখন এই সব আদি পুস্তক-প্রকাশকদের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশে যাঁরা ছাপাখানার মালিক তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাপাখানার এই বিরাট দায়িত্ব এবং সৃজনী শক্তির কথা জানেন না, অথবা জানলেও পয়সার মোহে তাঁরা মানব-সভ্যতার এই মহা কল্যাণকর সৃষ্টিকে শুধু পয়সা রোজগারের কল-স্বরূপই ব্যবহার করেন।

ক্যাক্‌স্‌টন জীবদ্দশায় বিপুল সম্মান লাভ করেন। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড তাঁর প্রেসে এসে তাঁর ছাপার কাজ দেখতেন। চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ডের পর তৃতীয় রিচার্ডও তাঁকে প্রভূত সম্মান দেখিয়েছিলেন।

কোন্‌ সালে তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তার সঠিক খবর জানা যায় না। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের সেণ্ট মারগারেট গির্জ্জার পুরাতন দফ্‌তরে শুধু এক জায়গায় খরচ লেখার পাতায় লেখা আছে যে, উইলিয়াম ক্যাক্‌স্‌টনের মৃত দেহ সমাধির উপলক্ষ্যে মশাল কেনার দরুণ ৬ শিলিং ৮ পেন্স, ঘণ্টার দরুণ ৬ পেন্স।

তারপর মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হতে লাগল, প্রেসের গঠনও সেই সঙ্গে বদলাতে লাগল। আজকাল যে সব প্রেস থেকে ঘণ্টায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে, তার গঠন এবং বিচিত্র উদ্ভাবনী কৌশল বর্ত্তমান জগতের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। সে কাহিনী স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

বাঙ্গালার কথা

—নিখিলনাথ রায়

বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্ত

মুনিম খাঁর পর খাঁ জাহানের হস্তে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি দায়ুদ খাঁর পতন হইলে, বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। তখন হইতে বাঙ্গালায় মোগল শাসনের আরম্ভ। খাঁ জাহানই বাঙ্গালার প্রথম মোগল শাসনকর্ত্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হন। খাঁ জাহানের পর মুজঃফর খাঁ এবং তাহার পর রাজা তোড়ড়মল্ল সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনেকদিন থাকিয়া রাজা তোড়ড়মল্লের বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি শেরশাহের নিকটও কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। শেরশাহ বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্তের যে চেষ্টা করেন, তোড়ড়মল্ল সে সকল অবগত ছিলেন। সেই জন্য আকবর বাদশাহ তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন।

তোড়ড়মল্ল বাঙ্গালার ভূমির বিবরণ ও পরিমাণ জানিয়া লইয়া তাহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি গ্রাম বা মৌজা লইয়া পরগণা ও কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হইয়াছিল। এইরূপে সমস্ত বঙ্গরাজ্য ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত হয়। বঙ্গরাজ্যের ভূমিকে খালসা ও জায়গীর নামে অভিহিত করা হইত। যাহার আয় রাজকোষে আসিত, তাহাকে খালসা ও যাহার আয়ে রাজকর্ম্মচারীগণের ব্যয়

নির্ব্বাহ হইত, তাহাকে জায়গীর বলিত। তোড়ড়মল্ল খালসা ভূমির ৬৩,৪৪,২৬০৲ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩,৪৮, ৮৯২৲ টাকা, মোট ১,০৬,৯৩,১৫২৲ টাকা জমা স্থির করেন। তিনি এই জমা বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাকে 'আসল জমা তুমার' বলে। এইরূপে রাজা তোড়ড়মল্ল শেরশাহের অসম্পূর্ণ বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মোগল-পাঠান

বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইলেও, এখান হইতে পাঠানদিগের ক্ষমতা একেবারে লোপ পায় নাই। দাযুদ খাঁর পতন হইলে অন্যান্য পাঠান সর্দ্দারেরা সহজে মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। উড়িষ্যায় ও উত্তর বঙ্গের ঘোড়াঘাট প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পাঠানেরা ক্রমাগত মোগলদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল। এই সময়ে মাসুম খাঁ কাবুলী প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী মোগল কর্ম্মচারীও পাঠানদিগের সহিত যোগদান করে। মোগল সুবেদার আজিম খাঁর শাসনসময়ে দাযুদের প্রধান অনুচর কতুল খাঁ উড়িষ্যায় প্রবল হইয়া উঠিলে, আজিম খাঁ তাঁহাকে দমনের চেষ্টা করেন। সেই সময়ে ঘোড়াঘাটের পাঠানদিগকেও দমন করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু পাঠানেরা কিছুতেই মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। তাহার পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসিলে, পাঠানদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মানসিংহ কতুল খাঁকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে কতুল খাঁর মৃত্যু হইলে পাঠানেরা বাধ্য হইয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয়।

কিছুকাল পরে আবার পাঠানেরা বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করে। মানসিংহ তাহাদিগকে দমন করিতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এবং তাহাদিগকে পরাজিতও করেন। ইহার পর মানসিংহ বাদশাহের আদেশে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিলে পাঠানেরা ওসমান খাঁকে সর্দ্দার মনোনীত করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। বাদশাহ আবার মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। মুর্শিদাবাদ জেলার শেরপুর আতাই নামক স্থানে ওসমানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ওসমান পরাজিত হন। তাহার পর পাঠানেরা উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওসমানের দল কিছুকাল শান্তভাবে ছিল। কিন্তু অন্যান্য পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকে।

ইস্‌লাম খাঁর শাসন সময়ে ওসমান আবার পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মোগল সেনাপতিদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই যুদ্ধে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং বাঙ্গালায় পাঠান বিদ্রোহেরও অবসান হয়। অন্যান্য পাঠানরাও ক্রমে ক্রমে পরাজিত হইয়াছিল। এই মোগল-পাঠানের যুদ্ধ লইয়া 'মোগল-পাঠান' নামে একটি খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। 'মোগল-পাঠানে'র চিহ্ন লুপ্ত হইলে সেই খেলার পট হইতেই তাঁহাদের কথা জানা যাইত। তাই কবি বলিয়াছেন—

> "কিছুদিন পরে আর, বিধির বিধান,
> ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল-পাঠান।"

কবি-কঙ্কণ

বাঙ্গালায় মোগল-পাঠানে অবিরত যুদ্ধ হইতে থাকিলেও এবং তাহাদের রক্তে বঙ্গভূমি রঞ্জিত হইয়া উঠিলেও, বঙ্গলক্ষ্মী যেমন শস্যসম্ভারে ও ফলফুলে বাঙ্গালার অধিবাসীগণকে পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, বঙ্গ-সরস্বতীও তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এই মোগল-পাঠানের বিবাদ সময়েও বঙ্গ-কবির বীণা বাজিয়া উঠিত এবং তাহার ঝঙ্কার বাঙ্গালার পল্লীর আকাশে-বাতাসে খেলিয়া বেড়াইত। এই সময়ে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কবি কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া সকলকে আনন্দের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। মোগল-পাঠানের বিবাদের ফল অবশ্য বাঙ্গালার পল্লীতেও গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেখানে নিরীহ প্রজাগণও কতক কতক উৎপীড়িত হইয়াছিল। সেই উৎপীড়নে মুকুন্দরাম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিজগ্রাম দামুন্যা ছাড়িয়া মেদিনীপুরে আরড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ রাজা বাঁকুড়া রায় ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া চণ্ডীকাব্যের রচনা শেষ করেন। কবির ভণিতা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি।

> "ধন্য রাজা রঘুনাথ। কুলে শীলে অবদাত
> প্রকাশিল নূতন মঙ্গল,
> তাঁহার আদেশে পান শ্রীকবি কঙ্কণ গান
> সমভাষা করিত কুশল।"

কবিকঙ্কণ নিজের বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন,—

"মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।"

কবির নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। কবিকঙ্কণ তাঁহার উপাধি। যে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেই সময়ে কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে মানসিংহের কথা এইরূপ লিখিত আছে,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পাদাম্ভোজ ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।"

কবিকঙ্কণের প্রণীত কালকেতু, ধনপতি ও শ্রীখণ্ডের উপাখ্যান অত্যন্ত সুন্দর ও সুমধুর। এই চণ্ডীকাব্য গায়কেরা গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইত। চণ্ডীকাব্য ভিন্ন কবিকঙ্কণ আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরাম

কবিকঙ্কণের চণ্ডীগানের ঝঙ্কার যে সময়ে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে উঠিতেছিল, তাহার প্রায় শত বৎসর পরে আবার—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

একথাও পল্লীবাসীগণ পাঠ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিল। চণ্ডীগানের পরই কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীর প্রাণে আনন্দরসের ধারা ঢালিয়া দেয়। তাহারা মোগল-পাঠানের বিবাদে একেবারে নিরানন্দ হইয়া পড়ে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর সহিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীগান ও কাশীরামের মহাভারত পাইয়া পল্লীবাসীগণ আপনাদের পর্ণকুটীরে বসিয়া তাহাদেরই রস আস্বাদন করিত। তাই আমরা দেখিয়াছি যুদ্ধের রক্তপাতে বাঙ্গালার শান্তি কখনও বিনষ্ট হয় নাই।

কাশীরাম দাস বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গীগ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এইরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥"

ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়াই কাশীরাম তাঁহার মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। সে কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"ব্যাসের বচনে ইথে নাহিক অন্যথা।
সকল গ্রন্থের সার ভারতের কথা॥
শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥"

কাশীরামের মহাভারত প্রচারিত হইলে অন্যান্য মহাভারতের আদর কমিয়া যায়। লোকে কাশীরামের মহাভারতই আদর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। আজিও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। রাজা মহারাজের অট্টালিকা হইতে মুদীর দোকানে পর্য্যন্ত এই রামায়ণ ও মহাভারত সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে বাঙ্গালার জাতীয় সম্পদ বলা যাইতে পারে। আশা করি তোমরাও এই জাতীয় সম্পদের অধিকারী হইবে।

বার ভুঁইয়া

কবিতার ঝঙ্কার হইতে আমাদিগকে আবার রণকোলাহলের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। মোগলেরা যে কেবল পাঠানদিগকেই দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বাঙ্গালার পরাক্রান্ত হিন্দু মুসলমানদেরও সহিত তাঁহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশ সহজে মোগলদিগকে আধিপত্য স্থাপন করিতে দেয় নাই। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশ কতকগুলি ক্ষমতাশালী ভুঁইয়া রাজার অধীন ছিল। তাঁহারা বার ভুঁইয়া নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন। মুসলমানেরা সকলেই পাঠান বা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বে অবশ্য এই বার ভুঁইয়ার সকলেই হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় আসাম আরাকান প্রভৃতি স্থানেও বার ভুঁইয়ারা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পাল বংশের রাজত্বকাল হইতে বাঙ্গালার বার ভুঁইয়ার কথা জানা গিয়া থাকে। ইঁহারা পালরাজগণের অধীন রাজা বলিয়াই গণ্য হইতেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাল-রাজগণের সভাবর্ণনায় বার ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

"যায় ভুঞা বসে আছে বুকে নিয়ে ঢাল।"

পাঠান আমলেও এই বার ভুঁইয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সে সময়ে মুসলমানেরাও ভুঁইয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মোগল-বিজয়ের সময় যাঁহারা বার ভুঁইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু। কেহ কেহ হিন্দু ভুঁইয়ার সংখ্যা আরও অধিক মনে করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা যে সকলেই পাঠান বা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট, সে কথা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কারণ তখন বাঙ্গালা দেশে পাঠানেরাই রাজত্ব করিতেন। এই মুসলমান ভুঁইয়াগণের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তাঁহার নাম ইশা খাঁ। কিন্তু অন্য আটজন মুসলমান ভুঁইয়ার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু তিন জনের মধ্যে বিক্রমপুর—শ্রীপুরের চাঁদ রায়,কেদার রায়, বাকলাচন্দ্র দ্বীপের কন্দর্প রায়, রামচন্দ্র রায় ও যশোরের প্রতাপাদিত্যের কথা আমরা জানিতে পারি। এই চারিজন প্রসিদ্ধ ভুঁইয়ার সহিত কিরূপে মোগল সুবেদারগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে শুনাইতেছি। বাঙ্গালী কি করিয়া তখন যুদ্ধ করিতে পারিত ইহা হইতে তোমরা তাহা জানিতে পারিবে।

ইশা খাঁ

ইশা খাঁর পিতা হিন্দু ও মাতা পাঠান রমণী ছিলেন। ইশার পিতা কালিদাস গজদানী রাজপুত বংশীয়, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সোলেমান খাঁ উপাধি ধারণ করেন। ইশা ও ইসমাইল নামে তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মে। ইশা আপন প্রতিভাবলে সামান্য সৈনিক হইতে ক্রমে ক্রমে একজন প্রধান ভুঁইয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় অধিকাংশই তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার অনেকগুলি রাজধানী থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা জেলাস্থ নারায়ণগঞ্জ সহরের উত্তরাংশে স্থিত খিজিরপুর, কাঠারব বা দেওয়ানবাগ এবং ময়মনসিংহ জেলাস্থ জঙ্গলবাড়ী গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। অন্যান্য ভুঁইয়ারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইশা খাঁ প্রথমে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তিনি অন্যান্য পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্রোহী মোগল কর্ম্মচারী মাসুম খাঁ ইহাঁর সহিত যোগদান করিয়াছিল। মোগল সুবেদারগণ ইশাকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইশা মধ্যে মধ্যে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেই স্বাধীন হইয়া উঠিতেন।

এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোগল সুবেদারদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতে চলিতে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হন। তখন ইশা খাঁর সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইশা মানসিংহের সহিত স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ উভয় যুদ্ধেই যারপরনাই পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জলযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ নিহত হন। মানসিংহ এগারসিন্ধু দুর্গ অবরোধ করিয়া ইশার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে মোগল পক্ষ বড় সুবিধা করিতে পারে নাই। আজীবন মস্তক উন্নত রাখিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইশা খাঁ পরলোক গমন করেন। ইশা খাঁর উপাধি ছিল মসনদ্-ই-আলি। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ইশা খাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

কেদার রায়

এবার তোমাদিগকে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ভুঁইয়ার কথা বলিতেছি। তাঁহার নাম কেদার রায়। কেদার রায়ের এক পুত্রের নাম ছিল চাঁদ রায়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিম রায় কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশে ইঁহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীপুর নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর পদ্মায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন তাহার কোনই চিহ্ন নাই। চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুইজনই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ইশা খাঁর ন্যায় ইঁহারাও মোগলের অধীনতা স্বকীর করেন নাই। ইশা খাঁর সহিত ইঁহাদের বেশ মিত্রতাও ছিল। কিন্তু অবশেষে সে মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন দুইপক্ষে বিবাদ আরম্ভ হয়। মোগলেরাও ইঁহাদিগকে দমন করিতে অনেকরূপ চেষ্টা করে। কিন্তু ইঁহাদের রাজ্যে বহু নদনদী প্রবাহিত থাকায় তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে মোগলদিগের প্রবেশ করা কঠিন হইয়া উঠিত।

কিছুকাল পরে চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে কেদার রায় একাকীই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সন্দ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু মোগলেরা তাহা অধিকার করিয়া লয়। কেদার রায় তাহা উদ্ধার করিবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। কার্ভালো নামে একজন পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি সেনাপতির সাহায্যে তিনি সন্দ্বীপ আবার অধিকার করিয়া লন। কার্ভালো যখন সন্দ্বীপে ছিলেন তখন তাহা অবরোধ করিবার চেষ্টা হইলে চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া রক্ষা করে। এই সময়ে আরাকানের মগ রাজা সেলিম সা পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার জন্য সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। কেদার রায় পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্যে অসন্তুষ্ট হইয়া মগরাজকেই সাহায্য করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজেরা কিন্তু মগরাজের রণতরী সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। মগরাজের সহিত যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের রণতরী সকলও ভগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহারা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে গমন করে। কার্ভালো কতকগুলি রণতরী লইয়া শ্রীপুরে পুরাতন প্রভু কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হন। সন্দ্বীপ লইয়া মোগল, বাঙ্গালী, মগ ও ফিরিঙ্গীর মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। পর্ত্তুগীজেরা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে মগরাজা তাহা অধিকার করিয়া লন।

এদিকে মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। কার্ভালোর সহিত যুদ্ধে মানসিংহের সেনাপতি মন্দা রায় নিহত হন। ইহার পর কেদার রায় মগরাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মানসিংহ আবার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে আরাকান-রাজকে দমন করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। সে সময়ে কেদার রায়ের ৫০০ শত রণতরী ছিল। তিনি মোগল সেনাপতি কিলমফকে শ্রীনগরে অবরোধ করিলে, মানসিংহ তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। উভয় পক্ষ হইতে গভীর গর্জ্জনে কামান সকল গোলাবৃষ্টি করিতে থাকে এবং ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার অভিনয় হয়। কেদার রায় আহত হইয়া বন্দী হন। মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এইরূপে অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া কেদার রায় যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শীলাময়ী নামে দেবীমূর্ত্তি মানসিংহ লইয়া গিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বর নগরে স্থাপন করেন। এখনও তথায় সেই প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে।

বীর হাম্বীর

ভুঁইয়ারা ব্যতীত আরও কোন কোন বাঙ্গালী জমীদার সে সময়ে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ভূষণার মুকুন্দরাম রায়ই প্রধান। বিষ্ণুপুরের রাজবংশ প্রাচীন কাল হইতে একরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা মল্লবংশ নামে পরিচিত। আদিমল্ল রঘুনাথ হইতে ইঁহাদের বংশ আরম্ভ। মল্লাব্দ নামে একটি অব্দও ইঁহাদের রাজ্যে প্রচলিত ছিল। মোগল-পাঠানের সঙ্ঘর্ষের সময় বীর হাম্বীর মল্ল বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে মোগলদিগের বিরুদ্ধে পাঠান-দিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। হাম্বীর কতলু খাঁর সহিত মিলিত হন। পাঠানেরা রাত্রিকালে জাহনাবাদের নিকট মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিলে হাম্বীর তাঁহার বিপদ বুঝিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন ও বিষ্ণুপুরে লইয়া যান। তিনি পূর্ব্ব হইতে জগৎসিংহকে সতর্ক করিয়াছিলেন। জগৎসিংহ কিন্তু হাম্বীরের কথায় কান দেন নাই। ইহার পর মোগলদিগের সহিত হাম্বীরের মিলন ঘটে। তখন আবার পাঠানেরা তাঁহার রাজ্যে লুঠপাঠ আরম্ভ করে। কিন্তু মানসিংহ পাঠানদিগকে পরাজিত করেন।

হাম্বীর একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সে সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে হাম্বীরের লোকেরা আচার্য্যের ভক্তিগ্রন্থসকল আহরণ করে। হাম্বীর আচার্য্যের পরিচয় পাইয়া সে সকল গ্রন্থ ফিরাইয়া দেন ও তাঁহার শিষ্য হন। হাম্বীরের রচিত দুই একটি গানের পদও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্যদাস নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই নামের ভণিতাযুক্ত তাঁহার কতকগুলি গান প্রচলিত আছে,—

> "শ্রীচৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল।
> বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল।"

হাম্বীর কোন কোন দেবমূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ নামে বিগ্রহ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। [ক্রমশঃ

হাম্‌বুর্গে বাঙ্গালীর জীবন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ঘরদুয়ার গুছাইয়া বসিয়া নূতন জায়গায় পুরাতন হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ইউনিভার্সিটির তখনও ছুটি চলিতেছে। একদিন সকালে আকাডেমিশে আউস্‌লাণ্ড-ষ্টেলেতে গিয়া শুনিলাম একটি ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করিতেছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে চান। আমি চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু আকাডেঃ আউঃএর কেরাণী-যুবতীটি বলিলেন, ভদ্রমহিলা পরদিন আবার আসিবেন, আমিও যেন আসি। পরদিন মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি সুপরিচিতের মত অনেক খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার অনেক সংবাদ দিলেন ও আমি জার্ম্মান পড়িবার কি ব্যবস্থা করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, বার্লিনের ডয়েট্‌শে আকাডেমী হইতে এখানে যে জার্ম্মান কোর্স দেওয়া হইবে আমার তাহাতে যোগ দেওয়ার কথা আছে। মহিলাটি বলিলেন, তাহার তো এখনও তিন সপ্তাহ দেরি আছে, ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কাছে জার্ম্মান পড়িতে চাই কি না। মহিলাটির পূর্ণ পরিচয় তখনও পাই নাই, ভাবিলাম জার্ম্মান-শিক্ষয়িত্রী বুঝি, তাই এড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, আমার অর্থবল খুব বেশী নহে, বেশী ফি দিবার সামর্থ্য নাই। তিনি বলিলেন, সেজন্য চিন্তা নাই, তাঁহার স্বামীর অবস্থা ভাল, তাই তিনি বিনা ফিতেই পড়াইবেন। অতএব আপত্তি করিবার কিছুই থাকিল না, মহিলাটি নাম-ঠিকানাসহ কার্ড দিয়া গেলেন, পরদিন হইতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পড়া আরম্ভ করিলাম ও ক্রমে তাঁহার পরিচয় পাইলাম।

এই মহিলার নাম ফ্রাউ ফেরা, **Frau Fera**। * ইনি আকাডেঃ আউঃ-এর সভাপতি ও ইউনিভার্সিটি সমাজে ইঁহার খুব প্রভাব প্রতিপত্তি। ইঁহার স্বামী খুব বড় ওয়াইন-সওদাগর। হের্ ফেরার বয়স প্রায় ষাট, ফ্রাউ ফেরার পঞ্চাশ। স্বামী পাকা ব্যবসায়ী ও খুব আমুদে লোক, স্ত্রী বিদুষী, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও করুণাময়ী; শুধু তাই নয়, যুদ্ধের সময় স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফ্রাউ ফেরা নিজেই ব্যবসা চালাইয়াছিলেন এবং ওয়াইন ছাড়া অন্য আমদানি-রপ্তানির কারবারে নিজের দায়িত্বে ব্যবসা চালাইয়া যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আলষ্টার লেকের ধারে সহরের সম্ভ্রান্ততম পাড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী কিনিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী এখন সেখানেই বাস করেন। ইঁহাদের দুটি ছেলে, বড়টি রটার্ডামে বিদেশী ফল ও সব্‌জী আমদানির ব্যবসা করেন, ছোটটি হাম্‌বুর্গে বাপের ব্যবসায়ে কাজ করেন, কিন্তু ভিন্ন বাড়ীতে ফ্ল্যাট লইয়া বাস করেন। বিদেশীদের সম্বন্ধে ফ্রাউ ফেরার বড় আগ্রহ, তিনি যে শুধু ইউনিভার্সিটির বিদেশী বিভাগের সভাপতি তা নয়; গবর্ণমেণ্ট, নগরের মেম্বর বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশীদের সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে ফ্রাউ ফেরাকে দলে টানিবার চেষ্টা করেন; বিদেশী কন্‌সাল্‌রাও সামাজিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। ব্যবসায়-সূত্রে ভারতের সঙ্গে ফ্রাউ ফেরার প্রথম পরিচয় হয় ও পরে

ফ্রাউ ফেরা।

মহাত্মা গান্ধীর কথা পড়িয়া ভারত সম্বন্ধে তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। গ্রীসের সঙ্গে ব্যবসার ফলে ফ্রাউ ফেরা এখানে "জার্ম্মান-গ্রীক-সমিতি" স্থাপনা করেন। গান্ধী সম্বন্ধীয় অনেক বই ছবি প্রভৃতি ফ্রাউ ফেরার বাড়ীতে আছে, মহাত্মা সম্বন্ধে এক সময়ে ইনি এত আলাপ-আলোচনা করিতেন যে, বন্ধুরা তাঁহাকে গান্ধীশিষ্য নাম দিয়াছিল। সব বিদেশীদের চেয়ে ভারতীয়দের প্রতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের প্রতিই, ইঁহার অনুরাগ বেশী। বিদেশী ছাত্রদের ইনি মাতৃস্থানীয়া, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের কি উপকার ও সাহায্য করিতে পারেন সেজন্য সদাসচেষ্ট। কাল্‌কুট্টা (Calcutta, জার্ম্মান

---

* ফ্রাউ Frau মানে 'মিসেস', হের্ Herr মানে 'মিষ্টার', ও ফ্রয়লাইন Fraulein মানে 'মিস্'।

বানান Kalkutta) হইতে লোক আসিয়াছে বা আসিতেছে শুনিলে ফ্রাউ ফেরার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা থাকে না। ফ্রাউ ফেরা বিদেশীদের জন্য সপ্তাহে দুই সন্ধ্যা বাড়ীতে জার্ম্মান ক্লাস করেন, খাতা, পেন্সিল, টাইপকরা পাঠ ও নোট সরবরাহ করেন এবং ক্লাসের পর কেক বিস্কুট চা-কফি ওয়াইনের ছড়াছড়ি করেন। এ ছাড়া সকাল দুপুরেও প্রয়োজন হইলে পড়ান। ফ্রাউ ফেরার কাছে এখানকার বাঙ্গালীদের খবর পাইলাম।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘোষ-ট্র্যাভেলিং-ফেলোশিপ লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ইউরোপের হাওয়ায় যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, ট্রামে বাসে পারতপক্ষে উঠিতেন না, পায়ে হাঁটিয়া হন্ হন্ করিয়া দামী ক্যামেরা বগলে করিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া বড় আনন্দে ছিলেন, শীতের প্রারম্ভে দেশে ফিরিয়া গেলেন, বলিলেন, গৃহিণী বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, লম্বা লম্বা চিঠি লিখিতেছেন। শ্রীঅমর মিত্র নামক এক ভদ্রলোক লণ্ডন হইতে এখানে ভাষাশিক্ষা ও ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, মাস চারেক পরে বার্লিনে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল, এম-বি, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে হাউস-সার্জ্জন ছিলেন, এখানে স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আসিয়াছেন। শ্রীরাজীব রায় (ব্যারিষ্টার ৺জে. এন. রায়ের পুত্র) টেক্‌নিকাল যন্ত্রকল বিষয়ে শিখিতেছেন।

এখানে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের একজন ট্রেড কমিশনার থাকেন, এখন আছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই-সি-এস। ইঁহার পিতা ৺ কর্ণেল গুপ্ত, আই-এম্-এসে ছিলেন। হামবুর্গের "চৌরঙ্গী"পাড়ায় ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনারের অফিস। ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধীয় ভারত সরকারের যাবতীয় পাব্‌লিকেশন ও দৈনিক সাপ্তাহিক অনেক পত্রিকা ভারত সরকার এখানে পাঠান। ভারতের সঙ্গে যে জার্ম্মান কোম্পানিরা ব্যবসা করিতে চায় তাহারা এখানে সব খবরাখবর পায়, পণ্যদ্রব্যের নমুনা পাঠায় এবং ভারতজাত পণ্যেরও এখানে নমুনা রাখা হয়। মিঃ গুপ্তের সঙ্গে অফিসে দেখা করিবার কয়েকদিন পরেই তিনি বাড়ীতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি নূতন লোক বলিয়া নিজের মোটরে আমাকে বাসা হইতে লইয়া গিয়া রাত্রে আবার নিজেই বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। মিঃ গুপ্ত কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন, তাঁহার সৌজন্য ও সামাজিক অমায়িকতা ঠিক খাঁটি ইংরেজ ভদ্রলোকের মত। মিসেস্ গুপ্ত সার অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। সার অতুল ইউ পি অঞ্চলের সিভিলিয়ান ছিলেন এবং বহুকাল ইংলণ্ডে বসবাস করিতেছেন। মিসেস গুপ্ত ছেলেবেলা হইতেই ইংলণ্ডে ও পরে কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাই বুঝিতে ও পড়িতে পারিলেও বাংলা ভাল বলিতে পারেন না, (মিঃ গুপ্তকে "গোপ্টেন" বলিয়া ডাকেন), যাহাও বলেন তাহাতে ইংরেজীর টান ও ইউ-পি হিন্দির গন্ধ, কিন্তু ইংরেজী এত চমৎকার বলেন যে কান জুড়াইয়া যায়। যাঁহারা খাঁটি ইংরেজের সংসর্গ করিয়াছেন ও খাঁটি মেকির তফাৎ বুঝিতে পারেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে আজকাল বাংলা দেশ হইতে ভাল ইংরেজী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; এখনকার 'জেনারেশন' গোটা কত ক্যাচ্-ফ্রেজের বুক্‌নি কাটিয়া বড় জোর গলাটা তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজ বা ফিরিঙ্গির মত করিয়া একটু চালিয়াতি করিয়া ভাষাজ্ঞান ও বাক্‌শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। সকলেই জানেন যে, ভাষাশিক্ষা বিষয়ে এবং লেখায় না হউক বিদেশী ভাষায় কথা বলাতে সব দেশেই পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা বেশী। বাঙ্গালী মেয়েদের সুন্দর হিন্দি পাঞ্জাবী উর্দ্দু উড়িয়া বলিতে শুনিয়াছি কিন্তু ইংরেজী বলিতে সেরূপ শুনি নাই; যাঁহারা বলিতে পারেন তাঁহারা মেমদের ইস্কুলে পড়িয়াছেন তাই অধিকাংশক্ষেত্রেই সঙ্গদোষে উচ্চারণ, অ্যাক্‌সেণ্ট, বিশেষতঃ "ইন্‌টোনেশান"টা ফিরিঙ্গিদের "চি চি ইংলিশ"এ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিশোর যুবকদেরও দেখিয়াছি ইংরেজ মাষ্টার প্রোফেসারদের কাছে পড়িবার সুযোগ লাভ করিলেও ইঁহাদের উচ্চারণ অনুকরণ না করিয়া সহপাঠী ফিরিঙ্গি এমন কি মাদ্রাজিরও অনুকরণ করে। অর্থনীতিশাস্ত্রে "গ্রেশাম্‌স্ ল" আছে, বাজারে খাঁটি ও মেকি মুদ্রা একসঙ্গে চালাইলে মেকিটারই প্রচলন হয় বেশী। আর খাঁটিটা অচিরে তিরোধান করে; মনস্তত্ত্বের কোন্ ল'তে লোকে যে "সুরস পায়স চিনি পরিহরি চিটেতে আদর এত" প্রকাশ করে তাহা কে জানে! যাক সেকথা, কিন্তু মিসেস গুপ্তের মুখে প্রাঞ্জল, অনর্গল, সুমার্জ্জিত, সুবিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক ইংরেজী শুনিয়া আমার বড় তৃপ্তি বোধ হইল ও সুপাত্রে পড়িলে খাঁটি ও সুন্দর জিনিষ বিদেশী হইলেও কেমন চমৎকার মানায় তাহা মনে হইল। মিসেস গুপ্ত জার্ম্মানও বেশ বলেন। বিদেশেই বেশী থাকিয়াছেন বলিয়া মিসেস গুপ্তের ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানপিপাসা খুব, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে খুব আগ্রহ, মহেঞ্জো-দাড়ো সম্বন্ধে নূতন প্রকাশিত প্রকাণ্ড তিন ভলিউমের বই কিনিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছেন। মিষ্টার গুপ্তের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকিলে জার্ম্মান দাসীর দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা দেশী মতে ভাত ডাল তরকারির (কারি পাউডারের সাহায্যে) ব্যবস্থা হইত, লণ্ডনে কেনা বোতলের দেশী আচার খাইয়া প্রাণে বল আসিত। মিঃ গুপ্তদের দুটি ছেলে, প্রেম ও হেম, লণ্ডনে স্কুলে পড়ে; ছুটির পর তাহাদের মাতামহের কাছে রাখিয়া আসিতে মিসেস গুপ্ত লণ্ডনে গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, দেশী রান্না খাইবার ইচ্ছা হইলেই তিনি না থাকিলেও তাঁহার দাসীকে বলিয়া যেন বানাইয়া লই।

তাহার পর আলাপ হইল শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে। ইনি নদীয়া-মেহেরপুরের জমিদার-বাড়ীর ছেলে, বি এস্‌সি পাশ করিয়া এটা-ওটা চাকরি ও কিছুদিন, এমন কি সরবতের দোকানও করিয়াছিলেন। শেষে মাড়োয়াড়ীর পাটের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি ও দক্ষতার বলে কাজ শিখিয়া এখানে একটা খুব বড় মাড়োয়াড়ী পাট-কোম্পানীর প্রতিনিধির কাজ করিতেছেন। এই কর্ম্মসূত্রে গত চার বৎসরে ইউরোপ আমেরিকার প্রায় সব দেশ ঘুরিয়াছেন। ভাল মাহিনা পান ও বেশ ভাল ষ্টাইলে থাকেন, তাঁহার প্রতিনিধিত্বে ভারতীয় ব্যবসায়ের বিশেষতঃ মাড়োয়াড়ী কোম্পানীর এদেশে ইজ্জৎ বাড়িয়াছে। তিনি আসার পর কোম্পানীর বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকার লোকসান বন্ধ হইয়াছে। কন্টিনেণ্টের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী সমাজের কাগজ-পত্রে জুট-এক্‌স্‌পার্ট বলিয়া মিঃ মল্লিকের নাম উল্লিখিত হয়, অথচ বয়স তাঁহার মাত্র ত্রিশ। বিদেশ হইতেও মিঃ মল্লিক পাটের গুপ্ত তত্ত্ব শিখাইবার জন্য চাকরির প্রস্তাব পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে দেশের ক্ষতি হইবে বলিয়া নেন নাই। মিঃ মল্লিকের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃতী বিদেশে ভাগ্যোপার্জ্জককে দেখিয়া আনন্দ হয় আবার দুঃখও হয় যে, তাঁহার মত যোগ্য লোককে বাংলার অতি নিজস্ব জিনিষ পাট লইয়া চাকরি করিতে হয় কিনা মাড়োয়াড়ী কোম্পানীর! বাঙ্গালী ব্যবসাদারদের এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছে।

মিঃ মল্লিকের বাড়ী এখানকার বাঙ্গালীদের মিলনস্থান ছিল। সম্প্রতি কিছুদিন আগে মিঃ মল্লিক নবপরিণীতা পত্নীকে এখানে আনিয়াছেন। মিসেস মল্লিক সুশিক্ষিতা, স্বল্পভাষিণী ও ব্যবহারে সলজ্জনম্র এবং স্বয়ং পাকা রাঁধুনী, তাহার উপর বিদেশে পতিগৃহে আসিয়াছেন প্রচুর দেশী মশলা এমন কি টিনভরা সরষের তেল পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া; নিজ হাতে এবং দাসীকে শিখাইয়া পোলাও কালিয়া পিঠা সন্দেশ সিঙ্গাড়া হালুয়া প্রভৃতিতে আমাদের সব ক্ষুধাই মিটাইয়াছেন। আমরা কয়জন ভাত-মাছবুভুক্ষু তেল-মশলা-বিরহী বাঙ্গালী-যক্ষ যখন একত্র মিঃ মল্লিকদের টেবিলে বসিয়া ইউরোপীয় রামগিরির সকল বাধাবন্ধন কায়দাকানুন ভুলিয়া পরম ও পূর্ণ দৈশিক আকণ্ঠতার সঙ্গে ভূরি পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত সুখাদ্যাদি পরিভোজন করিয়া পরে উঠিয়া আবার ড্রইংরুমে ফিরিয়া পুরু সোফায় বসিয়া সুপারি ও মশলা চিবাইতাম, তখন মনে হইত, আঃ এই তো অলকা! আরও কিছুদিন কোনমতে এই বিদেশে "লোচনে মীলয়িত্বা" কাটাইয়া দিয়া শার্ঙ্গপাণির ভুজগশয়নশয্যা কালাপানি পার হইয়া দেশে ফিরিলে নিত্য-ঝোল-ঝাল-মশলা-প্লাবিত দেশী খাওয়া শুধু "পরিণত শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু" নয়, সর্ব্ব ঋতুতে দুপুর সন্ধ্যা খাইতে পারিব! "মেঘদূতে"র বিরহীযক্ষ স্বপ্ন দেখিত সেই দেশের, যেখানে

> যত্রোন্মত্ত ভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
> হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
> কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
> নিত্যজ্যোৎস্না প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

আর এই উত্তর ইউরোপ-প্রবাসী আমরা বাঙ্গালীরা স্বপ্ন দেখি সেই দেশের, যেখানে

> যত্রছ্যাঁকছ্যাঁকনিনাদমুখরা হাঁড়িয়া নিত্যতৈলা
> বাঁটামশলারচিতঅমৃতা নিত্যঝোলা বাটিকা।
> ভাতোৎকণ্ঠা ভবনলোকেরা ক্ষুধাগ্লানিবিহীনা
> নিত্যঝালাম্বলপ্রতিহতশীতগ্রীষ্মা দুপুরাঃ॥

পাঠক অপরাধ লইবেন না! পেটের দায়ে লোকে কি না করে—"বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং?" নতুবা আমাকে

শৃব্রিং-দম্পতি।

কাব্যরোগে ধরিত না। মূলশ্লোকটির সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা উহাকে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ কালিদাস-অরচিত সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাই আরও প্রাকৃতজনোচিত অপভ্রংশপ্রক্ষেপের ধৃষ্টতায় অগ্রসর হইলাম। কিন্তু যে যাই বলুন, কতদেশ তো ঘুরিলাম কিন্তু বাংলাদেশের মত রান্না পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই একথা নির্ভয়ে বলিতে পারি। রান্নার প্রক্রিয়াজটিলত্ব, উপকরণবাহুল্য ও আস্বাদবৈচিত্র্য যদি সভ্যতার পরিমাপক হয়, তবে বাংলাদেশ শুধু ভারতকে কেন সারা পৃথিবীকে বহু বৎসর আগাইয়া আছে। দন্তমান ব্যক্তি দন্তমর্ম্ম বুঝে না, অবিরহী লোক প্রেমের দুঃখ জানে না, অপ্রবাসী বাঙ্গালীরা আমাদের দুঃখ বুঝিবেন কিনা জানি না, তবে একটি বাঙ্গালী যুবক আমার সঙ্গে বোম্বাই হইতে এক জাহাজে এক ক্যাবিনে আসিয়াছিলেন, মাস ছয়েক জার্ম্মানীর একটি ছোট সহরে কারখানার কাজ শিখিয়া, দেশে ফিরিবার মুখে হামবুর্গ হইয়া গেলেন, ছয়মাস বাঙ্গালীর মুখ দেখেন নাই সেই দুঃখ করিতে-

ছিলেন। আমি যখন মিঃ মল্লিকদের বাড়ীতে আমাদের রসনাসুখের কথা বলিলাম, তখন ভদ্রলোক হিংসায় শোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সুখ কিন্তু কোথাও চিরকাল থাকে না, মিঃ মল্লিককে সেদিন কোম্পানীর কাজে হঠাৎ সস্ত্রীক দেশে যাইতে হইল।

ঝালমশলার রান্না এমনিই জিনিষ যে, একবার ধরাইয়া দিতে পারিলে বিদেশী ইহা ছাড়িতে পারে না। ফিরিঙ্গিরা কলিকাতার সাহেব-বাজারের একাধিক মাদ্রাজি শুঁটকি মাছ ও চাট্‌নীর দোকানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, ভারতপ্রবাসী সাহেবরা দেশে ফিরিয়াও রাইস্‌-কারির মহিমা ভুলিতে পারেন না এবং এতই ইহার সুযশ রটাইয়াছেন, যে কখনও দেখিয়া বা খাইয়া না থাকিলেও এই সুদূর জার্ম্মানীতেও লোকে জানে যে, রাইস্‌-কারি নামে একটি পরম রসাল খাদ্য আছে। মিঃ গুপ্তের সহকারী এখানকার অ্যাসিষ্টাণ্ট ইণ্ডিয়ান ট্রেড কমিশনার, জার্ম্মান বাপ ও ইংরেজ মায়ের সন্তান, ইনি প্রায়ই আমাদের সঙ্গে মিঃ গুপ্তদের বাড়ীতে খাইতেন। দেখিতাম, ভদ্রলোক নিরাপত্তিতে প্লেট্‌ প্লেট্‌ ভাত-ডাল-কারি চালাইয়া যাইতেন ও দুই রকম আচারের বোতলের মধ্যে যেটা বিভীষণ ঝাল, সেটাই বেশী পছন্দ করিতেন। মিঃ মল্লিকদের জার্ম্মান দাসী প্রথম প্রথম বাংলা রান্নায় নাক সিঁট্‌কাইত, শেষে তাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, বাংলা মাছতরকারি বা মিষ্টির চামচকাটা চুষিত ও মিসেস মল্লিকের কাছে আবদার করিত, "ফ্রাউ মাল্লিক, অমুক তরকারিটা আবার কবে রান্না হইবে? অমুক মিষ্টিটা আর একদিন করুন!" ইত্যাদি। আমার একটি ভাগ্নী ছেলেবেলায় বড় লোভী ছিল এবং খুব অল্প বয়সে কথা বলিতে শিখিয়াছিল। আমরা বলিতাম, লোভী মেয়ে ইচ্ছামত খাবার চাহিয়া খাইতে পারিবে বলিয়া অত তাড়াতাড়ি কথা বলিতে শিখিয়াছে; মিঃ মল্লিকদের ঝি বাংলা রান্না শিখিয়া লইয়াছিল এবং আমাদের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি একটু উপলক্ষ পাইলেই মিসেস মল্লিককে সরাইয়া দিয়া নিজে অনেক রকম বাংলা রান্না ও মিষ্টি প্রস্তুতে লাগিয়া যাইত, মিঃ মল্লিক বলিতেন, বেটি নিজে ভাল করিয়া খাইবার মতলবে ও রকম করে। ইংরেজ বণিক যেমন বহু প্রোপাগাণ্ডা করিয়া আমাদের চা ধরাইয়া নিজে বড়লোক হইয়া গেল, সেরূপ কোন উদ্যোগী বাঙ্গালী কোম্পানী এদেশের বড় বড় সহরে ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁ খুলিয়া একবার নেশা ধরাইবার চেষ্টা করিলে পারেন, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এখানে একটা নিরামিষ রেস্তরাঁ আছে, এই "ভেগেটারিশেস্‌" (Vegetarisches) রেস্তরাঁতে নানা রকম অতি সাধারণ যাতা বিক্রী হয়, কিন্তু দোকানটা খুব ফ্যাশনেব্‌ল্‌ হইয়া পড়িয়াছে, ডবল দাম বিনা এখানে খাওয়া হয় না, তাও লাঞ্চের সময় দেখি লোক গিশ্‌গিশ্‌ করিতেছে, একটার দু মিনিট পরে গেলেও জায়গা পাওয়া দুষ্কর।

মিঃ মল্লিকদের বাড়ীতে আলাপ হইল ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পি-এচ-ডি মহাশয়ের সঙ্গে। ডাঃ দাশগুপ্ত পঁচিশ বৎসর এদেশে আছেন এবং মধ্যে একবারও দেশে যান নাই। ইনি কেমিষ্ট, অনেক নামজাদা ফার্মে বড় কেমিষ্টের কাজ করিয়াছেন ও অনেক নূতন ঔষধাদির আবিষ্ক্রিয়া ও প্রস্তুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখন ইনি কয়েকটি দুশ্চিকিৎস্য রোগের চিকিৎসা লইয়া গবেষণা চালাইতেছেন ও অনেক রোগীর উপর চিকিৎসা চালাইয়া আশাতীত সুফল পাইয়াছেন। ব্যবসাদার ডাক্তার না হইলেও এখন ইঁহার কাছে রোগীর ভীড় হয়। বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা গিয়াছে ও তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী পরীক্ষার জন্য বড় সরকারি হাঁসপাতালে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন যে, আধুনিক যুগের কেমিষ্ট্রির জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরাজরা প্রয়োগ-ফলাফল বিচার করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগ-চিকিৎসা সম্বন্ধে এত উচ্চাঙ্গের অনেক তথ্যের খবর জানিতেন যে, ইউরোপ এখন তাহার তুলনায় নিতান্ত নাবালক আছে। কবিরাজী শাস্ত্রের বিধিনিষেধের সত্যতা আধুনিক কেমিষ্ট্রির ভাষা ও প্রণালীতে সপ্রমাণ করিয়া ডাঃ দাশগুপ্ত দেখাইতেছেন যে, তাহা রোগচিকিৎসা বিষয়ে কতদূর সুফলপ্রসূ। মুখে মুখে যত আশ্চর্য্য খবর ডাঃ দাশগুপ্তের কাছে শুনিলাম তাহা তিনি এখনও প্রকাশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক, কারণ তিনি নিজের বহুবর্ষব্যাপী পরীক্ষাতে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ সুফল পাইলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজের সংস্কার এখনও তাঁহার বিরুদ্ধে। আপত্তি করিবার আর উপায় থাকিবে না এমন অবস্থায় আনিয়া ইনি তাঁহার মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন। একটানা পঁচিশ বৎসর এদেশে আছেন, মধ্যে পাঁচ দশ বৎসর বাংলা কেন ইংরেজি বলিবারও লোক পান নাই, তবু ডাঃ দাশগুপ্ত নিজের কুমিল্লা জেলার উচ্চারণের টানটা সম্পূর্ণ ঠিক রাখিয়াছেন। দুতিন বৎসর বিলাতে থাকিয়া যে বঙ্গীয় সাহেবরা বাংলা ভুলিয়া গিয়া থাকেন তাঁহারা কি বলেন? এই বাংলাভুলো নীলবর্ণ শৃগাল মহাশয়দের সম্বন্ধে মিঃ গুপ্ত একটি গল্প বলিলেন—তাঁহার সহযোগী একজন ইংরেজ বাংলার একটি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সাহেবের অধীনে একটি এলাহাবাদের আই-সি-এস বাঙ্গালী যুবক নবীন সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছিলেন। এলাহাবাদী সিভিলিয়ানদের যদিও মাত্র বৎসরখানেক বিলাতে থাকিতে হয় তবু এই নবীন যুবক দেশে ফিরিয়া চাকরিতে 'জয়েন' করিয়া আদালত ও অন্যত্র হাবভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি বাংলা ঠিক বুঝিতে ও বলিতে পারেন না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানে একথা উঠিল; সাহেব রসিক ছিলেন, তিনি যুবককে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনি নাকি এক বৎসর বিদেশে থাকিয়া মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহা যদি হয় তবে

তো আমাকে আপনার মানসিক শক্তির অবস্থা সম্বন্ধে চীফ্ সেক্রেটারিকে জানাইতে হইবে।" বলা বাহুল্য, কালেক্টার সাহেবের এই গুরুকৃপায় নবীন সাধক অচিরাৎ আবার জাতিস্মরত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

লণ্ডনে যাইতে আসিতে ও জার্ম্মানীর অন্যত্রবাসী অনেক বাঙ্গালীরাও মধ্যে মধ্যে হামবুর্গে এক আধদিন থাকিয়া যান। ব্যবসা সম্পর্কেও অ-বাঙ্গালী কোন কোন ভারতীয় এখানে কিছুদিন বাস করেন। লণ্ডন প্যারিস মিউনিক বার্লিনে অবশ্য ভারতীয়ের সংখ্যা অনেক বেশী এবং তাই ভারতীয়দের নিজেদের কোন রকমের একটা প্রতিষ্ঠান গড়িবারও সেখানে সুবিধা হইয়াছে। হামবুর্গে সে সুবিধা না থাকিলেও ইহার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য কিছু চেষ্টাও করা হইতেছে।

ডয়েট্শে আকাডেমীর শ্প্রাখকুর্জেস্ Sparchkurses অর্থাৎ ভাষাক্লাস আরম্ভ হইল। আরম্ভে ও শেষে দুদিন নাচ হইল। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে অনেকগুলি ছোটখাট ভ্রমণ, দৃশ্য দেখা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। আমেরিকা ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে অনেক ছাত্রছাত্রী আসিয়াছিল। আজকাল ইউরোপের প্রায় সবদেশে ভাষা শিক্ষা ও বেড়ান-চেড়ানর মধ্য দিয়া "কালচারাল্ প্রোপাগাণ্ডা" করা হইতেছে, সেই সেই দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, আর্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি শুনান হইতেছে। রেলে বাসে আশেপাশের অনেক জায়গা দেখিলাম। একটি প্রকাণ্ড সিগারেট ফ্যাক্টরি দেখিতে গেলাম, ফ্যাক্টরির কর্ত্তৃপক্ষ বাস সরবরাহ করিলেন ও সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া প্রচুর কেক কফি খাওয়াইয়া প্রত্যেককে বিভিন্ন রকমের তিন বাক্স দামী সিগারেট উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। সুবৃহৎ কারখানার ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ ভাল লাগিল, বহুশত কর্ম্মচারীর জন্য কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়ে মাধ্যাহ্নিক আহার ও স্নানের আয়োজন। একদিন ষ্টিমারে করিয়া এলবে নদীর উপর হামবুর্গের বিরাট পোর্ট দেখান হইল। একদিন একটি বেকার-নিবারণী 'ক্যাম্প' দেখিলাম, কর্ম্মীদের সহরের বাহিরে মাঠের কাজ, ড্রেন বানানো প্রভৃতিতে লাগান হইয়াছে, শুইবার খাইবার ও অবসর সময়ে শিক্ষালাভেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমস্তই খুব সাদাসিধা সরল ভাবের, কিন্তু ঘড়ির কাঁটার মত সুনিয়ন্ত্রিত। এটি নাট্‌সিদের দলের দ্বারা পরিচালিত। একদিন এখানকার "রাট্‌হাউস" Rathaus অর্থাৎ পার্লামেণ্ট-গৃহ দেখিলাম; হামবুর্গ আগে জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্বর্ত্তী হইলেও স্বাধীন নগর ছিল, নিজের শাসন ও সব ব্যবস্থাই নিজের মেয়র ও সভাদ্বারা পরিচালনা করিত। নূতন ব্যবস্থায় এখন সমস্ত নগর ও প্রদেশের স্বাধীনতা ও শাসন-সভা লোপ পাইয়া একচ্ছত্র "রাইশ্" Reich অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রভুত্ব ঘোষিত হইয়াছে। একদিন ফ্রাউ ফেরার স্বামীর ওয়াইন-গুদাম দেখিলাম। শত শত প্রকাণ্ড পিপায় ভরা বহু দেশের বহু রকমের ওয়াইন। কর্ম্মচারীর দ্বারা অনেক পিপায় রবারের নল লাগাইয়া হাতে হাতে ছোট ছোট ওয়াইন-গ্লাস লইয়া আমরা আস্বাদ করিলাম, পরে হের্ ফেরার টেষ্টিং রুমে গিয়া তাঁহার নিকট আবদার করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সব চাইতে দামী শ্যাম্পেনের বোতল ভাঙ্গান গেল। দেশে থাকিতে আমাদের যে 'মদ্যম্ অপেয়ম্ অদেয়ম্ অগ্রাহ্যম্' রকমের একটা ভীতি থাকে, এখানে কিন্তু সেটা অহেতুক বলিয়া মনে হয়, কারণ বীয়ার এখানে লোকে জলের মত খায় ও অন্য রকমের অনেক ওয়াইনও খায়। বীয়ারে মাত্র তিন চার পারসেণ্ট

মল্লিক-দম্পতি।

অ্যাল্‌কহল, দু গ্লাস খাইয়াও দেখিয়াছি কোনরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় হয় না, একটু তিত একটু মিষ্ট আস্বাদ আর দেখিতে সোনার মত রং। যখন তখন রেস্তরাঁ মাত্রেই কাঁচের মগে করিয়া লোকে জলের মত বীয়ার খায়। ঝাঁঝাল মিষ্ট লিকার, মিষ্ট রঙ্গীন ওয়াইন, অমিষ্ট সাদা ওয়াইনও কত রকমের, পাঁচ হইতে দশ পনের বা ততোধিক পারসেণ্ট অ্যাল্‌কহল। লিকার ও ওয়াইন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাসে খাইতে হয়, দুই এক গ্লাসে কিছুই হয় না, বড় জোর শরীরটা একটু গরম হয়, আরও কিছু বেশী খাইলে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। মদ খাইয়া গুম হইয়া পড়িয়া থাকা বা উন্মত্ত প্রলাপ বকা বা মাতলামি করা এদেশে দেখি নাই। মদ খায় মানেই পাঁড় মাতাল, নেশা করিয়া চুর্ হইয়া পড়িয়া থাকে—ইহা আমাদের দেশে বেশী দেখা যায়, কারণ তীব্র ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি তাও আবার 'নীট' অর্থাৎ নির্জ্জলা প্রচুর পরিমাণে পান করার নির্ব্বুদ্ধিতা শুনিলাম

আমাদের দেশে বেশী। উগ্র অ্যাল্‌কহল ও খাঁটি দ্রাক্ষার রসজাত ওয়াইন ভিন্ন জিনিষ। একজন বিলাতি ডাক্তারের মত পড়িয়াছিলাম যে, ওয়াইন মানুষের প্রতি ভগবানের মহাদান, কারণ যথামাত্রায় সেবন করিলে এমন স্নায়ুমস্তিষ্ক-পোষক হ্লাদিনী সুধা নাকি আর হয় না।

এখানে ব্রেকফাষ্টের নাম "ফ্রুহ্‌ষ্টুক" Fruhstuck অর্থাৎ প্রাতঃখণ্ড। কফি, রুটি, মাখনই সাধারণতঃ থাকে, কখনও মার্মালেড, ডিমসিদ্ধ ও বেকনও বা একটু ফল। বেলা বারটা হইতে তিনটার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন. সুপ, মাংস, তরিতরকারি, ফলের মোরব্বা ও পুডিং। তরকারীর মধ্যে আলুই প্রধান, সাধারণ অবস্থার লোকে আমাদের ভাতের মত এইটা দিয়াই পেট ভরায়, মাংসটা উপলক্ষ মাত্র, আমরা যেমন মাছের গন্ধে ও ঝোলে ভাত উজাড় করি। বুড়ীরা বলেন, আলুতে হাড় শক্ত হয়। "মিট্টাগএসেন" Mittagessen অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজনের আধঘণ্টা এক ঘণ্টা পর কফি ও কেক বিস্কুট। বৈকালিক খাবার এখানে আগে কিছু ছিল না, আজকাল ইংলণ্ডের অনুকরণে কখন একটু চা-বিস্কুট কেক খাওয়া হয়। সন্ধ্যা সাতটা আটটার মধ্যে "আবেণ্ড্‌এসেন্" Abendessen বা রাত্রির খাওয়া ; অবস্থাপন্ন বাড়ী ছাড়া এ আহারটার জন্য সাধারণতঃ বিশেষ কিছু রাঁধা হয় না, বড় জোর একটু সুপ বা ডিম ; সাধারণতঃ এ আহারটা 'ঠাণ্ডা' খাওয়া হয় অর্থাৎ রুটি, মাখন, ফল ও ঠাণ্ডা মাংস অর্থাৎ নোনা মাংস, ধোঁয়ানো মাংস, নোনা ও ধোঁয়ানো মাছ, ও বিভিন্ন রকমের সসেজ। সসেজের নাম এদেশে "ভুর্ষ্ট" Wurst, কত যে রকমের হয় তাহা অবর্ণনীয়, শূয়রের মাংস, বলদের মাংস, রাছুরের মেটে, শূয়রের মেটে প্রভৃতি থেঁতো করিয়া বা বাটার মত করিয়া পশুর অন্ত্র বা তদনুরূপ পাতলা নকল জিনিষের বিবিধ আকারের চোঙ্গায় ভরিয়া রাখে। চিচিঙ্গের মত, শশার মত, বেগুন, মানকচু বা লাউয়ের মত কত আকারের যে সসেজ হয় তাহা অবর্ণনীয়। সসেজ এদেশে এত সাধারণ জিনিষ যে "ভুর্ষ্ট" শব্দের গৌন অর্থ "অতি সাধারণ জিনিষ", "এস্ ইষ্ট্ ভুর্ষ্ট ট্সু মীর" es ist wurst zu mir মানে "আমার কাছে ওসবই সমান" (it is all the same to me ; জার্ম্মান কথাটির শাব্দিক ইংরেজি it is sausage to me.)। ইংরেজের যেমন গোখাদক বলিয়া ইউরোপে প্রসিদ্ধ, ফরাসীর যেমন ব্যাংখেগো, জার্ম্মানদের সেরূপ সসেজখেগো বলিয়া অপনাম। আমাদের জার্ম্মান 'প্রাথকুর্জেস'এর শিক্ষক গল্প করিলেন যে, তিনি যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজি শুনিয়া ও মাথার চুল পাশের দিকে কামানো না ও উপরে ছোট করিয়া ছাঁটা না দেখিয়া ও তুপকেট বোঝাই সসেজ নাই দেখিয়া লণ্ডনের ইতরশ্রেণীর লোকে বিশ্বাস করিত না যে, তিনি জার্ম্মান। রুটির মধ্যে সাণ্ডউইচের মত পুরিয়া রামকাঁচা আমমাংসের কিমাও এখানে অনেকে খায়, হের্ ফেরা এইটির বড় ভক্ত। আর একটি পরম সুখাদ্য রাত্রিভোজনের সঙ্গে খাওয়া হয়, তাহা চীজ বা পনীর, জার্ম্মানে নাম "কেজে" Kase। কলিকাতার সাহেব বাজারের শক্ত চীজ প্রায় গন্ধ-হীনই, তবু অনেক বাঙ্গালী গন্ধের জন্য খাইতে পারেন না, ইটালিতে ভাত বা ম্যাকারোনির উপর গুঁড়া চীজ ছড়াইয়া খাইতে হয়, তাহাতে দুর্গন্ধ নাই, কিন্তু জার্ম্মানীর নরম চীজে যে কি বীভৎস অশুভ পাপ গন্ধ তাহা বলিতে পারি না। জৈনদের শাস্ত্রে সব জিনিষের একটা ধরাবাঁধা বর্ণনা থাকে, দুর্গন্ধের কথা বলিতে হইলেই তাঁহারা উপমা দিতেন "মরা সাপের মত, মরা গরুর মত·· ইত্যাদি, বা তাহার চেয়েও ভয়ঙ্কর" ; কিন্তু চীজের গন্ধের বর্ণনা বোধহয় তাঁহাদেরও অসাধ্য হইত, হয়ত বলিতেন "মরা ব্যাংকে সাতদিন পচাইয়া তারপরে নোংরা জলে ভিজাইয়া অতঃপর ড্রেনের কাদা মাখাইয়া···ইত্যাদি।" আমি যখন যেখানে থাকি ল্যাণ্ড-লেডীর উপর কঠোর আদেশ থাকে, চীজ যেন আমার ত্রিসীমানার মধ্যে না আসে, রাত্রিভোজনের জন্য হোটেলে গেলে দাসীকে সকলের আগে ঐটি নিষেধ করিয়া দিই।

সান্ধ্যভোজনের পর রাত্রে বসিয়া গল্পসল্প আলাপ, আমোদ করিতে হইলে বীয়ার-পাত্রের উপর তাহা করিতে হয়, অবস্থা যাদের ভাল তারা অবশ্য বিস্কুট বা ঠাণ্ডা ক্রীমের সঙ্গে ওয়াইনের উপর এটি করে।

হামবুর্গ সাগরতীরের কাছে ও নদীর উপর বলিয়া মাছ এখানে খুব শস্তা। ছয় আনা হইতে এক টাকা সেরে সব মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরার দ্বারা বেকার নিবারণের জন্য হিট্‌লার নিয়ম করিয়াছেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সকলকে মাছ খাইতে হইবে, কারণ এদেশের লোক সাধারণতঃ মাছ-প্রিয় নয়। মৎসজীবীরা নিয়মিতভাবে যাতে হাতে কাজ পায় সেজন্য নিয়ম হইয়াছে একদিন গৃহস্থরা, একদিন হোটেলগুলি, একদিন হাঁসপাতাল, একদিন জেল প্রভৃতি মাছ খাইবে। একটি শুধু মাছের রেস্তরাঁ আছে, অবশ্য "বাবু"দের জন্য নয়, কারণ শস্তা ; মাছের অন্য যেসব ঝোলজাতীয় ডিশ হয় তা আমাদের মুখে অখাদ্য, তবে পোয়া দেড়েক কাঁটাহীন বড় মাছের খণ্ড ভাজা ও আধপ্লেট আলুভাজা আট আনায় খাওয়া যায়। ডিম টাকায় আটটা দশটা। দুধের সের চৌদ্দ পয়সা। দোকানে এক কাপ কফির সাধারণ দাম চার আনা বড় ফ্যাশনেবল জায়গায় ছ আনা আট আনা। চা এখানে সান্ধ্যভোজনের সময় খাওয়া হয়, বিনা দুধ বিনা চিনিতে খুব পাৎলা করিয়া। বৈকালে যারা চা খায় তারা কেহ কেহ চায়ের কাপে খোসাশুদ্ধ লেবুর চাকা ফেলিয়া তাহাই একটু নাড়িয়া খায়, কেহ বা সামান্য চিনিও যোগ করে। লেবুর খোসায় চায়ে বেশ সুগন্ধ হয়, ইটালিতেও এইরূপ চা খাওয়া দেখিলাম। যে দার্জ্জিলিং চা কলিকাতায় এক টাকা পাউণ্ড এখানে তাহা প্রায়

ছয় হইতে আট টাকা পাউণ্ড। ছোট ছোট চিনে মাটির গ্লাসে জমান দই কোন কোন দোকানে বিক্রি হয়। রোমে ছানা খাইয়াছি কিন্তু বেজায় নোন্তা ও শক্ত। শস্তা দোকানে পাঁচসিকা দেড়টাকায় বেশ দুপুরের খাওয়া হয়। হোটেলের ওয়েটারদের এদেশে "হের্ ওবের" Herr Ober বলিয়া ডাকিতে হয়, "ওবের" কথাটির পুরা রূপ হইতেছে "ওবের-কেল্‌নের" Ober-Kellner অর্থাৎ সর্দ্দার-ওয়েটার, সব মিস্ত্রীই যেমন "রাজ"মিস্ত্রি তেমনি সব ওয়েটারই "হের ওবের"। অটোম্যাটিক রেস্তরাঁগুলিতে দাম একটু শস্তা কারণ ওয়েটারের সেবা-নিরপেক্ষ হইয়া এখানে খাওয়া যায় এবং টেবিল চেয়ার প্রভৃতিরও সজ্জা কম। কাঁচের কেসে ছোট ছোট পাত্রে থাপে থাপে আহার্য্য বসান থাকে, কেসের গায়ের ছিদ্রে পয়সা ফেলিলেই যন্ত্রযুক্ত থালায় বসান একটি পাত্র হাতের কাছে ঘুরিয়া আসে, বাহির করিয়া লইয়া পাশের টেবিলে দাঁড়াইয়া খাইলেই হইল। মধ্যে মধ্যে লোক আসিয়া ব্যবহৃত পাত্রগুলি সরাইয়া লইয়া গিয়া ভিতর হইতে আবার আহার্য্য দিয়া যন্ত্রে ভরিয়া দেয়। গরম মাংস সুপ প্রভৃতি কাউণ্টারে চাহিয়া লইতে হয়, পাশেই বিভিন্ন বাক্সে ছুরি কাঁটা চামচ ও মুখ মুছিবার জন্য পাতলা কাগজের রুমাল সাজান থাকে, প্রয়োজন মত তুলিয়া লইয়া চাদরহীন টেবিলে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া খাইতে হয়। জার্ম্মানীতে আউটোমাট 'Auotomat'এর বড়ই প্রচলন। টেলিফোনের নম্বর নিজ হাতে চাকৃতি ঘুরাইয়া সংযোগ করিতে হয়, সব প্রকাশ্য স্থানে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে টেলিফোনের কামরা থাকে। ডাকঘরে টিকিট ও কার্ড, ষ্টেশনে রেলের টিকিট খবরের কাগজ ও চকোলেট এবং রেস্তরাঁতে দেশলাই সবই ছিদ্রে পয়সা ফেলিয়া হাণ্ডেল ঘুরাইলেই মিলে। ফ্ল্যাটওয়ালা বড় বড় বাড়ীতে লিফ্‌টে নামা ওঠাও নিজেই বোতাম টিপিয়া করিতে হয়।

১লা নবেম্বর ইউনিভারসিটি খুলিল। ছাত্রছাত্রীরা সারি করিয়া ভর্ত্তির নাম লিখাইল। ভর্ত্তির সময় এখানে প্রত্যেক ছাত্র তিনটি জিনিষ পায়, একটি ছাত্রের নাম নম্বর ঠিকানা স্বাক্ষর ও ফটোসংযুক্ত পরিচয়-পত্র, এটি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে হয় ও বহু প্রয়োজনে দেখাইতে হয়; দ্বিতীয়টি হাজিরা-বই, এটিতে বিভিন্ন কলমে 'কোন্' অধ্যাপকের কাছে কি বিষয়ের ক্লাসে যোগ দিই, সেজন্য কত ফি দিয়াছি এবং অধ্যাপকের স্বাক্ষর ও মন্তব্য লিখাইতে হয়; তৃতীয়টি রোগবীমার ডাক্তারের বই, প্রত্যেক ছাত্রকে ইউনিভার্সিটির "ক্রাংকেন্ কাস্‌সে" Kran-Ken Kasse বা রোগবীমার সভ্য হইতে হয় এবং ফলে বিনা ফিতে ডাক্তার দেখান ও বিনা দামে ঔষধ মিলে। এখানে ইউনিভার্সিটির বৎসর দুই "সেমেষ্টের" Semester বা টার্মে বিভক্ত; ১লা নবেম্বর হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই চার মাস শীতের সেমেষ্টের, মার্চ্চ এপ্রিল দুমাস ছুটি; আবার ১লা মে হইতে ৩১শে জুলাই এই তিন মাস গ্রীষ্মের সেমেষ্টের, আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর ছুটি। প্রতি বৎসর নূতন রেকটার নিযুক্ত হন, নবেম্বরে ক্লাস আরম্ভ হইবার আগে নূতন রেকটার নূতন ছাত্রদের অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা দেন, বক্তৃতার পর প্রত্যেক ছাত্রকে মঞ্চে উঠিয়া নিজ নাম ও কোন ফ্যাকাল্‌টির অধীনে পড়িতেছি বলিয়া রেকটারের সঙ্গে হস্তমর্দ্দন করিতে হয়। এখানে নাগরিক জীবনের সঙ্গে ইউনিভারসিটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, নূতন রেকটারকে নগরমুখ্যদের সামনেও দাঁড়াইতে হয়; এজন্য প্রকাশ্য স্থানে সভা হয়, ব্যাণ্ডবাদ্যের মধ্যে বিচিত্র গাউন পরিহিত অধ্যাপকরা মঞ্চে আরোহণ করেন, পুরাতন রেকটার বাৎসরিক কাজ সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের পর নিজের গলার সোনার রেকটার-হার নূতন রেকটারের গলায় পরাইয়া দেন ও নূতন রেকটার বক্তৃতা করেন। বিদেশী ছাত্রদের

গুপ্ত-দম্পতি।

অভ্যর্থনার জন্য রেকটার একদিন ডিনার ও নাচ দেন, প্রত্যেক দেশের যখন নাম ডাকা হয়, তখন সেই দেশের ছাত্র ও উপস্থিত অভ্যাগতদের দাঁড়াইয়া "বাউ" করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়ে। ইউনিভারসিটির কাছেই "ষ্টুডেন্‌টেন্ হাউস" Studentenhaus, এখানে খবরের কাগজ, পত্রিকা প্রভৃতি পড়া যায়, বসিয়া গল্প করারও জায়গা আছে এবং অপেক্ষাকৃত শস্তায় খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে, বহু ছাত্র রোজ এখানে খায়। ইউনিভারসিটির মধ্যেও একটি ছোট রেস্তরাঁ ও একটি ষ্টেশনারী দোকান আছে। সবই অবশ্য ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত। লেকচার ও ক্লাস প্রভৃতি এখানে কলিকাতার কলেজেরই মত, তফাৎ এই যে ক্লাসে যাওয়া না যাওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। "আকাডেমিশে ফ্রাইহাইট্" Akademische Freiheit বা সারস্বত-স্বাধীনতা জার্ম্মানীর ইউনিভারসিটি জীবনের বিশেষত্ব ও

গৌরবের জিনিষ। ছাত্রেরা সব সেমেষ্টের এক ইউনিভারসিটিতে না পড়িয়া বিভিন্ন ইউনিভারসিটিতে পড়িতে পারে, ক্লাসে যাওয়া না যাওয়া পড়াশুনা করা না করা সম্পূর্ণ ছাত্রদের নিজেদের দায়িত্ব। অধ্যাপকরা এখানে ক্লাসে আসিয়া "হিটলার স্যালুট" দেন, অধ্যাপক ক্লাসে আসিলে ছাত্রদের উঠিয়া দাঁড়ান এদেশে রীতি নয়; সাধারণতঃ প্রত্যেক ক্লাস এক ঘণ্টা করিয়া হয়, তবে প্রবীণ অধ্যাপকদের ১৫ মিনিট দেরী করিয়া ক্লাসে আসিবার প্রথা, নবীন অধ্যাপকেরা ঠিক সময়ে আসেন কিন্তু এক ঘণ্টার আগেই লেকচার শেষ করিতে পারেন। জার্ম্মাণীতে বহু ইউনিভারসিটি, বার্লিন হাম্বুর্গ মিউনিকের মত প্রকাণ্ড, আবার বোন্ Bonn মারবুর্গ Murburg প্রভৃতির মত ছোট সব রকম ইউনিভারসিটিই আছে। সাধারণ ইউনিভারসিটিতে যেসব বিষয়ের অধ্যাপনা হয়, তাছাড়া হাম্বুর্গ জার্ম্মাণীর সঙ্গে বহির্জ্জগতের যোগাযোগের দ্বারস্বরূপ বলিয়া এখানে চীন জাপান ভারত পারস্য আরব প্রভৃতি দেশের ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইণ্ডোলোগী Indologie অর্থাৎ ভারত-তত্ত্বের আলোচনার জন্য জার্ম্মানী প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ের চর্চ্চা জার্ম্মানীতে আরম্ভ হইয়া এখন সব দেশের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছে। এবং অন্য অনেক বিষয়ের মত ভারততত্ত্ব সম্বন্ধেও জার্ম্মান পণ্ডিতদের কাজই অন্যদেশীয় পণ্ডিতদের প্রধান অবলম্বন।

হামবুর্গের ভারতীয় বিভাগের নাম "সেমিনার ফ্যুর কুলটুর উণ্ট গেশিখ্‌টে ইণ্ডিয়েন্‌স্" Seminar fur kultur und Geschichte Indiens অর্থাৎ ভারতীয় কালচার ও ইতিহাসের সেমিনার, অধ্যাপক ষ্টেন্ কোনো Sten Konow ইহার প্রতিষ্ঠাতা, ইনি ১৯২৫-২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলেন। এখন এ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক শূব্রিং Schubring; ইনি অধ্যাপক লয়মানের Leumann ছাত্র। লয়মান জৈনসাহিত্যে মহাপণ্ডিত ছিলেন, শূব্রিংও জৈনসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও এ সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশ করিয়াছেন, ইনি ১৯২৮ সালে ভারতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এদেশে বিশেষজ্ঞ না হইলে পণ্ডিতরা অধ্যাপকের আসন পান না, এবং ছাত্রেরা যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চায় সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক যেখানে আছেন সেখানে পড়িতে যায়। এখানকার ভারতীয় বিভাগে ডাঃ জাহাঙ্গীর তবড়ীয়া নামে একজন পার্সী ভদ্রলোক লেকচারার আছেন, হিন্দি গুজরাটি প্রভৃতি পড়ান। সেইরেন্ মাৎসুনামি নামে একটি জাপানী ভদ্রলোক টোকিও ইউনি-ভার্সিটির পড়া শেষ করিয়া গত তিন বৎসর এখানে ভারততত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। জনকয়েক জার্ম্মান ছাত্রছাত্রী সংস্কৃত পড়েন। একজন জার্ম্মান এখানকার ভারতীয় বিভাগের উপাধি লাভ করিয়া এখন ভারতে শিক্ষকের কাজ করিতেছেন, তাঁর বাগ্‌দত্তা ভাবীপত্নী এখানে ঋগবেদ পড়িতেছেন। হিন্দি গুজরাটি যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে একজন সহরের ব্যবসায়ী। এখানে পুরা ছাত্র ছাড়া বাহিরের লোকেও ফি দিয়া বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাসে যোগ দেয়, অধ্যাপকদের মধ্যেও কেহ কেহ অপর বিষয়ের ক্লাসে বসিয়া লেকচার শুনেন, নোট লেখেন। ভারতীয় বিভাগে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, ভারত সম্বন্ধে জার্ম্মান বই এত আছে যে তাহার মধ্যে অনেকের খবরই আমরা দেশে রাখি না, তাছাড়া ভারতে প্রকাশিত অনেক বই তো আছেই।

এখানে ইউনিভার্সিটির এক স্থানে একটা গোটা লাইব্রেরী নাই। ছাত্রেরা অবশ্য সহরের বিরাট লাইব্রেরী হইতে ইচ্ছামত বই আনাইয়া লইতে পারে। ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে তাহার সেমিনার থাকে, সব সেমিনার এক জায়গায় নয়, কারণ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন বাড়ীতে। এই সেমিনারগুলিতে সেই সেই বিষয়ের লাইব্রেরী সংযুক্ত থাকে ও ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সব ব্যবস্থা থাকে, এমন কি টেবিলের উপর সিগারেটের অ্যাশ্‌ট্রে পর্য্যন্ত। হাতে টানিয়া বা মইএ উঠিয়া খোলা আলমারি হইতে ইচ্ছামত বই নামাইয়া লইয়া বেলা ৯টা হইতে রাত ৯টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা যাইতে পারে। বই সম্বন্ধে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হইলে অধ্যাপকের সেক্রেটারি (এই মহিলাকে সেমিনার লাইব্রেরিয়ানের কাজও করিতে হয়) সদা সাহায্যদানে প্রস্তুত, আরও বেশী সাহায্য প্রয়োজন হইলে প্রোফেসার স্বয়ং আসিয়া সহায়তা করেন। এই সেমিনারগুলিই জার্ম্মান ইউনিভার্সিটি-জীবনের হৃদ্‌পিণ্ড। এখানে ছাত্র অধ্যাপকে সংযোগ হয়, বিচারমূলক গবেষণা-প্রণালীর শিক্ষা হয়, এবং অধ্যাপকের চোখের নীচে হাতের কাছে দাঁড়াইয়া ছাত্র নিজের কাজে সানন্দে দিনের পর দিন অগ্রসর হয়। ফাঁকি দিবার ইচ্ছা হইলে, ক্লাসে বা সেমিনারে না গেলে সীমা বা শাসন কেহই করিবে না—এদেশে সব ব্যাপারে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলে কেহই নিষেধ করে না, কিন্তু কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রোফেসারেরা যত ভাবে যত রকমে সম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত, ছাত্রের কাজের জন্য যত রকম সুবিধার প্রয়োজন সবেরই ব্যবস্থা করা হয়। এদেশে প্রোফেসাররা কৃতী ছাত্রকে মনে মনে পুত্রবৎ স্নেহ করেন কিন্তু বাহিরের ব্যবহার ঠিক যেন সমানে সমানে, ছাত্র যেন তাঁর সহকর্ম্মী সমকর্ম্মী, সময় সময় ছাত্রের প্রতি প্রোফেসারের স্নেহ, আগ্রহ, সম্ভ্রম এমনই আকার নেয় যে, মনে হয় ছাত্রই যেন বড়, অধ্যাপকের নিজের পরিপক্ক জ্ঞান যেন শুধু ছাত্র যাহাতে বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারে সেজন্যই, ছাত্রকে গৌরব লাভ করাইবার জন্যই; হায়! এই "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ" ভাব কি আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর

মধ্যে আর তেমন দেখিতে পাওয়া যায়? প্রোফেসারদের বিদ্বানসুলভ বিনয় এদেশে দেখিবার মত, ক্লাসে সেমিনারে বন্ধুবৎ ব্যবহার তো আছেই তাছাড়া রাস্তায় পরিচিত প্রোফেসারদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে নিজে টুপি স্পর্শ করিবার আগেই দেখি অধ্যাপক টুপি খুলিয়া "গুটেন্ মোর্গেন্" Guten Morgen বলিয়া ফেলিয়াছেন। অধ্যাপকদের এই ভদ্রতার প্রতিদানে ছাত্রদের দিক হইতে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না, অথচ সে সম্ভ্রমের মধ্যে জুজুভীতি বা বাড়াবাড়ি নাই। ষ্টুডেন্‌টেন হাউসের লাউঞ্জ-ঘরে ইউনিভার্সিটির রেকটার হয়ত অন্য দুই একজন প্রোফেসারের সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, ছাত্রেরা তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া উঠে না, যে যেখানে বসিয়া আছে সেখানেই থাকে, মুখের সিগারেট বা সঙ্গের বান্ধবী বা হাতের খবরের কাগজ যেমন ছিল তেমনিই থাকে, কিন্তু রেকটার বা প্রোফেসাররা কাহাকেও কিছু কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া "হের রেকটোর" বা "হের প্রোফেসোর"কে ছাত্রেরা যথোচিত সম্ভ্রম দেখায়। ভয়বিহীন সম্মানপ্রদর্শন আমাদের দেশে এতটা সুলভ নয়, যাহাকে সম্মান দেখান উচিত সে যদি একটু ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে তবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানের ভাবটা কমিয়া যায়; বিলাত হইতে সদ্য আগত আমাদের দেশের কলেজের সাহেব প্রোফেসারদের ও বিলাত-ফেরৎ দেশীয় প্রোফেসারদের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, সবিনয় ও বন্ধুবৎ ব্যবহার করিলে আমাদের ছেলেরা "অ্যাডভানটেজ" নেয় ও ঘাড়ে হাত দিয়া ও তাহার পর মাথায় চাঁটি মারিয়া ইয়ার্কি দিবার চেষ্টা করে।

এদেশে ছাত্রদের কাজের সুবিধার জন্য প্রোফেসার বা ইউনিভার্সিটি যত রকম সাহায্য করেন তাহা দেখিয়া দেশের একটি ঘটনা মনে পড়িল। আমার একটি বন্ধু খুব ভাল ভাবে এম-এ পাশ করিবার পর খ্যাতনামা গুরুর কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করিয়া নিজ বিষয়ের একটি বিশিষ্ট বিভাগ সংশ্লিষ্ট কাজের প্রক্রিয়া হাতে-কলমে শিখিবার জন্য মিউজিয়মের সেই বিভাগের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। বিভাগীয় বড় বাবু আবেদনকারীর পরিচয় ও উদ্দেশ্য সব শুনিয়া সহকারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও মশায়, এই দেখুন কুক্কুটপাদ মিশ্র এসেছেন। 'পঞ্চদিবসানি গুরুগৃহে' অধ্যয়ন করে এই দেখুন ইনি এসেছেন এখানে অমুক জিনিস শিখতে। আর সঙ্গে হাতিয়ার এনেছেন দুখানি হাত আর দুখানি পা।"

হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির জার্ম্মান সাহিত্য ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক প্রোফেসার মায়ার-বেনফাই Meyer Benfey ও তাঁহার বিদুষী স্ত্রী রবীন্দ্রনাথের অনেক বই জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ ও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক লেখা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের নামে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছিল, দেখা করিবার জন্য চিঠি লিখিলে প্রোফেসার-পত্নী উত্তর দিলেন যে, অমুক দিন অতটার সময় আমার বাসার কাছের ষ্টেশন হইতে "সহর-রেলে" যেন আসি, আমার বাসা হইতে ছয় ষ্টেশন দূরে তাঁহাদের বাড়ী, প্রোফেসার তাঁহাদের বাড়ীর ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আমি মোটামুটি সময় হিসাব করিয়া ষ্টেশনে গিয়া প্রথম যে গাড়ী পাইলাম তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম, তখন নূতন আসিয়াছি, জানিতাম না যে, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর "সহর-রেলের" গাড়ী পাওয়া যায়। যথাস্থানে পৌছিয়া দেখিলাম, কোন বুড়ো-প্রোফেসার রকমের লোক এই কৃষ্ণমূর্ত্তিকে সম্ভাষণ করিল না, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, ভাবিলাম অধ্যাপক হয়ত আসিয়া উঠিতে

ডক্টর দাশগুপ্ত।
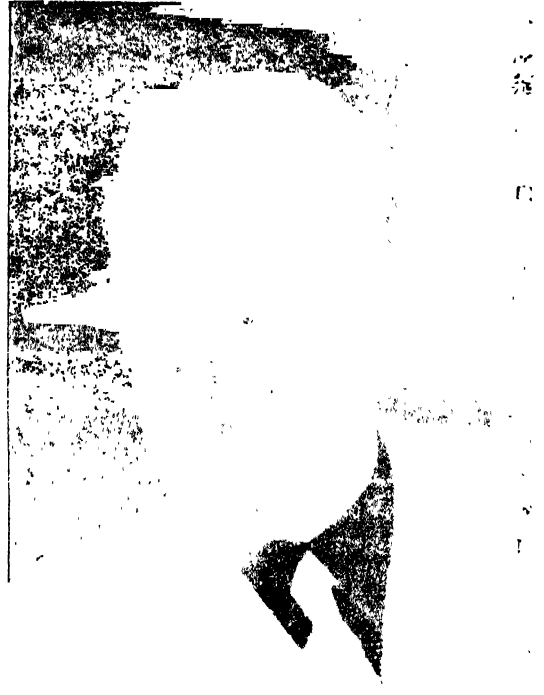
পারেন নাই, ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া লোককে ঠিকানা দেখাইয়া অনেক ঘুরিয়া প্রোফেসারের বাড়ী আসিলাম। দরজার ঘণ্টা টিপিয়া উত্তর পাইলাম না, খানিক দাঁড়াইয়া বাগানে ঘোরাফেরা করিয়া ভাবিলাম, আমি হয়ত সময়ের আগে আসিয়াছি, ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলে হয়ত প্রোফেসারের দেখা পাইব, এই মনে করিয়া বাগান পার হইতে গিয়া দেখিলাম, এক ভদ্রলোক ভিজিতে ভিজিতে বাগানে ঢুকিলেন এবং আমাকে বৈকালিক অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সামনে দেখিয়া হতভম্বের মত বলিয়া উঠিলেন, "মিষ্টার সেন!"

যা হোক, পরিচয় সম্ভাষণাদির পর জানিলাম, আমি দশ মিনিট আগের গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, প্রোফেসার ঠিক গাড়ী ও তাহার পর আরও দুখানা গাড়ী দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন। অধ্যাপক-পত্নী অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "ওঁকে আমি কোন কাজে সেইজন্য পাঠাই না, জানি যে উনি কিছু না কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয় বাধাইয়া বসিবেন।" আমি ভাবিলাম, "খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু," দোষ সম্পূর্ণই আমার, বহুবার বলা সত্ত্বেও স্বামীর অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে অধ্যাপক-পত্নীর স্থির সিদ্ধান্ত শিথিল হইল না।

প্রোফেসার মায়ার-বেনফাই ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিংগেন-ইউনিভার্সিটিতে পণ্ডিত কীলহোর্ণ Kielhorn এর কাছে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। কীলহোর্ণ বহুদিন ভারতে বাস করিয়া কাশীর পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে সংস্কৃত চর্চ্চা করেন, কিন্তু কীলহোর্ণ ভারতীয় পণ্ডিতদের পরম্পরাগত (traditional) ব্যাখ্যায় বেশী বিশ্বাসী ছিলেন, এ ধারা কিন্তু এ যুগের পণ্ডিতরা আর মানেন না। জার্ম্মান ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে কীলহোর্ণ-এর মত ভারতীয় পরম্পরার জ্ঞান আর কাহারও ছিল না, এজন্য, বিশেষতঃ "মহাভাষ্য" সম্বন্ধে তাঁহার কাজের জন্য এদেশে কীলহোর্ণের একটি বিশিষ্ট খ্যাতি আছে। গ্যোটিংগেনে প্রোফেসার মায়ার-বেনফাই-এর সতীর্থদের মধ্যে এখনকার বার্লিন-ইউনিভার্সিটির প্রথিতযশা সংস্কৃতাধ্যাপক লুডার্স Luders একজন ছিলেন। লুডার্স ১৯২৮ সালে ভারতে বেড়াইয়া আসিয়াছেন। মায়ার-বেনফাই-পত্নী (অধ্যাপকদের স্ত্রীরা এদেশে "ফ্রাউ প্রোফেসোর" নামে অভিহিতা হন) বইএর বাংলা বেশ বুঝিতে পারেন এবং স্বামীর সংস্কৃতজ্ঞান ও সুবল-মিত্রের ডিক্‌শনারীর সাহায্যে বাংলা বেশ পড়িতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বই প্রধানতঃ ইংরেজী হইতেই ইঁহারা অনুবাদ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য অনেক ইউরোপীয় ভাষার বিখ্যাত বইও ফ্রাউ প্রোফেসোর জার্ম্মানে অনুবাদ করিয়াছেন এবং কবিতা লেখাতেও ইঁহার সুনাম আছে। ইঁহারা রবীন্দ্রনাথকে যে কতদূর শ্রদ্ধা করেন তাহা বলা যায় না। ইঁহারা ও ইঁহাদের দলের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা রবীন্দ্রনাথেই সাহিত্য ও কাব্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন, "গীতাঞ্জলি"র চেয়ে বড় 'মেসেজ' ইঁহাদের কাছে আর কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ হামবুর্গে আসিয়া ইঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন, সেজন্য ইঁহারা নিজেদের কৃতার্থ ও বাড়ীটিকে ধন্য জ্ঞান করেন। ভারততত্ত্ববিদ জার্ম্মান পণ্ডিতদের মধ্যে ভীষ্মতুল্য অশীতি-বর্ষীয় ইয়াকোবির Jacobi রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কিনা আমি একথা জিজ্ঞাসা করায় অধ্যাপকপত্নী আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এই ঘরে বসিয়া ইয়াকোবি বহুক্ষণ কবির সঙ্গে কথা বলিয়া গিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের বাংলা আবৃত্তি এখানে যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন যে, সে রূাটমুসের Rhythmus ঝঙ্কার এখনও তাঁহাদের কানে বাজিতেছে, তাঁহার চেহারার রাজভাবের কথা অধ্যাপক শূব্রিং প্রায়ই লোকের কাছে উল্লেখ করেন।

প্রোফেসার মায়ার-বেনফাইদের একদিন বলিলাম, তাঁহারা যদি রবীন্দ্রনাথের আরও অনুবাদ করেন তো মন্দ হয় না, আমিও হয় ত যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিব। তাঁহারা এ প্রস্তাবে সোৎসাহে সম্মত হইলেন, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁহাদের সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ থাকে ও পরে অনুবাদের কাজ চলে। "নষ্টনীড়" ও "দুইবোন" অনুবাদ শেষ হইয়াছে, "কথা ও কাহিনী" ও "বিচিত্রিতা"র কিছু কবিতা চলিতেছে; গীতাঞ্জলির জার্ম্মান অনুবাদ ইংরেজী হইতে হইয়াছিল অন্য লোকের দ্বারা, অধ্যাপক-পত্নী প্রস্তাব করিয়াছেন সমস্তটা তাঁহারা আবার মূল বাংলা হইতে জার্ম্মানে নূতন করিয়া অনুবাদ করিবেন। এটি লক্ষ্য করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইঁহারা যে জার্ম্মান অনুবাদগুলি করিয়াছেন তাহা ইংরেজী অনুবাদের চেয়ে ঢের বেশি সজীব বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয় ইউরোপের পাঠক-পাবলিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের vogue কাটিয়া গিয়াছে, পাবলিশাররা মোট মোটা লাভের আশা নাই বলিয়া সহজে তাঁহার লেখা ছাপাইতে রাজি হয় না।

সান্ধ্যভোজনের বহু উপকরণ থাকিলেও অধ্যাপকপত্নী আমার জন্য ভাত-ঘটিত একটা ডিসের সর্ব্বদা আয়োজন করেন। একদিন বলিলেন, শীত আসিতেছে, আমি ঘরে মধ্যে মধ্যে চা বানাইয়া খাইলে ঠাণ্ডা কম লাগিবে, এবং এজন্য আমাকে কিছু জিনিষপত্র দিবেন; পরসপ্তাহে গিয়া দেখিলাম যে, ষ্টোভ হইতে আরম্ভ করিয়া এত বাসনপত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে একটা ছোট বাঙ্গালী পরিবারের সসমারোহে চা ও তাৎসঙ্গিক খাওয়া চলে, সজ্জিত জিনিষের এক চতুর্থাংশ আমি বাক্স ভরিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম আর অধ্যাপক-পত্নীকে বলিলাম, বাকি জিনিষগুলি যদি আমাকে লইতে হয় তবে আমার সুবৃহৎ সংসারের খবরদারির জন্য তাঁহাকে আমার জন্য একটি স্ত্রীও সরবরাহ করিতে হইবে। অধ্যাপক-পত্নী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বলো তো তারও ব্যবস্থা করি!" অধ্যাপকদম্পতির পরম্পরানুগতা বন্ধুসমাজে সুবিজ্ঞাত, একদিন খাওয়ার মাঝ-খানে পত্নী কি কাজে রান্নাঘরে গিয়াছেন,সেদিন মুর্গি ও অ্যাস্‌পারাগাসের ডাঁটা দিয়া আমার জন্য মাখমপক্ক ভাতের ডিশ ছিল এবং সেটা সকলেই তারিফ করিয়া খাইতেছিলাম; অধ্যাপকের পাত খালি দেখিয়া তিনি আর একটু ভাত নেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় অধ্যাপক খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "দেখি আমার স্ত্রী কি করেন;" পত্নী রান্নাঘর হইতে টেবিলে ফিরিলে তাঁহাকে আরও ভাত লওয়াইলাম কাজেই স্বামীও

লইলেন; তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বামীর মহাসমস্যার কথা পত্নীকে জানাইলাম, সকলেই খুব হাসিলেন, পত্নী অনুযোগ করিলেন, "ভাল ক'রিয়া না খাওয়ার জন্ত আজই দুপুরে ওঁকে বকিয়াছি।" অধ্যাপক একটু লাজুক প্রকৃতির, তাঁহার যে ফটোটি দিলাম তাহার একটু ইতিহাস আছে—রবীন্দ্রনাথ এখানে যখন ছিলেন তখন হামবুর্গের প্রধান ফটোগ্রাফার কোম্পানী তাঁহার ছবি তুলিতে আসেন; ফটো তুলিতে দিতে কবির ঔদার্য্য অসাধারণ, সকলেই জানেন, কিন্তু এক্ষেত্রে পরিহাসরসিক কবি বলিলেন, তাঁহার একটা সর্ত্ত আছে; সর্ত্তের কথা শুনিয়া সকলে একটু ভড়্কাইয়া গেলেন. কবি তখন বলিলেন, অধ্যাপককেও ঐ কোম্পানীর দ্বারা ছবি তোলাইতে হইবে, নচেৎ তিনি নিজের ছবি নিতে দিবেন না। এ কথায় কোম্পানী জোর করিয়া অধ্যাপকেরও ছবি লইয়াছিলেন। কবির প্ররোচনায় উঠিয়াছিল বলিয়া এই ছবিখানিকে অধ্যাপকদম্পতী বিশেষ গৌরবের জিনিষ বলিয়া মনে করেন। এক-সময় কথা হইয়াছিল, অধ্যাপক হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির কাজ ছাড়িয়া নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরীসহ সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গিয়া বিশ্বভারতীর কাজে জীবন কাটাইবেন, ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠে নাই।

ডিসেম্বরে অসহ্য শীত পড়িল। সমস্ত শরীর জমাট হইয়া যাইতেছে, রাস্তায় বাহির হইলে মনে হয়, কানের উপর ছুরি চলিতেছে। প্রথম দিন হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের মত বরফে ওভারকোট ঢাকিয়া গেল, ক্রমে বরফের মাত্রা বাড়িল, পেঁজা তুলার মত হালকা বরফ ফিস্ ফিস্ করিয়া পড়িয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, বাড়ীঘর গাছপালা রাস্তাঘাট সাদায় সাদা হইয়া গেল, সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা! মনে হয় যেন কে এক আর্টিষ্ট রাশীকৃত পুঞ্জীভূত শ্বেতমহিমার উজ্জল সমারোহে "দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ হ্রস্বো দীর্ঘো লঘুর্গুরুঃ" সকলকে একাকার করিয়া চূর্ণমুষ্টির বর্ষণ-বিলেপনআচ্ছাদনের দ্বারা ধরিত্রীর সনাতন আকৃতির উপর একটা ভূকৈলাসরূপসৃষ্টির গম্ভীর লীলায় লাগিয়া আছে। সব চেয়ে শোভা হয় গাছগুলির—শীতে সব পাতা ঝরিয়া পড়িয়া নেড়া হইয়া বিশীর্ণ প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিত যাহারা তাহারা যেন হঠাৎ কোন মায়াবীর লঘু হস্তস্পর্শে রজতহীরক মণিমাণিক্যের বিচিত্র আভরণে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নন্দনের স্বপ্নরাজ্যের ধ্বজাপতাকা উড়াইয়া দেবসভার কল্পশোভা ধারণ করিয়া মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে। বেলা দশটার সময় সূর্য্যবিম্ব কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণপ্রকাশিত হইয়া চক্রবালসীমার সামান্য অংশ পরিভ্রমণ করিয়া বেলা তিনটার মধ্যেই একেবারে লুপ্তজ্যোতি হইয়া পড়েন, তারপর বৈকালসন্ধ্যার তরল অন্ধকার যখন বরফে প্রতিফলিত হইয়া উষালোকের অনুকারী হয় তখন রাস্তার বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মনে হয়, জ্যোৎস্নারাত্রে চুনার-বিন্ধ্যাচলের গঙ্গাসৈকতে বালি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। পথের লোক ও গাড়ীমোটরের চলাচলের জন্ত. বরফ ক্রমাগত সরাইয়া রাস্তার পাশে গাদা করিয়া রাখা হইতেছে; ছেলেরা পথে বাগানে বরফের তাল পাকাইয়া ছুঁড়াছুঁড়ি করিতেছে, "বরফের মানুষ" বানাইয়া খেলা করিতেছে। ক্রমে টেম্পারেচার শূন্যডিগ্রির আরও নীচে নামিয়া গেল, রাত্রে যে বরফ বালির নরম কাদার মত পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি

প্রোফেসার মায়ার-বেনফাই।

সকালে তাহা জমিয়া কাঁচের মত শক্ত ও পিছল হইয়া আছে। জানা ছিল না বলিয়া সকালে দরজা খুলিয়া বাড়ির বাহির হইবামাত্র প্রকাণ্ড আছাড় খাইয়া খানিকটা সরসর্ করিয়া ঘষ্টাইয়া গেলাম, কোনমতে গলি পার হইয়া রাস্তায় উঠিয়া দেখিলাম, ফুটপাতে কাঠের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঠেঘাটে ছেলেরা স্কেট ও স্লেজ লইয়া দস্তুবেগ পদার্থের চিরন্তন বেগশীলতা সপ্রমাণ করিতেছে, আল্‌ষ্টার লেকের উপর লোকে সাইকল্ করিতেছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়া দুতিন ঘণ্টা সূর্য্যের আলো থাকিলেও বরফ একটুও নরম হয় না, পৃথিবীর তাপ এত কম; রৌদ্রে আলোই আছে তাপ একটুও নাই। ক্রমে তাপ বাড়িয়া বরফ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন বড় বিশ্রী দেখিতে হয়, বরফে জলে কাঠের গুঁড়ায় কাদাতে মিশিয়া প্যাচ প্যাচ করে, ফুটপাতের বরফ-

কাদা সরাইয়া এ সময়ে পাথুরে কয়লার গুঁড়া ও ছাই ছড়ান হয়, পরে এগুলিকে আবার চাঁচিয়া ফেলিয়া ফুটপাত বাড়ীর মেঝের মত তকতকে ঝকঝকে রাখা হয়। ঘরের মধ্যে এদেশে শীতের কষ্ট নাই, সর্ব্বত্র সেণ্ট্রাল হীটিংএর ব্যবস্থা আছে।

গণিতের অধ্যাপক ব্লাশ্‌কে Blaschke ১৯৩২ সালে কলিকাতায় গিয়াছিলেন ও ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। খুব অল্প বয়সেই বিদ্যাবত্তার সুনামে ইনি প্রোফেসারি পাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শ্যামদাসবাবু ইঁহার সঙ্গে কাজ করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। প্রোফেসার ব্লাশ্‌কে এখানকার রোটারি ক্লাবেরও প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণের পর রোটারি ক্লাবে ভারত সম্বন্ধে কিছু বলিবার অনুরোধ করিলেন। এখানকার "ফিরপো" Vierjahres-zeiten "ফীরইয়ারেস্‌ট্‌সাইটেন্ বা চারি ঋতু" নামক হোটেলে রোটারির বৈঠক হয়। "প্রেসিডেণ্টের গেষ্ট" বলিয়া খুব খাতির পাইলাম, ভারতের শিক্ষা, সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে দ্রুত প্রগতির সম্বন্ধে কিছু বলিলাম, রোটারিয়ানদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বলিয়া জানাইলাম যে, বাংলাদেশে এখন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবকরা ব্যবসায়ে ঢুকিতেছে, আর যাদের অতিথি তাদের একটু খুশী করিবার জন্য বলিলাম,আমাদের দেশ সম্বন্ধে জার্ম্মান প্রোফেসরেরা যত কাজ করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই—বলিলাম, ভারতে জার্ম্মান প্রোফেসারদের খুব খাতির এবং জার্ম্মান মালেরও খুব কাট্‌তি,আমরা বলি জাপানি জিনিষ শস্তা কিন্তু খারাপ, বিলিতি জিনিষ ভাল কিন্তু আক্রা, আর জার্ম্মান জিনিষ ভাল ও শস্তাও—খুব হাততালি পড়িল। রোটারিতে আলাপ হইল এখানকার তথা পশ্চিম জার্ম্মানির সব চেয়ে বড় দৈনিক "হামবুর্গের ফ্রেমডেনব্লাট" Hamburger Fremdenblatt-এর সম্পাদকের সঙ্গে। তাঁহার কাগজের আফিস ও ছাপাখানা দেখিতে চাহিলাম, কয়েকদিন পরেই কাগজের ফরেন-এডিটার দিনক্ষণ ঠিক করিয়া টেলিফোন করিলেন ও ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বিরাট কারখানা, ছাপিবার ছবি তুলিবার বহু রকমের যন্ত্র ও প্রক্রিয়া সযত্নে ঘুরিয়া দেখাইলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য দেখিলাম, বেতার ফটো তুলিবার যন্ত্র, নিউইয়র্কের রাস্তায় গাড়ী উল্টাইয়া গেলে সেখানকার রিপোর্টার স্ন্যাপ তুলিয়া তাহা এই যন্ত্রযোগে এখানে পাঠাইয়া দশ মিনিটের মধ্যে সে ছবি হামবুর্গের কাগজে বাহির করিতে পারে। ধন্য বিজ্ঞানের কৌশল! জার্ম্মানীতে দৈনিক, সাপ্তাহিক অসংখ্য, কাজেই কোন কাগজেরই কাট্‌তি অসম্ভব রকম বেশী নয়। দৈনিক কাগজগুলার ছাপা কাগজের মানটাও খুব উঁচু নয়, দেখিতে চেহারা একটু খেলো রকমের, আমাদের দেশের কাগজের মত। নাট্‌সি গবর্ণমেণ্টের অঙ্গুলিহেলনে প্রত্যেক লাইনটি লিখিতে হয় বলিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, বহু কাগজ বন্ধও হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে শুধু পাঠকেরা নয় কাগজওয়ালারা নিজেরাই স্বীকার করেন, খবরের কাগজের রাজা হইতেছে লণ্ডনের "টাইম্‌স্"। আমরা ইংরেজকে খাটো করিতে পারিলে পুরুষার্থ জ্ঞান করি কিন্তু ইউরোপে সর্ব্বত্র দেখিতেছি ইংরেজদের সব বিষয়ে কি প্রকাণ্ড প্রেস্‌টীজ। কলিকাতার "ষ্টেটস্‌ম্যান"কে আমরা বয়কট করিয়া পুড়াইয়া জব্দ করিবার কত চেষ্টা করিলাম, পাশাপাশি রাখিয়া এখন দেখিতেছি, ছাপায় কাগজে সংবাদ সন্নিবেশ-কৌশলে গাম্ভীর্য্যে ভাষায় মর্য্যাদাজ্ঞানে ষ্টেটস্‌ম্যান 'টাইমসে'র গা ঘেঁষিয়া যায়, সময় সময় বুঝিতে কষ্ট হয় যে, একখানি লণ্ডনে আর একখানি ভারতে ছাপা হয়। "ফ্রেমডেন্‌ব্লাটে"র এঞ্জিনিয়ারও বলিলেন, ষ্টেটস্‌ম্যানের ছাপাখানা উল্লেখ করিবার মত, অথচ আমাদের একখানা কাগজ ষ্টেটস্‌ম্যানের মাইলখানেকের মধ্যে আসিবার মত হইল না, মুক্তকচ্ছ টিকিধারী মাদ্রাজীদের "হিন্দু"ও বা যাহা পারিল বাঙ্গালীর দ্বারা তাহাও হইল না, পরস্পর মারামারি খাওয়াখাওয়ি করিয়াই আমাদের সব শক্তি ব্যয় হইয়া গেল।

সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভাল্‌টের Walther-এর বাড়ীতে পক্ষান্তে একদিন সান্ধ্যভোজনের পর আলোচনাচক্রে নিমন্ত্রণ থাকে। প্রোফেসার ভাল্‌টের ভারতে যান নাই বটে তবু ভারত সম্বন্ধে বহু খবর রাখেন। ভাল্‌টের একদিন তাঁহার কাছে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় লিখিত একখানি চিঠি ও তৎসঙ্গে প্রেরিত কলিকাতার একটি অর্থনৈতিক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দেখাইয়া এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খাঁটি খবর চাহিলেন। আমি বলিলাম, ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের কথা আমার জানা নাই তবে সরকার মহাশয় বাংলাদেশে খ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁহার কথা অধ্যাপক সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন।

এখানকার জগদ্বিখ্যাত "ট্রোপেন্ ইন্‌ষ্টিটুট্" Tropen Institut বা গ্রীষ্মদেশীয় রোগাদির চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যালেরিয়া বিষয়ে বহুতত্ত্বের আবিষ্কারক সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার নোখ্‌ট Nocht-এর বাড়ীতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ পাই। ডাঃ নোখ্‌ট গ্রীষ্মরোগাদির গবেষণা-সভা প্রভৃতিতে যোগদানের কাজে কয়েকবার ভূপ্রদক্ষিণ করিয়াছেন, একবার ভারতেও গিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও "নটীর পূজা" অভিনয় দেখিয়াছিলেন। ভারতীয় নৃত্যকলার খুব সুখ্যাতি ফ্রাউ প্রোফেসারের মুখে শুনিলাম। ঐ নৃত্য জোড়াসাঁকো বা চৌরঙ্গীপাড়ার থিয়েটারের বদলে যখন শান্তিনিকেতনের আমবাগানে পত্রপুষ্পসজ্জার মধ্যে পূর্ণিমা রাতের চন্দ্রালোকে অভিনীত হয় তখন তাহার অনুমেয় শোভার কথা যখন বলিলাম, তখন অধ্যাপকপত্নী ও উপস্থিত মহিলারা রূপাবিষ্ট হইয়া বলিতে

লাগিলেন, "ভূণ্ডেরবার, ভূণ্ডেরশ্যোন্ (Wunderbar, Wundersohon), কি আশ্চর্য্য, কি চমৎকার!"

বড়দিনের উৎসব এদেশের সবচেয়ে বড় পারিবারিক উৎসব। আসল দিনের দশ পনের দিন আগে হইতেই বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব আরম্ভ হয়। দক্ষিণ-জার্ম্মানীর ও সুইট্জারল্যাণ্ডের জঙ্গল হইতে তিন হইতে আট হাত উঁচু ছোট বড় নানা আকারের "ফার"গাছ কাটিয়া আনিয়া দোকানের সামনে ফুটপাতে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, গৃহস্থরা ইহা কিনিয়া আকার অনুযায়ী বসিবার ঘরে টেবিলের উপর বা মেঝেতে খাড়া করিয়া মোমবাতি, ফানুষ প্রভৃতিতে সাজাইয়াছে। এই গাছের চারিপাশে পরিবার ও বন্ধুবর্গ মিলিয়া খাওয়া-দাওয়া নাচগান করে, পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা ও উপহারাদি আদান-প্রদান করে। পরিচিত পরিবারদের প্রায় সকলের কাছেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, অনেক জায়গায় বাদাম-আখ্রোট জাতীয় ফলের সঙ্গে ওয়াইন খাইলাম, পিয়ানো-বেহালাতে কত বেটোফেন্-মোট্সার্ট-বাখ প্রভৃতির 'মিউজিক' শুনিলাম। মায়ার-বেনফাইদের বাড়ীতে প্রোফেসার পিয়ানো বাজাইলেন, পত্নী অনেকগুলি পুরাতন জার্ম্মান বড়দিনের-গান করিলেন ও শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া খৃষ্টপর্ব্ব পালন করিলেন। শূব্রিংএর বাড়ীতে কাঁচের জানালার মধ্য দিয়া আসন্ন সন্ধ্যান্ধকার ও বরফের শ্বেতিমার দিকে তাকাইয়া শূব্রিং বলিলেন, "হাঁ, এইবার ঠিক বড়দিন বড়দিন মনে হইতেছে, না?" ঠিক কিসে তিনি এই ভাবটি দেখিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক একটু মুস্কিলে পড়িলেন, বলিলেন "তা ঠিক বলিতে পারি না, এই চারিদিকের গাছ-পালার বরফ, সন্ধ্যার উজ্জ্বল সাদা অন্ধকার, জানালার শার্শিতে মোমবাতির ছায়া, এই সবের মধ্যেই বড়-দিনের ভাব!" আমার মনে হইল, আশ্বিনের শারদীয় সোনালি রোদের দিকে তাকাইয়া আমাদেরও এই রকম "পূজা পূজা" মনে হয়। ভারতীয় সেমিনারে অনেকগুলি টেবিল জোড়া দিয়া সাদা চাদর বিছাইয়া তাহার উপর ফার পাতায় সারনাথ অশোকস্তম্ভের অনুকরণে প্রকাণ্ড সুদর্শন "ধর্ম্মচক্র" রচিত হইয়াছিল, তাহার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলি ক্ষুদ্রকায় মোমবাতি যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন এই দূর দেশের বিদ্যামন্দিরে জাতীয় পর্ব্বোৎসবের দিনে তথাগতের বাণী ও ভারতীয় প্রাচীন সম্রাটের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন সজীব হইয়া উঠিল, লুপ্তবীর্য্য হতভাগ্য দেশের প্রাচীন মহিমার জয়গান ঘোষিত হইল।

মায়ার-বেনফাই-পত্নী

৩১শে ডিসেম্বরের বর্ষশেষের রাত্রির উৎসব এদেশে বড় উৎকট রকমের। প্রায় লোকই এ রাত্রে বাসায় থাকে না, দশ পনের দিন আগে হইতে হোটেল রেস্তঁরাগুলির সব টেবিল ডবল তিন ডবল দামে রিজার্ভ হইয়া যায়। সারা রাত হোটেলে হোটেলে স্ত্রীপুরুষ সবাই বিবিধ মদ্যপান করিয়া নাচিয়া বেড়ায়। গভীর রাত্রে দারুণ ফূর্ত্তির মাতামাতি হয়, রাস্তায় রাস্তায় লোকে মাতাল হইয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়ায়, আমোদের নেশায় স্ত্রীপুরুষ উন্মত্তের মত হইয়া উঠে। মধ্য-যুগের কার্ণিভালের মত ও উত্তর-ভারতের দোল-উৎসবের মত সাধারণ লোকে এ দিনটির জন্য যেন সারা বৎসর সভ্যতার বাঁধনে বদ্ধ অন্তর্নিহিত আদিম পশুটিকে বেশ একচোট ছাড়া দিয়া ভরপেট খেলাইয়া নেয়।

দিবারাত্রির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের সমুদ্র নয়, আরও উন্মাদ হৃদয়-সমুদ্রের কলরবে মাঝরাত্রি পার না হলে হেরম্বের ঘুম আসে না। তবু আজ প্রত্যুষেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের প্রয়োজন আছে কিন্তু ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে সে কষ্ট ভোগ করার চেয়ে উঠে বসে চুরুট ধরানোই হেরম্ব ভাল মনে করলে। কাল গিয়েছে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি। আনন্দের পূর্ণিমা নৃত্যের পরবর্ত্তী অমাবস্যা সম্ভবতঃ আজ দিনের বেলাই কোন এক সময়ে সুরু হয়ে যাবে।

হেরম্ব উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাগানের অপর প্রান্তে আনন্দ ফুল তুলছে। দেখে হেরম্বের খুসী হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু আগামী সমস্ত দিনটির কল্পনায় সে বিষণ্ণ হয়েই থাকে। দিনের বেলাটা এখানে হেরম্বের ভাল লাগে না। উৎসবের পর সামিয়ানা নামানোর মত নিরুৎসব কর্ম্ম-পদ্ধতিতে সারাদিন এখানকার সকলে ব্যাপৃত হয়ে থাকে, হেরম্বের সুদীর্ঘ সময় বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সকালে মন্দিরে হয় ভক্ত-সমাগম। লাল চেলী পরে কপালে রক্তচন্দনের তিলক এঁকে মালতী তাদের বিতরণ করে পুণ্য, অভয় চরণামৃত এবং মাদুলী। চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রদীপ জেলে ও ধূপধুনো দিয়ে আনন্দ মাকে সাহায্য করে, হেরম্বকে খেতে দেয়, অনাথের জন্য এক পাকের রান্না চড়ায় আর নিজের অসংখ্য বিস্ময়কর ছেলেমানুষী নিয়ে মেতে থাকে। ফুলগাছে জল দেয়, আঁকশী দিয়ে গাছের উঁচু ডালের ফল পাড়ে, কোঁচড়ভরা ফুল নিয়ে মালা গেঁথে গেঁথে অনাথের কাছে বসে গল্প শোনে।

হেরম্বের পাকা মন, যা আনন্দের সংশ্রবে এসে উদ্বেল আনন্দে কাঁচা হয়ে যেতে শিখেছে, খারাপ হয়ে যায়। সে কোন দিন ঘরে বসে ঝিমায়, কোনদিন বেরিয়ে পড়ে পথে।

জগন্নাথের বিস্তীর্ণ মন্দির-চত্বরে, সাগরসৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আপনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে মেতে থাকে। মিলন আর বিরহ, বিরহ আর মিলন। দেয়ালের আবেষ্টনীতে ধূপগন্ধী অন্ধকারে বন্দী জগন্নাথ, আকাশের সমুদ্রের দিকহীন ব্যাপ্তির দেবতা। পথে কয়েকটি বিশিষ্ট অবসরে সুপ্রিয়াকেও তার স্মরণ করতে হয়। কাব্যোপজীবীর দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের মত এক অনিবার্য্য বিচিত্র কারণে সুপ্রিয়ার চিন্তাও মাঝে মাঝে তার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই বাড়ী আর বাগানের আবেষ্টনীর মধ্যে সে যতক্ষণ থাকে, পর্য্যায়ক্রমে তীব্র আনন্দ ও গাঢ় বিষাদে সে এমনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে তার চেতনা আনন্দকে অতিক্রম করে সুপ্রিয়াকে খুঁজে পায় না। পথে বার হয়ে অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন সহরের শেষ সীমা সাদা বাড়ীটির কাছে পৌছয়, তখন থেকে সুরু করে তার মন ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সে স্পষ্ট অনুভব করে, একটা রঙীন, স্তিমিত আলোর জগৎ থেকে সে পৃথিবীর দিবালোকে নেমে আসছে। ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ, দুদিকের দোকানপাট, পথের জনতা তার কাছে এতক্ষণ ফোকাস-ছাড়া দূরবীণের দৃশ্যপটের মত ঝাপসা হয়ে ছিল, এতক্ষণে ফোকাস ঠিক হয়ে সব উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে সে যে একা নয়, শোণিত-সুরা-সন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের চিরন্তন ও অনভিনব সুখদুঃখে বিচলিত অসংখ্য নরনারী যে তাকে ঘিরে আছে, এই অনুভূতির শেষ পর্য্যায়ে জীবনের সাধারণ ও বাস্তব ভিত্তিগুলির সঙ্গে হেরম্বের নূতন করে পরিচয় হয়। সুপ্রিয়া হয়ে থাকে এই পরিচয়ের মধ্যবর্ত্তিনী কান্তা, রৌদ্রতপ্ত দিনের ধূলিরুক্ষ কঠোর বাস্তবতায় একটি কাম্য পানীয়ের প্রতীক।

:

কোন দিন বাইরে প্রবল বর্ষা নামে। মন্দির ও সমুদ্র জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে বিছানো লোমশ কম্বলে বসে আনন্দ ঝিনুকের রাশি গোণে এবং বাছে, ডান হাত আর বাঁ হাতকে প্রতিপক্ষ করে খেলে জোড়-বিজোড়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হেরম্ব চুরুট খায় আর নিরানন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দের খেলা চেয়ে দেখে। এই বিরহ-বিপন্ন বিষণ্ণ মুহূর্ত্তগুলিতেও তার যে দৃষ্টির প্রখরতা কমে যায় তা নয়। আনন্দের স্বচ্ছপ্রায় নখের তলে রক্তের আনাগোনা তার চোখে পড়ে অধরোষ্ঠের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের সে মর্ম্মোদ্ঘাটন করে, কপালে ছেলেখেলার হারজিতের হিসাব

গুলিকে গোণে। ঘরের আলো বর্ষার মেঘে স্তিমিত হয়ে থাকে।

আনন্দ শ্রান্তস্বরে বলে, 'কি বৃষ্টিই নেমেছে। সমুদ্রটা পর্য্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেল।'

আনন্দ কথা বলে না। আনন্দের বর্ষা-বিরাগে তার দিন আরও কাটতে চায় না।

চুরুটের গন্ধে আনন্দ মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। হেরম্ব ভাবল, আনন্দ হয়ত হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকবে। এখন বাগানে যেতে অস্বীকার করার জন্য হেরম্ব নিজেকে প্রস্তুত করছে, আনন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, যার সুস্পষ্ট অর্থ, এখন হেরম্বের বাগানে যাবার দরকার নেই: দূরত্বই ভাল, এই ব্যবধান। হেরম্ব চুরুটটা ফেলে দিয়ে সরে গেল। কাছাকাছি না গেলে চাওয়া-চাওয়িও এখন না হলে চলবে।

গামছা কাপড় নিয়ে হেরম্ব খিড়কির দরজা দিয়ে বার হয়ে বাড়ীর পূবদিকের পুকুরে স্নান করে এল। বাড়ীতে ঢুকে দেখল, বাগান থেকে ঘরে এসে আনন্দ অনাথের কাছে গল্প শুনতে বসেছে। হেরম্বও একপাশে বসে। গল্প শোনার প্রত্যাশায় নয়: অনাথের বলা ও আনন্দের শোনা দেখবার জন্য।

অনাথ আজ মেয়েকে নচিকেতার কাহিনী শোনাচ্ছে।

—'তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। বাজশ্রবসের নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। একবার এক যজ্ঞ করে বাজশ্রবস নিজের সর্ব্বস্ব দান করলেন। দক্ষিণা দেবার সময় হলে নচিকেতা—স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যতীতি, আমায় কাকে দেবেন? নচিকেতা তিনবার এ প্রশ্ন করলে বাজশ্রবস রাগ করে বললেন, তোমায় যমকে দেব।'

হেরম্ব মৃদুস্বরে বললে, 'যম নয়, মৃত্যুকে।'

আনন্দ বললে, 'তফাৎ কি হল?'

হেরম্ব বললে, 'উপনিষদে মৃত্যু শব্দটা আছে।'

আনন্দ তার এই বিদ্যার পরিচয়ে মুগ্ধ হল না। বললে, 'তারপর কি হল বাবা?'

হেরম্বের মনে হয়, আনন্দ তাকে অবহেলা করেছে। তার অস্তিত্বকে আনন্দের এ পরিপূর্ণ বিস্মরণ। বাগানে আনন্দের ঘাড় নাড়া ধরলে এই নিয়ে দুবার হল। সকালের সুরু দেখে আজকের দিনটি হেরম্ব মোটামুটি নিরানন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবারও আশা করতে পারে না। এদিকে মালতী এসে নিচকেতার কাহিনীতে বাধা জন্মায়।

'তারপর কি হল বাবা! কচি খুকীর মত সকালে উঠে গপ্পো গিলছিস্? স্নানটান করে মন্দিরটা খোল না গিয়ে! কাজের সময় গপ্পো কি?'

অনাথ বলে, 'এমনি করে বুঝি বলতে হয় মালতী?'

'কি করে বলব তবে? একটা কাজ করতে বলার জন্য পেটের মেয়ের কাছে গলবস্ত্র হতে হবে?'

অনাথ চুপ করে যায়। আনন্দ স্নানের উদ্দেশ্যে চলে যায় পুকুরে। তার পরিত্যক্ত স্থানটি দখল করে বসে মালতী। হেরম্বের মনে হয়, সেও বুঝি অনাথের কাছে গল্পই শুনতে চায়। যে-কোন কাহিনী।

হেরম্বের আবির্ভাবে এদের দুজনের সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। অনাথের অসঙ্গত অবহেলার জবাবে মালতীর স্বেচ্ছাচারিতা যেমন উগ্র ছিল তেমনি উগ্র হয়ে আছে। কিন্তু তার সমস্ত রুক্ষ আচরণের মধ্যে একটি পিপাসু দীনতা, ক্ষীণতম আশ্বাসের প্রতিদানে নিজেকে আমূল পরিবর্ত্তিত করে ফেলার একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞা হেরম্ব আজকাল সর্ব্বদা আবিষ্কার করতে পারে। বোঝা যায়, অনাথের প্রতি মালতীর সমস্ত ঔদ্ধত্য অনাথকে আশ্রয় করেই যেন দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের জীবনে সে যে স্থূল অপরিচ্ছন্নতা আমদানী করেছে, অনাথের গায়ে তার নমুনাগুলি লেপন করে দেবার চেষ্টার মধ্যে যেন তার একটি প্রার্থনার আর্ত্তনাদ গোপন হয়ে থাকে, আমাকে শুদ্ধ কর, পবিত্র কর। অনাথের নিরুপদ্রব নির্ব্বিকার ভাব মাঝে মাঝে হেরম্বকেও বিচলিত করে দেয়। সময় সময় তার মনে হয়, এও বুঝি এক ধরণের অসুখ। জ্বর যেমন উত্তাপ বেড়েও হয়, কমেও হয়, এরা দুজনে তেমনি একই মানসিক বিকারের শান্ত ও অশান্ত অবস্থা দুটি ভাগ করে নিয়েছে।

কখনো কখনো এমন কথাও হেরম্বের মনে হয় যে অনাথের চেয়ে মালতীরই বুঝি ধৈর্য্য বেশী, তিতিক্ষা কঠোরতর, অনাথের আধ্যাত্মিক তপস্যার চেয়ে মালতীর তপস্যাই বেশী বিরামবিহীন। অনাথের বিষয়ান্তরের আশ্রয় আছে, অন্যমনস্কতা আছে, যৌগিক বিশ্রাম আছে,—মালতীর জীবনের

নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গতি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একনিষ্ঠ। অনাথকে কেন্দ্র করে সে পাক খাচ্ছে। অনাথ তার জগৎ. অনাথ তার জীবন, অনাথকে নিয়ে তার রাগ দুঃখ হিংসা ক্লেশ, অনাথ তার অমার্জ্জিত পার্থিবতার প্রস্রবণ, তার মদের নেশার প্রেরণা। অনাথকে বাদ দিলে তার কিছুই থাকে না।

হেরম্বকে চোখ ঠেরে মালতী গম্ভীর মুখে অনাথকে বললে, 'কাল এক স্বপন দেখলাম! তুমি আর আমি যেন কোথায় গেছি,—অনেক দূর দেশে। পোড়া দেশে আমরা দুজন ছাড়া আর মানুষ নেই, রাস্তায় ঘাটে ঘরে বাড়ীতে সব মরে রয়েছে।'

অনাথ বললে, 'ভুলেও তো সৎ চিন্তা করবে না। তাই এরকম হিংসার ছবি ভ্যাখো।'

মালতী এ কথা কানেও তুললে না,বলে চলল, 'স্বপন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছে বাপু, যাই বল। আচ্ছা, চল না আমরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি কদিন? ওদের কণ্ঠি-বদলটা চুকিয়ে দিয়ে যাই, ওরা এখানে থাক। তুমি আমি বিন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধি চল।'

মালতীর গাম্ভীর্য্যকে বিশ্বাস করে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে অনাথ বললে, 'এখনো তোমার ঘর বাঁধবার সখ আছে, মালতী? বনে যদি যাও তো চল।'

মালতী তার আকস্মিক বিপুল হাসিতে অনাথের ক্ষণিকের অন্তরঙ্গতা চূর্ণ করে দিলে। বললে, 'কেন, বনে যাবার এমন কি বয়সটা আমার হয়েছে শুনি? রাধাবিনোদ গোঁসাই কণ্ঠি-বদলের জন্য সেদিনও আমায় সেধে গেল না? মেয়ে টের পাবে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম, ডাকলেই আবার আসে। তোমার চোখ নেই তাই আমাকে বুড়ী ভ্যাখো! না কি বল, হেরম্ব? আমি বুড়ী?'

হেরম্বকে সে আবার চোখ ঠারলে, 'রাধাবিনোদ গোঁসাইকে জান হেরম্ব? মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আর সাধতে আসে—লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটা। চেহারা যেমন হোক, পয়সা আছে। সেবাদাসীর খাতিরও জানে বেশ—সৌখীন বৈরিগি কিনা। তোমাদের এই মাষ্টার মশায়ের মত কাঠখোট্টা নয়।'

অনাথ বললে, 'কি সব বলছ, মালতী?'

মালতী হঠাৎ ঢোঁক গিলে এদিক-ওদিক তাকায়। দৃষ্টি দিয়ে অনাথকে গ্রাস করতে তার এই দ্বিধা দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। কিন্তু মালতী নিজেকে চোখের পলকে বদলে ফেলে। ঔদ্ধত্যের সীমা তার কোন দিনই নেই। সে হেসে বলে, 'বৈরিগি মানুষের অত লজ্জা কেন? বলি না হেরম্বকে কাণ্ডটা।—শোন হেরম্ব, বলি। এই যে গোবেচারী ভাল মানুষটিকে দেখছ, সাত চড়ে মুখে রা নেই, আমার জন্যে একদিন এ রাধাবিনোদ গোঁসাই-এর সঙ্গে মারামারি করেছে। হাতাহাতি চুলোচুলি সে কি কাণ্ড হেরম্ব, দেখলে তোমার গায়ে কাঁটা দিত। আমি না সামলালে সেদিন গোঁসাই খুন হয়ে যেত, হেরম্ব। আর আজকে আমি মরি বাঁচি গ্রাহ্যি নেই!"

হেরম্ব বুঝতে পারে, কথার আড়ালে মালতী পুষ্পাঞ্জলির মত অনাথের পায়ে নিবেদন বর্ষণ করছে—যেদিন ছিল সে দিন আবার ফিরে আসুক।

'হাঁ গো, চল না আমরা যাই? মেয়ের মুখ চেয়ে আর কতকাল আমায় কষ্ট দেবে?'

'তোমার সঙ্গে কথা কইলেই তুমি বড় বাজে বক, মালতী।'

বলে অনাথ উঠে গেল। মালতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,'আমার সঙ্গে এমন করলে ভাল হবে না বলছি। বস এসে, আমার আরও কথা আছে, ঢের কথা আছে।'

অনাথ চলে গেলে মালতী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে নিরুৎসাহ ও নিরুৎসব ভাব চাপা পড়ে গেল। এইমাত্র যে ছিল ভিখারিণী, সে হঠাৎ ক্ষমাদাত্রী হয়ে বললে, 'লোকটা পাগল হেরম্ব, খ্যাপা। আর ছেলেমানুষ।'

'আমি কিছু বলব, মালতী-বৌদি?'

'চুপ! একটি কথা নয়!'—মালতী টেনে টেনে হাসলে, 'তুমি বোঝ ছাই, বলবেও ছাই। দেড় যুগ আঙুল দিয়ে ছোঁয় না, তাই বলে আমি কি মরে আছি? বুড়ো হয়ে গেলাম, সখ-টখ আমার আর নাই বাবু, এখন ধম্মোকম্মো সার। ঠাট্টা তামাসা করি একটু, মিনসে তাও বোঝে না।'

স্নান করে এসে চাবি নিয়ে আনন্দ মন্দিরে গেল। মালতী ঘরে ঢুকে এই ভোরে বাসিমুখে গিলে এল খানিকটা।

কারণ। মালতী প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবী, কিন্তু সব দিক দিয়ে অনাথের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য শিশু গোপালমূর্ত্তির পূজারিণী মালতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মন্ত্র নিয়ে ধ্যান-ধারণা সমস্ত পর্য্যবসিত করেছে কারণ-পানে। হেরম্বের প্রায় সহ্য হয়ে এসেছিল, তবু ঘুম থেকে উঠেই মালতীর মদ খাওয়া তার বরদাস্ত হল না। সে বাইরে চলে গেল।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমাকে হয়ত আজ ভক্তদের ব্যবস্থাও করতে হবে, আনন্দ।'

আনন্দ চন্দন ঘষছিল। কাজে আজ তার উৎসাহ নেই।

'না, মা আসবে।'

'তিনি এইমাত্র খালি পেটে কারণ খেলেন। চোখ লাল হতে আরম্ভ করেছে।'

'কারণ খেলে মার কিছু হয় না।'

হেরম্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আনন্দের অন্যমনস্ক কাজ করা দেখলে। হাত পা নাড়তে আনন্দের যেন কষ্ট হচ্ছে। যেমন তেমন করে পূজার আয়োজন শেষ করে দিতে পারলে সে যেন বাঁচে। তিন দিন আগে বর্ষা নেমেছিল। সেদিন থেকে আনন্দের কি যে হয়েছে কেউ জানে না, হয়ত আনন্দ নিজেও নয়। অল্পে অল্পে সে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে যে আবেগময় উদ্‌গ্রীব উল্লাস আপনা হতে উৎসারিত হতে পথ পায় না, হেরম্বের ডাকেও আজ তা সাড়া দিতে চায় না। সে ঝিমিয়ে পড়েছে, হেরম্বের কাছ থেকে গিয়েছে সরে। দূরে নয়, অন্তরালে। সেদিনের মেঘ-মেদুর আকাশের মত কোথা থেকে সে একটি সজল বিষণ্ণ আবরণ সংগ্রহ করেছে, ভালবাসার পাখায় ভর করে হেরম্বের মন উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে উঠেও অবারিত নীল আকাশকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এতদিন হেরম্ব কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজ সে প্রশ্ন করলে, 'তোমার কি হয়েছে, আনন্দ?'

'আমার অসুখ করেছে।'

হেরম্ব হতবাক হয়ে গেল। তার প্রশ্নের জবাবে এই যদি আনন্দের বক্তব্য হয়, তার ভালবাসাকে শুধু এই কৈফিয়ৎ যদি আনন্দ দিতে চায়, তবে আর কিছু তার জিজ্ঞাস্য নেই। সে কি জানে না আনন্দের অসুখ করেনি!

গুরুতর পরিশ্রমের কাজে মানুষ যে ভাবে ক্ষণিকের বিরাম নেয়, চন্দন ঘষা বন্ধ করে আনন্দ তেমনি শিথিল অবসন্ন ভাবে মন্দিরের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল। বললে, 'মাথাটা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে—'

নিষ্ক্রিয় অবসাদে হেরম্ব মাথা নেড়েও সায় দিল না।

'—আর মন কেমন করছে। চন্দনটা ঘষে দেবে?'

আনন্দের বিষণ্ণতার সমগ্র ইতিহাস এইটুকু। হয়ত এর বিশদ ব্যাখ্যা ছিল; কিন্তু আজও, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্য্যন্ত আনন্দের হৃদয়ে অতিথি হয়ে বাস করার পরেও, বিশ্লেষণে যা ধরা পড়ে না, শুধু অনুমান দিয়ে আবিষ্কার করে তাকে গ্রহণ করার শক্তি হেরম্বের জন্মায়নি। আনন্দের মুখ দেখে হেরম্ব ছাড়া আর সকলের সন্দেহ হবার সম্ভাবনা আছে যে আনন্দের দাঁত কন্ কন্ করছে।

'চন্দনটা তুমিই ঘষে নাও, আনন্দ', বলে হেরম্ব মন্দির ছেড়ে চলে এল। বহুদিন আগে একবার এক বর্ষণ-ক্লান্ত বাড়ীতে নিশীথ স্তব্ধতায় সজল বায়ুস্তর ভেদ করে হেরম্বের কলকাতার বাড়ীতে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল। স্ত্রীর ভয় তারও মনে সংক্রামিত হওয়াতে বাকী রাতটা হেরম্ব আতঙ্কে ঘুমাতে পারেনি। আজ কিছুক্ষণের জন্য তার অবিকল সেই রকম ভয় করতে লাগল।

ঘরে গিয়ে হেরম্ব বিছানায় আশ্রয় নিলে। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখে গেল, অনাথ তার ঘরে ধ্যানস্থ হয়েছে। তার নিস্পন্দ দেহের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, বাহ্যজ্ঞান নেই। অনাথের সুদীর্ঘ সাধনা হেরম্ব দেখেনি, এত দ্রুত তাকে সমাধিস্থ হতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আনন্দের কাছে সে শুনেছে, গত বৎসরও অনাথের এ ক্ষমতা ছিল না। মাস চারেক আগে অনাথ একবার মাথার যন্ত্রণায় কদিন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে আসনে বসলেই সে সমাধি পায়।

জীবনে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবার সখ হেরম্বের কোন দিন ছিল না, এ বিষয়ে কৌতূহলও তার নেই। বিছানায় চিৎ হয়ে সে ঘুমের তপস্যাই আরম্ভ করল। আনন্দ যখন ঘরে এল ঘুমের আশা সে ত্যাগ করেছে, কিন্তু চোখ মেলেনি।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘুমিয়েছ?'

'না।'

'চন্দন ঘষে দিলে না যে?'

হেরম্ব উঠে বসল। বললে, 'ওসব আমি পারি না। আমাদের সংসার হলে তুমি যে বলবে এটা কর ওটা কর তা চলবে না, আনন্দ। আলসেমিকে আমি প্রায় তোমার সমান ভালবাসি।'

'আচ্ছা, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস?'

সহজ ও সরল প্রশ্ন নয়। উচ্চারণের পর মরে যায় না এমন সব কথা আনন্দ আজকাল এমনি অবহেলার সঙ্গে বলে। হেরম্বের মনশ্চক্ষে যে ছানি পড়তে আরম্ভ করেছিল চোখের পলকে তা স্বচ্ছ হয়ে গেল। আনন্দের মুখ দেখে সে বুঝতে পারলে শুধু বিষণ্ণতা নয়, সেই প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রকলা-নাচ শেষ করার পর আনন্দের যে যন্ত্রণা হয়েছিল তেমনি একটি কষ্ট সে জোর করে চেপে রাখছে। হেরম্ব সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'একথা বলছ কেন, আনন্দ?'

'আমার কদিন থেকে এ রকম মনে হচ্ছে যে!'

'আগে বলনি কেন?'

'মনে এলেই বুঝি সব কথা বলা যায়? আগে বলিনি, এখন তো বলছি। তুমি বলেছিলে ভালবাসা বেশীদিন বাঁচে না। আমাদের ভালবাসা কি মরে যাচ্ছে?'

হেরম্ব জোর দিয়ে বললে, 'তা যাচ্ছে না আনন্দ। আমাদের ভালবাসা কি বেশী দিনের যে মরে যাবে? এখনো যে ভাল করে আরম্ভই হয় নি!'

আনন্দ হতাশার সুরে বললে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সব হেঁয়ালির মত লাগে। তুমি, আমি, আমাদের ভালবাসা, সব মিথ্যা মনে হয়। আচ্ছা, আমাদের ভালবাসাকে অনেকদিন, খুব অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না?'

হেরম্ব একবার ভাবল মিথ্যা বলে আনন্দকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সত্য মিথ্যা কোন সান্ত্বনাই আত্মোপলব্ধির রূপান্তর দিতে পারে না, হেরম্ব তা জানে। সে স্বীকার করে বললে, 'তা যায় না আনন্দ, কিন্তু সেজন্য তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? বেশীদিন নাইবা বাঁচল, যতদিন বাঁচবে তাতেই আমাদের ভালবাসা ধন্য হয়ে যাবে। ভালবাসা মরে গেলে আমাদের যে অবস্থা হবে এখন তুমি তা যত ভয়ানক মনে করছ, তখন সেরকম মনে হবে না। ভালবাসা মরে কখন? যখন ভালবাসার শক্তি থাকে না। যে ভালবাসতে পারে না প্রেম না থাকলে তার কি এসে যায়?'

আনন্দ বিস্মিত হয়ে বললে, 'একি বলছ? যা নেই তার অভাববোধ থাকবে না?'

'থাকবে, কিন্তু সেটা খুব কষ্টকর হবে না। আমাদের মন তখন বদলে যাবে।'

'যাবেই? কিছুতে ঠেকানো যাবে না?'

সোজাসুজি জবাব হেরম্ব দিলে না। হঠাৎ উপদেষ্টার আসন নিয়ে বললে, 'এসব কথা নিয়ে মন খারাপ ক'র না আনন্দ। বেশীদিন বাঁচলে কি প্রেমের দাম থাকত? তোমার ফুলগাছে ফুল ফুটে ঝরে যায়। তুমি সেজন্য শোক কর নাকি?'

'ফুল যে রোজ ফোটে।'

কিছুক্ষণের জন্য হেরম্ব বিপন্ন হয়ে রইল। তার মনে হল, আনন্দের কথায় একেবারে চরম সত্যটি রূপ নিয়েছে, এখন সে যাই বলুক সে শুধু তর্কের খাতিরে বলা হবে, তার কোন মানে থাকবে না। কদিন থেকে প্রয়োজনীয় নিদ্রার অভাবে হেরম্বের মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে ছিল, জোর করে ভাবতে গিয়ে তার চিন্তাগুলি যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। অথচ সত্যকে চিরদিন বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে এসে আনন্দের উপমা-নিহিত অন্তিম সত্যকে কোন রকমে মানতে পারছে না দেখে তার আশা হল, বংশহীন ফুলের মত একবার মাত্র বিকাশ লাভ করে ঝরে যাওয়ার ব্যর্থতাই মানব-হৃদয়ের চরম পরিচয় নয়, বিকাশের পুনরাবৃত্তি হয়ত আছে, হৃদয়ের পুনর্জন্ম হয়ত অবিরাম ঘটে চলেছে। মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষীণজীবী হৃদয়েরও হয়ত আছে।

হেরম্ব যতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে চারিদিক অন্ধের মত হাতড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল এই সার্থকতার স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ল না। হেরম্বের নিদ্রাতুর মনও বেশীক্ষণ থেইহারা চিন্তায় অর্থহীন বিড়ম্বনা ভোগ করবার নয়। ক্রমে ক্রমে সে শান্ত হয়ে এলে এত সহজে হৃদয়ের মৃত্যু-রহস্য তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল যে, এই সুলভ জ্ঞানের জন্য ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে নিজের কাছেই সে লজ্জা পেল।

সে প্রীতিকর প্রসন্ন হাসি হেসে বললে, 'মানুষও রোজ ভালবাসে, আনন্দ। প্রত্যেকটি ঝরে-যাওয়া ফুলের জন্য রোজ যেমন একটি করে ফুল ফোটে, প্রত্যেকটি মরে-যাওয়া ভালবাসার জায়গায় তেমনি একটি করে ভালবাসা জন্মায়। আমরা মানুষ, গাছ-পাথরের মত সীমাবদ্ধ নই। আমাদের চেতনা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আমরা বেঁচে আছি। আমি যেমন সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি, সমস্ত মানুষ তেমনি আমার প্রতিনিধি। একটা প্রকাণ্ড হৃদয় থেকে এক টুকরো ভাগ করে নিয়ে আমার স্বতন্ত্র হৃদয় হয়েছে, কিন্তু নাড়ী কাটার পরেও মা আর ছেলের যেমন নাড়ীর যোগ থাকে, সমস্ত মানুষের সমবেত অখণ্ড হৃদয়ের সঙ্গে আমারও তেমনি আত্মীয়তা আছে। তুমি ভাবছ এ শুধু কল্পনার বাহার। তা নয় আনন্দ। আকাশ আর বাতাস থেকে আমার মন আমার হৃদয় নিজেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেনি, তাদের প্রত্যেকটি কণা এসেছে মানুষের ভাণ্ডার থেকে। আমরা জন্মাই একটা বিপুল শূন্য, আজীবন মানুষের সাধারণ হৃদয়-মনের সম্পত্তি থেকে তিল তিল করে ঐশ্বর্য্য নিয়ে সেই শূন্য পূরণ করি। আমরা তাই পরস্পর আত্মীয়, আমরা তাই প্রত্যেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের ভালবাসা যখন মরে যাবে, অন্য মানুষ তখন ভালবাসবে। আমাদের প্রেম ব্যর্থ হবে না।'

আনন্দ মুহ্যমানার মত তাকিয়ে ছিল। বললে, 'না ?'

'আমরা তো একদিন মরে যাব। আমরা যদি মানুষ না হতাম, যদি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই প্রত্যেকে নিজেদের জেল দিতাম, তা হলে ভাবতাম, মরে যাব বলে আমাদের জীবন নিরর্থক। কিন্তু যে চেতনা থাকার জন্য আমরা পশুর মত জীবনের কথা না ভেবে বাঁচি না, মরণের কথা না ভেবে মরি না, সেই চেতনাই আমাদের বলে দেয় মানুষ মরে, মানবতার মৃত্যু নেই। মানুষের জীবন দিয়ে মানবতার অখণ্ড প্রবাহ চলে বলে জীবনও ব্যর্থ নয়। তেমনি—'

'চুপ কর।' হেরম্বকে তীব্র ধমক দিয়ে আনন্দ কেঁদে ফেলল।

ধমকের চেয়ে আনন্দের কান্না আরও তীব্র তিরস্কারের মত হেরম্বকে আঘাত করল। আনন্দ তো কবি নয়। মেয়েরা কখনো কবি হয় না। পৌরুষ ও কবিত্ব এক-ধর্ম্মী। নিখিল মানবতার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে তার হৃদয়ের একদা রণিত ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে সে কখনো খুঁজে বেড়াতে পারবে না। জগতে তার দ্বিতীয় প্রতিরূপ নেই, সে বৃহতের অংশ নয়; সে সম্পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র। যে বংশপ্রবাহ মানবতার রূপ, সে তা বোঝে না। অতীত ভবিষ্যতের ভারে তার জীবন পীড়িত নয়, সার্থকও নয়, সৃষ্টির অনন্ত সূত্রে সে গ্রন্থির মত বিগত ও অনাগতকে নিজের জোরে যুক্ত করে রাখে না। পৃথিবী যেমন মানুষের জড় দেহকে দাঁড়াবার নির্ভর দেয়, মানুষের জীবনকে এরা তেমনি আশ্রয় যোগায়। পৃথিবী জুড়ে হেরম্বের আত্মীয় থাক, আনন্দের কেউ নেই। সে একা।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা ছিল না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলার সাহস কার হত বলা যায় না। এমন সময় হঠাৎ মালতীর তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

হেরম্ব চমকে বললে, 'ওকি ?'

'মা বুঝি ডাকল।'

বারান্দায় গিয়ে হেরম্ব বুঝতে পারলে, ব্যাপার যাই ঘটে থাক অনাথের ঘরে ঘটেছে। ঘরে ঢুকে সে দেখলে, অনাথ অজ্ঞান হয়ে আসনে লুটিয়ে পড়ে আছে, মৃদু ও দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, অতিরিক্ত রক্তের চাপে মুখ অসুস্থ, রাঙা। মালতী পাগলের মত সেই মুখে করে চলেছে চুম্বনবৃষ্টি !

তাকে ঠেলা দিয়ে হেরম্ব বললে, 'শান্ত হন, সরে বসুন, কি হল দেখতে দিন।'

'ও মরে গেছে হেরম্ব, আমি ওকে মেরে ফেলেছি।'

হেরম্বের চিকিৎসা চলল আধ ঘণ্টা। তিন কলসী জল খরচ হল, মালতীর আউন্সখানেক কারণও কাজে লাগল। তারপর অনাথ চোখ মেলে চাইলে।

'আঃ, কি কর মালতী ?' বলে আরও খানিকটা সচেতন হয়ে অনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হয়েছিল ?'

মালতী কপাল চাপড়ে বললে, 'আমার যেমন পোড়া কপাল ! জন্মদিন বলে একটা প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, কে জানে তাতেই ভড়কে গিয়ে ভিরমি খাবে !'

অনাথের স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠ আরও ঝিমিয়ে গেছে। সে বললে, 'আসনে বসলে আমাকে ছুঁতে তোমায় কতবার বারণ করেছি, মালতী। কঠিন যোগাভ্যাস করছি, হঠাৎ অপবিত্র স্পর্শ পেলে—'

মালতী ইতিমধ্যেই খানিকটা সামলেছে।

'কিসের অপবিত্র স্পর্শ? চান করে আসিনি আমি? এমন বিদ্‌ঘুটে স্বভাব জানি বলেই না পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম!'

'পুকুরে ডুব দিয়ে এলে মানুষ যদি পবিত্র হত—'

'আমার পোড়া কপাল তাই মরণ নেই!'

অনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তুমি বুঝতে পার না, মালতী। পবিত্র অপবিত্র স্পর্শের জন্য শুধু নয়, আসনে আমি যে রকম অবস্থায় থাকি আমাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হয়, কোন কারণে হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরলে বিপদ ঘটে। আমি আজ মরেও যেতে পারতাম!'

মালতী কোন সময় হার স্বীকার করে না। বললে, 'এমন আসনে তবে বসা কেন!'

অনাথ বলল, 'সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু আজ তো তোমার জন্মদিন নয়!—কাল।'

'আজ তো আগের দিন?—আজ আমার জন্মদিনের পারণ।'

অনাথ আর তর্ক করলে না। ঘরের কোণে টাঙানো শুকনো দড়ি থেকে একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মালতী বসে রইল মুহ্যমানা হয়ে। সেও আগাগোড়া ভিজেছে। তাকে কয়েকটা সদুপদেশ দেবার ইচ্ছা হেরম্ব জোর করে চেপে গেল। এত কাণ্ডের পরেও আনন্দ এ ঘরে আসেনি খেয়াল করে সে উসখুস করতে লাগল।

'দেখলে, হেরম্ব?'

এ প্রশ্নের জবাব হয় না, মন্তব্য হয়। হেরম্ব সাহস পেল না।

'এমন জানলে কে মিনসেকে ঠাট্টা করতে যেত!'

'ঠাট্টা নাকি, মালতী-বৌদি?

মালতী রেগে বললে, "কি তবে? সঙ্কেত্তন? আবোল, তাবোল ব'ক না বাবু, মাথায় আগুন জ্বলছে, মন্দ কিছু বলে বসব। কাল আমার জন্মদিন। জন্মদিনে শ্রীচরণে ঠাঁই পাই। বছরে ওর এই একটা দিনরাত্তির আমার সঙ্গে সম্পর্ক,—হেসে কথাও কয়, ভালও বাসে।—গা ছুঁয়ে বলছি ভালবাসে, হেরম্ব!' মালতী মুচকে মুচকে হাসে, 'কেন জান না বুঝি? শোন বলি। সেই গোড়াতে, মাথাটা যখন পর্য্যন্ত ওর খারাপ হয়নি, তখন প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছিলেম, আর যেদিন যা খুসী কর বাবু, কথাটি কইব না, আমার জন্মদিনে সব হুকুম মেনে চলবে। পাগল হলে কি হবে হেরম্ব, প্রতিজ্ঞের কথাটি ভোলেনি। মুখ বুজে আজও মেনে চলে।' মালতী বিজয় গর্ব্বে হাসে, 'বিষ খেতে বললে তাও খায়, হেরম্ব।'

অনাথের এটুকু দুর্ব্বলতা হেরম্ব কল্পনা করতে পারে। মালতী তাকে দিয়ে সেদিন কি ভালটাই যে বাসিয়ে নেয় তাও সে সহজেই বুঝতে পারে।

'এবার জন্মদিনে তাই বরং মাষ্টারমশাইকে খেতে দেবেন, মালতী-বৌদি।'

শুনে মালতী আগুন হয়ে হেরম্বকে ঘর থেকে বার করে দিলে।

হেরম্ব আর কোথায় যাবে, প্রথম রাত্রিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ীর পিছনের প্রাচীর ডিঙিয়ে অদূরবর্ত্তী যে আম বাগান তার চোখে অরণ্যের মত প্রতিভাত হয়েছিল, বান-প্রস্থাবলম্বীর মন নিয়ে হেরম্ব সেইখানে গেল। এখানে আছে ভোরের পাখীর ডাক আর অসংখ্য কীটপতঙ্গের প্রণয়। পচা ডোবার জলে হয়ত 'আমিবা' আত্মপ্রণয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলছে, তরু-বল্কলের আড়ালে পিপীলিকার চলেছে শুঁড়ে শুঁড়ে প্রণয়ভাষণ, হেরম্বের পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলৌকা দম্পতী, গাছের ডালে ডালে একজোড়া অচেনা পাখীর লীলাচাঞ্চল্য। ক্ষুধাশীর্ণ দুটি ভীরু কুকুর এই বনে ভালবাসতে এসেছে। মৃদু অমায়িক হাসি হেসে হেরম্ব সম্মতি জানায়, অস্ফুট স্বরে বলে, জয় হোক।

অনেকক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরে আসে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মন্দির-চত্বরে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে সুপ্রিয়াকে আবিষ্কার করতে তার বেশীক্ষণ দেরী হয় না। তখন পূজা ও আরতি শেষ হয়েছে। মালতী মাদুলি বিতরণ করছে। তার কাছে বসে সুপ্রিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনন্দের দিকে। হেরম্ব মিলিয়ে দেখলে কদিনের বর্ষার পর আজ যে ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে, সুপ্রিয়ার চোখের আলোর সঙ্গে তার প্রভেদ নেই।

প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য মালতীর জন্মদিনে অনাথ তার সমস্ত হুকুম মেনে চলে, প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্যই এখানে এসে হেরম্ব সুপ্রিয়াকে একখানা পত্র লিখেছিল। সুপ্রিয়া যে তাকে দিয়ে চিঠি লেখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল তা নয়, কথা ছিল ঠিকানা জানাবার। চিঠি না লিখে একজনকে ঠিকানা জানানো যায় না বলে হেরম্ব বাধ্য হয়ে একখানা চিঠি লিখেছিল। ঠিকানা দিয়ে তার দুটি দরকারের কথা সুপ্রিয়া স্বীকার করেছিল। প্রথম, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে হেরম্বকে সে তার কথা ভুলতে দেবে না। দ্বিতীয়, হেরম্ব কোথায় আছে জানা না থাকলে তার কেবলি মনে হয় সে হারিয়ে গেছে, অসুখে ভুগছে, বিপদে পড়েছে,—এই দুশ্চিন্তাগুলির হাত থেকে সে রেহাই পাবে।

খুসীমত কাছে এসে হাজির হওয়ার একটা তৃতীয় প্রয়োজনও যে তার থাকতে পারে হেরম্ব আগে তা খেয়াল করেনি। একটা নিশ্বাস ফেলে সে মন্দির-চত্বরে ভক্তদের সভায় গিয়ে বসলে।

'কবে এলি, সুপ্রিয়া ?'

সে যেন জানত সুপ্রিয়া পুরীতে আসবে। কবে এসেছে তাই শুধু সে জানে না।

'এসেছি পরশু। আপনি এখানে কদিন আছেন ?'

'আজ নিয়ে পনের দিন।'

'দিন গোণার স্বভাব তো আপনার ছিল না।' সুপ্রিয়া আনন্দের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করলে।

হেরম্ব হেসে বললে,'এমনি অনেকগুলি স্বভাব আমি অর্জন করেছি সুপ্রিয়া, যা আমার ছিল না। আগেই তোকে বলে রাখলাম পরে যেন আর গোল করিসনে।'

মালতী রুক্ষস্বরে বললে, 'বড় গোল হচ্ছে। এদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা না, আনন্দ ? এটা আড্ডা দেবার বৈঠকখানা নয়।'

সুপ্রিয়া একথায় অপমানিত বোধ করে বললে, 'আমি বরং আজ যাই।'

আনন্দ বললে, 'না না, যাবেন কেন ? ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।'

হেরম্বও আমন্ত্রণ জানিয়ে বললে, 'আয় সুপ্রিয়া।'

(ক্রমশঃ)

রাশিয়া

—ম্যারিস্ ব্যারিং

তোমার আমার মাঝে কি রয়েছে গোপন শৃঙ্খল ?
যে গান ভাসিয়া আসে পার হয়ে তোমার সীমানা,
আমার অন্তর ছুঁয়ে চোখে মোর কেন আনে জল ?
প্রাণের নিগূঢ় বাণী যা তোমার, কেন দেয় হানা—

বুকে মোর বান্ধবের পরম প্রেমের বাণীরূপে,
তব নগ্ন প্রান্তরের সুবিপুল শান্ত উদারতা,
নৃত্য কলোচ্ছ্বাস, আর তীব্র ব্যথা প্রকৃতির যূপে ;
তোমার তটিনী স্বচ্ছ, তোমার বিষাদ-মলিনতা ?

বলিতে পারি না আমি, তবু ইহা করি অনুভব,
দৃপ্ত কণ্ঠে গাহে গান পথে যবে তব সৈন্যদল,
মাঠে শস্য কাটে চাষী, খেলা করে, করে কলরব
পথে পথে আত্মহারা ওই তব শিশুরা চঞ্চল,

পুরুষেরা পূজা করে মন্দিরে মন্দিরে দেবতার,
সবার মঙ্গল চেয়ে বাস করি অঙ্কেতে তোমার।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৩৮]

বাঙ্গালায় রচিত প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত কাব্য যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য ভা গ ব ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ তে এবং অন্য কতিপয় গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ এবং লোচনদাসের গ্রন্থের নাম একই হওয়াতে বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম বদলাইয়া চৈ ত ন্য ভা গ ব ত রাখেন। এই প্রবাদের কোন ভিত্তি নাই। এ বিষয়ে প্রে ম বি লা সে[১] যাহা আছে তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

> চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
> বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীরামের কন্যা নারায়ণী। তাঁহারই পুত্র বৃন্দাবনদাস। বৃন্দাবনদাসের জন্মতারিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগে অথবা দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অল্প বয়সেই বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর হন। পরে বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড় গ্রামে বসতি করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ভ ক্তি র ত্না ক রে উল্লিখিত হইয়াছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে অষ্টম দশকের শেষের দিকে ইনি পরলোক গমন করেন।

বৃন্দাবনদাস চৈ ত ন্য ভা গ ব তে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর আদেশেই শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনায়[২] প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চৈতন্য-জীবনীর অধিকাংশ উপকরণই তিনি প্রধানতঃ নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট পাইয়াছিলেন।[৩] অন্যান্য চৈতন্যপার্ষদের নিকটও অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন।[৪] স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ইহাতে কিছুই নাই; তবে কোন কোন ঘটনার ব্যাখ্যা বৃন্দাবনদাসের নিজস্ব হইতে পারে। চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র রচনাকাল জানা নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ তে এবং জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গৌ র গ ণো দ্দে শ দী পি কা য় কবি কর্ণপূরের উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তখন চৈ ত ন্য ভা গ ব ত বিখ্যাত গ্রন্থ।[৫] গৌ র গ ণো দ্দে শ দী পি কা ১৪৯৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; সুতরাং চৈ ত ন্য ভা গ ব ত ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্ব্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্ব্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ এবং তাঁহার সন্তানদ্বয়ের ইতিহাস বৃন্দাবনদাসেব রচিত বলিয়া প্রচলিত নি ত্যা ন ন্দ বং শ-বি স্তা র নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বইটি বৃন্দাবনদাসের রচিত হওয়াই সম্ভব। বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে র আকস্মিক সমাপ্তি দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, বইটি বৃদ্ধাবস্থায় রচিত হইয়াছিল এবং রচনা পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাস পরলোক

১। ঊনবিংশ বিলাস।

২। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
[আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়]॥ ইত্যাদি

৩। নিত্যানন্দপ্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥
[মধ্য খণ্ড, বিংশ অধ্যায়]॥

৪। বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥
[আদিখণ্ডে প্রথম অধ্যায়]॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
[মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায়; অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়]॥

৫। বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥ ১০৯॥

গমন করিয়াছিলেন। এই উক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ ইহা মনে হয় যে, নিত্যানন্দ-প্রভু বর্ত্তমান থাকার মধ্যেই গ্রন্থটির রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

চৈ ত ন্য ভা গ ব ত তিন খণ্ডে বিভক্ত, আদি, মধ্য, এবং অন্ত্য। আদিখণ্ডের পনেরোটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর গয়া গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে সাতাইশটি অধ্যায়; মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণেই মধ্যখণ্ডের সমাপ্তি। অন্ত্য খণ্ডে দশটি মাত্র অধ্যায়; ইহাতে সন্ন্যাসের পর নীলাচল গমন এবং নীলাচলে বাসকালীন কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ এবং বৃন্দাবন গমনের কোন উল্লেখ নাই।[১] অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনদাসের পাটবাটীতে একখানি পুঁথি পান, তাহা বাহ্যতঃ চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে র অন্ত্যখণ্ডের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়। এই গ্রন্থের ১৬২৮ শকাব্দে লিখিত একটি দ্বিতীয় অনুলিপি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হস্তগত হয়। এই দুইটি পুঁথি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় ৪২৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে র এই "অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়" প্রকাশ করেন। এই তিনটি অধ্যায় যথার্থই বৃন্দাবনদাসের রচনা কিনা তাহার আলোচনা পরবর্ত্তী প্রস্তাবে করিব।

চৈ ত ন্য ভা গ ব ত বৃন্দাবন দাসের inspired রচনা। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র এবং নিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা কবিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, এই সুবৃহৎ কাব্যটির মধ্যে কবির লেখনী কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কাব্যটির মধ্যে কবিত্ব ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না, তথাপি চৈতন্য-চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য্য এবং কবির অন্তর হইতে স্বতঃউৎসারিত অজস্র ভক্তিরস চৈ ত ন্য ভা গ ব ত কে একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের পদে উন্নীত করিয়াছে। চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র যে কোন স্থান পড়িলেই ভক্ত কবির আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা বলিয়াছেন[২] তাহাই চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র ন্যায্য এবং উপযুক্ত প্রশংসা,

> অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
> চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥
> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
> চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
> বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
> যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
> *   *   *
> চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
> সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
> মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
> বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
> বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
> ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
> নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
> তাঁর গর্ভে জন্মিলেন দাস বৃন্দাবন॥
> তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
> যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব স্থাপনের জন্য বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যলীলার সঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। তবে এইরূপ শ্লোকের সংখ্যা বেশী নহে। পাষণ্ডীদের প্রতি ঘৃণাসূচক উক্তি চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণও ছিল। প্রথম কারণ, সে সময়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর নিন্দুকের অভাব ছিল না; দ্বিতীয় কারণ, বৃন্দাবনদাসের জন্মঘটিত কিছু কুৎসা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। (কবিকে যে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি এতৎসম্বন্ধীয় কিছু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?) ইহার জন্য হয়ত কবিকে সাধারণ জনসমাজে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল। সেইজন্য কবির লেখনীতে যে মধ্যে মধ্যে তিক্ততা ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তথাপি এই তিক্ততাকে কবি যথাসাধ্য মন্দীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও বলিতে হইবে।

চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র কাব্যাংশের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; কিরূপ স্বল্প আয়োজনে বৃন্দাবনদাস বর্ণনীয় বিষয়ে রং ফলাইয়াছেন তাহা নিম্নের বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

> রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
> তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥

১। আদি খণ্ডে সূত্রমধ্যে সেতুবন্ধে ও মথুরায় গমনের উল্লেখ আছে

২। 'শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত, আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈতসভায়।
আইসেন অগ্রজেরে লবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণকথন মঙ্গল॥

* * *

প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥১

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রথম যৌবনেই নিমাই পণ্ডিত পরম উদ্ধত ছিলেন। সেই সময়ের যে ছবি বৃন্দাবনদাস আঁকিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই পরম রমণীয়। পথে ঘাটে চতুষ্পাঠীতে পড়ুয়া দেখিলেই প্রভু ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীবাস প্রভৃতি বিজ্ঞ বৈষ্ণবও বাদ যাইতেন না। প্রভুকে পথে দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে ইহাঁরা সকলে পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িতেন।

যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে॥
কৃষ্ণ কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাকি বিনু প্রভু কৃষ্ণকথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যাযেন গঙ্গা স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কত দূরে॥
প্রভু দেখি জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিল কোন ভিত॥
প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥১

মুকুন্দ-দত্ত এবং মুরারি-গুপ্ত এই দুইজনের উপরই নিমাই পণ্ডিতের অধিক আক্রোশ ছিল। নিমাই যে টোলে অধ্যয়ন করিতেন মুরারি-গুপ্তও সেই টোলে পড়িত। অনেক পড়ুয়াই নিমাইয়ের নিকট পাঠ বলিয়া লইত, মুরারি তাহা করিত না। ইহা লইয়া দুইজনে খটাখটি লাগিত। শেষ পর্য্যন্ত হার অবশ্য মুরারিরই হইত।

বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুথি চিন্তে তারে করে হাস॥
প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধিকার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুথি না চিন্তয়॥
শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ টঙ্কার।
না বলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার
তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়॥
প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া নাড়ী কর দড়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥
রুদ্র অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিল কেনে বড় ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর॥
সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলে উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি জানিস তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি॥
প্রভু বলে ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥২

এইরূপ human interestএর হিসাবে চৈতন্য-ভাগবত পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়।

১। আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।
২। আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও যৌবন লীলা এইরূপ সহজ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র মধ্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে শ্রীধরের কাহিনীটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কৌতূহলী পাঠককে আদি খণ্ডের দশম অধ্যায় এবং মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায় হইতে শ্রীধরের কাহিনী পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য কাজীর আদেশ অমান্য করিয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস এইরূপে তাঁহার তৎকালীন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন,

চতুর্দ্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য রসে।
হরি বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক হরি বলে আলগ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনকবিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥
আজানু লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে॥
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনককদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥[১]

গৃহত্যাগ করিবার অব্যবহিত প্রাক্কালে মাতার সহিত মহাপ্রভুর সম্ভাষণের যে বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন তাহা মোটেই ঘোরাল বা সাড়ম্বর নহে; বর্ণনাটি অত্যন্ত সরল এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। পেশাদার কবি হইলে এইখানে একহাত লইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত সুতরাং এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে না।

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলে ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার॥
তোমার প্রসাদে মা তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিবাও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহারে পরমার্থে যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাতে দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥[২]

চৈ ত ন্য ভা গ ব তে নানাবিধ সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। ষোড়শ শতকের প্রথম

১। মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

২। মধ্যখণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পাদের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস রচনার পক্ষে এই সকল বিভিন্ন প্রকার তথ্য অতিশয় মূল্যবান। এই বিষয়ে আধুনিক-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে চৈতন্য-ভাগবতের সমকক্ষ কিছুই নাই। চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণ করিবার সময় নবদ্বীপের যে সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ছিল তাহার চিত্র নিম্নে মূল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা রস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

* *

না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

* *

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণ ভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

* *

কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥১
জগত প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যা রসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতী সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে চলে॥
এত যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্য দুঃখ না যায় খণ্ডন॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাক।২
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥৩

* *

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥৪
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥৫

তখনকার দিনে বহির্ম্মুখ "পাষণ্ডী"রা বৈষ্ণবদিগের যেরূপ নিন্দাবাদ ও কুৎসা করিত তাহার বেশ বাস্তব বর্ণনা বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥

১। আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।
২। 'হাঁক' হইবে বোধ হয়।
৩। আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।
৪। মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।
৫। অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।

গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥১
কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
কৃষ্ণ বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হইল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুঞি দেয়ালে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখন বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহ বলে আমরা সবার কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥২
কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি॥
কেহ বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানা বিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহ বলে কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে॥৩

শ্রীচৈতন্যের মহিমা দর্শনে রাঢ়ে ও বঙ্গে অনেক চুনাপুঁঠিও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই তথ্য কেবল চৈতন্যভাগবত হইতেই জানিতে পারা যায়।[৮] নিম্নে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনাকে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনাকে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল।৫
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সেই বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥৬
উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব॥৭

এ যাবৎ যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত ঘটনায় পূর্ণ বলিয়া চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিকত্ব কমাইবার চেষ্টা

১। আদিখণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
২। মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৩। মধ্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়।
৪। ভক্তিরত্নাকরে এই জাতীয় এক জয়গোপালের উল্লেখ আছে। ইনিই কি বৃন্দাবনদাসের উল্লিখিত "গোপাল"?
৫। আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়। ৬। মধ্যখণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়।
৭। মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে রচিত দুই একখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের উল্লেখ আছে বলিয়াই অসংখ্য অসংলগ্ন ও ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ সেই গ্রন্থ গুলিকে প্রামাণিক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্য-ভাগবতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ অতি যৎসামান্য এবং তাহাও বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। এই সকল সমালোচক এবং তথাকথিত অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীও এখনকার দিনে ইহার অপেক্ষা প্রচণ্ডতর আজগবী ঘটনা (বিশেষতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত গুরুর সম্বন্ধে) অক্লেশে গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন! বৃন্দাবনদাসের দোষ এইমাত্র যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসের জন্য তিনি অনেক ঘটনার বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তথ্যকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করেন নাই। নিত্যানন্দ-প্রভু, অদ্বৈত-প্রভু এবং মহাপ্রভুর অনেক পার্ষদের নিকট বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও যৌবনলীলার ঘটনাগুলি অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং চৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা।

উড়াইয়া দেওয়া গায়ের জোরের অথবা মূঢ়তার কাজ। এদিক-ওদিকে (details-এ) তুচ্ছ দুই একটা ভুল থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করা উচিত নহে।

চৈতন্যভাগবত পয়ার ছন্দে রচিত ; দুই এক স্থলে ত্রিপদীর ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা গান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থলে এবং দুই একটি গানের টুকরা অংশে রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে।[১] মূলের কতিপয় অংশেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে, কাব্যটি গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে যে সকল গান বা পদের অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই যে বৃন্দাবন-দাসের রচিত তাহা বোধ হয় না। এইরূপ পদের অংশ দুইটি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

> নাগ বলিয়া ২ চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
> যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥
> কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
> ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ আনন্দে হেরিছে॥৩
>
> বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
> হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥৪

শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান থাকা কালে অদ্বৈত-প্রভু চৈতন্যকীর্ত্তন প্রচলিত করেন। বৃন্দাবনদাসের উক্তি অনুসারে নিম্নে উদ্ধৃত পয়ার শ্লোকটি অদ্বৈত-প্রভু নিজে রচনা করিয়া নীলাচলে গাহিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

> শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
> দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥৫

(ক্রমশঃ)

১। এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে, শ্রী, পঠমঞ্জরী, মঙ্গল নট, ধানশী, কেদার, রামকিরি (রামকেলি), ভাটিয়ারী, মল্লার, করুণা শারদা, পাহিড়া। ২। =বলবান্। ৩। আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।৪। মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৫। অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়।

আর একদিক

জেম্‌স্ চার্টার্স তাঁহার নূতন পুস্তক 'দিস্ মাষ্ট বি দি প্লেস'-এ অনেক মজার লোকের সংবাদ দিয়াছেন। ১৯১৪ সালে সারাজেভোতে অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউক আততায়ীর হাতে প্রাণত্যাগ করেন, যার ফলে ইউরোপে মহাযুদ্ধ সূচিত হয়। উৎসলাক নামে একজন আর্টিষ্ট সেই সময়ে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের অপরাধে ধৃত হন। সমস্ত যুদ্ধের সময়টা তাঁহার সার্বিয়ার এক কারাগারে কাটে।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যখন প্যারিসে ফেরেন, তখন তিনি সর্ব্বস্বান্ত। উদরান্নের সংস্থান নাই—কচিৎ একটি ছবি বিক্রয় হয়, তাহাতেই কোনও রকমে চলে। বিক্রয় হইলে, সেদিন এক মহাকাণ্ড। সার-সার চারিটি ট্যাক্সি করিয়া সেদিন তিনি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমটিতে নিজে, দ্বিতীয়টিতে তাঁহার শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তৃতীয়টিতে হ্যাট, চতুর্থটিতে কোট। সে এক অভিযান।

বাংলা দেশের টিক্‌টিকি-ভুক্‌ মাকড়সা

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, মাকড়সারা কেবল মেরুদণ্ডহীন কীটপতঙ্গের রস-রক্ত চুষিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু সম্প্রতি বিবিধ ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন জাতের মাকড়সা অত্যন্ত উপাদেয়বোধে মাছ, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি নানা জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী ভক্ষণ করিয়া থাকে। কেবল ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে এদেশীয় মাকড়সার টিক্‌টিকি ভক্ষণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ প্রদান করিতেছি।

অনেক দিন হইতেই বিবিধ পোকামাকড় লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম, পরীক্ষাব্যপদেশে একদিন 'কাঠী'-ফড়িং-এর দেহ-পরিবর্ত্তনের বিচিত্র প্রণালীর ফটো তুলিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ ঘসা-কাচখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। নীচে একটি তার খুব টানিয়া বাঁধা ছিল, কাচখানি তারের উপর পড়িতেই কম্পনের ফলে এক প্রকার সুর উৎপন্ন হইল। ঐ স্থানের নিকটে একটু উঁচুতে গায়ে সাদা কালো ডোরা-কাটা খুব সুন্দর একটি বড় মাকড়সা জাল পাতিয়া বসিয়াছিল। এই ঘটনার পূর্ব্বেই মাকড়সাটা আমার নজরে পড়িয়াছিল। তার হইতে সুরের ঝঙ্কার উঠিবার একটু পরেই দেখি—সেই নীরব, নিশ্চেষ্ট মাকড়সাটা যেন অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে। তিন চার বার নাচিয়া উঠিয়াই আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কৌতুক বোধ করিয়া আবার তারে ঘা দিলাম—এবারও ঠিক পূর্ব্বের মতই একবার পায়ের উপর উঁচু হইয়া উঠিয়া আবার জালের উপর চাপিয়া বসিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। কৌতুক কৌতুহলে পরিণত হইল। তবে কি ইহাদের সুরবোধ আছে? ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবস্থানই বা কোথায়? যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাবই সূচিত হয়। তবে হয়তো গায়ের শোঁয়া প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া শব্দের অনুভূতি জন্মায়। সুর-বোধ থাকা না থাকার কথা ওঠে না। অবশ্য মাকড়সার সুর-বোধ সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় এই জাতীয় মাকড়সারা বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট তন্ত্রীতে ঘা দিলে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয় এবং সময় সময় বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গীও করিয়া থাকে।

শিকারান্বেষী টিকটিকি-ভুক মাকড়সা।

এই ব্যাপারে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি সেই মাকড়সাটিকে লইয়া আসিয়া আমার পরীক্ষাগারে জাল পাতিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। বিশেষতঃ, কোন কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে যৌন সংসর্গ ব্যতীত সন্তানোৎপত্তির কথা জানা গিয়াছে। এই মাকড়সা সেই পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। এজন্য ঐ জাতীয় আরও অনেক ছোট বড় মাকড়সা আনিয়া বিভিন্ন ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া

দিলাম। কয়েক খানা চৌকা-ফ্রেমও ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। কতকগুলি মাকড়সা ওই ফ্রেমে আর কতকগুলি এখানে সেখানে ইতস্ততঃ জাল পাতিয়া বসিল। মাঝে মাঝে ছোট বড় প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি ঘরে ছাড়িয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিলেই উহারা ইতস্ততঃ উড়িতে উড়িতে জালে আটকাইয়া
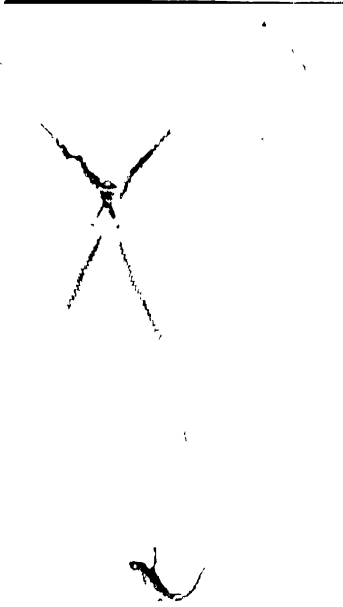
টিকটিকি জালে পড়িয়াছে।

পড়িত। এই জাতীয় মাকড়সার বৈজ্ঞানিক নাম argiope pulchella; যদিও ইহাদিগকে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি বাংলায় ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই।

সম্মুখের পা হইতে পিছনের পা পর্য্যন্ত ৩ ইঞ্চি লম্বা একটি বড় মাকড়সা ঘরের কোণের দিকে তিন ফুটেরও বেশী চওড়া একটি জাল পাতিয়াছিল। একদিন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম, মাঝারি আকারের একটি ফড়িং ওই জালের এক কোণে আটকাইয়া গিয়াছে এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য দ্রুতগতিতে ডানা কাঁপাইয়া ভয়ানক ঝাপটা-ঝাপটি সুরু করিয়া দিয়াছে। এই মাকড়সারা সাধারণতঃ তাহাদের জালের মধ্যস্থলে খুব মোটা করিয়া ঠিক × এর আকৃতিবিশিষ্ট একটি স্থান নির্ম্মাণ করে এবং নীচের দিকে মুখ করিয়া জোড় পায়ে তাহার উপর বসিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করে। এই মাকড়সাটাও সেইভাবে জালের উপর বসিয়া ছিল, ফড়িংএর ঝাপটা-ঝাপটিতে ভয় পাইয়া জালের এক কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার আসিয়া সেই জালের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম, মাঝারি আকারের একটা টিকটিকি ফড়িংটার কাছেই জালের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। টিকটিকি জাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল এবং ঝাপটা-ঝাপটিতে জালটা অনেকখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। খুব সম্ভব ফড়িংটার নড়াচড়ায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দেয়াল হইতে লাফ মারিয়া টিকটিকি এই বিপদে পড়িয়াছিল। জালের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই টিকটিকিটা প্রাণের ভয়ে আরও জোরে ঝাপটা-ঝাপটি করিতে লাগিল কিন্তু জাল ছাড়াইতে পারিল না, কেবল জালটা আরও খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটে তাহা দেখিবার জন্য আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর টিকটিকিটা ক্লান্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে জালের মধ্যে ঝুলিতে লাগিল। মাকড়সাটা ভয়ে জালের টানা বাহিয়া ছাতের একধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তখনও বুঝিতে পারি নাই, মাকড়সাটার এ ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আছে। প্রায় ১৫।২০ মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর টিকটিকিটা আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মাকড়সাটা জালের টানা বাহিয়া নীচে ছুটিয়া আসিয়া একদিকের টানা কাটিয়া দিতেই জালের সে দিকটা উল্টাইয়া আসিয়া টিকটিকির শরীরের অনেকখানি অংশ জড়াইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে আবার ছুটিয়া আসিয়া টিকটিকিটার উপর পড়িল এবং পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে ফিতার মত চওড়া সূতা দিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাধারণতঃ, মাকড়সারা তাহাদের শিকারকে পিছনের দুই পা দিয়া লাটাইয়ের মত ঘুরাইয়া সূতা দিয়া সম্পূর্ণরূপে মুড়িয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে টিকটিকি তাহার নিজের শরীরাপেক্ষা বহুগুণ ভারী এবং বড় হওয়ায় সেইরূপ ঘুরাইয়া

ঘুরাইয়া সূতা জড়াইতে পারিতেছিল না, কেবল টিকটিকির শরীরের এদিক-ওদিক স্তূপাকারভাবে ফিতার মত সূতা

জালেপড়া টিকটিকিকে পুঁটুলাবন্দী করা হইতেছে।

ছুঁড়িয়া দিতেছিল। এই সময়ে শিকার আবার ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়া মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এইবার টিকটিকির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতেই গায়ে জড়ানো সূতা ও জালের কতকাংশ লেজের সঙ্গে লইয়া সে ধপ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল এবং খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সেই সূতা শুদ্ধই ছুটিয়া পলাইল। শিকার হাতছাড়া হওয়াতে মাকড়সাটা যেন কতকটা হতবুদ্ধি ও বিষণ্ণ হইয়া জালের মধ্যস্থলে বসিয়া হাত-পা পরিষ্কার করিতে লাগিল।

এই ঘটনা হইতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, এই মাকড়সারা টিকটিকির মাংসও পছন্দ করে। কিন্তু দৈবক্রমে ঘটিত একটা কোন ঘটনা হইতে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কাজেই সেই মাকড়সাটাকে জাল বুনিবার জন্য একটি ফ্রেমের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। সেইদিন সন্ধ্যাকালেই মাকড়সাটা ফ্রেম জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটা জাল তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যস্থিত × আসনে বসিয়া নূতন শিকারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষাগারসংলগ্ন আবর্জনা রাখিবার একটা ঘর ছিল; তাহাতে অনেক টিকটিকি আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিত। মাকড়সাটিসহ ফ্রেমটিকে সেই ঘরের মধ্যে দেয়ালের কাছাকাছি ঝুলাইয়া দিলাম। টিকটিকিগুলিকে মাকড়সার জালের দিকে আসিতে প্রলুব্ধ করিবার জন্য একটি সরু কাঠের সঙ্গে সমকোণে আর একটি ছোট কাঠ জুড়িয়া সেটাকে ছাতের সঙ্গে জাল হইতে প্রায় এক ইঞ্চি তফাতে ঝুলাইয়া রাখিয়া জালের অপর দিকে স্থাপিত দণ্ডের উপর একটি জীবন্ত ফড়িংকে লেজের দিকে আঠা দিয়া জুড়িয়া দিলাম। ফড়িংটি উড়িয়া যাইবার জন্য অনবরত খুব জোরে ডানা কাঁপাইতে থাকে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া টিকটিকি ওই কাষ্ঠদণ্ড বাহিয়া নীচে

মাকড়সা টিকটিকির রক্ত শুষিয়া খাইতেছে।

নামিয়া ফড়িংটিকে ধরিতে যাইবার সময় মধ্যস্থিত জালে আটকাইয়া যাইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই এরূপ ব্যবস্থা করা
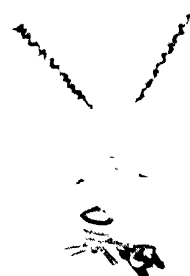
হইয়াছিল। কিন্তু দিন দুই অপেক্ষা করিয়াও আশানুরূপ ফল ফলিল না। দুই একটি টিকটিকিকে এই দণ্ড বাহিয়া নীচে নামিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ফড়িং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ায় ডানা নাড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কাজেই রোজই নূতন ফড়িং ধরিয়া আটকাইয়া দিতে লাগিলাম। একদিন বেলা তিনটার সময় গিয়া দেখি—সত্য সত্যই এবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৩½ ইঞ্চি লম্বা একটি টিকটিকি ফড়িং ধরিতে গিয়া জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। টিকটিকির ভারে জালের অনেকটা জায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং টিকটিকি সেই জালের আঠালো সূতায় জড়াইয়া

টিকটিকির প্রথম ও শেষ অবস্থা বড় করিয়া দেখান।

ঝুলিতেছিল। জাল হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য বারংবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ততক্ষণে মাকড়সা জালের মধ্যস্থিত বসিবার স্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এই সময়ে উহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে টিকটিকি আবার ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল। মাকড়সাটা প্রস্তুত হইয়াই ছিল; একটু নড়াচড়া করিবার পরই ছুটিয়া আসিয়া শিকারকে আক্রমণ করিল এবং সাদা ফিতার মত সূতা বাহির করিয়া তাহাকে মুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। এই সময়েও টিকটিকিটা পূর্ব্বের মতই ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করিতেছিল; কিন্তু মাকড়সার তখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, উপরে, নীচে, এপাশে ওপাশে প্রচুর পরিমাণে সূতা ছাড়িয়া শিকারকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল। সর্ব্বশেষে শিকারের চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূতা জড়াইয়া একটি পুঁটুলীর মত করিয়া তুলিল। অবশেষে পুঁটুলীটির সঙ্গে একটি শক্ত সূতা জুড়িয়া তাহার অপর প্রান্ত জালের মধ্যস্থলে আটকাইয়া দিল। এইরূপে শিকারকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যেন বিজয়গর্ব্বে নৃত্যের ভঙ্গীতে সকল পায়ের উপর উঁচু হইয়া উঠিয়া আবার নীচু হইয়া একপ্রকার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। শিকার আয়ত্ত হইবার পর এই জাতীয় মাকড়সারা প্রায়ই এইরূপ বিজয়নৃত্য করিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত শিকারী চুপ করিয়া থাকিয়া ছিন্ন জালের কিয়দংশ মেরামত করিয়া লইল। সূত্রাবৃত টিকটিকিটি তখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাকড়সা আস্তে আস্তে শিকারের কাছে গিয়া ঘাড় কামড়াইয়া বিষদাঁত ঢুকাইয়া দিল। টিকটিকিটি কতক্ষণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মাকড়সাটা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত টিকটিকির ঘাড় কামড়াইয়াই রহিল। অবশেষে শিকারের পুঁটুলীটি জালের মধ্য স্থলে টানিয়া লইয়া গিয়া চিবাইতে সুরু করিয়া দিল। সারারাত খাওয়ার পর তারপর দিন বেলা এগারোটার সময় দেখিতে পাইলাম, ছোট্ট একটি মাংসের ডেলা অবশিষ্ট আছে মাত্র। সেই ডেলা টুকুতে টিকটিকির কোন চিহ্নমাত্র নেই। ছবিতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। চিবাইবার সময় ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। প্রায় সাড়ে বারটার সময় মাকড়সা খাওয়া বন্ধ করিল এবং অবশিষ্ট টুকরাটুকু মেঝেতে ফেলিয়া দিল। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সেই মাংসের টুকরা পরীক্ষা করিয়া কয়েক টুকরা হাড়, একটু চামড়া এবং থ্যাৎলানো মাথাটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। অতবড় টিকটিকিটাকে খাইয়া মাকড়সাটা ভয়ানক মোটা এবং অলস হইয়া পড়িয়াছিল এবং জালের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নড়াচড়া মোটেই নাই। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত কিছু খাওয়ার বা শিকার ধরিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না, এমন কি সে জালটি পর্য্যন্ত মেরামত করে নাই।

কিছুদিন পরে এই মাকড়সাটা আরেকটি টিকটিকি ধরিয়া খাইয়াছিল। এই জাতীয় মাকড়সার টিকটিকি খাওয়ার অভ্যাস যে কেবল এই কয়টি ঘটনা হইতেই সমর্থিত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এই জাতীয় বিভিন্ন মাকড়সার টিকটিকি খাওয়ার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। *

* আমেরিকার "সায়েন্টিফিক মান্থলি" (আগষ্ট ১৯৩৪, ৩৯ ভলুম্) নামক কাগজে লেখক কর্ত্তৃক এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।—বং সং

ঝান্সীর রাণী

শিল্পী—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনাথ ডাক্তার

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাবে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হইবে তাহারই মহল্লা চলিতেছিল। আমার যাইতে একটু দেরী হইয়াছিল। একটু লজ্জিত ভাবে আসরে বসিলাম। ওপাশ হইতে প্রেসিডেন্ট পবিত্রবাবু ডাকিয়া বলিলেন, ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলেন।

তাঁহার অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন। লম্বাচওড়া, সুস্থ, সবল দেহ। প্রৌঢ়ত্ব বোঝা যায় শুধু চুলের শুভ্রতায় আর দন্তহীনতায়। মাথার চারিপাশের চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু সামনের চুলগুলি বেশ কালো, সযত্নবিন্যস্ত। সম্মুখের গুটি দুই তিন দাঁত নাই, তাহার পরেই দুটি দাঁত বেশ বড় বড়, ঠোঁটের উপর চাপিয়া আছে। কাঁচাপাকা বেশ বড় গোঁফ এক জোড়া, দুই প্রান্ত তাহার পাকাইয়া উঠিয়াছে। দুইটি আয়ত প্রদীপ্ত চোখ। দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয় লোকটি সাহসী, হয়ত বা কিছু উগ্র।

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনার বইখানা পড়ছিলাম। প্রতি-নমস্কার করিয়া আমি একটু হাসিলাম। পবিত্রবাবু তাঁহার পরিচয় আমাকে দিলেন, উনি শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এখানে প্রাক্‌টীস করবেন বলে এসেছেন। আমার ওখানেই এখন রয়েছেন।

বলিলাম, বেশ বেশ। ভাল হল আমাদের, এখানে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের অভাব খুব।

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, আমারও অভাব খুব সামান্যই স্যর। পেটের ভাত আর পরবার কাপড়, অন্ন এবং বস্ত্র। মাসে কড়িপচিশটে টাকা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নিবাস?

শ্রীনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, জন্মস্থান নদে জেলা। কিন্তু বাস করবার কোথাও অবকাশ পাইনি। ঘুরতে ঘুরতেই জীবন কাটছে। দেখি শেষ কটা দিন যদি আপনাদের এখানেই কেটে যায়। সেই খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, পথে কাল পবিত্রবাবুর সঙ্গে আলাপ। চলে এলাম ওঁর সঙ্গে।

··কান মলে দেব এয়ার ছোকরা।···চাচা গলায় 'জগমণি'র চীৎকারে চমকাইয়া উঠিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, ও বাবা!

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও পার্টটা ও করে ভাল। ডাক্তারের দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না, 'জগমণি'র ভাবভঙ্গী দেখিয়া পূর্ণ ভাবে মুখ খুলিয়া হাসিতেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি মেয়েছেলে আনবেন ত?

ডাক্তার জলের মত সচ্ছন্দ গতিতে উত্তর দিলেন, ভাগ্যবান পুরুষ স্যর, স্ত্রী মরে গেছে। ঘোড়া কখনও ছিল না, কাজেই দুর্ভাগ্য কাছ ঘেঁসতেই পারলে না।

—ছেলেমেয়ে?

—ওয়ান মাইনাস ওয়ান। একটা হয়েছিল, তিন দিনের দিন আঁতুড়েই গেছে। জীবনে এক বোতল হরলিকস্ কিনেছি মোটে।—হা হা করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

'জগমণি' চীৎকার করিয়া উঠিল, চোপ, ইষ্টুপিট!

ডাক্তারের হাসিতে টিনের চাল যেন ফাটিয়া পড়িল।

—বড় গোল হচ্ছে মশাই।

গলা মোটা করিয়া কে উইংসের ফাঁক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। বক্তাকে দেখা গেল না—অন্ধকারে শুধু জ্বলন্ত বিড়ি একটা জোনাকীর মত টিপ-টিপ করিতেছিল। ডাক্তার হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আপনাকে যা বলছিলাম। আপনার বইখানার কথা। শোকে এমন অভিভূত হওয়া মানে তার একটি স্থায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া, আমার মতে এ অবাস্তব। দুদিন না হয় চারদিন, তারপর, আবার কি? মন হাঁপায় হাসবার জন্যে, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বিমর্ষ হয়ে থাকতে হয় দায়ে পড়ে। আমি ত অনুভবই করলাম না মশায়।

আমার চোখে দেখা ছবি, কিন্তু সে লইয়া তর্ক করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। নবপরিচিত বলিয়াও বটে আর লেখক বলিয়া যে মর্য্যাদাবোধ বা অহঙ্কার তাহাতেও বাধিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কিন্তু অদ্ভুত লোক, ছাড়িবার পাত্র নয়। আমাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া জোর করিয়া ধরিলেন, আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে আপনাকে।

ঠিক এই সময় একটা গোলমাল উঠিয়া আমাকে ত্রাণ করিল। যে লোকটি পাহারাওয়ালা সাজে সে বাঁকিয়া বসিয়াছে।

—ও পার্ট আমি করব না মশায়। চর, না হয় দূত, গতবার আবার দিলেন অনু-চর। এবার আবার পাহারা-ওয়ালা—এ মশায় আমি করব না।

লোকটাকে পাহারাওয়ালার পার্টও দেওয়া চলে না। সরল সূতা তাড়াতাড়িতে যেমন জট পাকাইয়া বসে—তেমনি কথা কহিবার দ্রুততা হেতু লোকটার কথার মালায় জট পাকাইয়া যায়। এ যুক্তি সে বুঝিবে না। বলে—ক্যানেম শাই এওন কতা কি থাকে নান্ না কি ?

কে বলিল, বেশ তুমি যোগেশের পার্ট কর।

ওদিক হইতে কে ভ্যাঙাইয়া উঠিল, এওন কতা কি থাকে নান্ না-কি ?

লোকটা আর কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। আরও দুই একবার এমনি করিয়া সে চলিয়া গেছে। আমাদের জানা ছিল যে, ও এবার আর ফিরিবে না। আগামী বারে অবশ্য ডাকিতে হইবে না। মহলা বসিবার দিন হইতেই নিয়মিত আসিবে। কিন্তু এবার ও হিমালয়। পাহারাওয়ালা খুঁজিয়া আর পাওয়া যায় না। কে বলিল, বাবুদের চাপড়াশী ধরে নামিয়ে দেব।

কিন্তু কথা আছে যে। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তুমি—তুমি—তুমি ?

সকলেরই পার্ট আছে। যাহার নাই—সে বলিল, আমি ত থাকবই না সে দিন, নইলে—।

—আমাকে দিয়ে চলবে মশাই ?

লম্বা-চওড়া ডাক্তারবাবু উঠিয়া দর্জ্জির দোকানে মাপ দিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। খাড়া সোজা মানুষ, চুল ও দাঁত ছাড়া অবয়বের কোনখানে প্রৌঢ়ত্বের অবসন্নতা একবিন্দু নাই। দেখিয়া আনন্দ হইল।

কে বলিয়া উঠিল, দি ম্যান ফর দি পার্ট। ভগবান যেন পাহারাওয়ালা সাজতেই ওঁকে গড়েছিলেন।

অল্পবয়স্কের দল হাসিয়া উঠিল। আমরা কয়েকজন খুব লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। একটা ধমক দিয়া পবিত্রবাবু কি বলিতে গেলেন—কিন্তু ডাক্তার তাহার পূর্ব্বেই নিখুঁত একটি মিলিটারী অভিবাদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যর, বলুন বলুন, কি বলতে হবে বলুন। আমি কিন্তু মশাই থিয়েটার কখনও করিনি।

প্রম্পটার ওদিক হইতে বলিল, বলুন, সেলাম হুজুর।

ডাক্তার আবার মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া বলিলেন, সেলাম হুজুর।

কে বলিল, উঁহু, হল না। সেলাম কি এমনি না কি ?

গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বলিলেন, পুলিশ সেমি-মিলিটারী।

বক্তা রামসুন্দর পান-বিড়ির দোকান লইয়া মেলায় মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার দোকানে কনেষ্টবলেরা প্রায়ই পান খায়। তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সে প্রহরী সাজে। সে এ কথা মানিল না। বলিল, তা মিলিটারী সেলাম কি ওই রকম নাকি ?

ডাক্তার বলিলেন, 'আর্মি'তে তিন বছর ছিলাম মশাই। মিলিটারী স্যালিউট কি, তা শিখতে তিন বছর সময় কি যথেষ্ট নয় ?

বুঝিলাম ডাক্তার চটিয়াছেন। রামসুন্দরকে আর কষ্ট করিয়া কাহাকেও নিরস্ত করিতে হইল না। 'আর্মি'র উল্লেখেই সে ঘায়েল হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেই সে চুপ করিল, বলিল, কে জানে মশাই। যা ভাল হয় করুন।

মানুষটিকে লইয়া আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না।

* * *

সময়টা শীতের প্রারম্ভ। মাঠে ধান কাটা হইতেছে। পরদিন গিয়াছিলাম ধান কাটার তদারকে। ফিরিতে প্রায় এগারটা হইয়া গেল।

—সুরেন বাবু, সুরেন বাবু !

অপরিচিত উচ্চ কণ্ঠে কে ডাকিতেছিল। ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, মাঠ ভাঙিয়া দ্রুত পদে আসিতেছেন কল্যকার সেই ডাক্তার। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, এমন সময় আপনি ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তিনটের সময় ওঠা আমার অভ্যেস। উঠে দেখি, পবিত্র বাবুর বাড়ী স্বপ্নবিভোর। কি করব, বেরিয়ে পড়লাম। আপনাদের দেশটা দেখে এই ফিরছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন লাগল ?

—মাটী দেখলাম। দেশ দেখতে পেলাম না। তবে কল্পনা করছি এ মাটীর মানুষ ভালই হবে। এই দেশেই বাস করব।

আমি হাসিলাম! ডাক্তার বলিলেন, চলুন আপনার বাড়া যাই।

কথাটা আমারই বলা উচিত ছিল। লজ্জিত হইয়া বলিলাম, চলুন—চলুন।

চলিতে চলিতে ডাক্তার বলিলেন, কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি।

উত্তর দিলাম, নতুন জায়গায় ঘুম সচরাচর হয় না।

—কেন হয় না বলুন ত? সমস্ত রাত্রি অতীত জীবনটা ইতিহাসের পড়ার মত মুখস্ত করেছি।

চট করিয়া উত্তর দিলাম না। কথাটা ভাবিতেছিলাম। ডাক্তার আবার বলিলেন, কেন এমন হয় বলুন ত?

বলিলাম, অপরিচয়ের মধ্যে একটা পীড়া আছে, ডাক্তার বাবু। পারিপার্শ্বিকের মমতাহীনতা আমাদের পীড়া দেয়। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় আমি একা, এরা আমার পর। দোষও নেই, অপরিচিত স্থানে পাই আমরা ভদ্রতা—একান্ত মৌখিক বস্তু। ঠিক তুলোর মত, পরিমাণে হয়ত অনেক কিন্তু ওজন কই তাতে?

কথাটা ডাক্তারের মনে ধরিল, বলিলেন, ঠিক বলেছেন, নতুন জুতো পায়ে দেওয়া আর কি। ভেতরের চামড়ার রং—কষ যতক্ষণ না উঠছে—ততক্ষণ পা দিলেই লাগবে রং, স্নায়ু-শিরা হবে আড়ষ্ট—হোক ছেঁড়া, তবু পুরোনো জোড়ার হাজার গুণ মনে পড়বে।

হাসিয়া ফেলিলাম। ডাক্তার বলিলেন, উপমায় আমার ভুল পাবেন না। বিচার করে দেখুন। জুতো না থাকাটাই হল স্বাভাবিক অবস্থা পায়ের। অথচ জুতো না হলে তার চলবে না। ফোস্কা হবে, টন টন করবে, তবু চাই। মানুষের দেখুন—একা আসে—একা যায়—একাকীত্বই তার সত্য অকৃত্রিম অবস্থা; তবু সে একা—তার কেউ নাই, মনে হলেই বুকে যেন পাথর চেপে বসে।

বলিলাম, তা সত্য।

উৎসাহ পাইয়া ডাক্তার আরম্ভ করিলেন, আবার দেখুন, নতুন জোড়াটি যাই মুখস্থ হল, বাস্, পুরোনো জোড়াটা মাটীতে পুঁতে তার ওপর নারকেল গাছ রোপণ করা হল। তাইত বলছিলাম কাল, আসলে মানুষ হল একা। তার শোক দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। স্ত্রী মারা গেলেন মশাই, তাঁর বাপের বাড়ীতে মারা গেলেন, মা-বোনের কান্না-কাটীতে ঘরের ছাদ ফেটে গেল। সিঁদুর—আলতা—ফুলের মালা দিয়ে তাঁরা শব সাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত ভেঙ্গে গেছে—জিভের আগল নেই, বলে ফেললাম, খালি মদের বোতলে আর সিঁদুর দেওয়া কেন? বাস্, সিদ্ধান্ত হয়ে গেল—মাতাল আমি—আমিই বোতল খালি করেছি। তারপরই—নিকালো হিয়াসে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। চলে এলাম কলকাতায়। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল—গড়ের মাঠের ভিড়—কোথায় যে তার মধ্যে দুঃখ হারিয়ে গেল—সাগরে যেন নদীর ঘোলা জল মিশে গেল। বাস্!

আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। মৃত প্রিয়জনের জন্য বেদনার ক্ষত আরোগ্য হয় মানি, কিন্তু সেখানে দাগ একটা থাকিয়া যায়। সেখানে হাত পড়িলে বেদনায় টন্ টন্ না করুক—অন্ততঃ ক্ষতবেদনার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনুমান করিলাম, স্ত্রী ডাক্তারের প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল—কিন্তু প্রিয়া ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, কি রকম? আপনি যে চুপ করে গেলেন স্যর! জিভের গোড়ায় আসিয়া পড়িল, ভাবছি, এমন সহজভাবে এসব কথা আপনি বলেন কেমন করে?

কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলাম।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মুখুজ্যেদের বাড়ী। কর্ত্তা মুখুজ্যে মহাশয় ধর্ম্মপ্রবণ অমায়িক ব্যক্তি। বাহিরে বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নমস্কার।

মুখুজ্যে মহাশয় সবিস্ময়ে প্রতি-নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিত-ভাবেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন, সুরেশ, ইনি?

পরিচয় আমাকে দিতে হইল না। ডাক্তার নিজেই সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, আপনাদের আশ্রয়ে থাকব বলেই এসেছি। নাম আমার শ্রীনাথ দেবশর্ম্মা, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমি।…আপনি চলুন সুরেশবাবু, আমি গেলাম বলে।

ডাক্তার বোধ হয় আমার অসহিষ্ণু ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমি নিজেও ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ডাক্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করিলাম না।

বৈঠকখানায় হাতমুখ ধুইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে ডাক্তার আসিয়া হাজির হইলেন। চুপ করিয়া থাকা যেন ডাক্তারের অভ্যাস নয়, তিনি বলিলেন, মুখুজ্যে মহাশয়ের সঙ্গে আবার একটা সম্বন্ধ বেরিয়ে গেল মশায়। দূর সম্পর্ক অবশ্য।

বলিলাম, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তারপর উনিই বলিলেন, আপনার মামার বাড়ী নাকি পাটনায় ? আপনার মাতামহের নাম কি বলুন ত ?

পরিচয় দিতেই ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন। প্রকাণ্ড একটা বংশ-পরিচয় আওড়াইয়া সম্বন্ধ তিনি একটা বাহির করিয়া ফেলিলেন, আমার মাতামহ তাঁহার দূর সম্পর্কীয় মামা। ভদ্রতা রক্ষার জন্য প্রণাম করিতে উঠিলাম। ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, ও নয়, সুরেশ বাবু। বন্ধু আত্মীয় হলেন এই আমার পরম লাভ। মরি যদি তবে সৎকার হবে এই ভরসাই যথেষ্ট। ঐ টুকুই আমার আত্মীয়তার দাবী রইল। প্রণামের চেয়ে বরং চা আনতে বলুন।

তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম।

চা লইয়া ফিরিয়া দেখি ডাক্তার খবরের কাগজ পড়িতেছেন। চা টা আগাইয়া দিলাম। ডাক্তার সহাস্যমুখে কাগজখানা একটু সরাইয়া দিয়া বলিলেন, পুলিশের বড়-কর্ত্তার কাছে একখানা দরখাস্ত করব। পুলিশ এখন সত্যিই নারীহরণের প্রতিকারে মন দিয়েছে।

তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার বলিলেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার স্ত্রীকে 'বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

বিস্ময়ের আমার সীমা ছিল না। প্রশ্ন করিলাম, সে কি ? তবে যে—

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। হরণকর্ত্তা দুর্বৃত্ত যম।

তারপর হো-হো করিয়া হাসিয়া ঘরখানা যেন ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

এতটা আমার ভাল লাগিল না। হয়ত ঠিক বলা হইল না, মনটা আমার বিষাইয়া উঠিল। বলিয়া ফেলিলাম, মাপ করবেন ডাক্তার বাবু, আপনার স্ত্রীর জন্যে আপনার মনে কষ্ট হয় না ?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, হাত পুড়িয়ে রান্না করবার কষ্ট যেটুকু—দুঃখই বলুন আর শোকই বলুন সেও ঠিক ওইটুকু। ওজন করলে এক তিল বেশী হবে না।

সবিস্ময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, এখন রান্নার কষ্ট সহ্য হয়ে গেছে, শোক বাক্যটার বানান পর্য্যন্ত মনে নেই। দৈবাৎ কোন দিন হাত-টাত পুড়ে গেলে নেশার খোঁয়াড়ীর মত মাথার মধ্যে একটু বোঁ-বোঁ করে দেখা দেয়। সে একটু ওষুধ লাগিয়ে এক গ্লাস জল খেলেই ঠাণ্ডা !

আবার ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত ততখানি জোরে নয়। বোধ হয় আমার বিরক্তি তিনি বুঝিয়াছিলেন। আমি নীরব হইয়া ভাবিতেছিলাম, মানুষের বৈচিত্র্যের কথা। আকারে, অন্তরে প্রত্যেক জন স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। এই শোকেই ত কতজন পাগল হইয়া যায়। আমার নিজের কথাতেই জানি, দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমার পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে মারা গেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এমন একটি দিন যায় না, যেদিন তার সকরুণ মুখ আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সে আসিয়া না দাঁড়ায় ! আজকে ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বুকের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখে জল আসিয়াছিল, কোনরূপে গোপন করিলাম। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস বাধা মানিল না।

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন। আমার মনে হইল, সে হাসি যেন ছুরীর মত তীক্ষ্ণ। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আমার হারানো মেয়েটি যেন শিহরিয়া উঠিল। ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন। আমি প্রচ্ছন্ন ঘৃণাভরেই বলিলাম, বেলা অনেক হল, আপনি আসুন ডাক্তার বাবু।

* * *

দিন তিনেক বাড়ীতে ছিলাম না। কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিলাম তৃতীয় দিন রাত্রে। সকাল বেলা একটি কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখি, পাড়ার ছেলেরা হাট বসাইয়া ফেলিয়াছে।

তাহার মধ্যে দেখি আমার তিন বৎসরের মেয়েটি পর্য্যন্ত দুই-হাত তুলিয়া নাচিতেছে। বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম —এই তিন দিনের মধ্যে আমার বাড়ীটাকে এমন শিশু-মঙ্গল-মঠ বানাইয়া তুলিল কে? আমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল আমার মেজ ভাই। আমার বিস্মিত মনোভাব বোধ করি সে বুঝিয়াছিল, বলিল, শ্রীনাথবাবুর মক্কেল সব।······ওই যে ডাক্তারবাবু আসছেন।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারের নাতিউচ্চ প্রাচীরটার ওপাশে ডাক্তারের মাথা দেখা যাইতেছে।

—নমস্কার! কখন এলেন? কাল রাত্রে বোধ হয়! ওদিক হইতেই ডাক্তার সম্ভাষণ করিলেন।

প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, পসার যে জমিয়ে তুলেছেন দেখছি।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন, কান টানলে মাথা আসে জানেন ত। ছেলের হাত ধরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকব।

ছেলের দল এমন কলরব করিয়া উঠিল যে, আমার আর উত্তর দেওয়া হইল না। বাগানের মধ্যে বাঁধান বেঞ্চটার উপরে বসিয়া ডাক্তার বলিলেন, ভোর বেলাতে কার জয়? সমস্বরে ছেলেগুলা চেঁচাইয়া উঠিল, সুয্যি মামার জয়।

—তাঁকে সবাই প্রণাম কর।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল কচি কচি হাতগুলি তুলিয়া নমস্কার করিল।

তারপর ডাক্তার বলিলেন, লাইন করে দাঁড়াও সব।

এইবার ঔষধ পরিবেশন আরম্ভ হইল। এক পুরিয়া করিয়া সুগার অব মিল্ক। তৃতীয় ছেলেটিকে ঔষধ দেওয়া হইল না। তাহাকে লাইন হইতে বাহির করিয়া অন্য স্থানে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, তুই পরে ওষুধ পাবি। তোর নাক দিয়ে সিক্‌নি ঝরছে।·· এই—এই—জিভ দিয়ে চেটে খাসনে। ঝেড়ে ফেল।

আবার আর একজনকে ধরিয়া বলিলেন, এই হাঁদা, তোর পেটের অসুখ কেমন আছে?

—কাল রাত্রে একবার পেট কামড়েছিল শুধু। ভাল হয়ে গিয়েছে, মা বলছিল।

—তুইও বাইরে দাঁড়া।

এ লাইন শেষ হইলে ডাক্তার কয়টা শিশি বাহির করিয়া বসিলেন, পৃথক ভাবে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা এইবার ঔষধ পাইবে।

এদিকে চা আসিয়া পড়িয়াছিল, ডাক্তারকে বলিলাম, চা এসেছে আপনার শিশু-মঙ্গল শেষ করুন।

ডাক্তার বলিতেছিলেন সরকারদের সুধীরকে, দাঁড়া তুই একটু। তোর বাবাকে দেখতে যাব।

সরকার-পরিবার আমাদের প্রতিবেশী। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে সুধীরের বাপের?

ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, আরে মশায়, আপনারা প্রতিবেশীর খবর রাখেন না! লোকটা আজ দশদিন শয্যা-শায়ী, এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নানান গোলমাল, জ্বর, কোমরে একটা এ্যাবসেস উঠছে।

সুধীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাটের পয়সা নাই আজ ডাক্তার বাবু।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক মারিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, চল চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার। আবার দত্তপাড়ার আড্ডায় যেতে হবে।

দত্তপাড়ার আড্ডা গ্রামের একটি বিখ্যাত আড্ডা, কড়ি, কলম প্রভৃতি নানা চিহ্নযুক্ত গোটা বিশেক হুঁকা অগ্নিগর্ভ বয়লারের মত অবিরাম সেখানে ধূমোদ্গীরণ করে। বয়সের তারতম্যের কোন বালাই নাই। ভাগবৎ পুরাণ, রাজনীতি, আইন আদালত, পরনিন্দা, এমন কি পরস্ত্রী-চর্চ্চা পর্য্যন্ত অবাধে অনুশীলিত হইয়া থাকে।

তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেখানে?

হা-হা করিয়া হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, ও আড্ডারও সভ্য হয়েছি মশাই।

তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, বন্ধু হিসেবে হয় ত ওরা ভাল নয় সুরেশ বাবু, কিন্তু সঙ্গী হিসেবে ওরা বড় ভাল। সময়ের ওদের কোন মূল্য নেই।

কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, ডাক্তার উদার-চরিত ব্যক্তি। সমস্ত দিনের মধ্যে ভদ্রলোকের অবসর নাই। বসুধার এই ক্ষুদ্রতম অংশটির প্রত্যেকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে করিতে সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। কোন কোন দিন দশ

এগারটাতেও সঙ্কুলান হয় না। পাশায় কিম্বা দাবায়, বা বিনা পয়সায় কোন রোগীর শিয়রে পুনরায় প্রভাত হইয়া যায়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ডাক্তারের বন্ধু।

হাসি আর রহস্য ছাড়া শ্রীনাথ ডাক্তারের কথা নাই। চেষ্টাকৃত রহস্য বা রহস্যের মাত্রাহীনতার জন্য অনেকে অনেক সময় বিরক্ত হয় কিন্তু ডাক্তারের অট্টহাসির অভাব হয় না। রহস্য করিবার লোক না পাইলে ডাক্তার রোগী খুঁজিয়া বেড়ান।

কোন অবলম্বন না থাকিলে ডাক্তার আমার মাথা খাইতে আসেন। ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ আসিয়া চাপিয়া বসিয়া বলেন, কি লিখলেন আজ? কই পড়ুন শুনি।

লোকের বিরক্তি ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, সে কথা আমার কানেও আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে আমিও বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেদিন ইঙ্গিতে সে ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম, একটা ডাক্তারখানা করে বসতে আরম্ভ করুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, একটা ঘর দেখে দিন না!

খানিক পরে ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একা যে থাকতে পারিনে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

* * *

অকস্মাৎ ডাক্তারের জীবনে একটা পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দিন পাঁচেক ডাক্তারের দেখা না পাইয়া সেদিন ডাক্তারের বাসায় গিয়া উঠিলাম।

ডাকিলাম, ডাক্তার বাবু!

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, আসুন।

আমি কিন্তু উত্তরে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ডাক্তারের মুখস্ত-করা রসিকতা একটি। ইহার পূর্ব্বে ডাক্তার বলিতেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, মেয়েদের সরে যেতে বলি।

প্রথম দিন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ডাক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলাম।

আজ ভিতরে গিয়া দেখি ডাক্তার একরাশ বই লইয়া বসিয়া আছেন। একখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একখানা চিকিৎসাশাস্ত্রের বই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? রসশাস্ত্র ছেড়ে হঠাৎ রসায়ন নিয়ে পড়লেন যে?

ডাক্তার মুখ তুলিলেন। গভীর চিন্তায় সমস্ত মুখখানা থম থম করিতেছে। চশমার ভিতরে বড় বড় দীপ্ত চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত স্থির, পলকহীন। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, ভেরি ইণ্টারেষ্টিং কেস মশায়।

তার পর বাঁ হাতের আঙুল দিয়া সামনের একগোছা চুল লইয়া অনর্থক পাক দিতে দিতে আবার বলিলেন, এ্যালো-প্যাথরা কেউ বলে প্যারালিসিস, কেউ বলে নার্ভাস ডিরেঞ্জমেণ্ট, কেউ বলে ফাইলেরিয়া। কিন্তু আমার—

ডাক্তার আবার বইএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কি মনে হয়?

দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখি—এখনও স্থির সিদ্ধান্ত কিছু করতে পারিনি।

ডাক্তারকে বিরক্ত করিলাম না, উঠিয়া পড়িলাম। ডাক্তার একখানা বই বন্ধ করিয়া বলিলেন, উঠছেন? দুটো ভাত আজ পাঠিয়ে দিতে পারেন? রান্নার হাঙ্গাম আজ আর করব না। কাল রাত্রেও খাইনি।

বলিলাম, সে কি?

আর একখানা বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন, ভেরী ইণ্টারেষ্টিং কেস মশাই।

* *

এই একটি রোগীর চিকিৎসা করিয়াই ডাক্তার এ অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করিলেন। রোগীটি অবশ্য বাঁচে নাই। কিন্তু সে কলঙ্কও ডাক্তারকে স্পর্শ করিল না। শেষের দিকে রোগীর দেহের কয়েকটি স্থান পাকিয়া উঠিতেই এ্যালোপাথরা ছুরী চালাইবার জন্য রোগীটিকে ছিনাইয়া লইয়াছিল। রোগীর আত্মীয়-স্বজন ডাক্তারকে মত জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার বলিয়াছিলেন, বাঁচবে কি না আমি বলতে পারিনে—বরং একটু সন্দেহই হয়। কিন্তু কাটাকাটি করলে ফল ভাল হবে না এটা নিশ্চয়। হইয়াছিলও তাই।

ফলে ডাক্তার প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, ডাক্তার কল-বাক্স সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। শুধু

তাই নয়, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের বাসায় প্রকাণ্ড একটি আসরও জমিয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পূর্ব্বে ডাক্তারের যাওয়ায় যাহারা বিরক্ত হইত তাহারাও এ অবস্থায় আসিতে দ্বিধা করে না। আমিও যাই। আড্ডা চলে, ডাক্তার কিন্তু অধিকাংশ সময় ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকেন। ডাকিতে গেলে দেখা যায়, ডাক্তার একরাশ বই সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন, মুখ উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, টি-বি, মানে, যক্ষ্মা কত রকম জানেন?

একটু থতমত খাইতে হয়। ডাক্তার ইত্যবসরে আবার আরম্ভ করেন, ভয়ঙ্কর ব্যাধি, মৃত্যুর নিঃশ্বাস থেকে বোধ হয় এর উৎপত্তি। সেদিন একটা মাদার-টিঞ্চারের শিশি দেখাইয়া বলিলেন, এ ওষুধটা কিসের থেকে তৈরী জানেন? কলার কন্দ থেকে। বিষ থেকে পর্য্যন্ত ওষুধ তৈরী হয়। বিষের মধ্যেও অমৃত আছে। অদ্ভুত সৃষ্টি ভগবানের।

অকস্মাৎ ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র-মন্থন কাহিনীটা আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমি কিন্তু করি। সমুদ্রের তলদেশে এমন সব উদ্ভিদ, জীবজন্তু আছে যা থেকে অমৃত প্রস্তুত হয়।

* * *

দুই তিন দিন পর। বৈকালের দিকে একপশলা বৃষ্টির পর সূর্য্যকিরণে আকাশ একখানা অখণ্ড অসীমবিস্তার গাঢ় নীল স্ফটিকের মত ঝলমল করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম, হঠাৎ?

প্রশ্ন-সমাপ্তির পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিলেন, একটু বেড়াতে যাব, যাবেন?

এমন প্রসন্ন অপরাহ্ণ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি আমারও ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাক্তার চিন্তাকুল ভাবেই পথ চলিয়াছিলেন। আমরা দুইজনে নদীর ধারে আসিয়া বসিলাম।

ডাক্তার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার সেই বইখানার কথা আজ সমস্ত দিন ভেবেছি সুরেশ বাবু।

কৌতূহল হইল। প্রশ্ন করিলাম, কেন বলুন ত?

ডাক্তার গভীর চিন্তার মধ্য হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, প্রথম দিনই এ প্রশ্ন আপনাকে করেছিলাম মনে আছে আপনার?

আমার মনে পড়িল, কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না।

ডাক্তারই আবার বলিলেন, শোকের স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন—এমন কি, চিরজীবনই ধরুন। আমি শুধু ভাবছি আপনি যা দেখিয়েছেন এটা বাস্তব কি না?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কি অবাস্তব মনে হয়?

ধীরে ধীরে ডাক্তার উত্তর দিলেন, হত, যদি আপনার নায়ক মদ না খেত। মদ খেয়ে সে যদি ভবিষ্যত জীবনের আশা-আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না ফেলত, তবে অবাস্তব হত। ভবিষ্যতের আশা-আলো যতক্ষণ জ্বলবে—ততক্ষণ শোক স্পর্শ করে জলের মত। একটু পরেই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ বিষ বলুন বিষ—অমৃত বলুন অমৃত। কোটী কোটী নমস্কার এর আবিষ্কারককে।

ডাক্তার পকেট হইতে ছোট একটি ফ্লাস্ক বাহির করিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, প্রশ্ন করিলাম, ও কি?

ডাক্তার বলিলেন, মদ। আপনি মদ খান?

বিরক্তিভরে বলিলাম, না।

ধীর ভাবে ডাক্তার বলিলেন, আমি খাই, বহুকাল থেকে খাই। স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, সে প্রায় চব্বিশ বছর, নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে খেয়ে এসেছি। তিনি নিজে ঢেলে দিতেন আমি খেতাম। স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর উন্মত্তের মত অপরিমিত পান করেছি। কিন্তু এর চেয়েও প্রবল নেশা আছে সুরেশ বাবু—পৃথিবী দূরের কথা—মদের তৃষ্ণাও ভুলিয়ে দেয়।

কিছুদিন হইতেই ডাক্তারের চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সন্দেহ হইতেছিল, হয় ত বা ডাক্তার বেশ প্রকৃতিস্থ নন্। আজ সে সন্দেহ ঘনীভূত হইল। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম, দেখছেন ডাক্তার বাবু, সন্ধ্যাস্তের রং-এর বাহার!

ডাক্তার একবার আকাশের দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন। ওপারে নদীর ঘাটে জল লইয়া কয়টি মেয়ে গ্রামে ফিরিয়া চলিয়াছিল।

ডাক্তার বলিলেন, মেসোপটেমিয়ার কথা মনে পড়ছে। সেখানে অবসর পেলে এমনি বসে সম্মুখের পানে চেয়ে দেশের

কথা ভাবতাম। টেণ্টের সম্মুখে যে দিন বসতাম সেদিন টেবিলের উপরে থাকত হুইস্কি আর বিয়ারের বোতল। সেই খানেই মদের এই গুণের পরিচয় পাই। অতীতকে উজ্জ্বল করে তোলে—বিস্মৃতির বন্ধ দ্বার ভেঙে বেদনাকে বুকের মধ্যে মুক্তি দেয়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, চলুন ডাক্তার বাবু ওঠা যাক।

উঠিতে উঠিতে ডাক্তার বলিলেন, আজ আমার ফুলশয্যার দিন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যেও আমার স্ত্রীর মুখ আমি একবারও মনে করতে পারলম না সুরেশ বাবু। নিবিষ্ট মনে যতবার চিন্তা করতে গেলাম, মনে জেগে উঠল ক্ষয় রোগ আর তার ওষুধ। ডাক্তার নীরব হইলেন। মৌন মূঢ় অন্ধকারের মধ্যে দুজনে নির্জ্জন পথে চলিয়াছিলাম। লাল কাঁকড় বিছানো পাকা রাস্তাটার উপরে দুজনের জুতার শব্দ একসঙ্গে সৈনিকের পদশব্দের মত বাজিতেছিল। এটি ডাক্তারের গুণ। ভদ্রলোক যে কোন সঙ্গীর সঙ্গে কয়েকবার পা মিলাইয়া লইয়া একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন এবং চলেনও। চলিতে চলিতে ডাক্তার আরম্ভ করিলেন, অথচ আমার স্ত্রী শুদ্ধমাত্র আমার স্ত্রীই ছিলেন না, আমার প্রেমতমাও ছিলেন। চিরদিনই আমি উদ্দাম প্রকৃতির, প্রথম যৌবনে বাবার শাসন মানি নি। মেডিকেল সিক্সথ ইয়ার পর্য্যন্ত পড়েছিলাম। কিন্তু বাবাকে উপেক্ষা করবার জন্যই পরীক্ষা দিলাম না, হোমিওপ্যাথি পড়তে আরম্ভ করলাম। সেই আমার মত উদ্দাম, তার ওপর তখন আমি মাতাল—আমি স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলাম। তার হাত ছাড়া মদ খাবার অধিকার তিনি আমায় দেন নি, আমি কোন দিন খাই নি।

হঠাৎ একটা জীবের যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আবার শব্দ উঠিল। বুঝিলাম সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। তাড়াতাড়ি টর্চ্চটা জ্বালিয়া শব্দলক্ষ্যে আলোক-পুচ্ছটা ঘুরাইয়া দেখিলাম। ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান—দেখি, টর্চ্চটা দেখি।

গভীর খাতের মধ্যে আলো ফেলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি দেখিতে দেখিতে ডাক্তার খাতের মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, কোথায় যাচ্ছেন? সাপটা ওইখানেই কোথাও আছে। আহারের সময় বিঘ্ন দিলে বড় ভয়ঙ্কর হয় ওরা।

ডাক্তার সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। জঙ্গলটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার কতকগুলা আগাছা তুলিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কি?

বাঁ হাতে টর্চ্চ জ্বালিয়া সেগুলি দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন, চেনেন?

চিনিতে পারিলাম না। ডাক্তার বলিলেন, চেনেন না যখন তখন থাক। এ আমার প্রোফেসনাল সিক্রেট।

ডাক্তার হাসিলেন। ডাক্তারের মুখের দিকেই চাহিয়া-ছিলাম—অন্ধকারের মধ্যে ভুল বুঝিলাম কিনা কে জানে, কিন্তু মনে হইল অল্পক্ষণ পূর্ব্বের সে মানুষ এ নয়। সমস্ত রাস্তার মধ্যে ডাক্তার আর একটা কথাও কহিলেন না।

পরদিন বাড়ীতে একটা ছোটখাটো নিমন্ত্রণের ব্যাপার ছিল। পাড়া প্রতিবেশী এবং স্বজন বন্ধুদের নামের ফর্দ্দ করিয়া মেজভাইকে বলিলাম, ডাক্তারকে নেমন্তন্ন তুমি করে এস।

কিছুক্ষণ পর সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাক্তার আসতে পারবেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন?

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, ডাক্তার বেশ প্রকৃতিস্থ নাই। অচেতনের মত পড়ে আছেন। মনে হল সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন। ঘরে মদের গন্ধও উঠছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক হইতে আমার অজ্ঞাত-সারেই যেন ঝরিয়া পড়িল। শুধু বলিলাম, হুঁ।

মেজভাই বলিল, উঠোনময় কাঁচের শিশি, টেষ্ট-টিউব ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে আছে। পাশের ময়রারা বললে সমস্ত রাত্রি নাকি ভদ্রলোক উঠোনে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর শিশি-গুলো ভেঙেছেন।

সে বেলা আর পারিলাম না, অপরাহ্নে ডাক্তারের বাসায় গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হইলেও তিনি অপ্রকৃতিস্থ নন্। একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলাম, কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু?

—সমস্ত রাত্রি কাল মদ খেয়েছি আর কতকগুলো যন্ত্রপাতি ছিল—সেগুলো ভেঙেছি।

—যন্ত্রপাতি ! কিসের যন্ত্রপাতি ?

ডাক্তার বলিলেন, মাদার-টিঞ্চার তৈরী করবার। যুদ্ধের পর ফিরবার সময় আমি আমেরিকা ঘুরে আসি। সেখান থেকে মাদার-টিঞ্চার তৈরী করতে শিখে আসি।

ডাক্তার নীরব হইয়া উঠানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কাঁচের টুকরাগুলি রৌদ্রসম্পাতে ঝকমক করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, ওইখান থেকেই এই অভিশাপ আমি বয়ে নিয়ে আসি।

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, অভিশাপ বৈকি। মাদার-টিঞ্চার তৈরী করতে শিখে হঠাৎ খেয়াল হল কি জানেন, আমাদের দেশের ভেষজ থেকে নতুন ওষুধের মাদার-টিঞ্চার তৈরী করব। এ দেশের রোগ, এদেশেই তার প্রতিষেধক ভেষজ আছে। তাই আরম্ভ করলাম। কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে দু তিনটে ছোটখাটো অসুখের ওষুধে কৃতকার্য্য হয়ে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম, সুরেশবাবু। সব তুচ্ছ হয়ে গেল, স্ত্রী পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন, আমার অবহেলায়। আমি তখন পাগল হয়ে উঠেছি যক্ষ্মার ওষুধের জন্যে। আয়ুর্ব্বেদ থেকে ভেষজের নাম সংগ্রহ করি আর মাদার-টিঞ্চার তৈরী করবার চেষ্টা করি। প্রাক্‌টীস প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। স্ত্রী একদিন অনুযোগ করলেন। যেদিন তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম সুরেশবাবু—সেদিন তাঁর কি আনন্দ। আমার অহঙ্কারে, গৌরবে, তাঁর যেন মাটীতে পা পড়ছিল না। এরপর থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। কোনদিন কোন অভিযোগে তিনি আমায় বিরক্ত করেননি। তার ওপর সেবা—অক্লান্ত সেবা। একদিন মনে হল, আমার আবিষ্কারে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি। পরীক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, বাড়ীর ওই পোষা বেড়ালটার ওপর পরীক্ষা আরম্ভ করব। আমার স্ত্রীর পোষা বেড়াল—বড় শান্ত—আর তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

ডাক্তার নীরব হইলেন। আমিও নীরব। বহুক্ষণ নীরবতার পর আমিই প্রশ্ন করিলাম, তারপর ?

ডাক্তার বলিলেন, তারপর আর কি ? বেড়ালটাকে তিনি আদর যত্ন করতেন, তা থেকেই বিষ তাঁতেও সংক্রামিত হল। একেবারে গ্যালপিং থাইসিস। দিনকয়েকের মধ্যেই সব শেষ।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার স্বল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, তখন আমি এতদূর মত্ত যে, রোগের আরম্ভে আমি বুঝতেই পারিনি। তখন তাঁর দিকে লক্ষ্য করবার অবসরও আমার ছিল না। শরীর খারাপ দেখেই তাঁকে আমি জোর করে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। একবার কারণ খুঁজেও দেখলাম না। তারপর ভাবলাম, নিশ্চিন্ত এইবার। খাবার জন্যে জ্বালাতনের হাত এড়ান গেল। তারপর যখন টেলিগ্রাম পেয়ে গেলাম তখন আর উপায় ছিল না। আমায় দেখেই প্রথম তিনি কি বলেছিলেন, জানেন ? হেসে বলেছিলেন, এখানে সকলে ভয় পেয়ে গেছে, ওগো, তুমি কি ওষুধ বের করলে সেই ওষুধ আমায় দাও তো !

জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ওষুধ দিয়েছিলেন ?

—না। তখন বেড়ালটার উপর পরীক্ষায় বিফল হয়েছি, আর আমেরিকার ডাক্তারেরা পরীক্ষার ফলে জানিয়েছেন আমার আবিষ্কারের কোন মূল্য নাই—একান্ত অসার।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল, জলকণায় বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মেঘলা আকাশের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ চিত্তে ডাক্তারের কথাই ভাবিতেছিলাম। ডাক্তারও নীরবে বসিয়া ছিলেন। কতক্ষণ পর জানি না ডাক্তারই বলিয়া উঠিলেন, শোকও সহ্য হয় না। ভাবি হেসে উড়িয়ে দেব। মানুষের সাহচর্য্য খুঁজি। মানুষ বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার ওপর জীবিকার সমস্যা। বাধ্য হয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু এমনি প্রচণ্ড মোহ এর সুরেশ বাবু, আরম্ভ করলে আর রক্ষা নাই। অকস্মাৎ এই সর্ব্বনাশা নেশা ঘাড়ে চেপে বসে। কাল সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্য করেছিলেন কি সেই ভেষজগুলো পেয়ে আমার পরিবর্ত্তন ? কিন্তু কাল আত্মরক্ষা করেছি—সব ভেঙে ফেলে দিয়েছি।

* * *

ইহার কিছু দিন পর ডাক্তার অকস্মাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। আমার সহিত কিন্তু আর একদিন ডাক্তারের দেখা হইয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষ্যে মাস দুই কলিকাতায় থাকিয়া ফিরিবার পথে গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, ডাক্তার ষ্টেশন-প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে। মদে বিভোর ডাক্তার 'যোগেশে'র পার্ট করিতেছিলেন—মরচে মর মর। আমি কি করব ? আমি মদ খাইনে।

—'এই—এই—একটা পয়সা দাও না—একটা পয়সা দাও না।'

আমি ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম ছি—ডাক্তারবাবু !

মাতালের হাসি হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, পার্টটা কেমন হচ্ছে বলুন ত ?

স্থানীয় চিত্রশালা গঠনের অন্তরায়

—শ্রীরমেশ বসু

আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ক্রমেই যেমন ইহা নানাদিকে বিস্তৃত হইতেছে তেমনই বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনার নানারূপ অসুবিধা দেখা দিতেছে। সরকারী, বে-সরকারী এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালায় নানা প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হইতেছে। তাহাতে ঐগুলি রক্ষিত হইতেছে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐগুলির প্রকৃত আদিস্থান নির্ণয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না। শুধু প্রাপ্তিস্থানের নাম পাওয়া যায়। এই কারণেই বিশেষভাবে প্রাদেশিক মূর্ত্তিতত্ত্ব আলোচনায় বিষম অসুবিধা উপস্থিত হয়।

মুসলমান-পূর্ব্বযুগে যে স্থানে মূর্ত্তি স্থাপিত হইত, সেই স্থানের লোকেরা ঐ সব মূর্ত্তি পূজা করিত। তখন এক স্থানের মূর্ত্তি অন্য স্থানে নীত হইবার কোনও অবকাশ হইত না। কিন্তু মুসলমান যুগে নানা কারণে এক অঞ্চলের মূর্ত্তি অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। কোনও ধর্ম্মস্থান বিধ্বস্ত হইলে লোকে প্রাণ ও মানভয়ে পলাইবার পূর্ব্বে বৃহৎ মূর্ত্তিগুলিকে জলাশয়ে বিসর্জ্জন দিত এবং ছোট ছোটগুলিকে সঙ্গে লইয়া দূরদেশে চলিয়া যাইত। আরও শুনিতে পাওয়া যায়, সে যুগের সাধু-সন্ন্যাসীরা নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গলায় ঝুলাইয়া বা ঝুলিতে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং কোনও শিষ্যের যথোচিত ভক্তি দেখিলে তাহাকে দিয়া যাইতেন। এইরূপে বহু মূর্ত্তি সেকালে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইবার নূতন কারণ ও পদ্ধতি প্রচলিত হইল। কোনও কোনও সম্পন্ন হিন্দু ভদ্রলোক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ক্রয় বা হস্তগত করিয়া নিজ বাসস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। আর একটি নূতন পদ্ধতি হইল সরকারী চিত্রশালার জন্য মূর্ত্তি সংগ্রহ করা এবং এই জন্য আইনও প্রচলিত হইল। ক্রমশঃ এই পাশ্চাত্য পদ্ধতি এত উগ্র হইয়া উঠিল যে, এই সব মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা একটি লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিল। যাঁহারা সেই যুগে এই সব নানা উদ্দেশ্য লইয়া মূর্ত্তিগুলির রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন আমরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে শুধু সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন ততটা দৃষ্টি এই মূর্ত্তিগুলির আদিস্থান নির্ণয়, রীতিবদ্ধ বিবরণী লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে দেন নাই। ঐ সব মূর্ত্তি এখন সংগ্রহকারীদের নামেই পরিচিত। এইজন্য মূর্ত্তিতত্ত্বের বিশদ আলোচনায় এবং মূর্ত্তিতত্ত্ব হইতে, অথবা মূর্ত্তির পাদপীঠে লিখিত কোন লিপি হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের পথেও বিষম বাধা দেখা দিয়াছে।

বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন গ্রামেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা উপরিলিখিত মন্তব্যটি বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন গ্রামের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। বিক্রমপুরে আড়িয়ল একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া বিক্রমপুরের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে একটি স্থানীয় চিত্রশালা স্থাপন করিতে যাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে যে সব বাধা উপস্থিত হইতেছে তাহা হইতেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। কতকগুলি মূর্ত্তির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি পত্রিকায় সাধারণ ভাবে বাহির হইয়াছে।[১] প্রথমেই দেখা যায়, প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে কাটিতে আকস্মিক ভাবে অনেকগুলি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ মূর্ত্তিব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা মূর্ত্তিগুলি স্থানান্তরিত হয়। এই সব মূর্ত্তি প্রায়শঃই বঙ্গের বাহিরে এমন কি ভারতের বাহিরে স্থানলাভ করে। অন্ততঃ স্থানীয় ভাবে এই ব্যবসায়টিকে দমন করিতে দেখা গেল যে এই ব্যাপার বহুদিন হইতে চলিতেছে। তখন একদিকে যেমন এই ব্যবসায়টিকে দমন করার ভার লইতে হইয়াছে তেমনই অতীতে এইভাবে বা অন্যভাবে যে সব মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার খোঁজ করাও প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া এই ৩।৪ বৎসরে বিক্রমপুর আড়িয়ল চিত্রশালা যাহা করিয়াছে তাহার একটি বিবরণ দেওয়া গেল।

১। একটি নূতন ধরণের বিষ্ণুমূর্ত্তি, (বিশ্বরূপ) পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ ১৩৩৮।
একটি গ্রাম্য চিত্রশালা—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪০।
Vikrampur Arial Museum—Modern Review, June 1934.

ঢাকা সহরের ডালবাজারের জমিদার ৺জীবনচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে একটি লিপিযুক্ত চণ্ডীমূর্ত্তি আছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত হইয়া জীবন বাবুকে উপহার প্রদত্ত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পাদপীঠের লিপিটি প্রথম উদ্ধার করেন এবং তদবধি ইহা ডালবাজারের চণ্ডীমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত হয়। এই মূর্ত্তিটির লিপি বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত। কারণ ইহা লক্ষ্মণসেনের ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।[২] রাখাল বাবু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ইহাকে ডালবাজারে আবিষ্কৃত (?) বলিয়াই খ্যাত করেন।[৩] কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা মিউজিয়ামের মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ইহাকে রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া উল্লেখ করেন। "The unique four armed image of Chandi described below was found in the ruins of Rampal in the Dacca District. It was obtained by the late Babu Baikuntha Nath Sen along with a number of other images and presented to the late Babu Jiban Chandra Ray who erected a temple for this fine image and installed it there."[৪] কিন্তু এই বিষয়ে তিনি যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। বিক্রমপুর আড়িয়ল চিত্রশালার সম্পাদক শ্রীমান জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জীবন বাবুর বাড়ীতে খোঁজ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নির্দ্দিষ্টভাবে রামপাল হইতে আনীত এই কথা বলেন না। কোনও মূর্ত্তি রামপাল হইতে আনীত হইয়া থাকিলে সে বিষয়ে ঢাকার লোকের স্মৃতি সুস্পষ্ট থাকিবার কথা। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তিটি রামপাল হইতে নীত নহে, বিক্রমপুরের অন্য কোনও স্থান হইতে আনীত।

২। J. A. S. B. 1913 P 291 Plates XXIII & XXIV.

৩। রাখাল বাবুর 'বাংলার ইতিহাস' ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ চিত্র নং ২৬। যতীন বাবুর 'ঢাকার ইতিহাস' ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯১, চিত্র। ননীগোপাল বাবুর 'Inscription of Bengal vol III P. 116.

৪। Iconography of Buddhistic and Brahmanical sculpture in the Dacca Museum—N. K. Bhattasali P. 202.

এই মূর্ত্তিটি যে আড়িয়ল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার কতকগুলি প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বৈকুণ্ঠ বাবু হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া কতকগুলি মূর্ত্তি আড়িয়ল হাটখোলা হইতে ঢাকায় লইয়া গিয়াছিলেন। এই কথা গ্রামের বয়স্ক লোকদের মনে আছে। হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের কাছ হইতে অনুসন্ধান করিয়া এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। এই গ্রামবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের

চণ্ডীমূর্ত্তি, লক্ষ্মণসেনের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নগরে ডাল-বাজারে আবিষ্কৃত।

নিকট এ বিষয় যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল। পরলোকগত হরিমোহন শিরোমণি মহাশয় এই অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। চিত্রশালার সম্পাদক শ্রীমান জয়শঙ্কর তাঁহার নিকট বসিয়া প্রাচীন ঘটনা সমূহের তিনি যে বিবরণ দেন তাহা লিখিয়া লন। বিবরণটি

তিনি স্বাক্ষরযুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। গ্রামের অন্যতম বৃদ্ধ ৺লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৭ সনের ২৭শে ফাল্গুন শ্রীমান জয়শঙ্করের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐ চিঠির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ঢাকা—ডালবাজারে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ চণ্ডীমূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থ শিলালিপি।

"ঐ সময় হাটখোলার অশ্বত্থ গাছের নীচে এক তান্ত্রিক সাধু থাকিতেন। তিনি একখানা আস্তা প্রতিমা তাঁহার আস্তানায় রাখেন। তিনি প্রতিমাখানাকে 'কালী' বলিয়া পূজা করিতেন। আমরাও 'কালী' বলিয়াই জানিতাম। * * সাধু মারা যাওয়ার পর লোকে সিন্দুর ইত্যাদি দিত। এমন কি পাঁঠাও মানত করিত। কিছুদিন পর এক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী একটি হাতী নিয়া হাটখোলা আসে। সে নাকি ঐ মূর্ত্তিটিকে হাতীতে করিয়া ঢাকা নিয়া গিয়াছে শুনিয়াছি। * * ঢাকা ডাইলবাজারের জমিদার বাড়ী ঐ মূর্ত্তিটিকে দেখিয়াছি। * * আমাদের শিরোমণি মহাশয়ও এই ঘটনা জানেন। আমি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছি। তিনি এ বিষয় তোমাকে লিখিতে বলিলেন। এই মূর্ত্তিটি যে হাটখোলা হইতে নিয়াছে তাহা বহুলোকে দেখিয়াছে।"

আড়িয়লের প্রাচীন হাটখোলায় যেখানে এই মূর্ত্তিটি ছিল তাহার অনতিদূরেই 'সেনের দীঘি' নামক একটি প্রকাণ্ড দীঘি এবং তাহারই পাশ দিয়া একটি প্রাচীন রাস্তা সানবাড়ীর দেউল হইতে আরম্ভ করিয়া রামপাল অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। হাটখোলার দীঘি খনিত হইবার সময় বহু মূর্ত্তি পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠবাবু কেবল ভাল অভগ্ন মূর্ত্তিগুলিই লইয়া যান, ভগ্ন মূর্ত্তিগুলি ঐখানেই পড়িয়া থাকে। তাহার কতক হাটখোলার পশ্চিম দিকে বোরজের নীচে ফেলা হইয়াছে, অন্যগুলি যে যেমন ভাবে পারিয়াছে লুটিয়া লইয়াছে।

ঢাকা কালেক্টারীর প্রাঙ্গণে মোট ৬ খানা মূর্ত্তি আছে। এগুলিও নাকি বৈকুণ্ঠবাবুর সংগৃহীত। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইখানা যে আড়িয়ল হইতে নীত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভাওয়াল রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক দ্বারিক মাষ্টারের পুত্র শ্রীযুক্ত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই খবর প্রথম বিক্রমপুর-আড়িয়ল চিত্রশালার কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমান জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনিও এ বিষয়ে অবগত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

৭।৮ বৎসর হইল আড়িয়লের এক ধোপা মাটী উঠাইবার সময় বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পায়। এই মূর্ত্তিটি স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া জানা গিয়াছে। ময়মনসিংহ হইতে আগত কোনও ব্যক্তি প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া উক্ত ধোপাকে ৪।৫৲ দিয়া মূর্ত্তিটি ময়মনসিংহ লইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্তও এই মূর্ত্তিটি খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু অত প্রকাণ্ড স্ত্রীমূর্ত্তি নিশ্চয়ই বিশেষত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

১৯২৪-২৫ সনে ঢাকা চিত্রশালার জন্য বিক্রমপুর শিয়ালদি হইতে একটি গৌরীমূর্ত্তি সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত ভট্টশালীর মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে এই মূর্ত্তিটির শিল্পসুষমার প্রশংসা আছে। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি যিনি দান করিয়াছেন তিনি বলিয়া দেন যে মূর্ত্তিটি আড়িয়ল হইতে সংগৃহীত। শ্রীযুক্তা সুরেন্দ্রবিনোদিনী পাল মহাশয়া এইটুকু বলিয়া না দিলে মূর্ত্তিটির আদিস্থান দুর্জ্ঞেয় রহিয়া যাইত।

সানবাড়ীর দেউলের দীঘির পাড়ে একটি বড় মূর্ত্তি পড়িয়া ছিল। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কোনও ফুটবল খেলোয়াড়ের দল ঐ মূর্ত্তিটি লইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত মূর্ত্তিটির কোনও সন্ধান হয় নাই।

১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে আড়িয়লের আশপাশ হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি বেলুড়মঠে স্থানান্তরিত হয়। তাহা হইতে কয়েকটি নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের নবনির্ম্মিত গৃহে লাগান হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি এখনও দেখা হয় নাই। কেবল সংগ্রাহক কলমা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীমান জয়শঙ্কর একটি বিবরণপূর্ণ চিঠি পাইয়াছেন।

আপাততঃ আমরা একটি মাত্র গ্রামের প্রত্নবস্তুনির্ণয়ে কি রকম বাধা উপস্থিত হয় তাহা দেখাইলাম। এই বিবরণও সম্পূর্ণ নহে। বিক্রমপুর-আড়িয়ল চিত্রশালায় অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধেও অনুরূপ অনুসন্ধান হইতেছে। তবে ইহার সামর্থ্য সামান্য বলিয়া কাজ মন্থর গতিতে চলিয়াছে। অদূরভবিষ্যতে আমাদের অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্থিক প্রসঙ্গ

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

অটোয়া চুক্তির ফলাফল

১৯৩২ সনের শেষে কানাডার রাজধানী অটোয়া নগরীতে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে পরস্পর সুবিধাদানমূলক একটি বাণিজ্যচুক্তি করা হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের উপনিবেশ সিংহল, মালয়, ফিজি এবং মরিসাস্ প্রভৃতির সঙ্গেও ভারতের কতকগুলি পণ্যদ্রব্য বিষয়ে ঐরূপ চুক্তি করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য কি ভাবে চলিয়াছে এবং ভারতবর্ষ কতখানি সুবিধালাভ করিয়াছে তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ডাঃ মীক্ একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রিপোর্টে সংখ্যাবিবৃতির সাহায্যে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অটোয়া চুক্তির ফলে বিশেষ ভাবে লাভবান হইয়াছে।

অটোয়া চুক্তির ফলাফল বিবেচনা করিতে হইলে আমাদের একটি ব্যাপার মনে রাখা উচিত। গত এক বৎসর বা পনের মাসে অটোয়া চুক্তির কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাণিজ্যে ধীরে ধীরে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। কাজেই ইংলণ্ড যে ভারতের পণ্য গত বৎসরের তুলনায় বেশী লইয়াছে তাহা শুধু অটোয়া চুক্তির জন্য নহে, কাঁচা মালের চাহিদা যে সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার ফলেও। যে সব পণ্যদ্রব্য বিষয়ে চুক্তি হইয়াছে তাহাদের আমদানী-রপ্তানীর সংখ্যা-বিবরণ বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সমস্ত জিনিস ইংলণ্ড বেশী লইয়াছে সেগুলি অন্যান্য দেশও বেশী লইয়াছে, অথবা সেই সব জিনিসের রপ্তানী অন্য দেশে ভয়ানক ভাবে কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডকে বেশী সুবিধা দেওয়ার দরুণ অন্যান্য দেশে আমাদের বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে অথবা অটোয়া চুক্তির জন্য কোন ফলই হয় নাই। শুধু দুই একটি তৈলবীজে ইংলণ্ড হইতে আমরা সুবিধা পাইয়াছি এবং তাহাও অন্য দেশে শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায়। আর্জেণ্টাইন্ দেশ হইতে ইংলণ্ড অনেক তৈল-বীজ আমদানী করিত, কিন্তু সেখানে শস্যমন্দা হওয়ায় ভারতীয় তৈলবীজ ইংলণ্ডে বেশী বিক্রয় হইয়াছে। ডাঃ মীকের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বাদাম সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সমান সুবিধা আমরা লাভ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই। যে স্থলে অন্যান্য দেশ ইংলণ্ডের বাজারে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৬ ভাগ বেশী অংশ লাভ করিয়াছে, সেস্থলে ভারতের অংশ হইয়াছে ঢের কম।

মোটের উপর, অটোয়া চুক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, যদিও ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে কোন কোন দ্রব্য বেশী লইয়াছে, তাহাতে আমাদের সমগ্র বহির্ব্বাণিজ্যের তেমন সুবিধা হয় নাই। অন্যান্য দেশে আমাদের বাণিজ্য এই চুক্তির জন্য ঢের কমিয়া গিয়াছে। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই আমাদের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ নহে এবং সেখানে আমাদের বাণিজ্যপ্রসারের সম্ভবনা খুব বেশী নাই, কারণ সেখানে কৃষিপ্রধান দেশই বেশী। আমাদের সমগ্র রপ্তানী-বাণিজ্যের অর্দ্ধেকেরও কম ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই বাকী অর্দ্ধেকের বেশীর জন্য আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত অন্যান্য দেশের বাজার রক্ষা করা। অটোয়া চুক্তির ফলে আমাদের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে তাহা এই বলিলেই প্রমাণ হইবে যে, আমাদের আমদানী-বাণিজ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ শতকরা ৪৪·৭ ভাগ হইতে ৫০·০ ভাগ-এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেস্থলে অন্যান্য দেশের অংশ ৫৫·৩ হইতে ৫০·০এ হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অন্যান্য দেশের ক্ষতি করিয়া আমাদের আমদানী-বাণিজ্যে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য দেশ এই যে ক্ষতি দিয়াছে তাহার ফল-স্বরূপ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের অংশ সেই সব দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ৪৫·১ ভাগ হইতে ৪৬·২ এ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেস্থলে অন্যান্য দেশে ৫৪·৯ হইতে ৫৩·৮ এ হ্রাস পাইয়াছে। যদি অটোয়া চুক্তি না থাকিত তবে অন্যান্য দেশ আমাদের দ্রব্য আরও বেশী লইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই অটোয়া চুক্তির সুবিধা বিশেষভাবে যে ভারতবর্ষ কিছু পায় নাই তাহা বলা চলে। ইংলণ্ডের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড আমাদের আমদানী-বাণিজ্যে ১৯৩২-৩৩ সনের তুলনায়

শতকরা ৪'৪ অংশ বৃদ্ধি করিয়াছে। সেস্থলে ভারতবর্ষের রপ্তানী-বাণিজ্যে ইংলণ্ডের অংশ ১৯৩২-৩৩ সনের তুলনায় মাত্র ২'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ড যে পরিমাণে সুবিধা পাইয়াছে, ভারতবর্ষ সে পরিমাণে সুবিধা আদায় করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই অটোয়া চুক্তির অযৌক্তিকতা এবং ভারতের স্বার্থের পক্ষে যে ইহা কতখানি হানিজনক তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অটোয়া চুক্তি হইয়াছিল পরস্পর সুবিধাদানমূলক নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই। যদি এই সুবিধা সম পরিমাণে না হয় এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের পক্ষে যদি তাহা স্পষ্টভাবে ক্ষতিজনক হয় তবে এই চুক্তির কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। এই দিক হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যনীতির যে বিশেষ ভাবে পুনরালোচনা ও পরিবর্ত্তন করা দরকার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত সংরক্ষণ বিল

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে বিদেশাগত বিভিন্ন রকমের লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় লৌহশিল্পকে সুবিধাদান করা হইয়াছিল। এই সুবিধা আরও কিছুদিন দেওয়া হইবে কিনা তাহাই তদন্ত করিবার জন্য ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে টেরিফ্ বোর্ড (শুল্ক তদন্ত বোর্ড) ভারত সরকার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিল। এই তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এতখানি ব্যস্ততা অনেকের কাছেই সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতেছে। টেরিফ বোর্ডের মতে সংরক্ষণ শুল্কের অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিবার জন্যই এই বিলের সৃষ্টি। যে জিনিষটি সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়, সে হইল এই যে, ভারতীয় লৌহশিল্পকে যেমন সংরক্ষণ নীতির সুবিধা দেওয়া হইতেছে ব্রিটিশ ইস্পাতশিল্পও তেমনই অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী সুবিধা পাইতে যাইতেছে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে ভারত সরকারের রাজস্ববৃদ্ধির জন্য বিদেশাগত সমস্ত লৌহদ্রব্যের উপরেই শুল্ক ধার্য্য ছিল। তাহা এখন আংশিকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইল—ব্রিটিশ ইস্পাতশিল্পকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধা দিবার জন্যই। আর একটি ব্যাপার এই যে, ভারতীয় প্রতি টন ইস্পাতের ইনগট্-(ingot)-এর উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে এবং ইহার খারাপ ফল দূর করিবার জন্য বিদেশাগত ইনগটের উপর সমান অনুপাতে শুল্ক স্থাপিত হইবে। বিদেশী প্রতিযোগিতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই দুই রকমের শুল্কের ফল আর্থিক হিসাবে আমাদের দেশীয় শিল্পের পক্ষে সমান, কারণ লৌহশিল্পের মূল্য বিদেশীরা ঐ শুল্কের জন্য কম করিতে পারিবে না। কিন্তু যে সব লৌহ-দ্রব্যের উপর হইতে রাজস্ব শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইল, সেগুলি বিনা করে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্পের যে অনেকখানি অসুবিধা ঘটিবে তাহাই বিপদের কারণ। আরও, প্রতি টন ইনগটের উপর যে ৪৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স ধরা হইয়াছে তাহাতে ইস্পাত শিল্পের বৃদ্ধি ও প্রসারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে। একটি শিল্প যদি উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থা হইতেই বাধাগ্রস্ত হয় তবে তাহার পরবর্ত্তী বিভিন্ন অবস্থায় যে বিশেষ বাধা ও প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা আসে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত বিলটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। যদি গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়া থাকেন যে, ভারতীয় লৌহশিল্প "সংরক্ষিত" করা প্রয়োজন তাহা হইলে সেই সংরক্ষণের সঙ্গে বিবিধ সর্ত্ত ও অসুবিধা সৃষ্টি করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ করিতে গেলেই যে ব্রিটিশ শিল্পকে কিছু সুবিধা দান করিতে হইবে তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যখন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছিল তখনও ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের জন্য গবর্ণমেণ্টের উদ্বেগ এবং প্রচেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। পরস্পর সুবিধাদান-মূলক বাণিজ্যচুক্তি হইতে পারে এবং যতদিন উপযুক্ত প্রতি-দানমূলক সুবিধা পাওয়া যায় তত দিন বিদেশীয় শিল্পকে কিছু সুবিধা দান করা বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্যনীতির মূলসূত্র। কিন্তু নিজেদের শিল্পের অসুবিধা এবং ভবিষ্যতের বৃদ্ধিকে পঙ্গু করিয়া সুবিধদাননীতি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক।

কয়লা নিয়ন্ত্রণ

চারিদিকের বাণিজ্যমন্দার জন্য সকলেই মনে করিতেছেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্যই অনেকগুলি

দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কয়লার বাজার মন্দা হইবার কারণও ইহাই, এই ধারণা জন্মিয়াছে। কাজেই কয়লার উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আন্দোলন চলিয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্ঘটের অনেক পূর্ব্বেই ১৯২৩-২৪ সন হইতে কয়লার বাজারে মন্দা আরম্ভ হয়। কাজেই অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের তুলনায় যে কয়লার মূল্য অনেক বেশী হ্রাস পাইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। ফলে শত শত কয়লার খনিতে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে এবং যাহারা এখনও করে নাই, তাহারা বিক্রয়-মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অনেক লোক ও শ্রমিক ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে খনির মুখে প্রতি টন কয়লার দাম ৩৲ টাকা; কোন কোন খনিতে উৎপাদন-ব্যয় প্রতি টনে পড়ে ২৲ টাকার মত, কিন্তু অধিকাংশ খনিতেই উৎপাদন-ব্যয় তিন টাকা এবং এমন কি আরও বেশী। কাজেই অনেক খনি যে ক্ষতি স্বীকার করিয়া বা বিনা লাভে কাজ করিতেছে তাহা মনে করা যায়। ১৯৩৩ সনে ষ্টক ও শেয়ার-লিষ্টি হইতে দেখা যায় যে, ৬৮টি খনির মধ্যে ৩৩টি অংশীদারদিগকে এক পয়সাও লভ্যাংশ দেয় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহাদের লাভ মোটেই হয় নাই।

এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য কয়লা-উৎপাদন সঙ্কুচিত করিতে হইবে বলিয়া একদল লোক দাবী জানাইতেছে। কিন্তু এই সঙ্কোচন-নীতি সকলেই সমর্থন করিতেছেন না। তাঁহারা যুক্তি দেন যে, কয়লা-সঙ্কোচনের ফলে কয়লার মূল্য কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু অন্য দিকে দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে বাধা জন্মিবে। তাঁহারা বলেন যে, কয়লার মূল্য বর্দ্ধিত হইলে যেসব শিল্পে কয়লার ব্যবহার হইয়া থাকে সেগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশী হইবে এবং ফলে তাহাদের লাভ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। আর যে সব কয়লার খনি সম্প্রতি কাজ বন্ধ করিয়াছে তাহাদের পুনরুত্থানের কোন পথ থাকিবে না। ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ হইতেও বলা হইতেছে যে, সঙ্কোচন নীতির ফলে কয়লার মূল্য বর্দ্ধিত হইলে রেলওয়ের খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই পরিমাণে লাভ কমিয়া যাইবে। এই সব যুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলিবার নাই, কিন্তু কয়লার বাজার এখন যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সত্বর এই রূপ কোন পন্থা অবলম্বন না করিলে যে সমগ্র ব্যবসায়টিই বিনষ্ট হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি কয়লা-বাণিজ্য একবার উজ্জীবিত হইতে পারে, তাহা হইলে পরে এরূপ সময় আসা অস্বাভাবিক নয় যখন অনেক নূতন খনিও কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে এবং সাধারণ বাণিজ্যোন্নতির ফলে বর্দ্ধিত মূল্যের দরুণ যে অসুবিধা তাহা মোটেই অনুভূত হইবে না। অন্যপক্ষে কয়লা ব্যবসায়কে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা না করিলে ভবিষ্যতে নূতন কোন খনিই কাজ আরম্ভ করিবে না। রেলওয়ের পক্ষে এই বলা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে কয়লার ভাড়ার উপর যে শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে তাহা যদি উঠাইয়া দেওয়া যায় তবে রেলওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে যুক্তি দেওয়া হইবে যে, এই শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাঁহাদের আয় কমিয়া যাইবে। ইহাতে এই বলা যায় যে, কয়লা বাণিজ্যের মন্দার জন্য তাঁহাদের আয় পূর্ব্বেই অনেক ভাবে হ্রাস পাইয়াছে; বর্ত্তমানে যদি কয়লা ব্যবসায়কে কোন উপায়ে এবং এমন কি কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সবল ও সুস্থ করিয়া তোলা যায়, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাদের অধিকতর লাভের সম্ভাবনা আছে।

কয়লা-সঙ্কোচনে আর একটি সমস্যা, কয়লা ব্যবহারকারীদের স্বার্থ। কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অনেকগুলি শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই তাহাদের কতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে রাজী করান যাইতে পারে তাহাই বিবেচনার বিষয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট, কয়লা-উৎপাদনকারী এবং কয়লা-ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বৈঠক বসিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষ হইতে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি এবং একজন সরকারী চেয়ারম্যান লইয়া একটি কয়লা-নিয়ন্ত্রণ-বোর্ড (Control Board) গঠিত করা হইবে। ইহার কাজ হইবে, উৎপাদন যাহারা করে তাহাদের এবং কয়লা ব্যবহার যাহারা করে তাহাদের স্বার্থ সমভাবে রক্ষা করা। প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার যোগ্য।

কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের দরুণ সুফল হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর চারিদিকেই সঙ্কোচন-নীতি অবলম্বন করা হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় চায়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য চায়ের বাজার যে

সতেজ হইয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক ভাবে রবারের নিয়ন্ত্রণও আরম্ভ করা হইয়াছে এবং ফলে রবার ব্যবসায় সবল হইয়া উঠিতেছে। কাজেই সঙ্কোচন নীতির ফলে কয়লা সম্বন্ধেও আমরা সুফল আশা করিতে পারি।

বাঙ্গালার আর্থিক তদন্ত বোর্ড এবং কৃষিঋণ সমস্যা

১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট কমার্স ডিপার্টমেণ্ট হইতে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে আলোচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক তদন্ত বোর্ড (Board of Economic Enquiry) নামে একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালার কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী বিভিন্ন সংঘ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ্ এবং কৃষিকর্ম্মীদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—বাঙ্গালার বিবিধ আর্থিক সমস্যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা এবং তাহাদের সমাধানের জন্য উপযুক্ত পন্থা নির্দ্দেশ করা। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যে দেশের আর্থিক দুর্গতির গুরুত্ব অনুভব করিয়া এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিলেন তাহাতে জনসাধারণের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। আজ কয়েক মাস হইল এই তদন্ত বোর্ডের জন্ম হইয়াছে; কিন্তু তাহার কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই জানিতে পারিল না। আমরা অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বোর্ড যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্ব্ব শেষ করিয়া বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রথমতঃ, বোর্ডকে চারিটি শাখা-কমিটিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি শাখা-কমিটি বিশেষ একটি সমস্যা ধরিয়া তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। কমিটিগুলির জন্য এই ভাবে কর্ম্মবিভাগ হইয়াছিল:—(১) অর্থনৈতিক সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ; (২) আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন; (৩) কৃষিঋণ সমস্যা দূর করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং (৪) কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বা আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ। আমরা অবগত হইলাম যে, প্রত্যেকটি শাখা-কমিটির অনেকগুলি সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং কৃষিঋণভার লাঘব করিবার জন্য একটি বিলের খসড়া নাকি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আমরা বিলটির সর্ত্তগুলি এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানি না, তবে কৃষকদের ঋণভারের গুরুত্ব অনুসারে নাকি বিলে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাদের ঋণ দুই বৎসরের উপার্জ্জনের অধিক হইবে তাহাদের নাকি দেউলিয়া বলিয়া মনে করা হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদের বাস্তুভূমি বাদ দিয়া অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিল সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে বাঙ্গালার প্রতি জেলায় অনেক গুলি করিয়া জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বিলটির সর্ত্তগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডগুলির হস্তে অনেক দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং তাহারা যতখানি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে বিলটি আইনে পরিণত হইলে জনসাধারণ যে খুব বেশী সুবিধা পাইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। যদি ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে স্থানীয় দলাদলি এবং অক্ষমতা হইতে রক্ষা করা না যায় তবে যে অনেক অবিচার সাধিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। বোর্ডগুলিকে নূতন প্রণালীতে পুনর্গঠিত করা দরকার এবং যাহাতে স্বার্থশূন্য ও উপযুক্ত লোক বোর্ডে আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তাহা হইলেও বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়া কৃষকের ঋণভার লাঘব করিতে সচেষ্ট হইতে যাইতেছেন তাহাই সর্ব্বসাধারণের আশার কথা। একটি কেন্দ্রীয় পাট কমিটি স্থাপিত হইবে বলিয়া যে জনরব শুনা যাইতেছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গালা দেশের আর্থিক সম্পদ পাটের পুনরুজ্জীবন আমরা আশা করিতে পারি।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলজিয়ামের খালপথে (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নৌকার মাঝিদের রবিবার

যখন আমরা উইলব্রুক সহরের কাছাকাছি গিয়েছি, তখন মনে হল যেন সহরের সমস্ত লোক খালের ধারে জুটেছে

বেলজিয়ামের অনেক শহরেই এই 'বেগুইনি' (beguine) আশ্রম-চারিণীদের দেখা যাইবে। আর্ত্তের কল্যাণকল্পে ইঁহারা জীবন নিয়োগ করিয়াছেন। আজীবন কুমারী থাকিয়া ইঁহারা দেশের মঙ্গল-ব্রতে জীবন-যাপন করিতেছেন—সংখ্যায় ইঁহারা প্রায় ৮০০।

কি একটা উৎসবে। বজরা বাঁধবার জায়গায় বড় বড় নৌকা ও বজরার ভিড়, তাদের মাস্তুলে রঙীন লণ্ঠন ঝুলছে, চারিদিকে

বেলজিয়ামের এখানে ওখানে আজও এই মধ্যযুগের অতি পরিচিত বাতাস চালিত জাঁতা-কল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

লোকজনের কলরব, গান বাজনার শব্দ, খালের ধারে পথের উপর ছেলেবুড়ো সবাই নাচছে, সকলেরই পরনে রঙীন পোষাক।

ব্যাপার কি? শোনা গেল, আজ নৌকার মাঝিদের ছুটীর দিন। তাই এই রকম। আজ খালে কাজকর্ম্ম বন্ধ, আজ খালের ধারে জুটে সবাই আমোদ-প্রমোদ করে—অর্থাৎ কিনা আজ রবিবার।

উইলব্রুক সহরের দোতালা তেতালা ঘরগুলো একেবারে অন্ধকার—সেখানে আজ জনপ্রাণী নেই। বারো হাজার নরনারী রাজপথের উপর উৎসবমত্ত।

বেলজিয়ামের ধীবর: মনে হয় কোনও খ্যাত শিল্পী অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি।

সহরটা খুব এমন বড় কিছু নয়, তবে অনেক কল-কারখানা আছে। এই সব কারখানার মেয়ে-মজুরেরা খালের মাঝিদের সঙ্গে আজ নেচে বেড়ায়। রাস্তার ধারে ধারে খাবারের দোকান—নাচতে নাচতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত তরুণ-তরুণীরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর খাবারওয়ালী তার উনুনের ওপর চাপানো কড়া থেকে গরম আলুর তরকারী ও আলুভাজা কাঠের প্লেটে করে তাদের খেতে দিচ্ছে, খেয়ে গিয়ে

আবার অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তারা নাচছে। আবার খেতে আসছে, আবার নাচবার জন্যে ফিরে যাচ্ছে, এই রকম

পরচর্চা : বেলজিয়ামের পথে এইরূপ আলাপরত বৃদ্ধাদের প্রায়ই দেখা যায়।

চলবে দুপুর রাত পর্য্যন্ত। কোথাও বাজি পুড়ছে, কোথাও বক্সিং হচ্ছে, কোথাও ছোটখাট তাঁবুতে ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। আজ এই উৎসবের জন্যে কত জায়গা থেকে ফর্সা পোষাক পরে ও গলায় রুমাল বেঁধে মাঝিমাল্লার দল এসেছে। আজকার এই রাতটিই তাদের রাত, সপ্তাহে এই একটিবার এ রাত আসে।

কাল ওরা আবার কতদূর চলে যাবে, কেউ যাবে আণ্টোয়ার্প, কেউ রাইন নদীতে যাবে, কেউ ব্রুজেস্‌এ যাবে। আর ওদের মুখে-রং-মাখানো নৃত্য-সঙ্গিনীরা কাল সকালে সারি বেঁধে বিরাট কাগজের কলের ফটক দিয়ে পিল পিল করে ঢুকতে সুরু করবে। আবার এক সপ্তাহ নীরস কর্ম্মক্লান্ত জীবন যাপন, আজকার রাতের প্রেমিকের প্রেম-গুঞ্জনের মধুময় স্মৃতি এই এক সপ্তাহ তাদের মনে বল যোগাবে, আশা ও উৎসাহ এনে দেবে, রবিবার তো আবার এল বলে!

ওই যে লোকটি সোনালী পাড় বসানো টুপি পরে একা দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। ও নাচছে না কেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে বটে কিন্তু ওর নাচবার যো নেই, ও হল পুলিসের পাহারাওয়ালা। তা ছাড়া সহরের কেউ বাদ নেই, শিশু থেকে শিশুর পিতামহ সবাই আছে।

লুভেন

মহাযুদ্ধের গোলার আগুনে যে লুভেন সহর পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, এ সে লুভেন নয়। বর্ত্তমান লুভেন সহর নূতন তৈরী হয়েছে যুদ্ধের পরে। অনেকটা আমেরিকার প্রভাব এসে পড়েছে বর্ত্তমান লুভেনের উপরে।

লুভেনের পার্কে দু একটা জার্ম্মান কামান এখনও পড়ে আছে। এখন তার উপরে উঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে। যেন কোন্ বিস্মৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুর মৃতদেহ।

লুভেনের পর থেকে ছোট ছোট পাহাড় পড়ল। দুটো ছোট পাহাড়ের মধ্যে ঝিরঝিরে ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে—তৃণাবৃত প্রান্তর। ম্যাপে কিন্তু দেখা গেল নদী নয়, এসব

ব্রুসেল্‌স্ : ওপারে পার্লামেণ্টের বাড়ী। এপারে হইতে ছেলেরা কাগজের নৌকা ভাসাইতেছে।

খাল। কিন্তু কাটাখালের কৃত্রিমতা এখানে অন্তর্হিত হয়েছে, চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর।

বেলজিয়াম: কয়লার খনির নারী-শ্রমিক।

বিবাহার্থী তরুণ-তরুণীর পিকনিক

এক জায়গায় মদের দোকানের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখলাম—

সান্ধ্যভোজনের আয়োজন: বেলজিয়ানরা অত্যন্ত ভোজন-বিলাসী।

"যে সব অবিবাহিত যুবক বিবাহ না করার জন্যে এখন মনে মনে অনুতপ্ত, তাঁরা জেনে রাখুন যে, আগামী রবিবার ইৎর্এর অবিবাহিত যুবকসম্প্রদায় রঁ ফিয়ের অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে তাঁদের একটা উৎসবে আহ্বান করেছেন। সেখানে নৌকা বেড়ানো ও খাওয়াদাওয়া হবে। টিকিটের দাম পনেরো ফ্রাঁ। যদি এই রবিবারে উপযুক্ত পাত্রী না মেলে, তার পরের রবিবারে রঁ ফিয়ের তরুণীগণ ইৎর্এর যুবকদের জন্যে আর একটা পিকনিকের আয়োজন করবেন।
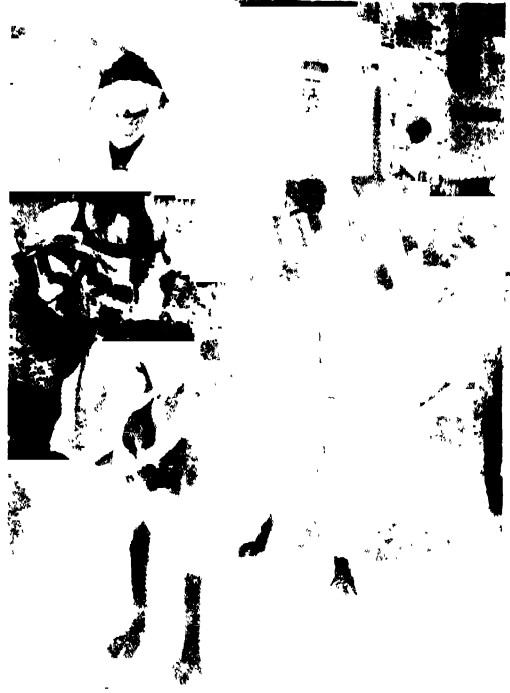
দুগ্ধবিক্রয়কারিণী বেলজিয়ান দুহিতা।

সাবধান! এ সুযোগ কেউ হেলায় হারাবেন না।"

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এটি একটি ঘটকসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন। এদেশে এ ভাবে সবাই একত্র হয়, কেউ কোন দোষ ধরে না এবং এই বনভোজনের উৎসবের মধ্যে দিয়ে অনেক তরুণ যুবক তার মনের মত পত্নীকে খুঁজে পেয়েছে—তাদের বিবাহিত জীবন সুখেরও হয়েছে।

মজা এই যে, বিবাহের বিজ্ঞাপনের পাশে একটা মৎস্য-শিকার প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনও মারা আছে। অর্থাৎ

রবিবার খালের জলে কে কতগুলো মাছ ছিপে গাঁথতে পারে তারই পরীক্ষা।

গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা এই দুইটি বিজ্ঞাপন পাশাপাশি দেখে বিরক্তমুখে বলে, হুঁঃ বিয়ের পিকনিক আর মাছ ধরা, ও দুইই সমান। তুমি জানই না তোমার বর্শিতে কি গেঁথে উঠবে। অন্ধকারে ঢিল ফেলা আর কি?

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবারও নয়।

আমেরিকার কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য্য ঘুম

উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে কালিফোর্ণিয়া থেকে আলাস্কা এবং সেখান থেকে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে

কাঠবিড়ালীর ছানা: এখনও ১ মাস বয়স হয় নাই।

এক ধরণের কাঠবিড়ালী বাস করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহারা 'সিটেলাস' (citellus) নামক বৃহৎ শাখার অন্তর্ভুক্ত। এরা মাটীর মধ্যে গর্ত্তে বাস করে এবং মাঠের ফসল ও উদ্ভিজ্জমূল খেয়ে সাধারণতঃ জীবনধারণ করে।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে এরা প্রতি বৎসর দশ কোটী ডলার মূল্যের শস্যের অনিষ্ট করে থাকে। কয়েক প্রকার সংক্রামক রোগও এদের দ্বারা সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সব কারণে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এদের ধ্বংসসাধনে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন।

এরা মাটীর তলাতেই থাকে, মাটীর মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গর্ত্ত খোঁড়ে। উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত তৃণভূমিতে এদের আড্ডা। গাছপালা যেখানে নেই সেখানে এরা টিকতে পারে না। পূর্ব্ব ওয়াশিংটন, ওরিগণের কিছু অংশ এবং ইডাহো অঞ্চলের তৃণাচ্ছাদিত মালভূমিতে এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালীর একটি বিশেষ জাতি বাস করে। এদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত হয়েছেন।

এদের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা খুব সহজ কাজ নয়। এদের রং ধূসর, এরা সূর্য্যালোকপ্রিয় এবং অল্পেই ভয় পায়। যেখানে গমের ক্ষেত থেকে ভাল করে আগাছা দূর করা হয় না, সেখানে এরা হু-হু করে বেড়ে ওঠে।

এদের জলের দরকার হয় না। জলের চেয়ে এরা উদ্ভিদের রসাল ডাঁটা বেশী পছন্দ করে। এই জন্যেই এদের দ্বারা এত বেশী ফসলের ক্ষতি হয়। যদি সময়মত এদের উপদ্রব নিবারণ করার চেষ্টা না করা যায়, তবে কচি গমের ক্ষেত অতি অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই শীর্ষবিহীন ও পত্রবিহীন ভাঙা ডাঁটার ক্ষেতে পরিণত হয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এদের বাসভূমিতে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত জলকষ্ট ঘটে। তখন কোনরকম ফসলও ক্ষেতে থাকে না, অন্য কোন উদ্ভিদের কচি রসাল ডাঁটাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, তখন তৃষ্ণায় এদের মারা যাওয়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরণের পরিবর্ত্তে তারা এ সময়ে ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

অনেক প্রাণী শীতকালে গর্ত্তে বা কোটরে জড়ের মত অবস্থান করে, একথা সকলেই জানেন। তাদের সঙ্গে কাঠ-বিড়ালীদের পার্থক্য এই যে, এদের নিদ্রা আরম্ভ হয় ভীষণ গ্রীষ্মের সময়। জুলাই মাসের প্রথম থেকেই এদের সংখ্যা কমতে সুরু করে, মাটীর ওপর নড়ে চড়ে বেড়াতে কমই দেখা যায়। আগষ্ট মাসের প্রথমে একটা কাঠবিড়ালীও আর দেখা যায় না কোথাও। ফেব্রুয়ারী মাসে বরফ গলতে সুরু না করা পর্য্যন্ত আর এদের দেখা যায় না।

এই কয়মাস তারা গভীর ভাবে নিদ্রা যায়—এ নিদ্রা এক ধরণের মৃত্যু বললেও চলে। সাধারণতঃ এদের দেহের

উত্তাপ ৯৮° ফরেনহাইট্। নিদ্রিতাবস্থায় সেই উত্তাপ নেমে পড়ে ৪০° ফারেনহাইটে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এদের সে অবস্থায় কেউ দেখলে বলতে পারবে না যে, এরা একদিন
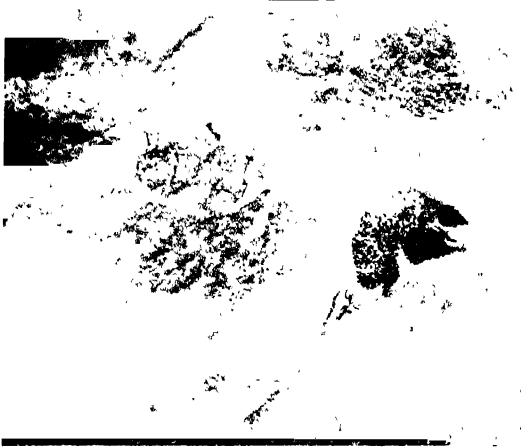
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যাইবার জন্য কাঠবিড়ালীরা এই গর্ত্ত ব্যবহার করে।

আবার বেঁচে উঠে মাটীর ওপর ছুটোছুটি করে বেড়াবে—এরা এমন নির্জ্জীব ও হিমাঙ্গ হয়ে পড়ে সে সময়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘুম ভেঙে উঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা পূর্ব্ব সজীবতা ফিরে পায়।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি শ্যালুস্ নদীর ধারের সমতল ভূমিতে বেড়াতে গেলে আগ্নেয়-গিরির ছাই-মিশ্রিত মাটীর তৈরী অসংখ্য ছোট বল্মীকস্তূপের মত দেখা যাবে—ওইগুলি কাঠবিড়ালীর নিদ্রিতাবস্থার বাসগৃহ। এ সময় এসব স্থানে একটি কাঠবিড়ালীর চিহ্ন দেখা যায় না—কিন্তু আর সপ্তাহখানেক পরে এই অঞ্চল জীবন্ত হয়ে উঠবে কাঠ-বিড়ালীর ভিড়ে।

আগষ্ট মাসের ভয়ানক গরমের সময় এরা ঘুমিয়ে পড়ে, এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ঘুম ভেঙে ওঠে। মার্চ্চ থেকে জুলাই এই পাঁচ মাসের মধ্যে তাদের গর্ভ-ধারণ ও সন্তান প্রসব করা চাই। আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে সে সন্তান এমন সবল হওয়া চাই যাতে তারা দীর্ঘ সাতমাসব্যাপী নিদ্রার উপযুক্ত হতে পারে। সুতরাং নষ্ট করবার মত সময় এদের হাতে একেবারেই নেই। এপ্রিল মাসের প্রথমেই এদের বাসায় সদ্যপ্রসূত সন্তান দেখা যাবে এবং আর মাস-খানেক পরে ছোট ছোট লোমশ বাচ্চা-গুলিও গর্ত্তের মুখে খেলা করবে।

কাঠবিড়ালীদের এই অদ্ভুত নিদ্রার বিষয় জানতে মার্কিণ দেশের বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। জুলাই মাসের প্রথমে এত কাঠবিড়ালীর ভিড়, হঠাৎ আগষ্ট মাসে এরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এ তথ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

বরফের রাজ্য—হেল্‌সিংফোর্স

ফিনল্যাণ্ডের নাম আমাদের দেশে নিতান্ত অপরিচিত নয়—হেল্‌সিংফোর্স সেখানকার রাজধানী। জানুয়ারী মাসে যদি কেউ সেখানে যায়—গিয়ে দেখবে সমস্ত সহরটা সাদা বরফে আবৃত, মাথার ওপর ধূসর আকাশ যেন ঝুলে পড়েছে—সমস্ত দিনই অন্ধকারে ঢাকা।

পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানবিদ্ কর্ত্তৃক তৈয়ারী বাসায় কাঠবিড়ালীর ছানা বড় হইতেছে।

সূর্য্যদেব ওঠেন বেলা ন'টার সময়ে। অস্ত যান তিনটের কাছাকাছি। কয়েকঘণ্টা মাত্র দিনের আলো যা থাকে, তাও মেঘে ঢাকা। সুতরাং আফিসে, ইস্কুলে, বাড়ীতে, কারখানায় সর্ব্বত্র দিনরাত বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে।

শীতকালে ফিনল্যাণ্ড অতি ভয়ানক স্থান। বাইরের লোক গিয়ে টিকতে পারে না, ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ঘোরতর শীতে অতি কষ্টে দিন কাটায়। ডিসেম্বর মাস থেকে

তবুও হেলসিংফোর্সের ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে ওখানকার শীত খুব বেশী নয়। তবে তুষারপাত যথেষ্ট হয়, বিশেষ করে বছরের প্রথম তিন মাস।

হেলসিংফোর্স: সুউচ্চ এম্পারার নিকোলস চার্চ্চের চূড়া দেখা যাইতেছে। দূরে আবছা চূড়াটিও একটি গির্জ্জার।

এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ওদের দেশে শীতকাল, জানুয়ারী মাসের প্রথমে হেলসিংফোর্সের সাম্‌নের সমুদ্র জমে যায়, রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকজন দেখা যায় না, আফিসে ইস্কুলে দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জ্বেলে কাজ হয়—সমস্ত সহরটা যেন ঘুমুচ্ছে।

হেলসিংফোর্স: ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি রাজধানীর অন্যতম দ্রষ্টব্য সামগ্রী।

হেলসিংফোর্সে আইন আছে শীতকালে প্রত্যেক বাড়ীর সাম্‌নে থেকে বরফ সরিয়ে ফেলতে হবে—তা তারা নিজেই করুক, বা সহরে এ কাজের জন্যে যে ব্যবসায়ী কোম্পানী আছে, তাদের হাতেই ছেড়ে দিক।

এই বিষয়ে বড় একটা আইন ভঙ্গ কেউ করে না। তুষার-পাতের এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক রাস্তায় কোদাল হাতে কুলীমজুরের দল বরফ সরিয়ে ফেলছে। গাড়ী করে এই সব বরফরাশি হেলসিংফোর্সের বন্দরে সমুদ্রের ধারে জমা হয়।

শীতের দিন রবিবারে সবাই 'শি' (ski) পরে সহরের রাস্তায় বা সমুদ্রের ওপর চলাফেরা করে। সপ্তাহের মধ্যে এই দিনটিতে শীতকালে যা কিছু সজীবতা দেখা যায়।

হেলসিংফোর্সের বন্দরের বাইরে নিকটে ও দূরে ছোটবড়

অনেক দ্বীপ আছে—এই সব দ্বীপে অনেক লোক বেড়াতে যায় রবিবারের দিনে। কেউ একা যায়—কখনো বা দলবদ্ধ

ফিনল্যাণ্ড সুন্দরী: বাম পার্শ্বের ছবিটি পাহাড়ী নারীর, ডাহিনের জন দ্বীপবাসিনী। ফিনল্যাণ্ডের মেয়েরা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ খুব পছন্দ করে।

হয়ে যায়—মেয়েরা জমকালো রঙীন পোষাকে ও তরুণেরা বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে, পায়ে 'শি' এঁটে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে।

শীতকালে বরফের উপর নানারকম মেলা ও আমোদ-প্রমোদ হয়—তার মধ্যে 'শি' পায়ে এঁটে হাঁটা বা দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা একটা প্রধান খেলা। 'শি' জিনিসটা দুটো কাঠের দীর্ঘ নাগরা জুতোর মত। 'শি' পায়ে দিয়ে মসৃণ বরফের উপর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়, দৌড়ানো যায়—তবে এ সমস্তই অভ্যাসসাপেক্ষ। অনেক দিন ধরে অভ্যাস না করলে 'শি' পায়ে দিয়ে হাঁটতে গেলে বিপদও আছে।

এ ছাড়া বরফের ওপর স্কেটিং ও মোটরগাড়ীর রেসও হয়। এসব খেলায় বিপদও কম নয়—বিশেষ করে শীতকালের শেষের দিকে যখন বরফ গল্‌তে সুরু করে। রবিবারে নাচ-ঘর, থিয়েটার ও সিনেমাতে খুব ভিড় হয়, হোটেল রেঁস্তরা ভর্ত্তি থাকে।

এই গেল শীতকালের কথা।

হঠাৎ শীত কেটে যায়, বসন্ত পড়ে, গ্রীষ্ম আসে। এই পরিবর্ত্তন এখানে যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়কর। বসন্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রূপ রাতারাতি বদলে যায়—হঠাৎ গাছে নতুন কচিপাতা গজায়, বরফের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস চোখে পড়ে। পার্কে নানা ধরণের ফুল ফোটে, লোকে 'শি' ছেড়ে দিয়ে সাইকেলে চেপে কর্ম্মস্থানে যায়।

ফিনল্যাণ্ডের গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়—আমাদের দেশের বর্ষাকালের মত—গ্রীষ্মকালে গরমে আই-ঢাই করতে হয় না, এ সব দেশের তুলনায় খুব শীত। রাত্রি বলে কোন জিনিস নেই, সূর্য্য অস্ত যায় না গ্রীষ্মকালে। অল্পদিন স্থায়ী বলেই গ্রীষ্মের দিনগুলো সবাই খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদে কাটায়।

হেলসিংফোর্সের অদূরে সমুদ্রবক্ষে ছোট বড় দ্বীপগুলিতে সহরের ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত লোকদের অনেক বাগানবাড়ী আছে—সাধারণ লোকের আমোদ-প্রমোদের জন্যেও অনেক ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মকালে সহর থেকে অধিকাংশ লোক সকালে উঠে ষ্টীমারে এই সব দ্বীপে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে

লাপল্যাণ্ডের দক্ষিণে বোথনিয়া উপসাগরের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে জঙ্গল ও জলাভূমির দেশের দুইটি মেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা সহরে ফেরে। সচ্ছল অবস্থার লোকে এ কয় মাস ওই সব দ্বীপের বাগানবাড়ীতে কাটায়।

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

সাত

পল ফিরে এসে তার খাবার-ঘরে টেবিলের কাছে বসল। মা খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে তখন তারা একটা অন্য কথা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলে। রাজা নিকোদিমাসের পালানর বিষয় নিয়ে কথা উঠল। এদিকে আন্টিয়োকাস সেই রূপোর তেলের পাত্র ও অন্যান্য যে সব জিনিষ বার করা হয়েছিল সে সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে তার লাল ক্লোকটা না খুলে রেখেই দৌড়ে গেল আর কি খবর পাওয়া যায় জানতে। প্রথম বার সে ফিরে এল, এক অদ্ভুত খবর নিয়ে—বুড়ো ত অদৃশ্য হয়েইছে, তার আত্মীয়রা তার যা কিছু টাকাকড়ি ছিল তা নেবার জন্য নাকি তাকে কোথায় একেবারে সরিয়ে দিয়েছে।

"ওরা বলছে যে তার সেই কুকুর আর ঈগল পাখীটা পাহাড় থেকে নেমে এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে।" একজন কথাটা শুধরে নিয়ে ঠাট্টা করে বললে, "আমি কুকুরের কথাটায় বিশ্বাস করিনে।" একজন বুড়ো লোক বললে, "কিন্তু ওই যে ঈগল সে বড় ঠাট্টার ব্যাপার নয়। আমার মনে আছে, তখন আমি ছেলেমানুষ, আমার আঙন থেকে একটা বেশ বড় ভেড়া ঈগলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।"

তারপর আন্টিয়োকাস আবার নতুন খবর আনলে সেই রুগ্ন বুড়োকে নাকি পর্বতের উপত্যকার উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ইচ্ছা ছিল যে, সেইখানেই সে মরে। শেষ পিদীমের তেজ যেমন জোর হয়ে ফুটে ওঠে, তেমনি তার দেহে একটা বল এসেছিল। বল ফুরিয়ে যাবার আগের সে বল তাই। মরতে যাচ্ছে যে শিকারী, ঘুমন্ত লোক যেমন চলে যায় তেমনি সে উঠে চলে গেল, সেখানে যাওয়াই তার প্রাণের শেষ ইচ্ছে ছিল। পাছে তাকে যাতে কেউ না বিরক্ত করে, তার অবস্থা আরো না খারাপ করে, তার আত্মীয়রা তাই তাকে সেখানে নিয়ে গেছে। সে তার পাহাড়ের ওপরের সেই কুঁড়েতে নির্বিঘ্নেই গেছে।

"এখন বস, খেয়ে নাও," পাদরী সাহেব বালককে বললে।

আন্টিয়োকাস পাদরীর কথা শুনে টেবিলের কাছে গিয়ে বসল। পাদরী সাহেবের মায়ের পানে প্রথম একবার চেয়ে অনুমতি না নিয়ে কিন্তু বসল না। তিনিও একটু হাসলেন, তাকে বললেন, "হ্যাঁ, বস।" আন্টিয়োকাসের মনে হল, যেন সে এখন এই বাড়ীরই ছেলে, একই পরিবারের লোক। ছেলেমানুষ, সাদা মন, সেত জানে না যে, এরা দুজন বুড়ো শিকারীর পালানর সেই কথা ফুরিয়ে যাবার পর, এখন একলা হতে মনে ভয় পাচ্ছে। মা দেখতে পেলেন যে, তার ছেলের অশান্তিমাখা চোখ কি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল, যেন কোন অজানিত অদৃশ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে। পল বসে কাজ করছিল, সে চমকে উঠল, বুঝতে পারলে যে তার মা তাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছেন, তার ভেতরের যাতনা যে কতখানি তা তার মা বেশ অনুভব করতে পাচ্ছেন। কিন্তু টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে দিয়ে তিনি ঘর থেকে তক্ষুনি চলে গেলেন, আর এলেন না।

দুপুর বেলায় চক্‌চকে রোদের ভেতর আবার হাওয়া উঠল। পশ্চিমের মধুর বাতাসে পাহাড়ের ধারের গাছের মাথা এতক্ষণ দুলছিল না। ঘর রোদের আলোয় আলো। জানালার বাইরে হাওয়ায় এখন গাছের পাতা নাচছে তার ছায়া এসে ঘরে পড়ে, এক একবার এক এক রঙের ছক পেতে দিচ্ছে, আবার রং বদলে নতুন ছক পাতছে। সাদা মেঘগুলো আকাশের গায়ে ভাসছে। বীণার সাজানো তারে বাতাস ধীরে ধীরে যেন শান্ত সুর বাজিয়ে চলেছে।

রঙের মোহস্বপ্ন ভেঙে গেল। দরজায় কে এসে ধাক্কা দিলে। আন্টিয়োকাস তাড়াতাড়ি ছুটে গেল খুলে দিতে। ফ্যাকাসে মুখ, একটি তরুণী বিধবা মেয়ে, ভয়ে তার চোখ কাঁপছে, এসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। পাদরী সাহেবের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে নিয়ে এসেছে। ছোট মুখখানি, জ্বল-জ্বল করছে, একটা লাল রেশমী রুমাল মাথায় আলগোছে এলো খোঁপায় বাঁধা। মেয়েটিকে টানতে টানতে আনছে, এধার থেকে ওধার তার হাত ছাড়িয়ে যাবার জন্য সে ভীষণ ছটফট করছে। চোখ দুটো বুনো বেরালের মত যেন আগুনের ঝলক দিচ্ছে। বিধবাটি বললে, মেয়েটার ভারি অসুখ, পাদরী সাহেব যদি বাইবেল পড়ে তার ঘাড়ে যে পাপভূত চেপেছে, তাকে ছাড়িয়ে দেন।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে হতভম্ব ভাবে আন্টিয়োকাস দরজার আধখানা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। পাদরী সাহেবকে এখন এ ভাবে এ সব নিয়ে বিরক্ত করার সময় নয়। মেয়েটি দুমড়ে-মুচড়ে একদিক থেকে আর একদিক যাচ্ছে, তার মার হাত কামড়ে দিচ্ছে, সে পালাতে পাচ্ছে না বলে। দেখে সত্যি সত্যি ভয়ও হয়, দুঃখও হয়।

লজ্জায় বিধবাটির মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বললে, "দেখতে পাচ্ছেন, ওকে ভূতে পেয়েছে।" তখন আন্টিয়োকাস তাড়াতাড়ি তাকে ভিতরে আসতে দিলে, এমন কি মেয়েটিকে যাতে ভিতরে টেনে আনতে পারে, তার জন্যে চেষ্টাও করলে। মেয়েটা দরজার পাশের চৌকাঠ চেপে ধরে যতখানি তার জোর আছে, তা দিয়ে শক্ত হয়ে বাধা দিতে লাগল।

ব্যাপারটা কি পল তা শুনলে। আজ তিনদিন ধরে ছোট মেয়েটা এমন হয়েছে, কেবলই হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা। সব বৃথা, বোবা ও কালার মত হয়ে গেছে, শোনেও না, জবাবও দিতে পারে না। পাদরী সাহেব

তাকে কাছে আনতে বললেন। তার কাঁধ দুটি ধরে, তার মুখ-চোখ ভাল করে পরীক্ষা করলেন।

"এ কি অনেকক্ষণ ধরে রোদে ঘোরাঘুরি করেছিল ?"

তার মা চুপি চুপি বললে, "না তা একেবারেই নয়, আমার বোধহয় কোন খারাপ দৃষ্টি পেয়ে ভূত এর ঘাড়ে চেপে বসেছে।" তার পর কাঁদতে কাঁদতে বললে, "একলা ও কি আর আছে, ওর ঘাড়ে কে চেপেছে।"

পল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার ঘর থেকে, বাইবেল আনতে গিয়ে থামল। অ্যান্টিয়োকাসকে বললে, "ও ঘর থেকে বাইবেল নিয়ে এস ত।" বইখানা টেবিলের উপর এনে রাখা হল। তখন পল সেই মেয়েটির আগুনের মত তপ্ত মাথায় এক হাত দিয়ে পড়তে লাগল। মেয়ের মা হাঁটু গেড়ে দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রইল। পল জোর গলায় বলতে লাগল —

"... আর তারা তখন গাদারিনদের দেশে এসে পৌঁছুল, সে দেশটা গ্যালিলির বিপরীত দিকে। যখন তিনি সেই দেশে গেলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে একজন ভূতে-পাওয়া লোকের দেখা হল সহরের বাইরে। তার ঘাড়ে অনেক দিন ধরে ভূত চেপে আছে। অঙ্গে কোন কাপড় নেই, ঘরদোর নেই, কোন বাড়ীতে তাকে জায়গা দেয় না, শুধু গোরের ভেতর থাকে। যখন সে ঈশাকে দেখতে পেলে, সে চীৎকার করে ঈশার পায়ের কাছে এসে পড়ল। চীৎকার করে তাঁকে শোনালে, 'তোমার সঙ্গে আমার কি দরকার ঈশা, তুমিত ভগবানের সন্তান, সবার চেয়ে বড় ? আমি ব্যাগ্‌ৃগাতা করছি আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না।'"

অ্যান্টিয়োকাস পুঁথির পাতের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার চোখ টেবিলের উপর, পাদরী সাহেবের হাতের দিকে আর পুঁথির দিকে ঘুরতে লাগল, যেখানে সেই কথাগুলো রয়েছে। "তোমার সঙ্গে আমার কি দরকার ?" সে দেখতে পেলে তার হাত কাঁপছে, মুখ তুলে দেখলে, পলের চোখ জলে ভরে গেছে। তারপর একটা অদম্য ভাবের ধাক্কায় সে সেই বিধবা মেয়েটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটা হাত বাড়িয়ে বাইবেল-পুঁথি ছুঁয়ে রইল। মনে মনে নিজে ভাবলে,

"নিশ্চয়ই এ লোক জগতের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কথা পড়তে পড়তে যখন তার চোখ জলে ভরে উঠে।" আর তার পলের মুখের পানে চাইতে সাহস হল না। অন্য হাতে সে ছোট মেয়েটির ঘাগরার নীচেটা ধরে টেনে রইল, তাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে। অথচ তার ভয়ও হচ্ছে, পাছে ওই ভূত ছেড়ে যাবার সময়, ওকে ছেড়ে না আবার তাকে ধরে বসে।

ভূতে-পাওয়া মেয়েটা তখন তার হাত পা ছোঁড়া থামিয়েছে। শক্ত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে, তার সরু গলা ও ঘাড় লম্বা টান করে, তার ছোট খুঁৎনিটা রুমালের গাঁঠের ওপর জোর করে চেপে পাদরী সাহেবের মুখের দিকে সে স্থির হয়ে দেখতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তার মুখের ভাব বদলাতে লাগল, তারপর মুখ আলগা হয়ে মুখ খুলে গেল। তখন মনে হল যে, বাইবেলের সেই বাণী, বাতাসের সর-সর শব্দ, পাহাড়ের গায় গাছের দোলায় পাতার ঝির্ ঝির্, মেয়েটির ওপর যেন মন্ত্রের মত কি বিছিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ, সে অ্যান্টিয়োকাসের হাত থেকে ঘাগরার কোণটা জোরে ছিনিয়ে নিয়ে, তার পাশে ধড়াস করে হাঁটু গেড়ে বসল। পাদরী সাহেবের যে হাত তার মাথার উপর বাড়ান ছিল, তা তেমনি রইল। পল আবার কম্পিত স্বরে পড়ে যেতে লাগল,

"তখন সেই লোকটা, তার ঘাড় থেকে ভূত ছেড়ে চলে গেল। প্রার্থনা করলে, বললে ঈশাকে, যেন তাঁর পায়ের কাছে সে থাকতে পায়; কিন্তু ঈশা তাকে বল্লেন, 'তুমি যাও। তোমার নিজের বাড়ীতে ফিরে যাও। দেখাও, জানিয়ে দাও গে যে, ভগবান তোমায় দয়া করে কেমন তোমার এত বড় মঙ্গল করলেন।'"

বাইবেল পড়া থামল, পল মেয়েটির মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলে। মেয়েটি এখন একেবারে শান্ত। অবাক হয়ে সে অ্যান্টিয়োকাসের মুখের পানে চেয়ে রইল। সেই নিরালা শান্তির মধ্যে বাইবেলের বাণী থেমে যাবার পর, আর কিছুই শোনা গেল না। শুধু গাছের পাতার দোলানির সঙ্গে বাতাসের ঝির ঝির শব্দ আর দূর পাহাড়ের পথের ধারে পাথর ভাঙার ঠক্-ঠক্-ঠক্।

পলের ভারি যন্ত্রণা হতে লাগল। বিধবা মেয়েটির যে কুসংস্কার যে তার মেয়েকে ভূতে পেয়েছে, তা পলের মনে একটুও লাগেনি। তার দুঃখ এই ভেবে যে, সে যে বাইবেল পড়ছিল তাতে নিজে বিশ্বাস করে না। যদি সয়তান কোথাও থাকে তবে সে তার নিজের ভেতরেই আছে। তাকে যেমন করেই হোক্ তাড়াতে হবে। তবু সে নিজে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করছিল, যখন সে পড়ছিল, "তোমার কাছে আমার কি দরকার ?" তার মনে হল যে, এই যে তিন জন ধর্ম্মবিশ্বাসী তার সামনে রয়েছে, ওই যে তার মা রান্নাঘরে হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করে রয়েছে, তারা তার শক্তির কাছে ত' মাথা নত করেনি, করেছে তার এই অক্ষম দৈন্যের কাছে। কিন্তু যখন সেই বিধবা মেয়েটি তার পায়ে মাথা রেখে চুমু খেতে গেল, তখন তাড়াতাড়ি পা-টা সে সরিয়ে নিলে। তার মায়ের কথা মনে হল, তিনি ত' সব জানেন। ভয় হল, পাছে তিনিও তাকে ভুল বোঝেন।

বিধবা মেয়েটি বেদনায় ও কৃতজ্ঞতায় এমন আশ্চর্য্য হয়ে রইল যে, যখন সে মুখ তুললে, তখন দুজনেই হাসতে লাগল, এমন কি পলের যে এত যাতনা তারও যেন কতক লাঘব হয়ে গেল।

পল বললে, "এখন ওঠ, সব ত ঠিক হয়ে গেছে, মেয়েটি শান্ত হয়েছে।"

সকলে উঠে দাঁড়াল। অ্যান্টিয়োকাস ছুটে দরজা খুলে দিতে গেল, সেখানে আবার কে এসে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। সেই রক্ষক, তার চামড়ার ফিতেয় বাঁধা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অ্যান্টিয়োকাস চেঁচিয়ে বললে, তার মুখ চোখ যেন আনন্দে ঝলমল করছিল,

"একটা পরম আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে। নিনা মাসেয়ার কাঁধ থেকে উনি ভূত তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

কিন্তু রক্ষক ওসব দৈব ব্যাপারকে বিশ্বাসই করে না, দরজা থেকে একটু তফাতে সে দাঁড়িয়ে বললে, "তাহলে জায়গা ছাড়, ভূতগুলো পালাবার রাস্তা পাক।"

অ্যান্টিয়োকাস চেঁচিয়ে বললে, "তারা তোমার ওই কুকুরটার ভেতর গিয়ে ঢুকবে।"

"ওখানে তারা ঢুকতে পাচ্ছে না, কারণ সেখানে অন্য ভূত আছে।" রক্ষক উত্তর করলে। সে খুব গম্ভীর হয়ে রইল বটে, কিন্তু তার কথার ভেতর যথেষ্ট তাচ্ছিল্য ও রহস্য মাখা ছিল। ঘরের দরজার চৌকাঠের কাছে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে কিছু মাত্র চোখ না ফিরিয়েই পাদরী সাহেবকে কুর্নিশ করলে। বললে, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা কইতে পারি হুজুর?"

মেয়েরা রান্নাঘরে সরে গেল, আর অ্যান্টিয়োকাস বাইবেল নিয়ে উপরে রাখতে গেল। যখন সে নীচে নেমে এল, রক্ষক কি বলে তাই শোনবার জন্যে একটু থেমে দাঁড়াল।

"মার্জ্জনা করবেন, ও কুকুরটা আপনার সামনে নিয়ে এসেছি বলে, কিন্তু ও খুব পরিষ্কার জানে যে কোথায় এসেছে, ও আপনাকে কোন রকমেই জ্বালাতন করবে না। আমি এসেছি সেই বুড়ো নিকোদিমাস পানিয়ার ব্যাপারটা বলতে, লোকে যাকে রাজা নিকোদিমাস বলে। সে তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এসেছে, শেষ ধর্ম্ম-উপদেশ নেবার জন্য আপনার সঙ্গে ফিরে দেখা করতে চায়। আমার এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে……"

পাদরী সাহেব অধীর হ'য়ে চেঁচিয়ে বলল, 'হে ভগবান!' কিন্তু পরক্ষণেই তার ছেলেমানুষের মত আহ্লাদে বুক ভরে গেল, এই জন্যে যে, এখুনি পাহাড়ের উপত্যকায় যেতে পারবে। যে মানসিক যন্ত্রণাটা তার হচ্ছে, সেটা পাহাড়ে ওঠার শারীরিক পরিশ্রমে একেবারে দূর চলে যাবে।

তখন তাড়াতাড়ি বলল, "হাঁ, হাঁ, কিন্তু আমার যে ঘোড়া চাই। পথটা কি রকম?"

"ঘোড়ার ব্যবস্থা আমি দেখছি, সেত আমারই কর্ত্তব্য," রক্ষক বললে।

পাদরী সাহেব তাকে পান করবার জন্যে অনুরোধ করল। রক্ষক কখনও কার কাছ থেকে কোন জিনিষ নেওয়াটাকে নীতিবিরুদ্ধ মনে করে, এক গেলাস মদও নয়; কিন্তু এক্ষেত্রে সে পাদরীর ধর্ম্মকার্য্য আর তার নাগরিক কার্য্য পরস্পর নিকটসম্বন্ধ মনে করে, নিমন্ত্রণ নিলে। তাই সে এক গেলাস মদ খেলে, খেয়ে তার শেষ ফোঁটা মাটীতে ফেললে। (কারণ মানুষে যা কিছু খায়, তার একটু ভাগ পৃথিবীকে দিতে হয়)। তারপর সেই সৈনিকের মত কুর্নিশ করে তার ধন্যবাদ জানালে। এদিকে সেই প্রকাণ্ড কুকুরটা তার ল্যাজ নাড়তে লাগল। পলের দিকে মুখ তুলে যখন চাইলে, তখন তার চোখের তাকানিতে বেশ বন্ধু-ভাব মাখিয়ে যেন বলছে— ভাব হয়ে গেল।

অ্যান্টিয়োকাস আবার দরজা খুলে দিয়ে, ঘরে এসে দাঁড়াল নতুন কোন আদেশ নেবার জন্য। তার মার জন্যে সে বড় দুঃখিত হল। সেই মদের দোকানের পেছনে ছোট ঘরটিতে কখন থেকে সেই পাদরী সাহেবের জন্যে বসে আছেন। সে ঘরে কত করে পরিষ্কার করে, অতিথির জন্যে, থুকেয় করে গেলাস সাজান হয়েছে। কিন্তু উপায় কি, কর্ত্তব্য সবার আগে। মায়ের সঙ্গে পাদরী সাহেবের দেখা হওয়া আজ আর হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে।

রক্ষকের স্বরের গাম্ভীর্য্যের নকল করে অ্যান্টিয়োকাস বললে, "ছাতা কি আমাদের সঙ্গে নিতে হবে?"

"তুমি কি মনে করছ? আমি ত এখন ঘোড়ায় যাচ্ছি, তোমার এখন যাবার দরকারই হবে না। আচ্ছা আমি তোমাকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

"না, আমি হেঁটেই যাব, আমার একটু কষ্ট হয় না" ছেলেটি জেদ করে বললে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রস্তুত হয়ে এল। ছোট একটি বাক্স হাতে, তার সেই লাল পোষাকটা পাট করে হাতের উপর ফেলা। সে মনে করেছিল ছাতাটাও নিয়ে যাবে, কিন্তু যখন উপরওয়ালার হুকুম তখন কি আর করবে।

যখন সে পাদরী সাহেবের জন্যে গির্জ্জের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তখন যত ছেঁড়া কাপড় পরা ময়লা পোষাকওয়ালা দুষ্ট ছেলের দল, ওই রাস্তার চৌমাথাটা যাদের খেলার মাঠ আর লড়াইয়ের জায়গা, তারা এসে অ্যান্টিয়োকাসকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশী কাছে এস না, কারণ ওই বাক্সটাকে তারা সম্মানও করে আবার কিছু ভয়ও করে।

"চল, আমরা কাছে যাই।" একজন বললে।

"সব দূরে সরে থাক্, নইলে ওই রক্ষকের কুকুর লেলিয়ে দেব তোদের", অ্যান্টিয়োকাস খুব চেঁচিয়ে বললে।

"রক্ষকের কুকুর! হাঁ; তুমি ওর দশ মাইলের ভেতর আসতে সাহস কর না।"

দুষ্ট ছেলেরা অ্যান্টিয়োকাসকে মুখ ভেঙচে বললে।

"আমি সাহস করিনে, কি?" অ্যান্টিয়োকাস একেবারে বেশ রকম করে মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে।

"না, তুমি সাহস কর না? তুমি ওই বাক্সটায় পবিত্র তেল নিয়ে বয়ে চলেছ বলে তুমি বুঝি মনে করেছ যে, একেবারে ভগবানের সমান, না?"

"আমি যদি হতাম," একটা মন-খোলা ছেলে বললে, "আমি ওই বাক্সটা নিয়ে, ওই পবিত্র তেল দিয়ে, যতরকম যাদু আছে করতাম।"

"চলে যা, যত সব গুবরে-মাছির দল! নিনা মাসিয়ার ঘাড় থেকে ভূত নেবে তোদের ঘাড়ে বসেছে।"

"সে আবার কি? ভূত?" ছেলেরা সব চেঁচামেচি করে উঠল।

তখন অ্যান্টিয়োকাস খুব গম্ভীর হয়ে বললে, "হাঁ-হাঁ। এই আজ বিকেলে নিনা মাসিয়ার দেহ থেকে তিনি ভূত ছাড়িয়েছেন। ওই যে সে আসছে।"

গির্জ্জেবাড়ী থেকে, সেই বিধবা তখন মেয়েটির হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। ছেলেরা সব তাকে দেখতে ছুটে গেল। এক নিমেষের মধ্যে সেই দৈব ব্যাপারের খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। পাদরী সাহেব প্রথম আসার

দিন যে রকম দৃশ্য হয়েছিল,আজও ঠিক অনেকটা সেই রকম ঘটে গেল। সমস্ত লোক সেই গির্জ্জের চৌমাথার কাছে এসে জড়ো হল। আর গির্জ্জের সব উঁচু সিঁড়ির ধাপে নিনা মাসিয়ার মা তাকে বসালে। সেখানে নিনা মাসিয়া বসল। তার সেই রোগা, কটা রঙ, তার সেই সবুজ চোখ, আর মাথার উপর দিয়ে বাঁধা লাল রুমাল দেখে মনে হতে লাগল যেন, কোন পুরাকালের একটা পুতুল বসান হয়েছে- ঠাকুর বলে পুজা করবার জন্যে, এই সরল বিশ্বাসী গেঁয়ো লোকদের কাছে।

মেয়েরা ত সব কেঁদেই অস্থির, তারা একবার করে তাকে স্পর্শ করতে চায়। ইতিমধ্যে সেই রক্ষক সেখানে তার কুকুর নিয়ে হাজির। পাদরী সাহেব তখন ঘোড়ায় করে চৌমাথাটা পার হয়ে গেছে। জনতা তাকে ঘিরে একটা মহা জটলা করে শোভাযাত্রার মত তার পিছনে চলছে। কিন্তু যখন পল তাদের সেই অভিবাদন দুধার থেকে, হাত নেড়ে নিতে লাগল, তখন তার দুঃখের যাতনায় যে বিরক্তি এসেছিল, তার চেয়েও তার কষ্ট হচ্ছিল। যখন সে পাহাড়ের উপরে পৌঁছল, তখন ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরলে, মনে হল, এইবার বোধহয় সে কিছু বলবে, কিন্তু সে ঘোড়া হাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি নীচের রাস্তায় নেমে চলে গেল। তার মনে একটা অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল যে, একেবারে টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে এই উপত্যকা থেকে পালায়; নিজেকে ফেলে হারিয়ে, তার সারা দেহ মন প্রাণ ওই হোথায়, ওই দূরে যেখানে আকাশ ও গ্রামের শেষ রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে, ওই যেখানে চোখ রেখায় হারিয়ে যায়।

বাতাস যেন মনকে তাজা করে দিলে। ঝোপে ঝাপে সাঁঝের রশ্মির আলো আসছে। নদীর বুক নীল আকাশের রঙে ভরে গেছে। কারখানার চাকা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যে জল ছিটকে উঠছে, তার গায়ে আলো পড়ে দেখাচ্ছে যেন মাণিক হীরে ঝরঝর করে পড়ছে।

রক্ষক তার কুকুর নিয়ে আর আন্টিয়োকাস তার বাক্স নিয়ে গম্ভীরভাবে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। তারা তাদের নিজেদের কাজের গুরুত্ব বেশ ভালই বোঝে। পল রাশ টেনে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলে। নদীটা পেরুবার পর, পথটা সোজা ঘুরে ঘুরে আবার উপত্যকার দিকে চলেছে। ধারে ধারে পাথর বসান নীচু পাঁচিল, পাহাড়ের খানিকটা—বেঁটে গাছের সারি, পশ্চিমা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। গন্ধমাখা পাতার গন্ধের সঙ্গে দুনোগোলাপের কড়া গন্ধ মিশে বাতাস পথ ভরে দিয়েছে, মাটীতে সে গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

পথটা ক্রমেই আবার উপরের দিকে উঠেছে। যখন তারা পাহাড়ের ধারে মোড় ফিরল তাদের চোখ থেকে গ্রামখানা মুছে গেল। পৃথিবীতে তখন আর কিছুই নেই, শুধু বাতাস আর পাথর, সাদা ধোঁয়া জলীয় বাষ্পের মত উঠে, দৃষ্টির সীমানার পারে পৃথিবী ও আকাশকে গেঁথে দিয়েছে। থেকে থেকে কুকুরটা ডেকে উঠছে, আর তার সেই ডাকের উত্তরে পাহাড়ের আর আর কুকুরগুলোর উত্তর।

তাদের পৌঁছবার পথে অর্দ্ধেকটা যখন এসেছে, পাদরী সাহেব তখন আন্টিয়োকাসকে তার পিছনে উঠে বসবার জন্য বললে। ছেলেটি কিছুতেই রাজি হল না, শুধু তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেলের বাক্সটা তার হাতে দিয়ে দিলে। তখন সে রক্ষকের সঙ্গে কথা কইতে গেল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। রক্ষক তার কাল্পনিক পদমর্য্যাদায় গম্ভীর, সে একমুহূর্ত্তও সেটা ভোলে না। যখন-তখনই সে থামছে, গ্রামভারী চালে ভুরু কোঁচকাচ্ছে: তার টুপীর ধারটা নীচে করে নামিয়ে, চারদিকের জায়গাকে বেশ লক্ষ্য করছে যেন সারাটা পৃথিবীতে বুঝি এখনি কি একটা বিপদ এসে পড়ল, আর পৃথিবীর সবটাই যেন তারই অধিকারে। কুকুরটাও তখন থেমে, চারটা পায়ের থাবা শক্ত করে রাখছে, বাতাস নাক দিয়ে ঝেড়ে ফেলছে, আর কান থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত কাঁপাচ্ছে। সন্ধ্যায় সব নিস্তব্ধ, শুধু একমাত্র নড়াচাড়া দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ে ছাগলগুলোর, তারা খুব চটপটে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে চলেছে। দেখাচ্ছে যেন কালো মানুষের সার সিলুটের মত – সেই নীল আকাশের গায়ে, আর গোলাপী সূর্য্যের আলোর আভায়।

তারপর তারা এসে পড়ল একটা নাবাল পাহাড়ের গায়ের কাছে, সেখানে চাঁই চাঁই বড় বড় গ্র্যানাইট পাথর খাড়া হয়ে আছে। একটা চমৎকার পাথরের ঝরণার মতন, একটা থেকে আর একটা, তার থেকে আর একটা এমনি করে ঝরণার জল পড়ার মত পাথর নেমে গেছে। আন্টিয়োকাস এইবার জায়গাটা চিনতে পারলে। সে একবার তার বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল। পাদরী সাহেব পথ ধরেই চলল, সেটা খানিকটা ঘুরে ঘুরে গেছে, রক্ষক কর্ত্তব্যের খাতিরে সঙ্গে সঙ্গে পিছু পিছু চলেছে। ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে একটা পাহাড়ের গা থেকে আর একটায় গিয়ে, সবার আগেই সেই কুঁড়েঘরের কাছে উঠে দাঁড়াল।

কুঁড়েটা পোড়ো ভাঙা ভাঙা কাঠের গুঁড়ি আর গাছের ছাল দিয়ে খাড়া-করা বড় বড় চাঁই পাথরের স্বাভাবিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা, এর ধারে ওই বুড়ো শিকারী তার সেকেলে কেল্লা তৈরী করে রেখেছে, চারদিক থেকে বড় বড় অনেক পাথর এনে ঘিরে দিয়েছে। এই পাথরের বেড়ার আড়ালে সূর্য্যি কাত হয়ে ডুবে যায়, যেন পাতকুয়োর ভেতর ডুব দিচ্ছে। তিন দিক দিয়ে কিছু দেখবার জো নেই, সব পাথর দিয়ে বন্ধ, শুধু ডান দিকে দুটো পাথরের মধ্যে ফাঁক, তার ভিতর দিয়ে দূরে গাঢ় নীলের বুকে একটা চকচকে রূপোর মত রেখা দেখা যায়,—সেটা সমুদ্র।

পায়ের শব্দ পেয়ে, বুড়োর নাতী তার কাল কোঁকড়ান চুলে ঢাকা মুখখানা কুঁড়ের দরজার ভিতর থেকে বার করে দেখলে।

আন্টিয়োকাস জানিয়ে দিলে যে তাঁরা আসছেন।

"কারা আসছে?"

"পাদরী সাহেব আর রক্ষক।"

লোকটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল, তার ছাগলের গায়েও কেমন কাল লোম, তার গায়েও প্রায় তেমনি। বোকার মত হৈ-চৈ করে বললে যে, এই রক্ষকটা সকল সময়েই অন্যের কাজের মধ্যে এসে গোলমাল করে।

"তার হাড় কখানা আমি ভেঙে গুঁড়ো করে দেব।" ভয় দেখানোর ভাবে সে গর্জ্জন করে উঠল। কিন্তু যখন সে রক্ষকের কুকুর দেখলে তখন

একেবারে সরে গেল। বুড়োর কুকুরটা তখন বেরিয়ে এসে দৌড়ে এগিয়ে এল যারা আসছে তাদের গা শুঁখে অভিবাদন করতে।

অ্যাণ্টিয়োকাস আবার তেলের বাক্সর ভার নিলে, পাহাড়ের যে দিকটা খোলা সেই দিকে তাকিয়ে একখানা পাথরের উপর সে বসল। চারিদিকেই গাদা পরিমাণ বুনো বরার ছাল, কাল ধোঁয়াটে দাগ। সোনালি রঙের কিসের ছাল, পাহাড়ের উপর রোদে শুখোবার জন্যে পেতে দেওয়া রয়েছে। কুঁড়ের ভেতর বুড়োর আকৃতি দেখা যাচ্ছে। এক গাদা চামড়ার ওপর পড়ে আছে, তার কাল মুখখানা, সাদা চুল আর দাড়ি দিয়ে বাঁধা। মরণ এসে যে ঢাকা শিয়রে বসেছে, তা তার মুখের ভঙ্গীতে আর দাগে বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাদরী সায়েব তাকে জিজ্ঞাসার জন্যে ঝুঁকে বসল, বুড়ো কোন উত্তর করতে পারলে না। চোখ বুজেই পড়ে রইল। তার সেই বেগুনী ঠোঁটের ধারে এক ফোঁটা রক্ত যেন কাঁপছে। একটু দূরে আর একখানা পাথরের উপর রক্ষক বসে, পায়ের কাছে সেই কুকুরটা। রক্ষকের চোখ কুঁড়ের ভেতর দিকে স্থির। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে, কেননা সে মরবার সময় বুড়ো, আইন মেনে মরছে না, তার শেষ ইচ্ছা কি আর উইলটা যে কি করবে, তা বললেও না, করেও গেল না। অ্যাণ্টিয়োকাস যেমন তার দুই চোখ দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে দেখলে। সেই দিকে তার মনে হল, রক্ষক যেন বসে আছে এমন ভাবে, যে ওই মরণাপন্ন বুড়োর দিকে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেবে, যেমন একটা চোরের পিছনে লোকে কুকুর লেলিয়ে দেয়।

আট

কুঁড়ের ভেতর পাদরী সাহেব নীচু হয়ে দুমড়ে বসে, তার হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটি জড়ো করা, তার মুখ ক্লান্তি আর অসন্তোষের ভারে ভারী হয়ে আছে। সেও এখন একেবারে চুপ। সে যেন সব একেবারে ভুলে গেছে, কি করতে সে এখানে এসেছে। বসে বসে শুধু বাতাসের শব্দ শুনছে, মনে হচ্ছে যেন দূরে সমুদ্র ডাকছে। হঠাৎ রক্ষকের কুকুরটা ডাক দিযে লাফিয়ে উঠল। অ্যাণ্টিয়োকাস তার মাথার উপর পাখার ঝাপট শুনে চমকে উঠে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে যে, বুড়ো শিকারীর পোষা ঈগল পাখীটা পাহাড়ের উপর এসে বসছে, তার সেই প্রকাণ্ড দুই পাখা আস্তে আস্তে বাতাসে আঘাত করছে। দুটো বৃহৎ কাল পাখা।

ভিতরে পল বসে ভাবছে আপনার মনে: "এই তা হলে মৃত্যু। এই লোকটা অন্য সব লোক ত্যাগ করে এখানে পালিয়ে এসে ছিল, সে খুন করতে ভয় পেত, কিম্বা অন্য কোন ভীষণ পাপ করতেও তার ভয় হত। আর এখন সে এখানে পড়ে রয়েছে পাথরের মধ্যে পাথর হয়ে। আর আমিও এমনি হব ত্রিশ, না হয় চল্লিশ বছরে। একটা যেন নির্ব্বাসনের মত, যে নির্ব্বাসন অনন্তকাল ধরেই চলবে। হয়ত এ্যাগনিস আজ রাত্রেও আমার অপেক্ষা করছে।..."

সে চমকে উঠল। আঃ, না—সে ত মরা নয় সে যা ভাবছিল: প্রাণ এখনও তার ভিতরে ঢেউ দিয়ে ওপরে উঠছে, ওই পাহাড়ের উপরের ঈগলের মতন, তেমনি থরনখে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়বার পাত্র সে নয়।

"আজ সারারাত এইখানেই থাকব" নিজের মনে সে ঠিক করলে, "আজকের রাত যদি এখানে কাটাতে পারি তার সঙ্গে দেখা না করে, তাহলেই আমি বেঁচে যাব।"

পল কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, অ্যাণ্টিয়োকাসের পাশে এসে বসল। কালচে লাল আকাশে তখন সূর্য্য ডুবছে। উঁচু পাহাড়ের কাল ছায়াগুলো বেড়ার গায়ে লম্বা হয়ে পড়েছে, হাওয়ায় দোলখাওয়া ঝোপের উপর আরো লম্বা হয়ে গেছে। বাইরের সেই ঝাপসা আলোয় যেমন সকল জিনিষ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তেমনি তার নিজের মনের ভিতর কোন আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল, কোন ইচ্ছেটা যে তার ঠিক ইচ্ছে, তার বিচারও সে করতে পাচ্ছে না। সে বললে:

"বুড়ো লোকটা আর কথা কইতে পাচ্ছে না, সে এখুনি মারা যাবে। তার শেষ কায করবার সময় এসেছে। যদি সে মারা যায়, তাহলে তার দেহকে এখান থেকে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এটা দরকার হবে..." তারপর বললে, যেন সে নিজেকেই নিজে বলছে, কিন্তু কথাটা শেষ করতে তার সাহস হল না—"বোধহয় আজ এখানে রাত্রে থাকতে হতে পারে।"

অ্যাণ্টিয়োকাস উঠে শেষ কায্য করবার সব তোড়জোড় করতে লাগল। সে বাক্সটা খুললে। খুব আনন্দের সঙ্গে রূপোর আঙটা দুটো খুললে। সাদা কাপড় আর সেই গন্ধ তেলের পাত্রটা বার করলে। তারপর তার লাল ক্লোকটা খুলে বাক্সের উপর রাখলে—যেন সে নিজেই এখন পাদরী সাহেব! যখন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন তারা দুজনে কুঁড়ের ভিতর গেল। সেখান বুড়োর নাতী, তার জানুর উপর বুড়োর মাথাটা ধরে রেখেছে। অ্যাণ্টিয়োকাস তার অন্য ধারে হাঁটু গেড়ে বসল, তার সেই লাল ক্লোকের ভাঁজগুলো মাটীতে বেশ করে ছড়িযে সাজিয়ে দিয়ে। একখানা বড় পাথরের উপর সাদা কাপড়খানা বিছিয়ে পেতে সেটাকে টেবিলের মত করে নিলে। তার সেই ক্লোকের লাল রঙের আভা রূপোর কৌটার ওপর আভা দিতে লাগল। রক্ষক কুঁড়ের বাহিরে হাঁটু গেড়ে বসে, কুকুরটা তার পাশে।

তারপর পাদরী সায়েব বুড়োর কপালে ও হাতের চেটোয় সেই তেল বেশ করে মাখিয়ে দিলে। এ হাত কোনদিনই কোন লোকের ওপর অত্যাচার করবার জন্যে কোন কিছুই করেনি। তার পা তাকে মানুষের কাছ থেকে দূরে, মানুষের যত কিছু পাপ ও অন্যায় তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

অস্তমান সূর্য্যের শেষ সোনার আভার ঝলমলে আলো কুঁড়ের ভেতর পড়ছে, অ্যাণ্টিয়োকাসের সেই লাল ক্লোক যেন তাকে জ্বলন্ত করে তুললে। একদিকে সেই বুড়ো আর দিকে সেই পাদরী, এ দুজন যে পোড়া ছাই, আর এণ্টিয়োকাস যেন জ্বলন্ত আঙার।

পল ভাবছিল, "এইবার আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে, আর ত থেকে যাবার কোন অছিলেই নেই।" তারপর বাইরে এসে বললে, "কোন আশাই নেই, একেবারে জ্ঞান হারিয়েছে।"

"কোমা," রক্ষক একেবারে যেন ঠিক-ঠাক বলে দিলে।

"ঘন্টা কয়েকের বেশী আর সে টি'কছে না। এখন তার দেহটা গ্রামে নিয়ে যাবার একটা কোন বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু পলের ইচ্ছে যে সে বলে, "আমাকে সারারাতই এখানে থাকতে হবে।" অথচ এ মিথ্যের জন্য সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত মনে করছে।

এখন সে চায় খানিকটা বেড়াতে। গ্রামে ফিরে যাওয়াটাই তার সব চেয়ে বেশী ইচ্ছে। যত রাত হয়ে আসতে লাগল, তার সেই পাপ চিন্তা তাকে একটু-একটু করে আবার আকর্ষণ করতে লাগল। তাকে একটা অদৃশ্য অন্ধকারজালের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সে বেশ বুঝতে পারলে, তার ভয় হল। কিন্তু সে নিজেকে সাবধান করে রাখছে। বুঝল যে তার বিবেক জেগেছে, সে তাকে ধরে রাখতে প্রস্তুত হয়েছে।

"যদি শুধু আজকের রাতটা তার সঙ্গে দেখা না করে আমি কাটিয়ে দিতে পারি, তা হলে এ যাত্রা আমি বেচে যেতে পারব," এটা হল তার মনের নিঃশব্দ চীৎকার। যদি কেউ তাকে আজ রাত্রের মত জোর করে আটকে রাখে। যদি ওই বুড়োর জ্ঞান হয়, সে যদি এ সময় তার ক্লোকের পাড় জোর করে চেপে ধরে তাকে আটকে রেখে দেয়।

আবার সে বসে পড়ল, তার চলে যাওয়ার কিসে দেরী হতে পারে তাই খুঁজে দেখতে লাগল। উঁচু উপত্যকার অপর ধারে সূর্য্য তখন অনেকখানি নেমে গেছে আর বড় বড় ওকগাছের গুঁড়ি, লাল আগুনের আভা মাথায় আকাশের গায়ে বিরাট থামের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাথার উপরে অন্ধকার কাল বিরাট ছাদ। এই যে নিস্তব্ধতা, এই বিরাট গাম্ভীর্য্য মরণ এসেও তাকে একটুও নষ্ট করতে পারে নি। পল অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সকালে যেমন বেদার তলায় তার মনে হয়েছিল এখন সেই রকম মনে হচ্ছে—সে এই পাথরের উপরই অঙ্গ ঢেলে দেয় আর ঘুমিয়ে পড়ে। আর যেন সে পারছে না। ইতিমধ্যে রক্ষক একটা মীমাংসা করে ফেললে নিজের জন্য। সে কুঁড়ের ভিতর ঢুকে সেই বুড়োর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, তার কানে কানে কি বললে। নাতি সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা সন্দেহ ও ঘৃণার তাকানি তাকিয়ে সে পাদরী সাহেবের কাছে এসে বললে, "এখন ত আপনাদের সব কর্ত্তব্যই হয়ে গেছে। এখন তবে আস্তে আস্তে শান্তিতে চলে যান। এখন যা কিছু করবার দরকার তা আমিই করব এখন।"

সেই সময়ে রক্ষক বাইরে এসে পড়ল।

"কথা কওয়ার বাইরে গেছে, সে বললে, "কিন্তু সে আমাকে হাব-ভাবে নিশ্চিন্ত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার বিষয়-আশয়ের একটা বিশেষ ব্যবস্থা সে করে রেখে গেছে। নিকোদিমাস পানিয়া," সেই বুড়োর নাতির দিকে ফিরে বললে: 'নিকোদিমাস পানিয়া, তুমি তোমার জ্ঞান ও বিবেক নিয়ে বলতে পার যে আমরা এখন নিশ্চিন্ত শান্তিতে এখান থেকে যেতে পারি?"

"পবিত্র শেষ ধর্ম্ম উপদেশ ও ধর্ম্মকার্য্য ছাড়া তোমাদের এখানে আসবার কোন দরকারই ছিল না। আমার এসব কাজের মধ্যে তোমাদের গোলমাল করতে আসবার কি দরকার ছিল?" বুড়োর নাতি একেবারে মার-মুখো হয়ে বললে।

"আমাদের আইন মেনে ত' চলতে হবে অমন করে চেঁচিয়ো না," রক্ষক বললে। "থাম থাম যথেষ্ট হয়েছে, আর চেঁচামিচি করতে হবে না," পাদরী সাহেব কুঁড়ের দিকে দেখিয়ে দিলেন আঙুল বাড়িয়ে।

"আপনি সব সময়ে শুধু ওই এক শিক্ষাই দিচ্ছেন, জীবনে শুধু কর্ত্তব্য করাই একমাত্র ধর্ম্ম", রক্ষক খুব গম্ভীর ভাবে সে কথা শোনালে।

পল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালে, এই কথার আঘাতে সে একেবারে যেন জেগে উঠল। যা কিছু দেখছে, যা কিছু সে শুনছে সবই তার জন্য। সে ভাবলে যে ভগবান মানুষের মুখ দিয়ে যা বলাচ্ছেন, সে সবই যেন তাঁর কথা।

পল ঘোড়ায় উঠল, বুড়োর নাতিকে ডেকে বললে: "যতক্ষণ না তোমার ঠাকুরদার প্রাণ বের হয়, ততক্ষণ তুমি এইখানেই তবে থাক। ভগবানের শক্তি মহান, আমরা কিছুই জানিনা কখন কি ঘটবে।"

লোকটা খানিক পথ পলের সঙ্গে সঙ্গে গেল, যখন সে রক্ষকের কাছ থেকে অনেকটা দূরে গেছে, তখন পলকে জিজ্ঞাসা করলে: "শুনুন মশায়। আমার ঠাকুরদা তাঁর যা কিছু টাকা-কড়ি সব আমার কাছে দিয়ে গেছেন, সে সব আমার এই কোটের পকেটে। খুব বেশী নয়, কিন্তু যাই হোক এ টাকা এখন আমার, কেমন কি না?"

"যদি তোমার ঠাকুরদা সব টাকা শুধু তোমার জন্যেই তোমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে সবই তোমার।" লোকটা ফিরে দেখতে গেল যে আর সব তার পিছনে আসছে কিনা।

তারা সব পিছনে আস্তে আস্তে আসছে। অ্যান্টিয়োকাস একটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে লাঠির মতন করে নিয়েছে, তার উপরে ভর দিয়ে সে এগিয়ে আসছে। রক্ষক, তার চকচকে টুপীর চূড়োটায়, তার জামার বোতামের ওপর সন্ধ্যার সূর্য্যের শেষ আলোর লাল আভার চকচকানি—রাস্তার মোড় ফেরবার সময় একবার ফিরে দাঁড়াল সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে মুখ করে। একটা কুর্ণিশ দিলে সৈনিকের মত। এ কুর্ণিশ সে মৃত্যুকে দিচ্ছে। আর সেই পোষা ঈগল পাখীটা, তার সেই উঁচু পাহাড়ের বাসা থেকে, সেই কুর্ণিশের ফিরে কুর্ণিশ দিলে, তার সেই বড়-বড় দুটো কাল ডানার শব্দ করে। তারপর সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকার উপত্যকাকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলতে লাগল, তারপরেই সেই তিনজন পথিককে অন্ধকারে ঢেকে দিলে। যখন তারা নদী পার হয়ে বাড়ীর পথের দিকে ফিরল, দূরে গ্রামের আলো তাদের পথকে খানিকটা আলো করে দিলে। দেখাতে লাগল, যেন সমস্ত উপত্যকাটায় আগুন লেগে গেছে, পাহাড়ের ধার থেকে ভীষণ আগুন উপরের দিকে উঠছে। রক্ষক খর দৃষ্টিতে দেখলে যে, গির্জ্জের সামনের চৌমাথায় অনেক লোক

ঘোরা-ফেরা করছে। সেটা শনিবার; কিন্তু রবিবারের মত যেন সবাই বাড়ী ফিরে এসেছে বিশ্রাম করার জন্যে। কিন্তু তাতেও এটা বোঝা গেল না কি কারণে এ আগুনের আতসবাজীর খেলা, আর গ্রামের হঠাৎ তাতে এত উৎসাহ।

অ্যান্টিয়োকাস খুব আনন্দের সঙ্গে বললে, "আমি জানি এসব কি হচ্ছে। ওরা আমাদের অপেক্ষা করছে। তারা এই নিনা মাসিয়ার দৈব ব্যাপারটার জন্যে উৎসব করতে এসেছে।"

"হে ভগবান! আণ্টিয়োকাস, তুমি পাগল নাকি?" পাদরী সাহেব চীৎকার করে বললে। সে চীৎকারটা প্রায় ভয়েরই সমান। গ্রামের নীচের দিকে পাহাড়ের গায়ে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে সেই আগুনের শিখা থেকে এক এক বার লকলকে আলোর ঝলক উঠছে। দেখে তার মনের ভেতর একটা অজানিত ভয় হল।

রক্ষক কিন্তু কোন জবাব দিলে না, কোন মতও প্রকাশ করলে না, শুধু একবার তার কুকুরের গলার লোহার শিকলিটা ধরে নাড়া দিলে। কুকুরটা একেবারে ভীষণভাবে জোরে ডেকে উঠল। কুকুরের ডাক শুনে, উপত্যকা থেকে একটা চাপা হৈ হৈ চীৎকার উঠল, একটা অসম্ভব কলরব সারাটা গ্রাম আর পাহাড় কাঁপিয়ে দিল। আর পাদরী সাবের কাছে, মনে হতে লাগল যে, একটা কোন রহস্যময় দেশ থেকে এই স্বর আসছে, সে বলছে, একি! এই সব অবান্তর ব্যাপার করে। তুমি ওই সরলবিশ্বাসী গ্রামের লোক-গুলোকে না হোক্ ঠকাচ্ছ।

নিজের মনে বিচার করতে লাগল, নিজের কাছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি আমি তাদের জন্যে করেছি? আমি যেমন নিজেকে একটা বোকা বানিয়েছি, তেমনি ওদেরও একেবারে বোকা বানিয়েছি। ভগবান যেন আমাদের সব পাপ থেকে রক্ষা করেন।"

এক একবার মনে হল, একটা বীরত্ব দেখাবার সুযোগ এসেছে, দেখাই। যখন সে গ্রামে পৌঁছুবে, তখন ওই জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবার সামনে তার নিজের পাপের কথা খুলে জানাবে। সে তার বুক চিরে দেখাবে যে কি দুর্দম ক্ষত তার এই হৃদয়ে, কি দুঃখের আগুনে সে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে বনকাঠ জ্বেলে যে আগুন উঠেছে, তার চেয়ে তার এই যাতনার আগুন কি ভয়ানক, কি ভীষণ দাহ তার।

কিন্তু এখানে আবার তার বিবেকের বাণী তার কানে বললে:

"এ তারা তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসব করছে। ভগবানের যে মহান শক্তি তোমার মধ্যে জেগে উঠে এই আশ্চর্য্য কাজ করালে, তার গৌরব তারা ওই আগুনের খেলায় জানাচ্ছে। তোমার ভেতরে তোমার অন্তরের যে দৈন্য, তার আর ভগবানের মাঝে নিজেকে টেনে এনে খাড়া করে, এ সব কাণ্ড করার প্রয়োজন কি বাপু?"

কিন্তু অন্তরের আরো গভীর অতল থেকে আর একটা বাণী তার কানে যেন এল:

"এ তা নয়। এর কারণ তুমি নিজে হয়েছ হীন, মহাপাপীর মন তোমার, সত্য করতে পাচ্ছ ভয়, নিজের সত্যের আগুনে নিজে জ্বলে পুড়ে যেতে আসলে তোমার হচ্ছে ভয়।"

যতই তারা গ্রামের কাছাকাছি হতে লাগল, যতই লোকের ভিড়ের কাছে তারা এগিয়ে আসতে লাগল, পল ততই নিজেকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জিত মনে করতে লাগল। যেমন সেই লকলকে আগুনের শিখাগুলো পাহাড়ের গায়ের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করছিল, সেই রকম তার অন্তরের অন্তরে বিবেকের ঘরে আলো ও অন্ধকারের লড়াই চলছিল। সে বুঝতে পাচ্ছিল না যে সে কি করবে। তার স্মরণ হল, এক বছর আগে সে এই গ্রামে যখন আসে, সঙ্গে তার মা কি উৎকণ্ঠা নিয়ে এলেন, তার জন্মের পর থেকেই তিনি তার সম্পর্কে সেই উৎকণ্ঠা নিয়েই চলেছেন।

যাতনার দাহনে পল ভেতরে গর্জ্জন করে উঠল, "আজ তাঁর চোখে আমি পতিত," তিনি হয়ত ভাবছেন আগের মতন যে তিনি আমাকে আবার উপরে তুলে ধরেছেন। হায়! আমি কিন্তু আজ মৃত্যুবাণের আঘাতে মরা।

তারপর হঠাৎ তার মনে হল যে, একটা স্বস্তি পাবার আশা আছে। এই উৎসব তার এই গোলমালের ভেতর থেকে মুক্তি দেবার সাহায্য করবে। যে বিপদের ভয় সে করছে, সে বিপদ হয়ত এড়িয়ে যেতে পারবে।

"আমি জনকতককে ওর মধ্যে থেকে গির্জ্জেবাড়ীতে সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্যে নেমন্তন্ন করব। তারা নিশ্চয়ই অনেক রাত অবধি আমার ওখানে থাকবে। আজকের রাত যদি কোন রকমে কাটাতে পারি, তাহলেই আমি বেঁচে যাব নিশ্চয়।"

চৌমাথার পাঁচিলের কাছে কালো কালো যে সব মূর্ত্তিগুলো, তা যেন এখন কতক চেনা যাচ্ছে, আর উঁচুতে গির্জ্জের পিছনে উৎসবের আগুনের আলো লাল নিশানের মত বাতাসে উড়ছে। রোজ গির্জ্জের যে ঘণ্টা বেজেছিল আজও তাই বাজছে বটে, কিন্তু একটা কনসার্টিনার ভিতর থেকে দুঃখের করুণ সুর সেই উৎসবের সাধারণ উল্লাসের ভেতর যেন মিশিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ গির্জ্জের চুড়োর মাথার উপরে একটা যেন তারা ফুটে উঠল। তখনই সেটা ভয়ানক শব্দে হাজারে হাজারে আলোর টুকরো ছড়িয়ে, সারাটা উপত্যকাকে শব্দে কাঁপিয়ে তুললে। জনতার ভেতর থেকে একটা ভীষণ উল্লাসের সোর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা সেই রকম তারা উঠে আলোর অসংখ্য টুকরো আকাশে ছড়িয়ে দিলে। বন্দুকের শব্দও উঠতে লাগল। তারা আনন্দ প্রকাশ করবার জন্যে অবিরাম বন্দুকের আওয়াজ করছে, যেমন তারা বড় বড় উৎসবের রাত্রে করে থাকে। "ওরা সব পাগল হয়ে গেছে", রক্ষক বললে। জোর দৌড়ে সবার আগে সে সেখানে গেল। কুকুরটা এমন ভয়ানক বিকট চীৎকার করে ডাকতে লাগল যেন দূরে সেখানে একটা ভয়ানক বিদ্রোহ হয়েছে, তাকে এখুনি থামাতে হবে।

আণ্টিয়োকাসের কেমন যেন কান্না আসছিল। পাদরী সাহেবকে ঘোড়ার ওপর সোজা বসে থাকতে দেখে তার মনে হল যেন একজন মহা-

পুরুষকে তারা উৎসবের ভিতর শোভাযাত্রা করে নিয়ে চলেছে। তখনি আবার তার চিন্তা, অন্যদিকে ব্যবসাদারের মত মনে হল :

"এই যে এরা সব উৎসব করছে আহ্লাদে মত্ত হয়ে, এতে আজ আমার মায়ের দোকানে বেশ সুবিধা হয়ে যাবে।"

তার এতই আনন্দ হল যে, সে তার গায়ের লাল ক্লোকটার ভাঁজ খুলে ফেলে তার কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলে। তারপর সেই তেলের বাক্সটা হাতে করে নিয়ে চলল। তার সে নতুন লাঠিটা কিন্তু সে ছাড়লে না, সেইটে নিয়ে সে গ্রামের ভেতর এল, যেন তিন জন রাজার মধ্যে সেও একজন রাজা।

সেই বুড়ো শিকারীর নাতনী তখন তার বাড়ীর দরজা থেকে পাদরী সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, তার ঠাকুর দাদা কেমন আছেন?

"সবাই বেশ ভাল", পল উত্তর করলে।

"তাহলে ঠাকুরদা ভাল আছেন, কেমন?"

"তোমার ঠাকুরদা এতক্ষণে বোধ হচ্ছে মারা গেছেন।"

সে তখন একটা অসম্ভব চীৎকার করে উঠল। এত বড় উৎসবের মাঝে তাই শুধ্ একটা বেসুরো বাজতে লাগল।

ছেলেরা তখন পাদরী সাহেবকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে পাহাড় থেকে নেমে গেল। তারা যেন এক ঝাঁক মাছির মত তার ঘোড়ার চারধার ঘিরে ফেললে, তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে সেই গির্জ্জের চৌমাথার কাছে এসে জড়ো হল। দূর পাহাড় থেকে যত বেশী লোক বলে দেখাচ্ছিল, কাছে এসে দেখলে তত নয়। সেই রক্ষক আর তার কুকুর শোভাযাত্রায় সাজান ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। বড় বড় গাছের তলায় সেই পাঁচিলের ধারে ধারে লোকেরা সব সার দিয়ে দাঁড়াল। অ্যান্টিয়োকাসের মার মদের দোকানে কেউ কেউ মদ খেতে লাগল। মেয়েরা তাদের ছোট ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে বুকে করে গির্জ্জের উঁচু সিঁড়ির ধাপে বসে। আর তাদের মধ্যখানে বসে নিনা মাসিয়া, যেন একটা পোষা ঘুমন্ত বেরাল।

চৌমাথার ঠিক মাঝখানে সেই রক্ষক তার কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে, শক্ত যেন একটা পাথরের মূর্ত্তি।

পাদরী সাহেব আসবা মাত্রেই সবাই উঠে দাঁড়াল, চারিদিক থেকে তাকে ঘিরলে। কিন্তু ঘোড়াটা তার সওয়ারের পায়ের তাড়া খেয়ে বরাবর গির্জ্জের উল্টো মুখে এক রাস্তায় ছুটে চলে গেল, যেখানে তার প্রভুর বাড়ী। তার প্রভু তখন ওই মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছিল। মদের গেলাস হাতে করেই সে দৌড়ে এসে ঘোড়ার লাগামটা ধরে দাঁড়াল।

"আরে বাচ্ছা! ভাবছিস কি রে। এই যে আমি!"

ঘোড়াটা তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। তার প্রভুর দিকে নাক আর মুখ বাড়িয়ে দিলে, সেও যেন তার গেলাস থেকে মদ খেতে চায়। পাদরী সাহেব ঘোড়া থেকে নামবার ভাব করতেই লোকটা তার একটা পা ধরে, ঘোড়া শুদ্ধ সওয়ার টেনে সেই মদের দোকানের সামনে নিয়ে হাজির করলে! একজন সঙ্গী তার বোতল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাত বাড়িয়ে তার হাতে গেলাসটা দিয়ে দিলে।

সমস্ত জনতা তখন, মেয়ে-পুরুষে মিলে পাদরী সাহেবকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। মদের দোকানের দরজার কাছে আলো জ্বলছে। সেখানে অ্যান্টিয়োকাসের মা হাসিমুখে একটা বেদিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখখানা আগুনের আলোয় রাঙাটে তামার মত দেখাচ্ছে। ছোট ছেলে-মেয়ে সব শব্দের গোলমালে ঘুম ভেঙে মায়ের কোলের ভেতর ছটফট করছে। মায়েদের হাতের পলার তাবিজ ও সোনার কবচ বাঁধা, আগুনের হলকায় সেগুলো ঝকমক করছে। এমন কি যারা খুব গরীব তাদের হাতেও আছে। তারা যখন চলা-ফেরা নড়াচড়া করছে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোয় আগুনের আভা ঝলক দিয়ে উঠেছে। এই অস্থির, চঞ্চল, লোকের ভিড়, আগুনের মধ্যে ধোঁয়াটে রঙের মূর্ত্তিগুলোর মাঝখানে, পাদরী সাহেব সেই ঘোড়ার ওপর বসে, —দেখাচ্ছে যেন একজন রাখাল তার ভেড়ার পালের মধ্যে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা পাকা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লোক এসে পলের হাঁটুর উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললে, ভাবের সুরের দোলায় তার স্বর কাঁপছে।

"ভাই সব শোন। এ একজন সত্যি সত্যিই ভগবানের জানিত লোক।"

"তবে তাঁর নামে সবাই এই মধুর রস পান কর।" ঘোড়ার মালিক চেঁচিয়ে বললে। পলের কাছে সেই গেলাস ভরতি করে ধরলে। পল তা হাতে নিয়ে তাতে ঠোঁট ঠেকালে। গেলাসের ধারে ঠোঁট ঠেকাতেই তার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। সেই গেলাসের লাল মদ আগুনের আলোয় যেন টাটকা রক্তের মত দেখাতে লাগল। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

"এলিমেন্ট" — ৯৩ আবিষ্কার

এতদিন আমরা মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে 'হাইড্রোজেন'কে আদি অর্থাৎ রোমান অক্ষরে 'আলফা' এবং 'ইউরেনিয়াম'কে সর্ব্বশেষ অর্থাৎ 'ওমেগা' বলিয়াই জানিতাম। মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে 'ইউরেনিয়াম' 'হাইড্রোজেন' অপেক্ষা ২৩৮ গুণ ভারী, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভারী ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুদিন হইতেই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু এডিংটন (Sir Arthur Eddington) প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯৩তেই শেষ হইবে না ঊর্দ্ধসংখ্যায় ১৩৬ পর্য্যন্ত উঠিবার সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, সম্প্রতি রোমের রয়েল ইউনিভার্সিটীর ৩২ বৎসর বয়স্ক পদার্থবিদ ডাঃ ফার্মি (Dr. Enrice Fermi) প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি আণবিক সংঘর্ষ ঘটাইয়া এক অজ্ঞাত নূতন পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি এই নূতন পদার্থকেই "এলিমেন্ট-৯৩" বলিতেছেন। 'ইউরেনিয়ামে'র সহিত 'নিউট্রন' কণিকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া তিনি এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সফলতা লাভ করিয়াছেন। ডাঃ ফার্মির ৯৩ সংখ্যক "এলিমেন্ট" যদি অন্যান্য গবেষণার দ্বারা সমর্থিত হয় তবে ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ হইবে। অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা এই যে, যদি সত্যই কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত ভারী ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর পদার্থ হইবে। কিন্তু 'রেডিয়াম' প্রভৃতি স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থ সমূহ যেরূপ গতিতে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এই নূতন পদার্থের বিকীরণ গতি তদপেক্ষা বহুগুণে দ্রুততর হইবে। ডাঃ ফার্মির আবিষ্কৃত নূতন পদার্থ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ইহা বিকীরিত হইতে হইতে ১৩॥ মিনিটে অর্দ্ধেকে পরিণত হয়।

ডাঃ ফার্মি ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'নেচারে' তিনি ২৩টি বিভিন্ন পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একই যন্ত্রসাহায্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হইতে এই নূতন পদার্থ পাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্বতঃবিকীরণ-শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, যখন এই স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন ইলেকট্রণ ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্যারির আইরিণ কুরী ও তাঁহার স্বামী প্রোফেসর জলিও (Irene Curie & Prof. Joliot) স্বতঃবিকীরণশীল পদার্থের তেজনির্গমের সময় 'পজিট্রণ' বিকীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন। আণবিক সংঘর্ষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে এখনও অনেক অনুমান ও মতদ্বৈধ আছে। তবে ডাক্তার ফার্মির পরীক্ষায় এই এক ব্যাপার ঘটিতে পারে—তিনি যে 'নিউট্রনে'র সাহায্যে সংঘর্ষ ঘটাইয়াছেন তাহা 'ইউরেনিয়াম' পরমাণুর কেন্দ্রিণের (nucleus) সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় (অবশ্য যদি 'নিউট্রন' সত্য সত্যই একটা ধন-তড়িৎ কণিকা—'প্রোটন' এবং ঋণ-তড়িতাবেশ—'ইলেকট্রনে'র সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকে) এবং 'প্রোটন' 'ইউরেনিয়াম' পরমাণুর কেন্দ্রিণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই ৯৩ সংখ্যক নূতন পদার্থের ওজন বৃদ্ধি করিতে পারে। যদি ঠিক এই ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে তবে অবশিষ্ট 'ইলেকট্রন'কে 'জিজার কাউন্টার' (Gieger Counter) বা উইলসনের 'মেঘ-প্রকোষ্ঠে' পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতে পারে। অথবা গুরুত্ব-নির্দ্ধারক বর্ণ-বিশ্লেষণের সহায়তায় এই ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু ডাঃ ফার্মি উক্ত প্রকার পরীক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন কিনা অথবা কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি এই নূতন পদার্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন নাই।

ডাঃ ফার্মি তাঁহার পরীক্ষায় সংঘর্ষ ঘটাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল 'নিউট্রন' স্রোত ব্যবহার করিয়াছেন। একটি ছোট্ট কাচের নলের মধ্যে 'বেরিলিয়াম' এবং 'রেডিয়াম' রাখিয়াছেন—'রেডিয়ম' স্বতঃবিকীর্ণ হইতে হইতে 'রেডন' গ্যাস (radon) উৎপন্ন হয়। 'বেরিলিয়ামের' উপর 'রেডন'-এর প্রতিক্রিয়ার ফলে 'নিউট্রন' বাহির হইয়া আসে। এই 'নিউট্রন' নিকটস্থ এক টুক্‌রা 'ইউরেনিয়ামে'র উপর পতিত হইয়া সংঘর্ষ ঘটায়। এই প্রণালীতে সেকেণ্ডে প্রায় ১০০,০০০ 'নিউট্রন' কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতে থাকে। কিন্তু আজকাল এই জাতীয় সংঘর্ষের পরীক্ষায় আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থলে ইহা অপেক্ষা শতগুণ প্রবল 'নিউট্রন' স্রোত ব্যবহৃত হইতেছে। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'বঙ্গশ্রী'র 'বিজ্ঞান জগতে' কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গত জানুয়ারী মাসে জলিও-আইরিণ কুরী 'বোরণ' 'ম্যাগ্নেসিয়াম' এবং এলুমিনিয়াম'এর সঙ্গে 'হিলিয়াম' কেন্দ্রিণের সংঘর্ষ ঘটাইয়া 'নাইট্রোজেন', 'সিলিকণ' এবং ফস্ফোরাসের এক প্রকার স্বতঃবিকীরণশীল, ক্ষণস্থায়ী পদার্থ উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আণবিক সংঘর্ষ সম্বন্ধে যত তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বতঃবিকীরণশীল পদার্থসমূহের বিকীরণ-বেগ হ্রাস বৃদ্ধি করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি ডাঃ ফার্মির এই আবিষ্কার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় সমর্থিত হয় তবে প্রাকৃতিক স্বতঃবিকীরণশীল পদার্থকে রূপান্তরিত করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে (গত জুন মাসে) জোয়াকিমস্থান (জেকিমস্ত) ন্যাসন্যাল ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম কারখানার ডিরেক্টর ডাক্তার কোবলিক (Odolen Koblic) 'বোহেমিয়াম' নামে এক নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। স্বতঃতেজবিকীরণশীল পদার্থসমূহকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং তিনটি বিভাগ 'ইউরেনিয়াম', 'থোরিয়াম' এবং

'এ্যাক্টিনিয়াম' হইতে উৎপন্ন। মিট্‌নার (Meitner) এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন—এ্যাক্টিনিয়াম' শ্রেণী 'ইউরেনিয়াম' শ্রেণীরই একটি শাখা মাত্র। কিন্তু কোন উপায়েই 'প্রোটো-এ্যাক্টিনিয়ামে'র সমস্যার সমাধান হয় নাই। 'প্রোটো-এ্যাক্টিনিয়ামের' সমস্যা লইয়াই ডাক্তার কোব্‌লিক প্রথম তাঁহার পরীক্ষা সুরু করেন। এই 'প্রোটো-এ্যাক্টিনিয়ামে'র উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াই নানা কারণে তাহার ধারণা জন্মে যে, 'ইউরেনিয়াম'ই সর্ব্বশেষ মৌলিক পদার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই 'রিনিয়ামে'র (rhenium) অনুরূপ অপর একটি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে, যাহার আণবিক সংখ্যা হইবে ৯৩ এবং এই 'রিনিয়াম' ভাঙ্গিয়াই 'এ্যাক্টিনিয়াম' শ্রেণী গঠিত হয়। অনেক জটিল রাসায়নিক পরীক্ষার পর জেকিমভের পিচ-ব্লেণ্ড হইতে তিনি এই নূতন পদার্থ পৃথক করিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জেকিমভের পিচ-ব্লেণ্ডের মধ্যে শতকরা একভাগ মাত্র এই নূতন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আছে। তাহা হইতে মাত্র ৩৪ গ্রাম দানাদার পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ইহার আণবিক গুরুত্ব প্রায় ২৪০। এই স্বতঃবিকীরণশীল নূতন পদার্থের জীবনকাল প্রায় ৫০০,০০০,০০০ বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ডাঃ কোব্‌লিক তাঁহার স্বদেশের নামানুসারে এই ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের নাম দিয়াছেন—'বোহেমিয়াম'।

এস্থলে ডাঃ ফার্মি ও ডাঃ কোব্‌লিকের আবিষ্কৃত 'এলিমেণ্ট'-৯৩এর মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিলাম। ডাঃ ফার্মি কৃত্রিম উপায়ে আণবিক সংঘর্ষ ঘটাইয়া 'ইউরেনিয়াম' হইতে স্বতঃবিকীরণশীল নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ডাক্তার কোব্‌লিক 'ইউরেনিয়াম' ও অন্যান্য স্বতঃবিকীরণশীল পদার্থ সমূহের আকর পিচ ব্লেণ্ড হইতে সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বতঃবিকীরণশীল নূতন পদার্থ পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা হইতে সহজেই মনে হয়—এই দুই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত উভয় পদার্থই ৯৩ সংখ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—তবে কি উভয় পদার্থই এক? এক না হইলে দুইটিই এক সংখ্যক হইতে পারে না। ডাঃ ফার্মি ও ডাঃ কোব্‌লিকের পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইবার আশা করা যায়।

বৃহত্তম ক্যামেরা: উপরের লোকটি ক্যামেরা ফোকাস করিতেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যামেরা

জলপথ এবং আকাশপথের মানচিত্র পুনর্মুদ্রণ এবং তদনুরূপ অন্যান্য জিনিষের অনুলিপি অথবা প্রতিলিপি যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স-এ এক বিরাট ক্যামেরা নির্ম্মিত হইয়াছে। ৫০ বর্গইঞ্চি প্লেটের মধ্যে এক একখানি ছবি তোলা যাইবে এবং সিগারেটের কাগজ যতটুকু পুরু ছবিতে ততটুকু ভুলও হইবে না। ক্যামেরাটি লম্বায় ৩১ ফিট এবং ওজনে প্রায় ৩৭৮ মণ। বিভিন্ন মানচিত্র একত্র করিয়া একবার ছবি তুলিলেই কাজ চলিয়া যাইবে, কাজেই সময় এবং খরচের যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে। ওজনে অসম্ভবরূপে ভারী হইলেও ক্যামেরার 'লেন্স-বোর্ড'এবং পা-দান চাকার সাহায্যে হাত দিয়া অনায়াসে এদিক-ওদিক ঠেলিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ক্যামেরার পশ্চাদভাগে আলোকপ্রবেশশূন্য একটি কুঠুরী এমন ভাবে সংলগ্ন আছে যে ফটোগ্রাফার ক্যামেরার মধ্যে থাকিয়াই ছবি 'ফোকাস', ডেভেলপ বা ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ করিতে পারে। এই বিরাট ক্যামেরাটি নির্ম্মাণ করিতে পূরা দুই বৎসর সময় লাগিয়াছে।

বজ্রপাত সম্বন্ধে নূতন তথ্য

মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠে বজ্রপাত হয়—ইহাই প্রচলিত ধারণা। কিছুদিন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইজন গবেষক ইঞ্জিনীয়ার বজ্রপাত সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। অতি দ্রুত গতিতে ছবি তুলিবার জন্য শক্তিশালী এক বিরাট ক্যামেরা নির্ম্মাণ করিয়া ঝড়বৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁহারা বজ্রপাতের অনেক ছবি তুলিয়াছেন। এই সকল ফটোগ্রাফ ও বজ্রপাতের আনুষঙ্গিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

যে, বজ্রপাত মেঘ হইতে হয় না, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতেই লক্ষ লক্ষ 'ভোল্ট' বিদ্যুৎ দীপ্তি বিকীরণ করিয়া উপরে উঠিয়া যায়। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই খুব ক্ষীণ অস্পষ্ট বিদ্যুৎ-রশ্মি মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসে। এই ক্ষীণ-রশ্মি সময়ে সময়ে প্রায় ১৮০ ফুট লম্বাও হইয়া থাকে। বজ্রপাতের সময়ে প্রধান বিদ্যুৎ পথের আশে

বজ্রপাতের প্রধান তড়িৎ-প্রবাহ পৃথিবী হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে।

পাশে যেমন আকাবাঁকা ডালপালা দেখা যায় বজ্রপাতের অগ্রগামী এই ক্ষীণরশ্মির সেরূপ কিছু থাকে না এবং ইহা সেকেণ্ডে প্রায় ৮১০ হইতে ১৯,৯০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। বজ্রাঘাত সম্বন্ধে গবেষণাকারীরা বলেন—সম্ভবতঃ বজ্রপাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বিদ্যুৎ-রশ্মি বায়ুস্তরগুলোর মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়ার ফলে এই পথের বাতাসের অণুপরমাণুগুলি 'আয়নে' (Ion) রূপান্তরিত হয়। সাধারণ অবস্থায় বাতাস তড়িৎ-অপরিচালক কিন্তু 'আয়নে' রূপান্তরিত হইলে তাহা তড়িৎ-পরিচালক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত ইঞ্জিনীয়ার-দ্বয় দেখিয়াছেন যে সেই মুহূর্ত্তে ক্ষীণ তড়িৎ রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায় ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভূপৃষ্ঠ হইতেই বিপুল তড়িৎ স্রোত 'আয়নে' রূপান্তরিত বায়ুপথে তীব্র আলোক বিকীরণ করিয়া সেকেণ্ডে প্রায় ২৮,০০০ মাইল বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। এই প্রধান তড়িৎ-স্রোত একটি বিভিন্ন অগ্নিশিখার মত না ছুটিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে মেঘ পর্য্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন প্রজ্বলিত অগ্নিপথ রূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রজ্বলিত পথ হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর আলোকরেখা সময় সময় ডালপালার আকারে বাহির হয় এবং প্রধান প্রবাহের সঙ্গে ঊর্দ্ধ দিকে না উঠিয়া বিপরীত মুখে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই বজ্রপাতের সাধারণ ফটোগ্রাফ হইতে এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, মেঘ হইতে নিম্নাভিমুখে সাধারণ বজ্রাঘাত হইয়া থাকে। দুইখানি 'লেন্স' সংযুক্ত বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান এক প্রকার ক্যামেরার মত যন্ত্রসাহায্যে বজ্রপাতের গতিবেগ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

বামদিকে—ক্ষীণ তড়িৎ-রশ্মি প্রথমে মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া থাকে। ডানদিকে—পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে প্রধান তড়িৎ প্রবাহ ক্ষীণ রশ্মি-পথ ধরিয়া মেঘের দিকে যাইতেছে।

ক্ষুদ্রতম ক্যামেরা

বিলাতে সম্প্রতি অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার ক্যামেরা বাজারে বাহির হইয়াছে। ক্যামেরাটি অনায়াসে ওয়েষ্ট কোটের ক্ষুদ্র পকেটে রাখিয়া দেওয়া

ক্ষুদ্রতম ক্যামেরা।

যায়। ছবি তুলিবার জন্য 'রোলারে' জড়িত খুব সরু 'ফিল্ম' ব্যবহৃত হয়। ছবি ওঠে ঠিক ডাকটিকিটের মত ছোট, কিন্তু খুব স্পষ্ট আর নিখুঁত। এক একটি 'ফিল্মে' ৮ খানি করিয়া ছবি তুলিবার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ ক্ষুদ্র ক্যামেরা যে প্রণালীতে নির্ম্মিত হয় ইহাও সেই প্রণালীতেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দিবার প্রণালী

আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণতঃ পুস্তকপাঠ, দুই চারিটি সাধারণ পরীক্ষা এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার মধ্যেই নিবদ্ধ। অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রণালী আলোচনা করিলে এতদ্দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। এস্থলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের

পিবোডি মিউজিয়ামে প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্রদের মানুষের ক্রমবিকাশ ও সাধারণ বিবর্ত্তনবাদের ধারা হাতে-নাতে শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন স্তরের পূণ

মানব-দেহের অভিব্যক্তি পরিজ্ঞাপক সজ্জিত কঙ্কাল।

কঙ্কাল এমন ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়াই তাহাদের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে অতি সহজে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া থাকে। এস্থলে উক্ত মিউজিয়ামে রক্ষিত মানুষের ক্রম বিকাশের একটা সজ্জিত নমুনার ছবি দেওয়া হইল। ইহাতে বানর জাতীয় গিবন হইতে ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং সর্ব্বশেষে মানুষের ক্রমবিকাশের একটা পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়।

আমেরিকার সর্ব্ববৃহৎ যাত্রীবাহী বিমান পোত

আমেরিকায় অল্পদিন হইল এক বিরাট যাত্রীবাহী বিমান পোত নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ডানার দৈর্ঘ্য ১১৪ ফুট এবং ওজন ১৯ টন। এইরূপ বৃহৎ বিমান-পোত আমেরিকায় আর একখানাও নাই। যাত্রী বহন করিবার জন্য ঠিক এই রকমের আরও পাঁচখানা পোত নির্ম্মিত হইবে। বিভিন্ন ইঞ্জিনের সাহায্যে চারটি প্রোপেলার একযোগে ঘুরিয়া এই বৃহৎ বিমান-পোত পরিচালিত হইবে। ইহা ৩২ জন যাত্রী বহন করিতে পারিবে। ব্রিজ পোর্ট নামক স্থানে এই বিমান-পোতের পরীক্ষায় খুব সন্তোষজনক ফল লাভ হইয়াছে। বুয়েনস্ আয়াস এবং মিয়ামির মধ্যে এই বিমান-পোত যাত্রীবহন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। কোথায়ও না থামিয়া ইহা একদমে ২৫০০ মাইল উড়িতে পারিবে। এই বিমান-পোতের সাহায্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিবার একটা পরিকল্পনা চলিতেছে। প্রয়োজন হইলে ইহা জলের উপর ভাসিয়া চলিতে পারিবে।

বত্রিশ জন যাত্রী-বহনকারী আমেরিকার বিরাট এরোপ্লেন।

সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত বিরাট লৌহ-গোলক

আধ মাইল নিমজ্জিত সমুদ্রের তলদেশ বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জর্জ্জ ক্লডের (George Claude)

সমুদ্রতল পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিরাট লৌহ গোলক।

তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সে এক বিরাট ফাঁপা লৌহ-গোলক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গোলকের ব্যাসের পরিমাণ ৩০ ফুট এবং ইহার মধ্যে অভিযানকারীর বাসস্থান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিপুল চাপসহনক্ষম বিশেষভাবে নির্ম্মিত স্বচ্ছ কাচের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত জানালা দেওয়া হইয়াছে। সমুদ্রের আধ মাইল নীচে বিপুল জলের চাপে এই লৌহ-গোলকের কোনই অনিষ্ট ঘটিবে না। উপর হইতে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হোস্ পাইপের সাহায্যে গোলকের ভিতরে বাতাস সরবরাহ করা হইবে। জর্জ্জ ক্লডই সমুদ্রতলের এই অভিযান পরিচালনা করিবেন।

গাইরোপ্লেন

উইলফোর্ড (E. B. Wilford)

নামে ফিলেডেলফিয়ার একজন আবিষ্কারক নূতন ধরণের এক অদ্ভুত এরো-প্লেনের পেটেণ্ট লইয়াছেন। তিনি এই নূতন বিমান-পোতের নাম দিয়াছেন

'জাইরোপ্লেন'

—'জাইরোপ্লেন'। এরোপ্লেনকে বাতাসে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য যেমন এক বা একাধিক ডানা থাকে, ইহাতে সেরূপ কোন ডানার প্রয়োজন নাই। বিমান-পোতের শরীরের উপরিভাগে দুইটি খাড়া শিং এর মত দণ্ডের সঙ্গে 'উইণ্ডমিল' বা চার 'ব্লেডের' বৈদ্যুতিক পাখার মত শয়ানভাবে দুইটি বা কোন কোন ক্ষেত্রে একটি 'রোটর' থাকে। এই 'ব্লেড'গুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী যে কোনদিকে ঘুরাইতে পারা যায়। এই পাখাগুলিকে দ্রুতবেগে ঘুরাইবার জন্য একাধিক শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই পাখাগুলি স্ক্রুর প্যাঁচের মত ঘুরিয়া বাতাস কাটিয়া 'জাইরোপ্লেন'কে বাতাসের মধ্যে উৰ্দ্ধদিকে টানিয়া তোলে, অথবা ভাসাইয়া রাখে। নামিবার সময়েও বেগ কমাইয়া আস্তে আস্তে সোজা নামিতে পারে। অবশ্য সামনের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইহার সম্মুখ ভাগে শক্তিশালী 'প্রোপেলার' স্থাপিত আছে। 'জাইরোপ্লেন' ঘণ্টায় কম পক্ষেও ১৮০ মাইল বেগে চলিবে: পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা সমান আয়তনের এরোপ্লেন অপেক্ষা অধিকতর ভারবহনোপযোগী।

আফ্রিকার ব্যাঘ্র মানব

আফ্রিকার বেলজিয়ান বঙ্গোর কর্তৃপক্ষ 'ব্যাঘ্র-মানব" আখ্যাধারী নর-ঘাতক ও নরমুণ্ড-সংগ্রহকারী স্থানীয় এক-দল অসভ্য সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পূর্ব্বে আফ্রিকা-ভ্রমণকারীদের নিকট নর-খাদক এবং নরমুণ্ড-সংগ্রাহক অসভ্যদের কাহিনী শোনা যাইত, কিন্তু তাহাদের অনেকেই বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শে ও দণ্ডের ভয়ে নরমাংস ভক্ষণের প্রবৃত্তি পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ওয়াম্বার ট্রাইবুনালে এই ধৃত অসভ্য সর্দ্দারদের বিচারের সময় যে সব লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাঘ্র আখ্যাধারী অসভ্যেরা যে সেই জাতীয় মানুষ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কঙ্গোর একটি অসভ্য পল্লীতে রাত্রিবেলায় চড়াও হইয়া নরহত্যার অপরাধে ট্রাইবুনালের বিচারে ইহাদের ৮ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এস্থলে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত দুইটি অসভ্যের ছবি প্রদত্ত হইল। বিচারের সময় এই ব্যাঘ্র-মানবের নরহত্যার প্রণালী সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ।

মধ্যস্থলে- প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আফ্রিকার দুই জন ব্যাঘ্র-মনুষ্যের প্রতিকৃতি। বামদিকে—বাঘ নখ যন্ত্র হস্তে পরিধান করিয়াছে। ডানদিকে ব্যাঘ্র-মনুষ্য অপরূপ পোষাক পরিধান করিয়া নরহত্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। নীচে—বাঘ-নখের সাহায্যে বাঘের থাবার ন্যায় দাগ ফেলিতেছে।

ইহারা নিজেদের এনিওটোস্ জাতির অন্তর্গত ব্যাঘ্র মানুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। জঙ্গলে জঙ্গলে না ঘুরিয়া ইহারা সংঘবদ্ধভাবে একস্থানে বাস

ছিদ্র বন্ধকারী অভিনব 'টায়ার'।
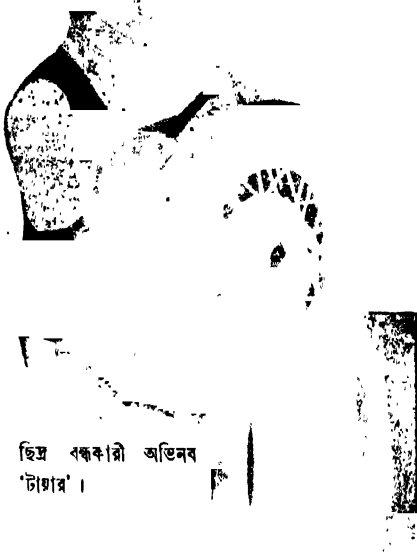
করে। স্থানীয় অন্যান্য কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগের গ্রাম আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা ইহাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত। বিশেষতঃ যেসব কৃষ্ণাঙ্গেরা শ্বেতাঙ্গদিগের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও ইহারা তাহাদিগকে হত্যা করিতে অগ্রসর হয়। হত্যা করিতে যাইবার সময় এই ব্যাঘ্র-মনুষ্যেরা মাথা ও মুখ ঢাকিয়া কোমর পর্য্যন্ত চিতাবাবের অনুকরণে চক্রাকার দাগসমন্বিত বৃক্ষছালের এক প্রকার অদ্ভুত আবরণী ব্যবহার করে এবং বাঘ-নখের অনুকরণে লৌহনির্ম্মিত এক প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র হাতের মণিবন্ধের সঙ্গে বাঁধিয়া নখরের ন্যায় ফলকগুলিকে হাত মুঠা করিয়া আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে বাহির করিয়া দেয়। এই ভাবে সজ্জিত হইয়া রাত্রিতে ইহারা গ্রামে গ্রামে হানা দেয় এবং সুমস্ত অধিবাসীদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ক্ষুরধার বাঘনখের সাহায্যে কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া ফেলে। পরে ব্যাঘ্রের আক্রমণের অনুরূপ সমস্ত শরীরে আঁচড় কাটিয়া রাখিয়া আসে। চলিয়া আসিবার সময় বাঘনখের সাহায্যে সারবন্দীভাবে মাটীতে ব্যাঘ্রের থাবার চিহ্ন রাখিয়া আসে। বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার নরহত্যা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

ছিদ্র-প্রতিরোধক অভিনব মোটর-টায়ার

রাস্তায় চলিতে চলিতে সাইকেল বা মোটরগাড়ীর বায়ুপরিপূর্ণ চাকায়, কাঁটা পেরেক বা অন্য কোন জিনিষ ফুটিলে ছিদ্র হইয়া গিয়া কিরূপ ঝঞ্চাট এবং সময়ে সময়ে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি ওহিওর একটি টায়ারের কারখানা হইতে নূতন ধরণের এক প্রকার 'টিউব' নির্ম্মিত হইয়াছে। টায়ারের রবার-টিউবের ভিতরের দিকে আঠালো নরম রবারের একটি আস্তরণ দেওয়া থাকে। যদি কোন কারণে 'টিউব' ফুটা হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ ওই নরম রবার সেই কর্ত্তিত স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং বাতাসের চাপে সঙ্গে সঙ্গেই ফুটা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে একটু বাতাসও বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

বেতার তড়িৎ-তরঙ্গ চালিত ট্রামগাড়ী

রেডিওর সাহায্যে চালকহীন গাড়ী, জলযান বা এরোপ্লেন চালানো সম্ভব হইলে তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র এবং উপরের তড়িৎ-প্রবাহক তার ব্যতিরেকে গাড়ী চলিতে পারিবে না কেন, এই প্রশ্ন উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালিফোর্নিয়ার এক বৈজ্ঞানিক নূতন ধরণের এক প্রকার ট্রামগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গাড়ী রেললাইনের উপর দিয়াই চলিবে কিন্তু সাধারণ তড়িৎ-উৎপাদন যন্ত্র বা তড়িৎ প্রবাহ পরিচালনের জন্য ট্রামগাড়ীর মত ঊর্দ্ধ-স্থিত তারের প্রয়োজন হইবে না। এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবক অতি অল্পশক্তিসম্পন্ন রেডিওসাহায্যে কয়েকগজ দূরত্বের মধ্যে বহু পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বয়েজ সিটি হইতে ক্রেটন পর্য্যন্ত ৪২ মাইল রেলের উপর রেডিও সাহায্যে গাড়ী চালাইয়া ইহার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আয়োজন চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বয়েজ সিটিতে তড়িৎ তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। শীঘ্রই এই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

ট্রাম বা রেলগাড়ী চালাইবার জন্য বেতার তড়িৎ-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র।

চাকার পরিবর্তে এরোপ্লেনে রবার-বল

ভূমিতে অবতরণ করিবার সময় ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া অনেক সময় এরোপ্লেনের বিপদ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ নূতন চালকের পক্ষে

এরোপ্লেনের রবার গোলক।

ভূমিতে অবতরণ করিবার সময় প্রায়শঃই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। এই বিপদ এড়াইবার জন্য একজন জার্মান আবিষ্কারক এরোপ্লেনের টায়ারের পরিবর্তে ধাক্কা সামলাইবার জন্য বায়ুপরিপূর্ণ দুইটি বিরাট রবার বল চক্রদণ্ডের সহিত কৌশলে জুড়িয়া দিয়াছেন। এরোপ্লেন যেরূপেই ভূমিতে অবতরণ করুক না কেন, ধাক্কা লাগিয়া কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। বিপদে পড়িয়া অনেক সময় এরোপ্লেনকে বাধ্য হইয়া অনভিপ্রেত স্থানে এমন কি জলের উপরও অবতরণ করিতে হয়। জলের উপর অবতরণ করিলেও এই বিরাট রবার-বলের সহায়তায় ইহা অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে। আবিষ্কারক প্রথমে খোলা ভাবে রবার বল ব্যবহার করিয়া নানা প্রকার অসুবিধা লক্ষ্য করেন। পরে বর্তমান 'ষ্ট্রীমলাইনিং' প্রথায় গোলাকার কঠিন আবরণীর ভিতর অল্পপরিসর স্থানে রবারগোলক আবদ্ধ করিয়া অধিকতর সুফল লাভে সমর্থ হইয়াছেন।
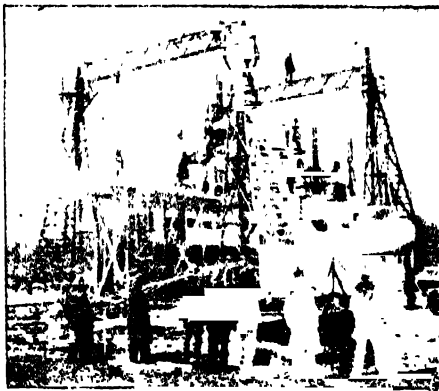
অতিকায় বিমান পোত

ইংল্যাণ্ডের রোচেষ্টার ফ্যাক্টরীতে সম্প্রতি চারটি ইঞ্জিন সমন্বিত এক বিরাট যাত্রাবাহী বিমান-পোত নির্ম্মিত হইতেছে। ব্রিটিশ বিমানপথে এপর্য্যন্ত যতগুলি যাত্রীবাহী বিমান-পোত চলিতেছে, এই নবনির্ম্মিত পোতটিই হইবে তাহাদের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। পাশের ছবিতে লোকগুলি যে বিরাট ডানা দুইটি ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা হইতে এই বিমান-পোতের বিশালত্ব উপলব্ধি হইবে। বিশেষতঃ রোচেষ্টারের বিরাট কারখানা-গৃহে এই পোতটি নির্ম্মাণ করিবার স্থান সঙ্কুলান হয় নাই, এজন্য কারখানার বাহিরে খোলা জায়গায় বিরাট ক্রেন ও লৌহফ্রেমের সাহায্যে পোতটি নির্ম্মিত হইতেছে।

অন্ধদিগের সবাক পুস্তক

সহজে বহন করিতে পারা যায় এরূপ ছোট্ট সুটকেসের মধ্যে অন্ধদিগকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইবার এক প্রকার যন্ত্র শীঘ্রই আমেরিকার বাজারে বাহির হইবে। যে কোনও পুস্তকের সহজবোধ্য সংস্করণের সমস্ত বিষয়ই খুব সস্তা
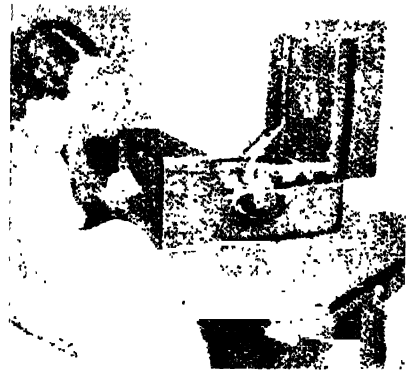
অন্ধদিগকে পুস্তক পড়িয়া শোনাইবার যন্ত্র।

উপাদানে নির্ম্মিত এক প্রকার রেকর্ডে অঙ্কিত থাকিবে। সুট-কেসের মধ্যে একটি তাড়িতিক ফনোগ্রাফ ও বর্ত্তমান রেডিও সুরবর্দ্ধক যন্ত্রের সমবায়ে রেকর্ড হইতে শব্দ উৎপন্ন হইবে। বাড়ীর ইলেকট্রীক বোর্ডের সঙ্গে 'প্লাগ' লাগাইয়া দিলেই রেকর্ড হইতে বই পড়া সুরু হইবে। সহজ বোধ্য সংস্করণের বইয়ের রেকর্ড সমস্ত পুস্তকালয়েই পাওয়া যাইবে

ইংল্যাণ্ডের নবনির্ম্মিত বিরাট এরোপ্লেন। ডানদিকের ছবিতে লোকগুলি এরোপ্লেনের বিরাট ডানা দুটি ঠেলিয়া আনিতেছে।

লাল পিঁপড়েদের বাসা বাঁধিবার কৌশল

আমাদের দেশে বনজঙ্গলে প্রায় সর্ব্বত্রই লাল পিঁপড়ের বাসা দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহারা যেমনই পরিশ্রমী ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, তেমনই দুৰ্দ্ধৰ্ষ। পশু পক্ষী দূরের কথা মানুষেরা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভয় করে—এমন ইহাদের বিষাক্ত কামড়। গাছের পাতা মুড়িয়া ইহারা বড় বড় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। এক দলের এলাকা খানিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, সেখানে অন্য দল প্রবেশ করিতে ভরসা পায় না। এক দল অপরের

লাল পিঁপড়েরা বাসা বাঁধিবার জন্য শিকল তৈয়ারী করিয়া গাছের পাতাকে নিকটে টানিয়া আনিতেছে।

এলাকায় প্রবেশ করিলে ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায় এবং এই লড়ায়ে এক দল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াই থামে না। অবশেষে বিজয়ী দল সমস্ত মৃতদেহ, ডিম, বাচ্ছা, স্ত্রী পুরুষ সকলকে ধরিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া যায়। স্ত্রী পিঁপড়ে যুদ্ধে যোগদান করে না। ইহারা বাসা বাঁধিবার

পালিতা মাদারের গাছে পিঁপড়েরা অস্থায়ী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া পাহারা দিতেছে।

[এই দুইখানি ছবি ও পরপৃষ্ঠার ছবিটি লেখকগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে লওয়া হইয়াছে।]

সময় বিভিন্ন অবস্থায় অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে। ইহাদের বাসা বাঁধিবার যেসব কৌশলপূর্ণ অভিনব প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহারই দুই একটি ফটোগ্রাফ এস্থলে প্রদত্ত হইল। বাসায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটি বাসার পিপীলিকারা বাসা বড় করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নিকটে আর উপযুক্ত কোন পাতা না থাকায় তাহারা একে অন্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া কিছুদূর নীচে একটা ডালের পাতাকে টানিয়া আনিয়া পুরাতন বাসার সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম সরু শিকল তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ আরও পিপীলিকারা যোগ দিয়া শিকলটাকে মোটা

লাল পিঁপড়েরা অস্থায়ী বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে। নীচের দিকে সাদা ডিম মুখে করিয়া তাহাদের দ্বারা পাতা জুড়িয়া দিতেছে।

করিয়া তুলিল এবং সেই শিকলের উপর দিয়া অন্য পিঁপড়েরা যাতায়াত করিয়া পাতাকে টানিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, অবশেষে শিকলের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ কমাইয়া কমাইয়া--ক্রমশঃ পাতাকে পুরাতন বাসার কাছে আনিয়া ফেলিল। ফটোগ্রাফ হইতে এই ব্যাপার পরিষ্কার প্রতীয়মান হইবে। বাসা ভাঙ্গিয়া দিলে ইহারা আধ ঘণ্টার মধ্যেই নূতন পাতা স্থির করিয়া একটা অস্থায়ী বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহাতে ডিম, বাচ্চা ও স্ত্রী পুরুষদের স্থানান্তরিত করে। সঙ্গে সঙ্গে বাসার নির্ম্মাণকার্য্য চলিতে থাকে। পাশের ছবিতে এইরূপ একটি অস্থায়ী বাসার ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে কর্ম্মী-পিপীলিকারা কিরূপে পাতার দুই ধার এক করিয়া কামড়াইয়া রহিয়াছে এবং অন্য কর্ম্মীরা মুখে ছোট ছোট ডিম লইয়া তাহাদের মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া তাহা দ্বারা পাতা জুড়িয়া দিতেছে। পূর্ব্বপৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবিতে অস্থায়ী বাসা নির্ম্মাণ শেষ করিয়া কর্ম্মীরা শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য খুব সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। ইহারা সাধারণতঃ কাহাকেও ভয় করে না; কিন্তু ক্ষুদে পিঁপড়েদের দেখিলেই দূরে পলায়ন করে। ক্ষুদেপিঁপড়েরাও একবার ইহাদের সন্ধান পাইলে যেমন করিয়াই হউক ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল। *

* এই প্রবন্ধের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় 'রোমান অক্ষর' স্থলে গ্রীক অক্ষর হইবে।

স্মরণ

আকাশে ছিল মেঘ, নদীর জলে ছিল ঢেউ,
সঙ্গী ছিল যারা তারা তো জানে নাক' কেউ—
দুজনে ছিনু মোরা, মোদের মাঝে ছিল কি যে!

বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, ঝাউয়ের ভিজে শাখা দোলে,
বাঁধানো তটে জল আঘাতে কলতান তোলে;
অদূরে ম্লান রবি নদীর জলে যায় ডুবে—

তাহারি রঙ লাগে পূবের নীলকালো মেঘে।
ঝিমায় সবে যেন, দুজন মোরা রই জেগে,
জাগিয়া রহে আর ঝাউয়ের শাখে ঝড়ো হাওয়া।

একেলা শুনিলাম তোমার গাওয়া সেই গান,
যে-গান চোখে চোখে আনিয়া দিল সন্ধান—
তোমার মন কবে কাহার গলে দিল মালা।

মানুষ করে ভিড়, নিরালা তবু চারিদিক,
তোমার মুখপানে খানিক চেয়ে অনিমিখ,
কেন যে অকারণ নয়ন ভরে এল জলে।

যা মূক মুখে তব, বুকের তলে সেই বাণী
উঠিল গুমরিয়া তবু না হল জানাজানি,
সবার মাঝখানে তোমারে না নিলাম বুকে।

ফিরিয়া এনু ঘরে অসহ সুখে কাটে রাতি,
তিমির যত গাঢ় তত যে অচপল বাতি—
দিবস যত যায় তোমারে তত পাই কাছে।

তোমার বুকে মোর জেনেছি আছে ঠাঁই পাতা,
বেসুর দুটি প্রাণ সেদিন সুরে হল গাঁথা,
বসিয়া আছি কবে সে সুর গানে হবে গাওয়া।

মনোবিশ্লেষণ

—শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন

১

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের যত ক্ষতি করিয়াছে অন্য কিছুই তত ক্ষতি করিতে পারে নাই।" সূর্য্য স্থির আছে এবং পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে—এই বৈজ্ঞানিক সত্য আজকাল স্কুলের অল্পবয়স্ক ছেলেরাও অবিচলিত চিত্তে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহা আবিষ্কার করার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিওকে অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। গ্যালিলিওর প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে আছে—

"The proposition that the sun is in the centre of world and immovable from its place is absurd, the philosophically false and formally heretical, because it is expressly contrary to the Holy Scriptures."

আধুনিক সভ্যতার যুগেও আমেরিকার মত অগ্রগামী দেশের কোন কোন বিদ্যালয়ে অভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution) শিক্ষা দেওয়া হয় না। কারণ অভিব্যক্তিবাদ নাকি বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির সংঘর্ষের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। সেই সত্য আমাদের অভিপ্রেত হয় কিনা, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত হয় কিনা, তাহার বিচার করা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। Empirical science বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যাহা আছে বা ঘটিতেছে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা, যাহা হওয়া উচিত তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সত্যের মাপকাঠিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি টিকিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। সাইকো এনালিসিস বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া মনের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির আবিষ্কার করার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে এমন অনেক অপ্রিয় সত্য হয়তো উদ্ঘাটিত হইয়াছে যাহা আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে আঘাত দেয়। কাজেই সাইকো এনালিসিস বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের কথা ভুলিয়া গিয়া scientific attitude বা বৈজ্ঞানিক মনোভাব পোষণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সত্যের সন্ধানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২

ডাঃ ফ্রয়েড (Dr. Sigmund Freud) 'Psycho-analysis' বা মনোবিশ্লেষণের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সাইকো-এনালিসিস-এর মূল সূত্রগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি বহুবর্ষব্যাপী গবেষণার ফলে ফ্রয়েড-এর নিজের মতামতও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ফ্রয়েড-এর শিষ্যদের মধ্যে আবার অ্যাডলার এবং ইয়ুঙ্ গুরুর বশ্যতা অস্বীকার করিয়া সম্প্রতি নিজ নিজ মত প্রচার করিতেছেন। আমি শুধু এখানে ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্বের সাধারণ আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

ফ্রয়েড কি ভাবে নূতন মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলি আবিষ্কার করিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া ফ্রয়েড প্রথমে 'Embryology of the Nervous System' সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন; তখনও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার মোটেই সম্পর্ক ছিল না। এই সময় ব্রয়ের নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ব্রয়ের সম্মোহন বা hypnosis-এর সাহায্যে হিষ্টিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা করিতেন।* ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রয়ের-এর নিকট হিষ্টিরিয়ার এক অদ্ভুত রোগিণী আসিলেন। তাঁহার বয়স একুশ বৎসর—তাঁহার প্রধান উপসর্গ ছিল যে, কোন গ্লাস হইতে জলপান করিতে ভীষণ বিতৃষ্ণা হইত। সম্মোহনের সাহায্যে এই বিতৃষ্ণার কারণ ক্রমে ক্রমে রোগিণীর স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনেক বৎসর পূর্ব্বে তিনি জনৈক ভদ্রলোকের অতি আদরের একটি কুকুরকে গ্লাস হইতে জলপান করিতে দেখিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তিনি খুব বিরক্তি বোধ করেন। পাছে তাঁহার বিরক্তি কুকুরের মালিকের সম্মুখে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি বিরক্তির ভাব সম্পূর্ণরূপে নিরোধ (suppress) করিয়া ফেলেন। এই নিরুদ্ধ বিরক্তি তাঁহার মনের অবচেতনা

* ফ্রয়েড ব্রয়ের-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রয়ের-এর মতানুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

প্রদেশে নিহিত ছিল। যদিও consciousness বা সংবিতের স্তরে ইহার কোন চিহ্ন ছিল না। এই বিশ্লেষণ ফ্রয়েড-এর মনে নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাত করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, জীবনের কোন অভিজ্ঞতা মানুষের সংবিৎ হইতে দূরীভূত হইলেও মন হইতে বিতাড়িত না হইতে পারে এবং ইহা আমাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এখানেই ফ্রয়েড-এর 'theory of the un-conscious' এর আরম্ভ। ইহার কিছুদিন পর ফ্রয়েড প্যারিসে শার্কো-এর নিকট হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতে যান। শার্কো-এর মতে মানসিক বিকারে মানুষের মন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। সম্মোহনে ঠিক এই অবস্থা হয়। ফ্রয়েড গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিন্তু শার্কো একদিন এমন একটা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যাহাতে ফ্রয়েড-এর চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। জনৈক ছাত্র শার্কোকে একটি রোগীর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি উত্তর দিলেন, এই ধরণের রোগের অন্তরালে সর্ব্বদাই কোনও না কোনও যৌন ব্যাপার নিহিত থাকে "Such cases always have a sexual basis." কথাটাকে জোর দিবার জন্য তিনি বলিয়া উঠিলেন, সর্ব্বদাই, সর্ব্বদাই, সর্ব্বদাই "always, always, always!" এই মন্তব্য ফ্রয়েড-এর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এই খানেই তাঁহার 'যৌনতত্ত্বের' (sexuality theory) সূত্রপাত হয়। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মানসিক বিকারের চিকিৎসায় ব্যাপৃত হইলেন। ক্রমে সম্মোহন-প্রণালী (hyponotic method) ত্যাগ করিয়া তিনি নূতন পদ্ধতিতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কিন্তু নির্জ্ঞান (unconscious) এবং যৌন প্রবৃত্তি(sex) তাঁহার প্রবর্ত্তিত মনোবিজ্ঞানের মলস্তম্ভ হইয়া উঠিল।

৩

নির্জ্ঞান (theory of the unconscious)—নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব ফ্রয়েড-এর পূর্ব্বেও অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি নির্জ্ঞানের নূতন স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্জ্ঞান (unconscious) আমাদের নিরুদ্ধ কামনা বা suppressed desires-এর সমষ্টি। নিরুদ্ধ হইলেও কামনাগুলি মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয় না—তাহারা সর্ব্বদা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ছুটাছুটি করে। দৈনন্দিন ভুল-ভ্রান্তি স্বপ্ন ও মানসিক বিকার প্রভৃতিতে নিরুদ্ধ কামনার পরোক্ষ প্রকাশ (indirect manifestation) লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা ভালরকম বুঝা যাইবে। মনোবিশ্লেষণ চর্চ্চা-সমিতির (Psycho-analytic Association) সভাপতি ডাঃ জোন্স্ কর্ত্তব্যের খাতিরে জনৈক ভদ্রলোককে একখানা চিঠি লিখেন। প্রথমতঃ লেখা হওয়ার পরে চিঠিখানা তাঁহার টেবিলে কতদিন পড়িয়া থাকে। পরে একদিন চাকরকে দিয়া উহা ডাকঘরে পাঠাইয়া দেন। ডাকঘর হইতে চিঠিখানা তাঁহার নিকটে আবার ফিরিয়া আসিল। ঠিকানা ভুল হইয়াছে। এবারে তিনি ঠিকানা সংশোধন করিয়া অন্য খামে পুরিয়া দিলেন। চিঠিখানা আবার ফেরৎ আসিল। ইহাতে টিকিট দেওয়া হয় নাই। ডাঃ জোন্স্ নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন—নানা কারণে ভদ্রলোকের নিকট চিঠি না লেখার কামনাই তাঁহার মনের অন্তরালে বলবতী ছিল।

জনৈক ভদ্রলোক কোন সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া—আমি ঘোষণা করিতেছি যে সভা আরম্ভ হইল "I declare the meeting open" বলার পরিবর্ত্তে বলিয়া বসিলেন, আমি ঘোষণা করিতেছি যে সভা বন্ধ হইল "I declare the meeting closed"। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় তাঁহার মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে সভা না হওয়ার ইচ্ছা বর্ত্তমান ছিল। সব সময় যে মনের নিরুদ্ধ কামনা কোনরূপে বিকৃত না হইয়া সহজ ভাবে প্রকাশ পায় তাহা নহে। যেখানে সামাজিক আচার নীতি বা ধর্ম্মের অনুশাসন নিরুদ্ধ কামনার সম্পূর্ণ বিরোধী, সেখানে তাহা নানা বিকৃত ভাব ধারণ করে। কোন যুবক জনৈক ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে বলিয়াছিল, "I wanted to 'insort' her," তাহার বলার উদ্দেশ্য ছিল, "I wanted to escort her." বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল—তাহার অবচেতনা প্রদেশে ভদ্রমহিলাকে অপমান বা insult করার ইচ্ছা বলবতী ছিল। বাহিরের ভাব ও অন্তস্তলের কামনার সংমিশ্রণে escort ও insult দুইটি শব্দ মিলিয়া 'insort' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আর একটি দৃষ্টান্ত খুব আমোদজনক। এক ভদ্র-

লোকের স্ত্রী তাঁহাকে একখানা বই উপহার দেন। পরে নানা কারণে ভদ্রলোকের স্ত্রীর প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিরাগের সঙ্গে সঙ্গে বইখানাও অন্তর্ধান করে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া ভদ্রলোক বইখানা পাইলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মাতার অসুখের সময় খুব সেবাশুশ্রূষা করেন। ইহাতে বিরাগের ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন ভদ্রলোকটি দেখিলেন, বইখানা শেল্‌ফের নির্দ্দিষ্ট যায়গায়ই রহিয়াছে। স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধের সময় তিনি যখন বইখানা খুঁজিতেছিলেন, বাহ্যত ইহা পাওয়ার চেষ্টা করিলেও তিনি নির্জ্ঞান অবস্থায় (unconsciously) স্ত্রীর প্রদত্ত উপহার না পাওয়ারই কামনা করিতেছিলেন। ফ্রয়েডএর Psychopathology of everyday life নামক পুস্তকে জীবনের তুচ্ছ ভুলভ্রান্তিরও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় মনোজগতে আকস্মিক, accident বলিয়া কোন জিনিষ নাই। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার কোন না কোন কারণ আছে। অনেক সময় কারণটা এত সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত যে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না।

স্বপ্নও মানুষের নিরুদ্ধ কামনার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। ফ্রয়েড বলেন, "Dream is wish fulfilment." আমাদের এমন অনেক কামনা আছে যেগুলি সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে সাক্ষাৎ ভাবে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। এমন কি বিচারবুদ্ধি (power of discrimination) জাগ্রত থাকা কালে আমরা নিজেও তাহাদের কথা ভাবিতে পারি না। নিদ্রিত অবস্থায় বিচারবুদ্ধি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তখন নিরুদ্ধ কামনাগুলি স্বপ্নে নানা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জনৈক স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃতদেহ সৎকারে যাইতেছেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল—কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটির অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্র মারা যায়। তাহার মৃতদেহ সৎকারের সময় স্ত্রীলোকটির জনৈক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়। এই ডাক্তারের প্রতি তাঁহার অবৈধ আসক্তি ছিল। অন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুকামনার অন্তরালে ডাক্তারের উপস্থিতির কামনাই বলবতী ছিল। ফ্রয়েড-এর স্বপ্নতত্ত্ব (theory of dream) এত ব্যাপক ও জটিল যে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। শুধু নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া প্রমাণের জন্য এখানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিলাম।

ফ্রয়েড-এর theory of the unconscious' মোটামুটি মানিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে না। তাঁহার মনস্তত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র, যৌনতত্ত্ব (sexualsm) অনেক রুচিবাগীশের মনে যুগপৎ ভীতি ও বিরক্তির উৎপাদন করে। ফ্রয়েড-এর মতে আমাদের নিরুদ্ধ কামনার মধ্যে অনেকগুলিই যৌন প্রবৃত্তি সম্পর্কীয়। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা, উপযুক্ত বয়স না হইলে যৌন প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না। ফ্রয়েড বলেন—একেবারে শৈশবকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যৌন প্রবৃত্তি কোন না কোন ভাবে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অবশ্য বয়স্ক ব্যক্তি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার যৌন প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিশু পরোক্ষ ভাবে নানা উপায়ে যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকে। যৌন প্রবৃত্তির মূল শক্তিকে (energy of the sex instinct) ফ্রয়েড লিবিডো "Libido" নাম দিয়াছেন। 'Libido' ক্রমে ক্রমে কি ভাবে পরিণতি লাভ করে তাহা তিনি বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অতি শৈশবে শিশু আঙ্গুল চুষিয়া (thumb sucking) ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে stimulution দিয়া আনন্দ অনুভব করে। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি (sexual satisfaction) হয়। আঙ্গুল চোষার আনন্দ ও পরিণত বয়সের যৌনতৃপ্তি একজাতীয় জিনিষ, যদিও প্রকার বিভিন্ন। শৈশবের যৌন প্রবৃত্তির লক্ষণ (infantile sexuality) এই যে, ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট পথে সীমাবদ্ধ নয়। তাই ফ্রয়েড এই অবস্থাকে polymorphous আখ্যা দিয়াছেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন, "Heaven lies about us in our infancy." অতীত যুগে প্লেটোও এই মতের একটা দার্শনিক ভিত্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড মনে করেন, শৈশব কাল হইতেই সমস্ত তথাকথিত কুপ্রবৃত্তি লোকের মনে নিহিত থাকে। অবশ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যৌন প্রবৃত্তিকে খারাপ বলিয়া ধরা হয় না। যে অবস্থায় শিশু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে stimulation দিয়া যৌন আনন্দ অনুভব

করে তাহার নাম auto-eroticism. এই সময় শিশুর আর একটি ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাতার সংসর্গে সর্ব্বদা থাকিতে হয় বলিয়া সে মাতার প্রতি ক্রমে ক্রমে আসক্ত হইয়া পড়ে। এই আসক্তিতেও যৌন প্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফ্রয়েড ইহার নাম দিয়াছেন œdipus complex. যাহা সংবিতে আছে তাহাকে complex বলে না। যে কামনা বা ভাব নিরুদ্ধ অবস্থায় নিৰ্জ্ঞানে (unconscious) সুপ্ত থাকে, তাহার নাম complex. œdipus complex-এর সময় পিতার প্রতি শিশুর একটা বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হয়। সে মাতাকে সম্পূর্ণ নিজের অধিকারে রাখিতে চায়, কিন্তু সে দেখিতে পায় কঠোর পিতা এ ক্ষেত্রে তাহার প্রতিযোগী। এই ভাব নিরুদ্ধ হইয়া ক্রমে পিতার প্রতি ভক্তিও জন্মে। কিন্তু বিরোধের ভাব নিৰ্জ্ঞানে রহিয়া যায়। এই ত গেল ছেলের কথা। মেয়েরও ঠিক বিপরীত ভাবে পিতার প্রতি আসক্তি জন্মে। নানা কারণে এই আসক্তি নিরোধ করিয়া ফেলিতে হয়। ফ্রয়েড ইহার নাম দিয়াছেন electra complex. Auto eroticism-এর পরে যে অবস্থা আসে তাহার নাম Narcissism. এই অবস্থায় শিশু নিজেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। নিজের যত্ন লওয়া, নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা প্রভৃতি এই সময়ের প্রধান লক্ষণ। তার পরে homosexual stage. একটু বয়স হইলেই শিশু নিজের সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি হয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মনোভাব যাঁহারা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা সমকামিতার (homosexuality)র অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য অনেক স্থলে বাহ্য যৌন ক্রিয়া (overt sexual act) না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া একই sex-এর দুই জনের মধ্যে যৌন আসক্তির দৃষ্টান্ত খুব কম নয়। ফ্রয়েড-এর মতে যৌন প্রবৃত্তিকে বিশেষ ব্যাপক ভাবে বুঝিতে হইবে। শুধু বাহ্য যৌন ক্রিয়াই যৌন প্রবৃত্তির বিকাশ নয়। অবিবাহিতা ধাত্রী শিশুকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া যে আনন্দ অনুভব করে তাহাতেও যৌন প্রবৃত্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সমকামিতার পরের অবস্থা ইতরকামিতা (hetero-sexuality)। অন্য sex-এর লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে যৌনক্রিয়া সম্পাদন ও সন্তান উৎপাদনই যৌন প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য। এই সহজ লক্ষ্যে পৌঁছিতে auto-eroticism, Narcissism, ও homosexuality প্রভৃতি নানা অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়।

৫

Libido কি ভাবে বিভিন্ন অবস্থা (stage) অতিক্রম করিয়া সহজ স্বাভাবিক পথে hetero sexualityতে পরিণতি লাভ করে তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কোন সময় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় পরের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাও হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় চিত্ত এত মত্ত 'fixation' হইয়া যায় যে, পরের অবস্থাতে কেহ কেহ নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারেন না। তখন তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় ফিরিতে বাধ্য হন। ফ্রয়েড ইহার নাম দিয়াছেন, প্রত্যাবর্ত্তন (regression. (Libido unable to adjust itself to a latter stage may regress to the former stage). দৃষ্টান্ত স্বরূপে সমকামী বিকৃতমনার (homosexual perverse) কথা বলা যাইতে পারে। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিবাহিত জীবনে মোটেই আনন্দ পান না। তাঁহাদের সমকামিতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। উপযুক্ত সামঞ্জস্যের অভাবে আরও নানা রকম মানসিক বিকার উপস্থিত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মানসিক বিকারের (neurosis) কথা আসিয়া পড়ে। ফ্রয়েড প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি মানুষের অন্তস্তল বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। মানসিক বিকার সম্পর্কে তাঁহার মত নিৰ্জ্ঞান এবং যৌন প্রবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের সমাজবিরুদ্ধ কামনাগুলি আমরা নিরোধ করিতে বাধ্য হই। নিরোধ যদি সফল না হয়, তবে সেই নিরুদ্ধ কামনা গৌণ ভাবে নানা উপায়ে তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা করে। ফ্রয়েড-এর মতে মানসিক রোগের নানাবিধ লক্ষণ নিরুদ্ধ কামনার আত্মপ্রকাশের নামান্তর মাত্র। এখানে মানসিক ব্যাধির বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। ফ্রয়েড মানসিক বিকারগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ

করিয়াছেন এবং কোন্‌টা সাধারণত কোন্ কারণে হয় তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমাদের মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ কামনা আছে, তাহা কিরূপে আবিষ্কার করা যায়? ফ্রয়েড-এর পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক বিকারের চিকিৎসার জন্য সম্মোহনই একমাত্র আরোগ করিবার উপায় ছিল। রোগীকে সম্মোহিত করিয়া নানা নির্দ্দেশ suggestion দেওয়া হইত। সম্মোহনের সময় রোগী সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করে। তখন তাহাকে যাহা নির্দ্দেশ করা হয় তাহা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করিয়া থাকে। এইরূপে নির্দ্দেশ দিয়া হিষ্টিরিয়ার উপসর্গগুলি দূর করা যায়। কিন্তু ইহাতে রোগের মূল কারণ ধরা পড়ে না। বাহ্য উপসর্গের সাময়িক উপশম হইলেও মূল কারণ দূর না হওয়ায় আবার তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে। ইহার জন্য ফ্রয়েড এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই উপায়ের (method) নাম free association method. ইহাতে রোগীকে নিঃসঙ্কোচে তাহার নিজের জীবনের চিন্তাধারা (associations) বলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকের নিকট এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে যাহাতে সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব তাহার মন হইতে সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হইয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও রোগী সব সময় নিজের সংস্কার ও বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মনের গভীরতম প্রচ্ছন্ন কামনার সন্ধান পায় না। সেই জন্য স্বপ্নের বিশ্লেষণ অনেক সময় রোগের কারণ নির্ণয় করিতে সাহায্য করে। বিকারের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে রোগী আপনা আপনি আরোগ্য লাভ করে। Libido অনুপযুক্ত পথে আবদ্ধ হওয়ায় রোগের সময় অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয়। Free association method-এর সাহায্যে সেই অনুপযুক্ত পথ হইতে সরিয়া আসিয়া তাহা চিকিৎসকের প্রতি ধাবিত হয় (transferred)। চিকিৎসক তখন সামঞ্জস্য করাইয়া ইহাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতে পারেন। মোটামুটি ফ্রয়েড-এর চিকিৎসাপ্রণালীর তিনটা ক্রম ধরা যাইতে পারে (1) Exploration by means of free association method (2) Transference (3) Readjustment. আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হইলেও বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেহ এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে পারেন না। আমাদের দেশে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু ছাড়া কেহ ফ্রয়েড-এর চিকিৎসা প্রণালী ভালরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

মানসিক বিকারের বিশ্লেষণ হইতে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে। নির্জ্ঞানে বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘর্ষ ও অসামাজিক প্রবৃত্তির নিরোধই যদি মানসিক বিকারের কারণ হয়, তাহা হইলে যাহাতে অস্বাভাবিক নিরোধ না হয় এবং আমাদের অবচেতনা প্রদেশে যে সকল প্রবৃত্তি সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের সন্ধান রাখা যায় সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রসিদ্ধ মনোবিদ ম্যাকডুগালের ভাষায় বলিতে গেলে—

"All mental therapy and hygiene may be summed up in the Greek maxim—'know thyself' and this maxim may be usually expanded into the maxim—'Learn to understand your own nature more specially your own motives'."

৬

Libidoর নিরোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে কিন্তু Libido সহজ ও স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া অন্য ভাবেও নিজেকে চরিতার্থ করিতে পারে। যখন Libido নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুকে তাহার লক্ষ্য করিয়া লয় তখনকার অবস্থাকে sublimation বলে। ফ্রয়েড-এর মতে আর্ট, ধর্ম্ম প্রভৃতি মহত্তর আদর্শগুলি যৌন বৃত্তির মহত্তর প্রকাশ (sublimation of libido)। জগতে নরনারীর প্রেম (love) সম্বন্ধে যত গীতি-কবিতা রচিত হইয়াছে অন্য কিছু সম্বন্ধে তত হয় নাই। কিন্তু আমরা যদি কবির মন বিশ্লেষণ করি তবে দেখিতে পাই অনেক স্থলে কবির মনের অন্তস্তলে অতৃপ্ত কামনা ছিল—সেই কামনাই কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কালিদাস, দান্তে, শেক্‌সপীয়ার, শেলী, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা আলোচনা করিলে ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শেলী সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

"It was obstacles to Shelley's desire that led him to write poetry. If the noble and unfortunate lady Emilia

Viviane had not been carried off to a convent, he would not have found it necessary to write 'Epipsychidion', if Jane Williams had not been a fairly virtuous wife, he would never have written 'The Recollection' The social barriers against which he inveighed were an essential part of the stimulus to his best activities."

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে sex reference লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোবিশ্লেষকের মত (Psycho analytic theory) মানিতে একটু দ্বিধা বোধ হয়। কারণ ধর্ম্ম ও যৌন প্রবৃত্তির বিরোধ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মবীর তাঁহারা যৌন প্রবৃত্তিকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চান না। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করিলে ধর্ম্মের সহিত যৌন প্রবৃত্তির সম্পর্ক একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা আচারনিষ্ঠ হিন্দুরা এখনও অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা তীর্থে গিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি। কামাখ্যা মন্দিরের পৌরাণিক উৎপত্তি কি ? বিষ্ণুচক্রে যখন সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায় তখন জগজ্জননীর যোনি পতিত হইয়া কামাখ্যা পাহাড় তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মভীরু হিন্দুরা অম্বুবাচী উপলক্ষে জগন্মাতার menstrual periodএর সময় কামাখ্যায় গিয়া ভক্তি-উৎসর্গ করেন। শিবলিঙ্গের পূজা এখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে। শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করার সময় একটা যোনিও প্রস্তুত করিয়া তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতে হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গাত্রে যে সকল মূর্ত্তি আছে তাহা নগ্ন অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রের পৃষ্ঠায় যথেষ্ট কামাত্মক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি mystic ecstacy বা ভূমানন্দকে যৌন তৃপ্তির সঙ্গে আংশিক তুলনা দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগে মিষ্টিসিজম্ (mysticism) খুব প্রচলিত ছিল। মিষ্টিসিজমের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন। এই মিলনের পথে নানা ক্রম আছে। যে ক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে আধ্যাত্মিক "spiritual marriage". আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনোবিদ লিউবা, মধ্যযুগের মিষ্টিকদের ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন,নানা কারণে তাহাদের যৌন বাসনা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহারা যৌন প্রবৃত্তিকে ভূমার দিকে ধাবিত করিয়া (sublimated) spiritual marriage এর আদর্শ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা করিয়াছেন বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না। তাহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"They knew not what they did."

৭

ধর্ম্ম ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করা সাইকো-এনালিসিসের মূল উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম্মভাবের উৎপত্তির কারণ কি ? মানুষের ধর্ম্মভাবের অন্তরালে কোন্ কোন্ মানসিক শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় · সাইকো-এনালিসিস প্রথমত এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করে। Psycho-analysis is nothing but mental anatomy. শারীরতত্ত্ব যেমন একটি সুন্দর মনুষ্যদেহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখায়—ইহা কতকগুলি হাড় মাংস প্রভৃতির সমষ্টি ; সেইরূপ সাইকো-এনালিসিসও মানুষের মনের অন্তস্তলে কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে কিরূপ বিরোধ চলিতেছে, বিরোধের ফলে কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। ভালমন্দ বিচার করা বিজ্ঞানের সীমার বাইরে। রাসেলের কথায়,

The sphere of values lies outside sceince except in so far as science consists in the pursuit of knowledge.

কিন্তু ফ্রয়েড শুধু মনোবিদ নন। তিনি মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে Future of an Illusion নামক তাহার একখানা বই প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকে তিনি ধর্ম্মকে illusion (delusion ?) আখ্যা দিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

Religion consists of certain dogmas, assertions about facts and conditions of external (or internal) reality which tell us something which one has not oneself discovered and which claim that one should give them credence. If we ask on what their claim to be believed is based (?) we receive three answers which accord

remarkably ill with one another. They deserve to be believed firstly because our primal ancestors believed them, secondly because we possess proofs which have been handed down from this period of antiquity and thirdly because it is forbidden to raise the question of their authenticity. Formerly this presumptuous act was visited with the very severest penalties and even to-day society is unwilling to see any one renew it. In other words religious doctrines are illusions, they do not admit of proof, and no one can be compelled to consider them as true or believed in them.

ধর্ম্মের উপরে এত নির্ম্মম কশাঘাত আজ পর্য্যন্ত আর কেহ করিতে সাহস পান নাই।

৮

সংক্ষেপে ফ্রয়েড-এর মতগুলি বিবৃত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য ও কোন্‌টি অবিশ্বাস্য তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে। ফ্রয়েড-এর স্বপক্ষে প্রমাণ এই যে, তিনি তাঁহার মনস্তত্ত্বের মূল সূত্র-গুলিকে অনুসরণ করিয়া মানসিক বিকারগ্রস্ত অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ফ্রয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—কাজেই ফ্রয়েড-এর মনোবিজ্ঞান অসুস্থ মনের সম্বন্ধেই খাটে ; সুস্থ বা স্বাভাবিক মনের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মনের মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত, (differnce in degree) শ্রেণীগত নয়। সুস্থ ব্যক্তির মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য (harmony) কোনপ্রকারে নষ্ট হইয়া গেলে মানসিক-বিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং মানসিক ব্যাধির বিশ্লেষণের সঙ্গে সুস্থ অবস্থার মনোবৃত্তির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। সুস্থ অবস্থায় মনোবৃত্তিগুলি কিভাবে কাজ করে তাহা বুঝিতে না পারিলে মানসিক ব্যাধির বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কেহ নূতন থিয়োরী আবিষ্কার করিলে সেই থিয়োরী অনুসারে সমস্ত ঘটনাই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে অনেক সময় কষ্টকল্পনা আসিয়া পড়ে। ফ্রয়েডও যে এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, সেইগুলি আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে।—মনোবিদ ফ্রয়েড ও দার্শনিক ফ্রয়েড-এর মতগুলির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি অবিশ্বাস্য তাহা আপনাদের আলোচনার জন্য রাখিয়া আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিলাম। *

* শিলচর বাণী-পরিষদে পঠিত।

তুমি

তোমারে লয়ে করিব আমি কি যে,
ভাবিয়া তাহা আজো না পাই দিশা,
মরীচিকা মৃগ সে দেখে নিজে,
মরুতে বারি রচে যে তারি তৃষা।
কামনা মম ধরেছে রূপ, তোমার রূপ মাঝে,
বাঁশী কি তাই, চকিতে তার রন্ধ্রে যে সুর বাজে ?

তোমারে আমি কোথায় দিব ঠাঁই,
রাখিব কাছে কি তব পরিচয়ে,
আগুনে জানি ঢাকিতে পারে ছাই,
রবি আড়াল মলিন মেঘোদয়ে।
পরশমণি গোপনে রয় খনির অন্ধকারে,
আঁধার মাটি পড়ে না ফাটি অসহ সুখভারে।

তোমারে আমি কহিব কোন্ কথা,
মনের ভাষা মুখেতে নাহি ফোটে,
বুঝিয়া নিজে শিশুর ব্যাকুলতা,
মা তার ভাষা কুড়ায়ে লয় ঠোঁটে।
বাসনা হয়ে আমার ভাষা মরিয়া যায় লাজে,
কথায় সেথা কাজ কি, সুর আপনি যেথা বাজে।

তোমারে আমি শোনাব কোন্ গান,
তোমার গান রচিব কোন্ সুরে,
দুকূল ভেঙে ছোটে যখন বান,
নদীর তট সরিয়ে যায় দূরে।
আমার গান ভাসিয়া যায় বিপুল স্রোতোবেগে,
তটের বুকে আবার গান উঠিবে নাকি জেগে ?

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত আলোচনা করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে – সে শিক্ষার বিরোধী ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, আর ছিলেন দেশের লোক, কিন্তু ঘোরতরভাবে উদ্যোগী ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের খৃষ্টান মিশনরীগণ। এ রহস্য উদ্ঘাটনযোগ্য।

দেশীয় লোক যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তার নিদর্শন আজও কতক পাওয়া যায়। তৎকালে দেশীয় স্ত্রীগণের শিক্ষার বিস্তার ও প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অ্যাডাম সাহেবের যে তিনখানি রিপোর্ট ও সমসাময়িক লেখা পত্র আছে, তাহাদের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি -

The entire female population with hardly any known exceptions are hereditarily debarred from the advantages of instruction of any kind and consequently abandoned to the absolute dominion of an all-enveloping night of starless and rayless ignorance —[The state of indigenous education in Bengal & Behar, Calcutta Review. Vol II pp 356. (1844)]

The state of instructions amongst this unfortunate class (females) cannot be said to be low, for with very few exceptions there is no instruction at all....The notion of providing the means of instruction for female children never enters into the minds of parents ; and girls are equally deprived of that imperfect domestic instruction which is sometimes givens to boys. A superstitious feeling is alleged to exist in the majority of Hindu females, principally cherished by the women and not discouraged by the men, that a girl taught to write & read will soon after marriage become a widow...and the belief is also generally entertained in native society that intrigue is facilitated by a knowledge of letters on the part of females... an anxiety is often evinced to discourage any inclination to acquire the most elementary knowledge so that when a sister, in the playful innocence of childhood is observed imitating her brother's attempts at penmanship, she is expressly fobidden to do so & her attention drawn to something else.* The Mahomedans participate in all the prejudices of the Hindus against the instruction of their female offsprings....The juvenile female populations, of the teachable age or of the age between 14 and 15 years, without any known exceptions & with few probable exceptions that they can scarcely be taken into account is growing wholly destitute of the knowledge of reading & writing.

The few probable exceptions here alluded to are these. 1st, Zeminders are said occasionally to instruct their daughters in writing & accounts, since without such knowledge they would in the event of widowhood be incompetent to the management of their deceased husband's estates, & would unavoidably become a prey to the interested & unprincipled, altho' it is difficult to obtain from them an admission of the fact. Such in social repute, is the disgrace of instructing a female in letters !

2nd, The mendicant Vaishnavas or followers of Chaitanya are alleged in some measure at least to instruct their daughters in reading & writing, Yet it is a fact that as a sect they rank precisely the lowest in point of general morality & especially in respect of the virtue of their women.

3rd, Many of the wretched class of *nautch* girls...also acquire some knowledge of reading & writing in order to enable them the better to carry on their clandestine correspondence & intrigues. (2nd Report. 1836)

পাঠশালা ছিল না, ঘরের বাহিরে না গিয়া ঘরের মধ্যেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

I made it an object to ascertain in those localities in which a census of the population was taken whether the absence of public means of native origin for the instruction of girls was to any extent compensated by domestic instruction. The result was negative. No adult females were found to possess the lowest grade of instruction. (3rd Report. 1838)

আডাম-এর রিপোর্টের কথাগুলি একটু সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। ইহার ভিতর একটু একদেশদর্শিতা ও অতিরঞ্জন থাকা যে অসম্ভব তাহা নহে। মেয়ে-পাঠশাল ছিল না এটা সত্য, তা বলিয়া লেখাপড়া বাড়িতে বসিয়াও কেহ শিখিত না একথা জোর করিয়া বলা যায় না : সহরে ও পাড়াগাঁয়ে একই অবস্থা ছিল তাহাও বলা যায় না those localities in which census of the population was taken—অর্থাৎ সারা

---

* যদি ছোট ২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয় "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।"

বাঙ্গালা সহর ও পাড়াগাঁনির্ব্বিশেষে অনুসন্ধান হয় নাই, অতএব একটু একদেশদর্শিতার দোষ যে অর্শাইতে পারে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" পুস্তকের (১৮৮০) মুখবন্ধে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আছে—

> I was born in the year 1814 corresponding with the Bengali year 1221 (8 Shravan). While a pupil of the Patsala at home, I found my grandmother, mother and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then.

মিত্রজা যখন পাঠশালায় পড়েন, তার পরে আডাম সাহেবের রিপোর্ট লেখা হয় ইহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকের স্মরণ আছে, তাঁর কোন আত্মীয়া (যাঁর জন্ম প্রায় আডাম সাহেবের রিপোর্টের সমসাময়িক) কোন পাঠশালায় না গিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন এবং সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়েদের কাশীখণ্ড, হিতোপদেশের গল্প এবং রামায়ণ মহাভারতের ইতিবৃত্ত শুনাইতেন—গল্পের মাঝে মাঝে রামায়ণের পয়ার এবং ত্রিপদী কবিতা আবৃত্তি করিতেন। অনুরূপ স্মৃতি অনেক বৃদ্ধেরই থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব অ্যাডাম সাহেবের কথা একটু রাখিয়া ঢাকিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

তারপর লেখাপড়া শিখিবার স্কুল না থাকায় সাধারণভাবে লেখাপড়া শিক্ষা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না—কিন্তু তজ্জন্য তৎকালের নারীমাত্রেই "were abandoned to the absolute dominion of an all envolping night of starless and rayless ignorance."—একথা একটু অতিরঞ্জিত। "সাদার উপর কালর" আখর টানাকে আমাদের দেশে কোন দিনই শিক্ষার শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। পাঠশালে না পাঠাইয়াও মানুষকে মানুষ করা যায়—এই ধারণাবশতঃ আমাদের দেশে লোকশিক্ষা নিরক্ষরতা দূর করা মাত্র, একথা কখনও কেহ মানিয়া লয় নাই।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আডাম সাহেবকে দেশীয় শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করিবার ভার দিয়া যে সুদীর্ঘ তিনটি রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহার ভিতর তাঁহার অভিসন্ধি ছিল। সে অভিসন্ধির কথা বুঝিলে উক্ত রিপোর্টত্রয়কে খুব সাবধানতার সহিতই গ্রহণ করিতে হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয়গণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহারা বহু অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া মোটের উপর স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, দেশীয় ভাষায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ভারতে ইংরাজের অধিকার শিথিল হইয়া আসিবে—অসন্তোষ বাড়িবে, চক্ষু ফুটিলে যে সব উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাই হইবে; অতএব দেশীয় ভাষায় দেশীয় জনসাধারণের শিক্ষার তাঁহারা বিরোধী ছিলেন—এবং স্ত্রীশিক্ষারও অনুকূল ছিলেন না।

> Up to 1853, the Indian Government did not do anything for female education. It was not encouraged, because from the utilitarian point of view, it was of little use to Government. Women clerks & women subordinate officials were not in demand then in Government establishments and hence there was no need for educated females. And so they tried to find reasons for not educating Indian women.—(History of Education in India under the Rule of the East India Company, p. 68.—B. D. Basu.).

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা একান্ত হাস্যোদ্দীপক হইলেও শিক্ষাপ্রদ। প্রথম যুক্তি এই আবিষ্কৃত হয় যে, দেশীয় লোক স্ত্রীগণের শিক্ষার বিরোধী, অতএব লোকমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা সুযুক্তি নহে; দ্বিতীয়, স্ত্রীগণ শিক্ষিত হইলে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত কুরুচিপূর্ণ পুস্তক আছে সেই সকল জঘন্য পুস্তক পাঠ করিতে বাধ্য হইবে। অতএব স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে। *

এইবার স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক খৃষ্টান মিশনরীগণের কথা আলোচনা করা যাউক। খৃষ্টান মিশনরীগণের তরফ হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিশিষ্ট কর্ম্মী মিস্ কুক্ (পরে মিসেস্ উইলসন) সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। নিজের দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অভিপ্রায় কি, প্রশ্ন করায় তিনি যে উত্তর দেন তাহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

> Another woman asked, "What benefit will you derive from this work?"
>
> She was told that the only return wished for was to promote their best interest and happiness—

এই একান্ত হেঁয়ালীপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার পরিচয়ের পর Calcutta Review-এর লেখক (Cal. Rev. no. 25 p. 102) লিখিতেছেন

> We will not conceal the fact, that our own earnest desire is that India will be thoroughly Christianized and that we regard Female Education as an important means towards that end.

এই স্পষ্টবাদিতার পার্শ্বে মিস্ কুকের মোলায়েম কথাগুলি নির্লজ্জ মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া না লইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির ভিতরও গভর্ণমেণ্টের কেরাণী সৃষ্টি ছাড়া যে এই অভিসন্ধি সংগুপ্ত ছিল তাহা লর্ড মেকলে কর্ত্তৃক ১৮৩৬ সালে তাঁহার পিতাকে লিখিত পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

> The effect of this education on the Hindus is prodigious. No Hindu who has received an English education ever remains

* Lords Committee on the Government of Indian territories, 26th June, 1853,—reproduced in History of Education in India under the East India Co.—by B. D. Basu. p. 169. et seq.

sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure deists and some embrace Christianity. It is my firm beleif that if our plans of education are followed up there will not be a single idolater among the respectable castses in Bengal thirty years hence. (Quoted—History of Education in India under the East India Co. —by B. D. Basu. p 105)

এস্থলে আলোচনা হয়ত অবান্তর হইবে কিন্তু উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল যে, মিশনরী তথা মেকলের আশা পূর্ণ হয় নাই। নিরাশ হইয়া, মিশনরী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর সার্থকতা আছে কি না, বিভিন্ন খৃষ্টীয় মিশনের পরিচালক-বর্গ আজ খুব নিবিষ্টচিত্তে তাহা পর্য্যালোচনা করিতেছেন।

মিশনরীগণের প্রচেষ্টার মধ্যে নিগূঢ় অভিসন্ধির কথা মাথায় রাখিয়া আমরা তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিব।

মিশনরীগণের প্রচেষ্টা ও দেশীয় লোকের সেই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে মতামত ও কার্য্য সম্যক বুঝিতে হইলে এই নিগূঢ় কথাটি পাঠকের মনে রাখিতে হইবে।

কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে যেখানে মিশনরীগণের কেন্দ্র ছিল সর্ব্বত্রই স্কুল করিবার এবং মেয়ে-স্কুল করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, প্রত্যেক মিশনরী-পত্নী মেয়ে কুড়াইয়া প্রাথমিক পাঠশালা করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন পাকা ফল ফলে নাই— ফল বিপরীতই হইয়াছিল।

Girls were bribed to attend with presents of money or clothes. These girls exclusively belonged to the lowest classes. Female education had to be invested with some degree of respectability....These schools were fitted rather to bring discredit upon the cause in the estimation of a community who regard nought as good in which the poor and the lowly are permitted to share. (Calcutta Review, Vol 25, p. 61 et seq)

এ অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা স্বতই আসিয়া পড়ে। প্রথম চেষ্টা করেন Calcutta Juvenile Society for the establishment & support of Bengali Female Schools. এই সোসাইটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত—সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ. এচ্. পিয়ার্স। স্কুল করার প্রধান অন্তরায় হয় উপযুক্ত দেশীয় শিক্ষকের অভাব। রেভারেণ্ড পিয়ার্স বলেন, "In April 1820 a well qualified mistress was obtained and thirteen scholars collected...The Society provided to establish female schools in Shambazar (নন্দন বাগান ?) Jaunbazar, Intalli ec." এই সময়ে সোসাইটির হাতে রাধাকান্ত দেবের নিকট হইতে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কের' পাণ্ডুলিপি আসিয়া পড়ে এবং সোসাইটি তাহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিতে কৃতসংকল্প হন।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ইতিপূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৮ সালে টাউনহলে মিঃ জে এচ. হ্যারিংটনের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা হয়। সেই সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার সার মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান স্কুল ও পাঠশালা সকলের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এবং দেশে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণের সহায়তা করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। মেয়েদের শিক্ষাও ইহার অন্তর্গত ছিল। এই সভায় কার্য্যকরী সমিতির সভ্য মনোনীত হন—স্যর অ্যাণ্টনি বুলার, জে. এচ. হ্যারিংটন, ডব্লিউ ইয়েটস, ঈ. এস. মণ্টেগু, ডেভিড হেয়ার, রাধামোহন ব্যানার্জ্জী, রসময় দত্ত, লেফ্‌টনাণ্ট আর্ভিন ও মণ্টেগু, সেক্রেটারিদ্বয়।

এই কার্য্যকরী সমিতি যে পাঠশালা সমূহের আদমসুমারী করেন তাহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। বৎসর বৎসর এই সমিতি কলিকাতাস্থ পাঠশালা সমূহের এক পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহাতে ছেলেদের সঙ্গে Female Juvenile Society কর্ত্তৃক স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় সমূহ হইতে ৪০টি বালিকা পরীক্ষা দেয় (১৮২০)।

Calcutta Female Juvenile Society পরে Bengal Christian School Society এই নাম গ্রহণ করে। আবার নাম বদলাইয়া Ladies' Society for Native Female Education এই নামে পরিচিত হয় (১৮২৪)।

সুতরাং এই সময় কলিকাতায় বালিকা শিক্ষার জন্য দুইটি সমিতি থাকে— ১ম, Calcutta School Society. এই Society ছেলে এবং মেয়ে দুয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে থাকে। ২য়, Ladies' Society, ইহা শুধু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে।

এই সময় বিলাতের British & Foreign Society মিস্ কুক্ নামে একজন বৃটিশ মহিলাকে Calcutta School Societyর নিকট পাঠাইয়া দেন (১৮২১)। মিস্ কুক্ একজন "eminently qualified lady for the purpose of introducing a regular system of education among the native female population."

School Societyর টাকা ছিল না এবং Ladies' Societyরও আর্থিক অবস্থা তদ্রূপ। এই উভয় সোসাইটি Church Missionary Societyর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মিস্ কুক্ C. M. Societyর একজন পাদরী রেভারেণ্ড আইজাক উইলসনকে বিবাহ করেন এবং মিসেস্ উইলসন তদানীন্তন সমস্ত স্ত্রীশিক্ষালয়গুলির তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। প্রথম বৎসরেই ৮টি স্কুল স্থাপিত হয় এবং তথায় ২১৪টি বালিকা বিদ্যালাভ করিতে থাকে।

কলিকাতা রিভিউ-এর লেখক (Calcutta Review, 1855. July) লিখিয়াছেন—"It was somewhere about 1818 or 1819 that a Society called we beleive the Union Schcol Society was formed in Calcutta for education purposes." এই ইউনিয়ন সোসাইটির সভ্যমধ্যে সাহেব বাঙ্গালী দুই ছিলেন। মিস কুক আসিয়া

উপস্থিত হইলে নাকি বাঙ্গালী সভ্যেরা পদত্যাগ করেন। কলিকাতা রিভিউয়ের লেখক বলিতেছেন—

> The native members of the committee of that society, although they had spoken well while yet the matter was at a distance & in the region of theory, recoiled from the obloquy of so rude an assault on time-honored custom....The babus had been brought up to the talking-point, but not to the acting point.

লেখকের এ বিদ্রূপ খুব সুলভ হইলেও সমীচীন হয় নাই। বাবুরা acting-pointএ যাইবার পূর্ব্বে thinking-pointএ দাঁড়াইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন যে, খৃষ্টানগণের এই আপাতউদার কার্য্যধারার ভিতর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে তখন তাঁহারা পিছাইয়া গিয়াছিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ গৌড়ীয় সভা, ধর্ম্ম-সভা ইত্যাদি দ্বারা সমবেত ভাবে বিরুদ্ধ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ঠন্‌ঠনিয়ায় মিস্ কুক প্রথম স্কুল স্থাপন করেন। নিম্ন শ্রেণীর বালিকারাই এই স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এক বৎসরের মধ্যে ৮টি স্কুল স্থাপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা ২১৪। ১৮২৮ সালে ১৯টি স্কুল গড়িয়া উঠে। এই স্কুলের শিক্ষক—"Pandits and Sarkars." এই সকল স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে মিসেস্ উইলসন লেখেন—

> The children afford us, on the whole, much gratification and make tolerable progress, & could they be placed under Christian teachers instead of heathens, no doubt they would be more regular in their attendance & make corresponding progress.
> —(Bengal Missions, 1848 p. 415)

ছাত্রীদের স্কুলে আসার বিভ্রাট ঘটিত। ছাত্রীদিগকে স্কুলে লইয়া আসিবার জন্য ঝি (Hirkari) নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন ছাত্রীদের হাজিরার সংখ্যার অনুপাতে তাহারা একটা কমিশন পাইত, ছাত্রী প্রতি দৈনিক ১ পয়সা বা ১॥০ পয়সা। ঝিরা এই ব্যবস্থাকে একটা ব্যবসায়ে দাঁড় করাইয়াছিল। এবং নিজের কমিশনের একাংশ ছাত্রী বা ছাত্রীদের অভিভাবককে দিয়া, অল্পায়াসে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইত। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের এ ব্যবস্থায় রাজী হওয়া খুবই সম্ভব হইত। কিন্তু সংখ্যার উপর কমিশন নির্ভর করায় ছাত্রীবিশেষের উপস্থিতির কোন স্থিরতা থাকিত না। স্কুলে বড় ছাত্রীদের "সর্দ্দার পোড়ো" (monitor) নিযুক্ত করিয়া কিছু কিছু বৃত্তি দান করা হইত। তাহার ফলে তাহারা অধিক দিন স্কুলে থাকিয়া পড়াশুনা করিত এবং অন্য ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া স্কুলে আনিয়া জড় করিত।

মেয়ে পাঠশালার সংখ্যা বাড়িয়া উঠায়, মিসেস্ উইলসনের তত্ত্বাবধান-কার্য্য কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল; পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে যাহা হয়। "বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর" এই রূপই চলিতে লাগিল। মিসেস্ উইলসন মন্তব্য করিলেন, পাঠশালার ছাত্রীগণকে [illegible]

পারিলে সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে Society for Native Female Education নামে একটি সমিতি গঠিত হয় (১৮২৪)। এবং ১৮ই মে ১৮২৬ সালে Central School নামে একটি স্কুলের ভিত্তি স্থাপন হয়—

> On the eastern side of Cornwallis Square, Calcutta ; being in the centre of the thickest as well as the most respectable Hindu population, and in a spot formerly notorious for robbery and murders committed there. A brass plate with the usual ceremonies,

Central School
for the
Education of native females
Founded by a Society of ladies
which
was established on march 25, 1824.
Patroness :
The Right Hon. Lady Amherst.
George Balland Esq. Treasurer.
Mrs. Hannah Ellerton. Secretary.
Mrs. Mary Ann Wilson, Superintendent.
This work was greatly assisted by a liberal donation
of sicca rupis 20,000 from
Rajah Boidonath Roy Bahadur
The foundation stone was laid on the
18th May 1826.
in the seventh year of the reign of
His Majesty King George IV.
The Right Hon. Wm. Pitt, Lord Amherst
Governor General of India.
C. K, Robinson Esq. Gratuitous Architect.

রাজা বৈদ্যনাথের পরিচয়—A short sketch of Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur & his family by Benimadhav Chatterjee (1928) এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে—

Bengal Mission-এ উদ্ধৃত Chapman's Female Education (p. 86)এ আছে—

> For sometime the raja continued to give a kind countenance to the work & Mrs. Wilson was admitted to visit the rani, on the most friendly terms, instructing her in the English language. At a later period, when the Central School was in full operation, the rani expressed a wish to see it, & consented to meet several ladies on the occasion of her visit. She was extremely delighted & made a most pleasing impression upon all who were present. Not long after, the raja withdrew almost entirely from public life ; and, altho' it is ascertained that the rani maintains an increasing regard for Mrs. Wilson it was not considered etiquette for her to receive any stranger as formerly

ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডে লোকশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা একটু জানিয়া রাখিলে মিশনরীদের আমাদের দেশের মেয়েছেলেদের শিক্ষার জন্য মাথাব্যথার কারণ আরও রহস্যময় হইয়া দাঁড়ায়। Charity begins at home এ কথা মনে রাখিলে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া আমাদের দেশের মেয়েছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আসা অন্ততঃ মিশনারীদের পক্ষে খুব নিঃস্বার্থ পরোপকার বলিয়া প্রতীয়মান নাও হইতে পারে।

> Before 1803, only the twenty first part of the population was placed in the way of education, and at that date England might justly be looked upon as the worst educated country in Europe...
>
> In 1817 only one thirty fifth part of the population of France received education...
>
> Terrible moral evils in child life, fearful absence of knowledge of good & evil arose and a generation that had no information on any subject whatever, save automatic skill necessary with narrow limits of daily factory work sprang up & became a disgrace to the country, not only a generation that had no knowledge of religion or even of elementary morality, but a generation that was a positive danger to existing society & a disruptive force that threatened to hinder all civilized developements.—State intervention in English Education by De Montmorency p 210-14

তৎকালে ইংলণ্ডের শিক্ষার অবস্থা এইরূপ উক্ত পুস্তকে দেওয়া আছে--

> Paid for by the rich and controlled by the priest,—that describes the position of schools up to the time (1833) when the state came to endow public schools (£22,000).

এই দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে দুইটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়—একটির নাম British and Foeign School Society (1801) আর একটির নাম National Society for promoting the Education of the poor. শেষোক্ত সমিতি খৃষ্টান ধর্ম্ম মুখ্যতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মের ভিত্তির উপর শিক্ষা বিস্তার, দ্বিতীয়টি ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠানকে স্কুলের বাহিরে রাখিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আত্মনিয়োগ করিল। শেষোক্ত সমিতির কার্য্যতালিকার চতুর্থ ধারায় ছিল,

> All schools which shall be supplied with teachers at the expense of this Institution shall be open to the children of parents of all religious denominations. No catechism or peculiar tenets shall be taught in the schools.

এই সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মিস্ কুক্ যখন কলিকাতা আসিলেন তিনি খৃষ্টান মিশনারীগণেরই একজন হইয়া দাঁড়াইলেন এবং স্কুল গড়াকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারেরই সহায়তা করিতে লাগিলেন। মিশনারী মাত্রেরই এই অভিপ্রায় ছিল। এই সম্বন্ধে মেজর বি. ডি. বসুর Education in India under E. I. Company নামক পুস্তকের Conversion & Education of Indians শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি পাঠ করিলে মিশনারী তথা কোম্পানীর ভারতে শিক্ষা বিস্তারের আদিম রহস্য সম্যক উপলব্ধ হইবে।

কিন্তু কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে মিশনারীগণ যে বিপুল চেষ্টা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন তাহার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝিতে দেশের লোকের অধিক সময় লাগিল না ; এবং ঐ সকল স্কুলে যে শ্রেণীর ছাত্রকে কুড়াইয়া জড় করা হইতে লাগিল তদ্দারা সে শিক্ষার আদর আভিজাত্য-গর্ব্বিত হিন্দু সমাজ মোটেই করিল না। "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" পুস্তকে যে "রসী, মতী, হীরা, ভগী"র কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যেই উক্ত শিক্ষা আবদ্ধ রহিল ; এবং যে সকল ব্যক্তি (রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি) মিশনারীগণের প্রচেষ্টার অভিনবত্বে মুগ্ধ হইয়া প্রথম প্রথম তাহাদের সহায়তা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই তাঁহারাই শেষে মিশনরীগণের শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমে সরিয়া দাঁড়াইলেন — পরে প্রকাশ্যভাবে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

৬ই ফাল্গুন রবিবার ১২২৯ সালে (ইং ১৮২৩), গৌড়ীয় সমাজ নামে দেশীয়গণের এক সভার আনুষ্ঠানিক অধিবেশন হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন-- রামজয় তর্কালঙ্কার, "দায়ভাগ সংগ্রহের" লেখক। উমানন্দ ঠাকুর, স্কুল বুক সোসাইটীর সভ্য। চন্দ্রকুমার ঠাকুর, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী। দ্বারিকানাথ ঠাকুর। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ জেনারেল ব্যাঙ্ক। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কাশীকান্ত ঘোষাল—স্মৃতিশাস্ত্রের তরজমা করেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন —স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। শিবচরণ ঠাকুর। বিশ্বনাথ মতিলাল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সমাচার চন্দ্রিকা"র সম্পাদক। রামদুলাল দেব। রাধাকান্ত দেব। কালীপদ বসু, 'সহমরণ' সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তকের লেখক। রামচন্দ্র ঘোষ। রামকমল সেন। কাশীনাথ মল্লিক। বীরেশ্বর মল্লিক। রসময় দত্ত, প্রভৃতি।

এই সভার সভাপতি মনোনীত হন রামকমল সেন এবং গৌরমোহন সেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঐ সভার অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করেন। অনুষ্ঠান-পত্রে কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এই সভার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চয় বলা যাইত। তবে সভাপতির কথায় জানা যায়—"সাধারণ আমার দিগের কোন সোসাইটী অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কি ২ ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার" ইহাই অনুষ্ঠান-পত্রে বিবৃত হইয়াছিল।

অনুষ্ঠান-পত্র পাঠের পর যে তর্ক-বিতর্ক হয় তার মধ্যেও সভার প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "শ্রীযুত রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র

নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন।"

এই কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, চারিদিকে মিশনারীগণের কার্য্যকলাপে দেশের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন এবং সেই অস্বস্তির প্রতিবিধানের জন্য পরবর্ত্তী সময়ে যে দুর্জ্জয় চেষ্টা হইয়াছে এই সভা তাহারই সূত্রপাত করে। প্রত্যক্ষতঃ গৌড়ীয় সভা 'বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধি" ও সমাজসংস্কারেই তাহার স্বল্পায়ু জীবনের চেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া বিরুদ্ধ স্রোতকে বাধা দিবার সূত্রপাতও করিয়াছিল।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার দুই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তারপর আর তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয়, স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্যে যেমন তাঁর বিদ্বজ্জন সমাজে স্থান হইয়াছিল--কিন্তু সে সমাজের কাম্য স্কুলবুক সোসাইটি প্রভৃতি মিশনারীসেবিত তথাকথিত হিতৈষী সভার কার্য্যের পরিপোষক না হওয়ায় তাঁহাকে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৪১ সালে গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী প্রমথ নাথ দেব কর্ত্তৃক আহূত যে সভা হয়, এই গৌড়ীয় সভা তাহারই পূর্ব্বসূচনা।

The procedings began with Raja Radha Kanto Deb taking the chair. It was resolved that a society be formed, named the Hindu Soceity and that at the first instance, each of the heads of castes, sects and parties at Calcutta, orthodox as well as unorthodox, should as members of the said Society, sign a certain covenant. binding him to take strenuous measures to prevent any person belonging to his caste, sect or party from educating his son or ward at any of the Missionary Institutions at Calcutta, on pain of excommunication from the said caste sect or party...It was presumed that the example will be soon followed by the inhabitants of the mofassil. [Bengal Missions by Long—p. 501 (1848)]

তৎকালের সমাজনেতৃগণের এই মনোভাব মফঃস্বলে সংক্রমিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। বারাসতে একটি বড় রকমের মেয়ে-স্কুল ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়। এই স্কুল সম্বন্ধে Calcutta Review-এর (১৮৫৫) লেখক লিখিয়াছেন—

The most violent animosity was exhibited on the part of the more bigoted portion of the community towards the school and every one connected with it. The law was, as usual, enlisted in the cause of oppression & persecution. Charges of assault, suits for arrears of rent & complaints of all kinds & characters were lodged against the parents who sent their daughters to the school...The members of the female school committee were assailed in the streets with the foulest language, & every kind of annoyance that vinidictiveness could suggest, was brought to bear against them...Notwithstanding all this they persevered & the poorer people persevered in sending their children to school though they were excommunicated—annoyed & persecuted.

কিন্তু মিশনরীগণের অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। অধ্যবসায়ের কারণও ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—সুতরাং if the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা Zenana mission এর সূত্রপাত করিলেন--মিষ্টার ফর্ডাইস এই অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। খৃষ্টান গুরুমা অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলে নানা অনর্থের মধ্যে একটা অনর্থ এই যে, মেয়ে খৃষ্টান হইয়া যাইবে এই আপত্তি করায় এই উত্তর দিতে বাধে নাই—

> And is the religion of the most civilized portion of the world, the religion of Europe, of England, of England's Queen, that model of lady-like accomplishments, so great a bugbear ?

স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনে দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে—এ আপত্তির উত্তরে মিশনরীগণ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বিপ্লব আনয়নই তাঁহাদের অভিপ্রায় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন রূপ বিপ্লবই তাঁহাদের অভিপ্রেত।

বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মেয়ে স্কুল এই ভদ্রমেয়েদের আকর্ষণ করিবারই প্রয়াস মাত্র। দেশের লোক খুব কঠিন সর্ত্তেই উক্ত স্কুলে মেয়ে পাঠাইতে রাজী হইয়াছিল—প্রথম, খৃষ্টান ধর্ম্ম উক্ত স্কুলের পঠন-পাঠনের মধ্যে স্থান পাইবে না। দ্বিতীয়—No pupil was to be admitted without the ascertainment of the unsullied respectability according to native ideas of her family—১৮৪৯ সালে ৬০টি ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয় খোলা হয়।

এইখানে বাঙ্গলার স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক চেষ্টার প্রথম অধ্যায়ের শেষ।

আগাছা

—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১

পিপড়ে, পতঙ্গ, মাছি, মশা, ছাগল, গরু, মুরগী, মানুষ, কুকুর, বেরাল, যেখানে এক জায়গায় এক সঙ্গে বাস করে, মনোরমার ছেলে সেইরকম একটা জায়গায় ঘুঁটে, কাঠ, টিন, কয়লা, ভাঙাহাঁড়ি, কলসীর টুকরো নিয়ে খেলা করছিল।

একটুকরো ঘুঁটের একটুখানি মুখে পুরে সে ফেলে দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা পিপড়ে ধরে মুখে পুরলে, এবং তার পরেই কাঁদলে।

এবারে শশীর মা এল। মুখ থেকে পিপড়েটা টেনে বার করে ফেলে দিয়ে একবার কোলে তুলে নিলে। তারপর সামনের ঘরের একটি মেয়েকে ডেকে বললে, একটু দেখিস তো মা একে, একবার ঘুরে আসি মনিব-বাড়ী।

খোকা একলা বসে এক টুকরো মিছরী চুষতে থাকে, নয়ত একখানা বাতাসা, তারপর আপনি ঢুলতে থাকে। তখন শশী বা অন্য কেউ কোন ঘরে তাকে তার মাদুরের ওপর একটা কাঁথা-বালিস দিয়ে শুইয়ে দেয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ঠোঁট চুষতে থাকে আস্তে আস্তে, যেন মায়ের কোলে ঘুমচ্ছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শশীর মা কাজ থেকে ফেরে একবাটি দুধ হাতে—ছেলেটাকে খাওয়ায়। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, হাঁরে কেঁদেছিল? নয়ত দুষ্টুমী করেছিল? ওর যেন মায়া হয়।

তারপর কোলে করে দুধ খাওয়ায়, কখনো বা আদর করে 'যাদু সোনা দুধ খাও' বলে।

কিন্তু শশীর মা মনোরমা নয়. মনোরমা—বা ছেলেটার মা একজন ছিল।

পিতৃ পরিচয়?—সে কথা থাক্।

তার মার বা মনোরমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়ের ঠিক কোন ইতিহাস জানা নেই। সম্ভবতঃ তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ তার হয়। সে বিবাহের আধিভৌতিক প্রয়োজন তার বরপক্ষে ছিল না, যেহেতু তাঁর স-গৃহস্থালী একটি গৃহিণী ছিলেন। কন্যাপক্ষেও বিবাহের দায়িত্ব ছিল না, তাকে শুধু কন্যকা নাম থেকে নামান্তরিত করা হয়েছিল।

সুতরাং বিয়ের আগেও সে যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল, তার মার কাছে। মা ছিল কোন্ দূর এক আত্মীয়ের বাড়ী রাঁধুনী। ওরা ছিল দুটি বোন, বড়র বিয়ে আগেই হয়েছিল, সে স্বামীর ঘরে থাকত। ছোটর জন্য মার চিন্তার সীমা ছিল না, বিবাহ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিবাহ-সংস্কার না হলে সে ব্রাহ্মণই নয়, তার হাতের অন্নজল কে গ্রহণ করবে? অতএব বিবাহ তার হয়েইছিল এবং সেই বিয়ের চিহ্ন ছিল তার কপালে সিঁদুর।

মা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। এবং নির্লিপ্ত নির্ব্বন্ধন বিবাহিতা মেয়ে মায়ের রান্নাঘরের কাযের উত্তরাধিকার পেয়েছিল।

তারপর আশ্রয়দাতার বাড়ীতে থাকতে থাকতে একদিন সেও যত কাঁদলে, বাড়ীর গৃহিণীও ততই কাঁদলেন।

তারপর? তারপর অনেক কথা। সেই তারপরের একটা স্তরে দেখা গেল মনোরমার ঐ ছেলেকে। তার মাঝের, আগের এবং পরেরও ইতিহাস কেউই প্রায় জানে না, অতএব প্রায় অজ্ঞাতই আছে সেটা।

যা হোক; তার পরেও দেখা গেল মনোরমার ছেলে, তার চাকরী আর আত্মমর্য্যাদা তিনই পৃথক পৃথক ভাবে একরকম করে টিঁকে আছে।

২

আগাছা যেমনভাবে সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে, অযত্নে অশ্রদ্ধায়ও তাড়াতাড়ি পুষ্ট হতে থাকে, বাইরের স্নেহজল তার জন্য না থাকলেও মাটীর স্নেহস্তন্যসুধা টেনে নিয়ে—মনোরমার ফেলা তেমনিভাবেই মাতৃস্তন্য আর মাতৃস্নেহহীন হয়েই শুধু অন্য দুটি জননীর অন্তরের করুণারস আকর্ষণ করে নিয়ে বড় হতে লাগল।

বাতাসা, খই, মিছরী, মুড়ি, ঘুঁটে, খোয়া, কাঁকর, কয়লা সবই তার সমান খাদ্য, শুধু কোনটা সে খায়, কোনটাকে মুখে দিয়ে ফেলে দেয়।

তাকে সশঙ্ক স্নেহে আগলাবার, মধুরস্নিগ্ধ আনন্দময় কৌতূহলে দেখবার, অথবা সেই আহার্য্যের কৌতুকলীলা দেখে হাসবার কেউ নেই।

বিশ্বপ্রকৃতির সন্তানের মত সে যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই হাসে, কাঁদে, খায়, ঘুমায়। সেই নিয়মেই কখনো বা সে পিঁপড়ে পোকা ধরে কামড় দেয়, কখনো বা পিঁপড়ে পোকারা তাকে কামড়ায়।

ধূলোমাখা দেহ, হৃষ্টপুষ্ট, ঈষৎ মলিন, গৌরবর্ণ ভদ্রঘরের ছেলেটি এই জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেই একটির পর একটি করে বছর অতিক্রম করে পাঁচ বছরে পড়ল।

মনোরমার মনের কথা কেউ জানে না। সম্মান ও আশ্রয় তার বজায় ছিল, তারপরেও ছেলের কথা সে হয়ত ভাবে নি, অথবা ভেবেছিল গোপনে, তা জানা নেই। সে নির্ব্বিঘ্নে বেঁচেছে, বেড়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে।

বাড়ীর যিনি গৃহিণী ছিলেন, তিনি সন্তানের জননী ছিলেন —কি ভেবে কি জানি তিনি ওই মা ও স্বজনপরিত্যক্ত বঞ্চিতকে—ওঁরই ঘরের শিশু বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মনোরমার ছেলে কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলে ভর্ত্তি হল। জামাকাপড় তার জোটে। খাতাপত্র শ্লেট বইও পায়। আধা-ভদ্র আধা-বস্তিবাসী ধরণে সে পড়ে। তার পালিকা মা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসিয়ে দিয়ে মনিববাড়ী যায় কাজ করতে।

শশীর মার মেয়ে-জামাই ঘরে থাকে, শশীকে সে দিদি বলে। শশীর মাকে মাও বলে, মাসীও বলে।

৩

আপন সন্তান ও পরের সন্তান মানুষ করার যে প্রভেদ থাকে এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। দয়া ও কর্ত্তব্যের দায়ে যে মানুষ হয় সে মাসীকে মা বললেও, জানতে পারে তার জীবনযাত্রার ধরণটা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পালিকা মাতার ভদ্রলোকের ছেলে মানুষ করার কর্ত্তব্যের দায়ে ফেলা দিনের বেলা ওই সব পল্লীর ছেলেদের মত সব সময় খেলা করতে পায় না; অশ্রাব্য অকথ্য কথা শুনতে পায়, কিন্তু বলতে পায় না; গাল দেওয়া মারামারি করায় এগোতে পায় না। নিজেদের মায়ের স্নেহসজাগ দৃষ্টিতে থেকে পাড়ার ছেলেরা যা খুসী তাই করে, বলে; কিন্তু মাসীর তীক্ষ্ণ সচেতন লক্ষ্যের মাঝে থেকে ফেলার লেখা পড়া, খেলার, শোয়ার সময়ের বেশী নড়চড় হয় না।

ফলে, সকলেই জানতে পারলেও ওদের ছাড়া, বিশেষ কেউ, হয়ত ভদ্রলোকের ছেলে। বোঝা যায়, ওর জন্যে খরচের টাকা আছে, খবর করার লোক আছে।

বয়স আস্তে আস্তে জ্ঞানের সীমায় এসে পৌঁছল।

সঙ্গী ছেলেগুলো কেউ কেউ বলে, তুইতো বড় লোক হবি। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, পাশ করবি।

আর একটা ছেলে বলে, হাঁরে, তোর মাসীর অনেক টাকা আছে, না? তোকে জামা কিনে দেয়, জুতো দিয়েছে সেদিন।

অন্য একটা ছেলে বলে, করে তো ঐ গোঁসাইবাড়ীতে কাজ, তা আর মাইনে কত? কি করে তোকে ওসব কিনে দেয় রে?

ফেলা বড় হয়েছে, যেন একটু গর্ব্বিত হয় মনে মনে, মুখে বলে, কেন? তোদেরওতো জামা আছে, জুতো আছে।

—তোর মতন তো নয়!

গর্ব্বিতভাবে ফেলা চুপ করে রইল—হ্যাঁ, ওরই এই বস্তির মধ্যে অবস্থা ভাল, পয়সা আছে ওদের!

একটা ঘুঁটেওয়ালীর ষোল-সতের বছরের মেয়ে একটু দূরে দিনান্তের শুকনো ঘুঁটে জড় করতে দেওয়াল থেকে খুলছিল। সে একটু হাসলে, বললে, জানিস নে তোরা? ওযে শশীদের মার বাবুদের পুষ্যিপুত্তুর হয়!

তার কথায় তার পাশের একটা মেয়ে একটু হাসলে।

ফেলা ওদের হাসি বা শ্লেষের অর্থ বুঝতে না পেরে অন্য ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি মার্ব্বেলের খেলার দলের মধ্যে মিশে গেল। সন্ধ্যের আর দেরী নেই, তারপরেই বস্তির পথ ঘোর অন্ধকার। তখন খেলা তো দূরের কথা, পথের কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই একটা ঘর থেকে ডাক এল, ফেলা, ও খোকা ঘরে আয়।

ফেলার জুতো জামার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাকাতর বালকেরা বললে, পরে ও ভদ্দরলোক হয়ে, পড়া করতে গেল, খেলবে না।

ক'বছর গেছে। ইতিমধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করে, কেউ বা আগেই, ফেলার সব সঙ্গীরা বস্তির ছেলেরা—কলে, কারখানায়, আপিসে, লোকের বাড়ীতে মজুরীতে ঢুকেছে।

ফেলা সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে তাদের পুরোনো সংশয় বাড়িয়ে দিয়ে হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে।

এ স্কুলে মাহিনা লাগে। মাহিনা দিয়ে লেখাপড়া করে ও করবে কি? বস্তির মেয়েরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ মাসী, কত মাইনে লাগে? মাসী হাসে, তার মানে, তা লাগুক। এবং এখন মাঝে মাঝে শশীর মা বলে, যা তো বাবা, ওবাড়ীর মাঠাকরুণের ঠেঁয়ে তোর ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে আয়। তেনাকে পেন্নাম করিস।

চোদ্দ পনের বছরের ফেলা গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ায়। —কিন্তু গৃহিণী চোখ তুলে না চেয়েই টাকা দিয়ে দেন বা দিতে বলে দেন। মনে তাঁর অস্বস্তির সীমা থাকে না।

মনোরমা রান্নাঘরের দরজার পাশ থেকে একদিন মাত্র দেখেছিল। আর দেখতে সাহসই করেনি, কিংবা লজ্জায়ই দেখেনি বলা যায় না। কিন্তু দুটি জননীরই যেন অস্বস্তির শেষ ছিল না।

ফেলার পড়া যেসময়ে অদৃশ্য রহস্যজগতের চাবীবন্ধ দরজা একটি একটি করে খুলে দেবার উদ্যোগ করছিল, আর এই স্কুলের সঙ্গ ও আবেষ্টন যখন ফলহরি দাসকে ভদ্র-জীবনের ভদ্রসমাজের সামনের যাত্রাপথের দুরাকাঙ্ক্ষার দিক দেখিয়ে দিচ্ছিল—এমনতর সময় ওবাড়ীর গৃহিণী বিষম অসুখে পড়লেন এবং হাওয়া বদল করতে গেলেন তার কিছুদিন পরেই। তারপর আর ফিরলেন না।

তিনি ফিরলেন না বটে, কর্ত্তা কিন্তু ফিরে এসে কিছুদিন পরেই তাঁর স্থান পূর্ণ করে নিলেন।

নতুন গৃহিণী এসে সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরলেন। নতুন বাজেটে ব্যয়সঙ্কোচ সমস্যা প্রথামত জাগল। ঝি চাকরের খাটুনির ওপর বসল ট্যাক্স, অর্থাৎ তাদের কাজ বাড়ল, লোক কমল। খরচ বাঁচল তাতে কিছু, এবং স্বভাবতঃই মনোরমার ছেলের জন্য যেখরচা সংসারে বরাদ্দ ছিল, সেটাও বাঁচানো হল। ছোটলোকের ছেলের পড়ার জন্য, বিশেষ করে ঝিয়ের বোনপোর জন্য (ছেলে হলেও বা হত!) এত শিরঃপীড়া কি জন্য, মানেই হয় না।

সংসারের হিতৈষী হিতৈষীণীরা দু'একজন ছিল, তারা বললে, ঐ রকম? তিনি কিছু বুঝে-সুজে করেন নি কখনো, করলে কলকাতায় বাড়ী হয়ে যেত!

শশীর মা বাড়ী এসে বললে, খোকা, আর পড়ো না। এবারে কাজকর্ম্ম কর।

ফেলা সবিস্ময়ে বললে, সে কি মা, আমি আর তিন বছর পড়লেই একটা পাস হয়ে ভাল কাজ পাব। ততদিন পড়ি? স্কুলে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ ভদ্রালোকের ছেলের মত তাকেও আকৃষ্ট করেছিল।

দুঃখিত ভাবে শশীর মা বললে, আমাদের ঘরে এইতেই কাজ হতে পারে। আমারি কাজ থাকে কিনা ও বাড়ীতে গিন্নী মা গিয়ে!

গিন্নীমার জন্য ফেলার দুর্ভাবনা ছিল না। সে শুধু বললে, তাহলে তোমাদের ঘরে আগে পড়িয়েছিলে কেন?

ওর চোখে জল আসে। শশীর মারও কষ্ট হয়।

পড়ার নেশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুরাশা ফেলাকে ছাড়ে না। ফেলা খুঁজে খুঁজে চাকরী নিলে।

এক চায়ের দোকানে দুবেলা বাটি-বাসন ধোয়া, চা দেওয়া, সরবৎ দেওয়া সকাল থেকে দশটা পর্য্যন্ত, বিকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত।

ইস্কুল ছাড়ার দরকার হল না।

যে জ্ঞানের কুঞ্চিকা ওর মনের চোখের সমুখে কল্প-লোকের দু একটি দরজা একটু মাত্র ফাঁক করে দিয়েছিল, এবারে ওর প্রতি একেবারে অন্ধ, নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত আবেষ্টনে চায়ের দোকানের খদ্দেরদের আলাপ-আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বেশী ওকে—ওর মনকে—ওর দুরাকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত করে তুললে।

যারা চা খেতে আসে, তারা যেন ওর মনে বায়স্কোপের মত কল্পনা জাগায়, রোমাঞ্চ জাগায়। ওরা কত রাত্রি

অবধি গল্প-আলোচনায় মজে ডুবে থাকে, মাঝে মাঝে একটা করে হাসির প্রবল উচ্ছ্বাস জেগে উঠে ফেটে পড়ে। তার পরেই ডাক আসে, ফলহরি, আর পাঁচ কাপ চা দাও শীগগীর।

রূপকথার সঙ্গে ফেলার পরিচয় নেই, কিন্তু যা যার পক্ষে অসম্ভব, তাই তো তার কাছে রূপকথা। এই রূপকথা তার সর্ব্বাঙ্গ শোনে। বাইরে প্রকাশ্যে সে শুধু চা করে, চা দিয়ে যায়, নিঃশব্দ নত মুখে। হাতাকাটা জামা পরা, সাবানকাচা ধুতি কোমরে জড়ানো, আধ-ফরসা রং, অতি সাধারণ মুখ, নীচু মুখে শুধু কাজ করে যায়, আর সর্ব্বাঙ্গ আর সব মন দিয়ে শোনে আর ভাবে ওদের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, শেলী, সুইনবার্ণ, লরেন্সের কবিতা, বাজার দর, বেকারদের কথা, স্বর্ণমান সমস্যা, নব্য রুষ, উদিত জাপান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, নূতন বিলিতি বই, ছিট্‌কে ছিট্‌কে ওর কানে আসে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে, ওর চারধারে হীরার মত, আলোর মত ঠিকরে পড়তে থাকে।

একটি কথাও দাঁড়িয়ে শোনবার জো নেই, কান পেতে শোনার ইচ্ছার সঙ্গেই হুকুম আসে, আর দু'পেয়ালা চা। আচ্ছা, দু'কাপ কোকো আরো।

সূর্য্যাস্তের সময়ের ছেঁড়া রঙীন মেঘের মত ওর মনের আকাশে ছেঁড়া কথার টুকরোর ঐশ্বর্য্য মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জমা হয়। ওর মন সে ঐশ্বর্য্য কুড়িয়ে নিতে চায় বৃথাই। এই অসম্পূর্ণ কথা শোনার ফলে বালকের অর্দ্ধেক-শোনা রূপকথার বাকী অর্দ্ধেকটা কথা নিজেই রচনা করতে চায় বৃথাই। চা কোকো পৌঁছয়। কানে আসে, ছোকরাটি কাজের আছে হে।

—হ্যাঁ বেশ চটপটে। জবাব দেয় দোকানের কেউ।

চৌবাচ্চা থেকে বালতি করে জল তোলে ও এঁটো পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুতে থাকে। তার অভিভূত বর্ত্তমান তার অনাসক্ত ভবিষ্যৎকে জানে না, চেনে না, শুধু বীজমন্ত্রের মত সে নামগুলি জপ করে। কে গোর্কি, কে শেকভ, কে জহরলাল, কে বিবেকানন্দ, ও জানে না কাককে—নামের পর নাম—মনের পথে শুধু নামের পায়ের চিহ্ন পড়ে; আর কোনও ঠিকানা জানা নেই। কঠিন উচ্চারণে অপরিচিত নাম, মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত বেশী শোনা নাম,…শুধু নামই—নামেরই লেখা পড়ে, কাপ-সসারগুলো ধুয়ে ধুয়ে চৌবাচ্চার ধারে মিলিয়ে মিলিয়ে সাজায়। মনের নামের সঙ্গে যেন হাতের কাজের ছন্দ মিলে যায়।

যখন ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় একটা চরম সীমায় এসেছে অর্থাৎ ও ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ী গিয়ে ফেলা দেখলে, শশীর মার ঘরে তার মনিববাড়ীর রাঁধুনী ঠাকরুণ এসে শুয়ে আছে।

রাঁধুনী ঠাকরাণীকে সে চিনতও না, শুনলে যে সেই।

একে পড়ার জায়গা নেই, তাতে রাত্রের ঘুম ও পড়ার নিশ্চিন্ত নীরবতাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়ে তার স্বপ্নের ধ্যানের একটি মাত্র জায়গা, ঐ ঘরে মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ মনোরমার বিছানা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ও কে?

শশীর মা বললে, ও বাড়ীর বামুন মেয়ে। জ্বরে ধুঁকছিল, ওরা সব বাড়ী বন্ধ করে হাওয়া খেতে গেছে, বললে তুমি অন্য কোন খানে যাও। কোথায় যাবে, কাঁদতে লাগল, তাই নিয়ে এলাম। বামুনের ঘরের ভদ্রলোকের মেয়ে।

অতিশয় বিরক্ত মুখে ফেলা বললে, তাতো বুঝলাম, আমি পড়ব কোথায়?

—ঐ খানেই পড়িস না! কতটুকু বা থাক বাছা ঘরে, ইস্কুলে আর কাজেই তো কাটে।

—আমি তাহলে ওখানেই শোব, ফেলা বললে।

তারপর বিরক্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

মনোরমা সব শুনতে পেলে। লজ্জায় কাঠ হয়ে আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে সে শুয়ে রইল। যতদিন বাড়ীতে পুরোনো গৃহিণী ছিলেন ততদিন ডাক দিয়ে কাজ নিতেন, আগলাতেন, দয়া করতেন। তার জন্যে তাঁর থাকত ভাবনা দায়িত্ব, মনোরমার ছিল ভয় সঙ্কোচ। বাড়ীর আশ্রিত মেয়ের মতই তার অবস্থা ছিল। নতুন গৃহিণীর তাকে আশ্রয় দিয়ে আগলাবার দরকারের কথা ভাবতে হয়নি, সেই জন্য প্রচুর অবজ্ঞা নিয়ে তাকে দেখতেন। তারপর যখন শরীর তার মাঝে মাঝে খারাপ হত তখন কর্ম্মিষ্ঠা নতুন কর্ত্রী তাকে রাখার কোন দরকারই মনে করেননি। এমনতর সময়ে মনোরমারও অসুখ হল, ওদেরও বেড়াতে যাবার কথা

উঠল ছুটিতে, তখন বন্ধ বাড়ীতে মনোরমাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কর্ত্তা প্রস্তাব করেছিলেন নিয়ে যাবার। আগের ছেলেমেয়েরাও বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ নতুন কর্ত্রী কর্ত্তার ওপর করলেন সকোপ শ্লেষাত্মক উক্তি প্রয়োগ, আর মনোরমাকে বললেন, তোমার তো রোজই অসুখ, তুমি দেশে তোমার বোনের কাছে চলে যাও, আমরা খরচ দিচ্ছি। আমার রাঁধবার লোকের দরকার নেই।

জবাবের অপেক্ষা না রেখে তিনি টাকা এনে হাতে দিলেন, উদারতা দেখিয়ে দু' এক টাকা বেশীও দিলেন। সকালের গাড়ীতে তাঁরা বিদেশ যাত্রা করলেন, বিকালের লোক্যাল ট্রেনে ওকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। বললেন, শশীর মা দেশে পৌঁছেও দেবে দরকার হলে।

বিকাল বেলার দিকে দুর্ভাবনা ক্লান্তিতে জ্বরে অভিভূত হয়ে মনোরমা শশীর মার ঘরে এসে বিছানা নিলে। ওর দেশ, ওর দিদি, ওর স্বজন, ওর আত্মীয়বন্ধু কারুকেও ওর জানা নেই। পৃথিবীতে ওর কোনও কূল বা কিনারা নেই। উত্তরাধিকারে পাওয়া কাজ—রান্নাঘর, এই ওর সব। ওর মোহ, ওর দুর্ব্বলতা, ওর ভয় আশ্রয় সমস্তই ওই বাড়ী খানিতে, আর কোথায় ও যাবে? রোগের চেয়ে ভাবনায়, অপরিমিত পৃথিবীর ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল দিনের পর দিন। ফেলার বিরক্তিসত্ত্বেও তার শীগগির সেরে ওঠবার বা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

উপরন্তু ফেলার দু'আনা এক আনা বকশিস চায়ের দোকানের মাহিনার ওপর, যেটা সে শশীর মাকে দিত, তাও সব খরচ হয় ওই রোগীর জন্য, শশীর মা চেয়ে নেয়। সুতরাং শশীর মার ওই বামুন-বোনের ওপর ফেলার বিতৃষ্ণার সীমা থাকে না।

সাত আট দিন ধৈর্য্য ধরে সে একদিন রাত্রে খাবার সময় শশীর মাকে বললে, ঘরটা জোড়া করে রেখেছ, পড়তে পাইনে, শুতে পাইনে, এগ্‌জামিন আসছে। খরচও বলছ কুলচ্ছে না, আমার হাতে খাবার পয়সাটিও নেই। ও কবে যাবে? তুমিই তো ওর খরচ জোগাচ্ছ?

শশীর মা বললে, তা কি করব, আর কে খরচ করবে, ওর নেই যখন! মানুষটা মরতে বসেছে।

—তাই বলে আমরা করব কেন? ফেলা বিরক্ত হয়ে উঠল।

এবারে শশীর মাও বিরক্ত হয়ে উঠল, তা দয়া করে করলিই বা।

—আমি করব না দয়া।

—তোর মা, তুই করবি না দয়া, আমিই সব করব? বিরক্তিতে রাগে শশীর মার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

পাতের ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে শশীর মার মুখের দিকে সে হতবুদ্ধি ভাবে চাইলে, না ঠাট্টা নয়, মিথ্যাও নয়, সত্য কথার সুর আলাদা হয়। পাতের ডাল-ভাত মাছ সব একাকার হয়ে মিশে গেল ঝাপসা চোখের সামনে। আলোর কুপীটার শিখা যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অনেক বড় হয়ে উঠল, চোখের সামনে অনেক খানি জায়গা রাঙা করে তুললে। এক নিমেষের মধ্যে বাড়ীঘর, শশীর মা, মনোরমা, তার স্কুলে পড়ার খরচ, বাল্য-সঙ্গীর ঈর্ষা, আলোচনা সমস্ত যেন সেই শিখার আগুনে ধরে উঠে ওর মনের চারদিকে আগুন জেলে দিলে। সেই আগুনের আলোয় তার উনিশ বছরের জীবন, বস্তির পারিপার্শ্বিক—অভিজ্ঞ মনের চোখের আশেপাশে কত কি লেখা কথা ফুটে উঠতে লাগল! ফেলা দেখতে পেলে না, যেন দেখতে ভরসা হল না।

ব্যাকুল হয়ে সে জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে গেল, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে, গলার কাছে কি জড় হয়ে। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়ে পারলে না। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, না, না, না, মিথ্যে কথা! তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ওতো বামুনদের মেয়ে—কথাটা গলায় আটকে গেল।

হাতের জলের গ্লাসটি ভাতের থালার ওপড় উপুড় করে দিয়ে ভাতমাখা হাতেই সে ঝাপসা চোখে উঠে দাঁড়াল। ঝর ঝর করে কয় ফোঁটা জল চোখ থেকে পড়ল, তুমি যে বলতে মা মরে গেছে! মা নেই।

ফেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবুরা তখনও দোকানের বাইরের ঘরে কথা কইছিলেন। ফেলা বিমূঢ় ভাবে ভেতরের চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌবাচ্চার পাশে বালতীর কাছে কয়েকটা চায়ের বাসন পড়ে ছিল। ধোয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। দুটো ধুয়ে রেখে ক্রমাগত মুখে আর মাথায় জল দিতে লাগল।

ছপ ছপ করে অঞ্জলি ভরে ভরে জল নিয়ে সে মুখে আর মাথায় দিতে লাগল। যেন পাগলের মত কি সব করতে যায়, ভুলে যেতে চায়, না কি ধুয়ে ফেলতে চায়! কি যে তার দরকার! মাথাতেই শুধু জল দেয়—ছপ, ছপ, ছপ!

কতক্ষণ মনে নেই।

এদিকে লাইট জ্বেলে দোকানের বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি করছ অত জল নিয়ে? আমরা দরজা দিচ্ছি।

তার চমক ভাঙল। অপ্রস্তুত মুখে কি জবাব দিতে গেল, বলতে পারল না। দরজা বন্ধ করে বাবুরা চলে গেলেন।

ফেলা ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে স্থিরভাবে ভাবনাহীন, কল্পনাহীন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেই খানেই। যেন এক পা নড়লে, সরলে, এখনি সমস্ত স্থিরতা, মূঢ়তা, শুব্ধতা, চঞ্চল হয়ে উঠে বিশ্বের প্রশ্ন করবে তাকে!

কতক্ষণ গেল। শ্রান্তিতে শীতে যখন দেহ অবসন্ন হয়ে এল, কোন রকমে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে পরে সে তার মাদুরে শুয়ে পড়ল।

মা! মৃদুস্বরে আপন মনে বলতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার তো কেউ ছিল না, সে তো জানত না চিনত না কারুকে! তাহলে?···তাহলে ওই তার—? আর একটি কথাও তার আলাদা করে ভাববার ছিল না। একসঙ্গে নাম স্থান জাত পরিচয় ··অনেক কথা মনে পড়ে, ..তারপর?

তার আগে? তাই? তার চোখ থেকে খুব আস্তে আস্তে জল পড়তে লাগল।

সকাল গেল কাজের মধ্যে। সেই শান্ত স্থির অভিভূত মনেই দুপুর গেল, বিকাল গেল, গভীর রাত্রিও কাটল।

তারপর দিন সকালে শশীর বর এল, কাজে যাবার সময়। যাওনি কেন?—যেয়ো। ওরা ভাত নিয়ে অনেক রাত অবধি বসে ছিল।

ফেলা সহজভাবে বললে, সময় পাইনি। যাব'খন।

তার শান্ত মনের তলায় অনড় অচল হয়ে মনোরমার কথা গঙ্গায় ভাসা বয়ার মত জেগে ছিল; ডুবে যায়নি, নড়েনি, সরেনি, ওর অস্তিত্বের সঙ্গে দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধা সেটা। ও আর ভাবেনি, ভাবছিল না; কিন্তু সেটা ছিলই।

রাত্রে শশীর বর খেতে ডাকতে এল। ও সহজ ভাবে খেতে গেল। হাতের খুচরা পয়সা শশীর মাকে দিয়ে এল।

৫

কদিন গেল। ফেলা কালার মত আসে, বোবার মত বসে নীরবে খেয়ে চলে যায়।

শশীর মার অস্বস্তি বাড়ে। অনেক কথা কয়। একদিন হঠাৎ বললে, আহা বামুন-মেয়েটি এখনো জ্বরে ভুগছে।

ফেলা কালার মতই চুপ করে খেয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে মনোরমা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ও দিদি, আর ব'ল না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি একটু সারলেই এখান থেকে চলে যাব, দিদির কাছে দিয়ে এস। নয়ত কোনখানে কাজ দেখে দিও, করব। আর আমার নাম ক'র না।

শশীর মা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে থেকে তারপর বলে, কেন, বললে হয়েছে কি আর? তুমিও যেমন! রোগ না দেখালে যে মরে যাবি! কেন বলব না? হাজার হোক মা তো!

বস্তি-বাসিনীর আবেষ্টন-অভ্যস্ত অনুভূতিতে মনোরমার মনের সীমাহীন লজ্জার স্পর্শ ধরা পড়ে না।

মনোরমা শ্রান্তভাবে চুপ করে যায়। আবার চোখ বুজে শুয়ে থাকে। জিভ নড়ে কি না নড়ে, সে আস্তে আস্তে আপন মনে প্রলাপের মত বিড় বিড় করে নিজের কাছেই যেন বলে, না, না, আমার লজ্জার শেষ নেই, সীমা নেই, হে ঠাকুর একি করলে?

মনের সীমাহীন সাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে; পুরাতন কাহিনীর খণ্ডচিত্র তাতে ফুটে উঠে নতুনে মিশিয়ে যায়। পুরাতন গৃহিণীর মৃত্যু, তার অসুস্থতা, বাড়ীর নতুনত্ব, তাকে এই বিষম আবর্ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। তার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। নিজের মার কথা মনে পড়ে। তিনি কত কষ্টের মধ্যে তাদের লালন করেছেন। সে? সে কি করেছে তাঁর মতন? মা! মার মতন সে কি করেছে! অনেক জননীর চিত্র এমন কি শশীর মার কথাও তার মনের চোখের সামনে ভাসে। তাদের সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ—তার আকর্ষণ, তার মধুরতা মনে পড়ে। ও বাড়ীর গৃহিণীর কথা মনে হয়,

তার ছেলেমেয়েদের যত্নের কথাও মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীরই আরও অনেক কথা, নিজের কথা, দুর্ভাগ্যের, লজ্জার কথা, তিক্ত লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে মনে হয়।

বিহ্বল ভাবে তার মনে হয়, আর নয়, এবারে হয় মৃত্যু—নয় কোনখানে, একেবারে অজানা কোন জায়গায় পালিয়ে যাবে। মৃত্যু বোধ হয় হল না, সে পালাবেই একদিন। চুপি চুপি চলে যাবে।

যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, যে সম্বন্ধের দাবী সে কোনদিন স্বীকার করেনি, আজ তাকে, অজানা নিরপরাধ সেই বালককে এই আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনবার কোন তো দরকার ছিল না; সে একদিন বিনা পরিচয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত। যাকে কিছুই দেয়নি, মর্য্যাদা, স্নেহ, পরিচয়, যত্ন, তাকে এই কষ্টের মধ্যেও রাখবে না আর। মুক্তি দেবেই। পৃথিবীর এককোণে কি আর লুকিয়ে থাকবার জায়গা মিলবে না? মনোরমা ভাবে।

সুযোগ এল দিনকতক পরে। মনোরমা তখনো তেমনি অসুস্থ। শশীর মা, শশী, তার বর, সকলে একটা বিয়ে-বাড়ীর ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে গেছে। অন্ধকার পৃথিবী। বস্তির নিরালোক জগৎকে যেন কোন্ অন্ধকারতম প্রদেশের একটা অংশ মনে হচ্ছে। মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল তার মাঝে। আস্তে আস্তে আঙিনা পার হয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

গলির শেষ প্রান্তে একটা মাঝারি রাস্তায় গ্যাসের আলো দেখা যায় মাত্র। কল্পনার চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়! বিমূঢ় ভাবে মনোরমা চাইলে। তার তখনো জ্বর সারে-নি, শরীর দুর্ব্বলই, তার সম্মুখে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, অপরিচয়। বিরাট পৃথিবী যেন এক সঙ্গে ওর দিকে ঘোমটা দেওয়া রহস্যময় বিভীষিকার মত ইঙ্গিতময় ভাবে চেয়ে রইল। মনোরমা মূঢ়ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে রইল, শশীর মার বস্তির ঘর তার কাছে পরম আশ্রয় মনে হতে লাগল। গলিতে ওদিকে পায়ের শব্দ হল। মনোরমার পা কাঁপতে লাগল, সে চুপ করে চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল, তারপর বসে পড়ল। শশীর মার কথার চেয়ে পৃথিবীকে আরও বিভীষিকা-ময় মনে হল।

ফেলা বাড়ী ফিরেছিল। মানুষ দেখে থমকে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

মনোরমা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হয়ে বসে রইল। জবাব দিতে পারলে না।

ফেলা আবার বললে, কে?

কম্পিতস্বরে এবারে মনোরমা বললে, আমি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। ফেলা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারলে যেন কে। তার মন অকারণ নিষ্ঠুর তিক্ত বিরক্তিতে ভরে উঠল। একটু থেমে নিষ্ঠুর শুষ্ক স্বরে বললে, এখানে কেন?

মনোরমা অপ্রস্তুত ভাবে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে। উঠান পার হয়ে সে রোয়াকে উঠল, ঘরের আলোতে তার কঙ্কালসার দেহকে দেখাচ্ছিল প্রেতের ছায়া। পৃথিবীর অধিবাসিনী বলে মনে হয় না। মনোরমা ঘরে ঢুকল।

ফেলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর একবার শশীর ঘরের দিকে, একবার শশীর মার ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলে। তারা কেউ নেই।

মনোরমা চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত কান্না নয়, অভিমানের, ক্ষোভের, আপনার প্রতি কারুণ্যের অশ্রু নয়; মৃতের চোখের জলের অশ্রুর মত।

ফেলা দোকানে ফিরে গেল। দোকানে তখনও লোক আছে। গল্প চলছে।

সে চায়ের বাটি, সরবতের গেলাস ধুয়ে রাখল। তারপর চুপ করে দাঁড়াল বারান্দায়, অন্য আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু বাড়ীতে তারা গেল কোথায়? মনোরমাই বা কোথায় যাচ্ছিল? হঠাৎ ফেলার বিষম ভয় হল, শশীর মা তাকে তার ঘাড়ে ফেলে চলে যাবে না তো? যায় যদি? তার পরেই মনে হল শশী দিদি তার বরশুদ্ধ যাবে কোথায়? আর যায়ই যদি, সেও পালাবে ফেলে। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডাক এল, 'ফেলা, চারটে কমলা লেবু নিয়ে এসতো।' শোনা গেল আদেশকর্ত্তা কাকে বলছেন, 'হাঁ, মার জ্বর কদিন', তারপর আবার ফেলাকে বললেন. 'এই নাও পয়সা।' পয়সা দিলেন ফেলাকে।

ফেলা পয়সা নিয়ে রাস্তায় নেবে গেল।

লেবু কিনে ফেরবার মুখে কি মনে হল, সে ফিরল। ফিরে আরও দুটো লেবু কিনে নিলে।

৬

রাত্রি অনেক হয়েছে। ফেলা লেবু দুটো নিয়ে বাড়ীর দিকে গেল। এতক্ষণে হয়ত শশী ফিরেছে, লেবু দুটো মাসীকে দিলেই হবে, সে দেবেখন ওকে।

আঙিনা যেমন তেমনই অন্ধকার। ওদের ঘরের দিকেও আলো নেই। শশীর ঘর এখনও তালাবন্ধ। দরজার কাছে গিয়ে ফেলা দাঁড়াল। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে অনেকখানি কালো ভুষোয় মোটা হয়ে সামান্য একটুখানি আগুনের মত রয়েছে। শিখাটা নিবে গেছে মনে হচ্ছে। তবু কেমন করে যেন ঘরে একটুখানি আলো রয়েছে। ফেলা উঁকি মারলে। কঙ্কাল তেমনি শুয়ে আছে, মনে হল ঘুমচ্ছে। এগিয়ে এসে সে আলোটা আস্তে আস্তে উস্কে দিলে। সেটা মিটমিট করে ওর দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরখানা আশ্চর্য্য নিস্তব্ধ।

ফেলা একটু চুপ করে দাঁড়াল। বড্ড ঘুমচ্ছে, বুকের উপর একটি হাত, আর একটি হাত পাশে, আধকাত হয়ে শুয়ে। ও চুপ করে দেখলে আজ, হ্যাঁ, খুব রোগা, খুব বিশ্রী, মৃতের মত দেখাচ্ছে।

সামান্য অল্প একটু দয়ার মত তার মনে জাগল। লেবুটা দেবে? না, ঘুম থেকে উঠে আপনি খাবে।

আনন্দ দেবার আত্মপ্রসাদের ইচ্ছা মনের কোণে থেকে উঁকি মারে, জাগিয়েই দিক না, খায় তো এখনি খাবে 'খন।

ফেলা এগিয়ে আসে। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে।

দেখতে যেন ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করে ডাকবে?……'শোনো, এই, লেবু—কমলা লেবু খাবে একটা?—' একটু থেমে আরও নীচু হয়ে—একটু জোরে বললে, 'ওঠো,—একটা খেলে ভাল লাগবে।' না—বড্ড ঘুমচ্ছে, পরেই খাবে।

সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর নিস্তব্ধ। ঘটিবাটি, বাসন, চৌকী, প্রদীপ-পিলসুজ, বাক্স-পেটরা, আবছা অন্ধকারে যেন কি রকম দেখাচ্ছে।

ফেলা ফিরে এল। কি মনে করে কেরোসিনের ডিবেটি হাতে নিয়ে মনোরমার মাথার কাছে নীচু হল। কি বিশ্রী গভীর ঘুম! এত গভীর!

আরও একটু নীচু হল, আলোটা মাথার কাছে রেখে হাতটা মাথায় রাখবার জন্য এগিয়ে এনে মাথায় না রেখে নাকের কাছে নিয়ে গেল। নিশ্বাস কই?

এবারে ফেলা কপালে হাত রাখলে। কপাল হিম, স্যাঁতা ঘরের মার্ব্বেল পাথরের মত কঠিন, ঠাণ্ডা চটচটে একটু।

কতটুকু সময়, হয়ত মিনিটখানেক পরে ফেলা উঠে দাঁড়াল। মনের ভিতর আর সমস্ত কথা কেমন মিলিয়ে গিয়ে শুধু নির্লিপ্ত ভাবে জাগছিল, হ্যাঁ, মারা গেছে, মৃত্যু হয়েছে। চুপ করে একটুখানি কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে করে ফেলা চোখ ফিরিয়ে নিলে। তার মনে হল, এই খানিকক্ষণ আগেই—হয়ত যে সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সে ভাবছিল, যদি শশীর মা তাকে ফেলে কোথাও চলে যায়! মনে হচ্ছে সেই সময়েই মারা গেছে··। ফেলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাথার কাছে কমলা লেবু দুটো নিয়ে প্রদীপটা মনোরমার শবদেহ আগলে চেয়ে জেগে রইল।

আর একদিক

মহাযুদ্ধের জন্য যে-খরচ হইয়াছে, (৪০ কোটি ডলার মুদ্রা) তৎ সাহায্যে কি কি গঠনমূলক কাজ সম্ভব হইত, নিকোলাস বাটলার সম্প্রতি তাহার একটি হিসাব করিয়াছেন। এই টাকায় একর প্রতি ১০০ ডলার মূল্যে পাঁচ একর জমি লইয়া তাহার উপর ২০০০ ডলার খরচে একটি করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সে-অট্টালিকা ১০০০ ডলারের আসবাবপত্রে সাজানো চলিত। এমন বাড়ী এতগুলি নির্ম্মাণ করা চলিত যেখানে নাকি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, আয়ার্লাণ্ড, স্কটলাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মানী ও রুশিয়া ইত্যাদি সব দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্কুলান সম্ভব হইতে পারিত। এই সকল দেশের ২০ হাজার অধিবাসীর প্রত্যেক শহরকে ৫০ লক্ষ ডলার খরচ করিয়া এক-একটি লাইব্রেরী ও দশলক্ষ ডলার খরচে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত। এই সব খরচ করিয়াও যে-সংস্থান থাকিত, তাহাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার শিক্ষকের এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার নার্সের জন্য বার্ষিক ১ হাজার ডলার বেতনের ব্যবস্থা সম্ভব হইত।

সম্পাদকীয়

বাংলা দেশের ভোটারের শিক্ষা

বাংলা দেশের ভোটারের শিক্ষা কিরূপ এ সম্বন্ধে সমগ্র দেশের ভোটারদের একত্র লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ নাই—কারণ আমাদের দেশে ভোটাররা প্রধানতঃ মুসলমান ও অ-মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অ-মুসলমানেরা প্রধানতঃ হিন্দু।

ভোটাররা সকলেই ২১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক। বাংলা দেশে শিক্ষার বিস্তার অল্পই হইয়াছে। এজন্য আমরা নিম্নে আদম-সুমারীর রিপোর্ট হইতে যাহারা ২০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত দিলাম। আমরা প্রত্যেক লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিকেই শিক্ষিত বলিয়া ধরিয়া লইতেছি।

হাজারকরা লিখন-পঠনক্ষম বা শিক্ষিতের অনুপাত

	১৯২১		১৯৩১	
	যাহাদের বয়স ২০র উপর		যাহাদের বয়স ২০র উপর	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৩১৩	৩৫	২৯২	৪৭
মুসলমান	১৪৬	৫	১৪৬	১৬

দেখা যায়, সাবালক হিন্দু পুরুষদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত শতকরা ৭ করিয়া কমিয়াছে। মুসলমান পুরুষদের মধ্যে অনুপাত সমান আছে।

যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষিত ও সাবালক অর্থাৎ ২০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক তাঁহাদের হিন্দু ও মুসলমাননির্ব্বিশেষে উপরোক্ত অঙ্কগুলির সহিত মিলাইবার জন্য অঙ্ক দিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু এরূপ অঙ্ক সহজে পাওয়া যায় না।

সমগ্র বঙ্গদেশে যাঁহারা ২০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষিতের অনুপাত গত দশ বৎসরের মধ্যে কিরূপ আছে তাহা দেখান হইল।

প্রতি ১০,০০০ দশ হাজারে ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা—

১৯২১		১৯৩১	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৩৮৮	২৪	৪৯৫	৪৬

হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে যাহারা ৫ বৎসরের উর্দ্ধ তাহাদের মধ্যে কত অনুপাত ইংরেজী-শিক্ষিত তাহাও পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে দিলাম।

প্রতি হাজারে যাহারা ইংরেজী-শিক্ষিত—

	১৯২১		১৯৩১	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৫৯	২	৬৮	৬
মুসলমান	১১	০'৩	২০	২

এক্ষণে আমরা যদি ধরিয়া লই, ভোটারদের মধ্যে শিক্ষিত বা লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বা অনুপাত সাধারণ দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত বা লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যার বা অনুপাতের অনুরূপ, তাহা হইলে ভোটারদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কত তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী ১৯২৫।২৬ সালে ও ১৯২৯ সালে দুই বারে তদন্ত করিয়াছিলেন। তদন্তের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

ইংরেজী ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে পল্লীগ্রামের ভোটারদের মধ্যে নিরক্ষরতা কত বেশী তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তিন প্রকার তদন্ত করা হয়। প্রথমে, প্রত্যেক জেলায় দুইটি করিয়া polling area বা ভোটার নির্ব্বাচনের এলাকায় বাড়ী বাড়ী তদন্ত করা হয়। দ্বিতীয়, ১৯২৬ সালে ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় তদন্ত করা হয়। তৃতীয়, ভোটের সময় যাহারা ভোট দিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে polling officer পোলিং-অফিসার দ্বারা তদন্ত করান হয়। তদন্তের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিরক্ষরতার শতকরা অনুপাত

	বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা		ভারতীয় এ্যাসেম্বলী	
	অ-মুসলমান	মুসলমান	অ-মুসলমান	মুসলমান
১ম তদন্ত	৪১	৫৫	...	...
২য় "	৪১'২	৬১'৭	...	...
৩য় "	৩৩'৪	৫২'৭	৮'৫	২৫'৫

উপরোক্ত প্রকার তদন্ত ইংরেজী ১৯২৯ সালেও করা হয়। প্রথমে যখন ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়; তৎপরে যখন ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন

হয়। এই দুই বারেই প্রত্যেক প্রিসাইডিং অফিসারকে presiding officer বলা হয় যে, আগত ভোটারদের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের নাম পড়িতে পারিবেন না তাঁহাদের নিরক্ষরের তালিকায় ফেলিবেন। ১৯২৯ সালের তদন্তের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল। ১৯২৬ সালের সহিত তুলনার সুবিধার জন্য ১৯২৯ সালের প্রথম তদন্তকে ২য়; দ্বিতীয় তদন্তকে ৩য় বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

নিরক্ষরতা শতকরা অনুপাত—(১৯২৯)

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

	অ-মুসলমান	মুসলমান
২য় তদন্ত	৩৯.৮	৫৮.৩
৩য় "	৪২.২	৫২.৪

এই তদন্তের ফল হইতে জানা যায় যে, ভোটারদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। আরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হিন্দু ভোটারদের মধ্যে নিরক্ষরতা ১৯২৬ হইতে ১৯২৯ এই ৩ বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

শতকরা নিরক্ষরতা বৃদ্ধি (ভোটারদের মধ্যে)

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

	অ-মুসলমান	মুসলমান
২য় তদন্ত	—১.৪	—৫.৪
৩য় "	+৮.৮	—০.৩

(কমি —), (বৃদ্ধি +)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য

সম্প্রতি টিচারস জার্নালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। নিম্নে আমরা উহা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আয়		ব্যয়	
(Endowment)			
এককালীন	৬৪৮,০০০ পাউণ্ড	শাসন বাবদ	৪৩০,০০০ পাউণ্ড
দান,	১২ %		৮ ০
চাঁদা প্রভৃতি	১১৭,০০০ "	শিক্ষকগণের	৩,১১১,০০০ "
	২.৩ %	মাহিয়ানা বাবদ	৬৩ ২ %
মিউনিসিপালিটী		বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির	
প্রভৃতি হইতে	৫৫৫,০০০ "	বাটী সংরক্ষণ	৫২৮,০০০ "
দান	১১.০ %	বাবদ	১৭.৪ %
সরকারী দান	১,৭৪৩,০০০ "	ফেলোশিপ ও	৮৫০,০০০ "
	৩৪.৮ %	স্কলারশিপ বাবদ	১৭.২ %
ফীস	১,১৮০,০০০ "		———— "
	২৩ ৫ %	মোট ব্যয়	৪,৯১৯,৯৭৬ "
পরীক্ষার ফী	৩৭৫,০০০ "		
ইত্যাদি	৭.৪ %		
অন্যান্য আয়	৩৯১,০০০ "		
	৭ ৮ %		
মোট	৫,০০৮,৭৭৩ "		

উপরোক্ত আয়-ব্যয় ইংরেজী ১৯৩১-৩২ সালের।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্যের পরিমাণ মাত্র শতকরা ১৪ টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশনও কিছুমাত্র সাহায্য করেন না। এমন কি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বাবদ বার্ষিক প্রায় ২৬,০০০ টাকা আদায় করিয়া লন। ট্যাক্স বাবদ যে পাওনা হয়, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে যদি প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহায়ক হয়, কলিকাতা কর্পোরেশন তাহা পরিত্যাগ করেন। এই-রূপে চিড়িয়াখানাকে বাৎসরিক ২১,০০০ টাকা দাবী ছাড়িয়া দেন। মিউজিয়ামকেও প্রায় ৩৬,০০০ টাকা দাবী ছাড়িয়া দেন। স্বরাজ্য পার্টির হস্তে কর্পোরেশন আসিবার পর কর্পোরেশনের আয় বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে—তথাপি তাঁহারা এই সামান্য ২৬,০০০ টাকার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার

মহম্মদ আলি জিন্নার ১৪ দফার ১ দফা—বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার হওয়া চাই-ই চাই। আর সে শাসন-সংস্কার যেমন তেমন হইলে চলিবে না, বাংলা বা বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে যেরূপ শাসন-সংস্কার হইবে সেইরূপ শাসন-সংস্কার চাই। দাবীটা ভাল - কিন্তু তথ্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দাবীটা আব্দার-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। বেলুচিস্থান সেন্সাস রিপোর্ট (১৯৩১ সাল) পাঠ করিয়া জানা যায় যে, স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে—খায় খেলাতের খানের রাজ্য ও লাস বেইলার জাম সাহেবের রাজ্য—মাত্র ৪৮৪ জন ইংরেজী জানেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকের স্থায়ী বাসস্থান নাই—যাযাবর জীবন যাপন করেন। ১৯৩১

সালের সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট গুল মহম্মদ লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমানে শতকরা ২৫জন যাযাবর জীবন যাপন করেন—আধা-যাযাবর জীবন যাপন করেন শতকরা ১২ জন। এই ত অবস্থা। এই ৪৮৪ জনের মধ্যে যাহারা সাবালক তাহাদের সংখ্যা আরও কম। যদি ইঁহাদের মধ্য হইতে ৭ জন মন্ত্রী করিতে হয় ও ১৪০ জন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য করিতে হয়, তবে মন্দ হয় না। আমাদের দেশের ইউনিয়ন বোর্ডের একটা বড় রকম সংস্করণ হয়।

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গশ্রী'র অন্তঃপুর বিভাগে আমরা পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। গত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তিকাখানির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন তাঁহাদের নিকট এই আলোচনাটি মূল্যবান মনে হইবে সন্দেহ নাই।

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া কেহ কেহ আমাদের একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। পুস্তিকার একাধিক স্থলে "শৈলম পাঠশালা"র উল্লেখ আছে; এই "শৈলম" কি কলিকাতার "সিমলা"র অপভ্রংশ? আমরা এ-বিষয়ে ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানাইয়াছিলাম; তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

> "ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটীর দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণীর সারমর্ম্ম সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত *Calcutta Journal* পত্রের ১১ই মার্চ্চ ১৮২২ তারিখের সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহা পাঠে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর পাওয়া যাইবে :—

"FEMALE JUVENILE SOCIETY—The Second Report of the Calcutta Female Juvenile Society ...is dated the 14th of December last,... The Society has been in operation upwards of two years and a half; ...its object is to support Bengalee female schools. Any person by contributing a permanent subscription (monthly or annual) becomes a member; the business is conducted by a President and Committee of fourteen Ladies members of the Society, including the Treasurer, two Secretaries and the Collector; and a General Meeting is held annually,... ...Seventy-six of the Society's Scholars are under the care of Female Teachers, and three only, two in Syambazar and one in Juan-bazar, are under Schoolmasters. Each of the Schools is placed under the particular care of a Member of the Committee, and is visited by her, if possible, once or twice every week, and as a mark of gratitude as well as matter of convenience, the schools (with the exception of that first formed, called the "Juvenile school") are named after the place in which the Ladies reside, who appears by recent accounts, have contributed to their support. The second is called the "Liverpool School," the third that of "Salem," and another near Chitpore established since the date of the Report, the "Birmingham School".

এই **Salem School**ই 'শৈলম পাঠশালা'।

বিখ্যাত চিত্রসমালোচকের মৃত্যু

বিখ্যাত ইংরেজ চিত্র-সমালোচক মিঃ রজার ফ্রাই-এর মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের দেশেও যাহারা চিত্র ও চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট মিঃ ফ্রাই ও মিঃ ক্লাইভ বেলের নাম সুপরিচিত। চিত্র-সমালোচনাকে অনেকেই নিছক উচ্ছ্বাস বলিয়াই ধরিয়া থাকেন। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ যে ধরণের লেখাকে চিত্রকলার সমালোচনা বলা হয় তাহাতে এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মিঃ রজার ফ্রাই-এর **Vision and Design** ও **Transformations** শীর্ষক বই দুইখানি পড়িলে এই ধারণা কতদূর ভুল তাহা বোঝা যায়। মিঃ ফ্রাই-এর লেখা অনেক সময়ে দার্শনিক আলোচনার মত দুরূহ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অস্পষ্ট বা ঝাপসা কিছুই নাই, কবিত্ব করিয়া সমালোচকের দায়িত্ব এড়াইবার প্রচেষ্টাও নাই। যে দুইটি বই-এর নাম করা হইল তাহা ছাড়া মিঃ ফ্রাই-এর আরও অনেক রচনা আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি ব্যাপক ছিল। তিনি

একদিকে যেমন ইংলণ্ডের ও হল্যাণ্ডের চিত্রকলার পরিচয় দিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই প্রাচ্য চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার আটষট্টি বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্লেড প্রফেসর অব ফাইন আর্ট' ছিলেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার লীগে প্রবেশ

সোভিয়েট রুশিয়ার লীগ অফ নেশ্যনস্-এ প্রবেশ সব দিক হইতেই একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। প্রথমতঃ, সোভিয়েট রুশিয়া বরাবরই লীগের বিরোধী ছিল এবং বরাবরই উহাকে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ভণ্ডামি বলিয়া তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে লীগের যাঁহারা পাণ্ডা তাঁহারা সোভিয়েট রুশিয়াকে এতদিন পর্য্যন্ত একঘরে করিয়া রাখিবার চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। অথচ আজ সোভিয়েট রুশিয়াকে লীগ অফ নেশ্যনসের কাউন্সিলে চিরস্থায়ী পদ দিবার আয়োজন চলিতেছে। ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জার্ম্মানীতে নাৎসি অভ্যুদয়।

হিটলারের শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মানী এবং রুশিয়া উভয়েই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তখন ফ্রান্স ও অন্যান্য রক্ষণশীল শক্তিবর্গ উভয়েরই প্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু নাৎসিদের অভ্যুদয়ের পর হইতে জার্ম্মানী কম্যুনিজম্ ও রুশিয়াকেই জার্ম্মানীর প্রধান শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে সোভিয়েট রুশিয়াকে বাধ্য হইয়া জার্ম্মানীর মহাশত্রুদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এদিকে ফ্রান্সেরও ভয় যে, জার্ম্মানী একদিন না একদিন ভের্সাই-এর সন্ধির প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। এই সম্ভাবনা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স জার্ম্মানীর সকল শত্রুকে এক দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের এই চাল ব্যর্থ হয় নাই। ফ্রান্সের নেতৃত্বে জার্ম্মানীর চারিদিকে একটি ব্যূহ রচনা হইতেছে।

নূতন সামরিক আইন

'লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলী' ও 'কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট' উভয় স্থানেই জাতীয় দল ভুক্ত সদস্যদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীদের সমান অধিকার দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান সেনাপতি বলিয়াছেন, ইংরেজ ও দেশী অফিসারদের সাম্য সম্বন্ধে আইন না থাকিলেও কার্য্যতঃ ফল একই হইবে, সামরিক নিয়মাবলীর দ্বারা ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকেও ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মতই নেতৃত্ব করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অধিকারটাকে আইন-কানুন দ্বারা পাকাপাকি করিতে এত আপত্তি কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীরা এখনও ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীর অধস্তন পদে কাজ করিতে প্রস্তুত নয়। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রলিন্সন্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,

"People here [in England] are frightened by this talk 'Indianization', and old officers say they won't send their sons out to serve under natives. I agree that the new system must be allowed to take its course, but it will require very careful watching and cannot be hurried. The only way to begin is to have certain regiments with native officers only."

ভারতীয় অফিসারদিগকে সেনাবাহিনীর একটি অংশে আবদ্ধ রাখিবার একটি কারণ যে ইংরেজ অফিসারদের জাত্যভিমান সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য অন্য সামরিক কারণও ইহার মধ্যে আছে।

দায়িত্বহীন সমালোচনা

কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটে সামরিক আইন সম্বন্ধে বিতর্কের সময়ে প্রধান সেনাপতি কোন কোন মেম্বরের যুক্তিকে দায়িত্বহীন সমালোচনা বলিয়া অভিহিত করেন এই মর্ম্মে সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে একটু বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়াতে, পরে তিনি বলেন, এই কথাটি তিনি ব্যবহার করেন নাই, এবং বিরোধী মেম্বরদিগকে দায়িত্বহীন বলিয়া তিনি মনে করেন না। স্যর ফিলিপ চেটউড ইহার দ্বারা ভদ্রতারই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরা প্রায়ই সামরিক বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের যুক্তিতর্ক ও সমালোচনাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন এবং প্রকাশ্যেও ইঙ্গিত করেন যে, যেহেতু ভারতীয় নেতারা নিজেরা যুদ্ধ করেন নাই, সেজন্য তাঁহাদের সামরিক ব্যাপারে কথা বলিবারও অধিকার নাই। এই যুক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ড হল্ডেনের

মত আইনজীবীর সমর-সচিব হইবার কি অধিকার ছিল তাহাও বিচার করিতে হয়। ইহা ছাড়া আর একটা কথাও আছে। ভারতবর্ষের লোক যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কেবল মাত্র যোগ্যতা অনুসারে সমর-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে না তাহার জন্য দায়ী কে? ভারতবর্ষের অংশবিশেষের ও শ্রেণীবিশেষের সামরিক অক্ষমতার জন্য তাঁহারা যে কতটুকু দায়ী একথা ইংরেজরা তর্কের ঝোঁকে প্রায়ই ভুলিয়া যান।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব

আগামী বৎসর জানুয়ারী মাসে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের আয়ু শতবর্ষ পূর্ণ হইবে, সেই উপলক্ষ্যে দুর্ঘটনায় আহতদিগের জন্য একটি নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে। এই আয়োজনকে সফল এবং সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বিশিষ্ট নাগরিকদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় উক্ত কমিটির সভাপতি হইয়াছেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শুধু এই নগরীর গৌরব নয়, ইহা সমগ্র এশিয়ার গৌরব। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের শত-বার্ষিকী উৎসব যে তাহার গৌরব ও মর্য্যাদা অনুযায়ীই সম্পন্ন হইবে, তাহা আমরা আশা করিতে পারি এবং তাহাতে প্রত্যেক নাগরিকের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। জনগণের কল্যাণ-অনুষ্ঠানরূপে হাসপাতালের তুল্য মহৎ প্রতিষ্ঠান আর কিছু হইতে পারে না। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই দেশের এক সম্রাট এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন এবং তিনিই প্রথম সরকারী ব্যয়ে সাধারণের জন্য আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু মানুষের জন্য নয়, পশুর জন্যও তিনিই প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ অশোকের দ্বিতীয় গিরিলিপি হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠার প্রথম জন্ম-পত্রিকা।

আমাদের দেশের হাসপাতালের সমস্যা

১৮৩৫ সালে যখন প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন দুইটি বড় সমস্যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। ১৮৩৬ সালে যখন অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তখন শব-দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য ছাত্র পাওয়া গেল না। কিন্তু একদা জগতের প্রথম শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক আমাদের দেশেই জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি সুশ্রুত সেই প্রাচীন কালে ১২৪ রকম অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মানব-দেহ-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদেরও শ্রদ্ধার বিষয়। এবং সে জ্ঞান দৈব ছিল না। কিন্তু সেদিন এদেশে বহু চেষ্টার পর দশজন ছাত্র পাওয়া গেল, যাহারা শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত হইল মাত্র। তাহাও শুষ্ক অস্থি এবং ছাগলের কঙ্কাল লইয়া। তাহার মধ্য হইতে মধুসূদন গুপ্ত নামে মাত্র একজন ছাত্র শব-ব্যবচ্ছেদে সম্মত হইলেন। যে-গৃহে শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল তুলিয়া দেওয়া হইল এবং প্রাচীরের উপর পুলিশ পাহারা বসিল। সেই ছিল প্রথম সমস্যা। সুখের বিষয় সে সমস্যার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদের আর কোনও সম্পর্ক নাই।

কিন্তু ইহার পরই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল। চারিদিকে গুজব রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য ছেলে-ধরারা ছেলে ধরিয়া হাসপাতালে লইয়া যায় এবং হাসপাতালে যে-সব রোগী চিকিৎসার জন্য যায়, শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য তাহাদেরও নাকি মারিয়া ফেলা হয়। যাহাদের জন্য হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা, সেই জনগণের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল। শুধু আমাদের দেশে নয়, য়ুরোপেও যখন প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও এই আতঙ্ক জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সহজে লোকে হাসপাতালে আসিতে চাহিত না। বহুদিনের ধৈর্য্যশীল সেবার দ্বারা এবং হাস-পাতাল-পরিচালনার দিক হইতে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিয়া, য়ুরোপ আজ সেখানকার জনসাধারণের চিত্ত হইতে এই আশঙ্কা দূর করিতে পারিয়াছে। আজ যে কোন য়ুরোপীয় অসুস্থ হইয়া নিজের ঘরে অবস্থান করা অপেক্ষা হাসপাতাল-বাসকেই অধিকতর নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে ইহা একটা সাধারণ নিয়মই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অসুস্থ হইলেই হাসপাতালে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে জন-সাধারণের চিত্ত হইতে হাসপাতাল সম্বন্ধে সেই আতঙ্ক এখনও দূরীভূত হয় নাই এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যেও হাসপাতালে আসাটা এখনও স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত;

হয় নাই। নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় না পড়িলে, সাধারণত লোকে হাসপাতালে আসিতে চায় না বা আসে না এবং অত বিলম্বে আসার দরুণ রোগীর দিক হইতে যেমন আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা কম থাকে, হাসপাতালের দিক হইতেও দায়িত্ব কম বাড়িয়া যায় না। এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আমাদের মনে হয়, এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। একশো বছরের মধ্যে জনসাধারণের চিত্ত হইতে হাসপাতাল সম্বন্ধে এই যে আশঙ্কা দূর হইল না, তাহা কতটা তাহাদের সহজাত অজ্ঞতার ফল, আর কতটাই বা বিরূপ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। দরিদ্র জনসাধারণের জন্যই হাসপাতাল। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং রোগে আমাদের দেশের জনসাধারণ যতখানি ভারাক্রান্ত এমন আর কোন দেশেই নয়। যে-আশ্বাসে লক্ষ লক্ষ লোক মুমূর্ষু অবস্থাতে মন্দিরে ছুটিয়া আসে, ঠিক সেই আশ্বাসে যেদিন তাহারা হাসপাতালে আসিবে, সেইদিন আমাদের দেশে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। এবং যাহাতে লোকে সেই ভাবে হাসপাতালে আসে সেই মনোভাব তৈরী করিবার একমাত্র দায়িত্ব তাঁহাদের যাঁহারা হাসপাতাল পরিচালনা করেন। নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া এই শতবার্ষিকী উৎসবকে চিহ্নিত করিয়া রাখার সুমহান প্রচেষ্টা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনে হয় যে, আমাদের উল্লিখিত সমস্যাটি সম্বন্ধে আরও অধিকতর ভাবে সজাগ হইবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লগ্ন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্বর্দ্ধনা

পঁচাত্তর বৎসর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় সমগ্র বঙ্গভাষা-ভাষীর পক্ষ হইতে পরম শ্রদ্ধেয় প্রবীণতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কে যথাযোগ্যভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। বহু যুগ ধরিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্য এবং বাঙালী সাহিত্যিকের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে এবং অমায়িক চরিত্র-গুণে তিনি বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের মর্য্যাদা এবং প্রতিষ্ঠাকে বাংলা এবং বাংলার বাহিরে যেখানে লোকে বাংলা ভাষায় কথা বলে, সেইখানেই সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাংলা দেশের সংবাদপত্র প্রকাশের এক রকম প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি সংবাদপত্র পরিচালনার সহিত সংযুক্ত। আজ তাঁহার এই সম্বর্দ্ধনা উৎসব উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের প্রীতি-প্রমুখ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। সুখের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পরলোকে অতুলপ্রসাদ সেন

৬৩ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার নিজ বাস-ভবনে কবি অতুলপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা দেশ এবং বাঙালী সাহিত্য-সমাজ এই সাধন-বিরল যুগে একজন সত্যকারের মানুষ এবং প্রতিভাকে হারাইল।

একটি বিরাট পরিবার যখন মৃত্যু-প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশ জনবিরল ও শূন্য হইয়া আসিতে থাকে, তখন যে দুই একজন অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের মধ্য দিয়া শুধু তাঁহাদের মৃত্যু নয়, সমস্ত পরিবারের নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার স্মৃতিটা একসঙ্গে জাগিয়া উঠে। বাংলা দেশের অবস্থা আজ মনে হয় সেই রকম হইয়া আসিতেছে। কীর্ত্তিমানদের পরিবার বাংলা দেশে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে জীবন-সংগ্রামে অশক্ত, মেরুদণ্ডহীন, রুগ্ন, অস্থির-মস্তিষ্ক এবং বিকৃত-ভাবনা এক নূতন ধরণের লোকের ভিড় বাড়িতেছে।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন বাঙালী-সমাজের শেষ কীর্ত্তিমানদের মধ্যে একজন। তাই তাঁহার মৃত্যু যেমন একদিকে একটা ব্যক্তিগত বেদনা আনিয়া দেয়, অন্যদিকে এই কথাও জাগিয়া উঠে—চিন্তায়, কর্ম্মে এবং জীবনের অভিব্যক্তিতে যাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ, বাংলা দেশে তাঁহাদের যুগ কি নিঃশেষ হইতে চলিল ?

যৌবনে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। নিজের প্রতিভায় তিনি সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব হন। নিজের শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে তিনি বিদেশে বিদেশীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন অধিকার করেন। তাঁহার গৃহ শিক্ষা, সঙ্গীত, সংস্কার এবং মৈত্রীর কেন্দ্রস্থল ছিল। বিদেশে তিনি ছিলেন বাঙ্গালী বিদগ্ধ-সমাজের এবং বাঙ্গালী সভ্যতার প্রতিনিধি।

এবং এই দিক দিয়া তিনি বাঙালীরই গৌরব-বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বাংলা দেশ এবং বাঙালীকে তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রবাসী চিত্তে স্বদেশ-বিরহ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহণ করে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সমযুগ-বর্ত্তী হওয়া সত্বেও তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে আমরা একটা স্বতন্ত্র সুর শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেই স্বতন্ত্র সুর তাঁহার সকল সঙ্গীতেই ধ্বনিয়া উঠিয়াছে - কোমল, মধুর, বিচ্ছেদ-বেদনা-বিদ্ধ! সে বেদনায় আক্রোশ নাই, অভিশাপ দিবার বাসনা নাই, এ যেন নিজের দগ্ধ অন্তরের একদিক তন্দ্রা-ঘোরে অপর দিককে সান্ত্বনা দিতেছে। তাই প্রেম-বিরহের নিঃসঙ্গ লগ্নে বাঙালীর তরুণ তরুণীর বুকে সেই সুর এবং সঙ্গীত অনায়াসে তাহার আসন পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে।

সেইখানে তাঁহার প্রবাসী চিত্ত নিজের ঘরের সন্ধান পাইয়াছে।

পরলোকে স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ গত ২৪শে ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। আগের দিন বৈকাল পর্য্যন্ত তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়। বাঙ্গলা দেশের বহু সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অকাল-তিরোধানে বাংলা দেশ হইতে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হইল।

কলেরা চিকিৎসায় নূতন পদ্ধতি

জীবাণুতত্ত্ববিদ ডাঃ এইচ ঘোষ কলেরা চিকিৎসার এক নূতন সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। যে টক্সিনে কলেরা রোগীর মৃত্যু হয়, এতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ডাঃ এইচ ঘোষ তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই টক্সিন খরগোসের দেহে ইন্জেকশন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমে তিনি তাঁহার গবেষণার ফল বিবৃত করিয়া প্যারিসের জীবাণুতত্ত্ববিদ-সম্মেলনের মুখপত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে তাঁহার আবিষ্কৃত সিরাম পরীক্ষা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায়; বহু মুমূর্ষু রোগীকে ঐ সিরাম প্রয়োগ করিয়া আরাম করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার এক অধিবেশনে বিশিষ্ট চিকিৎসক মণ্ডলীর সমক্ষে ডাঃ ঘোষ তাঁহার আবিষ্কৃত সিরামের পরীক্ষাফল বর্ণনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তার ঘোষের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, তাঁহার আবিষ্কৃত সিরামের ফলে কলেরা চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তর আসিবে। কিন্তু এই বিষয়ে আরও গবেষণা আবশ্যক। ইহা অব্যর্থ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ ঘোষ আরও পরীক্ষা করিতেছেন।

বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলা

উত্তর বাংলা এবং বিহারে বন্যা প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। বন্যা আমাদের দেশের নিত্য-সহচর হইয়া উঠিয়াছে। যদিও আমাদের কবি জোর গলায় গাহিয়াছেন, "মন্বন্তরে মরি নিকো মোরা, মারী নিয়ে ঘর করি" কিন্তু সেই গর্ব্ব লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার মেয়াদও বোধ হয় আমাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে। নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের বৈজ্ঞানিকরা নানা গবেষণা দ্বারা বন্যার এবং নদী-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিপদ্ আপদ নিবারণের পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অচিরেই হওয়া প্রয়োজন। নতুবা এই দুর্ঘটনার অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোনও উপায় নাই। এই সম্পর্কে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। অন্য প্রদেশ যখন বিপন্ন হয়, তখন বাংলা অর্থ-সামর্থ্য লইয়া সকলের আগে যে ভাবে আগাইয়া যায়, বাংলার বিপদের সময় অন্য কোনও প্রদেশ সেই ভাবে সাহায্য লইয়া অগ্রসর হয় না। অন্য দিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও বোম্বাই মাদ্রাজ বিশেষভাবে এই দিক দিয়া বাংলার কাছে ঋণী। ঐ সকল প্রদেশে ধনীলোকেরও অভাব নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাই, বিপন্ন বাংলার সাহায্যের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোনও আন্তরিক চেষ্টা নাই। অথচ তাঁহারাই আবার আশা করেন, তাঁহাদের মিলের কাপড় বাঙ্গালীরা কিনিবে এবং তাঁহাদের যখন কয়লার প্রয়োজন হইবে তখন তাঁহারা বাংলাকে ভুলিয়া আফ্রিকার দিকে চাহিবেন।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা গত মাসে সমালোচনার্থ পাইয়াছি। সমালোচনা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত সকল পুস্তকের সমালোচনা এই মাসে করা হইবে বলিয়া ভাদ্র মাসে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল স্থানাভাবে তাহা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। কার্ত্তিক সংখ্যায় বাকীগুলির সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—স ব.]

কালিদাসের পাখী—শ্রীসত্যচরণ লাহা এম এ, পি-এইচ-ডি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ৬৲

Pet Birds of Bengal Vol I, Satya Churn Law. Thacker Spink & Co.

সরস্বতী—১ম খণ্ড। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা। ৩৲

Cultural Fellowship in India, Atulananda Chakravarty. Thacker Spink & Co. Rs. 5/-

রাইকমল—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৲

নীট্‌শের বাণী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর।

তাঁর চিঠি—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস। ১॥৹

নানা প্রসঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস। ১॥৹

নারীর পথে—শ্রীপঞ্চানন সরকার। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস। ১॥৹

ছেলে ধরা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যমন্দির। ॥৹

জামাই-ই-চোর—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৭৮ কাশীপুর রোড্। ।৵৹

সুন্দরের সীমানা—সুরেশ-দিলীপ-নলিনী-শ্রীঅরবিন্দ। আর্য্য পাবলিশিং হাউস। ৸৹

রূপ ও যৌবন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। নিয়োগী নিকেতন। ॥৹

মধুচ্ছন্দা—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১।৹

আনারস—শ্রীনবজীবন ঘোষ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৲

কৃপণের দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীঅজিতশঙ্কর দে। ভারত লাইব্রেরী। ৸৹

তাই ত!—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। ।৹

রাসপুটিন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। সরস্বতী লাইব্রেরী। ৸৹

যূথপতি—শ্রীধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—অনুবাদক, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এস, সি সরকার এণ্ড সন্স। ১।৹

ঝঞ্ঝা—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১ নং গারষ্টিন প্লেস। ।৵৹

রামচরিতমানস গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ। সঙ্কলনকর্ত্তা ও অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ২৲

গান্ধীজীর আত্মকথা শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত, অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। খাদি-প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। ৫ম খণ্ড, প্রতিখণ্ড ৸৹

আমাদের জাতীয়তা উদ্বোধন ও মোহমুক্তিসাধনায় প্রতিষ্ঠা দিবস হইতেই বাংলার খাদিপ্রতিষ্ঠান যে অক্লান্ত কার্য্যকরী পরিশ্রম করিতেছেন, সময় আসিলে জাতি একদা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিবে। অধিকতর সুখের বিষয় এই যে শুধু চরখা ও খদ্দর প্রচারের মধ্যেই ইঁহাদের সাধনা আবদ্ধ থাকে নাই, দেশীয় জনগণের মনের খোরাক জোগাইবারও ব্যবস্থা ইঁহারা করিতেছেন। রামচরিতমানস ও গান্ধীজীর আত্মকথার অনুবাদ প্রকাশের মূলে এই প্রবৃত্তি যে রহিয়াছে তাহার প্রমাণ এই পুস্তকগুলির মূল্য আরও অধিক ধার্য্য হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না, জনসাধারণ এই পুস্তকগুলি পাঠ করুক প্রকাশকের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। আশা করি, এই উদ্দেশ্য সফল হইবে।

খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখিয়া আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ হয়, তাহা এই যে, ইঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণকে এক ভাবে ভাবিত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতি লইয়াই ইঁহারা কারবার করেন না। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশকে বাঁচিতে হইলে প্রদেশের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া সে বাঁচিবে না, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তাহার একাত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইবে—খাদি প্রতিষ্ঠান ইহা অনুভব করিয়াছেন। তাই বাংলার বাহিরে যে সকল গ্রন্থ বহুকাল ধরিয়া অসংখ্য লোকের মনের খোরাক জোগাইয়া আসিয়াছে খাদি প্রতিষ্ঠান সেই গুলির সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় সাধন করাইতেছেন। এই রূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা কখনই বিফল হইবেন না।

রাম-চরিত-মানস বা তুলসীদাসকৃত রামায়ণের স্থান সম্ভবতঃ গীতার নীচেই। যুগে যুগে ইহা ভারতবর্ষের অসংখ্য লোককে মনের শান্তির সন্ধান দিয়াছে, এই গ্রন্থখানিকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালী ভুল করিবে। ইহার সহিত মানসলোকে পরিচয় ঘটিলে ভারতবর্ষের হিন্দী ভাষাভাষী কোটী কোটী লোকের সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর যোগ সহজে সংসাধিত হইবে, ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনার পথ এই মিলনের দ্বারা প্রশস্ততর হইবে।

গান্ধীজীর আত্মকথাও একখানি অমূল্য গ্রন্থ, ইহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। যাহারা গুজরাটি জানেন না, ইংরেজী জানেন তাঁহারা মহাদেব দেশাই অনূদিত My Experiments with Truth পাঠে খুসী হইতে পারেন কিন্তু দাসগুপ্ত মহাশয়ের গান্ধীজীর আত্মকথা তাহা অপেক্ষাও আমাদের উপকার সাধন করিবে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

দাশগুপ্ত মহাশয়কে কি বলিয়া প্রশংসা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। তিনি যে মহাব্রতের উদযাপনে ব্যাপৃত আছেন এই দুইখানি গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা সেইপথে তিনি অনেক দূর আগাইয়াছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ বলিয়া সুসাহিত্যিক না হইয়াও যে ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সহজ সুন্দর প্রাঞ্জল হইয়া অনায়াসে সাহিত্যমর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভাল অনুবাদের কথা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া এই কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনের দরজায় এত সহজে তুলসীদাস ও গান্ধীজীকে হাজির করিয়া দিতে পারিয়াছেন। মাতৃভাষায় এই দুইখানি অমূল্যগ্রন্থ মূলগ্রন্থপাঠের সমান আনন্দ লইয়া পড়িতে পাইতেছি বলিয়া আমরা বাংলা সাহিত্যের তরফ হইতে দাসগুপ্ত মহাশয়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মানসী—শ্রীমতী আশালতা দেবী। প্রকাশক: পি. সি. সরকার এণ্ড কোং ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি উপন্যাস। লেখিকা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। রবীন্দ্রনাথ লেখিকাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, "আশার মননশক্তির মধ্যে অসাধারণতা আছে।" হয়তো আছে, কিন্তু এ বই পড়িয়া তাহা মনে হয় না। বইখানি পড়িতে পড়িতে কেবল মনে প্রশ্ন হয়, সত্যই কি এ যুগের বাঙ্গালা ছেলে ও মেয়ে সোমনাথ আর সুরমার মত? একজন 'আমেরিকান অর্গানে' রামকেলী এবং টোড়ী বাজাইতেছে, আর একজন 'হাক্সলি' পড়িয়া বিদুষী হইতেছে! বইখানি এই পিগ্‌মি-পুরুষ আর নিউরটিক মেয়েটির প্রেম-কাহিনী। লেখিকা যদি বইখানিকে কাট-ছাঁট করিয়া 'স্যাটায়ার-এ রূপান্তরিত করিতে পারেন, তবে ইহা আদৃত হইতে পারে। সহজ সুস্থ মানুষের এ বই ভাল লাগিবে না।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

গত ১১ই জুলাই এই কোম্পানীর অংশীদার ও বীমাপত্র-ধারকদের বিশেষ সভায় কোম্পানীর যে ত্রৈবার্ষিক মূল্যাবধারণ-পত্রিকা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার একখণ্ড আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯৩০ সনে যে-ত্রিবর্ষ শেষ হয়, তাহাতে কোম্পানী ১৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬ শত ৩৬ টাকার জন্য ৮৩ হাজার ৮ শত ৬৭ খানি বীমাপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, এই ত্রিবর্ষে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১৮ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত ৮৪ টাকার জন্য ৯৪ হাজার ৬ শত ৫৯ খানি বীমাপত্রে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব ত্রিবর্ষে আয়ের অঙ্ক ছিল, চাঁদা আদায়: ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬ শত ১৩ টাকা এবং সুদ, ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত ১৭ টাকা, বর্ত্তমান ত্রিবর্ষে এই টাকা বাড়িয়া চাঁদা আদায় হইয়াছে ৬ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত ৬৯ টাকা এবং সুদ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬ টাকা। দাবীর অঙ্কে দেখা যায়, গত ত্রিবর্ষে দাবীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৭ শত ৪৯ টাকা, এই ত্রিবর্ষে হইয়াছে ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ১৮ টাকা। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত ত্রিবর্ষে ব্যয়ের অনুপাত ছিল ২৩.১৯, এবারে কমিয়া ২১.৩৬ হইয়াছে। সকল দিকে বৃদ্ধির হিসাব দেখাইয়া ব্যয়ের হিসাব কমানো কৃতিত্বের পরিচায়ক। আমরা ওরিয়েণ্টালকে ভারতবর্ষের ব্যবসায়-ক্ষেত্রের গৌরব বলিয়া পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি। বর্ত্তমান মূল্যাবধারণ-পত্র আমাদের পূর্ব্বমতের সমর্থন করিতেছে।

এয়ারহুইল টায়ার

গুডইয়ার টায়ার ও রবার কোম্পানী কৃত এয়ার হুইল টায়ার প্রথমে এরোপ্লেনের জন্য নির্ম্মিত হয়। এরোপ্লেনের পথ-ঘাটের কোন ঠিকানা নাই, অতি কঠিন পাহাড় হইতে অতিরিক্ত সিক্ত জলাভূমি, যে কোনটার মধ্যে এরোপ্লেনকে চলাচলের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে এয়ারহুইল টায়ারের তুলনা ছিল না। বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকার মোটর গাড়ীর জন্য এই টায়ার উক্ত কোম্পানী প্রস্তুত করিয়াছেন। যে কোন প্রকার পুরাতন টায়ার বদলাইয়া এই টায়ার পাওয়ার ব্যবস্থাও গুডইয়ার কোম্পানী করিয়াছেন।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[শিল্পরসিক ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সৌজন্যে

বিজয়া দশমী
শিল্পী—শ্রীসুধীর সেন

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

নব্য বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ কাব্যের উদ্ভব-কাল ১৮৬০-৮০ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। মাইকেলের মেঘনাদ-বধ, বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ এই কালের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। নব্য বাংলা সাহিত্যের সূচনার কথা বলিতেছি না, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সাহিত্যের আয়োজন চলিয়াছিল; তথাপি বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরেই এবং তাহার মধ্যে একটু আকস্মিকতার আভাস আছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথমতঃ গদ্য-সাহিত্যের মত কাব্য-সাহিত্য একেবারে অকর্ষিত ও অভাবনীয় রীতি-প্রকৃতির অবস্থায় ছিল না; দ্বিতীয়তঃ কাব্যপ্রতিভা একটি দৈবী-শক্তি, সে শক্তির জন্য কবিচিত্তের জাগরণই প্রধানতঃ দায়ী; কখন কি কারণে এমন ঘটনা ঘটে তাহার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণা চলিতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, যাহাকে অনুকূল অবস্থা বলা যায় তাহা সত্ত্বেও এরূপ জাগরণ না ঘটিতে পারে। কবি-চিত্তের জাগরণও সব সময়ে সত্য ও গভীর হয় না, তজ্জন্য কাব্যসৃষ্টিতে নানা ত্রুটি থাকিয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কারণ সন্ধান যেমন দুরূহ, খাঁটি কবিপ্রতিভাও তেমনই কোনও কার্য্য-কারণ তত্ত্বের অধীন নয়। একটা যুগের সাধারণ কাব্য-প্রবৃত্তির কার্য্য-কারণ তত্ত্ব কতকটা অনুমান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রতিভার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যুগ ও কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে। একটি যুগের অন্তর্বর্ত্তী অধিকাংশ লেখকের মানস ধর্ম্ম একটা সাধারণ লক্ষণে চিহ্নিত করা হয় ত সম্ভব, কিন্তু ঐ যুগের এক বা একাধিক লেখকই যুগস্রষ্টা রূপে দেখা দেন, অপর সকলে অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তন করেন। সাধারণতঃ এইরূপ যুগনায়কের প্রতিভা ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে যুগপ্রবৃত্তি বা কালের প্রভাবকে কারণরূপে আবিষ্কার করা হয়—এরূপ কারণ কতকটা সত্য বটে, দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়াই ভাব রূপ পরিগ্রহ করে—তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ কারণনির্দ্দেশই সাহিত্যের যাহা পরম বস্তু, যাহা কবি-ব্যক্তির স্বকীয় সৃষ্টি, তাহার মূল্যনির্ণয়ে যথেষ্ট নয়। সৃষ্টিতে কার্য্য-কারণ তত্ত্ব যাহা আছে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যে বুদ্ধি বিশেষ করিয়া কাজ করে, কেবলমাত্র যদি তাহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত হয়, তবে যেমন একদিকে প্রতিভার দৈবীশক্তিকে একরূপ অস্বীকার করা হয়, তেমনই অনেক কবি-লেখকের সাহিত্য-সাধনার সম্যক মূল্য নিরূপণের প্রয়োজন থাকে না; সাধারণ যুগপ্রবৃত্তির সঙ্গে যাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রেরণার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই যাঁহারা সমসাময়িক খ্যাতিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন—তাঁহাদের পরিচয়-সাধনে বিলম্ব ঘটে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু অনেক সময়ে এই সকল বিস্মৃত ও অখ্যাত লেখককে আবিষ্কার করিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যুগধর্ম্ম ও কার্য্য-কারণ তত্ত্বের দিকেই দৃষ্টি রাখিলে চলে না—প্রতিভার যে দিব্য লক্ষণ সর্ব্বযুগেই সমান তাহার প্রতি চিত্তকে উন্মুখ রাখিতে হয়, রসবোধকেই দীপবর্ত্তিকার মত সন্তর্পণে সঙ্গে লইয়া চলিতে হয়।

*　　*　　*

আমি বলিতেছিলাম, সেকালে নব্য বাংলা কাব্যের অভ্যুদয় কতকটা আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়। ইহারও একটা কারণ দেওয়া যায়। যাঁহারা বলেন সকল কাব্যের মূলীভূত প্রেরণা বিস্ময়-রস, তাঁহাদের উক্তি অযথার্থ নয়। একটা কিছু অতিশয় অভিনব, বাহিরে হোক, ভিতরেই হোক, যখন আচম্বিতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা বিস্ময় বোধ করি। এই বিস্ময় বোধ করার শক্তি অনুসারে এবং বিস্ময়ের কারণ অনুসারে মানুষের চিত্তে যে ধরণের সাড়া জাগে তাহা হইতেই অন্তরে বিপ্লব ঘটে—যিনি রসিক তিনি-

ইহাকে রসরূপে আত্মসাৎ করেন, যিনি চিন্তাশীল তিনি এই অভিনব অভিজ্ঞতাকে পূর্ব্বধারণার সহিত সমন্বিত করিয়া নিজ চিত্তবিক্ষেপ শান্ত করিতে প্রয়াস পান। নূতন জ্ঞান ও নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে মনের ক্ষুধা যখন অপরিমেয় খাদ্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠে, তখনও সহসা সেই সম্পদ লাভ করিয়া এমন একটা উৎসাহ ও আনন্দ জন্মে যে, জ্ঞান-পিপাসার সঙ্গে কতক পরিমাণে রসোল্লাসও ঘটে। তাই গত শতাব্দীর বাংলাকাব্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, তৎকালীন কবিগণের চিত্তে রসকল্পনার সঙ্গে অধিকতর পরিমাণে নূতন জ্ঞান-সম্পদের উত্তেজনা ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছিল। ইহারই কারণে ১৮৬০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত আমরা বাংলা কাব্যে যে আকস্মিক ভাবাবেগ উৎসারিত হইতে দেখি, তাহাতে শান্ত সমাহিত রস-কল্পনা অপেক্ষা বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতামূলক প্রেরণা, নবলব্ধ জ্ঞানের উগ্র অধীরতাই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইতে দেখি। আকস্মিক বিস্ময়-বোধের যে কথা বলিয়াছি তাহাই মুখ্যতঃ এই কাব্য-প্রেরণার মূল। বাঙ্গালীর জাতিগত ভাবপ্রবণতা এই নূতন জ্ঞানের সংস্পর্শে নূতন করিয়া সাড়া দিয়াছিল—এই ভাব-প্রবণতার মধ্যে যেখানে যেটুকু কবি-প্রতিভার অবকাশ ঘটিয়াছিল সেই খানে কিছু সত্যকার কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে—নতুবা, সেকালের অধিকাংশ কবিতাই সুসম্পন্ন আকার অথবা সুন্দর বাণীমূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। নব্য সাহিত্যের সেই প্রথম যুগে আমরা দুইজন মাত্র কবির কবিশক্তির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি ; সে দুইজন—মধুসূদন ও বিহারীলাল। বাকি যে সকল কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কবিযশঃ সম্বন্ধে বা বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহাদের যথার্থ স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে এখনও সম্যক আলোচনা হয় নাই—খাঁটি রস-বিচার-পদ্ধতির প্রয়োগ এখনও হইতে পারে নাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসও যেমন এখন পর্য্যন্ত অলিখিত আছে, তেমনই আধুনিক পদ্ধতিতে রসের বিশুদ্ধ আদর্শ অনুসারে, কাব্য-সমালোচনা আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞাত।

* * *

আমাদের নব্য সাহিত্যের প্রথম যুগে কাব্য-প্রেরণার প্রকৃতি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে একটি কথা আমি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে বলি। তাহা এই যে, সে যুগ জাতীয় চেতনার এমন একটি উন্মেষ-কাল (এবং আমাদের এই জাতি এরূপ ভাবপ্রবণ) যে, তখন সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগে কাব্যের প্রভাবই প্রবল হইবার কথা। যাহার বিষয়বস্তু খাঁটি গদ্য তাহাও কাব্যের আবেগে ছন্দোময়—জ্ঞানবস্তু ও রসবস্তু তখন একাকার হইয়া গেছে—চিন্তার জটিলতাও পুলক-বিস্ময়ের আবেগে কাব্য-প্রেরণার অনুকূল হইয়াছে। মহাকবি গোটে-র একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়—

Poetry as a rule exerts the greatest influence either when a community is in its infancy, whether it be crude or only half-cultivated, or else when its culture is undergoing a transformation and it becomes alive to some new or foreign culture. It may consequently be said that the effect of novelty invariably makes itself felt.

এই উক্তির শেষের কথাটিই আমাদের নব্য সাহিত্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য—"when its culture is undergoing a transformation and it becomes alive to some new and foreign culture"—এই অবস্থাই উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যেমন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, তেমন আর কোথায়ও হইয়াছে কিনা জানি না। সেই যুগের বাংলা কাব্যের মূল প্রবৃত্তি বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে, এ কাব্যে উৎকৃষ্ট কবি-প্রেরণার সন্ধান করিবার কালে সে যুগের স্বাভাবিক মানস বিপ্লবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—কবিপ্রেরণার সঙ্গেই একটা নূতন ভাবচিন্তার বিক্ষোভ সেকালের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—ভাবের আবেগ যেমন অনিবার্য্য, তেমনই সেই সঙ্গে পুরাতন চিন্তাধারার সঙ্গে এক অতিশয় নূতন চিন্তা-প্রণালীর সংঘর্ষও অবশ্যম্ভাবী। সেকালের কবি-প্রতিভা এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত নহে—এই জন্য সর্ব্বত্র ভাবের আবেগ প্রবল হইলেও, উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

* * *

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। আমি যে অখ্যাত ও বিস্মৃতপ্রায় কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সেই যুগের

যথার্থ ধারণা অত্যাবশ্যক। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহাতে বলিয়াছি, সর্ব্বোচ্চ কবি-প্রতিভার সম্পর্কে যুগ-প্রভাবটাই প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসকে আমি মূল্যহীন বলি নাই। বরং ইহা মনে করি যে, এইরূপ ইতিহাসে কোনও যুগের যথার্থ ধারণা করিতে হইলে লোকোত্তর প্রতিভা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর লেখকগণকেই বিশেষভাবে গণনা করা উচিত—কারণ, ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির সাধারণ মনোভাব—যুগ-পরিবর্ত্তনে জাতীয় মনের উৎকণ্ঠা—এই সকল লেখকের রচনায় সমধিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এইরূপ লেখক হিসাবে যাঁহার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী সেই যুগসন্ধি-কালের প্রধান প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা এই প্রসঙ্গের অভিপ্রায়। গত যুগের বাংলা সাহিত্য আজিও ঐতিহাসিক আলোচনা অথবা রসবিচারের বিষয়ীভূত হয় নাই, তাই সেকালের লেখকগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা এখনও ঘুচে নাই। মাইকেল অথবা বিহারীলাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা বিস্মৃতি না ঘটিবার কারণ আছে, কিন্তু হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা এত কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সেকালের এমন একজন কবির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, যাঁহার রচনায় সে যুগের একটি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবোৎকণ্ঠাই নয়, খাঁটি সাহিত্যিক প্রতিভা ও ভাব-কল্পনার মৌলিকতা এত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমি মহিলা-কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলিতেছি। এই কবির সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই মনে হয়—বাংলা সাহিত্যে, বাঙ্গালীসমাজে, কবির প্রতিষ্ঠা কেবলই প্রতিভার উপরে নির্ভর করে না—কবিযশও খামখেয়ালী বিধি-বিধানের বহির্ভূত নয়। একথা বিশ্বাস করিতে মন চায় না; কারণ তাহা হইলে নাস্তিক হইতে হয়। জাতির রসবোধ ও সত্য-নির্ণয়-চেষ্টার অভাবই, এককথায় মনের আলস্য ও প্রাণের অসাড়তাই ইহার কারণ। যাহা কোনও কারণে সহসা আপনা হইতেই চলিয়া যায় তাহাই চলে—একবার রব উঠিলেই হইল যে, অমুক বড়, তারপর আর তিন পুরুষেও সে সংস্কার ঘুচে না। আমাদের সমাজে অতীতে ও বর্ত্তমানে যে সকল পুরুষ যত খাঁটি ও শুদ্ধচিত্ত, যাঁহারা যত খ্যাতিবিমুখ ও আত্মস্থ তাঁহাদের পরিচয় তত সুকঠিন। বাঙ্গালী কখনও পিছু ফিরিয়া চাহে না, সামনে যাহা পায় তাহাও তলাইয়া দেখে না, এবং ক্ষণিক ভাবোন্মাদের উপরে বিচারবুদ্ধিকে স্থান দেয় না। নীরবতা অপেক্ষা কোলাহল, আত্মপ্রত্যয় অপেক্ষা বাহিরের হাততালি, চিরন্তন অপেক্ষা সাময়িকের আরাধনা যাহারা করে, তাহাদের ইতিহাস নাই, তাহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধও নাই। এ জাতির মধ্যে সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা, যে আপনার নিভৃত সাধন-গৃহ ত্যাগ করিয়া চৌরাস্তায় মাতামাতি করে না, যে যশকে ত্যাগ করিয়া সত্য ও সুন্দরের আরাধনা করে। সাহিত্যিক যশের সম্পর্কে এই কথা হয় ত সর্ব্বাংশে ঠিক নহে—অর্থাৎ সমসাময়িক সমাজের প্রাণমনের তন্ত্রীতে যে আঘাত করিতে পারে সেই যশস্বী হয়, এবং তাহা অসঙ্গত নহে। কিন্তু চিরন্তন সাহিত্যেরও একটা মনোভূমি আছে, সেখানে যে প্রতিষ্ঠা তাহা লোকায়ত না হইতে পারে কিন্তু জাতির স্মৃতিশক্তি ও বিচার-বুদ্ধি যদি সেদিকে বিন্দুমাত্র প্রসারিত না হয়, তবে 'পূজ্যপূজাব্যতিক্রমের' যে পাপ অন্ততঃ সেই পাপেও তাহার অধোগতি অনিবার্য্য। হেম নবীনের যুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা সে যুগের একটা দিক মাত্র; যে আত্ম-প্রসাদমূলক কল্পনা সেকালের সমাজকে অতি স্থূল রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল তাহা সেকালের সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক বটে। কিন্তু যে উৎকণ্ঠা—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের মিলন ঘটাইয়া একটা ঐক্যতত্ত্বে আরোহণ করিবার যে আগ্রহ—কেবল সহজ আত্মপ্রসাদ নয়—মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার তাড়নায় যে গভীরতর আন্দোলন—সে যুগে বাঙ্গালী জাতির স্বভাবসিদ্ধ ভাব-প্রবণতার মধ্যেও সম্ভব ছিল, তাহারই প্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। বড় বড় ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসময় কাব্য হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন—আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাদের কুত্রাপি বক্তৃতার বাগ্‌ভঙ্গি ছাড়া, খাঁটি কাব্যগুণযুক্ত বাণী-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজিতে যাহাকে **gift of phrase-making** বলে, এই দুই বিখ্যাত কবির বিপুলায়তন কাব্যরাশির মধ্যে তাহার প্রমাণ এতই অল্প যে, একটিও মনে পড়ে কিনা সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের স্বল্পায়তন কাব্যকীর্ত্তির প্রসঙ্গে দুইটি গুণের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে

পারে—প্রথম, তাঁহার বাক্য-যোজনার মৌলিক ভঙ্গি এবং দ্বিতীয়, তাঁহার ভাব-চিন্তার মৌলিকতা। তথাপি তাঁহার কবিশক্তির অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে যে, ভাব ও ভাষার এমন শক্তি সত্ত্বেও তিনি হেম-নবীনের মত কাব্যরচনার প্রয়াস পাইলেন না কেন? তিনি যখন সে ধরণের কাব্য লেখেন নাই তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার সে শক্তি ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রশ্নের একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং যুগপ্রভাব এই দুই-এর সম্বন্ধে বিচারে আমরা যে তত্ত্বে উপনীত হই, মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথের কবি-কীর্ত্তির মধ্যে তাহারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ, সমসাময়িক অপর কবিগণ যে ধরণের কাব্য রচনা করিয়া যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই—ইহা নিশ্চিত; হয় ত, তাঁহার প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যই তাহার জন্য দায়ী, কিন্তু তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি গুণ বর্ত্তমান যাহা সেকালের খ্যাতনামা কবিগণের রচনায় যুক্ত হইলে, তাঁহাদের কবিকীর্ত্তি কেবল সমসাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া, পরবর্ত্তী কালের উন্নত রস-পিপাসার উপযোগী হইতে পারিত—কল্পনার সহিত সংযম, ভাবের সহিত ভাবুকতা এবং বৃথা শব্দাড়ম্বরের পরিবর্ত্তে বাক্য-রচনার গূঢ়তর রসধ্বনি ও অর্থগৌরবের সমাবেশ হইত।

* * *

বাংলার কবি-সমাজে উপেক্ষিত এই কবির সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়। আমি বাঙ্গালীর স্বভাবের একটা দোষের উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালী হুজুগপ্রিয়, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সাফল্যকে সে যেমন বরণ করিয়া লইতে উৎসুক, চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে যাহাকে বড় হইয়া উঠিতে দেখে তাহার প্রতি বাঙ্গালীর যেমন শ্রদ্ধা, তেমন আর কিছুর প্রতি নহে। কোনও কিছুর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণে একটা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ আদর্শের সন্ধান ও তাহার প্রতিষ্ঠা যেন এই অতিশয় বর্ত্তমান-সর্ব্বস্ব, বাস্তবাগীশ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জানি না, এই অর্থেই বাঙ্গালী 'আত্ম-বিস্মৃত জাতি' কিনা। কবি সুরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁহারই দোষে, তাঁহার রচনাগুলি সুপ্রকাশিত হয় নাই। প্রথমতঃ তিনি সে বিষয়ে অতিশয় নিস্পৃহ ছিলেন, তারপর যাহা কিছু প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশে কবির নাম থাকিত না। যাহাতে নাম থাকিত তাহারও অধিকাংশ অতিশয় ক্ষণজীবী পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় এবং পরে সংগৃহীত না হওয়ায় নষ্ট হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে, কবির শ্রেষ্ঠ রচনা মহিলা-কাব্য, তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাঁহারা দীর্ঘজীবীও নহেন এহেন সমাজে তাঁহাদের পরিচয় লুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রসবোধ বা রসের উচ্চ আদর্শের কথা নয়: বাঙ্গালী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—সকলেই জনরবের, বহুল প্রচারের, হুজুগের এবং ব্যক্তিগত সামাজিক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এই জন্যই আমাদের সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া নব্য সাহিত্যের ইতিহাসে, অসাধারণ প্রতিভা অথবা সাময়িক নানা অনুকূল অবস্থার সুযোগ ব্যতিরেকে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এবং এই একই কারণে, সাময়িক প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছু বড় বেশী কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। একটি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান হইতেই দিব। কবি সত্যেন্দ্রনাথের যশোভাগ্য ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—জীবিতকালে তাঁহার যে কারণে যে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত তাহা এখনও অটুট থাকিত।—অবশ্য যদি প্রতি মাসে তিনি এক এক গুচ্ছ কবিতা (সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইলেই আরো ভাল) প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া নাই ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

* * *

সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও তাহার বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। মনে রাখিতে হইবে, তখন হেম-নবীনের যুগ, মাইকেল কেবল মহাকবি নামটি মাত্র খেতাবস্বরূপ লাভ করিয়া বিদায় হইয়াছেন, কবি বিহারীলাল তখন কবিই নহেন। সেই কালে কাব্যের সেই বিষয়-গৌরব ও ভাষার বক্তৃতাত্মক ঘনঘটার যুগে আমরা এমন একটি কবিতার সাক্ষাৎ লাভ করি—

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার—
দেবরূপ দৃশ্য ধরা 'পরে।
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার
আলো-দ্বীপ আঁধার সাগরে!

ললিত লীলায় কায়
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়— যেন কোন দেব বিদ্যমান !

দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আঁধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন
জবা যেন যমুনার নীরে !
আঁধারের কালো কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান হেন,
কাল কেশে কামিনার পদ্মরাগ যেন !

কি ফুল ফুটেছে গাহা অন্ধকার বনে,
নদীপারে প্রদীপ সন্ধ্যার
প্রিয়মুখ ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশুসুত বিধবার ,
হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ
আছে মাত্র এক আশ,
যেন নরহৃদয়ের দেখায় আভাস,
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল প্রকাশ।

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে, শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায়।
আগারে বালক মেলা,
ছায়া-ধরাধরি খেলা,
হেরি' প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন
ছায়া-ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন !

১২৮৭ সালে, 'নলিনী' নামক পত্রিকায় এই কবিতাটি কাশিত হয় তারপর, ইহাকে আর কোথাও পাওয়া যায় ই। সুরেন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য এই কবিতাটির মধ্যে রিস্ফুট হইয়া আছে, অতএব আমি এই কবিতাটি একটু শ্লেষণ করিয়া দেখিব। প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার গঠন-ৗষ্ঠব—ইহাতে যে **stanza form** ব্যবহৃত হইয়াছে, াহা সেই সময়ে বাংলা কবিতায় সর্ব্বপ্রথম আমদানী হয় টে, কিন্তু আর কাহারও কবিতায় **stanza**-র এইরূপ সম্বদ্ধ ছন্দোরূপ দেখা যায় না। ইহাতেই কবির কাব্যরীতি বং কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন শব্দগ্রন্থনে, তেমনই চরণবিন্যাস ও ছন্দসুষমায় কবি ক্ল্যাসিক্যাল রীতির পক্ষপাতী। তাঁহার কবিমানস ভাবপ্রধান বা **sentimental** নয়, ভাব-অর্থের সুসংযত প্রকাশ ও সুস্পষ্ট বাণীরূপের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা আছে। ভাবের দিক দিয়া এই কবিতা কোন কোন বিষয়ে, সে যুগের অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের গূঢ়তর কবি-দৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত। সুরেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের কবিতা পাশাপাশি রাখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' কিম্বা 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা' কবিতা দুইটি অনেকেরই স্মরণ আছে। ওই দুই কবিতার ভাববস্তু একটা সুলভ উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহাতে যে ভাবুকতা আছে, তাহা আমাদের দেশে যাঁহাদিগকে স্বভাব-কবি বলা হয় তাঁহাদেরই মত। রূপসৃষ্টি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই তাহার প্রধান প্রেরণা। সুরেন্দ্রনাথের কবিতা শুধু ভাবময় নয়, তাহা চিত্রময়। বর্ত্তমান কবিতাটিতে আমরা যে ধরণের চিত্রাঙ্কণ দেখিতে পাই, তাহা ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের **picturesque**-প্রিয়তার অনুরূপ। বস্তুর বাস্তব আকারটির প্রতিই কবির দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ, সেই বাস্তব আকারের অবাস্তব-মনোহর ইঙ্গিত, তাহারই রূপ রং ও রেখা আশ্রয় করিয়া নানা উপমায় ধরা দিয়াছে। এই জাতীয় কবিদৃষ্টি অনুসন্ধান করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের যুগে আসিতে হয়—সে যুগে ইহা অনন্যসাধারণ। কবির এই রূপসন্ধানী দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তাঁহার বাণীসৃষ্টিও তেমনই যথাযথ। ভাবের উপযুক্ত বাণীরূপের আবিষ্কার, বস্তুগত রূপকে শব্দগত রূপে অনুবাদ করার যে শক্তি—যাহার মূলে আছে চোখের পিপাসা এবং তদনুসঙ্গী রসকল্পনার আবেগ—তাহাই এই কবিতাটির স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই বাংলা গীতিকাব্যে ভাব-কল্পনা ও প্রকাশরীতির একটি সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গি দেখা যাইতেছে। হেম-নবীন অথবা মধুসূদন, কেহই নব্য গীতিকবিতার ভাষা খুঁজিয়া পান নাই — বিহারীলালই সে বিষয়ে অগ্রগণ্য, ইহা আমরা জানি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সে যুগের আর একজন মাত্র কবি, যিনি এই বাণীপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাবের উপযুক্ত ভাষা যদি না জোটে, তবে কবিপ্রেরণা খুব খাঁটি বা গভীর নয় বুঝিতে হইবে। ছন্দোবদ্ধ গদ্যে কিম্বা উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতার ভাষায় যাহা রচিত হয়, তাহাতে একরূপ অবাধ ভাবপ্রেরণার পরিচয়

থাকিলেও যে কবিদৃষ্টি যথার্থ কাব্য সৃষ্টি করে সেই দৃষ্টির অভাবে সে কাব্য সুন্দর হয় না। বিষয়-গৌরব অথবা সুপ্রসর কল্পনাই কাব্যের উৎকর্ষের প্রমাণ নয়—কল্পনাকৌশল বা রসনৈপুণ্যই কাব্যের প্রাণ, এবং তাহা বিশেষভাবে বা একান্ত-ভাবে প্রকাশ পায় কাব্যের বাণীভঙ্গিতে। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের মধ্যে মধুসূদন ও বিহারীলাল ব্যতীত আর কাহারও কাব্যে এই বাণীনিষ্ঠার পরিচয় নাই। অখ্যাত ও বিস্মৃতপ্রায় কবি সুরেন্দ্রনাথই আর একজন মাত্র, যাঁহার রচনায় কাব্য-শিল্পের সেই প্রধান লক্ষণটি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এই একটিমাত্র গুণের দ্বারাই আমরা কবিকে চিনিয়া লইতে পারি—প্রতিভার ছোট বড় বিচার তার পরে। যে রূপ-পরায়ণ দৃষ্টির ফলে ভাষায় এই গুণ বর্ত্তে, তাহার প্রমাণ উপরি উদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে আছে, যথা—

ললিত লীলায় কায়
হেলে দুলে বিনা বায়
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ—
… …
দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে
… …
বদনের কাছে বাতি জননী দুলায়
খল খল হাসে শিশু তায়—
আভায় আভায় মেশে শোভায় শোভায়
হেরে মাতা স্নেহের নেশায়—
…

এ ভাষা বক্তৃতার ভাষা নয়, শব্দঝঙ্কারের ঘনঘটাই এ কাব্যের অধিষ্ঠানভূমি নয়। ইহাতে আছে কবিদৃষ্টির বস্তু-রূপ-নিষ্ঠা এবং সেই রূপকে তদনুরূপ শব্দ-যোজনা দ্বারা পাঠকেরও চক্ষু-গোচর করা। 'হেলে দুলে বিনা বায়' এবং 'চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে' যেমন বস্তু-রূপনিষ্ঠার পরিচয়, তেমনই 'আভায় আভায় মেশে শোভায় শোভায়' কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি এবং 'হেরে মাতা স্নেহের নেশায়'—ঐ 'স্নেহের নেশায়' বাক্যটি ভাব-প্রকাশক ভাষাসৃষ্টির নিদর্শন। বস্তুতঃ 'স্নেহের নেশায়' বাক্যটি যেস্থানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে উহা একটি inevitable phrase হইয়া উঠিয়াছে। কত সরল সহজ অথচ কত যথাযথ! কবিতাটির মধ্যে কয়েকটি উপমা আছে—উপমাগুলি ভাবের চিত্ররূপ, অথবা ভাবময় চিত্র। একটি দীপশিখা দেখিয়া কবিচিত্তে যে রসসঞ্চার হইয়াছে তাহারই প্রেরণায় কবি নানারূপে সে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এই দেখারও যেমন মৌলিকতা আছে, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহাও বাস্তব রূপকে অতিক্রম করে নাই; তাহা কষ্ট-কল্পনার conceit নহে। বস্তুর অন্তরালে তাহারই যে ছায়া ভাবরূপে বিরাজ করে—যে রূপ, যে রং, যে রেখা চাক্ষুষ করিতেছি, তাহারই সহিত যে আর এক সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে—কবিকল্পনা তাহাকে আবিষ্কার করিয়া, বস্তু-জগত ও ভাব-জগতের মধ্যে যে সেতু যোজনা করেন, এই কবিতাটির কল্পনামূলে কবির সেই প্রেরণা কাজ করিয়াছে। অনেক কাব্যে উপমা কবিতার অলঙ্কার মাত্র, উহা মূল কল্পনাকে পল্লবিত করিয়া তোলে, কিন্তু এই কবিতায় উপমাই মুখ্য, তাহাই উহার রস, তাহাই রূপ। তথাপি উপমাগুলি একজাতীয় নহে—আলঙ্কারিক উপমাও আছে—কিছু conceit বা কৃত্রিমতার ছাপ দুই একটিতে আছে, যেমন—'জবা যেন যমুনার নীরে'। কিন্তু—

আঁধারের কালো কায়,
তাহে অস্ত্রাঘাত প্রায়
দীপ দেখি রক্তমাথা ক্ষত-স্থান হেন।

এখানে কল্পনার আতিশয্য আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নাই। বরং এই ধরণের উপমাই কাব্যের রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির—অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় রসের—grotesque ও bizarre-এর—নিদর্শন। উহা সম্পূর্ণ modern। কল্পনার এই দুঃসাহস, অথচ অনিবার্য্যতা সুরেন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁহারই কাব্যে এক একটি মৌলিক ভাব-চিন্তা একটি মাত্র উপমায় নিঃশেষ হইয়াছে—তড়িত-চমকের মত প্রকাশ পাইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। এমন অনেক ভাব, এমনি মৌলিক কল্পনার চকিত আভাস—পরবর্ত্তী কালের কবিগণের কাব্যে এক একটি সম্পূর্ণ কবিতার আশ্রয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে

ইহার মধ্যেও আলঙ্করিকতার প্রয়াস আছে—তথাপি কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়াছে। বনের সহিত অন্ধকারের তুলনা এবং সেই বনে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র ফুলের সঙ্গে দীপ-

কান্তির সাদৃশ্য কল্পনা-চাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও, এক প্রকার সুন্দর-বোধের তৃপ্তি সাধন করে। উপমাটি আরও সুন্দর হইয়াছে ভাষার গুণে—সুরেন্দ্রনাথের ভাষার সংক্ষিপ্ত স্বল্পাক্ষর ভঙ্গি সংস্কৃত কাব্যের উৎকৃষ্ট উপমার সৌন্দর্য্যের অনুকূল। কেবল মাত্র 'অন্ধকার-বনে' এই phraseটিই উপমার সবটুকু রস ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু—

> নদীপারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
> প্রিয়মুখ ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
> যেন শিশুসুত বিধবার।

এই দুইটি পর পর দ্রুত-অনুসারী উপমায় শুধু ভাবের অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব নয়, বাস্তব-অনুভূতির যে প্রাণময়তা প্রকাশ পাইয়াছে—বিশেষতঃ যেন "শিশুসুত বিধবার" এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে যে বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার পরিচয় আছে—সে যুগের সেই সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসময় কবিত্বের দিনে তাহা সচরাচর মিলিত না। অথবা মিলিলেও তাহা প্রকাশ-কৌশলের অভাবে কাব্যশ্রী লাভ করে নাই। বিপুল অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, সে কেমন?—"যেন শিশুসুত বিধবার!" কেবল বিধবার এক মাত্র পুত্র নয়—শিশুসুত! দুই তিনটি মাত্র শব্দেই সবটুকু অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার অধিক আর একটিমাত্র শব্দ থাকিলেও যেন উপমাটি এমন অর্থপূর্ণ হইত না। এই উপমা দুটির প্রথমটি ভাবপ্রধান, দ্বিতীয়টি বাস্তব অনুভূতিপ্রধান। কিন্তু দুইটিই পাশাপাশি বিদ্যমান। শেষেরটি খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল; যাহা প্রত্যক্ষ, সুপরিচিত ও লোকায়ত, যাহা ব্যক্তিগত কল্পনাবৃত্তির আশ্রয় নহে—যাহা চিরযুগের সাধারণ মানবপ্রকৃতি ও মানবভাগ্যের অভিজ্ঞতা-মূলক, তাহাকেই যদি ক্ল্যাসিক্যাল বলা যায়, তবে সুরেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি ক্ল্যাসিক্যাল, ইহাই তাঁহার প্রবলতর প্রবৃত্তি। উপরি উক্ত উপমাটি তাহারই নিদর্শন। এখানে যে অভিজ্ঞতা কবিকল্পনার আশ্রয় হইয়াছে, তাহা মানুষ মাত্রেরই সুপরিচিত, এ জন্য এরূপ রসসংবেদনার কোনও বাধা নাই, হৃদয়তন্ত্রী সহজেই বাজিয়া উঠে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের এই পংক্তি কয়টিও এই জাতীয় কাব্যের দৃষ্টান্তস্থল। মেঘনাদ হত হইলে, কৈলাসে ধূর্জ্জটি রাবণের অবস্থা স্মরণ করিয়া হৈমবতীকে বলিতেছেন—

> এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে
> ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
> পুত্রশোক! চিরস্থায়ী হায় সে বেদনা—
> সর্ব্বহর কাল তারে না পারে হরিতে।

এখানে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনহৃদয়বেদ্য, স্থান, কাল ও পাত্রের সংযোগে এই অতিসাধারণ ভাববস্তু অপূর্ব্ব রসকল্পনায় মণ্ডিত হইয়াছে; স্বয়ং মহাকালের দ্বারা তাঁহার করধৃত ত্রিশূলের আঘাতের সহিত উপমিত হইয়া, মানুষের সন্তানবিয়োগ-যাতনা যেমন ভীষণতা লাভ করিয়াছে, তেমনই তাহা ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মহাকাব্যের উপযুক্ত উপমাই বটে। এই Epic সুর অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের উপমায় নাই, থাকিতে পারে না; তথাপি কল্পনার যে ক্ল্যাসিক্যাল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায় তাহাই প্রবল। কিন্তু এই বাস্তবানুভূতি ও তজ্জনিত ভাবুকতাই কিছু অতিরিক্ত হওয়ায় কল্পনা অপেক্ষা চিন্তার দিকেই কবি-মানসের পক্ষপাত দেখা যায়, এই জন্যই কবিতাটির শেষের কয় ছত্রে যে ভাবুকতার ভঙ্গি আছে, তাহা খাঁটি কাব্যরসের উপাদান নহে—ভাব অপেক্ষা ভাবনা, কল্পনা অপেক্ষা জল্পনা এবং রাগ অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রাধান্যই তাহাতে বেশী, তথাপি 'ছায়াধরাধরি খেলা' এই একটি phrase লেখকের কবিশক্তির পরিচয় দিতেছে। অব্যর্থ শব্দযোজনার যে কবিশক্তি, যে শক্তির অভাব ঘটিলে কবি বাণীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত আছেন বুঝিতে হইবে, সুরেন্দ্র-নাথের রচনায় মৌলিক ভাবসম্পদের সঙ্গে সেই শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব, তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিচারকালে সে প্রতিভার সম্যকস্ফূর্ত্তির বাধার কথাও বলিব। পরিচয়ের প্রথম অবসরে, আমি একটা কথা বিশেষ করিয়া বার বার উল্লেখ করিতেছি, তাহা এই যে, সে যুগের কবিসমাজে এমন একজন কবির স্থাননির্দ্দেশ হয় নাই, নব্য বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, সেকালের অক্ষম, অপটু পদ্যরচয়িতাদের কবিতারণ্যে যাঁহার রচনা, ভাব ও ভাষার দুর্ল্লভ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তি পাইতেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথের রচনা কেবল সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা হইতেই নয়—নব্য বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট ও সবল ভঙ্গিরূপে সাহিত্য হিসাবেও

মূল্যবান। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যচর্চ্চায় আমরা সে যুগের একটি অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তির পরিচয় যেমন পাই এবং সে হিসাবে তাহা যেমন অনুধাবনযোগ্য, তেমনই তাঁহার কবিতায় দেশী বিদেশী উভয়বিধ পুরাতন কাব্যরীতির পক্ষপাতী কবিমানস, এবং সেই সঙ্গে সেকালের বাংলা গীতিকাব্যে, কবিকল্পনার সঙ্গে বাহিরের বস্তুজগতের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে যে গূঢ়তর ভাব-চিন্তা ও তদনুযায়ী নূতন ভাষানির্ম্মাণের স্বাভাবিক প্রেরণা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিহারীলালের ধ্যান-প্রকৃতি খাঁটি লিরিকের ভাষা ও সুর ধরাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, এই তিনজনেরই কবিপ্রেরণা ও বাণী-রচনায় বিহারীলালের ভাষা ও সুর এবং কল্পনাভঙ্গি যে অন্ততঃ একটা আদর্শরূপেও পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই হিসাবে বিহারীলালকেই নব্য গীতিকবিতার শুকতারা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে গীতিকল্পনার সেই রসাবেশ নাই—সেই subjective বা অন্তর্ম্মুখী ভাবসাধনার আবেগ তাহাতে নাই। তাঁহার কবিতার সর্ব্ববিধ আবেগ ধ্যান-কল্পনা অপেক্ষা ভাবুকতার দ্বারা, বস্তুগত দৃষ্টি বা বাস্তব অভিজ্ঞতার শাসনে অতিশয় সংযত। হেম-নবীনের কল্পনার রোমাণ্টিক প্রবৃত্তি, কাব্য-রস অপেক্ষা বিষয়-গৌরব, সৌন্দর্য্য অপেক্ষা নৈতিক আদর্শের দিকে অধিক ঝুঁকিয়াছিল—কাব্যের অভিপ্রায় ক্ল্যাসিক্যাল হইলেও কল্পনার সেই সংযম ছিল না, অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, রসসৃষ্টি অপেক্ষা বক্তৃতার আবেগ—অধিক হওয়ায় তাঁহাদের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তথাপি যে ধরণের কাব্য সে যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে উপাদেয় ছিল, তাঁহারা তাহা রচনা করিয়া কবিযশের অধিকারী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল বা হেম-নবীন, এই দুয়ের কোনও পক্ষেরই সমকক্ষ ছিলেন না। অতিশয় সুস্থ ও সবল চেতনা, তীক্ষ্ণ বস্তুগত দৃষ্টি, ঐকান্তিক সহানুভূতি, সূক্ষ্মবিচার এবং অতিশয় সহজ রসাবেশ—এই সকলের সমবায়ে তাঁহার কবি-প্রকৃতি এমন একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, যাহাতে সহজেই তাঁহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। মনে হয়, বাঙ্গালীর প্রতিভার যে আর একটি লক্ষণ আছে—কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই নয়, প্রখর ভাবুকতা; কল্পনাবিলাস নয়, অতিজাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তি, বাস্তব চেতনাপ্রসূত রসবোধ, সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভায় তাহারই এক অভিনব উন্মেষ ঘটিয়াছে। আমি যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া কবি-পরিচয় আরম্ভ করিয়াছি তাহা সুরেন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গি ও প্রকাশ-কৌশলের একটি সুন্দর নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, রসিক পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কোন্ ধরণের কবিপ্রেরণা আছে। ভূমিকা স্বরূপ এই আলোচনার পরে আমি অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার কিঞ্চিৎ ইতিহাস এবং তাঁহার কবিশক্তির কথঞ্চিৎ বিস্তৃত পরিচয় দিবার মানস করিয়াছি।

আলোচনা

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক'-রচয়িতা পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

গত ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের লেখক পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের পরিচয়প্রসঙ্গে দুই চারি কথা লিখিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সেকালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে অনুসন্ধান করিলে এখনও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। সম্প্রতি পুরাতন সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কুড়ি বৎসর যোগ্যতার সহিত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির কাজ করিবার পর শেষে শান্তিপুরের নিকট সুখ-সাগরের মুন্সিফ হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ সনের ৮ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ :—

"পরম্পরা শুনিতেছি যে সুখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত আছে ঐ মুন্সেফ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির সুপ্রেণ্টণ্ডেটী কার্য্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া তদুভয় সভায় সেক্রেটারি ও মেম্বর ও প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পাত্র হইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজারঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ আমারদিগের লিখা আবশ্যক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্সেফের সচ্চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত হইলে এদেশীয় প্রাড্‌বিবাকবর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চেখভের ডার্লিং

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

অসম্ভবের করি না সাধনা, চাহি না নিত্যপ্রেম,
ততটুকু মোরে ভালবাস তুমি, যতটুকু থাকি কাছে,
যত দূরে যাই ততখানি যেয়ো ভুলে।
জানি, বিদায়ের কালে
তোমার চোখের ছল-ছল-করা জলের অন্তরালে
লুকাইয়া আছে, থাকিবে লুকায়ে, তুমি না জানিতে পার—
প্রেমের পীড়ন হইতে তোমার মুক্তির হাসিখানি ;
উঠিবে শিহরি ভাবিতেও সেই কথা,
সেই হাসি তবু জাগিবে সত্য হয়ে।

যুগে যুগে এই মাটির ধরণী সাধিয়াছে জনে জনে,
করিয়াছে পূজা লাখো মন্বন্তরে
লক্ষ মনুরে, মনু-সন্তান লাখো লাখো মানবেরে ;
স্মৃতির বেদীতে অমর করিয়া পূজা করি বহুদিন
বিস্মৃতিজলে শেষে ফেলিয়াছে টানি।
চেখভের ডার্লিং—
পূজিতে একেরে একের পূজাই ভেবেছে সত্য বলি,
ভেবেছে, তাহাই সত্য নিত্যকাল।
এক চলে গেছে, অপরে আসিয়া লইয়াছে তার পূজা,
একেরে ভুলিতে এক নিমিষেরও লাগেনি অধিক কাল,
কারো পূজা তার মাটির জীবনে হয়নি মিথ্যা কভু,
কারো স্মৃতি তার হয়নি মনের ভার—
প্রেমের এ ইতিহাস!

মাটির ধরার তুমিও তুলালী মেয়ে,
তুমিও মাটির মেয়ে—
এই ধরণীর মাটির রক্ত করিয়া অতিক্রম
পারো না হইতে পাথর-কন্যা শিবানী হৈমবতী!
জীবনে যে স্বামী, মৃত্যুতে তার ছাই-মাখা কাঁধে চড়ি
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডে খণ্ডে পড় নাই পীঠে পীঠে।
এক হও নাই বহু—
বহুরে মিলায়ে এক করিতেছ দেহ-পাদপীঠতলে।

আমি সে বহুর এক—
দেহবেদী'পরে চাপিয়া বসেছি নিত্যদেবতারূপে,
গুরু গুরু বুকে বিসর্জ্জনের শুনিতেছি জয়-ঢাক,
নূতন দেবতা আসিতেছে পায়ে পায়ে,
বিদায় আমার আসন্ন হ'ল দেবী।

বিদায় আমার আসন্ন হ'ল, ক্ষোভ নাহি করি তবু,
জেনেছি সত্য মাটির জগতে ক্ষণিকের ভালবাসা,
তোমরা মাটির মেয়ে—
এক বরষার প্রণয়-প্লাবনে পলি-পড়া বালুতটে
ফোটে যে কুসুম, আর বরষায় ভেসে যায় স্রোতোমুখে।
নূতন করিয়া পলিপড়া বালুচরে
ফোটে যে নূতন ফুল।

যে ফুল ফুটিবে তাহারি গন্ধে ভরিয়া উঠিছে দিক ;
স্রোতে-ভেসে-পড়া শুষ্ক ফুলের কাঁপিতেছে প্রাণমন,
নূতন ফুলেতে পুরানো দেবীর পূজা—
পেতেছি আভাস তার।
আভাস পেতেছি, সে ফুলও শুকাবে ভাসিয়া কালের স্রোতে
জমিবে আসিয়া মৃত কুসুমের ভিড়ে-
তারি অভিনন্দন।

তাই বলে তব প্রেম কি সত্য নয়?
না হয়, নিত্য নহে।
বিদায়-বেলার ছলছল জল ইঙ্গিতভরা চোখে
প্রেম বেদনায় আসে নাই তব মর্ম্ম মথিত করি?
তোমার ওষ্ঠপুটে,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে না তব গূঢ় হৃদয়ের কথা?
পরম সত্য তাহা।
পরম সত্য—আজি নিশিশেষে সে কথা যাইবে ভুলি,
আকাশের তারা মুছে যায় যথা প্রভাতে অরুণোদয়ে—
মুছে যায় তবু এক ঠাঁই রয় স্থির।

প্রেয়সী, তোমার ক্ষণিকের এই প্রণয়ের ধূপধূমে
নিত্য হয়েছে প্রেম-দেবতার পূজা।
নেশা তো ছুটিয়া যায়,
তাই বলে নেশা যতখন থাকে নহেক মিথ্যা কিছু।
বিদায়-বেলার আঁখিজল আর ছলছল ইঙ্গিত
করুক রচনা প্রেম-বাঁধনের মুক্তির ইতিহাস,
বিদায় হইলে শেষ।

আজি ক্ষণকাল ম্লান বিদায়ের ক্ষণে,
তোমার আমার প্রেমবন্ধন উঠুক নিত্য হয়ে,
সত্য হউক ক্ষণিকের মায়াজাল।
আমি ভুল করে ভাবি—
তোমার অভাবে দিনগুলি মোর থমকি দাঁড়াবে থামি,
আঁধার হইবে দিনের রৌদ্র মম।
তুমিও আবেগে বুকে এসে মোর, বল হাত দুটি ধরি',
আমি চলে গেলে চলিবে না তব দিন,
শরীরে আমার বলিবে যত্ন নিতে,
রাত জেগে জেগে কবিতা না যেন লিখি,
বেশী ঝাল যেন লোভে পড়ে নাহি খাই—
আরও সে অনেক কথা।
বলিতে বলিতে চোখ দুটি তব আসিবে আয়ত হয়ে,
উপচি পড়িবে জল,
আমিও তোমারে বুকে টেনে নিয়ে দুটো বেশী খাব চুমা।

তারপর তুমি আবছা দেখিবে, দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে,
জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চলে যায় ভেসে,
ভেসে চলে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।
দেখিতে পাবে না সে কথাও ভুলে দেখিবে আরেক জনে,
নদীস্রোত হতে মুখ ফিরাইবে যবে,
আমারে ভাবিয়া তারে নিয়ে গিয়ে ঘরে
পরম সোহাগে জড়াবে বুকেতে তারে,
চেখভের ডার্লিং!
যুগে যুগে ধরা এই করিয়াছে, তোমরা মাটির মেয়ে,
ধান্য সরিষা আলুর ফসল ফলিছে মাটির বুকে,
ফলিছে আগাছা সুখে,
মাটির রসেতে সমান সবুজ সবে।

পাথর-কন্যা সতীরে লইয়া কাঁধে
শিব শুধু ফেরে শ্মশানে শ্মশানে নাচিয়া তাথৈ থৈ,
ধরা টলে তার টলমল পদভরে।

তোমরা সহজ, নিজেদেরে নাহি চেন,
চেখভেরা শুধু তোমাদের চিনে গভীর করুণাভরে,
লিখে রেখে যায় কালের বক্ষে তোমাদের ইতিকথা।

বল বল প্রিয়ে, হাসিকান্নায় গাঁথা বিদায়ের কথা,
কর নাখো অনুযোগ—
শুনিতে এসেছি, শুনিব তা ভালবেসে,
শুনিব, আমারে ভুলিবে না তুমি কাছ হতে দূরে গেলে,
বুঝিব, ভুলিবে কালই!
তা বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়া ললাটে খাব না চুমা?
কান হতে তব সরায়ে সরায়ে এলোমেলো চুলগুলি,
কপোলে কেন না বুলাইব হাতখানি?
বুলাইব হাত, ভাবিব নির্ব্বিকারে,
আরও কতদিন থাকিবে না জানি চিঠি লিখিবার পালা।

শ্মশান-বিলাসী শিব,
কাঁধ হতে মৃত সতীরে ফেলিয়া দাও!

চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন

—শ্রীকিরণকুমার রায়

উত্তর-ফাল্গুনী

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে বিদেহের রাজধানী বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কুণ্ডগ্রামে ক্ষত্রিয় অধিপতি সিদ্ধার্থের গৃহে মহাবীরের জন্ম হয়। জৈন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে আছে: রাত্রি তখন গভীর, চাঁদ তখন উত্তর-ফাল্গুনীতে। এই উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রই মহাবীরের জীবনের গতি-নির্দ্ধারক। গর্ভাপহার, জন্ম, সন্ন্যাস ও কেবল লাভ সমস্তই তাঁহার এই নক্ষত্রে। নির্ব্বাণ স্বাতি নক্ষত্রে। রাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত, অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলা স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার গর্ভে চতুর্দ্দশ মঙ্গল-দ্রব্য প্রবেশ করিতেছে……কুঞ্জর, বৃষ, সিংহ, শ্রী, পুষ্পমাল্য, শশী, সূর্য্য, ধ্বজা, রজতপূর্ণ কলস, পদ্মসর, ক্ষীরোদ-সাগর, বিমান, রত্ননিকররাশি ও নির্ধূম অগ্নিশিখা।

এই স্বপ্নকে চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন বলা হয়।

পাবা পুরী: মহাবীরের নির্ব্বাণ-ভূমি।

জৈন-কাল-বিভাগ

জৈনশাস্ত্রে কালকে একটি বলয়াকার চক্রের মত বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই বৃত্তের একটি আবর্ত্তকে কালের এক অংশ এবং প্রত্যাবর্ত্তনকে আর এক অংশ বলা হয়। ঠিক সঙ্গীতের আরোহ-অবরোহের মত। আরোহ হইতেছে উন্নতিকাল, ইহাকে উৎসর্পিণী বলা হয়, অবরোহ অবনতি, ইহাকে অবসর্পিণী বলা হয়। উৎসর্পিণীর আবার ছয়টি কালবিভাগ। ইহার প্রারম্ভে পৃথিবীর সকল জীবের চরম দুঃখের অবস্থা—শাস্ত্রে বলে দুঃখ-দুঃখ অবস্থা; তারপর সামান্য উন্নতি, কেবল দুঃখ, অতঃপর দুঃখ-সুখ; সুখ-দুঃখ, সুখ এবং সুখ-সুখের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আসে।

আমাদের এ যুগ কিন্তু অবসর্পিণীর যুগ, ইহার প্রারম্ভে ছিল, সুখ-সুখের অবস্থা। সে সময়ে কল্পবৃক্ষ ছিল। মানুষের

সকল প্রয়োজন এই কল্পবৃক্ষ মিটাইতেন। জন্ম-মৃত্যুরও তখন ব্যবস্থা ছিল অন্য প্রকার। এই সুখ-সুখের অবস্থা কাটিয়া ক্রমে সুখ, সুখ-দুঃখ, দুঃখ-সুখের যুগ গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ হইতেছে দুঃখের যুগ। মহাবীরের নির্ব্বাণের সাড়ে তিন বৎসর পর হইতে এ যুগের আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কাল ২১০০০ বৎসর। এ যুগের কেহই এক জীবনে

পঞ্চম তীর্থঙ্কর সুমতিনাথ।

মোক্ষলাভ করিতে পারিবে না। ইহার পরের যুগ হইতেছে দুঃখ-দুঃখের। তখন পৃথিবীর অবস্থা চরম হইবে।

তীর্থঙ্কর

জৈন মতে এই প্রত্যেক কালবৃত্তে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আগমন হয়। দুঃখ-দুঃখ ও দুঃখ-যুগে কোনও তীর্থঙ্করের আগমন-সম্ভাবনা নাই। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব সুখ-দুঃখের যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আরও তেইশ জন তীর্থঙ্করের জন্মলাভ ও নির্ব্বাণ হইয়াছে। সর্ব্বশেষ মহাবীর। এই তীর্থঙ্করদের প্রত্যেকের এক একটি লাঞ্ছন আছে। আদিনাথ বা ঋষভ দেবের ছিল বৃষভ। অজিতনাথের হস্তী। সম্ভবনাথের অশ্ব। অভিনন্দনের কপি। সুমতিনাথের ক্রৌঞ্চ বা চক্রবাক। পদ্মপ্রভের পদ্ম। সুপার্শ্বনাথের স্বস্তিক। চন্দ্রপ্রভের চন্দ্র। সুবিধিনাথের মকর। শীতলানাথের শ্রীবৎস চিহ্ন, মতান্তরে কল্পবৃক্ষ। শ্রেয়াংশনাথের গণ্ডার কিংবা গরুড়। বসুপূজ্যের মহিষ। বিমলানাথের বরাহ। অনন্তনাথের শ্যেন বা ভল্লুক। ধর্ম্মনাথের বজ্র। শান্তিনাথের মৃগ। কুন্থনাথের ছাগ। অরনাথের নন্দ্যাবর্ত্ত, মতান্তরে মীন। মল্লিনাথের কুম্ভ। ইনি একমাত্র স্ত্রী-তীর্থঙ্কর কিন্তু দিগম্বরীরা স্ত্রীলোক মোক্ষলাভ করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাঁহারা ইহাকে পুরুষই বলেন। মুনিসুব্রতের কূর্ম্ম। নমীনাথের নীলোৎপল। নেমিনাথের শঙ্খ। পার্শ্বনাথের সর্প। মহাবীরের সিংহ।

তীর্থঙ্করদের এই চিহ্নগুলির মূল্য আছে। আমরা দেখিব, পার্শ্বনাথের জীবনে সর্প এক বিশেষ মঙ্গল সাধন করে। সম্ভবতঃ অপরাপর তীর্থঙ্করদের জীবনেও তাঁহাদের চিহ্নের কোন শুভাত্মক ফল ফলিয়াছে। এ সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্নের পাঁচটি এই তীর্থঙ্করদের চিহ্নগুলির মধ্যে মেলে। যথা, হস্তী, বৃষ, সিংহ, চন্দ্র, কুম্ভ। এই চিহ্নগুলির সহিত চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্নের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

প্রত্যেক তীর্থঙ্কর-জননীই তীর্থঙ্কর গর্ভে আসিবার প্রাক্কালে স্বপ্ন দেখেন, চতুর্দ্দশ মঙ্গল-দ্রব্য তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অধিকাংশ জৈন মন্দিরে এই মঙ্গল-দ্রব্যগুলির রৌপ্য প্রতিকৃতি আছে।

কোন কোন মন্দিরে পয্যুসনে এই চতুর্দ্দশ মঙ্গল দ্রব্যকে নীলামে চড়ান হয়।

পর্য্যুষণ

পয্যুসন (পর্য্যুষণ) জৈন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী হইতে শুক্লা পঞ্চমী, সাধারণতঃ এই আট দিন পর্য্যষণের অনুষ্ঠানকাল। প্রারম্ভে এই উৎসব

কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদের দ্বারা আচরিত হইত। কালক্রমে সংসারীরাও সাধুদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে জৈন সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা কর্তৃক এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন।

যে সময়ে এই উৎসবের সূচনা, তখন সাধুরা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই পারিব্রাজক জীবন যাপন করিতেন। জৈন যতি 'অণগার,' অর্থাৎ গৃহহীন, পথবাসী। তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামে পদব্রজে ফিরিতে হয়। ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কোন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান তাঁহার নিষেধ। কিন্তু বর্ষাকালের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। বর্ষায় পথ চলিলে প্রাণিজীবন ও উদ্ভিদজীবনের হানির আশঙ্কা অধিক, তাই বর্ষার চারি মাস সাধুদের একস্থানে থাকিবার জন্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন এক স্থানে একাধিক বৎসর বর্ষাবাস চলিবে না। অন্ততঃ পক্ষে তিন বৎসর না কাটিলে যে গ্রামে কোন যতি এক বর্ষা যাপন করিয়াছেন, সে-গ্রামে তাঁহার পুনর্ব্বার পদার্পণ পর্য্যন্ত নিষেধ। পাছে কোন গ্রামের প্রতি সাধুর পক্ষপাতসূচক অনুরাগ হয়, তাই এই ব্যবস্থা। কেননা, সাধু 'নির্গ্রন্থ' : কোন প্রকার 'গ্রন্থি'র বন্ধন তাঁহার থাকিলে চলিবে না।

প্রারম্ভে এই বর্ষাকালই পর্য্যুষণের পক্ষে উপযুক্ত সময় হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ বিরামকালই পূজানুষ্ঠানের জন্য প্রশস্ত বিবেচিত হইত। ভ্রাম্যমাণ যতি ও সাধু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যুষণের জন্য যে-সময় সেদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও তদনুযায়ীই উৎসব নিষ্পন্ন হয়। সে সময়ে সাধুদের বর্ষাবাসের নিমিত্ত গ্রামান্তদেশে উপাশ্রয় বা বিরাম-গৃহ ছিল। সেখানে সাধুরা সমবেত হইয়া পর্য্যুষণানুষ্ঠান করিতেন। সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য নির্ম্মিত উপাশ্রয় বা মঠ আজও এই উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধুরা সকলে সেখানে মিলিত হন, গৃহীরা তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে যান।

প্রতিক্রমণ

পর্য্যুষণ শব্দের অর্থ হইতেছে পরিপূর্ণ সেবা। সেবা বোধকরি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব সাঙ্গ হইলে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকল জৈনই সকলের নিকট এক বৎসরের যাবতীয় অন্যায়ের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন। ইহাকে সম্বৎসরী-প্রতিক্রমণ বলা হয়। অনেকটা হিন্দুদের বিজয়া দশমীর অভিবাদন, আলিঙ্গন, প্রণাম, নমস্কারের মত। প্রতিক্রমণান্তে দূরদেশে

চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন।
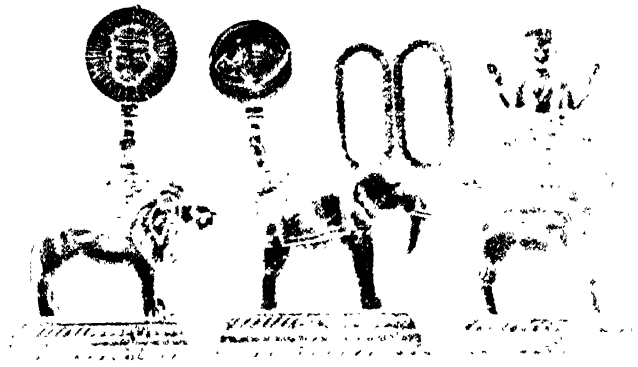
ক্ষমাভিক্ষার জন্য একপ্রকার মুদ্রিতপত্র ব্যবহৃত হয়। তাহাকে ক্ষামনা-পত্র বলে। এই পত্রের কোন ধরাবাঁধা ধরণ নাই, মোটের উপর বৎসরের সকল অপরাধের জন্য মার্জ্জনাভিক্ষাই

ইহার মূল কথা। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাঁহারা স্বকীয় পরিবারের ব্যবহারার্থে নিজেদের ব্যয়ে এই পত্র ছাপাইয়া লন, যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহাদের জন্য বাজারে এই ধরণের মুদ্রিত পত্র বিক্রয় হয়। গুজরাটী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষায় এই সব পত্র ছাপানো বাজারে পাওয়া যায়। ইংরেজীতেও পাওয়া যায়। জনৈক জৈন ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি, হিন্দুদের বিজয়াভিবাদনের সহিত প্রতিক্রমণের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। হিন্দুরা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ী প্রণাম, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদির বিনিময় করেন। কিন্তু জৈনদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রণম্য, পিতা পুত্রের যেমন প্রণম্য, পুত্রও পিতার তেমনই প্রণম্য। বৎসরের কৃতাপরাধের জন্য প্রতিক্রমণের দিন পুত্রও যেমন পিতার মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন, পিতাও ঠিক তেমনই পুত্রের মার্জ্জনা যাচ্ঞা করেন।

কল্পসূত্র

পর্য্যুষণের প্রধান অঙ্গ, কল্পসূত্র পাঠ। প্রথম কয়েকদিন 'পর্য্যুষণাষ্টাহ্নিক ব্যাখ্যান' হইতে সাধুরা গৃহীগণকে পর্য্যুষণ-পালনরীতি পাঠ করিয়া শোনান। চতুর্থ দিনে কল্পসূত্র পাঠ আরম্ভ হয়। কল্পসূত্র অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত। বর্ত্তমানে অর্দ্ধমাগধী সাধারণের অবোধ্য। সাধুরা তাই সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা করেন। মূলতঃ কল্পসূত্র মহাবীরের জীবনী। পার্শ্বনাথ, অরিষ্টনেমি, ঋষভদেব ইত্যাদি আরও কয়েকজন তীর্থঙ্করের প্রসঙ্গ থাকিলেও ইহার প্রধান আলোচ্য মহাবীর প্রসঙ্গ।

পার্শ্বনাথ

মহাবীর চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের সর্ব্বশেষ। বস্তুতঃ, তিনিই জৈনধর্ম্মকে ইহার বর্ত্তমান রূপ দান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে তেইশ জন তীর্থঙ্করের অভ্যুদয়োল্লেখ আছে, তাঁহাদের এক পার্শ্বনাথ ব্যতীত অপর কাহারও নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পার্শ্বনাথের পিতা অশ্বসেন বারাণসীর রাজা ছিলেন, তাঁহার মাতার নাম বামা দেবী। সম্ভবতঃ ৮৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার জন্ম, নির্ব্বাণ মহাবীর জন্মের ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৭৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। পরেশনাথ পাহাড়ে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হয়। কল্পসূত্রের দুষ্প্রাপ্য দুইখানি পুথি হইতে এখানে পার্শ্বনাথের জীবনীর একটি কাহিনীর দুইখানি ত্রিবর্ণ প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। একটি পুথি ভারতবর্ষের মুঘল অধিকারের পূর্ব্বে লিখিত, অপরটি মুঘল যুগের। কাহিনীটি এই: পার্শ্বনাথ তখন রাজা, শুনিলেন কমঠ নামে কে একজন সাধু তাঁহার রাজ্যে কঠিন সাধনা করিতেছেন। হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া পার্শ্বনাথ সেখানে গেলেন। কমঠ তখন পঞ্চাগ্নিসংযোগে তপস্যা করিতেছেন। পার্শ্বনাথ কমঠকে বলিলেন, 'আপনি সাধু, অগ্নিসংযোগে প্রাণিহত্যা কেন করিবেন?' উত্তরে কমঠ তাঁহাকে রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলেন, বলিলেন, 'তুমি বিলাসী, ঐশ্বর্য্যের পঙ্কে ডুবিয়া আছে, তুমি আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি বুঝিবে?' পার্শ্বনাথ তদুত্তরে কিছুই না বলিয়া কেবল অগ্নিসংযুক্ত একটি কাঠ বাহির করিলেন। সেই কাঠ কাটিতেই তাহা হইতে জীবন্ত সর্প বাহির হইল। এই চিত্রে সেই কাহিনী অঙ্কিত আছে।

চতুর্দ্দশ মঙ্গল দ্রব্য

পর্য্যুসনের পঞ্চম দিবসে মহাবীরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যদিও ইতিহাসানুযায়ী মহাবীরের জন্ম সেদিন নয়। এই দিনে পর্য্যুসনের উৎসবের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের চরম কৃত্য সাঙ্গ হয়।

পর্য্যুসনের চতুর্থ দিবসে চতুর্দ্দশ মঙ্গলদ্রব্যগুলিকে শুভযাত্রা করিয়া উপাশ্রয়ে আনা হয়।* এই সঙ্গে আর একটি জিনিষ থাকে,—মহাবীরের দোল্না। সকালে কল্পসূত্র হইতে মহাবীরের জন্মকথা পাঠ হয়। তারপরে এই মাঙ্গলিকী-গুলিকে নীলামে চড়ানো হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য পৃথক নীলাম ডাকা হয়। নীলামে সর্ব্বাধিক স্বীকৃত মূল্য মন্দিরের সাধারণ ভাণ্ডারে জমা হয়।

এই নীলামের দিন পর্য্যুষণে সর্ব্বত্র যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। প্রথমে নীলামের তত্ত্বাবধায়কপদের জন্য মূল্য হাঁকা

* নীলামের এই বিবরণী "এশিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ অনুযায়ী লিখিত। প্রবন্ধ লিখিবার পর জনৈক জৈন ভদ্রলোককে ইহা পাঠ করিয়া শোনাইলে তিনি নীলামের এই বিবরণী সত্য নয় বলেন।

হয়। তারপর যাঁহারা নীলামে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদের কপালে তিলক পরাইবার অধিকারের জন্য নীলাম ডাকা হয়। এই সম্পর্কে সকল জিনিষেরই মূল্য হাঁকিয়া লওয়া হয়। চতুর্দ্দশ স্বপ্নের নীলাম হইয়া গেলে, মহাবীরের দোল্নাকে নীলামে তোলা হয়। এই নীলামে সমধিক উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন সময়ে এই সব নীলামের ডাকে যে-মূল্য উঠে, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। একটি নীলামে দোলনার মূল্য প্রায় ২৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

পর্য্যুষণের ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসে কল্পসূত্রের পাঠ চলে। অষ্টম দিনে ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করা হয়।

পোষধ

মূলতঃ জৈনধর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম্ম। পর্য্যুষণে' যোগদান করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনার্থে প্রত্যেক গৃহীকে পোষধ ব্রত করিতে হয়। পোষধ ব্রতে উপবাসীকে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আত্মচিন্তা করিতে হয়। এই ব্রত কেবল পর্য্যুষণের সময়ে নয়, মাঝে মাঝেই করিবার জন্য জৈনশাস্ত্রের নির্দ্দেশ আছে। ইহাতে জৈনগৃহীর সহিত জৈন যতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। আসলে প্রত্যেক জৈনই যতি, গৃহধর্ম্ম তাহার ধর্ম্ম নহে। কেবল যতিজীবন গ্রহণের সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় প্রত্যেক গৃহীকে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বন্দী থাকিতে হয়।

পোষধ ব্রতের ভিতরকার কথা এই।

জৈনধর্ম্ম

জৈন ধর্ম্ম শক্তিমানের ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ক্ষত্রিয়-মনের বিদ্রোহ হইতে জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি। জৈনধর্ম্মের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। কল্পসূত্রে মহাবীরের যে জন্মকাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আছে,—প্রথমে মহাবীরকে গর্ভে ধারণ করেন ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। কিন্তু তীর্থঙ্করের কোন সামান্য বংশে জন্ম গ্রহণ করা নিষেধ। তাই ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভাপহার হইল। অতঃপর সে-গর্ভ ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলায় সঞ্চারিত হইল। অপরাপর অনেক নীচ জাতির নাম করিয়া তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণেরও নাম করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য কল্পসূত্র রচয়িতার ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে যিনি জয়যুক্ত করিয়াছিলেন সেই মহাবীর, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন, বিবাহ করেন, সন্তানের জন্ম দেন। * অতুল ঐশ্বর্য্যশালী না হইলেও মহাবীরের পিতা সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তাঁহার মাতামহবংশে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় নৃপতি মগধরাজ বিম্বিসার বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ সন্ন্যাস লইবার পর এক বৎসর কাটে নাই, বিলাসে লালিত ও পুষ্ট মহাবীর উপলব্ধি করিলেন যে, পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত মানুষের অর্হত্ব-লাভে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইতে হইবে। আচারঙ্গ-সূত্রে তাঁহার এই উলঙ্গ-জীবনের বিষয়ে একটি গাথা আছে। ভারতবর্ষের সাধু সন্ন্যাসীদের উলঙ্গ হওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু উলঙ্গ হইবার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আচারঙ্গ সুত্রের এই গাথা সকলের পড়া দরকার। অতঃপর দ্বাদশ বৎসর যে কঠিন তপশ্চর্য্যা মহাবীর করেন, ইতিহাসে তাহার জোড়া নাই। বুদ্ধ মাত্র ছয় বৎসর তপস্যা করেন।

জৈন ধর্ম্ম বীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা যিনি করেন, তাঁহার নাম শুধু মহাবীর ছিল না, তিনি কাজেও মহাবীর ছিলেন। চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্নের মূলেও এই বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়—অধিকাংশ মঙ্গলদ্রব্যই বীরধর্ম্মী।

* দিগম্বরী মতে মহাবীর ব্রহ্মচারী ছিলেন।

কুজ্ঝটিকা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ধীরে ধীরে ওরা উঠে চলে এল,
পাহাড়ের গায়ে ছুটে চলে এল,
অজানা ফুলের মধু লুটে এল,
আলোকবিজয়ী কুজ্ঝটিকা।

এতখন কোন্ গুহার ভিতরে
পাইনের ছায়ে ছিল যে কি করে—
গেঁথে নিয়ে মালা নীহার-নিকরে
কপোত-ধূসর বরণ-লিখা।

ওই ডুবে যায় পাইনের সারি,
মহেশের ঋজু তপোবন-দ্বারী,
পাহাড়ীর বাড়ী যায় রে।

আলো-ঝলমল গিরিদরী তলে
সেখানেও গাঢ় ছায়া ফেলে চলে,
থাকে-থাকে-নামা চায়ের বাগান
পলকের মাঝে কোথা অবসান
আঁধারে মিলায় মিলায় রে।
সূর্য্যের ভালে দিয়ে আসে ওরা
পাতালের কালো কলুষটীকা
কুজ্ঝটিকা।

ঐরাবতের দল এল ওরা আলোকতমারি
—কুজ্ঝটিকা।

রবির কিরণ-মৃণাল গুলিরে
উপাড়িয়া নিল শুণ্ডে তুলিরে
গিরি-সঙ্কটে রাস্তা ভুলিরে
চলে দুলি দুলি বরণ ফিকা।

ধূপি গাছে ঢাকা শ্যামল পাহাড়ে
গাঢ় ছায়াখানি পড়ে বারে বারে
গুহার মাঝারে কালো।

শিখরের কোন্ মর্ম্মের মাঝে
গুপ্ত ঝোরার মর্ম্মর বাজে।
উর্ব্বশীহারা পুরূরবা প্রায়
রৌদ্র এখানে ছায়ারে খেদায়
অশ্রু-কোমল আলো।
বহু বিরহের দীর্ঘ বেদনা
শ্বসিতেছে হেথা তুষার-শিখা।
—কুজ্ঝটিকা।

নিজেরে ঘেরিয়া ঘনায়ে তুলিলে
এ কেমন ধারা কুজ্ঝটিকা!

এ গিরিশিখরে ওগো শিখরিণী
ভেবেছিনু তব হৃদি লব জিনি,
সন্দেহ লাগে চিনি কি না চিনি
বিধাতার পরিহাস এ লিখা।

সেখানে আছিলে পল্লীবেশিনী
এখানে হেরি যে স্বপনদেশিনী
উদাসকেশিনী, মরি;

আধো আবরণে, আধো আভরণে
একি লুকোচুরি আপনার সনে।
আধো কুয়াশায়, আধেক আশায়,
বহু বঞ্চিত প্রেম তিয়াষায়
তুলিছ জটিল করি!
খোলো খোলো সখি, তব ভালে লখি
মোর দেওয়া সেই প্রেমের টীকা।

মেঘলোকে আজ একি দেখা সখী,
আলো-আঁধারের প্রান্তে এসে।

গ্রীষ্মতাপিত পাগলা-ঝোরার
মত তব তনু বিরহে কাহার
ব্যথার উপলে তোলে ঝঙ্কার
কভু আঁখিজলে, কখনো হেসে।

ওই হাসিখানি হাসি সে তো নয়,
খর তপনের সহে না প্রণয়—
জানি পরিচয়, সখী।

ছিল যা স্বপনে, থাক্ তাহা মনে,
কল্পলতা কি বাঁচে এ ভুবনে!
হাসি-কান্নার সুমেরুশিখরে
কেন হেন আজ পলকের তরে
হ'ল মিছা চোখাচোখী!
এ হাত যা কভু পাবে না নাগাল
　　তারি লাগি মরি দীনের বেশে।

অনেক দেখাই এ জীবনে সখী,
　　এই কুয়াশার ঘোম্‌টা আড়ে!
অনেক দেখাই এ জীবনে হায়,
ক্ষণ-দুর্লভ পাহাড়ী উষায়,
গৌরীশিখর সম আভা পায়
　　বাষ্পবিভোল দিকের পারে।

ইন্ধনহীন শিখার মতন
তব তনুখানি ধ্যাননিমগন
নিজেরে দগ্ধ করি।

অয়ি কেশান্তশিখা-স্বরূপিনী,
তব পরিচয় নব প্রতিদিনই!
ওই আঁখি দুটি তুলিছে কেবল
গিরিশিখরের স্বর্ণকমল,
　　ভোর হলে বিভাবরী।

যেটুকু তোমার পড়ে না নয়নে
　　সেই টুকু বেশি হৃদয়-কাড়ে।

গিরি-শিখরের পাইনের শাখে
　　উঠে এল ধীরে পূর্ণশশী।

ম্লান ছায়াখানি নির্ম্মোক প্রায়
নেমে এল ক্রমে পাহাড়ের পায়,
আলোর আঁচল পড়িল ছড়ায়ে
　　রজনীর গেল ঘোমটা খসি।

অতি অতি দূরে ধ্যানপারে যেন,
জাগে নিশ্চল সত্যের হেন
দিগন্তে গিরি-রেখা।
পুঞ্জিত ঘন কালো কুহেলিকা
লভিল ইন্দ্রধনুকের লিখা!

শুক্তির মাঝে মুক্তার মত
এই কুয়াশার মর্ম্মে সতত
পাবো নাকি তব দেখা।
মহুয়া-পাণ্ডু নিভন্ত চাঁদ
　　ছিঁড়ে পড়ে গেল কাননে পশি।

তবে তাই হোক্ ঘনাক আবার
　　তোমারে ঘেরিয়া কুজ্ঝটিকা।

মনের মানুষে দেখেছে কে কবে!
শুধু খুঁজে মরা আধো অনুভবে,
শুধু সন্দেহ, বুঝি হবে হবে
　　দীপ নাহি হেরি, কেবলি শিখা!

কৃতার্থ আমি যদি এই ক্ষুধা
থাকে চিরদিন, নাহি চাই সুধা,
যেন এ তৃষ্ণা থাকে।

এই কুয়াশার মাঝে নিরবধি
ধন্য তোমারে খুঁজে ফিরি যদি!
এ পারেতে ছিলে আমারি খানিক,
ওপারেতে হবে ধ্যানের মাণিক
কল্পতরুর শাখে।
তোমার লাগিয়া এই সন্ধান
　　চিরকাল ভালে থাকুক লিখা।

ভেরনল

—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

উত্তর-ভারতের নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে নৈনিতালে এসেছি। নভেম্বরের শেষে নৈনিতাল প্রায় জনহীন। আমাদের হোটেলের দোতলায় আমি আর একজন বাঙ্গালী প্রৌঢ় ডাক্তার, দু'জন আছি। হোটেলটি পাহাড়ের মাথায় বনের ধারে, নীচে নীল হ্রদ পাহাড়-ঘেরা, কখনো মরকতমণির মত ঝকমক করে, কখনো গলিত পোখরাজের মত। রৌদ্রতপ্ত সুনির্ম্মল দিন, জ্যোৎস্নাময় সুশীতল পাণ্ডুর রাত্রি, চারিদিকে অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা।

সমস্ত দিন হ্রদটি চিত্রিত দর্পণের মত স্থির ছিল, রঙীন বাংলোর সারি, সবুজ বন, নীলাকাশ, মেঘের স্তূপ, তার ওপর নানা রূপ ও বর্ণের প্রতিবিম্ব। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে মেঘপুঞ্জে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দিগ্‌বধূরা হোলিখেলায় মেতে উঠল, হ্রদ সুবর্ণবর্ণ। তারপর পাইন-বনের পিছনে চাঁদ উঠল, পাহাড়ের তলায় ঘন অন্ধকারময় হ্রদ রহস্যময়ী নারীর কালো চোখের মত।

ডিনার খেয়ে যখন ঘরের সামনে কাচ-ঘেরা বারান্দায় বসলুম, বিষ্টি পড়ছে, চারিদিক সজল অন্ধকার, দেবদারু-বন আন্দোলিত করে ঝোড়ো বাতাস উঠছে ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের মত।

বারান্দায় বসে থাকা গেল না, ঝড়ের জন্য নয়, দাঁতে অসহ্য বেদনা অনুভব করলুম। বাঁ মাড়ির শেষে একটু ব্যথা দু'দিন ধরে রয়েছে, সহসা মাঝ রাত্রে ঝড়ের মধ্যে ব্যথা অসহ্য মনে হল, দাঁতের স্নায়ুগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! ঘরে ঢুকে দেখলুম, এ্যাস্‌পিরিন বা বেদনা-নাশক কোন ওষুধ সঙ্গে নেই। রাত বারোটা হবে, বাহিরে ঝড় উঠেছে। ওষুধের জন্য কোথায় যাওয়া যায়?

মনে পড়ল, আমার ঘরের পরে দুটি খালি ঘর, তার পরেরটাতে প্রৌঢ় ডাক্তার সরকার আছেন। তাঁর কাছে নিশ্চয় কোন ওষুধ পাওয়া যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। অদ্ভুত মানুষ মনে হয়। তিনি সমস্ত পৃথিবী দু'বার পরিভ্রমণ করেছেন। কোনদিন দেখি, বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে স্তব্ধ বসে, আকাশে মেঘের লীলা-হ্রদে রঙের খেলা দেখছেন, কোনদিন দেখি মোটা চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন ভীমতালের দিকে। ছ'ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ, সুঠাম, দৃঢ়, বৃদ্ধ শালগাছের মত, সব সময়ে ছাই রংএর একটা সুট পরে, চোখে কালো কাচের চশমা, রেখাঙ্কিত মুখে আরক্তিম ভাব, নাকের ডগায় লাল ছোপ কাঁচকড়ার ফ্রেমের নীচে টক্‌টক্ করে।

দাঁতের যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল। ডাক্তারের ঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

করিডরের এক কোণে একটি আলো মৃদু জলছে। ডাক্তারের ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা দিলুম,—ডাক্তার সরকার!

ভেতর হতে উত্তর হল,—আঁত্রে! (দরজা খুলে আসুন)

দরজা ভেজান ছিল, একটু ঠেলতে খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম, স্প্রিং-গদিওয়ালা রেক্সিন-মোড়া লম্বা সেত্তিতে ডাক্তার সরকার অর্দ্ধশয়ানভাবে সামনের জানলার দিকে চেয়ে; জানলার কাচের ওপর বৃষ্টি-ঝড় আছড়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত। বাহিরে ঝঞ্ঝার আর্ত্ত-নাদ কিন্তু ঘরের ভেতর অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেত্তির পেছনটা দরজার দিকে, ডাক্তার সরকার আমার প্রবেশ দেখতে পাননি, তিনি বলে উঠলেন, আসুন হের্ রোজেনবেয়ার্গ, আপনার প্রতীক্ষা করছিলুম।

হের্ রোজেনবেয়ার্গ! এ হোটেলে কোন জার্ম্মানকে ত কখনও দেখিনি। চেঁচিয়ে বললুম, আমি—কিছু মনে করবেন না—দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা—

চমকে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চশমার কালো কাচ দিয়ে চোখ দেখা গেল না, রেখাময় কুঞ্চিত কপালের ওপর কালো সাদা চুলগুলি চক্‌চক্ করতে লাগল।

ও, আপনি! কি চাই?

দেখুন, দাঁতে বড় ব্যথা, যদি আপনার কাছে কোন ওষুধ থাকে, আমার এ্যাস্‌পিরিন—

ব্যথা! ভাল, যত ব্যথা পাবেন জীবনকে তত গভীর ভাবে অনুভব করবেন। যার যত বেদনা-বোধ সে তত উচ্চ-স্তরের জীব।

দেখুন, ডাক্তার যদি দার্শনিক হয়ে ওঠেন, রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়।

হা! হা! ডাক্তার-দার্শনিক! কোথায় ব্যথা, বলুন?

দাঁতে, এই বাঁ মাড়িতে, যেন স্নায়ুগুলি কে ছিঁড়ে—

থাক, ব্যথার বর্ণনা করতে হবে না, আমি বুঝেছি। বসুন, বসুন, ওই সোফায়। কি লিক্যর আপনি ভালবাসেন, ক্যুমেল, বেনেডিক্‌টিন্—আমার এখানে কয়েক রকম আছে মাত্র।

সামনের ছোট টেবিলে নানা বর্ণ ও আকৃতির বোতল ও ছোট বড় লিক্যর-গ্লাস।

না, আমিও কিছু খাই না।

খান না? হা, হা, খেলে দাঁতের ব্যথা হত না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দেখছি। আচ্ছা, দেখি একটা ওষুধ আছে।

ডাক্তার সরকার লেখবার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। শিশি হতে দুটি চ্যাপ্টা বড়ি এক মাঝারি গ্লাসে রাখলেন, তারপর একটা বড় বোতল হতে সোনালী তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দিলেন। গ্লাসটা নেড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, খেয়ে ফেলুন। একটু হাল্কা বোর্দো দিলুম, ওতে ওষুধের কাজ ভালই হবে, আর আমার ঘরে জল নেই, চাকরটা সন্ধ্যা থেকে পলাতক। ভাবুন ওষুধের অনুপান হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সূর্য্যালোকপুষ্ট রক্তিম দ্রাক্ষারস।

ব্যথা দূর করবার জন্য তখন কেউ হাতে বিষ দিলেও খেয়ে ফেলতে পারতুম। বড়ি-মিশ্রিত বোর্দো এক চুমুকে খেয়ে ফেলুম।

ডাক্তার সরকার আমার মুখোমুখি বসলেন সেত্তিতে হেলান দিয়ে। ছোট গ্লাস হতে এক চুমুক সারক্রজ খেয়ে বল্লেন, কেমন মনে হচ্ছে?

বেদনা কম মনে হচ্ছে।

ব্যস, তাহলেই হল। বেদনা হয়ত আপনার আগেকার মতই আছে, তবে ওই যে মনে হচ্ছে বেদনা নেই তাহলেই হল। আসল হচ্ছে মন, আর মন দিয়ে যা অনুভব না করি তাই মিথ্যা। বসুন, গল্প করা যাক, এ ঝড়ের রাতে কি আর এখন ঘুম হবে!

বেশত আপনি একটা গল্প বলুন, আপনার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা, কত দেশ কত রকম মানুষ দেখেছেন, তার ওপর আপনি ডাক্তার, কত রকম রোগী—

ডাক্তারের রোগী দেখা, clinical eye দিয়ে দেখাও সত্যিকার দেখা নয়, যে দেখায় বেদনা নাই, হৃদয়ের ব্যথা নাই, আতঙ্ক নাই, সে দেখা সত্যি দেখা নয়।

কিন্তু দেখায় আনন্দও ত থাকতে পারে।

হাঁ, কিন্তু সব গভীর আনন্দানুভূতির সঙ্গে তীব্র বেদনা রয়েছে। শুধু মনের ব্যথা নয়, দেহের ব্যথাকেও যত রকম ভাবে যত নূতন নূতন করে জানতে পারবেন, জীবনকে তত গভীর ভাবে জানবেন, প্রাণের মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌছবেন। এই দেহ মনের বেদনার অভিজ্ঞতায় আমাদের সত্তা গড়ে ওঠে, আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়।

আপনার জীবনে বহু অভিজ্ঞতা আছে মনে হয়।

হাঁ, নব নব অনুভূতি লাভের তৃষ্ণা আমাকে সারা জীবন দিশাহারা করেছে। ডাক্তাররূপে আমাকে দেখতে হয়েছে মানুষের দেহ-মনের ভাঙনের রূপ, তার পরম বেদনার মূর্ত্তি। সেজন্য প্রকৃতির বা মানবসৃষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য আমি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরেছি, দেহের সমস্ত স্নায়ু শিরা উপশিরার রক্তস্রোত দিয়ে প্রাণের গতি উল্লাস আনন্দময় অভিব্যক্তি অনুভব করতে চেয়েছি। এম্নি ঝড়ের রাতে আমি সাঁতরে পদ্মাপার হয়েছি, বন্যায় নগরগ্রাম ভেসে যেতে দেখেছি, কারাকোরাম পর্ব্বতের সতের হাজার ফিট উঁচুতে তুষার-নদী পার হয়ে কাশ্মীর হতে খোটান গেছি, মোটরকারে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছি, উগাণ্ডার জঙ্গলে সিংহ মেরেছি। কত অপূর্ব্ব বস্তু কত অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শ্রীনগরে ডাল হ্রদে রঙীন সন্ধ্যা; শীতের সুইজারল্যাণ্ডে জ্যোৎস্নারাত্রে অনন্ত তুষার-শুভ্রতায় স্লেজ্ চালান; লিডোতে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র তীরে সূর্য্যালোক পান, নিউইয়র্কের পঞ্চম এভিনিউর জনতা; জঙ্গলবেষ্টিত এঙ্কোর-ভাট; বেলজিয়ামের যুদ্ধ-ট্রেঞ্চ; অন্ধকার রাত্রে তাজমহল; প্রয়াগে কুম্ভমেলা; মিসিসিপির ঘন অরণ্য; প্রশান্ত মহাসাগরের উপর এরোপ্লেন। এ সব অভিজ্ঞতা আমার আত্মাকে মূর্ত্ত করেছে বটে কিন্তু আমার সত্তার বিকাশ হয়েছে মানব অন্তরের বেদনাময় অনুভূতিতে।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। ঝোড়ো বাতাসে কাচের জানলা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ চমকে গেল। ঘন নীলপর্দ্দা ঘেরা আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমি ধীরে বল্লুম, আচ্ছা আপনি হের্ রোজেনবেয়ার্গ নামে কার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন?

ডাক্তার সরকার চমকে সোজা হয়ে বসলেন; তাঁর চশমার কাচ চক্‌চক্ করতে লাগল অন্ধকার রাত্রে কালো বাঘের চোখের মত। বোতল থেকে একটু সুরা ঢেলে পান করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর আমার দিকে চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, একটা চুরুট ধরান। গল্পটা তাহলে আপনাকে বলি—

ম্যুনসেনে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে আমি কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ডাভোসে এক যক্ষ্মা-স্যানাটোরিয়মে কাজ করি। এম্নি নভেম্বর মাসের শেষাশেষি একবার ডাভোস থেকে প্যারিসে আসি। গারন্থলিয়ঁতে যখন নামলুম, রাত এগারটা হবে। কুলিকে জিনিষ বুঝিয়ে দিচ্ছি, ওভারকোটের ওপর কে থাপ্পড় মারলে—হের্ ডক্টর!

ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ, আমাদের স্যানাটোরিয়মের একটি রোগী। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, দেখতে আমার চেয়েও লম্বা, বহু দিন রোগে ভুগে শীর্ণ শুষ্ক মুখ, চোখে একটা তীব্র ক্ষুধিত দৃষ্টি। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির এক হাড়ে যক্ষ্মা, ছ'বছর স্যানাটোরিয়ম বাসের পর প্রায় সেরে গেছে, এখন ক্রাচের (crutch) সাহায্যে বাঁ পা তুলে খট্‌খট্ করে ঘুরে বেড়ায়। লোকটি জাতিতে সুইস, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ এসেছিলেন নরওয়ে থেকে। জুরিকের এক ধনী মহাজনের একমাত্র সন্তান।

বিস্মিত হয়ে বল্লুম, আপনি এখানে? পরশু আপনার জ্বর হয়েছিল, আপনারত স্যানাটোরিয়ম হতে বার হওয়া বারণ।

আমি পলাতক, হের্ ডক্টর। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। আপনি কোন হোটেলে যাচ্ছেন?

ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার এক জানা সস্তা হোটেল আছে, সেখানে ঘর রাখতে লিখেছি।

চলুন, আপনার সঙ্গেই যাব। একা বড় হোটেলে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে না। ছাত্রদের থাকবার হোটেল ত?

পথে ট্যাক্সিতে রোজেনবেয়ার্গ বল্লেন, তাঁর মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাঁর বিশ্বাস তাঁর মস্তিষ্কে ক্যানসার হচ্ছে; জুরিকে এক ডাক্তার নাকি বলেছেন ছোট একটা টিউমার হতেও পারে। প্যারিসে বড় ডাক্তার দেখাবার জন্য তিনি স্যানাটোরিয়ম থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, একটা ক্যানসার কোথায়ও হচ্ছে।

কথাটা আমি বিশ্বাস করলুম না। আমার হোটেলে আমার ঘরের কাছেই রোজেনবেয়ার্গের জন্য ঘর ঠিক করে দিলুম। শোবার উদ্যোগ করছি, ট্রেণের সুট বদলে সাজসজ্জা করে রোজেনবেয়ার্গ আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, বল্লেন,—চলুন, একটু বেরোন যাক।

আমি বড় শ্রান্ত।

ছ'বছর পরে প্যারিসে এলুম, এরমধ্যেই শোব! Tender is the night—

আপনি ঘুরে আসুন, আমি কাপড় জামা ছেড়ে ফেলেছি।

সেন নদীর তীরে একবার ঘুরে আসতে না পারলে রাত্রে ঘুম হবে না। আচ্ছা, বন্‌নুই!

বিছানাতে শুয়ে শুনতে লাগলুম, হের্ রোজেনবেয়ার্গ সরু সিঁড়ির কাঠের ওপর ক্রাচের খট্ খট্ শব্দ করে দ্রুত নেমে চলেছেন, প্যারিসের পথে আনন্দ লাভের সন্ধানে।

পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলুম, রোজেনবেয়ার্গ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, রাত তিনটের সময় মত্তাবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন।

এরপর সাতদিন রোজেনবেয়ার্গের সঙ্গে দেখা হয় নি।

রাত্রে পুচিনির টস্কা দেখে অপেরা-প্রাসাদ হতে রাস্তায় বের হয়েছি, ওভারকোটের ওপর এক থাপ্পড় মেরে কে বল্লে,—হের্ ডক্টর! পিছন ফিরে দেখি, রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ।

হের্ ডক্টর, কেমন লাগল অপেরা?

চমৎকার।

চলুন, কাছে এক ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ আমার জানা আছে, চমৎকার মোজেল-মদ রাখে? ১৯১৩ সালের যুদ্ধের

ঠিক আগের বছরের মোজেল-মদ, না এলে আমি সত্যই দুঃখিত হব।

অপেরার সঙ্গীত-লহরী শ্রবণে অন্তর তখন উল্লসিত। শালিয়াপেনের সুরদীপ্ত মহান কণ্ঠধ্বনি কানে বাজছে। বল্লুম, চলুন আজ রাত্রে একটু হল্লা করা যাক।

রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে আমরা অপেরার কাছে এক কাফেতে এসে বসলুম। পথের ফুটপাতের অর্দ্ধেক জুড়ে টেবিল চেয়ারের সারি, পাশ দিয়ে নানা সজ্জায় নরনারীস্রোত অবিরাম চলেছে।

রোজেনবেয়ার্গ, প্যারিসের জীবন কেমন উপভোগ কচ্ছে?

বড় বেদনা, মাথার মধ্যে অসহ্য বেদনা হয়।

পকেট থেকে সে একটি ছোট শিশি বের করে ছোট টেবিলের ওপর রাখলে। কিছুক্ষণ পর শিশি থেকে দুটো বড়ি বার করে কফির সঙ্গে খেয়ে ফেল্লে।

দু'ঘণ্টা অন্তর এই এ্যাস্পিরিন খাচ্ছি; না খেলেই যন্ত্রণায় মরে যাব।

কোনও ডাক্তার দেখালে?

দেখালুম বই কি, ডাক্তার লেভি বললেন, মাথায় নয় পেটে, লিভারের কাছে টিউমার মনে হচ্ছে, ক্যানসারের পূর্ব্বলক্ষণ হতে পারে। তবে আমি জানি ক্যানসার, ও ক্যানসার হবেই। ক্যানসারে আমার মা মরেছেন। ও! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

সহসা সে থামল। দেখলুম জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের সুসজ্জিতা বারবিলাসিনীদের দিকে চেয়ে আছে। তিনটি রূপজীবিনী চলেছে শিকারের সন্ধানে। রোজেনবেয়ার্গের চেয়ারের পাশে খাড়া-করা ক্রাচ দু'টির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে তারা চলে গেল। রোজনবেয়ার্গের শীর্ণ মুখ আরও কালো হয়ে উঠল।

বল্লুম, ডাক্তাররা ত নিশ্চিতরূপে কিছু বলছেন না?

নিশ্চিতরূপে কে কি বলতে পারে? অহর্নিশি এই যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি! ক্যানসার রোগীকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরতে আমি দেখেছি, তার সব সিম্‌টম্‌ আমি জানি। গারসঁ, আরও দু' গ্লাস। আচ্ছা আপনি ডাক্তার, ক্যানসারের কোন চিকিৎসা আছে?

এখনও পর্য্যন্ত আমাদের জানা নেই, নানা পরীক্ষা চলছে।

শুধু রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মরে।

একদিন ত আমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

ক্যানসার রোগী যদি আত্মহত্যা করে, তাতে দোষ কি?

প্রাণ অমূল্য, প্রাণকে আমরা এখনও সৃষ্টি করতে পারিনি, স্বইচ্ছায় তাকে বিনাশ করার অধিকার আছে কি?

শুধু যন্ত্রণা ভোগের অধিকার আছে। আমি আত্মহত্যা করতে পারি, আমার মা নেই, বাবা দু' মাস হল মারা গেছেন, কিন্তু এক বুড়ী দিদিমা আছেন, তিনি মনে বড় আঘাত পাবেন। গারসঁ, এই নোটটা ভাঙিয়ে আন দেখি।

কাফের এক খিদমৎগার এগিয়ে আমাদের কাছে এল। রোজেনবেয়ার্গ তার বুকের পকেট থেকে এক মোটা মনি-ব্যাগ বের করলে, নানা রংএর নোটে ভরা। নোটের তাড়া থেকে একখানি একহাজার ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের নোট বের করে গারসঁর হাতে দিলে। তারপর মনিব্যাগটা খুলেই টেবিলের ওপর রাখলে। শুধু কাফের নয়, রাস্তার লোকেও দেখতে পেলে নোটভরা মনিব্যাগ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাগটা তুলে রাখ, রিচার্ড।

হুঁ! এ ব্যাগে মার্ক-ফ্র্যাঙ্ক-পাউণ্ড-ডলারে ত্রিশ হাজার ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের বেশী আছে।

রোজেনবেয়ার্গ কথাগুলি এত উচ্চস্বরে বল্ল যে রাস্তার লোকও শুনতে পেলে। কাফের লোকেরা আমাদের টেবিলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আস্তে, এত চেঁচামেচি করছ কেন। ব্যাগটা পকেটে রাখ। এত টাকা পকেটে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় এরকম ভাবে ঘোরাব মানে কি?

হুঁ, মানে কি? বেশ বলেছ ডক্টর, আচ্ছা তোমাকে ধাঁধা দেওয়া যাচ্ছে, উত্তর দাও; একটা লোক ত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেন? হা হা, জীবনটা একটা গোলকধাঁধা নয় কি, একবার প্রবেশ করলে সব সময়ে তা থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেখ এরচেয়ে কম টাকার জন্য প্যারিসের পথে লোক খুন হয়েছে।

বা, বেশ বলেছ। শোন ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল ভালই হল, আমার যে রকম শরীরের অবস্থা যে

কোন সময়ে কিছু ঘটতে পারে, আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, দেখ আমি এখন লক্ষপতি, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি এক ক্যানসার রিসার্চ হাসপাতালে দিয়ে যেতে চাই, আমার একটা উইল আছে, স্যানাটোরিয়মে আমার ঘরে নয়, এক জায়গায় লুকোনো আছে, সেটা তোমায় বলে যেতে চাই—

সহসা রোজেনবেয়ার্গ চুপ করে পথের দিকে চাইলে। আমাদের কাছ দিয়েই একটি যুবক ও যুবতী যাচ্ছিল, যুবকটি কদাকার ভীম প্রকৃতির দেখতে, প্যারিসের গুণ্ডাদলের মনে হয়, যুবতী কিন্তু পরমাসুন্দরী, সদ্যপ্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত স্নিগ্ধ লীলায়িত মূর্ত্তি!

রোজেনবেয়ার্গ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে ডাকলে,—মাদলেন! মেয়েটি হেসে এগিয়ে এল, আমাদের টেবিলে আমাদের দু'জনের মাঝে চেয়ারে এসে বসল। যুবকটি কিন্তু কোথায় সরে পড়ল।

এ্যালো মাদলেন! কি খাবে?

চল, এক রেস্তোরাঁতে যাওয়া যাক, সন্ধ্যে থেকে খাইনি. বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মাদলেনের দুই চোখে কৌতুকময় হাসি, রোজেনবেয়ার্গ তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে। ধীরে সে বল্লে, আমরা এই খেয়ে এলুম, এই নাও, কাল সকালে খেও।

রোজেনবেয়ার্গ আবার ব্যাগ বের করে মাদলেনের হাতে একখানা পাঁচশ ফ্র্যাঙ্কের নোট দিলে। ব্যাগে নোটের তাড়া রাস্তার লোক শুদ্ধ দেখতে পেলে। মাদলেনের নয়ন দু'টি বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি বল্লুম, অনেক রাত হয়েছে, এবার যাওয়া যাক।

আমরাও যাব, চলো মাদলেন।

ট্যাক্সিতে মেয়েটি বসল আমাদের দু'জনের মাঝখানে। আমি চুপ করে বসে রইলুম, রোজেনবেয়ার্গ অনর্গল বকে যেতে লাগল।

দেখ ডাক্তার, আজকাল রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না। আচ্ছা, কোন ভাল ঘুমের ওষুধ তোমার জানা আছে? তুমি দিতে চাও না, বুঝতে পারছি।

মেয়েটি হেসে বলে উঠল, আমি জানি।

আবেগের সঙ্গে রোজেনবেয়ার্গ বল্লে, কি?

মেয়েটি উচ্চ হেসে বল্লে, সে বলব না।

তারপর সমস্ত পথ রোজেনবেয়ার্গ আমার সঙ্গে ভেরনলের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে এল,—সে তিন থেকে চার ট্যাবলেট খায়; ক'টা ট্যাবলেট খেলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা, ডাভোসে কে কবে ভুলে বেশী ভেরনল খেয়ে মরেছে, ইত্যাদি।

হোটেলে ঢুকে রোজেনবেয়ার্গকে একটু আড়ালে ডেকে বল্লুম,—মেয়েটি কে? সে অবাক হয়ে বল্লে, কে? আমি কি ওকে জানি? ওকে আমি চিনি না। বিস্মিত হয়ে বললুম, তা'হলে তুমি ওকে জান না! তোমার সঙ্গে এত টাকা রয়েছে, ব্যাগটা না হয়—দেখলুম, আমাদের ট্যাক্সির পেছনে আর একটা মোটরকার আসছিল।

রোজেনবেয়ার্গের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল।

হের্ ডক্টর, এ পৃথিবীতে আমরা কে কাকে জানি?

মেয়েটিকে নিয়ে রোজেনবেয়ার্গ তার ঘরে গেল। আমি আমার ঘরে গিয়ে কোচে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম; বাইরে টিপ টিপ বিষ্টি পড়ছে, শূন্য কালো গলিতে বাতাস বইছে ক্ষ্যাপা কুকুরের অবিশ্রাম আর্ত্তনাদের মত। সমস্ত হোটেল নিঝুম নিদ্রিত।

এ রাত্রে ঘুমোবার আশা নেই। ফায়ার প্লেসের উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ঘড়িটা শূন্য ভাবে চেয়ে রইল। মোপাসাঁর একটি গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না, জানালার সার্সির ঝন্-ঝন্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঝড় উঠেছে, তার সঙ্গে মৃদু তুষারপাত।

বাহিরে উন্মত্তা প্রকৃতি, গর্জ্জমান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি; কিন্তু হোটেল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।

চমকে উঠলুম, রোজেনবেয়ার্গের ঘরে কি হয়েছে কে জানে? মেয়েটি নিশ্চয় কাজ শেষ করে চলে গেছে। পাশে স্নানের ঘরে জলের কল ভাল করে বন্ধ করেনি, জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়ছে।

মনে হল, কে যেন আমায় ডাকছে, ডক্টর, হের্ ডক্টর! কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার করিডর পার হয়ে সে আহ্বান আসছে।

ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুললুম, অন্ধকার করিডর, রোজেনবেয়ার্গের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করা, সেই ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা পথের তমিস্রপুঞ্জে এসে পড়েছে। আলোর রেখা দেখে মনে সাহস হল।

চকিতপদে করিডর পার হয়ে রোজেনবেয়ার্গের ঘরে প্রবেশ করলুম। স্তব্ধ ঘর, রোজেনবেয়ার্গ বিছানাতে চাদরের ওপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে। সুট ছেড়ে রাতের পোষাকও পরেনি। অতিস্থির শুয়ে, চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি; পাশে ছোট মার্ব্বেল টেবিলে ভেরনলের শূন্য শিশি, দুটি খালি বোতল ও খালি গেলাস। মেয়েটি কোথায়ও নেই।

ডাকলুম,—রোজেনবেয়ার্গ! রিচার্ড!

কোন সাড়া নেই। কোথায় একটা খট্‌খট্‌ শব্দ হল। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তুষার-শীতল। হাত ধরে নাড়ী দেখলুম, কোন স্পন্দন নেই। জামা খুলে বুকের ওপর কান চেপে শুনতে চেষ্টা করলুম, বুকের ধুকধুকানি একটু আছে কিনা। চিরদিনের মত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে। বাহিরে ঝোড়ো বাতাস গর্জ্জন করছে।

বুঝলুম আমার আর কিছু করবার নেই। ধীরে চোখ দু'টি বন্ধ করে, গায়ের ওপর একটি চাদর ঢাকা দিয়ে দিলুম।

নিজের ঘরে পবিশ্রান্ত হয়ে সোফায় বসতে শীতের রাত্রে গায়ে ঘাম দিল।

আবার মনে হল, কে আমায় ডাকছে, ডক্টর! হের্ ডক্টর! অন্ধকাব করিডর পার হয়ে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে সে ডাক আমার সমস্ত ঘর ধোঁয়ার মত ভবে তুলেছে। একটা সিগারেট ধরালুম, একটা জানালা খুলে দিলুম, যদি বাহিরের ঝোড়ো বাতাসের গর্জ্জনে ঘরের এ ডাক ডুবে যায়।

আহ্বান অতি মৃদু ছিল, তীব্র উচ্চ হয়ে উঠল। শুধু আমার নাম ডাকা নয়, একটা খট্‌খট্‌ শব্দ, সিঁড়ির কাঠের ধাপেব ওপর ক্রাচেব খট্‌খট্‌ শব্দ। সুষুপ্ত হোটেলের স্তব্ধতা কেঁপে উঠেছে।

ক্রাচের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সারি পার হয়ে অন্ধকার করিডর অতিক্রম করে আমার ঘরের সম্মুখে এসে থামল, ঘরের দরজার উপর তিনটে টোকা পড়ল—হের্ ডক্টর!

তখন আতঙ্কে মূর্চ্ছা যাওয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি আতঙ্ক-রস অনুভব করতে চেষ্টা করছিলুম। রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা দেখতে আমি প্রস্তুত।

বল্লুম,—আঁত্রে!

ধীরে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার পটভূমিতে ছবির মত রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের মূর্ত্তি ফুটে উঠল, মোটা কালো ওভার-কোট পরা, মাথায় ধূসর টুপি, দুই বগলে লম্বা ক্রাচ! মুখের ওপর ঘরের আলো পড়ে কাচের মত চক্‌চক করচে। চোখে ক্ষুধিত তীব্র দৃষ্টি নেই, বড় শ্রান্ত ঝিমানো ভাব।

যেন বেতার-যন্ত্র হতে কথাগুলি কানে এল। হের্ ডক্টর, আমি বাইরে যাচ্ছি, উইলের কথা বলতে এলুম, উইলটা আছে আমাদের স্যানাটোরিয়মে, ফ্রাউ মায়ারের ঘরের টেবিলের তৃতীয় ড্রয়ারে আছে। আচ্ছা, বন্‌মুই, অনেক দূব যেতে হবে।

মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলুম। খট্‌খট্‌ শব্দ দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে গা শিরশির করে উঠল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পাচ্ছি। দু'ঘরের পরে রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ!

সহসা করিডরে কে আলো জাললে, চোখ ঝলসে উঠল। সিঁড়িতে যুবকদলের হাস্য, যুবতীদের চঞ্চল পদধ্বনি। একদল নৈশিক ছাত্রছাত্রী হাস্যে গল্পে সিঁড়ি মুখর করে উঠ্‌ছে। বাত্ দুটোর আগে তারা সাধারণতঃ ফেরে না।

ছাত্রের দল যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমিও আমাব ঘরের দরজায় চাবি দিলুম। হোটেল আবার সুপ্ত স্তব্ধ।

ঝড় থেমেছে, নিঃশব্দ শুভ্র তুষার পতন হচ্ছে, যেন দোলন-চাঁপা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। খোলা জানালার কাছে একটা সিগাবেট ধরিয়ে বসলুম প্রভাতের আলোর আশায়।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। আমি নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলুম। বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে, মৃদু জ্যোৎস্নায় আকাশ থম থম করছে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন, মিষ্টার ঘোষ, আজ রাত্রেও আমার ঘুম হবে না দেখছি। এখন রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না।

কথাগুলি শুনে কোন অজানা ভয়ে চমকে উঠলুম। এ যেন ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বর নয়।

দেখুন ত ওই খানে একটা শিশি আছে, হ্যাঁ ওই হলদে শিশিটা। আমি আর উঠতে পারছি না। পায়ে কেমন ব্যথা হয়েছে। কয়েকটা ট্যাবলেট শিশি থেকে এই গেলাসে রাখুন।

ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কটা?

কটা? ও এই পাঁচ ছ'টা। ওতে কিছু হবে না আমার। ওর কমে ঘুম হয় না। আপনি হয়ত ছ'টা খেলে—

মন্ত্রচালিতের মত ছ'টা ট্যাবলেট গেলাসে ফেলে তার সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে ডাক্তার সরকারকে দিলুম। তিনি এক চুমুকে সবটা খেয়ে বল্লেন—একটু বসুন। তারপর চোখ বুজে সেত্তিতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি চুপ করে বসে রইলুম। পা যেন নাড়তে পারছি না। ঘরে স্তব্ধতা পাথরের মত ভারী; জানালার কাচ ঝকমক করছে অবগুণ্ঠিতা নারীর ভীতিব্যাকুল দৃষ্টির মত।

কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না। কালের স্রোত যে বয়ে চলেছে, সে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মনে হল, খট্‌খট্‌ শব্দ আসছে, কাঠের মেজের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্‌ শব্দ! সে শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের সামনে এসে থামল, দরজার ওপর তিনটে টোকা, টক্ টক্ টক্!

ভয়ে শিউরে উঠলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—ডাক্তার সরকার!

কোন সাড়া নেই।

প্রাণপণে চেঁচালুম—ডাক্তার সরকার! ডাক্তার!

নিঃসাড়, স্পন্দহীন দেহ।

ডাক্তার সরকারের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। বরফের মত কন্‌কনে হাত, নাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না।

নাকের কাছে হাত রাখলুম, বুকের উপর কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলুম, নিশ্চল হৃদ্‌পিণ্ড, দেহে রক্তচলাচল নেই।

ডাক্তার সরকার মৃত? হয়ত ভেরনলের মাত্রা আমি অধিক দিয়েছি। বিবর্ণ মুখ সাদা মুখোসের মত।

আতঙ্কে বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালুম। দরজার ওধারে রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা, আর এধারে ডাক্তার সরকারের মৃতদেহ।

কালো চশমার কাচের পেছনে চোখ দু'টো নড়ে উঠল। শিউরে উঠলুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন, কি মিষ্টার ঘোষ! আবার দাঁতের ব্যথা হচ্ছে নাকি?

না!

তবে ভয় পেয়েছেন। না, আমি মরিনি, অত সহজে মৃত্যু হয় না।

আমার মনে হচ্ছিল—

হুঁ, সে রাত্রে প্যারিসের হোটেলে কি রকম আতঙ্ক অনুভব করেছিলুম তার কিছু আভাস পেলেন বোধ হয়।

আপনি চমৎকার অভিনেতা দেখছি।

অভিনয় করতে পারি বলেই ত এতদিন বেঁচে আছি। আচ্ছা আপনি শুতে যান, আজ রাত্রে আর রোজেনবেয়ার্গ এল না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যান। একটু খেয়ে যান, ভাল ঘুম হবে। শুনুন, গল্পের শেষটুকু আপনাকে বলা হয়নি। পরদিন সকালে কিন্তু রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ হোটেলের ঘরে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে সেন-নদীর জলে মৃতদেহ পাওয়া গেল। লোকে বলে গুণ্ডারা রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছল। কিন্তু আমার থিওরি হচ্ছে, মাদলেন ওকে মারেনি। আপনার কি মনে হয়?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চলে এলুম। ঘরে এসে খোলা জানলার পাশে বসলুম। হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

ভাবতে লাগলুম, ডাক্তার সরকার কি উন্মাদ, না বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ!
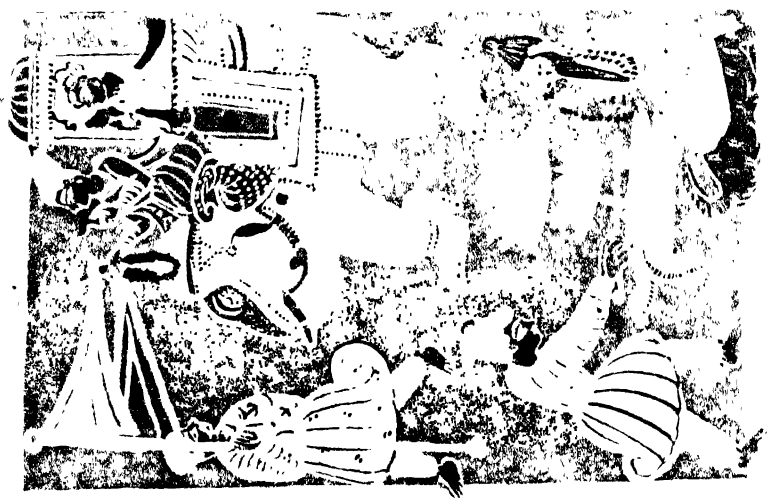
আপেক্ষিক তত্ত্বের ভূমিকা

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ পাঠকের মনে আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি আগ্রহ আছে। এই আগ্রহ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে দেখিতে পাই।

একদল মনে করেন, আইনষ্টাইন অসম্ভব রূপে অসঙ্গত এবং আশ্চর্য্যরূপে দুর্ব্বোধ্য এক হেঁয়ালীর প্রচার করিয়াছেন। চারি আয়তন-বিশিষ্ট দেশ এবং অবস্থান-ভেদে কাল ও পাত্রের তারতম্য, সসীম বিশ্ব, সমান্তর সরল রেখার পরস্পর ছেদ ও ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টির দুই সমকোণ অপেক্ষা আধিক্য প্রভৃতি আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি, ঐতিহ্য ও যুক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধতাই ইহার বিশেষত্ব। বস্তুতঃ, আপেক্ষিক তত্ত্বের দুর্জ্জ্ঞেয়তাই ইহাকে ইঁহাদের নিকট আকর্ষণের বস্তু করিয়াছে; এবং জগতে মাত্র দ্বাদশ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, কোনও ত্রয়োদশ ব্যক্তির পক্ষে তাহার সম্ভাবনা নাই—এই সগর্ব্ব পরিহাস-বাক্যের উদ্ভাবনা করাইয়াছে।

অপর পক্ষে আর একদল বলেন, আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনষ্টাইন নূতন কিছুই বলেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই দার্শনিকগণ সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের আত্মগত ও বস্তুগত এই দুইটি দিক নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন; এবং কোপার্নিকাসের সময় হইতেই (হয়ত তাহার পূর্ব্বেই) গতির আপেক্ষিকতা মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে। ইঁহারা মনে করেন, আইনষ্টাইনের তত্ত্বের মূল সূত্র হইতেছে—"জগতে সর্ব্ব ব্যাপারই আপেক্ষিক;" এবং ইহা চিরদিনই মানুষের পরিজ্ঞাত ছিল। এ বিষয়ে আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদের 'Everything is relative" এই প্রিয়বাক্যের সমর্থনে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই ভারতীয় ঋষিবাক্য হয়ত একদা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইবে। *

প্রকৃত প্রস্তাবে আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই দুই প্রকার ধারণাই আতিশয্যরঞ্জিত। আইনষ্টাইনের কালাপাহাড়ী তত্ত্বের ফলে সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যামিতি, গণিত ও পদার্থশাস্ত্রের ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিকের উপলব্ধ জগতে সম্পূর্ণ ওলোট-পালোট ঘটিয়াছে—এ কথা সত্য হইলেও, ইহা অপ্রত্যাশিত রূপে আকস্মিক নয়; এবং ইহার উপর যতখানি দুর্জ্জ্ঞেয়তার আরোপ করা হয়, তাহা ন্যায়তঃ ইহার প্রাপ্য নহে। পক্ষান্তরে দার্শনিকের আত্মতন্ত্রতা ও বস্তুতন্ত্রতা হইতে আপেক্ষিক তত্ত্ব পৃথক্। জগতে সর্ব্ব ব্যাপারই আপেক্ষিক—ইহাই আইনষ্টাইনের প্রতিপাদ্য বিষয়, একথা ঠিক নয়। সম্ভবতঃ, আপেক্ষিক তত্ত্ব নামটিই এই প্রকার ধারণার জন্য দায়ী। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে এই নামটি সুনির্ব্বাচিত হয় নাই।

তাহা হইলে আপেক্ষিক তত্ত্ব জিনিসটি বাস্তবিক পক্ষে কি?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, আর্য্যভট্ট, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটনের তত্ত্বের ন্যায় ইহা জাগতিক ব্যাপার সমূহকে আর একদিক হইতে দেখিবার ও ব্যাখ্যা করিবার একটি পন্থা; এবং ইহার সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনার আপেক্ষিক অংশ হইতে নিরপেক্ষ অংশকে পৃথক করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাকেও দর্শনের কোঠায় ফেলা চলে; কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দর্শন।

আপেক্ষিক তত্ত্বের পট-ভূমিকা পরিস্ফুট করিতে হইলে বিজ্ঞান-জগতের আবর্ত্তনের ধারাটির সহিত পরিচিত থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দুইটি উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ দেখা যায়। প্রথম, জগৎ সম্বন্ধে যথাসাধ্য জ্ঞান আহরণ করা; এবং দ্বিতীয়, সমুদায় পরিজ্ঞাত ব্যাপারকে সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা। বৈজ্ঞানিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও তত্ত্ব যখন কোনও অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন আবিষ্কার বা তথ্যকে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়, তখনই ইহাকে অন্তর্লীন রাখিয়া ও অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব প্রকটিত করিবার প্রয়োজন ঘটে। এই তত্ত্বও হয়ত সম্পূর্ণ না হইতে পারে; এবং উত্তর কালে নবতর আবিষ্ক্রিয়ায়

---

* ইহা নিছক কল্পনা নয়। সম্প্রতি আমেরিকায় জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক ঋগ্বেদে আপেক্ষিক তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এবং অন্ততঃ একটি ঋকের (১।১১৯।১০) অর্থ এরূপ ভাবে করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—যাহাতে অনুমিত হয়, প্রাচীন ভারতে ঋগ্বেদের যুগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারি এতদূর উন্নত ছিল যে, দ্রুত গমনাগমন, বার্ত্তা-প্রেরণ, যুদ্ধকামী সেনাদের সাহায্য, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োগ প্রচলিত ছিল।

পুনর্ব্বার ইহার প্রসার দরকার হইতে পারে। সার অলিভার লজ এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, প্রাকৃতিক জগতে দিন ও রাত্রির ন্যায় বিজ্ঞান-জগতে কেপ্লারীয় যুগ ও নিউটনীয় যুগের পরম্পর অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কেপ্লারীয় যুগে নূতন নূতন তথ্য এবং তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য নানা প্রকার অনুমান ও তত্ত্ব প্রচারিত হয়, যদিও এই সকল তত্ত্ব এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ ও ব্যাখ্যাত হয় না। ইহার পরেই আসে নিউটনীয় যুগ, যে যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত ও গণিতের সূত্রে সুসংবদ্ধ হয়। লজ বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান-জগতে কেপলারীয় যুগ শেষ হইয়া নিউটনীয় যুগের সূত্রপাত হইতেছে। পদার্থ শাস্ত্র এবং বিশেষ করিয়া তড়িৎ বিজ্ঞানের গত একশত বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে একথা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ ইহার শেষভাগে, পরীক্ষাগার সমূহে যে সকল অনুপপত্তি দেখা গিয়াছিল এবং এখনও দেখা যাইতেছে, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ তাহার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। আইনষ্টাইন, শ্রোডিংগার, বোস, ডিরাক প্রভৃতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ইহারই ইতিহাস।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিউটনীয় পদার্থ-শাস্ত্রের অধিকাংশ তথ্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের জানা ছিল। কোপার্নিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিওর অনুমান ও পরিকল্পনাসমূহ নিউটন তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে গণিতের সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে পরবর্ত্তী কালে মিকল্সন-মর্লি, লারমার, লরেঞ্জ, ফিট্‌জেরাল্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের একীকরণ করা হইয়াছে আপেক্ষিক তত্ত্বে। এই হিসাবে আইনষ্টাইন দ্বিতীয় নিউটন স্বরূপ। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বা চতুর্থ নিউটনের আবির্ভাব বিচিত্র নহে।

আইনষ্টাইনকে বুঝিতে হইলে প্রাক্-আইনষ্টাইন পদার্থশাস্ত্র ও গতিবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি একটু বিচার করা প্রয়োজন। নিউটনীয় পদার্থশাস্ত্র প্রধানতঃ ন্যায়-সিদ্ধান্তমূলক; এবং ইহার যে গাণিতিক সর্ব্বাঙ্গীনতা আছে, বর্ত্তমান পদার্থ শাস্ত্রে তাহা দুর্লভ। নব্য-বিজ্ঞান হইতে ইহার প্রধান পার্থক্য ইহার এই নিখুঁত গাণিতিক রূপ। বস্তুতঃ, সমগ্র নিউটনীয় পদার্থ শাস্ত্রে যেন প্রকৃতিকে এক মহা গণিতবিদ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে ইহা গ্রীক দর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

বস্তোত্তিচ নিউটনীয় বিজ্ঞানকে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহাতে প্রথমেই আমরা বিন্দুসমষ্টি দ্বারা গঠিত এক নিরপেক্ষ স্থান বা আকাশ

স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)।

ও মুহূর্ত্তসমষ্টি লইয়া গঠিত নিরপেক্ষ সময় পাইতেছি। ইহার পরেই পাইতেছি, বস্তু-কণা বা অণু; ইহারা চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আকাশে এক একটি বিন্দু অধিকার করিয়া থাকে ও পরস্পরকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ প্রয়োগ করিবার জন্য ইহাদের কোনও মধ্যস্থ বা অবলম্বন প্রয়োজন হয় না; সম্পূর্ণ শূন্য স্থানেও ইহা কার্য্য করে। মাধ্যাকর্ষণ দুইটি বস্তু-কণার বস্তুমানের গুণফলের সরল অনুপাতে এবং উহাদের দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে হয়, এবং বস্তুকণায় আকর্ষণের অনুপাতে বেগ বৃদ্ধি উৎপন্ন করে।

নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের বিশেষত্ব এই যে, পরবর্ত্তী কালে পদার্থ-বিজ্ঞানের সকল শাখায়ই এই উপমানের সাহায্যে

ঠিক অনুরূপ সূত্র নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। চুম্বক ও বিদ্যুতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সূত্র, আলোকের তীব্রতার সমীকরণ প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তত্ত্ব ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ; এবং সমগ্র ক্লাসিক পদার্থশাস্ত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ইহা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কারণ ইঁহাদের মতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্থান বা সময়ের কোন অর্থ হয় না, এবং দুইটি বস্তু বিনা অবলম্বনে পরস্পরের উপর বল প্রয়োগ করিতে পারে, ইহা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। এমন কি নিউটনও, যিনি বাস্তবিক পক্ষে পূরাপূরি নিউটনবাদী ছিলেন না, স্বয়ং এই দ্বিতীয় আপত্তিটি অস্বীকার করিতে পারেন নাই; এবং বলিয়াছিলেন, উত্তর কালে পরীক্ষার ফলে হয়ত মাধ্যাকর্ষণের অবলম্বন আবিষ্কৃত হইবে।

নিউটনের সমসাময়িক গণিতবিদ্ লাইবনিৎজ নিউটনের জীবদ্দশাতেই তাঁহার নিরপেক্ষ স্থান ও সময়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জগতে সর্ব্ব ব্যাপারেরই দুইটি দিক আছে; একটি ব্যক্তিগত অর্থাৎ পরিদর্শকের উপর নির্ভরশীল, অপরটি বস্তুগত—ব্যাপারটির নিজস্ব অংশ। অথচ আমাদের উপলব্ধির বিষয়ীভূত স্থান বা সময় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ—ইহা পরবর্ত্তী অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মানিয়া লইতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাখ্ ইহা একেবারে অস্বীকার করিলেন; ইহার পরে বার্গস঳ সময়ের বহুত্ব নির্দ্দেশ করিলেন; এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে আইনষ্টাইন ও মিঙ্কৌস্কি স্থান ও সময়ের আপেক্ষিকতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নিরপেক্ষ স্থান ও সময়ের বিরুদ্ধে নিউটনের সমালোচকগণ প্রধানতঃ দুইটি কারণ প্রদর্শন করেন। প্রথম, জগতে আমরা সকল বস্তু ও ঘটনায় ইহাদের আপেক্ষিক অবস্থান, অর্থাৎ দর্শকের অবস্থানের সম্পর্কে ইহাদের অবস্থানই মাত্র লক্ষ্য করিতে পারি; দ্বিতীয় স্থানের উপাদান-স্বরূপ জ্যামিতিক বিন্দুর ও সময়ের উপাদান হিসাবে মুহূর্ত্তের পরিকল্পনা একান্তই অনাবশ্যক অনুমান। বিজ্ঞানে কল্পনার স্থান অতি উচ্চে; কিন্তু পরিকল্পনার মিতাচার বিজ্ঞানের মূল সূত্র।

এই কারণ দুইটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

স্থান এবং সময় এই দুইটি বিষয়ে আমাদের ধারণা বস্তু ও গতি হইতে জন্মিয়াছে। বস্তুর বহিঃসীমার পরিস্থিতি হইতেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে অনুভূতির উদ্ভব। অর্থাৎ, বিভিন্ন বস্তু-সীমারেখার অন্তর্বর্ত্তী অবকাশকেই আমরা স্থান মনে করি। ইহা ব্যতীত অপর কোনও উপায়েই আমাদের স্থানের উপলব্ধি হয় নাই। এডিংটন ইহা ছাড়া স্থানের অপর কোনও সংজ্ঞা অস্বীকার করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত লইলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। মনে করা যাক, পাঠক জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই এমন স্থানে বদ্ধিত হইয়াছেন, যেখানে কোনও বস্তুই—এমন কি নিজের শরীর পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সহজেই বুঝিতে পারি, এরূপ অবস্থায় স্থান সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও ধারণাই জন্মিবে না। ঠিক অনুরূপ ভাবে, বস্তুর বিভিন্ন সীমা-রেখার পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ বা স্থানের পরিমাণের পরিবর্ত্তন—ইহাকেই গণিতের ভাষায় বস্তুর গতি বলা হইয়াছে—হইতেই আমাদের সময়ের ধারণা জন্মিয়াছে। একটি অবিচ্ছিন্ন ও চলিষ্ণু চিরন্তন সময়ের সংস্কার আমাদের মনে আছে, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই কোনও না কোন প্রকার গতি কল্পনার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। যে কোনও সময়-নির্দ্দেশক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। ইহা ব্যতীত সময় সম্বন্ধে অনুভূতিও মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুর ছন্দাত্মক গতিরই ফল। সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য জগতে সময়ের অস্তিত্ব নাই। "সময় চলিয়া যাইতেছে?··হায়, আমরাই চলিয়াছি···।"

কিন্তু জগতে আমরা সকল বস্তুর আপেক্ষিক অবস্থানই মাত্র লক্ষ্য করিতে পারি। অতএব বস্তু-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল স্থান ও সময়ের ধারণাও আপেক্ষিক মাত্র। বিজ্ঞান অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে পরোক্ষ উপলব্ধিতে উপনীত হইয়াছে বটে; কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এমন কোনও পরিণামকে স্বীকার করে নাই, যাহার সাম্ভাব্য বাস্তব কল্পনার অতীত। এই বিচারে বস্তু-নিরপেক্ষ স্থান ও সময় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বাহিরে।

পরিদৃশ্যমান জগতের এই আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে হইলে ইহাকে কেবল মাত্র দর্শনোপলব্ধির বিষয়ীভূত অর্থাৎ মানস ব্যাপার বলিয়া মানিতে হয়। ইহার ফলে দেকার্ত্তে সকল জাগতিক ব্যাপারে যে মানস ও বাস্তবরূপ দ্বৈত-বাদ

আরোপ করিয়াছেন, তাহার মূলে কুঠারঘাত করা হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শাখায়ই চরম অবস্থায় বৈজ্ঞানিককে একমাত্র দর্শনের উপরেই নির্ভর করিতে হয়; এবং ইহার সাহায্যে যে জ্ঞান আহরিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব দিকও উপেক্ষার নহে। শুধু ইহাই নহে; মাখ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সকল অনুভূতিই বহির্জগতের অংশমাত্র। অতএব পক্ষান্তরে এ'কথাও বলিতে পারা যায় যে, বহির্জগৎ একান্তভাবে আমাদের অন্তরেই অবস্থান করিতেছে; বাহিরে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই। মাখ এইভাবে জড়জগৎ সম্পর্কে দ্বৈতবাদের পরিবর্তে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। স্পিনোজা ও কাণ্টের দর্শনে ও শঙ্করের মায়াবাদে ইহার দার্শনিক দিক পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, দার্শনিকের আত্মতন্ত্রতা বৈজ্ঞানিকের আপেক্ষিকতা হইতে পৃথক্। দার্শনিকের ঔৎসুক্য দর্শকের চেতনাগত উপলব্ধি লইয়া, এবং বৈজ্ঞানিকের বাস্তব অনুভূতি লইয়া। কোনও ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণে দার্শনিকের পক্ষে দর্শকের চেতনাবিশিষ্ট মনকে উপেক্ষা করা চলিবে না; কিন্তু দর্শকের স্থানে আলোকচিত্রের প্লেট, ঘড়ি বা অপর কোনও লেখক-যন্ত্র রাখিলেও বৈজ্ঞানিক আপত্তি করিবেন না। তথাপি উভয় প্রকার চিন্তাধারারই মূল কারণ ও প্রকৃতি একই।

এই বিচারে নিরপেক্ষ স্থান ও কালের ধারণা যুক্তি-বহির্ভূত হইলেও বিজ্ঞান-জগতে যে ইহারা এতদিন টিকিয়া ছিল, তাহার কারণ নিউটনীয় পদার্থশাস্ত্রে ইহাদের অপরিহার্য্যতা। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, নিউটনীয় পদার্থ-শাস্ত্র ইহার গাণিতিক সম্পূর্ণতার জন্য জাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যায় অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু সমগ্র নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান নিরপেক্ষ গতি ও নিরপেক্ষ বেগবৃদ্ধির (acceleration) উপরে প্রতিষ্ঠিত। নিরপেক্ষ স্থান ও সময় পরিত্যক্ত হইলে ইহার দাঁড়াইবার জায়গা থাকে না।

আপেক্ষিক তত্ত্ব স্থান ও কালের পার্থক্য অস্বীকার করিয়া স্থান-কালের সমন্বয় সাধন করিয়াছে; এবং নিরপেক্ষ গতির পরিবর্ত্তে একমাত্র আপেক্ষিক গতি স্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আইনষ্টাইন Theory of Tensors-এর সাহায্যে ইহার যে গাণিতিক রূপ দান করিয়াছেন—তাহা যে শুধু বাস্তব জগতের নিউটনীয় ব্যাখ্যাকে আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা নয়; ইহাতে নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের হিসাবে প্রকৃতিতে যেটুকু গরমিল দেখা যাইত, (যদিও ব্যবহারিক জগতে ইহা উপেক্ষা করা চলে) তাহারও সমাধান হইয়াছে।

গটফ্রীড্ ভিলহেলম্ লাইবনিৎজ্ (১৬৪৬-১৭১৬)।

দেখিতেছি, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে নিরপেক্ষ স্থান ও সময়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল; যদিও লাইবনিৎজ এবং নিউটন স্বয়ংও, দূর হইতে নিরাবলম্বভাবে এক বস্তুর অপর বস্তুর উপর বল প্রয়োগ—স্বীকার করিতে পারেন নাই। নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞানে 'বল'কে সর্ব্বপ্রকার গতি-প্রচেষ্টার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হেত্বাভাস মাত্র। কোনও গমনোন্মুখ বস্তুকে বাধা দিতে বা বিচলিত করিতে গেলে আমাদের পেশীতে শক্তি-প্রয়োগ-জনিত অনুভূতি বা বল উৎপন্ন হয়—ইহা আমরা জানি। কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীর উপর অথবা লুব্ধক দক্ষিণ মেরু নক্ষত্রের উপর মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া অনুরূপ বল (!) প্রয়োগ করিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে মন বাধা পায়। তথাপি প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহের গাণিতিক

ব্যাখ্যা সহজ ও বোধগম্য করে বলিয়া পদার্থবিদ্ ইহার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন।

কালক্রমে বৈজ্ঞানিকগণের এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 'বল' জিনিষটির অস্তিত্বই নাই; ইহা বস্তুর পরিস্থিতি ও বেগবৃদ্ধির মধ্যস্থ একটি গাণিতিক সংজ্ঞোযক মাত্র। কিন্তু গতি-বিজ্ঞানে ইহা অপরিহার্য্য নয়। নদীর জল পৃথিবীর আকর্ষণে সমুদ্রের পানে প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু নদীর পাড় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক ও আবেষ্টন যে তাহাকে এই পথে চলিতে বাধ্য করিতেছে না—তাহার প্রমাণ কোথায়? শুধু ইহাই নয়; কীর্শফ্ এবং মাখ দেখাইয়াছেন, 'বল' কল্পনা না করিয়াও গতিবিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব। ইহাদের পরিকল্পিত গতি-বিজ্ঞানকে হার্ৎজ যে সর্ব্বাঙ্গীনতা দান করিয়াছেন, তাহার ন্যায়সিদ্ধ-রূপ ইউক্লিডের সমতুল্য।

অতএব দেখিতে পাইতেছি, নিরপেক্ষ দেশ ও কালের যে ব্যাখ্যাগত ও গাণিতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহাও আর নাই।

ইহা ব্যতীত আরও দুইটি ব্যাপারে নিউটনীয় পদার্থ-শাস্ত্রের অটলতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আঘাত লাগিয়াছে। এবং ইহার ফলে নিউটনের সার্ব্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়া আইনষ্টাইনের পথ প্রশস্ত হইবার সুবিধা হইয়াছে। নিউটনের সমসাময়িক ডাচ্ বৈজ্ঞানিক হায়গেন্স্ সর্ব্বপ্রথম আলোকের তরঙ্গ-প্রকৃতি নিরূপণ করেন; ইতিপূর্ব্বে নিউটন আলোককে ভ্রাম্যমান আলোকণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই তরঙ্গের পরিব্যাপ্তির কারণ স্বরূপ ঈথার পরিকল্পিত হইল। এই সর্ব্বব্যাপী আলোক-তরঙ্গবাহী ঈথারের কল্পনা প্রত্যক্ষভাবে নিউটনীয় বিশ্ব-কল্পনার বিরুদ্ধ না হইলেও, ইহা পদার্থবিদ্যার নিউটনীয় কাঠামোর অন্তর্গত নহে। এবং ইহাই প্রথম নিউটনের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। পরবর্ত্তীকালে তড়িৎ-বিজ্ঞানে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজ আলোক-তরঙ্গের সম-ধর্ম্মী তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন; ইহাও ঈথার তরঙ্গ। ইহার ফলে ঈথারের অস্তিত্ব আরও প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে নব্য আলোক ও তাড়িত-চৌম্বক তত্ত্ব নিউটনকে অস্বীকার করিয়াও বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিলাভ করিল। শুধু ইহাই নয়; তড়িৎ বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণায় নিউটনীয় তত্ত্বের বিপরীত যে সকল ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত মতকে অপর যে ব্যাপারে বিচলিত করিয়াছে—তাহা অন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভাবনা ও বিকাশ। বিশুদ্ধ গণিত হিসাবে ইউক্লিডের জ্যামিতির অতুলনীয় ন্যায়সিদ্ধ সম্পূর্ণতা নিউটনের পদার্থ-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার পরিপূরক। এই উভয় শাস্ত্রই গ্রীক দর্শনের ন্যায় নিখুঁত এবং উহার দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু লোবাচেভ্স্কির ও রীমানের জ্যামিতি—যাহার আরম্ভ ইউক্লিডের জ্যামিতির ন্যায় বিন্দুর কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহাও প্রয়োজনীয়তায় ন্যূন নহে। ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রধানতঃ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা—যাহাদের যাথার্থ্যের কোনও প্রমাণ নাই—এবং নিছক যুক্তিশাস্ত্রের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। দেখা গিয়াছে, জড় জগৎ প্রকৃত পক্ষে ইহাকে মানিয়া চলে না। লোবাচেভ্স্কি ও রীমানের জ্যামিতি বাস্তব পরিমাপ এবং পদার্থশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এবং ইহাই বস্তুতঃ প্রাকৃতিক জ্যামিতি। ইউক্লিড, লোবাচেভ্স্কি ও রীমানের জ্যামিতির মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ; লোবাচেভ্স্কি প্রমাণ করিয়াছেন—উহা দুই সমকোণ অপেক্ষা কম; এবং রীমান দেখাইয়াছেন, বাস্তব জগতে উহা সর্ব্বদাই দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর!

আমরা দেখিতে পাইতেছি—ক্লাসিক পদার্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তির দিক হইতে আপত্তি নিউটনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু মাত্র গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহা বহু পরিমাণে বাস্তব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে। বুধ গ্রহের স্ফুট-বিন্দুর আবর্ত্তন—যাহার পরিমাণ এক বৎসরে ৪২″ সেকেণ্ড মাত্র—যে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না,—ইহা অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বেই জানা থাকিলেও, আলোকের গতির নিরপেক্ষতা, গতিবেগের সহিত সর্ব্ববস্তুর আয়তনের সঙ্কোচ ও বস্তুমানের বৃদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক পরীক্ষালব্ধ তথ্যই ইহাকে বিশেষ ভাবে বলযুক্ত করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাগুলি হইতে দেখা যাইবে, আইন-ষ্টাইনের অভ্যুদয়ে আকস্মিকতা কিছুই নাই। তাঁহার নিজের

ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহার পূর্ব্বসূরিগণ বিজ্ঞান-জগতে যে বর্ত্ম রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আইনষ্টাইনের না আসিয়া উপায় ছিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে, আপেক্ষিক তত্ত্ব যদি বিজ্ঞান-জগতে চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতির অপরিহার্য্য ফল হয়, তাহা হইলে ইহার অপ্রত্যাশিত দুর্ব্বোধ্যতার সমাধান কোথায়? ইহার উত্তর এই—ব্যবহারিক জগতের ন্যায় বিজ্ঞান-জগতেও আমরা সংস্কারমুক্ত নহি। বিজ্ঞানের পথে আমরা সর্ব্বদাই কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা অর্থাৎ মনগড়া ধারণা মানিয়া লইয়া যাত্রা সুরু করি। দীর্ঘ দিনের পৌনঃপুন্যের ফলে ইহারা ক্রমশঃ সংস্কারে পরিণত হয়, এবং তখন কেহ ইহার যাথার্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিলে ক্ষুব্ধ হই। একটি দৃষ্টান্ত লইলে ইহা স্পষ্ট হইবে। আমরা সকলেই জানি, সংসারে কোথাও জ্যামিতিক বিন্দু, সরল রেখা বা বৃত্তের অস্তিত্ব নাই। ইহাদের জ্যামিতিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলেই এ কথা ধরা পড়িবে। অথচ এই সকল সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের প্রগাঢ় অবস্থা। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রে ইহার আর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কোনও বস্তুর উপর বাহির হইতে বল প্রয়োগ না করিলে—ইহা স্থির অচল অবস্থায় থাকে, অথবা চিরকাল ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত বেগে সরল রেখায় চলিতে থাকে। সমগ্র নিউটনীয় গতি-বিজ্ঞান প্রধানতঃ এই সূত্রকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও ইহার একটি মাত্র দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ কথা আমরা ভাবিতেও পারি না যে, যে ব্যাপারের একটিও দৃষ্টান্ত বাস্তব জগতে দেখা যায় না, তাহা নিশ্চয়ই অবাস্তব কল্পনা মাত্র! অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত শক্তি ও কার্য্যের সংজ্ঞার মধ্যে দেখিতে পাই। শক্তি বা কার্য্য বল ও দূরত্বের গুণফলের সমান। এই সংজ্ঞায় আমরা কেহই আপত্তি করি না। কেন করি না তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষেও পূর্ব্বোক্তরূপ বৈজ্ঞানিক সংস্কারই প্রধান প্রতিবন্ধক। যদি আমরা প্রথম হইতেই এই প্রকার সংস্কারের মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত না হইতাম, তাহা হইলে আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের নিকট অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য হইত। রাসেল এবিষয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মনে করা যাক, পাঠককে ঔষধপ্রয়োগে সংজ্ঞাহীন করিয়া একটি বেলুনে তোলা হইল। পুনরায় জ্ঞান হইলে, তিনি বুদ্ধি ও বিচারশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সুপ্ত রহিল। এই সময়ে দেওয়ালীর অন্ধকার রাত্রে বেলুনটি কলিকাতার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। বেলুন হইতে নীচের দিকে চাহিলে অন্ধকারের জন্য তিনি কোনও বস্তুই দেখিতে পাইবেন না; কেবলমাত্র দেখিবেন, নানাবিধ

আলবার্ট আইনষ্টাইন (১৮৭৯-)। [হারমান ষ্ট্রুপ্ অঙ্কিত]

আলোকমালা ও অসংখ্য আলোক-রশ্মি বিচিত্র গতিতে নানা দিকে বিসর্পিত হইতেছে। এই অবস্থায় পাঠকের মনে জগৎ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জন্মিবে? তাঁহার মনে হইবে, জগতে কোনও কিছুই স্থির বা স্থায়ী নহে; এবং ইহা কতকগুলি অদ্ভুত সংক্ষিপ্ত আলোকস্ফুরণের সমষ্টি মাত্র। ইহার কিছুই স্পর্শ দ্বারা অনুভবযোগ্য নয়; দর্শনই ইহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। এই অভিজ্ঞতা হইতে বুদ্ধিমান পাঠক যে প্রাকৃতিক জ্যামিতি ও পদার্থশাস্ত্র রচনা করিবেন, তাহা প্রচলিত জ্যামিতি ও পদার্থশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন

প্রকার হইবে। যদি কোনও সাধারণ মর্ত্তালোকবাসী তাঁহার সহিত জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা কেহই অপরের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কিন্তু আইনষ্টাইন যদি পাঠকের নিকট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই জগৎ ব্যাপার সম্বন্ধে একমত হইবেন।

দেখিতে পাইতেছি, নিউটনীয় ক্লাসিক পদার্থ-শাস্ত্র কয়েকটি কাল্পনিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা সত্ত্বেও যে ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং ইহার অনুপপত্তি অলক্ষিত ছিল, তাহার একটি কারণ, ব্যবহারিক জগতে পরীক্ষালব্ধ অনেক ফল—ইহার সাহায্যে নিষ্পন্ন পরিণামের সহিত (মোটামুটি) মিলিয়া যায়। এরূপ হইবার প্রধান হেতু এই যে, আমরা যে গ্রহের অধিবাসী—সৌভাগ্যবশতঃ তাহার উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ইহার উপরকার বস্তুসংস্থান প্রায় স্থায়ীরূপ লাভ করিয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের আপেক্ষিক অবস্থানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না, এবং একখণ্ড প্রস্তর এখানে ফেলিয়া রাখিলে, কিছুক্ষণ পরে উহা সুইটজারল্যাণ্ডে হাওয়া খাইতে যাইতেছে না। ইহার ফলে যে কেবল নিউটনীয় পদার্থশাস্ত্র ব্যবহারিক ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা নয়; জগৎ সম্পর্কে আমাদের মনে এরূপ কতকগুলি ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহা ইহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিপন্থী।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে জগতের যে রূপ ধরা পড়িয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে কি পাওয়া যায়—দেখা যাক। জড়বস্তুর রাজ্যে আমরা মাঝারি আকৃতির বলিয়া জগতের যে পুঞ্জীভূত চেহারা দেখিতে পাই—ইহা তাহার প্রকৃত রূপ নহে। যদি আমরা সহসা তড়িৎকণার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া যাই, তাহা হইলে দেখিব, বিশ্বে কোথাও নিরেট বস্তু নাই; সর্ব্বত্রই প্রায় অসীম শূন্য স্থানের মধ্যে দূরে দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা সকল অসম্ভব বেগে ছুটাছুটি করিতেছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখণ্ডের সম্পূর্ণ আকৃতি দুই একজন প্রতিভাশালী গণিতবিদ্ ব্যতীত অপর কাহারও ধারণায় আসিবে না। পক্ষান্তরে যদি আমরা নক্ষত্রের বিশালতা লাভ করি এবং আমাদের উপলব্ধিও সমানুপাতে মন্থর হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ঠিক অনুরূপ দৃশ্যই দেখিতে পাইব—মহাশূন্যে সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ ভীম বেগে ইতস্ততঃ ছুটিতেছেন। বিশ্ব-জগতের এই রূপ দেখিতে পাওয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বিমানচারীর সমতুল্য হইয়াছে। ইহার ফলে, জ্যামিতি ও পদার্থশাস্ত্রকে ভাঙিয়া যে নূতন রূপ দান করিতে হইয়াছে—তাহাই ইহাদের সত্যতর রূপ।

বাস্তব জগতের এই প্রকৃত রূপ সমগ্র পদার্থশাস্ত্রকে যে ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—তাহা বিস্ময়জনক। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বহির্জগত সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি ও জ্ঞান প্রধানতঃ স্পর্শ ও দর্শনের সাহায্যে হয়। দেখা গিয়াছে, দুইটির মধ্যে দৃষ্টি স্পর্শ অপেক্ষা অধিকতর অভ্রান্ত: যদিও সাধারণতঃ স্পর্শানুভূতিকেই অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। এবং বিজ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রে দৃষ্টি ব্যতীত অপর কোনও অনুভূতি-জ্ঞাপক আমাদের হাতে নাই। সহজেই বুঝা যায়—দর্শনলব্ধ জ্ঞান দর্শকের অবস্থানসাপেক্ষ হইবে। ইহা পূর্ব্বেও জানা ছিল; এবং কোন ঘটনা দুই বিভিন্ন দর্শক লক্ষ্য করিলে, তাহাদের অবস্থান পার্থক্যহেতু উভয়ের উপলব্ধির পার্থক্যেরও সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনও স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইলে, নিকটে অবস্থিত ব্যক্তি কিছু পূর্ব্বে, এবং দূরে অবস্থিত ব্যক্তি কিছু পরে উহা শুনিবে। দুই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিলেও, শব্দের বেগ জানা থাকিলে —উভয়ের বর্ণনা হইতেই শব্দ উৎপন্নের একই সময় নির্দ্দেশ করা যায়। এইভাবে, চিরকালই প্রাকৃতিক ব্যাপারে সর্ব্ব-প্রকারে ব্যক্তিগত অংশ অপসারিত করা হইয়াছে, এবং মনে করা হইয়াছে—এইরূপে নিষ্কাশিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত।

কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ ভাগে কয়েকটি বিখ্যাত পরীক্ষায় যে অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, দুইজন দর্শকের উপলব্ধির পার্থক্য কেবলমাত্র তাহাদের অবস্থানের উপরেই নির্ভর করে না; উহা তাহাদের আপেক্ষিক বেগের উপরেও নির্ভর করে। দুই একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। যদি দুইজন বিভিন্ন বেগবান দর্শক আলোক-সঙ্কেতের সাহায্যে একটি বস্তুর আয়তন পরিমাপ করে, তাহা হইলে আলোকের বেগ এবং তাহাদের নিজেদের বিভিন্ন বেগ-জনিত অসঙ্গতি দূর করিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক সিদ্ধান্তে

উপনীত হইবে। ইহার একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে এই যে, এই দুই দর্শক সময়ের অবকাশ সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে। এই দুই দর্শকই যদি পর পর দুইটি ঘটনা —মনে করা যাক—দুইটি বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিতে পায়, এবং প্রত্যেকে নির্দ্দোষ ঘড়ির সাহায্যে ইহাদের অবকাশকাল লক্ষ্য করিয়া, আলোকের গতি ও নিজেদের গতি হইতে গণনা দ্বারা বিদ্যুৎস্ফুরণ দুইটির মধ্যবর্ত্তী সময় নির্দ্দেশ করে—তবে তাহাতেও পার্থক্য দেখা যাইবে। এই পার্থক্য কোনও ভ্রান্তি বা যন্ত্রের ত্রুটিবশতঃ নহে। এবং প্রত্যেক দর্শকের পক্ষে তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তই সত্য হইবে।

একথা ঠিক যে দুই দর্শকের আপেক্ষিক গতিবেগ অতি বৃহৎ—প্রায় আলোকের বেগের সমপর্য্যায়ের না হইলে, এই পার্থক্য অনুভবযোগ্য হইবে না। এই জন্যই ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত দুই দর্শক কোনও অবকাশ-স্থান বা অবকাশ-কাল একই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তির আপেক্ষিক গতির ঊর্দ্ধ সীমা ঘণ্টায় পাঁচ ছয় শত মাইলের অধিক হইতে পারে না। আলোকের গতির তুলনায় (সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল) ইহা নগণ্য। ভূপৃষ্ঠে আমাদের আপেক্ষিক গতির অল্পতা নিউটনীয় পদার্থশাস্ত্রের এত দীর্ঘকাল অবিচলিত থাকিবার অন্যতম কারণ; যেহেতু ইহাতে বেগ প্রভৃতি পরিমেয় রাশির পরিমাপ অপরিবর্ত্তনীয় দৈর্ঘ্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দৈর্ঘ্য ও বেগের আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রকাশিত হওয়ায়, নিউটনীয় পদার্থশাস্ত্রের ভিত্তি অপসারিত হইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জড়-জগতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং যাহা লইয়া বর্ত্তমানে বিশেষরূপে ব্যাপৃত আছে, সেখানে দুই বস্তুর আপেক্ষিক বেগ, আলোকের বেগের সম-পর্য্যায়ের। দুইটি তড়িৎ কণার আপেক্ষিক বেগ আলোকের বেগের নয়-দশমাংশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব ইহাদের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়ে আপেক্ষিকতাকে অবহেলা করা চলিবে না। দর্শক ও তড়িৎকণার আপেক্ষিক বেগও অনুরূপ পর্য্যায়ের হইতে পারে। ইহার ফলও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পরীক্ষাগারে পর্য্যবেক্ষকের চোখের উপরে তড়িৎকণা, যাহা সকল জড় বস্তুর একটি চরম উপাদান—তাহার বস্তুমান পাঁচ ছয় গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইহার আর একটি দিকও বিবেচনার যোগ্য। অসীম বিশ্বে কোনও বস্তুই নিরপেক্ষ ভাবে স্থির হইয়া নাই। অপর কোনও বস্তুর তুলনায় তাহার অপেক্ষিক গতি আছে। এই গতি অন্যোন্যসাপেক্ষ। রাম শ্যামের নিকট হইতে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছেন—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে শ্যাম রামের নিকট হইতে এই বেগেই দূরে চলিয়া যাইতেছেন—ইহাও সত্য। প্রকৃত পক্ষে কে চলিতেছে—তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করা চলে না; কারণ ইহা নির্দ্দেশ করিবার কোন অপরিবর্ত্তনীয় চরম নিরিখ বিশ্বে নাই। অতএব জগতে বিশুদ্ধ গতির কোনও অর্থ হয় না; গতি কেবল মাত্র আপেক্ষিকই হইতে পারে। কোপার্নিকাসের পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সমন্বিত আকাশ প্রত্যহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কোপার্নিকাস বলিলেন, পৃথিবীই প্রকৃত পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করে; এবং নিউটন ও গ্যালিলিও ইহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু আপেক্ষিকতার বিচারে এই দুইটি বর্ণনাই সত্য। দর্শক যখন নিজেকে যেখানে অধিষ্ঠিত মনে করিবেন, সেইটির সম্পর্কে অপরটি ঘুরিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনও একটিকে প্রাধান্য দিবার বৈজ্ঞানিক হেতু নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, যেহেতু বাস্তব জগতে সকল বস্তুরই আপেক্ষিক গতি আছে এবং যেহেতু ইহাদের মধ্যে বস্তু-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অতএব প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠিত দর্শকগণ একই প্রাকৃতিক ব্যাপারের অন্তর্গত দৈর্ঘ্য, বেগ, সময়, বস্তুমান প্রভৃতির যে বিভিন্ন পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কি? এবং ইহাদের মধ্যে কাহার লব্ধ ফল যথার্থ বলিয়া লওয়া চলিবে? তাহা হইলে কোনও ঘটনার কি কেবল মাত্র দর্শকগত আপেক্ষিকতাই আছে? উহার নিরপেক্ষ নিজস্বতা কিছুই নাই?

ইহারই উত্তর আইনষ্টাইন দিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন, একই ব্যাপার সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শক-গণের মধ্যে যিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাঁহার নিকট তাহাই সত্য। এবং আপেক্ষিক তত্ত্বে একই ব্যাপারের এই বিভিন্ন আপেক্ষিক সিদ্ধান্ত হইতে ঘটনাটির একটি নিরপেক্ষ নিজস্বতা নির্ণয় করিবার গাণিতিক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিউটনীয় পদার্থ-বিদ্যা ও আইনষ্টাইনের পদার্থবিদ্যায় প্রধান পার্থক্য এইখানে।—নিউটন কাল্পনিক সংজ্ঞা ও সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তিশাস্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব্ব নিখুঁত সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু আইনষ্টাইন একমাত্র বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সাম্ভাব্যতার নিয়ম অনুসরণ করিয়া বাসোপযোগী সুদৃঢ় গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। নিউটনীয় সৌধের সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য ইহার নাই। এবং হয়ত ইহা কখনই সে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। কারণ সকল জিনিসের ন্যায় সত্যও আপেক্ষিক মাত্র; এবং তাহার আপেক্ষিকতা নিরাকরণ করিবার গাণিতিক উপায় আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুখুজ্জে মশায়

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গয়লার ঘরে বিবাহে কন্যা পণ পায়। ছোট্ট বৎসর ছয়েকের একটি মেয়ে, তাহার পণ একশত হইতে দেড়শত টাকায় উঠিয়াছে। এক পক্ষে গুপ্তিপাড়ার বাবুদের ৪৭৪নং তৌজির প্রজা গোপাল ঘোষ, অপর পক্ষের পাত্র হারাণপুরের মুখুজ্জেদের জমিদারীর প্রজা শিবু ঘোষ। শিবু আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল জমিদারের খুড়ো বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী।

কীটদষ্ট ফলের মত খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণ, কুব্জদেহ মুখুজ্জে তখন প্রচণ্ড বর্ষায় ভগ্ন একটা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন, ভাঙ ভাঙ, যত পারিস ভেঙে সাধ তোর মিটিয়ে নে।

তারপর ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের একটা পিচ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, কচু করবি, তুই আমার করবি কচু। কাল চলে যাব পাকা বাড়ীতে। এত বড় পাকা বাড়ী পড়ে খাঁ খাঁ করছে। হীরু ত সাধাসাধি করছে—দানপত্র লেখাপড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। কাল রেজেষ্টারী করে নেব।

হীরু অর্থাৎ হীরেন্দ্র, গ্রামের জমিদার। ব্যবসায়ে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়া আজ দুই পুরুষ তাহারা কলিকাতা-বাসী। সম্প্রতি বালিগঞ্জে প্রাসাদের মত বাড়ী করিয়া সেইখানেই স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। তাহাদেরই পাকা বাড়ীটার কথা বিষ্ণু মুখুজ্জে বলিতেছিলেন। শিবু আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া পা ধরিতে গেল। মুখুজ্জে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এ্যাই-ও-এ্যাই-ও! তফাৎ থেকে, তফাৎ থেকে যা বলছিস বল।

পা লইয়া মুখুজ্জের বড় ভয়। একটি পা তাঁহার খোঁড়া। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মুখুজ্জে পিছাইয়া গেলেন।

শিবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমায় বাঁচান, খুড়ো-হুজুর।

মুখুজ্জে একটা মোড়ার উপর বসিয়া গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, কি, হয়েছে কি তোর?

শিবু কাঁদিতে কাঁদিতেই আরম্ভ করিয়াছিল, একশ টাকায় কথা-বার্ত্তা আমার সঙ্গে পাকা হয়েছিল—

মুখুজ্জে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, চোপ রও ব্যাটা, খেঁকী কুকুরের বাচ্চা—কাঁদছিস্ কেন—বলি, তুই কাঁদছিস কেন? মোছ বেটা চোখের জল মোছ। যা বলবি ভাল করে বল। তা না, এ্যাঁই-এ্যাঁই!

কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিয়া শিবু কথাটা কোনরূপে শেষ করিয়াই আবার কাঁদিয়া সারা হইল। মুখুজ্জে বলিলেন, এ্যাঁই-এ্যাঁই······আবার কাঁদে, আবার কাঁদে! চোপ বেটা চোপ, এখন কি করতে হবে বল।

শিবু চুপ করিয়া রহিল। অন্তরের কথাটা প্রকাশ করিতে ভরসা হইতেছিল না। মুখুজ্জে উত্তেজনাভরে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরময় ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিলেন, এ হল গোটা গাঁয়ের অপমান। ৪৭৭ নম্বর তৌজির সঙ্গে ২৭২ নম্বরের চিরকেলে ঝগড়া। পাঁচ হাত প্রস্থ একটা নালা—তার জন্যে দু হাজার টাকা খরচ। তুই বেটা হারামজাদা জমিদারের শুদ্ধ মুখ হাসালি। হীরু শুনলে বলবে কি আমায়? নিয়ে আয়, আজই রাত্রে মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আয়।

শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল। মুখুজ্জে প্রবল রোষে খোঁড়া পাটাই মাটীর উপর ঠুকিয়া বলিলেন, ডাক তোদের সব গয়লাকে। ভেমো ব্যাটাদের মান-অপমান জ্ঞান নাই, ষাট বছর নইলে সাবালক হয় না—কলঙ্ক, তোরা গাঁয়ের কলঙ্ক।

শিবু শুষ্ক মুখে বলিল, আজ্ঞে সে বড় বিপদের কাজ। থানা-পুলিশ ফৌজদারী।

মুখুজ্জে মোড়াটার উপর বসিয়া খোঁড়া পাখানি টিপিতে টিপিতে বলিলেন, এ:, কানা-খোঁড়ার আগী দোষ—সে কথা মিথ্যে নয়। হুঁ:, থানা পুলিশ—সে একটা কথা বটে।

শিবু বলিল, আজ্ঞে তাই ত' বলছিলাম—শেষকালে জেল-টেল—

মুখুজ্জে আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তার আর আমি কি করব? তুই খাটবি জেল, না, তুই বিয়ে করবি আর আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘানি টানব? না—গাঁয়ের মুখ হেঁট হবে।

শিবু আবার মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে কিছু টাকা বাবুর ইষ্টাট থেকে—

মুখুজ্জে গম্ভীর হইয়া গেলেন। শিবু বলিল, আজ্ঞে আপনি যদি বলে দেন—তা' হলে বাবু নিশ্চয় দেবেন।

মুখুজ্জে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা ত' দেবেন। কিন্তু কথা কি জানিস, শিবু?

মুখুজ্জে অকারণে বারকয় নাক ঝাড়িয়া সহসা আকাশের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ঝিপির—ঝিপির—ঝিপির চব্বিশ ঘণ্টা, বিরাম নেই। বেটার যেন বাপ মরেছে, কান্না আর ফুরোয় না রে বাপু।···তাইত' শিবু, টাকা—কিন্তু শোধ করবি কিসে? জানিস ত'—এইটে বলে খাব-খাব এইটে বলে কোথা পাব? এইটে বলে ধার করগে এইটে বলে শুধবি কিসে—এইটে বলে খট-খট—লবডঙ্কা!

তিনি কনিষ্ঠা হইতে একে একে অঙ্গুলিগুলি নাড়িয়া সর্ব্বশেষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লবডঙ্কা দেখাইয়া দিলেন। মুখুজ্জেগিন্নী অন্তরাল হইতে বোধ করি সব শুনিয়াছিলেন। পঞ্চাশেরও অধিক বয়স্কা প্রৌঢ়া এতখানি ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শিবুকে দেখিয়াও তাঁহার লজ্জা। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, বলি হ্যাঁগা—লোকটা কাঁদছে তোমার পায়ে ধরে, তবুও তোমার দয়া-মায়া নাই। তুমি বলে দিলে যদি হীরু টাকা দেয়, তা তোমার একশ বার দেওয়া উচিত।

মুখুজ্জে বলিলেন, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। এই স্ত্রীবুদ্ধিতেই দেশটা মাটী হল। বলি ও শোধ করবে কিসে শুনি?

মুখুজ্জেগিন্নী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, বলিলেন—কেন? শিবু জোয়ান বেটাছেলে, খেটে শোধ দেবে, রোজকার করে শোধ দেবে।

মুখুজ্জে আবার প্রশ্ন করিলেন, খেটে শোধ করতে পারবে শিবু? তুমি বলছ? তা' পারবে না? জোয়ান বেটাছেলে!

মুখুজ্জে বলিলেন, তা' হলে না হয়—তাই চলবে শিবু কলকাতাই চল।

মুখুজ্জেগিন্নী বলিলেন, তুমি বলে দিলে হীরু দেবে ত' টাকা?

মুখুজ্জে তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললে—কি বললে তুমি?

গিন্নী এতটুকু হইয়া গেলেন, অপরাধীর মতই তিনি বলিলেন, না না, তা' বলিনি আমি, হীরু ছেলেমানুষ। বড় ঠাকুর থাকলে—সে কি আর জানিনে আমি!

তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

মুখুজ্জে বলিলেন শিবুকে, দ্যাখ শিবে, এই দেড়শো টাকা দিয়ে কালসাপ ঘরে আনছিস তুই। বুঝে কাজ কর।

শিবু কিছুই বুঝিতে পারিল না, অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

মুখুজ্জে বলিলেন, এই মেয়েমানুষ জাতটাই পাজী। চব্বিশ ঘণ্টাই মতলব, কেমন করে বিচ্ছেদ ঘটাবে। সব পর করে তবে ছাড়বে। শুনলি, শুনলি তুই মাগী কি বললে? বলে হীরু তোমার কথা রাখবে ত! আরে সে হল আমার ভাইপো। মনে পড়ে, মনে পড়ে তোর দাদাবাবুকে? ব্যাটা হাঁদলা, চেয়ে আছে দেখ। ওরে হারামজাদা, হীরুর বাপকে, কত্তাবাবুকে মনে পড়ে? বেট্টা ছাড়া তার কোন কাজ হত না। বাঁশবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাতে অন্ধকারে গর্ত্তে পা আটকে পা ভেঙে গেল। চুঁচড়োর হাসপাতালে দাঁত মেলে পড়ে রইলাম। দেওয়ালের ওপর পা তুলে দিয়ে গান করি, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?' আর চেঁচাই, কলকাতা থেকে মটর করে দাদা গিয়ে হাজির। প্রথমেই দিলেন কানটা মলে। বললেন, গাধা যাত্রা শুনতে যাও তুমি বাঁশবেড়ে? গ্রামে দেখে খেদ মেটে না তোমার? তারপর রোজ রোজ মটর করে আসা চাই। ফলফুলুরী ঝুড়ি করে দিয়ে যেতেন। দিয়ে দিতাম ডাক্তারদের, নে বেটারা খেয়ে নে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, সেই হল কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ। ডাক্তার বেটারা বলে কি—এ ত' কেউকেটা নয়। চাইলে, ঘুঁষ দাও, বড়লোক তোমরা, তোমরা না দিলে আমরা পাই কোথা! বেগে হতভাগীর বেটারা শেষে পাটাই খাটো করে দিলে।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া মুখুজ্জে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন দাদা যদি থাকতেন আর আমি যদি যেতাম শিবে! তিনি থাকলে আজ আমি ভাবতাম?·· তা হোক, নে, বাঘ নেই বাঘের বাচ্চা আছে।

হীরুও ভারী ভাল ছেলে। যা তুই গোটা পাঁচেক টাকা যোগাড় করে ফেল। এই দুপুরের গাড়ীতেই যাব চল।

চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া মুখুজ্জে বাহির হইবেন এমন সময় মুখুজ্জেগিন্নী বলিলেন, হ্যাঁ গা তুমি ত চললে চালে কিছু খড় চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা—

মুখুজ্জে বাধা দিয়া বলিলেন, যাক ভেঙে পড়ে। পাকা বাড়ীর চাবী নিয়ে আসব। জিনিষপত্তর তুমি বরং বেঁধে-ছেঁদে রাখ।

* * *

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়াই মুখুজ্জে শিবুকে সাবধান করিয়া দিলেন, সাবধান বেটা গয়লা—এ আবার সিমেণ্টের ওপর বার্নিশ করা আছে। পা একবার হড়কালে আর রক্ষে নেই, একেবারে আলুর দম। এ্যাই—এ্যাই, বেটা ভেমো হাঁ করে দেখছে দেখ। ওরে বেটা ওসব কেরোসিনের ডিপে নয়—ইলেকট্রি আলো। চল বেটা চল। এ্যাই শিবে—ধর না আমাকে একটু, খোঁড়া পা আমার, ধর ধর।

বড়বাজারের মোড়ে আসিয়া বলিলেন, শিবে, শুধু হাতে বাড়ীতে যাওয়া ভাল হবে? গেলেই ত' হীরুর ছেলেমেয়েরা ছুটে আসবে, দাদাবাবু এসেছে—দাদাবাবু এসেছে। কি বলিস তুই?

শিবু এতক্ষণ একটি কথাও কয় নাই, সে অবাক হইয়া দেখিতেছিল মহানগরীর বিপুলতা আর তার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার। ঈর্ষা সে করে নাই, একান্ত ক্ষুদ্র জীবনের অতি স্বল্প কামনা সভয়ে যেন অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সে শুধু ভাবিতেছিল—এত, এত আছে সংসারে! মুখুজ্জের কথায় শিবু সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিছু মিষ্টি না হয় কিনে ন্যান না খুড়োহুজুর।

মুখুজ্জের কোঁচার খুঁটটি সুকৌশলে ট্যাঁকে গোঁজা ছিল। ট্যাঁক-মুক্ত করিয়া মুখুজ্জে চাদরের খুঁটটি খুলিলেন। খুঁটেয় বাঁধা ছিল দুটি আধুলি। বারকয় নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি আধুলি মুখুজ্জে বাহির করিলেন। তারপর বলিলেন, চার আনার মিষ্টি নিয়ে নি, কি বলিস শিবু?

শিবু সসঙ্কোচে বলিল, আনা আষ্টেকেরই নিয়ে ন্যান খুড়োহুজুর। একটি সিকি সে বাহির করিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, সে ভারী ভাল হবে, ভারী ভাল হবে, শিবু।

মিষ্টি কিনিয়া একটি ভাঁড়ে শালপাতা দিয়া মুড়িয়া লইয়া মুখুজ্জে বলিলেন, যাবার সময় চল হেঁটেই যাই। বেশ সব দেখতে দেখতে যাবি। কি বল্? আসবার সময় ত হীরুর মটরে আসতে হবে, সে ত' ছাড়বে না। কানের পাশ দিয়ে সব দেখতে না দেখতে তীরের মত বেরিয়ে যাবে। এই ত' এইটুকু—কি বল্ শিবু?

শিবুর আপত্তির কারণ ছিল না। সে অগ্রসর হইল। ছোট একটা রাস্তার মোড়ে মুখুজ্জে শিবুর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এ্যাই—এ্যাই, বেটা চলেছে যেন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। চাপা পড়ে মরবি যে!

* * *

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। হীরেন বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোলাহল প্রায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। চাকরেরা শুধু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিতেছিল। মুখুজ্জে শিবুকে লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হাজির হইলেন। আউট-হাউসের বারান্দায় একখানা খাটিয়া পড়িয়া ছিল, সেটার উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, বাপ্‌রে বাপ—বালিগঞ্জ দেখি কিষ্কিন্ধ্যে পেরিয়ে। হীরু আর বাড়ী করবার জায়গা পায় নি রে বাবা!

বাহিরের কলতলায় বলাই চাকর খানকয়েক বাসন লইয়া বসিয়া ছিল। গোবিন্দ ওপাশে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, কেহ কোন উত্তর দিল না। বাড়ীর ভিতর হইতে ঠাকুর হাঁকিতেছিল, বলাই, থালা দিয়ে যাও।

বলাই সে কথারও কোন উত্তর দিল না। শুধু মৃদুস্বরে আপনাকেই বোধ করি বলিল, মর্ বেটা তুই গলা ফাটিয়ে।

মুখুজ্জে বলিলেন গোবিন্দ চাকরকে, বলি ও হে ছোকরা —কি নাম তোমার আহা—মনে করি দাঁড়াও।

মনে কিন্তু পড়িল না। বাড়ীর ভিতর হইতে ঠাকুর এবার বাহির হইয়া আসিল, বলি ক'খানা থালা মাজতে কতক্ষণ যায়রে বলাই?—

বলাই সমান তেজে উত্তর দিল, দাঁড়াও, এ আমার হাত বটে, কল নয়।

ঠাকুর কিন্তু এ কথার কোন জবাব দিল না; সে বলিয়া উঠিল, খুড়োঠাকুর যে! কখন এলেন?

মুখুজ্জে অভিমানাহত স্বরে বলিলেন, দেখ, চিনতে পারছ ত? এরা ত' চিনতেই পারলে না। এই এয়ার-ছোকরা ত ফস্ ফস্ করে বিড়িই টেনে দিলে সামনে। ডাকলাম, বলি কি নাম হে তোমার? তা' কাকে কি বলছ! বাবু বসে বিড়িই টানছেন—বিড়িই টানছেন।

ঠাকুর এ বাড়ীর অনেক দিনের লোক, সে বিগত কর্ত্তার আমল দেখিয়াছে। বাড়ীর মান-সম্মানের দিকে তাহার নজর আছে। সে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁরে গোবিন্দ—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ গোবিন্দে বেটা গোবিন্দে। ভারী ঠেঁটা হয়েছে বেটা। দে বেটা, তামাক দে দেখি। তারপর ঠাকুর, এবাড়ীর খবর সব ভাল? হীরু ভাল আছে? বৌমা? তিনি কেমন আছেন? নাতী-নাতনীরা কেমন আছে সব? বৌদিদি কেমন আছেন? তারপর তুমি কেমন আছ বল দেখি?

ঠাকুর এইবার অবসর পাইয়া বোধ হয় উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখুজ্জে আবার বলিয়া উঠিলেন, বলি হ্যাঁ হে, হীরুর সেই বড় কুকুরটা কি হল হে? সেটাকে দেখছিনে ত! আর সেই সাদা খরগোস দুটো, সে দুটো আছে ত?

বলাই বাসনের গোছাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, থালা নাও ঠাকুর।

ঠাকুর মুখুজ্জের কথার উত্তর না দিয়া বলিল, হাত মুখ ধুয়ে নেন খুড়ো ঠাকুর, আমি ভাত বেড়ে ফেলি।

বলিয়া সে ফিরিল। মিষ্টির ভাঁড়টি তুলিয়া মুখুজ্জে ব্যস্ত ভাবে ডাকিল, আরে শোন শোন—বলি অ—হরিহর! আঃ তোমরা যে দেখি সবাই ঘোড়ায় চড়ে কাজ কর।

ঠাকুরের নাম হরিহর। হরিহর ফিরিল, ব্যস্ত ভাবে বলিল, কি বলছেন—বলুন।

—বলছিলাম—। মুখুজ্জে একটু ইতস্তত করিয়া ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিলেন, তারপর বলিলেন, বলি বৌদিদি জেগে নেই ত? তিনি থাকলে—

—না—না—না—তিনি উপরে গিয়েছেন। ব্যস্তভাবে ঠাকুর চলিয়া গেল।

মুখুজ্জে বলিলেন শিবুকে—তা হলে কি আর রক্ষে থাকত শিবু। ডাক এখুনি ডাক বিষ্ণু ঠাকুরপোকে। তারপর এ কেমন আছে, ও কেমন আছে—সে কেমন আছে—বললাম যে দেশের পশুপক্ষীর খবরটা পর্য্যন্ত নেওয়া চাই। আর এটা খাও—ওটা খাও—বুঝলি কি না। সেবার আমার পেটের অসুখই করে গেল। আর নাতী-নাতনীরা জেগে থাকলে ঠকাঠক্ পেল্লাম, খোঁড়া পা নিয়ে সে আমার এক বিপদ!

শিবু একান্ত সঙ্কোচভরে বলিল, বাবুর সঙ্গে একবার দেখাটা করলে হত না!

মুখুজ্জে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, মারব বেটাকে খোঁড়া পায়েই এক লাথি! হারামজাদা বেটা—এ কি তোর ওই গুপ্তিপাড়ার বাবুরা নাকি? সমস্ত দিন আপিসে কাজ করে বেচারা একটু শুয়েছে। দেখছিস না বেটা ঘরে ঘরে নীলবর্ণ আলো জ্বলছে! দেখেছিস কখনও এমন আলো, শূয়ারকি বাচ্চা?

ঠাকুর বাড়ীর ভিতর হইতেই ডাকিল, আসুন খুড়ো-ঠাকুর—জায়গা হয়েছে।

মুখুজ্জে উঠিলেন, বলিলেন, গোবিন্দে, তামাক কি হল র‍্যা—?

গোবিন্দ সেখানে ছিল না। মুখুজ্জে ধমক দিলেন শিবুকে, নে রে ব্যাটা হাত মুখ ধুয়ে নে। ব্যাটা বিয়ের জন্যই ভেবে অস্থির।

* * *

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড বাড়ীখানা সচল সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অদূরবর্ত্তী রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এর বুকে ট্রামের চাকার ঘর্ঘর শব্দে ও বিদ্যুৎপ্রবাহিত তারের একটা তীক্ষ্ণ গোঙানীতে পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল। মটরের হর্ণের বিচিত্র শব্দ মুহুর্মুহু বাজিয়া চলিয়াছে। হীরেনবাবুর বাড়ীতেও চাকরেরা ঘুরিতেছে যেন কলের পুতুল। সামনের খোলা জায়গাটার উপর দুখানা প্রকাণ্ড মটর সাফ করা হইতেছে। শচীন ড্রাইভার মটরের নীচে শুইয়া একটা নাট্ আঁটিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে কলতলায় একটা ঝি বাসনের ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়াই যেন অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে।

শিবু অবাক হইয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল। মুখুজ্জে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ওদিকের ঘরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, একজন মাষ্টার ছোট ছেলেদের পড়াইতেছে। মুখুজ্জে ফিরিলেন। বারকয়েক এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আর একটা ঘরে ঢুকিলেন। জন দুই ফিট্‌ফাট্ বাবু মোটা মোটা খাতা লইয়া হিসাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই আপনার?

মুখুজ্জের চাহিবার কিছু ছিল না। সে বলিয়া উঠিল, হীরু উঠেছে?

ভদ্রলোক এমন ভ্রূকুটী করিয়া উঠিলেন যে, মুখুজ্জের আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস হইল না। সম্মুখ দিয়া বাবুর খাস খানসামা কানাই কি একটা কাজে চলিয়াছিল, মুখুজ্জে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা কানাই।

কানাই মুখ ফিরাইল। মুখুজ্জে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু কোথায় বাবা?

—ড্রইং রুমে বসে আছেন।

কানাই চলিয়া গেল। মুখুজ্জে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মূল-বাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইলেন। মার্ব্বেলে মোড়া বারান্দা। অতি সন্তর্পণে সমস্ত বারান্দাটা অতিক্রম করিয়া একেবারে পূর্ব্বদিকের ঘরে উঁকি মারিয়া মুখুজ্জে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘরটা ড্রইং রুম। একটা সোফায় বসিয়া হীরেনবাবু গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

মুখুজ্জে একবার নাক ঝাড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা এত ক্ষীণ যে কোন শব্দ তাহাতে উঠিল না। মিনিট দুইতিন পর মুখুজ্জে যেমন নিঃশব্দ সন্তর্পিত পদক্ষেপে গিয়াছিলেন—তেমনি ভাবেই ফিরিয়া আসিয়া খাটিয়াটার উপর বসিলেন।

শিবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুর সঙ্গে—

বাধা দিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, মার্‌বেল দেখেছিস শিবু? মার্‌বেল? মানে মর্ম্মর পাথর? যা দেখে আয়, বারান্দাটা একবার দেখে আয়।

শিবু অবাক হইয়া খুড়োঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুখুজ্জে কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি আবার উঠিয়া পড়িলেন। এবার উঁকি মারিলেন আউট-হাউসেরই আর একটা ঘরে। ঘরের মধ্যে একখানা চৌকীর উপর একটি যুবা বসিয়া অনর্গল কি লিখিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া মুখুজ্জের সাহস হইল। লোকটির পারিপার্শ্বিক ও একাগ্র উদাসীনতার মধ্যে তিনি যেন অভয় পাইয়াছিলেন। চারিপাশে কতকগুলা পোড়া বিড়ি সিগারেট, রাত্রের বিশৃঙ্খল বিছানা তখনো তোলা হয় নাই, এক কোণে মশারীটা জড়ো হইয়া আছে। লোকটি মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া তাকায়, সে দৃষ্টি শূন্য কিন্তু কোমল। মুখুজ্জে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুমি আবার কে হে? নতুন মাষ্টের বুঝি? লোকটি বলিল, না। আমি এঁদের আত্মীয়।

ভ্রূকুটী করিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, আত্মীয়? আমার অজানা? কি নাম তোমার? ভদ্রলোক তখন আবার লেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

পায়ের চেটোর উপর চাপড় মারিতে মারিতে অগত্যা মুখুজ্জে ডাকিলেন, গোবিন্দে অ গোবিন্দে!

কেহ সাড়া দেয় না। মুখুজ্জেও চুপ করিয়া গেলেন। অকস্মাৎ বার দুই নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, এ গুলো ফাঁকা ছিল কত! এই হীরুর মেয়ের বের সময়। হীরু আমার ভাইপো হয়, বুঝলেন!

ভদ্রলোক লিখিতেছিল, কোন সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুখুজ্জে আপন মনেই বলিলেন, তের শো উনচল্লিশ সাল মাঘ মাস। এই ত' মোটে দু বছর!

তারপর আবার বলিলেন, হীরুর মেয়ে এই ত সেদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদত। এরই মধ্যে ছেলে হয়ে গেল। জানেন—হীরুর সঙ্গে আমার খুব নিকট সম্বন্ধ।

শেষের কথাগুলি ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল, কিন্তু সে ইহাতেও কোন উত্তর দিল না। মুখুজ্জে এবার জানালার দিকে তাকাইয়া ডাকিলেন, শিবে—অ—শিবে! ঘুমুচ্ছিস না কিরে? ওরে বেটা, দিনে ঘুমুস নে এখানে, নোনা ধরবে, মরবি।

শিবের নিকট হইতেও কোন সাড়া আসিল না। মুখুজ্জে যেন হাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, নাঃ, এ তো ভাল নয়। কেউ গেরাহ্যিই করে না দেখি।

বাড়ীর পুরানো ঝি চিত্ত একরাশ কাপড়-জামা ঘরখানার পাশের কলতলাতে ফেলিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিল, মুরলী বাবু যে! কখন এলেন? একগাল হাসিয়া মুখুজ্জে বলিলেন—ভাল আছ চিত্ত?

চিত্ত বলিল, আমাদের আবার ভাল-মন্দ! গতরে না খাটলে ত' খেতে দেবে না মশায়! দু দিন অসুখ হলে কেউ বলবে না যে চিত্ত আজ শুয়ে থাক তুই!

মুখুজ্জে বলিলেন, বাড়ীর সব, বৌদিদি, ছেলেরা—এরা সব ভাল ত?

চিত্ত বলিল, মন্দ কি দুঃখে থাকবে বলুন? মাথা ধরলে দশটা ডাক্তার আসে—মাথার শেয়রে ডাক্তারখানা বসে। রোগে ভোগে গরীব, বুঝলেন!

সে কাপড়গুলা লইয়া কলতলায় বসিল। মুখুজ্জে এবার বাহির হইয়া আসিয়া চিত্তকে প্রশ্ন করিলেন—এ ছোকরা কে চিত্ত?

চিত্ত বলিল, উনি যে পিসে মশায়—বাবুর মাসতুত বোনের বর।

—অ—। তা ও ছোকরা এত নেকে কি চিত্ত, দিনরাত? কলটা কাপড়ের রাশের উপর খুলিয়া দিতে দিতে চিত্ত বলিল, উনি বই লেখেন সব। ছাপা হয়, নাম হয়।

মুখুজ্জে ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাসানের গান নেকেন? না পাঁচালী?

কানাই ঠিক এই সময়েই আসিয়া বলিল, আপনাকে বাবু ডাকছেন। মুখুজ্জে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমাকে?

—হ্যাঁ, আবার কাকে? কানাই চলিয়া গেল।

মুখুজ্জে যাইতে যাইতে চিত্তকে বলিলেন, কানাই ছোঁড়ার ভারী গরম হয়েছে চিত্ত।

এই কথার উত্তরেই নাকি কে জানে, চিত্ত বলিল—বাপরে বাপ, এই রাশ রাশ কাপড় কাচা—এ বাবা চিত্ত হতভাগী ছাড়া কেউ করবে না। আর মার লাথি—মার ঝাঁটা চিত্তর ওপরেই।

* * *

ড্রইং রুমের একখানা সোফার মাথায় হাত দিয়া মুখুজ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হীরেনবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, কখন এলেন আপনি?

মুখুজ্জে উত্তর দিলেন, ভাল আছ বাবা হীরু?

হীরেনবাবু ছোট্ট একটা ব্যাগ খুলিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া মুখুজ্জের হাতে দিলেন। বলিলেন, পড়ুন।

মুখুজ্জে দেখিলেন, চিঠিখানা নায়েবের লেখা। সে লিখিয়াছে,

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

রাজবাটীর কুশল সমাচার দানে ভৃত্যকে সুখী করিবেন।

হীরেনবাবু বলিলেন, বয়েস অনেক হল আপনার। সামর্থ্য দিন দিন কমেই যায়। আপনার দোষ দিই না আমি।

মুখুজ্জে পড়িতেছিলেন, আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় মথুরা বাবু শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা কাজকর্ম্মের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। এরূপ লোক লইয়া কার্য্যের দায়িত্ব লইতে এ অধীন একান্ত অক্ষম।

হীরেনবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, এষ্টেট থেকে মাসে কিছু করে ভাতার বন্দোবস্ত করে দেব আমি। অনেক পুরানো লোক আপনি।

মুখুজ্জে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হীরেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাবু বলিলেন, তা' হলে গিয়েই আপনি কাগজপত্তর নায়েব বাবুকে বুঝিয়ে দেবেন। বুঝলেন?

ঘরের দরজা জানালা যেন কাঁপিতেছিল। পায়ের নীচের মাটী, সেও যেন কাঁপিতেছে। মুখুজ্জে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শিবে বারান্দায় শুইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, শিবে, আয় আয়, টেরেণ ফেল হয়ে যাবে।

শিবু বলিল, বাবু কি বললেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখুজ্জে বলিলেন, সে সব পথে বলব আয়।

ঘণ্টা দুই পরে ঠাকুর আসিয়া ডাকিল, খুড়ো মশায় চান করে নিন।

খুড়োর সাড়া পাওয়া গেল না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল বলাইকে, কানাইকে, গোবিন্দকে।

বলাই বলিল, কে জানে বাবা আমার মরবার সময় নাই।

কানাই কোন উত্তরই দিল না।

গোবিন্দ বলিল, এইখানেই ত ছিল।

বলিয়া যে স্থানটা নির্দ্দেশ করিল সেখানে শুধু শালপাতায় মোড়া ছোট একটি ভাঁড় পড়িয়াছিল।

*   *   *

তখন ময়দানে মিউজিয়ামএর সম্মুখে চলিতে চলিতে মুখুজ্জে শিবুকে বলিলেন, একটু বস শিবু,—বসে সব তোকে বলব আয়। দে বাবা পাটা একটু টেনে দে ত। আঃ আঃ। রাস্তা কি কম রে!

শিবু সতৃষ্ণ নয়নে মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। মুখুজ্জে বলিলেন, বয়স ত কম হল না। তাই বললাম আজ হীরুকে। বাবা উপযুক্ত হয়েছ, সব দেখেশুনে নাও। আমি এইবার কাশী যাব। হীরুর চোখ ছল ছল করে উঠল!

মুখুজ্জে নীরব হইলেন। আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ দেখলাম আমি শিবু, হীরুর চোখ ছল ছল করছে। তার পর আমাকে কি বললে জানিস, বললে খুড়ো মশায়, মাসে কিছু করে পেনামী কিন্তু আপনাকে নিতে হবে।

শিবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি হল, বাবু কি বললেন?

মুখুজ্জে বলিলেন, বলতে পারলাম না রে শিবু। বুঝলাম, হীরুর এখন বড় টানাটানি চলছে, সেই দেখে বুঝলি বলতে পারলাম না।

শিবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মুখুজ্জে বলিলেন, অমনি ব্যাটা ভেমোর মুখ শুকিয়ে গেল। আরে ৩৭৪ নম্বরের কাছে ২৭২ তৌজির অপমান বিষ্ণু মুখুজ্জে বেঁচে থাকতে হবে ভাবিস? গিন্নীর ডুগাছা তাগা আছে সেই ডুগাছা বেচে দেব। কি হবে? বুড়ীর আবার গয়নার সখ কেন? বুঝলি? খেটে শোধ দিবি তুই। আমি মরে গেলে কিছু কিছু করে কিন্তু বুড়ীকে দিবি। কেমন? এ্যাই এ্যাই, বেটা পা ধরে টানে দেখ, পা ধরে টানে দেখ। দেখেছিস শিবে, কি চক্‌চকে মটরখানা দেখেছিস, আর কত বড়! হীরুর মটরখানা কিন্তু এর চেয়েও দামী—একটু পুরানো হয়েছে, এই যা।

প্রকৃতির মূর্ত্তি

জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যেটুকু, তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শ-শব্দের অর্থাৎ কতিপয় অনুভূতির সমবায়ে গঠিত। আর প্রত্যক্ষের বাহিরে যে টুকু, সে টুকু বর্ত্তমানের অনুভূতি নহে, সেটাকে স্মৃতি বা অনুমান, কল্পনা বা যুক্তি, বিশ্বাস বা স্বপ্ন, এই সকলের মধ্যে ফেলিতে পারি। স্মৃতি, অনুমান, যুক্তি, যাহাই বল, কাহারও না কাহারও অতীত বা ভবিষ্যৎ কোন না কোন কালের অনুভূতি হইতে তাহার উৎপত্তি, সে বিষয়ে দ্বিধা করিও না। সেরূপ দ্বিধা করিতে গেলে একালে আর চলিবে না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির চিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে, সেইটা আমাদের বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোকে আধ আঁধারে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈষৎ অপরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ নহে, তাহার খানিকটার নাম অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ, খানিকটা দূরগত ও দর্শনাতীত, আর খানিকটা সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়, খানিকটার নাম স্মৃতি শ্রুতি, খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন, ও আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়। সম্মুখের এই টেবিল কালি ও কাগজ, দীপাধার প্রদীপ ও দীপশিখা, আসবাবসমেত গৃহপ্রাচীর, রান্নাঘরের ধোঁয়া-সমেত পাচকমুখনিঃসৃত ধ্বনি, জানালার বাহিরে নারিকেল গাছ ও তদুপরি নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র, উৎকট গ্রীষ্ম ও রাস্তার চতুষ্পার্শ্ব হইতে আগত উৎকটতর কলরব—ইত্যাদি মিলিত হইয়া আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহা ছাড়িয়া গল সাহেবের আবিষ্কৃত গ্রহ ও নিকলা টেসলার তাড়িত-তরঙ্গ, ক্লিয়োপেট্রার কটাক্ষ ও মার্গারেটের ক্ষুৎ, মধুসূদন দত্তের জীবনলীলা (যাহা সকালে যোগীন্দ্রবাবুর পুস্তকে পড়িতেছিলাম), বেঞ্চের উপরে কাতার দিয়া ছাত্রের শ্রেণী, ও তৎসঙ্গে আগামী ছুটির দিনের শুভাগমন, এই কয়টা ও ইহা ছাড়া আরও কত কি লইয়া আমার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবশিষ্ট জগৎ। ইহাদের মধ্যে কোনটা আমার শ্রুতি, কোনটা আমার স্মৃতি, এবং শেষোক্তটা বোধ করি পরম আনন্দ, কিন্তু কোনটাই বর্ত্তমান শব্দস্পর্শাদিময় প্রত্যক্ষগোচর অনুভব নহে। গোচর অগোচর উভয়ই আমার পক্ষে ব্যক্ত প্রকৃতির অঙ্গীভূত। গোচর ও অগোচর উভয়ের মাঝে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভবে না। গোচর অজ্ঞাতসারে অগোচরে লীন হইতেছে, অগোচর আসিয়া অজ্ঞাতসারে গোচরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আমার প্রকৃতির মানচিত্রেও সীমানা টানিতে পারি না, তখনই সেই সীমানার রেখা বিস্তার লাভ করিয়া মানচিত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিতেছে, তখনই আবার সঙ্কুচিত হইয়া আমার নিজের অস্তিত্বের ভিতর মিলিয়া যাইতেছে। কেন না, আমার নিজের অস্তিত্ব এক অর্থে প্রকৃতির এই চিত্রখানার সমব্যাপী। আমি এই চিত্রখানা জড়াইয়া আছি, ইহাই আমার মরণকাঠি ও জীবনকাঠি। ইহার পরিধির ভিতরেই আমার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, এবং ইহার পরিমাণেই আমার অস্তিত্বের পরিমাণ।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৩৯]

চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড একাদশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। চৈতন্য-ভাগবতের এই পরিসমাপ্তি বড়ই আকস্মিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় দেনুড়স্থিত বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাট হইতে একখানি পুঁথি পাইয়াছিলেন যাহা আপাতদৃষ্টে চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায় (দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ) বলিয়া মনে হয়। পরে ইহার দ্বিতীয় একখানি পুঁথি কাইগ্রামের বসু মহাশয়দের গৃহে তিনি প্রাপ্ত হন। এই দ্বিতীয় পুঁথিখানির অনুলিপি দিল্লীতে ১৬৫৮ শাকে বাঙ্গালা ১১৪৩ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিখে সম্পূর্ণ হয়। এই পুঁথি দুইটিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৪ সালে কালনা হইতে চৈতন্য-ভাগবতের এই তথাকথিত অধ্যায়ত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই অংশটুকুকে যথার্থই বৃন্দাবনদাসের রচনা বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমান যে যথার্থ নহে তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-ভাগবতের আকস্মিক পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

> নিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
> চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥১

সুতরাং এই অধ্যায়ত্রয় যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।

এই পুঁথির মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবনীবিষয়ক অনেক মুখ্য মুখ্য ঘটনার এরূপ বিসদৃশ ব্যতিক্রম দেখা যায় যে, বৃন্দাবনদাসকে এই পুঁথির রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হয়। এইরূপ কতিপয় ব্যাপার এখানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইতেছেন। পথে রাঢ়দেশে কুলীনগ্রামে অনন্ত-মিশ্রের গৃহে এক অহোরাত্র থাকিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি গেলেন শ্রীবাসের বাড়ী (কুমারহট্টে ?)।২ তথা হইতে খড়দহ, এবং তাহার পর কাটোয়া। কাটোয়ায় শ্রীরাম-আচার্য্যের গৃহে রাত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন।৩ পর দিন প্রভাতে রূপ সনাতন দুই ভাই আসিয়া মিলিত হইল।

> হেন কালে রূপ সনাতন দুই ভাই।
> পশ্চাতে আছিলা তারা আইলা তথাই॥
> প্রভু বোলে আইস আইস রূপ সনাতন।
> বৃন্দাবনের পথ ধর যাই বৃন্দাবন॥
> রূপ হৈল আগে তাঁর পাছে ন্যাসীবেশ।
> তার পাছে গদাধর সনাতন শেষ॥৪

এইরূপে তিনি ব্রজভূমে পৌঁছিলেন, পৌঁছিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গদাধরকে সঙ্গে লইয়া মদনগোপাল, গোবিন্দদেব ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর পাঁচ বৎসর যাবৎ ব্রজভূমি পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

> এইমতে বার বন করিলা ভ্রমণ।
> পাঁচ বৎসর মহাপ্রভু কৈল পর্য্যটন॥
> চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণ করিলা গৌরহরি।
> পাঁচ বৎসরেতে অন্ত কহিতে না পারি॥৫

তাহার পর প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই পুঁথিখানি যে আসল নহে মেকী, অর্থাৎ বৃন্দাবনদাসের রচনা নহে পরন্তু অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালের রচনা তাহা প্রমাণ করিতে আর অধিক কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই; উপরের বর্ণনাটিই যথেষ্ট। তবে পুঁথিখানি অর্ব্বাচীন বলিয়া ইহাতে উক্ত সকল কথাই যে অযথার্থ হইতে হইবে তাহা বলা চলে না।

কুলীনগ্রামে মহাপ্রভু অনন্ত-মিশ্রের গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি তাঁহার অশ্রুসিক্ত কাঁথা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এই কথা সত্য হইতেও পারে।

> রাঢ় মধ্যে ধন্য ধন্য নাম কুলীনগ্রাম।৬
> ভক্তগোষ্ঠী সহিতে তথা করিলা বিশ্রাম॥

১। আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। ২। দ্বাদশ অধ্যায়।

৩। ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৪। চতুর্দ্দশ অধ্যায়; পৃঃ ১৬। ৫। ঐ পৃঃ ২৬।
৬। 'কুলিনগ্রাম' মূল।

মিশ্র অনন্ত নাম দ্বিজবর ঘরে।
করিলা কীর্ত্তন অহোরাত্র তার পুরে॥
প্রেমের আবেশে প্রভুর তিতিল গুধড়ি।
রাখিয়া চলিল প্রাতে ব্রাহ্মণের বাড়ী॥
সেই বিপ্র ভাগ্যবান্ এত দয়া যাঁরে।
শ্রীঅঙ্গের কাস্থা অদ্যাপিও যাঁর ঘরে॥১

কাটোয়াতে মহাপ্রভুর স্থিতি সম্বন্ধে পুঁথিটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সেই অংশটুকু নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই শ্রীরাম কে? ইনি কি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই?

সবে গদাধর প্রভুর সংহতি রহিলা।
কাটঞা নগরে প্রভু আসি উত্তরিলা॥
শ্রীরাম সীতার বাড়ী যেদিন২ রহিলা।
শুনিয়া কাটঞার লোক হরষিত হৈলা॥
ভোজন করিলা প্রভু ছয় জন সঙ্গে।
বসিলা শ্রীরাম সঙ্গে কথার প্রসঙ্গে॥
শ্রীরামেরে বোলে প্রভু শুনহ শ্রীরাম।
কোন বাণে রাবণের বধিলে পরাণ॥
হাসিয়া শ্রীরাম বোলে তুমি তারে নাশি।
বধিলা রাবণ পূর্ব্বে এথন সন্ন্যাসী॥
কংসেরে করিলা যেই নিধন মরারি।
কলিতে হইলা সেই এবে দণ্ডধারী॥
যে জন বলি রাজারে রাখিল পাতালে।
কলিযুগে সেইজন প্রেম যাচি বুলে॥
মৎসরূপে যেইজন বেদ উদ্ধারিলা।
কলিযুগে সেইজন সন্ন্যাসী হইলা॥
রাবণরাক্ষসে যে করিলেক নাশ।
সন্ন্যাস করিয়া সেই লুকাবার আশ॥
আজি সে বিদিত যেই হইল আমায়।
কিবা ভাগোদয় মোর কহন না যায়॥
শুনিয়া রামের কথা গৌর ভগবান।
হাতে ধরি কোল দিয়া দিল প্রেমদান॥
প্রভুর পরশ পাইয়া শ্রীরাম উদার।
অনায়াসে পাইলেন প্রেমের ভাণ্ডার॥
হাসিয়া শ্রীরামে বোলে শুন গুপ্তধন।
রাধানাথ ঠাকুরের শুনাহ কীর্ত্তন॥
শুনিয়া বোলে তেঁহ সংপ্রদা নাহি মনে।
তোমার ঠাকুরে গীত শোনাব কেমনে॥
এত বলি হুঙ্কার করিল হরিধ্বনি।
নারদ তম্বুর দোঁহে আইলা আপনি॥
প্রভু বোলে দোঁহে আইলা করিবারে হিত।
কৃষ্ণনাম গান কর আনন্দ সহিত॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা নারদ তম্বুর।
বিরহধ্যান গীত গান শব্দ প্রচুর॥
বাজে বীণা মৃদঙ্গ পাখোয়াজ করতাল।
সভে শুনে গীতবাদ্য বড়ই রসাল॥
দেখিতে না পায় কেবা গীতবাদ্য করে।
শব্দ শুনি সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা হই পড়ে॥
অনাহূত গীতবাদ্য নাহি দেখি ছায়া।
শ্রীরামে জানিল এই গৌরাঙ্গের মায়া॥
এইমতে কৃপা করি শ্রীরামে চৈতন্য।
করিল কাটঞা পুরী সর্ব্বলোকে ধন্য॥
শ্রীরাম আচার্য্য ঘরে প্রভুর যে লেহা।
কৃষ্ণভক্তি হয় যেইজন শুনে ইহা॥৩

পুঁথিটিতে মদনগোপালের মাহাত্ম্যের উপর একটু জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৃন্দাবনে—

মদনগোপাল আগে দরশন করি।
গোবিন্দদেব দরশন কৈলা গৌরহরি॥৪

তাহার পর—

এথা সে যথন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
ন্যাসীরূপে গেলা মদনগোপালের স্থান॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুনঃ কোথা গেলা প্রভু না পারে লখিতে॥৫

পুঁথির রচয়িতা কি মদনগোপালের সেবক অথবা সেবকের শিষ্য এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাভুক্ত ছিলেন?

গদাধরের সঙ্গে মহাপ্রভু যথন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণলীলার কিঞ্চিৎ উল্লেখ এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। দানলীলা সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত দানখণ্ডকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গের অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ক্রোশ পাঁচ ছয় আছে যমুনার তীর।
বাহ্য ছাড়ি গদাধর হইলা অস্থির॥
দধি নিবে ঘোল নিবে ডাকে পরিত্রাই।
শুনিঞা যতেক লোক আইসে ধাঞাধাঞি॥

১। দ্বাদশ অধ্যায়; পৃঃ ১০ ১১। ২। 'সেদিন' হইবে কি?

৩। ত্রয়োদশ অধ্যায়; পৃঃ ১২-১৫। ৪। চতুর্দ্দশ অধ্যায়; পৃঃ ২০। ৫। ঐ; পৃঃ ২৯।

* * * *

বড়াই বড়াই বলি ক্ষণে ক্ষণে ডাকে।
মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে ॥
দহি মেরো খায় মটকি ডার দিএ।১
ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে ॥
উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।
ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহুঁগে গোহারি ॥
ছোড় ছোড পিন্ধন নিচোল পাছে ফাটে।
তুঁঝে দান দিব সব ভূপকো নিকটে ॥
দেখহ বড়ায়ি হাম কানু সাথ নাহি লাগে।
ঝুট দানি বাটোয়ার আলিঙ্গন মাঁগে ॥২
আলিঙ্গন পাঞা গদাধর প্রেমে নাচে।
দধি নিবে দধি নিবে ঘন ঘন যাচে ॥
গদাধর বোলে বড়াই আইস বংশীবটে।
এ পথে আইলে বিকে পড়িবে সঙ্কটে ॥৩

* * *

গদাধর বোলে এইখানে তুমি সেই।
ছিঁড়িলে কাঁচলী যে খাইলে দুধ দই ॥
এইখানে বড়াইর বসন ধরিয়া।
তাহার গলার মালা লইলে ছিঁড়িয়া ॥
সকল গোপিনী মিলি সাধিল তোমারে।
দিলে দধি দুগ্ধ নৌকা ডুবিল ওপারে ॥৪

* * *

গদাধর বোলে শুন গুপ্ত-দানীরায়।
কাঁদাইয়া গোপী দান সাধিলা গথায় ॥
মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।
সেইস্থান প্রিয় তব আমি ভাল জানি ॥৫

এই বর্ণনা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই পুঁথিটির রচয়িতা শ্রী কৃ ষ্ণ কী র্ত্ত নে র সহিত অথবা অনুরূপ কোন কাব্য বা কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে দানখণ্ডের যে উল্লেখ আছে তাহা ঠিক শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে বর্ণিত দানলীলার অনুযায়ী নহে।[৬] চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে উল্লিখিত দানলীলার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ নহেন, তিনি বালগোপাল এইরূপ বোধ হয়।

[৪০]

লোচনদাসের শ্রীশ্রীচৈ ত ন্য-ম ঙ্গ ল বৃন্দাবনদাসের চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে র পরে রচিত। স্বীয় কাব্যে লোচন বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৭] লোচনদাস আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম কবির জন্মভূমি। কবির পিতার নাম কমলাকর এবং মাতার নাম সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নিকট কবি শিক্ষালাভ করেন। নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় কবির গুরু ছিলেন। চৈ ত ন্য-ম ঙ্গ লে র সমাপ্তিভাগে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

চারিখণ্ড পুঁথি সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস ॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম ॥
কমলাকরদাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা ॥
সংসারেতে জন্ম দিল সেই মাতা পিতা।
মাতামহকুল তার শুন কিছু কথা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে ॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থপূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত ॥
মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র ॥
যথাতথা যাই সে দুল্লাল করে মোরে।
দুল্লাল লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার ॥
তাহার চরণে মুঞি করোঁ নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে তাহার ॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥

১। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ: পৃঃ ১৯। ২। ঐ, পৃঃ ২০। ৩। ঐ, পৃঃ ২৬। ৪। ঐ, পৃঃ ২৫। ৫। ঐ, পৃঃ ২৬।

৬। হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাললীলায় ॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরম সন্তোষ ॥
[অন্ত্য খণ্ড; পঞ্চম অধ্যায়]।

৭। শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥ সূত্রখণ্ড, বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২।

তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥

কবি অল্প বয়সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া অনুমান করি। চৈতন্য-মঙ্গলের একস্থানে বলিয়াছেন—

নরহরিদাসের দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া অবাধ সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে॥[১]

রামগোপাল দাসের শাখানির্ণয়ে লোচনদাস সম্বন্ধে একটি নূতন কথা পাওয়া যায়। ইহাতে এই উক্তিটি আছে—

গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ॥

সম্ভবতঃ ফিরিঙ্গিদের সহিত নরহরিদাসের কারবার ছিল। কোন গোলমাল হওয়াতে হয়ত ফিরিঙ্গিরা কবিকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল।

লোচনদাসের কাব্য মুখ্যভাবে গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, ইহা কবির উক্তি হইতে বুঝা যায়[২] এবং প্রচুর রাগরাগিণীর[৩] উল্লেখ হইতেও বুঝা যায়। চৈতন্য-ভাগবতের মত চৈতন্য-মঙ্গল অধ্যায়াদিতে বিভক্ত নহে, কেবল সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং শেষখণ্ড এই চারি স্থূল ভাগে বিভক্ত। ইহাতেও বোধ হয় যে কাব্যটি প্রধানতঃ গান করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। 'মঙ্গল' কাব্যের সহিত এই কাব্যটির সামান্য কিছু মিল দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-মঙ্গলের প্রথম কবিতাটিতে গণেশ, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা আছে, তাহার পর গুরুজন, বিষ্ণুভক্ত এবং গুরুর বন্দনা।

লোচনের কাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে রচিত।[৪] সেই কারণে গৌরাঙ্গ রচিত বিষয়ে ইহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। যে যে বিষয়গুলি নূতন মনে হয় সেগুলি স্বকপোলকল্পিত। উদাহরণ হিসাবে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্‌কালে বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্ভাষণ অংশটি দেখান যাইতে পারে। মুরারি গুপ্তের কড়চা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, লোচন তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। নরহরি দাসের নিকটও কবি কিছু কিছু চৈতন্যচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন।[৫]

চৈতন্য-ভাগবতের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গল বিষয়-বস্তুর বর্ণনায় কিছু ঊন বটে, তবে কবিত্বাংশে লোচনের কাব্য বৃন্দাবনদাসের কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের রচনা মুখ্যতঃ বর্ণনাত্মক আর লোচনের রচনা প্রধানতঃ রসাত্মক। এই কারণে লোচনের কাব্যে ত্রিপদীছন্দ পয়ারের সহিত তুল্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে ত্রিপদীর ব্যবহার খুবই অল্প এবং তাহাতে বৃন্দাবনদাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে গীতিকবিদিগের মধ্যে লোচনদাসের আলোচনা করিয়াছি এবং তাহাতে চৈতন্য-মঙ্গলের একটি পদও তুলিয়া দিয়াছি।[৬] তাহা হইতে লোচনের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। চৈতন্যচরিত-চিত্রণে লোচন কিরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহার আরও কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভুর ভাবাবেশ—

১। ঐ পৃষ্ঠা ৩০।

২। করুণা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
সে পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে॥ পৃঃ ২। ইত্যাদি।

৩। চৈতন্য-মঙ্গলে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—

পঠমঞ্জরী, কেদার, বড়ারি, মারহাটিয়া, ধানশী, শ্রী, ভাটীয়ারী, বিভাস, পাহিড়া, সিন্ধুড়া, মল্লার, মঙ্গল গুর্জ্জরী, তুড়ী, রামকেলি, কামোদ, করুণশ্রী, পুরবী, সিন্ধুড়া, শ্যামগড়া, আহিরী, সুহই, ললিত।

৪। সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
... ...
শ্লোকবন্ধে কৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিঞা আমার মনে বাঢ়িল পিরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত॥ সূত্র খণ্ড, পৃঃ ৩॥
কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিঞা মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোলে।
নিজদোষ না দেখিয়া মন ভোর ভেলে॥
যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ॥ মধ্যখণ্ড, পৃঃ ১৬১।

৫। তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥ পৃঃ ১৯০॥

৬। বঙ্গশ্রী। আষাঢ়, ১৩৪১ সাল, পৃঃ ৮০৩।

তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নাসিকায় বহে শ্লেষ্মা অতি নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥
ভূমেতে লুটাঞা কাঁদে রজনী দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে বিবশ॥
দিবসে পুছয়ে প্রভু, কত রাত্রি যায়।
সব জন কহে, দিবা, রাত্রি নাহি হয়॥
তবে সেই মত প্রভু প্রেমাতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুন আনন্দে অবশ॥
প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে।
দিন নাহি হয়, কহে কাছে যত আছে॥
প্রেমায় বিভোর নাহি জানে দিবারাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥
কৃষ্ণগুণ নাম গীত কেহো যদি গায়।
শুনিঞা তখনি কান্দে ভূমেতে লুটায়॥
ক্ষণে দণ্ডবত করি করে পরণাম।
ক্ষণে উচ্চস্বর করি গায় কৃষ্ণনাম॥
সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর॥
নিরন্তর পরবশ ক্ষণেকে প্রবোধে।
সেইক্ষনে স্নানদান জন-অনুরোধে॥১

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া অদ্বৈতপ্রভুগৃহে কয়দিন থাকিয়া নীলাচলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই সময়ে ভক্তগণের ব্যাকুলতা লোচনদাস সহজ কবিত্বের সহিত এই ভাবে লিখিয়াছেন—

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করে অনুবন্ধ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তিহীন॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস॥
একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥
শচীর দুলাল তুমি দুর্লীল চরিত।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তজননয়ন-অমিয়া দিঠি পাতে।
এ দেহ প্রেমার তরু বাঢে হাথে হাথে॥
অনেক আছিল প্রেমফল-প্রতি আশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে আশে॥
পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যায় তোরে বিদায় করিয়া॥
এখনে চলিয়া যাব মো সব অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে তুমি পতিত-পাবন॥
করুণা-কর্দ্দমে তনু গঢ়িয়াছে বিধি।
বিনোদ-বিলাসলীলা দিয়া নানা নিধি॥
কেবল পরম প্রেমা তাহে জীবন্যাস।
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ করিয়া প্রকাশ॥
উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতর॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে॥
যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিব সভে আগুনে পুড়িয়া॥
হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনানিঞা-বাণী॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে॥
শূন্য যেন লাগে সব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার বাড়ী যোজন অন্তর॥২

মহাপ্রভু সকলকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—

কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥

ভক্তগণকে এবং মাতাকে প্রবোধ দিয়া প্রভু সত্বর গমনে চলিলেন। অদ্বৈত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যায়।
দণ্ড দুই গিয়া প্রভু পাছু পানে চায়॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে॥
বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায়॥
তুমি পরদেশে যাবে এই মোর দুখ।
তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক॥

১। মধ্যখণ্ড, পৃঃ ৮৬।

২। মধ্যখণ্ড, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

আপন অন্তর কথা কহিল গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥১
তোর নিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে।
এ কাঠকঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে॥
আমার অধিক আর দুরাচার কহি।
তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেমা উঠে নাহি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব শুন মোর বোলে॥
তোমার প্রেমায় আমি ছাড়িতে না পারি।
তেকারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি॥
ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥২

চৈ ত ন্য-ম ঙ্গ লে-ও মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথা কিছুই নাই। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া প্রতাপরুদ্র রাজার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শনের পরই প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

লোচনের নামে কতকগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক ও সহজিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও পুঁথি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কেবল দু র্ল্ল ভ সা র গ্রন্থটিই লোচনদাসের রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পুস্তিকাটিতে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা চৈ ত ন্য-ম ঙ্গ ল-স্থিত বর্ণনার সহিত অভিন্ন। বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষতঃ রাগানুগাপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা দু র্ল্ল ভ সা রে আছে। বইটি একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। লোচনের ধর্ম্মমত বিষয়ে আমি অন্যত্র৩ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি, বাহুল্যভয়ে সেকথা এখানে লিখিলাম না।

[৪১]

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ ত। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের রচিত কথা কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব মতের দার্শনিক তথ্য ও তাহার বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে এবং অবলীলাক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেমন অগাধ পণ্ডিত অথচ পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহার রচনাও সেই পরিমাণে সরল অথচ গভীর হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যে কতটা ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা এই গ্রন্থখানি না পড়িলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। শ্রীশ্রী চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ ত অবিসংবাদিতভাবে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে যদি একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের নাম করিতে হয় তাহা এই শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ ত।

অনেকের ধারণা শ্রীশ্রী চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ ত বইটির ভাষা কটমট এবং যৎপরোনাস্তি দুর্বোধ। যাঁহারা এই কথা বলেন হয় তাঁহারা বইখানি জীবনে কখনও খুলেন নাই নতুবা বলিতে হইবে যে দার্শনিক আলোচনা তাঁহাদের মাথায় ঢুকে না। বিষয়বস্তুর কাঠিন্যকে ইঁহারা ভাষার কাঠিন্য মনে করিয়া ভুল করেন। আর একদল সমালোচক আছেন যাঁহারা বলেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থটি মিশ্র বাংলা এবং হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে পারি, দীর্ঘকাল বৃন্দাবন বাসহেতু কবিরাজের কলমের মুখে ক্বচিৎ দুই একটা হিন্দী শব্দ বা প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে,৪ কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বলেন যে, চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ তে র ভাষা মিশ্র হিন্দী তাঁহারা পরের মুখেই ঝাল খান। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার অনভিজ্ঞতা হেতু অধুনা-অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দকে অনেকে আবার হিন্দী শব্দ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

[৪২]

চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ তে র তারিখ লইয়া গোলমাল আছে। অনেক পুঁথিতে এবং প্রায় সবগুলি মুদ্রিত সংস্করণে গ্রন্থের সর্ব্বশেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোহ্ন্যাসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ, ১৫৩৭ শকাব্দে (=১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইল।

১। মধ্যখণ্ড, পৃঃ ১৪৯। ২। মধ্যখণ্ড, পৃঃ ১৫০।
৩। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ সাল।
৪। যেমন, 'নাহি কাঁহা সো বিরোধ'।

এই শ্লোকটির একটি পাঠান্তর কতকগুলি পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই তারিখ ৩৪ বৎসর পিছাইয়া যায়। পাঠান্তরটি এই—

শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোহ্হ্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

কিন্তু গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৫০৩ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে পড়ে নাই, সুতরাং এই তারিখটিতে ভুল আছে।

অথচ ১৫৩৭ শকাব্দও যে লওয়া চলে না তাহা দেখাইতেছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন গোস্বামী ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিরোধান করেন, তাহা হইলে কবিরাজ অন্ততঃ ১৫৫০ সালের দিকে বৃন্দাবনে আগমন করেন। কবিরাজ যে প্রৌঢ়াবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন ইহা এক রকম সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলে কবির বয়স যুক্তিসঙ্গত বার্দ্ধক্যেরও সীমা ছাড়াইয়া যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কবি নিজেই বলিয়াছেন—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥১
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥২

গ্রন্থরচনাকালে কবিরাজ গোস্বামী প্রৌঢ়ত্বের কোঠা পার হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু উপরের উক্তি যে অনেকটা কৃষ্ণদাসের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় প্রসূত তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। গ্রন্থটি রচনা করিতে ৭ বৎসর লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান করিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। গ্রন্থ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার সময় কবিরাজ গোস্বামী বার্দ্ধক্যের অজুহাত দেখান নাই, সুতরাং তখন তিনি সক্ষম ছিলেন বলিতে হইবে। সুতরাং এক পীড়া ছাড়া সাত বৎসরের মধ্যে শুদ্ধ বার্দ্ধক্যের তরে 'বৃদ্ধ জরাতুর' এবং 'অন্ধবধির' হওয়া যায় না। সুতরাং বৈষ্ণব সমাজে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার যে তারিখ ধরা হয়—আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ—তাহা অনেকটা এই হিসাবে ঠিক বলিয়া মনে হয়।

কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে জীবগোস্বামীর গোপালচম্পুর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে যেহেতু গোপালচম্পূ রচনা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল সেই হেতু চৈতন্য-চরিতামৃত উক্ত তারিখের পরে রচিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেখান যাইতে পারে। প্রথমতঃ গোস্বামীদিগের গ্রন্থের শেষে যে তারিখযুক্ত শ্লোক দেওয়া থাকে তাহার মধ্যে অনেক গলদ আছে, এবং এইরূপ অধিকাংশ শ্লোকও প্রক্ষিপ্ত। একটি উদাহরণ দিতেছি। রূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ভাণিকায় অনেক পুঁথির শেষে যে শ্লোকটি[৩] আছে তাহা হইতে ইহার রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। অথচ এই ভাণিকা হইতে শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এদিকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনাকাল হইতেছে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং এই সকল পুষ্পিকা-শ্লোক যে রচনাকাল হিসাবে কতদূর প্রামাণ্য, তাহা জানা গেল।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুষ্পিকাগুলি প্রায়ই মূলগ্রন্থের কোন প্রাচীন অনুলিপির তারিখ। সুতরাং আমার অনুমান হয় যে 'শাকে সিন্ধগ্নি' ইত্যাদি পুষ্পিকাশ্লোকটি চৈতন্য-চরিতামৃতের কোন প্রাচীন অনুলিপি সমাপ্তির তারিখ। পরে এই অনুলিপি হইতে যে সকল পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছিল তাহার সবগুলিতেই এই শ্লোকটিও লিখিত হইয়াছিল। দানকেলি-কৌমুদীর পুষ্পিকা শ্লোকটির ইতিহাসও এই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অপর দুইটি রচনায়, গোবিন্দলীলামৃতে এবং

১। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ২। অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

৩। গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা সারঙ্গরঙ্গদায় কোন রূপ তারিখজ্ঞাপক পুষ্পিকাশ্লোক নাই।

গোপালচম্পু সমাপ্তির তারিখ সত্য ধরিয়া লইলেও তাহা অবিসংবাদিত ভাবে চৈতন্য-চরিতামৃতের পরবর্ত্তিত্ব প্রমাণ করে না। চৈতন্য-চরিতামৃতে গোপালচম্পুর নাম আছে বলিয়াই যে উহা পরবর্ত্তী রচনা তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। গোপালচম্পু সুবৃহৎ গ্রন্থ, ইহা সমাপ্ত করিতে বহুবর্ষ লাগিয়াছিল। হয়ত জীব গোস্বামী বইটি আরম্ভ করিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার আরম্ভের কথা কবিরাজ গোস্বামীর জানা থাকায় তিনি তাহা জীবগোস্বামীর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে এবং ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দে চৈতন্য-চরিতামৃতের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। যাঁহারা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষপাতী তাঁহারা এই দুইটি বইকে জাল বলেন। কিন্তু শুধু জাল বলিলেই তো হইবে না, যতক্ষণ না তাঁহারা বইখানিকে জাল প্রতিপন্ন করিতে পারেন ততক্ষণ তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য।

ফলতঃ চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল অজ্ঞাত। মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদের শেষে অথবা চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে বইখানি রচিত হইয়াছিল। ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলিবার মত উপকরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

[৪৩]

চৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়। নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। এই নৈহাটি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান, বর্ত্তমানে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে সুপ্রসিদ্ধ নৈহাটি সহর নহে। কবির এক ভ্রাতা ছিল। কবি একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার আদেশ মত ব্রজভূমে বাস করেন। তথায় তিনি সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্য হন।

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
. . .
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ॥
. . .
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
. . .
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥[১]

প্রেম-বিলাসের মতে কৃষ্ণদাস স্বপ্নে নহে সাক্ষাতে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, অত্যধিক বিনয় বশতঃই কবিরাজ গোস্বামী সাক্ষাদ্দর্শনকে স্বপ্নদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিরাজের সম্বন্ধে ইহাতে কিছু কিছু নূতন কথা আছে। প্রেমবিলাসের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড় দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥
একদিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তর॥

১। আদিলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
২। বহরমপুর দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টাদশ বিলাস, পৃঃ ২৭১-২৭২

প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥
নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে।
না জানয়ে দীনহীন কৃপা কৈল মোকে॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিল গমন।
আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥
কেন হেন লিখে কেন করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয়॥
সিদ্ধ ব্যবহার এই অনন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয়ে যে সকল॥
সেই গুণে কৈল কৃপা রূপসনাতন।
এই মত অভিমত করিল বর্ণন॥

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে কৃষ্ণদাস ১৪১৮ শকাব্দে (১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৪ শকাব্দায় (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) তিরোধান করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, এবং ভ্রাতার নাম শ্যামদাস।[১] এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ জগদ্বন্ধু বাবু ভক্তিদিগ্‌দর্শনীর উল্লেখ করিয়াছেন। বইটি আধুনিক সন্দেহ নাই।

জীবগোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্যের মারফৎ গৌড়ে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চৈতন্য-চরিতামৃতও ছিল। পুঁথি লুটের সংবাদ পাইয়া কাতর হৃদয়ে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণত্যাগ করেন। এই কথা প্রেমবিলাসে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে কৃষ্ণদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এই বিষয়ে সনাতন, রূপ এবং জীবগোস্বামী ছাড়া তাঁহার কোন সমকক্ষ বৈষ্ণব মহান্তদিগের মধ্যে ছিল না। কবিরাজের পাণ্ডিত্য বুঝিবার জন্য গোবিন্দলীলামৃত অথবা সারঙ্গরঙ্গদা পড়িবার আবশ্যক করে না, চৈতন্য-চরিতামৃত দেখিলেই হইল। পাণ্ডিত্যের অবধি অথচ বিনয়ের খনি ছিলেন কবিরাজ। তাঁহার এই পরম বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও আত্মলোপের জন্যই চৈতন্যচরিতামৃতের মত দুরূহ গ্রন্থেও কোথায়ও এতটুকু মাত্র পাণ্ডিত্যের উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি চৈতন্য-চরিত লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বৃন্দাবনদাস পাছে অসন্তুষ্ট হন তাহার জন্য কি সশঙ্ক নম্রতা! এমন কি পাছে চৈতন্য-ভাগবতের আদর কমিয়া যায় এই জন্য কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনাই করিলেন না, অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করার জন্য বাল্যলীলা কেবল সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়া সারিয়া লইয়াছেন; যে সকল ঘটনা বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই কেবল সেই সেই ঘটনা বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও মত সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা অনেকেরই নূতন বলিয়া ঠেকিবে। তাঁহারা পাছে ঐ সকলের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ করেন এই জন্য কবিরাজ সর্ব্বদাই ত্রস্ত। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যের উদাহরণ দিতেছি।

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥[২]

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দো সভার শ্রীচরণ
সভে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপরঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥[৩]

চৈতন্যলীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥[৪]

ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

১। গৌরপদতরঙ্গিনী উপক্রমণিকা, পৃঃ ৫৭-৬০।

২। আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। ৩। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৪। অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

খেলা ও পর্ব্বতারোহণে 'শী'

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

তোমার পক্ষে যাহা খেলা, আমার পক্ষে তাহা মৃত্যু, একথা দুর্ব্বল প্রচার করিয়াছে। কিন্তু আমার পক্ষে যাহা খেলা, আমার পক্ষেই তাহা মৃত্যু, একথা একমাত্র বীরই বলিতে পারে। বীরের কাছে মৃত্যু এবং খেলার মধ্যে কোনো ভেদ নাই।

হাসও আমাদের জানা নাই। এরূপ অবস্থায় য়ুরোপীয়দের শী-র সাহায্যে খেলা এবং পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণের কথা আমাদের মনে অনুরূপ কার্য্যে উৎসাহ না জাগাইলেও বিস্ময় জাগাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

নরওয়ে দেশে বরফের উপর দ্রুত চলাফেরা করিবার জন্য

এক্র্যার দৃশ্য: দড়ির সাহায্যে উপরে উঠা।

য়ুরোপবাসী বীর, তাই খেলা ও মৃত্যু তাহাদের জীবনে এক। শান্তশিষ্ট বাঙালীর কাছে য়ুরোপীয় খেলা নিতান্ত পাশবিক বলিয়াই বোধ হয়। খেলিতে খেলিতে একেবারে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙাইয়া যাওয়া, এ কেমন কথা? আমাদের দেশে খেলার নামে এরূপ বিপজ্জনক জিনিসে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। পরপারের যাত্রীদের মধ্যে তীর্থযাত্রার নামে পর্ব্বতারোহণ কেহ কেহ করেন। যুবকদের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। চাকুরীর খাতিরে বা অন্য কারণে দুর্গম পর্ব্বতপথে যে সকল বাঙ্গালীকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে তাঁহাদের ইতি-

যে কাষ্ঠের পাদুকা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম Ski বা শী। ইহার মাপ ৮ ফীট হইতে ১২ ফীট × ৪ ইঞ্চি। শুধু নরওয়ে দেশে নহে, য়ুরোপের যে সব অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত হয় সেই সব অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই এই শী, চলাফেরা করিবার জন্য অথবা খেলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার কানাডা দেশেও শী-র ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু শুধু চলাফেরা বা খেলা নহে, তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের কাজেই শী-র ব্যবহার ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। বহু পর্ব্বত-আরোহণ-কারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ মূল্যবান এবং একান্তভাবে

অপরিহার্য্য মনে হইতেছে। যদিও এমন পর্ব্বত আরোহণ-কারীর সংখ্যা খুব বেশি নহে, অন্তত শী যাহারা খেলা হিসাবে ব্যবহার করে তাহাদের তুলনায় কম। শী-খেলার যাবতীয় নিয়ম এবং চালনা-চাতুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করিলে শী-র সাহায্যে তাহার চেয়ে কঠোর এবং মারাত্মক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। তাই মুখ্যত খেলা উপলক্ষেই শী-র জন পথে দৌড়াইতে হয়। পথের নিশানা স্বরূপ মাঝে মাঝে দুইটি করিয়া পতাকা পুঁতিয়া দেওয়া হয় ইহারই ভিতর দিয়া শী ছুটিয়া চলে। লাংলাউফ নামক রেস্-এ নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘপথ যে যত আগে অতিক্রম করিতে পারিবে তাহারই তত বেশি জিত। ইহা ছাড়া আরো বহু প্রকার রেস্ আছে। রেসের সময় ঝোঁক সামলাইবার জন্য হাতে কোনো দণ্ড ব্যবহার

এইরূপ তুষারপাতে শী-চালকের আদর্শ।

প্রিয়তা। যুরোপ এবং আমেরিকায় বহু শী-ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতি দেশের ক্লাব-পরিচালকগণ বহুবিধ আইন করিয়াছেন। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রতিযোগিতা হয়, সেজন্য আন্তর্জ্জাতিক আইনও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পুরাতন আইন ভাঙিয়া প্রতি বৎসরই উন্নত ধরণের নূতন আইন প্রস্তুত হইতেছে। কোনো একটা নিয়মে অসুবিধা হইলে সেই নিয়ম রাখা উচিত কি তুলিয়া দেওয়া উচিত ইহা লইয়া আন্তর্জ্জাতিকভাবে আলোচনা-বৈঠক বসিতেছে। প্রতিযোগিতা নানারূপ হইয়া থাকে। স্লালম রস নামক দৌড়-প্রতিযোগিতায় শী-আরোহণকারীকে নির্দ্দিষ্ট করা সঙ্গত চলে না। অনেকের মতে এই দণ্ড পর্ব্বতারোহণের জন্যই ব্যবহার করা উচিত, রেস্ খেলায় ব্যবহার করা উচিত নহে, করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

শীতকালে সুইজারল্যাণ্ডে শী-র ব্যবহার খুব বিস্তৃত ভাবে চলে। আল্পস পর্ব্বতে উঠিবার জন্য দেশবিদেশের শী-ব্যবহারকারীর ভীড় পড়িয়া যায়। খেলা হিসাবে এবং পর্ব্বত আরোহণ এই দুই উপলক্ষেই শী-র ব্যবহার। পর্ব্বত আরোহণে যাঁহাদের উৎসাহ তাঁহারা শী-র সাহায্য লইয়াছেন মাত্র, সাধারণ খেলোয়াড় হইতে হঠাৎ পর্ব্বত-আরোহণে উৎসাহী হন নাই। শী যেখানে অচল সেখানেও সেই

উৎসাহী দুঃসাহসিকগণ পায়ে হাঁটিয়া উঠিয়াছেন। সেইজন্য শী-ব্যবহারকারীগণ প্রধানত দুই দলে বিভক্ত। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিয়াও নানারূপ বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের জাতই পৃথক। তাহাদেরই কেহ কেহ তাঁহাদের এই আরোহণ-অবরোহণের গবেষণা করা হইয়াছে। জেনোফোনের অধীন দশহাজার সৈন্যকে পরাজিত হইয়া ফিরিবার মুখে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে-হয়। দলবদ্ধভাবে পর্ব্বত-লঙ্ঘন ইহাই নাকি প্রথম। খৃঃ পূঃ ৪০১ সালে এই দশ হাজার সৈন্যকে আরমেনিয়ার পর্ব্বতসমূহ এবং অনেকগুলি গিরিসঙ্কট পার হইতে হয়।

গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডার, যিনি প্রাকৃতিক অথবা মানব-

টেণ্ডডির দৃশ্য।

কাজটিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ করিবার জন্য শী-র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা খেলোয়াড়ও নহেন, পর্ব্বত-আরোহণকারী হিসাবেও পরিচিত নহেন, যেমন তীর্থযাত্রী, লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি তাঁহাদের অনেককে প্রয়োজনের খাতিরেও পর্ব্বত ডিঙাইতে হয়। ইঁহাদের পর্ব্বত-আরোহণ বা উল্লঙ্ঘনে কোন বিশেষত্ব নাই। বিশেষত্ব তাঁহাদেরই যাঁহারা বিনা দায়ে বা প্রয়োজনে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। প্রয়োজন অবশ্য একটা থাকেই কিন্তু তাহার স্বরূপ অন্য প্রকার।

য়ুরোপে শীতকালে পর্ব্বত-আরোহণের ইতিহাস বিষয়ে রচিত কোন বাধাকেই বাধা বলিয়া মানেন নাই তাঁহাকে শীতকালের একটি অভিযানে ইরাণ এবং এলবার্সল্যাণ্ড পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের পুরোভাগে আসিতে হয়। তিনি হিন্দুকুশ লঙ্ঘন করেন এবং চকপাস-এ তাঁহাকে ১০,৬৫০ ফীট উচ্চে আরোহণ করিতে হইয়াছিল।

১৩১১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইটালির কবি দান্তে প্রাটো আল সাগলিওনে ৪৫০০ ফীট আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহার চারিশত বৎসর পরে ১৭৭৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে জার্ম্মান কবি গ্যটে সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভার নিকটবর্ত্তী ডোল নামক পর্ব্বতে আরোহণ করেন, এবং শামোনিক্স হইয়া মণ্টানভার্ট পর্য্যন্ত

অগ্রসর হন। এখান হইতে তিনি গভীর তুষার-আবৃত পথে কল্ দ্য ব্যাল্ম্ এবং ফুরকায় যান।

দান্তে এবং গ্যেটে যেমন শীতকালে পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদের জুড়ি পেট্রার্ক এবং লিওনার্ডো দা ভিন্সি গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইঁহার পর টি. এস. কেনেডি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শীত ঋতুতে মাটারহর্ণ চূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা উত্তর হাওয়ার বেগে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইঁহার নোটবই হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া ভয়ঙ্কর বেগে আমাদের উপর আসিয়া প'ড়িল, পা বরফের উপর রাখা যায় না—
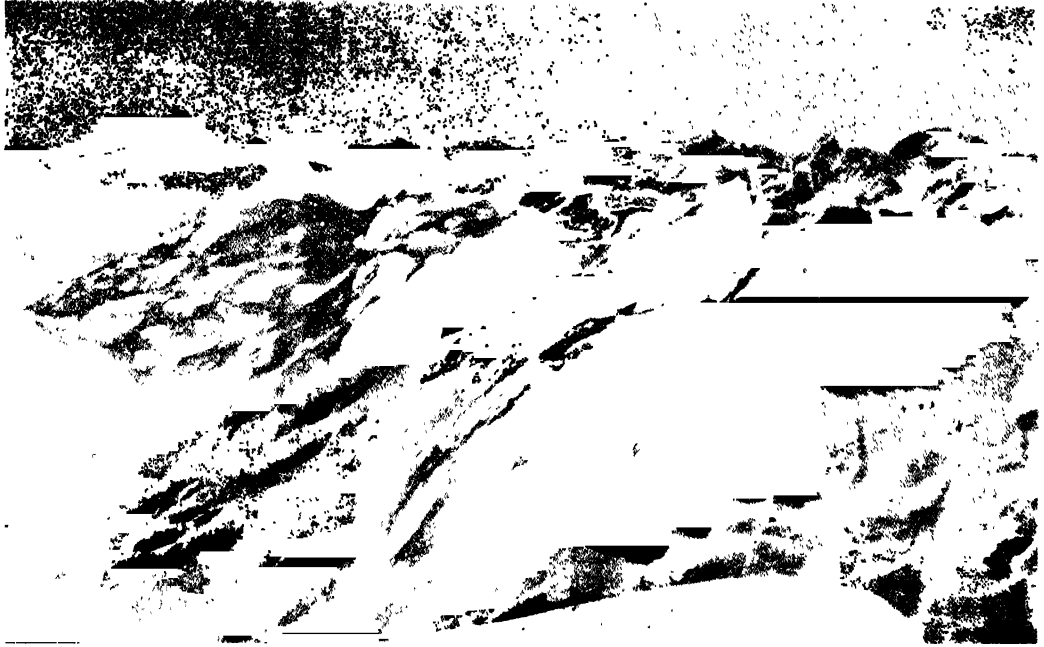
শোয়াৎ'স্ হর্ণ হইতে দেখা।

অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে, আধুনিক যুগে প্রকৃত পর্ব্বত-আরোহণকারী বলিতে যাহা বুঝায়—সেইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন হুগি নামক জনৈক সুইস্ বৈজ্ঞানিক। শীত ঋতুতে ইনিই যথার্থ ভাবে প্রথম আরোহণকারীর গৌরব লাভ করিয়াছেন।

হুগিই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্লেসিয়ারের চরিত্র লক্ষ্য করেন। স্থানীয় অজ্ঞলোকের বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি সকলকে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ দেন। ইনি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞান-শিক্ষক অবস্থায় পর্ব্বত-আরোহণ আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, গ্লেসিয়ার শীতকালে অচল হইয়া পড়িয়া থাকে। হুগিই প্রথম এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছেন।

আমাদিগকে উড়াইয়া লইবার উপক্রম করিল। একটি উচ্চ পাথরের আড়ালে বসিয়া পড়িলাম। সাময়িক নির্ব্বিঘ্নতা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আনন্দও যে তখন কিছু না হইয়াছিল তাহা নহে। আমরা যেন যুদ্ধ করিতে গিয়াছি। সম্মুখে মাটারহর্ণ তাহার অবিচলিত দৃঢ়ত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া হুহু করিয়া তীব্র বায়ু বহিয়া যাইতেছে—প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখে লইয়া আমরা একটু দূরেই বসিয়া আছি। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিয়া মানুষের অন্তরে অন্তরে যে ক্ষমতা জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই ক্ষমতা আমারো মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। ঘূর্ণী হাওয়া তুষারকণিকাগুলিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ভীষণ বেগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে—মুখে তাহা সূঁচের মত আসিয়া বিঁধিতেছে।

এক ফুট দেড়ফুট দীর্ঘ বরফের এক একটা খণ্ড নীচের গ্লেসিয়ার হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের পাশ দিয়া তীর-বেগে ছুটিয়া যাইতেছে, কিন্তু এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে কেহই বলে না যে, নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় লই! তারপর যখন ঝড়ের বেগ অসম্ভব বাড়িয়া গেল, যখন আর দাঁড়াইয়া থাকা গেল না তখনই আমরা পাথরের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে নহে।"

টি. এস. কেনেডির মত দুঃসাহসিক আরোহণকারী সে যুগে বিরল ছিল। তিনিই প্রথম দাঁ ব্লাশ চূড়ায় আরোহণ করেন। আল্পস্ পর্ব্বতের যত চূড়া তাহার প্রত্যেকটিতেই আরোহণ করিতে হইবে ইহাই যেন প্রতিজ্ঞা।

মূল উদ্দেশ্য চূড়ায় আরোহণ; শী উপলক্ষ মাত্র, পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে। পায়ে হাঁটিয়া উঠা-নামায় সময় বেশি লাগে। বরফ জমাট এবং অচল অবস্থায় বেশি দিন থাকে না। এ অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে উঠা-নামা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই শী-র ব্যবহার। জড় প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাণবান মানুষের লড়াই। মানুষ পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না, তাই বিঘ্নবিপদ দেখিয়াও তাহার লড়াইয়ের স্পৃহা আরো বাড়িয়াই যায়।

পর্ব্বত-আরোহণ যদি ঠিক পর্ব্বতে ভ্রমণ করিবার জন্যই হইত তাহা হইলে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থারই আশ্রয় লইত এবং না পাইলে চুপ করিয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা না পাইয়া উহারা কদাপি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই।

ইহাদের নির্ভীকতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দীর্ঘ সময়ের দরুণ যে সব বিপদ ঘটিত, শী-র দ্বারা সময় সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া সেই সব বিপদের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন বিপদ দেখা দিল। মানুষ কোনো অবস্থাতেই হার মানিল না।

রেভারেণ্ড কুলিজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেক গুলি চূড়ায় আরোহণ করিয়া খুব নাম করেন। কিন্তু তিনি শী ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরঞ্চ শী-র প্রতি তাঁহার অবজ্ঞাই ছিল। তাঁহার লাইব্রেরিতে শীর সাহায্যে পর্ব্বত-আরোহণ সম্বন্ধে একখানা বই ছিল। বইটির নাম 'Mountaineering on Ski,' ইহার নীচে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 'No!—Snow-running on Ski' অর্থাৎ তুষারে খেলা করা ছাড়া পর্ব্বত-আরোহণের মত মহৎ কাজে শী চাই না।

মিঃ মুর নামক একজন বিখ্যাত পর্ব্বত-আরোহণকারী, শীত ঋতুতে, "আল্‌স্‌-এর তুষারাবৃত প্রদেশে সময় সময় অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব করা যায়" এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কুলিজও লিখিয়াছেন—"শীতের আল্‌সে বরফের উপরে মাঝে মাঝে অসহ্য উত্তাপ অনুভব

রাড়ুনার কপৃফ্, গ্লেসিয়ার এবং রটহর্ণ।

করা গিয়াছে।" তিনি আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে, "উচ্চতর শৃঙ্গসমূহে তুষারের পরিমাণ কম, নীচের ক্ষেত্রে বেশি। বোধ হয় প্রবল হাওয়ায় উচ্চ শৃঙ্গ হইতে তুষার জমিবা-মাত্র উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।"

শী-পরিহিত একদল জার্মান পর্ব্বতারোহী।

কিন্তু শীতকালে শী-র সাহায্যে পর্ব্বত-আরোহণ সকলে পছন্দ করেন না। কারণ পর্ব্বতচূড়ায় প্রবল ঝড় শীতকালেই হইতে থাকে, হাড়সুদ্ধ জমিয়া যাইতে হয়। পায়ে প্রকাণ্ড শী, দুইহাতে চক্রার্ধ দুইটি দণ্ড বা দাঁড়। সম্মুখের, পশ্চাতের এবং দুইপার্শ্বের ঝোঁক সামলাইয়া তীব্র বেগে উঠা-নামা করিতে হয়। বহু দুঃসাহসী আরোহণকারীর সমাধির উপর দিয়া তাহাদের পথ।

এইরূপ বিপজ্জনক দুরূহ পথে চলিবার প্রেরণা পর্ব্বত-আরোহণকারীরা কোথা হইতে লাভ করে ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। মেরুপ্রদেশেই হউক বা পর্ব্বতশৃঙ্গেই হউক মানুষ যেখানেই নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া গিয়াছে সেই যাওয়ার মধ্যে বাহাদুরির অংশ অনেকখানিই আছে। প্রতিযোগিতা, নাম, যশ, সবই আছে। ইহা না থাকিলে আরামপ্রিয় মানুষকে শত রকম বিপদের সঙ্গে মুখামুখী দাঁড় করাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ঘরছাড়া করিবে কিসে?

শীতের দেশ বলিয়া ঘরের বাহিরে ছুটাছুটি করিবার আবশ্যকতাও স্বভাবতই উহাদের আছে। কিন্তু শীত জয় করা এবং প্রকৃতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সেই মারাত্মক যুদ্ধ জয় করা পৃথক জিনিস। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই রহস্যময়ী মূর্ত্তিকে দেখিয়া নানারূপ জ্ঞান লাভ করিবার স্পৃহাও কম প্রবল নহে। কিন্তু এসব ছাড়াও আরো একটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়।

ক্যামেরার সাহায্যে এই উপলক্ষে যে সব ছবি সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায় আরোহণকারীদের প্রেরণা যোগায় কে। যাহাদের দৃষ্টিতে এই সব অপরূপ দৃশ্য ধরা পড়িয়াছে—তাহারা যে সৌন্দর্য্যের উপাসক ইহা সহজেই মনে হয়। এই সৌন্দর্য্যই তাহাদের মূল প্রেরণা যোগায়।

দুই হাতে চক্রশীর্ষ দণ্ড লইয়া দ্রুত অবতরণ।

ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতির রুদ্র অথবা প্রশান্ত রূপের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের স্পর্শলাভ ঘটে। ইহা তাহাদের এক প্রকার

সৌন্দর্য্যপূজা। অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি দিন সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সৌন্দর্য্যের উগ্র ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই তাহাদের এই অভিযান।

স্নানে হর্ণ।

চারিদিকে প্রচণ্ড জনহীন শূন্য শুভ্রতা। কখনো বা তুষার-ঝড়ে চারিদিক অন্ধকার। নির্ভীক পূজারী প্রকৃতির সেই উন্মত্ত রূপের মধ্যে আপনাকে উৎসর্জ্জিত করিয়া দিয়াছে। ঝড় থামিল। কুয়াসা দূর হইয়া গেল। পর্ব্বতের শুভ্র চূড়াগুলি যেন সমুদ্রের ঢেউএর মত তাহার চোখের সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতে লাগিল। অচঞ্চল পর্ব্বত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—প্রকাণ্ড বরফের চাপ ভাঙিয়া পড়িতেছে, তুষারের নদী বহিয়া যাইতেছে। এই বিপুল শক্তিময়ী প্রকৃতির সঙ্গে তাহার নিবিড় যোগসাধনা। ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্ব ভুল হইয়া যায়—মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার বৃহত্ত্ব উপলব্ধি করে।

আল্পস্-আরোহণকারীদের নিজের অভিজ্ঞতাই উদ্ধৃত করা গেল। 'মাইজে'-যাত্রী পিয়ার ডালোস্ লিখিতেছেন—

"শেষবারের জন্য মাইজের দিকে চাহিলাম। সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল মাইজে আমাদের দৃষ্টি ধাঁধাইয়া দিল। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে মাইজে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অদ্ভুত তাহার সৌন্দর্য্য, যেন স্বপ্নের সৃষ্টি, যেন জীবন্ত। তাহার রহস্য ভেদ করি এমন সাধ্য আমার নাই, তাহাকে কোনো নিয়মে বাঁধা যায় না—সে এক মহিমাময় অপূর্ব্ব প্রকাশ, আমাদের মনে অসীম বিস্ময় জাগাইয়া তোলাই তাহার কাজ। সে যেন আমাদের প্রাত্যহিক জগৎকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে লইয়া যায়।"

এক স্কী-আরোহণকারী লিখিতেছেন—

"নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া আবিষ্কারকারীর যেরূপ আনন্দ আমিও সেই আনন্দ অনুভব করিলাম—সম্মুখে প্রসারিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ক্ষুধিত দৃষ্টিদ্বারা সেই সৌন্দর্য্য যেন গ্রাস করিতে লাগিলাম।"

অন্যে লিখিতেছেন—

স্নাসেন হর্ণ।
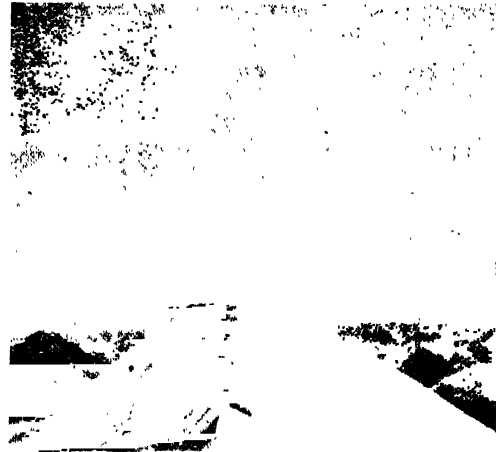
"তইদিন পূর্ব্বে যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম, ফিরিবার পথে গ্লেসিয়ারের সেই বাঁকে বিশ্রাম করিতেছি। সেই

দৃশ্যের দিকে একবার চাহিলাম—কিন্তু এবারে দৃশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত নূতন বলিয়া মনে হইল। চারিদিকে গভীর প্রশান্তি, সূর্য্যাস্তের সময় ধীরে ধীরে তুষারের উপর একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। দূরে এভারেষ্টের উপরে তুষার হইতে একটি ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হইতেছিল, তুষার হাওয়ায় ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়—সেই আলো কুয়াসার মধ্যে মিলাইয়া গেল। নির্ম্মল আকাশের বুকে এভারেষ্টের শুভ্র শীর্ষ যেন ঘুমাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। চারিদিকে তাহার গর্ব্বিত দৃষ্টি—মানুষের অতি ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

"সেই সন্ধ্যায় প্রদীপের ক্ষীণ আলোর সম্মুখে বসিয়া বসিয়া আমার এই অভিযানটিকে নূতন করিয়া উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। একে একে সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিলাম; উপর হইতে যাহা কিছু অন্তরে বহন করিয়া আনিয়াছি অন্তরের ভাণ্ডার খুলিয়া কৃপণের মত তাহা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। স্মৃতির ঐশ্বর্য্যভারে মন পীড়িত হইয়া উঠিল—মনে হইল যেন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া হস্তপুটে জলপান করিতেছি কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়া জল নীচে পড়িয়া যাইতেছে।"

দৈহিক শক্তিদ্বারা বস্তুকে জয় করা চলে, কিন্তু বস্তুহীন সৌন্দর্য্য অন্তর দিয়া জয় করিতে হয়। শী-ব্যবহারকারী পর্ব্বত-আরোহীগণ যে কত বড় শিল্পী এবং সৌন্দর্য্যপিপাসু তাহা এই চিত্রগুলিতেই প্রমাণিত হইবে। ক্যামেরা ত যন্ত্রমাত্র, কিন্তু যাঁহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা মহৎ শিল্পী হিসাবে নমস্য। মূল কথা, শী-র সাহায্যে বা বিনা শী-তে পর্ব্বত-আরোহণকারীগণ যে-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বার বার কঠোর দুঃখ সহ্য করিয়াছেন তাঁহাদের সেই সৌন্দর্য্য-বোধই আমাদের মনে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলে। ইহা না থাকিলে শুদ্ধমাত্র সার্কাস্ দেখাইবার জন্য পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণকারীকে আমরা এরূপভাবে স্মরণ করিতে পারিতাম না।

খোকার ঘুম

সোনার স্বপন জড়িয়ে আসে যাদুমণির চোখে—
আয়রে ঘুম আয়—
হীরের চূড়ো, মতির লহর গড়িয়ে দেব তোকে,
দেব, গয়না সারা গায়।
চমক হেনে আসিস্ নারে
আয় হেঁটে পায় পায়,
আলোর দেশের যাদু আমার
ঘুমের দেশে যায়।

আকাশ ছেয়ে এল আঁধার,
বাতাস হ'ল ভারী,
দাপাদাপি থাম্‌ল কখন
ঝিমায় সারা বাড়ী।

মেনি বেরাল হেঁসেল-কোণে হাই তোলে আর ধোঁকে,
আয়রে ঘুম আয়—
আসতে যদি করিস দেরী, আচ্ছা করে ব'কে
দেব, আয় স্বপনের নায়।
লুকিয়ে কাজল চোখের পাতায়,
খোকন ঘুমু যায়—
কালো নদীর ঢেউ তোলা ঘুম—
আয় হেঁটে পায় পায়।

নারীর বন্ধু

—শ্রীসীতা দেবী

অমরকুমার সকালের ডাকে চিঠিখানা পাইয়াছিল। সঙ্গে ছিল দুইখানি পোষ্টকার্ড, এবং সে মাসের "ধরিত্রী" কাগজখানা। গৃহিণী একবার মাসিকপত্রখানি হাতে পাইলে, বিজ্ঞাপনগুলিও নিঃশেষে না পড়িয়া কাগজখানি হাতছাড়া করেন না, সুতরাং তাঁহার হাতে দিবার আগেই অমরকুমার তাড়াতাড়ি ছবি ক'টা এবং ছোট গল্প কয়টার উপসংহারের উপর চোখ বুলাইয়া লয়।

আজও সে তাহাই করিতেছিল। সামনে চায়ের পেয়ালাটা তখনও অর্দ্ধেক ভরা, অল্প ঘিয়ে ভাজা পরোটা দুটির একখানি মাত্র উদরস্থ হইয়াছে। কিন্তু এগুলির সদ্ব্যবহার পরে করিলেও চলিবে, সম্প্রতি "ধরিত্রী"খানার সদ্ব্যবহার সময় থাকিতে করিয়া ফেলা ভাল।

ছবিগুলিতে রংচং-এর বাহার খুব, আর বেশী বিশেষত্ব কিছু নাই। জড়োয়া গহনা ও দামী বেনারসী অথবা ছাপা রেশমের শাড়ী পরা, স্বাস্থ্যবতী কয়েকটি যুবতীর ছবি। এ রকম ছবি আঁকায় দুগুণ লাভ। মাসিকপত্রে মৌলিক চিত্ররূপেও এগুলি ছাপা চলে, আবার রেশমের দোকান ও গহনার দোকানের বিজ্ঞাপন হিসাবেও ইহাদের চাহিদা আছে। এই ত গেল ছবির ব্যাপার। গল্প গুটিচার আছে বটে, তাড়াতাড়িতে চোখ বুলাইয়া অমর ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, কোন্‌টি আগে পড়িতে আরম্ভ করিবে। প্রথম গল্প 'মৃত্যুবাসর' নিশ্চয়ই ঘোরতর বিয়োগান্ত ব্যাপার। পরিশ্রম করিয়া মন খারাপ করিতে হইবে, এত সুখের কপাল অমরকুমারের নয়, ও খোরাক এমনিতেই যথেষ্ট আসিয়া জোটে। সুতরাং অমরকুমার পাতা উল্টাইয়া বাহির করিল, 'পূর্ণিমাতে'। শ্রীমতী বিভাসিনী দেবী লিখিত। লেখা এবং লেখিকা উভয়ের নামই অমরের কানে ভাল শুনাইল, সে চটপট করিয়া এই গল্পটিই পড়িয়া চলিল। আরম্ভটি বেশ মধুর, গল্পও ভালই হইবে। লেখিকা বুদ্ধিমতী, কিরূপে পুরুষ পাঠক ও অধিকাংশ মহিলাদের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। নায়িকা মাধবী, আদর্শ আর্য্যনারী।

কিন্তু নিশ্চিন্তে গল্প পাঠ করা বেচারা অমরের ভাগ্যে লেখা ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হইতে না হইতে তাহার প্রথমা কন্যা মিণ্টুর কাংস্যকণ্ঠ তাহার কানের কাছে বাজিয়া উঠিল, "বাবা, ওকি হচ্ছে? মা বলে দিয়েছে না 'ধরিত্রী'র মোড়ক কখনও তুমি খুলবে না? দাঁড়াও আমি মাকে গিয়ে এখনি বলে দিচ্ছি।"

অমর চকিত হইয়া কাগজখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। একটু রাশভারি ভাব আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "খুলেছি ত কি হয়েছে? ভারি সব ইয়ে হয়েছে না?"

মিণ্টু ততক্ষণ তাহার চেয়ারের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, টুলের উপর রক্ষিত কাঁসার রেকাবীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "তুমি কি খাচ্ছ বাবা? হুঁ, তোমরা নিজেরা কেবল ভাল ভাল খাও, আমাদের বেলা খালি গুড় আর রুটি, হুঁ!"

অমর আধখানা পরোটাতে একটু গুড় মাখাইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভাল ভাল খাবার জো আছে কিনা তোমাদের জ্বালায়? এই নাও, গেলো।"

মিণ্টু দাঁড়াইয়া পরোটা খাইতে লাগিল। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া তাহার বাবা আবার তাড়াতাড়ি মাসিকখানার পাতা উল্টাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণে মেয়ের খাওয়া শেষ হইবে ততক্ষণ তাহার অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়া যাইবে।

ভিতর হইতে এবার পত্নী শোভারাণীর ঝঙ্কার শোনা গেল, "হ্যাঁ লা মাণ্টি, কি গিলছিস ওখানে গব গব করে? মা, মা, কি হ্যাংলা মেয়ে গা! বাপের পাত থেকে চুরি করে খাচ্ছিস? হ্যাঁ গা, তুমিও কি চোখের মাথা খেয়েছ? ওমা, ওখানা কি তোমার হাতে? ধরিত্রী বুঝি? পই পই করে তোমায় বলেছি না, যে ওখানা তুমি খুলবে না?" বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া ছোঁ মারিয়া কাগজখানা স্বামীর হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

অমরকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার শুকনো পরোটা ও চায়ে মন দিল। আর্য্যনারীদের পতিগতপ্রাণতার কথা গল্পে পড়িতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু কার্য্যে তাহার পরিচয় পাইলে আরো ভাল লাগিত বোধ হয়। এই দেখ না তাহার নিজের স্ত্রী শোভা। কাজকর্ম্ম করে, ঘর-সংসার চালায়, সবই বোঝা

যায়, কিন্তু কথাবার্ত্তাগুলি একটু মোলায়েম হইলে ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু সে কথার উল্লেখ মাত্র করিবার জো কি? মফঃস্বলের ক্ষুদ্র শহরের উকীল বেচারা অমর। অতিকষ্টে দু'পাঁচ টাকা যাহা আনে, তাহাতে সংসার চলে না। শোভারাণীকে সারাক্ষণ বাপের কাছে চাহিয়া, মামার কাছে আব্দার করিয়া, সময়বিশেষে গহনা বাঁধা দিয়াও সংসার চালাইতে হয়। মা লক্ষ্মীর কৃপা নাই, কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপা বেশ আছে। সুতরাং গৃহিণীর কথার উপর তাহার কোন কথাই চলে না। "ধরিত্রী"খানা আবার শ্বশুর মশায়ই মেয়ের নামে পাঠান, কাজেই আইনতঃ অমরের সেখানা খুলিবার কোনো অধিকার নাই। স্ত্রীর চিঠি খুলিয়া পড়াতে বিলাতের এক ভদ্রলোকের সেদিন অর্থদণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং জজের কাছে তীব্র মন্তব্য লাভ হইয়াছে, এ সংবাদ মাত্র কয়েকদিন আগে কাগজে ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলিবার মত নৈতিক সাহস অমরকুমারের একেবারেই চলিয়া গিয়াছে।

চায়ের পেয়ালা শেষ হইল। মিণ্টুর পরোটা খাওয়াও ততক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে পেয়ালা পীরিচ ও কাঁসার রেকাবী উঠাইয়া লইয়া, তৎসংলগ্ন গুড়টুকু চাটিতে চাটিতে ভিতরে চলিয়া গেল। অমর চিঠি তিনখানিতে মন দিল। খামখানা শেষের জন্য রাখিয়া দিল, তাহার উপরের হস্তাক্ষর অপরিচিত বলিয়া। একখানা পোষ্টকার্ড আসিয়াছে শ্বশুরালয় হইতে, স্বয়ং শ্বশুর মহাশয়ের লেখা। তাঁহারা সকলে কুশলে আছেন, কেবল অমরের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বাত আবার চাগিয়া উঠিয়াছে, এখানের সকলের কুশল প্রার্থনীয়। যাক্। আর একখানি পোষ্টকার্ড আসিয়াছে অমরের ভগিনীর নিকট হইতে। হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়াই অমর একবার মুখ বিকৃত করিল। ভগিনী অর্থের প্রয়োজন না থাকিলে কখনও ভুলিয়াও চিঠি লেখেন না এবং প্রত্যেক চিঠি আরম্ভ করেন এই বলিয়া যে বহুদিন দাদার এবং ভাইপো-ভাইঝিদের খবর না পাইয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত আছেন। ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে তাঁহার বনে না, কারণ টাকা দিবার পথে সেই প্রধান বাধা, সুতরাং চিঠিতে কখনও তাহার নামোল্লেখও থাকে না। যাক্, এ চিঠিতেও দস্তুরমাফিক দুঃখ ও চিন্তা প্রকাশ ও কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যের জন্য তাগিদ আছে। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পোষ্টকার্ডখানা টেবিলের উপর দোয়াত চাপা দিয়া রাখিয়া দিল।

এইবার খামখানির পালা। বেশ মোটা পুরু খাম, উপরের হস্তাক্ষর অতি পাকা হাতের। এ হাতের লেখা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া অমরকুমারের মনে পড়িল না। কে আবার তাহাকে চিঠি লিখিতে গেল?

খাম ছিঁড়িয়া সে চিঠি টানিয়া বাহির করিল। সলিসিটারের কাছ হইতে আসিয়াছে। ব্যাপারখানা কি!

চিঠি পড়িয়া বিস্ময়ে অমরের চোখ কপালের মাঝামাঝি উঠিয়া গেল। শ্রীযুক্ত অমরকুমার গাঙ্গুলী যদি আগামী শনিবার কলিকাতায় ১২নং—ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ৪টার সময় উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের লাভজনক কোন সংবাদ শুনিতে পাইবেন। নিম্নে যাঁহার নাম স্বাক্ষর, অমর এতদূরে বসিয়াও তাঁহার যশের ঝঙ্কার শুনিয়াছে। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত আইনজীবী, অমরের সঙ্গে কোন প্রকারেই তাঁহার শ্যালক সম্পর্ক আছে তাহা বলা চলে না, এবং মাসটাও সেপ্টেম্বর, এপ্রিল নয়। সুতরাং ইহাকে রসিকতা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। অথচ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও ত কঠিন। অমরের ভাগ্যে লাভজনক কখনও কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া ত মনে পড়ে না। বিড়ালের ভাগ্যে যদি বা দুই একবার শিকা ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহাও সময় বুঝিয়া সামলাইয়া গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত ছেঁড়ে নাই।

অমরকুমার দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। দেশের স্কুল হইতে পাশ করার পর, অনেক কষ্টে, ভিটামাটি বন্ধক দিয়া বাপ তাহাকে কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। আশা ছিল, এই ছেলে হইতেই একদিন ভিটা আবার উদ্ধার হইবে। সে আশা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই। সব শুদ্ধ আট নয় বৎসর অমরকুমার কলিকাতায় বাস করিয়াছিল। এই সময়ে তাহার বাবা তাহার পিছনে যে টাকা ঢালিয়াছিলেন, চৌদ্দ বৎসর ওকালতী করিয়াও তাহার অর্দ্ধেক টাকা সে ঘরে আনিতে পারে নাই। কলিকাতায় দিনগুলা তাহার ভালই কাটিয়াছিল, সেই যা লাভ। জীবনে আর তেমন দিন আসিবে কিনা সন্দেহ, মনে করিলে এখনও বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠে। পরলোকগত পিতা এই একটা উপকার তাহার

অন্ততঃ করিয়া গিয়াছেন। শোভারাণীর সঙ্গে বিবাহটাও অবশ্য তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে ব্যাপারটাকে অবিমিশ্র কল্যাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অমর আজও পারিয়া উঠে না। অবশ্য বাহিরে এ লইয়া তর্ক করিবার সাহস তাহার নাই। শোভারাণীর পিতৃসৌভাগ্যেই এখন পর্য্যন্ত যাহোক দুইটা শাকচচ্চড়ি-ভাত তাহার মুখে উঠিতেছে।

কিন্তু সে যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া এখন ভাবনা করা বৃথা। কলিকাতার ব্যাপারটার সম্প্রতি কি করা যায়? এ এক বিষম সমস্যা। হয়ত সত্যই লাভজনক কিছু সংবাদ পাইবার আশা আছে, যদি অধিক সন্দেহবাদী হইয়া সে না যায়, তাহা হইলে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইবে। এ রকম সুযোগ জীবনে দুইবার আসে না, অন্ততঃ অমরের মত মানুষের কপালে। আবার শুধু যদি ধাপ্পা হয়, তাহা হইলেও খরচপত্র করিয়া গিয়া আফ্‌শোষের সীমা থাকিবে না। এই ত মাগ্গিগণ্ডার দিন, দুইটা টাকা কাহারো কাছে চাহিলে পাওয়া যায় না। যাতায়াতে ও থাকা খাওয়ার খরচে কোন্ না কুড়িটা টাকা ব্যয় হইবে? যদি চোখ কান বুজিয়া কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী ওঠা যায়, তাহা হইলেও পনেরো টাকা খরচ হইবেই। এত টাকা সে পাইবে কোথায়? নিজের তাহার দৈনিক চার আনা হাত-খরচ বরাদ্দ, ইহা হইতে কোনো দিনই কিছু বাঁচে না, বরং শোভারাণীর কাছে উপরি কিছু চাহিতে হয়, এবং তাহার জন্য যথেষ্ট মুখনাড়া সহ্য করিতে হয়। শোভারাণীর কাছে টাকা না থাকাই সম্ভব, এমনিতেই সংসার চালাইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর যদিই বা দুই চার টাকা সে লুকাইয়া-চুরাইয়া রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অমরকে তাহা দিবে কেন? অমরই বা চাহিতে যাইবে কোন্ মুখে?

সেজ ছেলে পানু হাঁকিয়া বলিল, "বাবা, মা জিগ্‌গেস করছে আজ কি আদালত ছুটি? ন'টা কখন বেজে গেছে, তুমি চানও করছ না, কিছুই না। এরপর কলঘর পাবে না কিন্তু।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি," বলিয়া অমরকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। শোভারাণী একবার স্নান করিতে ঢুকিলে, সে বেলার মত নিশ্চিন্ত। সুতরাং বাড়ীর আর সকলে ভয়ে ভয়ে আগেই কাজটা সারিয়া লয়।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, শোভারাণী ভাত বাড়িয়া, আসনের সম্মুখে সাজাইয়া, মাছি তাড়াইতেছে। স্বামীকে দেখিয়া বলিল, "নাও এখন কোনো মতে জল দিয়ে ভাত ক'টা খেয়ে কোর্টে দৌড়ও, সাধে কি আর এত হজমের গোলমাল? কি যে কর সারা সকাল তা তুমিই জান, অথচ কোনোদিন সময়মত নাওয়া খাওয়া তোমার দ্বারা হবার জো নেই।"

অমর ডাল দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "একটা ব্যাপারে বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেছে তা খেয়ালই ছিল না।"

শোভারাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি আবার ভাবনার ব্যাপার ঘটল? কারো অসুখ-বিসুখ হয় নি ত? কলকাতার চিঠি এসেছে? ওখানের সব ভাল ত?"

যেন কলকাতা ভিন্ন আর কোথাকার কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে কোনোই ভাবনার কারণ নাই। মেয়েমানুষ এমনই স্বার্থপর বটে। কিন্তু বল দেখি তাহাদের সামনে এ কথা! আস্ত গিলিয়া খাইতে আসিবে। তাঁহাদেরই দয়ামায়ায় নাকি সংসার টি'কিয়া আছে।

মুখে বলিল, "না অসুখ-বিসুখ কিছু না। কলকাতার সবাই ভালই আছে। কিন্তু আজ কলকাতার এক সলিসিটারের কাছ থেকে এক অদ্ভুত চিঠি পেয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি, কি করব, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না।"

শোভারাণী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, উকীলের চিঠি কেন গা? কারো ভালয়ও নেই, মন্দেও নেই, তোমার উপর এ উৎপাত কেন?"

অমর বলিল, "উৎপাত নাও হতে পারে, উল্টোটা হওয়াই সম্ভব।" সে স্ত্রীকে সবিস্তারে চিঠিখানার মর্ম্ম খুলিয়া বলিল।

শোভারাণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যাও না হয় দেখেই এস। আমরা ত কারো মন্দ করিনি, আমাদের মন্দ লোকে করবে কেন? যা দুর্গতিতে দিন কাটছে, তা কেবল মা দুর্গাই জানেন। যদি কিছু দু'চার টাকা পাওয়া যায় ত তাই লাভ।"

অমর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিন্তু বিনা পয়সায় ত আর কলকাতা যাওয়া যায় না।"

শোভারাণী বলিল, "গোটা কয়েক টাকা কি আর কারো কাছে ধার পাবে না? এত বন্ধু-বান্ধব তোমার। চা করতে করতে ত হাতে ফোস্কা পড়ে যায়।"

অমর বলিল, "ঐ চা খাওয়া পর্য্যন্তই। একবার দুটো টাকা চাও দেখি? ছ'মাস আর এ মুখো হবে না।"

ঢং ঢং করিয়া নিকটের একটা স্কুলে ঘণ্টা পড়িয়া গেল। অমর একলাফে উঠিয়া পড়িল, আর দেরি করা চলে না। কোনোমতে চোগা-চাপকান আঁটিয়া বাহির হইয়া গেল, কলিকাতা যাইবার পরামর্শ টা আর শেষ হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিল। মিণ্টু রেকাবীতে করিয়া কয়েক টুকরা আম ও বাড়ীতে তৈয়ারী একটু মিষ্টি রাখিয়া গেল। হাতের তালপাখা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে অমর জলযোগ আরম্ভ করিল। বাবাঃ, কি অসহ্য গরমই পড়িয়াছে, প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে চায়। এ ত আর কলিকাতা নয় যে সুইচ টিপিলেই মাথার উপর বন্‌বন্ করিয়া ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ঘুরিতে আরম্ভ করিবে? এখানে পচিয়া মরা ছাড়া উপায় নাই। কলিকাতায় গিয়া বাস করার সৌভাগ্য আর এ জীবনে ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া ত বোধ হয় না। এক যদি ঐ সলিসিটারের চিঠিটাতে সত্যই কিছু লাভ ঘটে। কিন্তু যাওয়া যায় কি প্রকারে?

বিকালের কাপড়কাচা শেষ করিয়া, ভিজা কাপড় উঠানে খাটান তারের উপর মেলিয়া দিতে দিতে শোভারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো কিছু জোগাড় হল?"

আমর ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "হ্যাঃ, জোগাড় হবে। তেমনি স্থানেই আছি। বলে আমারই কাছে একটা টাকা ধার নেবার জন্যে কত লোকে সাধাধাধি করলে। যাওয়াটা আর শেষ অবধি হবে না দেখছি।"

শোভারাণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সংসারের অভাব-অনটনের ধাক্কা সবটাই প্রায় সে পোহায়। স্বামীর আর কি! খাইয়া-দাইয়া একবার বাহির হইয়া যাইতে পারিলেই হয়, তারপর আর কোন ভাবনা নাই। দুপয়সা ঘরে যদি আসে তাহা হইলে শোভারাণীরই হাড়ে বাতাস লাগে বেশী করিয়া। অমরকুমার যত সহজে যাইবে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে পারে, সে ত তা পারে না। সকালে এই কথাটা শোনা অবধি তাহার যেন আহারনিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। যাইবার পাথেয় সংগ্রহের কত উপায়ই যে সে ভাবিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কত হলে তোমার হয়?"

অমর আশান্বিত ভাবে বলিল, "টাকাকড়ি আছে নাকি তোমার কাছে কিছু?"

শোভারাণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ কত হাজার দুহাজার এনে দিচ্ছ আমায়, আমি টাকা জমাব না ত আর কে জমাবে?"

অমর মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিল, "হাজার দু হাজার যে আনি না, তা ত জানিই, তা কি আর আমার এক মুহূর্ত্ত ভুলবার জো আছে? তুমি কথাটা তুলতে গেলে কেন? টাকা যখন নেই-ই, তখন আমার কুড়ি টাকা লাগলেই বা কি আর একশ টাকা লাগলেই বা কি?"

শোভারাণী স্বামীকে খোঁটা দিবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও সামলাইয়া গেল, কারণ এখন অধিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের পরামর্শ দরকার। বলিল, "টাকা পনেরো দিতে পারি কোনও মতে। মাকড়ী জোড়া ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই স্যাক্‌রার কাছে বেচে দিয়েছিলাম। পূজোর সময় বৌএর কানে যেমন আছে, সেই রকম একজোড়া দুল গড়িয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল। তা ভাগ্যে থাকে ত অমন দুল ঢের হবে, তুমি এখন টাকাটা নিয়ে একবার এস গিয়ে। যাওয়া-আসার খরচ বই ত না?"

শোভারাণী ধরিয়াই লইল যে, অমর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উঠিবে। তাহার নিজের কিন্তু সে মতলব ছিল না। তাহার বন্ধু যোগেশের বাড়ীই যাইবে। এমন একটা অদ্ভুত কাজে সে যাইতেছে যে, যত কম লোক জানাজানি হয় ততই ভাল।

জলযোগ শেষ করিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে সে বলিল, "আচ্ছা, পনেরো টাকাই দাও, ওতেই কষ্টেসিষ্টে চালিয়ে নেব। কালই বেরিয়ে পড়ি। শনিবার হতে দেরি ত আর নেই।"

শোভারাণী ভিতরে চলিয়া গেল। এই দারুণ গরম, ইহার উপরে দুবেলা হাঁড়িঠেলা। শোভারাণীও কিছু সুখে নাই। দেখা যাক, সত্যই যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে

এইবার একটা ঠাকুর রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাড়িতেই শোভারাণী কাপড়-চোপড় সিদ্ধ করিতে লাগিয়া গেল। ময়লা কাপড় লইয়া ত বিদেশে যাওয়া যায় না। আর এ রাজধানী নয় যে, পয়সা খসাইলেই একঘণ্টায় কাপড় ধবধবে হইয়া আসিবে। কাজেই ঘরে কাচিয়া গরম জলভরা ঘটির সাহায্যে ইস্ত্রি করিয়া দিতে হইবে।

পরদিনই অমর রওনা লইয়া গেল। যাইবার সময়ে শোভারাণীকে আশ্বাস দিয়া গেল, "ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তা হলে তুমি কেন, যা কিছু গহনার সখ আছে সব গড়িয়ে নিতে পারবে।"

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোজা সে বন্ধুর বাড়ী গিয়াই উঠিল। যোগেশ তখন সবে চা খাওয়া শেষ করিয়াছে। অমরকে দেখিয়া সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া, ভিতরে আর একবার চায়ের হুকুম পাঠাইয়া দিল। বলিল, "বোসো বোসো, কি মনে করে? তোমাদের দেখতে পাওয়া ত আজকাল সহজ ব্যাপার নয়।"

অমর বলিল, "এই একটু ডাক্তার দেখাতে হবে। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ভাবলাম টাকা খরচ করে যখন দেখাবই, তখন পাড়াগাঁয়ে হেতুড়েকে না দেখিয়ে একবার কলকাতাই যাই।"

যোগেশ বলিল, "মিথ্যে নয়।" বলিয়া হেতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়িয়া কোথায় কত দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছে, তাহারই বর্ণনা আরম্ভ করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুর মহাশয়রা এখন এখানে নেই নাকি?"

অমর অপ্রতিভভাবে বলিল, "বিলক্ষণ আছেন। তবে তাঁদের ওখানে উঠলাম না, কেন জান? অসুখ বিসুখের ব্যাপার, ডাক্তারে কি বলতে কি বলবে। কিছুর ঠিকানা নেই ত। তাঁরাও ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, আর আমার গিন্নীটিও মূর্চ্ছাই যাবেন, জান না ত ভারি হিষ্টিরিকাল্ মানুষ। তাই লুকিয়ে এসেছি, কাজে যাচ্ছি, হ্যান-ত্যান বলে। এখন ব্লড্ প্রেসারই দাঁড়ায় কি ডাইবেটিস্ই দাঁড়ায়, তা ত বলতে পারছি না কিছু।"

যোগেশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল. "সেটা একরকম মন্দ করনি। আমাদের ঘরের মেয়েছেলেদের কিছু না জানানই ভাল।"

বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজবে সকালটা একরকম ভালই কাটিল। কিন্তু তাহার পর যোগেশ ত খাইয়া-দাইয়া অফিস চলিয়া গেল, তখন হইল অমরের দারুণ বেকার অবস্থা। বন্ধুপত্নী মোটেই আধুনিক নন, অমরের সামনে শুদ্ধ তিনি আসেন না। ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় যে দুই তিনটা তাহারা ইস্কুলে চলিয়া গিয়াছে, বাকিগুলার সঙ্গে কথা বলা চলে না। শ্বশুরবাড়ী যাইবার উপায় থাকিলে শ্যালকদের সঙ্গে গল্প করিয়া দিব্য আরামে দুপুরটা কাটিত, কিন্তু তাহাদের ওখানে যখন ওঠে নাই, তখন শনিবারের ব্যাপার চুকিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ও মুখো আর হওয়া চলিবে না। কালই শনিবার, আজকার দিনটা কোনো মতে কাটাইয়া দিতে হইবে। এখানেও গরম, কিন্তু ফ্যান্ ত আছে, কাজেই দরজা জানলাগুলি ভেজাইয়া দিয়া অমরকুমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে লাগিয়া গেল দিবানিদ্রার চেষ্টায়।

বিকাল হইতে না হইতে চা খাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ১২নং—ষ্ট্রীটটা আগে হইতে দেখিয়া শুনিয়া রাখা ভাল, কাল যেন আর ঘোরাঘুরি করিতে না হয়। যোগেশের ত ফিরিতে সেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে, ততক্ষণে অমর ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

১২নং—ষ্ট্রীট খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। মস্ত বড় বাড়ী, ঠিক বড় রাস্তার উপরেই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাড়ীখানা সেই স্বনামধন্য আইন-জীবীরই। অমর দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া আসিল। আর ত কিছু করিবার নাই, রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করিয়া ঘুরিলে, হয়ত বা শ্যালকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া যাইবে, তখন আবার অপ্রস্তুত হইতে হইবে। কাছেই একটা সিনেমা হাউসে ঘোর রোলে বাদ্য সুরু হইয়া গিয়াছে, অমরের বহুকালের বঞ্চিত প্রাণটা হু হু করিয়া উঠিল। শোভারাণীর ক্রুদ্ধ মুখের স্মৃতিও তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, চার আনা পয়সা খরচ করিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

বায়স্কোপ হইতে বাড়ী ফিরিতে ন'টা বাজিয়া গেল। যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ?"

অমর বলিল,"এই নানা জায়গা ঘুরতে দেরি হল, ডাক্তার-টাক্তারও ঠিক করলাম।"

কোন্ কোন্ ডাক্তারকে দেখান উচিত সেই বিষয়ে যোগেশ দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিল, অন্দরমহল হইতে খাওয়ার তাগিদ না আসা পর্য্যন্ত সে আর থামিল না।

পরদিন ভোর হইতেই অমর উঠিয়া বসিল। বাড়ীর কেহ তখনও জাগে নাই, সবে চাকরটার নড়াচড়ার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। সারারাত উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার ঘুমই হয় নাই। সম্মুখের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি টাঙানো। আর কাহাকেও না পাইয়া অমর যুক্তকরে সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেই একটা নমস্কার জানাইয়া মনে মনে বলিল, "হে ঠাকুর, দয়া রেখো, কিছু যেন পাই, একেবারে খালিহাতে যেন বাড়ী ফিরতে না হয়।" তাহাই যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ হয়, তাহা হইলে পত্নীর মুখের চেহারাখানা কিরূপ হইবে, ভাবিতেই তাহার ভয় করিতে লাগিল।

দিনটা যে তাহার কি ভাবে কাটিল, তাহা সেই জানে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটাই কর্ কর্ করিতে লাগিল। সময়টাকে কোন মতে ঠেলা মারিয়া যদি আগাইয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে অমর বর্ত্তিয়া যাইত। কোর্টে যাইবার যখন তাড়া থাকে, তখন হতভাগা ঘড়ি যেন নক্ষত্রের গতিতে চলিতে থাকে, আর আজ রকম দেখ না? দশটার ঘর হইতে কাঁটাটা যেন নড়িতেই চাহে না।

যাহা হউক, ঘড়িতে অন্য দিন যে সময় চারটা বাজে আজও তাহাই বাজিল। বিকালে রোদ পড়িতেই যে সে বাহির হইয়া যাইবে, তাহা অমর সকাল বেলায়ই লোকমারফত বন্ধু-গৃহিণীকে জানাইয়া রাখিয়াছিল। তাই তিনটা বাজিতেই পিরীচে দুইটা বড় রসগোল্লা এবং এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আসিয়া হাজির হইল। টপাটপ্ মিষ্টি দুইটি গিলিয়া ফেলিয়া চা-টার অর্দ্ধেক, মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ও অর্দ্ধেক ফেলিয়া রাখিয়া অমর বাহির হইয়া গেল।

ট্রামে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে পৌছিতে তাহার মিনিট পনেরোর বেশী লাগিল না। বাড়ীর সামনে গুটি তিন চার ভাল ভাল গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। হোমরা-চোমরার ব্যাপার, ইহার ভিতর ট্রাম হইতে নামিয়া প্রবেশ করিতে তাহার যেন কেমন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা লজ্জা করিয়াই বা লাভ কি? মোটর হাঁকাইবার ক্ষমতা যদি থাকিত তাহা হইলে আর এখানে সে আসিবে কি করিতে?

ভিতরে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় এক দারোয়ান তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, "আপকো কার্ড বাবু?"

কার্ডের বালাই অমরকুমারের কোনদিন ছিল না, কিন্তু না দিলে যখন নয়, তখন পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া, পেন্সিল দিয়া নিজের নাম লিখিয়া দিল। দারোয়ান ভিতরে ঢুকিয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিল, এবং অমরকে পথ দেখাইয়া একটা মস্ত হলঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিল।

ঘরটি সলিসিটার মহাশয়ের অফিসঘর বোধ হয়, সেই ভাবেই সজ্জিত। তিন চারজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা অমরকে নমস্কার করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। অমর প্রতি-নমস্কার করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। গৃহস্বামী কে তাহা বুঝিতে পারিল না, সুতরাং কাহারও সহিত কথা বলিতেও ভরসা করিল না। চারটা বাজিতে আর মিনিট পনেরো মাত্র বাকি আছে, কাজেই বেশীক্ষণ তাহাকে আর সংশয়ের দোলায় দুলিতে হইবে না।

দেখিতে দেখিতে আর তিনচার জন লোক ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার পরই দরজা দুইটি ভেজাইয়া দেওয়া হইল। টেবিলের সামনে বেশ মোটাসোটা একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "চারটা বেজেছে, আমরা সবাই উপস্থিতও হয়েছি, আর দেরী করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের সামনে কি কাজ, তা আপনারা সবাই জানেন না। একটি উইল আজ পড়বার কথা, তারই জন্যে আপনাদের আজ কষ্ট দিয়ে আনা।"

অমর নিজের যেখানে যত আত্মীয় আছে, সকলের নাম তাড়াতাড়ি মনে করিয়া গেল। কেহ তাহাদের ভিতর ধনী নয়, ক্যানাডায় বা অষ্ট্রেলিয়ার কেহ যায় নাই, বালো কেহ নিরুদ্দেশ হইয়াও যায় নাই। উইলে তাহাকে মনে করিয়া আধ কাণাকড়িও দিয়া যাইবে, এমন কাহারও কথা, সে মনেই আনিতে পারিল না।

ডেস্ক হইতে বড় একটি শীলমোহর করা খাম বাহির করিয়া, সলিসিটার মহাশয় খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার পর উইল পড়া আরম্ভ হইয়া গেল।

উইলটি শ্রীমতী করুণাময়ী মিত্রের।

নামটা শুনিবামাত্র অমরের মাথাটা একবার বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। মুখটা একবার লাল হইয়া উঠিয়া, আবার পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ইচ্ছা করিতে লাগিল ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলায়, কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিল

না। সব বন্ধু ও আত্মীয়ের কথা সে ভাবিয়াছিল, কিন্তু করুণার কথা ভাবে নাই। করুণা তাহার বন্ধু নয়, আত্মীয়ও নয়, কিন্তু একদিন বন্ধু ও আত্মীয় হইতে অনেক বেশী ছিল। অমর অবশ্য তাহার সহিত বন্ধু বা আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে নাই। পৃথিবীতে এই একটি মানুষের সঙ্গে সে যথার্থ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার অন্য সব ব্যবহারের ত্রুটি এই এক অপরাধের পাশে অত্যন্তই ম্লান দেখায়। করুণাই কি শেষে পরলোক হইতে তাহার দুঃখ মোচন করিতে আসিল? পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

করুণাময়ী চিকিৎসক ছিলেন। বহুবর্ষব্যাপী ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ফলে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অবিবাহিতা, তাঁহার একেবারে নিকট আত্মীয়ও কেহ নাই। সমস্ত অর্থসম্পত্তির সুব্যবস্থার জন্য তিনি এই উইল করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার দুইখানি বাড়ী আছে, একটি তিনি স্থানীয় কোন বালিকা বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। অন্যটির ভাড়া হইতে পাঁচটি মেয়েকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি দেওয়া হইবে। মধুপুরে একটি বাড়ী ও জমি আছে, তাহা তিনি কয়েকজন ট্রাষ্টীর হাতে দিয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্র একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের জন্য। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহার নাম হইবে "নারীবন্ধু পুরস্কার", বাঙলা দেশে বৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি নারীদের কল্যাণার্থে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই যোগ্যতা বিচারের ভার রহিল একটি কমিটির উপর, খালি প্রথমবার এই পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরকুমার গাঙ্গুলীকে দেওয়া হইবে বলিয়া দাত্রী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অমর স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। নারীর বন্ধু সে? কোনো দিন ত অনাত্মীয়া কোনো নারীর জন্য কিছু সে করে নাই। আত্মীয়াদের প্রতিও যে সদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহা কোনো আত্মীয়াই স্বীকার করিবেন না। তবে এ ব্যবস্থা কেন? তাহার প্রতি দয়াবশতঃ? হাজার দুই টাকাও যে দরিদ্র অমরের পক্ষে একটা সম্পত্তির মত!

উইল এইখানে শেষ হইল বটে, কিন্তু সলিসিটার মহাশয় খামের ভিতর হইতে আর একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, "আপনাদের আর কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে বসে এই চিঠিখানা শুনে যেতে হবে, এই আমার ক্লায়েন্ট-এর ইচ্ছা ছিল।"

সকলে বসিয়াই রহিল। চিঠি পড়া আরম্ভ হইল। চিঠিখানা উকীল মহাশয়কেই লেখা। করুণাময়ী লিখিয়াছেন,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

পুরস্কার কেন এমন একজন অখ্যাতনামা ব্যক্তিকে দিয়া গেলাম, ইহা জানিবার কৌতূহল আপনাদের সকলের হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে পত্রখানি লেখা। আমার বয়স যখন মাত্র উনিশ কুড়ি বৎসর, তখন উক্ত অমরকুমারের সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে সবে ঢুকিয়াছি, তিনি বি-এ পড়িতেন। আমাদের পাশের বাড়ীতে বাস করিতেন বলিয়াই এ পরিচয় হয়। আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। আমি কায়স্থ-কন্যা হইলেও আমাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত হন, এবং বাগদত্তা স্বামীর সকল অধিকারই গ্রহণ করেন। আমার মাতার নিকট হইতে নানা অছিলায় বহুবার অর্থও গ্রহণ করেন। দুই তিন বৎসর এই ভাবে কাটার পর সহসা তিনি আমাদের পাশের বাড়ী হইতে কাহাকেও না জানাইয়া প্রস্থান করেন। অনেক অনুসন্ধানেও কিছুদিন তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। তাহার পর তাঁহার নিকট হইতে মা পত্র পান যে, তিনি নিজের গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আমাদের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য জোর করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং একটি বিশুদ্ধ হিন্দু ঘরের ব্রাহ্মণবালিকার সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

আমি যেমন পড়াশুনা করিতেছিলাম, তাহাই করিতে লাগিলাম এবং ভালভাবেই পাশ করিলাম। পুরুষ জাতির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ বিবাহ করি নাই। মা মারা যাইবার পর ভারতবর্ষের খ্যাত অখ্যাত, সুদূর প্রদেশেও কার্য্যে একাকী গিয়াছি, যেখানেই অর্থ পাইবার সম্ভাবনা থাকিত সেইখানেই গিয়াছি, বিপদের ভয়ে পিছাই নাই। এই সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ, ও মায়ের সব সম্পত্তি রাখিয়া গেলাম নারীর কল্যাণার্থে। "নারীবন্ধু পুরস্কার" প্রথমবার অমরকুমারকে দিয়া গেলাম এই জন্য যে, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাই আমাকে স্বাবলম্বনে প্রণোদিত করিয়াছিল। নতুবা ঐ অপরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া আমি গৃহবাসিনী জন্তুতেই পরিণত হইতাম। এই দিক্ দিয়া তিনি যথার্থ "নারীবন্ধু"।"

উকীল মহাশয় পাঠ শেষ করিলেন।

অমরের মাথাটা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আর কোন দিন যে সে মাথা তুলিতে পারিবে তাহা আর তাহার বোধ হইল না।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অভিনব ফনোগ্রাফ

অষ্ট্রিয়াতে নূতন ধরণের এক প্রকার ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে গোলাকার 'রেকর্ডের' পরিবর্ত্তে সরু 'ফিল্ম' বা ফিতা ব্যবহৃত হয়। সবাক চলচ্চিত্রের 'ফিল্মে' যেরূপে শব্দের ছবি তোলা হয়, ইহাতেও ঠিক সেই প্রকারে গান-বাজনার 'রেকর্ড' করা হয়।

গান গাহিলে বা কথা বলিলে বায়ুতরঙ্গ গ্রামোফোনের শব্দ-উৎপাদক যন্ত্রের পর্দ্দার (diaphragm) উপর পড়িয়া শব্দানুযায়ী তাহাকে কাঁপাইয়া তৎসংলগ্ন পিনের সাহায্যে দক্ষিণে বামে ঢেউ খেলানো অথবা গভীর অগভীর দাগ কাটা 'রেকর্ড' তৈয়ারী হয়। এক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই করা হয় না, এ স্থলে গানের শব্দকে প্রথমে তড়িৎ-শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করা হয় ; তৎপরে সেই তড়িৎ-

অভিনব গ্রামোফোন।
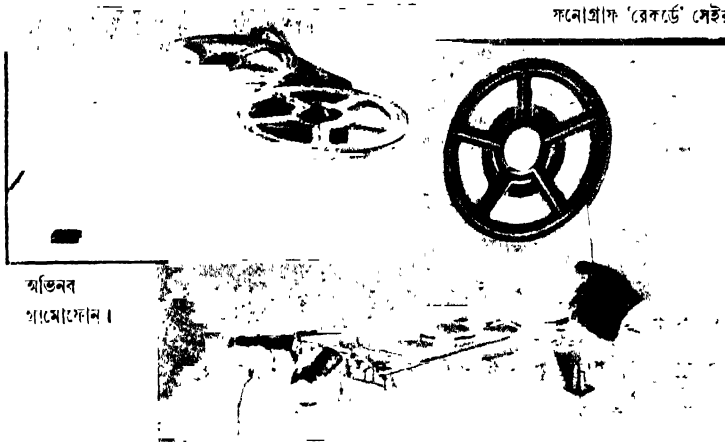
শক্তিকে পুনরায় আলোকে রূপান্তরিত করিয়া বিভিন্ন ঘনত্বে সাদা ও কালো রেখায় ফটোগ্রাফ তোলা হয়। গান-বাজনার দরুণ বায়ুকম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র বা 'মাইক্রোফোনের' অভ্যন্তরস্থ লৌহ পর্দ্দা সমান তালে কাঁপিতে থাকে। পর্দ্দার কম্পনে 'মাইক্রোফোনের' তারকুণ্ডলীতে শব্দানুযায়ী তড়িৎশক্তির উন্মেষ ঘটে। ওই তড়িৎপ্রবাহ তারের মধ্য দিয়া এমপ্লিফায়ার বা পরিবর্দ্ধক যন্ত্রে পৌঁছিয়া বহু সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত তড়িৎশক্তি ক্যামেরার মধ্যস্থিত এয়ো-লাইট (aeo-light) নামক বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত এক প্রকার বাতির মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবার সময় তাহার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। এক পাশের একটি লম্বা সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া ওই আলোক-রশ্মি 'ফিল্মের' উপর পড়িয়া আলোর তীব্রতার তারতম্যের অনুপাতে বিভিন্ন ঘনত্বের দাগ অঙ্কিত করে। ইহাই হইল sound track বা শব্দের ছবি।

একটি বাতিকে নির্দ্দিষ্ট ভোল্টের তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা অনবরত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়। ওই আলোক-রশ্মিকে 'লেন্সের' সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফিল্মের' সাদা কালো সূক্ষ্ম রেখাঙ্কিত অংশের ভিতর দিয়া 'ফটো-ইলেকট্রিক' সেলের উপর ফেলা হয়। বাতি হইতে 'ফিল্মের' বিভিন্ন গভীরতাবিশিষ্ট শব্দ রেখার ভিতর দিয়া আলো চলিয়া যাইবার সময় তাহার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুপাতে 'ফটো-টিউবের' মধ্যে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তড়িৎস্রোত 'এমপ্লিফায়ারে'র মধ্য দিয়া বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া 'লাউড-স্পীকারে'র তারকুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত হইবা মাত্রই লৌহপর্দ্দা (diaphragm) তড়িৎস্রোতের তারতম্যানুযায়ী কখনও জোরে কখনও বা আস্তে কাঁপিয়া গায়ক বা গায়িকার অবিকল কণ্ঠস্বর উৎপাদন করে।

সবাক চিত্রের 'ফিল্মে' যেমন এক লাইনে শব্দের ছবি তোলা হয়, এই ফনোগ্রাফ 'রেকর্ডে' সেইরূপ পাশাপাশি তিন লাইনে শব্দতরঙ্গের ছবি অঙ্কিত থাকে। ফনোগ্রাফের মধ্যেই এমন ভাবে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপিত আছে যে, এক লাইন শেষ হইবা মাত্রই তাহার সাহায্যে অন্য লাইন আপনা-আপনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া আসে। কাজেই এই ব্যবস্থায় ১০০০ ফুট 'ফিল্ম' প্রকৃত প্রস্তাবে ৩০০০ ফুট দীর্ঘ 'ফিল্মের' কাজ করে। একখানি 'নেগেটিভ ফিল্ম' হইতে ফটোগ্রাফীয় প্রণালীতে যত ইচ্ছা 'পজিটিভ' ফিল্ম তৈয়ারী হইতে পারে। গ্রামোফোন 'রেকর্ড' অপেক্ষা এই নূতন 'ফিল্ম' দামে সস্তা এবং শব্দোৎপাদক যন্ত্রের দামও সাধারণ গ্রামোফোন অপেক্ষা কম।

পাখীর মত ডানা কাঁপাইয়া উড়িতে সক্ষম অভিনব এরোপ্লেন

রেমাণ্ড নিম্‌ফুয়ার (Raymund Nimfuehr) নামে একজন অষ্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ভিয়েনাতে তাহার নিজের কারখানায় এক অদ্ভুত এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিতেছেন। সকল প্রকার এরোপ্লেনই যেমন 'প্রোপেলারে'র সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়, ইহাতে সেরূপ কোন 'প্রোপেলার' মোটেই থাকিবে না। ডানার নীচের দিকে ভিন্ন ভিন্ন সারে বায়ুপূর্ণ শত শত রবারের কুঠুরী থাকিবে। যন্ত্রসাহায্যে অতিরিক্ত চাপের বাতাস একের পর আর এক সারের কুঠুরীতে প্রবেশ করাইয়া ডানার নিম্ন ভাগে ক্রমাগত উঁচু-নীচু ঢেউ এর সৃষ্টি করাইবে। ইহার ফলে এরোপ্লেন পাখীর মত ডানা কাঁপাইয়া উপরে উঠিবে এবং সম্মুখের দিকেও অগ্রসর হইবে। আবিষ্কারক আশা করেন—ইহা যেমন ডানা নাড়িয়া উপরে উঠিতে পারিবে তেমনি আবার সোজাসুজি নীচেও নামিতে পারিবে।

পুলিসের অদ্ভুত পোষাক

চোর, ডাকাতের বন্দুকের গুলি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ওহিওর কলম্বাস পুলিসের জন্য মধ্যযুগের লৌহবর্ম্মের মত এক প্রকার অদ্ভুত পোষাক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির চোর, ডাকাতেরা অনেক সময় পুলিসকে গুলি করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। তিন ভাগে বিভক্ত কব্জাসংযুক্ত এই লৌহ-বর্ম্ম পরিধান করিলে বন্দুকের গুলিতে আহত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বাহিরের জিনিষ দেখিবার জন্য চোখের কাছে বন্দুকের গুলি-নিবারক এক প্রকার বিশেষ কাচের জানালা আছে। পোষাকের ডানদিকে হাতের কাছে ছিদ্র দিয়া গুলি চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

'প্রোপেলার'বিহীন এরোপ্লেন।

পুলিসের ব্যবহারের নিমিত্ত গুলি-প্রতিরোধক বর্ম্ম।

হেনরির ইলেকট্রিক মোটর

১৮৫১ খৃঃ অব্দে হেন্‌রি (Henry) সর্ব্বপ্রথম এক প্রকার ইলেকট্রিক মোটর নির্ম্মাণ করেন। এস্থলে অতি সহজ ভাবে হেনরির প্রণালীতে ইলেকট্রিক মোটর নির্ম্মাণ করিবার উপায় প্রদত্ত হইল। যে কোন বালক অতি সহজে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবে এবং বুদ্ধিকৌশলে কোন রকম আমোদজনক খেলনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবে। আজকাল লেকট্রিক 'টর্চ্চলাইট' প্রভৃতির জন্য খুব সস্তা দরে 'ব্যাটারী' বা "ড্রাই-ল" কিনিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে সাড়ে চার ভোল্ট বা রও কম ভোল্টের দুইটি মাত্র ব্যাটারীর প্রয়োজন। ইলেকট্রিক 'বেলের' ন্য সূতা জড়ানো বা এনামেল-করা এক প্রকার সরু তার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ১৮নং এর কতকটা লম্বা তার লইয়া, ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একটি লৌহ-শলাকার একদিকে চিত্রানুযায়ী প্রায় ৫০ পাক জড়াইয়া তারের দুই প্রান্ত ওই শলাকার বিপরীত দিকে আলগা ভাবে রাখিতে হইবে। লৌহ-শলাকার অপর দিকেও অনুরূপ ৫০ পাক তার জড়াইয়া তাহার দুই প্রান্ত বিপরীত দিকে লইয়া আসিতে হইবে। তার-জড়ানো শলাকাটির ঠিক মধ্য-স্থলে একটি ছিদ্র করিয়াই হউক বা অন্য কোন সুবিধাজনক উপায়েই হউক ঢেঁকিকলের মত আড়ভাবে একটি পিন বসাইয়া দিতে হইবে। একখানি কাঠের বোর্ডের উপর খাড়াভাবে আর একটি দণ্ড স্থাপিত করিয়া তাহার উপরের দিক একটু মোটা করিয়া চিরিয়া তাহার মধ্যে লৌহশলাকাটিকে
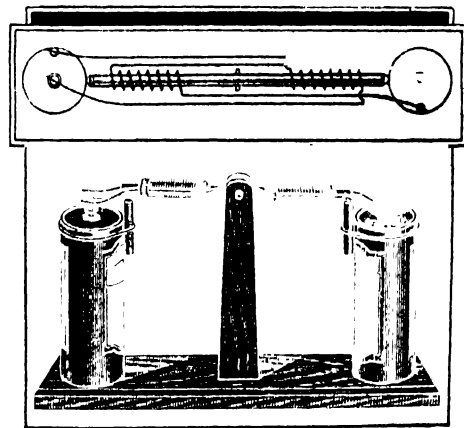
হেন্‌রির ইলেকট্রিক মোটরের নমুনা।

ঢেঁকিকলের মত আড়ভাবে স্থাপিত পিনের উপর বসাইয়া দিতে হইবে। এখন দুইটি ব্যাটারীর পাশেই এক একটি ছোট লৌহখণ্ড সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। লৌহশলাকাটির দুই প্রান্তের বরাবর ব্যাটারী দুইটি এমন

ভাবে বসাইতে হইবে যে, প্রত্যেক দিকের তারের দুইটি প্রান্ত নীচের দিকে নামিলেই যেন ব্যাটারীর দুইটি 'নেগেটিভ' ও 'পজিটিভ' 'পোল' বা তড়িৎ-প্রান্তের সঙ্গে লাগিয়া যায়। যেই মাত্র তারের প্রান্ত দুইটি ব্যাটারীর উভয়

অভিনব মাইক্রোস্কোপ।

প্রান্ত-সংলগ্ন হয় অমনই তারের মধ্য দিয়া তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইবা মাত্রই লৌহদণ্ডটি চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং বিপরীত দিকস্থ ব্যাটারীর গাত্রসংলগ্ন লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে। কাজেই ঢেঁকিকলের মত অপর প্রান্ত উপরে উঠিয়া পড়ে এবং এদিকের তারের প্রান্তদ্বয় ব্যাটারীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়। অপর প্রান্ত উঠিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং বিপরীত দিকস্থ ব্যাটারী হইতে তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া লৌহশলাকার বিপরীত দিকে চৌম্বক ধর্ম্ম উৎপন্ন করে। এই উপায়ে লৌহশলাকাটি কোন দিকেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, একবার এদিক একবার ওদিক উঠানামা করিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাটারী নিঃশেষ না হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনবরতই শলাকাটি এইভাবে কাজ করিয়া যাইতে থাকে।
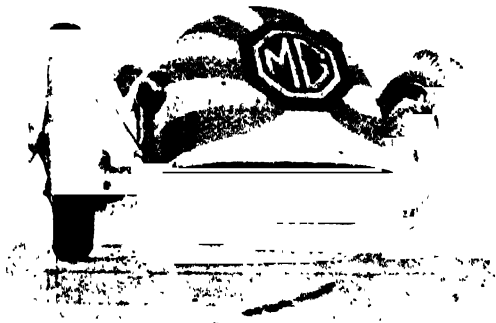
দ্রুতগামী ডিম্বাকৃতি মোটর।

নূতন ধরণের অনুবীক্ষণ যন্ত্র

সম্প্রতি নূতন ধরণের এক প্রকার 'মাইক্রোস্কোপ' বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এক চোখে দেখিবার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে 'আই-পিস্' বা নেত্র-কাচ যোগ করিবার জন্য একটিমাত্র নল থাকে। বিভিন্ন বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বার বার 'আই-পিস্' পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। এই নূতন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি চাক্‌তির উপর কাৎ-ভাবে চারিটি বিভিন্ন 'আই-পিস্' স্থাপিত আছে। প্রয়োজন মত পর্য্যবেক্ষক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়াই চাক্‌তি খানি ঘুরাইয়া যে কোন 'আই-পিস্' ব্যবহার করিতে পারে, নীচের দিকেও গোলাকার চাক্‌তির উপর চারিটি বিভিন্ন 'অব্‌জেক্‌টিভ্' স্থাপিত আছে। ছোট বড় বিভিন্ন পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বার বিভিন্ন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না।

দৌড়ের বাজী প্রতিযোগিতায় ডিম্বাকৃতি মোটরগাড়ী

মোটরদৌড়ের বাজীতে পৃথিবীর 'রেকর্ড' ভঙ্গ করিবার জন্য এক প্রকার অদ্ভুতাকৃতি মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ীটি সম্মুখে দুই চাকা ও পিছনে একটি চাকার উপর স্থাপিত। সাধারণ মোটর গাড়ীর মত ইহার
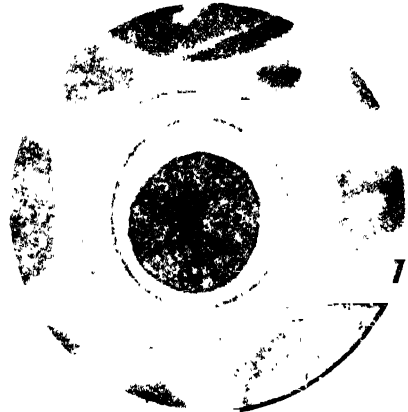
নিষিক্ত ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ 'ক্রোমোসোম'।

সম্মুখভাগ লম্বা নহে—সম্পূর্ণ ডিম্বাকৃতি। এরোপ্লেনের ধরণে নির্ম্মিত সম্মুখভাগ ডিম্বাকৃতি হওয়ার ফলে ইহা অনায়াসে বাতাস কাটিয়া চলে। ইঞ্জিনের আয়তন বা শক্তি বৃদ্ধি না করিয়াও এই অদ্ভুত গাড়ী একই শক্তি বিশিষ্ট সাধারণ গাড়ী অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। ক্যাপ্টেন জর্জ্জ ইষ্টন ইংলণ্ডে এই গাড়ী চালাইয়া ইহার দ্রুত গতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তড়িৎপ্রবাহসাহায্যে স্ত্রী বা পুং শিশুর জন্মনিয়ন্ত্রণের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

রুশিয়ার বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ প্রোঃ নিকোলাস্ কোলজফ্ (Prof. Nicholas R. Koltzoff) বহুবিধ গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে তাঁহার বিজ্ঞানাগারে বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছামত মনুষ্যেতর প্রাণীর স্ত্রী-শিশু বা পুংশিশু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অন্যান্য পরীক্ষাগারেও খরগোসের উপর কোলজফ্ প্রদর্শিত পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন

করিয়া খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। শতকরা নব্বইটি খরগোসই পরীক্ষকের অভিপ্রায়ানুযায়ী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রোঃ কোলজফের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার সর্ব্বত্রই একটা উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছে। রুশিয়ার গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্ম সমূহে তাঁহার এই অদ্ভুত আবিক্রিয়া বিস্তৃত ভাবে পরীক্ষিত হইতেছে। যদি এই পরীক্ষা মেষ, ছাগল, গরু, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতির উপর কার্য্যকরী হয় তবে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত ইহাদের স্ত্রী বা পুরুষ সন্তান উৎপাদন করাইয়া মানুষের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথেচ্ছ সংগ্রহ করিতে পারিবে, প্রকৃতির খামখেয়ালীতে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যথেচ্ছাচার চলিবে না।

জীবতত্ত্ব-বিদ্যায় ইহা একটা পরিচিত ঘটনা যে, পুরুষের বীর্য্যকোষ ও স্ত্রীর ডিম্বকোষের মধ্যে একপ্রকার আনুবীক্ষণিক সূত্রবৎ

পার্শ্বের চিত্রে বীর্য্য নিষেক ক্রিয়ার পর ডিম্বের আভ্যন্তরিক ক্রমিক পরিণতি: প্রথম শুক্রকীট প্রবেশ হইতে ক্রমশঃ 'ক্রোমোসোম' পৃথক হইতে হইতে শেষে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নের চিত্রে U-টিউবে বীর্য্য-কোষ তড়িৎ প্রবাহ প্রয়োগে পৃথক করিয়া খরগোসের উপর পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পদার্থ আছে—এগুলিকে 'ক্রোমোসোম্' (chromosome) বলা হয়। বীর্য্যকোষ ও ডিম্বকোষের কেন্দ্রীয় পদার্থ (nucleus) এই 'ক্রোমোসোম্' লইয়াই গঠিত, ইহাদের দ্বারাই পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানুষের স্ত্রী-ডিম্বকোষ এত ক্ষুদ্র যে ৫০,০০০টি একত্র করিলেও একখানি ক্ষুদ্র ডাকটিকেটের মত স্থান পূর্ণ হইবে না। পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে—এই স্ত্রী-ডিম্ব-কোষে ২৪টি করিয়া ক্রোমোসোম" থাকে। পুরুষের বীর্য্য-কোষ ডিম্ব-কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের মধ্যেও ২৪টি কিংবা ২৩টি ক্রোমোসোম থাকে।

যাবতীয় প্রাণীদেহই কতগুলি বিশেষ বিশেষ কোষের সমবায়ে গঠিত। বিশেষ পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই কোষসমূহ তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অর্থাৎ কোন কোন কোষ ধনতড়িৎপ্রবাহ এবং কোন কোন কোষ ঋণতড়িৎপ্রবাহের সংস্পর্শে সাড়া দেয়। যেমন হাঙ্গরের রক্ত-কণিকা ব্যাটারীর ঋণতড়িৎপ্রান্তের দিকে আকর্ষিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য প্রাণীর রক্ত-কণিকা ধনতড়িৎপ্রান্তের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাণীদেহের রক্তকণিকা যদি বিভিন্ন তড়িৎপ্রান্তের দিকে আকর্ষিত হইতে পারে তবে যে সব শুক্রকীট স্ত্রীডিম্ব নিষেক করিয়া স্ত্রী পুরুষ সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে - তাহাও বিভিন্ন তড়িৎপ্রান্তে আকর্ষিত হইবে না কেন? ইহাই প্রোঃ কোলজফের যৌন পার্থক্য নির্দ্ধারণের পরীক্ষার মূল ভিত্তি। এক বছরেরও কিছু পূর্ব্ব হইতে তিনি এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, দুই প্রকারের বিভিন্ন বীর্য্যকোষ আছে। এক প্রকার বীর্য্যকোষের দ্বারা স্ত্রী এবং আর এক প্রকার বীর্য্য-কোষের দ্বারা পুরুষ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব একজাতীয় বীর্য্যকোষ ধনতড়িৎপ্রান্ত দ্বারা এবং আর এক জাতীয় বীর্য্যকোষ ঋণতড়িৎপ্রান্তের দ্বারা আকর্ষিত হইতে পারে। তিনি তাঁহার অনুমানের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কাচের নলকে ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকাইয়া লইলেন। এই নলের নীচের দিকে বাঁকা অংশের ঠিক মধ্যস্থলে এমন ভাবে একটি "ভাল্‌ভ" বা দরজার ব্যবস্থা করিলেন যে, একদিকের তরল পদার্থ অন্যদিকে যাইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামত সেই চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। শুক্রকীট অনেকক্ষণ সজীব থাকিতে পারে এরূপ খানিকটা তরল পদার্থের মধ্যে খরগোসের শুক্রকীট মিশ্রিত করিয়া এই নলে ঢালিয়া

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রয়োগে বৃক্ষদেহের বৃদ্ধি। [৪৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দেওয়া হয় এবং ব্যাটারীর দুই প্রান্ত হইতে দুইটি তার লইয়া নলের দুই বাহুর মধ্য দিয়া খানিকক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চালাইবার পর দেখা যায়—নলের মধ্যস্থিত

বর্ণশূন্য পরিষ্কার পদার্থ আস্তে আস্তে নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। লাখে লাখে অদৃশ্য শুক্রকীট বেঙাচির মত লেজ সঞ্চালনে পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া

টেলিফোন বিজ্ঞাপনের বিরাট মূর্ত্তি। [৪৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উপরের দিকে ছুটিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহাতেই তরল পদার্থের নড়াচড়া পরিলক্ষিত হয়, আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, সেই তরল পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপেক্ষা করিয়া বাঁকা নলের দুই দিকে উর্দ্ধ মুখে উঠিতে থাকে। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে নলের নীচের অংশ সম্পূর্ণরূপে খালি হইয়া যায় এবং তরল পদার্থ যেন যাদুপ্রভাবে উপরের দিকে ঝুলিতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি মধ্যস্থলের 'ভাল্‌ভ' বন্ধ করিয়া দেন, যেন দুই দিকের তরল পদার্থ পুনরায়

টায়ার-পাম্প। [৪৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

একত্রিত না হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহও বন্ধ করেন। তড়িৎপ্রবাহ বাঁকা নলের দুই বাহুর মধ্যে স্ত্রী ও পুং সন্তানোৎপাদক বীর্য্য-কোষকে পৃথক করিয়া দিয়াছে—ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু পৃথকীকৃত পদার্থকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন—দুই পদার্থই এক—বাঙিচর মত। কোন তফাৎই বোঝা যায় না। তিনি অতঃপর দুইটি স্ত্রী-খরগোসে কৃত্রিম উপায়ে এই পৃথকীকৃত বীর্য্য নিষেক করিয়া খুব সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৬ সপ্তাহ পরে খরগোস শাবক প্রসব করিল। যেটিকে ধনতড়িৎবাহী নল হইতে বীর্য্য নিষেক করা হইয়াছিল সেইটির ছয়টি স্ত্রী শাবক জন্মিয়াছিল। ঋণতড়িৎবাহী নল হইতে যেটিকে বীর্য্য নিষেক করা হইয়াছিল সেটি ৫টি শাবক প্রসব করে। ইহার একটি বাদে বাকীগুলি সমস্তই পুরুষ। আরএকটি খরগোসকে দুইটি নলের মিশ্রিত পদার্থের দ্বারা নিষিক্ত করা হইয়াছিল, ইহার চারিটি শাবক জন্মে—দুইটি স্ত্রী এবং দুইটি পুরুষ। কাজেই তিনি স্থির করিলেন—পুং সন্তানোৎপাদনকারী বীর্য্যকোষ ধনতড়িৎপ্রান্তে এবং স্ত্রী সন্তানোৎপাদনকারী বীর্য্য কোষ ঋণতড়িৎ প্রান্তে আকৃষ্ট হয়।

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রোঃ কোলজফ অন্য এক পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে বহুসংখ্যক খরগোস লইয়া পরীক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি নিজে খরগোস হইতে বীর্য্যকোষ সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পৃথক করিয়া তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেন। কোন্‌টিতে কোন্ বীর্য্যকোষ দিতেন তাহা পরীক্ষকদিগকে বলা হইত না। খরগোসগুলিকে দুই ভাগ করিয়া দুই রকম বীর্য্য নিষেক করা হইল। এই পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল। প্রশ্ন উঠিল, সময়ে সময়ে দুই একটি ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দেখা যায় কেন? অনুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় এই প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি শুক্রকীটকে লেজ মোচড়ানো অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য কীটগুলির মত সমান ভাবে চলিতে না পারিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালিত হইবার সময় পরস্পরের অসম্ভব রকমের ঠেলাঠেলিতে কোন রকমে জড়াইয়া গিয়া অন্যান্যের সঙ্গে বিপরীত প্রান্তে উপনীত হইয়া থাকে। ইহার ফলেই সময়ে সময়ে বিপরীত ফল পাওয়া যায়।

গরু, ঘোড়া প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীর উপরও এই পরীক্ষার সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ফার্মের ২০০০,০০০ এর বেশী জন্তুর উপর কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছানুরূপ সন্তান প্রজনন-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া শতকরা ৯০টিরও বেশী ক্ষেত্রে সুফল লাভ হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, স্তন্যপায়ীদের মত পুং বীর্য্যকোষের দ্বারা পাখীদের সন্তানের যৌন পার্থক্য নিরূপিত হয় না। ডিম্ব-কোষের সাহায্যে পক্ষী-শাবকের যৌন পার্থক্য নিরূপিত হইয়া থাকে। মস্কো পরীক্ষাগারে পক্ষী-শাবকের যৌন পার্থক্য সংঘটনের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য পরীক্ষা চলিতেছে।

প্রোঃ কোলজফ ১৮৭২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জার্ম্মেনী, ফ্রান্স এবং ইটালীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন। ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি মস্কোর পরীক্ষামূলক জীবতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন। প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার সহকারী ডাঃ জামকফ (Dr. A.A. Zamkoff) এক-যোগে আসন্নপ্রসবা নারীদেহনিঃসৃত রস হইতে gravidan নামে এক প্রকার জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জিনিষের schizophrenia নামক

এক প্রকার মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং অন্যান্য রোগ নিরাময়ের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। পুনর্যৌবন সংঘটনেও ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে।
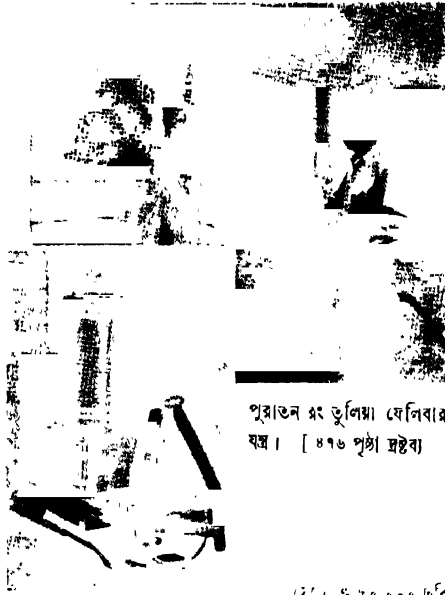
পুরাতন গৃহ তুলিয়া ফেলিবার যন্ত্র। [৪৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আমেরিকান এবং জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরা ইহার পরীক্ষামূলক ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। এই আবিষ্কার উপলক্ষ্য করিয়া রুশিয়াতে Uro-therapyর এক বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। রেশম-সূত্রের স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ওই পোকার ডিম্বের স্বতঃনিষেক ক্রিয়ায় আইওডিন ব্যবহার তিনিই প্রচলন করেন। এই আবিষ্ক্রিয়ায় রেশমসূত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইউরোপের খ্যাতনামা জীবতত্ত্ববিদ্‌গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছেন। এতকাল অপরিজ্ঞাত যৌন পার্থক্য নির্দ্ধারণের এই তাড়িতিক পরীক্ষায় তিনি সকলের কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির সহায়ক রেডিও তরঙ্গ

হলবার্গ (J. H Hallberg) নামে নিউইয়র্কের একজন তড়িৎ-বিজ্ঞান গবেষক তাঁহার গবেষণাগারে বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির উপর তড়িৎ-তরঙ্গের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এক জাতীয় গাছের দুইটি কন্দ একই সময়ে বিভিন্ন পাত্রে রোপণ করিয়া তাহার একটিতে বিশেষভাবে নির্ম্মিত প্রেরকযন্ত্র হইতে উচ্চ কম্পন-সংখ্যা-বিশিষ্ট তড়িৎ-তরঙ্গ প্রয়োগ করিয়া এবং অপরটিকে সাধারণ ভাবে বাড়িতে দিয়া তিনি অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছেন। যে গাছটিতে তড়িৎ-তরঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা যখন ১৯ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে তখন অপর গাছটি মাত্র চার ইঞ্চি গজাইয়াছে।

টেলিফোন বিজ্ঞাপনের বিরাট মূর্ত্তি

বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে আরও বেশী লোক টেলিফোন ব্যবহার করে সেইজন্য মেক্সিকোর এক টেলিফোন কোম্পানী এক বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাজপথের মধ্যে স্থাপন করিয়াছে। মূর্ত্তিটি রাস্তার এপারে-ওপারে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার হাতে একটি বিরাট টেলিফোন রহিয়াছে। ইহার মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে রেডিও-সংগ্রাহক যন্ত্র স্থাপিত আছে; তাহা হইতে গান বাজনা শুনিয়া রাস্তার লোক আরও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অভিনব টায়ার পাম্প

চলিতে চলিতে মোটরের চাকায় ছিদ্র হইয়া গেলে অনেক সময়েই বিষম অসুবিধায় পড়িতে হয়, অনেক সময়ই গাড়ী ঠেলিয়া মেরামত করিবার স্থানে লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক প্রকার 'পাম্প' উদ্ভাবিত হইয়াছে। ছিদ্রযুক্ত চাকার দণ্ডের সঙ্গে সহজেই এই পাম্প জুড়িয়া দেওয়া যায়। চাকা ঘুরিতে থাকিলেই 'পাম্প' চলিতে

[illegible] ৭০,০০০ ছবি তুলিতে সক্ষম ক্যামেরার বিভিন্ন অংশের ছবি। মধ্য-স্থলে জলের ফোঁটা পড়িবার সময়ে বিভিন্ন অবস্থার ছবি নীচে বামপাশে ৮ খানি লেন্সের অবস্থান দেখান হইয়াছে। মধ্যস্থলে ইলেক্‌ট্রিক ফিউজ পুড়িবার ছবি। দক্ষিণ পার্শ্বে শাটার-এর ছবি। [৪৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

থাকে এবং পাম্পের সঙ্গে চাকার 'ভালভ্‌' টিউব যোগ করিয়া দিলেই বাতাস প্রবেশ করিয়া টায়ারকে প্রয়োজনানুরূপ ফুলাইয়া রাখে, মেরামতী কারখানা যতদূরেই অবস্থিত হউক না কেন—সহজভাবে গাড়ী চালাইয়া সেখানে পৌছিতে কোনই অসুবিধা হয় না। এই পাম্প এমনভাবে নির্ম্মিত যে, অল্পপরিসর

অদ্ভুত সামুদ্রিক জন্তু। [৪৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্থানের মধ্যে বাতাসের কুঠরী, ভাল্‌ভ্‌, চাকা ও পিষ্টন রড্‌' স্থাপিত হইয়াছে।

পুরাতন রং তুলিয়া ফেলিবার যন্ত্র

ঘর, দরজা, আসবাব পত্র বা গাড়ী প্রভৃতি নূতন করিয়া রং করিতে হইলে প্রথমে পুরাতন রং তুলিয়া ফেলিতে হয়। পুরাতন রং পরিষ্কারভাবে না তুলিয়া ফেলিলে নূতন রং ভাল হয় না। কিন্তু এই সব জিনিষের পুরাতন রং তুলিয়া ফেলাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ একটু একটু করিয়া আঁচড়াইয়া তুলিতে হয়— তাহাতে ভালরূপে পরিষ্কার হয় না বলিয়া ভালরূপে ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। পুরাতন রং তুলিয়া ফেলিবার জন্য সম্প্রতি একপ্রকার নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'বয়লারের' মত একটি পাত্রে রাসায়ণিক পদার্থ মিশ্রিত জল রাখিয়া তাহাতে উত্তাপ দেওয়া হয়। বাষ্প প্রস্তুত হইলে পাত্রসংলগ্ন নলের সাহায্যে রং উঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে নলের মুখ কিছু দূরে ধরিয়া রাখিলেই বাষ্প জোরে ছুটিয়া সেই রংএর উপর লাগিলেই বাষ্পের গরমে ও রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে নরম হইয়া পরিষ্কার রূপে উঠিয়া যায়। সাধারণ জ্বালানী তেলের সাহায্যে আগুন জ্বালাইয়া বাষ্প তৈয়ারী হয় এবং একটি ¼ অশ্বশক্তির ছোট ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জল ক্রমাগত বয়লারের মধ্যে পাম্প করিয়া দেওয়া হয়, ওই মোটরের সাহায্যেই একটি পাখা ঘুরাইয়া আগুনের তেজ বৃদ্ধি করা হয়। ঘর দরজা বীজাণুশূন্য করিতেও এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে।
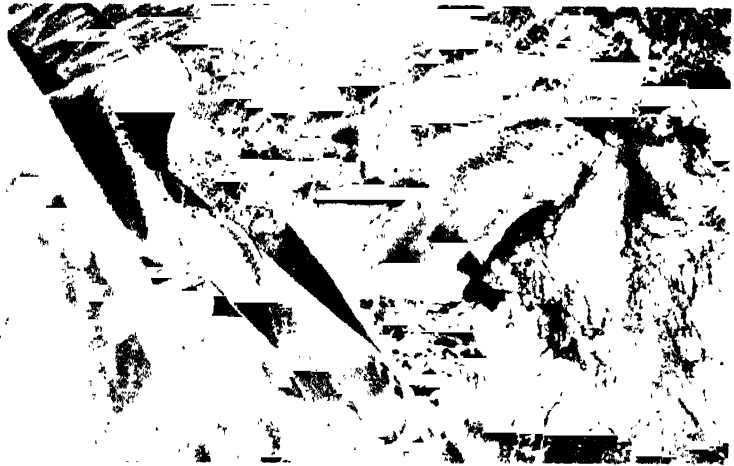
এক সেকেণ্ডে ৮০,০০০ ছবি তুলিতে সক্ষম অভিনব ক্যামেরা

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধার জন্য জার্ম্মেনীতে অতিমাত্রায় শক্তিশালী একপ্রকার ক্যামেরা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্যামেরার সাহায্যে এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ৮০,০০০ ছবি তোলা যাইতে পারে। একটা জলের গামলার মধ্যে কিছু উপর হইতে এক ফোঁটা জল ফেলিবার সময় এই ক্যামেরার সাহায্যে তাহার বিভিন্ন অবস্থার ছবি তোলা অতি সাধারণ ব্যাপার, এমন কি বৈদ্যুতিক তারের 'ফিউজ' পুড়িয়া যাইবার সময় যে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লাগে—তাহার মধ্যেই এই ক্যামেরার সাহায্যে অনায়াসে তাহার বিভিন্ন অবস্থার ছবি তোলা যাইতে পারে। উচ্চ গতিশক্তিবিশিষ্ট যন্ত্রাদি অথবা তাহাদের 'ভাল্‌ভ', স্প্রিং প্রভৃতির কোথায় কি ত্রুটি হইতেছে চলিবার সময় তাহা চোখেতে ধরা পড়ে না। এই ক্যামেরার সাহায্যে চলতি অবস্থায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি দোষত্রুটি পরিষ্কার ভাবে ফটোগ্রাফ করা যাইবে। সাধারণ চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় যেমন একখানি মাত্র 'লেন্স' থাকে, এই ক্যামেরার নির্ম্মাণকৌশল সেরূপ নহে। ইহাতে আটখানি পৃথক পৃথক 'লেন্স' আছে। এই আটখানি 'লেন্স' একখানি গোলাকার চাক্‌তির উপর স্থাপিত। ছবি তুলিবার সময় 'লেন্স' সহ এই চাক্‌তিখানি ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে দ্রুত বেগে ঘুরিতে থাকে। ঘূর্ণায়মান 'লেন্সে'র চাক্‌তিখানির সম্মুখে আর একখানি চাক্‌তি আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে কতকটা হেলানভাবে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রের সার আছে।

জাহাজের সহিত তিমি মাছের সংঘর্ষ। [৪৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

প্রত্যেক সারে ৮টি করিয়া ছিদ্র থাকে। ছবি তুলিবার সময় এই চাক্তিখানাও ঘুরিতে থাকে। প্রত্যেকটি ছিদ্রই সেকেণ্ডের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে পর পর অতি দ্রুত গতিতে ওই ৮ খানা 'লেন্সের' বরাবর উপস্থিত হয় এবং তন্মুহূর্ত্তেই আবার সরিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যেই ছবি 'লেন্সের' মধ্য দিয়া চলন্ত 'ফিল্মের' উপর পড়ে এবং ছাপ রাখিয়া দেয়। এই ছিদ্রযুক্ত চাক্তিখানাই 'শাটারের' (shutter) কাজ করে, সাধারণ ভাবে একখানা ছবি তুলিবার সময় 'শাটার্' 'লেন্স,' একযোগে ঘুরাইলেই প্রায় একই সময়ে ফিল্মের বিভিন্ন অংশে ৮ খানা ছবি উঠিবে, একসঙ্গে অনেক ছবি তুলিবার সুবিধা থাকায় এই ক্যামেরার সাহায্যে চলচ্চিত্রের ছবি তুলিবার পক্ষেও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে।

অদ্ভুত সামুদ্রিক জন্তু

কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রান্সে শেরবুর্গের (Cherbourg) উপকূলে একটা মৃত অতিকায় সামুদ্রিক জন্তু পাওয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত জন্তুটার মাথা এবং গলা উটের মত। ঘাড়ের কাছে দুইদিকে দুইটি বিরাট পাখনা আছে এবং লেজের দিক দুইভাগে বিভক্ত। জন্তুটা দৈর্ঘ্যে ২৫ ফুট। এই জন্তুটি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা যে কোন্ জাতীয় জানোয়ার তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সামুদ্রিক জানোয়ারের বিষয় জানা গিয়াছে, এই অদ্ভুত জন্তুটি তাহাদের কোন শ্রেণীতেই পড়ে না। মৃত দেহটা পাড়ে ভাসিয়া আসিবার পর ঢেউএর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং সামুদ্রিক পাখীরাও কতকাংশ উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই ইহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ অস্ত্রোপচার করিয়া ইহার বিভিন্ন দেহাংশের পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছেন।

জাহাজের সঙ্গে তিমি মাছের সংঘর্ষ

জাহাজের সঙ্গে তিমি মাছের খুব কদাচিৎ ধাক্কা লাগিয়া থাকে। যদিও বা কোন সময়ে সংঘর্ষ হয় তথাপি সেই অবস্থার কোন ফটোগ্রাফ এপর্য্যন্ত কেহ তুলিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। এস্থলে এরূপ একটি ঘটনার ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। 'প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌ট' নামক একখানি জাহাজ যাত্রী লইয়া নিউইয়র্ক যাইবার পথে বাল্‌বোয়া নামক স্থান হইতে ১০০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে কোন কিছুর সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগে। প্রথমে মনে হইয়াছিল কোন ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছে, কিন্তু পরে দেখা গেল একটা বিরাট তিমির সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়াছে। তিমিটা তখন ভাসিয়া ছিল। ঠিক সংঘর্ষের মুখেই ফটো লওয়া হইয়াছে।

যন্ত্রচালিত নকল মানুষ

ফিলেডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটের সম্মুখে সম্প্রতি এক যন্ত্র মনুষ্য স্থাপিত হইয়াছে। এই নকল মানুষটির নাম রাখা হইয়াছে—এগবার্ট। যখনই কোন লোক ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ করিবার জন্য দরজার কাছে এই নকল মানুষটির নিকটে উপস্থিত হয়, অমনই সে হাত তুলিয়া অভিবাদন করে এবং ঠিক মানুষের মত স্বরেই সাদর-সম্ভাষণে ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করে। কেহ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার ছায়া ওই নকল মানুষের ভিতরে স্থাপিত—আলোকপাতে উত্তেজক পদার্থনির্ম্মিত চক্ষুর উপর পড়ে, এবং তাহার ফলে একটি বৈদ্যুতিক 'রিলের' (relay) সাহায্যে নকল মানুষের হাতখানি উপরে উঠিয়া অভিবাদন করে। কৌশলে স্থাপিত গ্রামোফোন 'রেকর্ড' সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া শব্দ উৎপন্ন করে।

অভিবাদনকারী কৃত্রিম মনুষ্য।

'এলিমেণ্ট' ৯৩

গত সংখ্যার 'বিজ্ঞান-জগতে' জেকিমস্‌ভ-পিচ্‌-ব্লেণ্ড হইতে ডাঃ কোব্লিক আবিষ্কৃত নূতন 'এলিমেণ্ট' বা মৌলিক পদার্থের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি ডাঃ কোবলিক এই নূতন 'এলিমেণ্ট' আবিষ্কারের দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন। ('নেচার'—২৫-৮-৩৪)। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন পদার্থ কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের নিকট এক্স-রে বর্ণচ্ছত্রের পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে নূতন পদার্থের আণবিক সংখ্যানুযায়ী কোন রেখা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহারা এই পদার্থের মধ্যে Tungsten-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ডাঃ কোবলিকও তাঁহার বিবৃতি প্রচারের পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় Tungsten এর অস্তিত্ব টের পাইয়াছেন। আণবিক সংখ্যা নির্দ্ধারণে ভুলের কারণ এই যে, ডাঃ কোবলিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত Silver Saltকে ধরিয়া লইয়াছিলেন—Ag (93) O₄. অর্থাৎ Ag—

রৌপ্য এক পরমাণু, O_3=বোহেমিয়াম এক পরমাণু এবং O_4=অক্সিজেন ৪ পরমাণু—মিলিয়া 'সিলভার-বোহেমিয়েট' জাতীয় পদার্থের এক একটি অণু গঠিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জিনিষটি ছিল—Silver Tungstate বলা বাহুল্য—ডাঃ কোব্লিকের আবিষ্কারের সহিতডাঃ ফার্মির আবিষ্কৃত 'এলিমেণ্ট' ৯৩র কোনসম্বন্ধ নাই।

আইওডিন, গন্ধক প্রভৃতি সাধারণ পদার্থকে কঠিন এবং দর্পণের মত উজ্জ্বল এক প্রকার ধাতুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। সীসা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে স্পঞ্জের মত এমন এক প্রকার পদার্থে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে আর ধাতব পদার্থ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। এমন কি সাধারণ অবস্থায় এ সকল ধাতুর যে তড়িৎ পরিচালন শক্তি থাকে তাহাও লোপ পাইয়া গিয়াছে।

তরল অথবা বায়বীয় পদার্থকে বিপুল চাপে কঠিন ধাতব পদার্থে পরিণত করা হয়। পদার্থের পরমাণুগুলি বিপুল চাপে খুব কাছাকাছি আসিয়া কঠিন পদার্থ সৃষ্টি করে। আবার ইহার বিপরীত প্রক্রিয়ায় চাপ কমাইতে কমাইতে কঠিন ধাতব পদার্থকে দুধের ফেনার মত হাল্কা করিয়া ফেলা যায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ব্রিজম্যান (Dr. P. W Bridgman) একটা বিরাট গাঁতি-কলের সাহায্যে কাচের মত স্বচ্ছ এবং তড়িৎ অপরিচালক খানিকটা সাদা ফস্ফরাসের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২২৫০ মণ চাপ দিয়া তাহাকে এক প্রকার উজ্জ্বল কালো রংএর ধাতব পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাহার তড়িৎ পরিচালন শক্তি লক্ষ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন ডাঃ গোয়েজের সহকর্ম্মীরা এই সমস্ত পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন ডাঃ এণ্ডারসন অভিনব উপায়ে এক প্রকার ধাতব-পাত নির্ম্মাণ করেন। গলিত রৌপ্য হইতে অতিরিক্ত উত্তাপে বাষ্প উদ্গত হইবার সময় তরল বায়ুর সাহায্যে একখানি সমতল প্লেটকে অতিমাত্রায় শীতল করিয়া তাহার উপর ধরা হয়। উত্তপ্ত রৌপ্য বাষ্প-কণিকা প্লেটের উপর পড়িবামাত্রই অতিরিক্ত শৈত্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়া ক্রমশঃ একটা পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। আস্তরণ এত পাতলা যে, ইহার ২০০০ খানা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া রাখিলেও একখানা সাধারণ পাতলা কাগজের মত পুরু হয় না। এই পাত রৌপ্য হইতে নির্ম্মিত হইলেও সেই বর্ণ বা ঔজ্জ্বল্য কিছুই থাকে না, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে আর ধাতব পদার্থ বলা চলে না। মোটের উপর ব্যাপার যাহা ঘটিতেছে তাহাতে যে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুকে চাপ দিয়া প্রয়োজনানুযায়ী আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া যে কোন পদার্থকে ধাতুতে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যন্ত্রের প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

বায়বীয় পদার্থকে কঠিন পদার্থে অথবা কঠিন পদার্থকে অভিনব অবস্থায় রূপান্তরিত করিবার জন্য তরল বাষ্প প্রয়োগের যন্ত্রাগার।

গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থকে কঠিন ধাতব পদার্থে রূপান্তরিত করিবার অভিনব প্রক্রিয়া

ক্যালিফোর্নিয়ার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডাঃ গোয়েজ (Dr. Alexander Goetz) তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহায়তায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে ধাতব পদার্থে রূপান্তরিত করিবার জন্য একপ্রকার অভিনব পরীক্ষা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস হইতে জল অপেক্ষা ২০ গুণ হাল্কা অথচ ইস্পাত অপেক্ষা বহুগুণ শক্ত এক প্রকার ধাতব পদার্থ তৈয়ারী হইবে।

প্রলুব্ধ বিধাতা

—আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন

তোমাদের প্রায়ই বলতে শুনি, দৈবদুর্ঘটনা, দৈবাৎ······ ঐখানেই আমার আপত্তি। আমার কথা এই যে, যেটাকে বাইরে থেকে আকস্মিক মনে হচ্ছে, সম্ভবতঃ তার পিছনে বিধি একটা আছে। একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

আমার বয়স ষাট বছর পার হয়ে গেল। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা কাটিয়ে উঠে ঠিক এই বয়সেই মানুষ জীবনের তিন রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা বেছে নেয়; হয় অর্থলিপ্সা, না হয় যশোলিপ্সা, না হয় তত্ত্বলিপ্সা। আমার মতে এর মধ্যে সত্যকার দুটি মাত্র পথ আছে। যশ খুঁজতে গেলেই এসে পড়ে অর্থের পিপাসা, না হয় ক্ষমতার পিপাসা, অতএব এই দুইয়ের একটিকে বেছে নিতে হবে, নয়তো আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মন দিতে হবে।

নিজেকে আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক বলবার সাহস আমার নেই, অত বড় আখ্যাটা আমাকে শোভা পায় না··· আমার চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না। যে কাজে পুণ্যসঞ্চয় হয় এমন কিছু করেছি তার প্রমাণ দেখানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু এটা বলতে পারি, জীবনে আমি অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি, সম্পদের আস্বাদ পেয়েছি, দারিদ্র্যেরও আস্বাদ পেয়েছি, দুঃখপীড়া পেয়েছি বিস্তর—প্রিয়-বিরহ, শোক, কারাবাস, লোকসান, প্রেম, নির্ভরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সমস্তই ভোগ করেছি। আর বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু আমি মানুষ দেখেছি। মনে করছ বুঝি আমি নিতান্ত বাজে বকছি? তা নয়। একজন মানুষের পক্ষে আর একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া বড় শক্ত; পরকে বুঝতে হলে আগে নিজেকে একেবারে ভুলে যেতে হবে,—আমায় দেখে লোকে কি ভাবছে, পাঁচজনের কাছে নিজেকে কি রকম দেখাচ্ছে,—এ সব কথা ভাবলে চলবে না। আমি ঠিক জানি, খুব কম লোকই অপরকে দেখতে পায়।

আমাকে তো দেখছ, পাপীলোক, শেষ বয়সে এসে মানুষের জীবনের কথা ভাবতে ভাল লাগছে। আমি বৃদ্ধ, পৃথিবীতে একা, রাত্রিকাল যে আমাদের পক্ষে কত দীর্ঘ তা তোমরা ভাবতেই পার না। আমার স্মৃতি-ভাণ্ডার নিজের বিষয়ে আর পরের বিষয়ে সহস্র ঘটনা মনের মধ্যে সঞ্চয় করে জীবন্ত করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু গোরু যেমন আলকুসীর লতা চিবিয়ে পরে জাবর কাটে, তেমন করে স্মৃতির জাবর কাটা এক কথা, আর জ্ঞান ও বিচারের সঙ্গে চিন্তা করা অন্য কথা। তাকেই বলি তত্ত্বচিন্তা।

আমাদের কথা হচ্ছিল দৈব-দুর্ঘটনার বিষয়ে। স্বীকার করি, আমাদের জীবনে যা ঘটে, সবই আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, অকারণ, অযৌক্তিক, অসঙ্গত। কিন্তু এই সবের উপর, অর্থাৎ পরস্পর-সম্পর্কিত লক্ষ লক্ষ ঘটনাবলীর উপর এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিরাজ করে, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। সব কিছু চলে যায়, আবার ফিরে ফিরে আসে, সামান্য জিনিষের ভিতর থেকে—একেবারে শূন্য থেকে, আবার তা জন্মলাভ করে, কষ্ট পায়, পুড়তে থাকে, আবার তার সবটুকু সময়মত স্ফূর্তি পায়, উচ্চে যতটা ওঠবার ওঠে, আবার পড়ে যায়, আবার ফিরে ফিরে আসে; যেন কালের চক্র-পথে বারবার আবর্তন করতে চায়। এই আবর্তন শেষ হয়ে গেলে অনেক বছর ধরে পুনর্ব্বার গ্রন্থি খুলতে থাকে, ফিরে নিজের স্থানে আসে, তারপর নূতন বৃত্ত রচনা করে, বৃত্তের পর বৃত্ত······তার আর শেষ নেই।

তোমরা বলবে, এমন কোন নিয়মই যদি থাকবে, তবে এখনো সেটা লোকের অজানা থাকত না, এতদিনে তা আবিষ্কৃত হয়ে যেত, এমন কি তার একটা মানচিত্র পর্য্যন্ত যথাযথ আঁকা হয়ে যেত। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমরা সকলে মিলে যে জালটা বুনছি, লম্বায় চওড়ায় সেটা সীমার মধ্যে নয়। খুব কাছে থেকে যতটুকু দেখা যায় কেবল ততটুকু দেখছি, সবটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সুমুখ দিয়ে সেটা পার হয়ে চলে যাচ্ছে, কতকগুলি রং পরে পরে আসছে যাচ্ছে, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সব সরে সরে যাচ্ছে···কিন্তু খুব কাছে আছি বলে সমস্ত ছকটা এক সঙ্গে ধরা পড়ছে না। কেবল যারা জীবনভূমির উপরে উঠে দাঁড়াতে পারে, আমাদের চেয়ে যারা উঁচুতে যেতে পারে,

জ্ঞানীরা, মহাপুরুষরা, অদৃষ্টদর্শীরা, সাধু মহাত্মারা, কবিরা, জীবনযাত্রার ধাঁধার মধ্যে থেকেও কচিৎ এর পূরা আভাস পেয়ে যান, দিব্যদৃষ্টিতে তাঁরা এই ডিজাইনের বা পরিকল্পনার মধ্যে সুসঙ্গতি দেখতে পান, গোড়াটা দেখে তাঁরা বলতে পারেন শেষটা কি হবে।

তোমরা মনে করছ আমার কথাগুলি নেহাৎ ধোঁয়া, না? আচ্ছা একটু সবুর কর; কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেশী কথা বলতে গেলে তোমাদেব আবার উৎপীড়ন করা হবে না তো?...কিন্তু বেলগাড়ীর যাত্রীদের কেবল কথা বলা ছাড়া আর কি করবার আছে?

প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট আইন আছে এবং সে আইনের পিছনে বুদ্ধি ও চাতুর্য্য আছে তা আমি স্বীকার করি, যে-নিয়মে গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ পথে চালিত হয়, সেই একই নিয়মে সামান্য মাছির পেটের ভিতরকার হজমের কাজটুকু পর্য্যন্ত চালিত হয়; এ নিয়মকে আমি বিশ্বাস করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরো একটা কিছু বা আরো একটা কেউ আছে যে এই নিয়মের চেয়েও বলবান, সমস্ত সৃষ্টির চেয়েও বড়। যদি কোন শূন্য 'বস্তু' হয়, আমি তাকে বলব যুক্তির খামখেয়াল, কিংবা খামখেয়ালী যুক্তির বিধান, যেটা তোমাদের খুসী... কথাটা ঠিক প্রকাশ করে বলতে পারছি না। আর যদি সেটা কোন 'ব্যক্তি' হয়, তবে সে এমন কেউ যার তুলনায় বাইবেলের ডেভিল আর কল্পনার সয়তান নিতান্ত নিরীহ নাবালক মাত্র।

মনে কর এই পৃথিবীর উপর তোমাকে ভগবানের সমান কর্ত্তৃত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; এদিকে ছেলেমানুষী খেলা করবার কৌতূহল তোমার অদম্য, ভাল-মন্দ জ্ঞান নেই, একেবারে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম, অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আবার ওদিকে সুবিচার করবারও অদ্ভুত এক রকমের নিজস্ব ধরণ আছে। বুঝতে পারলে না বোধ হয়? আচ্ছা উদাহরণ দিয়ে বলি।

ধর নেপোলিয়ান; মানব-জীবনে এক অদ্ভুত বিকাশ, কল্পনাতীত ব্যক্তিত্ব, অফুরন্ত অমানুষিক ক্ষমতা, তার শেষ পরিণতি কেমন দেখ,—ছোট একটি দ্বীপে, মূত্ররোগে ভুগে, ডাক্তারদের নামে অবহেলার নালিশ করে, সামান্য খাবার জিনিষ নিয়ে নানা রকম খুঁটিনাটি বায়নক্কা করে, বার্দ্ধক্যসুলভ অসন্তুষ্টিতে আপন মনে গুমরে পড়ে থাকা...নিশ্চয় এটা সেই কেউ-একজন ব্যক্তিটির একটা উপহাস মাত্র, তার রুদ্র মুখের একটা বিদ্রূপের হাসি। জ্ঞানী লোকের মতামতের কথা ছেড়ে দাও, কারণ তারা হয় তো এটাকে সোজা কার্য্য-কারণের যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝিয়ে দেবে, কিন্তু এই শোচনীয় জীবনটাকে একবার বেশ করে তলিয়ে দেখ; জানি না, তোমাদের ধারণায় কি মনে হবে, কিন্তু আমি তো এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যুক্তি আর খামখেয়াল পাশাপাশি মিশে আছে, তা ছাড়া এর আর কোন সদর্থ তো আমি খুঁজে পাই না।

তার পরই দেখ জেনারেল স্কোবেলেফ্। একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। অসমসাহসিক, নিজের জীবন যে নিরাপদ সে সম্বন্ধে অসম্ভব বিশ্বাস। মৃত্যুকে সর্ব্বদা উপহাস করত, আস্ফালন করে চলে যেত মারাত্মক শত্রুব্যূহের মধ্যে, জীবনকে অশেষ রকমে বিপন্ন করত, বিপদের তৃষ্ণা কিছুতেই যেন তার মিটত না। কিন্তু দেখ শেষে মরল কোথায়—ভাঙা একটা খাটে শুয়ে,—সামান্য ভাড়াটে ঘরে বারবণিতাদের সংসর্গে। আবার আমি বলি—খামখেয়ালী নিষ্ঠুরতা, কিন্তু এর তবু যেন কোথায় একটা যুক্তি আছে। এই দুই শোচনীয় মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, যেন এত বড় আরম্ভের অত ছোট পরিণতির দ্বারা একটা ওজনের সামঞ্জস্য করে নিলে, যেন বিপরীত দিক থেকে জীবন আর মৃত্যু এক সঙ্গে মিশে দুটি অপরূপ আত্মাকে সম্পূর্ণ করে ফলিয়ে তুললে।

প্রাচীন লোকেরা চিনেছিল সেই কেউ একজনকে, তাকে ভয় করতে, কেবল তার রুদ্র বিদ্রূপটাকে ভাগ্য মনে করে ভুল করত।

আমি নিশ্চিত করে তোমাদের বলছি—অর্থাৎ কিনা তোমাদের বলছি না, আমি নিজে নিজেই অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে অনুভব করছি যে, এককালে, হয়তো ত্রিশ হাজার বছর পরে ধরাতলবাসীর জীবন অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠবে, অসম্পূর্ণতা কিছুই থাকবে না। কেবল থাকবে অট্টালিকা আর ফুলের বাগান, আর ফোয়ারা...এখনকার মানুষের যা কিছু কষ্টের বোঝা,—দাসত্ব, প্রভুত্ববোধ, মিথ্যাবাদ, উৎপীড়ন—সমস্ত লোপ পাবে। অনিয়ম, ব্যাধি, পীড়া, মৃত্যু, এও কিছু থাকবে না; হিংসা থাকবে না, পাপ থাকবে না, আপন-পর থাকবে না, সকলেই সকলের ভাই হয়ে থাকবে। আর তখন সেই যে তিনি, তাঁকে মান্য করে তিনি বলাই ভাল—তিনি একদিন এখান দিয়ে যেতে যেতে এই সব একবার

নজর দিয়ে দেখবেন। একটু ক্রূর হাসি হাসবেন, তারপর এমন একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন যে, এতদিনের পুরানো এই পৃথিবী তাঁর এক ফুৎকারেই একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এমন সুন্দর গ্রহটির এ রকম শোচনীয় পরিণামের কথাটা খুব খারাপ শোনাচ্ছে, না? কিন্তু একবার ভেবে দেখ, পৃথিবী যদি একেবারে ভাল হওয়ার চরমে গিয়ে ওঠে, আর এই বৈচিত্র্যহীন ভাল দেখে দেখে যদি লোকের একঘেয়ে অতি-ভালতে অরুচি ধরে যায়, তখন কি রক্তারক্তি, কি মহাপ্রলয় উপস্থিত না হতে পারে!

যাক্ - এসব পৃথিবীর কথা, নেপোলিয়ানের কথা, প্রাচীন যুগের কথা—এত সব বড় বড় উদাহরণ দেবারই বা কি দরকার। আমি নিজেই কতবার কত সামান্য ঘটনার মধ্যে এই বিচিত্র নিয়মের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাই। যদি তোমরা শুনতে চাও, আমি এমন একটা তুচ্ছ ঘটনার কথা বলতে পারি যেখানে আমি নিজে ঐ বিদ্রূপের হাসি একেবারে চোখের উপর দেখেছি।

ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় উঠে তোমস্ক্ থেকে পিটার্সবার্গ যাচ্ছিলাম। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিল একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার, মোটাসোটা ভালমানুষের মত চেহারা; রুষীয়-সুলভ সরল গোলগাল মুখ, কটা কটা চোখের পাতা আর ভুরুর চুল, কেশবিরল মাথার চুল বুরুষ দিয়ে পিছন দিকে টেনে দেওয়া, তার ফাঁক দিয়ে মাথার লাল চামড়া দেখা যায়…নিতান্ত বেচারা ভাল মানুষ। শূকরছানার মত নিরীহ নীল চোখ দুটিতে মিট্‌মিট্ করে চায়।

প্রথম থেকেই লোকটির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। এত শীঘ্র ভাব জমিয়ে ফেলতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। আমি যাওয়া মাত্রই তার নীচের বেঞ্চিটা আমাকে ছেড়ে দিলে, তাড়াতাড়ি আমার ট্রাঙ্কটা ধরে উপর-তাকে তুলতে সাহায্য করলে, এমন ব্যবহার করতে লাগল যে, আমি একটু অপ্রস্তুতই হলাম। পরের একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই অনেক খাদ্য পানীয় কিনে এনে কামরায় যারা ছিল তাদের সকলকেই খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে লাগল।

তখনই বুঝতে পারলাম, লোকটি কোন আন্তরিক আনন্দের আবেগে ভরপুর হয়ে আছে, তার মনের ভাবটা এই যে, সে যেমন খুসী আছে তার আশপাশের অন্যান্য সকলেই তেমনি খুসী হয়ে উঠুক।

দেখা গেল, আমার ধারণাটা মিথ্যা নয়। দশ মিনিটের মধ্যেই আমার কাছে তার হৃদয় উদ্ঘাটিত করে ফেললে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলাম যে, লোকটি নিজের কথা বলা সুরু করতেই অন্যান্য যাত্রীরা নড়ে-চড়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালে, বাইরের দৃশ্য যেন কতই মনোযোগ সহকারে দেখছে। পরে বুঝলাম, প্রত্যেকে তার একই গল্প ইতিপূর্ব্বে অন্ততঃ বারো বার শুনেছে। তারপর এসেছে আমার পালা।

ইঞ্জিনিয়ার দূর প্রাচ্য দেশ থেকে ফিরছিল পাঁচ বৎসর প্রবাসের পর। পিটার্সবার্গে তার স্ত্রী-পরিবার আছে, পাঁচ বৎসর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। প্রথমে ইচ্ছা ছিল এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফিরবে, কিন্তু কতকগুলি ব্যবসা এমন লাভবান হয়ে উঠল যে, সেগুলো না শেষ করে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এতদিনে সমস্ত কাজ শেষ করে সে বাড়ী ফিরছে। লোকটি কিছু বেশী বকে, কিন্তু কেমন করেই বা তাতে দোষ দেওয়া যায়? বেচারা পাঁচ বছর ঘর ছেড়ে একা বিদেশে কাটিয়েছে, তার পর এখন ফিরছে প্রচুর সম্পদ নিয়ে, তাতে রয়েছে অটুট স্বাস্থ্য, চঞ্চল যৌবন, অপরিতৃপ্ত ভালবাসা! প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মাইল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে অধৈর্য্য বেড়ে উঠছে, এমন সময় কে চুপ করে থাকতে পারে, কে বা অধৈর্য্য চাপতে পারে!

তার সংসারের সকল কথাই শুনলাম। স্ত্রীর নামটি সুসানা, ওরফে সানোচা, মেয়ের নাম হচ্ছে য়ুরোচা। তিন বছরের মেয়েটি রেখে গিয়েছিল,—"ভেবে দেখুন, এখন কত বড় হয়েছে, প্রায় বিয়ের যোগ্যই বা হবে!"

বিয়ের আগে স্ত্রীর কি নাম ছিল তাও আমাকে বলেছে। বিয়ের পর ওরা খুব দারিদ্র্য ভোগ করেছিল, তখনো ওর ছাত্রাবস্থা ছিল, পরণের পায়জামা দ্বিতীয় মাত্র ছিল না, সে সময় ওর স্ত্রীই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু, দাসী, ভগ্নী, জননী, একাধারে সব।

বুক ফুলিয়ে বুকের উপর চাপড় মেরে মুখ চোখ লাল করে উচ্ছ্বসিত গর্ব্বে বলতে লাগল—"যদি একবার তাকে দেখতেন

কি চমৎকার ! পিটার্সবার্গে গেলে তার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেব। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়ী যেতে হবে, কোন ওজর আপত্তি শুনব না। ১৫৬নং কিরোচ্ছায়া। আলাপ করিয়ে দেব, নিজের চোখে একবার দেখবেন। রাজরাণীর মত দেখতে ! আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের বল-নাচে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। একবারটি আপনাকে যেতেই হবে, নইলে আমি ভারী রাগ করব।"

আমাদের সকলকেই সে একখানা করে ভিজিটিং-কার্ড দিলে, তাতে পুরানো মাঞ্চুরিয়ার ঠিকানা কেটে দিয়ে তার পিটার্সবার্গের ঠিকানা লিখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলে তার স্ত্রী এক বছর থেকে মস্ত একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে আছে, - তার সঙ্গতি হবার পরই সে স্ত্রীকে ভালভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছে।

তার মুখের কথাগুলো যেন ঝর্ণার জলের মত ঝরছিল। দিনের মধ্যে চার বার, কোন বড় ষ্টেসনে এসে গাড়ী থামলেই একখানা করে রিপ্লাই-টেলিগ্রাম বাড়ী পাঠাচ্ছে, পরের ষ্টেশনে পৌছেই তার জবাব চাই, ঠিকানা অমুক নামের অমুক নম্বরের ফার্ষ্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার।...টেলিগ্রাফ-পিওন যখন এসে হাঁকছে—"অমুক প্যাসেঞ্জারের নামে টেলিগ্রাফ আছে"—তখন যদি তার মুখখানা একবার দেখতে ! বেশ দেখা যাচ্ছিল সাধু মহাত্মাদের মুখে যেমন জ্যোতি থাকে, তার মুখেও তেমনি একটু জ্যোতি ফুটে উঠছিল। পিওনকে বক্‌শিষ দেওয়া হচ্ছিল একেবারে রাজা-রাজড়ার মত মুক্তহস্তে। কেবল পিওনকে নয়, সবাইকেই সে মুক্তহস্তে দান করতে চায়, সবাইকেই চায় সে খুসী করতে। আমাদের সকলকে স্মৃতি-চিহ্ন বলে কত যে জিনিষ দিলে, দামী দামী সাইবিরিয়ার পাথরের মালা, বোতাম, সেফ্‌টিপিন, চীনা পাথরের আংটি, জেড্ পাথরের মূর্ত্তি, আরো কত সৌখীন জিনিষ। তার মধ্যে অনেক জিনিষ বহুমূল্য, দুষ্প্রাপ্য, অনেক জিনিষের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম, এসব জিনিষ নিতে অত্যন্ত দ্বিধাবোধ হচ্ছিল, তবু প্রত্যাখান করার কোন উপায় ছিল না, এমন নাছোড়-বান্দার মত আমাদের নেবার জন্য সে সাধাসাধি করছিল, ছোট ছেলে যদি একটা মিষ্টান্ন নিয়ে তোমাকে খাবার জন্য ক্রমাগত জেদ করতে থাকে তা হলে যেমন সেটা না খেয়ে থাকতে পার না, ঠিক তেমনি।

তার বাক্সগুলি জিনিষে একেবারে ঠাসা, সমস্তই সানোচা আর য়ুরোচার জন্য উপহার। সে সব আশ্চর্য্য সামগ্রী, বহুমূল্য চীনা পোষাক, গজদন্তের আর সোনার কত রকমের গহনা, রংবেরংয়ের খেলনা, কারুকার্য্যমণ্ডিত হাত-পাখা, ল্যাকারের কাজকরা বাক্স, ছবির এলবাম—এই সব জিনিষ - কোনটা কার জন্যে, আদর করে তাদের নাম উচ্চারণ করা যদি একবার তোমরা শুনতে ! হয়তো তার ভালবাসা অন্ধই ছিল, হয় তো লোকটির অতিশয়োক্তি করাই স্বভাব, কিংবা এসম্বন্ধে সে কিছু বাইগ্রস্ত, কিন্তু তবু যে এটা তার সত্যকারের খাঁটি ভালবাসা, প্রকাশ করার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে আছে, একথা অনায়াসেই বোঝা যায়।

আমার মনে আছে, একটা বড় ষ্টেশনে যখন আমাদের গাড়ীর সঙ্গে একটা ওয়াগন্ জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন দৈবাৎ চাকার তলায় পড়ে একজন পয়েণ্টস্‌ম্যানের পা কেটে দুখানা হয়ে গেল। চারদিকে হট্টগোল পড়ে গেল, প্যাসেঞ্জাররা লোকটিকে দেখবার আগ্রহে ভীড় করে নেমে পড়ল। মানুষ যখন রেলগাড়ীর যাত্রী হয় তখন না থাকে তাদের মনুষ্যত্ব, না থাকে কোন দয়া মায়া। ইঞ্জিনিয়ার এই ভিড়ের মধ্যে গেল না, সে চুপি চুপি ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে এগিয়ে গেল, তার সঙ্গে কি কথা কইলে, তারপর তার হাতে কতকগুলো নোট গুঁজে দিলে—বেশ বোঝা গেল নেহাৎ কম টাকা নয়, কারণ ষ্টেশন-মাষ্টারটি সেটা হাতে নিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে টুপি খুলে অভিবাদন করলে। এই কাজটা সে এমন তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে যে কেউ ব্যাপারটা টের পেল না, কিন্তু আমার নজর এই সব দিকেই থাকে, আমার চোখ এড়াতে পারলে না। ট্রেণ ছাড়বার একটু দেরী ছিল, তারপর দেখলাম এখান থেকেও একটা 'তার' পাঠানো হল।

এখনো যেন তার সেই মূর্ত্তিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঠিক যেমন সে প্ল্যাটফরম দিয়ে হেঁটে আসছিল, মাথায় সাদা টুপি, পরণে দামী তসরের লম্বা কোট, গলায় কলার আঁটা, এক দিকের কাঁধে ঝুলছে দূরের জিনিষ দেখবার ফিল্ড-গ্লাসের চামড়ার ব্যাগ, আর এক কাঁধে ঝুলছে তার চিঠিপত্রের ব্যাগ, —টেলিগ্রাফ-অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে সে, কি স্বাস্থ্যপূর্ণ হাস্যময় মুখ, যেন সদ্য পল্লীগ্রামের আমদানি সরলচিত্ত এক বলিষ্ঠ তরুণ যুবক।

টেলিগ্রামের জবাবও পাওয়া যাচ্ছিল প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে। পিওন আসবারও সে অপেক্ষা রাখছিল না, নিজেই দৌড়ে যাচ্ছিল টেলিগ্রাফ-আফিসে খবর নিতে তার নামে কোন টেলিগ্রাম আছে কি না। আহা বেচা-রা! আনন্দটা নিজের মনে চেপে রাখতে পারে না, প্রত্যেক টেলিগ্রামখানা আমাদের কাছে পড়ে পড়ে শোনায়; যেন তার ঐ দাম্পত্যপ্রীতির কথা শোনা ছাড়া আমাদের আর কিছু ভাববার জিনিষ নেই। "ভাল আছ তো? আমরা চুম্বন পাঠাচ্ছি, অধীর আগ্রহে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছি। সানোচা, যুরোচা।" কিংবা—"ঘড়ি ধরে আমরা টাইম-টেবলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি তোমার ট্রেণ কোন ষ্টেশনে পৌছলো। আমাদের মন কেবল তোমার কাছেই ঘুরছে।" সব টেলিগ্রামগুলোই প্রায় এই রকম। একখানাতে আবার এই রকম ছিল—"তোমার ঘড়ি পিটার্সবার্গ-টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে নাও; ঠিক রাত্রি এগারোটার সময় সপ্তর্ষি-মণ্ডলের আল্‌ফা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থেকো। আমিও তাই থাকবো।"

গাড়ীতে একজন বয়স্ক যাত্রী ছিল, সোনার খনির বোধ হয় মালিক, কিংবা খাজাঞ্জী হবে, লোকটা সাইবিরিয়া দেশের, মুখখানা যেন মুসার মত। লম্বা, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি, লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ী, দেখলে মনে হয় সংসারের অনেক রকম পোড় খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সেই লোকটি একবার ইঞ্জিনিয়ারের যেন চৈতন্য করিয়ে দেবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করলে,

"দেখ বাপু, টেলিগ্রাফের সুবিধা আছে বলে সেটাকে অতটা অপব্যবহার করা ঠিক নয়।"

"কেন, কেন? কিসের জন্য ঠিক নয়?"

"দেখ, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে দিবারাত্র কেবল টেলিগ্রাফের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকা অসম্ভব। পরের মনের কি অবস্থাটা হচ্ছে তাও তো তোমার ভেবে দেখা উচিত।"

ইঞ্জিনিয়ার হো-হো করে হেসে উঠে তার হাঁটুর উপর চাপড়ে দিলে।

"হাঁ গো কর্ত্তা, আপনারা হচ্ছেন মান্ধাতার আমলের লোক, আপনাদের যে এসব ভাল লাগবে না তা জানি। আপনারা বাড়ী ফেরেন চুপি চুপি, কারুকে কোনো খবর না দিয়ে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে দেখতে চান, যেমনটি রেখে গিয়েছিলেন তেমনটি ঠিক আছে কি না। কেমন, ঠিক কি না?"

সেই ভদ্রলোক চোখ তুলে চেয়ে অল্প একটু হাসলেন। "তা এতে ক্ষতি কি আছে? কখনো কখনো তাও দরকার হয়।"

নিঝনি ষ্টেশনে আমাদের গাড়ীতে কয়েকজন নূতন যাত্রী উঠল, মস্কৌতে আরও জনকতক উঠল। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারটির কথা বলার আগ্রহ তখনো বেড়ে চলেছে। তাকে নিয়ে কি করা যায়! সকলের সঙ্গেই সে যেচে আলাপ করলে; বিবাহিত লোকদের সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কত তাই নিয়ে কথাবার্ত্তা হল, অবিবাহিতদের বুঝিয়ে দিলে তাদের জীবনে কোন শৃঙ্খলা নেই, যুবতীদের শুনিয়ে দিলে একনিষ্ঠ প্রেমের মূল্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা, সন্তানবৎসলা জননীদের সঙ্গে ছেলেপুলের বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিলে, কিন্তু সব কথাতেই ঘুরে ফিরে এসে পড়ে তার সেই সানোচা আর যুরোচার কথা। এখনো তার দু'একটা গল্প মনে আছে,—কেমন করে তার মেয়ে আধো-আধো সুরে বলত, "আমাল্ হল্‌দে ড্রতো আথে।" একদিন নাকি সে বেরালের ল্যাজ ধরে টানছিল, বেড়ালটা মিউ-মিউ করছিল, তার মা বললে—"অমন করে টেনো না, ওর লাগছে", তাতে সে উত্তর করলে—"না মা, ওর বেশ ভাল লাগছে।"

এ সব শুনতে ভালও লাগে আমোদও হয়, কিন্তু বেশী বার শুনতে হলে কেমন বিতৃষ্ণা এসে পড়ে।

পরের দিন আমরা পিটার্সবার্গের কাছাকাছি এসে পড়লাম। সে দিনটা মেঘলা ছিল। কুয়াশা না হলেও ছিপছিপে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আকাশটা অন্ধকার হয়ে ছিল, পাইন গাছগুলো কালো কালো দেখাচ্ছিল আর লাইনের দুধারে ভিজা পাহাড়গুলো দেখতে হয়েছিল যেন লোমঘেরা জাঁচিলের মত। আমি সকালে উঠে হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছিলাম গোসলখানায়; পথে দেখা হল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে, সে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একবার তার ঘড়ির দিকে চাইছে, একবার বাইরের দিকে চাইছে।

আমি বললাম, "গুড মর্নিং, এখানে কি হচ্ছে?"

সে বললে, "ও, গুড মর্নিং! গাড়ীটা কত জোরে চলেছে তাই পরীক্ষা করছি; এখন ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল যাচ্ছে।"

"ঘড়ি নিয়ে তাই দেখছেন বুঝি?"

"হাঁ, এর খুব সোজা উপায় আছে। ঐ যে তারের খুঁটিগুলো, ঐ রকম কুড়িটা খুঁটি পার হলে হয় এক মাইল। একটা খুঁটি থেকে আর একটা খুঁটি পর্য্যন্ত যেতে যদি চার সেকেণ্ড লাগে তা হলে বুঝতে হবে আমরা ঘণ্টায় ৪৫ মাইল যাচ্ছি; যদি তিন সেকেণ্ড লাগে তা হলে ঘণ্টায় ৬০ মাইল হয়, যদি দু সেকেণ্ড লাগে তা হলে ৯০ মাইল হয়। কিন্তু ঘড়ি না থাকলেও এটা বোঝা যায় যদি মনে মনে সেকেণ্ড-গুলো ঠিক গুণে যেতে পারেন; তাড়াতাড়ি অথচ স্পষ্টভাবে সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করে গেলেই হল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, এই রকম করে গুণে যেতে হবে। অষ্ট্রিয়ার জেনারেল ষ্টাফের মধ্যে সকলেরই এ গুণ আছে।"

এই রকম সে বকে যেতে লাগল, কিন্তু ভঙ্গী তার অতি চঞ্চল, চোখের দৃষ্টি অস্থির,—বুঝতেই পারলাম যে, এসব কথাবার্ত্তা আর অষ্ট্রিয়ান জেনারেল ষ্টাফের সেকেণ্ড গোণার পরিচয় উপস্থিতক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর, কেবল এমনি করে আপন অসহিষ্ণুতাকে সে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

লুবান ষ্টেশন পার হবার পর বেচারীর অবস্থা বড় ভীষণ হয়ে উঠল। আমার মনে হল, তাকে রীতিমত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, হঠাৎ যেন তার বয়স বেড়ে গেছে। তখন তার কথাবলাও বন্ধ হয়ে গেছে। চুপ করে কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়ার ভাণ করছিল, কিন্তু সেটা তার পক্ষে কত অসহ্য হচ্ছে তা বেশ দেখা যাচ্ছিল; একবার দেখি কাগজখানা উল্টো করেই ধরে আছে। পাঁচ মিনিট যদি চুপ করে বসে তো তারপরই জানালার কাছে উঠে যায়, আবার এসে চুপ করে এমনভাবে বসে যেন ট্রেণখানাকে ঠেলে আরো এগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আবার উঠে যায় জানালার কাছে, ঘড়ি ধরে ট্রেণের গতি পরীক্ষা করে, জানালার বাইরে ঝুঁকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে একবার সুমুখে একবার পিছনে। কে না জানে যে প্রিয়দর্শনপ্রতীক্ষায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া বরং অনেক সহজ, কিন্তু সকলের চেয়ে কঠিন এই শেষের আধঘণ্টাগুলো, এই শেষের পনেরো মিনিট সময়টুকু।

অবশেষে দেখা গেল ষ্টেশনের সিগন্যাল; তারপর হিজি-বিজি বেড়াজালের মত অসংখ্য রেললাইনের ক্রসিং, তারপরই ষ্টেশনের লম্বা প্ল্যাটফরম, সাদা জামা পরা ষ্টেশন-কুলীরা সার সার দাঁড়িয়ে আছে।......ইঞ্জিনিয়ার তার কোট পেড়ে নিয়ে গায়ে দিলে, ব্যাগটি হাতে নিলে, গাড়ীর বারান্দা পার হয়ে দরজার কাছে চলে গেল। আমিও জানালা দিয়ে উঁকি মেরে চেয়ে ছিলাম, মৎলব যে গাড়ী থামলেই একজন কুলীকে ডাকব। ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলাম সে তখন দরজা খুলে পা-দানীর উপর নেমে দাঁড়িয়েছে; আমাকে দেখতে পেয়ে সে মাথা নেড়ে একটু হাসলে, কিন্তু তবু হঠাৎ দেখলাম তার মুখটা যেন একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

রূপালী পোষাক পরে এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণী প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ছিল, মাথায় মস্ত ভেলভেটের হ্যাট্, মুখের উপর নীল ভেল্, আমাদের গাড়ী তার পাশ দিয়ে চলে গেল। একটি ফ্রক্ পরা ছোট মেয়ে, পায়ে লম্বা সাদা মোজা, তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনেই যেন কাউকে খুঁজছে, প্রত্যেক জানালাটার দিক আগ্রহদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ইঞ্জিনিয়ারকে তারা দেখতে পায় নি। তারপরই শুনতে পেলাম, ইঞ্জিনিয়ার কেমন একরকম বিকৃত কাঁপাগলায় চেঁচিয়ে ডেকে উঠল—"সানোচা!"

বোধহয় দুজনেই তার দিকে ঘুরে চাইলে। তারপরই অকস্মাৎ কি তীব্র মর্ম্মভেদী চীৎকার ··সে আর আমি জীবনে ভুলতে পারব না। সে রকম ভয়বিহ্বল অমানুষিক যন্ত্রণা-সূচক দারুণ আর্ত্তনাদ আমি আর জীবনে কখনো শুনিনি।

পরমুহূর্ত্তেই দেখতে পেলাম, ইঞ্জিনিয়ারের মাথাটা একেবারে প্ল্যাটফরমের নীচে, ট্রেণের চাকার গোড়ায়। মুখটা দেখা গেল না, কেবল দেখলাম সেই ফাঁক ফাঁক চুলের ভিতর দিয়ে তার মাথার পরিচিত লাল চামড়া,—কেবল চকিতের মত দেখতে পেলাম, তার পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।......

সাক্ষী হিসাবে আমার তলব হয়েছিল। তার স্ত্রীকে সে সময় আমি একটু ঠাণ্ডা করবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু অমন অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার কি কথা আছে? লাসটা আমি দেখেছি,—তালগোল পাকানো খানিকটা মাংস-

পিণ্ড। ট্রেণের তলা থেকে যখন টেনে বের করা হল তখন আর কিছু নেই। পরে শুনতে পেলাম আগে তার পা কেটে যায়, তারপর নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে, তখন সমস্ত শরীরটার উপর দিয়ে চাকা চলে যায়।

কিন্তু এর পরে যা বলব তা আরো ভয়ানক কথা। ঐ দারুণ বিপদের সময়টাতে যে এক অদ্ভুত ভাব আমার মনে উদয় হল, কিছুতে সেটা আমি ত্যাগ করতে পারি না। ঘটনাটা হয়ে যাবার পর অবশ্য মনে হয়েছিল, "একি কুৎসিত মৃত্যু, কি অসম্ভব অন্যায়, কি নির্দ্দয়!" কিন্তু কেন, যে মুহূর্ত্তে আমি তার অমন করে চেঁচিয়ে ডেকে ওঠার আওয়াজটা শুনতে পেলাম, তখনি আমার মনে কেন যে স্পষ্ট উদয় হল, এবার ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটবে, যেন এইটাই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী? কেন এমন হয়? বুঝিয়ে দিতে পার? সেই সয়তান দেবতাটির শ্লেষ তাচ্ছীল্যের হাসিটা দেখতে পেয়েই এ কথা আমার মনে হয়েছিল সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি!

বিধবাটির সঙ্গে আমি পরে দেখা করেছিলাম এবং সে আমাকে তার স্বামীর বিষয় অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছে; সে বলে ওদের ভালবাসায় কোন সংযম ছিল না, পরস্পরের সম্বন্ধে যখনই যা মনে করেছে তখনই তাই করেছে, যখনই মিলতে চেয়েছে তখনই মিলেছে, ভবিষ্যতের বিষয়ে ওরা নাকি ভাগ্যবিধাতাকে প্রলুব্ধ করেছিল। হতেও পারে···বলা যায় না · প্রাচ্যদেশ, সমস্ত প্রাচীন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা যেখানে, সেখানে কোন লোকই আগে "ইন্স্-আল্লা" অর্থাৎ "যদি ভগবান করেন" এই কথাটি না বলে কখনই এমন কথা বলে না যে, আমি আজ এই কাজটা করব কি কাল অমুক কাজটা করতে চাই।

যাই হোক, আমার মনে হয় না যে, ভাগ্যকে ওরা লুব্ধ করেছিল, আমার বোধ হয় রহস্য-দেবতার সেই এক খাম-খেয়ালী যুক্তিই এর ভিতর আছে। বিচ্ছেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতীক্ষায় ওরা যে আনন্দটা উপভোগ করে এসেছে, এত দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও ওদের আত্মা যে ভাবে মিলিত হয়েছিল, সাক্ষাৎ মিলনে এর চেয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া হয়তো ওদের পক্ষে সম্ভব হত না! কে জানে এর পরে ওদের কি অবস্থা দাঁড়াত! হয়তো মোহ ভেঙ্গে যেত। না হয় অবসাদ আসত! না হয় বিতৃষ্ণা! না হয় ঘৃণা! *

অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

* আলেক্‌জাণ্ডার কুপ্রিন রচিত টেম্পটিং প্রভিডেন্স (Tempting Providence) গল্পের অনুবাদ। কুপ্রিন প্রসিদ্ধ রুষীয় লেখক, ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'ডুয়েল' নামক উপন্যাস লিখিয়া তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া আখ্যাত হন। কিন্তু 'ইয়ামা' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। পৃথিবীর অনেক ভাষায় ইহার তর্জ্জমা হইয়াছে এবং ইহার মত কাটতি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর খুব কম উপন্যাসেরই হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কুপ্রিনকে জীবনকাব্যের কবি (poet of life) আখ্যা দেওয়া হয়।

গ্যাসকে কঠিন ধাতব অবস্থায় রূপান্তরিত করিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র। [৪৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ছায়া

—শ্রীশান্তি পাল

লোহা-পাথরের সৌধকিরীটী-সহরবাসিনী দেবী—
স্তিমিত নেত্রে মৃত্যুর দ্বারে বসেছি তাঁহারে সেবি'।
বসিয়া রয়েছি তাঁর বেদীমূলে যূপকাষ্ঠের বলি,
ধীরে ধীরে প্রাণ নিঃসাড় হল, ওদিকে সহরতলী
বাড়িয়া বাড়িয়া পল্লীর বুকে ফেলিতেছে কালো ছায়া—
সহরের নেশা আসিছে জমিয়া, কাটিছে গ্রামের মায়া।
ঘরে ঘরে সেথা কে দেখিবে চেয়ে, চাল-খুঁটো গেছে খসে,
দেয়ালের গায়ে মাটি পড়েনিক' আধখানা গেছে ধ্বসে।
পাকশালে আর জ্বলে না উনান, খালি হাঁড়ি ধরে শিকে,
ফাটলের গায়ে বাসা বাঁধিয়াছে বাদুড়ে ও চামচিকে।
বাগানের কোণে, খামারের পাশে, পুরানো গোয়াল-ঘর,
বাতায় বাতায় ঘুণ ধরিয়াছে উড়িছে চালের খড়।
ধানের মরাই শূন্য পড়িয়া ভরে নাই কেহ ধান;
গাঁয়ে গাঁয়ে আজ নিত্য নূতন হইতেছে অকল্যান।
নয়ান-জুলি যে শুকায়ে গিয়াছে নাহিক' তাহাতে জল,
খাল, বিল, দীঘি ভরিয়া বাড়িছে কচুরীপানার দল।
সান-বাঁধা ঘাটে শেওলা জমেছে সাফ নাহি কেহ করে,
সাঁঝের বাতাস হয় না উতলা ঘটভরা কলস্বরে।
মাঠে মাঠে আর বাথানে বাথানে শৃগাল কুকুর নাচে,
বনের পাখীরা উড়িয়া উড়িয়া বসেনাক' গাছে গাছে।
গাঁয়ের গোধন আধপেটা খেয়ে শুইয়া নদীর বাঁকে,
রাখালের লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাম্বা হাম্বা ডাকে।
কৃষাণের মেয়ে একেলা বসিয়া ঘরের কোণেতে আজ,
আগেকার মত পাড়া পাড়া ঘুরে পরে না এয়োর সাজ।
নিরালা নিঝুম দুপুরের তাতে কলা-বাগানের পাশে,
কাঁকালে বহিয়া মাটির কলসী তারা আর নাহি আসে।
খিড়কীর ঘাটে সখীদের সাথে খেলেনাক' জল-খেলা,
এ-পার ও-পার হয় না কেহই ভাসায়ে কলার ভেলা।

আঁচল পাতিয়া, এলাইয়া চুল সিনানের ঘাটে বসে,
আল্‌তা-রঙীন বরণ তাদের কেহ আর নাহি ঘসে।
বেউর বাঁশের বাঁশীতে বাজে না উতলা উদাসী সুর,
ভাঙা ঢেউ লেগে ভাসে না কলসী, যায় না সে বহুদূর।
কুমারী মেয়েরা বকুলের তলে করে নাক' ছুটাছুটি,
সাঁঝের বেলায় জ্বালে না প্রদীপ তুলসীতলায় জুটি,
আঁধার মৌন ঘেরে চৌদিক, থামিয়াছে কলতান,
ঘরে ঘরে আর পড়ে না সন্ধ্যা, উঠে না সান্ধ্যগান!
দেবতার ঘরে বাজে না শঙ্খ, ঘণ্টা নাহিক বাজে,
ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজায়ে নাচে না কেহ আঙিনার মাঝে।
নাহি শুনি আর বাউলের গান, তরজা পাঁচালী ছড়া,
কীর্ত্তন ঢপ গাহে না কেহই কটিতে পরিয়া ধড়া।
কবিদের আর হয় না লড়াই ময়নাপাড়ার মাঠে,
এ-মাঠ ও-মাঠ একাকার আর হয় না গাঁয়ের বাটে।
সত্যপীরের পাঁচালীর কথা গ্রাম ছেড়ে গেছে চলে,
মনসা-ভাসান, মুস্কিলাসান আর নাহি কেহ বলে।
কথকতা, ব্রত, রূপকথা কই, বাস্তু দেবীর দান,
আউনী, বাউনী, কলার বরণ, কৃষ্ণলীলার গান?
জারীর পালা যে শেষ হয়ে গেছে কণ্ঠ গিয়াছে বুজে,
কলকণ্ঠের কলহাসি আর পায় না কেহই খুঁজে।

গাঁয়ের বুকেতে আগুন লেগেছে পুড়িয়া হয়েছে খার,
ধিকি ধিকি শুধু জ্বলিছে আগুন, নামিছে অন্ধকার।
আজ শুধু শুনি দুঃখের কথা ঘরে ঘরে ওঠে ওই,
পল্লী-মায়ের বুকভাঙা ডাক কেমন করিয়া সই?
চারিদিক দেখি, শ্মশান বিরাজে, করে সবে হাহাকার,
উপোসে ও জ্বরে গাঁয়ের মানুষ হয়েছে অস্থিসার!

লোহা-পাথরের সৌধকিরীটী-সহরবাসিনী দেবী,
কি পেলাম আর কি যে হারালাম তোমার চরণ সেবি'!
গণিতে বসিয়া শিহরিয়া উঠি, দেখি মৃত্যুর ছায়া,
সহরের নেশা ছুটাও হে দেবী, বাড়ুক গ্রামের মায়া।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদাগাস্কার দ্বীপে রবার গাছের সন্ধানে

মার্কিন যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে কয়েক প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছের অনুসন্ধানে মাদাগাস্কার দ্বীপে একদল অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাঠানো হইয়াছিল। চার্লস সুইঙ্গ্‌ল তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

মাদাগাস্কার দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বড় সহর মাজুঙ্গা থেকে আমাদের যেতে হবে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, প্রায় ১৩০০ মাইল ঘুরে বেড়াতে হবে গাছগুলার খোঁজে। আমার সঙ্গে ছিলেন আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি হামবার্ট।

মাজুঙ্গা থেকে যে জাহাজ দক্ষিণদিকের বন্দর টুলেয়ারে যায়, সে জাহাজ আমরা পেলাম না, পনেরো মিনিট আগে সেখানা ছেড়ে চলে গিয়েছে—অগত্যা আমরা এখান থেকে ছদিন নৌকাতে গিয়ে এক জায়গায় নেমে মোটরবাস ধরে এই দ্বীপের রাজধানী আন্তানানারিভোতে গেলাম এবং সেখান থেকে মোটরযোগে ভ্রমণের সব ব্যবস্থা করা গেল।

এই মোটরবাসে ভ্রমণ আমাদের অনেককাল মনে থাকবে। দুধারে পাহাড় পর্ব্বত, প্রায়ই রুক্ষ ও অনাবৃত আগে এই পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্যানী ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তার চিহ্ন আছে। মানুষে কাঠের লোভে এই সকল জঙ্গল নষ্ট করেছে।

পাহাড় থেকে অনেক নদী বার হয়ে এসে নীচের সমতল ভূমিকে উর্ব্বরা করেছে। মাদাগাস্কার দ্বীপের এই অংশে প্রচুর পরিমাণে ধান হয়, চাল এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। সমতল ভূমির এই অংশে আমরা অসংখ্য র‍্যাভেনালা (পান্থপাদপ) দেখলাম।

পান্থপাদপ এদেশের লোকে নানা কাজে লাগায়। তার কলাপাতের মত চওড়া পাত পেতে ভাত খায়। এর কাঠ জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের প্রত্যেক চওড়া পাতা যেখানে এসে গুঁড়ির সঙ্গে মিশেছে, সেখানে সুন্দর নির্ম্মল জল পাওয়া যায়—তবে অনেকস্থানে পোকামাকড়ে এই জল নষ্ট করে ফেলে।

পথে যেতে যেতে আমরা একদল পঙ্গপাল দেখলাম। কালো মেঘের মত, আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করে উড়ে চলেছে—সমস্ত দলটির উড়ে চলে যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। এদেশের লোক পঙ্গপাল খায়, আন্তানানারিভোর বাজারে আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি পঙ্গপাল বিক্রয়ার্থ মজুদ দেখেছি।

আন্তানানারিভো সহরে প্রায় সত্তর হাজার লোক বাস করে। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে এই সহরের সম্পর্ক খুব বেশী

মাদাগাস্কার দ্বীপবাসী নর ও নারী।

নেই। খুব কম বিদেশী লোকই এখানে ভ্রমণ করবার জন্যে এসে থাকে। ১৮৯৫ সালে এই দ্বীপে ফরাসীদের অধিকার স্থাপনের পরে যদিও এখানে নানাদিক থেকে নানা পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবুও সহরের লোকে সেই আগেকার মত সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে। কেবল মাঝে মাঝে

রেস্তোরাঁর উঁচু মাস্তুল মনে করিয়ে দেয় যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছেছে।

সহরের বাড়ীগুলো কাঁচা ইটের, চারি পাশের অনুচ্চ শৈলমালার গায়ে থাকে থাকে অবস্থিত। মাঝে মাঝে কাঠের তৈরী ঘরও আছে। দুচারখানা দোতলা বাড়ীও চোখে পড়ে। সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থানে একটা পাহাড়ের উপর স্থানীয় রাজপ্রাসাদ—এখানে বলে 'রাণীর বাড়ী'। মাদাগাস্কারের শেষ রাণী তৃতীয় রানাভালোনার নির্ব্বাসনের পরে এই রাজপ্রাসাদ এখন জাতীয় মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে।

মাদাগাস্কারের সহরে পুরাতন ও নূতন ধাঁজের এই সংমিশ্রণ অনেক বসত বাটিতে দেখা যাইবে। সম্মুখে ধান-ভানা হইতেছে। বাংলার পল্লীগ্রামেও এ দৃশ্য অপরিচিত নয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে ঢুকতে হলে মাথা খুব নীচু করে ঢুকতে হয়, দোর এত ছোট। এদের ঘরে আসবাবপত্র থাকে খুব কম। মেজেতে একখানা বড় মাদুর বিছানো, কয়েক চাঙ্গারী চাল, রাঁধবার জন্যে একটা বড় লোহার কড়াই, জল রাখবার জন্য দুটো তিনটে বড় জালা কিম্বা লাউয়ের খোল। ছাদের সর্ব্বত্র কালো কালো মাকড়সার ঝুল ঝুলছে, দেয়ালে দু'একটা কাঠের দেবদেবীর মূর্ত্তি।

মাদাগাস্কারে স্ত্রীলোকেরা সমাজে খুব সম্মানিত। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসী অধিকারের পূর্ব্বে রাজার বদলে রাণীরা এখানে অনেক দিন রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্য এখানকার মেয়েদের গৃহকর্ম্ম, রান্না, ধানভানা—সবই করতে হয়, সংসারের জন্যে হাটবাজারও করতে হয়—কিন্তু পুরুষের কাছে নারীদের যথেষ্ট সম্মান।

মাদাগাস্কারে জীবনযাত্রাপ্রণালী খুব দুরূহ ও জটিল নয়। বছরের মধ্যে দিনকতক খেটে ধান্যরোপণ করলেই সারা বছরের কাজ হয়ে গেল। ধান কাটার সময় আরও কয়েক দিনের খাটুনি আছে—তারপর গোলা থেকে ধান বার করা, ধানভানা, আর ভাত রাঁধা। পুরুষদের আর একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পশুপালন। এদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের যথেষ্ট গরুবাছুর আছে। যার যত গরু-বাছুর বেশী, স্থানীয় সমাজে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি তত বেশী।

বোধ হয় এই জন্যই এখানকার লোকে প্রাণ গেলেও গরু-বাছুর বিক্রী করতে চায় না বা গরুর মাংস খাওয়ার চলন থাকলেও কখনো গোহত্যা করে না। এর কারণ এই যে, যদি তার গোশালায় গরুর সংখ্যা কমে যায়, তবে প্রতিবেশীর চোখে তার পসার কমে যাবে।

গরুচুরি এখানে খুব চলে। প্রায়ই শোনা যায় এ ওর গরু চুরি করে জেল খাটছে। ফরাসী আইনে চুরি মাত্রেই অপরাধ বলে গণ্য এই হয়েছে মুস্কিল, নতুবা গরুচুরি মাদাগাস্কারের দেশী সমাজে অপরাধ বলেই গণ্য নয়। ওটা একটা খেলার মধ্যে ধরা হয়—একথা বলা যেতে পারে, ফুটবল যেমন ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় স্পোর্ট, মাদাগাস্কারের গরুচুরি তেমনি একটা স্পোর্ট। ওতে কেউ দোষ ধরে না—তবু ধরা পড়লে চোরকে জেলে যেতে হয় বটে। সে তো ফুটবল খেলতে গিয়েও হরদম হাত পা ভাঙছে—সে জন্য ফুটবল খেলতে ভয় পায় কে?

স্থানীয় বাজার একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। রোজ বাজার বসে না—সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন এজন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বাজারের দিন এখানে একটা উৎসবের দিন বলে পরিগণিত।

অনেকদূর থেকে লোকে মাথায় করে কিংবা গাধা ও অশ্বতরে বোঝাই দিয়ে মালপত্র, ডিম, ধান, চাল, জীবন্ত, মুরগী, হাঁস, মাদুর ইত্যাদি আনে।

পান্থপাদপ : তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের জন্য ইহা সর্ব্বদা শীতল জল সঞ্চিত রাখে। পাতাতে দিব্য খাওয়া-দাওয়ার কাজ চলে।

বাজারের এক জায়গায় স্তূপীকৃত ইউরোপীয় পরিচ্ছদ বিক্রী হচ্ছে, বহু পুরানো ধরণের পোষাক, যা এখন ইউরোপে সবাই ভুলে গিয়েছে। একজন হাতুড়ে অনেক রকম দেশী গাছ-গাছড়া ও ওষুধ বিক্রী করতে এনেছে এবং তারস্বরে তার পণ্য-রাজির দ্রব্যগুণ ঘোষণা করে বিক্রেতা যোগাড় করছে। তার পাশে একজন বিক্রী করছে কয়েক ঝুড়ি পঙ্গপাল, খালি বোতল ও খালি টিন।

আমাদের দরকারী জিনিস স্থানীয় বাজারে পেতাম না যে তা নয়। খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে আমাদের প্রায়ই বাজারে আসতে হত। এখানকার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, খাবার জিনিস যা দেয় তা রান্নার দোষে বিস্বাদ, কাজেই আমরা বাজার থেকে প্রায়ই কলা, অনারস, পেয়ারা, আম কমলালেবু এবং পেঁপে প্রভৃতি ফল কিনে নিয়ে যেতাম।

আন্তানানারিভো থেকে ট্রেনে আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম, ছোট ছোট গাড়ী, ন্যারো-গেজ লাইন, এঞ্জিনে কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠ জ্বলে, ঘণ্টা কয়েক গিয়েই রেলপথ ফুরিয়ে গেল। যেখানে রেলপথ শেষ হল, সেটা একটা ছোট সহর, নাম অ্যাণ্ট-সিরেব—ফরাসী পদ্ধতিতে নির্ম্মিত চওড়া চওড়া রাস্তা, ঘরবাড়ী, পার্ক—এই আধুনিক ধরণের সহর দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে আমরা মাদাগাস্কারেই আছি।

অ্যাণ্টসিরেব এ অঞ্চলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে কয়েকটি উষ্ণজলের ফোয়ারা আছে—এদেশের ধনীলোকেরা মাঝে মাঝে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্যে এখানে আসে।

অ্যাণ্টসিরেব থেকে আমাদের যেতে হবে মোটরে। প্রায় চারশো মাইল যাবার পরে লক্ষ্য করা গেল, আমরা এমন স্থানে এসে পড়েছি যেখানে গাছপালা খুব কম। অনাবৃত,

মাদাগাস্কার : সাধারণতঃ এই দ্বীপে স্ত্রীলোকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে না। এই ছবিতে দেখা যাইতেছে, ইহারা মাঝে মাঝে কঠিন কাজও করে।

রুক্ষদর্শন পাহাড় পর্ব্বত, বিস্তৃত সমতলভূমি—জল কোথাও নেই, নদী চোখেই পড়ে না। পান্থপাদপ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

মাদাগাস্কার: হাট, দক্ষিণে ছত্রধারিণীর ইউরোপীয় বেশভূষা দ্রষ্টব্য। এই হাটে এই সব বেশভূষা ক্রীত হয়।

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর অসভ্য। রাজধানীর কাছাকাছি স্থানের অধিবাসীরা ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বদলে গিয়েছে, কিন্তু এইসব দূরতর অঞ্চলের লোকে এখনও বর্শা হাতে নিয়ে বেড়ায়। কম্বলের মত মোটা একখানা কাপড়ই এদের একমাত্র পরিধেয়—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাপড়চোপড়ের বালাই নেই।।

এর পরে যে রাস্তা আরম্ভ হল, সেদিকে কোনো সহর পড়ে না। সুতরাং টুলেয়ার বলে একটা ছোট সহর থেকে আমরা পেট্রোল ও খাদ্যদ্রব্য কিনে নিলাম। পথে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। কোনো মোটর ওপথে যায় না, গবর্ণমেণ্টের ডাক লোকে কাঁধে ঝুলিয়ে পদব্রজে নিয়ে যায়।

একদিন পথের ধারের একটা খড়ের ঘরে আমরা বিশ্রাম করছি, পথ দিয়ে একদল লোক মৃতদেহের সৎকার করতে যাচ্ছে। তারা এমন অদ্ভুত ধরণের তারস্বরে শোকধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে যাচ্ছিল যে, আমরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখতে গেলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে দেশী গাইড ছিল, সে আমাদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করলে। এ অবস্থায় ওদেশের লোকে নাকি এত দেশী মদ খায় যে, বিদেশী লোকদের পক্ষে কাছে থাকা বিপজ্জনক।

একটা গ্রামে গিয়ে আমরা দুদিন বিশ্রাম করলাম। সেই গ্রামের চারি পাশের বালির পাহাড়ে ইপিয়র্নিস্ বলে এক প্রকার অধুনাবিলুপ্ত বৃহৎকার পাখীর ডিম পাওয়া যায়। বোধ হয় আরব্য উপন্যাসের রক্ পাখীর কল্পনা এই জাতীয় পাখী থেকে হয়ে থাকবে।

আমরা অনেক খুঁজেও তেমন ভাল ডিম যোগাড় করতে পারিনি। ডিমের কয়েক টুক্‌রো খোলা পাওয়া গিয়েছিল, সকলের চেয়ে বড় টুক্‌রোটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। এর মধ্যে কোন কোনটা বালির মধ্যে তিন চার ফুট পুঁতে ছিল, কোনটা বা বালিয়াড়ির ওপরে পাওয়া গিয়েছিল।

এই অঞ্চলে আমরা ফণিমনসা জাতীয় এক প্রকার অদ্ভুত গাছ প্রথম লক্ষ্য করি। এই গাছ পত্রহীন, দীর্ঘ, শাখাগুলি যেদিকে বাতাস বয়, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। ভারী চমৎকার দেখায় সে সময়।

মাদাগাস্কার দ্বীপের সর্ব্বত্রই নানা মূল্যবান গাছপালা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু টুলেয়ার ও ফোর্ট ডফিনের মধ্যবর্ত্তী

ইপিয়র্নিসের ডিম: এমন ডিম বারোটার বেশী পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় প্রস্তরীভূত অবস্থা।

মরুভূমিতে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য রবার গাছ পাওয়া যায়, যার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী। এই রবার গাছ আজকাল বেশী

দেখতে পাওয়া যায় না এবং এরা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ইউফোর্বিয়া ইন্টিসি।

এবার আমরা মরুভূমিতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছি। এই ছোট গ্রামটা থেকে জল ও খাবার নিতে হল। কুলী ও গাইড প্রথমে মেলে না, মরুভূমির পথের বিপদ কারো অজানা নেই, এখানে কেউ সঙ্গে যেতে রাজি নয়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অবশেষে অনেক কষ্টে আটত্রিশ জন লোক যোগাড় হল। আমাদের ছেড়ে মাঝপথে পালিয়ে গেলে তাদের পনেরো দিন করে জেল হবে, পুলিশ এই হুকুম শুনিয়ে দিলে। সঙ্গে একজন দেশী সিপাই দিলে পুলিশে।

পথে কোথাও জল নেই। সঙ্গে অনেক জলের দরকার। চল্লিশটি তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণীর উপযুক্ত জল নেওয়াও এক কঠিন ব্যাপার। অবশেষে ভেবে-চিনতে মাত্র ষাট গ্যালন জল নিয়ে রওনা হওয়া গেল। অনেকে বললে মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে জল পাওয়া যাবে। ষাট গ্যালন জল ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুরে কুলিদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া গেল। মাদাগাস্কারের মরু-পথে চলার দুটো প্রধান অসুবিধা—রোদ ও কাঁটাবন। শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ও ভারী বুট পায়ে আমরা সে দুটো বিপদের বিরুদ্ধে নিজেদের অনেকখানি প্রস্তুত করেছিলাম। পথে ভাত ছিল আমাদের একমাত্র খাদ্য। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক কুলিকে দৈনিক এক সেরের উপর চাল দিতাম। অনেক সময় তারা একসের চাল একবারে খেয়ে ফেলত—এবং হাঁড়িধোয়া জল আকণ্ঠ পান করে তৃপ্তিলাভ করত।

এই হাঁড়িধোয়া জল সমগ্র মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের একটি অতি প্রিয় পানীয়। ভাত রাঁধবার সময় কড়াজালে ভাত ধরিয়ে ফেলানো নিয়ম—যাতে হাঁড়ির তলায় পোড়া ও ধরা ভাত কিছু লেগে থাকে। তারপর ভাত রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে ওই পোড়া ভাতগুলোতে জল দিয়ে আবার খানিকক্ষণ ফুটানো হয়—সেই গরম জলটাই এখানকার অধিবাসীদের নিকট চা কিংবা কফির স্থান অধিকার করেছে।

ওদের রাঁধবার পাত্র ওরা সঙ্গে নেয়নি। এখানে নিয়ম আছে যে কোনো গ্রামের যে কোনো অধিবাসী দুচার মুঠো চালের বিনিময়ে তার রাঁধবার হাঁড়ি ধার দেয়—কাজেই ও জিনিষটা কাঁধে ঝুলিয়ে বইবার দরকার হয় না।

খাবার পাত্রেরও দরকার নেই।

দেখা গেল, তারা ছোট ছোট খড়ের ঝুড়ি পেতে ভাত খাচ্ছে। তাতে একটু আশ্চর্য্য হতে হল, কারণ জিনিসপত্র বাঁধবার সময় এত খড়ের ঝুড়ি আমরা তো বেঁধে নিই নি বেশ মনে আছে। কিন্তু খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তারা যখন সেই খড়ের ঝুড়িগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে নিজের নিজের মাথায় দিলে, তখন বোঝা গেল, এগুলো ওদের মাথার খড়ের টুপি।

মাদাগাস্কার: ইউফোরবিয়া বৃক্ষ।

মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী যে খুব জটিল নয়, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিছুদূর যেতে না যেতে লক্ষ্য করলাম, সঙ্গে আমরা এত জল নিয়েছি যে, তাতে আমাদের পথচলার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘোর জলহীন মরুভূমিতে জল ফেলে দেওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই, সুতরাং আমরা প্রত্যেক কুলিকে যত ইচ্ছা জল পান করতে অনুরোধ করলাম, বাকী জল ত্রিশটি লাউয়ের খোলার মধ্যে পুরে ত্রিশজন কুলির

কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছিল।

আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, পথের ধারের গ্রাম থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙতে দেরী হল না। পথে গ্রাম প্রথমতঃ খুব বেশী নেই, দ্বিতীয়তঃ সেসব গ্রামে এত জলকষ্ট যে তাদের মেয়েরা সকালবেলার শিশির সঞ্চয় করে রাখে জলের অভাবে। ঝোপে-ঝোপে যে শিশির পড়ে ভোরের বেলা, মেয়েরা লাঠি দিয়ে সেই ঝোপ ঠ্যাঙায় এবং তলায় জলের পাত্র পেতে রাখে।

গুলোর! তবুও তারা আমাদের বিরুদ্ধে একটি তিরস্কার-বাক্য উচ্চারণ করলে না বা কোনোরকমে অসন্তোষ প্রকাশ করলে না। কলের পুতুলের মত চলতেই লাগল।

আমাদের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মাত্র জল অবশিষ্ট ছিল—তাই সেই পথিপার্শ্বে পতিত হতভাগ্যের ঠোঁটে মুখে মাখিয়ে আমরা তাকে সেখানে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম, কারণ তাকে সঙ্গে নেবার কোনো উপায় ছিল না।

শীঘ্রই আর একজনের ওই অবস্থা হল, তার পরে আর একজন—ক্রমে ক্রমে পাঁচজনের এই অবস্থা দেখে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি তখন। তাদের পথের পাশে জনহীন মরুভূমির মধ্যে সে অবস্থায় ফেলে যাওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ তা আমরা বুঝি, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়—জলের অভাবে তারা মরতে বসেছে, আমরা জল পাব কোথায় যে তাদের প্রাণ বাঁচাব?

সিমানাম্পেৎ সোৎসা হ্রদ: ইহার জল পানের অযোগ্য।

সুতরাং তাদের ফেলে রেখে আবার চললাম। সামনের দিকেই চললাম, কারণ ফিরে যাওয়া আরও অসম্ভব। সামনের দিকেই বা কোথায় কত দূরে জল কে জানে! কি ভয়ানক বেঘোরেই পড়ে গিয়েছি।

পরদিনও কাটল এই ভাবেই।

সন্ধ্যাবেলা ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

দূর থেকে আমরা একটা গ্রাম দেখতে পেলাম। অতি কষ্টে সেই গ্রামে পৌঁছে সামান্য পরিমাণ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত জল পাওয়া গেল। নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে গ্রামের সমস্ত লোকদের আমরা জল সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মরুভূমির মধ্যে, যাদের ফেলে এসেছি তাদের নিয়ে আসতে।

দু একদিনের মধ্যে তারা এসে পৌঁছল—ভগবানকে ধন্যবাদ, তাদের মধ্যে কেউ মারা পড়েনি।

এ অবস্থায় তাদের কাছে জল চাওয়া চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিনের অবসানে দেখা গেল, আমাদের সঙ্গের পানীয় জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উপায় ছিল না, সম্মুখে অগ্রসর হতেই হবে এবং মরুভূমির ভীষণতম অংশ এখনও আমাদের সামনে।

কুলিরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের একটা গুণ দেখলাম, যখন তারা বুঝলে চেঁচামেচি করেও কিছু হবে না তখন তারা চুপ করে সব সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হল। শীঘ্রই জলের অভাবে একজন কুলি চলতে অশক্ত হয়ে পথের ধারে শুয়ে পড়ল, কি অদ্ভুত ধৈর্য্য এই লোক

উলু

—শ্রীমনোজ বসু

উলু! উলু! উলু!

মেয়েরা উলু দিতেছে। শিবনাথেরও যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিল। বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে লাফাইতে লাফাইতে তিনি তাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

ও কি হচ্ছে? ওরে শালীরা, একি লগ্ন-পত্তোর হচ্ছে—না, পাকা দেখা?

মেয়েরাও হারিবার পাত্র নয়। কমলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—তার চেয়ে বেশী, দাদু। শুভদৃষ্টি হচ্ছে। বর ঐ চোরচোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েব মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে।... নাম ভাঁড়িয়ে কি আর আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

পরাস্ত হইয়া শিবনাথ তখন বলিলেন—দে, তবে খুব করে উলু দে। এ ভাঙা ঘরে দশ বছর ত হয়নি ও পাট!

বলিয়া হাসিতে গিয়া বুড়া চোখ মুছিলেন।

দশ বছর আগেকার সে ঘটনা মনে পড়িলে চোখে জল আসিবার কথা বটে। শিবনাথের একমাত্র ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ঘরে অতুল রূপ লইয়া পুত্রবধূ যোগিনী সাজিল; গৌরী তখন বছর পাঁচেকের। সেই গৌরীর বিয়ে, দিন-ক্ষণ সমস্ত স্থির, টাকাকড়ির কিছু অগ্রিম লেন-দেন হইয়া গিয়াছে। আজ হঠাৎ বরের কজন বন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন। এবং উঁহাদের সঙ্গে বর নাকি আসেন নাই···তিনি কিছুতেই আসিলেন না, তাঁর নাকি ভয়ানক লজ্জা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্দর হইতে শিবনাথ পুনশ্চ বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে তখন মহা মুস্কিল, মেয়ে কিছুতে মুখ তুলিবে না। শিবনাথ মিনতি করিতে আসিলেন—ও গরবী দিদি, কথা শোন্, কিসের এত লজ্জা? আচ্ছা, আমার দিকে চা' দিকি—

এত পীড়াপীড়ি, গৌরীর ফর্শা মুখ একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘামিয়া খুন, চেষ্টাচরিত্র করিয়া এক একবার মুখ তুলিতে চায়, খানিক উঠিয়া আবার নত হইয়া পড়ে, মুখ সে কিছুতে তুলিতে পারিল না।

বন্ধুরা সদয় হইয়া বলিল—থাক্, থাক্, ঐ হয়েছে—

শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন—বড্ড লজ্জা। আজকালকার মেয়ের মত নয়। এই বুড়োর সঙ্গে থেকে থেকে একেবারে যেন আদ্যিকালের বুড়ী হয়ে উঠেছে। তারপর সকলের পিছনের চশমাচোখে নিতান্ত গোবেচারা গোছের ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমাকে একটু উঠতে হবে, দাদা।

যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে আগন্তুকেরা সকলেই এমনি ভাবে তাকাইল।

শিবনাথ বলিলেন—মানে, আমার ছোট মেয়ে কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছে, জামায়ের সঙ্গে একেবারে সিমলা পাহাড়ে—। বিয়ের সময়ে থাকতে পারবে না। সে-ই একবার একটু ভাল করে দেখতে চায়···।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয় ওপাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি আসিয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন পাত্র কনে দেখতে এসেছে, আর পাত্রী বুঝি বর না দেখে ছেড়ে দেবে!

বন্ধুরা তুমুল আপত্তি করতে লাগিল।—বললাম ত—পাত্র আমাদের মধ্যে নেই—আমরা কি মিছে কথা বলছি মশাই?

—সে আমরা বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে শোনে না। শিবনাথ নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ওরা ঐ ওঁকে পাঠিয়ে দিতে বলছে।

বন্ধুরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল, এবং তাদের দিকে করুণ অসহায় দৃষ্টি ফেলিয়া চশমাধারী উঠিল।

অন্দরে মহা সোরগোল।

—ও গৌরী, দেখসে এসে · কোথায় গেলি হতভাগী, বর পছন্দ করবি আয়—

মেয়ে এক আধটি নয়, বিশ কুড়ি কি তারও বেশী। নানা বয়সের। তাদের মধ্যে পড়িয়া সভয়ে ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে আমি বর নই—

—সে হচ্ছে। আস্তিনটা তোল দিকি—

দেখিতে ভাল মানুষ হইলে কি হয়, আসলে কিন্তু ছেলেটি মোটেই সে রকম নয়, অধিকতর ভয়ের ভঙ্গি করিয়া বলিল—

আস্তে না। আস্তিন গুটিয়ে কি হবে? দৃষ্টিটা ছিল বিশেষ করিয়া খুব স্থূলকায়া একজনের দিকে। বলিল - আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠব না, আমি আপোষে হার মানছি—

সুধা আগাইয়া আসিয়া বলিল উনি কে—জান?

না —

তোমার বউয়ের ছোটপিসি। তা হলে তোমারও পিসি হলেন। উনিই তোমায় দেখতে চেয়েছিলেন।

ছেলেটি মনে মনে জিব কাটিল। সুধা তখন আস্তে আস্তে তার হাতের জামা সরাইয়া দিয়া বলিল—এই যে জতুক রয়েছে। ও জুয়োচোর, তুমি ঢাকলে কি হয়? ঘটক যে ফাঁস করে দিয়েছে। তোমার চোখে চশমা, হাতে জতুক, নাম নবনী। মিথ্যে নাম বলবার শাস্তি এবার কি হবে বল ত?

হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া নবনীর আর কথা বলিবার জো রহিল না। বিজয়ীর দল তখন শাসাইতে লাগিল - শাস্তি দেবার জনকে ডাকছি এখুনি। দেখ তোমার কি হয়! গৌরী —গৌরী।

ভাঙাচোরা অতি পুরানো প্রকাণ্ড দালান। তাহারই মধ্যে পাথরের মত ভারী কালো হাঙ্গরমুখো খাটের উপর গদি ও সেকেলে জাজিম পড়িয়াছে। বর সেইখানে শাস্তির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। কিন্তু কোথায় গৌরী?

পাতি পাতি করিয়া এঘর ওঘর সমস্ত খোঁজা হইল। একটা জায়গায় বালিশ বিছানা গাদা করা,—দুষ্ট মেয়ে করিয়াছে কি—একদম তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ধরিবে কাহারো সাধ্য কি! সকলে খুঁজিয়া মরে—সে এক একবার মুখ বাড়াইয়া চোখ মিটি মিটি করিয়া মজা দেখে—কাছাকাছি কেহ আসিলে তখনই আবার লুকাইয়া পড়ে। কিন্তু একবার কেমন একটু অসাবধানে গোটা তিনচার বালিশ দুমদাম করিয়া মেজেয় পড়িয়া গেল। আর রক্ষা আছে! ধরিয়া ফেলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাকে লইয়া চলিল।

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ পায়ের তোড়া বাজিতেছে। প্রায় দোরের গোড়া অবধি পৌঁছিয়াছে, নবনী তখন যুক্ত করে কাতর হইয়া কহিল—আমার অন্যায় হয়েছিল, মাপ করুন।

কিন্তু ততক্ষণে মেয়ে আসিয়া লজ্জিত মুখে মেজে লইয়াছে।

ছোট পিসি হাসিয়া ডাক দিলেন—ধুলোয় বসিস্‌নে। উঠে আয় খাটের উপর।

কমলা কহিল—ইস্, পোড়ারমুখী লজ্জায় আর বাঁচেন না। মনে না ধরে দাদুকে বল। এখনো সময় আছে।

অনেক জোর জবরদস্তি করিয়াও মেয়েকে উঠানো গেল না। তখন ছোট পিসি গিয়া বরের হাত ধরিলেন—তুমি বাবা, তবে একটু নীচে নেমে এস। আমার বড় সাধ একটু পাশাপাশি বসিয়ে দেখে যাই—

শিহরিয়া উঠিয়া নবনী বলিল—না—না।

সুধা বলিল—আপত্তিটা কি ভাই? দু'দিন আগে আর পরে। পিসিমা এত করে বলছেন। ওতে কোন দোষ নেই। এস—

সব শেষে উঠিতেই হইল। সকলে তখন জোর করিয়া গৌরীর ঘোমটা খসাইয়া দিল। দুটিতে অপরূপ মানাইয়াছে। কে বেশী ভাল, তুলনা করিয়া বলিবার জো নাই। দৃষ্টি আর ফিরানো যায় না।

ছোট পিসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। এমন রাজ-রাজেশ্বরী মেয়ের বাপ না জানি কোন দূরদেশে ছাই-ভস্ম মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাঢ়স্বরে বলিলেন—চিরজীবী হও তোমরা। দুজনের চিবুকে হাত ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বর ধীরে ধীরে উঠিয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিল। ছোট পিসি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন দেখলে, বল বাবা। আমি একবার কানে শুনে যাই। দেখতে পাব না।

—ভাল!

সুধা রাগিয়া উঠিল। শুধু ভাল? ইঃ, নিজের একটু-খানি কটা চামড়া আছে কিনা—সেই দেমাকে বাঁচেন না। মেয়ে ত তোমরা ডজন ডজন দেখেছ—শুনলাম। এমনটি আর দেখেছ কখনো?

মুখ টিপিয়া নবনী বলিল—কিন্তু দোষও আছে—

ছোট পিসি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—কি দোষ বাবা?

—আপনি কেন? আপনি চলে যান, পিসিমা। আমি আর সকলের সঙ্গে কথা বলছি। বলিয়া সেই আর সকলের

দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ঐ গৌরী-টৌরী—সত্যযুগের নাম চলবে না। নাম বদলাতে হবে।

—এই? চলিয়া যাইতে বলিলেও ছোট পিসি এক পা নড়েন নাই। এতক্ষণে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন—তোমাদের যে রকম খুসী—বিয়ের সময় সেই নাম দিয়ে নিও। ও-ত আজকাল হচ্ছেই। ঐ যে হালদারদের পটলি, বিয়ের সময় তার নাম হয়ে গেল সুলেখা দেবী।

সকলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বর তখন চুপি চুপি কহিল—বন্ধুরা বললেন, নামটা মীরা হলেই যেন—

মীরা? মীরাবাই?—কমলা একেবারে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। বলিল—কিন্তু আমাদেরও একটা আপত্তি আছে, বর মশাই।

বর সপ্রশ্ন ভাবে চাহিল।

কমলা বলিতে লাগিল—তোমারও ঐ নবনী-টবনী চলবে না ভাই। তোমার নাম হবে কুম্ভ সিং।

সুধা টিপ্পনী কাটিল—শূন্য কুম্ভ। যে রকম বক্ বক্ করে।

যে আজ্ঞে—বলিয়া বর তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে ঘাড় নোয়াইল।

কমলা বলিল—আরও আছে—

—হুকুম হোক্।

—পাল্কী চেপে বিয়ে করতে আসা চলবে না।

নবনী বলিল—পাল্কী হবে না। নৌকোর ব্যবস্থা হয়েছে।

—উঁহু, তা-ও চলবে না। হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কমলা বলিল—ঘোড়ায় চড়ে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আসতে হবে। মশাল জ্বলবে, জয়ঢাক বাজবে, মাথায় উষ্ণীষ ঝলমল করবে—

—কিন্তু আমি সে রাজসজ্জা দেখতে পাব না। ছোট পিসির মুখভরা আনন্দদীপ্তির মধ্যে আবার অশ্রু চকচক করিয়া উঠিল। বলিলেন—যাই হোক বাবা, খুকীকে তুমি আদর যত্ন ক'রো। বড্ড অভিমানী। বাপ থেকেও নেই, হতভাগী বড্ড ভালবাসার কাঙাল।

বর ও বরের বন্ধুরা চলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা ধুপধাপ বাহিরের ঘরে আসিয়া কলকণ্ঠে শিবনাথের সম্বর্দ্ধনা করিল—

চমৎকার! সত্যি দাদু, তোমার পছন্দ আছে। এ মাণিক কোথা থেকে খুঁজে-পেতে আনলে?

কিন্তু উহাদের বয়স এমনি, সোজা কথাটারও বাঁকা মানে হইয়া যায়। শিবনাথ বলিলেন—ঠাট্টা করছিস?

নিশিকান্ত মল্লিক তখনো বসিয়া বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। নল ফেলিয়া উৎসাহের প্রাবল্যে খাড়া হইয়া বসিলেন। বলিলেন—ঠিক ধরেছিস তোবা। কেবল রাঙা মূলো, ভেতরে কিস্‌সু না। আমিও তাই বলছিলাম দাদাকে।

ছোট পিসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—না, মল্লিক মশায়, তা কেন? আলাপে ব্যবহারে বিদ্যেয় চেহারায় ছেলে একেবারে হীরের টুকরো—

হা-হা-হা করিয়া প্রবল হাসির চোটে বক্তব্যের শেষটা মল্লিক উড়াইয়াই দিলেন। বলিলেন—এদিকে ভাঁড়ে যে মা ভবানী—এক কাঠা জমাজমি নেই, ঘরে ছুঁচোয় তে-রাত্তির করে—সে খবর জানিস?

শিবনাথ দুঃখিত স্বরে কহিলেন—কিন্তু এর চেয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাই কোথায়?

সুধার মুখে কিছুই আটকায় না। তৎক্ষণাৎ কহিল—কেন, এই মল্লিক মশায়। ঘরদোর বিষয়-সম্পত্তি, নাতিপুতি একেবারে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন মিলবে কোথায়?

যাঃ ফাজিল। বলিয়া শিবনাথ তাড়া দিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা হলে পছন্দ হয়েছে তোদের? যাক, বাঁচলাম। ও যে আমার কত সাধের গরবিণী—ঐ দুগ্‌গো-প্রতিমা কি যার তার হাতে দিতে পারি?

কমলা বলিল—তুমি ত শিবঠাকুর আছ দাদু, অন্যের হাতে দিতে গেলে কেন?

—চেষ্টার কি কসুর করেছি? মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, বলে বুড়ো। কিছুতে রাজী হয় না।…ও কে রে? ও গৌরী, ও গরবী, ও গরবিণী, এদিকে এস। বলে যাও বর পছন্দ হল কিনা।

গৌরী জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝুম ঝুম করিয়া তোড়া বাজাইয়া পলাইয়া গেল।

বিয়ের দিন। সেই ভাঙা বাড়ির চেহারা বদলাইয়াছে, জঙ্গল একদম নাই, বৈঠকখানার ইট-বাহির-করা দেয়ালের উপর লাল-নীল কাগজ আঁটা হইয়াছে। ভিতরের উঠানে মস্ত সামিয়ানা, ফুল দেবদারু পাতা দিয়া বিবাহ-আসর সাজানো।

সকাল হইতে ঢোল আর কাঁসি পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

শিবনাথ অন্দরে আসিয়া ঘন-ঘন তত্ত্ব লইতেছেন।—আহা, দিদির আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু দুধ খেতে দাও। ওতে কিছু দোষ হবে না। দাও, বৌমা, দাও।

মেয়ের মার যদি বা একটু মন নরম হয়,—কিন্তু এই বিয়ে উপলক্ষে শিবনাথের ছোট বোন আসিয়াছেন, নাম কাদম্বিনী, তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ, যা বিধি আছে একচুল তার এদিক-ওদিক হইবে না। একদিন না খাইলে কেহ আর মরিয়া যায় না, কিন্তু শুভকর্ম্মের মধ্যে এদিক-ওদিক হওয়াটা কিছু নয়।

বড় সুন্দর পিঁড়ি চিত্র করা হইয়াছে; আলপনার বড় পদ্মটি যেন সত্য সত্যই একটি শ্বেতপদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ মহা আনন্দে চেঁচাইয়া বাড়ি মাৎ করিতে লাগিলেন।

—ও দিদি, কোথায় পালালি গো?—এদিকে আয়।

—কি দাদু?

—আয়। ঐ পদ্মটার উপর কমলে কামিনী হয়ে একবার দাঁড়া দিদি, আমি দেখি।

যাঃ—বলিয়া পলাইতে যাইতেছিল, এবারে মা আসিয়া হাত ধরিলেন। তাঁরও যেন ঐ ইচ্ছা। আনন্দদীপ্ত মুখে বলিলেন—বস্ না একটু—খুকী,...বাবা বলছেন।

গৌরীর তবু লজ্জা। এক একবার মুখ তোলে, চোখো-চোখি হইলেই হাসিয়া ঘাড় নামায়। তারপর অনেক সাধ্য-সাধনায় এক-পা এক-পা করিয়া পিঁড়ির উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই আবার উঠিয়া দৌড়। দৌড়—দৌড়। মেয়ে আর ত্রিসীমানায় নাই। আর ছেলে-মানুষ শিবনাথও পাকা দাড়ি দোলাইয়া পিছন পিছন ছুটিলেন—ধর্ ধর্—

লগ্ন দু'টা,—একটা সন্ধ্যার পর, আর একটা মাঝ-রাত্রের দিকে। সন্ধ্যার লগ্নেই শুভকার্য্য চুকিয়া যায়, সেইটা সকলের ইচ্ছা। বাড়ীতে মানুষ-জন নাই। কুটুম্বের মধ্যে আসিয়াছে মাত্র ঐ এক কাদম্বিনী, পাড়ার লোক ধরিয়া কাজকর্ম্ম খাওয়ানো-দাওয়ানো সমস্ত করিতে হইতেছে, কাজেই সকাল সকাল হইয়া গেলে সবদিকে সুবিধা। বরপক্ষকে বার বার এই কথাটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘোর হইয়া আসিতে মশালের বোঝা লইয়া কদমতলার ঘাটে বিশ কুড়ি জন দাঁড়াইল। একটু পরেই রায়গঞ্জের বাঁকের দিক দিয়া ঢোলের আওয়াজ। শিবনাথ কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাজকর্ম্মের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন, দূরের সেই ঢোলের বাদ্যে তাঁহার বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিল। এ পক্ষের ঢুলিরা সারা পাড়া মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে জল-সইয়া ঘুরিয়া এখন বসিয়া বসিয়া চিঁড়া ও নারিকেলের সন্দেশ চিবাইতেছিল। শিবনাথ তাহাদের উপর গিয়া রুখিয়া পড়িলেন—ওরে বেটারা, হাত পা কোলে করে বসে রইলি—ওরা যে এসে পড়ল। জবাব দিবিনে? জিততে পারলে গামছা বখশিষ একখানা করে।

গুড়্ গুড় গুড়্ গুড়্—বীরদর্পে ঢোলে কাঠি দিতে দিতে এদিককার বাজনদারেরা উঠিয়া পড়িল। শিবনাথ আর সেখানে নাই। চরকীর মত এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কনের ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দন-আঁকা মুখ, লাল চেলী পরা, শুভ্র অঙ্গে সোনার গহনা ঝিকমিক করিতেছে। মুখখানা আদর করিয়া তুলিয়া ধরিতে ঝর ঝর করিয়া শিবনাথের এক রাশ চোখের জল ঝরিয়া পরিল। বলিলেন—ও দিদি, নতুন বর পেয়ে বুড়োকে মনে থাকবে ত?

গৌরীর বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, দাদুর চোখ দুটা মুছাইয়া দেয় একবার। কিন্তু সাহস হইল না। সুধা, মিনু, কমলারা সব নানাদিকে রহিয়াছে, যে শত্রুপুরীতে বাস, ফাঁক পাইলে কেউ আজ রেহাই দিবে না।

সদর বাড়ীতে এদিকে তুমুল কাণ্ড। লোকে লোকারণ্য। ফটকের এধারে রাস্তার দিকে মুখ করিয়া কন্যাপক্ষের ঢুলি ও কাঁসিদারেরা। ওদিককার ঢুলির দল তাদের সামনে মুখো-মুখি যুদ্ধভঙ্গিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া সুপুষ্ট পেশীবহুল হাত ঝাঁকাইয়া তারা ঢোলে ঘা দিতেছে, মুখে বলিয়া বলিয়া অবিকল সেই বোলগুলি ঢোল ও কাঁসীর মধ্য দিয়া আদায় করিতেছে—ভিড়ের মধ্য হইতে বাহবা আসিতেছে। বরের ঢোলে হাঁকিল—

কোথায় কনে—কুলো ব্যাঙ্?

অমনি দুই ফেরতা দিয়া কন্যাপক্ষের জবাব—

ঘরের কনে দেবো ক্যান? ঘরের কনে দেবো ক্যান্?

তির্য্যকগতিতে অমনি পাঁচ-সাত পা ছুটিয়া আসিয়া বরের লি কাঠি দিতে লাগিল —

না দিবি ত এলাম ক্যান্? না দিবি ত ভাঙ্‌ব ঠ্যাং—ভাঙ্‌ব ঠ্যাং—ভাঙ্‌ব ঠ্যাং

হঠাৎ ইহার মধ্যে শিবনাথের চীৎকারে রসভঙ্গ হইল।

—বর কই ?

বরের বাপ নাই, জ্ঞাতিসম্পর্কের এক কাকা বরকর্ত্তা। াগাইয়া আসিয়া তিনি বলিলেন—এই এসে পড়ল বলে। পছনের নৌকোয় আসছে। বরযাত্রীরা প্রায় সব এসে গছেন।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের উপর ভাঁড়ারের ভার। বর দখিতে তিনিও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন—আচ্ছা াও—বিয়ে যেন আপনাদের মশায়। গ্রামের মানুষ সব ভঙ্গে এসেছে—ছাদের উপর ঐ ওঁরা সব কি রকম তাকিয়ে। াজনা-টাজনাগুলো বর আসা পর্য্যন্ত সবুর করতে হয়।

বরকর্ত্তা হাসিয়া উঠিয়া সগর্ব্বে কহিলেন—এ হল বরযাত্রীর াজনা। বর এলে কি আর এই হবে? ইংরেজী বাজনা ।শায়, ইংরেজী বাজনা। জয়ঢাক রয়েছে, জিলিপি বাঁশী·· রের নৌকোয় আসছে সব। এ ঢোলের বাদ্যি-টাদ্যি উড়ে াবে তার মধ্যে।

বরযাত্রীরা আসন গ্রহণ করিলেন কিন্তু ভিড় কমিল না। ার ওই আসে, ওই আসে। নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া সকলে ফটকের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমশঃ চারিদিক কেমন ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম লগ্ন কাটিয়া গেল, ত্রিসীমানা মধ্যে ইংরেজী বাজনার সাড়াশব্দ নাই।

গ্রামে মধু চক্রবর্ত্তীর ঘোড়া আছে। ঘোড়ায় করিয়া তাঁকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, নদীর তীরে তীরে কুকশিমার হাট অবধি যাইবেন, যদি পথে বরের নৌকার দেখা পান।

ক্ষণপরে নিশিকান্ত বৈঠকখানায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—মশাইরা গাত্রোত্থান করুন।

বরকর্ত্তা এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলেন—অর্থাৎ ?

হাসিয়া নিশিকান্ত বলিলেন--সে সব কিছু নয় মশায়, কাজকর্ম্ম এগিয়ে রাখছি, উঠে পড়ুন।

কিন্তু ওরা না এসে পড়লে···সে কি রকম হবে · । হঠাৎ তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। আর ঐ যে কথায় কথায় ইংরেজী বলে, গোঁফ কামানো, টেরীকাটা ঐ গুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে, মশায়। ওরাই ত গোল বাধালে। বসে বসে চা গিলছে, আর বললে—আপনারা রওনা হন, আমরা ছোট নৌকোটায় চলে যাব, কতক্ষণ লাগবে? নবনীকে বললাম—তুই আয়। ও বললে, কলকাতার বন্ধুদের ফেলে যাই কি করে? আমি ঠিক বল্লাম, বেটারা কুকশিমার হাটে বসে খিঁচুড়ী-ভোজ লাগিয়েছে। আস্ত রাক্ষস এক একটা—

বরযাত্রীদলের পরিতোষপূর্ব্বক আহারে কোন বাধা ঘটিল না। তারপর একদল দু'দল করিয়া গ্রামের নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষদেরও হইয়া গেল। বরের খোঁজ নাই।

বিয়েবাড়ি তখন একেবারে নিস্তব্ধ। পাড়ার সকলে দুই একে সরিয়া পড়িয়াছেন। আপাততঃ একটু ঘুমাইয়া লওয়া যাক, ইংরেজী বাজনা শুনিলেই তারপর আসা যাইবে। বৈঠকখানার বড় আলো নেভানো, মিটিমিটি বাতি জ্বলিতেছে, বরযাত্রীদের নাসিকা-গর্জ্জন ছাড়া কোন দিকে কোন ধ্বনি নাই। অন্দরের উঠানে সাজানো বিয়ের আসরের খানিক দূরে মেয়ের মা আবছা অন্ধকারে বসিয়া আছেন। আর শিবনাথ একবার ঘর একবার বাহির, কেবলই ছুটাছুটি করিতেছেন।

শেষ-লগ্নও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এমনি সময়ে খটখট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া মধু চক্রবর্ত্তী আসিয়া নামিলেন। ঘটক ত্রিলোক-তারণ তাঁর পিছন হইতে ভিজা কাপড়ে লাফাইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবনাথ ছুটিয়া আসিলেন, কাদম্বিনী আসিলেন, ওদিকে কোথায় ঝিনমিন গহনা বাজিয়া উঠিল।

কি? কি? কি?

—নৌকোডুবি।

চোখ বুছিতে মুছিতে বৈঠকখানা হইতে বরের কাকা ছুটিয়া আসিলেন—সে কি সর্ব্বনাশ! ঝড় নেই, ঝাপটা নেই—

ঘটক বলিল—ভরতের দেউলের ঐ খানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন—কোটালের গাঙ, টানের মুখ—

কাঁপিতে কাঁপিতে শিবনাথ বলিলেন—নবনীধন?

ঘটক দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

আর্ত্ত, আকুল চীৎকার করিয়া শিবনাথ কহিতে লাগিলেন —বর কোথায়? বল শীগ্‌গির—বল—বল—

তারপর বজ্রাহতের মত তিনিও সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কাদম্বিনী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—বসে থাকলে ত হবে না, দাদা। কপালের ভোগ। ওঠ—

শিবনাথ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিলেন। তারপর উঠিয়া সদর বাড়ির দিকে চলিলেন। সেখানে অপরিসীম নিঃশব্দতা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড উঠানটির ভয়াবহ শূন্যতা যেন প্রেতপুরীর মত লাগিতেছে। বৈঠকখানার বাতি জ্বলিতে জ্বলিতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, দপ করিয়া তাহাও একসময় নিভিয়া গেল। শিবনাথ বসিয়া রহিলেন। এমনি সময়ে ছায়ামূর্ত্তির মত মেয়ের মার হাত ধরিয়া কাদম্বিনী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর পড়িল।—

ও বাবা, না খেয়ে না দেয়ে সাতরাজ্যি ঘুরে খুকীর আমার সোনার বর এনেছিলে তুমি—কোথায় গেল সে, ধরে নিয়ে এস—···

পলকহীন চোখ মেলা ছিল, এইবার শিবনাথ চোখ বুঁজিলেন। চোখের কোণ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চুপ কর বৌমা, চুপ কর—। কাদম্বিনী আঁচল দিয়া নিজের চোখ মুছিলেন, তারপর বলিলেন—আভ্যুদিক হয়ে গেছে, ও মেয়ে ত ঘরে রাখা যাবে না দাদা, ওঠ—

মেয়ের মা আগুন হইয়া উঠিল।—কে তাড়ায় আমার মেয়ে? আমি ঐ সঙ্গে বিদায় হব তা'হলে।

কাদম্বিনী বলিলেন—অবুঝ হোস্‌নে বৌমা, রাত পোহালে মেয়ে যে বিধবা হয়ে যাবে। তার চেয়ে রাতের মধ্যে একজনকে এনে—

ভগ্নকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন—কাকে পাব? সোনার প্রতিমা কার হাতে দেব? বলিয়া মাথায় হাত দিলেন।

কিছু না হলে ত হবে না।—ওঠ। হঠাৎ কাদম্বিনীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিল—ঐ নিশি মল্লিক। বৌ মরবার পর দিনকতক উসখুস করেছিল না? কাকে দিয়ে যেন একবার খবর পাঠিয়েছিল শুনেছিলাম।

অমন কাজ কাজ কর না পিসিমা, মেয়ে আমার আত্মহত্যা করবে।

মেয়ের মা আবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। বলিল—আমি যেমন ওকে জানি, কেউ তোমরা জান না। ও আমার বড্ড অভিমানী।

কাদম্বিনী বলিলেন - বৌমা, অবুঝ হস নে। আর ত উপায় নেই। রাত শেষ হলে এল। তুমি এস দাদা ··

নিশিকান্ত মল্লিকের কর্ত্তব্যজ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। বিয়েবাড়ি বাহিরের একটা মানুষও নাই। কেবলমাত্র তিনি যথারীতি ভাঁড়ার আগলাইয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথকে লইয়া একরকম টানিতে টানিতে কাদম্বিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মল্লিক ত আকাশ হইতে পড়িলেন। সে কি! ইহা যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। ঘর খালি করিয়া তিন তিন দফা ঘরের লক্ষ্মী বিদায় লইয়াছে, বুকের মধ্যে তাঁর যা হইয়া থাকে সে কথা আর বলিয়া কাজ কি? আবার সেখানে কোন মুখে আর একজনকে লইয়া বসানো যায়? ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে নিশিকান্ত বলিলেন—না। ও হবার জো নেই···

কাদম্বিনী বলিলেন—না বললে কি হবে মল্লিক মশায়? ও যে বিধি-লিপি। খুকী তোমার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছিল —ও কি আর কোথাও হবার জো আছে। রাত শেষ হয়ে এল—ওঠ—

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর নিশিকান্ত নরম হইলেন। শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিন্তু সোনা-রূপো, নগদ টাকা···যা সমস্ত দেওয়া হচ্ছিল তার এক পাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। কত ঝক্কি পোহাতে হবে—কত লোকে কত কি বলবে—বাড়িতে এক পাল ছেলেপুলে রয়েছে—বুঝে দেখুন ব্যাপারটা।

চুক্তি সমাধা হইয়া গেলে ধাঁ করিয়া নিশিকান্ত কোমরের গামছা খুলিয়া হাত পা ধুইয়া পিঠের উপর কোঁচার খুঁট তুলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বরাসনে বসিলেন। বলিলেন—বাড়িতে খবর দিয়ে কাজ নেই। পঙ্গপালগুলো এসে জুটবে···বাধা পড়ে যাবে। আমার ত ইচ্ছে ছিল না। কি করি—তোমাদের এই মহা বিপদ।

কিন্তু পুরুত ঠাকুর চলে গেছেন, তাঁকে যে ডাকতে হবে। —শিবনাথ হতভম্বের মত বসিয়া ছিলেন, তাঁহার গায়ে নাড়া

দিয়া কাদম্বিনী বলিলেন—যাও না একবার—ও দাদা, ঠাকুর মশায়কে আর পাড়ার ওঁদের সব ডেকে নিয়ে এস—

নিশিকান্ত বাধা দিয়া উঠিলেন—না, না—তা-ও কাজ নেই। ওঁকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

উদ্যোগী পুরুষ। হারিকেন জ্বালিয়া নিজেই পুরোহিত ডাকিতে বাহির হইলেন।

ঢুলিরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরও আর ডাকা হইল না। রাত্রি শেষ প্রহর। নিঃশব্দে বিবাহের আয়োজন হইল।

খুকী! খুকী!

গৌরী ঘুমায় নাই, জানালায় বসিয়া বাহিরের অন্ধকারে তাকাইয়া ছিল। ঝুন ঝুন করিয়া সে উঠিল। শিবনাথ সজল কণ্ঠে বলিলেন—চলে আয় দিদি, সম্প্রদান হবে।

ধীরে ধীরে মেয়ে পিঁড়ির উপর বসিল।

ফিস ফিস করিয়া কাদম্বিনী বলিলেন—দেখলে বৌমা। তুমি যে কত ভয় করেছিলে...মেয়ে আত্মহত্যা করবে—হেন করবে, তেন করবে...। সত্যি বড্ড শান্ত মেয়ে।

নিঃশব্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাঙাচোরা অতি বৃহৎ সেকেলে বাড়ি। দুটি মাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলো। মাথার উপরে নির্নিমেষ নক্ষত্রমণ্ডলী। হঠাৎ আলোর শিখা কাঁপাইয়া হু-হু শব্দে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। পুরোহিতের দেহের প্রতিশিরায় কম্পন বহিল। বলিলেন—নাও। হয়ে গেল এবার। বর-কনে ঘরে তোল।

এ কি রকম কাণ্ড—এমন ত দেখিনি কখনো। একটা উলু পর্য্যন্ত দিতে পারলে না কেউ—

কাদম্বিনী বলিলেন—ও বৌমা, দাও না গো। আমি বিধবা মানুষ—আমার যে দিতে নেই।

শুভ-বিবাহে উলু দেওয়া বিধি, এবং বিবাহক্ষেত্রে সধবা বলিতে ঐ এক মেয়ের মা। দু'তিন বার সে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে। স্বর না ফুটিয়া চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া যায়।

শিবনাথ নিস্তব্ধ পাথরের মত বসিয়া ছিলেন—হঠাৎ মহা চেঁচামেচি সুরু করিলেন—কে আছিস্ শাঁখ নিয়ে আয়; বাজনদার বেটারা বাজা এইবার। দিদি আমার বিদেয় হয়ে গেল। ওগো বৌমা, তুমি একটু উলু দাও—

পুরোহিত বলিলেন—উলু দাও, শাঁখ বাজাও—মেয়ে জামাই ঘরে তোল।

তবু চুপচাপ। হঠাৎ ইহার মধ্যে কি হইয়া গেল। সেই বিয়ের কনে—চন্দন ও অলঙ্কারে ভূষিতা চিরদিনকার সেই শান্ত লাজুক মেয়েটি অকস্মাৎ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত পিঁড়ির উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, এক ঝটকায় চেলির ঘোমটা টানিয়া দূর করিয়া দিল, বিদ্যুল্লতার মত মুখখানি জ্বলিতেছে—উষাকালের শান্ত নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বিমথিত করিয়া আরম্ভ করিল—উলু—উলু—উলু—

ধর্ ধর্। ধরে বসা। তেল-জল নিয়ে আয়। বাতাস কর। শিবনাথ আর্ত্তনাদ করিয়া আসিয়া গৌরীকে ধরিলেন; পুরোহিত, কাদম্বিনী সকলেই ধরিলেন। ধরিয়া বসায় কাহার সাধ্য—মেয়ের গায়ে যেন অসুরের বল। কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পুরানো ভাঙাবাড়ির প্রত্যেকটি অলিন্দ কাঁপাইয়া ক্রমাগত সে উলু দিতেছে—উলু—উলু—উলু—

ও খুকী, মাগো আমার—মা পাগলের মত দুই হাতে সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া একেবারে মেয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। বলিতে লাগিল—ওরে, তোমরা ধরে-বেঁধে আমার মাকে খুন করলে। আয় মা, তুই আর আমি চলে যাই...

ধপাস করিয়া গৌরী সংজ্ঞাহারার মত আবার পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

এত গোলমালের মধ্যেও বর কিন্তু অবিচল। আসন হইতে তিনি নড়েন নাই, এবং ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এইবার বিজয়ীর মত মুখ করিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন—দেখলে ত দিদিমা, ঠাণ্ডা হয়ে বসল কিনা। অনেক দেখা শুনা, তোমার এ নাতজামাই ত আজকের লোক নয়—

সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না, কাদম্বিনীরও নয়। নিশি মল্লিক বলিতে লাগিলেন—এই কাজ করে করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, জানতে কিছু বাকী আছে? সমস্ত দিন খায়নি, তার উপর এই রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল... ও অমন হয়েই থাকে। আর এই নিয়ে আপনারা কি সব আরম্ভ করে দিলেন বলুন ত।

মেয়ে তখন দিব্য জড়সড় হইয়া বসিয়াছে, ঠিক আগেকার মত। এই মেয়েই যে একটু আগে এমন করিয়া উঠিয়াছিল, ভাব দেখিয়া তিলমাত্র বুঝিবার জো নাই। দিব্য ফুটফুটে সকাল হইয়া গিয়াছে। সকলেই লজ্জিত হইয়া পড়িল।

পুরুত বলিলেন—একপাক বাসরটা বেড়িয়ে এস হে মল্লিক, রীত রক্ষা করতে হয়।

—অনেক পাকই হয়ে গেছে ঠাকুর মশায়, কিন্তু এখন অনেক কাজ—হেঁ হেঁ—মল্লিক দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গাঁটছড়া খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথের উদ্দেশে বলিলেন—একা মানুষ—জানেন ত, দাদা মশায়। কিছু মনে করবেন না। এখনই বাড়ি গিয়ে বউ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘপদক্ষেপে নিশিকান্ত অদৃশ্য হইলেন। এবং বিকালে পাল্কী লইয়া আসিয়া বধূ, বরশয্যা, গহনা ও টাকাকড়ি দেখিয়া শুনিয়া হিসাবপত্র করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনীও সেই দিন চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর চাকরটা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ঝি নীচে শুইয়া। এ ঘরে বুড়া দাদু আর ও ঘরে মা আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে খোলা জানলার সামনে দেবদারু ফল খাইতে বাদুড়ে বড় ঝটাপটি লাগাইল। মার ভয় ভয় করিতে লাগিল। উঠিয়া গিয়া খট করিয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিল।

ও ঘর হইতে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন—বৌমা জেগে আছ?

—ঘুম আসছে না।

—আমারও না। এস তাস খেলি।

আলো লইয়া শ্বশুরের শয্যার একান্তে বধূ তাস লইয়া বসিল। তাস হাতে ধরিয়াই শিবনাথ ঝিমাইতে লাগিলেন।

বধূ বলিল—বাবা টেক্কা ঘুস দিলে যে!

ঈস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে ত! চোখ মেলিয়া তাড়াতাড়ি বুড়া খাড়া হইয়া বসিলেন। হাত তুই খেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—দুত্তোর, একি হয়? আমি বাপু, খেলা দেখতে পারি—তাই আমার অভ্যাস।

ইহাদের অভ্যাস এই, অনেক রাত্রি অবধি মা ও গৌরী তাস খেলিত; শিবনাথ বধূর দিকে জুত দিবার নাম করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন। গৌরী বলিত—ও দাদু, শুয়ে পড় না—

অর্দ্ধমুদ্রিত চোখ বড় বড় করিয়া মেলিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিতেন—তোর ঘাড়ে পঞ্জা-ছক্কা না দিয়ে? ও বৌমা, বসে বসে করছ কি?

গভীর রাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িত, প্রকাণ্ড খাটের আর একধারে শিবনাথ ঘুমাইতেন। মা উঠিয়া আলো নিভাইয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইত।

শিবনাথ বলিতে লাগিল—গরবী দিদি এমন আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে গেল—আমার বড্ড রাগ হচ্ছে। আসুক সে একবার। আচ্ছা, সে এখন কি করছে—বল দিকি বৌমা।

ঘুমুচ্ছে আর কি। কাল সারারাত ত দু' পাতা এক করে নি।

শিবনাথ যেন কতকটা সান্ত্বনার ভাবে কহিতে লাগিলেন—এক হিসেবে বর নিতান্ত মন্দ হয় নি। বাড়ী ঘর, চাকর চাকরাণী, এলাক পোষাক কোন কিছুর অভাব নেই। এক বয়েসের দিক দিয়ে একটু—তা-ও এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী বয়সে মানষে বিয়ে করছে—

বধূ কিন্তু সায় দিতে পারিল না, চুপচাপ রহিল। শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—কিছু বলছ না যে বৌমা?

মৃদু স্বরে বধূ কহিল—কি আর হবে?

শিবনাথ রুখিয়া উঠিলেন। কি হবে, মানে? ভেবে দেখ দিকি, মন্দটা কি! আমি ত বলি, ও নবনীধনের চেয়ে ভালই হয়েছে। গরবী দিদিও মনে মনে বুঝে দেখেছে তাই। ভারী চালাক মেয়ে। আজকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে পাল্কীতে উঠে বসল। আমি ভেবেছিলাম, কত কাঁদাকাটা করবে। একবার টুঁ শব্দটা করলে না—

এক পক্ষেরই কথা চলিতেছে, বধূ নিরুত্তর।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিতে লাগিলেন—যা ভয় হয়েছিল আমার। তুমি দেখ বৌমা, নিশি আমার দিদিকে কি রকম যত্ন করবে। তিন তিনটে বৌ গিয়েছে, এবারে রাঙা বৌ পেয়ে ধিন ধিন করে কাঁধে তুলে নাচাবে। তুমি দেখো—

বলিয়া নিজের রসিকতায় হা হা করিয়া নিজেই হাসিয়া আকুল।

বধূ ধীরে ধীরে উঠিয়া দোর ভেজাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

আরো কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। আলো নিভিয়া ঘর অন্ধকার। ডাকাডাকিতে শিবনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বধূ পা ধরিয়া নাড়াইতেছে, আর ডাকিতেছে।

বাবা! বাবা!

শিবনাথ তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিলেন।

—শুনতে পাচ্ছ?

—কি?

হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া শ্বশুরকে বধূ নিজের ঘরে জানালার দেবদারু গাছের কাছে লইয়া আসিল।

শুনতে পাচ্ছ না, ঐ কে যেন উলু দিচ্ছে?

শিবনাথ বলিলেন—না-তো—

—শোন। মা আমার এসেছে···ঢুকতে পারছে না, বাইরে বাড়ির ফটকের ঐখানে উলু দিচ্ছে। ভাল করে কান পেতে শোন দিকি—

এমনি সময়ে আবার একঝাঁক উলু উঠিল। অনেক দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি রাত্রির বুক কাটিয়া কাটিয়া আসিতেছে—

উলু—উলু—উলু!

—যাচ্ছি দিদি। উন্মাদের মত আকাশ-ফাটানো কণ্ঠে শিবনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এক লাফে দুই তিন ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড দু'টি মহল পার হইয়া ছুটিয়া চলিলেন। পিছনে পিছনে মা-ও ছুটিল। ফটক খুলিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, গৌরী। একটা গাছের উপর অজস্র জোনাকী পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, তাহারই তলায় ছোট ছোট অজস্র ঝুপ্‌সি গাছ। তার মাঝখানে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া গৌরী ক্রমাগত উলু দিয়া যাইতেছে—উলু—উলু—উলু।

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্ত মল্লিকও উপস্থিত। বলিলেন—দিনমানে খাসা ভাল মানুষ—কোন গোলমাল নেই। সন্ধ্যার থেকেই ক্ষেপে উঠল। উলু দেয় আর ছুটে ছুটে বেড়ায়। কালরাত্রি বলে আমার আবার সামনে যাবার জো নেই। মেজ খোকা, খুদি আর চারুকে বলে দিলাম। তা ওদের কাজ? জোরজার করে ধরে শুইয়ে দিয়েছিল। কখন পালিয়ে এসেছে। সকাল বেলা উঠে—খোঁজ—খোঁজ।

একটু পরেই পাল্কী-বেহারা চলিয়া আসিল।

শিবনাথ মিনতি করিয়া বলিলেন—আমাদের এখানে ক'দিন রেখে যাও দাদা, আমরা সুস্থ করে তারপর পাঠিয়ে দেব—

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিশিকান্ত বলিলেন—মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আজকে ফুলশয্যে, তারপর বউভাত। জ্ঞাতির পাতে দুটো ভাত দেব, মনন করেছি···বিয়ে ত ঐ রকমে হল, এর পরে একেবারে কিছু না করলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে—

শিবনাথ বলিলেন—নিতান্ত আজকের দিনটে। ওর মনটা একটু ভাল হয়ে যাক। নাতজামায়ের হাত দু'খানা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার ত সেই থেকে গা কাঁপছে, দাদা। সমস্ত রাত ও ঘুমোয় নি, কেউই ঘুমোয় নি। এখন একটু ঘুমোচ্ছে। আজকে থাক্, কাল নিয়ে যেও।

মল্লিক মুখ কালো করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বলিলেন—তাই আমি সেদিন কিছুতে রাজী হচ্ছিলাম না। চুণ-কালি আমার মুখে ভাল করে পড়ুক গিয়ে। আজকে ফুলশয্যে, নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন হয়ে গেছে—আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে—

বিরস মুখে শিবনাথ কহিলেন—তবে নিয়ে যাও।

ঘুম হইতে মেয়েকে ডাকিয়া তোলা হইল। সকলকে প্রণাম করিয়া শান্তভাবে গৌরী পাল্কীতে গিয়া বসিল। নিশিকান্ত তখন ভরসা দিয়া বলিলেন—কিসসু ভাবনা করবেন না, দাদা মশাই। আপনারা জানেন না তাই, আমার বিস্তর দেখা আছে। কালত আমি দেখাশুনো করতে পারিনি—এখন থেকে নিজে দেখব, যত্ন-আত্তি করব, দরকার হয় ডাক্তার দেখাব—ভয় কি? শাশুড়ী ঠাকরুণকে বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু চেষ্টা যত্ন এবং নিশিকান্তের নিজের দেখা সত্ত্বেও ঠিক আগের রাত্রির মত উলু পড়িতে লাগিল। এবং এদিন একেবারে অন্দরের উঠানের উপর সেই দেবদারু গাছটির গোড়ায়। গলায় ফুলের মালা, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড়ে-চোপড়ে এসেন্সের সুগন্ধ; বাতাস সেই গন্ধে সুরভিত হইয়াছে, ফুলের শয্যা হইতে পলাইয়া রাজরাজেশ্বরী দেবদারুর ডাল ধরিয়া কলকণ্ঠে যেন সুমস্ত নিশীথিনীর কানে উলুধ্বনি করিতেছে।

উলু—উলু উলু !

—খুকী, খুকী !

যেন তার সম্বিৎ নাই, যেন সে আর কোন জগতে চলিয়া গিয়াছে। ধরিয়া আনিয়া গৌরীকে শোয়ান হইল। তারপর আর কোন গোল নেই, চুপ করিয়া সে ঘুমাইতে লাগিল।

শিবনাথ চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—উঠোনে এল কি করে বৌমা!

বধূ বলিল—ফটক আমি খুলে রেখেছিলাম।

—তুমি কি জানতে?

—আমার মন ডেকে বলেছিল। ভাবলাম, যদি আসে, সেকি আমার পথে দাঁড়িয়ে থাকবে!

পরদিন পাল্কী বেহারা সহ নিশিকান্ত যথারীতি দর্শন দিলেন। মুখখানা হাঁড়ির মত। বলিলেন—এই করে নিত্যি আমার পাল্কী-ভাড়া লাগছে পাঁচ সিকে। প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে, রাতবিরেতে বউ ঝি এই একমাইল পথ পায়ে হেঁটে আসবে—এই বা কি রকম?

শিবনাথ বলিলেন—ও ত সহজ বুদ্ধিতে আসেনি। দিদি আমার তেমন মেয়ে নয়।

নাত-জামাই গর্জ্জাইতে লাগিলেন—না, বজ্জাতের হাঁড়ি। আমি জেগে আছি। বলে, বাইরে থেকে আসছি। তারপর চোঁ-চা ছুট। আমি আর রাগ করে এলাম না। এ রকম ব্যাধি ত কোন পুরুষে শুনিনি। সমস্ত ঢং মশায়, বাপের বাড়ি আসবার ছুতো। কিন্তু যাবে কোথায়, আমিও তিন তিনটে বউ সায়েস্তা করেছি।

এই বিষয়ে এককালে মল্লিক মহাশয়ের সুনাম রটিয়াছিল বটে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মেয়ের মা ও শিবনাথ দু'জনেই শিহরিয়া উঠিলেন। এতদিন পরে মা আজ জামায়ের সঙ্গে প্রথম কথা কহিল।

—না বাবা, ছুতো ধরবার মেয়ে নয়—স্বর কাঁপিতে লাগিল, কথা আর ফুটিতে চায় না, তবু বলিতে লাগিল—সমস্ত সেরে যাবে বাবা, তুমি একটু দৃষ্টিমুখ দিয়ো। ও আমার বড় শান্ত মেয়ে—

পরম কৃতার্থ হইয়া জামাতা পায়ের ধূলা লইলেন। এক-মুখ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। মন্তর পড়ে বিয়ে করেছি—চালাকী কথা নয়—। যা করতে হয় আমি করব। কিছু ভেব না মা, মেয়ে তোমার ঠিক হয়ে যাবে। দুটো দিন সবুর কর—

ভক্তিমান জামাই পুনশ্চ শাশুড়ী ও দাদাশ্বশুরের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল।

শিবনাথ বলিলেন—আজকেও কি ফটক খুলে রাখবে বৌমা?

বৌমা জবাব দিল না, কিন্তু ফটক সে খুলিয়া রাখিল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে জানালায় দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, শেষ-রাতের চাঁদের আলো তেরছা হইয়া ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল, শিয়ালের দল শেষ ডাক ডাকিয়া চুপ করিল, তখন শিবনাথকে ডাকিয়া বলিল—বাবা, উলু কিছু শুনতে পাও?

কান পাতিয়া দু'জনে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। জগতের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও বুঝি থামিয়া গিয়াছে, এমনি গভীর নিদারুণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন—গরবী দিদি এতক্ষণ বরের কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চল চল বৌমা, আর কোন ভয় নেই···

দিন সাত-আট কাটিয়া গেল, সত্যই কোন গোল নাই। নিশিকান্ত বহুদর্শী লোক, রাগ মানাইবার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করিতে হয়। ইতিমধ্যে ঝি গিয়া দিন তিনেক খবর আনিয়াছে। প্রথম দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, দিব্য সে হাসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, চুপি চুপি বলিয়াছিল—দাদুকে বলিস, নিয়ে যেতে···। কিন্তু তা হইবার জো নাই; বউভাত হয় নাই, এবং কবে যে সে শুভক্ষণ আসিবে, তাহাও নিশিকান্ত ঠিক করিয়া বলেন না। তারপর আরও দু'দিন গিয়াছে, কিন্তু জামাই দেখা হইতে দেন নাই। শেষের দিন চটিয়াই আগুন। বলিয়া দিলেন—নিত্যি নিত্যি তোমরা শত্রুতা সাধতে কেন এস, বল দিকি?

ঝি অবাক।

জামাতা বলিতে লাগিলেন—বাপের বাড়ির কুটোগাছটা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, আর তুমি ত আস্ত মানুষ একটা। ওষুধ-পত্তর হচ্ছে—নিজেরা রাত-দিন লেগে পড়ে আছি, প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, তোমরাই এসে গোল বাধাও। কিন্তু আর বিশেষ গোলমাল নেই—বাড়িতে ব'লো।

খবর শুনিয়া শিবনাথ নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—ও বৌমা, মিছিমিছি আর ফটক খুলে রাখ কেন? আঁব দুধ মিশে গেছে—আঁটি এখন তল। দেখলে? নাতজামায়ের আমার চেষ্টার কসুর নেই। আহা-হা, চিরজন্ম বেঁচে থাক। কিন্তু শালীর আক্কেলটা দেখ, নতুন বর পেয়ে বুড়োটাকে একদম ভুলে গেল। না আসতে পারিস, এক আধ ছত্র চিঠি লিখেও ত খোঁজ নেওয়া যায়।

মনের আনন্দে হাসিয়া বুড়া ছাদ ফাটাইতে লাগিলেন।

পরের দিন সকালবেলা শিবনাথ উঠিয়া খাটের উপর বসিয়াই গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। বধূ আসিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—বাবা, খুকী এসেছে।

এসেছে? গুড়গুড়ি ফেলিয়া শিবনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—অ বৌমা, পাল্কী করে এসেছে ত? নইলে নাতজামাই রেগে যাবে।

—দেখ সে এসে। বলিয়া উন্মাদিনীর মত বধূ শ্বশুরের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। নীচে গিয়া চেঁচাইতে লাগিল—ওরে, কে কোথায় আছিস্—ছুটে আয়। মা আমার ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে।

ঝি ও চাকর ছুটিয়া আসিল। রাস্তার উপর তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফটকের গা ঘেঁসিয়া ফুটন্ত চাঁপার গুচ্ছের মত গৌরী এলাইয়া পড়িয়া আছে। ছিন্ন বেশ, রুক্ষ আলুথালু চুল, পিঠের ও হাতের কাপড় সরিয়া গিয়াছে, তাহার আগাগোড়া ব্যাপিয়া বড় বড় রক্তের রেখা। সোনার অঙ্গে নির্ম্মম হাতে বেত মারিয়াছে, চামড়া কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে, চাপ চাপ রক্ত জমিয়াছে।

রাস্তার লোক একজন মন্তব্য করিল—পশু!

মা কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়া সেইখানে—রাস্তার উপর আছড়াইয়া পড়িল।—মা আমার, আজ কি গয়না পরে এলি?…ও বাবা, তুমি আমায় ফটক খুলতে মানা করতে, মা আমার সমস্ত রাত এইখানে রয়েছে, কত ডেকেছে,…কালঘুম ঘুমিয়ে ছিলাম।

অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ধরাধরি করিয়া আনা হইল। ডাক্তার আসিল। নিশি মল্লিকের কাছে খবর গেল, রাগ করিয়া তিনি আসিলেন না। বেলা প্রহর দেড়েকের সময় রোগিনীর জ্ঞান ফিরিল। জর খুব বেশী, চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল। চোখ মেলিয়াই সে লাফাইয়া উঠিতে যায়। তারপর প্রলয়ের কণ্ঠে—উলু—উলু—উলু!

বিকালের দিকে গৌরী ঘুমাইল। ডাক্তার বলিলেন—বিকারে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। কিন্তু ওষুধে কাজ হয়েছে। একটু কমেছে। আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু খুব সাবধান।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কাটিয়া গেল, গৌরী শান্ত চোখ দুটি বুঁজিয়া তেমনি ঘুমাইতেছে। মা ভয়ে ভয়ে একবার নাকের কাছে নিঃশ্বাসের স্পর্শ লন। তারপর একবার বার্লি তৈয়ারীর জন্য রান্নাঘরে গেলেন। কেহই নাই। হঠাৎ উলু—উলু—উলু—

বিছানা ছাড়িয়া গৌরী উঠিয়াছে। রুক্ষ এলায়িত চুলের বোঝা। কবে কখন সিন্দুর পরিয়াছিল, তাহার রেখাটি কপালের উপর জ্বলজ্বল করিতেছে। রক্তের রেখা নিটোল শুভ্র অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া গিয়াছে। অসম্বৃত বেশভূষা। নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া পুরানো বাড়ির কক্ষে কক্ষে ঝঙ্কার তুলিতেছে—উলু-উলু-উলু।

ধর্ ধর্—

কে তার সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে? ধরিতে গেলে সেই অপরূপ রূপে খিল খিল করিয়া সে ছুটিয়া পলায়। বেলাশেষে সূর্য্য আকাশপ্রান্তে নামিয়া আসিয়াছে, বেড়ার ধারে সন্ধ্যামণি ফুটিয়া উঠিল, হাওয়ায় ঝুর ঝুর করিয়া দেবদারু পাতা ঝরিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখার মত নাচিয়া নাচিয়া সে উঠানময় ঘুরিতে লাগিল; যেখানে সামিয়ানার নীচে বিয়ের বাসর রচিত হইয়াছিল, পায়ের আঘাতে সেই শুকনো শতচ্ছিন্ন ফুল উড়াইতে লাগিল।

আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া, বাড়ীর প্রতি কক্ষ, অলিন্দ, প্রত্যেকখানি ইট স্পন্দিত করিয়া অশ্রান্ত কণ্ঠের অবিরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল—উলু-উলু-উলু—

বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী চোখ বুঁজিল।

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

আমাদের নারীপ্রগতি ঃ

অতীত ও বর্ত্তমান

অনেক দিন ধরিয়া আমরা গতানুগতিকতার সুনির্দ্দিষ্ট বাঁধা রাস্তা দিয়া চলিয়াছি এবং পূর্ব্বপুরুষের কৃতকার্য্যের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি করিতে পারাকে পরম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছি। মনুষ্যত্ব যে তদুপরি আর অগ্রসর হইতে পারে, একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতির চেষ্টাকে শাস্ত্রানুশাসন, সামাজিক শাসন ও নরকের ভয় প্রদর্শনের দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং ইহাতেই ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা পাইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

যে সকল দেশ পাশ্চাত্য নহে, পৃথিবীর এমন অনেক অংশে বহু প্রাচীনকালে মানব-সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। যে কারণেই হউক, এই সকল সভ্যতার প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যখন ইহাদের অবনতি ঘটিতে লাগিল, এই সকল সভ্যতার উত্তরাধিকারীরা যখন দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের দ্বারা উন্নতি আর সম্ভব হইতেছে না, এমন কি, পূর্ব্বতন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার শক্তিই তাঁহাদের নাই, তখন স্বভাবতই অতীত গৌরবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং প্রাচীন আদর্শের মহিমান্বিত চিত্র লোকের সম্মুখে ধরিয়া অতীত ঐশ্বর্য্যকে নষ্ট হইতে না দিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিল।

কিন্তু, কোন জাতির মধ্যে সৃষ্টিপ্রতিভার যখন অভাব ঘটে এবং তাহার উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন পূর্ব্ব উন্নতিকে ধরিয়া রাখিবার উদ্যম এবং শক্তি সে হারাইয়া ফেলে, এবং বস্তুহীন খোসা ও অর্থহীন আচারকে প্রাচীন গৌরবের প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লওয়া তখন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে নিতান্ত দুর্গতির অবস্থা বলিতে হইবে। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুর্গতি ভোগ করিয়াছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত যখন আমাদের দেখা হইল, তখন ইহা প্রচুর শক্তি ও উদ্যমের পাথেয় লইয়া নবীন তেজে সমগ্র বিশ্বগ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। এই শক্তি ও বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাত আমাদের অনেক দিনের সুপ্ত ও নিশ্চেষ্ট মনকে সজোরে নাড়িয়া দিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রভাবকে আমরা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না। এই দেশে ইংরেজের রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ জাতির সাহিত্য ও সমাজের সহিত আমাদের অনেক দিন ধরিয়া নিকট সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের সকল প্রগতি-চেষ্টার মূলে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের নারী-প্রগতির মূলেও এই প্রেরণা। ইংরেজের সাহিত্য ও সমাজের সংস্পর্শ হইতেই আমাদের দেশে নারী-প্রগতির সূচনা বলিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নারী-জাগরণ প্রথম আরম্ভ হয়।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক প্রগতি এবং চিন্তার স্বাধীনতার জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজের নিকট, (এসম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা অপেক্ষা অনেক অধিক) ঋণী। আমরা একদিকে যখন ইঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছিলাম ও গালাগালি দিতেছিলাম, তখন, নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইঁহাদের চিন্তা ও ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছিলাম, এবং সকল দিকে ইঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতেছিলাম। বাংলা দেশে ব্রাহ্মদের সংখ্যা যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, তাহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সংস্কার-সমূহ হিন্দু থাকিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

এদেশে আধুনিক নারী-স্বাধীনতার আদর্শও প্রথমে ব্রাহ্মরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিত হিন্দুরাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সে দিন দেশের জনসাধারণের যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অনেকদিন ধরিয়া এই আদর্শ সমাজের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষিত লোকেরা প্রধানত সহরেই থাকিতেন এবং চিন্তায়, কার্য্যে ও আচার-ব্যবহারে জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের কোনও সম্পর্ক থাকিত না। ইঁহাদের প্রগতি-মূলক মনোভাব দেশের লোকের

চিত্তে কতকটা প্রভাব বিস্তার ও ঔৎসুক্য সঞ্চার করিতে যদিও সক্ষম হইয়াছিল, তবুও এই কারণে, ইহার প্রত্যক্ষ কোনও ফল দেশের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। ইঁহাদের প্রভাব বিশেষ ফলদায়ক না হইবার আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, ব্রাহ্মদের একটা আদর্শ ও সত্যলাভের প্রেরণা থাকিলেও, যে সকল হিন্দু সংস্কারের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ করিয়াছিলেন প্রয়োজনের তাড়নায় বাধ্য হইয়া এবং অপর কেহ কেহ করিয়াছিলেন, কতকটা ফ্যাশানের খাতিরে। পশ্চাতে কোন একটা বিশেষ সত্যের প্রেরণা না থাকায়, এই আদর্শকে প্রচার করিবার, বা ইহা লইয়া বিশেষ কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হয় নাই।

সকল দিক বিবেচনা করিলে, এই সময়ে নারীপ্রগতির প্রকৃতি বিশেষ সরল ছিল বলা যাইতে পারে। কারণ বর্ত্তমান নারী-প্রগতির সহিত সম্পর্কিত অধিকাংশ সমস্যা জীবিকা ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা হইতে উদ্ভূত। যাঁহারা সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বলিয়া, তখন এই সকল সমস্যা দেখা দেয় নাই।

আমাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের নারীপ্রগতির ইতিহাস এই প্রকার ক্ষীণ, শান্ত ও বৈচিত্র্যহীন ছিল। কিন্তু, লোকচক্ষুর অন্তরালে, ধীরে এবং নিশ্চিতভাবে দেশে বিস্তৃততর বহু সমস্যাসঙ্কুল নারী-স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। সর্ব্বসাধারণের বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল, এবং ফলে স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটিতেছিল। ইত্যবসরে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রকার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ইহার মধ্যে আমাদের সামাজিক দোষ-ত্রুটির বিষয় সমূহ নানাভাবে প্রতিফলিত হওয়ায়, আমাদের সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গত আচরণ ও প্রথার বিরুদ্ধে লোকের মন অনেকটা সজাগ হইয়া উঠিবার নূতন সুযোগ পাইল।

নূতন যুগ আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন লইয়া আসিল, তাহাও আমাদের সামাজিক পরিবর্ত্তনে এবং আমাদের মনের প্রসারতা সম্পাদনে কম সহায়তা করে নাই। শিক্ষা-বিস্তারের সহিত এবং বিদ্বজ্জনোচিত কর্ম্ম-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হইবার সহিত শিক্ষিত লোকদের অনেকের গ্রামে থাকিবার প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বে বিদেশ-বাসী প্রগতিশীল অনেক পরিবার আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে ক্রমে সহরের আবহাওয়া গ্রামে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সহরের সহিত গ্রামের যোগ অন্য দিক দিয়াও ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। জীবন-সংগ্রাম পূর্ব্বে অনেক সহজ থাকায়, লোকের গ্রামে থাকিলেই চলিয়া যাইত; জীবিকার জন্য অল্প লোকেরই গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু জীবিকার্জ্জনের প্রতিযোগিতা বাড়িয়া যাওয়ায়, কার্য্যোপলক্ষে এবং কার্য্যের চেষ্টায় অনেককেই সহরে আসিতে হইতে লাগিল। ইহাতে পল্লী-অঞ্চল সহরের পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিল না। দেশে যাতায়াতের সুবিধা বাড়িয়া যাওয়ায় স্থানের দূরত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইল এবং সহর ও পল্লীর ক্রমবর্দ্ধমান সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবার পক্ষে অবস্থা অধিকতর অনুকূল হইল।

কিন্তু, আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই অন্য সকল প্রকার উন্নতিমূলক চেষ্টার ন্যায় নারীপ্রগতিকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। যে কোন ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই হউক, মানুষের মন স্বাধিকার-লাভের জন্য একবার যখন জাগ্রত হয়, তখন সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসঙ্গতির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে এবং এ সকলের সম্পূর্ণ প্রতিবিধান না করিয়া সে শান্ত হইতে চাহে না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন, দেশের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং গতানুগতিক জীবন-যাত্রাকে অস্বীকার করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতে পারিবার যে সাহস আনিয়া দিয়াছে সেই মনোভাব এবং নূতনকে গ্রহণ করিতে পারিবার সেই সাহস আমাদের সামাজিক গতানুগতিকতাকেও নিশ্চিন্তে থাকিতে দিতেছে না।

তদ্ব্যতীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজ গতির মধ্যে যে সকল ধাপ অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তাহা উল্লঙ্ঘন করা সহজ হইয়া পড়ে। গত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনগুলিতে যে সকল নারী যোগদান করিয়াছিলেন, অন্য কোনও প্রকারে তাঁহাদিগকে অবরোধের বাহিরে আনয়ন করা হয়ত সম্ভব হইত না।

এই সুযোগে আমরা আরও একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করিলাম। এতদিন আমরা পুস্তকপত্রিকাদিতে পাঠ করিয়া আসিতেছিলাম যে, নারীরাও বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, জাতির নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্যে পুরুষের ন্যায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, এবং দেশের বিপদের সময় তাঁহাদের কর্ম্মশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া জাতি বাঁচিতে পারে না। কিন্তু, আমরা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমাদের নারীদেরও শক্তি আছে, তাঁহাদিগকে আমরা যতটা 'অবলা' মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, আমাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা এবং নিখুঁত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, তাঁহারা ততটা অবলা হইয়া পড়েন নাই, আমাদের ন্যায়ই বিঘ্নবিপদের সম্মুখীন হইবার সাহস ও সামর্থ্য তাঁহাদের আছে এবং বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগিতা তাঁহাদের পুরুষদের অপেক্ষা কম নহে। নারীদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু এই অবস্থা আমাদের সমাজ-জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। এই সময় নারীদের মধ্যে যে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং উদ্যম দেখা দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমাদের দেশে নারীস্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে যতটা আশান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকটা নিরাশ হইতেও হইয়াছে। কারণ, যাঁহারা আগ্রহ, উদ্যমের সহিত এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তৎপরতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই পুনরায় অবরোধের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাহিরের জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক হইয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, নারী-স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অথবা নারীর প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় স্বরূপে তাঁহারা ইহা করেন নাই। দেশাত্মবোধের যে দুর্নিবার প্রেরণা সেদিন সমস্ত দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহা পুরুষ নারী নির্ব্বিচারে সকলকেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, সেদিন যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সম্মুখের কোন বাধা তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এইজন্য অবরোধও নারীদের অনেকের পথে এই সময় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। কিন্তু, এই আন্দোলন থামিয়া যাইবার পর, ইঁহারা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে এই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই বা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহা হইলেও বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে নারীদের যোগদান আমাদের গতানুগতিক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আদর্শকে কঠোর ভাবে আঘাত করিয়াছে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র দেশব্যাপী হওয়ায় এবং ইহার কেন্দ্রগুলি সহর ও পল্লী সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহার ধাক্কা আমাদের সমাজের মূলদেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মেয়েদের বাহিরে চলাফেরা শিক্ষা ও নানাবিধ কার্য্য ও ক্রীড়া প্রভৃতিতে যোগ দিবার আগ্রহ যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহার মূলেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে।

আমাদের অনেক নারী ও পুরুষের মনে নারীপ্রগতির জন্য অনেক দিন হইতে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও নীতিতে পরিচালিত বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রূপ নিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহা নারী-জাগরণকে অনেকটা সাহায্য ও অগ্রসর করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানের অনুকূল ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করিবার পক্ষে বর্দ্ধিত সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের সমবায়ে বর্ত্তমানে নারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অগ্রবর্ত্তিতা ও অধিকার লাভের জন্য যে আগ্রহ জাগিয়াছে, অতীতের সহিত দুইটি স্থানে তাহার বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে।

পূর্ব্বে নারীপ্রগতির বিশিষ্ট সমর্থকেরাও নারীদের স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝিতেন, তাহাকে পুরুষদের অধীনতা এবং তাঁহাদের উপর নির্ভরতার কতকটা উন্নত, মার্জ্জিত ও ভদ্রোচিত সংস্করণ বলিতে পারা যায়। সুনির্দ্দিষ্ট বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ এই স্বাধীনতায় নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা হইলেও, এই পথে অজানা পথের বিপদ ও শঙ্কা বিশেষ কিছু ছিল না। সেই জন্য যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী-জাগরণ প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, সে সম্প্রদায়ের পুরুষদের মনে, সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উদ্বেগ দেখা দেয় নাই। যাঁহারা ইহা পছন্দ করিতেন না, তাঁহারা এই প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপাদি করিতেন বটে, কিন্তু, তাঁহাদের বিরুদ্ধতা ইহার অধিক আর অগ্রসর হয়

ই। নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি-স্তর উন্নয়ন, তাঁহাদিগকে শিক্ষিত পুরুষদের যোগ্য সহধর্ম্মিণী, মা-ভগিনী বা পরিবারভুক্ত লোক করিয়া তুলিবার চেষ্টা ভৃতি এইরূপ ধরণের কার্য্য, সে সময়ের নারীপ্রগতির লক্ষ্য ল। এককথায় সংসারের এবং বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া খিতে গেলে পুরুষের নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের অধিকতর উপযোগী রিয়া তুলিবার ইচ্ছাই সেদিনকার নারীপ্রগতির অন্তরালে কিয়া কার্য্য করিয়াছিল।

অনেক সময় সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমরা তাহাকে ব রাখিতে পারি, কিন্তু, অর্দ্ধেক মাত্র স্বীকার করিয়া হাকে একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রাখিতে পারি না। জের শক্তিতে পথ করিয়া নিয়া, সে শীঘ্রই আমাদের সমস্ত ত্ত অধিকার করে এবং পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়। পুরুষের হিত সর্ব্ববিষয়ে নারীর সমান অধিকার ও তুল্য স্বাধীনতা ইবার যে দাবী আছে, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্পষ্ট ছা দ্বারা নারী-আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তারা অনুপ্রাণিত হইলেও, তাঁহাদের চেষ্টা ও কার্য্যের ফলেই বর্ত্তমানকালের রীরা এই সত্যকে স্বীকার ও গ্রহণ করিবার শক্তি এবং হস লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানের নারীপ্রগতির মূলধারাটি অতীত হইতে এই নে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহার আনুসঙ্গিক ান্য উপযোগিতা ও উপকারের কথা বর্ত্তমানে গৌণ হইয়া ড়য়াছে এবং মেয়েদের সর্ব্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভের চেষ্টাই ইহার প্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয় হইয়াছে।

অতীতের সহিত ইহার দ্বিতীয় গুরুপ্রভেদ এই হইয়াছে বর্ত্তমানে শুধু মাত্র শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা বদ্ধ নাই। ইহা সমগ্র শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ বলিতে গেলে শার নারী-সাধারণের মধ্যেই স্বাধীনতা এবং সামাজিক বনের জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে।

নারী-প্রগতির এইরূপ পরিবর্ত্তনের সহিত অনেক নূতন স্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহার সমাধানের জন্য নূতন র্যপন্থা অবলম্বনের ও এই নূতন ভাবের প্রতি সুবিচার রিবার জন্য আমাদের মন এবং বুদ্ধিকে প্রস্তুত করিবার য়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

নারীদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যাইবে, তাঁহাদিগের আর্থিক স্বাধীনতার, তাঁহাদের নূতন অবস্থার উপযোগী কর্ম্ম যোগাইবার কি করা যাইবে ইত্যাদি প্রশ্ন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী তীব্র হইয়াছে। কিন্তু, পুরুষদেরও অতি সামান্য সংখ্যক লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা অথবা উপযুক্ত কার্য্যের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিয়াছি। নারীরা যতদিন প্রকাশ্য-জীবনের অন্তরালে ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের সমস্যাকে সমগ্র দেশের সমস্যা বলিয়া আমরা মনে করি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সকল সমস্যা চিরদিনই ছিল, যদিও, পূর্ব্বে এ সকল দিকে আমাদের মনোযোগ যথোপযুক্তভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, পুরুষদেরই যখন কাজ জুটিতেছে না, তখন নারীদের আবার এই প্রতিযোগিতার মধ্যে লইয়া আসিলে অবস্থা জটিলতর হইবে। কিন্তু নারীদের প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখায় যদি দেশের সকল পুরুষই কাজ পান, এবং তাহা হইতে আমরা মনে করি যে, বেকার-সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে, কোনও অপ্রীতিকর ব্যাপারকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে যে ভুল করা হয়, আলোচ্য ক্ষেত্রেও সেই ভুল করা হইবে। কারণ, দেশের সকল কর্ম্মক্ষম লোককে কাজ দিতে পারিলেই তবে, বেকার-সমস্যার সমাধান হইল, বলিতে পারা যায়। নারীরা জনশক্তির অর্দ্ধাংশ, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত কাজ দিতে না পারিলে, জাতির কর্ম্ম-শক্তির অর্দ্ধভাগ বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হইয়া রহিল।

ঘরের কাজকর্ম্ম এবং রান্নার ফর্দ্দ বাড়াইয়া অথবা বাজার ও ধোবার হিসাব রাখিবার বা ছেলেদের জামা তৈয়ারী এবং অতিথি পরিচর্য্যার ভার তাঁহাদের উপর দিয়া যদি আমরা মনে করি মেয়েদের শক্তিকে প্রকৃত ক্ষেত্র দান করা হইল, তাহা হইলে, তাহাতে আমাদের বিবেক শান্ত থাকিতে পারে, এবং নারীদের মধ্যে কর্ম্মাভাবের জন্য অসন্তোষ না জাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রকৃত সত্যকে আবৃত করিয়া রাখা হইবে।

মেয়েরা স্বাধীন হইলে ও কর্ম্মপ্রার্থী হইলে, বর্ত্তমানে যত পুরুষ কাজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কাজ পাইতেন না, একথা নিশ্চিত। কিন্তু, মেয়েরা বাহির হইতে আসেন নাই। তাঁহারা আমাদের দেশের, সমাজের এবং পরিবারের লোক।

কাজেই, বর্ত্তমানে যতজন পুরুষ কাজ করিতেছেন, পুরুষ ও মেয়ে মিলিয়া ততজনে কাজ পাইলে জাতি বা সমাজের দিক দিয়া কোনও ক্ষতি হইত না এবং বর্ত্তমানে কর্ম্মক্ষম মেয়েরা কাজ না পাওয়ায় জাতির যে ক্ষতি হইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা কিছু কমিয়া, পুরুষ-বেকারের সংখ্যা ঠিক সেই পরিমাণে মাত্র বাড়িলে, জাতির ক্ষতি একই প্রকার হইতে থাকিবে। মেয়ে ও পুরুষ উভয়কে লইয়া আমাদের পরিবার গঠিত বলিয়া, বর্ত্তমানের কর্ম্মনিযুক্ত পুরুষ ও বেকার মেয়েদের মিলিত প্রচেষ্টায়, আমাদের পরিবারগুলির গড় আর্থিক অবস্থা যাহা আছে, কিছু পুরুষ কর্ম্মচ্যুত ও সেই পরিমাণ মেয়ে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইলে, পরিবারগুলির গড় অবস্থা তাহাই থাকিবে।

কাজেই সমগ্র দেশের শিক্ষা, জীবিকাসংস্থান প্রভৃতির সহিত নারীদেরও এই সমস্যা জড়িত এবং তাহার সমাধানের উপরই এ সকলের সমাধান নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য প্রচুর সময় ও চেষ্টার প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু নারীদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা অধুনা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সম্মুখে তীব্রতর সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। আমাদের এই উভয়বিধ জীবনে এই নবজাগ্রত ভাবকে কি ভাবে উপযুক্ত স্থান, গুরুত্ব, আনুপাতিক মর্য্যাদা ও সমতা দান করা যাইবে তাহাই কিছু লোকের চিন্তা এবং বহু লোকের আশঙ্কার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

নারীদের শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় যদিও বা কিছু ধীরগতি কর্ম্মপন্থা ও বিলম্ব করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত স্বাধীনতা ও সুযোগ দানে বিলম্ব করিতে গেলে, আমাদের সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হইবার, অন্তর্বিরোধ ও অসামঞ্জস্য বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে।

ইহার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে দৈনন্দিন জীবনে নারীদের গতিবিধির স্বাধীনতা দান করা এবং অবরোধ প্রথা যে ভাবে এবং যে আকারেই থাকুক সর্ব্বপ্রকারে এবং সকল ভাবে তাহার উচ্ছেদ সাধন করা। মেয়েদের বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান-গ্রহণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের শিক্ষায় আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তদপেক্ষাও তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইতেছে প্রাত্যহিক জীবনে মুক্তিলাভ। কারণ এখানেই তাহার স্বাধীনতাকে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বতোভাবে বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম সকল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রযত্নে অস্বীকার করা হইয়াছে। যেখানে চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা নাই, কথা বলিবার স্বাধীনতা নাই, মুখ অনাবৃত করিবার স্বাধীনতা নাই, নিজের শত দুঃখ-কষ্টের কথাও যেখান হইতে কাহাকেও জানাইবার স্বাধীনতা নাই, বাহিরের জগৎ হইতে যেখানে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, পরিবারের (অর্থাৎ পরিবারস্থ পুরুষদের) সুখসুবিধার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া নারীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠার বাধ্যতা যেখানে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে তদপেক্ষা বড় কারাগার আর কি হইতে পারে, ইহার চেয়ে অধমতর দাসত্ব আর কোথায় থাকিতে পারে? মানুষের পক্ষে অধিকতর অপমানকর, মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে অধিকতর বিঘ্নকর ব্যবস্থা আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে? কাজেই বর্ত্তমান নারীপ্রগতির সর্ব্বপ্রধান কাজ হইতেছে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

অতীতে নারীপ্রগতির লক্ষ্য ছিল, কোন বিশেষ বিষয়ে তাহাকে উপযোগী করিয়া তোলা আর বর্ত্তমানে ইহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে এই বন্ধন অস্বীকার করা। তাই যখনই আমরা বলি, আধুনিক মেয়েদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, বাহিরে চলাফেরাতেই তাহার শেষ হইতেছে, পুরুষের সহিত পাল্লা দিবার ইচ্ছা ব্যতীত তাহার মধ্যে আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য দেখিতে পাইতেছি না, তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে এই কথা স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের নারী-আন্দোলনের মধ্যে এতদিন পরে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য দেখা দিয়াছে।

এই ভাবকে সহজে অগ্রসর হইতে দেওয়া এবং নারীকে গৃহ ও পরিবারে পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, অনেকটা আমাদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও মানুষের প্রতি সহানুভূতিবোধের উপর নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা হইতেছে এইখানে। ইহার ফল যে ভাল হইবে না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ইউরোপের সামাজিক অবস্থাকে নজীর স্বরূপে প্রায় সকলেই আমরা উপস্থিত করিতেছি।

আমাদের নারী-জাগরণের মূলে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণা রহিয়াছে, সেকথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এজন্য নারী-জাগরণ-আন্দোলনকে সাহেবিয়ানার চেষ্টা বলিয়া বিদ্রূপ করা সহজ হইয়াছে এবং এই আন্দোলন-প্রবর্ত্তনকারীদের প্রতি নানাপ্রকার উদ্দেশ্য আরোপ করা, তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যভাবের প্রতি অন্ধভাবে মোহগ্রস্ত প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু একথাটা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, সকল বৃহৎ সভ্যতার পশ্চাতেই মহৎ সত্যের শক্তি আছে; ইওরোপের বর্ত্তমান সভ্যতারও আছে। কোনও বিশেষ দেশের মানুষ, কোনও বিশেষ সত্যের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়াই, সেই সত্য শুধু মাত্র সেই বিশেষ দেশের লোকের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকে না। সমগ্র বিশ্বের সকলের পক্ষেই তাহা সমান সত্য। ইহা গ্রহণে কাহারও কোন

লজ্জার কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের চিরাগত আদর্শের সহিত যতই বিরোধ থাকুক, ইওরোপের নিকট কোন সত্যের দীক্ষা গ্রহণে আমাদেরও লজ্জার কারণ থাকিতে পারে না। আবার আমাদের নব জাগ্রত মন নূতন চেষ্টা ও উদ্যমের মধ্য দিয়া নূতন পথে চলিয়া যদি নূতন পরীক্ষা করিতে চায়, এবং তাহার কোন কোন অংশের সহিত যদি ইওরোপের মিল থাকিয়া যায়, তাহাতে আমাদের শঙ্কিত হইবার বা লজ্জা পাইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আমাদের দেশের নারী-আন্দোলন সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে যে, ইহার প্রথম প্রেরণা ইওরোপ হইতে আসিলেও, ইহার মধ্যে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার-লাভের যে সত্য ও শক্তি আছে, তাহাই ইহাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছে। ইওরোপে নারীদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, অনেকটা হইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কাজেই ইওরোপের নারী-প্রগতির সহিত আমাদের দেশের নারী-প্রগতির অনেকখানি মিল দেখা যাইবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে নারীর অধিকারকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে অনেক স্থলে ইওরোপের বর্ত্তমান আদর্শকেও অতিক্রম করিতে হইবে।

কোনও ভাল কাজের মধ্যেই মানুষ অবিমিশ্র ভালর অধিকারী হইতে পারে না। ইওরোপের নারী-প্রগতির মধ্যেও হয়ত অবাঞ্ছনীয়, কোন কোন সময়, সমাজের পক্ষে অহিতকর জিনিসও কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার আশঙ্কায় মূল ভালকে পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ কখনই সুযুক্তি নহে। তদ্ব্যতীত ইওরোপের যে সকল সামাজিক সমস্যাকে সাধারণতঃ সেখানকার নারী-স্বাধীনতার সহিত সংযুক্ত করা হয়, ইওরোপের নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষা, তথাকার অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক কতটা তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা আমরা করি নাই। যদি প্রকৃতপক্ষে ইওরোপের সামাজিক সমস্যা সমূহের জন্য নারীপ্রগতি অপেক্ষা অন্যান্য অবস্থা অধিকতর দায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের নারী-জাগৃতির সহিত সে সকল সমস্যা উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি নারী-জাগরণের সহিত সে সকলের আংশিক সম্পর্ক থাকেও, তাহা হইলেও ইওরোপের দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকায়, আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কম থাকিবে।

ইওরোপের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা, সেখানকার সামাজিক অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ, ইওরোপের ঘটনা সমূহের অগ্রগতির দিক্ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নাই, সে জন্য ইওরোপের সামাজিক চিত্রের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ দেখিয়া আমরা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি, কোনও একজন লেখকের বিরুদ্ধ মতামত পড়িয়া মনে করি, ইওরোপ আমাদেরই চলা প্রাচীন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিটলার-শাসিত বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে অর্থ-নৈতিক কারণে নারীদের গৃহাভিমুখী করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, আমরা অনেকে তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, ইওরোপ নারী-স্বাধীনতার কুফল বুঝিতে পারিয়া, বর্ত্তমানে আমাদের পন্থা অনুসরণ করিতে যাইতেছে, আর আমরা ইওরোপের পরিত্যক্ত বসন গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। ইউরোপের চিন্তাধারার অনেকাংশের সম্পর্কে এই কথা সত্য হইলেও নারী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহা সত্য নহে এবং সত্য হইতেও পারে না।

আর যদি ইওরোপ কোনও কারণে অথবা কোনও বিশেষ অবস্থায় বাধ্য হইয়া এমন কোনও সত্যকে বর্জ্জন করিতে চায়, যাহাকে আমরা আজও স্বীকার করিতে পারি নাই, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের উল্লসিত হইবারও কারণ নাই। এবং সেই সত্যকে লাভ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইবার কারণও নাই।

ইওরোপে নারী-প্রগতি যে অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহাতে কোন কোন দিকে তাহাকে যদি সাবধান-বাণী শুনাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, আমাদের দেশের সর্ব্ব প্রকারে স্বাধীনতাহীন, অবরুদ্ধ এবং দাসত্বে শৃঙ্খলিত নারীদের আটঘাট বাঁধা স্বাধীনতার প্রয়াসকে লক্ষ্য করিয়া সে কথা প্রয়োগ করিতে গেলে, তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই শুনাইবে।

জার্ম্মানীতে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কাহারও কাহারও মনে ভুল ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। সেখানে নারীদের বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৃহস্থালীর কার্য্যে আকৃষ্ট করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, প্রধানত

তাহার মূলে রহিয়াছে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং বেকার পুরুষদের কাজ দিবার প্রয়াস। সেখানে নারীদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইতে হয় নাই, অথবা তাহাদের গতিবিধির, বাহিরে যাইবার, পুরুষের সহিত মিশিবার, ইচ্ছামত কার্য্য করিবার, এবং বাহিরের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সহিত সম্পর্ক রাখিবার স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই। কোন অনিবার্য্য কারণে ও দেশের কোন বিশেষ অবস্থায় যদি নারী এবং পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং অবস্থা ও সুবিধা অনুযায়ী যদি নারীর পক্ষে অন্তঃপুরের কার্য্যই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলেও, সেই প্রয়োজন ও অবস্থা নারী-স্বাধীনতার বিপক্ষে যায় না।

কাজেই, আমাদের নারীপ্রগতির পশ্চাতে যে সত্যের প্রেরণা আছে, ইওরোপের সামাজিক অবস্থার ভয়াবহ চিত্র সম্মুখে উপস্থিত করিয়া অথবা কোনও ক্ষমতাশালী লোকের কোন কার্য্যের ভুল ব্যাখ্যা নিজের মতের সমর্থনে প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা ইহার ত্রুটি ও বিপদের দিকগুলি বর্জ্জন করিয়া এবং সাহসের সহিত ইহার মূল সত্যকে স্বীকার করিয়া আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নারীকে পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিতে পারিলে, তাহার সকল ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলে, তাহাকে বর্ত্তমান নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উন্নীত করিতে পারিলে, তবেই সর্ব্বথা দেশের মঙ্গল হইবে। *

* পাজিয়া (যশোহর) সারস্বত-পরিষদে পঠিত।

মেঘ-মুক্ত

—শ্রীজীবনময় রায়

গীতহারা চিত্ত মোর রহে শুধু মৃত্যু প্রতীক্ষিয়া,
ছিন্ন-তার বীণা বাণীহারা ;

গম্ভীর অম্বরে বাজে মেঘের ডম্বরু—উন্মথিয়া
নিরানন্দ শ্রাবণের ধারা।

ভুবনে ভুবনে হায় ফিরি আমি কাঙালের মতো—
এক বিন্দু আলোর ভিখারী,

আঁধার আকাশ ভরি' উদ্বেলিয়া উঠে অনাগত
সুপ্তসিন্ধু নয়নের বারি।

আপনারে বুঝি না যে, খুঁজে খুঁজে হই দিশাহারা,
চিত্ত ভরি' ওঠে বেদনায় ;

কোন্ সপ্তসিন্ধুপারে সন্ধানিব না পাই কিনারা,
বিশ্ব জুড়ি' আঁধার ঘনায়।

বিদ্যুৎ হানিয়া দেয় আলোর ব্যঞ্জনা ব্যঙ্গভরে,
কালিমা ঘনায় দুর্নিবার ;

হতাশ্বাস কণ্ঠ শুধু ফুৎকারি ওঠে যে আর্ত্তস্বরে
"কোথা হায়, কোথা গো নিস্তার !

রুদ্ধ এ পীড়িত কণ্ঠ, রুদ্ধ শ্বাস, রুদ্ধ দিগ্বলয়,
এই অন্ধ রুদ্ধ কারাগারে

কে মোরে করিবে ত্রাণ ? জাগো জাগো, হে মহাপ্রলয়
হানো বজ্র, চূর্ণ করো তারে।"

সহসা তোমার কণ্ঠে দাক্ষিণ্যের বার্ত্তা বহি আনে,
স্তব্ধচিত্তে শুনি তব গান,

আনন্দের ধারা ঝরে, চাহি মুগ্ধ আকাশের পানে
চূর্ণ হয় নির্ম্মম পাষাণ।

জ্যোতির তরঙ্গাঘাতে দুলে ওঠে বিশ্বচরাচর,
হেরে আপনারে মুগ্ধ চোখে

নব সৃজনের পানে সবিস্ময়ে ; নিখিল অন্তর
আনন্দে জাগিল লোকে লোকে।

সুরের মোহন মন্ত্রে আলোকের পদ্ম ওঠে জেগে
ব্যাপ্তিহারা মুগ্ধ নীলাকাশে,

উদ্ভাসিয়া ওঠে বিশ্ব নিরঞ্জন জ্যোতিস্পর্শ লেগে
চিত্ত জাগে আপন প্রকাশে।

তোমার সঙ্গীত-মন্ত্রে নিজেরে যে করো আত্মহারা
সেই ছোঁয়া লাগে মোর মনে,

মুহূর্ত্তে জীবন হ'তে মুছে যায় কালিমার ধারা
আপনারে চিনি সেই ক্ষণে।

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

নয়

পল তার ছোট খাবার ঘরে টেবিলের কাছে বসে। ঘরটা একটা তেলের পিদীমের আলোয় আলোকিত। গির্জ্জে বাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের উঁচু জমি, কালো পাহাড়ের মত। ফিকে রঙের আকাশ। পাহাড়ের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাদ উঠছে।

গ্রামের কতকগুলি লোককে পল নিমন্ত্রণ করে এসেছে, আজ রাত্রে তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। তাদের মধ্যে সেই পাকাদাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটি আর সেই ঘোড়ার মালিক ছিল। তারা দুজনেই বসে সেখানে মদ খাচ্ছে, গল্প গুজব ঠাট্টা-তামাসা করছে আর তাদের শিকার কাহিনী শোনাচ্ছে। পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটি নিজেও শিকারী, রাজা নিকোদিমাসের কথা নিয়ে সে আলোচনা করতে লাগল। তার মতে, সেই বুড়ো নিকোদিমাস, যে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, ভগবানের আইন মেনে শিকার করত না।

"আমি তার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা বলতে চাইনে, বিশেষ তার মৃত্যুর পরে" সে বলে যেতে লাগল, "কিন্তু সত্য কথা বললে বলতে হয়, সে বুড়ো শিকার করে বেড়াত, যেন ব্যবসাদারের ফটকাবাজীর মত। গেল বছর শীতকালে সে ওই পশমওয়ালা বেজির ছাল থেকে নিশ্চয় হাজারে হাজারে টাকা করেছে। ভগবান আমাদের পশু শিকার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের একেবারে ঝাড়ে বংশে শেষ করতে বলেননি। শুধু তাই নয়: সে আবার জাল পেতে ধরত সেও ভগবানের বারণ। কেননা জানোয়ারেরাও মানুষের মত ব্যথা, যাতনা ভোগ করে; আর যেসময়ে তারা জালে আটকা পড়ে, তখন নিশ্চয়ই তাদের ভীষণ একটা যন্ত্রণা হয়। একবার আমি নিজের চোখে দেখেছি; একটা জাল পাতা রয়েছে, তাতে একটা খরগোসের বিছিন্ন ঠ্যাং আটকে রয়েছে। ব্যাপারটা যে কি তা বুঝলে? খরগোসটা জালে আটকা পড়েছিল, তার পায়ের সব মাংস থেঁতলে ছালচামড়া ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার জন্য পাখানা ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আর সেই রাজা নিকোদিমাস তার এত টাকা নিয়ে, শেষে কি করে গেল? সব রাখলে লুকিয়ে, এখন তার নাতি দু চার দিনের মধ্যেই মদ ভাং খেয়ে সব উড়িয়ে দেবে।"

"টাকা হয়েছে খরচ করবারই জন্যে", সেই ঘোড়ার মালিক বলতে লাগল। লোকটা সব সময়েই একটু বেশী অহঙ্কারের কথা কয়। 'আমি নিজে ধর, সব সময়েই খোলা খরচ করেছি, আনন্দ করেছি, কারও কোন ক্ষতি না করে। একবার এই আমাদের উৎসবে কিছু করবার না পেয়ে একটা লোক রেশমের কাটিম বিক্রী করছিল, তারই একটা বোঝা নিয়ে সে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি একেবারে সবটা কিনে নিলাম। চৌমাথার মাঝখানে এসে সেই কাটিম-গুলো দিলাম রাস্তায় গড়িয়ে, আর তার পিছু পিছু ছুটতে আরম্ভ করলাম। পা দিয়ে সেগুলোকে এখানে সেখানে ওখানে সব ছিটকে দিতে লাগলাম। এক মুহূর্ত্তের ভেতর একেবারে প্রকাণ্ড ভিড় জমে গেল। সবাই চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, হৈ হৈ করছে। ছেলেরা যুবারা, এমন কি বুড়োরা পর্য্যন্ত সবাই খুব ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলে ছেলেদের নকল করে। সে খেলা আজও পর্য্যন্ত কেউ ভুলতে পারেনি গাঁয়ে। পুরোনো পাদরী সাহেবের সঙ্গে যখনই দেখা হত, তিনি আমাকে চেঁচিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "ও হে প্যাসকেল মাসিয়া, আজ আর রেসমের কাটিম নেই রাস্তায় গড়াবার জন্যে!"

সব অতিথিরা গল্প শুনে খুব হাসল। শুধু পল অন্যমনস্ক, ক্লান্ত, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তখন পাকাদাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা, পলের দিকে সে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়েছিল, সে চোখ টিপে সঙ্গীদের জানিয়ে দিলে যে, এখুনি সবাই চল আর কেন। উনি ভগবানের দাস, পবিত্র নির্জ্জন ভাবে থাকবার সময় হয়ে এসেছে। তার উপযুক্ত শান্তি ও বিশ্রামের দরকার নিশ্চয়।

অতিথিরা সব তখন এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে, পাদরী সাহেবকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে বিদায় নিলে। পল তখন বড় একলা। একদিকে ঘরের তেলের পিদীমের কম্পমান শিখা, আর জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই পূর্ণিমার চাঁদ, এই দুই আলোর শান্ত উজ্জ্বল মাধুর্য্যের মধ্যে সে একেবারেই একলা। দূরে অতিথিরা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের পায়ের নাল-বসান জুতো খালি রাস্তায় শব্দ করছে।

এখুনি শুতে গেলে বড় শীগগির হবে। যদিও নিজেকে একেবারে ক্লান্ত লাগছে, তার কাঁধ যেন দুমড়ে দুমড়ে ভেঙ্গে পড়ছে। যেন সারাদিন একটা ভারি জোয়াল তার কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবুও তার নিজের ঘরে থাকবার কোন ইচ্ছা তার মনে নেই। তার মা তখনও রান্না-ঘরে, যেখানে পল বসে, সেখান থেকে তাকে একটুও দেখা যায় না। কিন্তু পল বেশ বুঝতে পারলে যে, তার মা সেখান থেকে লক্ষ্য করে তাকে পাহারা দিচ্ছেন, যেমন আগের রাত্রে দিয়েছেন।

আগের রাত্রে! তার মনে হল সে যেন সবে এই মাত্র ভয়ানক ঘুম থেকে উঠছে। অ্যাগনিসের বাড়ী থেকে ফিরে আসার যন্ত্রণা, রাত্রে সেই নানা চিন্তা, সেই চিঠিখানা, সেই ধর্ম্ম-উপাসনা, সেই পাহাড়ের উপর যাওয়া, গ্রামের লোকের এই প্রকাণ্ড উৎসব, গোলমাল, সবই যেন একটা কল্পনার সুতোয় গাঁথা মস্ত একটা স্বপ্ন। তার আসল জীবন এই সবে আরম্ভ হচ্ছে। শুধু উঠে কয়েক পা চলা, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খোলা—তার কাছে ফিরে যাওয়া। এইত তার আসল জীবন এইবার সুরু হল!

"কিন্তু হয়ত, সে আর আমার আশা করছে না। হয়ত আর কখনই সে আমার আশা আর মনে রাখবে না।"

তারপর তার মনে হল যে, তার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন ভয় পেয়েছে, তার কাছে আর ফিরে যাওয়া চলে না। হয়ত সে তার অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। আর এখন থেকেই তাকে ভুলতে আরম্ভ করেছে।

তার অন্তরের অতল থেকে সে অনুভব করলে, পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসার সব চেয়ে কঠিন ও কষ্টের ব্যাপার হল এই - তার সম্বন্ধে কিছু না জেনে তার কোন কথা না পেয়েই তাকে একেবারে জীবন থেকে মুছে ফেলে দেওয়া।

এ যেন জীবন্ত অবস্থায় মরে থাকা, সে যদি তাকে আর না ভালবাসে ·· তার ভালবাসা যদি একেবারে থেমে যায়!

দুহাত দিয়ে তার মুখ পল ঢাকলে, আর মনে মনে দরজার কাছে এ্যাগনিসের মূর্ত্তি আনবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে। তারপর তাকে ভৎসনা করতে লাগল এমন সব জিনিষ নিয়ে যে সেও ঠিক সেসব নিয়ে তেমনি তাকে ভৎসনা করতে পারে।

"এ্যাগনিস! তুমি তোমার শপথ, প্রতিজ্ঞা ভুলতে পার না। কি করে তুমি তাদের ভুললে! তুমি তোমার দুই হাত দিয়ে জোরে আমার হাতের কব্জা ধরে বলেছিলে না যে, আমরা একসঙ্গে চিরকালের জন্য, জীবনে ও মরণে। সত্যি তুমি একথা ভুলতে পার? তুমি বলেছিলে, তুমি জান, তোমার মনে আছে "

তার হাতের আঙ্গুলগুলো তখন গলার কলার চেপে ধরছে, যেন দুঃখের যাতনায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

"না, শয়তান আমাকে তার জালে জড়িয়ে ফেলেছে।" তার তাই মনে হল, তখনি তার আবার মনে পড়ে গেল সেই খরগোসটাকে, যেটা জাল থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার একটা ঠ্যাং রেখে গেছে জালের ভেতরে।

একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে, চেয়ার থেকে উঠে, আলোটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়াল। নিজের এই ইচ্ছাকে সে জয় করতে একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার দেহের মাংস যদি এতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয় তাও সে করবে, যাতে সে নিজেকে এই বাঁধন, এই মোহের জাল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। স্থির করলে এখন নিজের ঘরেই যাবে, কিন্তু যেমন সে হলঘরের দিকে এগুলো, সে দেখতে পেলে যে, তার মা সেই নির্জ্জন রান্নাঘরে সেই একই জায়গায় বসে আছেন আর তার পাশে অ্যান্টিয়োকাস ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে পল জিজ্ঞাসা করলে—

"এখনও ছেলেটি এখানে কেন রয়েছে? ও যায় নি?"

তার মা একটু থতমত খেয়ে তার দিকে তাকালেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, কথার কোন উত্তরই দেবেন না, বরং অ্যান্টিয়োকাসকে তাঁর আড়ালে ঢেকে রাখবেন, যাতে পল আর দেরী না করে তার ঘরে চলে যায়। ছেলের উপর মায়ের বিশ্বাস এখন সম্পূর্ণ রকমে জেগেছে বটে, কিন্তু শয়তান আর তার জাল পাতার কথা তাঁর মনে পড়ল। সেই সময়ে অ্যান্টিয়োকাস জেগে উঠল। তার মনে হল যে, সে এখনও কেন সেখানে অপেক্ষা করছে, যদিও পলের মা অনেক বার তাকে বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন।

সে বললে, "আমি এখানে অপেক্ষা করছি, কারণ পাদরী সাহেব আমাদের ওখানে যাবেন বলে আমার মা অপেক্ষা করে আছেন।"

পাদরী সাহেবের মা বাধা দিয়ে বললেন, "এই রাত্রে কি লোকের বাড়ী দেখা করতে যাবার সময়? তুমি এখন যাও, আজ এস, তোমার মাকে গিয়ে বল যে পল বড় ক্লান্ত। ও কাল যাবে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।"

তিনি ছেলেটিকে কথা বলছিলেন, অথচ তাঁর নিজের চোখ ছিল তাঁর ছেলের মুখের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর ছেলের চোখ যেন কাঁচের মত ঝকঝকে, দৃষ্টি আলোর দিকে কিন্তু তার চোখের পাতা কাঁপছে, যেমন আলোর কাছে প্রজাপতির পাখা দুখানা কাঁপে।

অ্যান্টিয়োকাস একটা ঘন নিরাশা ও বিষাদের ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"কিন্তু আমার মা ওঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন, কি নাকি ভারি দরকারী কথা আছে।"

"বেশত, যদি দরকারী কোন কাজই থাকে, হবে। বলগে তাঁকে এখনি গিয়ে যে কাল পল তাঁর সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই করবে। এস, এখন তুমি শীগগির বাড়ী যাও।"

তিনি অত্যন্ত তীব্র স্বরে কথাগুলো বললেন। যেই পল তাঁর মুখের দিকে চাইলে, অমনি তাঁর চোখ রাগ আর বিরক্তিতে আগুনের মত জ্বলে উঠল। পল বুঝতে পারলে, তার মা ভয় পাচ্ছেন, পাছে তাঁর ছেলে রাত্রিতে আবার বেরিয়ে যায়। মনে হতেই, পলের এমন রাগ হল যে, সে আলোটা ধপ করে টেবিলের উপর বসিয়ে রেখে অ্যান্টিয়োকাসকে বললে:

"চল আমরা যাই, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব।"

হলঘরে যেতে যেতে সে আবার ফিরে বললে:

"আমি এখুনি ফিরে আসছি মা, তুমি দরজা বন্ধ কর না।"

মা যেখানে বসে ছিলেন, সেখান হতে উঠলেন না। যখন তারা দুজনে চলে গেল, তখন তিনি উঠে আধ-ভেজান দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন, তারা চাঁদের আলোয় ধোয়া চৌমাথা ছাড়িয়ে গিয়ে, ওই মদের দোকানে গিয়ে ঢুকল। তখনও সেখানে আলো জ্বলছে। তারপর আবার ফিরে গেলেন তাঁর রান্নাঘরে। গতরাত্রে যেমন পাহারা দিয়েছিলেন, সেই রকম সতর্ক হয়ে রইলেন।

মা নিজের সাহস দেখে নিজেই চমকে গেলেন। আর সেই বুড়ো পাদরীর ভূত ফিরে আসার তিনি ভয় করেন না। সে যেন একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু তিনি এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন, হয়ত সেই পাদরীর ভূতটা ফিরে এসে, মোজা সেলাই হয়ে গেছে কিনা বলে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারে।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "আমি তাদের সব সেলাই করে ঠিক করে দিয়েছি।" তাঁর ছেলের মোজা সেলাই করে মা ভাবছেন তারই করে

য়েছেন। তাঁর বোধ হতে লাগল, এমন কি শয়তান যদি এখুনি এসে হাজির ।, তবে তিনি তার সামনে সহজে দাড়িয়ে তার সঙ্গে বন্ধু ভাবেই কথা ।তে পারবেন।

চারিদিকে তখন নিশ্চিন্ত নীরবতার রাজত্ব। বাইরে জানালার ধারের ছগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় রূপোর মত ঝকঝক করছে। আকাশ যেন ধ ধোয়া সমুদ্র, আর গন্ধভরা পাতার সুগন্ধ বাতাস যেন বাড়ী পর্য্যন্ত য আসছে। মা যেন এখন একটু শান্ত হলেন, যদিও বুঝতে পাচ্ছেন যে কেন। আশঙ্কা আছে পল এখনও আবার সেই পাপে গিয়ে পড়তে রে। কিন্তু আর তিনি ভয় করেন না। তাঁর মনের ভেতর দেখতে লেন, পলের গালের কাছে তেমনি চোখের পাতা কাঁপছে, যেন ছোট ছেলে, ুনি কেঁদে ফেলবে। তাঁর মায়ের বুক স্নেহ-মমতায় একেবারে গলে ল।

"কেন? কেন? হে ভগবান, কেন, কেন?"

প্রশ্ন শেষ করতে তাঁর আর ভরসা হল না। একটা কুয়োর জলের নায় পাথর পড়ে থাকলে যেমন নড়ে না, পড়ে থাকে, এও তেমনি অন্তরের নায় পড়ে রইল। কেন, কেন? হে ভগবান, মেয়েটিকে ভালবাসা লের পক্ষে একেবারে নিষেধ! ভালবাসায় কারও বাধা নেই। হীন চাকর-র নয়, রাখাল যারা গরু চরায় তাদের নয়। এমন কি কানা খোঁড়া, চোর কাত যারা জেলের ভেতর থাকে, তাদের বারণ নেই, শুধু আমার ছেলে, ল, তারই পক্ষে বারণ? শুধু একজন, যার জন্যে সমস্ত ভালবাসা একেবারে ষেধ?

আবার তাঁর মনে প্রত্যক্ষ সত্যের আঘাত পেলেন। অ্যান্টিযোকাসের া তাঁর মনে পড়ল। একটা সামান্য ছোট বালকের চেয়ে তাঁর বুদ্ধি কম ল মার নিজেরই যেন লজ্জা হল।

"তারা নিজেরাই, যাঁরা সেই পুরাকালের পাদরীদের মধ্যে বয়সে ছোট লেন, তারাই সভা করে বৃদ্ধদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন, পবিত্র কতে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে, নারীর সম্পর্ক থেকে চিরদিনের মত সকল কমে দূরে থাকতে।"

পল খুব জোরাল মানুষ, তার পূর্ব্বকালের পাদরীদের চেয়ে সে কোন ংশেই ছোট নয়। সে কখনও চোখের জলে ভোলবার মানুষ নয়, তার খের পাতা চিরদিনই শুখনো থাকবে, মড়ার মত। সে আমার ছেলে, ব জোরাল মানুষ।

"না, আমি এ কি ছেলেমানষী করছি।" মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

তাঁর মনে হল তিনি যেন আরো কুড়ি বছর বুড়ো হয়ে গেছেন এই কদিনের যাতনায়, উঃ, এই একটা দীর্ঘদিনের সব ক্ষয়-করা ভাবের ধাক্কায়। কটা করে ঘণ্টা কেটেছে আর একটা করে ভারি বোঝা তাঁর বুকে পিয়ে দিয়েছে আর তাই বইতে হচ্ছে। একটা করে মিনিট কেটেছে ার একটা করে লোহার হাতুড়ীর ঘা তাঁর আত্মার বুকে লেগেছে। যেমন ই দূরে পাহাড়ের ধারে পাথর-ভাঙারা রাশীকৃত পাথরের উপর হাতুড়ীর মেরে মেরে পাথর ভাঙে। আগেকার দিনের চেয়ে, আজ তাঁর কাছে অনেক জিনিষ যেন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ্যাগ্‌নিসের মূর্ত্তি যেন তাঁর চোখের সামনে এসে হাজির হল। তার অলঙ্কার, তার ভিতরে কি হচ্ছে, সে ভাবকে একেবারে ঢেকে রেখে দিয়েছে।

মা ভাবলেন, "সেও খুব জোরাল মেয়ে, সে সবই নিশ্চয় লুকিয়ে রাখতে পারবে।" তারপর ধীরে ধীরে তিনি উঠলেন, ছাই দিয়ে আগুনটা ঢাকতে লাগলেন। গুছিয়ে সরিয়ে বেশ করে ছাই ঢাকা দিলেন, যাতে কোন রকমে একটা আগুনের ফিনকিও উড়ে গিয়ে কাছের কোন জিনিষে না আগুন ধরায়। তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি জানেন, পল একটা আলাদা চাবি সব সময়েই তার কাছে রাখে। খুব জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলেন, যেন সে চৌমাথা থেকে তার পায়ের শব্দ শুনে বোঝে আর বিশ্বাস করে যে, তাঁর এই জোর পা-ফেলা যেন ভিতরের নিশ্চিন্ততার বাইরের পরিচয়।

তিনি ভাবলেন, এই যে বাইরের নিশ্চিন্ততা, এর আসলে কোন দৃঢ় পাকা ভিৎ নেই। জীবনে কোন্ জিনিষটা বা পাকা? পাহাড়ের ভিৎও পাকা নয়, গির্জ্জের ভিৎও পাকা নয়। এক ভূমিকম্পেই দুটোকে ভিৎ থেকে উল্টে পেড়ে ফেলে দিতে পারে। এই রকমে তিনি নিজের মনের ভেতর পলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন, নিজের জন্যও নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু সকল সময়েই ভেতরে তলায় তলায় থেকে গেল একটা অজানিত ভয়, যে কোন মুহূর্ত্তেই যা একেবারে সব ওলটপালট করে দিতে পারে। যখন তিনি তাঁর শোবার ঘরে গেলেন, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। আবার ভাবনা এল, হয়ত সদর দরজাটা খুলে রাখাই ভাল ছিল।

তারপর উঠে তাঁর পোষাকের বাঁধন-রসি খুলে ফেলতে গেলেন। তাতে এমন একটা গাঁট পড়ে গেছে, যে খুলতে গিয়ে তিনি ধৈর্য্য হারালেন। তাঁর সেলাইয়ের ঝুড়ি থেকে কাঁচিখানা আনতে গিয়ে দেখেন, কয়টা বেরাল ছানা সেই ঝুড়িতে তালপুঁটুলি হয়ে ঘুমুচ্ছে। কাঁচিখানা, সুতার কাঠিম সব তাদের গায়ের তাপে গরম হয়ে রয়েছে। জীবনের একটা অনুভূতি ও তাপ তাঁর মনের ভেতরে কেমন করে দিলে। অস্থিরতার জন্য মনে দুঃখ হল। তখন আলোর কাছে গিয়ে, রসির গাঁটটা দেখে দেখে খুলতে পারলেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি ধীরে ধীরে কাপড় ছাড়লেন। পোষাকগুলো আস্তে আস্তে ভাল করে পাট করে একটার পর একটা চেয়ারের উপর রাখলেন। সব প্রথম পকেট থেকে চাবিগুলো বার করে সার দিয়ে টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখলেন, যেমন সব ভাল গৃহস্থে রাখে, শোবার সময়। ছেলেবেলায় তাঁর যারা মনিব ছিল, তাদের কাছে এই ভাবে সব সাজিয়ে রাখা ও পরিষ্কার ভাবে গুছিয়ে রাখা তিনি শিখেছিলেন, সেই ভাবেই চলে এসেছেন। সেই পুরোনো শিক্ষাই তাঁর মেনে চলা বরাবর অভ্যাস হয়ে এসেছে।

তিনি আবার এসে বসলেন। ছোট সেমিজ থেকে পায়ের নীচটা বার হয়ে আছে, যেন দুখানা শুকনো কাঠের তৈরী। বসে বসে, ক্লান্তিতে হাই উঠতে লাগল। না, আর এখন তিনি নীচে নামছেন না। তাঁর ছেলে ফিরে

আসুক, এসে দেখুক দরজা বন্ধ। তা থেকে সে বুঝুক যে, তার মা তাকে সম্পূর্ণ রকমেই বিশ্বাস করে। তাকে চালানোর এই হল ঠিক রাস্তা, তাকে দেখানো যে তার উপর সব রকম বিশ্বাস মা রাখেন। তথাপি তিনি অতি সজাগ আছেন। একটা সামান্য কোন খুটখাট শব্দের দিকে কান খাড়া করে রেখেছেন। গত রাত্রে যে ভাবে সজাগ হয়ে ছিলেন, ঠিক সে ভাবে নয় বটে, কিন্তু খুব সজাগ হয়ে রইলেন। পায়ের জুতোজোড়া খুলে, পাশে রাখলেন, তারা যেন দুই বোন, দুজনে এক সঙ্গে রাতে ঘুমুবে। তারপর রাতের প্রার্থনা করতে লাগলেন। তার মাঝে থেকে থেকে হাই তুলছেন। ক্লান্তির জন্য এলিয়ে পড়া, ভাবনায়, দুর্ব্বলতায়, স্নায়ুগুলো যেন অচল হয়ে আছে। প্রার্থনা করছে আবার হাই তুলছেন।

আচ্ছা, এ্যাণ্টিয়োকাসের মায়ের কাছে পলের কি কথা বলবার আছে, কি কথা বলবার থাকতে পারে? সে স্ত্রীলোকটার সুনাম একেবারেই নেই। ভারি সুদে টাকা খাটায়, আর তা ছাড়া লোকে এও নাকি বলে যে, সে জুটিয়েও দেয়। না, পলের মা এসব ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। পোড়া পলতের ধোঁয়াটা হাত দিয়ে মুছে বিছানায় গিয়ে বসলেন, শুতে কিন্তু পারলেন না।

তখনি যেন তাঁর মনে হল ঘরে কার পায়ের শব্দ। সেই বুড়ো পাদরীর ভূতটা কি ফিরে এল? তাঁর ভয়ানক ভয় হল, সে যদি বিছানায় এসে তাঁর গলা টিপে ধরে। কিছুক্ষণের মত তাঁর শিরার রক্ত যেন হিম হয়ে জমে গেল, তারপর চৌমাথার মোড়ে যেমন লোকগুলো হঠাৎ ছুটে দৌড়ে যায়, তেমনি করে সমস্ত রক্তটা সব শিরা উপশিরা ও স্নায়ুর ভেতর চারিয়ে গেল। ভয়টা ভেঙে গেল, নিজের এই ভয়ের জন্য বড় লজ্জা হল। এ ভয়ের আর কোন কারণও তিনি খুঁজে পেলেন না, সম্ভবতঃ পলের প্রতি তাঁর সন্দেহ থেকেই এই ভয় দেখা দিয়েছে।

না, সে সব সন্দেহ আর কেন, সেতো শেষ হয়ে গেছে, আর কোন দিন কখনও তিনি তার কোন ছোট-খাট কাজের খোঁজ করতে যাবেন না, তার একমাত্র কাজ এই সংসার নিয়ে থাকা। যেমন তিনি এখন আছেন। এই ছোট একটা ঘর, যেখানে শুধু চাকর-চাকরাণী থাকতে পারে। তিনি শুয়ে পড়ে গায়ের কাপড়টায় আপাদমস্তক ঢেকে দিলেন। এমন কি কান দুটোয় পর্য্যন্ত বেশ করে চাপ দিলেন, যাতে পল বাড়ী ফিরে আসুক বা না আসুক, এলে যেন তার পায়ের শব্দটা তাঁর কানে না পৌঁছয়। কিন্তু তাঁর অন্তরের কোনে বেশ বুঝতে পারছেন যে, পল আজ রাত্রে আর ফিরে আসছে না। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন টেনে নিয়ে গেছে, যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজনকে আর একজন নাচের মজলিসে টেনে নিয়ে যায়।

তবুও তাঁর একথা বেশ স্পষ্ট, নিশ্চিত বলেই মনে হল যে, শীগ্‌গিরই হোক আর দেরীতেই হোক, পল কোন রকমে সেখানে থেকে পালিয়ে বাড়ী আসবে। যা হোক করে, তাঁর বিছানার গায়ের কাপড়ের ভেতর তিনি হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। ঘুম ঠিক এল না। কেমন যেন মনে হচ্ছে যে, তাঁর পোষাকের রসির গাঁট তিনি খুলছেন। তারপর কানের ভেতর কি যেন এক রকম ভোঁ ভোঁ শব্দ উঠল, সেটা আবার যেন চৌমাথার ভিড়ের কলরবের মত জানালার বাইরে থেকে শোনা গেল, আরো দূরে কান্না যেন দুঃখ করে কাঁদছে, আবার তার ভেতর হাসছে, নাচছে, গান গাইছে। তার পর তাদের মাঝখানে, আর তাদের মাথার উপরে অনেক উঁচুতে কে যেন বীণা বাজাচ্ছে। হয়ত ভগবান নিজে সব মানুষের নাচ-গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বীণা বাজাচ্ছেন।

দশ

আণ্টিয়োকাসের মা সারাটা দিনই মনের ভেতর তোলাপাড়া করছে, ব্যাপারটা কি? পাদরী সাহেব যে তার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর উদ্দেশ্য কি, যার জন্যে তার ছেলে তাকে এত রকম করে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে গেল। কিন্তু সে যে পাদরী সাহেবের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে, এ ভাব যাতে তিনি কোন রকমে না ধরতে পারেন, তার জন্যে খুব সাবধান হয়ে রইল। বোধ হয় সে খুব বেশী সুদে টাকা খাটায় সেই কথা বলবার জন্যে আসছেন। আর তা ছাড়া আরো ত অনেক কারবার আছে, সেই সব কারবার সম্বন্ধে কিছু হয়ত বলতে পারেন। কিংবা সে যে টাকা ধার ধোর দেয় তারই কোন ব্যাপার অথবা কোন ওষুধপত্রের জন্য যা সে খুব অল্প খরচায় তৈরী করে দেয়। সে সব তার স্বামীর বংশগত জানা শোনা বিদ্যা থেকে সে পেয়েছে। অথবা তাঁর নিজের কিম্বা অন্যের জন্য টাকা ধার দেবার ব্যবস্থার জন্য আসছেন। যাই হোক্, শেষ খরিদ্দার দোকান থেকে চলে যাবার পর দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। দুটো হাত তার পয়সা ভরতি পকেটের ভেতর দিয়ে, সে তাকিয়ে দেখতে লাগল, আণ্টিয়োকাস ফিরে আসছে কিনা, তাকে দেখতে পায় কিনা।

তারপর তাড়াতাড়ি সে যেন ভয়ানক ব্যস্ত, দরজা দিতে এমনি ভাব দেখিয়ে সে দরজার আধখানা বন্ধ করে খিল দেবার জন্য একটু হেঁট হয়ে রইল। সে চলাফেরায় বেশ থরথরে ও কাজের লোক, যদিও খুব লম্বা আর মোটা। কিন্তু ওখানকার অন্য অন্য মেয়েদের চেয়ে তার মাথাটা বেশ ছোট, কেবল পেটে-পড়া কাল চুলের ফাঁপা প্লেটের মত খোঁপার মাথাটা তার একটু বড়ই দেখায়।

সেই পাদরী সাহেব এসে পৌঁছুলেন সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খুব শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে নমস্কার করলে। তার উজ্জ্বল কাল চোখ দিয়ে সোজা একেবারে পাদরী সাহেবের চোখের উপর চোখ রেখে দেখতে লাগল। তাতে জিজ্ঞাসার ভাবও রয়েছে, আবার ক্লান্তির জন্য যেন খানিকটা ঢলে পড়ার ভাবও রয়েছে। তারপর মদের দোকানের পিছনে যে ঘরটা সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে পাদরী সাহেবকে বসবার জন্য তাঁকে আহ্বান করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আণ্টিয়োকাস তার চালাকী-খেলান চোখের চাউনিতে মাকে যেন বললে, ওই পাশের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য একটু জেদ কর। কিন্তু পাদরী সাহেব বেশ হাসতে হাসতে বললেন,

"না না থাক, এই খানেই আমরা বসি।" পাদরী সাহেব তখন সেই লম্বা টেবিলটার ধারে বসে পড়লেন। সেই ছোট দোকানে মদের দাগে ভর্ত্তি সেই টেবিলখানাই হল ঘরের আসবাব। আণ্টিয়োকাস ব্যাপারটা অনিবার্য্য ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে

ওদিকে সচকিতে দেখতে লাগল সব ঠিক ব্যবস্থা মত আছে কিনা, ভয় হচ্ছে শেষে আবার গভীর রাতের কোন খদ্দের এসে তাদের এ সভার কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন গোলমাল না ঘটায়।

সবই ঠিক-ঠাক রয়ে গেল। অতরাত্রে আর বড় কেউ একটা এল না। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছে, তার আলোয় তার মায়ের ছায়া দেয়ালের গায়ে খুব বড় হয়ে পড়েছে। তাকের ওপর নানা রঙের বোতল ভরা মদ, কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, কোনটা হলদে সাজান বোতলগুলির উপর পড়ছে সেই ল্যাম্পের আলো। দোকানের অপর ধারে সারি সারি গেলাস, ছোট বড়, তাতে আলোর ঝলক পড়ে মাঝে মাঝে নড়া-চড়ার জন্যে চক্ চক্ করে উঠছে। ঘরে সেই বড় টেবিলটা ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। সেইটার কাছে বসে আছেন পাদরী সাহেব নিজে আর একটা ছোট টেবিল আছে এক পাশে। দরজার মাথার কাছে ঝুলছে এক গোলো হলদে ফুল। তাতে দু কাজই হয়। রাস্তা থেকে লোকে দেখে বুঝতে পারে এটা মদের দোকান, আর এই ফুলের গন্ধে মাছিগুলো এসে আর গেলাসে বসে না।

অ্যান্টিয়োকাস এই মুহূর্ত্তটির জন্যে সারাদিন ভাবের ঘোরে অপেক্ষা করে রয়েছে, এই শুভমুহূর্ত্তে তার জীবনের সব রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে। সে কেবলই ভয় করছে, পাছে মাঝ থেকে কোন বাইরের আগন্তুক এসে গোল বাধায় আর তার মা যেমন ভাবে সব ব্যবহার ও ব্যবস্থা করতে হয় তা না করে। পাদরী সাহেবের সামনে, তার মনের ইচ্ছে যে তার মা আর একটু নম্রভাব দেখান, আরো একটু বেশ ঠাণ্ডা, ঘরোয়াভাবে কথাবার্ত্তা কন। কিন্তু তার মা তার বদলে গিয়ে বসল তার নিজের জায়গায়, সেই গরাদের পেছনে, গম্ভীরভাবে যেন রাণী তার সিংহাসনে বসে আছেন। তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে, সে বুঝছে যে, তার সামনে মদের দোকানে টেবিলের ধারে যে ব্যক্তিটা বসে আছে সে একজন সাধারণ মদের খরিদ্দার নয়, একজন মহাপুরুষ, যিনি দৈবকার্য্য সাধন করতে পারেন ও করেছেন। এ সব ভেবেও যাঁর দৌলতে আজ এত প্রচুর মদ বিক্রী হল, তিনি সেই এত বড় বিক্রীর একেবারে মুখ্য কারণ না হলেও, তাঁর ব্যাপারের উৎসব থেকেই এই এত বিক্রী হল। তার মা একটুও কৃতজ্ঞ নন।

শেষে পল নিজে কথাবার্ত্তার জন্যে মুখ খুললেন।

"দেখ তোমার স্বামীর সঙ্গেও দেখা হলে বড় ভাল হত, আমার ইচ্ছা ছিলও তাই", টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে, আঙুলের ডগাগুলো পরস্পর এক করে মিলিয়ে পল আরম্ভ করলে। অ্যান্টিয়োকাস বললে যে, তার পিতা পরের রবিবারের আগে ফিরছেন না।

স্ত্রীলোকটি শুধু মাথা নেড়ে সে কথায় সায় দিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, পরের সপ্তাহেই আসবেন, তবে আপনি যদি বলেন আমি তাঁকে এখানে ডেকে আনতে পারি", অ্যান্টিয়োকাস বললে খুব আগ্রহের সঙ্গে। কিন্তু মা বা পাদরী সাহেব তাতে একেবারেই কান দিলেন না।

"তোমার এই ছেলেটির সম্বন্ধে কথা" পল বলে যেতে লাগল; "এখন সময় এসেছে ছেলেটার সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করে একটা কিছু করা, তাকে এখন কোন্ কাজে দেবে বলে তোমরা মনে করছ? এখন ত সে বড় হতে চলল। যদি তোমরা তাকে কোন ব্যবসার ভেতর ঢুকোতে চাও, তবে তাকে তা শেখাতে সুরু করে দাও, আর তা যদি না করে তাকে পাদরী হবার ব্যবস্থা করতে চাও, তাহলে কি গুরুতর দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিচ্ছ সেটার সম্বন্ধে একটা ভেবে-চিন্তে ঠিক করারও দরকার।"

অ্যান্টিয়োকাস কথা কইতে গেল, কিন্তু তার মা যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখন সে শুধু চুপ করে শুনে যেতে লাগল। তার সেই ছেলে-মানুষের মত মুখে-চোখে মার কথাতে একটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে অসম্মতির ছায়া খেলতে লাগল।

স্ত্রীলোকটি সুযোগ পেয়ে ধরলে চেপে, তার স্বভাবই হল তাই। সুযোগ পেলে সে কখনও কাউকে হাতের বাইরে যেতে দেয় না। সে তার স্বামীর গুণের নানা সুখ্যাতি জুড়ে দিলে, আবার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, তার চেয়ে তার স্বামী বয়সে অনেক বড়, তবু কেন তাকে সে বিয়ে করল।

"প্রভুপাদ নিশ্চয়ই জানেন যে, আমার স্বামী মার্টিন পৃথিবীতে সব চেয়ে ধর্ম্মভীরু, লোকও বুদ্ধিমান। স্বামী হিসাবে খুব ভাল, সৎ পিতা, আর অন্য সকলের চেয়ে বেশী খাটিয়ে ও কাজের লোক। এই সারাটা গ্রামের ভেতর কে এমন আছে বলুন, যে তার মত এত বেশী পরিশ্রম করে বা করতে পারে? আপনিই বলুন, আপনি ত সব জানেন গ্রামের লোকগুলো কি রকম অলস, কুঁড়ের সেরা হয়ে নিজেদের চরিত্র, ধর্ম্ম সব নষ্ট করছিল। তাই আমি বলছি, অ্যান্টিয়োকাস যদি কোন ব্যবসা করাই পছন্দ করে সে তার বাপের যে কাজ বা ব্যবসা তাই ত' করতে পারে, সেই হচ্ছে তার পক্ষে সব চেয়ে ভাল ব্যবসা। তার যা ইচ্ছে হয়, স্বাধীন ভাবে যা পছন্দ করে তাই সে করুক। আর এমন কি, যদি কিছু সে না করতেই চায় (আমি সেটা অহঙ্কার করে বলছিনে) তাতেই বা কি আসে যায়। সে চোর ছ্যাঁচড় না হয়েও সচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে, ভগবানকে ধন্যবাদ। তার ত কোন অভাব নেই। যদি সে তার বাপের ব্যবসা ছেড়ে অন্য কোন কাজই করতে চায়, তা বুঝে পছন্দ করে নিক। কয়লার ব্যবসা করুক, যদি ছুতোরের কাজ করতে চায় তাই করুক, যদি অন্য কোন মজুরীর কাজ করতে চায়, তাই করুক। আমাদের কোন আপত্তি নেই। তার ত কোন অভাব ভগবান রাখেন নি।

"আমি পাদরী হতে চাই" সাগ্রহে বালক বললে, "আমি পাদরী হতে চাই।"

তার মা উত্তর করলেন, "বেশ খুব ভাল, তাই হোক, তবে সে পাদরীই হোক।"

এই রকমে বালকের ভাগ্য নিরাকরণ হয়ে গেল।

পল টেবিলের উপর হাত দুটো আলগা ভাবে ফেলে দিয়ে, একবার চারদিক দেখে নিলে। তার মনে হল, একি, অন্য লোকের কাজকর্ম্মের ভেতর সে এসে এত বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রস্তুত কেন? যে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার কোন মীমাংসা নিজে করতে পারে নি, পারে না, সে আবার অ্যান্টিয়োকাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত কথা ও মীমাংসার ভেতর কেন

আসে? ...নেটা দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে, একখানা আগুনে পোড়ান লাল টকটকে লোহার হাতুড়ী যেমন আঘাতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, আশার আলোয় তার মুখখানা তেমনি হয়ে রয়েছে, আঘাতে গড়ে উঠবে বলে। প্রত্যেক কথারই সেই আঘাত দেবার ক্ষমতা রয়ে গেছে, সে ইচ্ছে করলেই গড়ে দিতে পারে, ইচ্ছে না হলে ভেঙে নষ্ট করে দিতে পারে। পলের দৃষ্টিতে মনে হয় তার উপর যেন তার ঈর্ষা হচ্ছে। তার অন্তরের ভেতর থেকে পলের বিবেক অ্যান্টিয়োকাসের মায়ের কাজের প্রশংসা করছে, এই জন্য যে, তার মা তার ছেলেকে, তার নিজের স্বভাবজাত ইচ্ছা ও পথে চলতে দিচ্ছেন, যা পলের মা করেন নি।

পল বললে, "দেখ স্বভাব কখন আমাদের ভুল পথে নিয়ে যায় না।" সে যেন নিজেই নিজের মনকে চীৎকার করে একথা শুনিয়ে দিলে। "কিন্তু এ্যান্টিয়োকাস, এখন শোন, তোমার মার সামনে বল, তুমি কি জন্য পাদরীর কাজে নিজেকে তৈরী করতে চাও। পাদরীগিরি সে একটা ব্যবসার ব্যাপার নয়, এত তুমি জান, এ কয়লার কারবারও নয়, ছুতোরের ব্যবসাও নয়। হয়ত তুমি মনে ভাবছ এখন, সে কাজটা অতি সোজা, বেশ আরামেই জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু পরে দেখবে যে আজীবন পাদ্রী হয়ে কাটান কতখানি শক্ত। সংসারে যে সব আনন্দ ও সুখ সকল মানুষের জন্য সচ্ছন্দভাবে আছে, যা তারা পায়, পাদরীর কাজের রাস্তায় সে সব সুখ ও আনন্দ পাবার কোন উপায় নেই, সে পথ তাদের চিরকাল ধরে বন্ধ থাকবে। আমরা ভগবানের দাস হয়ে তাঁরই কাজের জন্যে প্রাণমন উৎসর্গ করতে চাইলে আমাদের জীবন শুধু একটা একটানা ত্যাগের জীবন হওয়া চাই। এ জীবনে আর কিছুই পাবার নেই, সবই বারণ, সবই নিষেধ।"

বালক খুব সহজভাবে উত্তর করলে, "আমি তা জানি, আমি শুধু ভগবানের সেবা করতেই চাই।"

সে তার মার দিকে তাকালে, কেননা মার সামনে তার সমস্ত মনের ভাব এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল দেখে সে একটু লজ্জিত হল। কিন্তু তার মা সেই গরাদের পিছনে সেই সিংহাসনে বসে অতি শান্তভাবে সব শুনে যেতে লাগলেন, যেন সে তার খরিদ্দারদের সঙ্গেই বসে ব্যবসার কথা শুনছে। অ্যান্টিয়োকাস বলে যেতে লাগল,

"আমার বাবা ও মা দুজনেই ইচ্ছা করেন যে, আমি পাদরী হই, কেন তাঁরা এ বিষয়ে বাধা দেবেন? আমি অনেক সময় একটু অন্যমনস্ক থাকি বটে, তার কারণ আমি ত' এখনও ছেলেমানুষ, ভবিষ্যতে আমি আরো গম্ভীর হব। আর সব বিষয়ে আরো মনোযোগের সঙ্গে কাজ করব।"

পল বললে, "অ্যান্টিয়োকাস, সে কথা নয়, সে প্রশ্ন নয়, তুমি এখনই যথেষ্ট গম্ভীর ও মনোযোগী। তোমার যা বয়েস, সে বয়সে কোন কিছুতে দৃকপাত না করে, খুব আনন্দ করে বেড়ানই স্বাভাবিক। জীবনের যুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে নিজেকে তৈরী হতে হবে, শিখতে হবে, সে কথা ত ঠিক। কিন্তু তুমি যে বালক, তোমার খেলাধুলো আছে।"

অ্যান্টিয়োকাস বাধা দিয়ে বললে, "কেন আমি কি ছেলেমানুষের মত নই? আমিত' খুব খেলাধুলো করে বেড়াই। শুধু আমি যখন খেলা ধুলো করে বেড়াই, তখন আপনি দেখেন নি তাই। তা ছাড়া, আমার যদি ভাল না লাগে, তবে খেলা করে বেড়াব কেন? অনেক রকমের আনন্দ ও খেলা আমার আছে। গির্জের ঘণ্টা বাজিয়ে আমার ভারি আনন্দ হয়, আমার মনে হয় আমি যেন গির্জের চূড়োয় একটা পাখী হয়ে বসে আছি। এই আজকে কি আমার খুব আনন্দ হয় নি? ওই বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাবার সময়, ওই উচু পাহাড়ের উপর চড়া। আমি সবার আগেই সেখানে গিয়ে উঠেছি, যখন আপনি ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। আবার পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় কত আনন্দ হল, বাড়ী ফেরার সময়।.. আজ আমার খুব আনন্দ হয়েছে আমি আজ ভারি সুখী।" তারপর বালকের চোখ মাটির দিকে নেমে গেল ধীরে ধীরে বললে, "যখন আপনি নিনা মসিয়ার দেহ থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন।"

"তুমি এসব ভূত-ছাড়ান বিশ্বাস কর?" পাদরী সাহেব খুব আস্তে আস্তে এ কথাগুলি বললেন। তখনি ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, বালকের চোখ উপরের দিকে, ভগবানের মহিমায় বিশ্বাসের আলোয় তার মুখ যেন জ্বলজ্বল করছে। পল তার নিজের মনের অন্ধকার ছায়ায় ঢাকা অন্তরের দিকে তাকিয়ে তাকে ঢাকা দেবার জন্যে স্বভাবের দুর্বলতায় ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে ফেললে।

"শুধু যখন আমরা সবাই ছেলেমানুষ থাকি, তখন আমরা এক রকম ভাবি, সব জিনিষই আমাদের কাছে খুব বড় রকমের ব্যাপার আর খুব সুন্দর বলেই মনে হয়", পল বলতে লাগল, "কিন্তু যখন আমরা বড় হই, সব জিনিসেরই রূপ বদলে যায়, তখন সব আর এক মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। জীবন ধরে একটা এরকম গুরুতর জিনিসকে এভাবে আঁকড়ে চলতে যদি ইচ্ছে হয়, তবে সেটা নেবার বা ধরবার আগে বেশ করে সকল দিক দিয়ে বিচার করে, ভেবে চিন্তে নেওয়া উচিত, যাতে তাকে ভবিষ্যতে আর সেই কাজ নেওয়ার জন্যে পরে অনুতাপ না করতে হয়।"

বালক স্থিরভাবে বললে, "আমি কখনও অনুতাপ করব না, আমি নিশ্চয় জানি। আপনি কি কখনও এ কাজের জন্যে অনুতাপ করেছেন? না, নিশ্চয়ই না। আমিও কখন কাজ নিয়ে অনুতাপ করব না।"

পল আবার তার চোখ তুলে দেখলে: আবার তার বোধ হল, এই বালকের আত্মা যেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে, মোমের মত নরম, যেমন ইচ্ছে তাকে গড়া যেতে পারে, একটু আধটু এদিক-ওদিক টিপেন দেওয়ার ওয়াস্তা, একেবারে কুৎসিতও হয়ে যেতে পারে। আবার তার ভয় হল, আবার সে চুপ করে রইল।

এই সমস্ত ক্ষণই, অ্যান্টিয়োকাসের মা সেই গরাদের পিছনে বসে চুপ করে সব শুনে যাচ্ছে। কিন্তু পাদরী সাহেবের এই কথায় তার মনের ভেতর একটা ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল। তার সামনের দেরাজের একটা টানা খুলে দেখলে, সেখানে তার সব টাকাকড়ি থাকে, বেশী সুদে অল্প টাকা জিনিষ বাঁধা রেখে যা ধার দেয়, গ্রামের লোককে সেই সব জিনিষ, চেরি

ফলের মত কর্ণেলিয়ান কানের দুল, ব্রোচ, মুক্তা-বসান গয়না,যা গ্রামের মেয়েরা রেখে গেছে তা নাড়াচাড়া করলে। একটা অতি অদ্ভুত ভাবনা তার মাথায় খেলে গেল, তার মনের অন্ধকারভরা কোণ থেকে সেটা যেন চমক দিয়ে উঠল, যেমন ওই গয়নাগুলো অন্ধকার টানার ভেতর লুকোন পড়ে আছে, আবার চমকও দিচ্ছে।

"পাদরী সাহেব নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছেন যে, অ্যান্টিয়োকাস কোন দিন পাদরী হয়ে হয়ত এই গির্জ্জেবাড়ী থেকে তাঁকেই তাড়াবে", সে ভাবতে লাগল, "অথবা তাঁর টাকার খুব অভাব, সেই জন্যে এই সব আবোল-তাবোল বলে মনটাকে খাড়া করে নিচ্ছেন। এখুনি হয়ত টাকা ধার চাইবেন।"

টানাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে, খুব শান্তভাবে আবার ফিরে বসলে। সে ওখানে ওই রকম চুপ করেই বসে থাকত। কখনও তার খরিদ্দারদের তর্ক বা কথাবার্ত্তায় যোগ দেয় না। এমন কি যদি তারা আগ্রহ করে মত জানতে চায় তা হলেও নয়। যখন তাস খেলে তখনও নয়। এই রকমে সে চুপ করে থেকে অ্যান্টিয়োকাসকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমুখেই খাড়া রেখে দিলে,—সে নিজেই যা হয় করুক।

"এ বিশ্বাস না করা, কি করে সম্ভব হতে পারে বলুন?" বালকটি উৎসাহিত ও আশ্চর্য্য হওয়ার মাঝামাঝি ভাব দেখিয়ে বললে, "নিনা মাসিয়াকে ভূতে পেয়েছিল, পায়নি? সে কি! আমি নিজে দেখেছি, আমার বেশ মনে আছে যে শয়তান তার দেহের ভিতর কাঁপছে, যেমন একটা নেকড়ে বাঘ খাঁচার ভেতর কাঁপে আর ছটফট করে। আর এটা সত্যি যে, শুধু আপনার মুখে সেই বাইবেলের বাণী শুনে ভূত তাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

সে কথা অবশ্য সত্য, ভগবানের বাণী সব কাজই সাধন করতে পারে, পাদরী সাহেব তা স্বীকার করলেন। তারপর হঠাৎ পল তার আসন ত্যাগ করে উঠল।

তিনি কি চলে যাচ্ছেন তবে? অ্যান্টিয়োকাস তার দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। "আপনি কি চলে যাচ্ছেন?" সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এই কি তাঁর এখানে শুভক্ষণে আসা! সে মার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার মাকে ভাবে বোঝালে যে, এ কি করছ? মা ঘুরে গিয়ে তাকের ওপর থেকে একটা বোতল পাড়লে। মনে ভেবেছিল, আশা ছিল, গ্রামের পাদরী সাহেবকে কম সুদে টাকা ধার দিয়ে তার এই সুদ-খাওয়া বৃত্তিটা ভগবানের সামনে একেবারে আইনসঙ্গত করে নেবে। কিন্তু তা না করে, সে ব্যক্তি কিনা বললে যে, দেখ অ্যান্টিয়োকাস, ছুতোরের ব্যবসা করা আর পাদরীগিরী করা একেবারে এক নয়। যাক্, তিনি যখন এসেছেন, তখন তাঁকে যে রকমেই হোক শ্রদ্ধা করা দরকার।

"সেকি! সেকি! প্রভুপাদ এমন ভাবে চলে যাচ্ছেন? তা কি হয়! অন্ততঃ কিছু পান করতে সম্মত হন, এ মদ খুব পুরোনো, বড় ভাল জিনিস।"

অ্যান্টিয়োকাস আগে থেকেই খুঙ্কেতে গেলাস বসিয়ে হাতে ধরে ছিল, "আচ্ছা, তা হলে খুব একটুখানি দাও", পল বললে।

গরাদের পাশে হেলান দিয়ে স্ত্রীলোকটি মদ গেলাসে ঢালতে লাগল, এমন সাবধানে যেন একটি ফোঁটাও না ছিটকে পড়ে। পল গেলাসটা হাতে তুলে ধরলে, তার ভেতরে চুণী রঙের মদ, তা থেকে গোলাপের সুগন্ধ বের হচ্ছে, তারপর অ্যান্টিয়োকাসের ঠোঁটে ঠেকিয়ে, সে গেলাসে তার নিজের ঠোঁট ঠেকালে।

"তবে ভবিষ্যৎ এখার গ্রামের পাদরী সাহেবের নামে আমরা এই সুরা পান করি।" পল বললে।

অ্যান্টিয়োকাস পা টলে পড়ছিল, গরাদে হেলান দিয়ে তবে যেন সে দাঁড়াতে পারলে। তার হাঁটু দুটো দুমড়ে যাচ্ছে। জীবনের সব চেয়ে এই হল তার আনন্দ-মুহূর্ত্ত। তার মা ঘুরে আবার সেই দামী মদের বোতল তাকে তুলে রাখলে। ওদিকে আনন্দের উল্লাসে বালক দেখতে পেলে না যে, পাদরী সাহেবের মুখখানা একেবারে মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে, দরজার দিকে অবাক হয়ে চোখ কটমটিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন, যেন সামনে ভূত দেখেছেন।

একটা কালো মূর্ত্তি চৌমাথার ধার পেরিয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে আসছে। মদের দোকানের দরজার কাছে এসে, ভেতর পানে এদিক ওদিক দেখে কালো চোখ ড্যাব ড্যাবে করে তাকিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে দোকানে ঢুকে পড়ল।

মেয়েটি এ্যাগ্‌নিসের একটি দাসী।

পাদরী সাহেব ভয়ে মদের দোকানের শেষের দিকে সরে দাঁড়াল, নিজেকে লুকোবার জন্য। তারপর হঠাৎ সেদিক থেকে একেবারে মনের ভেতরের এক ধাক্কায় সামনে এগিয়ে এল। তার মনে হল, যেন সে একটা লাট্টু, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে ভেবে নিলে যে, সে ত এখানে একলা নেই, পাছে এরা অন্য কোন কথা ভাবে সেজন্য তার সাবধান থাকাই উচিত। সেই জন্যে একেবারে শান্ত ভাবে খাড়া হয়ে রইল। তার ইচ্ছা ছিল না একেবারেই যে, মেয়েটা ওই স্ত্রীলোকটির কাছে কি বলছে তা শোনে। স্ত্রীলোকটা খুব মনোযোগ দিয়েই তার কথা শুনছে। পল কেবল পালিয়ে নিরাপদ হবার আকাঙ্ক্ষায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। তার বুকের শব্দ থেমে গেছে। তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়েছে, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। তা সত্ত্বেও সেই দাসীর কথা সব তার বুকের ভেতরে গিয়ে বিঁধলে।

মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, "তিনি পড়ে গেছেন, নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বয়ে যাচ্ছে, এমন রক্তের ধারা যে আমাদের মনে হচ্ছে তার মাথার ভেতর কোথায় শির ছিঁড়েছে, কি কিছু ভেঙে গেছে। এখনও পর্য্যন্ত রক্ত তেমনই পড়ছে, থামেনি। আমাকে মিশরের সেণ্ট মেরীর যে চাবি আছে তা শীগ্‌গির দাও। শুধু তাই ছুঁইয়ে দিলে এ রক্ত বন্ধ করতে পারবে।"

অ্যান্টিয়োকাস খুঙ্কে আর গেলাসটা হাতে নিয়ে তখনও শুনছিল। পুরোনো গির্জ্জের এখন যেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার চাবিটা আনতে সে ছুটে চলে গেল। সে চাবিগুলো সত্যিই কারো কাঁধে ছুঁইয়ে রাখলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া খানিকটা বন্ধ হয়ে যায় এরকম কথা আছে।

পল ভাবলে, এ সব ছলনা, আর কিছু নয়, এর মধ্যে কোন সত্যি নেই। সে তার এই দাসীটাকে পাঠিয়েছে গোয়েন্দার মত আমার পেছনে, আর আমাকে একটা ভাঁওতা দেখিয়ে তার ওখানে নিয়ে যাবার এ একটা কল। এরাও নিশ্চয় সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে।

তখন তার মনের ভেতর এমন একটা চাঞ্চল্য এল যে, তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ একেবারে যেন উল্টেপাল্টে দিতে লাগল। আহা না, দাসী মিছে কথা নিশ্চয়ই বলেনি। এ্যাগ্‌নিস যথেষ্ট অহঙ্কারী, সে কারো কাছে এ সব কথা বিশ্বাস করে জানাবে বলেও মনে হয় না। বিশেষতঃ আবার তার দাসীদের কাছে। নিশ্চয়ই মিছে কথা নয়। এ্যাগ্‌নিসের নিশ্চয়ই অসুখ, সত্যই তার বিপদ। তার মনের চোখ দিয়ে সে দেখলে, আহাঃ, সারা মুখখানা একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যে আঘাতে এ রক্ত পড়ছে সে আঘাত পল নিজেই যে করেছে। ওই যে দাসী বললে না, "আমাদের মনে হয় তার মাথার ভিতরে কি বুঝি ভেঙে-চুরে গেছে।"

সে দেখলে গরাদের পিছনে বসে, সেই স্ত্রীলোকটা ছলনামাখা চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। পল যে এ ব্যাপার গায়ে মাখলে না এতে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেছে।

"কিন্তু কি করে এটা ঘটল?" দাসীকে পল জিজ্ঞাসা করলে, খুব শান্ত ও গম্ভীর ভাবে, যেন সে নিজেই নিজের উৎকণ্ঠাকে ভাল করে চাপা দিচ্ছে, যেন অন্য কেউ তা বুঝতে না পারে। মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে একেবারে পাদরী সাহেবের মুখোমুখী হল, তার কাল শক্ত টিকলো নাক মুখ একেবারে সামনে যেন পাথরের মত হয়ে রইল, তাকে কোন কথা বলে আঘাত করতে পলের বেশ একটু ভয় হল।

"তিনি যখন পড়ে যান, আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি যখন ঝরণা থেকে জল আনতে যাই আজ সকালে, তখন এটা হয়েছে। আমি ফিরে এসে দেখি তাঁর ভয়ানক অসুখ। দরজার চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে তিনি গেছেন পড়ে, গল গল করে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আঘাত যত গুরুতর না হোক ভয় হয়েছে তাঁর অনেক বেশী। তারপর রক্ত পড়া থেমে যায়, সারাদিন ভয়ানক দুর্ব্বল বোধ করেন আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, কিছুই খেতে চান নি। আবার এই সন্ধ্যা থেকে রক্ত পড়া আরম্ভ হয়েছে। শুধু তাই নয়, কি যেন এক রকম ধনুষ্টঙ্কারের মত হাত পা খেঁচে দুমড়ে উঠছে। এই এখনি তাঁকে রেখে আমি এখানে ছুটে আসবার সময় দেখে আসছি, হাত পা ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে, আর রক্ত এখনও ঝরছে। আমার ত হাত পা আসছে না।" মেয়েটি এই কথা বলে অ্যান্টিয়োকাসের হাত থেকে চাবিগুলো নিয়ে তার কাপড়ে জড়িয়ে রেখে আবার বললে, "আর শুধু আমরা দুজনে মেয়েমানুষ বাড়ীতে আছি, আর ত কেউ নেই।"

দরজার দিকে মেয়েটি এগিয়ে গেল, কিন্তু সমস্তক্ষণই তার কাল চোখ দিয়ে পলের মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল, যেন শুধু তার দৃষ্টির বলে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অ্যান্টিয়োকাসের মা সেই গরাদের পিছনের আসন থেকে বলে উঠল, একটু কেমন যেন বেসুরো সুরে,

"প্রভুপাদ কেন একবার নিজে সেখানে গিয়ে তাকে দেখেন না।"

অজানিত ভয়ে পল তার দুটো হাত কচলাতে কচলাতে, তোতলার মত বললে, "আমি ত, আমি ত ঠিক জানতাম না। আর এখন অনেক রাত হয়ে গেছে?"

"হাঁ, আসুন আসুন!" দাসীটা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। "আমার মনিবঠাকরুণ নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হবেন, আপনাকে কাছে পেলে তাঁর সাহস বাড়বে।"

পল ভাবলে, "শয়তান তার মুখ দিয়ে একথা বলছে।" কিন্তু আপনার অজ্ঞাতে সে মেয়েটির পিছু পিছু গেল। অ্যান্টিয়োকাসের কাঁধের উপর হাত জোর করে রাখল, তাকে যেন একটা অবলম্বনের মত ধরে চলতে চায়। ছেলেটা যেন এখন তার কাছে সেই মহাসমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের মাঝে একখানা তক্তা, ভেলার মত নিরাপদ। তাকে ধরে পল এগিয়ে গেল। চৌমাথা পেরিয়ে তারা গির্জ্জে-বাড়ীর কাছ বরাবর এল। দাসীটা আগে আগে দৌড়ে যাচ্ছিল। গোটা কতক করে পা ফেলে, আবার তাদের মুখের দিকে ফিরে ফিরে চায়। তার কালো চোখের সাদা ক্ষেত চাঁদের আলোয় জ্বল জ্বল করছে। রাত্রে তাকে যেন কি রকম দেখাচ্ছে। কালো মূর্ত্তি, কালো মুখোস পরা মুখখানায় যেন কি একটা নিষ্ঠুর শয়তানী মাখান। পল একটা ভয়ে ভয়ে যেন তার পিছু চলেছে। অ্যান্টিয়োকাসের কাঁধে ভর দিয়ে সে চলতে লাগল, যেমন অন্ধ অবস্থায় চলে।

গির্জ্জেবাড়ীর কাছ এসে দরজা পেরিয়ে যাবার সময় বালক অ্যান্টিয়োকাস সেটা খোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল যে, দরজাটায় চাবি বন্ধ। পল বুঝলে মা তালা বন্ধ করে রেখেছেন। পল একটু থামলে, থেমে তারপর সঙ্গীদের চলে যেতে বললে।

"মা আমার চাবি বন্ধ করে রেখেছেন, কারণ আগে থেকেই তিনি জানেন যে, আমি আমার কথা রাখব না।" পল এই মনে ভেবে বালককে বললে:

"অ্যান্টিয়োকাস, তুমি তা হলে এখনি বাড়ী যাও।"

দাসীটাও দাঁড়িয়ে ছিল, দুচার পা এগিয়ে গেল, তারপর আবার থামলে। দেখলে যে বালক বাড়ীর দিকে ফিরে গেল আর পাদরী সাহেব তার দরজায় চাবি লাগিয়ে খুলছেন। তখন সে তার কাছে এল।

পল মুখ ফেরালে। একেবারে ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয় দেখিয়ে তাকে বললে, "আমি এখন আসতে পারব না।" দাসীটার মুখের পানে সোজা তাকিয়ে চেষ্টা করতে লাগল, তার বাইরের মুখের ভাব থেকে আসল সত্যিটা জানা যায় কি না। তারপর করুণভাবে তাকে বললে, "দেখ সত্যিসত্যি যদি আমাকে তোমাদের দরকার হয়, বুঝতে পারছ? সত্যি যদি আমাকে তোমাদের দরকার হয়,—তা হলে ফিরে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেয়ো।"

দাসীটা চলে গেল আর একটা কথাও বললে না। পল তার নিজের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তার হাত সেই চাবির উপর, যেন লাগান চাবি ঘুরতে চায় না, ফিরে দরজা খুলতে চায় না। সে কিছুতেই বাড়ীতে ঢুকতে পাচ্ছে না, বাড়ীতে ঢোকা যেন তার শক্তির একেবারে বাইরে। সামনেও সে আর এগুতে পারে না। তার মনে হল সে যেন সেই দরজার সামনে অনন্তকালের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবার অভিশাপ পেয়েছে, একটা বন্ধ দরজা, যেখানে সে ঢুকতে পারে না, যদিও চাবি তার হাতেই রয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যান্টিয়োকাস বাড়ী গিয়ে পৌঁছেছে। তার মা দরজায় চাবি দিলেন। বালক গেলাসগুলো ধুয়ে দূরে সরিয়ে রেখে দিলে। প্রথম গেলাস যেটা ধুলে, সেটা হল যেটা থেকে সে নিজে পান করেছিল। ফরসা সাদা কাপড় দিয়ে বেশ খুব যত্নের সঙ্গে সেটা শুকনো করে মুছলে। তার ভেতরের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাল করে মুছলে। তারপর আলোর শিখার কাছে গেলাসটা ধরে এক চোখ বুজে পরীক্ষা করতে লাগল। গেলাসটা দেখাতে লাগল যেন খুব বড় একখানা হীরের মত ঝকঝকে। তার পর সেটাকে তার নিজের বাসন রাখবার জায়গায় রেখে দিলে, এমন নিবিড় শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখলে, যেন সেটা অতি পবিত্র উপাসনার একটা পাত্র।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ডাক-টিকিট সংগ্রহ

ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা মস্ত বড় একটি নেশা। ব্যক্তিগত খেয়াল থেকে এখন ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার ব্যাপার একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহকারীদের রীতিমত সভাসমিতি আছে এবং অনেক দেশের রাজা বা শাসক স্বয়ং এই সব সমিতির উদ্যোগী কর্ম্ম-কর্ত্তা। এই সব সভার মধ্যবর্ত্তিতায় এক দেশের সংগ্রহকারী অন্য দেশের সঙ্গে রীতিমত ভাবে সংযুক্ত থাকতে পারেন। এই ভাবে ডাক-টিকিটসংগ্রহকারীদের জগৎ-ব্যাপী এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

আজকাল এই সব সমিতি থেকে ডাক-টিকিটসংগ্রহ করার ব্যাপার নিয়ে দেশে-বিদেশে ডাক-টিকিট সম্বন্ধে নানারকমের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মানুষের এই অবসর-বিনোদনের খেলা থেকে এক অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে।

আমরা যারা পয়সা রোজগার বা খরচ করি, আমাদের সঙ্গে টাকা-পয়সার এক রকম সম্বন্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে টাকা-পয়সার আর একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাঁদের গবেষণার পক্ষে, ইতিহাসের দিক থেকে, টাকা-পয়সার ভয়ানক দাম। বিশেষ করে টাকা-পয়সা যত পুরানো হবে, তত বেশী কাজে লাগে। তার কারণ, টাকা বা পয়সার গায়ে তারিখ থাকে, যে রাজার আমলে মুদ্রিত হয়েছে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি থাকে, সেই জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে এর বিশেষ মূল্য আছে। পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ করা এবং তার পাঠোদ্ধার করা ঐতিহাসিকের একটা মস্ত বড় কাজ।

ডাক-টিকিটের উপর যে ছবি থাকে, আমরা সাধারণত তা লক্ষ্য করি না; কিন্তু ডাক-টিকিটের এই সব বিভিন্ন ছবির মধ্য দিয়ে সমসাময়িক জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে বার করা যায়। প্রত্যেক দেশের ডাক-টিকিটের উপর যে ছবি ছাপা হয়, তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সেই দেশের ইতিহাস বা কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে তার সেই ছবির অতি ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। আজকাল যে পদ্ধতি অনুসারে ডাক-টিকিটের উপর ছবি ছাপান হয়, তাতে করে, ডাক টিকিট থেকে সেই দেশের মোটামুটী সব বড় ঘটনার একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়েছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ইংলণ্ডে স্যর রোণাল্ড হিল সর্ব্বপ্রথম ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এক পেনীর ডাক-টিকিটের প্রচলন করেন। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত, পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা বলে শেষ করা
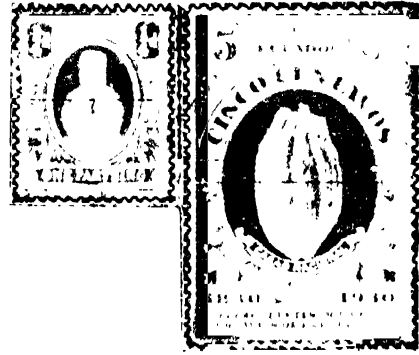
ডাক-টিকিটে উদ্ভিদের ছবি: টার্কস আইলাণ্ডের ক্যাক্টাস ও ইকোয়েডরের ক্যাকাও।

যায় না। গত একশো বছরের মত যুগান্তরকারী শতাব্দী বোধহয় জগতে আর আসে নি। সেই একশো বছরের জগতের ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার প্রমাণ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ডাক-টিকিটের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। সেইজন্য বলছিলাম যে, এই অবসর-বিনোদনের খেলা থেকে ক্রমশঃ এক অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। ডাক-টিকিটের সাহায্যে চিঠির চলাচল ছাড়া কল্যাণকর অন্য বহু কাজ মানুষ করে নিচ্ছে। তার পরিচয় পরে দিচ্ছি।

সাধারণ লোক, বিশেষ করে ছাত্রেরা একখানা ডাক-টিকিটের এ্যালবাম থেকে অনেক জিনিষ শিখতে পারেন। পুরাতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বিমানপোত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ডাক-টিকিটের সাহায্যে বোঝান সম্ভব।

প্রথমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের কথা ধরা যাক্। জগতের বিভিন্ন দেশের ডাক-টিকিট থেকে, এত বিভিন্ন জাতীয় ফল-ফুলের

নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা কোন ছাত্র কোন একখানা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বই থেকে পাবে না। সেই সঙ্গে অনায়াসে জানা যায়, কোন্ দেশে কোন্ ফল বিশেষভাবে হয়। কিউবার পাম গাছ, চীনের ধান-ক্ষেত, মিশরের তুলো, ইকোয়েডর প্রদেশের "কাকাও" ফল, যা থেকে আমাদের কোকো হয়, ফ্রান্স আর ইতালীর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, লেবাননের চন্দন-বন, সমস্তই সেই সব দেশের বিভিন্ন ডাক-টিকিটে আমরা মুদ্রিত দেখতে পাই। এইভাবে, আমরা বোধ হয় প্রত্যেক দেশের প্রধান শস্যের একটা চিত্র-নমুনা সংগ্রহ করতে পারি।
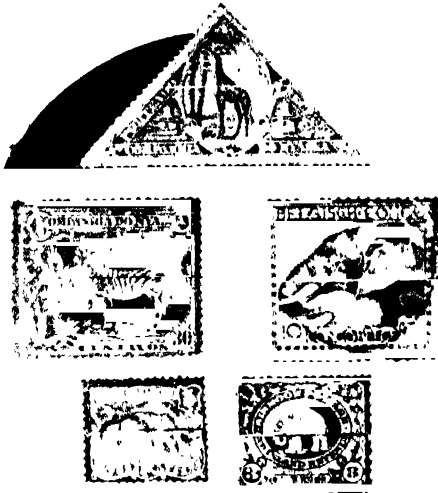
ডাক-টিকিটে জীব-জন্তুর ছবি।

পশু-পক্ষীর দিক থেকে, এক একটা বড় শহরের পশুশালায় যে সব জন্তু নেই, তাদেরও খবর এবং চেহারা আমরা ডাক-টিকিটের এ্যালবাম থেকে পেতে পারি। এবং চেষ্টা করলে A থেকে আরম্ভ করে Z পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তু পরে পরে সাজিয়ে যাওয়া যায়—বৃটীশ গায়নার 'পিপীলিকা-খাদক' (ant-eater) থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকার জেব্রা (Zebra) পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তুর চিত্রই ডাক টিকিটে পাওয়া যায়। কোন কোন জন্তুর জাতি, উপজাতি বিভাগ করেও সাজান যায়। ভারতের সামন্ত রাজত্ব সিরমুর ষ্টেটের ডাকটিকিটে ভারতীয় হাতী আর বেলজিয়ান কঙ্গোর ডাকটিকিটে আফ্রিকান হাতীর চিত্র থেকে স্পষ্টতঃ এই দুই দেশের হাতীর গঠনের পার্থক্য বোঝা যায়। সুদান এবং উত্তর মঙ্গোলিয়ার কোন কোন প্রদেশের ডাকটিকিটে উটের ছবি থাকে। কিন্তু এই দুই উটের গড়ন আলাদা। সুদানের ডাকটিকিটে যে উট সে এসেছে আরব দেশ থেকে, তার পিঠে একটা কুঁজ কিন্তু উত্তর মঙ্গোলিয়ার উটেরা ভিন্ন জাতের। তাদের পিঠে দুটো করে কুঁজ। লাইবেরিয়া অঞ্চলের ডাক-টিকিটে পশু-পক্ষীর ছবি খুব বেশী থাকে। ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের তিমি থেকে আরম্ভ করে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সামন্ মাছ, তলায় লেখা King of the River, সমস্তই ডাকটিকিটে মিলবে। এই ডাক-টিকিটের উপর মাছের ছবি থেকে বোঝা যায়, এই মাছের সঙ্গে সেই দেশের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে যে, এই ছোট দ্বীপ থেকে বছরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাছ রপ্তানী করা হয়।

নৃ-তত্ত্বের দিক দিয়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের আকৃতি, গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিবরণ ডাক-টিকিটের ছবি থেকে বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরপৃষ্ঠার ছবিতে ছটি বিভিন্ন দেশের ছটি প্রতিমূর্ত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে তিনজন হলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। প্রথম ছবিটি হল, আফ্রিকার কাবন প্রদেশের নর-খাদক, পিঠে তূণে ভরা বিষাক্ত বাণ। ষষ্ঠ ছবিটি হল বর্ত্তমান য়ুরোপের লুক্‌সেম্‌বুর্গ প্রদেশের তরুণী। দ্বিতীয় ছবিটি একজন ভারতীয় সামন্তরাজের। তৃতীয় ছবিটি লাইবেরিয়া গণতন্ত্রের সভাপতির প্রতিমূর্ত্তি, চতুর্থ মূর্ত্তি চীনের মুক্তিদাতা সান-ইয়াৎ-সেনের এবং পঞ্চম মূর্ত্তিটি আমেরিকার সাল্-ভা-ডোরের সর্ব্বজন সমাদৃত আদিম নিবাসীদের দলপতি আত্‌লাকাত্‌লের ছবি।

যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁদের জীবন এবং সাধনার দ্বারা সমসাময়িক জগৎকে গড়ে তুলছেন তাঁদের অধিকাংশেরই পরিচয় ডাক-টিকিটের ছবি থেকে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক চরিত্র নামে যে দুখানি ডাক-টিকিটের ছবি এখানে ছাপান হয়েছে, সে দুটির একটু বিশেষত্ব আছে। উপরের টিকিটটি পোলাণ্ডের, নীচেরটি ব্রেজিলের। উপরের টিকিটের ছবিতে দুদিকে পোলাণ্ডের দুই বীর সন্তান কস্‌কুইস্‌কো এবং পুলাস্কি। কিন্তু মধ্যখানে যাঁর ছবি তিনি পোলাণ্ডের কেউ নন্—তিনি হলেন আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ

ওয়াশিংটন। এ রকম যোগাযোগ কি করে সম্ভব হল? ডাক-টিকিটের উপর ওয়াশিংটনের ছবির তলায় দুটি বছরের উল্লেখ আছে একটি ১৭৩২, আর একটি ১৯৩২। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংটন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ডাক-টিকিটে ব্যবহার করা হচ্ছে। সোবিইস্কি এবং জোসেফ বেম্ প্রাচীন পোলাণ্ডের দুই বীরপুরুষ। তাঁদের দুজনেরই ছবি মার্শাল পিল্‌সুড্‌স্কীর ছবির সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাযুদ্ধের পর হাঙ্গেরীতে আহত এবং আশ্রয়হীন

নৃতত্ত্ব: বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির আকৃতি, গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই ডাক টিকিট হইতে জানা যায়: (১) আফ্রিকা কাবন: নরখাদক (২) ভারতবর্ষ: সামন্ত নৃপতি (৩) লাইবেরিয়া: গণতন্ত্র-সভাপতি (৪) চীন: সানইয়াৎ সেন) (৫) সালভাডোর: আত্‌লাকাৎল (৬) লুক্সেমবুর্গ: তরুণী।

জগতের সমস্ত সভ্য দেশ এই মহাপুরুষের দ্বিতীয় শতবার্ষিক জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পোলাণ্ডের রাজ-সরকার এই উপলক্ষে নতুন ডাক-টিকিট বের করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাঁদের অন্তরের মৈত্রী-বাসনা জ্ঞাপন করেন। দ্বিতীয় ডাক-টিকিটটিতে বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব রাজা এ্যালবার্ট এবং ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্টের ছবি পাশাপাশি রয়েছে। মহাযুদ্ধের পর যখন বেলজিয়ামের রাজা ব্রেজিলে এসেছিলেন তখন তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে ব্রেজিলের গভর্ণমেণ্ট এই ডাক-টিকিট বার করেন।

সমস্ত মহাযুদ্ধ এবং তার ফলে য়ুরোপের বিপর্য্যয়ের অনেক ইতিহাস ডাকটিকিট থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেকো-শ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, লাটভিয়া, লিথুয়ানা, মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা পায়। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে সেই সব দেশের ডাক-টিকিটে বিশেষ ছবির ব্যবস্থা করা হয়। যেকো-শ্লোভাকিয়ার কোন ডাক-টিকিটের ছবিতে দেখান হয়েছে, বন্দী সিংহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলছে, কোন ছবিতে দেখান হয়েছে, মা দু হাত বাড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে বুকে তুলে নিচ্ছেন। পোলাণ্ড তার নবজন্মদাতা মার্শাল পিল্‌সুড্‌স্কীর ছবি ডাক-টিকিটের উপর ছাপিয়ে মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়কের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। পোলাণ্ডের এই নব জাতীয় জাগরণ উপলক্ষে তার অতীত ইতিহাসের বীরপুরুষদের ছবি

সৈন্যদের সাহায্যের জন্য এক রকম ডাক-টিকিটের উপরে, ছবিতে রুষদের হাতে বন্দী হাঙ্গেরী-সৈন্যদের চিত্র দেখান হয়েছে। মহাযুদ্ধের বহু দৃশ্য ও ঘটনাকে চিত্রিত করে
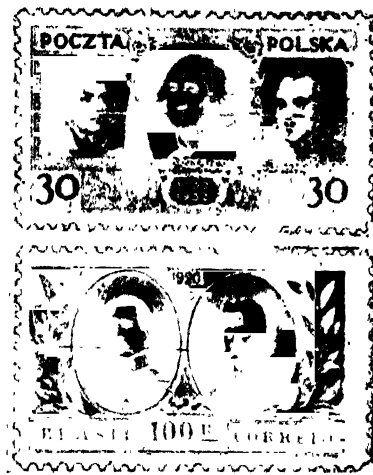
ঐতিহাসিক চরিত্র: উপরে পোলাণ্ডের কস্‌কুইস্কো ও পুলাস্কির মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন। নীচে ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট ও বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলবার্ট।

তুরস্কের ডাক-টিকিটে ব্যবহার করা হয়। কোথাও সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে তুরস্ক সৈন্যরা চলেছে, কোথাও বীরসেবার বাইরে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও গ্যালিপলীর ট্রেঞ্চের

কোন দৃশ্য! কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মানী মহাযুদ্ধের ঘটনা স্মারক বিশেষ কোন ছবি ব্যবহার করে নি।

নোট হিসাবে ডাক-টিকিটের ব্যবহার নামে যে দুটি ডাক-টিকিটের দুপিঠ ছবি এখানে ছাপান হয়েছে, সে দুটিই মহাযুদ্ধের এক অতি শোচনীয় পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন অনেক য়ুরোপীয় দেশের এরকম অবস্থা যে কাগজের অভাবে তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে নোট বের করতে পারেন না। সেই দুরবস্থার সময় তাঁরা ডাক-টিকিট এবং ব্যাঙ্ক-নোট এক সঙ্গেই তৈরী করেন। এই সব ডাক-টিকিট টাকা

নোট হিসাবে ডাক-টিকিট ব্যবহার: উপরে রুষিয়া, নীচে লাটভিয়া।

হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারত, আবার টিকিট হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারত। উপরের ডাক-টিকিটটি রুষিয়ায় প্রচলিত হয় তখনও রুষিয়ায় বোল্‌শেভিক উত্থান হয় নি। টিকিটের উপর রুষিয়ার রোমানফ বংশের শেষ জারের ছবি। রোমানফ বংশের শত বর্ষ রাজত্বকাল সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই ডাক-টিকিট ব্যবহার করা হয়। নীচের টিকিট খানি লাটভিয়া দেশের। ১৯২০ সালে লাটভিয়ার এ রকম অবস্থা হয় যে, কাগজের নোটের বদলে তাঁরা এই সব ডাক-টিকিট ব্যবহার করতে বাধ্য হন এবং ডাক-টিকিট ছাপাবার উপযুক্ত কাগজও তাঁদের ছিল না। তাঁরা যুদ্ধে ব্যবহৃত ম্যাপের পেছন দিকে ডাক-টিকিট ছাপিয়েছিলেন।

বর্ত্তমান এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজের বয়স খুব বেশী নয়। প্রকৃত পক্ষে মহাযুদ্ধের সময় থেকেই এরোপ্লেনের প্রচলন বাড়তে আরম্ভ করে। মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপের ডাক-টিকিটে বর্ত্তমান যুগের এই অতি প্রয়োজনীয় আকাশযানের আবির্ভাব-কাহিনীও চিত্রবদ্ধ হয়ে আছে। "আকাশযানের কাহিনী" শীর্ষক চিত্রের দুটি ডাক-টিকিটে আকাশযানের ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা চিত্রিত দেখতে পাচ্ছি।

উপরের প্রথম ডাক-টিকিটটি গ্রীক এয়ারমেলে ব্যবহার করা হয়। উপরের ছবিটিতে আকাশবিহারের আদিম চেষ্টার কাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে। যদিও এয়ার-শিপ্ বা এরোপ্লেনকে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার বলা যেতে পারে, কিন্তু জগতের আদিম কাল থেকে মানুষের অন্তরের প্রবল বাসনা ছিল, পাখীর মত সে আকাশে উড়বে। তাই প্রত্যেক সভ্য জাতির পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে নানা রকমের আকাশ-বিহারের কল্পনা আমরা দেখতে পাই। য়ুরোপের পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে গ্রীস দেশের পুরাণে আমরা সর্ব্ব প্রথম অনুরূপ দৃষ্টান্তের পরিচয় পাই। কথিত আছে আইকেরাস্ পাখীর মত ডানা নিজের দেহে সংযুক্ত করে আকাশে উড়েছিলেন। যে জিনিস দিয়ে পাখা দুটো তাঁর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, সূর্য্যের কিরণে তা গলে যাওয়ায় পাখা দুটো তাঁর দেহ থেকে পড়ে যায় এবং তার ফলে আইকেরাস্ মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই পুরাণের কাহিনীকে গ্রীক এয়ার-মেলের ডাক-টিকিটে চিত্রিত করা হয়েছে। আইকেরাস্ ডানা মেলে আকাশপথ দিয়ে চলেছেন। আইকেরাস্‌কে অনুকরণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীতে লিলিয়াস্থেল দেহের সঙ্গে পাখা সংযুক্ত করে উড়তে চেষ্টা করেন। যদিও এই ব্যাপারে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু লিলিয়াস্থেলের প্রচেষ্টা থেকেই বর্ত্তমান এরোপ্লেনের উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় ডাক-টিকিটটি বর্ত্তমান আকাশ-যানের ইতিহাসের দ্বিতীয় স্মরণযোগ্য ঘটনাকে চিত্রিত করে রেখেছে। টিকিটটি ব্রেজিলের। ব্রেজিলের বিখ্যাত বিমান-পোত-চালক সান্তস্-ডুমন্টের নাম আকাশ-বিহারের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তিনিই জগতে সর্ব্বপ্রথম ১৯০১ সালে উড়ো-জাহাজ করে প্যারিসের ঈফেল টাওয়ারের চারদিক পরিভ্রমণ করে চার হাজার পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু উড়ো-জাহাজের গঠনকে তিনি সম্পূর্ণ করতে

পারেন নি। উড়ো-জাহাজের গঠনকে সম্পূর্ণ করেন—জার্ম্মানীর কাউন্ট জেপলিন্ এবং তাঁরই নাম অনুসারে উড়ো-

ডাক-টিকিটে আকাশ-যানের কাহিনী।
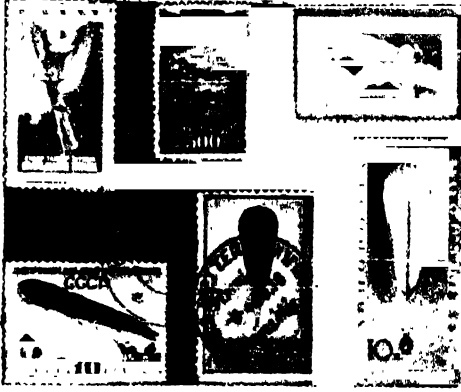
জাহাজের নাম হয়, জেপলিন্। সান্তস্ ডুমণ্ট উড়ো-জাহাজ থেকে এরোপ্লেন গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৬ সালের ১২ই নভেম্বর তিনি যে-এরোপ্লেন করে আকাশ বিহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, প্রথম সারির মধ্য-খানের ডাক-টিকিটে সেই ঘটনাটিকে চিত্রিত করা হয়েছে। ডাক-টিকিটে তাঁর নাম এবং সেই সঙ্গে সেই ঘটনার তারিখও দেওয়া রয়েছে। তৃতীয় ছবিতে বর্ত্তমান এরোপ্লেনের চিত্র দেখান হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এরোপ্লেনের গঠন এবং কার্য্যকারিতার যে কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা কল্পনা করা যায় না। যে যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই যন্ত্র আজ মাত্র দুযুগ পরে ঘণ্টায় দুশো মাইলেরও বেশী বেগে সমানে আকাশ-পথ দিয়ে চলেছে। নীচের সারির বাঁদিকের প্রথম ডাক-টিকিটটি সোভিয়েট রুষিয়ার পোষ্ট-অফিসের টিকিট, কিন্তু তাতে মুদ্রিত জার্ম্মানীর বিখ্যাত গ্রাফ জেপ্লিনের ছবি। উড়ো-জাহাজ বা জেপলিনের নির্ম্মাণে জার্ম্মানী সকলের চেয়ে আগে পারদর্শী হয়। কন্‌স্টান্স্ হ্রদের ধারে ফ্রীডরিশ স্হাফেনের জগৎ বিখ্যাত কারখানায় কাউণ্ট জেপ্লিন তাঁর অভিনব আবিষ্কারকে সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ডাঃ একনার সেই কারখানা থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রাফ জেপ্লিন নির্ম্মাণ করেন। ডাঃ একনার তাঁর গ্রাফ জেপ্লিন নিয়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে প্রমাণ করে দেন যে, উড়ো-জাহাজে মানুষ বিনা আশঙ্কায় এবং স্বচ্ছন্দে আকাশ-পথ দিয়ে চলাচল করতে পারে। যখন গ্রাফ জেপলিন ফ্রীডরিশ স্হাফেনের কারখানা থেকে মস্কো শহরে যায়, তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেই ঘটনা উপলক্ষে এই ডাক-টিকিট তৈরী করেন। গ্রাফ জেপ্লিন তখন জগতের সকল জাতির লোকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। এই ডাক-টিকিট বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তাই নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ফাণ্ড খোলা হয়। এই ফাণ্ডের অর্থে গ্রাফ জেপলিনের অনুরূপ একটি উড়ো-জাহাজ গড়ে তোলা হয়। বর্ত্তমান কালে আকাশ-বিহার সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হচ্ছে বেলুনে করে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে বিচরণ করা। বায়ুমণ্ডলে কে কত দূর উঠতে পারে তাই নিয়ে জাতিতে জাতিতে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়েছে

এঞ্জিনীয়ারিংএর কীর্ত্তি।

এবং ডাক-টিকিটেও তার রেখা পড়েছে। ১৯৩২ সালের ১৮ই আগষ্ট বেলজিয়ামের অধ্যাপক অগাস্ত পিকার্ড বেলুনে প্রায় সাড়ে দশ মাইল পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। এর আগে
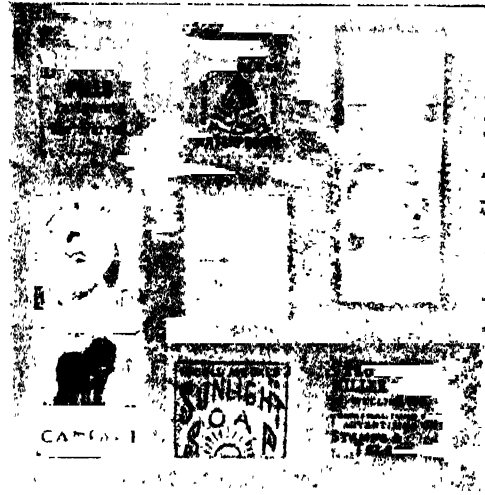
বিজ্ঞাপন।

বায়ুমণ্ডলে এত উঁচুতে আর কেউ উঠতে পারেন নি। নীচের সারির মধ্যখানের ডাক-টিকিটে বেলজিয়ামের পোষ্ট-অফিস সেই ঘটনাকে চিহ্নিত করে রেখেছে। কিন্তু এই ঘটনার প্রায় পনেরো মাস পরে, সোভিয়েট রুষিয়া থেকে দুজন বৈমানিক বেলুনে করে আরও ৯ হাজার ফিট উঁচুতে ওঠেন। দুর্ভাগ্যবশত নামবার সময় তাঁরা দুজনেই অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীচের সারির বাঁদিক থেকে তৃতীয় ছবিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেই ঘটনাকেই স্মরণীয় করে রেখেছেন। ডাক-টিকিটের উপরে শুধু সংক্ষেপে লেখা আছে, ১৯০০০ এম, আমাদের গণনায় প্রায় তেরো মাইল,

অর্থাৎ যতদূর পর্যান্ত সেই দুজন রুষ বৈমানিক উঠতে পেরেছিলেন।

বিমান-পোত ছাড়া বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তির কথা আমরা ডাকটিকিট থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

ডাক-টিকিটে নৌবিদ্যা।

এখানে "এঞ্জিনীয়ারিং-এর কীর্ত্তি" নামে তিনটি বিভিন্ন দেশের ডাক-টিকিটের ছবি দেওয়া হয়েছে। বাঁ দিকের প্রথম ছবিটি হল, সোভিয়েট রুষিয়ার ডাকটিকিট—একজন শ্রমিক বাষ্পশক্তি-চালিত বিরাট কোদাল ব্যবহার করছে। তাঁদের ফাইভ্-ইয়ার প্লানের আদর্শকে দেশের মধ্যে সু-প্রচারিত করবার জন্য সোভিয়েট রুষিয়া এই ধরণের ছবি ডাক-টিকিটে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। রুষিয়ার এই পুনর্গঠনের মূল কথা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে নতুন নতুন কর্ম্ম-ক্ষেত্র গড়ে তোলা। সেই জন্যে সোভিয়েট রুষিয়ার ডাক টিকিটে ইলেক্‌ট্রিক উনুন, যন্ত্রচালিত লাঙ্গল, বড় বড় কলের চিমনী—এই সব প্রায়ই দেখা যায়। আইরিশ্ ফ্রী-ষ্টেটও যে বৈজ্ঞানিক গঠন-কার্য্যে মনোনিবেশ করেছে, সেই কথা প্রচারের জন্য তাঁরাও তাঁদের ডাক-টিকিটে এঞ্জিনীয়ারদের নানা কীর্ত্তির চিত্র আঁকছেন। বাঁদিকথেকে তৃতীয় ছবিটি—একখানি আইরিশ ফ্রি-ষ্টেটের ডাক-টিকিট। আইরিশ কাব্যে এবং গাথায় অমর, শ্যান্-নদীর উপর যে অভিনব সেতু তৈরী করা হয়েছে, ছবিতে তাই দেখান হয়েছে। এই সেতু-গঠনের মূলে একটা বিশেষ ইতিহাস আছে। জার্ম্মান কন্‌ট্রাক্টরদের উপর এই সেতুনির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয় এবং আইরিশ শ্রমিকদের সঙ্গে এই সেতু নির্ম্মাণের সময় জার্ম্মাণ শ্রমিকরা জার্ম্মানী থেকে এসে পাশাপাশি কাজ করে গিয়েছে। ক্যান্টিলিভার সেতুর মধ্যে কানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর উপর যে-সেতু নতুন তৈরী হয়েছে জগতে সেইটেই হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সেতু কুইবেক্ শহরের এক মহাগৌরবস্থল। মধ্যখানের কানাডার ডাকটিকিটে সেই সেতুর চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই সেতু নির্ম্মাণের ইতিহাসে একটা বড় করুণ কাহিনী চাপা পড়ে আছে। প্রথম যখন এই সেতু তোলা হয়, তখন হঠাৎ এটা ভেঙ্গে পড়ে। এবং তার তলায় ৮৫ জন শ্রমিক থেঁৎলে গুঁড়িয়ে যায়।

মঙ্গোলিয়ার পোষ্ট-অফিস এক রকম ডাক-টিকিট বার করেছে তাতে বর্ত্তমান উন্নত ধরণের মুদ্রাযন্ত্র আঁকা। মঙ্গোলিয়া জগৎকে জানাতে চায় যে, রোটারী মেসিনের যুগে সে পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। বেলজিয়াম এক রকম ডাক-টিকিট বার করেছে, তাতে জিনোবি গ্রামের ছবি। তাঁর মূর্ত্তির তলায় ছোট্ট করে একটা ডাইনামোর ছবি। জিনোবি গ্রামই সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী ডাইনামো তৈরী করে তাকে কাজে লাগান। এইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বহু ক্ষেত্রের বহু সংবাদ আমরা ডাক-টিকিটের এ্যালবাম থেকে পেতে পারি।

কোন কোন দেশ ডাক-টিকিটের পিছন দিকটা বিজ্ঞাপনের কাজে লাগায়। "বিজ্ঞাপন" নামের ডাক-টিকিটগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। কোন কোন দেশে, অত স্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপন না দিয়ে, পোষ্ট-অফিসের ছাপের সময়, দু'চার কলম কোন কোন জিনিষ ব্যবহারের কথা লেখা থাকে। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রে কিন্তু ডাক-টিকিটের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কথা ব্যবহার করা আইনত বারণ।

ডাক-টিকিটে পুরাতত্ব।

এইভাবে আরও নানাদিক থেকে দেখান যেতে পারে যে, ডাক-টিকিটের এ্যালবাম শুধু অবসর-বিনোদনের খেলা নয়, এ থেকে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আমরা সংগ্রহ করতে পারি।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

প্রতাপাদিত্য

এই বার তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ভুঁইয়ার কথা বলিব। প্রতাপাদিত্যের নাম তোমরা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে।

যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

মহাকবি ভারতচন্দ্রের এই কবিতা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া যাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার কথা তোমাদের সকলেরই জানা আবশ্যক। আমরা তোমাদিগকে সে কথা ভাল করিয়াই শুনাইয়া দিতেছি। ইহা হইতে তোমরা জানিতে পারিবে যে, প্রতাপ কত বড় বীর ছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে সপ্তগ্রামে পরে গৌড়ে কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়াছিলেন। কাননগোরা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য করিতেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি শেষ পাঠান-নরপতি দায়ুদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এমন কি, কতুল খাঁ ও শ্রীহরি দায়ুদের দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ ছিলেন। দায়ুদের নিকট হইতে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন। দায়ুদ যখন মোগলদিগের ভয়ে উড়িষ্যায় পলাইয়া যান, তখন বিক্রমাদিত্যের উপর তাঁহার ধন-রত্ন রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কতকগুলি নৌকায় তাহা বোঝাই করিয়া পলায়ন করিতে করিতে সুন্দরবনের মধ্যে আসিয়া পড়েন। সেই খানে চাঁদ খাঁ নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের জায়গীর ছিল। তাঁহার বংশে কেহ না থাকায় বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে ঐ জায়গীর চাহিয়া লইয়াছিলেন। সেই জায়গীর মধ্যে হিন্দুদিগের দুইটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। একটি যশোর আর একটি সাগর-সঙ্গম। যশোর যশোরেশ্বরী নামে দেবতার পীঠস্থান, আর সাগর-সঙ্গম গঙ্গা ও সাগরের মিলন-স্থান। বিক্রমাদিত্য যশোরে যশোরেশ্বরীর নিকট বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যখন দায়ুদ ক্রমে ক্রমে পরাজিত হইয়া মোগলহস্তে নিহত হইলেন, তখন বিক্রমাদিত্য দায়ুদের সেই সমস্ত ধনরত্ন লইয়া যশোর নগর পত্তন করিয়া চাঁদ খাঁর জায়গীর ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি মোগল সুবেদারদের নিকট হইতে তাহা মঞ্জুর করিয়াও লইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক খুড়তত ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম জানকীবল্লভ। জানকীবল্লভ বসন্ত রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। এই বসন্ত রায়ের চেষ্টায় বিক্রমাদিত্য যশোর নগর ও যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতা বসন্ত রায় ও পুত্র প্রতাপাদিত্যকে সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন। বেশীর ভাগ প্রতাপাদিত্যের অংশেই পড়িয়াছিল। প্রতাপাদিত্য যশোরের নিকট ধূমঘাট নামে নগর পত্তন ও এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। বসন্ত রায় যশোরেই ছিলেন। মোগল পাঠানের বিবাদে সুযোগ পাইয়া প্রতাপাদিত্য ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার যেমন অনেক ঢালী, পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী ছিল, সেইরূপ অসংখ্য রণতরী ও কামান ছিল। এই সকল রণতরীর কতক ধূমঘাটের নিকট ও কতক সাগর-সঙ্গমের সাগরদ্বীপে থাকিত। এই সাগরদ্বীপকে সেকালের ইউরোপীয়গণ চান্দেকান বলিতেন। চাঁদ খাঁর জায়গীরের মধ্যে তাহা ছিল বলিয়া তাহাকে চান্দেকান বলা হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। এই সময়ে পাঠান সর্দ্দার কতুল খাঁর সহিত মোগলদিগের বিবাদ চলিতেছিল। কতুল বিক্রমাদিত্যের বন্ধু ছিলেন। প্রতাপ পিতৃবন্ধুর সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় গমন করেন। মোগলদিগের সহিত তাঁহার বিবাদের এই প্রথম সূত্রপাত। উড়িষ্যা হইতে প্রতাপ গোবিন্দ-দেব নামে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ লইয়া আসেন।

নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশঃ ঘোষয়ে ধরণী ॥

গোবিন্দদেব এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছেন।

মানসিংহ যখন সুবেদার হইয়া আসেন তখন প্রতাপ শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে নানা স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ ও সেনাপতি নিয়োগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বলশালী হইয়া উঠিতেছিলেন এবং মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীন হইবার আয়োজন করিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের এ সকল ভাল লাগিত না। তিনি প্রতাপকে নিজ পুত্রদের অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন। বসন্ত রায় প্রতাপকে মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করায় প্রতাপ ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। সামান্য কতকগুলি ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে চাকসিরি নামক স্থান প্রতাপ বসন্ত রায়ের নিকট হইতে চাহিয়া পান নাই বলিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সেইজন্য "সাতরাত পাক ফিরি তবুও না পাই চাকসিরি" বলিয়া একটি কথা প্রচলিত আছে। বিবাদ বাড়িয়া উঠিলে প্রতাপ ক্রোধের বশে বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। বসন্ত রায়ের কোন কোন পুত্রও প্রতাপের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায়ের এক পুত্র রাঘব রায় বা কচু রায় কোনরূপে পলাইয়া গিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন ও সমস্ত কথা নিবেদন করেন।

তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচু রায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥

কচু-বনে রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাঘবের কচু রায় নাম হয়। বসন্ত রায়ের হত্যা প্রতাপ চরিত্রের এক ভীষণ কলঙ্ক। কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহার জামাতা বাকলার ভুঁইয়া রামচন্দ্র রায়কেও বিবাহ সময়ে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। রামচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। তদ্ভিন্ন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকেও হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার কারণ কার্ভালোর বীরত্বের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। এই সকল ব্যাপারের জন্য প্রতাপাদিত্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

বসন্ত রায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইলেন। তিনি যেমন বীর ছিলেন সেইরূপ দাতাও ছিলেন। তাঁহার মুক্ত-হস্ততা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে ॥

এইরূপ কবিতাও রচিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পাদরীগণ প্রতাপের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সাগরদ্বীপে প্রতাপের সাহায্যে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন তাহাই বাঙ্গলার প্রথম গির্জ্জা। কিন্তু কার্ভালোর হত্যার পর প্রতাপাদিত্য পাদরীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। আকবর বাদশাহের মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায় মানসিংহ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী আগ্রায় চলিয়া যান। প্রতাপাদিত্য সেই সুযোগে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। কচু রায়ও বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রতাপের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সে সময়ে আবার পাঠানেরা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই সকল দমনের জন্য মানসিংহকে আবার বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিলেন।

মানসিংহ এই সময় নানা কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় বিদ্রোহীগণের দমনের জন্য বিশেষ কিছুই করিলেন না।*

মানসিংহের পরে কুতুবউদ্দীন প্রভৃতি দু-একজন সুবেদারের

* প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গ লইয়া রায় মহাশয়ের সহিত প্রবাসী পত্রিকায় আমার বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমার শেষ উত্তর "প্রতাপাদিত্যের কথা" ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৩৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার পূর্ব্বেই রায় মহাশয় পরলোকে গমন করায় তিনি আমার উত্তর দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস রায় মহাশয় আমার এই প্রবন্ধ দেখিলে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই মত পরিবর্ত্তন করিতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস মত প্রতাপাদিত্যের সহিত খানে আজমের (আজিম খাঁ) যুদ্ধ, মানসিংহের যুদ্ধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে এই দুই সুবেদারের এক জনের সঙ্গেও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। তদনুসারেই এই প্রবন্ধে পরিবর্ত্তনাদি করিলাম।— শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

পর ইসলাম খাঁ চিস্তি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী লইয়া যান ও তাহার জাহাঙ্গীর নগর নাম প্রদান করেন। ইসলাম খাঁ রাজমহলে উপস্থিত হইলে প্রতাপ তাঁহাকে উপহার দিবার জন্ম কয়েকটি হস্তী ও নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য নিজ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত পাঠাইয়া দেন। পরে ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে প্রতাপ নিজে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে হস্তী, নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য ও অনেক টাকা উপহার দেন। সুবেদারও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর প্রতাপকে মোগল সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহীগণের দমনে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ইসলাম খাঁ আদেশ দেন ও প্রতাপকে বিদায় প্রদান করেন। প্রতাপ কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত সুবেদারের আদেশ পালন করিলেন না। তিনি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগলের আজ্ঞাবহ হইতে ইচ্ছা করেন নাই। ইসলাম খাঁ বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে, ইসলাম খাঁর সহিত পারিয়া উঠা সহজ হইবে না; তখন তিনি পূর্ব্ব কথা মত কয়েকখানা রণতরী সহ নিজ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে সুবেদারের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপ পূর্ব্বে যোগ না দেওয়ায় সুবেদার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সংগ্রামাদিত্য সুবেদারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার নৌকাগুলি গৃহনির্ম্মাণের কাষ্ঠ বহন করাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন ও ইনায়েৎ খাঁ নামক সেনাপতিকে যশোর অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন।

ইনায়েৎ খাঁ অশ্বারোহী, পদাতিক, রণতরী ও কামান লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মির্জ্জা নথন তাঁহার সহকারী হইলেন। ইনায়েৎ খাঁ স্থলসৈন্যের, রণতরী ও তোপের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা পদ্মা ও জলঙ্গী প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ইচ্ছামতী নদীতে আসিয়া পড়েন। প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। যখন মোগলেরা তাঁহার রাজ্যে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রতাপ জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে সেনাপতি কমল খোজা ও কতলু খাঁর পুত্র জামাল খাঁর সহিত কতকগুলি রণতরী, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে রাজধানী ধূমঘাটের নিকট রহিলেন। যেখানে যমুনা নদীর সহিত ইচ্ছামতী মিলিত হইয়াছে তাহারই নিকটে মোগলদিগের সহিত প্রতাপের সৈন্যের যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে মোগল সৈন্যের আক্রমণে প্রতাপের সৈন্যেরা হটিতে লাগিল। সেনাপতি কমল খোজা বন্দুকের গুলিতে নিহত হইলেন। তখন উদয়াদিত্য রণতরী লইয়া পিছাইতে লাগিলেন। জামাল খাঁও হস্তী ও কামান লইয়া হটিয়া আসিলেন।

মোগলেরা ক্রমে ক্রমে জলপথে ও স্থলপথে আসিয়া ধূমঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে স্বয়ং প্রতাপের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষ হইতে গোলাগুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। কামানসকল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তীর, বর্শা, তরবারির খেলা চলিল। অগণ্য মোগলসৈন্যের নিকট প্রতাপের সৈন্যেরা অবশেষে পরাজিত হইল। প্রতাপ ধূমঘাটে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। পাছে মোগলেরা দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলে, ইহা মনে করিয়া প্রতাপ নিজে ইনায়েৎ খাঁর নিকট ধরা দিলেন। ইনায়েৎ খাঁ প্রতাপকে লইয়া ঢাকায় ইসলাম খাঁর নিকট গমন করেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে মির্জ্জা নথন কিছুদিন পরে ধূমঘাটের চারিদিকে লুঠপাঠ করিতে লাগিলেন। লোকে যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। উদয়াদিত্যের সহিত নথনের আবার যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার পর উদয়াদিত্যের কি হইল তাহাও জানা যায় না। প্রবাদ আছে যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আর এরূপ প্রবাদও আছে যে, প্রতাপকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠান হইয়াছিল কিন্তু পথিমধ্যে কাশীতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

প্রতাপের স্বাধীনতা ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ এখনও খুলনা জেলায় রহিয়াছে। ঈশ্বরীপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান, গোলাগুলি এবং কামানও দু' একটি এখনও লোকে দেখিতে পায়। প্রতাপাদিত্যের বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। বসন্তরায়ের

বংশীয়েরা আজিও চব্বিশ পরগণা জেলায় খোড়গাছি ও খুলনা জেলার নুরনগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

রামচন্দ্র রায়

এইবার তোমাদিগকে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের ভুঁইয়ার কথা বলিব। এই বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল বা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে। এই সময়ে এক মহাপ্লাবন হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে কন্দর্প রায় ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রায় বাকলার রাজা ছিলেন। তাঁহারা যে প্রধান ভুঁইয়া বলিয়া গণ্য হইতেন সে কথা তোমরা জানিয়াছ। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দনুজ মর্দনদেবের দৌহিত্র বংশে কন্দর্প রায় জন্মগ্রহণ করেন। কন্দর্প রায় একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তিনি বন্দুক ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন। কন্দর্প রায় পাঠান ও মগদিগকে দমন করিয়াছিলেন। মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের চেষ্টা করিলে, কন্দর্প রায় মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করেন।

কন্দর্প রায়ের পর তাঁহার শিশুপুত্র রামচন্দ্র রায় বাকলার রাজা হন। তাঁহার মাতাই তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন। শিশুকাল হইতেই রামচন্দ্র আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতেন। সে সময়ে যে সকল খৃষ্টান পাদরী এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শিশু রামচন্দ্রের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে রামচন্দ্র নিজ রাজ্যে না থাকায় আরাকানের রাজা তাহা অধিকার করিয়া লন। সে সময়ে বাকলার অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্র পরে আবার নিজ রাজ্যের উদ্ধার করেন। রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ শুনা যায় যে, প্রতাপ বিবাহসময়ে জামাতাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্রের রাজ্য অধিকার ও বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রতাপ নাকি এই ঘৃণিত ব্যাপার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ সমাজ বঙ্গজ কায়স্থগণের মূল সমাজ, বাকলার রাজারা তাহার সমাজপতি ছিলেন। রামচন্দ্র পত্নী বিন্দুমতীর নিকট হইতে তাঁহার হত্যার অভিসন্ধি শুনিতে পান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের সামন্ত রামনারায়ণ মল্ল তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া যশোর হইতে লইয়া যান। পরে বিন্দুমতী বাকলায় গেলে রামচন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে লইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বিন্দুমতী একটি স্থানে থাকিয়া সেখানে হাটবাজার বসাইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করেন। সেইস্থানকে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' বলিয়া থাকে। তাহার পর রাজমাতার কথানুসারে রামচন্দ্র বিন্দুমতীকে গ্রহণ করেন।

ইসলাম খাঁ যে সময়ে ইনায়েৎ খাঁকে প্রতাপের সহিত যুদ্ধের জন্য আদেশ দেন সেই সময়ে সৈয়দ হাকিম নামে এক সেনাপতিকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগলেরা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র মাতার কথায় মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহার পর অবশ্য তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বীরত্বেও বড় কম ছিলেন না। তিনি ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া বাকলায় লইয়া যান। গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গী নামে একজন পর্ত্তুগীজ জলদস্যু প্রথমে রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করে। পরে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার রাজ্যের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া লয়। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরিঙ্গীদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

ভুঁইয়ারা ব্যতীত ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায় ও তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎও সে সময়ে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। এই সকল ভুঁইয়া ও রাজারা মোগল, পাঠান, মগ ও ফিরিঙ্গীর সহিত যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী যে কাপুরুষের জাতি নহে এ সকল হইতে তোমরা তাহা জানিতে পারিতেছ। (ক্রমশঃ)

দিবারাত্রির কাব্য

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপমান ভুলে সুপ্রিয়া ঘরে গিয়ে বসতে রাজী হল। হেরম্ব জানত রাজী সে হবে। এতক্ষণ মালতী ও আনন্দের সঙ্গে সুকৌশলে আলাপ করে সে কতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করেছে হেরম্ব তা জানে না, কিন্তু আনন্দকে দেখার পর এই জ্ঞান-লাভের পিপাসা তার অবশ্যই এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে, আরও ভাল করে সব জানবার ও বুঝবার কোন সুযোগই সহজে আজ সে ত্যাগ করবে না। তার ভাল করে জানা ও বোঝাটা ঠিক কি ধরণের হবে হেরম্ব তাও অনুমান করতে পারছিল। অনুমান করে তার ভয় হচ্ছিল। ভয়ের কথাই। চোখের সামনে ভবিষ্যৎকে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখে ভয়ঙ্কর না হয়ে ওঠার মত নিরীহ সুপ্রিয়া এখন আর নেই। মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে গল্প শুনে যে বড় হয়েছিল, বড় হয়ে ছোট ছোট কাজ করে, ছোট ছোট সেবা দিয়ে আর সর্ব্বদা কথা শুনে চলে যে ভালবাসা জানাবার চেষ্টা করেছিল, আজ হেরম্বর সাধ্য নেই তাকে সামলে চলে। অথচ, আজকের এই সঙ্গীন প্রভাতটিতে সে আর অনন্দ দুজনকেই সামলে চলার দায়িত্ব পড়েছে তার উপরে। জীবন-সমুদ্রে তাকে লক্ষ্য করে দুটি বেগবতী অর্ণবপোত ছুটে আসছে, সে সরে দাঁড়ালে তাদের সজ্ঘর্ষ অনিবার্য্য, সরে না দাঁড়ালে তার যে অবস্থা হওয়া সম্ভব তাও একেবারেই লোভনীয় নয়। আজ পর্য্যন্ত হেরম্বের জীবনে অনেকবার অনেকগুলি সকাল ও সন্ধ্যায় কাব্যের অন্তর্দ্ধান ঘটেছে। আজ সকালে কাব্যলক্ষ্মী শুধু যে পালিয়ে গেলেন তা নয়, তার সিংহাসন যে হৃদয় সেখানে প্রচুর অনর্থ ও রক্তপাতের সম্ভাবনাও ঘনিয়ে এল। অনাথের একটি কথা তার বারংবার মনে পড়তে লাগল: মানুষ যে একা পৃথিবীতে বাঁচতে আসেনি সব সময় তা যদি মানুষের খেয়াল থাকত!

তাদের দুজনকে হেরম্বর ঘরে পৌছে দিয়ে আনন্দ চলে গেল। সুপ্রিয়া ম্লান হেসে বললে, 'মেয়েটার বুদ্ধি আছে তো!'

হেরম্ব অন্যমনস্ক ছিল। বললে, 'অ্যাঁ? কার বুদ্ধি আছে? ক্ষেপেছিস্! আমাদের ও বুদ্ধি করে একা রেখে যায়নি। কাজ করতে গিয়েছে। কাজ না থাকলে এখান থেকে ও নড়ত না, বসে বসে তোর সঙ্গে গল্প করত।'

'সত্যি? তা হলে মেয়েটা খুব সরল। আমি বুঝতে পারিনি।'

'বুঝতে পারিসনি? তুই কি ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিটও কথা বলিসনি, সুপ্রিয়া?'

সুপ্রিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল। সে নীচু গলায় বললে, 'তা বলেছি। আমারি বুদ্ধির দোষ। বুদ্ধি ঠিক থাকলে ওই মেয়েটা যে খুব সরল এটা বুঝতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগত না।'

সুপ্রিয়ার অপলক দৃষ্টিপাতে হেরম্ব একটু লজ্জা বোধ করল। সরলতার হিসাবে সুপ্রিয়াও যে কারো চেয়ে ছোট নয় এও তো সে জানে। সুপ্রিয়ার অভিজ্ঞতা বেশী, মানুষের মনের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করার শক্তি বেশী, সে তাই সাবধানে কথা বলে, হিসাব করে কাজ করে। কিন্তু তার কথা ও কাজে সরলতার অভাব কোন দিনই হেরম্বের কাছে ধরা পড়েনি, মিথ্যার মানস-স্বর্গ ওর নেই। এও হয়ত সত্য যে আনন্দের সহজাত সরলতার চেয়ে সুপ্রিয়ার মনোভিজ্ঞাত্যের সরলতা বেশী মূল্যবান। একটা ছেলেমানুষী, আর একটা সুশিক্ষা।

হেরম্ব সুর বদলালে।

'ভাল করে বস্ সুপ্রিয়া, তোর কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট হওয়া মন্দ কি? তাতে মানুষের দরদ পাওয়া যায়। চোখে না দেখলে কেউ তো বোঝে না কারো কষ্ট আছে কি নেই!'

'কারো কি কষ্টের অভাব আছে সুপ্রিয়া, যে পরের মধ্যে কষ্ট খুঁজে বেড়াবে?'

'সবাই তো সকলের পর নয়!'

হেরম্ব হেসে বললে, 'নয়? তুই ছাই জানিস্। মোহ-মুদ্গার, বৈরাগ্যশতক, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সবাই লিখছে—'

সুপ্রিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, 'কাছে এসে বসুন না? দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে লাভ কি?'

'কোথায় বসব দেখিয়ে দে।'

'তাহলে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

সুপ্রিয়া জানালার সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে বসে ছিল। সেখানে তার কাছে বসা অসম্ভব। হেরম্ব বিছানায় বসে তাকে ডাকলে, 'আয় সুপ্রিয়া, এখানে এসে বস্। এখুনি এলি, অত ঝগড়া করছিস কেন?'

উঠে এসে বিছানায় বসে সুপ্রিয়া বললে, 'আপনিই বা শুধু হাল্কা কথা বলছেন কেন? পুরীতে কেন এলাম জিজ্ঞাসা করবেন কখন?'

'একেবারেই যদি জিজ্ঞাসা না করি?'

'ত হলে একটু মুস্কিলে পড়ব।' সুপ্রিয়া এবার হাসলে, 'আপনি এ ঘরে থাকেন, না?'

'হ্যাঁ, একা। আমি এ ঘরে একা থাকি সুপ্রিয়া।'

'তা জানি না নাকি!'

'জানিস বৈকি। তবু বললাম। রাগিসনে। তোকে তো গোড়াতেই বলেছি, আমার ছিল না এমন অনেক স্বভাব ইতিমধ্যে আমি অর্জ্জন করে ফেলেছি। বাহুল্য কথা বলা তার মধ্যে একটা।'

কথা, কথা কথা! শুধু কথা পাকানো, কথা মোচড়ানো, কথা নিয়ে লড়াই করা। সুপ্রিয়া মাথা নত করলে। এত কথা কি জন্য? পরিচয়ের জন্য নয়, উদ্দেশ্যনির্ণয়ের জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্যও নয়। পরিচয় তাদেব যা আছে আর তা বাড়বে না, পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ভুল হবার তাদের কোন কারণ নেই, কথা না বললেও তাদের সময় কাটবে। তবু প্রাণপণে তারা কথা বলছে। এর চেয়ে সংসারে, অন্ততঃ ভালবাসার ব্যাপারে আটকা পড়েছে এমন একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে, যদি এই নিয়ম প্রচলিত থাকত যে মন জানাজানি হয়ে যাবার পর, যেদিন তাদের প্রথম দেখা হবে সেদিন একজন হয় 'আয় সুপ্রিয়া' বলে আর একজনকে তৎক্ষণাৎ বুকে জড়িয়ে ধরবে নয়তো লাথি মেরে বলবে, বেরিয়া যা—তাও যে অনেক ভাল ছিল। চিরকাল এমন ভাবে মানুষ কত কথা বলতে পারে? আজো অনিশ্চয়তা বজায় থাকার অভিমানে সুপ্রিয়া কথা বন্ধ রাখলে। হেরম্ব চুপ করলে বক্তব্যের অভাবে। একথা মিথ্যা নয় যে, কথা নিয়ে লড়াই করাটাই চরম উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বলে সুপ্রিয়াকে বলার তার কিছুই নেই। কাছে বসে এমনি ভাবে পরের মত তারা চিন্তা করছে, আনন্দ ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে টাকা আছে? দশটা টাকা দিতে পারবে?'

'টাকা কি হবে আনন্দ?'

'বাবা চাইল।'

হেরম্ব অবাক হয়ে গেল। 'মাষ্টার মশাই টাকা চাইলেন? টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন?'

আনন্দ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে না। সে জানে না। টাকা নিয়ে সে চলে গেলে হেরম্ব চেয়ে দেখলে সুপ্রিয়া খুব সরলভাবে অত্যন্ত কুটিল হাসি হাসছে। আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের আর্থিক সম্পর্কটি আবিষ্কার করা মাত্র তার যেন আর কিছু বুঝতে বাকী নেই। এতক্ষণে সে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হেরম্ব চুপ করে গেল। প্রতিবাদ শুধু নিষ্ফল নয়, অশোভন।

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বললে, 'বাড়ী পৌঁছে দেবেন না?'

'এখুনি যাবি?'

'আর বসে কি হবে? চলুন, পৌঁছে দেবেন।'

'তুই কি একা এসেছিস নাকি, সুপ্রিয়া? একা এসে থাকলে একা যাওয়াইতো ভাল।'

'একা কেন আসব? চাকরকে সঙ্গে এনেছিলাম, আপনি আছেন শুনে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। চলুন, যাই।'

ছলনা নয়, হেরম্ব সত্য সত্যই আলস্য বোধ করে বললে, 'আর একটু বস্‌না সুপ্রিয়া'।

সুপ্রিয়া মাথা নেড়ে বললে, 'না, আর একদণ্ডও বসব না। কি করে বসতে বলছেন?'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'তুই আসতে পারিস, আমি তোকে বসতে বলতে পারি না? আমার ভদ্রতা-জ্ঞান নেই?'

সুপ্রিয়া গম্ভীর হয়ে বললে, 'ভদ্রতা-জ্ঞানটা কোন কাজের জ্ঞান নয়। আমি এখানে কেন এসেছি জানা দূরে থাক, পুরীতে কেন এসেছি ও জ্ঞান দিয়ে আপনি তাও অনুমান করতে পারবেন না। না যদি যান তো বলুন মুখ ফুটে, এখানে আমার গা কেমন করছে, আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পুরী সহরে আপনি আমাকে আজকালের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারবেন সে ভরসা আছে।'

হেরম্ব আর কথা না বলে জামা গায়ে দিলে। বারান্দা পার হয়ে তারা বাড়ীর বাইরে যাবার সরু প্যাসেজটিতে ঢুকবে, ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দ একরকম পথরোধ করে দাঁড়ালে। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'একে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।'

'খেয়ে যাও।'

সুপ্রিয়া এর জবাব দিলে। বললে,'আমার ওখানে খাবে।'

আনন্দ বললে, 'পেটে খিদে নিয়ে অদ্দূর যাবে? সকালে উঠে খেতে না পেলে ওর মাথা ঘোরে তা জানেন?'

সুপ্রিয়া বললে, 'মাথা না হয় একদিন একটু ঘুরলই।'

হেরম্ব অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করলে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে তারা আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। সুপ্রিয়ার চোখে গভীর বিদ্বেষ, তাই দেখে আনন্দ অবাক হয়ে গেছে। দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেরম্ব সসঙ্কোচে বললে, 'আমার খিদে পায়নি আনন্দ, একটুও পায় নি।'

আনন্দ অভিমান করে বললে, 'না পায়নি! আমি কিছু বুঝিনে কিনা!'

হেরম্ব নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এবার কি কর্ত্তব্য, সুপ্রিয়া?'

তাকে মধ্যস্থ মেনে হেরম্ব একরকম স্পষ্টই ইঙ্গিত করলে যে, সে যখন বয়সে বড়, আনন্দের কাছে হার স্বীকার করে তারই উদারতা দেখানো উচিত। সুপ্রিয়া রাগ করে বললে, 'আমি জানিনে।'

'এখান থেকেই খেয়ে যাই, কি বলিস?'

'তাও আমি জানিনে।'

হেরম্ব নির্ব্বাক হয়ে গেল। আনন্দ একটু হেসে বললে, 'আপনি যে এত জোর খাটাচ্ছেন, আপনার কি জোর আছে বলুন তো! ও আমাদের অতিথি, আপনার তো নয়!'

'আমি ওর বন্ধু।'

আনন্দ আরও ব্যাপক ভাবে হেসে বললে, 'আমিও তো তাই!'

হেরম্ব কখনও কোন কারণে সুপ্রিয়ার মুখে হিংস্র ব্যঙ্গ শোনে নি, আজ শুনলে। হঠাৎ মুচকি হেসে সুপ্রিয়া বললে, 'তুমি?'—বলে, এই কয়টি মাত্র শব্দে আনন্দকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকের বিরাম নিয়ে সে যোগ দিলে, 'ওর সঙ্গে আমার যে দিন থেকে বন্ধুত্ব, তোমার তখন জন্মও হয় নি!'

আনন্দ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'যান্! আমার জন্মের সময় আপনার আর কত বয়স ছিল?—কত আর বড় হবেন আপনি আমার চেয়ে? আপনার বয়স উনিস কুড়ির বেশী কখখনো নয়।'

সুপ্রিয়া বুঝতে পারলে না, হেরম্বই শুধু টের পেল আনন্দের এ প্রশ্ন কৃত্রিম নয়। সুপ্রিয়ার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে যেন হঠাৎ ধমক দিয়ে বললে, 'তুমি ছেলেমানুষ তাই তোমাকে কিছু বললাম না। বয়সে যারা বড় আর কখনো তাদের সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা কর না।'

সুপ্রিয়ার ধমকে মুখ ম্লান করে আনন্দ যা বলেছিল তার কোন মানে নেই,—শুধু একটি 'আচ্ছা'। হেরম্ব ভাল করেই জানে, সুপ্রিয়ার কাছে সে যে অপমান পেয়েছে তার জন্য আনন্দ তাকেই দায়ী করবে। দায়ী করে সে হয়ে থাকবে বিষণ্ণ। আনন্দের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় সহজে এর প্রতিকারও করা যাবে না।

গাড়ীতে সুপ্রিয়ার সামনের আসনে বসে আনন্দের কথা ভাবা চলছিল। সে উঠে পাশে এসে বসায় হেরম্বের আর সে ক্ষমতা রইল না।

'পাশে বসাই নিয়ম, না?'

হেরম্ব একটু ভেবে বললে, 'অন্তত অনিয়ম নয়।'

সুপ্রিয়া হেসে বললে, 'আসল কথা, কথা বলব। কে একটা লোক পিছনে উঠে বসেছে, শুনতে পাবে বলে সামনে এগিয়ে এলাম।'

'তোর প্রগতির অর্থ খুব গভীর সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, 'আপনার এই যে কথা বলার ঢং মন্ত্রদাতা গুরুর মত, চিরকাল এই সুর শুনে আসছি। হাল্কা কথা বলেন, তাও উপদেশের মত ভারি আওয়াজ।'

'একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যকথার জবাব অমনি করেই দিতে হয়।'

'ও, আচ্ছা ভাবুন। আমি চুপ করলাম।'

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামা পর্য্যন্ত সুপ্রিয়া সত্যই চুপ করে রইল। যেখানে তারা বাড়ী নিয়েছে সেখান থেকে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায়, বাড়ীর ছাদে না উঠলে সমুদ্র দেখা যায় না। এবারও সুপ্রিয়া হেরম্বকে বাড়ীর বাজে অংশ পার

করিয়ে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে হাজির করলে। হেরম্ব লক্ষ্য করলে, ঘরখানা দোকানের মত সাজানো নয়, শয়ন-ঘরের মতও নয়। বিদেশ বলে বোধ হয় ঘরে আসবাব নেই, অস্থায়ী বলে সুপ্রিয়ার ঘর সাজাবার উৎসাহ নেই। উৎসাহের অভাব ছাড়া অন্য কারণও হয়ত আছে। এটা যদি সুপ্রিয়ার শয়নকক্ষ হয় তবে সে এখানে একাই থাকে। ছোট চৌকিতে যে বিছানা পাতা আছে সেটা একজনের পক্ষেও ছোট। যদিও অশোক বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে, এ অধিকার হয় তো তার সাময়িক, হয়তো এ তার নিছক গায়ের জোর। এই সব পলক-নিহত অনুমানের মধ্যেও হেরম্ব কিন্তু টের পেল অশোকের গায়ে জোর বড় আর নেই। সে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত শীর্ণ হয়ে গেছে।

অশোক উঠল না। বললে, 'হেরম্ববাবু যে!'

হেরম্ব বললে, 'আমিই। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না, অশোক!'

'যাবেও না। মরে ভৌতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি যে। এ যা দেখছেন, এ হল সূক্ষ্ম শরীর।'

'সূক্ষ্ম সন্দেহ নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পত্রে জানা গেল এখানকার জল হাওয়া ভাল। উনি মনে করলেন, আমার অবস্থা বুঝে পুরীতে নেমন্তন্নই বুঝি করছেন। তাই জোর করে টেনে এনেছেন। ছুটীর জন্য বেশী লেখালেখি করতে গিয়ে চাকরীটি প্রায় গিয়েছিল মশায়।'

আনন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় সুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরে যে ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অশোকের কথায় তার ভদ্র গোপন-করা ধ্বনি শোনা যায়। হেরম্ব একটু সাবধান হল।

'তোমার আঙ্গুলে কি হল, অশোক?'

অশোকের ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল দুটি কাটা। ঘা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু আরক্তভাব এখনো যায় নি, শুকনো ঘায়ের মামড়ি তুলে ফেললে যেমন দেখায়। এ বিষয়ে অশোকের নিজের কৌতূহল বোধ হয় এখনো যায়নি, হাতটা চোখের সামনে ধরে সে কাটা আঙ্গুলের গোড়া দুটি পরীক্ষা করে দেখে নিলে। বললে, 'একজন ছোরা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ছোরা, অশোক?'

'উঁহু', দেশী দা, ভয়ানক ধার। আটকাতে গিয়ে আঙ্গুল দুটো উড়ে গেছে। উড়ে যাওয়া উচিত ছিল মাথাটার, কেন যে গেল না ভাবলে মাথাটা আজও গরম হয়ে ওঠে!'

সুপ্রিয়া বললে, 'মাথা গরম করে আর কাজ নেই। দোষ তো তোমার। থানাভরা সেপাই জমাদার, তবু নিজে ডাকাতের সামনে গলা এগিয়ে দেবে, বিবেচনা তো নেই!'

অশোক নির্ম্মম ভাবে হেসে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও আমি নিয়মিত ভাবে সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করছিলাম?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, তুমি চুপ কর।'

হেরম্ব এতক্ষণে ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করার যে ধারালো ক্ষমতা সে প্রায় পরিত্যাগ করেছিল এবার তাই সে কাজে লাগাল।

'আহা বলুক না সুপ্রিয়া, বলুক। অতিথিকে অশোক এণ্টারটেন করছে বুঝতে পারিস না? গৃহস্বামীর এই তো প্রথম কর্ত্তব্য। ওর কথা শুন না অশোক, তোমার যা বলতে ইচ্ছা হয় এমনি রস দিয়ে বল। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে বৈকি!'

অশোকের স্তিমিত চোখ জল জল করে উঠল। হেরম্ব স্পষ্ট দেখলে অসুস্থ স্বামীর লাঞ্ছনায় সুপ্রিয়ার মুখও ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু হেরম্বের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা মরে যাচ্ছিল আজ তা মরণ-কামড় দিতে চায়। গলা নামিয়ে সে যোগ দিলে, 'তুমি গৃহস্বামী যে।'

অশোক দেয়ালের দিকে মুখ করে বললে, 'না।—না।'

হেরম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি না, অশোক?'

'গৃহস্বামী অসুস্থ, তার কোন কর্ত্তব্য নেই।'

হেরম্ব বললে, 'তা হলে তোমায় বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমরা অন্য ঘরে যাই।'

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুপ্রিয়া তাকে অন্য ঘরে, যে ঘরের মেঝেতে শুধু মাদুর পাতা ছিল, নিয়ে গিয়ে বললে, 'বসুন। ওকে একটু শান্ত করে আসি।'

'পারবি না সুপ্রিয়া। ও একটা আস্ত বাঁদর।'

'গালাগালি কেন?' বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।

শুধু একটি মাদুর বিছানো, একটা বালিশ পর্য্যন্ত নেই। নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে মাদুরটা দেয়ালের

কাছে সরিয়ে নিয়ে হেরম্ব আরাম করে বসলে। হেরম্বের প্রাণ-শক্তি অপরিমেয়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চেতনার বাদ-বিসম্বাদ সহ্য করার ক্ষমতা তার অনমনীয়, কিন্তু আজ সে অপরিসীম শ্রান্তি বোধ করলে। দুঃখ বিষাদ বা আত্মগ্লানি নয়, শুধু শ্রান্তি। সুপ্রিয়ার প্রত্যাবর্ত্তনের আগে এই বাড়ী ছেড়ে, আনন্দের সঙ্গে দেখা হবার আগে পুরী থেকে পালিয়ে চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পেলে সে যেন এখন বেঁচে যায়! হেরম্বের ঘুম আসে। এক সদয় দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। সে চোখ বোজে। একটা ব্যাপার সে বুঝতে পেরেছে। আনন্দের বিষণ্ণ বিরস প্রহরগুলির জন্ম-ইতিহাস। আর এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে কারণে না মরে তার আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব নয়, সেই কারণেই তার ক্ষয়-পাওয়া হৃদয়েরও পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তার জীবনে প্রেম এসেছে অসময়ে। প্রেমের সে অনুপযুক্ত। বসন্ত-সমাগমে অর্দ্ধমৃত তরুর কতগুলি পল্লব কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু কত শুষ্ক শাখায় জীবন নেই, কত শাখার বল্কল পিপীলিকা-বাস-জীর্ণ। তার অকাল-বার্দ্ধক্যের সঙ্গে আনন্দের অহরহ পরিচয় ঘটে, আনন্দের কত খেলা তার প্রিয় নয়, আনন্দের কত উল্লাস তার কাছে অর্থহীন। আনন্দ তা টের পায়। কত দিক দিয়ে আনন্দ তার সাড়া পায় না, যদি বা পায় তা কৃত্রিম, মন-রাখা সাড়া। আনন্দ বিমর্ষ হয়ে যায়। মনে করে, হেরম্বের প্রেম বুঝি মরে যাচ্ছে। হেরম্বের প্রেমই যে দুর্ব্বল এখনো সে তা টের পায়নি।

সুতরাং আনন্দকেও সে ঠকিয়েছে। জীর্ণাবশিষ্ট যৌবনের সবখানিই প্রায় তাকে ব্যয় করতে হয়েছে আনন্দকে জয় করতে, এখন তাকে দেবার তার কিছু নেই। একথা তার জানা ছিল না যে, পরিপূর্ণ প্রেমের অনন্ত দাবী মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের! অভিজ্ঞতায় প্রেমের খোরাক নেই, মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি প্রেমকে টিঁকিয়ে রাখার শক্তি নয়। নারীকে নিয়ে একদিনের জন্যও যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় বলে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপর সুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারো বেলা এর অন্যথা নেই।

সুপ্রিয়ার ফিরতে দেরী হল। সে একেবারে হেরম্বের খাবার নিয়ে আসায় বোঝা গেল, অশোককে শান্ত করতেই তার এতক্ষণ সময় লাগেনি।

খাবার খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে হেরম্ব বললে, 'তোর উপরে রাগ হচ্ছিল, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া খুসী হয়ে বললে, 'সত্যি? কখন?'

'এই মাত্র। খিদেয় অন্ধকার দেখছিলাম।'

'খিদেয়? আমাকে না দেখে নয়?'

হেরম্ব হাই তুলে বললে, 'একটা বালিশ এনে দেত, ঘুমব।'

সুপ্রিয়া একটি অত্যন্ত কুটিল প্রশ্ন করল।

'কেন? রাত জাগেন বুঝি, ঘুমোবার সময় পান না?'

হেরম্ব সমান কুটিলতার সঙ্গে জবাব দিলে, 'সময় পাই বৈকি। রাত দশটা বাজতে না বাজতে ওখানকার সবাই, আনন্দ শুদ্ধ, ঢুলতে ঢুলতে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। তারপর সারারাত নিষ্কর্ম্মা ঘুম দিলে আমায় ঠেকায় কে!'

সুপ্রিয়া লজ্জা পেল।—'বানিয়ে বানিয়ে এত কথা বলতে পারেন! কিন্তু আপনার শরীর যে রেটে খারাপ হয়েছে তাতে মনে হয় না ঠিক মত আহার নিদ্রা হয়।'

'রেটটা তোরও কম নয়, সুপ্রিয়া।"

'আমার অসুখ, ফিটের ব্যারাম। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার শরীর খারাপ হবে কেন?'

'আমারও হয় তো অসুখ, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া হেসে বললে, 'তর্কে হারবার উপক্রমেই অসুখ হয়ে গেল? বসুন, বালিশ এনে দিচ্ছি,—ওয়াড় পরিয়ে আনতে হবে। এমন আলসে হয়েছি আজকাল, ময়লা বালিশে শুয়ে থাকি তবু ওয়াড় বদলাই না। এবার আমি মরব নাকি?'

বালিশ নিয়ে সুপ্রিয়া ফেরার আগে এল অশোক।

'দুপুরে এখানেই খাবেন দাদা।'

তার এই অমায়িক আমন্ত্রণের সুরে হেরম্ব বুঝতে পারলে সুপ্রিয়া সত্য সত্যই অশোককে শান্ত করতে পেরেছে।

সুপ্রিয়ার এ ক্ষমতা তার অভিনব মনে হল না। অশোকের প্রতি সুপ্রিয়ার যে গভীর ও আন্তরিক মমতা আছে, অশোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যে নিবিড় মনোযোগ ও অক্লান্ত সেবায় তার এই মমতা প্রকাশ পায়, অশোকের অতিরিক্ত দুঃখ ও অপমান মুছে নেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুপ্রিয়ার প্রকৃতি শান্ত, সে বিশ্বাস করে মানুষ মাথাপাগলা নয়, বাস্তব জগতে ভাব নিয়ে মানুষের দিন কাটে না। যার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সে সমস্তই পাওয়া চাই। জীবন নষ্ট করবার জন্য নয়, নিজের জন্য চাইতে এবং নিতে, যতটা পারা যায় পরকে পাইয়ে দিতে, কারো লজ্জা নেই। নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়া চাই, পরের জীবন সাজিয়ে দেওয়া চাই। হেরম্বের জন্য অশান্তি উদ্বেগ সন্দেহ ঈর্ষা প্রভৃতি যতগুলি পীড়াদায়ক অনুভূতি আছে তার প্রায় সবগুলি অনুভব করে করে দিন কাটানোর ফলে ফিটের ব্যারাম জন্মে যাওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত মনোভাবের দরুণ সুপ্রিয়ার কথায় ব্যবহারে সর্ব্বদা এমন একটি কোমল ভাব ও সহানুভূতির সঙ্গে চারিদিক হিসাব করে চলবার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ পায় যে, তার সম্বন্ধেও মানুষকে সে বিবেচনা করে চলতে শেখায়। সে যাকে ব্যথা দেয় নিদারুণ ক্রোধের সময়ও তাকে স্মরণ রাখতে হয় যে উপায় থাকলে সে ব্যথা দিত না। সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে মনে নালিশ পুষে রাখা কঠিন।

হেরম্ব অশোকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে বললে, 'বেশ!'

'আর বিকেলে যদি পারেন ওকে একবার মন্দির স্বর্গদ্বার-টার যা দেখবার আছে দেখিয়ে আনবেন। আমার নিজের তো ক্ষমতা নেই নিয়ে যাব!'

'আচ্ছা।'

অশোক চুপি চুপি বললে, 'আমার কি ভীষণ সেবাটাই যে ও করেছে দাদা, বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুম নেই, নিজের চোখে যে না দেখেছে, সে বিশ্বাস করবে না—এখনো যথেষ্ট করছে। ও মনে করে আমি বুঝি কিছুই চেয়ে দেখি না, আমার কৃতজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ওর সেবা আমি কখনো ভুলব না।'

হেরম্ব বললে, 'তুমি ভুল করছ অশোক, ও কৃতজ্ঞতা চায় না।'

'জানি, জানি। ওর মন কত উঁচু জানি না।'

সুপ্রিয়া বালিশ নিয়ে ফিরে আসায় এ প্রসঙ্গ থেমে গেল। অশোককে এ ঘরে দেখে সুপ্রিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। বালিশটা মাদুরে ফেলে দিয়ে বললে, 'হেরম্ব বাবু এখন ঘুমবেন। চল আমরা যাই।'

অশোক উঠল।—'আমি ওঁকে এ বেলা খাবার নেমন্তন্ন করেছি, সুপ্রিয়া।'

'বেশ করেছ। নিজে রাঁধগে, আমি পারব না।'

বলে সুপ্রিয়া হাসলে। সুপ্রিয়াকে এত ঠাণ্ডা হেরম্ব আর কখনো দেখে নি।

বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে হেরম্ব দেখতে পেল তার ঘুমের অবসরে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে বাইরে দারুণ দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। বাতাস বইছে সাঁ সাঁ শব্দে, উত্তাল সমুদ্রের গর্জ্জন বেড়ে গেছে। উঠে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে হেরম্ব অবাক হয়ে গেল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ডাকা-ডাকি শুনে সুপ্রিয়া এসে দরজা খুলে দেয়। ভারি তালা খোলার শব্দ হেরম্ব শুনতে পায়।

দরজা খুললে তালাটিকে সে খুঁজে পায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, 'দেখি তোর হাত? এটা নয়; আঁচলের নীচে যেটা লুকিয়েছিস।'

'কেন?'

'দেখা কি লুকিয়েছিস। তালা বুঝি? দরজায় তালা দেওয়ার মানে?'

সুপ্রিয়া হেসে বলে, 'মানে আর কি, পালিয়ে না যেতে পারেন তাই। যে পালাই পালাই স্বভাব।'

হেরম্ব বলে, 'আমার ঘুমের মধ্যে অশোক বুঝি ছোরা হাতে এদিকে আসছিল?'

সুপ্রিয়া গলা নামিয়ে বলে, 'আস্তে কথা কইতে পারেন না?—তা আসেনি। আসতে পারত তো।'

হেরম্ব হেসে বলে, 'ও, তোর শুধু সন্দেহ! তুই সত্যি দারোগার বৌ, সুপ্রিয়া। সে গেছে কোথায়?'

'ছাতে।'

'এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে?'

'সমুদ্র দেখতে গেছে। বললে, ঝড় উঠলে সমুদ্র কেমন দেখায় দেখবার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমাকেও

জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একটু ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে এসেছি।'

'ধস্তাধস্তি কেন?'

'ও, এমনি। আমায় ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল আর কি। যত সব বিদঘুটে খেয়াল!'

হেরম্ব ফিরে গিয়ে মাদুরে বসলে। ঘরের জানালা দুটি বায়ুর গতির দিকে খোলে, বন্ধ করার দরকার হয়নি। বাইরে এমন দুর্য্যোগ নামলে আনন্দ তার ঘরে সমুদ্রের ঝিনুক নিয়ে খেলা করে, তার যখন খুশী তাকায়, যখন খুসী কথা বলে। তাদের নিজেদের প্রেমের সমস্যা ছাড়া সে ঘরে দুর্ভাবনার প্রবেশ নিষেধ। কারো জীবনের প্রভাব সেখানে নেই, সুপ্রিয়ারও নয়, তাকে সে ভুলে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়ার কাছে থাকলে একটি বেলার জন্যও তার রেহাই নেই। আবহাওয়া অবিলম্বে বৈদ্যুতিক হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনা ঘটে, দুঃসংবাদ পাওয়া যায়। তাদের মাঝখানে আর একটি জীবনের নাটকীয় অভিনয় ঘটে চলে। বাড়ীর ছাদের ভয়ঙ্কর ঘটনাটুকুর সংবাদ সুপ্রিয়া তাকে কেন দিয়েছে বুঝে হেরম্বের কষ্ট হয়। সুপ্রিয়া কি মালতী হয়ে উঠেছে?

'কি হয়েছিল?' হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলে।

'শুনে অবিচার করবেন না। আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যাবার সময় ওর কোন মতলব ছিল না, শুধু ছেলেমানুষী খেয়াল। আমাকে ধারে দাঁড়াতে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। হঠাৎ 'সুপ্রিয়া' বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আর একটু হলেই দুজনে একসঙ্গে—'

'তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না, সুপ্রিয়া।'

অবস্থা অতি সঙ্গীন, তাদের এই বর্ত্তমান অবস্থা। হেরম্ব সাংঘাতিক লোক, যাকে গুণ্ডা বলে প্রায় তাই। সুপ্রিয়া মৃত্যু-প্রার্থিনী। এই ধরণের বৈদ্যুতিক আবহাওয়াতে এক মুহূর্ত্ত বাস করতে হেরম্ব আজকাল নিজেকে অবশ অসাড় মনে করে। যাকে সামনে পায় তাকেই তার মারতে ইচ্ছা হয়। কেন তাকে এভাবে পীড়ন করা?

সুপ্রিয়া কোনদিন কলহ করেনি, আজও করলে না। তার চোখে শুধু জল এল। হেরম্ব একটু নরম হয়ে বললে, 'তোকে মিথ্যাবাদী বলিনি, সুপ্রিয়া।'

'না।'

এই 'না'র মানে বোঝা কঠিন নয়। হেরম্ব যে মিথ্যাবাদী শব্দটা ব্যবহার করেনি তা সত্য।

'আমি শুধু বলছিলাম যে তুই বুঝতে পারিসনি। অশোক যে তোকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল তার প্রমাণ কি?'

'ঝড়-বাদলে খোলা-ছাদে তোকে কাছে পেয়ে হঠাৎ মনের আবেগে—'

সুপ্রিয়া হাত বাড়িয়ে হেরম্বের পা ছুঁয়ে বললে, 'বিশ্লেষণ করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি। আবেগ!—আকাশ থেকে বৃষ্টির মত আবেগ গড়িয়ে পড়ছে!'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'তুই বুঝি আবেগে বিশ্বাস করিস না, সুপ্রিয়া?'

সুপ্রিয়া জবাব না দিয়ে চোখ মুছে ফেললে।

এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়। তার একি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? একি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্য্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়া তার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। একটু ভয়ে ভয়ে বললে, 'ওকে নামিয়ে আনবেন না? ভিজে ভিজে মরবে নাকি!'

'না, সেটা ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না।' বলে হেরম্ব উঠে দাঁড়ালে। (ক্রমশঃ)

আর্থিক প্রসঙ্গ

মানুষের জীবন ও জীবন-বীমা *

আমার চোখে জীবনবীমা একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র। জীবন-বীমার এইরূপ সংজ্ঞার কথা অনেকের নিকট হাস্যকর মনে হইবে। কারণ এ পর্য্যন্ত অনেকে জীবনবীমার অনেক প্রকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু কেহই ইহার যন্ত্ররূপ দেখেন নাই। আমার কিন্তু জীবনবীমাকে একটা যন্ত্র বলিতে ভাল লাগে। আজীবন যন্ত্র-বিদ্যার ছাত্রত্ব করিতেছি বলিয়া সমস্ত জিনিষেরই যন্ত্ররূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

জীবনবীমা-যন্ত্রের মূল উপকরণ (raw materials) মানুষের উদ্বৃত্ত অর্থ, এবং উৎপন্ন পদার্থ (product) হইতেছে—মানুষ মরিয়া গেলেও মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণ।

"মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণ"—খুব বড় কথা। ইহার মধ্যে মানুষ কি, তাহার জীবনের প্রয়োজন কি, তাহার মরণে কে কে কি কি অভাব অনুভব করে, ইত্যাদি অনেক কথা আছে।

মানুষ যখন বাঁচিয়া থাকে তখন সে পরিবারের একজন, তাহার উপার্জ্জন-ক্ষেত্রের একজন, তাহার সমাজের একজন, তাহার জাতির একজন, তাহার দেশের একজন এবং কৃতী হইলে সমগ্র মানব-সমাজের একজন বলিয়া পরিগণিত হয়।

এমন বহু নগণ্য মানুষ আছে যাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের উপার্জ্জন-ক্ষেত্র, তাহাদের সমাজ, জাতি, দেশ বা সমগ্র মানব-সমাজ বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কিন্তু তাহাদের পরিবার কিছু না কিছু অভাব অনুভব করিয়াই থাকে।

জীবদ্দশায় মানুষ নিজ পরিবারের সাহায্য করে—(১) উপার্জ্জিত অর্থের অংশ দিয়া এবং (২) উপার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির অংশ দিয়া। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার পরিবারস্থ সকলে এই অর্থ ও বিদ্যাবুদ্ধির সহায়তা হইতে বঞ্চিত হয়।

উপার্জ্জনের প্রাচুর্য্য থাকুক বা না থাকুক এবং জীবন সুখের হউক বা না হউক, প্রত্যেক মানুষই, আমি মরিয়া গেলে আমার স্ত্রীপুত্রের কি হইবে, কোনও না কোনও সময়ে এরূপ একটা দুশ্চিন্তা করিয়া থাকেন। এবং এই দুশ্চিন্তার ফলে, তাঁহাদের জীবনের দৈর্ঘ্য ও যৌবনের স্থায়িত্ব যে কিয়ৎপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

মানুষের মৃত্যুতে অন্ততঃপক্ষে তাঁহার পরিবারস্থ সকলের দুইটি অভাব ঘটে—(১) মৃতের উপার্জ্জিত অর্থের, (২) মৃতের উপার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির সহায়তার।

উপার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির সহায়তাকে যদি কোনও বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থের পরিমাণে পরিণত করা যায় তাহা হইলে উপরোক্ত দুইটি অভাবকেই আমরা অর্থের পরিমাণে দেখিতে পারি। এমন যন্ত্র যদি কিছু থাকে যাহার ভিতর জীবিতাবস্থায় কিছু কিছু চাঁদাস্বরূপ নিক্ষেপ করিলে, জীবন নিঃশেষ হইয়া গেলেও পরিবারস্থ সকলে উপরোক্ত দুইটি অভাবের পরিমাণানুযায়ী অর্থ পাইতে পারিবে, তাহা হইলে মানুষের মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তা কতকটা সংরক্ষিত হইল, ইহা বলা যাইতে পারে। জীবন-বীমা এইরূপ একটি যন্ত্র।

জীবনবীমা-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের (parts) নাম এবং তাহাদের বিভিন্ন কার্য্যের বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহা এই—

১ম অংশ—সাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থের সংগ্রহ। যে কোনও বস্তু সংগ্রহ করিতে হইলে কোনও একটা ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত অনুযায়ী করিতে হয়। এজেন্ট, স্পেশাল এজেন্ট, অর্গ্যানাইজার, স্পেশাল অর্গ্যানাইজার প্রভৃতি এই সংগ্রহ-কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া থাকেন।

২য় অংশ—সংগৃহীত অর্থের যথোপযুক্ত অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া রক্ষা করা। এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের পর্য্যবেক্ষকেরা ও পড়তার হিসাব (costing) যাঁহারা রাখিয়া থাকেন তাঁহারা এই বিভাগের দায়িত্ব লইয়া থাকেন।

---

* মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর কর্ম্মীগণের একটি সম্মেলন-সভায় উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টদের অন্যতম—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।—বঃ সঃ

৩য় অংশ—রক্ষিত অর্থের বৃদ্ধিসাধন। রক্ষিত অর্থকে খাটাইবার ভার যাঁহারা লইয়াছেন এই অংশের দায়িত্ব তাঁহাদের।

৪র্থ অংশ—যাঁহারা চাঁদা দিয়া যন্ত্রটির পরিচালনার সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ অনতিবিলম্বে যথাযথ বণ্টন। দাবীপূরণ-বিভাগের (claim department) ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই অংশের দায়িত্ব লইয়া থাকেন।

চারিটি মূল অংশে জীবন-বীমা-যন্ত্রকে বিভাগ করিয়া বর্ণিত করা হইল বটে কিন্তু অন্য অনেক স্থূল এবং সূক্ষ্ম কর্ত্তব্যের কথা বাদ পড়িল। নানা সুবিধা এবং অসুবিধা বিবেচনায় অবস্থানুসারে এই সকল কর্ত্তব্য সহজ ও জটিল হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই যন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা একটি মাত্র মূল যন্ত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশের দায়িত্ব লইয়া কাজ করেন মাত্র। যে কোনও যন্ত্রেরই সমস্ত অংশ মিলিত ভাবে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে যন্ত্রের স্থায়ী কার্য্যকারিতা হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

জীবন-বীমা সম্পর্কিত সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যথাযথ যন্ত্রবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সূচনা বা আরম্ভ, যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গরূপে স্ব স্ব দায়িত্ব নির্ব্বাহ করাই তাঁহাদের কার্য্য এবং মানুষের মৃত্যুর পর তাহার জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণই সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

জীবন-বীমা-যন্ত্রের বর্ণনা দ্বারাই জীবনবীমা-যন্ত্রের কার্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। মূল উপকরণ (raw materials)—যথা, মানুষের উদ্বৃত্ত অর্থ এবং উৎপন্ন পদার্থ (finished product) যথা, মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণ সম্বন্ধেও, কিছু বলা আবশ্যক।

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ই জীবনবীমা-যন্ত্রের সহিত সাধারণ মানুষের সম্বন্ধের কথা অর্থাৎ সাধারণের কাছে জীবনবীমা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার এবং জীবনবীমাকারীগণের প্রতি এই যন্ত্রের কর্ত্তব্যের কথা লইয়া।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনবীমা-যন্ত্র একটি বাণিজ্য বিশেষের অংশস্বরূপ এবং সমস্ত বাণিজ্যের মূলে ও পরিণতিতে অর্থ আছে। 'অর্থ' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Finance অথবা Money। আমার মনে হয়, ইংরেজী Money কতকাংশে বিজ্ঞানসম্মত হইলেও সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। সেই জন্যই অর্থ শব্দের সংস্কৃত অর্থ আমার বেশী বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হয়। এই শব্দটি অর্থ্-ধাতু হইতে আসিয়াছে এবং অর্থ্-ধাতুর অর্থ, প্রার্থনা করা। যাহা প্রার্থনা করা হয় অথবা মানুষ যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নাম অর্থ। যে বণিক তাঁহার ক্রেতা কি আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁহার অবস্থানুসারে কি আকাঙ্ক্ষা করা উচিত তদ্বিষয়ে চিন্তা না করেন তাঁহার বাণিজ্য দৃঢ়মূল হয় না।

বীমা-ব্যবসায়ে ক্রেতা যে বীমাকারীগণ তাহা বলাই বাহুল্য। কার্য্যতঃ দেখা যায় বীমাযন্ত্রের প্রতিনিধিগণ (agents) সাধারণের নিকট বীমার প্রস্তাব লইয়া গেলে তাঁহারা প্রায়শঃই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং প্রতিনিধিগণ ধৈর্য্যের অবতার না হইলে তাঁহাদের বাঞ্ছিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না।

এইরূপ কেন হয় তাহা চিন্তা করিলে নিম্নলিখিত কারণ কয়েকটি মনে হয়—

১। জীবন-বীমা যে মৃত্যুর পরেও জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণের পন্থা তৎসম্বন্ধে সাধারণকে সজাগ করিয়া তোলা হয় না।

২। কি পরিমাণ জীবনবীমা করিলে মৃত্যুর পর জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষিত হইতে পারে তাহাও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হয় না।

৩। মানুষের জীবিতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা কি ভাবে অর্থের পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় তাহাও সম্যক আলোচিত হয় না।

৪। উপযুক্ত পরিমাণে জীবন-বীমা করিতে হইলে উপার্জ্জিত অর্থের কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত রাখিতে হয় এবং উদ্বৃত্ত রাখা সম্ভব কিনা এবং কোন্ উপায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্বৃত্তির সম্ভাবনা সে বিষয়ে আলোচনার অভাব।

৫। যত প্রকার উপায়ে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব এবং উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিবার কি কি উপায় প্রত্যেকের নিজ নিজ আয়ত্তের অধীন তদ্বিষয়ে জ্ঞান বা আলোচনার অভাব।

বীমাকার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে তবেই তাঁহারা তাঁহাদের কাজে জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবেন এবং নিজেরাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত বীমার ক্রেতাগণের সহিত আদান-প্রদান রাখা, দেয় চাঁদার (premium) হার কমান ও রক্ষিত অর্থের বৃদ্ধির জন্য উপার্জ্জন-স্থলের সংখ্যা ও পরিধি বিস্তৃত করিবার উপায় সম্বন্ধেও আলোচনা ও শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জীবন-বীমা সম্বন্ধে কথা শুরু করিয়া আমি তাহার যন্ত্ররূপ পরিকল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম না, এই যন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য অর্থনীতি (Economics) সমাজতন্ত্র (Sociology) ও শিল্পবাণিজ্য- (Industries) কেও টানিয়া আনিলাম এবং এই গুলির দায়িত্ব ফেলিলাম বীমা-ব্যবসায়ীগণের স্কন্ধে। তাঁহারা বলিবেন, এ সকল বিষয়ে মাথা ঘামাইবার জন্য ভাবুক ও কর্ম্মীর অভাব নাই। বীমা-ব্যবসায়ীগণকে এ সকল বিষয়ে চিন্তার অংশ লইতে হইবে কেন? সংক্ষেপে এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে আমাকে কতকগুলি পাল্টা প্রশ্ন করিতে হইবে। মানুষের জীবন এবং আমাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলি অপরিহার্য্য এবং এই গুলির যথাযথ উত্তরের মধ্যেই সকল সমস্যার মীমাংসা নিহিত আছে। এই প্রশ্নগুলির ফলে মানুষের মনে যে সকল বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগরিত হইবে সেই গুলির সংখ্যা ও বিস্তৃতি যতই অধিক হইবে আমরা ততই মৃত্যুর পরেও জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেষ্ট হইব। প্রশ্নগুলি এই—

১। আমাদের সমস্ত চিন্তার যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করিব? অর্থাৎ আমাদের মিলন-ক্ষেত্র কি হইবে?

২। দেশ বলিতে প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কি বুঝি বা বাস্তব দৃষ্টিতে কি দেখিতে পাই?

৩। দেশ বলিতে বাস্তব দৃষ্টিতে যাহা দেখি তাহাদের প্রকৃতি এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব দৃষ্টিতে কি কি অনুভব করি?

৪। দেশের দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি বলিতে মূলতঃ কি বুঝায়?

৫। বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধির তারতম্য হয় কেন?

৬। ভারতবাসী সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষের পরিচালনার কর্তৃত্ব হারাইল কেন?

৭। ইংরেজ ভারতবর্ষের পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন কেন?

৮। মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সনাতন পন্থা কি কি?

৯। মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার বিভিন্ন সনাতন পন্থার উৎকর্ষ কি কি ?

১০। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার বিভিন্ন সনাতন পন্থার উৎকর্ষের বিভাগানুযায়ী ভারতবাসীর স্থান কোথায়, অভাব কোথায়, অভাব পূর্ণ করিবার কি উপায়?

১১। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার বিভিন্ন সনাতন পন্থার উৎকর্ষের বিভাগানুযায়ী ভারতবাসীর অভাব পূর্ণ করিবার উপায় কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা কি?

এ দেশের মানুষ যদি ঠিক মানুষ হইয়া সকল প্রকার অভাব দূর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহা হইলে এদেশীয় মানুষের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর চিন্তার উদ্ভব হওয়ার প্রয়োজন যাহাতে (১) দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষা কি কি (২) ওই আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে নিজেদের আয়ত্তাধীন উপায়ে পূর্ণ হইতে পারে এবং (৩) এই উপায়গুলি কি করিয়া উত্তরোত্তর বিস্তৃততর এবং কার্য্যকরী করা যায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে। উপরোক্ত একাদশটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই এই সকল চিন্তার উদ্ভব হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এদেশে এই ধরণের চিন্তা যে একেবারেই আসে নাই তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করা হইতেছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, আমূলস্পর্শী সুশৃঙ্খলিত চিন্তা আমাদের মনে জাগ্রত হইলে আমাদের অনেক সমস্যাই সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে।

মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই সকল শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সুস্থ যৌবনসম্পন্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকার আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। তাহা যখন সম্ভব হয় না তখন সে দীর্ঘজীবী হইবার কামনা করে এবং জীবনকে দীর্ঘতর করিবার সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত হয়। কিন্তু যখন সে দেখে

এ সকল সত্ত্বেও মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে তখন মৃত্যুর পরেও নিজের জীবনের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়। এই বিচারে জীবনবীমা-যন্ত্রের কার্যাকরী পরিধি যে কত বিস্তৃত, এই প্রতিষ্ঠান যে কত পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জগতের অন্যত্র জীবনবীমা-ব্যবসায়ের সকল অংশ সম্যক ভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা আমি জানি না। হউক বা না হউক, আমাদের দেশে আমরা কি এ ব্যবসায়ে একটা বিস্তৃততর ধারণা ও সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া কাজ করিতে পারিব না? জীবনের সকল বিভাগেই আমরা গতানুগতিক ভাবে পাশ্চাত্য ভাবুক এবং কর্ম্মীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। কি বিজ্ঞানে, কি ব্যবসায়ে, কি রাষ্ট্র বা সমাজ-আন্দোলনে আমরা নিজেরা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কোনও কর্ম্মের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি আজিও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। চিরকাল আমরা কেন মনে করিব যে দাগা বুলাইয়া চলা ছাড়া আমাদের গতি নাই। আমি আশা করি, জীবন বা ব্যবসায়ের যে কোনও একটা ক্ষেত্রে আমরা একটু স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তা মতে চলিতে চেষ্টা করিব। জীবন-বীমা ব্যবসায়ের পরিচালনাই সেই প্রচেষ্টার সূচনা হউক। মানুষের জীবনের উদ্বৃত্ত সামর্থ্য লইয়া ইহার কারবার এবং মানুষের মৃত্যুতে জাতিগত সমাজগত ও পরিবারগত ক্ষতি-পূরণই ইহার লক্ষ্য। আমাদের এই মুমূর্ষু জাতির এই দিকটা যদি আমরা রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে অন্য সকল বিভাগেও আমাদের সাফল্য অধিকতর সম্ভব হইবে। সেই সুদিন যতদূর সম্ভব শীঘ্র আসুক ইহাই আমার কামনা।

বাঙ্গালা দেশের বেকার-সমস্যা

গত কয়েক বৎসরে পৃথিবীব্যাপী যে আর্থিক দুর্ঘট ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার জন্যই প্রায় প্রত্যেক দেশেই বেকার-সমস্যা অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সব দেশই অর্থনৈতিক অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসে নাই; রুশিয়া জার্ম্মানী ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বিশেষ একটি ব্যাপক কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের প্রচেষ্টা যে আংশিক ভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের বেকার সমস্যা এরূপ বিস্তৃত ও করুণ হওয়া সত্ত্বেও তাহা দূর করিবার চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা এখনও সম্যক্ উপলব্ধ হয় নাই। এই বেকার-সমস্যার কতখানি বিস্তৃতি, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সমস্যার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে কোন আলোচনাই হয় নাই এবং কার্য্যপ্রণালীও অবলম্বন করা হয় নাই। শুধু দুই একটি আইন করিয়া শিল্পপ্রসারকে সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বেকার-সমস্যার গুরুত্বকে সামান্য মাত্রও কমাইতে সমর্থ হয় নাই।

প্রত্যেক দেশেই বেকার সমস্যার মূলে রহিয়াছে শিল্পোন্নতি ও জনবৃদ্ধির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য। যদি দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনোপায়ের সুবিধাগুলিকে সমপরিমাণে বৃদ্ধি করা না যায় তাহা হইলে দেশের দৈন্য এবং বেকার-সমস্যাও বৃদ্ধির দিকে চলিতে থাকে। বাঙ্গালা-দেশের বেকার-সমস্যার মূলে এই অসামঞ্জস্যই বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে যে স্থলে জন-বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৭.৩ জন, সে স্থলে বাঙ্গালায় কৃষিসম্পদ হ্রাসের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫৫ টাকা। যদি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের উপার্জ্জনে দেশের অর্থভাণ্ডারের এই ক্ষতি পূর্ণ হইত, কৃষিশিল্পের অবনতির জন্য যে সমস্যা তাহা অনেকাংশে কমিয়া যাইত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের শিল্প-প্রগতি যে তদনু-রূপ হয় নাই তাহা প্রমাণের আবশ্যক করে না। সেই জন্যই বাঙ্গালা দেশের প্রায় শতকরা ৭২ জন লোক, বাকী ২৮ জনের উপর জীবিকা-সংস্থানের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ১৯৩১ সনের আদম-সুমারীই তাহার প্রমাণ দিবে।*

আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গালায় বেকারদিগকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার, দ্বিতীয়তঃ সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত বেকার। যেহেতু সমাজের মেরুদণ্ডই হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাহাদের

* ১৯৩১ সনের সেন্সাস্ গণনায় দেখা যায়—প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ২৮৮ জন উপার্জ্জনশীল, তাহাদের মধ্যে ১৩ জন সাহায্যকারী পোষ্য এবং বাকী সবাই সমাজের বেকার পোষ্য।

মধ্যে যদি বেকার-সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় তবে দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছুই আশা করিবার থাকে না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল নির্ভর করে এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর উপরেই। দেশের শিক্ষা, উৎকর্ষ, এবং আদর্শ ইহাদেরই দান এবং দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার প্রেরণা ইহাদেরই মধ্যে সব চেয়ে বেশী। কাজেই এই শ্রেণীর মধ্যে যদি কর্ম্মহীনতা ও নিরুপায়তা আসিয়া ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয় তবে দেশের ও সমাজের ক্ষতি যে কত বড় হইবে তাহা অনুমান করা খুব মুস্কিল নয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সংখ্যা কত তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। ১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—৫৩২২৩৯ জন মুসলমান এবং ৯৬৮৬৯৩ জন হিন্দু। এই সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহকালে বেকার জনসাধারণের বেকার বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন ছিল বলিয়া, মনে হয়, প্রকৃত বেকার-সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী। বেসরকারী ভাবে বাঙ্গালা-দেশের কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সংখ্যা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের হিসাব অনুসারে বেকার-সংখ্যা সেন্সাসে সংগৃহীত সংখ্যা হইতে বেশী হইয়া দাড়ায়। মোটের উপর ১৭।১৮ লক্ষ লোক যে কর্ম্মহীন অবস্থায় দেশের অর্থ-ভাণ্ডারের উপর বাঁচিয়া রহিয়াছে কিন্তু নিজেদের উপার্জ্জন-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু দান করিতে পারিতেছে না—তাহাই দেশের পক্ষে বিরাট দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থার উদ্ভবের কারণ অনেকগুলি; তাহার মধ্যে মূলগত কারণ হইল এই যে, দেশে মিল ও ফ্যাক্টরী-শিল্পের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে যে সব কুটীরশিল্প সহস্র সহস্র জনের জীবিকার সংস্থান করিয়া আসিয়াছিল, সেগুলি ক্রমশঃ বিনাশ পাইতে লাগিল। মিল্ ও ফ্যাক্টরীজাত শিল্প কুটীর-শিল্পের অবনতি ঘটাইল। কিন্তু যে সব লোক কর্ম্মহীন হইয়া পড়িল তাহাদের স্থান মিল-ফ্যাক্টরীতে হইতে পারিল না। ফলে তাহাদের মধ্যে বেকারসমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। মুমূর্ষু কুটীরশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তেমন চেষ্টাও হইল না এবং যে সব শিল্পের যথেষ্ট জীবনীশক্তি ছিল এবং জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তাহারা অনাদরে ও অবহেলায় নষ্ট হইয়া গেল। বাঙ্গালার কুটীর-শিল্পের এই শোচনীয় অধঃপতন-কাহিনী দেশের অর্থনৈতিকইতিহাসে একটি করুণতম অধ্যায় হইয়া রহিল।

বাঙ্গালায় বেকার-সমস্যার আর একটি প্রধান কারণ হইল ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্য প্রদেশাগত লোকদের তীব্র প্রতিযোগিতা। বাঙ্গালার বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে অধিকাংশই অবাঙ্গালীর হস্তগত। শুধু যে ব্যবসায়ের অংশহিসাবেই বাঙ্গালীর কোন হাত নাই তাহা নয়, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদলেও বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি সামান্য। কলিকাতার ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মিল ও ফাক্টরীগুলিতে যত কর্ম্মী সংখ্যা আছে তাহার অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশ ও বিহার উড়িষ্যা হইতে আগত। ১৯২১ সনের সেন্সাসে দেখা যায় যে,বাঙ্গালার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১৭০,০০০ এর মধ্যে ৭১০০০ জন বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, শিল্প-প্রগতির প্রভাবে গ্রামে গ্রামে যে সব লোক কুটীর-শিল্পের অবনতির জন্য বেকার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের বেকার-অবস্থা দূর হয় নাই। বড় বড় ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও কলিকাতার অলিতে গলিতে দেখা যায় যে, শত শত ছোট ছোট দোকান অন্য প্রদেশীয় লোকগণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ট্যাক্সী-চালক, দারোয়ান, বেহারা প্রভৃতির হাজার রকমের কাজেও বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই। শুধু তাহাই নয়, সুদূর মফঃস্বলের বাজারে বাজারে, বন্দরে বন্দরে এবং সামান্য মেলাগুলিতেও রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার উড়িষ্যার লোকদের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অবশ্য বাঙ্গালীর স্বভাবগত উদ্যমশীলতার অভাব প্রমাণিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে, বাঙ্গালী যুবকেরা উদ্যম-পূর্ণ হইয়াও কিছু করিতে সমর্থ হইতেছে না, শুধু অবাঙ্গালীদের প্রতিযোগিতার জন্যই। তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ের ভিত্তি খুব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীরা প্রায় সবক্ষেত্রেই পরাজিত হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইতেছে। অবাঙ্গালীদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব কর্ম্মচারী দরকার তাহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ প্রদেশ হইতে আমদানী করা হয়; বাঙ্গালী যুবকেরা সে বিষয়ে কোন সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার বা সাহায্য সাধারণতঃ লাভ করে না। ফলে তাহারা আপনার

গৃহেই পর হইয়া আছে। গবর্ণমেণ্টও কোন কোন সরকারী বিভাগে বাঙ্গালীদের প্রবেশ অনুমোদন করেন না। বস্তুতঃ সৈন্য বিভাগে এবং বাঙ্গালার নিম্নতম পুলিসবিভাগে বাঙ্গালী যুবকদের প্রবেশ অনেকাংশে রুদ্ধ। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলেও কনষ্টেবল দল অন্যান্য প্রদেশ হইতেই আমদানী করা হয়। এই সব বিভাগে যদি বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হইত তাহা হইলে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা যে অনেকটা হ্রাস পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালাদেশের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, যখন অন্যান্য প্রদেশ শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে লাগিল এবং এমন কি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রদেশের লোক আসিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিল, তখন বাঙ্গালীরা সরকারী চাকুরী ও শিক্ষার মোহে ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে তেমন আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। বাঙ্গালার শিক্ষাপদ্ধতিও এইরূপ মনোবৃত্তি বৃদ্ধির পক্ষে সাহায্য করিয়াছে। কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রণালী বাঙ্গালীর যুব-শক্তিকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে অভিনব প্রেরণায় কখনও উদ্বোধিত করে নাই। প্রতি বৎসর হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহ-দরজা পার হইয়া আসিয়া শুধু বেকার-সমস্যাটিকেই গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। এই যে অর্থ, বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার, তাহা দেশকে কোন দিক দিয়াই সাহায্য করিতে পারে না। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি বাঙ্গালী যুবকদের উপযুক্ত স্থান হইবার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত তাহা হইলে শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতার দোষ যে অনেকাংশে হ্রাস পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার চিন্তাশীল নেতৃগণ আজ এই অবস্থাটি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় কখনও এত বড় একটি সামাজিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইতে পারে না। সব দেশেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই ব্যাপকভাবে বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করা হয়—অবশ্য জনসাধারণের সহানুভূতি ও কার্য্যকরী সাহায্য লইয়াই। বাঙ্গালা দেশে যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তেমন কিছু করা হয় নাই, তাহা রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য তাহাই অনেকটা প্রমাণ করে। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার নিজস্ব শিল্পগুলির পুনরুত্থান এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রসার করিয়া অনেকাংশে দেশের বেকার-সমস্যাকে মন্দীভূত করিতে পারেন। তাহার পর সৈন্যবিভাগে বাঙ্গালী-দিগকে গ্রহণ করিয়া,কৃষির বিবিধ উন্নতি করিয়া এবং বাঙ্গালার রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মপদ্ধতি আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের নিরুপায় কর্ম্মহীনতা অনেকাংশে দূর করিতে পারেন। আরও, দেশে যদি বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন হয় তবে অনেক শিক্ষিত যুবকের যে কর্ম্মসংস্থান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জন-সাধারণের কর্ত্তব্য বিষয়েও একথা বলা চলে যে, তাহাদের প্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টার উপরেও সমস্যাটির সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। এই বিংশ শতাব্দীর তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে অদৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সরকারী চাকুরী ও কেরাণীগিরির মত উপার্জ্জনের সহজ পন্থার উপর নির্ভরতা কম করিতে হইবে। ব্যবসাবাণিজ্যে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং সেজন্য অর্থ, শ্রম ও বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়োজিত করিতে হইবে। কলিকাতার বিভিন্ন অংশে চীনারা অতি দীন আড়ম্বরের মধ্যে কেমন করিয়া চামড়া ও জুতার কারখানা করিয়া বসিয়াছে তাহাতে তাহাদের কর্ম্মকুশল ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালীদের শিক্ষাগর্ব্বিত মনে এইরূপ কর্ম্মপ্রেরণা না আসিলে চলিবে না।

মোটের উপর, বেকার-সমস্যার সমাধান সন্তোষজনক ভাবে হইতে পারে একমাত্র দেশের শিল্পপ্রসারের সাহায্যেই। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় যে বিভিন্ন কুটীরশিল্প মৃতপ্রায় হইয়া আছে তাহাদের রক্ষা করা একান্ত দরকার এবং যেসব শিল্পের স্থানীয় অবস্থা-বিবেচনায় যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি এই স্বদেশী শিল্পগুলিকে সজীব ও উন্নতিশীল করিতে হইলে একটি স্বদেশী মনোবৃত্তিও সৃষ্টি করিতে হইবে। আমেরিকা প্রভৃতি সব দেশেই অর্থনৈতিক জাতীয়তার প্রভাবে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বিপুল আনন্দ চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশে খদ্দরের জন্য যে আকস্মিক আন্দোলন জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা স্থায়ী হয় নাই এই জন্য যে, তাহার মূল ভিত্তি ছিল একটি রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার স্থান নাই; কাজেই খদ্দর-আন্দোলনের পিছনে যদি অর্থনৈতিক যুক্তি থাকিত তাহা হইলে খদ্দর-শিল্প বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট সমাদর

পাইত এবং সেজন্য বাঙ্গালার অনেক ছেলে যে কাজ খুঁজিয়া পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের স্বদেশী শিল্পগুলিকে জনপ্রিয় করিতে হইলে বাঙ্গালী জীবনে তাহাদের সার্থকতা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে বড় বড় চিনি ও কাপড়ের ফ্যাক্টরীও স্থাপিত হইতেছে; তাহাতে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। মোট কথা—দেশের এই উৎকট বেকার-সমস্যা একদিনে দূরীভূত হইতে পারে না। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের যতই প্রসার হইতে আরম্ভ হইবে এবং বাঙ্গালীরা যতই তাহাতে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইবে—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা ততই দূর হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নতম স্তরে যে সব অশিক্ষিত বেকার আছে তাহারাও উপার্জ্জন-পথ খুঁজিয়া পাইবে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কুটীরশিল্পগুলির অবনতির জন্য শুধু যে মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যা গুরুতর হইয়াছে তাহা নয়, যাহারা একমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের সাহায্যে জীবন-ধারণ যাহারা করে তাহাদের মধ্যেও কর্ম্মহীনতার সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। তাহাদের শ্রমের জন্য যদি যথেষ্ট চাহিদা না থাকে এবং দেশের কৃষি যদি বর্দ্ধিষ্ণু না হয় তবে এই দিনমজুর-দের কষ্টের সীমা থাকে না। বাঙ্গালাদেশে একমাত্র পাটের চাহিদা ও মূল্য কমিয়া যাওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন *। কাজেই লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুণ এই দিন-মজুর শ্রেণীর মধ্যে যে বেকার-সমস্যা কতখানি করুণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইশ্রেণীর বেকারসংখ্যা নিরূপণেরও কোন উপায় নাই। প্রত্যেক দেশেই বেকার লোকদের সংখ্যাবিবৃতি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাখা হয়; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে যে কত লোক বেকার অবস্থায় অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছে তাহার খবর আমরা জানি না। দেশের এই অজ্ঞাত ও অপরিমিত দৈন্য ও উপায়-হীনতা নিশ্চয়ই সামাজিক জীবনে বিবিধ কুফল সৃষ্টি করিতেছে।

এই বেকার-সমস্যার নিম্নতম স্তরে সমাজের ভিক্ষোপ-জীবিকার সমস্যাও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। সেন্সাস্ গণনানুসারে প্রায় দুই লক্ষ নরনারী সমাজের ধনভাণ্ডারের উপর ঠিক পরগাছার মত নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিতেছে। তাহারা দেশের ধনসম্পত্তি ধ্বংস করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কোন কাজই করিতেছে না। তাহাদের জন্য সমাজের ক্ষতি আছে কিন্তু বৃদ্ধি নাই; বেকার অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক দিন-শ্রমিক ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং যখন তাহারা অনুভব করে যে, বিনাশ্রমে তাহারা জীবিকা সংস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে তখন পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয়। ফলে ভিক্ষুকের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পায়। জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক অনেক নরনারী যে অতি সহজ ভিক্ষোপজীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাই সমাজ-জীবনে বেকার-সমস্যার একটি বড় কুফল। উপযুক্ত আইন ও সাহায্য-প্রতিষ্ঠান না থাকিলে ভিক্ষোপজীবিগণের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পায় না, সমাজের উপর একটি লাভশূন্য ভার সৃষ্টি করিয়া বিবিধ কুফলও উৎপাদন করে। কাজেই ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন যতটা, তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনও ততটা। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, প্রণালী-বদ্ধভাবে কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন এবং বিবিধ সরকারী কাজের অনুষ্ঠান করিলে বাঙ্গালার এই দুই লক্ষাধিক ভিক্ষোপজীবীর বেকার-সমস্যা সমাধান হইতে পারে। দেশবাসীর যে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া দরকার তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

* ভাদ্রের "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "বাঙ্গালার পাট-সমস্যা ও আর্থিক দুর্গতি"—দ্রষ্টব্য।

নারীহরণ ও পুলিস

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গদেশে নারীহরণ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা হিন্দু কর্ত্তৃক ধর্ষিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা অপেক্ষা ১৯ গুণ বেশী। দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ৩ গুণ বেশী। এইরূপ হইবার সামাজিক কারণসমূহ হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে অত্যধিক মাত্রায় নারীহরণ বৃদ্ধির কারণ, পুলিসের অকর্ম্মণ্যতায় ও অমনোযোগে, অপরাধী দুর্ব্বৃত্তদিগের পলায়নের সুযোগ।

প্রত্যেক সমাজেই স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত আছে অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবই সমাজের ক্ষতিকর কার্য্য করা। এই দুর্ব্বৃত্তেরা যদি অকাজ করিয়া সাজা না পায় বা ধরা না পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের বুকের বল বাড়িয়া যায়। আর তাহাদের দেখাদেখি ও সঙ্গদোষে অনেকের দুর্ব্বৃত্তি করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। পুলিস আমাদের দেশে বরাবরই অকর্ম্মণ্য; এ জন্য ইংরেজী ১৯০২ সালে পুলিস-কমিশন বসাইয়া পুলিসের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। কতকটা যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু ১৯০৮ সাল হইতে বোমার সূত্রপাত হইল। সরকারের নজর পড়িল বোমাওয়ালাদের উপর। বোমা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। পুলিসও বোমা ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। বোমা-ধরায় পুলিসের কৃতিত্ব আছে, তাহা দেখিয়া বৎসরের পর বৎসর লাট সাহেব পুলিসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুলিসের বুক ফুলিয়া গেল। তাহাদের অকর্ম্মণ্যতার 'শতদোষ' বোমা ধরার একগুণে ঢাকা পড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে যখন লাট-বেলাট সাধারণ অপরাধ ধরিতে না পারায় কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, পুলিস বুঝাইয়া দিল, দেশের লোকের সহানুভূতির অভাব, সরকারও বুঝিলেন তাহাই। দেশের রাজনৈতিক হাওয়া মন্দ। ফলে গরীব গৃহস্থ মারা গেল। অকর্ম্মণ্য পুলিস তাহার নিজ অকর্ম্মণ্যতার দোষ দেশবাসীর স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত রহিল। আরও এক কারণে এই অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধি পাইল। মুসলমান দারোগা নিয়োগ করা মুসলমান নেতাদের আগ্রহের বিষয় হইল। একেই ত যোগ্য পুলিস কর্ম্মচারীর অভাব, তদুপরি শতকরা ৫৫ জন মুসলমান নিয়োগ করা চাই! Doctrine of 'minimum qualification অর্থাৎ এক কথায় সর্ব্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের কার্য্যে নিয়োগের এই নিয়ম যেখানে চলিতে থাকে সেখানে উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পুলিসের তরফ হইতে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, দেশে অপরাধের বা অপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেজন্য পুলিস কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। নিম্নে বাংলা দেশের বিভিন্ন বিভাগে লোক-সংখ্যার অনুপাতের ও অপরাধের অনুপাতের সহিত পুলিসের অনুপাত দেখাইলাম।

১৯৩৩ সাল

বিভাগ	১ জন পুলিসের অনুপাতে লোক-সংখ্যা	১ জন পুলিসের অনুপাতে তদন্তকৃত অপরাধের সংখ্যা
বৰ্দ্ধমান	১,৪৪৭	২·৯
প্রেসিডেন্সী	১,৬৮৬	২·৬
রাজসাহী	২,৩২১	২·৭
ঢাকা	২,৮০৫	২·৯
চট্টগ্রাম	৩,৪৮৬	২·৬
সমগ্র বঙ্গ	২,০০৩	২·৬

উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যায়, লোক-সংখ্যার অনুপাতে পুলিসের সংখ্যার সহিত পুলিস কর্ত্তৃক তদন্তকৃত অপরাধের সংখ্যার কোন সামঞ্জস্য বা সোজা সম্বন্ধ (direct correlation) নাই।

আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ, গড়ে প্রত্যেক পুলিসের অনুপাতে মাত্র ২·৬টি অপরাধের তদন্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বলা চলে যে, আমাদের দেশের পুলিশ আদৌ over-worked বা 'খাটিয়া সারা' নহে।

পুলিসের তরফ হইতে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, থানার সংখ্যা বাংলা দেশের অবস্থানুসারে কম। আমাদের দেশে থানায় দারোগা থাকে ও সেই থানেই অপরাধের তদন্ত আরম্ভ হয়। ফাঁড়ীতে হয় না। এক্ষণে দেখা যাউক, লোক-সংখ্যার অনুপাতে থানার অনুপাত কিরূপ।

১৯২১ সালে বাংলা দেশে ৬৫২টি থানা ছিল; ১৯৩১ সালে উহা কমাইয়া ৬১৯এ পরিণত করা হইয়াছিল। ১৯২১ সালে প্রতি ৭০,২২৭ জন লোক প্রতি একটি করিয়া থানা ছিল, ১৯৩১ সালে প্রতি ৭৯,৩৪৯ জনের জন্য একটি করিয়া থানা। এই থানা কমানই যে নারী-হরণবৃদ্ধির কারণ তাহা নহে। কারণ, ইহার পূর্ব্বে থানার সংখ্যা অত্যধিক কম ছিল। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে অনেক থানা সরকার বৃদ্ধি করেন: পরে অনাবশ্যক বিবেচনায় ৩৩টি থানা উঠাইয়া দেন। নিম্নে কোন্ বৎসরে কত থানা ও প্রত্যেক থানায় কত লোকের বাস তাহা প্রদর্শিত হইল :—

সাল	থানার সংখ্যা	প্রত্যেক থানার লোক-সংখ্যা
১৮৭২	৩৪৭	৯৭,৪৯২
১৮৮১	৩৬৫	৯৮,·১৫
১৮৯১	৩৭৫	১০২,৪২৯
১৯০১	৩৭৮	১০৯,২৪৯
১৯১১	৩৮৫	১১৫,৮১০

এক্ষণে দেখা যাউক, গত দশ বৎসরে থানার সংখ্যা কমানর দরুণ বা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ, অপরাধের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ সরকারী পুলিস রিপোর্টে অপরাধের ছয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। ১ম শ্রেণীর অপরাধ, রাজনৈতিক বা সরকারী কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্য। ২য় শ্রেণীর অপরাধ, মনুষ্যদেহের বিরুদ্ধে, যথা, খুন, জখম, নারী-হরণ ইত্যাদি। ৩য় শ্রেণীর অপরাধ, যেমন ডাকাতি, সিঁদেল চুরি প্রভৃতি। ৪র্থ শ্রেণীর অপরাধ, যেমন কাহাকেও বলপূর্ব্বক আটকাইয়া রাখা বা গোঁয়ার্তুমির কার্য্য। ৫ম শ্রেণীর অপরাধ, যেমন চুরি, ঠকান প্রভৃতি। ৬ষ্ঠ শ্রেণী, অপর সকল খুচরা অপরাধ, যেমন মিউনিসিপ্যাল আইন ভঙ্গ করা প্রভৃতি।

নিম্নে ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত গুরুতর অপরাধের শ্রেণী অনুযায়ী তালিকা প্রদত্ত হইল।

গুরুতর অপরাধ

	পুলিস-গ্রাহ্য			নালিসী অপরাধ				মোট
	১ম	২য়	৩য়	১ম	২য়	৩য়		
১৯২১	১,৬১৬	৪,৫৪৮	৪২,৪৭৪	৫,৩৬৪	১৩	৫২১	=	৫৪,৫৩৬
১৯২২	১,৯৭৫	৪,৯২৫	৪০,৬২৬	৫,৮৬০	১৫	৫০৭	=	৫৩,৯০৮
১৯২৩	১,৭৭৭	৪,৮৬৪	৩৮,১৩৫	৫,০৮৮	১৯	৫২১	=	৫০,৪০৪
১৯২৪	১,৫৩৮	৫,১৫১	৩৫,৮৬৩	৫,৪৪৭	২৫	৪৭৬	=	৪৮,৫০০
১৯২৫	১,৬৮৫	৫,৪১২	৩৩,১০২	৫,৯২৫	২৭	৫০৬	=	৪৬,৬৫৭
১৯২৬	১,৭৮৫	৬,০৮৪	২৫,৮৩১	৬,১৫১	২২	৪২৫	=	৪০,২৯৮
১৯২৭	১,৭৫২	৬,০৫৮	২৭,৫৭৪	৫,৬০৪	২৫	৫২৬	=	৪১,৫৩৯
১৯২৮	১,৮৭২	৬,৩২২	২৮,২৩৯	৫,৬৬২	১৭	৪৮৭	=	৪২,৫৯৯
১৯২৯	১,৯৮৪	৬,৮১০	২৮,৮০৩	৫,৫২০	৩৮	৫২৪	=	৪৩,৬৭৯
১৯৩০	২,৭৬৬	৬,৭০৭	৩১,০৯৭	৫,৯১৬	১৮	৫২০	=	৪৭,০২৪
১৯৩১	২,৩৪৯	৫,৯৭১	৩২,৩৭৫	৫,৮৭২	২৫	৪৮৭	=	৪৭,০৭৯

সামান্য অপরাধ

	পুলিস-গ্রাহ্য			নালিসী অপরাধ				মোট
	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ		
১৯২১	১,৩৪৭	৪৪,৫৩৪,	৯৭,১৪৭	৪৪,৫৫৭	১৭,৬০৩	৪৭,৫০৭	=	২৫২,৬৯২
১৯২২	১,৩৫৯	৪৪,২৭১	১১৭,৪৯৯	৪৫,৩৫২	১৮,০৫৩	৫১,৪৩৬	=	২৭৭,৯৭০
১৯২৩	১,৪২৮	৪৩,৫২১	১১১,৮০৯	৪৭,৯৭২	১৯,১১৩	৪৫,০৬০	=	২৬৮,৮৬৩
১৯২৪	১,৬২৮	৪৩,৯৯৮	১২১,০৯৫	৪৮,৭০৫	১৯,৬৪০	৪১,৫৪৫	=	২৭৬,৬১১
১৯২৫	১,৭০৫	৪১,৬৯৮	১৩২,৪৩১	৫১,৩৯২	২১,৯০০	৪৪,৭৯৬	=	২৯৩,৯২২
১৯২৬	১,৭৩৪	২৮,৬৪১	১৩২,৯৮২	৫১,৬৯৮	২০,০৮১	৪৬,৮৮৯	=	২৯২,০২৫
১৯২৭	১,৭০৬	৩৯,৬৬৩	১৪৭,৫০৮	৫১,৪৬৭	২০,৮০০	৫৩,০৫৮	=	৩১৪,২০২
১৯২৮	১,৮২৯	৪০,৭৩৪	১৬৯,২৪৭	৫১,৪০৪	২০,৬০০	৫৫,৩৯৮	=	৩৩৯.২১২
১৯২৯	১,৯৬৭	৩৯ ৯৯০	১৯৩,৭৪০	৪৯,৭৯৬	১৯,৮৭১	৭৪,৫৯০	=	৩৭৯,৯৫৪
১৯৩০	১,৮০৬	৩৭,৩৩২	১৫৫,৮২৬	৪২,০০৬	১৫,৮৬০	৬৩,১৩৭	=	৩১৫,৯৬৭
১৯৩১	৫৬১	২৬,০৬৭	১৫৪.৪২৮	৩৭,৩৩৬	১৩,৭২১	৭০,৩৪১	=	৩০০,৪৫৪

উক্ত তালিকা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, গত দশ বৎসরে গুরুতর অপরাধের মোট ৫৪,০০০ হইতে কমিয়া ৪৭,০০০এ দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধের সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে ও ২য় শ্রেণীর অপরাধ (যাহার মধ্যে নারী-হরণ আছে) বাড়িয়া ৪,৫০০ হইতে ৬,৭০০য় দাঁড়াইয়াছে।

আর সামান্য অপরাধের তালিকাপাঠে জানা যায় যে, যদিও মোট সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২৫ বাড়িয়াছে, এই বৃদ্ধি কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অপরাধের জন্য। ৫ম শ্রেণীর অপরাধ (যেমন চুরি প্রভৃতি) যথেষ্ট কমিয়াছে। এক্ষণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অপরাধ বৃদ্ধি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অপরাধ বেশীর ভাগ কলিকাতা সহরে হয় ও তাহা দশ বৎসরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু মফঃস্বলে প্রায় স্থির আছে। নিম্নের তালিকায় উক্ত ব্যাপারটি বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর অপরাধ

	পুলিসগ্রাহ্য		নালিশী	
	কলিকাতা	মফঃস্বল	কলিকাতা	মফঃস্বল
১৯২১	৭৮,৬৩৪	২০,৫১৩	৩৪,৬৪৫	১২,৮৫৯
১৯২২	৯৫,৭৩৭	২১,৭৬২	৩৭,৭৪৬	১৩,৬৯০
১৯২৩	৮৮,৬১৬	২৩,১৯৩	৩০,১০১	১৪,১৫৯
১৯২৪	৯৬,৪৩০	২৪,৬৬৫	২৭,২৩০	১৪,৩১৫
১৯২৫	১০৯,৫৬৪	২২,৮৬৭	২৯,৬৪৪	১৫,১৫২
১৯২৬	১০৮,১৬৮	২৪,৮১৪	৩২,১৬৫	১৪,৭২৪
১৯২৭	১২৩,৫৩৮	২৩,৯৭০	৩৮,৬০০	১৪,৪৫৮
১৯২৮	১৪৬,৯৫৬	২২,২৯১	৩৯,৯৪৯	১৫,৪৭৯
১৯২৯	১৬৮,৭২৩	২৫,০১৭	৫৮,৮২৪	১৫,৭৬৬
১৯৩০	১৩২,০০৫	২৩,৮২১	৪৯,২৭০	১৩,৮৬৭
১৯৩১	১৩৯,০২৭	১৫,৪০১	৫৮,১০০	১২,২৪১

কলিকাতায় পুলিস-গ্রাহ্য অপরাধ দুইগুণ বাড়িয়াছে, আর মফঃস্বলে কখনও বাড়িয়াছে, কখনও কমিয়াছে, মোটের উপর স্থির আছে। কলিকাতায় নালিশী অপরাধ মোটের উপর বাড়িলেও কখনও বাড়িয়াছে কখনও কমিয়াছে। মফঃস্বলেও অবস্থা সেইরূপ। বৃদ্ধি খুব সামান্য। কলিকাতা বাদ দিলে কিংবা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অপরাধ বাদ দিলে, এক হিসাবে অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে।

কিন্তু তথাপি পুলিসে নারীহরণকারীদের ধরিয়া সাজা দিতে পারিতেছে না। পুলিসের হইয়া একথা বলা চলে যে, তাহারা রাজনৈতিক অপরাধী ধরিতে ব্যস্ত, সুতরাং কি করিয়া এই সব সাধারণ অপরাধী ধরিবে। কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধ আলোচ্য দশ বৎসরের সর্ব্ব সময়ে বেশী মাত্রায় ছিল না। যেমন রাজনৈতিক অপরাধের জন্য পুলিসকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে পুলিস দেশবাসীর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ডিফেন্স পার্টি সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রামের লোক রাত্রে পাহারা দিতেছে ও পুলিসের নানা কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। ফলে ৩য় ও ৫ম শ্রেণীর অপরাধ ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি যথেষ্ট কমিয়াছে। ডাকাতি প্রভৃতি ৪২,০০০ হাজার হইতে ৩২,০০০ হাজারে নামিয়াছে ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি প্রভৃতি ৪৪,০০০ হাজার হইতে ৩৭,০০০ হাজারে নামিয়াছে। ইহা গ্রাম্য ডিফেন্স-পার্টির পাহারা দিবার সাক্ষাৎ ফল। রাত্রিতেই ডাকাতি, সিঁদেল চুরি প্রভৃতি হইত ও হয়। ডিফেন্স পার্টির পাহারা দিবার ফলে এই শ্রেণীর অপরাধ প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে। সামান্য চুরি দিনের বেলাও হয়, ডিফেন্স পার্টি সৃষ্টির ফলে এই শ্রেণীর অপরাধও কমিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অপরাধের ন্যায় কমে নাই। গ্রাম্য ডিফেন্স পার্টির কার্য্যাবলীর প্রশংসা সরকারী পুলিস রিপোর্টে বৎসরের পর বৎসর বাহির হইয়াছে। ১৯২৫ সালের পুলিস রিপোর্টে কাজের লম্বা প্রশংসা বাহির হয়। ১৯২৬ সালের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, সরকার তাঁহাদের কার্য্যে প্রীত হইয়া পুরস্কার ও পার্চমেন্ট সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৭ সালেও প্রশংসা বাহির হয়। আমরা Report of the Police Administration in Bengal হইতে দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ১৯২৬ সালের রিপোর্টে লিখিত আছে যে :—

Good work performed by the individual members of these parties has been recognised by the grant of money awards or Parchment certificates. Members of the *bhadralok* class generally appreciate a certificate rather than small money reward, and no less than 56 Parchment Certificates were issued during the year over the signature of the Inspector-General for meritorious work in aid of police.

বাংলার লাট ঢাকায় বক্তৃতাকালে গ্রাম্য ডিফেন্স পার্টির কার্য্যের খুব সুখ্যাতি করেন। ইংরেজী ১৯২৭ সালের রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, পুলিসের ইনস্পেক্টার-জেনারেল বলিতেছেন :—

I attach great importance to the development of these organisations and take this opportunity of acknowledging the assistance rendered to the police by the public-spirited person who are members of these parties.

ডিফেন্স পার্টির সংখ্যা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িয়া ইংরেজী ১৯৩১ সালে ২,৮১৩ হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের কার্য্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। ১৯৩১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলে অনেক গ্রাম্য ডিফেন্স পার্টি বিশেষ কাজ কিছুই করে নাই ; তবে যাহারা সরকারের সাহচর্য্য করিয়াছে তাহারা অনেক অপরাধ বন্ধ করিতে ও অনেক দাগী ধরিতে সক্ষম হইয়াছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রাম্য ডিফেন্স পার্টির সৃষ্টি হইতে পুলিস অনেক সাহায্য পাইয়াছে—যদিও এই সাহায্যের পরিমাণ কখনও কম এবং কখনও বা বেশী। এইরূপ সাহায্য সত্ত্বেও নারী-হরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ, আমাদের মনে হয়, পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা ও অমনোযোগিতা।

আরও একটি কারণ প্রকারান্তরে নারীহরণ বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। সেটি হইতেছে পুলিশ-চালানী অনেক আসামীর বে-কসুর খালাস এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীর লঘু দণ্ড।

নিম্নের তালিকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্ন-উত্তর হইতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসরে কয়টি হিন্দু-নারী ধর্ষিতা হইয়াছে ও কয়টি ক্ষেত্রে আসামীরা দণ্ড পাইয়াছে দেওয়া হইল।

	ধর্ষিতা হিন্দুনারী			সাজাপ্রাপ্ত আসমী		
	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
বর্দ্ধমান বিভাগ	৭০	৮০	৫২	৭	১৪	৮
প্রেসিডেন্সী ,,	৬৮	৭৭	৭৫	১৭	২৪	২২
ঢাকা ,,	৭৯	৬৬	৬৭	২৫	১৫	১৯
রাজসাহী ,,	৭৭	৭৪	৭৮	১৮	২০	১৪
চট্টগ্রাম ,,	১৪	১২	১১	২	৩	০
কলিকাতা সহর	৫৯	৫৩	৫৫	৯	৮	৫
সমগ্র বঙ্গ	৩৬৭	৩৬২	৩৩৮	৭৫	৮৪	৬৮

উপরে হিন্দু ধর্ষিতা নারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ধর্ষিতা মুসলমান নারীর সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এইরূপ অনেক আসামী ধরা না পড়ায়, এবং যাহারা ধরা পড়ে তাহাদের মধ্যে অনেকে বে-কসুর খালাস পাওয়ায় এবং যাহারা সাজা পায় তাহারা অল্প সাজা পাওয়ায়, নারী-হরণকারী দুর্ব্বৃত্তদিগের সাহস অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ কাল নানা রকমের সমাজ-কল্যাণকর আইন সৃষ্ট হইতেছে। অল্পবয়স্ক বালককে কোন অপরাধ করিয়া সাজা পাইলে তাহাকে বোর্ষ্টাল স্কুলে রাখিয়া শুধরাইবার চেষ্টা হইতেছে। "পাপ-ব্যবসা" উচ্ছেদের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে এবং পাপের লীলা-ক্ষেত্র হইতে অল্প-বয়স্কা বালিকা-দিগকে 'গোবিন্দকুমার আশ্রম" প্রভৃতি নামক আশ্রমে রাখিয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় যদি নারীহরণকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে কঠিনতম সাজা দিবার ব্যবস্থা করা হয়—তাহা হইলে বোধ করি নারী-হরণ অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। নূতন আইন প্রণয়ন না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট আর একটি উপায়ে নারী-হরণ কমাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। যদি কোন আসামী খালাস পায় বা অল্প দণ্ড পায়, বাংলা সরকার হাইকোর্টে ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। এই আপীল করিবার অধিকার বাংলা সরকার ব্যতীত অপর কাহারও নাই। দুই এক বৎসর এইরূপ আপীল করিয়া নারী-হরণকারী দুর্ব্বৃত্তদিগের উপর ইহার প্রভাব দেখিতে ক্ষতি কি? যদি ইহাতে নারী-হরণ বন্ধ না হয়, তখন নূতন আইন প্রণয়ন করিলেই হইবে।

পুলিস কোনও লোককে ধরিয়া চালান দিলে, সাধারণতঃ তাহার দায়রায় বিচার হয়। আর দায়রার বিচার জুরী দ্বারা হয়। আসামীগণের মধ্যে বেশীর ভাগ মুসলমান—যাহাদের মোকর্দ্দমা দায়রায় আসে তাহাদের মধ্যে ধর্ষিতা নারী বেশীর ভাগ হিন্দু। জুরীগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা জানেন যে ধর্ষিতা নারীর স্থান হিন্দুসমাজে নাই বলিলেই হয়। আর তাঁহাদের সংস্কারজাত বদ্ধমূল ধারণা, ধর্ষিতা নারীরা স্বয়ং পলাইয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যদি আসামীর তরফ হইতে বলা হয়, ধর্ষিতা নারীকে সে বিবাহ করিয়াছে, হিন্দু জুরীগণ আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হন। আর মুসলমান জুরীগণ সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। পূর্ব্বে এই ভাব প্রবল ছিল না, এক্ষণে খুব প্রবল দেখা যায়। যে যে ক্ষেত্রে জুরীরা divided verdict দেন—দেখা যায়, মুসলমান আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার পক্ষে হিন্দু জুরীর সংখ্যা মুসলমান জুরীর সংখ্যার সমান।* ফলে আসামী অনেক স্থলেই অব্যাহতি লাভ করে। আর যে যে ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে দায়রা জজেরা অতি লঘু দণ্ড দেন। সামান্য ২।১ বৎসরের কারাদণ্ড মাত্র। স্বর্গীয় আমীর আলি সাহেব যখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তিনি আইনের আমলে পাইলে এই শ্রেণীর অপরাধীদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান করিতেন। তিনি একবার যাহাতে এই শ্রেণীর অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। একথা তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন।

একেই ত আসামী ধরা পড়ে না, ধরা পড়িলে দোষী সাব্যস্ত হয় না, দোষী সাব্যস্ত হইলে সাজা সামান্য রকম হয়—ইহাতে যে দিন দিন নারীহরণ বৃদ্ধি পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

বড়ই দুঃখের বিষয়, বাংলা সরকার পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও পুলিসের ভাষায় বা পুলিসের জ্ঞানে নারীহরণকে serious crime বা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ১৯৩৩ সালের বাংলাদেশের পুলিসের ইনস্পেক্টার-জেনারেলের রিপোর্টে ৩১শ প্যারায় (১৭-১৮ পৃঃ) serious crime বা গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উহাতে দাঙ্গা, টাকা জাল, নোট জাল, খুন, নরহত্যা, ডাকাতী, দস্যুতা, সাধারণ চুরি, গরু

* এ বিষয়ে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় লর্ড উইলিয়ামস্ ও মহিমচন্দ্র ঘোষ সাহেবের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য ও প্রণিধানযোগ্য। (কলিকাতা উইকলি নোটসের ৩৮শ ভলমের ১০৮ পৃঃ)।

চুরি, গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কলিকাতা সহরের পুলিস কমিশনার সাহেবের ১৯৩৩ সালের রিপোর্টের ১৯শ প্যারায় ঐ ঐ অপরাধ ও চোরাই মাল রাখাকে serious crime ধরা হইয়াছে।

কিন্তু নারীহরণ গুরুতর অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই। পুলিস যদি নারীহরণকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, আর যদি পুলিস বিভাগের বড় কর্ত্তারা এইরূপ নিয়ম করিয়া দেন যে, নারী-হরণঘটিত অপরাধের কিনারা না করিতে পারিলে থানার দারোগাবাবুর জরিমানা হইবে বা তাঁহার পদের অবনতি ঘটিবে, জেলার পুলিস সাহেবের পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে, তাহা হইলে সকল পুলিস কর্ম্মচারীরই নারী-হরণ দমন সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।

সম্পাদকীয়

বিপ্লববাদের অর্থতত্ত্ব

দেশ হইতে বিপ্লব-বিভীষিকা দূর করিতে হইলে বেকার সমস্যা সমাধানের যে আশু প্রয়োজন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। যদিও আমাদের আর্থিক দুর্গতি সর্ব্বাংশে বিপ্লবী অনাচারের জন্য দায়ী নহে, তবুও বহুলাংশে ইহাই যে এই অনর্থের মূলে রহিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। প্রতিদিনই আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবক বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ চারিদিকেই রুদ্ধ, কোথা হইতেও এতটুকু আশা এতটুকু সাহচর্য্যের আশ্বাস আসে না; অনন্যোপায় হইয়া এই রিক্ত, ভ্রান্ত, আশাহত যুবকের দল দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় সর্ব্বনাশের পথে পা বাড়াইয়া দেয়।

সুখের বিষয়, বিগত ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ বিপ্লব বিরোধী সম্মিলনী বেকার সমস্যার গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিয়াছেন ও ইহা দূর করিবার জন্য কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন:

(১) অদ্যাবধি বাংলা দেশে সরকারী চাকুরীতে উপযুক্ত বাঙ্গালী থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন প্রদেশবাসীকে নির্ব্বিচারে লওয়া হইয়া থাকে; সামান্য কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার ও দেড় হাজার টাকা মাহিনার আমলা পর্য্যন্ত এ নিয়মের ব্যত্যয় নাই। বাংলার বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম, সেখানে ভিন্ন প্রদেশবাসীর মাথা গলাইবার এতটুকু উপায় নাই। সম্মিলনী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন (Imperial Service) চাকুরী ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইতে পারে এমন চাকুরী ভিন্ন সর্ব্বস্থানেই বাঙ্গালী লইতে হইবে।

(২) বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, শাসকের জাতি বাঙ্গালীকে সুদৃষ্টিতে মোটেই দেখেন না, ঘৃণা ও সন্দেহের একটা বিষবাষ্প দেশের আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই ঘৃণা ও সন্দেহের ভাব দূর না করিতে পারিলে, বাঙ্গালীর মনে সদিচ্ছা না জাগাইতে পারিলে সন্ত্রাসবাদ কিছুতেই ধ্বংস হইবে না, এই জন্য চাই য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের সত্যকারের সাহায্য ও সহানুভূতি, এবং শুধু মুখে নয়, কাজে-কর্ম্মে তাহা দেখাইতে হইবে। তাঁহাদের অধীন ট্রাম, রেলওয়ে ও অপরাপর বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে কোন কাজ খালি পড়িলেই প্রস্তাবিত বেকার সঙ্ঘের (Unemployment Bureau) ভিতর দিয়া তাহাতে বাঙ্গালী নিয়োগ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে ইংরেজের শুভ বুদ্ধি ও সদিচ্ছায় পরিচয় পাওয়া যাইবে, আপনা হইতেই বর্ত্তমানে হিংসা বিদ্বেষের ভাব দূর হইয়া যাইবে।

(৩) শুধু চাকুরী দিয়া কখনও বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যায় না, চাই ব্যবসায়। আজ অনেক উদ্যমশীল বাঙ্গালী যুবক ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিতেছেন, ইঁহাদের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যদি কারবার আরম্ভ করেন, লেন দেন করেন, আপনাদের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দাদন দেন, ধার দেন ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করিতে থাকেন, তবে শুধু যে বেকার সমস্যা দূর হইবে, এমন নহে, তাঁহারা বাঙ্গালীকে প্রকৃত বন্ধু ভাবে লাভ করিয়া লাভবান হইবেন, বিপ্লববাদ আপনা হইতেই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষা

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে-সকল সংস্কার প্রয়োজন, তাহাদের মধ্যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করাই নিঃসন্দেহে সর্ব্বপ্রধান। বহুকাল ধরিয়া এ-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা, যুক্তিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফল হয় নাই। উহার প্রধান কারণ গভর্ণমেণ্টের আপত্তি ও অনিচ্ছা। সরকারী অভিমত এই যে, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিলে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান কমিয়া যাইবে। কিন্তু ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রাখিয়াই কি বিশেষ কোন ফল দেখা যাইতেছে? দশ-পনর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ইংরেজী পড়াইয়াও আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজীর জ্ঞান এত অল্প কেন তাহা বাস্তবিকই অনুসন্ধান করিবার বিষয়। আমাদের মনে হয় অতি অল্প বয়সেই বিদেশী ভাষা সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া

ফেলার জন্য ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে কোন উৎসাহ থাকে না। এই ভার একটু লঘু করিয়া দিলে বরঞ্চ তাহাদের একটু আগ্রহ জন্মিতে পারে। অন্ততঃ এখন বিদেশী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহাদের সত্যকার ইচ্ছা আছে তাহারাই ইংরেজী শিখিতে অগ্রসর হইবে; ইহাতে ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালী ছাত্র উভয়ের উপরই অত্যাচারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে আর একটি বিশেষ উপকার হইবে বলিয়াও আশা করা যায়। বর্ত্তমানে ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান ও স্বাধীন-চিন্তার যে অভাব দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ বিদেশী ভাষার বাধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইতিহাস পড়ার কথা বলা যাইতে পারে। ইতিহাস অধ্যয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের ও জাতির অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা, ইংরেজী শব্দের অর্থ শিক্ষা করা নয়। অথচ আমাদের স্কুলগুলিতে ইতিহাসের পুস্তককে ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের মত পড়ান হয়, যে-কাল ও যে ব্যক্তি বা ঘটনার কথা বলা হইতেছে তাহার উপর কোন জোর দেওয়া হয় না। ইহাতে ইংরেজীর জ্ঞান সত্যসত্যই বাড়ে কি না তাহা অনুসন্ধানের বিষয় হইলেও ইতিহাস-জ্ঞান যে বাড়ে না তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি।

এতদিন পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা স্থির করিয়াছেন, তখন তাঁহারা উপরোক্ত যুক্তিগুলির সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। এই নূতন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ভাইস চ্যান্সেলরের কার্য্যকালে প্রবর্ত্তিত হইবে, ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়। তাঁহার পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কি করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত। পুত্রের কার্য্যকালে যদি সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে তবে তাহা সকল দিক হইতেই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার বাহন হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তনের পথে প্রধান অন্তরায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব। সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, এ-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভাইস্-চ্যান্সেলর এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ও বাহিরের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উহাতে আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহের ভার এক একজন বিশেষজ্ঞকে দেওয়া হইবে। এই পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ এখন চলিতেছে ও বর্ত্তমান ইংরেজী বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তখন এই পরিভাষা সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সাধারণের সমালোচনার জন্য প্রকাশিত হইবে ও উহার পর পুস্তক-রচনার কাজ আরম্ভ হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় যে এই কাজে হাত দিয়াছেন উহা বিশেষ সন্তোষের বিষয়। কার্য্যটি দায়িত্বপূর্ণ, কারণ উহার উপর বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। একশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে পুস্তক রচনা আরম্ভ হয় উহাতেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রসার ও উন্নতির সূত্রপাত হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা প্রবর্ত্তনকে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের আর একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রায় সকল বাঙ্গালা রচনাতেই এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যে ইংরেজী গন্ধবহুল বাঙ্গালার নমুনা দেখা যায়, তাড়াতাড়ি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নের হুজুগে নূতন পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও যদি সেই বাঙ্গালাই স্থান পায় তবে উহার অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার শোচনীয় পরিণাম আর কিছু হইতে পারে না। "জওহরলাল নেহরু বিচারে অংশ গ্রহণ করিলেন না" সংবাদপত্রে চলিতেছে। "ঐশ্বর্য্যের পূজা এখন আমাদের জীবনের প্রধান অংশ," "জেনারেল ফন্ সিয়েক্ট পৃথিবীর একজন অন্যতম সেনাশক্তি গঠনকারী যোদ্ধা," "আধুনিক জাতিসঙ্ঘের পরিবারে প্রবেশ করা," ইত্যাদিও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় দেখা যায়। এই দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু অ-বাঙ্গালা বাক্য যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন না করে তাহার জন্যে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আফগানিস্থান ও লীগ্ অফ নেশ্যন্স্

রুশিয়া ও আফগানিস্থানের লীগ অফ নেশ্যন্স্-এ প্রবেশ লীগের এবারকার বাৎসরিক সভার প্রধান ঘটনা। রুশিয়া যে জাপান ও জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই লীগে প্রবেশ করিয়াছে একথা আমরা গত সংখ্যায় কিছু বলিয়াছিলাম। আফগানিস্থানের লীগ প্রবেশের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকার সিমলাস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানের লীগে প্রবেশ সিমলাতে একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং সকলেই বলিতেছেন যে, উহা ভারত গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতির চূড়ান্ত সাফল্যের নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে এই সংবাদদাতা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সমীচীন। তিনি বলেন—

> ভারতবর্ষ জেনেভা লীগের সভ্য, আফগানিস্থানও এইবার সভ্য হইল, সুতরাং এখন হইতে Afghan menace (?) হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে কেহ কেহ এরূপ আশা করিতেছেন।
>
> প্রায় মাস কয়েক পূর্ব্বে সৈন্যবিভাগ হইতে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে শান্তিরক্ষার জন্য ও অন্যান্য কারণে কেন প্রতি বৎসর ৪৭ কোটী টাকা খরচ হয় তাহার হিসাব দিয়া পরিশেষে লিখিত হয়:---

"ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে দুই শক্তি রহিয়াছে, যাহাদের কেহই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য নহে, এবং আফগানিস্থানের পিছনেই যে রাজ্য সেখানে চিরকাল ভারতের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে বিপদ উদ্যত হইয়া আছে—সাইমন কমিশনও ইহা বলিয়াছেন। জার সাম্রাজ্যবাদের ভীতি এখন আর না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে আরও স্বার্থপর এবং বোধ হয় আরও ভয়ঙ্কর এক নীতি।"

এখন রাশিয়া ও আফগানিস্থান উভয়েই লীগের সভ্য হইয়াছেন। যে আশঙ্কার কথা উপরেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা তো এইবার বহুল পরিমাণে দূর হইল, সামরিক বাজেটের পরিমাণ তাহা হইলে এইবার নীচের দিকে নামিবে আশা করা যায় কি?

জাপানের গ্রাজুয়েটেরা পাশ করিয়া কি করে?

সম্প্রতি জাপান সরকারের শিক্ষাবিভাগ হইতে প্রকাশিত ৫৬ তম বার্ষিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন নূতন তথ্য জানা যায়। আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা করেন তাঁহাদের আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। জাপানে ৫টি ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উহা স্থাপনাবধি উহার গ্রাজুয়েটগণ কি করিতেছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা	৫৩,১৪০
ইহার মধ্যে যাঁহারা—	
(১) সরকারী বা সাধারণের চাকুরী করেন	১১,৭৩৬
(২) স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি	৮,৩৩৯
(৩) উকীল	১,৬১২
(৪) কারবারী	১২,২৩৭
(৫) ডাক্তার	৪,৭১১
(৬) যাঁহারা বিদেশে বা স্বদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যয়ন করিতেছেন	১,৬৮৩
(৭) অপরাপর কার্য্যে নিযুক্ত	২,৬৮৯
মোট	৪৩,০০৭
মৃত	৪,১৬২
যাঁহাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই	৫,৯৭১
সর্ব্বমোট	৫৩,১৪০

উপরি উক্ত তথ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণের অধিকাংশই ব্যবসা, কারবার প্রভৃতিতে যোগদান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। সাধে কি জাপান ব্যবসাক্ষেত্রে এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! আর আমাদের দেশে কি হইতেছে? সরকার এইরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন না। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহার দ্বারা একার্য্য সহজেই সম্ভব সম্পাদিত হইতে পারে।

আমাদের দেশে বি-এল পাশ করিলেই সকলে উকীল উকীল হন, তা তাঁহার ওকালতী করিবার সামর্থ্য থাকুক বা নাই থাকুক। এ বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন বিভাগের গ্রাজুয়েটেরা কে কি করেন নিম্নের তালিকায় তাহা দেওয়া হইল। তথ্যগুলি বুঝিবার সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া কেবলমাত্র টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪,০০০ হাজার ছাত্রের ভবিষ্যৎ বৃত্তি দেওয়া গেল।

	আইন বিভাগ	ডাক্তারি বিভাগ	এঞ্জিনীয়ারীং বিভাগ	সাহিত্য বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ	কৃষি বিভাগ	অর্থনৈতিক বিভাগ	মোট
শাসন বিভাগ	২,৩০৫	৪	--	৭৫	২৮	৩৫	৪৮	২,৪৯৭
বিচার "	১,৩৬৫	--	—	৩	২	১	—	১,৩৭৩
সম্রাটের খাস পার্শ্বচর বিভাগ	৭৬	২৭	৭	১২	৫	৫	—	১৩২
সরকারী টেক্‌নোলজিষ্ট	--	৫৪	১,৮২৪	৮	৩৮১	৯৪৯	—	৩,২১৬
যুদ্ধের ডাক্তার	—	৩৪	—	—	—	--	—	৩৪
সৈন্য বিভাগ	৫	৬	—	—	—	৪	—	১৯
পারলামেণ্টের সদস্য	৯৬	৩	৪	১০	৫	৩	—	১২১
উকিল	১,২৫১	—	—	৩	১	—	—	১,২৫৫
স্কুল সংক্রান্ত কার্য্যে	২৬৫	৭৫০	৬২৬	২,৩০৪	৬১৬	৫৫৬	৬৩	৫,১৯০
সরকারী হাঁসপাতালে	—	১,২৬৭	—	—	—	—	—	১,২৬৭
ডাক্তারী	—	১,০৯৩	—	—	—	—	—	১,০৯৩
গো-বৈদ্য	—	—	—	—	—	৭৬	—	৭৬
ব্যাঙ্কে ও ব্যবসায়ে	৩,৬৬২	১৯৮	২,৯৩৮	১১৮	২৫৩	২৭৯	১,০৭৯	৮,৫২৭
বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে	—	৩	১৫	—	—	—	—	১৮
অপরাপর	১,০৯১	২০	১৩৭	৩০১	৫	৪৩০	১১৯	২১০৩
বিশ্ববিদ্যালয়ে (post graduate)	৬৪	২৫	২৭	১৫১	১০৮	২৬	৮২	৪৮৩

	আইন বিভাগ	ডাক্তারি বিভাগ	ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ	সাহিত্য বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ	কৃষি বিভাগ	অর্থ নৈতিক বিভাগ	মোট
অপর বিভাগে	২৫	৩	৫	৩০	৭	২৪	২৪	১১৮
বিদেশে অধ্যয়ন	৩০	৩১	৬০	৫৩	১১	১	৮	১৯৪
যাহাদের বিবরণ জানা যায় নাই	১৭০৬	৯৩	২৫৭	১৯৬	৪১	২৬৫	৪৪৯	৩০০৭
মৃত	৪৩৬	৭৩৪	৫১৯	২৪২	১৩২	৪০৩	১৮	২,৮৮৪
মোট	১২,৭৭৭	৪,৩৪৫	৬,৪২৬	৩,৫০৬	১,৬০৫	৩,০৫৮	১,৮৯০	৩৩,৬০৭

উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জাপানে যাঁহারা আইন পাশ করেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ জন ওকালতী করেন। ডাক্তারী পাশদের মধ্যে বেশীর ভাগ সরকারী হাঁসপাতালে কাজ করেন। আরও দেখিতে পাই ৩৪,০০০ হাজার জাপানী গ্রাজুয়েটের মধ্যে ১৩০০০ হাজার আইন বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ। এইরূপ ভাবিবার কথা অনেক পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের তথ্য সংগৃহীত হইলে, তুলনা-মূলক সমালোচনা দ্বারা আমাদের গ্রাজুয়েটগণের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তথ্যের অভাবে কতকগুলি মন্তব্য করিয়া লাভ কি?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও যুবকগণ

বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিট্যুশনের স্বর্ণ-জুবিলী উৎসব উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা সম্পর্কে যে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়কে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষার বাসনা যদি প্রবল থাকে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেই হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাদানের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা এতই সহজলভ্য যে ইচ্ছা করিলে যে কেহ নিজের গৃহে বসিয়াই সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হইতে পারে। র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড, মুসোলিনি, হিটলার, ষ্টালিন প্রভৃতির কেহই নিয়মিত রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই; ইঁহারা অদম্য অধ্যবসায়, এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা নিজেকে নিজে শিক্ষিত করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে কয়জন যুবকের মধ্যে শিক্ষালাভের এরূপ স্পৃহা আছে? যে সকল যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে তাহারাও সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই। চটকি সাহিত্য পাঠ এবং অত্যন্ত সস্তা এবং রুচিসঙ্গতিহীন বিষয়ে চিন্তা করাই বর্ত্তমান যুবকদের প্রায় রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির অগ্রগমনে কি অবশেষে যুবকেরাই বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে?

ভারতবর্ষে রোমান লিপি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ভারতবর্ষে রোমান লিপি" নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই পাঠ করিবেন।

আমরা লেখকের মূল প্রস্তাব সমর্থন করি, তবে উচ্চারণ অনুযায়ী নূতন লিপি বিষয়ে তাঁহার নির্দ্দেশিত রূপগুলি সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা মারাত্মক নহে। লিপি-সমস্যাই যে শিক্ষার পথে আমাদিগকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দিতেছে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনারা সহস্র সহস্র অক্ষরের জালে আবদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছে। যাহারা ছাপার অক্ষর প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাদেরই মুক্তি সুদূরপরাহত। আমরা মধ্যপথে আছি, আমাদের এখনো নিরাশ হইবার কারণ নাই। রোমান লিপি আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষকে যেমন আমরা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ত্যাগ করি—প্রাচীন লিপিকেও তেমনি ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার যে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া আছে সেই নিগড় ত্যাগ করিয়া সে সকলের নিকট দ্রুত পৌছিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান জ্ঞানভাণ্ডারকেও সেই নিগড়েই আবদ্ধ করিতে হইতেছে। এই নিগড় বর্ত্তমান সময়ের উপযুক্ত নহে, অতএব ত্যাজ্য। এ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

পৃথিবীর সকল দেশ বর্ত্তমান সময়ে বহু সমস্যার দ্বারা পীড়িত। ভারতবর্ষেরও সমস্যার অভাব নাই।

পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহার সমাধান-চেষ্টা অতি বৃহৎ এবং গুরুতর কার্য্য, সন্দেহ নাই। সমস্যা-নির্দ্ধারণের মধ্যেই বহুবিধ চিন্তার ও আলোচনার অবকাশ আছে; সমস্যা-পূরণের উপায় নির্ণয় করিতে গেলে এই চিন্তার ও আলোচনার পরিধি যে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা এই কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি যে, অল্প পরিসরের মধ্যে তাহা করা সম্ভব হইবে না এবং এই প্রসঙ্গে বহু নীরস বিচারেরও অবতারণা করিতে হইবে। অথচ ইহাও নিঃসন্দেহ যে, এই সমস্যা ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলকেই অল্পবিস্তর পীড়িত করিতেছে এবং সকলেই কোনও না কোনও সময়ে নিজের অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য এবিষয়ে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পাছে নীরস দর্শন ও নিছক অঙ্কশাস্ত্রের অবতারণায় মূল বিষয়ে প্রবেশ করিতে তাঁহারা নিরুৎসাহ হন, এই জন্য প্রারম্ভেই আমরা আমাদের বক্তব্যের সারাংশ বিবৃত করিতেছি। আশা করি, মূল বিষয়ের গুরুত্ব অবগত হইয়া কথঞ্চিৎ পরিশ্রম সহকারে সকলেই আমাদের বিস্তৃত প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

'ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা' ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমরা সে মূর্ত্তি দেখিয়াছি এবং প্রত্যহ দেখিতেছি। দেখিতেছি—উদ্দীপ্তবদন কৃতবিদ্য যুবকগণ চাকুরীর অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতেছে, দেখিতেছি, মধ্যবয়স্ক ব্যবহারজীবী ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ চিন্তা-জর্জ্জরিত মুখে মক্কেল ও রোগীর বিফল প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতেছেন এবং দেখিতেছি, উদার আকাশের নীচে, জননী বসুন্ধরার বুকে অনাবৃত চরণ নিক্ষেপ করিয়া গ্রামের কৃষক অকালবার্দ্ধক্য বরণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। 'ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এই গুলিই আমাদের মূল প্রেরণা।

আমাদের প্রবন্ধের মূল চেষ্টা—প্রকৃতির নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করা। প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষকে কি কি দিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করা, মানুষ নিজের চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কি কি গুণ অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা।

আমাদের সূত্র

১। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে কুত্রাপি কোন কষ্ট অথবা অভাব অনুভব করে না। তাহার যত কিছু কষ্ট তাহার কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া চলা।

২। প্রকৃতি সমাজের (তথাকথিত) নিম্নতম শ্রমজীবীকে যাহা যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারাই শ্রমজীবী সুখ-সাচ্ছন্দ্যে তাহার নিজ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কৃষ্টিলাভের তারতম্যানুসারে মানুষের সংসারপালনের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান যত বাড়িয়া যাইবে তাহার তত বেশী সংখ্যক সংসার পালনের সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। আমাদের দৃষ্টান্ত, পশুপক্ষীর জীবন। যদি কৃষ্টি ব্যতীত কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করা প্রকৃতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পশুপক্ষীর বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইত না। অন্য দিকে মানুষের বেলা মানুষ কৃষ্টি ছাড়া বাঁচিতে পারিবে না আর পশুপক্ষী কৃষ্টি ছাড়াও বাঁচিতে পারিবে—ইহা প্রকৃতির

নিয়ম যদি বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিকে খামখেয়ালী বলিতে হয়।

৩। যাহাতে একমাত্র প্রকৃতির দেওয়া সামর্থ্য দিয়াই প্রত্যেক মানুষ বিনা কৃষ্টিতে তাহার শ্রম দ্বারা নিজ নিজ সংসারের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারে এবং কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জন অধিকতর হয়, তাহার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করা মানুষের সমাজে অথবা রাষ্ট্রবন্ধনে একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রতিপাদ্য

১। মানুষ মূলতঃ জমিজাত দ্রব্য দ্বারাই জীবনধারণের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি প্রস্তুত করে। জমি হইতেই কৃষি, পশুপালন, খনিজ পদার্থের উৎপত্তি, জঙ্গলজাত উপকরণ, মৎস্য ও মুক্তাদি। জমিজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের নাম শিল্প। জমিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য লইয়াই ব্যবসা-বাণিজ্য।

২। প্রকৃতি মনুষ্যের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে জমির পরিমাণ দিয়াছেন। মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদিকা শক্তিও বাড়িয়া যাইতেছে। উৎপন্ন শস্য, খনিজ পদার্থ, জঙ্গলজাত উপকরণ, মৎস্য ইত্যাদি জমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সর্ব্বদাই মোট মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজন সাধনে যথেষ্ট।

৩। কৃষি করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়াছে। কৃষির সুব্যবস্থা থাকিলেই একমাত্র কৃষি দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারে।

৪। শিল্প ও বাণিজ্য করিতে হইলে একমাত্র প্রকৃতির দেওয়া জিনিষ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য নানারকম ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং তাহা মানুষের কৃষ্টিসাধ্য।

৫। কৃষি ছাড়িয়া দিয়া শিল্প ও বাণিজ্যকে জীবিকার উপায় করিলে জীবনযাত্রা জটিল হয় এবং যাহাদের কৃষ্টির অভাব তাহাদের খাইয়া বাঁচিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং পরিণামে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা আসে।

৬। বর্ত্তমান জগতের যে সমস্ত জাতি কৃষি-সাধনায় বিফল হইয়া শিল্প ও বাণিজ্যকে জীবিকার একমাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষির সুব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। তাঁহাদের জমিবিষয়ক প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং তাঁহাদের দেশে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

৭। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ বহু। নির্ব্বিচারে অনুকরণপ্রিয়তা তাহার অন্যতম।

আমাদের উপসংহার, আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার পন্থা-নির্ব্বাচন।

আমাদের প্রথম পন্থা হইবে কৃষকের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা। কৃষকের দারিদ্র্য মোচন হইলেই আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের ও দেশের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর লোকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্থায়ী পন্থা উন্মুক্ত হইবে।

কৃষকের বাঁচিবার উপায় স্থির না করিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য আমরা যে কোন উপায় অবলম্বন করি না কেন, তাহাতে আপাততঃ কাহারও কাহারও উপকার হইলেও দেশের কোন শ্রেণীর লোকের অভাব স্থায়ীভাবে দূরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। কৃষকের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে:

১। জমি ও উৎপন্ন শস্যের নির্ব্বাচন—

(ক) একজন কৃষকের বৎসরে ঊর্দ্ধসংখ্যা মোট কত বিঘা জমি চাষ করিবার সামর্থ্য আছে তাহা নির্ণয় করা।

(খ) এমন জমি ও শস্য নির্ব্বাচন হওয়া চাই যাহাতে মোট জমি হইতে কৃষকের সংসারের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পরিমাণের ৩ গুণ উৎপন্ন হইতে পারে।

২। উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ—

উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণের ⅓ অংশের বিনিময়ে কৃষকের সংসারের খাদ্যেতর অপরাপর জিনিষের খরচ সঙ্কুলান হওয়া চাই।

৩। কৃষকের মজুরী নির্দ্ধারণ—

দৈনিক মজুরী মোট উৎপন্ন শস্যের ⅓ অংশের মূল্যকে মোট খাটিবার দিনগুলি দিয়া ভাগ করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা হওয়া চাই।

৪। প্রত্যেক কৃষকের কায়িক পরিশ্রমের জন্য তাহার পূর্ণ সামর্থ্যানুযায়ী জমির ব্যবস্থা।

আমরা "কৃষক" শব্দ দ্বারা শুধু জমির স্বত্ববিশিষ্ট চাষীকে বুঝাইতেছি না, যে ব্যক্তি জমিতে স্বত্বহীন থাকিয়া, দৈনিক

মজুর হিসাবে জমি চাষ করিতে পারে এমন লোককেও "কৃষক" আখ্যা দিতেছি।

একজন কৃষক যদি বৎসরে ১০ বিঘা জমি চাষ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে জমির স্বত্বাধিকারীগণকে অনুরোধ করিয়া সে যাহাতে ১০ বিঘা জমিতে খাটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

৫। উৎপন্ন অপরাপর শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ—

একজন কৃষকের একদিন পরিশ্রমের উৎপন্ন মোট যে পরিমাণ শস্য হয়, তাহার দাম একজন কৃষকের একদিন পরিশ্রমের উৎপন্ন মোট যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য হয় তাহার দামের সমান হওয়া চাই।

৬। যাহাতে অপর কোন বাহিরের জাতি কোন উৎপন্ন শস্য ভারতীয় উপরোক্ত নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা।

৭। শিল্পাবলম্বী যে জাতি ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত না হইবে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে ভারতের বাজারে বিক্রয় না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়—

ব্রিটিশ ভারতে মোট জমির পরিমাণ (পর্ব্বত অরণ্য ও জলতলস্থিত ভূমি সহ) মোট ২,৩০৩,২১১,১২০বিঘা। তন্মধ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৯,২৯,৬২,১৬০ বিঘা। ব্রিটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৮,৬৬,১৪,৩৪২। তন্মধ্যে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের সংখ্যা ৭,৫৩,৯৫,৭৭৫।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী, বালক ও বালিকাদিগের হিসাব অনুপাত করিলে দেখা যায় যে, এই চারিশ্রেণীর মানুষ প্রায় সমান সমান। অর্থাৎ প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের উপর নির্ভরশীল একজন স্ত্রীলোক, একটি বালক ও একটি বালিকা আছে। উপরোক্ত চারি শ্রেণীর চারিজনকে লইয়া এক একটি সংসার ধরিলে—

ব্রিটিশভারতে মোট $\frac{২৮,৬৬,১৪,৩৪২}{৪}$ = ৭,১৬,৫৩,৫৮৬ সংসার দাঁড়ায়।

একজন গ্রাম্য দরিদ্র কৃষকের সংসারের খরচের কথাই ধরা যাউক। তাহার সংসারের যতকিছু খরচ আছে তন্মধ্যে প্রধান খরচ খাদ্যে। খাদ্যের পর পরিধেয় এবং তারও পরে গৃহনির্ম্মাণ, গৃহমেরামত, পুত্রকন্যার বিবাহ, সন্তানের শিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা, আতিথেয়তা, কুটুম্বিতা, চিকিৎসা, ভ্রমণ এবং অন্যান্য খুচরা খরচ আছে।

চাষের জন্য আবশ্যক পরিশ্রমের দিন হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কৃষক বৎসরে দশ বিঘা ধানের জমি চাষ করিতে পারে। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, প্রত্যেক বিঘায় বাৎসরিক ফসল(ধান) গড়ে ৪ মণ। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, বিভিন্ন জিলার এবং বিভিন্ন গ্রামের ফসলের পরিমাণ গড়ে বাৎসরিক ৮ মণেরও উর্দ্ধ। আমরা মোটামুটি ফসলের পরিমাণ বিঘাপ্রতি গড়ে ৬ মণ করিয়া ধরিব। এই হিসাবে দশ বিঘা জমিতে একজন কৃষক বৎসরে ৬০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহার ভিতর জমির স্বত্বাধিকারী ও জমিদারের প্রাপ্য ও কৃষিখরচা বাবদ এক-তৃতীয়াংশ ফসল বাদ দিলে কেবলমাত্র কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কৃষকের উপার্জ্জন দাঁড়ায় ৪০ মণ ধান অথবা ২৮ মণ চাউল।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত এবং কৃষক সম্প্রদায়ের দৈনিক আহার্য্যের পরিমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি গড়ে প্রতিবেলায় এক পোয়া চাল অথবা এক পোয়া আটা আহার করিয়া থাকে। বালকবালিকাদের হিসাব তাহার প্রায় অর্দ্ধেক। এই হিসাবে প্রত্যেক চারজনের সংসারে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৪ মণ চাউল অথবা আটা ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ২০ মণ ধান হইতে ১৪ মণ চাউল প্রস্তুত হয়। একজন কৃষকের উপার্জ্জিত ৪০ মণ ধান হইতে তাহার সংসারের খাদ্য বাবদ ২০ মণ বাদ দিলে আরও ২০ মণ ধান উদ্বৃত্ত থাকে। এই ২০ মণ ধানের পরিবর্ত্তে অর্থাৎ ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থের বিনিময়ে যদি সে তাহার সংসারের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কৃষক কেবল মাত্র কৃষিকর্ম্মের দ্বারাই স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম।

উপরে যাহা দেখান হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, একজন কৃষক যদি ১০ বিঘা জমিতে মজুরী করিতে পারে এবং সে যদি ১০ বিঘা জমিতে মজুরী করিবার সুযোগ

পায় এবং ঐ জমি যদি এমন হয় যে, তাহার প্রত্যেক বিঘায় বাৎসরিক ৬ মণ ধানের কম ফলিবে না, তাহা হইলে কৃষকের মজুরী দ্বারা মোট ৬০ মণ ধান্য ফসল হইতে পারে। তাহার মধ্যে কৃষক যদি তাহার মজুরী বাবদ ⅔ অংশ অর্থাৎ ৪০ মণ ধান অথবা তাহার মূল্য পায় এবং ⅓ অংশ চাষের অন্যান্য খরচা এবং জমিদারের খাজনা বাবদ ধরা হয় এবং ধানের মূল্য যদি এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যায় যে, কৃষকের পরিশ্রমার্জ্জিত ধানের উদ্বৃত্তাংশের (অর্থাৎ কৃষকের সংসারের খাদ্য-খরচ ব্যতীত যাহা থাকিবে তাহার) মূল্য কৃষকের সংসারের বস্ত্রাদি অন্যান্য জিনিষ যাহা লাগিবে তাহার মূল্যের কম হইবে না, তাহা হইলে কৃষকের সংসার কৃষিদ্বারাই চলিতে পারে এবং ⅓ অংশ যাহা কৃষির খরচ ও খাজনা বাবদ ধরা হইয়াছে তদ্বারা কৃষকের ঋণও ক্রমে ক্রমে পরিশোধ হইবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

উপরোক্ত হিসাবে ভারতের সমগ্র অধিবাসীগণের যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদন করিতে ২,৪১,৮৩,০৮৫ জন কৃষকের প্রয়োজন। পরিধেয়ের জন্য তুলার চাষে ৬০,৪৫,৭৭১ জন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদনে ৪৩,৪২,৩৪১ জন কৃষকের প্রয়োজন হয়। কৃষক-সম্প্রদায়ের শিক্ষাকার্য্যের জন্য ২১,৫০,০০০ জন শিক্ষক, কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও তাহার জন্য জলযান ও স্থলযান পরিচালনায় ২১,৫০,০০০ কর্ম্মী ও কৃষির উৎকর্ষ বিধান ও পরিচালনার জন্য ১৭,০০,০০০ জন কর্ম্মচারীর কর্ম্ম-নিয়োগ সম্ভব। খাদ্য-শস্যের উৎপাদনে মোট ২৪,১৮,৩০,৮৪২ বিঘা জমি, তুলার জন্য ১,৭৩,৭০,৫৬৬ বিঘা জমি ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য শস্যের জন্য ৬,০৪,৫৭,৭১৩ বিঘা, মোট ৩১,৯৬,৫৯,১৩১ বিঘা জমি ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে, কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা হইলে ৪,০৫,৭১,১৯৭ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ যদি মোট ৩১,৯৬,৫৯,১৩১ বিঘা জমি লইয়া পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহাদের পরিশ্রমজাত ফসলে সমগ্র ভারতবাসীর খাদ্য ও ব্যবহার্য্য এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের শিক্ষা, কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা ও কৃষির উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। এবং ভারতবর্ষের ৪,০৫,৭১,১৯৭টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কর্ম্ম-নিয়োগ পাইয়া ৪,০৫,৭১,১৯৭টি সংসার স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারে।

ইহার পর বাকী থাকে (৭,১৬,৫৩,৫৮৬—৪,০৫,৭১,১৯৭ অর্থাৎ) ৩,১০,৮২,৩৮৯ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের কর্ম্মনিয়োগ এবং তাহাদের সংসার পরিচালনার ব্যবস্থা। তাহাদের প্রত্যেক ছয়টি সংসারের শিক্ষা, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ এবং মামলা-মোকদ্দমাদির কাজে গড়ে একটি সংসার চলিতে পারে। অতএব ৩,১০,৮২৩,৮৯ × ⅚ অর্থাৎ ২,৬৬,৪২,০৪৮ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের নিয়োগ হইলে উক্ত সম্পূর্ণ ৩,১০,৮২,৩৮৯টি সংসার পরিচালনার ব্যবস্থা হয়।

উপরে জমি সম্বন্ধে যাহা দেখান হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের মোট ৬৯,২৯,৬২,১৬০ বিঘা কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে ভারতবাসীর নিত্য প্রয়োজন সাধনে ৩১,৯৬,৫৯,১৩১ বিঘা লাগে এবং বাকী থাকে ৩৭,৩৩,০৩,০২৯ বিঘা—অর্থাৎ উপরোক্ত ২,৬১,৪২,০৪৮ জন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রত্যেকের ভাগে পড়ে প্রায় ১৪ বিঘা।

সমস্ত উদ্বৃত্ত লোক এই সমস্ত উদ্বৃত্ত জমির কাজে নিযুক্ত হইলে জগতের প্রয়োজন মত নির্ব্বাচিত শস্য উৎপন্ন করিয়া জগতের যে কোনও বাজারে যে কোনও মূল্যে তাহা বিক্রয় করিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পাবে।

কেবলমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারা এতখানি সম্ভব। ইহা ছাড়া খনিজ পদার্থের কার্য্য, জঙ্গলের কার্য্য, মৎস্য আহরণের কার্য্য, নানাবিধ সরকারী চাকুরী, বিদেশীয় আমদানী রপ্তানি, শিল্পকার্য্য আছে এবং তাহার কর্ম্মনিয়োগ আছে। এই সব কার্য্যের সুযোগ আমরা পাই ভাল, না পাইলেও ক্ষতি নাই। সমগ্র ভারতবাসীর জীবনযাত্রা একমাত্র কৃষির দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

ইহা ব্যতীত মূল প্রবন্ধে এদেশীয় যুবকদিগের শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হইবে; কি করিয়া তাঁহারা শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্রে নিম্নস্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, আমাদের অভিজ্ঞতা মত সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ইঙ্গিত থাকিবে।

কারণ, শুধু কৃষকদের লইয়াই নহে, শিক্ষিত বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের লইয়াও আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে রব উঠিয়াছে, আমরা নিরন্ন মুমূর্ষু জাতি, আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই। সমস্ত দোষ চাপানো হইতেছে আমাদের পরাধীনতার উপর;

ভারতের চিন্তাশীল নেতারা তাই কনষ্টিট্যুসন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির কথাও দিকে দিকে শুনা যাইতেছে, কিন্তু ভারতের ভারতীয় প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কোনও পন্থার নির্দ্দেশ কেহ করিতেছেন না। ফলে সমস্যা উত্তরোত্তর জটিলতর হইতেছে।

দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত দিশাহারা এই জাতিকে যিনি যখন যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহাকেই সে চরম পন্থা মনে করিয়া ক্ষণকাল আঁকড়িয়া ধরিতেছে—এবং বারম্বার বিফল-মনোরথ হইয়া অধিকতর দুর্দ্দশায় নিপতিত হইতেছে। আমরা হতাশ নহি, আমরা জানি হতাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই। আমাদের মুক্তির যে সহজ সরল পথ প্রকৃতিদেবী আমাদের সম্মুখে বিছাইয়া রাখিয়াছেন, তামসিকতায় অন্ধ আমরা, সে পথ চোখে দেখিয়াও দেখিতেছি না। সেই সহজ পথের সামান্য ইঙ্গিত আমরা দিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র। আমরা যে একদিনেই মায়ামন্ত্রবলে সেই পথে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, এমন দুরাশা পোষণ করি না। আমরা ভরসা করি, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দোষ-গুণ-সম্বলিত আমাদের এই পন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন এবং নানা-দিকে এই চিন্তার জাগরণে সহজ সত্য পথটি স্বতঃই আবিষ্কৃত হইবে।

* * * *

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ও উপসংহারের যৌক্তিকতা নির্দ্ধারণের জন্য মূল প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে :—

১। যাবতীয় সমস্যা পূরণের উপায়।

২। কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায়।

৩। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার নিরূপণ।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সামর্থ্য।

৫। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার পূরণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত শাস্ত্রজ্ঞানের আলোচনা।

৬। প্রচলিত শাস্ত্রজ্ঞানে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের বর্ত্তমান সামর্থ্যের সমঞ্জসীভূত কোন পদ্ধতি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান।

(ক) থাকিলে তাহা কার্য্যকরী করিবার উপায়।

(খ) না থাকিলে যথোপযুক্ত পদ্ধতির অনুসন্ধান এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার উপায়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

১। যাবতীয় সমস্যা পূরণের উপায়।

২। কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় –

(১) জাতি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

(২) দেশ বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

(ক) জমি ও জলহাওয়া (atmosphere) বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ কি ?

(খ) ১। মানুষ বলিতে কি বুঝায়।

(খ) ২। মানুষের মধ্যে ভারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ।

(খ) ৩। মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

ইহার অব্যবহিত পরে আলোচ্য—

(খ) ৪। মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা।

(খ) ৫। মানুষের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়।

(খ) ৬। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা।

(খ) ৭। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

(খ) ৮। মানুষের অবনতি ও পরাধীনতার কারণ। ইত্যাদি।

* * * *

যাবতীয় সমস্যা পূরণের নিয়ম

কোনরূপ সমস্যার পূরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রয়োজন হয়, সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিয়া বোঝা; দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন হয়, যে অথবা যাহারা সমস্যার পূরণ করিবে তাহার অথবা তাহাদের সামর্থ্যের পরিমাণ করা; তৃতীয়তঃ প্রয়োজন হয়, অনুরূপ সমস্যাপূরণের প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান; চতুর্থতঃ প্রয়োজন হয়, সমস্যার প্রকৃতির সহিত সমস্যা-পূরণকারিগণের সামর্থ্যের সমঞ্জসীভূত কোন পদ্ধতি কোথায়ও প্রচলিত আছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং থাকিলে ঐ পদ্ধতি কার্য্যকরী

করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা ; পঞ্চমতঃ প্রয়োজন হয়, উপরোক্ত সমঞ্জসীভূত প্রচলিত কোন পদ্ধতি না থাকিলে যথোপযুক্ত পদ্ধতির আবিষ্কার করা এবং তাহা কার্য্যকরী করার উপায় নির্দ্ধারণ করা।

কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায়

কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনার প্রয়োজন হয় :—

১। জাতি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

২। দেশ বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

৩। জাতি-সংগঠনের প্রয়োজন ও উপায়।

৪। জাতীয় সমস্যা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্ভব হয় কেন ?

জাতি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি

আমরা "জাতি" শব্দে মূলতঃ কতকগুলি সমগুণবিশিষ্ট জীবের মিলিত সঙ্ঘ বুঝিয়া থাকি। এখানে আমাদের আলোচ্য "মানুষের জাতি"। পশু পক্ষী হইতে পৃথক অথচ কতকগুলি সমগুণবিশিষ্ট জীবকে "মানুষ" নামে খ্যাত করা হয়।

মূলতঃ সমতার দিকে লক্ষ্য করিলে মানুষ মাত্রে একজাতীয় হইয়া পড়ে এবং তাহার পৃথকত্ব শুধু পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীবের সহিত। কিন্তু যে কারণেই হউক, বাস্তব জগতে ইংলণ্ডে "ইংরেজ", জার্ম্মানীতে "জার্ম্মান", ভারতে "ভারতীয়" এইরকম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশীয় মানুষ বিভিন্ন জাতি বলিয়া আখ্যাত হয়। দেশ লইয়া এই বিভিন্নতা শুধু নামে নহে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রেও স্থান পাইয়াছে। দেশজাত বিভিন্নতা উপেক্ষা করিয়া শুধু মানুষের মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যাপৃত কয়জন মানুষ জগতে আছেন তাহা গণনা করা বোধ হয় সুকঠিন নহে।

মূলতঃ জাতি বলিতে যাহাই বুঝা যাক না কেন, বাস্তব জগতে "জাতি" বলিতে বুঝায়, এক এক দেশে তৎ তৎ দেশবাসী লোকগণের সমষ্টি।

ইহা ছাড়া, ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সমষ্টিবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টার উদাহরণ বাস্তব জগতে আছে।

ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য নহে। তাহা লইয়া অনেক মতবিরোধ আছে। ধর্ম্মের শব্দগত মৌলিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে "মানুষের ধর্ম্ম" বলিতে বুঝিতে হয় এমন একটা কিছু, যাহা সকল মানুষের মধ্যে আছে এবং যাহার জন্য মানুষ "মানুষ" নামে খ্যাত হয় এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীব হইতে স্বাতন্ত্র্য পাইয়া থাকে। মানুষের আচার-ব্যবহারের পদ্ধতিকে আমরা সাধারণতঃ "ধর্ম্ম" নাম দিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের আভ্যন্তরীণ উপরোক্ত ধর্ম্মের (যাহার জন্য মানুষ "মানুষ" নামে খ্যাত হয়) সমঞ্জসীভূত আচার-ব্যবহারের পদ্ধতিকেই "ধর্ম্ম" বলিলে "ধর্ম্ম" সজীব ও কল্যাণকর হয়। সকল ধর্ম্মেই মানুষের ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগত ভাবে আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ আছে। এবং সমস্ত আচার-ব্যবহার নির্দ্ধারণের মূলে জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে কোথায় কোথায় অনুরূপতা আছে তাহা নির্দ্ধারণেরও একটা প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সজীব ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় উপদেশের এবং মানুষের অনুরূপতার মধ্যে সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত মানুষে যখন অনুরূপতা আছে তখন মানুষের আচার-ব্যবহারেও অনুরূপতা থাকা উচিত ইহা সহজবোধ্য। কাজেই নিজ নিজ ধর্ম্মে অর্থাৎ আচার-ব্যবহারের পদ্ধতিতে অপরকে আকৃষ্ট করিবার প্রচেষ্টার কারণও সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু "ধর্ম্ম"কে কেন্দ্র করিয়া জাতিগঠনের যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি না।

এক আচার-ব্যবহারের রীতিকে বাদ দিয়া প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গায়ের রং, মানুষের ওজন, মানুষের দৈর্ঘ্য, হস্তপদাদির গঠন, মানুষের পরমায়ু ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষের মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দুর ভিতর যতটুকু অনুরূপতা নজরে পড়ে, ভারতবর্ষের মুসলমান ও তুর্কীর মুসলমানে, অথবা ভারতবর্ষের খ্রীষ্টানে ও ইংলণ্ডের খ্রীষ্টানে ততটুকু অনুরূপতা নজরে পড়ে না।

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রকৃতিকে চিনিতে হইবে, প্রকৃতির দেওয়া জিনিষগুলিকে চিনিতে হইবে এবং আপন আপন কাজে লাগাইতে হইবে। প্রকৃতির দেওয়া

জিনিষের ব্যবহার-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানুষের সহজ ও সম্পূর্ণ সুখের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরও স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাইবে যে, মানুষ তাহার দেশের সঙ্গে যে পরিমাণে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্য কিছুর সহিত সে পরিমাণে জড়িত নহে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, মানুষের সমষ্টিগত হইবার সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্র "মনুষ্যত্ব" এবং তাহার পরই "দেশ"। কাজেই "জাতি" বলিতে "দেশ"কে কেন্দ্র করিয়া তৎ তৎ দেশবাসীগণের সমষ্টি অথবা সম্মেলন বুঝিতে হইবে।

"জাতি"র মৌলিক উপাদান ঐ জাতির প্রত্যেক মানুষ এবং তাহাদের মিলন। "জাতি"র অধিকরণ "দেশ"।

জাতির "উৎকর্ষ" শব্দের মৌলিক অর্থ এমন একটা অবস্থা যাহাতে "জাতি"র জাতীয়ত্ব অধিক পরিমাণে চিহ্নিত। [উৎ (অধিক) + কৃষ্ (চিহ্ন করা) + অ (অল্) —ভা]

জাতির জাতীয়ত্ব অধিক পরিমাণে চিহ্নিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত কর্ম্মের প্রয়োজন :—

১। যে যে গুণের জন্য মানুষ পশু হইতে পৃথক অথবা পশুর সহিত মানুষের বৈষম্য সেই সেই গুণের কৃষ্টি সাধন করিয়া মানুষের "মানুষ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে।

২। জাতীয়ত্বের অপর উপাদান "মানুষের মিলন" যাহাতে দৃঢ়মূল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দলাদলির সংখ্যা এবং পরিমাণ যত কমিয়া যায় ততই "মানুষের মিলন" দৃঢ়মূল হইতেছে বুঝিতে হইবে।

৩। অন্যদেশের বিনা সাহায্যে নিজদেশ হইতে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতির "অপকর্ষ" শব্দের মৌলিক অর্থ এমন একটা অবস্থা যাহাতে জাতির জাতীয়ত্ব নিন্দিত পরিমাণে চিহ্নিত। [অপ (অধম) + কৃষ্ (চিহ্নিত করা) + অ (অল্)—ভা]

জাতীয়ত্ব নিন্দিত পরিমাণে চিহ্নিত হইলে জাতির নিম্নলিখিত অবস্থার উদ্ভব হয় :—

১। যে যে গুণের জন্য মানুষ পশু হইতে পৃথক তাহার কৃষ্টি কমিয়া যায়।

২। মানুষের দলাদলির সংখ্যা এবং পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

৩। জীবিকার জন্য অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

দেশ বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি

দেশ বলিতে আমাদের চোখের সামনে আসে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিভাগের সমষ্টি। রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। আমাদের দেশে তাহাদের নাম—প্রদেশ, যথা বাংলা, বিহার ইত্যাদি ; বিভাগ (division), যথা প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান ইত্যাদি ; জিলা—যথা ২৪ পরগণা, নদীয়া ইত্যাদি ; মহকুমা—যথা ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ইত্যাদি। প্রত্যেক মহকুমায় কতকগুলি থানা এবং প্রত্যেক থানায় কতকগুলি গ্রাম আছে। আবার প্রত্যেক গ্রামে কতকগুলি জমি, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি কতকগুলি জীব এবং একটা জলহাওয়া (atmosphere—যাহা লইয়া সর্ব্বদা মানুষকে বিব্রত থাকিতে হয়) আছে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় বিভাগ বিভিন্ন রকমের হইতে পারে কিন্তু এমন দেশ নাই যেখানে কোন জমি, কোন জীব এবং একটা জল-হাওয়া (atmosphere) নাই।

কাজেই দেশ বলিতে জমি, জীব এবং জলহাওয়ার সমষ্টি বলা যাইতে পারে।

জীব ও জলহাওয়া ছাড়া জমি থাকিতে পারে না ; জমি ও জলহাওয়া ছাড়া জীব থাকিতে পারে না ; জমি এবং জীব ছাড়া জলহাওয়া থাকিতে পারে না—ইহা বাস্তব সত্য। জমি, জীব ও জলহাওয়ার ভিতর অভেদ্য সম্বন্ধ। কেন এইরূপ হয় তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। তবে তিনটির যে অভেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং তাহা যে বাস্তব সত্য ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

দেশের উৎকর্ষ কি তাহা বুঝিতে হইলে জমি, জীব এবং জলহাওয়ার উৎকর্ষ কি তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় এবং তাহাই আগে আলোচনার চেষ্টা করিব।

জমি, জীব ও জলহাওয়ার উৎকর্ষ না হইলে দেশের প্রকৃত উৎকর্ষ যে হয় না তাহা আমরা পরে আরও সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

জমি ও জলহাওয়া বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ কি

জলহাওয়ার উৎকর্ষ কি, জীবের উৎকর্ষ কি, জমির উৎকর্ষ কি, তাহা অতীব বিস্তৃত আলোচনা। তাহার এক একটি লইয়াই এক এক একটি বিস্তৃত বিজ্ঞান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য মূল বিষয় "দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায়"। জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার জন্য "দেশ" এবং তদন্তর্গত জমি, জীব এবং জলহাওয়া সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন আমরা এখানে শুধু ততটুকুই আলোচনা করিব।

আমরা আগেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, জমি ও জলহাওয়া ছাড়া জীব থাকিতে পারে না। জমিকে জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির দেওয়া উপকরণ বলা যাইতে পারে।

"জীবের জীবন ধারণ করিবার জন্য জমি" বলিলেও আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ হয় না। তথাপি জীবের কথা বলিতে হইল, কারণ তাহা না বলিলে জমির প্রয়োজনীয়তার কথায় অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

বাস্তব জগতেও দেখা যায়, এমন কোন জীব নাই যাহারা জমি ছাড়া বাঁচিতে পারে। জলচর জীবগণ আপাতদৃষ্টিতে জল খাইয়া, জলে বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু জল জমির আশ্রয় ছাড়া থাকিতে পারে না। খেচর জীবগণের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

আমাদের চোখে জমির চারিটি রূপ—যথা, (১) চাষের জমি, (২) জঙ্গলের জমি, (৩) খনিজ পদার্থের জমি, (৪) জলতলস্থ জমি।

মানুষ যাহা যাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং যাহা যাহা ব্যবহার করে তাহার সমস্তই মূলতঃ জমি ও জলহাওয়া হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষের খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য এমন কোন জিনিষ নাই যাহা মূলতঃ জমি ও জলহাওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়া প্রস্তুত হইতে পারে।

মানুষ জীবিকার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করে, তাহার মূলেও জমি ও জলহাওয়া। মানুষের জীবিকার উপায় যতগুলি আছে তাহা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় :—

১। জমির চাষ—(১) কৃষি ও পশুপালন (২) জঙ্গল-জাত দ্রব্যের আহরণ (৩) খনিজ পদার্থের আহরণ (৪) মুক্তা, মৎস্য প্রভৃতির আহরণ।

২। শিল্প। এমন কোন শিল্প নাই যাহার মূল উপকরণ জমি অথবা "জলহাওয়া" জাত নহে। জমি ও জলহাওয়া-জাত দ্রব্যের জীবের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের নাম শিল্প, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৩। বাণিজ্য—জমিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের আদান-প্রদানের নাম বাণিজ্য। টাকার লগ্নী কারবার অথবা ফাইন্যান্স, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতিও মূলতঃ জমির চাষ, শিল্প, বাণিজ্য ও রাজসেবা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের উদ্বৃত্তাংশের আদান-প্রদান।

৪। রাজসেবা—রাজা যে কর পাইয়া থাকেন এবং যাহা দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করেন তাহারও একমাত্র মূল—জমি। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে জমির অন্য নাম মা-টি।

রাজা হউন, রাজসরকারে দেশের প্রতিনিধি হউন, রাজকর্ম্মচারী হউন, ব্যবহারজীবী হউন, শিক্ষাজীবী হউন, বণিক হউন, দালাল হউন, দোকানদার হউন, কামার হউন, কুমার হউন, তাঁতি হউন, কলের স্বত্বাধিকারী হউন, অথবা মজুর হউন সকলেরই উপজীবিকার মূল মাটি।

মাটি কাহারও কাছে নিজের জন্য কিছু যাচ্ঞা করেন না। তিনি সকলকেই দিতে ব্যাকুলা। তিনি ধনীর বন্ধু, দরিদ্রের দুঃখহারিণী।

মানুষ যে স্তরেরই হউক, কোন শিক্ষা থাক আর নাই থাক—নিজের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পায়, তাহাকে প্রকৃতিদেবী কি করিয়া মাটিকে ব্যবহার করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতির দানও যথেষ্ট।

জগতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ—৩০৫৭, ৩৩,৬১, ৭৭০ বিঘা। জগতে মানুষের সংখ্যা—২০২, ৮০, ০০, ০০০ জন। প্রতি মানুষের ভাগে জমির পরিমাণ—১৪.৯ বিঘা। মানুষ জমিকে উপেক্ষা করিয়া ব্যবহার না করিলেও জমি ফলফুলে পরিপূর্ণ হইয়া জঙ্গলরূপে মানুষের বহু প্রয়োজনীয় জিনিষের আকর হইয়া অবস্থান করেন। জমির উৎকর্ষ বলিতে বুঝিতে হইবে জংলা জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা, অথবা

দেশে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যেক জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া তোলা।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে হইলে জমিকে চেনা চাই, জলহাওয়াকে চেনা চাই, জমির উপর জলহাওয়ার খেলা বুঝা চাই।

জমিকে চিনিতে হইলে জমির স্বাভাবিক প্রসবিনী শক্তি কোন্ কোন্ শস্য উৎপাদন করে, জমি কি কি গুণ বিশিষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি বুঝা চাই।

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে হউক অথবা জাতিগত ভাবে হউক, জমির চাষ উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিলে যে-শৃঙ্খলার সহিত কালাতিপাত করিতে পারে, অন্য কোন জীবিকা দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না।

জলহাওয়ার (atmosphere) তারতম্যানুসারে মানুষের খাদ্যের ও ব্যবহারের জিনিষে যে তারতম্য হয়, দেশের জমির প্রসবিনী শক্তিতে সে তারতম্য রহিয়াছে—ইহা একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জমির চাষ উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিতে হইলে জমির প্রসবিনী শক্তির উপরোক্ত তারতম্যটুকু বুঝিয়া মানুষের খাদ্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষ উৎপন্ন করিতে হয়।

যে দেশে প্রচুর আবাদী জমি আছে এবং দেশবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ও অপরাপর ব্যবহার্য্য জিনিষ নির্ম্মাণোপযোগী শস্য উৎপন্ন হয়, সে-দেশ অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারিলেও নিজের দেশের জমি ও মানুষের শ্রমশক্তি দ্বারা শৃঙ্খলায় জীবন কাটাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ দেশ অপর দেশের ব্যবহারের জন্য শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে না পারিলেও নিজ দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপত্তির জন্য শৃঙ্খলিত ভাবে শিল্পচর্চ্চা করিতে পারে এবং তাহাদের নিজের দেশের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুব্যবস্থা সম্পাদন করিতে পারে।

যে দেশে প্রচুর জমির আবাদ হয় নাই এবং দেশবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ও অপরাপর ব্যবহার্য্য জিনিষ নির্ম্মাণোপযোগী শস্য উৎপন্ন হয় না সে দেশে জীবিকার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য অবলম্বন করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু একমাত্র শিল্প ও বাণিজ্য জীবিকার অস্বাভাবিক অবলম্বন। তাহাতে দেশে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে, ও ক্রমশঃ জাতির ভিত্তি শিথিলতা প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য্য।

অপর দেশের উৎপন্ন জমিজাত দ্রব্য লইয়া শিল্প করা অথবা বাণিজ্য করা এবং তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার অন্য নাম অপর দেশের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া। শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অপর দেশে 'বাজার' গঠন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের ভূমি হইতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষের মূল শস্য উৎপন্ন না হইলে অপর দেশ হইতে তাহা ক্রয় করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন। কাজেই শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল জাতিকে অপর দেশে যাইতেই হইবে এবং অপর দেশের বাজারে শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেই হইবে।

শিল্পজাত দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রকরণের (Manufacturing) মূলে আছে—

১। মূল জমিজাত দ্রব্য (Raw or Basic materials)

২। মানুষের কায়িক পরিশ্রম (Labour)

৩। মূলধন ও তত্ত্বাবধান (Capital and Supervision)

আমরা বহু শিল্পজাত দ্রব্যের পড়তা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে মোট যে খরচ পড়ে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক মূল জমিজাত দ্রব্য (raw materials) বাবদ খরচ হয়। তাহার জন্য যে দেশের উপর নির্ভর করিতে হয় সে দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী দাম শিল্পপ্রস্তুতকারী দেশকে দিতে হয়। কাজেই প্রতিযোগিতার মূল উপকরণ হয় মানুষের কায়িক পরিশ্রম (Labour) এবং মূলধন ও তত্ত্বাবধানের (Capital and Supervision) বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য লইয়া বাজারে প্রতিযোগিতা সম্ভব হয় কেবলমাত্র ততদিন, যতদিন পর্য্যন্ত কাঁচামাল উৎপাদনকারী কোন দেশের কোন জাতি নিদ্রাতুর অথবা মোহাবিষ্ট থাকে।

শিল্পজাত দ্রব্যে মানুষের কায়িক পরিশ্রম (labour) জনিত খরচ (costing) হ্রাস করিবার উপকরণ "যন্ত্র"। ঐ খরচ (cost per labour) কদাচিৎ শিল্পজাত দ্রব্যের মোট খরচের (total cost of the industrial product)

শতকরা ৯ ভাগ (9%) এর বেশী হয়। অথচ মূল উপকরণের (raw materials) ব্যবহারের জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মূল উপকরণের পরিমাণের তারতম্য হয় এবং তাহাতে শতকরা ২০ ভাগ (20%) তারতম্য সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। কাজেই যন্ত্রবিজ্ঞানে যতই নৈপুণ্য লাভ করা সম্ভব হউক না কেন, তদ্দ্বারা শিল্পক্ষেত্রে ভূমিজাত দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞানের সহিত প্রতিযোগিতা অসম্ভব হইতে পারে।

পরন্তু "যন্ত্র" মানুষের আবিষ্কৃত। তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান মানুষের শিষ্যত্ব দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। জমিজাত দ্রব্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রকৃতিদেবীকে অধ্যয়ন করিতে হয়। যিনি প্রকৃতিদেবীর অধ্যয়নের সাধক এবং তাহাতে কৃতিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি চেষ্টা করিলে মানুষের আবিষ্কৃত যন্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান সহজেই লাভ করিতে পারেন ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কাজেই অন্যান্য দেশের স্ব স্ব অবস্থা সম্বন্ধীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যে নির্ভরশীল জাতির 'বাজার' কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে এবং বেকার ও অন্নাভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তখনও প্রকৃতির দেওয়া সহজ ও সরল জীবিকার উপায় অর্থাৎ জমির চাষ অবলম্বন না করিলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বুদ্ধিনৈপুণ্যের আশ্রয় লইয়া 'বাজার' সংরক্ষণের চেষ্টা এবং স্থানে স্থানে কায়িক শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যে পবিত্র কৃষ্টি তাঁহাদের শিল্প ও বাণিজ্য-জীবনের সাফল্যের নিদান তাহা ক্রমশঃ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া অপবিত্র হইয়া পড়ে এবং অন্য দেশে অপবিত্রতা অভ্যাসের ফলে নিজেদের দেশেও আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে অপবিত্রতা ক্রমশঃ স্থান পায়। তাহাতে রাজ্য-পরিচালক-দিগের উপর সাধারণের বিশ্বাস কমিয়া যায় এবং কালে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

রাজত্বচালনার অন্য নাম প্রজারঞ্জন অথবা প্রজার সন্তোষ বিধান করা। যতদিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্য-পরিচালক-গণের উপর দেশীয় সাধারণ লোক সন্তুষ্ট থাকেন ততদিন কোন রাজত্বের পতনের উদাহরণ ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। আবার সাধারণের সন্তোষ বিধান না করিয়া রাজত্ব বজায় থাকিবারও উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বোধ হয় উপরোক্ত পরিণতির অনুমান করিয়া এবং জমির চাষই মানুষের জীবিকার স্বভাবজ উপায় তাহা বুঝিয়া ভারতের ঋষিগণ ভারতবর্ষে উপযুক্ত পরিমাণ জমি আবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে গ্রামবাসীগণের খাদ্য ও ব্যবহার্য্য শিল্পজাত দ্রব্যের মূল শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত "ধন" শব্দের মূল ধাতু "ধন্"। তাহার অর্থ শস্য উৎপন্ন হওয়া। বোধ হয় শস্য উৎপন্ন করাকেই মানুষের স্বাভাবিক জীবিকার উপায় তাঁহারা মনে করিতেন বলিয়া শস্য উৎপন্ন করাকে তাঁহারা "ধন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। একদিকে যেমন উৎপন্ন শস্যের প্রাচুর্য্যের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, অন্য দিকে আবার যাহাতে সর্ব্বনিম্ন (minimum) কায়িক ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষকের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রচুর হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে নিজ নিজ খাদ্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষ ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থার দিকেও লক্ষ্য ছিল বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জমিকে এত ভাল করিয়া জগতের আর কোন জাতি চিনিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। তবে জমি যে স্বভাবতঃ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাহা বর্ত্তমান সভ্য ও স্বাধীন জাতি-গুলির অভ্যুত্থানের প্রারম্ভাবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলেও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইংলণ্ডেও কৃষি-ব্যবসায়ের উৎকর্ষের জন্য একটা প্রচেষ্টার ইতিহাস আছে। ইংলণ্ডের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে প্রচুর শিল্পজ সারের তত্ত্বালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যে সময়ে যে বীজ বপন করিলে বিনা আয়াসে বিনা খরচে ভারতীয় কৃষক স্থানীয় লোকগণের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যে পরিমাণে যোগাইতে পারেন তাহার মূলে জমি সম্বন্ধীয় যে তত্ত্বজ্ঞান অনুমিত হইতে পারে, তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্যায় আছে বলিয়া সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।

যাহাতে সর্ব্বনিম্ন (minimum) কায়িক ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষকের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রচুর হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে নিজ নিজ খাদ্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষ যথেষ্ট ক্রয় করা সম্ভব হয় তাহার কোন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য এক ভারত ছাড়া জগতের আর কোন বর্ত্তমান সুসভ্য দেশের

কৃষির উৎকর্ষ-প্রচেষ্টার ইতিহাসে আমরা খুঁজিয়া পাই না। বোধ হয় ইহাই ইংলণ্ডের কৃষির উন্নতি-প্রচেষ্টার অসাফল্যের কারণ।

ভারতে আজও কৃষিজীবীর সংখ্যা যথেষ্ট, কৃষিযোগ্য জমিরও অভাব নাই, প্রতি বৎসর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও প্রচুর। কিন্তু কৃষকের সর্ব্বনিম্ন কায়িক ক্ষমতা কতখানি, সে ভগবানের দেওয়া হস্তপদাদি দ্বারা কতখানি জমি চাষ করিতে পারে, কোন্ জমিগুলিতে পরিশ্রম করিলে সে ন্যায়তঃ এমন পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারে যদ্দারা তাহার সংসারের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগৃহীত হইতে পারে, কোন্ ব্যবস্থা করিলে তাহার পরিশ্রমলব্ধ মজুরীর বিনিময়ে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের ক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিবার কেহ আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

জমির কথা বলিতে বলিতে কৃষকের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। জমিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কৃষক কি তাহা বুঝিতে হয়। এবং কৃষক কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মানুষ কি, তাহার উৎকর্ষ কি এবং তাহার অপকর্ষ কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। মানুষের শরীরতত্ত্ব অথবা মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত বিচার করা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে।

দেশ বলিতে কি বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে জমি এবং জলহাওয়ার তত্ত্বাবধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "মানুষ" সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে :—

১। মানুষ বলিতে কি বুঝায়
২। মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ
৩। মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য
৪। মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা
৫। মানুষের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়
৬। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা
৭। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য
৮। মানুষের অবনতি ও পরাধীনতার কারণ

মানুষ বলিতে কি বুঝায়

"মনুষ্যজাতি"র কথা আলোচনা করিবার সময় মানুষ বলিতে বুঝিতে হয়, "পশুপক্ষী প্রভৃতি হইতে পৃথক অথচ কতকগুলি সমগুণবিশিষ্ট" জীববিশেষ, তাহা আগেই বলিয়াছি।

মানুষ যত রকমভাবে মানুষের সামনে অভিব্যক্ত হয় অথবা দুনিয়ার অভিব্যক্তি আয়ত্তাধীন করে তাহা লক্ষ্য করিলে মানুষকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিভিন্ন কার্য্যের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। নিজ নিজ কার্য্যের অথবা নিজ নিজ অস্তিত্বের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করিলে আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আমি খাইতে বসিয়াছি—আমার অভিব্যক্তি হস্তরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনায় এবং জিহ্বারূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চালনায়; আমি নিদ্রিত রহিয়াছি - আমার অভিব্যক্তি আমার চক্ষুরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিশ্চেষ্টতায় এবং নাসিকারূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিশ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণে; আমি বক্তৃতা দিতেছি—আমার অভিব্যক্তি বাক্ ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চালনায়—এইরূপ যতকিছু অভিব্যক্তি মানুষের হইয়া থাকে, তাহা তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অথবা বাক্, পাণি, পদ, পায়ু, উপস্থ রূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, মনরূপ উভয়েন্দ্রিয়ের অথবা মানুষের বুদ্ধির।

দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইতে হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই। এই জগতে এমন কোন মানুষ নাই যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। মানুষে মানুষে ওজনে তফাৎ থাকিতে পারে, দৈর্ঘ্যে তফাৎ থাকিতে পারে, গায়ের রংএ তফাৎ থাকিতে পারে, চালচলনে তফাৎ থাকিতে পারে, দৈহিক শক্তিতে তফাৎ থাকিতে পারে, বিচারশক্তিতে তফাৎ থাকিতে পারে কিন্তু এমন কোন মানুষ নাই যাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই। ইন্দ্রিয়চালনার রকম পৃথক হইতে পারে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। মানুষের জীবনে কৌমার্য্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের দৈর্ঘ্যে তফাৎ থাকিতে পারে কিন্তু কৌমার্য্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের অস্তিত্বে কোন তফাৎ নাই।

মানুষ যতই বোকা হউক, খাদ্য উদরস্থ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে, আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়িয়া মরিতে হইবে ইত্যাদি বোধ সমস্ত মানুষেরই আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, যাহা যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যরূপে অভিব্যক্তি তাহা সমস্ত মানুষেরই আছে। এবং

মানুষ তাহাদের নামকরণ করিয়াছে "ইন্দ্রিয়" এবং "মন" এবং "বুদ্ধি" এবং পাইয়াছে জন্মাবধি।

মানুষ তাহার অভিব্যক্তিতে যত খেলা খেলে তাহা নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

১। তাহার দেখা, শোনা, গন্ধ লওয়া, আস্বাদ লওয়া, স্পর্শ করা, কথা কওয়া, হাত পায়ের ব্যবহার করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, ইন্দ্রিয় সুখানুভব করা প্রভৃতি নানারকমের কার্য্য করা।

২। কোন্‌টা দেখিব, কোন্‌টা দেখিব না, কোন্‌টা শুনিব, কোন্‌টা শুনিব না, কোন্‌টা করিব আর কোন্‌টা করিব না প্রভৃতি নানা রকমের বিচার করা।

৩। কেন দেখিব, কেন দেখিব না, কেন শুনিব, কেন শুনিব না, কেন দেখিতে সুন্দর, কেন দেখিতে কুৎসিত ইত্যাদি বিশ্লেষণ দ্বারা কারণ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে "ইন্দ্রিয়ের খেলা", দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে "মনের খেলা", এবং তৃতীয় শ্রেণীর খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে "বুদ্ধির খেলা"।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে মানুষের ইন্দ্রিয়ের খেলায় তাহার মন ও বুদ্ধির শক্তির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহার মনের খেলার ও বুদ্ধির খেলার প্রাবল্যের প্রয়োজন নাই। আবার ইন্দ্রিয়ের খেলা না হইলে মনের খেলা উপস্থিত হয় না এবং ইন্দ্রিয় ও মনের খেলা না হইলে বুদ্ধির খেলা উপস্থিত হয় না। ইন্দ্রিয়ের খেলা সকলকেই খেলিতে হয় এবং অল্পাধিক মন ও বুদ্ধির খেলা সমস্ত মানুষই খেলিতেছেন। ইন্দ্রিয়ের খেলায় তাহার সমতা এবং মন ও বুদ্ধির খেলায় তাহার অসমতা অথবা তাহার পৃথকত্ব।

ইহা ছাড়া মানুষের অভিব্যক্তির আর একটি যন্ত্র আছে। তাহাকে "দার্শনিকগণ" আত্মা বলেন। মানুষের বুদ্ধির অভিব্যক্তি মানুষ দেখিতে পায়। কাজেই বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। বুদ্ধির অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইলে তাহার প্রসবিতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইতে হয়। বুদ্ধির প্রসবিতা অথবা পরিচালকের নাম "আত্মা"। প্রত্যেক মানুষ আপন আপন সেই যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত বটে এবং চেষ্টা করিলে তাহার উপলব্ধি করিতে পারে তাহাও সত্য কিন্তু আভ্যন্তরীণ সেই যন্ত্রের উপলব্ধি করিবার মানুষ খুব কম এবং তাহার সঙ্গে অপর মানুষের সম্বন্ধেও খুব নৈকট্য নাই।

কাজেই বাহ্যতঃ মানুষকে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির কার্য্যের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। মূলতঃ মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। পৃথকত্বের উদয় হয় তাহার মনের ও বুদ্ধির খেলায়।

মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ

মানুষের যাবতীয় খেলা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত তাহা দেখা গিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর খেলার রকমে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়:—

১। আমি একটি জিনিষ দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল, আমি তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম, ফলে জিনিষটিকে আমার দৈহিক উপভোগের সামগ্রী করিতে ইচ্ছা হইল, উপভোগের সুযোগ জুটিল। উপভোগে উন্মত্ত হইলাম, ফলে আমার অন্যান্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলাম এবং আমার জীবনযাত্রায় নানারূপ জটিলতা আসিল।

২। আমি একটি জিনিষ দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল, আমি তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম, ফলে জিনিষটিকে আমার দৈহিক উপভোগের সামগ্রী করিতে ইচ্ছা হইল, উপভোগের সুযোগ জুটিল। উপভোগে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু উন্মত্ত হইলাম না, আমার অন্যান্য কর্ত্তব্যও কিছু কিছু করিতে লাগিলাম, ফলে আমার জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল কিন্তু কোন বিষয়েই অসাধারণ উন্নতি হইল না।

৩। আমি একটি জিনিস দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল, আমি তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম, ফলে জিনিষটিকে আমার দৈহিক উপভোগের সামগ্রী করিতে ইচ্ছা হইল, উপভোগের সুযোগ জুটিল না অথবা বাধা পড়িল, ক্রোধে উন্মত্ত হইলাম এবং জিনিষটি পাইবার জন্য হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলাম—ফলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলাম।

৪। আমি একটি জিনিস দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল, আমি তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম, ফলে জিনিসটিকে আমার দৈহিক উপভোগের সামগ্রী করিতে ইচ্ছা হইল—হঠাৎ উপভোগের পরিণামের কথা স্মরণে আসিল—প্রশ্ন হইল, উপভোগ করিব কি করিব না। স্থির

হইল, উপভোগ করিব না। অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। ফলে সমস্ত কার্য্যেই অনুরাগের অভাব।

৫। আমি একটি জিনিষ দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল এবং প্রশ্ন আসিল, "জিনিষটির সৌন্দর্য্য কোথায়?" নানা রকমে দেখিয়া জিনিষটির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া থাকিলাম। সৌন্দর্য্যই উপভোগ করিতে লাগিলাম। জিনিষটি উপভোগের ইচ্ছা থাকিল না। কিন্তু অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া গেলাম। জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা আসিল।

৬। আমি একটি জিনিষ দেখিতেছি, জিনিষটি আমার সুন্দর লাগিল এবং প্রশ্ন আসিল, "জিনিষটির সৌন্দর্য্য কোথায়?" "সৌন্দর্য্যের কারণ কি?" নানা রকমে সৌন্দর্য্যের কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। সৌন্দর্য্য অথবা জিনিষটি উপভোগের আকাঙ্ক্ষা হইল না, উপভোগের পরিণাম ভাবিয়া জিনিষটি ছাড়িয়া দিলাম না। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহাকে বিশ্লেষণ করিবার পর সৌন্দর্য্যের কারণ আবিষ্কৃত হইল। নূতন নূতন সুন্দর জিনিষ সৃষ্টির পদ্ধতি শিখিলাম। জগতে সুন্দর জিনিষের সংখ্যা বাড়িয়া গেল।

প্রথম রকমের খেলায় মানুষের ইন্দ্রিয় স্বাধীন ও সতেজ। দ্বিতীয় রকমের খেলায় আরম্ভে ইন্দ্রিয় স্বাধীন ও সতেজ কিন্তু "উপভোগে উন্মত্ততার অনুপস্থিতিতে" বুঝিতে হইবে ইন্দ্রিয় মন অথবা বুদ্ধির অধীন হইয়াছে, কিন্তু মন অথবা বুদ্ধি খুব সতেজ হয় নাই। তৃতীয় রকমের খেলাও মানুষের ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা ও সতেজতার উদাহরণ। চতুর্থ রকমের খেলায় প্রথমে ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা এবং পরিশেষে মনের অধীনতা ও নির্জীবতার উদাহরণ। পঞ্চম রকমের খেলায় প্রথমে ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা ও সজীবতা, পরে ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধির অধীনতা এবং তেজস্বিতা কিন্তু বুদ্ধির তেজস্বিতার অভাবের উদাহরণ। ষষ্ঠ রকমের খেলায় ইন্দ্রিয়ের সতেজ বুদ্ধির অধীনতা এবং তাহার তেজস্বিতার উদাহরণ। ইহা ছাড়া মানুষের খেলার আরও অনেক রকম আছে।

মানুষের সমস্ত খেলাতেই আমাদের সামনে আছে তাহার ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার এবং পিছনে আছে তাহার মন ও বুদ্ধির ব্যবহার। মানুষের ইন্দ্রিয় তাহার মন ও বুদ্ধির অধীন না হইয়া স্বাধীন এবং সতেজ হইলে মানুষ বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় এবং পরের জীবনযাত্রানির্ব্বাহে সাহায্য করা ত দূরের কথা নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহেই অসুবিধা ভোগ করে। ইন্দ্রিয় তাহার মন ও বুদ্ধির অধীন হইলেও যদি মন ও বুদ্ধি সতেজ না হয়, তাহা হইলে নিস্তেজ মন ও বুদ্ধির অধীন ইন্দ্রিয়ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—তাহার ফলে হয় ঔদাসীন্য এবং সমস্ত কার্য্যেই সম্যক সাফল্যের অভাব। সতেজ মন ও বুদ্ধির অধীন ক্রিয়াশীল সতেজ ইন্দ্রিয়ই মানুষের নিজের জীবনযাত্রায় সাফল্য আনিয়া দেয় এবং মানুষকে অপর মানুষের হিতকারী করিয়া তুলে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যেই মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ এবং বুদ্ধির এই উৎকর্ষ মানুষের স্বাভাবিক নহে। ইহা তাহার সাধনামূলক।

বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে মানুষের তারতম্য হয় এবং মানুষে মানুষে পৃথকত্ব আসে তাহা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য মানুষের ছোট বড় আখ্যাপ্রাপ্তির কোন কারণ দেখা যায় না।

ব্যক্তিগত ভাবে অথবা মনুষ্য-সঙ্ঘের অংশীরূপে মানুষের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যতগুলি কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় এমন কোন মানুষ নাই, যিনি তাহার সমস্ত একাকী করিতে পারেন অথবা করিবার সামর্থ্যার্জ্জন করিতে পারেন।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল তাঁহাদের কোন জিনিষ ভাল করিয়া দেখা হয় না, ভাল করিয়া শোনা হয় না, ভাল করিয়া চিন্তা করা হয় না। অস্থিরতা, অধৈর্য্য, উত্তেজনা প্রভৃতির প্রবণতা তাঁহাদিগকে অধিকার করে। মানুষকে ছোট বড় মনে করা তাঁহাদের প্রত্যেক চালচলনে ফুটিয়া উঠে, ফলে মানুষের মিলন-প্রবৃত্তি অদৃশ্য হয় এবং সমাজ, জাতি প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থা নামে বর্ত্তমান থাকিলেও কার্য্যতঃ প্রাণহীন হয়।

যাঁহারা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনায় ব্যাপৃত তাঁহাদের অস্থিরতা, অধৈর্য্য, উত্তেজনা প্রভৃতি ক্রমশঃ বিলীন হয়। তাঁহারা প্রত্যেক জিনিষ ভাল করিয়া দেখিবার, শুনিবার এবং চিন্তা করিবার অবসর পান। মানুষের ভিতর পার্থক্য তাঁহাদের নজরে পড়ে বটে কিন্তু মানুষকে তাঁহারা ছোট বড় আখ্যায়

পৃথক করেন না। পুরা মানুষটি হইতে যাহা লাগে তাহাই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান। কুলী, কৃষক প্রভৃতি দেখিলে তাঁহারা দেখেন, পুরা মানুষ হইতে হইলে যে সমস্ত উৎকর্ষের প্রয়োজন হয়, তাহাদের মধ্যে বহু উৎকর্ষ কুলী, কৃষকের আছে এবং বহু উৎকর্ষ কুলী, কৃষকের নাই। আবার "পণ্ডিত" অথবা "ক্রোরপতি" দেখিলেও তাঁহাদের চোখে পড়ে পুরা মানুষ বলিয়া খ্যাত হইতে হইলে যে সমস্ত উৎকর্ষের প্রয়োজন তাহার অনেকগুলি তাঁহাদের মধ্যে নাই এবং অনেকগুলি আছে। কুলী, পণ্ডিত, ক্রোরপতি প্রত্যেকের ভিতরই মানুষ বলিয়া খ্যাত হইবার বহু গুণ আছে এবং বহু গুণ নাই; একের যাহা আছে অপরের তাহা নাই। কাজেই একজনকে অপরের তুলনায় ছোট বলার অথবা বড় বলার যুক্তি যে নাই তাহা তাঁহাদের নজরে পড়ে। সমাজ অথবা জাতির শৃঙ্খলাবদ্ধ চালচলনের জন্য গুণবিশেষের উৎকর্ষহেতু ঐ গুণ সম্বন্ধীয় কার্য্যে এক জনকে আর একজনের আদেশ পালন করিতে হইবে তাহার যুক্তি তাঁহারা দেখিতে পান কিন্তু তাহাতে মানুষের ভিতর ছোটত্ব, বড়ত্ব প্রতিপাদক আখ্যা তাঁহাদের মনে জাগে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে মানুষের ভিতর পৃথকত্ব আছে বটে, কিন্তু ছোটত্ব বড়ত্বের কোন যুক্তি নাই।

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনার তারতম্যের জন্য দুনিয়ার মানুষের অবস্থার নিম্নলিখিত রকমের শ্রেণীবিভাগ আছে :—

১। কেহ কেহ মানুষের আকাঙ্ক্ষা কি কি, আকাঙ্ক্ষণীয় কি কি, কি কি আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনীয়, আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি কি, আকাঙ্ক্ষণীয় কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় কি কি, আকাঙ্ক্ষণীয় জিনিষ উপার্জ্জন করিবার উপায় কি কি, উপায়ের উৎকর্ষ কি, অনুৎকর্ষ কি, অনাকাঙ্ক্ষণীয় বর্জ্জন করিবার উপায় কি কি ইত্যাদি চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা উপরোক্ত চিন্তার একটির পর একটির সমাধান করেন এবং অপর সমস্ত মানুষের কল্যাণ সম্পাদন করিয়া তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণকে এই শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে।

২। কেহ কেহ প্রথম শ্রেণীস্থ লোকের মীমাংসিত পন্থানুসারে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রকমের চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা শিক্ষা, সাম্রাজ্য পরিচালনা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় উৎকর্ষ-সম্পাদক বিভিন্ন বিষয়গুলি কিরূপে সংগঠিত হইতে পারে তাহার মীমাংসা করেন। যাবতীয় শৃঙ্খলাগত পরিচালনার সংগঠনকারীদিগকে (organiser) এই শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে।

৩। কেহ কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ মনীষীগণের মীমাংসিত পন্থা কি করিয়া কার্য্যকরী হইবে তাহার নির্ণয় করেন এবং নির্দ্ধারিত পন্থা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মাবলম্বন করেন। যাবতীয় বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে (officers) এই শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে।

৪। কেহ কেহ তৃতীয় শ্রেণীস্থ মনীষীগণের আদিষ্ট পন্থা সম্বন্ধীয় উপদেশ, যাঁহারা চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ফলপ্রসূ করেন এবং আমরা যাহাদিগকে চলিত কথায় শ্রমজীবী কহিয়া থাকি তাঁহাদিগের নিকট পৌছাইয়া দেন। যাবতীয় সহকারী কর্ম্মচারী- (subordinate officer) দিগকে এই শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে।

৫। কেহ কেহ চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় অথবা কায়িক পরিশ্রমদ্বারা আদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য ফলপ্রসূ করেন। সমস্ত রকমের শ্রমজীবীদিগকে এই শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে।

মানুষের অবস্থার উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীস্থ লোকের কোন এক শ্রেণীর জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি ব্যতীত কোন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা মনুষ্য-সঙ্ঘের অংশীভূত, সুশৃঙ্খলিত ও সুচারু জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ছাড়া সংগঠনকারীর সংগঠন সম্ভব নহে, সংগঠনকারীর সংগঠন ছাড়া কর্ম্মচারীর পক্ষে সুশৃঙ্খলিত কর্ম্মচালনা সম্ভব নহে, কর্ম্মচারীর সুশৃঙ্খলিত কর্ম্মচালনার উপদেশ ছাড়া সহকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে কর্ম্মোপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা সম্ভব নহে, সহকারী কর্ম্মচারীর কার্য্য-চেষ্টা ছাড়া কায়িক পরিশ্রমীর পক্ষে কার্য্য সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ করা সম্ভব নহে। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার সহিত কায়িক পরিশ্রমীর ফলপ্রসবিনী শক্তি শৃঙ্খলিত। দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের তারতম্যানুসারে দেশের অথবা জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জগতে মূক শ্রমজীবীগণের অনশন, অর্দ্ধাশন,

অর্দ্ধ বসন, ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য দ্বারা জীবনযাপন বর্ত্তমান থাকিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দর্শন ও বিজ্ঞান জ্ঞানের অভিমান অলীক ও অসার। জগতের ইতিহাসে এমন কাহারও উল্লেখ নাই যিনি একাধারে দার্শনিক, সংগঠনকারী, কর্ম্মচারী, সহকারী কর্ম্মচারী এবং কায়িক পরিশ্রমীর সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। একজনের যে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি থাকে অপরের তাহা থাকে না, পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইহা হইতেও দেখা যাইতে পারে, মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে কিন্তু ছোটত্ব বড়ত্বের কোন যুক্তি নাই।

মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য

মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য বিচার করিতে বসিলে পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। যে গুণের জন্য মানুষ পশু হইতে পৃথক এবং মনুষ্য নামে অভিহিত হন, তাহা না থাকিলে কেবলমাত্র মনুষ্যাবয়বী হইলেই মনুষ্য নামের সার্থকতা হয় না।

জগতে যতটুকু পশুতত্ত্বের জ্ঞান প্রচলিত আছে, তাহাতে পশুর যে মানুষের মত স্বভাবজ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। স্বভাবজ বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমষ্টিগত হইয়া আহার-বিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতে পারে। কেবল পারে না বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির যাবতীয় কার্য্যের নিদান কোথায় তাহার নির্ণয় করিতে। পারে না বুদ্ধির তারতম্য হয় কেন তাহার নির্দ্ধারণ করিতে এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে। বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের শক্তিই মানুষের বৈশিষ্ট্য।

কাজেই বলিতে হইবে মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা। ইহারই জন্য মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা।

"মানুষ বলিতে কি বুঝায়" তাহা আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যের সমষ্টি এবং ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় মানুষের কার্য্য করিবার বাহ্য যন্ত্রগুলি, মন বলিতে বুঝায়—কোনটা করিব এবং কোনটা করিব না—ইত্যাদি বিচার করিবার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রটিকে, এবং বুদ্ধি বলিতে বুঝায়—কেন করিব ও কেন করিব না অথবা কোন্ কার্য্যের কোন্ কারণ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রটিকে।

স্বভাবজ বুদ্ধি ও মন মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সকল জীবেরই যে আছে, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ অতি সুন্দর যুক্তি-দ্বারা আমাদের মত সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বভাবজ বুদ্ধি না থাকিলে পশুপক্ষী ও বৃক্ষ ভয় পাইত না এবং তাহাদের খাদ্য বাছিয়া লইতে পারিত না। এ বিষয়ক আলোচনার বিস্তৃতি আমাদের উদ্দেশ্যের সমগ্রসীভূত নহে।

স্বভাবজ বুদ্ধি ও মন থাকার ফলে ইন্দ্রিয় কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন হয় এবং ফলে অন্য কাহারও সুবিধা ও অসুবিধার দিকে না তাকাইয়া নিজ পরিতৃপ্তির জন্যই ব্যাকুলতা আনাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়প্রবণ হইলে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির ব্যাকুলতা থাকে বটে। কিন্তু পরিতৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহের শক্তি থাকে না। বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধনই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপকরণ-সংগ্রহের শক্তি।

প্রকৃতিদেবী পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের শক্তি দেন নাই বলিয়া তাহাদিগকে প্রয়োজন হইলে কেবল মাত্র জলহাওয়া(atmosphere) হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিনাতিপাত করিবার শক্তি দিয়াছেন। মনুষ্যকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার শক্তি দেওয়ার ফলে আহার্য্য ব্যতীত দিনাতিপাত করিবার শক্তি মানুষের অপেক্ষা-কৃত কম। যাহাতে মানুষের ইন্দ্রিয় স্বাধীন না হইয়া বুদ্ধির অধীন অথচ সতেজ থাকে ইহাই মানুষের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রিয় মানুষের কর্ম্মের যন্ত্র। মানুষ কাজ করিবার সময় যদি একটু চিন্তা করে—কোন্‌টা করিব, কোন্‌টা করিব না, কেন করিব, কেন করিব না—তাহা হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রবণতা ও যথেচ্ছাচার কমিয়া যায়।

কিন্তু উপরোক্ত উপদেশ দেওয়া যত সহজ, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ আরম্ভ হইলে ঐ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। ভারতের ঋষিগণ সেই জন্য বাল্যাবধি বালককে পরের জন্য আহার্য্য সংগ্রহের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন। ইন্দ্রিয় উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বালকের বিবাহের ব্যবস্থা অথচ তাহার উপর উপদেশ—"কার্য্য কর, জিনিষকে ভাল করিয়া দেখ শুন, জিনিষ সুন্দর হইলে সুন্দর কেন তাহা চিন্তা কর, কুৎসিত হইলে তাহা কুৎসিত কেন তাহা চিন্তা কর, কিন্তু জিনিষের কায়িক ব্যবহারের তৃষ্ণা ত্যাগ কর। যদি তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে না পার, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিবার জন্য নিজের উপর অত্যাচার করিও না, অনুরক্ত হও, কায়িক ব্যবহার কর, কিন্তু মত্ত হইও না।"

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হইলে মানুষ সমস্ত দ্রব্যের দ্রব্যত্ব ও গুণের রূপ দেখিতে আরম্ভ করে এবং তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন মানুষের নজরে পড়ে কোন একটি জিনিষকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কতখানি বুঝিবার প্রয়োজন হয়, যতই সে বুঝিতে থাকে ততই বুঝিবার বাকী কতখানি তাহা অনুভব করে, সর্ব্বদাই তাহার বুদ্ধির অভাব অনুভূত হয়।

বুদ্ধির উৎকর্ষের সাধক জানেন যে তিনি জানেন না, পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁহাকে মত্ত করিতে পারে না, পণ্ডিত তিনি নিজেকে মনে করেন না। সর্ব্বদা তাঁহার ছাত্রত্ব বজায় থাকে। বুদ্ধির উৎকর্ষ-প্রয়াসী ইন্দ্রিয়প্রবণ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়প্রবণ হইয়া কোন সঙ্ঘের নেতৃত্ব করার কথা তাঁহার মনে জাগে না, ব্যক্তিত্বের (personality) প্রচারে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয়। তাঁহার সহকারীগণ তাঁহাকে পূজা এবং নেতা মনে করেন কিন্তু তিনি নিজে সহযোগীগণের পূজা গ্রহণ করিতে চাহেন না, নেতা-সম্বোধনে সঙ্কোচ অনুভব করেন, সর্ব্বদা সকলের সেবক ভাব গ্রহণ করেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ মিলিত হয় এবং আপন আপন বৈষম্য কমাইয়া ফেলে।

উপরোক্ত ভাবের তারতম্যই বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যের চিহ্ন।

পশু হইতে মানুষের তারতম্য কোথায় এই জ্ঞান লাভ হইলে মানুষের মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান এবং পালনের চেষ্টা আরম্ভ হয়।

মানুষের মানুষ্যোচিত কর্ত্তব্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

১। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য
   (ক) নিজের প্রতি কর্ত্তব্য
   (খ) ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য
২। মনুষ্য-সঙ্ঘের অংশীদারভাবে কর্ত্তব্য

আমরা এখানে মানুষ বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই ধরিয়া লইতেছি। পুরুষ এবং স্ত্রীর আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম, গুণ এবং কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় একটি অপরটির পূরক, একটি যে কার্য্য আরম্ভ করেন অপরটি তাহার শেষ করেন, সন্তান-জননের আরম্ভ পুরুষ হইতে, শেষ স্ত্রী হইতে ; সন্তান-পালনের আরম্ভ স্ত্রী হইতে, শেষ পুরুষ হইতে ; উপার্জ্জনের আরম্ভ পুরুষ হইতে, শেষ স্ত্রী হইতে। মানুষের জীবনধারণের জন্য যত কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার প্রত্যেক কর্ম্ম কতকাংশ পুরুষোচিত গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত এবং কতকাংশ স্ত্রীজনোচিত গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত। দুইজনের কর্ম্মশক্তি লইয়া একটি পূরা মানুষের কর্ম্মশক্তি হয়। দুইজন সমধর্ম্ম অথবা সমগুণ অথবা সমকর্ম্মশক্তি-বিশিষ্ট নহে। দুইজনকে সমান করিতে যাওয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মের অসমঞ্জসীভূত এবং তাহাতে জীবন-যাত্রায় বিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত। কাজেই মানুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমেই স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্য বিভক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। মনে রাখিতে হইবে এই বিভাগ শুধু কর্ম্ম করার রকমে। লক্ষ্য এক কর্ত্তব্য —দুইজনের দুই পৃথক রকমের কর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণতা। কাজেই কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিবার সময় স্ত্রী-পুরুষের জন্য দুই রকম কর্ত্তব্য পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রথম নিজের বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা এবং তাহার নিয়ম সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করিয়াছি। তাহা মানুষের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে অভ্যাস করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন হয়—

১। মানুষের অবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

২। কি কি গুণের বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রেণীবিভাগের বৈষম্য—তাহার জ্ঞান।

৩। সমস্ত শ্রেণীতে কি কি গুণের সমতা আছে—তাহার জ্ঞান।

৪। সমস্ত শ্রেণীতে যে সমস্ত গুণের সমতা আছে গার্হস্থ্য জীবনের প্রারম্ভে সেই সমস্ত গুণ অর্জ্জিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা।

৫। উপরোক্ত সমস্ত সমগুণ অর্জ্জিত না হইয়া থাকিলে তাহার অর্জ্জনের চেষ্টা।

৬। কায়িক পরিশ্রমী, সহকারী কর্ম্মচারী, কর্ম্মচারী এবং সংগঠনকারীর অবস্থার গুণবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

৭। এক অবস্থার বিশেষ গুণের পর আর এক অবস্থার বিশেষ গুণ—এইরূপে সমস্ত অবস্থার বিশেষ গুণগুলি অর্জ্জনের চেষ্টা অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমীর অবস্থা হইতে সংগঠন-কারীর অবস্থায় উন্নত হইবার কর্ম্মচেষ্টা।

উপরোক্ত সমস্ত কথাই নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয়।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক মানুষের আপন আপন ছেলে-মেয়েদের উপর কর্ত্তব্য আছে। ছেলেমেয়েদিগকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত করান বাপমায়ের দায়িত্ব। ছেলে-মেয়েদের বাল্যকালেই তাহার কিয়দংশ আরম্ভ করিবার জন্য বাপমা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। অপরাংশ সম্পূর্ণ হয় মানুষের সঙ্ঘ-পরিচালিত বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য আমরা "সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য" বিচার করিবার সময় আলোচনা করিব।

ছেলে-মেয়েকে সুস্থ ও সবল রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা যাহাতে "মানুষের বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান" "সমস্ত শ্রেণীতে যে সমস্ত গুণের সমতা আছে" তাহা অর্জ্জনের প্রবৃত্তি ছেলে-বয়সেই পায় তাহার চেষ্টা করা বাপমায়ের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মানুষের "মনুষ্যসঙ্ঘের অংশীদার ভাবে কর্ত্তব্যের" আলোচনা যথাস্থানে করিব। (ক্রমশঃ)

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীসত্যসুন্দর দাস

গতবারে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কবি-পরিচয়ের মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি ; সে আলোচনা ভূমিকামাত্র হইলেও তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের কবি-মানস ও তাঁহার কাব্যের দুয়েকটি লক্ষণ একটু বিস্তারিত ভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। এবারে আমি সেই কথাই আরও সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা করিব। গত শতাব্দীর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্থান এবং তাঁহার কবিকীর্ত্তির মূল্য কতটুকু তাহাই একটু বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই, এবং তাহার সময় আসিয়াছে বলিয়াই আমার এই প্রসঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথের কথা যখনই মনে হয়, তখনই বুঝি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় কত বিলম্ব হইতেছে—নব্য বা আধুনিক বাংলা কাব্যের সেই প্রভাতকালে যে অতিশয় অল্প কয়েকজন কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের খ্যাতি জনপ্রবাদ হইয়াই রহিল, সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার একটা অবিচারিত কিম্বদন্তীই কাহারও খ্যাতি কাহারও বা অখ্যাতির কারণ হইয়া আছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় অতি-আধুনিক রসপিপাসুগণ পূর্ব্বতন সাহিত্যের নামেই শিহরিয়া উঠেন—সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারা—ভাবের ক্রমানুবন্ধ বা ভাষার বনিয়াদ কোনটাকেই তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও আধুনিক কবি-যশলোলুপ, অক্লান্ত লেখনীচালক, সর্ব্বভাষা ও সর্ব্বসাহিত্যবিদ্ প্রথিতনামা সাহিত্যিক আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কবি সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কারণ কি? উত্তরে কিছু বলি নাই, বলিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। সুরেন্দ্রনাথ Goethe বা Schiller নহেন, Romain Rolland বা Bertrand Russel নহেন—তিনি অতিশয় দীন-হীন বাঙ্গালী কবিগণের অন্যতম ; যে যুগে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে যুগে বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভা নবসৃষ্টির উন্মাদনায় অধীর হইয়াছিল—নব্য বাংলা কাব্যের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর পুষ্টিসাধনে যাঁহারা কথঞ্চিৎ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তিনি একজন, অথচ তাঁহাকে আমরা আজিও তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি—শুধু ঐতিহাসিক মূল্যই নয়, তাঁহার রচনা-গুলিতে একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, বাংলা কাব্যের একটা বিশেষ প্রবৃত্তি তাহাতে পরিস্ফুট হইয়া আছে—তাহা এমনই যে, এখনও তাহা কেবল বাংলা কাব্যের একটা অতীত অধ্যায়রূপে নয়, কবি-ভাবের একটি বিচিত্র অভিব্যক্তিরূপে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ঠিক সেই ধরণের ভাবুকতা আর কোথায়ও নাই—ভাবে ও ভাষায় তাঁহার যে স্বকীয়তা আছে তাহা তাঁহার সমসাময়িকগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—তিনি যেন ঠিক সেই যুগের নহেন অথচ সেই যুগেরই—তিনি মাইকেল ও বিহারীলাল অপেক্ষাও প্রাচীন আবার রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল বা দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও আধুনিক ; তিনি যেন বর্ত্তমানের বৃন্তকে আশ্রয় করিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎকে ধরিয়া আছেন—Classical ও Romantic, দেশী ও বিদেশী, ভাব ও চিন্তা, তত্ত্ব ও তথ্য সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব তাঁহার চিত্তকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রসকল্পনাকে স্তম্ভিত করিয়াছে—দুই বিরোধী শক্তির সাম্য-প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন তাঁহার ভাবুকতা প্রবল হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই তাঁহার রচনায় রসসৃষ্টির আবেগ প্রশমিত হইয়াছে—অতি গভীর ও উৎকৃষ্ট ভাবরাশি চিন্তার আকারে জমাট হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক এই কারণেই তাঁহার রচনার একটি স্বকীয়তা আছে—ভাবকে তত্ত্বরূপে বাঁধিতে গিয়াও তিনি যে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আজিকার এই ছন্দসর্ব্বস্ব ফেনোচ্ছ্বাসময় কাব্যবিলাসের দিনে ভাবগ্রাহী ও গম্ভীরবেদী পাঠকের মনোহরণ করে। সুরেন্দ্রনাথের মত কবির কাব্যানুশীলন, তাঁহার সহিত পরিচয়-সাধন এ যুগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; যে শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছ্বাস, কাব্যরসের যে শূন্যবাদ, তত্ত্বলেশহীন তথ্য বা অর্থলেশহীন কল্পনা—আজিকার কাব্যে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সুরেন্দ্র-নাথের কবি-মানস ও তাঁহার কাব্যরীতি বুঝিয়া দেখিলে লাভ আছে। তাছাড়া এরূপ আলোচনার অর্থাৎ পূর্ব্বতন কবিদের সম্বন্ধে সংবাদ রাখার আরও প্রয়োজন এই যে, সমসাময়িক সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে (আমার সেই প্রশ্নকর্ত্তা অতি-আধুনিক সাহিত্যরথীর মত সে বিষয়ে অতি-

রিক্ত গর্ব্ববোধের জন্যই) অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ, একের উপর অপরের প্রভাবের কথা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা লেখেন কেবল তাঁহারাই নহেন, যাঁহারা সমসাময়িক সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করেন, তাঁহাদেরও এই **historical sense** থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে বর্ত্তমানেরও যথার্থ বিচার হয় না।

সুরেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী যতটুকু পাইয়াছি—তাহা হইতে আমি তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাসটুকু সঙ্কলন করিব এবং তাহা হইতেই তাঁহার শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতির কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-সংস্কার বা কবি-প্রবৃত্তি বুঝিবার পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি প্রথমেই কয়েকটি তথ্য সঙ্কলন করিব।

১২৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে যশোহর জিলার জগন্নাথপুরে তাঁহার জন্ম হয়। জন্ম-পল্লীতেই তাঁহার শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ফার্সি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে মুগ্ধবোধসূত্র এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি নীতিগ্রন্থ অভ্যাস করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম হইতেই লোকচিত্ত-চর্চ্চা ও বিষয়-বুদ্ধির অনুশীলন করিতে হয়।

একাদশ বর্ষে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউশন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও পরে হেয়ার স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ শিক্ষালাভে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না, গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চার দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন।" প্রথম হইতেই ভাবালুতা অপেক্ষা বিষয়-জ্ঞানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসর মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্যবিধ সংস্কার লাভ করিবে।"

১২৬৬ সালে তিনি প্রথম অপস্মার রোগাক্রান্ত হন—এ রোগ হইতে তিনি কখনও মুক্ত হন নাই। ঐ বৎসরেই, অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রথম প্রকাশ্য সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। "মঙ্গল উষা" নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়া, তাহাতে কবি পোপের **Temple of Fame** কবিতার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এই সময়ে "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র কোনও এক সংখ্যায় তাঁহার 'প্রতিভা'-বিষয়ক গদ্য-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখকের নাম নাই। ইহারই সমকালে 'বিশ্বরহস্য' নামে একটি প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য বিষয়ক সন্দর্ভ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৪ সংবতে নূতন বাংলা যন্ত্রে উহা মুদ্রিত হয়। কিন্তু উহাতেও প্রণেতার নাম নাই।

বিষয়-বুদ্ধি বা লোক-চরিত্র-চর্চ্চার আরও উন্মেষ হয় তাঁহার জীবিকা-কর্ম্মে। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল, এ জন্য যৌবনে সঙ্গীত-চর্চ্চার আগ্রহে তিনি কিছুকাল এমন স্থানে যাতায়াত করিতেন যাহাকে সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গভূমি বলা যাইতে পারে, এবং সঙ্গদোষ হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই। যে মৌলবী সাহেব এই সঙ্গীত-চর্চ্চায় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন "তিনি দিল্লীর সম্রাটমান্য সৈয়দ বংশীয়—অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সুপণ্ডিত। আরব্য পারস্য উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি, এবং ইংরাজিও কিছু কিছু জানা ছিল। দর্শন ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল, কিন্তু ঘোর নিরীশ্বরবাদী।" সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে (অথবা তাঁহার কবিপ্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল—জীবনের এই বিষমন্থন-কালে) তাঁহার বন্ধুকে লিখিত পত্রাবলী হইতে কবির কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে।

"দেশহিতৈষিতা, ন্যায়পরতা ও করুণা—পরস্পরকে পরস্পরের অভাবেও অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পানানুরাগ, কামমত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষগুলির পরস্পর কি প্রণয়! একের অবস্থানকালে একে একে প্রায় সকলগুলিই সমবেত হয়।...তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্য স্বভাবদোষ আমার ছিল না; কিন্তু সেই একদোষের প্রভাবে ক্রমে সমুদয় দোষের আধার হইয়া এখন প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাবকে নিহত করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর সেরূপ নাই—আপনি আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিয়াছি।"

* * *

"আমি দুর্ব্বল দরিদ্রকে ঘৃণা করি, সবল ধনীকে ভয় করি; যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি।"

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই ঘূর্ণীপাক ঘটিয়াছিল ২৩।২৪ বৎসর বয়সে—সেই বয়সের সেই অবস্থায় তাঁহার এই সকল উক্তি পাঠ করিলে, তাঁহার চিত্তবৃত্তির প্রখরতা ও চিন্তাশীলতা প্রতিভাশালী ব্যক্তির উপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। দৈবীশক্তির অধিকারী যে পুরুষ তাহার বয়সের মাপ সাধারণের মত নয়; এ চরিত্র কবির, এবং এই রূপ অভিজ্ঞতা কবির জীবনেই ঘটে—সে পুরুষ মাটি মাখিয়াই আরও শক্তিমান হইয়া উঠে।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল—পরে ২৭ বৎসর পূর্ণ হইবার কালে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং ইহার পরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কঠোর আত্ম-সংযম কখনও শিথিল হয় নাই। ইহারই ফলে তাঁহার কাব্যকল্পনায় সহজ রস রসিকতার পরিবর্ত্তে অতি কঠিন তত্ত্বপ্রীতি ও নৈতিক উৎসাহ প্রবল হইয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার মনঃপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—কবিপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ তত্ত্বান্বেষী হইয়া উঠিলেন তাঁহার নিজের ভাষায়—"বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন আমি আর সেরূপ নাই। আপনি আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিয়াছি।" এই সময়েরই একখানি পত্রে তাঁহার বন্ধুকে কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও বুঝিতে পারি—প্রথম যৌবনেই অর্থাৎ তাঁহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষের মুখেই তাঁহার সারা চিত্ত মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর সাহিত্য-সাধনায় তিনি যে আদর্শ অবলম্বন করিলেন তাহাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি অপেক্ষা তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহার স্বভাবে যাহা ছিল তাহা মোচড় খাইয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তাই সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে কবি যেন সর্ব্বদা আত্মদমন করিয়া আছে, ভাবকল্পনার অপূর্ব্ব চমক সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিকেই প্রকট হইতে দেখি। কিন্তু সে কথা পরে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তের * লেখক বলিতেছেন—"তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথের) চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রেম যেন মল্ল-যুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল।"

ইহার পর কিছুকাল তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই অনুবাদ—মহাভারতের "কিরাতার্জ্জুনীয়", পোপের "ইলোসা ও আবেলার্ড", গোল্ড্‌স্মিথের "ট্রাবেলার", ও মূরের "আইরিশ মেলডিস্"এর অধিকাংশ ছন্দে গ্রথিত হইয়াছিল।

১২৭৪ হইতে দ্বিতীয়বার অপস্মার রোগের পর সুরেন্দ্রনাথ যাহা রচনা করেন তাহার কয়েকটি এই—গ্রের এলিজীর অনুবাদ, নবোন্নতি (আখ্যায়িকা), 'মাদক মঙ্গল' (কবিতা) 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুলরা' নামে দুইটি গাথা, 'ব্রাভো অব ভিনিসে'র (Bravo of Venice) অনুবাদ। এ সকল ব্যতীত তিনি একটি অতি দুরূহ অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করেন, প্লেটোর Immortality-র অনুবাদ নিজকৃত ব্যাখ্যা ও অবতরণিকা সমেত। এই পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপি পরে নষ্ট হইয়া যায়। বহু আয়াস সহকারে, দীর্ঘকাল গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। "ইহাতে সক্রেটিসের জীবনীও ছিল, এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভূত-বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাস, নব্য-বৃদ্ধ দার্শনিক সত্য এবং প্রাচীন গ্রীক-ভারতের আচারগত সাদৃশ্য প্রভৃতি সাবধানে আলোচিত হয়।" এই রচনা নষ্ট হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার আজন্মের যত্নসঞ্চিত আর আর লেখা নষ্ট হইয়া যদি এই একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিত, এত দুঃখিত হইতাম না।" এবম্বিধ পরিশ্রমসাধ্য জ্ঞান-গবেষণা, এবং কাব্যরচনা অপেক্ষাও তৎপ্রতি কবির এই আসক্তি সুরেন্দ্রনাথের কবিজীবন ও কবিস্বভাবের বিপরীত পরিণতির প্রমাণ দিতেছে। অথচ এই কালেই তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ১২৮৮ সালের 'নলিনী' পত্রিকায় 'সন্ধ্যার প্রদীপ', 'চিন্তা' 'খদ্যোতিকা' 'ঊষা' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্পষ্টই দেখিতে পাই, শক্তি থাকিতেও সুরেন্দ্রনাথ নিছক কবিকল্পনার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে আর রাজী নহেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই সুরেন্দ্রনাথের কবিমানস প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছিল। ক্রমে, তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা পরম তত্ত্বের আশ্রয় গড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রকৃতিগত কবিধর্ম্মই জয়ী হইয়াছিল। তাঁহার জীবনীলেখক বলিতেছেন, "জগৎকারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ-পরিজ্ঞান পক্ষে তিনি সহজাত সংস্কারকেই অভ্রান্ত মনে করিতেন।" তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন—"কবি আদৌ শঙ্করভাষ্যযুক্ত বেদান্তসূত্র দেখিয়া

* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত সুরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হইতে যান, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। তিনি শীঘ্র ঐ মতের অপূর্ণতা বুঝিয়া দেশীয় ধর্ম্মের দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা অবলম্বন করেন। এই উদ্যমে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল।"

১২৭৮ সালে, পুনরায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কবি কিছুকাল মুঙ্গেরে বাস করেন। সেই খানেই তিনি তাঁহার মহিলা-কাব্য রচনা করেন। ১২৮০ সালে তিনি কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থান অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। পাঁচখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও অনুবাদকের নাম গোপন ছিল। অতঃপর কোনও বন্ধু-অভিনেতার অনুরোধে তিনি 'হামির' নাটক রচনা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ সারস্বত কর্ম্ম বলিয়া মনে হয়; যদিও পূর্ব্বারব্ধ রাজস্থানের অনুবাদ তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আবার করিতে সুরু করেন। এই গ্রন্থের অনুবাদ অসমাপ্ত রাখিয়া ১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ প্রাতে তিনি বিসূচিকা রোগে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ইহাই সুরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস; এবং মনে হয়, তাঁহার কবি-মানস ও সাহিত্য-সাধনার মূল মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সুরেন্দ্র কখনও হৃষ্টপুষ্ট সবল ছিলেন না, তাঁহার দুরারোগ্য অপস্মার ব্যাধিও ছিল। এ সকল সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে সাহিত্য-সাধনায় একাগ্রতা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন—তাঁহার আয়ুষ্কালের সহিত তাঁহার রচনার পরিমাণ করিলে তাঁহাকে অতি-শ্রমী বলিতে হয়।

আমার মনে হয়, তাঁহার রচনার পরিমাণ অল্প না হইলেও অধ্যয়ন-অনুশীলন আরও অধিক ছিল। রচনাও অল্প নহে, কারণ, ইহাই প্রতীতি হয় যে, প্রকাশিত কাব্য, কবিতা ও নিবন্ধ ব্যতীত অপ্রকাশিত এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত রচনাও বিস্তর ছিল। এককালে যাহাও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সমুদয় সংগৃহীত হয় নাই, বহু খণ্ড কবিতা লুপ্ত হইয়াছে, বহু গদ্যরচনাও আর পাওয়া যায় না। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই সুরেন্দ্রনাথের দুর্ব্বল দেহ আরও দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাঁহার অকালমৃত্যুর কতকটা কারণ ইহাই।

সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার আর একটি লক্ষণ আজিকার দিনে আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। সে লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। তিনি যাহা রচনা করিতেন তাহা যেন প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। ইহার জন্যই অনেক রচনা নষ্ট হইয়াছে। যাহা প্রকাশিত হইত তাহাতেও নাম দিতে চাহিতেন না। প্লেটোর Immortality-র সটীক অনুবাদ এই জন্য কীটদষ্ট হইয়াছিল; এই জন্যই মহিলা-কাব্য তাঁহার মৃত্যুর পরে অর্থাৎ রচনার প্রায় দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। "জনৈক আত্মীয় চুরি করিয়া তাঁহার 'সবিতা-সুদর্শন' ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া মুদ্রাঙ্কণে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন।" 'বর্ষবর্ত্তন' কাব্যখানি কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়—উহাতে লেখকের নাম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের এই আচরণের অন্য যে কারণই থাকুক—তিনি যে কবি-যশের জন্য লালায়িত ছিলেন না, নিজ সন্তোষ, ও বিশেষ করিয়া আত্মানুশীলনের জন্যই, কাব্য রচনা করিতেন ইহাও সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা পড়ি নাই, তাহার যেটুকু সংবাদ মাত্র পাওয়া যায় তাহাতেই তাঁহার মনস্বিতা ও মৌলিক চিন্তার প্রমাণ আছে। 'প্রতিভা'-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি—এ ধরণের রচনা অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও স্বকীয় ভাবগ্রাহিতার পরিচায়ক। 'শাসন-প্রথা' অথবা 'ভারতের ব্রিটিশ শাসন' প্রভৃতি রচনার বিষয় হইতেই বুঝা যায় সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা কেমন সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত অথবা তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ সেকালের পক্ষে যথেষ্ট আধুনিক ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় লোকব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান বা বাস্তব তথ্যের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ছিল—মনে হয়, এই বাস্তব-প্রীতি কবিস্বভাবকে অতিরিক্ত নীতি-নিষ্ঠার পক্ষপাতী করিয়াছিল। তিনি বহির্জগতে যে নিয়ম-শাসন প্রত্যক্ষ করিতেন মানুষের স্বভাবেও তাঁহার অখণ্ড প্রভাব স্বীকার করিতেন। অদৃষ্ট বা দৈবশাসনকেও তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন না। এই বিশ্বাস যেমন একদিকে তাহার কবি-শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, তেমনই অপরদিকে ইহারই প্রেরণায় তিনি এক ধরণের দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র অতি সবল

সহজ ভাবগভীর উক্তি মানব-চরিত্র ও মানব-ভাগ্য সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট দিব্য-বচনরাশি ছড়াইয়া আছে।

সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চ্চা এবং তাঁহার চরিত্র ও চিত্ত-বৃত্তির যেটুকু পরিচয় এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম, তাহা হইতে তাঁহার কাব্য-প্রকৃতির ধারণাও—কাব্যপাঠের পূর্ব্বেই কতকটা জন্মিবে বলিয়া আশা করি। সুরেন্দ্রনাথের কবি-চিত্তের পরিচয় তাঁহার কবিতাগুলির আলোচনাকালে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আলোচনাকালে আমি বিশেষ করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভা ও কাব্য-রীতির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব, তৎপূর্ব্বে কবির এই চরিত-কথা জানা থাকিলে, পাঠক কাব্যের মধ্যে কবিমানুষটিকে চিনিতে পারিয়া আরও আশ্বস্ত হইতে পারিবেন। সুরেন্দ্রনাথ সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী—সহজাত শক্তির বলে তিনি এই শিক্ষাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁহার ভাব-প্রবণ চিত্তে যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা সমসাময়িক অন্য কবি-মনীষীর মানসেও ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে সেকালের অনেকেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন—কবি-যশও লাভ করিয়াছিলেন। এই বিদেশী বিদ্যার প্রভাবে জ্ঞান-গবেষণার প্রবৃত্তি যেমন জাগিয়াছিল তেমনই কল্পনার প্রসারও ঘটিয়াছিল; ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী আবার স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছিল, কল্পনায় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বমহিমা আস্বাদন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে যুগের পক্ষে জ্ঞান-গবেষণার প্রবৃত্তিই আরও স্বাভাবিক; এত তথ্য ও তত্ত্ব যখন চারিদিক হইতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল তখন বাস্তব সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার আবশ্যকতা গুরুতর হইয়া উঠিবারই কথা। তাছাড়া, তখন বাংলা সাহিত্যে গদ্য-সৃষ্টির যুগ—গদ্যচ্ছন্দের অভিনব ঝঙ্কার তখন বড়ই লোভনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গীতিসর্ব্বস্ব ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী তথ্য ও কল্পনা, গদ্য ও পদ্যের দোটানায় পড়িয়া তখন হাবুডুবু খাইতেছে; গদ্য পদ্য হইয়া উঠা এবং পদ্য গদ্য হইয়া উঠা অথবা সাহিত্যিক প্রতিভার উভচর বৃত্তি তখন অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজও খাঁটি গদ্য লিখিতে পারেন না—আমাদের সাহিত্যে 'Our indispensable Eighteenth Century' এখনও আসিল না। সুরেন্দ্রনাথের রচনায় সে যুগের সেই প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় পরিস্ফুট; ভাবুকতা ও ভাবালুতা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তিনি ক্রমশঃ ভাবুকতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তি, যুগপ্রভাবের বশে কল্পনাকে তত্ত্বসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ফলে আমরা বাংলাসাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথের মারফতে ইংরেজী গদ্যের না হউক, কবিতার Eighteenth Century—Gray, Pope Goldsmith-এর কাব্যরীতির সাক্ষাৎ পাই। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-কল্পনাও যুক্তিপন্থী—তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ভুলিতে চাহেন না—সেই বাস্তব লক্ষ্য ভেদ করিয়াই সত্যের সন্ধান পান, তাহাতেই তিনি মুগ্ধ ও চমৎকৃত—অন্য রসের আস্বাদনে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। এই তথ্য ও তত্ত্বের অরণ্যের মধ্যেই তিনি একটি সুসমঞ্জস সুশৃঙ্খল জগতের আভাস পাইয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার কবিত্ব। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনা তাঁহাকে এ বিষয়ে যতই সাহায্য করুক না কেন, তাঁহার একটি নিজস্ব স্বাধীন পন্থা ছিল—তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের সহায় ছিল স্বতন্ত্র ভাবসাধনা; এই জন্যই তিনি তত্ত্ব বা নীতিকথা বলিতে গিয়াও উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞান-গবেষণাকে ভাব-কল্পনার উপরে স্থান দিলেও, তিনি কবি-প্রতিভাকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের মূলাধার বলিয়া জানিতেন। কাব্যচর্চ্চাও এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ—উহাও এক প্রকার অধ্যাত্ম সাধনা, উহার দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধি নয়, জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনিও ধ্যান করিতেন—চক্ষু মুদিয়া নয়—চক্ষু খুলিয়া; কাব্য সৃষ্টিগ্রন্থের টীকা, উহাই বাস্তব জীবনযাত্রার উৎকৃষ্ট পাথেয়, উহা চিত্তরঞ্জিনী কল্পনারই একাধিকার নহে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুলি লিখিয়াছেন। কাব্যের এই নীতির বিচার পরে করিব। তৎপূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে তাঁহার কবি-শক্তি ও রচনাভঙ্গীর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়সাধন আবশ্যক। আমি অতঃপর তাহারই চেষ্টা করিব। এবারকার আলোচনায় আমি সেই পরিচয় কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া দিয়াছি, পাঠককে প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম; সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের দোষ ও গুণ—আমরা তাহাতে কি পাইব এবং কি পাইব না, সুরেন্দ্রনাথের কবি-জীবন ও সাহিত্য-সাধনার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে, আশা করি কাহারও ভুল থাকিবে না।

অন্তঃপুর

—শ্রীমাণিক গুপ্ত

নারী ও রাষ্ট্র

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম,

> পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া দেখি, মোটামুটি ভাবে তাহা পুরুষের ইতিহাস। রাজ-রাজড়ার যুদ্ধ, এদেশ কর্ত্তৃক ওদেশ আক্রমণ, এবং এ জাতির নিকট সে জাতির পরাজয়—ইহাই পৃথিবীর প্রচলিত ইতিহাস। এখানে-ওখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দুই একটি রাণী কি কোনও সম্রাটের সুন্দরী উপপত্নী, বড় জোর জোয়ান অব আর্ক কি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত কয়েকটি নারী, পুরুষের রচিত এই ইতিহাসে সামান্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইউরোপের ইতিহাস হইতে দেখিতে চেষ্টা করিব, প্রত্যেক যুগেই সম্রাট কি রাজার সুন্দরী এই সব উপপত্নীরা দেশের রাষ্ট্রকে মাঝে মাঝে কি ভাবে 'হস্তামলকবৎ' তাহার গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে চালনা করিয়াছে। এমন নহে যে, এই সকল ঘটনা যে-রাজ্যে ঘটিয়াছে তাহা নগণ্য কিংবা তাহার অধিপতি নির্ব্বোধ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের বিচক্ষণ কূটনীতিবিদরাও এই সকল নারীদের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষ-রচিত পৃথিবীর এই ইতিহাসে অবজ্ঞাত নারী কর্ত্তৃক প্রকৃতি এমনই করিয়া তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছে—এই ইতিহাসে ঐ সকল নারী কর্ত্তৃক পুরুষের প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে চোরা-বালির প্রক্ষেপ দিয়া আসিয়াছে। পুরুষ যে মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রবল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, পর মুহূর্ত্তে সে আপাদমস্তক এই চোরা-বালিতে নিমজ্জিত হইয়াছে।

মানুষের এই ইতিহাস অত্যন্ত মজার। ইহা অবশ্য পঙ্কের ইতিহাস, এবং নারীর পক্ষে ইহা গৌরব-জনক নহে। কিন্তু ইহার সকল কলঙ্ক পুরুষের। মুখ্যতঃ এ ইতিহাস উপপত্নীদের। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী পুরুষের প্রবৃত্তি। নারী সে-প্রবৃত্তিকে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা এই সকল নারীর যে পরিচয় পাই, তাহা চাতুর্য্যে দীপ্ত, বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে উজ্জ্বল। সে-পরিচয়ের পশ্চাতে যদি পুরুষ ও তাহার প্রবৃত্তি না থাকিত, তবে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের কলঙ্ক না হইয়া গৌরব হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ফলে নারীকে কলঙ্কের পসরা বহন করিতে হইয়াছে। পুরুষ এই সকল কাহিনীর মূলে না থাকিলে, কূটনীতির ইতিহাসে এই সকল নারীর নাম হয় তো চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

রাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখি, পুরুষ সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়াছে নারীকে রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে। সে-চেষ্টা অবশ্য সর্ব্বদা সার্থক হয় নাই। যদিও বা হইয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক ভাবে দেখা দিয়াছে। পুরুষের এই চেষ্টার মূলে একটি ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাই। সে ধরিয়া লইয়াছে যে, নারী তাহার ভালবাসার বস্তু, ভোগের সামগ্রী, খেলার পুতুল-মাত্র; সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা মর্য্যাদাজনক ছিল কি না, তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। কেননা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই। আমরা ইতিহাস হইতে যে-কাহিনী পাই, এখানে তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমত, গ্রীস দেশ। গ্রীকদের 'woman's sphere', নারীর কর্ত্তব্যসম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি ছিল; এত দূর পর্য্যন্ত নারীকে আসিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার পর নয়—গ্রীকদের মনোবৃত্তিতে এমন একটা ভাব সুপরিস্ফুট ছিল। তাহাদের গৃহে সাধ্বী নারীর জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। নারীর অঞ্চল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকার বিষয়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মত গ্রীকদেরও ঘৃণা ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানেও অন্তঃপুরের গণ্ডী ছিল। এই গণ্ডী-চিহ্নের বাহিরেও কিন্তু নারীর প্রয়োজন হইত। এবং সেই প্রয়োজনের জন্যই নারী সর্ব্বনাশের হেতু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতকে গ্রীসের ইতিহাসে হিটেরাদের (hetairai) প্রাধান্য হইতে ইহাই অনুমিত হয়। যদি নারীকে গ্রীসে অন্তঃপুরের সামগ্রী বলিয়া না ধরা হইত, তবে হিটেরাদের উত্থানের

কোন কারণ ছিল না। হিটেরারা ঠিক সাধারণ বারবনিতা না হইলেও উচ্চশ্রেণীর ঐ জাতীয় জীব ব্যতীত তাহারা আর কিছুই নয়। হিটেরা শব্দের অর্থ সঙ্গিনী। অন্তঃপুরের যে সঙ্গিনী বাহিরে সে সঙ্গিনী নয়—এই সামাজিক ধারণার জন্যই অসামাজিক হিটেরাগণের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই অসামাজিক হিটেরাগণই শেষ অবধি একপ্রকার গ্রীক-রাষ্ট্রের নায়ক হইয়া উঠে। সমাজে ইহাদের যে-স্থানই ধার্য্য থাক প্রকৃত পক্ষে ইহারা তখন কেবল যে রাষ্ট্রের প্রবলতম শক্তি তাহা নয়,—বুদ্ধিবিদ্যাতেও অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি প্লেটোর শিষ্যদের মধ্যেও ইহাদের একজনকে দেখি—লাস্‌থেনিয়া (Lastheneia)। প্রবলপরাক্রান্ত গ্রীকনৃপতি পেরিক্লিসের উপর তখনকার সুন্দরী-প্রধানা হিটেরা আস্‌পেসিয়ার এমন প্রভাব ছিল যে, অনেক ঐতিহাসিক বলেন, সামস ও পেলপন্নেসিয়ান যুদ্ধের জন্য সেই দায়ী। কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। কেননা সামসের যে-যুদ্ধ, তাহা পেরিক্লিস মিলেটুসের স্বপক্ষে লড়িয়াছিলেন। মিলেটুস আস্‌পেসিয়ার স্বদেশ। এই যুদ্ধে আস্‌পেসিয়া সর্ব্বসময়ে পেরিক্লিসের পার্শ্বে ছিলেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। মার্ক আণ্টনির ইতিহাস তো সর্ব্বজনবিদিত। এবং সে কাহিনী লইয়া যতবড় কাব্য কিংবা নাটকই রচিত হউক না, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাহা মাত্র ছলনাময়ী নারী দ্বারা প্রেমিক পুরুষের জয় নহে, নারী-বুদ্ধির নিকট পুরুষের বুদ্ধির নতি-স্বীকারও বটে।

অতঃপর রোমের ইতিহাস।

রোমক আইনের মূল কথা নারীকে পুরুষের অধীনে থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে সম্রাট অগাষ্টাসের সময় স্ত্রীলোকের অমিতব্যয়িতার জন্য আইন করিতে হয় (Oppian law : 195 B C); সম্রাট টাইবেরিয়ুসের সময়, রোমে সম্ভ্রান্তবংশীয়াদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ নিরোধের জন্য বিশেষ আইন-রচনাও উল্লেখযোগ্য।

ক্লডিয়ুসের সময় ইহার চরম হয়। তখন মেসালিনা (Messalina) রোমরাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা। রোমের ইতিহাসে মেসালিনার অভ্যুদয় প্রলয়াত্মক। সে রাষ্ট্রকে লইয়া যাহা খুসী তাহাই করিয়াছে। অর্থবিনিময়ে নাগরিকত্ব দান করিয়াছে, ইহার জন্য সেনেটের অনুমতি প্রয়োজন হয় নাই। সৈন্য-দলকে যথা ইচ্ছা নির্দ্দেশ দিয়াছে, ইহার জন্য ক্লডিয়ুসকে সামান্য জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নাই এবং ইহা ছাড়াও যে সব কাণ্ড করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় রোমের মত প্রবল সাধারণ-তন্ত্রের সকল পুরুষের বুদ্ধি একটি মাত্র স্ত্রীলোকের ইচ্ছার তুলনায় কিছুই নহে।

নীরোর সময়ে অ্যাক্‌টি (Acte) এবং পপিয়ার (Poppaea) কথাও মনে রাখিতে হইবে।

এই রোমেরই ইতিহাসে আবার নারীত্বের প্রশান্ত সূর্য্যোদয় দেখি, কর্ণেলিয়া (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) ও প্ল্যাসিডিয়ার (৫ম খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

মধ্য-যুগের ইউরোপের ইতিহাসে নারী সম্পর্কে কড়াকড়ির অন্ত নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীদের রাষ্ট্রজীবন বোধ করি ইহারই অন্যতম ফল।

কিন্তু একদিকে যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রয়োদশ লুইয়ের কীর্ত্তিকলাপে ইউরোপের ইতিহাস কলঙ্কিত, অপর দিকে এই সময় হইতেই বর্ত্তমান জগতের নারী-প্রগতির সূচনা। সম্ভবতঃ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে নারী-প্রগতিমূলক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। অবশ্য এযুগে লিখিত এই সম্পর্কে সকল পুস্তক ও পত্রিকাতেই একটু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। প্রথম বিতর্কের কলরব এগুলিতে সুস্পষ্ট। একজন লেখিকা (Jacquette Guillaume) বলিতেছেন —'Women are superior to men in everything and the most marvellous works of the world have all been done by women"—অর্থাৎ নারীরা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সকল মহৎ কাজ নারীই করিয়াছে। এবং তাহার পর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সে যুগে হাস্যের উদ্রেক করিলেও বিংশ শতাব্দীতে সে কথা আশ্চর্য্যভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তিনি পুরুষদের আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—'Come, come, little pygmies! Come to behold Cain killing his brother Able" অর্থাৎ—হে পুরুষজাতীয় মানবক, তোমাদের শ্রেষ্ঠ কাজ তো ভ্রাতৃহত্যা!

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র ইহা প্রমাণ করিয়াছে।

ফ্রান্সে যে সকল নারী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে * আনাতোল ফ্রাস, হ্যাভলক এলিস ও জেম্‌স জয়েস্‌ ইত্যাদিকে দেখিতে

ম্যাডাম ডি স্কুডিরি (Madame de Scudery)।

পাই, সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে ইহাদের উৎপত্তি। এই সকল আড্ডার স্থান (salon) বিষয়ে ফরাসী সাহিত্যে অনেক রচনা পাওয়া যায়। মলেয়ারের ব্যঙ্গ হইতেও ইহারা নিষ্কৃতি পায় নাই। আধুনিক নারী-প্রগতির মূল উৎস হিসাবে ইহারা চিরকাল ইতিহাসে থাকিবে। উপরের প্রতিকৃতি এইরূপ মজলিসের জনৈক কর্ত্রীর।

এই সময়ের নারী-আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ : নারী কর্ত্তৃক পুরুষের প্রতি যেমন, মাতৃত্বের প্রতিও তেমনই অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পা। সকল দেশেই প্রথম প্রথম নারী-আন্দোলনে এই রকম দুই একটি অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ক্রমে ইহা দৃষ্টিবহির্ভূত হয়। আধুনিক নারী-আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তাহা সচেতন নারীত্বের জাগরণ। রোমে ও গ্রীসে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে যে নারীশক্তির পরিচয় দেখিলাম তাহা অচেতন নারীশক্তি। এই অচেতন নারীশক্তির প্রবলতম প্রকাশ দেখা যায় ফরাসী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইয়ের বিলাস-ভবনে এবং ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বে। যে সকল নারী এই দুই সম্রাটের উপপত্নী হিসাবে পৃথিবীর এই সময়ের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে, তাহারা সকলেই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ছিল না। তাহাদের দুই একজনের মধ্যে স্বাভাবিক নারীধর্ম্মের যাহা কিছু অভিব্যক্তি, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ম্যাডাম ডি মেণ্টেনন (Madame de Maintenon)। যতদূর মনে হয়, মেণ্টেনন চতুর্দ্দশ লুইয়ের কোন ক্ষতি স্বেচ্ছায় করে নাই। কিংবা লুইসি ডি লা ভ্যালিয়েরিকেও (Lousie de La Vallieri) ভালই বলিতে হয়। লুইসি ১৬৬১ হইতে ১৬৬৮, এই সাত বৎসর চতুর্দ্দশ লুইয়ের উপপত্নী ছিল। এই সময়ে রাজা স্বেচ্ছায় ইহার জন্য যে ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অবশ্য প্রচুর। কিন্তু লুইসি লুইকে শোষণ করে নাই।

কিন্তু এই দুই রাজার উপপত্নীদের মধ্যে এমন দুই এক জনকে দেখা যায়, যাহাদের সম্পর্কে (নীতির দিক হইতে

ম্যাডাম ডি মেণ্টিনন (Madame de Maintenon)।

বিচার না করিলে) বলা যায়, ইহাদের যে-কাহারও এক-দশমাংশ প্রতিভা লইয়া যদি তদানীন্তন ফ্রান্স কি ইংলণ্ডের

* দ্রষ্টব্য : নারীর প্রতিভা (বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ, ১৩৪০—৯৯ পৃষ্ঠা)।

নৃপতি জন্মাইতেন—এ দুই দেশের সে সময়কার ইতিহাস অন্য প্রকার হইত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ম্যাডাম ক্যারওয়েলের কথা বলা যাইতে পারে। ইনি দ্বিতীয় চার্লসের জনৈকা উপপত্নী। ইংলণ্ডের রাজ-দরবারে ফ্রান্সের গুপ্তচর হিসাবে চতুর্দ্দশ লুই কর্তৃক ইনি প্রেরিত হন। যে পোনের বৎসর কাল তাঁহার ইংলণ্ডে কাটে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিকে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-পরিচালনায় অসীম প্রভাব, অপর দিকে নিয়মিত ইংলণ্ডে ফ্রান্সের সংবাদ বহন—এই দুই বিরুদ্ধ কাজেই সমান দক্ষতা। ওদিকে ব্যক্তিগত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিও স্থির আছে।

এই সকল উপপত্নীদের এক এক জনের আয়ের পরিমাণ শুনিলে অবাক হইতে হইবে। রাষ্ট্রের কোন কাজ ইহাদের বিনা সাহায্যে হইবার জো ছিল না।

ম্যাডাম ক্যারওয়েল ফ্রান্স হইতে দুইটি নিদ্দেশ লইয়া আসেন। এক, ওলন্দাজদের সহিত ইংলণ্ডের শত্রুতা ঘটাইতে হইবে, দুই, চার্লসকে ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই দুই নির্দ্দেশই তিনি পালন করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের প্রত্যেকের কাহিনী আলোচনা করিলে কেবল এই কথাই ভাবিতে ইচ্ছা করে যে, রাষ্ট্রব্যাপারে এই সকল নারীর অবিকৃত প্রতিভার সাহায্য পাওয়া গেলে, তদানীন্তন ফ্রান্স কি ইংলণ্ডের ইতিহাস কি রূপ গ্রহণ করিত।

নারী-সম্মেলন

নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখার দ্বিতীয় এবং শেষ দিনের অধিবেশন গত ২৮শে, ২৯শে কার্ত্তিক ১৩৪নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে করাচীতে যে নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে প্রস্তাব পাঠাইবার জন্য এই সভায় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যথারীতি বিনা মন্তব্যে প্রস্তাবগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। জনশিক্ষা :—এই সম্মেলন এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, ভারতের উন্নতির পক্ষে অবিলম্বে নিরক্ষরতা দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। এইজন্য সম্মেলন ইহার সদস্যাদিগকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছেন। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নূতন শাসনতন্ত্রে বর্ণপরিচয় – ভোটাধিকার লাভে যোগ্যতার অন্যতম নিরিখ হইতে পারে।

ম্যাডাম ডি পম্পাডুর (Madame de Pompadour)—পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী।

২। শারদা আইন : আইনের বিধান সমূহ গুরুতরভাবে ভঙ্গ করা হইতেছে। এইজন্য এই সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে উহা এরূপভাবে সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, যাহাতে বাল্যবিবাহ অসম্ভব হইতে পারে। এই সম্মেলন শারদা আইনকে রহিত করিবার অথবা তাহার বিধি-বিধান এড়াইবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার বিরোধিতা করিতেছেন। এই সম্মেলন ইহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলন কর্তৃক নবগঠিত নিখিল-ভারত শারদা-এ্যাক্ট-কমিটির কার্য্যে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

৩। গ্রাম-সংগঠন :- ভারতের গ্রাম সমূহের সাধারণ অবস্থা, বিশেষভাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধানের শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এই সম্মেলন অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন এবং গ্রাম-সংগঠনের কার্য্যকর কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য ইহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে তৎপরতা অবলম্বনের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

৪। নারী-হরণ :—অহরহ যে ভাবে দেশের সর্ব্বত্র নারী-হরণ চলিতেছে, তাহা দেশের পক্ষে নিদারুণ লজ্জার বিষয়। এজন্য এই

প্রবর্দ্ধমান পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে এই সম্মেলন নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনকে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছেন।

সম্মেলনের মত এই যে, যতদিন না এই শ্রেণীর দুর্বৃত্তদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়, ততদিন এই পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে না।

৫। ছাত্রী নিবাস :—এই সম্মেলন শুনিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন যে, কলিকাতার ছাত্রীদের হোষ্টেল সমূহের পরিচালনা-ভার যথাযোগ্য কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য কতকগুলি সুবিবেচিত কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং ছাত্রীদিগের অভিভাবকদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, ছাত্রছাত্রীদিগের সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এই পরীক্ষার যুগে বিদ্যার্থী-জীবন যথাযথ ভাবে পরিচালনার জন্য ঐরূপ হোষ্টেলের আবশ্যকতার গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহারা যেন এই কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং কলেজসমূহকে সাহায্য করেন।

সমস্ত অনুমোদিত ছাত্রী-হোষ্টেলের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সুযোগ্যা মহিলা এবং একটি কমিটি যতশীঘ্র সম্ভব নিযুক্ত করা হউক, এই সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অনুরোধ জানাইতেছেন।

৬। নারী-শ্রমিকদের স্বার্থ :—নারী-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করিতেছেন,—(ক) একটি নিখিল-ভারত প্রসূতিকল্যাণ বিধি প্রণয়ন, (খ) খনির এবং কারখানার শ্রমিকদের শিশুসন্তানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠা (গ) কারখানার সন্নিকটে মদের ভাঁটী রাখিবার যে ব্যবস্থা বিহারে আছে, তাহা রহিত করা (ঘ) শ্রমিকদের জন্য পায়খানার ব্যবস্থা (ঙ) শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হউক এবং (চ) ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বেই খনির ভিতর নারী-শ্রমিকদের কাজ করিবার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হউক।

৭। দেশীয় শিল্প :—যেহেতু নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের অর্থের অভাব এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ব্যতীত সম্মেলন হইতে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং যেহেতু নিখিল-ভারত পল্লী-শিল্প-সঙ্ঘ প্রভৃতি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ঐ সমস্যা সমাধানে ব্রতী রহিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মেলনের মতে নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের যে দেশীয় শিল্প-বিভাগ আছে তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং যে সব বিষয়ের সহিত নারীদের বিশেষভাবে স্বার্থসংশ্রব রহিয়াছে, সেই দিকেই নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা কর্ত্তব্য।

৮। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা :—জাতির কল্যাণ এবং উন্নতির সহিত স্বাস্থ্যের অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। সেজন্য নারী-সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, বালিকা বিদ্যালয় সমূহে মেয়েদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হউক।

৯। নারীদিগের আইনগত অনধিকার :—যে সব আইনগত অনধিকারের জন্য ভারতীয় নারীদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সেগুলি রহিত করিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর দাবী বর্দ্ধিত হইতেছে। আইনের দিক হইতে এই সম্বন্ধে এত বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যমূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত হওয়া উচিত এবং কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার পূর্ব্বে আইনের বিধানগুলি সম্বন্ধে সমগ্রভাবে পুনর্ব্বিবেচনা করা আবশ্যক। এজন্য এই নারী-সম্মেলন নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের বিগত অধিবেশনে গৃহীত এই সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে। প্রস্তাবটি এই :— "এই সম্মেলন নারীদের উত্তরাধিকার, বিবাহ, শিশুদের অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে আইনগত অনধিকার অবিলম্বে কি ভাবে রহিত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি নিখিল ভারত কমিশন নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে এবং জানাইতেছে যে, ঐ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বে-সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকা উচিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে নারী থাকা আবশ্যক।

১০। ফিল্ম ও ফিল্ম-বিজ্ঞাপনের সেন্সর :—বর্ত্তমান সিনেমেটোগ্রাফ আইনে ফিল্ম-পোষ্টার পরীক্ষা করিবার কোন বিধান নাই। সেইরূপ বিধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে চেষ্টা হইতেছে। নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলন কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হউক। ভারতবর্ষে প্রদর্শনযোগ্য শুধু বড় ফিল্মই নহে, বড় ফিল্মের সঙ্গে যে সমস্ত ছোট ছোট ফিল্ম দেখান হয়, সেগুলিরও কঠোরতর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

সাগরিকা

—শ্রীসুশীলকুমার দে

গিরিনদী সিন্ধুর পরপারে কোন্ দূর শীতের কুয়াসা ঢাকা গগনে
নিভৃতে কবে না জানি আশার আসনখানি পেতেছিলে প্রতীক্ষা-লগনে :
সেথায় কি চেরীফুল ঘেরি' তোমা' অনাকুল বাতাসে বিলায় মৃদু গন্ধ ?
সাগর কি পদতলে মর্ম্মরি শত ছলে মর্ম্মের গানে দেয় ছন্দ ?

পরশ-হরষ বহি' মেঘের দেশের দূর সেই সুর-সুরভিটি ছানিয়া
বাতাস বারতা তার দেহহীন দূতসম দেয়নি ত দেহে মনে আনিয়া ;
হিমজল সাগরের পারে কোথা জাগরের জাগে স্নেহ-সুনিবিড় স্বর্গ,
জানিনি ত নিরাশায়—কে রচিছে নিরালায় নিঃশ্বসি' কি অজানা অর্ঘ্য।

হেথা আমি ভ্রমে হারা ভ্রমি, তবু কোনদিন লওনি ত মোরে তুমি ডাকিয়া
প্রভাতের ক্ষুণ্ণতা, প্রদোষের শূন্যতা, রাত্রির রিক্ততা ঢাকিয়া ;
যাহা ছিল খেলাঘরে হারাইনু হেলাভরে, অবশেষে অবসাদ-খিন্ন
সর্ব্বহারার ছিল গর্ব্বের উপহাস, জর্জ্জর জীবনের চিহ্ন।

যাহা ছিল বন্ধন ভ্রান্তির ইন্ধন-সম সব পুড়ে গেল পলকে,
ছিল শুধু আশাহীন ব্যর্থ দুখের দিন সুখের ছলনাময় ঝলকে ;
চিনি-না তোমারে কভু, তোমারি লাগিয়া তবু হ'নু আমি দূর দেশ-যাত্রী
নিয়তির স্রোতে ভাসি' ভাগ্যের ভিক্ষুক,—সম্মুখে শ্রাবণের রাত্রি !

বহেনি দখিন হ'তে মধুমলয়ের বায় যেদিন ভাসিল মোর তরণী ;
অলক্ষ্য তব আঁখি ডাকে অগোচরে থাকি ? দেখিনি, আঁধার ছিল ধরণী ;
চারিদিকে বেড়ি' শুধু ছিল যবনিকা কালো, নাহি আলো—রশ্মির রন্ধ্র,
আঁধার-মগন ছিল গগনের ধ্রুবতারা ছিল বারিধারা মেঘমন্দ্র।

সপ্তসাগর ছিল দু'জনার মাঝখানে, পাইনি ত কোনোদিন আভাসে
অনাগত দিবসের অপরূপ রূপরাগ আঁধারের পরপারে যা ভাসে
চেয়ে আছি— চেয়ে আছি আশাহীন উদাসীন, সম্মুখে সীমাহারা সিন্ধু,
বুকে ঘোরে হাহাকার, দগ্ধ নয়নে আর নাহি তাপহরা জলবিন্দু।

কে রাখিবে কে ডাকিবে ফিরিবার তরে আর, গেছে সব বাধা-দ্বিধা ছিঁড়িয়া,
দেওয়া-নেওয়া সব শেষ, ভাঙাচোরা ভাবনার মাঝে আর কে আসিবে ফিরিয়া ?
পিছনে রয়েছে থাক সুদূর তীরের রেখা, নিবিড় তিমিরে হয়ে ছিন্ন ;
নাহি ক্ষুধা, নাহি খেদ, প্রাণে যেন পড়ে ছেদ আলোক-আঁধারে অবিভিন্ন।

নাহি ভাবপন্থীর ভাবনার গ্রন্থির বন্ধন ক্রন্দন-বিলাসে,—
সংসার-পাথারের সংশয়-সাঁতারের গুরুভার কণ্ঠের শিলা সে।
বেদনা-ঘূর্ণিপাকে চেতনা চূর্ণি থাকে, আপন আঁধারে নিজে মগ্ন
নিঃস্বের মিছে কেন বিশ্বের তরে ব্যথা,—হোক্ জীবনের তরী ভগ্ন।

রৌদ্র-দীপ্ত নীল আকাশ গিয়েছে যাক্!—ঝরা ফুলে ফুল ফোটা ভুলাবে?
শ্বাস বায়ু অবিরল, গরজে জলধি-জল, তাহারি দোলায় আজ দুলাবে।
অকূলে বা কূলে লাগে—কিবা তাতে আসে যায়? হোক্ ক্ষণিকের লীলারঙ্গ,
জীর্ণ জীবন-ফুল বিলুলিত করে দিক্ ঊর্ম্মির উদ্দাম ভঙ্গ!

জানা হতে অজানায় ভেসে চলি কোন্ টানে, মন নাহি জানে কোথা যাবে সে,
ছিল ভবিতব্যতা লয়ে ভাষাহীন ব্যথা অবিদিত আঁধারের আবেশে;
না থাকে না থাক্ আশা, স্রোতে ভাসা তরণীটি না পারুক্ বন্দরে ভিড়্‌তে,
তখন জানি না, ভেসে পৌঁছিব অবশেষে সাগরতীরের পূত তীর্থে।

প্রভাতের ফুলে তবু পশেছিল পিপীলিকা অকালে তাহারে জর্জ্জরিয়া,
হাতের মুঠিতে সোনা ধূলা হল, অনুরাগ অপরাগে গেল কবে ঝরিয়া;
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব, জ্ঞানমান-বুদ্ধির সদ্ভাব শুদ্ধির প্রান্ত,
উড়াইনু উপহাসে অবিবেকী সাহসের রভসের রসে উদ্‌ভ্রান্ত।

কেহ করে না ত ক্ষমা, আমিও ক্ষমিব কেন? দয়া নাই দয়াহীন স্বজনে;
অতীতের ছায়া ধরি, কেন মায়া তরে মরি, বেদনারে বাখানিয়া বিজনে?
ভুলিবার নহে কভু, ভুলিব সকলি তবু প্রমোদের প্রাঙ্গনে নিত্য
আশ্বাসহীন দুখে বিশ্বাসহীন সুখে পাথরে গড়িব মোর চিত্ত।

বিষে হবে প্রতিহত বিষবল্লীর ক্ষত,—হে রমণী, তোর মত হাসিয়া
র'ব আমি,—মুখে কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা, বঞ্চনা র'বে যেন ভাসিয়া:
শরতের লঘুমেঘ, লক্ষ্যহারার বেগ, সুনীল ছায়ার তলে শূন্য,
সারাদিন উত্তাপ, ধারাহীন অভিশাপ, উজ্জ্বল হাসি অক্ষুণ্ণ।

চক্ষের লগ্নতা, বক্ষের নগ্নতা সামালিতে নারে যেথা নাগরী,
মত্ততা মদিরার, অধীরার আশ্লেষ ভরে যেথা রসে দেহ-গাগরী,
সেথা শুধু খল্‌খল্ হাস্যের কোলাহল ঢেকে দেবে মিথ্যা ও সত্য,
প্রাণ নয়, প্রেম নয়, কাব্যের কথা নয়,—কে পেয়েছে তরুণীর তত্ত্ব?

জীবনের প্রয়োজন নিষ্ফল কতবার, এবারের আয়োজন কি আছে?
মধুমাস-পরিহাস রক্তশোভায় ভরি' শিমুলে বিক্ত করি গিয়াছে;
সঙ্কোচ-শঙ্কার কোনো বাধা নাহি যার, সব পেয়ে যে হয়েছে নিঃস্ব,
জাগিছে সে নিরলস সৃষ্টির অপযশ বিদ্রূপ-দৃষ্টির দৃশ্য।

তোমারেও হেলাভরে ডাকিনু খেলার তরে, মুখপানে চেয়ে শুধু হাসিলে,
তুমিও তাদের মত আপনি আমার ঘরে ক্ষণিকের খেলা তরে আসিলে ;
আশ্লেষ-চতুরার বিশ্লেষ-আতুরার বাঁধিলে ব্যাকুল বাহুবন্ধ,
অনাবৃত বক্ষের কান্তিটি, চক্ষের শান্তিটি রহে নিস্পন্দ।

শুচির রুচির পথ তেয়াগিয়া তবু আমি চলিব, কাহারো পানে চা'ব না ;
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা আমিও করিব খেলা,—থাক্ মায়া থাক্ মোহ ভাবনা ;
পথের পঙ্ক মাঝে তোমারে আনিব টানি, বুকে হানি' অকরুণ হাস্য,
ব্যথা দিয়ে কোনো ব্যথা সেধে আর নাহি ল'ব, করিব না দুঃখের দাস্য।

দলিনু পায়ের তলে তোমার সে পথ-চাওয়া আতিথ্য-আশাটিরে হেলাতে,
তোমার ব্যথার দান করি তার অপমান অজ্ঞান-নিষ্ঠুর খেলাতে,
নিরুপায় প্রাণটিরে ধূলায় লুটায়ে ছিঁড়ে ছিল শুধু হত্যার হর্ষ,—
মাগিছে মনের ক্ষোভ মনোজের বলি আজ, মনোহীন মদে দুর্দ্ধর্ষ।

জড়িত মেঘের মাঝে তড়িত-বেগের ওঠে শোভার শিহর শুধু কাঁপিয়া,
স্ফুরদর্চ্চির শিখা তব রূপলিখা, তারে কলুষ-কালিমা ঢাকে ব্যাপিয়া ;
ওগো কেন প্রশ্রয়ে আশ্রয় দিলে ভুলে, ডুবিলে অতলে তার সঙ্গে,
এ ত নহে পারাবার, শুধু পঙ্কের ভার মাখিলে আদরে সারা অঙ্গে।

দিলে তবু হাসিমুখে নিঃশেষ অধিকার, স্থির-ধীর বিশ্বাস নড়ে না,
যত মোর অনাচার অনায়াসে সহ সব, নিরাশার নিঃশ্বাস পড়ে না।
বিস্ময় জাগে মনে—রূঢ়তা মূঢ়তা মোর করিতে পারে না তোমা' খর্ব্ব ;
দেহে মনে নগ্নতা ভয় তুমি কর না তা,—ভেঙে দিলে সব মোর গর্ব্ব।

চাঁদ ছাড়া কেবা আর কলঙ্ক পারে তার স্বচ্ছ শীতল বুকে ধরিতে ?
বীণা ছাড়া কোথা আর সুরের নিবিড় মীড়,—নারী ছাড়া কেবা পারে মরিতে ?
থমকি থামিয়া যায় উদ্ধত উল্লাস, উদ্যত ধ্বংসের হস্ত ;
রৌদ্র-রক্ত দিন পুড়িয়া পোড়ায়ে শেষে সন্ধ্যার তটে যায় অস্ত।

ধরাবুকে গূঢ় তাপ, রূঢ় পাথরের চাপ কেমনে রাখিবে তারে দলিয়া ?
অটলেও টলাবে সে, পাথরেও গলাবে সে, প্রাণের উৎস উচ্ছলিয়া।
ওগো সাগরিকা, শুনি হিমসাগরের শুধু বরফের বিদারণ-শব্দ ;
কোথা তল, কোথা তীর, তপস্যা সুনিবিড় সঞ্চিত আছে কোথা স্তব্ধ।

অসীম ক্ষমায় তুমি ক্ষম' মোর ক্ষুদ্রতা, রুদ্রতা ঢাক' মৃদু হাসিতে,
তব নিঃশ্বাস আনে নব বিশ্বাস প্রাণে—রমণীও পারে ভালবাসিতে।
নীচের প্রাচের যেন শঙ্কিত আলোরেখা পশে কবে পেয়ে কোন ছিদ্র,
সহসা সুপ্রকাশ, চেয়ে রয় ছেয়ে রয়, দেহ-মন করি' উন্নিদ্র।

কেমনে ভুলাও তারে ভুলিতে যে নাহি পারে, জল আন নির্জ্জল আঁখিতে ?
কিসে দুঃসাহসীর নিশ্চিত মরণের পথ হতে পার তারে ডাকিতে ?
মানবের লোকালয়ে গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল, মন্থিয়া হৃদয়ের সিন্ধু,
উঠিল গরলভার, তুমি দিলে উপহার আপনার দুখসুধাবিন্দু।

দিনে দিনে পরিচয়, তিলে তিলে করি' জয় সবি মোর নিলে নিজ দখলে,
মিলনের মহিমাটি বিশ্বজনের জানা না হোক্, ফিরাক মুখ সকলে !
আমার মর্ম্মমরু, তুমি তারি মরীচিকা, এস আজ এস মোর বক্ষে,
গহন দহনরসে রসিত ছায়ার ছবি হেরিব তোমার মায়া-চক্ষে।

আজো মনে আছে সেই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মর-মুখরিত কাননে
পাইন-তরুর দূর গন্ধটি ভেসে আসে, হিমবায়ু লাগে তব আননে ;
দীর্ঘ সাঁঝের আলো চোখে লেগেছিল ভালো, রাত্রিটি কুয়াসায় সিক্ত ;
তুষারে আবৃত পথ ধবধবে গৃহচূড়া প্রান্তর-তরু শীতরিক্ত।

সোনার বরণ চুল, তুষার-বিশদ দেহ, সাগরের রঙ চোখে উছলে,
দাড়িম-বীজের বিভা ছোট্ট ঠোঁট্‌টি ভরে, কপোলে আপেল-আভা উজলে ;
তবু যৌবন-লোল নাহি হাস্যের রোল, কামহীন কামনার সৃষ্টি ;
বক্ষশিলায় মোর লক্ষ লীলায় তোর ঝরে ঝির্‌ঝির্ স্নেহ-বৃষ্টি।

লুটিয়া পড়নি কভু, লুটায়ে দিয়েছ তবু মৌন-মধুর তব ব্যথাটি ;
আগে থেকে বোঝ তুমি মনের যা' অভিলাষ, জানাতে হয় না কোনো কথাটি ;
বিদুষী চতুরা নহ, রঙ্গ-মধুরা নহ, দৃষ্টিটি নহে বিষ দিগ্ধ ;
অলস ক্ষণের শুধু নহে বিলাসের মধু, নারীর প্রাণটি ছিল স্নিগ্ধ।

নহে দয়া, নহে দাবী, দরদ আনিলে শুধু প্রীতির প্রসাদে মোরে ক্ষমিয়া,
ঘুচে গেল ভুল যাহা স্থূল যাহা ছিল রুধি' প্রাণের স্রোতের মুখে জমিয়া।
মূর্চ্ছিল তব কূলে জীবন-শঙ্খ মোর, মাখা ছিল বালি আর পঙ্ক,
তারে তুফানের শেষে তুলে নিল ভালবেসে তোমার ও কর অকলঙ্ক।

তখনো তাহার বুকে সাগরের ঘনরোল বাজিছে নিভৃতে বুঝি গুমরি'
চিক্কণ দেহে তার আঁকাবাঁকা রেখা রাখে সাগর-ঢেউএর স্মৃতি স্মরি',
নাড়া পেয়ে সাড়া দিল মর্ম্মের মর্ম্মর, এতদিন ছিল যাহা লুপ্ত ;
বিশদ অধরে তার অধরের ফুৎকার জাগাল যে-সুর ছিল সুপ্ত।

মনে আছে একদিন পীড়ার পীড়নে যবে ছিনু আমি অচেতন পড়িয়া,
তব কঙ্কণহীন দু'টি কর সেবালীন ছিল শুধু স্নেহ-রসে ভরিয়া ;
প্রহরে প্রহরে ভয়, বুঝিলে মৃত্যুসনে প্রাণপণে, নিশ্চল মূর্ত্তি,
কতরাত কতদিন নয়ন নিদ্রাহীন, মুখে নাহি বাক্যের স্ফূর্ত্তি।

সংজ্ঞাবিহীন আমি স্বপ্নে হেরিনু যেন—গীতিহারা গোধূলির শিহরে
দু'টি নয়নের ছায়া রচে স্নেহ ঘন মায়া, জাগ্রত কায়া রহে শিয়রে,
গুন্ঠিত নহে সীঁথি, কুন্ঠিত রহে প্রীতি, ব্যথায় নিবিড় মৃদু বাক্য ;
জ্ঞান যবে ফিরে এল—ক্লিষ্ট কান্তি তব দিল সেই স্বপ্নের সাক্ষ্য।

স্বজন স্বদেশ কোথা, স্বজনের চেয়ে তুমি ছিলে আপনার জন বিদেশে ;
ললাটে সিঁদুর নাহি, চিত্ত বিধুর তবু মোর লাগি' নিয়তির নিদেশে
সাগরের জলে ধোয়া খণ্ড রৌদ্র যেন, অশ্রুতে ধরি' হাসি দৃপ্ত,
শিশুসম অসহায় আমারে আদরে ঘেরি' করিলে চুমার তলে তৃপ্ত।

দুর্লভে লোভী আমি লভিলাম দুর্লভে এতদিন এতপথে ঘুরিয়া ;
শুধু তুমি আর আমি, আজ ঘটনার ঘটা নাহি ছোট পটভূমি জুড়িয়া ;
পথে চলি যতদিন কত জন আসে যায়—পার হয়ে সমুদ্র সপ্ত,
পথ শেষ হল যেথা, সেথা তুমি আন একা পরশটি বক্ষের তপ্ত।

আঁধার-গৃহের তলে শীতের আগুন জ্বলে, কথাহারা নির্জ্জনে বসিয়া
দেখেছি দু'জনে দূর বেলা-বালুকায় জলে ঝিকিমিকি ফেনরাশি খসিয়া ;
দিবসে দেখেছি—পড়ে মৃদু রৌদ্রটি আসি' ভূর্জ্জবনানী-তরু-পর্ণে,
পদতলে ঝলমলে ক্ষুদ্র ঘাসের ফুলে তুহিনের কণা ক্ষীণ বর্ণে।

তারপর কতদেশে ফিরিলে আমার সাথে, উদাসীর মন দিলে ভুলায়ে ;
আলো দিয়ে জ্বাল' আলো সবদিয়ে বাস' ভাল, বিস্মরণীর রাগ বুলায়ে ;
তোমার তড়িৎভরা পরশ তরুণকরা হরে নিল সব ক্ষোভ শ্রান্তি,—
তবু মিলনের কায়া ঘেরি' বিরহের ছায়া সুখে রচে দুঃখের ভ্রান্তি।

সমুখে জলধিজল, বালুকার তীরে আর সাধের সে-ঘর বাঁধা হল না ;
যে-নিয়তি এতদিন ঘুরায়েছে পথে-পথে সে বুঝি আবার করে ছলনা ;
শ্রান্ত নয়নে মোর মুছেছিল জলরেখা, সে নয়ন হল জল-অন্ধ ;
হতভাগ্যের ভালে কখনো সহে না সুখ, বুঝি তার সব দ্বার বন্ধ।

জানি আমি জানি তব কল্যাণবুদ্ধিটি জোর করে দিল মোরে ফিরায়ে,
আপনি ডুবালে তুমি আপন শরণ-তরী এত করি কূলে তারে ভিড়ায়ে ;
প্রাণগলা স্পন্দনে হাসিভরা ক্রন্দনে প্রত্যহ-বন্ধনে যুক্ত
করি', তবু পথে মোর দাঁড়ালে না বাধা সম, করে দিলে চিরতরে মুক্ত।

গ্রহণ করিয়া ঋণী করেছিলে মোরে, আজ তেয়াগিয়া ঋণ মোর বাড়ালে ;
সব দাবী-দাওয়া ছেড়ে প্রসন্ন প্রীতিটির আলোকে মুক্ত হয়ে দাঁড়ালে ;
ধন্য করিয়া তবু কর মোরে অপরাধী—করিলে যাহারে সুখলুব্ধ
তারে আজ ছেড়ে দিলে প্রতিদান-অক্ষম অশরণ দুখমাঝে ক্ষুব্ধ।

সিন্ধুপারের পাখী চলে যায় দূরদেশে মলিন আলোয় পাখা মেলিয়া,
সে কেমনে যাবে চলে যার আর ঠাঁই নাই, নিরাময় নীড়খানি ফেলিয়া ;
পথিকের ক্ষণিকের সম্বল ছিল যাহা হল তাহা চিরতরে ভ্রষ্ট,
সহসা পথের মাঝে চেতনা লুটায়ে পড়ে হয়ে বেদনার বিষদষ্ট।

যাহা ছিল বাঞ্ছিত করি' তারে লাঞ্ছিত সুখটিরে দুখে দিলে বিলায়ে ;
বিভাসের গান হল পূরবীর তানে শেষ, বিরহে মিলন গেল মিলায়ে।
আবারসাগর জলে ভাসিল তরণী মোর, এবারেও একা, নাহি সঙ্গী ;
বুকে ঘোরে হাহাকার, মনে পড়ে বার-বার তোমার সে বিদায়ের ভঙ্গী।

নাহি ছিল বিদায়ের সব শেষ কথা-বলা, সবশেষ চেয়ে-দেখা খসিয়া,
কোথা অশ্রুর ধারা আর্ত্তিটি অসহায় কাতরে অধরে পড়ে খসিয়া ;
অর্থবিহীন শুধু দু'চারি তুচ্ছ কথা, মুখে টানি' হাসিখানি মিষ্ট,—
সবহারা প্রহরের মগ্ন মরমে আর কিছু নাহি ছিল অবশিষ্ট।

জানি না কোথায় ওগো ওপারে কোথায় তুমি রয়েছ, হেথায় আমি এপারে ;
দৃষ্টি চিরন্তনী সৃষ্টির স্থির মণি মুছিতে মরম হতে কে পারে ?
রূপভার উপহার যা' দিলে রয়েছে আজো ভরি' স্মরণের সুধাপাত্র,
মনের অতল তলে বিরহের শতদলে হাসিখানি জাগে অহোরাত্র।

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের অমর আলো, বেঁচে আছ আজো মোর জীবনে।
সে পরম-পাওয়া আজো মরমে মিশিয়া আছে চিন্তার তন্তুর সীবনে ;
আজো ভাবনার স্রোতে এপারের প্রণতিটি ওপারে মূর্চ্ছি' হয় চূর্ণ,
একটি নারীর লাগি' আজো মোর সব গান নারীর মহিমা-গানে পূর্ণ।

আজ অনুভব করচি নূতন যুগের আরম্ভ হয়েচে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেচে বৃহত্তের দিকে মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য, সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই, যে, সকলের যোগে সে বড় হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা ; এই হোল মানুষের ধর্ম্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে-সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেচে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েচে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেচে, অবজ্ঞা করেচে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কুলের ছেলে

—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শিল্প-প্রদর্শনী খুলিতে আর বিলম্ব নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে অধ্যাপক এন. রায়কে কতকগুলি ছবি ও মাটির পুতুল পাঠাইয়া অনুরোধ করা হইয়াছে, তিনি যেন উহারই মধ্যে কতকগুলি বাছিয়া প্রদর্শনীর জন্য নির্ব্বাচন করিয়া দেন। কয়েকখানি পত্র এবং লোকের তাগাদা চলিতেছে; অধ্যাপক কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় প্রদর্শনী খুলিবা মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে অধ্যাপকের নিকট হইতে যে পত্রখানি আসিল—তেমন পত্রের প্রত্যাশা কেহই করেন নই।

—ক্ষমা করিবেন। ছবি ও ক্লে-মডেলিং বাছাই করিবার যে গুরুভার আপনারা আমায় দিয়াছিলেন—সে-ভার বহন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই ভার দিবেন। আপনাদের প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি। ইতি—

*　　　•　　　*

যে ঘটনা সংসারে অহরহ ঘটিতেছে—সাড়ম্বর ভূমিকা দিয়া তাহাতে রং ফলাইবার প্রয়োজন মিথ্যা। তথাপি নির্ম্মলের বর্ত্তমান জীবন-তরু যে ভূমিকার ভূমিতে শাখাপল্লব মেলিয়াছে সেটুকু বাদ দিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, সুতরাং ক্লান্তিকর ভূমিকার পুনরাবৃত্তি না করিয়া উপায় নাই।

শহর-ঘেঁষা গ্রাম, নামটা অপ্রকাশিত থাকুক। শহর ও পল্লীর সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই বর্ত্তমান। গোটা তিনেক হাই-স্কুল আছে—তারই একটাতে নির্ম্মল পড়ে। পড়ে বটে, মন পড়িয়া থাকে স্কুল-সীমার বাহিরে। বাহিরে—ছেলেরা কোলাহল জমাইয়া চু-কপাটি খেলে, ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের ভিড় জমে, অথবা মোড়ের পানের দোকানের রোয়াকে নানা দেশ, নানা জাতি ও ভবিষ্যৎ জীবনকে লইয়া গল্প জমে, সেখানে নহে,—নদী যাইবার পথে বন-জঙ্গলে ঘেরা কুমোর-পাড়াতে ঘূর্ণামান চক্রের মাথায় হাত দিয়া যেখানে নিপুণ কারিকর হাঁড়ি গড়িতে থাকে, সেইখানে। মাটির দাওয়া—উপরে খড়ের চাল; দাওয়ার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গহ্বর এবং গহ্বরের মধ্যে সেই চক্রযন্ত্র। যন্ত্রের মাথায় কাদা চাপাইয়া কুম্ভকার পা দিয়া ঘোরায় চাকা, আর হাতের টিপে হাঁড়ি, গেলাস, খুরি কেমন অনায়াসে ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসে। হাতের টিপে কুমোর যে পুতুল গড়ে, তাহাও চাহিয়া দেখিবার মত।

পাঠ্য পুস্তকের বাঁধা-ধরা বুলি নিত্য বলিয়া যাওয়াতে ত একটুও আনন্দ নাই; অথচ এই সব ক্ষুদ্র জিনিষকে যতই আগ্রহ ও যত্ন দিয়া সম্পূর্ণ ও সুন্দর করিতে পারা যায়, মনের আনন্দ ততই কূল ছাপাইতে থাকে।

পুতুল তৈয়ারীর আকর্ষণ নির্ম্মলের এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, স্কুলে আসিবার সময় এক তাল কাদা কচুপাতায় মুড়িয়া পকেটের মধ্যে করিয়া আনিতে সে ভুলিত না।

সেদিন পণ্ডিত মহাশয় তন্ময় হইয়া ধাতুরূপ দিয়া ছাত্র তৈয়ারী করিতেছেন, এবং নির্ম্মলের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে পণ্ডিত মহাশয়েরই শ্মশ্রুসমাকুল রুক্ষ মুখ। পড়াইবার আলস্যে পণ্ডিতের ঢুলু ঢুলু দুটি চোখ এবং কদম-ছাঁট চুলের কর্কশত্ব, মায় টিকি সমেত। ক্রমে ক্রমে সেই মুখে ফুটিয়া উঠিল বার্দ্ধক্যচিহ্নিত কয়েকটি বলিরেখা, বিরক্তিতে তীক্ষ্ণ, ক্লান্তিতে অবসন্ন এবং বয়োধর্ম্মে শিথিল।

ধাতুরূপের ধাতু বদলাইয়া গেল, মূর্ত্তি দেখিয়া পাশের ছেলেরা হাসিতে লাগিল।

হাসি সংক্রামক ব্যাধি।

পণ্ডিতের টেবিল পর্য্যন্ত সেই শব্দ পৌঁছিয়া তাঁহার তন্দ্রা টুটাইয়া দিল এবং কর্কশ কণ্ঠে তিনি হাঁকিলেন, হাসি কিসের? এত হাসি কিসের?

শাসনে হাসি কমে না, বাড়িয়াই উঠে, এবং ইঙ্গিত অনুসরণে পণ্ডিতের দৃষ্টি গিয়া পড়িল নির্ম্মলের মুখের উপর। সে মুখে যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—পণ্ডিত তাহার অন্য অর্থ করিয়া বেতগাছি তুলিয়া লইলেন এবং সামনে আসিয়া নির্ম্মলের গঠিত মূর্ত্তি একদৃষ্টে অল্পক্ষণের জন্য দেখিয়াই ক্রোধে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুখের তন্দ্রাতুর ভাব, রেখা, এমন কি টিকিটির নিরীহ বিন্যাস প্রভৃতি বদলাইয়া গেল। তারপর তরুণ শিল্পীর উপর বাক্য ও বেতের যে বর্ষণ আরম্ভ হইল—তাহার তুলনা শ্রাবণধারার সঙ্গেই দেওয়া চলে।

কিন্তু শাসনের শেষ এই খানেই নহে।

পরিবার বৃহৎ না হইলেও শাসকের অভাব ছিল না। বাপের চেয়ে কাকার রাশ ছিল ভারি; তিনি শাসন অস্ত্রে কুমোর-পাড়ায় বসাইলেন প্রহরী। 'অঙ্কুরে বিনাশ না করিলে বিশাল মহীরুহ'......ইত্যাদি প্রবচনগুলি তাঁর মুখস্থ। কি সকাল, কি দুপুর, কিবা বৈকাল দুধারের ঘন আসশ্যাওড়ার বুক চিরিয়া বিসর্পিত পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেই নির্ম্মলের অভিসন্ধি উঁহারা বুঝিয়া লন। ঐ পথ আমবাগানের মধ্য দিয়া, কড়াই-ক্ষেত পাশে রাখিয়া, সোজা চলিয়া গিয়াছে সজিনাগাছ ভরা কুমোরদের আঙ্গিনায়। শ্যাকরা-ডোবার মাটি খুব আঁটাল, হাঁড়ি, গেলাস, পুতুল প্রভৃতি ত উহাতে ভাল তৈয়ারী হয়ই, গৃহস্থের উনানের প্রয়োজনেও সে মাটির চাহিদা আছে। আগে সে মাটি নির্ম্মলই আনিয়া দিত বাড়ির প্রয়োজনে, এখন কড়া হুকুম জারি হইয়াছে, ও মাটি ত নহেই—দো-আঁশলা বেলে মাটিও সে স্পর্শ করিতে পারিবে না। স্কুলের ছেলে পড়িতেছে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, ময়লা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার উহার প্রয়োজন কি? স্কুলের ছেলের পাঁচ দিকে মন লাগাইয়া পড়া মাটি করা কোন মতেই উচিত নহে। স্কুলের ছেলে—উপরের রঙীন আকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না, নদীকিনারে বসিয়া পৃথিবীর প্রসার দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিবে না, সুতায় টানা ঘুড়ির মত থাকিবে সংযত। সে সুতা পাঠ্য পুস্তক এবং জগতের ওই একটিমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে মন স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে। স্কুলের ছেলে—মন্দ হইলে নিজেরই অকল্যাণ; অভিভাবকদের শাসন, বেত কল্যাণীয়দের সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া। যে দিন-কাল, চাকুরী আর জুটিবে কিনা,—তবু কয়েকটা পাশ দেওয়া থাকিলে......ইত্যাদি।

শাসনে নির্ম্মলের নেশা কাটিল কিনা কে জানে, কাহাকেও সে কোন কথা বলিল না। চটি খাতাখানি খুলিয়া তাহারই মাঝখানে সে যত্ন করিয়া লিখিল:

মানুষের প্রয়োজনে ধরণীর নহে আয়োজন,
চাতক কাঁদিয়া মরে, মেঘ তারে করিছে শাসন।

কি অদ্ভুত মোহ এ দুটি লাইনের! নির্ম্মলের যত কিছু দুঃখ ব্যথা কবিতার লাইন কটা কানে আসিতেই বিলীন হইয়া গেল। ঠিক যেন দুপুর রৌদ্রের উত্তাপ বাঁচাইতে ছায়াঘন আমবাগানের মধ্য দিয়া কুমোর-পাড়ায় যাত্রা। একটা কিছু করিবার আশায় অত্যন্ত অধীর, একটা মহান আবিষ্কার, অপ্রত্যাশিত লাভ।

চটি-খাতা ত দুই দিনেই শেষ হইল।

মোটা খাতা আনিয়া নির্ম্মল আঁকিল ছবি; ছবির নীচে দুইছত্র করিয়া কবিতা। আজ-কাল মাসিকের পৃষ্ঠায় সে এই রকম ছবি অনেক দেখিয়াছে।

ছবির বিষয়-বস্তু বেশী যত্ন করিয়া নির্ম্মলকে খুঁজিতে হইল না। প্রথমেই পেন্সিলের রেখায় ধরা পড়িল সেই অপূর্ব্ব চক্র-যন্ত্র। তারপর চাল-দেওয়া উঁচু দাওয়া, পুষ্পিত সজিনা গাছ, কুমোর-বাড়ীর অঙ্গন এবং অঙ্গনের দূর্ব্বাদল। অঙ্গনের পাশে পোয়াটাক পথ দূরের নদীটিকে নির্ম্মল বসাইয়া দিল। এইবার নদীতে খানকয়েক জেলে-ডিঙ্গি আর গোটাকতক পদ্মফুল ফুটাইয়া দিতে পারিলেই—

সহসা কান দুটিতে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেই তাহার তন্ময়তা কাটিয়া গেল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল গুরু-গম্ভীর মুখে কাকা দাঁড়াইয়া।

চাহিতেই গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনি ছুটিল, সকাল বেলায় বসে বসে দিব্যি ছবি আঁকা হচ্ছে যে! বলি এটাও কি স্কুলের ড্রয়িং?

নির্ম্মল ত পাথর বনিয়া গিয়াছে।

কাকা অতঃপর পাথরে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, এ বিষয়ে তিনি দক্ষ।

গাল দুটিতে গোটাকয়েক চড় কসাইয়া উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, পাজি, হতভাগা, খেলা করার আর সময় পাও নি? দাদা, দাদা, এস এ দিকে, একবার দেখে যাও বাঁদরের কীর্ত্তি।

শুধু দাদা নহে—পরিজনস্থ সকলেই আসিলেন। দাদা অর্থাৎ নির্ম্মলের পিতা খাতা দেখিয়া মন্তব্য করিলেন, তা এঁকেছে মন্দ নয়। ছোঁড়া বুঝি—

ততক্ষণে বারুদে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। মহাশব্দে ফাটিয়া পড়িয়া কাকা বলিলেন, তোমাদের আস্কারা পেয়েই ত ও এত বেড়েছে। নৈলে স্কুলের ছেলে, পড়া ছেড়ে আঁকছে মাথা মুণ্ডু—আর আর তোমরা দিচ্ছ বাহবা! কোথায় ধমকাবে—

দাদা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, সে ত তুই আছিসই। আমি শুধু বলছিলাম, ছবির হাত—

কাকা কথাটা শেষ করিতে দিলেন না, যাচ্ছেতাই। যাও তোমরা এখান থেকে, শাসন কেমন করে করতে হয় সে আমি জানি।

মেয়েরা হাউ-মাউ করিয়া উঠিলেন, ওবে বাছা, সেবার-কার মত সাত চোরের মার যেন মারিস নে, শেষ বারে গা হাত টাটিয়ে জ্বর না বেরয়।

কাকা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওই ত! আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা খেলে! থাক, যা ভাল বোঝ কর, আমি আর এর মধ্যে নেই। বলিয়া রাগ করিয়া খাতাখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি শাসনের রজ্জু শিথিল করিলেও নির্ম্মল সে গণ্ডী পার হইতে সাহস করিল না। সেও মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ওদিকে আর নয়। অবাধ্য মনকে যেমন করিয়াই হউক বশে আনিতে হইবে।

এমনই সে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা বাড়ির লোক পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

—ওরে নিমু, যা বাবা, একটুখানি বেড়িয়ে আয়।

—কেন? রুষ্টস্বরে নির্ম্মল প্রশ্ন করিল।

—দিনরাত ঘরে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবে যে।

—শরীর খারাপ হবে বলে পড়া খারাপ করতে হবে? বাঃ, বেশ যুক্তি ত তোমাদের!

—একটু বেড়ালে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাবে।

—না, হয় না! বলব কাকাকে যে তুমি পড়ার সময় খালি ঘ্যান ঘ্যান করছ?

কাকার নামে সকলেই ভয় পায়। মাও দমিয়া গিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো কি বলেছে দিনরাত পড়া তৈরী করতে?

নির্ম্মল রুষ্ট স্বরেই বলিল, না, বলে নি; বলেনি ত যখনই বেরুই, দেখি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। পাহারা দেওয়া আমি বুঝি না, না?

মা বলিলেন, সে ত তোকে কুমোর বাড়ি যেতে মানা করে। নৈলে—

—যাও, যাও মা, আঁকটা মোটেই মিলছে না। ছেলের তাড়া খাইয়া মাকে পলাইতে হয়।

কিন্তু খাইবার সময় আবার তাঁহার কোমল কণ্ঠে অনুরোধের সঙ্গে সেই মমতা ফুটিয়া উঠে।

—দেখ ছেলের খাওয়া। আর একখানা মাছ এনে দিই। উঠিস নি, উঠিস নি, ওরে দুধ আছে।

—দুধ খেতে গেলে স্কুলের বেলা হয়ে যাবে।

মা এইবার রাগ করিয়া বলেন, হোকগে বেলা। একে ত দিনরাত ঘরের কোণে বসে বসে পড়া, তার ওপর একটু দুধ কি মাছ না খেলে শরীর কদিন টিঁকবে!

সে মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া নির্ম্মল উঠিয়া পড়িল।

আঁচাইতে আঁচাইতে বলিল, শরীরের জন্য কিছু ভেব না মা, ভাল করে পড়তে পারলে ও-সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা সেই দিনই নির্ম্মলের কাকার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ও কি না খেয়ে, না বেড়িয়ে শুধু বই নিয়ে শুকুবে? এতে কখনও শরীর ভাল থাকে?

কাকা হাসিলেন, ভেব না বৌদি—শরীর ওতে ভালই থাকবে। ছোঁড়াটার একটা গুণ আমি লক্ষ্য করেছি, জেদ আছে। যখন যেটা ধরে সব ভুলে তাতেই মেতে থাকে। নৈলে দেখনি, কাদার পুতুল গড়া, ছবি আঁকা, পদ্য লেখা কোনটাই ত নেহাৎ নিন্দের করে নি। কম কষ্টে কি ও-সব ঝোঁক ছাড়িয়েছি। এখন খবরদার, কিছু বলে ওকে বিরক্ত কর না, তা হলেই পড়ার ওপর এই ঝোঁকটুকু চলে যাবে, হবে একটি আস্ত বাঁদর।

এমন দীর্ঘ বক্তৃতার পর নির্ম্মলের মা আর কি বলিবেন! চুপ করিয়াই রহিলেন।

*　　*　　*　　*

বাড়ির মধ্যে দূরদৃষ্টি যদি কাহারও থাকে ত সে নির্ম্মলের কাকার আর স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের। তাঁহাদেরই শাসন কিংবা প্রখর দৃষ্টির গণ্ডীবদ্ধ হইয়া সে দিব্য পাস করিল। পাস করিল প্রথম বিভাগে—বৃত্তির সহিত।

কাকা সুখবরটা দিয়া বলিলেন, কেমন বৌদি?

নির্ম্মলের মা আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, ধন্যি তুমি ঠাকুরপো। তোমারই জন্যে। উনি ত তোমার ভরসায় কিছুটি দেখেন না।

শুধু নির্ম্মলের মা নহে, প্রতিবেশীরাও বলিল, হাঁ, অমন বাঘের মত কাকা—তাই— ।

নির্ম্মল কাকাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, কোথায় ভর্ত্তি হবি ঠিক করলি ?

—প্রেসিডেন্সিতে।

—বেশ, বেশ। যা, পাড়ার সকলকে প্রণাম করে আয়।

ভাল ছেলের মত নির্ম্মল আদেশ পালন করিতে গেল।

প্রণামের পালা শেষ করিয়া সে আম-বাগানের পথ ধরিল। বহুদিনকার পরিত্যক্ত পথ। পথের দুপাশে বন-জঙ্গল হইয়াছে। আম প্রায় শেষ হইয়াছে, পাকা কাঁঠালের গন্ধে বন ভরিয়া আছে। আম-বাগানের নীচে তেমনই ঘন ভাঁট-বন, বসন্তের দিনে উহার গাঁটে গাঁটে ধরিত সাদা ফুল। গন্ধও বাহির হইত সুমিষ্ট। সকাল বেলা সেই ফুলে আনন্দ গুঞ্জন করিয়া মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করিত। সূর্য্য উঠিবার আগে তখনও আবছা অন্ধকার—আম-বাগানের তলায়, ফুরফুরে বাতাস লাগিত সমস্ত শরীরে, কানে বাজিত মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের আনন্দ-রাগিণী। ভাঁট-ফুলের গন্ধে ও শোভায় মন ও চক্ষু পরিতৃপ্তি লাভ করিত। রাত্রি ও প্রভাতের সেই সন্ধিক্ষণটিকে মনে পড়িল। এই পথ দিয়াই সে কুমোর-পাড়ায় যাইত।

শেয়াকুল কাঁটায় আজ আর কাপড় আটকাইয়া গেল না, পাকা বৈঁচির প্রলোভনেও নির্ম্মল ফিরিয়া চাহিল না। কুমোরদের উঠানের ধারে আসিয়া দেখিল কঞ্চির আগড়টা বেড়ায় ঠেসানো আছে। বহুদিন হইল সজিনা গাছের ডাঁটা-সমেত ডালগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, নবপল্লবে গাছটিকে টোপর-পরা বরটির মতই দেখাইতেছে। ভিতরের দাওয়ায় কুমোর বসিয়া তেমনই যন্ত্র ঘুরাইতেছে, আর হাতের ঠেলায় গড়িয়া উঠিতেছে তেমনই হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি।

আজ আগড় ঠেলিয়া এখানে বসিয়া একটি বেলা কাটাইয়া গেলেও কেহ কিছু বলিবেন না। কাদা মাখিলেও ভর্ৎসনা করিবার কেহ নাই, চাই কি পুতুল দিয়া কাহারও প্রতিমূর্ত্তি গড়িলে তিনি হয়ত খুসীই হইবেন।

মিনিট কয়েক আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল কি ভাবিল কে জানে, ভিতরে না ঢুকিয়া সর্পিল বনপথ ধরিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

* * * *

এই ত গেল ভূমিকা। ভূমিকার নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলের ভেলা যে জনপদ আশ্রয় করিয়াছে সেখানকার সমৃদ্ধির কথা থাকুক, কাহিনীটুকুতেই আমাদের প্রয়োজন।

নির্ম্মল প্রোফেসার হইয়াছে। মাহিনা মোটা, সংসার নিরুদ্বিগ্ন। প্রোফেসার হইবার সুসংবাদে গ্রামস্থ সকলের আনন্দ একখানি ছোট চিঠিতে সে প্রথম জানিতে পারে। চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন পণ্ডিত মহাশয়। কয়েকটা লাইন তাহার এইরূপ :

—তোমার কৃতিত্বে আমাদের যে কতখানি আনন্দ তাহা ক্ষুদ্র পত্রে লিখিয়া কি জানাইব! আমি জানিতাম তোমার মধ্যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের বীজ উপ্ত ছিল ; ছিল না পথের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। সেদিন বোধহয় মনে আছে, যেদিন ক্লাসে কাদার মূর্ত্তি গড়িয়া আমার বেত খাইয়াছিলে ?—বাড়িতেও কম লাঞ্ছনা ভোগ কর নাই। নদী যেমন গতি বদলায়, সেই শাসন তোমার জীবনকে করিয়াছিল নিয়ন্ত্রিত এবং তাহারই ফলে —....

তারপরের অংশটুকুতে শাসকদের কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতার দাবী, অনেক দৃষ্টান্ত, অনেক উপদেশ।

নির্ম্মল উপার্জ্জনের প্রথম টাকা কয়টি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মানস্বরূপ খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু ও-সব কথা, অর্থাৎ নির্ম্মলের কথা থাক।

শহরের মাঝখানে অধ্যাপক এন. রায়ের বাড়ী, মাস মাস ভাড়া গণিতে হয়। হাতে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে, বালিগঞ্জ অঞ্চলটিও কাঞ্চন-কৌলীন্য ও আধুনিক আভিজাত্যের দিক দিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দূর বলিয়া অধ্যাপক রায় ইতস্ততঃ করিতেছেন। মিসেস রায় কিন্তু এই অঞ্চলের পক্ষপাতী। টি-পার্টি, টেনিস পার্টি, সান্ধ্য-ভ্রমণ কোন্‌টার সুবিধা না ওই অঞ্চলে বিদ্যমান ? একটু দূর ? একখানা মোটর কিনিলেই সে অসুবিধায় কি যায় আসে! তা-ছাড়া দিবারাত্র ছাত্রের ভিড় তাঁহার পছন্দ হয় না। সেই একঘেয়ে নীরস তর্ক, একই বিষয়—একই প্রতিপাদ্য। জীবিত ও মৃত কবিদের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া এত কোলাহল তিনি ভালবাসেন না।—তর্কের আসর যেই মাত্র জমিয়া উঠে, ভিতরে আহারের ঘণ্টা-ধ্বনি অমনই কর্কশ হইয়া তাঁহাকে থামিবার ইঙ্গিত করে।

তর্ক অসমাপ্ত রহিয়া যায়, অধ্যাপক হাসিমুখে সকলের নিকট বিদায় লন।

সেদিন ভিতর হইতে আসিতেই মিসেস রায় বলিলেন, কলেজে সারাদিন বকে আবার সন্ধ্যেবেলায় ওদের সঙ্গে বকতে ভাল লাগে ?

অধ্যাপক হাসিলেন।

ঈষৎ উষ্ণ হইয়া মিসেস রায় বলিলেন, তোমার কেবল হাসি! চল না আজ বেড়িয়ে আসি মীনাদের ওখান থেকে।

অধ্যাপক মৃদু আপত্তি করিলেন, আজ থাক।

মিসেস রায় বলিলেন, বুঝেছি, গল্প গেল ত লেখা নিয়ে বসবে! কিন্তু তোমায় সত্যি বলছি, আজ কোন কাজ করতে দেব না, আলো দেব নিবিয়ে।

—দিও। নির্লিপ্ত স্বরে অধ্যাপক উত্তর দিলেন।

মিসেস রায় তাঁহার পানে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন, কোন কষ্ট হবে না তোমার, সত্যি বলছ ?

—সত্যি বলছি।

—ইস, তা আর হতে হয় না। আলো নিবিয়ে প্রায় দেখিনি আর কি! ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বেস পড়ছে, ঘন ঘন উঠছে হাই, এপাশ-ওপাশ ফিরছই ফিরছই।

—কি করি বল, ঘুমের ওপর ত জোর নেই। ওই একটা জিনিষ, অভ্যাসে যাকে জয় করা শক্ত।

—ঘুম না হলে খানিক গল্পও ত করতে পার আমার সঙ্গে।

—তোমার সঙ্গে গল্প না করেই যে তোমাকে বুঝতে পারি; কথা কইলে তোমরা যে হারিয়ে যাও।

—কথার উত্তরটি দেওয়া আছে ঠিক। কেন, ছাত্রদের সঙ্গে কথা কইবার উৎসাহ কোনদিন ত কম দেখলুম না।

অধ্যাপক হাসিলেন, ওদের সঙ্গে কারবারই যে আমার কথার। ওরা ত আমায় দেখতে আসে না, শুনতে আসে কথা। নিতান্ত বাঁধাধরা বিষয় নিয়ে চলে আলোচনা, সুতরাং ওদেরকে ভোলানো খুব সহজ।

—যত শক্ত আমায় ভোলানো! কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া মিসেস রায় সরিয়া গেলেন।

অধ্যাপক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু সত্যই ক্ষুধার্ত্তকে ডেকে এনে পরিহাস করা তোমার উচিত নয়।

*

আহারান্তে অধ্যাপক আলমারির দিকে হাত বাড়াইতেই মিসেস রায় তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এখন ওসব চলবে না। বসে একটু গল্প কর। বেশ, অন্য গল্প নয়, ওরই গল্প হোক।

দুজনে চেয়ারে বসিলেন। সামনে ছোট-টিপয়ের উপর ছোট একটা ফুলদানি, তার পাশে মীনার কাজ করা রূপার রেকাবে পানের মশলা;—এলাচ, লবঙ্গ, মৌরি, দারুচিনি ইত্যাদি।—অধ্যাপক পান খান না, মশলাও খান কম। কখনও কখনও গল্প করিতে করিতে গোটাদুই লবঙ্গ গালে রাখিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া পেন্সিলের দাগ টানেন, পাশের খাতায় নোটও লেখেন।

মিসেস রায় রেকাবীটা সামনে ঠেলিয়া দিতেই একটি এলাচ তুলিয়া তিনি মুখে দিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, ওই আলমারির গল্প, ও নেহাৎ বাজে। তার চেয়ে—

মিসেস রায় গ্রীবাভঙ্গী করিলেন, না, ওই কথাই বল। একরাশ খাতা ওর মধ্যে, এত ছবির আলবাম, আর নীচের তলায় কাদার পুতুলে সব নম্বর দেওয়া। তুমিই কি ওগুলোর একজামিনার ?

অধ্যাপক হাসিলেন, হঁ্যা। বিচারক বলতে পার। আর্ট-একজিবিশানে কোন্ কোন্ ছবি, কোন্ কোন্ ক্লে-মডেলিং রাখা যেতে পারে—তারই নম্বর দিয়ে আমায় ঠিক করতে হবে।

—আর খাতাগুলো ?

—সে আর এক ব্যাপার। কি একটা স্বর্ণপদকের জন্য লেখা প্রবন্ধ। পাঁচজন বিচারক করবেন তার বিচার, তার মধ্যে আমিও একজন। লেখা পড়ে আমায় রায় দিতে হবে।

মিসেস রায় হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন, হাসলে যে? আমার যোগ্যতায় নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহ আসেনি ?

—যদিই আসে ?

অধ্যাপক শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলিতে দিলেন না। বলিলেন, আসা সম্ভব, উচিত। কেন না, ও লাইন আমার নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য মীনা, লাইন দিয়ে ত দেশের লোক মাথা ঘামায় না। তাঁরা যোগ্যতা বিচার করেন একটিমাত্র মাপকাঠিতে। বিশ্ববিদ্যালয় আমার কপালে যে জয়টীকা এঁকে দিয়েছেন, তাকে মুছে ফেলবার সাহস কারো নেই। পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস। একি সোজা কথা? সুতরাং আমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ।

কথাশেষে অধ্যাপক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মিসেস রায়ও হাসিলেন, হাঁ, সে ত ঠিকই। লেখার বিচার মানলুম তোমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ছবি বা ক্লে-মডেলিং—

—সবই সম্ভব মীনা, সবই সম্ভব। যদি লেখার বিচার করতে পারি, ছবি বা মূর্ত্তির বিচারে আমার বাধা নেই। কিন্তু আমি জানি, কোনটাই আমার নয়। বই পড়ে নোট লেখা, ছাত্র নিয়ে তর্ক করা, কলেজের লেকচার সুন্দর করে মনে গেঁথে দেওয়া শুধু ওই সবই আসে। যেমন লোহার লাইনের ওপর রেলগাড়ি চলে মাপা সময়ে, মাপা গতিতে, সুশৃঙ্খলে। কিন্তু আমি হয়েছি আকাশযান, সময়ের মাপজোক নেই, লাইনের প্রয়োজন নেই, শৃঙ্খলার কথা বলাই বাহুল্য।

মিসেস রায় বলিলেন, সে কথা যাক। মানলুম তুমি রসগ্রাহী, বিচারশক্তিও তোমার আছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার বিচার-প্রণালী দেখে।

—কেন?

—রোজই তুমি আলমারি খোল, ছবি বার কর, পুতুল বার কর, কিন্তু না দাও নম্বর—না কর কোনটা বাতিল। এই ত চলছে মাসখানেক ধরে। এই রকম যদি চলে—

অধ্যাপক হাসিলেন।

—হাসলে যে? যা হয় সত্যি একটা ঠিক করে ফেল। বেশ ত, আজ রাত্রিতে আমিও না হয় তোমায় সাহায্য করব।

—পারবে সাহায্য করতে?

—অবশ্য বিদ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়েও নয়, রুচি দিয়ে তোমায় সাহায্য করব। আর্ট আমি বুঝি না, তবে সাধারণ ভাল মন্দ কিছু কিছু বুঝতে পারি।

—বেশত, খোল আলমারি। নিয়ে এস কতকগুলো বেছে, এই টেবিলের ওপর রাখ। আজ ছবি থাক, ক্লে-মডেলিং গুলোই আন।

মিসেস রায় আলমারি খুলিয়া কতকগুলি মূর্ত্তি বাছিয়া বাহির করিলেন। একে একে সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, এস, আজ এইগুলির বিচার করা যাক। তারপর তিনি একটা পুতুল হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, দেখেছ আনাড়ি কারিকরের কীর্ত্তি! দেহের চেয়ে হাতগুলো কি বড় বড়!

অধ্যাপক হাসিয়া পুতুলটি হাতে লইলেন।

মিসেস রায় ক্ষিপ্র করে কাগজের প্যাড ও লালনীল পেন্সিল লইয়া কাগজের উপর লাল ঢেরা-চিহ্ন কাটিয়া বলিলেন, নাও, সই কর।

অধ্যাপক বিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, মানে?

—মানে বাতিল। বেশী দেরী কর না, চট পট সই কর।

অধ্যাপক আর একবার হাসিলেন, আজ তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়েছ দেখছি।

মিসেস রায় ভ্রূকুটি করিতেই অধ্যাপক বলিলেন, তাদের কতটা শ্রম, কত সময় ও কত উদ্বেগ দিয়ে ওই পুতুলটি গড়ে উঠেছে—তা তুমি বুঝতে চাইছ না।

মিসেস রায় সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি এ-সব সত্যি বলছ, না ঠাট্টা করছ?

—সত্যিই বলছি। পরীক্ষার জন্য জিনিষ পাঠিয়ে তাদের মনে যে কতখানি উৎকণ্ঠা, প্রত্যেক দিনের দণ্ড তারা গুনছে। তারা হয়ত ফলাফল জানতে কতবার আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, সাহস করে ঢুকতে পারেনি। কতবার ফুটপাথে পায়চারি করতে করতে এই ঘরের দিকে চেয়ে ভেবেছে, না জানি তার জিনিষটি নিয়ে আমরা কি সব কথাই বলাবলি করছি।

কথা বলিতে বলিতে অধ্যাপকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

মিসেস রায় বলিলেন, পুতুলটা তুমি এমন ভাবে দেখছ, আর এমন ভাবে ওর শিল্পীর সম্বন্ধে কথা কইছ, যেন ওটা তোমারই অপটু হাতের তৈরী, বাতিল হলে তোমার বুক ভেঙে যাবে।

অধ্যাপক হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, কিন্তু সত্যি যেন আমি এর শিল্পীকে দেখতে পাচ্ছি। এই অক্ষম অসম্পূর্ণ রচনার পেছনে দাঁড়িয়ে সে, শুকনো মুখে ছলছল চোখে। আচ্ছা, তুমিই বলত—যিনি এটা তৈরী করেছেন, তিনি ভবিষ্যতের একটা ছবিও কি আঁকেন নি সেই সঙ্গে? মেডেল না পাক, এটা যদি একজিবিশানে স্থান পায় তাহলে তিনি কি মনে করবেন না তাঁর পরিশ্রম সার্থক! এবং সেই উৎসাহই তাঁকে হয়ত ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

মিসেস রায় বলিলেন, ও হল দরদের কথা। কালো কুৎসিত ছেলের ওপর বাবা-মার স্বাভাবিক টানটা যেমন বেশী হয়, খানিকটা মমতায় ভরা, তেমনি। কিন্তু অক্ষম শিল্পী তোমাদের উৎসাহ পেলে এমনও ত মনে করতে পাবেন যে, তিনি যা তৈরী করেছেন তা নিখুঁত। সেই সঙ্গে মনে জাগবে তাঁর অহঙ্কার এবং ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার।

অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিলেন। মিসেস রায় বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন ওর ত্রুটি বার করে যদি বাতিল কর, শিল্পী সাবধান হতে পারবেন। ভবিষ্যতে তিনি আরও সতর্ক হয়ে কাজে নামবেন।

অধ্যাপক বলিলেন, তুমি যা বলছ, সে হল সাধারণ পরীক্ষার প্রণালী। কিন্তু পরীক্ষকের কি হৃদয়ের সম্পর্ক রাখতে একেবারে নিষেধ!

মিসেস রায় হাসিলেন, সে ত তুমি ভালই জান। তোমার কাছে যেন কোন দিন কোন ছেলে নোট লিখে নম্বর হারায় নি! যাক ও সব কথা, সত্যিই কি তুমি ওগুলো দেখবে, না তুলে রাখব?

চেয়ারটায় সোজা হইয়া বসিয়া অধ্যাপক রায় বলিলেন, না, আজ রাত্রেই ও-গুলো শেষ করতে হবে। দাও পেন্সিল। বলিয়া কাগজে সই করিয়া অন্য একটি পুতুল হাতে তুলিয়া লইলেন।

তারপর পুতুলটি নিরীক্ষণ করিয়া কাগজে কাটিলেন লাল পেন্সিলের ক্রস্-চিহ্ন, নীচে করিলেন নামসহি। মিসেস রায় বলিলেন, ওটা কিন্তু চলতে পারত।

—কিসে?

—হাত, পা, মুখের ভঙ্গী কোনটাতেই খুঁত নেই।—

অধ্যাপক পুতুলটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, রেখাজ্ঞান এঁর কম। আধ বুড়ো ভিখারী, মুখের অসহায় ভাবটি সুন্দর, গড়নে কোথাও খুঁত নেই কিন্তু মুখটা ভাল করে দেখ। এ মুখ কোনও যুবকেরও বলতে পার। অকালবার্দ্ধক্যের কয়টি রেখা যদি থাকত ত সৃষ্টি হত সম্পূর্ণ।

মিসেস রায় বলিলেন, কিন্তু এত কঠোর হওয়া কি ভাল?

—ভাল। শিল্পীর ত্রুটিটুকু ভবিষ্যতে আর পাব না হয় ত! দেখ, দরদ রাখতে গেলে এর কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলবে না, বিচার করতে হলে—হতে হবে নির্ম্মম। বলিয়া হাসিলেন।

তারপর ক্ষিপ্র-করে বাছাই ও বাতিল চলিতে লাগিল। কাজ যখন শেষ হইল তখন ঘড়িতে একটা বাজিয়া গিয়াছে। সে দিকে চাহিয়া অধ্যাপক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ব্যস, আজকের মত কাজ শেষ। থাক আলমারি খোলা, আলো নিবিয়ে ওপরে যাই চল। বলিয়া তিনি নিজেই সুইচ টিপিয়া আলোটা নিবাইয়া দিলেন ও মিসেস রায়ের হাত ধরিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

* * *

দুই জনেই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। শয়নমাত্র আলস্যে দুই জনেরই চক্ষু মুদিয়া আসিল। মিসেস রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন, অধ্যাপক ঘুমাইলেন না। অথচ জাগিয়াও যে রহিলেন তাহা নহে। চক্ষু মুদিয়া আধ-তন্দ্রার মধ্যে তিনি যেন কোথায় পায়চারি করিতে লাগিলেন—নীচের সেই ঘরখানিতেই; মৃদু আলোকে সব কিছু দেখা যায়। চেয়ার, আলমারি, টেবিল, টেবিলের উপর সেই পুতুলগুলি, কাগজের উপর লাল পেন্সিলের ক্রস, তার নীচে স্বাক্ষর। পরীক্ষোত্তীর্ণ পুতুলগুলির মুখে আলোটা কিছু উজ্জ্বল, অন্যগুলি তরল অন্ধকারের মধ্যেও কেমন যেন ম্লান। রাত্রিশেষের পৃথিবীতে কৃষ্ণাতিথির ব্যাপ্তি—অদূরে আবছা দিনের আলো, কিন্তু বিদায়-মুহূর্ত্তের অন্ধকার কি রূঢ়—কি স্থূল! ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করিতেছেন। গতি দ্রুত, অন্তরের ক্ষুব্ধতা প্রত্যেক পাদক্ষেপে ফুটিয়া উঠিতেছে, নিশ্বাসপতনে জমিতেছে মালিন্য, চোখের দৃষ্টি সন্ধান হারাইয়া স্তিমিত। শিল্পীর দুঃখে তিনি কি বেদনা অনুভব করিতেছেন?

যদিই তরুণ শিল্পী এ আঘাত কাটাইয়া উঠিতে না পারে? যদিই সে তুলি ফেলিয়া কলম তুলিয়া লয়? মূর্ত্তি ফেলিয়া জীবনের মুহূর্ত্তকে সংসারের মায়াজালে নিক্ষেপ করে? করে করুক। হয়ত জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসারকাম্য স্বাচ্ছন্দ্যে সে প্রচুরতর শান্তি লাভ করিবে। এই সব খেয়াল বা স্বপ্ন জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখে বটে, কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে প্রতি পদে পায় আঘাত। ভঙ্গুর কাচের মতই—টুকরাগুলি বুকে আসিয়া বিঁধে—রক্তাক্ত করে হৃদয়।

অধ্যাপক রায় অকস্মাৎ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। শহর নহে, গ্রাম। রাত্রির অন্ধকার নহে আধপ্রকাশিত ঊষার অস্পষ্টতায় তিনি সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া বহুদিনকার সর্পিল পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কখন এক সময়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বালিভরা সঙ্কীর্ণ জল, দুধারে ঘন আসশ্যাওড়ার বন। বনের মাথা সাদা ফুলের কুঁড়িতে ভরা, মুঠা মুঠা ভাজা-চাল কে যেন ছড়াইয়া দিয়াছে। কটু গন্ধ, নিশ্বাস টানিলেই বুকের ভিতর চলিয়া যাইতেছে। বেশ ঠাণ্ডা গা-জুড়ানো হাওয়া। তারপরেই আমবাগান, তলায় ভাঁটের বন—অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। দোয়েল ডাকিতেছে। কোন্ মাস কে জানে, মুকুলগন্ধে আমবাগান মাতাল হইয়াছে; যে তার তলা দিয়া হাঁটে সেই মত্ততা তাকেও যেন পাইয়া বসে। বৎসরের সেরা ঋতুগুলি যেন একসঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—চঞ্চল বালক তারই ভিতর দিয়া ছুটিতেছে। আমবাগান পার হইয়া মাঠ, শ্যামল শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ, বায়ুর তরঙ্গে লীলাপ্রমত্ত। আকাশের নীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বন্ধন তার সঙ্কেতময়। তারপরেই অনাড়ম্বর সেই কুটীর, প্রাঙ্গণে ফুলে ভরা সজিনা গাছ, উঁচু দাওয়ায় সেই চক্রযন্ত্র। যন্ত্র ঘুরিতেছে। কুমোর নাই, আপনিই ঘুরিতেছে, ও হাঁড়ি সরা তেমনই গড়িয়া উঠিতেছে। দাওয়ায় পড়িয়া আছে কয়েকটা পুতুল। নির্ম্মল আসিয়া আগড়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঞ্চির আগড়, তালাচাবি দিয়া আটকানো নহে, একটু ঠেলিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! দুটি হাতের প্রাণপণ ঠেলাতেও আগড় খুলিল না। পরিশ্রমে মুখ রাঙা হইয়াছে, হাতের পেশী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আগড় কেন খোলে না?

আরও জোরে ঠেলিতেই হঠাৎ তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চোখ চাহিতেই দেখেন, ঘামে সারা দেহ ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানায় তিনি হাঁপাইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তথাপি গ্রামের পথ, বনের গন্ধ ও শস্যের শ্যামলতা মন হইতে মুছিয়া গেল না। এমন কি, সেই কঞ্চির আগড়টা পর্য্যন্ত সম্মুখে কঠিন দেহ মেলিয়া পথরোধ করিয়া আছে। ও-পারে ফুলে ভরা প্রাঙ্গণ, আলোর রেখাটি ঘন অন্ধকারে নিবিয়া আসিতেছে, নিশ্চিহ্ন হয় নাই। এখনই ঘন তিমির মাখিয়া রাত্রি আসিবে, কোথায়ও কিছু নজরে পড়িবে না।

তাড়াতাড়ি তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং আলো না জ্বালিয়াই নীচে নামিতে লাগিলেন।

টেবিলের উপর মূর্ত্তিগুলি তেমনই সাজানো, তলায় তার কাগজ চাপা। কোনটায় লাল পেন্সিলের ক্রস্-চিহ্ন, কোনটায় কালো পেন্সিলের স্বাক্ষর। তিনিই অসাফল্যের দাগ টানিয়া ওই গুলির ভাগ্য নির্ণীত করিয়াছেন।

ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি করিয়া অধ্যাপক রায়ের বুক মমতায় ভরিয়া উঠিল। বিচারের ভান করিয়া তিনি কেন আশা ও আনন্দে ভরা হৃদয়গুলি ভাঙ্গিয়া দেন? যে-বদ্ধ অর্গল তাঁহার জীবনকে পৃথক করিয়া সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, সে জগতে আসিয়া আর কেহ যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে—এ যেন অসহ্য।

হাত বাড়াইয়া তিনি প্রত্যেক মূর্ত্তির পদপ্রান্ত হইতে লাল পেন্সিলের ক্রস্-চিহ্ন দেওয়া কাগজগুলি টানিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্র-হস্তে কাগজের প্যাড টানিয়া লিখিলেন:

সে লেখা আমরা এই কাহিনীর প্রারম্ভেই পাঠ করিয়াছি।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বেটেদের সহর সেণ্ট ম্যালো

ব্রিটানির উপকূলে সেণ্ট ম্যালো একটি প্রাচীন বন্দর। এখানে পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটেদের বাসভূমি ছিল, এই দ্বীপের সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়ে বাস করিয়া ইহারা বহুদূরের সমুদ্রে লুঠপাট করিতে যাইত। এমন এক সময় ছিল যখন ইংলণ্ড সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী ইংলিশ প্রণালীর ভিতর আসিলেই ইহারা লুঠ করিত। চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের কাছ ঘেঁসিয়া যাইতে কোনো জাহাজের কাপ্তেন সাহস করিত না।

বলা বাহুল্য এখন আর সে কাল নাই। সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেদের বংশধরেরা এখন সমুদ্রে মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু এই মাছধরার ব্যাপারে তাহারা যে সাহস, নৌচালন-দক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাতে একথা স্বতঃই যে কোনো লোকের মনে হইবে যে, ইহারা দুর্দ্দান্ত ও নির্ভীক জলদস্যুদিগের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ব্রিটানির উপকূলে প্রাচীনকালের নিদর্শনস্বরূপ এই সহরটি দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী আসে। সেণ্ট ম্যালো সহরের হোটেল, কাফিখানা ও দোকানগুলির প্রধান আয় হইতেছে এই ভ্রমণকারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ। এখন সেণ্ট ম্যালোর অলিতে-গলিতে জুয়াড়ীর আড্ডায় বাজি রাখিয়া জুয়া খেলা হয়, সকালে-বিকালে দলে দলে ভ্রমণকারীদের নৌকা সমুদ্রে খানিকটা বেড়াইবার জন্য বাহির হয়—এখন আধুনিক সভ্যতা সেণ্ট ম্যালোকে নিরীহ করিয়া তুলিয়াছে।

সেণ্ট ম্যালো : কবি শাতোব্রিঁয়ার এই বাড়ীতে বর্ত্তমানে হোটেল খোলা হইয়াছে।

কিন্তু এই সেণ্ট ম্যালোরই জনৈক বীরসন্তান একদিন কানাডা ফ্রান্সের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, আর একজন রিও দে জেনিরো অধিকার করিয়াছিল। এক সময়ে সুদূর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে ইহাদের নাম ভয়সঞ্চার করিত। ইংলণ্ডের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮২ খানি রণতরী ও ৪৫১০ খানি সওদাগরী জাহাজ সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেরা লুঠ করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইবে যে, বিলাসী ও খেয়ালী ভ্রমণকারীদের কাফি ও আইসক্রিম পরিবেশন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার মত নরম ধাত ইহাদের নয়—তবে কালে কালে কি না হয়?
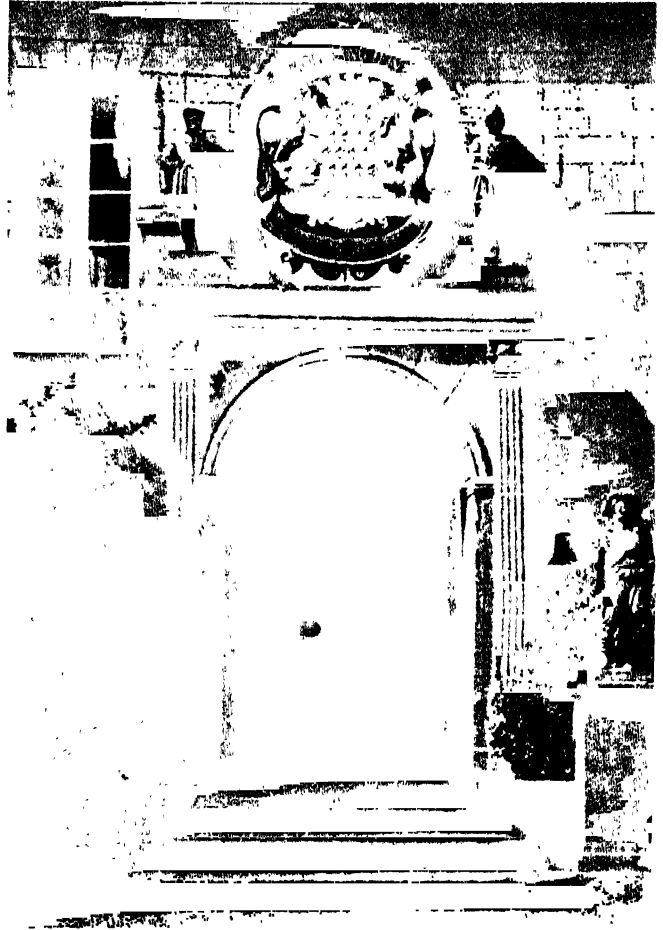
এই সহরে বিখ্যাত ফরাসী কবি ও দার্শনিক শাতোব্রিঁয়ার আবাসস্থান ছিল। যে অট্টালিকায় শাতোব্রিঁয়া বাস করিতেন

সেণ্ট ম্যালো উপসাগর: কার্ত্তিয়ে এই পথে কানাডা গিয়াছিল। জল এখানে অত্যন্ত গভীর, ফরাসী নৌবাহিনীর ধাত্রীভূমি হিসাবে এস্থান প্রসিদ্ধ।
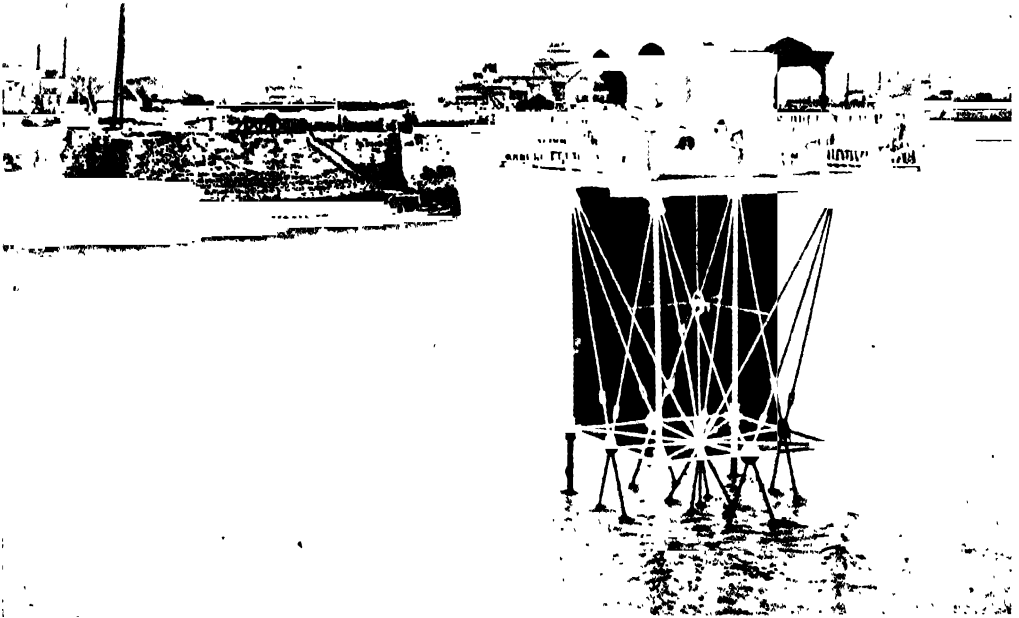
সেণ্ট ম্যালো ও সেণ্ট সেরভানের মধ্যবর্ত্তী অদ্ভুত খেয়া: জলের তলে লাইন পাতা আছে। পরের ছবিতে সে লাইন দেখা যাইতেছে।

এখন তাহা একটি হোটেল—প্রবেশদ্বারের উপরে কবির কৌলিক চিহ্ন ও তাঁহার প্রিয় মটো উৎকীর্ণ—"আমার রক্ত ফ্রান্সের পতাকা রঞ্জিত করিবে।"

শৈশবে কবি যখন এ পথে নগ্নপদে ছুটাছুটি করিয়াছেন—তখন এই রাস্তার নাম ছিল দি ষ্ট্রীট অফ দি জুস্, এখন কবির নামানুসারে এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। কাছেই একটি স্কোয়ার, পূর্ব্বে এটি ছিল পরিখা। এই স্কোয়ারে পূর্ব্বে শাতোব্রিঁয়ার একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ছিল—এখন সেটি এখান হইতে সরানো হইয়াছে। কেসিনো হোটেলের দেওয়ালের বাইরে এই ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে স্থাপিত আছে।

কোন মহিলা ভ্রমণকারী তাঁহার দলের পণ্ডিতম্মন্য একটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শাতোব্রিঁয়া কে হে?

কবি তাঁহার পৈতৃক প্রাসাদের যে ঘরে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহারই বহির্দ্দেশে গাইড-বই হাতে দাঁড়াইয়া, জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিয়া মহিলা এই প্রশ্ন করেন।

সঙ্গের রসিক পুরুষটি উত্তরে বলেন, কেউ কেউ তাঁকে লোক হিসাবে জানে. আবার কেউ কেউ জানে বিফ-ষ্টিক কাটিবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে।

লোকটি ভুল করিয়াছিল। বিফ-ষ্টিক কাটিবার পদ্ধতি কবি শাতোব্রিঁয়ার নামানুসারে হয় নাই—হইয়াছিল আর একজন শাতোব্রিঁয়ার নামে। কবির ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন—তাঁহার নামের বানান ছিল—Chateaubriant তখনও ঐ শব্দটি 'd' দিয়া বানান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ফ্রান্সের অনেক সুসন্তান এই ক্ষুদ্র শহরটির অধিবাসী ছিলেন, তন্মধ্যে সেণ্ট লরেন্স নদীর আবিষ্কারক জ্যাক্স্ কার্ত্তিয়ে ও বিবর্ত্তনবাদী ডাক্তার ব্রুসাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্যাথারিন দ্য মেদিচি এখানে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন ছিলেন, সেণ্ট্ বার্থোলোমিউ হত্যাকাণ্ডের দুই বৎসর আগে।

জ্যাক্স্ কার্ত্তিয়ে এই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না—তবে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনি প্রথম ফ্রান্সিস কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, সঙ্গে মাত্র ৬০ টনের দুখানি জাহাজ ছিল এবং ১২২ জন নাবিক ছিল। সেণ্ট লরেন্স উপসাগর ঘুরিয়া ইঁহারা সেণ্ট লরেন্স নদীর মুখে প্রবেশ করেন—কানাডাতে ফরাসী অধিকারের পত্তন করেন।

১৯০৫ সালে কার্ত্তিয়ের একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন নাবিকের পোষাকে ফ্রান্সের এই বীর-সন্তান জাহাজের হাইলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অনন্ত জলরাশির ওপারে কানাডার দিকেই যেন চাহিয়া আছেন - যে কানাডা ফ্রান্স পরবর্ত্তী কালে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বিখ্যাত জলদস্যু দুগুয়ে এই শহরেই ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে—যে বাড়ীতে সে ভূমিষ্ঠ হয়, সে বাড়ীটি এখনও আছে। ১৮ বছর বয়সেই দুগুয়ে একদল বোম্বেটের দলপতি হইয়াছিল—দুগুয়ে সত্যকার ব্রিটন ছিল, ব্রিটন জাতির দুর্দ্ধর্ষ সাহস, সমুদ্রের উপর গভীর টান, স্বদেশপ্রিয়তা তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অতি-বিখ্যাত জলদস্যু করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা তাহাকে উপাধিতে ভূষিত করেন, ইতিমধ্যে সে কুড়িখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও তিনশত সওদাগরী-জাহাজ লুঠের দ্রব্যস্বরূপ ফ্রান্সকে উপহার দিয়াছিল।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে দুগুয়ে ব্রেজিলের রাজধানী রিও দে-জেনিরো আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সেখান হইতে অনেক লুণ্ঠন-দ্রব্য লইয়া আসে। সেখান হইতে একটা সুবৃহৎ ঘণ্টা
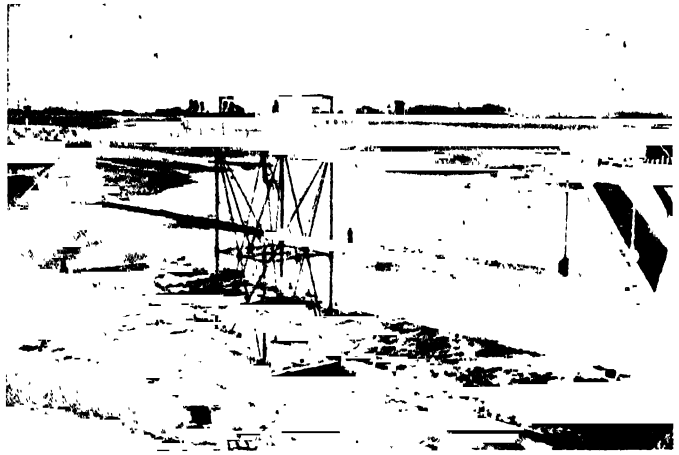
জোয়ারের সময় এই সেতুর অধিকাংশই জলের তলে ডুবিয়া যায়।

আনা হয়, একশত বৎসর ধরিয়া সেণ্ট ম্যালো শহরের প্রধান ফটকের ঘড়িঘর হইতে সেটি প্রহর ঘোষণা করিত। ফরাসী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই ঘড়িঘর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে, সেণ্ট ক্রিষ্টোফারের নাক ভাঙিয়া দেয় ও কুমারী মেরীর মূর্ত্তি পরিখার জলে টান মারিয়া ফেলে। বিদ্রোহের উত্তেজনা কাটিয়া যাওয়ার পরে মেরীর মূর্ত্তিকে জল হইতে তুলিয়া আবার সদর ফটকের উপরে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ঘণ্টাটিও এখন স্থানীয় একটি গির্জ্জার মাথায় প্রাচীন দিনের মতই প্রহর ঘোষণা করে।

ব্রিটানির এই সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ সন্তানের প্রতিমূর্ত্তি সেণ্ট ম্যালোর পথের ধারে এখনও দণ্ডায়মান আছে।

ব্রিটানির জলদস্যুরা ইংরেজদের ভাল চক্ষে দেখিত না। ইংরেজেরাও তাহাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করিত,

তাহাকে ব্যক্ত করার উপযুক্ত শব্দ ইংরেজী ভাষাতে নাই। গল্প প্রচলিত আছে, একবার জনৈক বন্দী ব্রিটনকে একটি ইংরেজ জাহাজের মাস্তুলে বাঁধিয়া চারিদিক হইতে তীর, ছুরি,

রদেন্থর সাধক-শিল্পী খোদিত পর্ব্বতগাত্রের অদ্ভুত মূর্ত্তি।

গরম সাঁড়াশী প্রভৃতির খোঁচায় ধীরে ধীরে মারিয়া ফেলা হইতেছিল।

হঠাৎ জাহাজের কাপ্তেন ব্যঙ্গের সুরে বলিল—শোন, প্রত্যেকেই এমন একটা জিনিষের জন্যে লড়াই করি, যা আমাদের আসলে নাই।

সেণ্ট ম্যালোর সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর কতকগুলি অদ্ভুত মূর্ত্তি আছে--এইগুলি 'রদেন্থর সন্ন্যাসী' নামক একজন স্থানীয় শিল্পী পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করিয়াছিল। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে খ্রীষ্টান সাধু ও সাপ, পশুপক্ষী, গৃহস্থালীর দৃশ্য—নানা রকম আছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পীর মৃত্যু হইয়াছে।

সান্টা ফি

সান্টা ফি বর্ত্তমানে ইউনাইটেড ষ্টেটসের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিউ মেক্সিকো প্রদেশের একটি শহর। এমন একদিন ছিল যখন আমেরিকার এই অংশে সভ্য মানুষে দলে দলে অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে নিহত হইয়াছে—এই পথে বসতি স্থাপন ও অধিকার বিস্তার করিতে তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সান্টা ফি'র পথ : সান ইসাবেল ন্যাশনাল ফরেষ্টের এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত এই বৃহৎ পর্ব্বত বিস্তৃত।

তোমরা লড়াই কর টাকার জন্য, আমরা লড়াই করি ইজ্জতের জন্য।

মুমূর্ষু বন্দী ব্রিটন বলিল, তবেই দেখুন, আমরা

এপথে প্রথমে যাহারা আসিয়া রাজ্য বিস্তার করে, কিট কার্সন তাহাদিগের অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাজ্যের অধিকার বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে এই নিরক্ষর, অসম-

সাহসী মানুষটির কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮২৬ সালে একদিন 'মিসৌরী ইণ্টেলিজেন্সার' নামক এক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়। "ফ্রাঙ্কলিন শহরে আমার ঘোড়ার জিনের দোকান হইতে কিট কার্সন নামে একটি শিক্ষানবিশ বালক কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ১৬ বৎসর, বয়সের তুলনায় দেখিতে বেঁটে, মাথার চুলের রং কটা। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে এক সেণ্ট পুরস্কার পাইবে।"

এই পুরাতন কাগজের বিজ্ঞাপনী পড়িয়া যে কথাটি আমাদের সর্ব্বপ্রথম মনে জাগে সেটি হইতেছে এই যে, যে-আমেরিকার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা একদিন স্বর্ণডলারের পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকিবে ইহাই বিধির বিধান, তাহাদেরই এক পূর্ব্বপুরুষ একদিন খবরের কাগজে প্রকাশ্য ভাবে এক সেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল!

যাহা হউক, কিট কার্সন আর ফেরে নাই। অজানা নিউ মেক্সিকোর পথে তখন দলে দলে ঘোড়ায়-টানা ছই-বসানো বড় বড় গাড়ী (সাম্রাজ্যবিস্তারের যুগে ইয়াঙ্কি ইংরাজিতে ইহাদের নাম ছিল ওয়াগন) চলিয়াছে—দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় তরুণ কিট কার্সন তখন মাতিয়া উঠিয়াছে, সেও এই দলে যোগদান করিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইল।

কিট কার্সেনের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি: ট্রিনিদাদে অবস্থিত। সাণ্টা ফি'র পথ আবিষ্কারের সহিত জুতার দোকান হইতে পলায়িত এই শিক্ষানবিশের নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে।

মেক্সিকো তখন সবে স্পেনের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে—সেখানে তখন যুক্তরাজ্যের মালের চাহিদা বেশী—তাই দুঃসাহসী সওদাগরেরা পথের শত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করিয়া দলে দলে চলিয়াছিল সাণ্টা ফি অভিমুখে বাণিজ্য ব্যপদেশে। বাণিজ্যের পথ ক্রমে রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল, যেমন সবদেশে হয়।

পথ রীতিমত দুর্গম—সেণ্ট লুইস হইতে সাণ্টা ফি প্রায় ১৬০০ মাইল। এই ১৬০০ মাইলের মধ্যে সভ্যলোকের উপযোগী খাদ্যও মিলিত না। মহিষের মাংস খাইয়া সওদাগরেরা দিন যাপন করিত, মহিষের চামড়া হইতে শক্ত জুতা প্রস্তুত করিয়া লইত। দিনে ১৫ মাইলের বেশী চলার নিয়ম ছিল না।

চারখানা ওয়াগন পাশাপাশি চলিত এবং এই ওয়াগনের সারি এক এক সময়ে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হইত। পশ্চিমকে জয় করিবার কি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা! এক বৎসর বড় মরসুমের সময় ৩০০০ ওয়াগন ও ৫০,০০০ জোড়া বলদ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিন তখন ছিল সভ্যজগতের শেষ সীমা—মিসৌরি প্রদেশে আর একটি মাত্র বড় শহর ছিল সেণ্ট লুইস, হাজার চারেক লোক সেখানে বাস করিত। সেণ্ট লুইস হইতে নৌকাযোগে বালির চড়া ও নদীর ঘূর্ণাবর্ত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে এবং নদীতীরের বনে হরিণ ও বন্য টার্কি শিকার করিতে করিতে লোকে আসিয়া পৌঁছিত ফ্রাঙ্কলিন শহরে এবং সেখান হইতে সাণ্টা ফি'র পথে রওনা হইত। সবাই ভাবিত সাণ্টা ফি একবার যাইতে পারিলেই হইল—সাণ্টা ফি রূপকথার এল্ ডোরেডো, সোনার দেশ, সোনা সেখানে ছড়ানো আছে যত্র তত্র—যে যত কুড়াইয়া লইতে পারে।

সব নাম তখন কোনোদিন শোনেও নাই—যদিও বর্ত্তমানে যুক্তরাজ্যের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী সে অঞ্চলে বড় বড় শহর স্থাপন করিয়া বাস করে, দীর্ঘ সড়ক বাহিয়া দামী মোটর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যায়—তাহাদের ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। ইয়েলোষ্টোন, সল্ট লেক সিটি, ডেনভার—এ সব স্থান বর্ত্তমানে কার না পরিচিত!

কে জানিত তখন যে আরিজোনা, নেভাডা ও কালিফোর্ণিয়াতে অত সোনা, রূপা ও তামার খনি অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে!

পৃথিবীর মধ্যে কোনো স্থানেরই এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়
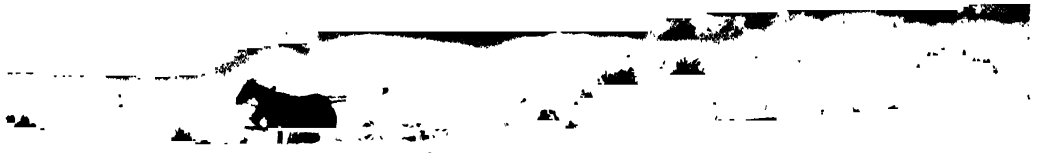
সাণ্টা ফি'র পথে একাকী শকট।

সাণ্টা ফি হইতে প্রত্যাগত লোকেরা এই সব গল্প রটাইয়া বেড়াইত। গল্পের মূলে খানিকটা সত্যও ছিল। একবার সাণ্টা ফি হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লোকে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে, এ উদাহরণ নিতান্ত বিরল ছিল না। কাপ্তেন বেকনেল নামে একজন লোক ওয়াগন বোঝাই দিয়া ছুরি কাঁচি লইয়া গিয়াছিল সাণ্টা ফি'তে। একদিন সে সাণ্টা ফি হইতে ফিরিল, সঙ্গে সুদীর্ঘ অশ্বতরের সারি, তাদের পিঠে বোঝাই রৌপ্য মুদ্রা। ফ্রাঙ্কলিন সহরের একটা গুদামে টাকার থলিগুলি আনিয়া ফেলিলে সেগুলি ছিঁড়িয়া টাকাগুলি ঘরের মেজেতে ছড়াইয়া মেজে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিল। এত টাকা লোকে কখনও দেখে নাই।

এই সব কথা যত প্রচার হইতে লাগিল ততই লোকে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও দলে দলে সাণ্টা ফি রওনা হইতে লাগিল। এই পথে যে সকল লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তাহারা যে সব নূতন অপরিচিত স্থানের নাম মুখে মুখে উচ্চারণ করিত—পূর্ব্ব-প্রদেশের লোকে সে

নাই—জনহীন মরুভূমি ও অরণ্য হইতে একেবারে সমৃদ্ধ জনপদ—পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ বেশী নাই।

তরুণ কিট কার্সন যে দোকানে বসিয়া ঘোড়ার জিন সেলাই করিত, এখন তাহার নিকটেই মিসৌরী নদীর উপর প্রকাণ্ড সেতু। সে-সেতু প্রতিদিন হাজার হাজার মোটরকার বোঝাই করিয়া সৌখীন টুরিষ্টদের এখন সাণ্টা ফি'র পথে লইয়া চলিয়াছে—কিট কার্সনের চামড়ার দোকানের কাছে এখন টুরিষ্টরা পেট্রোল কিনিবার জন্য দাঁড়ায়।

সাণ্টা ফি'র পথের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

সুবৃহৎ সাণ্টা ফি রেলরোড এখন মোটররোডের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, ট্রেন মোটরের বিরাম নাই। যেখানে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বন্য মহিষ ক্ষুরের ধূলি উড়াইয়া চরিয়া ফিরিত এবং ইণ্ডিয়ানদের তীর ও সভ্য মানুষদের রাইফেলের গুলিতে হত হইত, এখন সেখানে বেড়ায় ঘেরা গোচারণ-ভূমিতে গৃহপালিত গরু ঘোড়া চরিয়া বেড়ায় ও ধাবমান

মোটর ও ট্রেনের দিকে কৌতূহলের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে।

ওয়াশিংটন আরভিং-এর সময়ে যে সব প্রেইরী প্রান্তরে বন্য মুরগী চরিত, এখন সেথানে বড় শস্য-ক্ষেত্র ও পোষা লেগহর্ণ জাতীয় মুরগীর খোঁয়াড়।

সাণ্টা ফি রেলপথের ধারে ধারে অনেক বিখ্যাত স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। সহরের কোলাহল-পূর্ণ কর্ম্মব্যস্ত জীবনের পরে অনেকে নির্জ্জন-বাসের জন্যও এসব স্থান পছন্দ করে। এজন্য এই পথে টুরিষ্টদের ভিড় অত্যন্ত বেশী।
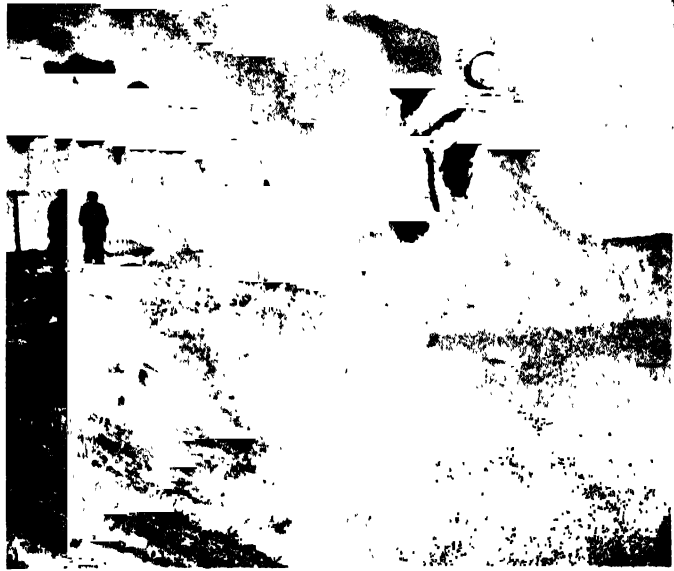
তুষারাবৃত এই পথ দিয়া এককালে সাণ্টা ফি'র অভিযানকারীরা পদব্রজে অগ্রসর হইয়াছিল। এখন রেল হইয়াছে। ছবিতে বুঝা যায় রেলেরও এপথে দুর্গতির সীমা নাই।

সাণ্টা ফি'র পথে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশ্রাম-গৃহ: কিট কাসন স্বহস্তে প্রস্তুত কফির রাত্রিভোজ সাঙ্গ করিয়া পরবর্ত্তী প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিয়া গিয়াছে।

মাঝে মাঝে দেখা যাইবে একজন দীর্ঘকেশ রেড ইণ্ডিয়ান ঢিলাঢালা পোষাক পরিয়া ব্যস্তভাবে কোথায় চলিয়াছে। ইহারই পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে বিষাক্ত রস মাথান তীর দিয়া শ্বেতকায় ব্যবসাদার কিংবা শিকারীকে হত্যা করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ওই লোকটি একজন শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ নাগরিক—খুব সম্ভবতঃ সে একজন তৈল-ব্যবসায়ী লক্ষপতি—ওকলাহোমা সহরে নূতন মডেলের মোটর গাড়ী কিনিতে চলিয়াছে।

সাণ্টা ফি'র পথের এক জায়গায় একটা পাহাড় আছে, ইহার নাম সনি রক। প্রাচীন দিনে এই স্থান অতীব বিপজ্জনক ছিল। এই পাহাড়ের নীচে দিয়া পথ, আর পাহাড়ের উপরিস্থিত শিলাখণ্ডের আড়ালে বসিয়া ওয়ালনাট, এ্যাশ ও আর্কানসাস উপত্যকার অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানেরা এইখানে লুকাইয়া থাকিয়া উপর হইতে তীর ছুঁড়িয়া মানুষ মারিত।

এই পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন কালের পথিকদের নাম খোদা আছে। পাহাড়ের চূড়া হইতে দূরের অতি সুন্দর ও শস্যশ্যামল প্রান্তর, আঁকাবাঁকা ওয়ালনাট নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। বহু পথিক বুকের রক্ত দিয়া এই পথে যুক্তরাজ্যের অধিকার বিস্তৃত করিয়া গিয়াছে।

নিশান্ত

—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

১

যেতে চাও চ'লে যেয়ো,
শুধু শেষ-বিদায়ের বেলা
এঁকে দাও ওষ্ঠাধরে
প্রেমমাখা একটি চুম্বন।
মুহূর্ত্তের ভালবাসা এর বেশী দাবী করিবে না,
তোমার যাত্রার পথে কাঁটা হয়ে থাকিব না আমি।
চিরন্তন যাত্রা তব
মধুময়, মধুময় হোক্,—
শোন তুমি সুদূরের—
অসীমের—নিখিলের গান।

২

নির্জ্জন নিলয়ে আমি
পড়ে আছি নিরালার কোণে,
অনন্ত আকাশ নীল,
তার ভাষা বুঝিতে পারি না;
অকস্মাৎ একদিন এলে তুমি তারি বার্ত্তাবহ,
আমার সীমার বুকে এনে দিলে অসীমের ভাষা।
আমার কুটিরে ছোট
মিটিমিটি মাটির প্রদীপে
উজলি' উঠিল দূর
নক্ষত্রের অতি-স্পষ্ট আলো।

৩

তুমি যাত্রী সুদূরের
পথপ্রান্তে শীতল ছায়ায়
এসেছিলে শ্রমক্লান্ত
ক্ষণকাল শ্রান্তি-বিনোদনে।
আমি ছোট নীড় রচি' বসে থাকি তাহাদের লাগি'
যাহারা তোমারি মত প্রার্থী মোর সীমানার মায়া।
এই মোর সার্থকতা—
প্রেমাপ্লুত কর্ত্তব্য আমার,
যে জন নিকটে আসে
সমাদরে তারে বুকে ধরি।

৪

ক্ষণিকের ভালবাসা—
ভুলে-যাওয়া একটি নিমেষ,
অনন্ত কালের স্রোতে
মুহূর্ত্তের সঞ্চয় আমার।
দাও, দাও, ওষ্ঠাধরে এঁকে দাও বিদায়-চুম্বন;
সীমাসন্ন ক্ষণপ্রেম ভুলে যাবে অনন্তের পথে:
রাত্রির আরতি জানি
শান্ত হবে নিশান্তের সাথে,
তবু মোরে দিয়ে যাও
প্রেমময় মুহূর্ত্ত আমার।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৪৪]

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তেরা প্রত্যহ চৈ ত ন্য ভা গ ব ত শ্রবণ করিতেন। চৈ ত ন্য ভা গ ব তে মহাপ্রভুর শেষলীলার কোন বিবরণ না থাকায় তাঁহারা তাহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহারাই একদিন শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করিবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনুরোধ করিলেন। যাঁহাদের আদেশে ও অনুরোধে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১] এই মহান্তেরা প্রায় সকলেই মহাপ্রভুর সমসাময়িক অনুচর বা ভক্ত ছিলেন।

মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া। তা সভার বোলে লিখি নির্ল্লজ্জ হইয়া॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদনগোপালে গেলাও আজ্ঞা মাগিবারে॥

*　　*　　*

প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল। প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥

*　　*　　*

আজ্ঞা পাইঞা[২] মোর হইল আনন্দ। তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

বৃন্দাবনদাসও বোধ হয় তখন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। কেন না কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥[৩]

অথবা এমনও হইতে পারে যে, গ্রন্থারম্ভের পর কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসকে পত্র বা লোক দ্বারা জানাইয়া গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার অনুমতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক গ্রন্থ-রচনার কালে বৃন্দাবনদাস যে জীবিত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ তে চৈ ত ন্য ভা গ ব ত ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অপর কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই।

যোগ্যতম ব্যক্তির উপরেই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মহান্তেরা শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যে, রসজ্ঞতায়, কবিত্বশক্তিতে কৃষ্ণদাসের তুল্য ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তাহার উপর তিনি স্বীয় গুরু রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর শেষ লীলার এমন অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন যাহা সাধারণ লোকের অগোচর ছিল। রঘুনাথ স্বরূপদামোদরের শিষ্যরূপে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার শেষ কয় বৎসরের ঘটনা সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সূত্রের মত শিখরিণীছন্দে রচিত কয়েকটি শ্লোকে লিপিবদ্ধও করিয়া-ছিলেন। এই শ্লোকগুলিকে উপজীব্য করিয়া এবং দাস-গোস্বামীর নিকট অপরাপর ঘটনা শুনিয়া কবিরাজ মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পশ্চিম ভ্রমণ ও অন্যান্য কতিপয় ঘটনা তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট অবগত হন।

স্বরূপদামোদর গোস্বামী কড়চা হিসাবে যে কয়টি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস সেগুলিরও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কবিরাজের উল্লেখ হইতেই প্রধানতঃ স্বরূপদামোদরের কড়চা নামক রচনার অস্তিত্ব জানা যায় এবং কবিরাজ গোস্বামী যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রধানতঃ সেই কয়টি শ্লোকই কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

তথ্যের দিকে কবিরাজের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনা করিয়া শেষে তাহার প্রমাণ হিসাবে গ্রন্থ অথবা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

চৈতন্যলীলা রত্নসার　　স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল　　তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
স্বরূপ গোসাঞির মত　　রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥[৪]

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দ মিলনলীলা করিল প্রচারে॥[৫]

স্বরূপগোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্য কৃপায় লিখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥[৬]

[৪৫]

শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত তিন খণ্ড বা লীলায় বিভক্ত, আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা। প্রত্যেক

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।
২। মূলে 'পাঞা'। ৩। আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।
৪। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৫। মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।
৬। অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লীলা আবার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থটি গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, শুধু পড়িবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, সে কারণ ইহাতে কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ নাই। যেমন হইয়া থাকে, ত্রিপদী এবং পয়ার এই দুই ছন্দেই গ্রন্থটি বিরচিত, তাহার মধ্যে ত্রিপদী অংশগুলির মধ্যেই কবিত্বের বাহুল্য বেশী আছে। কেহ যদি গান করে এই জন্য ত্রিপদী অংশগুলির পূর্ব্বে "যথা রাগঃ" এই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

আদিলীলায় সর্ব্বসমেত সতেরটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ, তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে চৈতন্যাবতারের কারণ ও প্রয়োজন কথন, পঞ্চমে নিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণ, ষষ্ঠে অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ, সপ্তমে পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ ও কাশীতে প্রকাশানন্দের সহিত বেদান্তবিচার, অষ্টমে গ্রন্থরচনার বিবরণ, নবম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পবৃক্ষ বর্ণন ও মূল এবং স্কন্ধ শাখা নিরূপণ। এই বারোটি পরিচ্ছেদ হইল মুখবন্ধ। তাহার পর ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবদ্বীপ লীলার বর্ণন।

মধ্যলীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদ। বৃন্দাবন হইতে নীলাচল প্রত্যাগমনেই মধ্যলীলার পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। ইহার পর মহাপ্রভু আর নীলাচল পরিত্যাগ করেন নাই। এই সপ্তদশ বা অষ্টদশ বর্ষের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি ও মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা অন্ত্যলীলায় বিবৃত হইয়াছে। অন্ত্যলীলায় সর্ব্বশুদ্ধ বিশটি পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভুর তিরোধানের কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। প্রত্যেক লীলার শেষে কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন পরিচ্ছেদের 'অনুবাদ' অর্থাৎ contents দিয়া গিয়াছেন। এই বিশেষত্ব পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

আদিলীলায় মহাপ্রভুর যে বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী বলা হইয়াছে তাহা যৎপরোনাস্তি সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অনাদৃত হইতে পারে এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার উপযুক্ত বর্ণনা করেন নাই। অথচ একেবারে বাদ দিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়, সেই জন্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিই কেবল সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] তবে দুইটি লীলা যাহা বৃন্দাবনদাস সংক্ষেপে সারিয়া লইয়াছেন তাহা কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হইতেছে গঙ্গাতীরে দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার[২], অপরটি হইতেছে নগর-সঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে কাজীদলন।

আদিলীলা শেষ করিবার সময়েই কবিরাজ গোস্বামীর মনে ভয় হইয়াছিল যে হয়ত তিনি গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন না, অথচ তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার এক প্রকার মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণন। এই আশঙ্কায় পড়িয়া কৃষ্ণদাস মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে মধ্যলীলার ঘটনাগুলি সূত্ররূপে লিখিয়াই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনপেক্ষিতভাবে শেষলীলার কিছু সূত্রাকারে বর্ণনা দিয়া গেলেন।

শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বর্ণন
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহাঁ না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

১। বাল্যলীলাসূত্র এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥
[আদিলীলা, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ]॥
পোগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙমাত্র ইঁহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হইল॥
[ঐ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]॥

২। এ সব লীলা বলিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ॥
[ঐ, ষোড়শ পরিচ্ছেদ]॥

মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপ করিয়াই বলা হইয়াছে, তাহার পর শান্তিপুরে আগমন ও অদ্বৈত-প্রভুর গৃহে মহোৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস করিয়া মহপ্রভুর রাঢ়দেশ ভ্রমণ ও শান্তিপুরে আগমনের যে বৃত্তান্ত চৈ ত ন্য ভা গ ব তে দেওয়া আছে তাহার সহিত চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ তে প্রদত্ত বর্ণনার কিছু কিছু অনৈক্য আছে। কৃষ্ণদাস যখন ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন তখন মনে হয় যে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাটিই সত্য। সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কৃষ্ণদাস কখনই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার আনুগত্য ত্যাগ করিতেন না। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে গমনের বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছেন বলিয়া কবিরাজ এই বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। চৈ ত ন্য ভা গ ব তে এই পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর চরিত বিষয়ে ধারাবাহিক বর্ণনা আছে, তাহার পর নীলাচলে অবস্থান-কালের দুই একটি ঘটনামাত্র ইতস্ততঃ ভাবে দেওয়া আছে। অতএব নীলাচলে পৌছান হইতেই কৃষ্ণদাস স্বাধীন পথে চৈ ত ন্য চ রি ত রচনায় অগ্রসর হইলেন।

[৪৬]

শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত চৈতন্যচরিত কাব্য মাত্র নহে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। এই তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বাহ্যাংশ নহে, চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণব নীতি দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিরূপে অচ্ছেদ্যভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শন রসতত্ত্ব কৃষ্ণলীলা কাহিনীর সহিত ওতপ্রোত, সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণলীলা যে অনেক পরিমাণে মুখ্যভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে বিস্ময় বোধ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই।

কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্যই চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। শ্রীচৈতন্য শুধু শ্রীকৃষ্ণের অবতার নহে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের ঐক্যাবতার। স্বরূপদামোদর প্রভৃতির মতে শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে "শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার" করিয়া রাধাভাবে আত্মানন্দ উপভোগ করা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বিবিধ চেষ্টিতের সহিত তুলনা করিতে হইলে বিরহিণী শ্রীরাধার চেষ্টিত ও বিজৃম্ভিতের সহিত তুলনা করিতে হয়। কবিরাজ গোস্বামীও তাহাই করিয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহার গ্রন্থের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু।

চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক দিয়াই চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের মত শুধু ভক্তির আবেশে চৈতন্যচরিত লিখেন নাই। তাঁহার বিচারবুদ্ধির সবটুকু দিয়াই তিনি চৈতন্যলীলার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যের উপর তাঁহার ভগবদ্বুদ্ধি ত ছিলই। তাহা না থাকিলে চৈতন্যচরিত রচনা ব্যর্থশ্রম হইত। শ্রীচৈতন্যের যে শেষ দশা তাহা বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির ধারণা ও বুদ্ধির অগোচর ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা মহাপ্রভুর শেষ কয় বৎসরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নীরব রহিয়া গিয়াছেন। সে "ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ-" এর মর্ম্ম জানাইতে এক কৃষ্ণদাস কবিরাজই সাহস করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন, এই কার্য্য অন্য কাহারও সাধ্যাতীত ছিল। ইহাতেই জানিতে পারি কবিরাজ গোস্বামীর অনন্যসাধারণ মনস্বিতা।

শ্রীচৈতন্য নিজপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের কোন ব্যাখ্যান লিখিয়া যান নাই। তাঁহার রচিত আটটি শ্লোকেতেই এবিষয়ে তাঁহার উক্তি নিবদ্ধ আছে। এই আটটি শ্লোক শি ক্ষা ষ্ট ক নামে প্রসিদ্ধ। যদি কেহ তাঁহার নিকট কোন উপদেশ চাহিত তাহা হইলে তিনি নৈতিক জীবন যাপন বিষয়ে গোটাকতক স্থূল উপদেশ দিতেন আর ভক্তিভরে ভগবানের নাম লইতে বলিতেন। দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বাদির আলোচনা করিতেন। প্রচারক না হইয়াও তিনি শুদ্ধ স্বীয় অতিলৌকিক চরিত্রমাধুর্য্যের দ্বারাই ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের চিত্তকে উন্মেষিত ও আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদর্শনের ও রসতত্ত্বের বিশিষ্ট মতবাদগুলিকে লিপিবদ্ধ করা অথবা প্রচার বিষয়ে তিনি দুই একটি অন্তরঙ্গ ভক্তের উপরই ভার দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে স্বরূপদামোদর, সনাতন গোস্বামী এবং রূপগোস্বামী প্রধান। স্বরূপদামোদর কয়েকটি শ্লোকে রচিত একখানি কড়চা প্রণয়ন করেন। চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ তে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক এবং কবি কর্ণপুরের গৌ র গ ণো দ্দে শ দী পি কা য়[১] উদ্ধৃত একটি শ্লোক ছাড়া এই কড়চাটির বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। তবে এই বিষয়ে স্বরূপের সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে রঘুনন্দনদাসকে শিক্ষাদান, আর এই রঘুনন্দনদাসের নিকট হইতেই কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অনুমোদিত ও স্বরূপের উপদিষ্ট রাগানুগাপদ্ধতি ও রসতত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ লাভ করেন। এই উপদেশ, এই জ্ঞান চতুর্থ কোন ব্যক্তি পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। শ্রীসনাতনগোস্বামীর অপেক্ষা রূপগোস্বামীই চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রকৃৎ হিসাবে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভ ক্তি র সা মৃ ত সি ন্ধু এবং উ জ্জ্ব ল নী ল ম ণি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের বেদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী বৈষ্ণবদর্শনের ব্যাখ্যায় খুল্লতাত ও গুরু রূপগোস্বামীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এই যে গোস্বামীদের "তিন লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ" ইহার সার সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিপুণতার সহিত স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল এবং সূক্ষ্ম মর্ম্ম এইরূপে চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ তে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সহিত জনসাধারণের উপযোগী করিয়া সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃতজনের ভা ষা য় বলিতে গেলে, শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত গোস্বামীদিগের তিন লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থকে এক হিসাবে বাতিল করিয়া দিয়াছে।

দুরূহ তত্ত্বালোচনার সাগরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কিরূপ অবলীলাক্রমে পয়ারে পাড়ি জমাইয়াছেন তাহা চৈ ন্য চ রি তা-মৃ ত পাঠ না করিলে কেহ অনুমান করিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের হস্তে ষোড়শ শতকের বাঙ্গালায় যে কার্য্য অবলীলাক্রমে সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নত ভাষাতেও সরলতর রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। অযথা কথা না বাড়াইয়া সংক্ষেপ করিয়া অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ব্যাখ্যান করিতে কৃষ্ণদাস যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসের বক্ষে জয়স্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।

জ্যামিতির ভাষার মত সরল, সহজ স্পষ্ট ভাষায় চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ তে র দার্শনিক ও তাত্ত্বিক অংশ রচিত। কবিরাজ গোস্বামির তত্ত্বব্যাখ্যাপদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ কিছু কিছু অংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। যাঁহারা বইখানি পড়েন নাই তাঁহারা হয়ত ইহা হইতে মূল গ্রন্থটি পড়িবার প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বপক্ষে কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান। পরব্যোমনারায়ণ স্বয়ং ভগবান॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার। এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতর্কানুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়।
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই বস্তু জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য।
বিপ্রত্ব বিখ্যাত আর পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইহঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত। কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ। পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ।
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ। স্বয়ংভগবত্ত্ব পাছে বিধেয়-সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ। তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্। তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্ষবিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ। তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন। মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ। আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন॥[১]
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন। যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে গাঢ় রতি হৈলে প্রেম অভিধান। কৃষ্ণভক্তি রসের এই স্থায়িভাব নাম॥
এই দুই ভাবের স্বরূপতটস্থলক্ষণ। প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

১। শ্লোক সংখ্যা ১৪৯।

১। আদিলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব
সাধু সঙ্গ যে করয় ॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে
কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। প্রাকৃতক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ;
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়। ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান। নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ। কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তার বাক্যক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥[২]

বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের জন্য চৈতন্যচরিতামৃতের তাত্ত্বিক অংশে দুই একটি স্থলে অন্ত্যানুপ্রাস সুবিধামত হয় নাই এবং কতিপয় স্থলে পয়ারেও প্রয়োজনাতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ ছন্দোদোষের সংখ্যা যৎ-সামান্যই।

চৈতন্যচরিতামৃতে, বিশেষ করিয়া তাত্ত্বিক অংশে, বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাছে ইহাকে কেহ পাণ্ডিত্য প্রকাশ মনে করে অথবা ইহাতে গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইতে পারে এই আশঙ্কা গ্রন্থরচনা কালেই কবিরাজের মনে উদিত হইয়াছিল। তথাপি কেন যে এত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার জবাবদিহি কবিরাজ গোস্বামী নিজেই করিয়া গিয়াছেন—

যদি কেহ হেন কহে　　গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ　　সেই করি বর্ণন
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাহাঁ সো বিরোধ　　নাহি কাহাঁ অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগদ্বেষ　　তাহাঁ হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহো　　শুনিতে শুনিতে সেহো
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি　　জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥
ভাগবত শ্লোকময়　　টীকা তার সংস্কৃত হয়
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুইচারি　　তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥[১]

উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে মনে হয় যেন কবিরাজ গোস্বামীর এই পুস্তক রচনা কোন কোন বৈষ্ণব মহান্তের অভিপ্রেত ছিল না। পরবর্ত্তী কালে রচিত বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের কোন কোন গ্রন্থে[২] চৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর বিরাগ বিষয়ে দুই একটি কাহিনী পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কাহিনীগুলির আসল উদ্দেশ্য হইতেছে চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিক মাহাত্ম্য জাহির করা। সুতরাং এই সকল কাহিনীর উপর একান্ত আস্থা স্থাপন করা যায় না।

[৪৭]

চৈতন্যচরিতামৃতে পল্লবিত কবিত্বের স্থান যদি কিছু থাকে তাহা স্বল্পই। গ্রন্থ রচনা করিবার সময় যখনই কবিরাজের মনে আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তখনই তিনি ত্রিপদী ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ত্রিপদী অংশগুলির মধ্যে যে সহজ সরল কবিত্বের প্রসাদ ও উদাত্ত গুণ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একান্ত দুর্ল্লভ। পরবর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে একমাত্র যদুনন্দন দাসই কৃষ্ণদাসের এই ত্রিপদী ছন্দের কবিত্ব ও প্রকাশভঙ্গী অনেকটা পরিমাণে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে ত্রিপদী অংশের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে আশা করি।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম　　যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ　　না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত　　শ্লোক পড়ে অদ্ভুত
শুনে দোঁহে এক মন হৈয়া।
আপন হৃদয় কাজ　　শুনিতে বসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজবীজ খাইয়া ॥

২। মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

১। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ২। বিবর্ত্তবিলাস ইত্যাদি।

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ না দেখি সে চাঁদমুখ
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম সুখ সিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥
এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥১

গ্রন্থের উপসংহারে কৃষ্ণদাস যে আন্তরিক বিনয় জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই মনকে স্পর্শ করে। বৃদ্ধ কবিরাজ পাণ্ডিত্যের আধার হইয়াও যেরূপ আত্মনিগ্রহ বা পরিহার করিয়াছেন তাহা অন্য কেহ করিলে হয়ত হাস্য-রসের উপাদান হইয়া উঠিত। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনা পড়িলে তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকে না।

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে। বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ। চৈতন্য চরিত বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা ওর-পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ বলিল।২ সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল ॥
নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার। তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
... ...
চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান। তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা। ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥

১। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ২। পাঠান্তর 'বর্ণিল।'

তৈছে এক কণ আমি ছুইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ॥
বৃদ্ধাজরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥
... ...
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ। দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ ॥
তোমা সভার চরণধূলি করিনু বন্দন। তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥
... ...
সভার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী। মোর১ বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন২ রাখিল। কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে। যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে।
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন। যা সভার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে। তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ। তোমরা এঅমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের মারফৎ গৌড়ে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরের নিকটে গ্রন্থবোঝাই সিন্দুকগুলি লুট হয়। এই সংবাদ পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী মর্ম্মাহত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এই কথা প্রেমবিলাসে আছে। হয়ত এটা কাহিনী মাত্র, তথাপি এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত গ্রন্থের অপঘাত ঘটিলে গ্রন্থকারের মৃত্যুতুল্য বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অপর প্রবাদ অনুসারে এই ঘটনার কিছুকাল পরে রঘুনাথদাস গোস্বামীর তিরোধান ঘটিলে কবিরাজ গোস্বামী দেহ রক্ষা করেন। যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দে এই দুই প্রবাদের একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে মনে হয় যে, গ্রন্থরচনার কালে রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ত্তমান ছিলেন।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের একটি টীকা রচনা করেন। বাঙ্গালা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা—ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণব সমাজে এই মহাগ্রন্থের কিরূপ আদর হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

১। পাঠান্তর 'তার'। ২। পাঠান্তর 'নাচাই'।

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

এগার

পল তখন বাড়ী ফিরে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওপরের সিঁড়িতে উঠল। ছেলেবেলায় সে যেমন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওপরের সিঁড়িতে উঠত (কোন্ বাড়ী তা এখন সে কিছুতেই মনে করতে পারে না), এখনও ঠিক তখনকার মতই তার মনে হতে লাগল·· মনে হল নিশ্চয়ই সামনে তার কোন বিপদ আসছে, যে বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে হলে, যে কাজ সে করছে, সে কাজের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখলে তবেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারে। ঘরের সামনে গিয়ে দরজার সামনে যখন দাঁড়ালে, তখন মনে হল সে অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। কিন্তু দরজা খোলবার আগে সে খানিক ইতস্ততঃ করতে লাগল। তারপর নিজের ঘরটা পেরিয়ে তার মায়ের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে তার আঙুলের গিঁঠের পিঠ দিয়ে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারতে লাগল। কোন উত্তর পাবার আগেই সে ঘরের ভেতর ঢুকলে।

সে যেন কতটা ভয়ে বেকুবের মত বললে, "মা, আমি' আলো জ্বালতে হবে না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মা বিছানায় পাশ ফিরলেন, সে শুনতে পেলে—তাঁর বিছানার নীচের খড়ের মাদুর খড়খড় করে উঠল: কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ত তাঁকে দেখতে চায় না। তাদের দুজনের আত্মা পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে সেই গাঢ় অন্ধকারে থেকেই কথা কইতে চায়, যেন তারা দুজনে এ পৃথিবীর সীমা-রেখা পেরিয়ে বাইরের দেশ কালের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

"কে তুমি? পল। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম", তাঁর ঘুম-জড়ান সুরের সঙ্গে যেন ভয় মাখানো রয়েছে। "আমার মনে হল, আমি যেন দেখছিলাম, খুব নাচ-গান হচ্ছে, আর কে একজন বাঁশী বাজাচ্ছে অতি মিষ্টি সুরে।"

মার কথায় কোন কান না দিয়েই সে বললে:

"মা, শোন। সেই স্ত্রীলোকটি—এ্যাগনিসের খুব ভারি অসুখ হয়েছে। আজ সকাল থেকেই তার ভারি অসুখ। সে হঠাৎ পড়ে গেছে, বোধ হয় তার মাথার ভেতর আঘাত লেগে কোন শির ছিঁড়ে গেছে, আর নাক দিয়ে কেবলই গল-গল করে রক্ত পড়ছে।"

"সেকি, তুমি কি বলছ? তুমি সত্যি এ কথা বলছ, না · সত্যি তার কি বড় বিপদের কথা?"

ঘোর অন্ধকারে তাঁর স্বর যেন ভয়ে কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে যেন একটা ঘোর অবিশ্বাসের সুর মাখান। পল তখন না থেমে একেবারে সেই দাসীটা হাঁপাতে-হাঁপাতে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলি মার কাছে আবার বলে গেল।

"আজই সকালে এ ঘটনা হয়েছে, আমার সেই চিঠিখানা পাবার পর। সারা দিন সে কিছু খেতে চায় নি, মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়েছিল। আজ এই সন্ধ্যায় সময় তার অবস্থা আরো খারাপ হয়, তার পর হাত পা খেঁচুনি আরম্ভ হয়। সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।"

পল বেশ জানে যে, সব কথাই সে বাড়িয়ে বলছে। সে থেমে গেল। মা কিন্তু একটা কথাও বলছেন না। কয়েক মুহূর্তের মত সেই নীরব অন্ধকারে, যেন মরণের টানাটানি চলেছে। যেন দুই প্রবল শত্রু পরস্পর মুখোমুখী হয়েছে অন্ধকারে লড়াই করতে, অথচ কেউ কাকেও খুঁজে পাচ্ছে না। আবার সেই খড়ের মাদুর খড়খড় করে উঠল। সেই উঁচু বিছানায় তার মা নিশ্চয় এবার উঠে সোজা হয়ে বসেছেন, কেননা তাঁর স্বর এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, আর খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে যেন আওয়াজটা আসছে বলে বোধ হল।

"পল, কে তোমাকে এ সব খবর দিলে? হয়ত এ সব সত্যি নাও হতে পারে।" আবার তার মনে হল, যেন তারই বিবেক মায়ের ভেতর দিয়ে তার সামনে এসে কথা কইছে। সে তার মুখও অন্ধকারে যেন দেখতে পাচ্ছে।

"হ্যাঁ, তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সেটা ত' কথা নয় মা, সে কথা নয়। আমার ভয় হচ্ছে সে না একটা কিছু করে বসে। সে সেই বাড়ীতে একলা, কেবল কতকগুলো দাসী তাকে ঘিরে রেখেছে। তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমাকে।"

পল তার গলার স্বর হঠাৎ একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বললে, "আমি নিশ্চয়ই গিয়ে দেখা করব।" কিন্তু এ চেঁচিয়ে বলার অর্থ মাকে ধমকান নয়, নিজেকে নিজে দাবিয়ে রাখাই এর উদ্দেশ্য।

"পল, তুমি প্রতিজ্ঞা শপথ করেছ আমার আছে।"

"আমি তা জানি যে, আমি শপথ করেছি, সেই জন্যেই ত সেখানে যাবার আগে তোমার কাছে সে কথা বলতে এসেছি। আমি তোমায় বলছি যে তাকে দেখতে যাওয়া আমার অত্যন্ত দরকার, আর যাওয়াই উচিত। আমার বিবেক আমাকে বলছে যে 'তুমি সেখানে যাও'।"

"পল, তুমি সোজা একটা কথা আমায় বল সত্যি তোমার সঙ্গে পথে দাসীর দেখা হয়েছিল ·· নিশ্চয়? প্রলোভনের খেলা, অনেক সময় অনেক রকমে খেলা করে। শয়তানের অনেক রকম ছদ্মবেশ আছে, সে হরেক রকম রূপে মানুষকে ছলনা করে।"

সে তার মায়ের কথা ঠিক বুঝতে পারলে না।

"তুমি কি বলছ, আমি কি তোমার কাছে মিছে কথা বলছি? আমার সঙ্গে সে দাসীর দেখা হয়েছিল।"

"শোন পল, গত রাত্রে আমি আবার সেই বুড়ো পাদরীর ভূত দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে, এখন যেন তার পায়ের শব্দ বেশ শুনতে পাচ্ছি।" তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "গত রাত্রে, সে আমার এই বিছানার পাশে এসে বসেছিল। আমি বলছি, আমি তাকে দেখেছি। সে দাড়ি কামায় নি। আর তার যে কটা দাঁত বাকী আছে, তা চুরুটের ধোঁয়ায় একেবারে কাল হয়ে গেছে। তার মোজায় কতকগুলো বড় বড় ফুটো দেখা যাচ্ছিল। সে বললে :

'আমি বেঁচে আছি, এইখানেই আছি, আর শীগ্‌গির তোমাকে আর তোমার ছেলেকে এই গির্জ্জেবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব,' সে আবার আমাকে বললে যে, তোমার বাপের ব্যবসাই তোমাকে শেখান উচিত ছিল, যদি তুমি পাপে না পড়তে চাও, যদি তুমি তোমার ছেলেকে পাপ থেকে বাঁচাতে চাও। আমার মনটা সে এমন ওলট-পালট করে দিয়েছে, পল, যে, আমি এ সব ঠিক কাজ করেছি কি ভুল কাজ করেছি, তার কোন বিচার করতে পারছি না। কিন্তু একথা স্থির নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, শয়তান কাল রাত্তিরে এইখানে এসে বসেছিল, আমার পাশে। সে নিশ্চয়ই শয়তানের আত্মা। যে দাসীর মূর্ত্তি তুমি পথে দেখেছ, সে সেই শয়তানের প্রলোভন দেখাবার একটা ছদ্মরূপও ত' হতে পারে।"

পল অন্ধকারে একটু হাসলে। তবুও যখন তার মনে পড়ল, সেই দাসীর অদ্ভুত মূর্ত্তি মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে, তার নিজের মনের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও তার কেমন একটা যেন ভয় হতে লাগল।

তখন তার মার গলা শোনা গেল আবার—"যদি তুমি আবার সেখানে যাও, তুমি কি নিশ্চয় করে বলতে পার যে তোমার আর পতন হবে না? এমন কি, যদি সত্যিই তুমি সে দাসীর মূর্ত্তি দেখে থাক, আর সেই স্ত্রীলোকটি, এ্যাগনিস সত্যিই যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তুমি ঠিক জান যে তোমার আর কোন রকমে পতন হবে না? কখনও পতন হবে না?"

মা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন : তিনি যেন সেই অন্ধকার ঘরের ভেতর গাঢ় আঁধার ছায়ার ভেতর দিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর ছেলের মুখ রক্তহীন, একেবারে পাঙাশ হয়ে গেছে। মায়ের মায়া, তাঁর বড় দুঃখ হল। কেন তিনি তাঁকে সেই মেয়েটির কাছে যেতে এমন করে বারণ করছেন, এত বাধা দিচ্ছেন? যদি এমনই হয় যে এই দুঃখের ভারে এ্যাগনিসের প্রাণ যায়? যদি আমারই পল এই দুঃখে শেষে মারা যায়? একটা ঘোর অনিশ্চয়তার যাতনায় মার বুকের ভেতরটা ভরে উঠল। যেমন কাঠের জাঁতায় ফেলে শাস্তি দেয়, তার যেমন অসহ্য যাতনা, মার তেমনি মনে হতে লাগল।

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগবান!" তার পরই মনে হল, তিনি ত' অনেক দিনই ভগবানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এসব বিপদ, এসব অবান্তর দুঃখের মীমাংসা করতে শুধু ভগবানই পারেন, আর ত' কারুও হাত নেই। তাঁর একটু যেন স্বস্তি এল, এ সব মীমাংসার জটিল ব্যাপার ত' তিনি শেষ করেছেন। কেন, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাঁর হাতে নিজেকে সব রকমে ফেলে দিয়ে, তাঁকে বিশ্বাস করে, তিনি কি সকল দ্বিধার মীমাংসা শেষ করেন নি?

আবার তিনি বালিশে মাথা দিয়ে শুলেন।

"যদি তোমার বিবেক তোমাকে বলে—যাও...তবে এখানে না এসে, কেন তুমি সেখানে গেলে না?"

"কারণ আমি তোমার কাছে শপথ করেছি যে, মা। তুমি আমায় ভয় দেখিয়েছ যে, যদি আর কখন আমি সে বাড়ী ফিরে মাড়াই, তাহলে তখনি তুমি যে চলে যাবে। আমি যে শপথ করে...।" অতি কাতর দুঃখের সঙ্গে পল বললে। তার ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে এইটে মনে হচ্ছিল যে, সে খুব চেঁচিয়ে বলে, "মাগো, জোর করে আমার শপথ রাখাও, আমার শপথ কখনও ভাঙতে দিয়ো না।"

কিন্তু পলের মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। তখন তার মা আবার বললেন :

"তবে যাও, যা তোমার বিবেক বলে, তাই তুমি কর।"

মায়ের বিছানার কাছে এসে পল তখন বললে, "ভেবোনা মা, অত উৎকণ্ঠিত হয়ো না।" কয়েক মুহূর্ত্ত পল নিঃশব্দে সেখান দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই একেবারে স্তব্ধ। পলের মনে হতে লাগল, যেন সে একটা বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে, আর তার মা সেইখানে বসে আছেন, যেন একটা মহারহস্যময় দেবমূর্ত্তি। এখনি তার স্মরণ হল, যখন সে সেই সেমিনারি স্কুলে পড়ত, তখন তার পাপ-দেষণার সময়, তাকে মায়ের সেই শুখনো, চাকরাণীর মত শক্ত চামড়া-কোঁচকান হাতে চুমু দিতে হত। তাকে বাধ্য হয়েই দিতে হত। ঠিক সেই সময়ের মতই, তার মনের ভেতর এখন ঘৃণা হতে লাগল। আবার ঠিক সেই একই রকমে, একদিকে ঘৃণা, আর অন্যদিকে আনন্দের উৎসাহ তাকে টেনে এনেছে। তার মনে হল, যদি সে একেবারে পুরো একলা হত, তা হলে অনেক আগেই ফিরে সে এ্যাগনিসকে দেখতে যেত, সারাদিন এই লড়াই করা আর ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতরই। কিন্তু তার মা শুধু তাকে বাধা দিয়ে আটকে রেখেছেন, তার জন্যে সে তার মার কাছে খুব কৃতজ্ঞ, না আর কিছু?

"মা তুমি কিছু ভেবো না।" তবু সারাক্ষণই সে মনে করছে আর ভয় পাচ্ছে যে, মা এখনিই হয়ত আরো কিছু বলবেন। অথবা হয়ত আলোটা জ্বেলে ফেলবেন। সেই আলোতে তার চোখের ভেতর পর্য্যন্ত দেখে, ঠিক করবেন তাঁর ছেলের মনের ভেতর অন্য কোন কিছু আছে কি না, সে সব চিন্তার লেখা পড়তে পারা যায় কি না। তাই পড়ে নিশ্চয় তাকে সেখানে যেতে বারণ করবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আবার সেই খড়ের মাদুর খড়্‌খড় করে উঠল। মা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পল বের হয়ে গেল।

সে ভাবলে যে, যাই হোক সে ত' একটা পাজী লোক নয়, আর সেখানে কোন মন্দ উদ্দেশ্যেও যাচ্ছে না বা কামনার তাড়ায় সেখানে যাচ্ছে না। সে ধর্ম্মতঃ বুঝে, ভেবে দেখে যাচ্ছে যে, যদি কোন বিপদই ঘটে, সে বিপদকে কাটিয়ে নেবার জন্য। আর সত্যিই যদি কোন বিপদ ঘটে, সে বিপদের জন্য

দাসী কে ? সেইত নিজে। তখনি আবার তার মনের সামনে দেখতে পেলে জ্যোৎস্নার আলো-পড়া মাঠের ঘাসের ওপর দিয়ে এ্যাগনিসের সেই দাসী ছুটে চলেছে, আর তার দিকে সেই কাল জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে ফিরে ফিরে দেখছে আর বলছে, "আমার ছোট্ট মনিব-ঠাকরুণ আপনি এলে অনেকখানি সাহস পাবেন।"

এখন তার মনে হতে লাগল, এ্যাগনিসের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা, তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করা, অতি হীনের কাজ, অতি নির্ব্বুদ্ধির কাজ হয়েছে। তার প্রথম কর্ত্তব্যই ছিল তখনি আগে ছুটে তার কাছে যাওয়া, তাকে সাহস দেওয়া, তাকে বোঝান। মাঠটা চাঁদের আলোয় রূপার মত চকচক করছে, যেমন আলো দেখে পোকা আলোর পানে চলে, ছুটে মাঠ পেরিয়ে যেতে পলের একবার নিজেকে তাই বলে মনে হল।

এ্যাগনিসকে দেখতে যাওয়া, তাকে আবার দেখতে পাওয়ার জন্য যে আনন্দ, তার সুখ, তার তৃপ্তিটুকু পেয়ে সে মনে করলে যে, সে এ্যাগনিসকে রক্ষা করতে যাচ্ছে, তার নিজের দায়িত্ববোধে কর্ত্তব্য করবার জন্যে ছুটেছে। মঠো ঘাসের যত সুগন্ধ, যত স্নিগ্ধতা, চাঁদের নরম আলোয় যতখানি মমতা তাই দিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছে তার মন, প্রাণ, তার আত্মাকে, সকল মলিনতা থেকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে নিচ্ছে। আর যেন সেই রাতের আকাশের শিশিরকণা তার মরণের মত কালো পোষাকের উপর পড়ে, তাকে নতুন করে সব রোগ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে।

এ্যাগনিস! এ্যাগনিস! ছোট্ট মনিব-ঠাকরুণটি! সত্যিই ত, ছোট্ট; ছোট মেয়েরই মত দুর্ব্বল। একলা সে, নেই বাপ, নেই মা। পাথরের ঢিপির ধারে অন্ধকার তার বাড়ী। আর সে তার উপর সেই সুযোগ নিয়ে, খালি বাড়ী পেয়ে, বাসা থেকে পাখীর ছানা যেমন হাতের মুঠোর ভেতর নেয়, তেমনি করে নিয়ে, এমন করে চেপে ধরেছে যে, তার দেহের সমস্ত রক্তটা একেবারে সব চলে গেল।

পল তাড়াতাড়ি দৌড়ল। না, সে কখনও খারাপ লোক নয়। কিন্তু যখন সে বাড়ীর সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে দাঁড়াল, যেখান দিয়ে বাড়ীর দরজায় ঢুকতে হয়, সেইখানে সে হোঁচট খেলে। মনে হল, যেন বাড়ীর চৌকাঠের ধারের প্রত্যেক পাথরখানা তাকে ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে উঠল, ভয়ে ইতঃস্তত করতে করতে দরজার কড়ায় হাত দিয়েই ছেড়ে দিলে আবার কড়ায় নাড়া দিলে। সাড়া পেতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকখানি হীন বলে তার মনে হল। জগতে কি এমন কারণ ঘটল যে, সে আবার এই দরজায় এসে কড়া নাড়লে। অনেক পরে দরজার মাথার উপরের আলো জ্বলে উঠল, আবার সেই মেয়েটি এসে দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল সেই ঘরে, সে ঘরের কথা পলের খুব ভাল জানা আছে।

ঘরের সবই ঠিক তেমনই আছে, কোন বদল হয়নি। অন্য অন্য রাত্রিতে যেমন সে ঘর দেখেছে ঠিক তেমনিই ত' রয়েছে, যখন সেই বাগানের ছোট দরজা দিয়ে এ্যাগনিস তাকে চুপি চুপি লুকিয়ে ঘরে নিয়ে যেত। সেই ছোট দরজাটা খোলা পড়ে আছে। শব্দ হচ্ছে। সেই ফাঁকটুকুর ভেতর দিয়ে, বাগানের ঝোপ থেকে রাত্তিরের বাতাস কি একটা সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে। দেয়ালে হরিণের মাথায় সেই কাঁচের চোখগুলো আলো পড়ে জ্বলছে, যেন সে ঘরে কি হয়ে গেছে, তার সব নিখুঁত খবর টুকে নিতে চায়। আগের রাত্রির বিপরীত। আগে ভেতর দিককার ঘরের দরজা বন্ধ থাকত, আজ সে সব খোলা। দাসীটা সেইদিকের পথ দিয়ে ভেতরে চলে গেল, তার ভারি পা ফেলায় কাঠের মেঝেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে লাগল। খানিক পরে একটা দরজা ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল যেন হঠাৎ একটা ঝড়ের ধাকায় দরজাটা পড়ল, সমস্ত বাড়ীটা কেঁপে উঠল। পল একটু এগিয়ে যেতেই সামনে দেখলে, ভেতরের ঘরের গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে এ্যাগনিস বেরিয়ে এল। মুখখানা একেবারে সাদা, আলুথালু চুলের রাশ এদিক-ওদিকে কাল থোকার মত মুখের ওপর এসে পড়েছে, ঠিক যেন একটা জলে ডোবা মেয়ের ভূতের মত। তারপর সেই ছোট মূর্ত্তিটা আলোর কাছে এল। পল হঠাৎ ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

এ্যাগনিস তার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, তার গায়ে ঠেসান দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। সে যেন দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, পল ছুটে এল তার দিকে। হাত বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু তাকে ছুঁতে তার সাহস হল না।

"কেমন আছ এ্যাগনিস?" অতি আস্তে পল কথাটা বললে, আগে দেখা হলে সে যে কথা বলত। কিন্তু সে কোন উত্তর দিলে না, তার সারাটা দেহ কাঁপছে, দুহাতে দরজা চেপে পিঠ দিয়ে রয়েছে, এখনি বুঝি পড়ে যায়।

একটু থেমে পল বললে: "এ্যাগনিস, আমাদের সাহসী হতে হবে।"

ঠিক যেমন সেই দিনই ভূতে-পাওয়া মেয়েটির কাছে সে বাইবেল পড়েছিল, তখনকার স্বর যেমন তার নিজের কাছে মিথ্যে ছলনা বলে মনে হয়েছিল, এও ঠিক তেমনি লাগল। যেই এ্যাগনিস চোখ তুললে, অমনি পলের চোখ মাটীর দিকে নীচুতে নামল। এ্যাগনিসের দৃষ্টি তাকে পাগল করে দিলে। হ্যাঁ, সে তাকানি যেমন ঘৃণা তেমনি আনন্দে ভরা।

"তবে কেন তুমি আবার এলে?"

"আমি শুনলাম তোমার অসুখ করেছে।"

গর্ব্বভরা ঝাঁঝাল মূর্ত্তিতে সে খাড়া সোজা হয়ে উঠল, কপালের চুলগুলো মুখ থেকে সরিয়ে দিলে।

"আমি বেশ ভাল আছি, আমি ত' তোমায় ডেকে পাঠাই নি।"

"আমি তা, জানি কিন্তু সে একই কথা, আমি এসেছি—আমি যে আসব না এখানে, এমন ত' কোন কথা নেই। তুমি বেশ সুস্থ আছ দেখে আমি খুসী, আনন্দিত হলাম, তোমার দাসী তোমার অসুখের কথাটা বড় বাড়িয়ে বলেছিল।"

এ্যাগনিস আবার পলের কথায় বাধা দিয়ে বললে: "না, আমি দাসীকে তোমায় ডেকে আনতে পাঠাই নি, তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি, কিন্তু যখন তুমি এসেছ, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি জানতে চাই, কেন তুমি এমন কাজ করলে,…কেন? কেন?"

কান্নার ফোঁপানিতে তার কথা আটকে গেল, তার হাত অন্ধের মত একটা ঠেকনো খুঁজতে লাগল। পল অত্যন্ত ভয় পেলে, সে কেন ফিরে এখানে

এল তার জন্য তার দুঃখ ও অনুতাপ হল। সে তার দুটি হাত ধরে, কৌচের কাছে গিয়ে বসলে, যেখানে তারা অন্যান্য রাত্রে এক সঙ্গে বসে থাকত। কৌচের যে জায়গায় অন্য মেয়েরা বসে বসে একটা নীচু গদির মত করে ফেলেছে, সেইখানে অ্যাগনিসকে বসিয়ে সে তার পাশে গিয়ে বসল।

তাকে ছুঁতে তার ভয় হতে লাগল। সে যেন একটা সুন্দর পাথরের ভাস্কর্য্য, যাকে সে নিজে হাতে ভেঙে আবার সব জুড়ে দিয়ে বসিয়েছে। সে মূর্ত্তি ঠিক আস্ত হয়েই বসে আছে বটে, কিন্তু একটু সামান্য নাড়া পেলে এখনি আবার টুকরো হয়ে পড়ে যাবে। সে তাকে ছুঁতে ভয় পেলে। সে ভাবতে লাগল :

"এই ভাল হবে। আমি এখন নিরাপদ—"

কিন্তু তার অন্তরের ভেতর সে জানে যে, এখুনি সে নিজেকে এক মুহূর্ত্তেই হারিয়ে ফেলতে পারে। সেই জন্য তাকে ছুঁতে তার ভয় হচ্ছে। আলোর নীচে সে বিশেষ লক্ষ্য করে এ্যাগনিসের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে, তার চেহারার সবটাই যেন বদল হয়ে গেছে। মুখখানায় ঠোঁট দুটির রং বদলে গেছে, গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে যেমন পোড়া রক্তের মত ধোঁয়াটে হয়ে যায় তেমনি। ডিমের গড়নের মত মুখ যেন লম্বা হয়ে গেছে। গালের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়েছে, চোখ দুটো যেন গর্ত্তের ভেতর ঢুকে গেছে, আর তার চারধারে কে নীল ঢেলে দিয়েছে। এক দিনের দুঃখে তার যেন বিশ বছরের বয়েস একেবারে বেড়ে গেছে, তবু সেই ঠোঁট দুটিতে তখনও কি যেন ছেলেমানুষের ভাব মাখান রয়েছে। জোর করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রেখে তার কান্নাকে সে থামিয়ে রেখেছে। আর সেই ছোট হাত দুখানি, অসাড় হয়ে কৌচের কাল অন্ধকারে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। যেন তার হাত মেলাবার জন্যেই তাকে সে হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

রাগে তার শরীরটা জ্বলে যেতে লাগল, কেন না তার সাহস হচ্ছে না যে, সে সেই ছোট হাতখানি তার নিজের হাতের মধ্যে নেয়। তাদের এই দুটি জীবনের ছেঁড়া শিকল যদি আবার জোড়া লাগে! তার মনে পড়ে গেল সেই বাইবেলের ভূতে পাওয়া লোকটার কথা, "তোমার সঙ্গে আমার কি দরকার?" তারপর সে কথা বলতে আরম্ভ করলে, তার নিজের দুই হাত জোড় করে চেপে ধরে, পাছে এ্যাগনিসের হাত আবার তাকে ধরতে হয়। কিন্তু তবু তার স্বর যে ছলনা আর মিথ্যায় ভরে রয়েছে সে তা স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছে। সেদিন সকালে যখন সে গির্জ্জেয় বাইবেল পড়ছিল, আর যখন সে সেই বুড়ো শিকারীর মরবার সময় পবিত্র রূপোর পেটটা নিয়ে গিয়ে শেষ উপাসনা শোনাচ্ছিল সে জানে সে সবই এমন মিথ্যেয় ভরা তার কাছে।

"এ্যাগনিস, শোন আমার কথা, গত রাত্রে আমরা দুজনে একেবারে ধ্বংসের গভীর অতলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভগবান আমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর আমরা সেই গভীর খাদের ধারে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ভগবান এখন আমাদের দুজনের হাত ধরেছেন, তিনিই এখন আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন আর পড়ব না, এ্যাগনিস, এ্যাগনিস!" পলের গলা কাঁপতে লাগল, যখন সে এ্যাগনিসের নাম মুখে উচ্চারণ করলে। "তুমি কি মনে কর যে, আমি সহ্য করছিনে? আমার মনে হচ্ছে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে, আর আমার এ যাতনা অনন্ত কাল ধরেই চলবে। কিন্তু এ আমাদের ভালর জন্য সহ্য করতেই হবে, তোমার মুক্তির জন্য তোমাকে এ সহ্য করতেই হবে। শোন এ্যাগনিস, সাহস কর, সাহস কর, যে প্রেম আমাদের দুজনকে এক করেছে তার জন্য, সেই প্রেমের দোহাই, সাহস কর, কারণ ভগবানের যে বিশেষ সৎ ইচ্ছা, যে দয়া আমাদের উপর আছে, তিনিই আমাদের এই মহা যাতনা দিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। তুমি আমায় ভুলে যাবে। তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সামনে তোমার সমস্ত জীবনটাই যে পড়ে রয়েছে। যখন তুমি আমার কথা ভাববে, তাকে একটা দুঃস্বপ্ন মনে কর। মনে কর, তুমি যেন উপত্যকায় পথ হারিয়ে গিয়েছিলে, যেন কোন শয়তান লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল যে, তোমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন, তুমি যে রক্ষা পাবার জন্যেই জন্মেচ এ্যাগনিস! আজ এখন সব তোমার কাছে কাল অন্ধকার দেখাচ্ছে, যখন এ অন্ধকার কেটে যাবে, তখন তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, আমি শুধু তোমায় যে ক্ষণিকের দুঃখ দিয়েছি বা এখন দিচ্ছি, আমি শুধু তোমার হয়ে তোমার ভালর জন্যে তোমার পক্ষ হয়ে এ-কাজ করছি। যেমনও কখনও কখন রোগীকে বাঁচানর জন্যে আমরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হই, তাকে যন্ত্রণা দিই...।"

পল থেমে গেল, পরের কথাগুলো যেন তার গলার ভেতর জমে বরফ হয়ে গেল। এ্যাগনিস তখন নিজেকে জাগিয়ে তুলেছে। সোফার একটা কোণে সোজা হয়ে জোর করে বসেছে। দেয়ালের হরিণের কাঁচের চোখের মত তার চোখ জ্বলছে। সে তাকানি পলকে স্মরণ করিয়ে দিলে, গির্জ্জেতে মেয়েরা উপদেশ শোনবার সময় এমনি ভাবে তাকায়। সে তার প্রতি রেখায় কথার জন্য অপেক্ষা করছিল, ধীরভাবে তার সেই ঠুনকো নরম দেহের রেখায় একটা নম্র ভাব, কিন্তু ছুঁলেই যেন ভেঙে পড়বে। তারপর পল, মুখে তার কথা নেই, শুনতে পেলে। আস্তে আস্তে এ্যাগনিস শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বললে : "না, না, একথা একেবারে সত্যি নয়।" পল তার ব্যাথায় ভরা মুখখানা নীচু করে বললে : "তবে সত্যি কথাটা কি?"

"কেন তুমি কাল রাত্রে এসব কথা বল নি? অন্য রাত্রেই বা কেন বলনি? কারণ তখন সত্যিটা ছিল অন্য রকমের, না? এখন কেউ হয়ত তোমার এ কীর্ত্তি ধরে ফেলেছে, হয়ত তোমার মা নিজেই ধরেছেন, এখন জগতের লোকের কাছে ভয় পাচ্ছ। ভগবানের ভয়ে তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছ, ভগবান তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছেন!"

পলের ইচ্ছা হল সে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, তাকে চড় মারে। সে তার হাত ধরলে, তার হাতের সেই সরু কবজী মুচড়ে ধরলে, যেন নিজের

কথাগুলো তাকে মুচড়ে-দুমড়ে দম বন্ধ করে রাখতে চায়। তারপর সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়ালে।

"তবে কি? তুমি কি মনে কর, তাতে কিছুই আসে যায় না? হাঁা, আমার মা সবই জানতে পেরেছেন। তিনি আমার কাছে সব কথা বলেছেন, যেমন আমার বিবেক আমার সামনে এসে কথা বলেছে। তোমার কি বিবেক বলে কোন কিছু নেই? তুমি কি মনে কর, যারা আমাদের উপর সকল রকমে নির্ভর করে, তাদের আঘাত করা, তাদের ক্ষতি করা, আমার পক্ষে ঠিক ন্যায় কাজ? তুমি চাও যে আমরা এখান থেকে চলে যাই, অন্যত্র গিয়ে এক সঙ্গে বাস করি। তোমার টাকা আছে। সে কাজটা করা হয়ত ঠিক হত যদি আমরা আমাদের এই প্রেম, এই ভালবাসাকে জয় না করতে পারতাম। কিন্তু যখন দেখছি যে, আমাদের এই পালান, এই পাপ, যারা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাদের একেবারে কেটে ছেঁটে ফেলে দিতে চায়, তখন তাদের জন্য আমাদের প্রেম, এ ভালবাসার যে সুখ ও আনন্দ তা আমাদের ত্যাগ করতেই হবে।"

কিন্তু এ্যাগনিস তার এসব কথা যে বুঝতে পারলে তা মনেই হল না। শুধু আগের মত আবার তার মাথা নাড়লে, বললে: "বিবেক? বিবেক? নিশ্চয়ই বিবেক আমার আছে বৈকি। আমি ত' এখন আর কচি খুকীটি নই। এখন আমার বিবেক বলছে যে, তোমার এসব কথা শুনে আমি একটা অতি গর্হিত কাজ করেছি, তোমাকে এখানে আসতে দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছি। এখন কি করা যায়? এখন আর সময় নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমেই কেন তোমার ভগবান তোমাকে এসব গুলো পরিষ্কার করে দেখান নি? আমি নিজে তোমার বাড়ী যাইনি, তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ। আমি যেন একটা ছেলেমানুষের খেলার পুতুল, তুমি আমাকে নিয়ে খেলেছ। আমি এখন কি করি বল? বল, বল আমায়। আমি যে তোমায় ভুলতে পাচ্ছি নি। তুমি যেমন বদলে যেতে পেরেছ, আমি তেমন বদলাতে পারিনি। তুমি যদি আমার সঙ্গে নাও যাও, তবু আমি চলে যাব। আমি চেষ্টা করতে চাই তোমাকে ভুলে যাবার জন্য। আমি সোজা চলেই যাব, না হলে…"

"না হলে?"

এ্যাগনিস আর কথার জবাব দিলে না। সে পিছিয়ে চলে তার কোণ ঘেঁসে বসল। সে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কি যেন এক ভয়ানক অনাসৃষ্টি, একটা মত্ততার কাল পাখা ছড়িয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে, তাকে ছুঁয়েছে। তার চোখ যেন ঘোর ঝাপসা হয়ে আসছে, সে হাত তুলে সেই ছায়াটাকে মুখের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল। পল আবার একটু তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, হাত বাড়িয়ে সেই পুরোনো কৌচটার ধার আঙুল দিয়ে জোর করে চেপে এমন করে ধরলে যে, তার সেই পুরোনো কাঠ-কাঠরা যেন গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, যেন তাদের দুজনের মাঝের যে দেয়াল, যা তাদের দম বন্ধ করে দিচ্ছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

সে যেন আর কথা কইতে পারছে না। হাঁ, তাই ঠিক, এ্যাগনিসই ঠিক বলেছে। যে অজুহাত দেখিয়ে, তার মানে বুঝিয়ে সে সত্য বলে তাকে বোঝাতে গিয়েছিল, সেটা ত' সত্য নয়—সত্য তাদের মাঝখানে এসে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে তাদের যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছিল, তাকে কি করে যে ভাঙতে হবে, তা সে জানে না। পল সোজা হয়ে বসল, তার যেন কে গলা টিপে ধরেছে, তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে লড়াই করতে লাগল। এখন এ্যাগনিস তার হাত চেপে ধরেছে, তার সেই সরু সরু আঙুল দিয়ে এমন জড়িয়েছে যেন আঁকড়ে চেপে রাখবার বড়শী দিয়ে গেঁথে ধরেছে।

"হা ভগবান!" অতি আস্তে এ্যাগনিস বললে, এক হাত দিয়ে তার চোখ চেপে বললে, "যদি ভগবান থাকে, যদি আমাদের তফাৎ হতেই হয়, তাঁর উচিত ছিল না যে আমাদের এ মিলন ঘটান। আমি জানি, তুমি যে আজ রাত্রেও এখানে এসেছ, তার কারণ তুমি এখনও আমায় ভালবাস। তুমি কি মনে কর যে আমি তা জানি না? আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি সেইটেই সত্যি—সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস।"

সে তার মুখখানা পলের মুখের কাছে তুলে ধরলে, তার ঠোঁট কাঁপছে, তার চোখের পাতা জলে ভিজে গেছে। আর পল, তার চোখও জল ভরা, সেই জলের গভীরতায় সেও—সেও যেন জ্বলছে, এমন একটা—তা জ্বলুক, যে আলোয় অন্ধ করে দেয় তাই আবার পথও দেখিয়ে দেয়। আর যে মুখখানা সে এখন দেখছে, সে যেন এ্যাগনিসের মুখ নয়, কোন পৃথিবীর কোন নারীর মুখ নয়, সে যেন তার প্রেম, তার ভালবাসার মুখ। পল ঝাঁপিয়ে এ্যাগনিসের দুই বাহুর বেষ্টনে পড়লে, তার মুখে দীর্ঘ আগ্রহের চুম্বন দিলে। আবার দুজনে এক হয়ে গেল।

বারো

পলের কাছে তখন জগত লুপ্ত হয়ে গেল। তার বোধ হল, সে যেন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে, গভীর সমুদ্রের জলের একটা ঘূর্ণীপাকের ভিতর, তাকে নিয়ে যাচ্ছে, যেন এক আলোভরা, অবিরাম জ্যোতি-ছড়ান দেশে, সমুদ্রের একেবারে অতলে। তারপর আবার তার জ্ঞান এল, এ্যাগনিসের মুখ থেকে সে ঠোঁট সরিয়ে নিলে। মনে হল যে, সে একটা জাহাজডুবি লোক, এসে পড়েছে বালির চড়ায়। নিরাপদ হয়েছে বটে, কিন্তু হাত পা ভেঙে গেছে। আনন্দে ও ভয়ের মাঝখানে কাঁপছে, কিন্তু আনন্দের চেয়ে ভয়টাই বেশী। যে মোহ সে মনে করেছিল একেবারে চিরকালের জন্য তার ভেঙে গেছে, আর ঠিক সেই কারণেই যে মোহকে তার মনে হয়েছিল অতি সুন্দর আর দুর্মূল্য, সে মোহ আবার তার জাল নূতন করে বুনানি সুরু করে দিয়ে আবার তাকে তার কেনা দাস করে নিলে। আবার তার কানে এ্যাগনিসের সেই প্রেমমাখা, মধুর আস্তে-আস্তে-কথা এল:

"আমি ত জানি যে, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।"

পলের আর শোনবার কোন ইচ্ছে নেই, আন্টিয়োকাসদের বাড়ীতে সে যেমন সেই দাসীর মুখে গল্প শুনতে চায় নি। এ্যাগনিসের মুখের উপর তার হাতখানা রেখেছে। এ্যাগনিস তার মুখখানা পলের কাঁধের কাছে রেখেছে। পল আস্তে আস্তে তার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে আদর করছে, তার উপর ল্যাম্পের আলো পড়ে সোনার মত দেখাচ্ছে। সে এত

ছোট, এত অসহায়, একেবারে তার হাতের মুঠোর ভেতর। অথচ তার ভেতরেই এত বড় ভয়ানক ক্ষমতা যে, তাকে টেনে সমুদ্রের অতলে নিয়ে যাচ্ছে, স্বর্গের সব চেয়ে উঁচুতে তাকে তুলে দিচ্ছে, তাকে তার নিজের ইচ্ছা, নিজের আকাঙ্ক্ষা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তারই হাতের পুতুল করে তুলেছে।

সে যখন উপত্যকা দিয়ে, পাহাড় বেয়ে ছুটে পালাচ্ছে, এ তখন তার ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, নিশ্চয় জানে যে, সে তার কাছ ফিরে আসবে, আর সে সেই ফিরেই এল।

"তুমি জান, তুমি জান,"...সে তাকে আরও কিছু বলতে লাগল। তার সেই মৃদু নিঃশ্বাস তার ঘাড়ে লেগে যেন আদর করছে। সে তার মুখের উপর আবার হাত দিলে, আর সে তার হাত চেপে ধরে রইল। এমনি করে দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর পল নিজেকে টেনে তুলে, তার ভাগ্যকে জয় করবার জন্য একটা ভীষণ চেষ্টা করলে। সেত তার কাছে ফিরে এসেছে, হাঁ, কিন্তু যে মানুষটিকে সে চেয়েছিল, সেত আর ঠিক সে মানুষটি নয়। তখন পলের চোখ তার সেই সোনার মত ঝকঝকে চুলের উপর পড়ে রয়েছে, কিন্তু এ যেন অন্য কোন পদার্থ, যেন কোন্ সমুদ্রের মধ্যে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল দেশের বস্তু।

পল তখন আস্তে আস্তে বললে:

"এখন ত' তুমি সুখী। আমি এখানে আছি, আমি ফিরে এসেছি, আর আমি তোমারই, যতদিন এ জীবন থাকবে। কিন্তু তুমি শান্ত হও, তুমি আমাকে একটা ভয়ানক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। এমন করে নিজেকে উত্তেজিত কর না, আর কখনও জীবনের যে সোজা পথ সে পথ থেকে অন্য আর কোন পথে ঘুরে বেড়িও না। আর আমি তোমাকে কখনও কোন কষ্ট দেব না, কিন্তু তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি শান্ত হয়ে থাকবে এখন যেমন আছ তেমনি—বল।"

পল বুঝতে পারলে, সে দেখলে যে, এ্যাগনিসের হাত তার হাতের ভেতরে থেকেও কাঁপছে, তার মনে হল যে, সে নূতন করে বিদ্রোহ সুরু করছে। পল বেশ জোর করে তার হাত ধরে রইল, যেন সে তার আত্মাকেও এমনি করে বন্দী করে রাখতে চায়।

'এ্যাগনিস, শোন, তুমি ত' কখনও জানবে না যে, সারাদিন আজ আমি কি যাতনাই ভোগ করেছি, কিন্তু তার দরকার ছিল। আমার ভিতর যা কিছু অপবিত্র ছিল তাতে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রক্ত ঝরে পড়েছে ততক্ষণ তাকে চাবকেছি। কিন্তু এখন আমি তোমারই, কিন্তু সে শুধু মনে, আত্মায় আত্মায়··তুমি দেখেছ" পল বলে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে বিনিয়ে বিনিয়ে, তার বুকের, প্রাণের ভেতর থেকে,...যেন সে তার প্রিয়তমাকে আরাধনার ফুল উপহার দিচ্ছে। "তোমার বোধ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেন অনন্ত কাল ধরেই ভালবেসে আসছি। হাজার হাজার বছর ধরে দুজনে একসঙ্গে আনন্দ করেছি, দুজনে একসঙ্গে যাতনা পেয়েছি। একজন একজনকে ঘৃণা করেছি, আনন্দে ঘৃণার জীবন বয়ে চলেছি, এমন কি মৃত্যুতে পর্য্যন্ত। এ সমুদ্রের যত ঝড়, আর যত ঢেউ, জীবনের যা কিছু, আমাদের সব তোলপাড় করে দিয়েছে। সবই প্রাণের ভেতরের কথা, যে জীবন আমাদের আত্মার ভেতর, এ সেখানকার কথা। এ্যাগনিস, আত্মার আত্মা তুমি আমার, এ হতে আর কি বড় জিনিষ আমি তোমায় দিতে পারি বল? তুমিই ত আমার আত্মার আত্মা।"

পল থেমে গেল। সে বুঝতে পারলে যে, এ্যাগনিস কিছুই বুঝতে পারছে না, সে এসব কখনও বুঝতে পারেও না। পল নিজেকে এ্যাগনিস থেকে তফাতে রেখে দ্রষ্টার মত দেখতে লাগল, যেমন মৃত্যু থেকে জীবনকে আলাদা করে দেখে; তার মনে হল অ্যাগনিস পলকে আগের চেয়েও আরো ভালবাসে, ঠিক মানুষ মরবার সময় যেমন জীবনকে ভালবাসে, আঁকড়ে ধরে, ছেড়ে যেতে কিছুতেই চায় না।

এ্যাগনিস পলের কাঁধের উপর থেকে মাথাটা তুললে, তার মুখের দিকে সোজা তাকালে, চোখ ক্রমেই যেন বিদ্রোহের মূর্ত্তি নিলে আবার··

"এখন শোন আমার কথা" সে তখন বললে, "আর আমার কাছে ও সব মিছে কথা বল না। যেমন কথা হয়েছিল কাল রাত্রে, যেমন সব ঠিক করেছিলাম, তেমনি একসঙ্গে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি কি যাচ্ছিনি, তাই সোজা বল। এ রকম করে আমরা এখানে বাস করতে পারিনি বুঝেছ, এ নিশ্চিত একেবারে নিশ্চয়।" সে এ কথা দুবার করে বললে। তার রাগ এখন ঠেলে উঠছে, খুব একটা রাগ ও যাতনায় একটু থেমে সে আবার বললে, "যদি আমাদের একসঙ্গে বাস করতে হয়, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, এই রাত্তিরেই যেতে হবে, বুঝেছ, এখনই। তুমি জান আমার টাকা আছে, আর সে টাকা আমার নিজের। আর তোমার মা বা আমার ভাইরা এর পর যখন জানবে, দেখবে, আমরা সত্যের উপর নির্ভর করেই দুজনে এক হয়েছি, এক হয়ে বাস করছি, তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবে। এ রকম করে আমরা এখানে বাস করতে পারিনা, না, কখনও না।"

"এ্যাগনিস!"

"আমাকে এখুনি উত্তর দাও, হাঁ, কি, না?"

"আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারিনে।"

"—তবে কেন, কেন এখানে ফিরে এলে শুনি?...যাও, ছেড়ে দাও, চলে যাও...যাও, যাও, ছেড়ে দাও·"

পল তাকে ছেড়ে দিলে না। তার সমস্ত দেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, পলের ভয় হল। তারপর এ্যাগনিস যখন তাদের উভয়ের ধরা-হাতের উপর ঝুঁকে পড়ল। পলের মনে হল, বুঝি এ্যাগনিস তাকে কামড় দেবে।

এ্যাগনিস রূঢ় ভাবে বলতে লাগল:

"যাও, যাও, তুমি এখনি যাও। আমি কি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম না কি? আমরা সাহসী হব, মজার কথা শোন, সাহসী হব, না? তবে আবার ফিরে এলে কেন? আবার, আবার, আমায় চুমু খেলে কেন? আঃ যদি তুমি মনে করে থাক, তুমি আমাকে এমনি করে খেলাবে, তা হলে খুব ভুল বুঝেছ। যদি তুমি মনে কর যে, রাত্রে এখানে রোজ আসবে আর দিনের বেলা অপমান করে চিঠি লিখবে, তা হলে খুব ভুল বুঝেছ, বুঝলে তুমি আজ রাত্রে ফিরে এসেছ, এমনি কাল রাত্রেও আবার আসবে ফিরে।

তারপর রোজ রাতের পর রাত এমনি করে এখানে আসবে, যতক্ষণ, যতদিন না আমি একেবারে পাগল হয়ে যাই, কেমন? কিন্তু এসব আমি আর চাইনে, আমি এ কিছুতেই হতে দেব না। বুঝেছ?"

"আমরা পবিত্র থাকব, সাহসী হব, বলছ, তুমি বলছ" সে বলে যেতে লাগল, দুঃখে, বিয়োগের যাতনায় তার মুখখানা বুড়ীর মত হয়ে গিয়েছিল, এখন মড়ার মত হয়ে গেল, "কিন্তু এ কথা ত' আজ রাত ছাড়া, অন্য কোন রাতে বলনি। তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে! যাও চলে, এখুনি যাও, খুব দূরে চলে যাও, যেন কাল আমি ঘুম থেকে উঠলে, আর তোমার এখানে আসার ভয় আমার না থাকে, আর এমন করে যেন আর অপমানিত হতে না হয়।"

"হে ভগবান! হে ভগবান!" পল তার দেহের উপর পড়ে, যাতনায় যেন ডেকে উঠল। কিন্তু এ্যাগনিস তখনি তাকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে বললে:

"তুমি কি মনে করেছ, একটা কচি মেয়ের সঙ্গে কথা কইছ?" সে একেবারে চেঁচিয়ে বলে ফেললে, "আমি বুড়ী হয়ে গেছি, তুমি, তুমি এই ক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বুড়ী করে দিয়েছ। জীবনের সোজা পথ! হাঁা, আহা! ঠিক! সেই হবে জীবনের অতি সোজা পথ, সেইটেই হবে আমাদের বেশ সোজা পথে চলা, কেমন! যদি আমরা এই রকম গোপনে গোপনে ভালবাসার আসা-যাওয়া ঠিক রাখি, কেমন সোজা পথ হবে, না? আমি একটা দেখে-শুনে স্বামী ঠিক করে নেব, তুমি তার সঙ্গে আমার ধর্ম্মমতে বিয়ে দিয়ে দেবে। তখন আমরা দুজনে বেশ দেখা-শোনা করবার সুযোগ পাব, তুমি আর আমি, আর সারাটা জীবন বাকী লোকগুলোকে বেশ ঠকিয়ে চলে যেতে পারব। ও, তাই যদি তোমার ভেতরের মতলব থাকে, তবে তুমি ঠিক আমায় চেন নি। কাল রাত্রে তুমি আমায় বলেছ, 'এখানে আর নয়, এখান থেকে চল আমরা চলে যাই, আমরা বিয়ে করে এক হই। আমি কাজ করব, খাটব।' বলনি তুমি সে কথা? বলনি? আর আজ রাত্রে এসে আমায় বললে কিনা, তার বদলে, ভগবান আর ত্যাগের কথা। কাল তোমার ভগবান কোথায় ছিল,—ঘুমুচ্ছিল? শুনি? যাক্ সব এখন শেষ হল, হোক্, আমরা তফাৎ হলুম। কিন্তু শোন, বল, আমাকে আবার বল, তুমি আজ রাত্রেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় এ ইচ্ছা আমার আর নেই। যদি কাল সকালে তুমি আমাদের গির্জ্জেয় আবার যাও ধর্ম্ম উপদেশ দিতে, আমিও সেখানে যাব। আর সেই বেদীর সিঁড়ির ধাপ থেকে চীৎকার করে গ্রামের সকলকে বলব, এই যে দেখ, তোমাদের মহাপুরুষ ইনি, যিনি দিনের আলোয় দৈবীকার্য্য করেন, আর রাত্তিরে অসহায় অবিবাহিতা মেয়েদের ঘরে ঢুকে তাকে কামনার মুখে জড়িয়ে নিয়ে ভোলান।"

পল তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। এ্যাগনিস জোর গলায় বলতে লাগল চেঁচিয়ে, "যাও যাও।" পল তার মাথাটা চেপে বুকের কাছে নিলে, বন্ধ দরজার দিকে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তখন তার মায়ের সেই কথা মনে পড়ল, তাঁর স্বর, অন্ধকারে রহস্যের মত যেন বলছে; "সেই বুড়ো পাদরী এসে আমার পাশে বসল, আর বললে 'আমি শীগ্‌গিরই তোমাকে, আর তোমার ছেলেকে এই গির্জ্জে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।'

"এ্যাগনিস! এ্যাগনিস! তুমি কি পাগল হলে?" পল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল, আর সে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে ভীষণ ছটফট করতে লাগল, - "শান্ত হও, শোন আমার কথা। এখনও কিছুই হারায় নি। তুমি বুঝতে পারছ না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আগের চেয়ে কত হাজার গুণ বেশী। আমি ত' তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি নি, আমি যাচ্ছি তোমার আরো কাছে থাকব বলে, তুমি... তোমাকে বাঁচাব বলে, আমার এই আত্মাকে আরাধনার মত তোমাকে দান করতে, যেমন মৃত্যুর সময়ে ভগবানের হাতে আত্মাকে সমর্পণ করে। তুমি কি করে জানবে সে সব যে, কাল রাত থেকে আজ রাত পর্য্যন্ত আমি—আমি কি যাতনা ভোগ করে আসছি। আমি পালিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে—তোমার ওই মূর্ত্তিকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। যেমন আগুন লাগলে লোকে পালায়, পালিয়ে মনে করে যে, আগুনের হাত থেকে এড়ান পাবে, আমি তেমনি ছুটেছিলাম, কিন্তু সে আগুন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরো ঘিরে ধরেছে। কোথায় না আমি আজ গিয়েছিলাম, কি চেষ্টাই না আজ করেছিলাম, তোমার কাছে যাতে না আর আমাকে ফিরে আসতে হয়। এ্যাগনিস, এখানে ছাড়া আর আমার কোথায় জায়গা? আর কোথায় যেতে পারি? তুমি আমার কথা শুনছ? আমি তোমাকে লোকের কাছে ধরিয়ে দেব না, আমি তোমাকে ভুলব না। আমি তোমাকে ভুলে যেতে ত' কামনা করি নে। কিন্তু এ্যাগনিস, আমরা আমাদের মলিনতা থেকে নিজেদের দূরে রাখব, আমরা অনন্তকালের জন্য এই প্রেমে দুজনে বাঁধা থাকব, সংসারে, জীবনে যা সব চেয়ে বড়, তাই ত্যাগের মধ্য দিয়ে লাভ করে, আমরা অনন্ত কালের জন্যে এক হয়ে থাকব—জীবনে এমন কি মরণে, মরণে মানে একেবারে ভগবানের হাতে। বুঝতে পারছ তুমি এ্যাগনিস? হাঁা, বল যে আমার কথা তুমি সব বুঝতে পারছ?"

সে অবিরাম পলের আলিঙ্গনের মধ্য থেকে ছটফট করতে লাগল, যেন সে পলের বুকের উপর নিজেকে একেবারে ভেঙ্গে-চুরে ফেলতে চায়। তারপর অনেক কষ্টে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে সরে গিয়ে সোজা শক্ত হয়ে বললে। তার সেই সুন্দর চুলের রাশি তার পাথরের মত শক্ত মুখের আশে পাশে কাল ফিতের মত যেন বাঁধন দিয়ে রেখেছে। তার চোখ বুঁজে, এসেছে ঠোঁট দুটি একেবারে চাপা, মনে হল সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছে প্রতিহিংসার। পল তার এই চুপ করে থাকাটাই সব চেয়ে বেশী ভয় করছিল, এই একেবারে মুখের রেখা পর্য্যন্ত বদল হচ্ছে না—এ বড় ভয়ানক। তার ঝাঁঝাল কথা, তার ওই উত্তেজিত ভাবে হাত পা নাড়া তাতে তার তত ভয় নয়, যতটা এই স্থির অবস্থায় ভয় আছে। সে আবার তার হাত দুটি নিজের হাতের ভেতর নিলে, কিন্তু এখন এই চার হাত এক হওয়ার যে আনন্দ, প্রেমের যে সব ছন্দের মিলন তা সব যেন একেবারে মজে আঁউড়ে গেছে।

"এ্যাগনিস, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পাচ্ছ না যে, আমি সত্য

বলছি। এস, লক্ষ্মীটি, যাও আজ এখন শোওগে, কাল থেকে আমাদের এক নতুন জীবন আরম্ভ হবে। আমরা আগের মতই উভয়ে উভয়কে দেখতে পাব, সব সময়েই মনে করব তুমি তাই চাও। আমি তোমার বন্ধুর মত, সখার মত, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করব, পরস্পর পরস্পরের দুঃখ সুখ ভাগ করে নেব। এ জীবন তোমারই এ্যাগনিস, তুমি রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। আমি তোমার সঙ্গে চিরকালই থাকব, মরণ পর্য্যন্ত, মরণের পরেও, অনন্ত কাল ধরে।"

এই প্রার্থনার সুর এ্যাগনিসকে আরো যেন আগুনের মত জ্বালিয়ে দিলে। সে হাতটা তার হাতের ভেতর থেকে ঘুরিয়ে মুচড়ে নিয়ে, কথা বলবার জন্য ঠোঁট খুললে। তারপর যেই পল তাকে ছেড়ে দিলে, সে তার কোলের কাছে হাত দুটো মুড়ে, মাথা নীচু করে বসল। মুখের ভাবে অশেষ দুঃখের সকল রেখা ফুটে উঠেছে। সে দুঃখ হল এক দিকে নিরাশার শেষের সীমা আর অন্যদিকে দৃঢ়তার প্রতিরেখাও তাতে ফুটে উঠেছে।

সে এ্যাগনিসের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, একজন সামনে মরছে দেখে তার দিকে যেমন লোকে তাকিয়ে থাকে। তাতে পলের ভয় আরো বেড়ে উঠল। পল এ্যাগনিসের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, মাথাটা তার কোলে রেখে তার হাতে চুমু খেলে। পল আর যেন কোন জিনিসই গ্রাহ্যের মধ্যে ধরল না। কেউ যদি তার এ অবস্থা দেখে, তাতেই বা কি এল গেল। সে একটা স্ত্রীলোকের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে পড়েছে, তার দুঃখের কাছে মাথা নীচু করেছে। যেন সে সেই দুঃখের পায়ের কাছে পড়ে আছে। জীবনে আর কখনও সে সকল মন্দ, সকল অমঙ্গল থেকে নিজেকে এমন মুক্ত বোধ করে নি, এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের রাজত্ব থেকে যেন এখন সে অনেক দূরে, তবু তার বড় ভয় হচ্ছিল।

এ্যাগনিস একেবারে অচল হয়ে বসে রইল। তার হাত বরফের মত হিম। মরণের চুম্বন তার শিরায় পৌঁছল না, অসাড়। তারপর পল উঠে আবার মিছে কথা বলতে আরম্ভ করলে।

এ্যাগনিস, তোমাকে ধন্যবাদ, এই ত চাই, এই ঠিক, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। পরীক্ষায় জয় লাভ হয়েছে, এখন তুমি শান্তিতে ঘুমাও। আমি তবে এখন যাচ্ছি, আর কাল সকালে"—সে খুব আস্তে আস্তে বললে প্রায় ফিস ফিস করে, আর তার দিকে একটু ঝুঁকে—'কাল সকালে তুমি গির্জ্জের উপদেশের সময় আসবে, আমরা দুজনে ভগবানের কাছে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করব, দুজনে তাঁর কাছে সব জানাব।"

এ্যাগনিস চোখ খুলে একবার পলের দিকে তাকিয়ে, আবার চোখটা বুঁজলে। সে যেন মরণের আঘাতে আহত হয়েছে। যখন চোখ খুলল আবার, সমস্ত চোখটা একবার মেলে নিলে, তখন সে চোখে একটা ভয়ানক ক্ষুব্ধ আক্রোশ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি আকুল প্রার্থনা। তারপরই ত আবার চোখ বুঁজলে। আর যেন খুলবে না।

"তুমি আজ রাত্তিরেই চলে যাবে এখান থেকে অনেক দূরে, যাতে আর আমি যেন তোমাকে না দেখতে পাই।" এ্যাগনিস প্রত্যেক কথাটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে। পল তখন বেশ অনুভব করলে যে, এ মুহূর্ত্তের জন্য এই যে অন্ধশক্তি একে বাধা দিতে যাওয়া একেবারেই বৃথা।

'না, আমি ত' এমন করে তোমায় রেখে যেতে পারি না" সে ধীরে ধীরে বললে : "আমি গির্জ্জেয় সকাল বেলা আগে ধর্ম্ম-উপাসনা নিশ্চয়ই করব, তুমি আসবে, বসে শুনবে। আর তারপর যদি প্রয়োজন হয়, তখন চলে যাবে।"

"তা হলে আমি সকালেই গির্জ্জেয় যাব, আর সেই ধর্ম্ম-উপাসনার ভিড়ে, সবার সামনে তোমার চরিত্রের কথা চেঁচিয়ে সকলকে জানাব।"

"যদি তুমি তা কর, করতে পার, তা হলে বুঝব যে, তাই তবে ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু তুমি ত তা করবে না এ্যাগনিস! তুমি আমায় যত ইচ্ছে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে শান্তিতে রেখে যাচ্ছি। বিদায় তবে, বিদায়!"

কিন্তু পল গেল না। তার দিকে তাকিয়ে, সে চুপ করে থমকে দাঁড়িয়ে রইল—তার সেই ঝলমলে চুলের চকচকানির দিকে সেই মধুর গন্ধ ভরা চুলের রাশ, যা সে এতদিন ধরে এত ভালবেসে এসেছে, যার ভিতর কতদিন তার হাত কত মত খেলা করেছে। তার মনের ভিতর একটা অসীম দুঃখ জাগিয়ে তুললে, এখন সেই মুখ দেখাচ্ছে যেন একটা আহত মাথায় কালো পটী বাঁধা।

এই শেষবারের জন্য সে তার নাম ধরে ডাকলে :

"এ্যাগনিস, এও কি সম্ভব যে, এই ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? ·" এস আবার সে বললে—"এস দাও তোমার হাত, ওঠ, দরজা তবে খুলে দাও আমাকে।"

এ্যাগনিস উঠল কথা শুনে, কিন্তু তার হাত দিলে না। যে দরজা দিয়ে সে এ ঘরে ঢুকেছিল সেই দরজার কাছে সোজা ফিরে গেল, সেখানে গিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

"এখন হবে কি করি?" পল নিজের মনে ভাবলে। পল খুব ভাল রকম জানে, শুধু একটা কাজ করলে তবে এ এখন শান্ত হয়, তার পায়ের তলায় আছড়ে পড়া, এই পাপ করা, আর জন্মের তরে এই মোহের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে হারিয়ে ফেলা।

না, কথনও না, আর কখনও না। সে কাজ আর সে করছে না। পল সেইখানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের পাতা নীচু করে তাকালে, পাছে এ্যাগনিসের চোখে তার চোখ পড়ে। যখন সে চোখ তুলে চেয়ে দেখলে, তখন এ্যাগনিস আর সেখানে নেই। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই নির্জ্জন, শান্ত বাড়ীর অন্ধকার যেন তখন তাকে গিলে ফেলেছে।

দেয়ালের গায় যে হরিণের মুণ্ড তার কাঁচের চোখ যেন তার দিকে তাকাচ্ছে, চোখটায় দুঃখের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের হাসি মাখা। আর সেই কি-হয় না-হয়ের মাঝখানে, একলা সেই প্রকাণ্ড বড় দুঃখভরা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে পল বুঝতে পারলে—তার বেশ করে অনুভব হল যে, কতখানি তার ঘৃণা আর কতখানি তাচ্ছিল্য, তার সেই ঘৃণার অতল গভীরতা, আর তার কদর্য্য ঘৃণ্য হীনতা। তার ঠিক মনে হল যেন সে একটা চোর, আর চোরেরও যেন সে অধম। একজন নিমন্ত্রিত লোক হয়ে, অতিথি হয়ে, যে নির্জ্জন বাড়ী তাকে ঠাঁই দিয়েছে, তার সর্ব্বস্ব, একলা পেয়ে তার সর্ব্বস্ব হরণ করে নিলে। যে আশ্রয় দিলে সে তারই এমন করে সর্ব্বনাশ করে দিলে। পল তার চোখ সরিয়ে নিলে, দেয়ালের গায়ে হরিণগুলোর কাচের চোখের তাকানি দেখে তার ভয় হতে লাগল। তবু পল তার মর্ম্মের ইচ্ছা থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও একচুল নড়েনি। এমন কি যদি সেই বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকের তখনি মরণ-ডাক ডেকে, সারাটা বাড়ীকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেয়, তবুও তাতেও তার মনে, সেই স্ত্রীলোককে ত্যাগ করে চলে আসার জন্য একটুও অনুতাপ আর কখনোই করবে না।

সে আর কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কই আর কেউ ত' এল না। তার মনের মধ্যে তখন একটা গোলমেলে ভাব হতে লাগল, সে যেন একটা মরার দেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চারিদিক তার স্বপ্ন আর কেবল ভুলে ঘেরা। দাঁড়িয়ে আছে এই আশায়, যদি কেউ এসে তাকে সেখান থেকে, এই মোহ-জালের ভিতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। কই, কেউ ত' এল না। তখন সে দরজা ঠেলে খুলে বাইরে এল বাগানের পথে। সে পথটা পাঁচিলের গা দিয়ে ঘুরে গেছে, সেটা পেরিয়ে, সেই অন্ধকার ছোট দরজা, যে-দরজার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে, সেই দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে চলে এল বাইরে।

(আগামী বারে সমাপ্য).

ফোটোগ্রাফির কথা

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

প্রতি বৎসর আমেরিকা ইংলণ্ড জার্মানি ফ্রান্স এবং চীন জাপান হইতে বহু লক্ষ টাকার ফোটো-সরঞ্জাম ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে 'প্রবাসী'র মারফৎ জানা গিয়াছিল বোম্বাইয়ে ড্রাই-প্লেট তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি ভাবী কম্পানির মুদ্রিত মেমোরেণ্ডামে দেখিয়াছিলাম প্লেট ফিল্ম প্রভৃতি বাংলা দেশেই প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইতেছে। বোম্বাইএ উক্ত প্লেট তৈয়ারীর কারখানা কতদিন টিকিয়াছিল এবং বাংলাদেশে উক্ত কম্পানি রেজিষ্টার্ড হইয়াছিল কি না জানি না। এদেশে এক বেলগাঁওতে একটি ক্যামেরা প্রস্তুতের কারখানা আছে বলিয়া জানি। তথায় ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত বড় ক্যামেরা এবং তদানুষঙ্গিক আরো দুই একটি সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই কারখানার বিজ্ঞাপনপত্র ব্যতীত তৈয়ারী কোনো জিনিস চোখে পড়ে নাই। ইহাতে মনে হয় ঐ কারখানার প্রস্তুত ক্যামেরা বিদেশী ক্যামেরার সমতুল্য হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহা যথেষ্টরূপে প্রচার লাভ করে নাই। সুতরাং পূর্ব্বে যেরূপ, বর্ত্তমানেও সেইরূপ জার্মান অথবা ব্রিটিশ ক্যামেরাই ব্যবসায়ীর একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু ব্যবসায়ীর জন্য যত ক্যামেরার প্রয়োজন, অব্যবসায়ী সৌখীন ফোটোগ্রাফারের জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি। 'অ্যামেচার' কথাটি ইংলণ্ড আমেরিকায় অশ্রদ্ধাজনক নহে। সেই জন্য অ্যামেচার অর্থাৎ সৌখীন ফোটোগ্রাফারদের সুবিধার জন্য তথায় নিত্য নূতন উন্নত ধরণের ক্যামেরা প্রস্তুত হইতেছে। ব্যবসায়ী ফোটোগ্রাফার বলিতে বুঝায়, যাহার ফোটো তুলিবার মত ষ্টুডিও আছে এবং যে, ষ্টুডিওর ভিতরে বা বাহিরে অর্ডার মত ফোটো তুলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রেস্ ফোটোগ্রাফার, বৈজ্ঞানিক কার্য্যের জন্য বৈজ্ঞানিক-ফোটোগ্রাফার, কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী ফোটোগ্রাফার রহিয়াছে। কিন্তু অ্যামেচারের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। সে ইহার সকল ক্ষেত্রই অধিকার করিতে পারে, কোথায়ও তাহার কোনো বাধা নাই। সেই জন্য প্রধানত অ্যামেচারকে সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাদান করিবার জন্য প্রস্তুতকারীর সযত্ন প্রয়াস দেখা যায়। সত্যকার শিল্পী হইবার সুযোগ অ্যামেচারের যত বেশি, ব্যবসায়ীর তত নহে। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তবু সে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তাহার কলাকৌশল যতটা সম্ভব প্রকাশ করিয়াছে। পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি, শিল্পী ফোটোগ্রাফারের হাতে শুদ্ধমাত্র মানুষের অবয়বের প্রতিবিম্বমাত্রে আবদ্ধ হইয়া নাই, উহাতে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যুক্ত হইয়া প্রতিকৃতি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান পোর্ট্রেচার বা প্রতিকৃতি-শিল্প কত দূর উন্নত হইয়াছে সে সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সভ্য সমাজের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ফোটোগ্রাফির প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই ইহার বিস্তৃত ব্যবহার ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। অ্যামেচারের সংখ্যাবৃদ্ধির ইহাই কারণ। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার অ্যামেচারগণ যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ফোটোগ্রাফির চর্চ্চা করিয়া থাকে আমাদের দেশে সেরূপ আশা করা বৃথা। আমরা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া নিজেদের অক্ষমতাবিষয়ে যেরূপ আত্মপ্রসাদ অনুভব করি তাহাতে কোনো বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তবুও এই দরিদ্র দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার ফোটোসরঞ্জাম প্রতিবৎসর বিক্রয় হয় এবং এই দেশের লোকেই তাহার অধিকাংশ কিনিয়া থাকে। সুতরাং কোন কিছুর দোহাই দিয়া অ্যামেচারদিগকে অক্ষমতার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে দেওয়া কোনো মতেই উচিত হইবে না। বাংলাদেশে বহু অ্যামেচার-ফোটোগ্রাফার রহিয়াছে এবং প্রতিদিন নূতন নূতন শিক্ষার্থী ক্যামেরা কিনিবার জন্য দোকানে ভিড় করিতেছে। দুঃখের বিষয় যাহারা ক্যামেরা কিনিয়াছে তাহারা ক্যামেরা ব্যবহার সম্বন্ধে এবং কি করিয়া প্লেট বা ফিল্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ফোটো'তে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে বহু উপদেশ পাইলেও একটি উপদেশ তাহারা কোথাও পায় না। তাহা এই যে প্লেট ফিল্ম এবং কাগজ প্রস্তুতকারীগণ তাঁহাদের প্রস্তুত জিনিসের সঙ্গে যে সব প্রক্রিয়ার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন

তাহা বর্ণে বর্ণে পালন না করিলে সুফল পাওয়া যায় না। ফলে সফলতালাভ সুদূরপরাহত হয় এবং বহু পয়সার অপচয় হয়। দরিদ্রদেশে যদি কিছুর জন্য দুঃখ করিতে হয় তাহা হইলে এই অকারণ অপচয়ের জন্যই করা উচিত।

ফোটোগ্রাফি নবাবিষ্কৃত শিল্প নহে, সুতরাং পরীক্ষা করিতে করিতে ক্রমাগত ভুলপথে চলিয়া ভাল ছবি তুলিবার কৌশল একদিন আবিষ্কার করিব বলিয়া পণ করিলে যে-অর্থ অকারণ নষ্ট হইবে তাহার পূরণ হইবে কিরূপে? শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল চোখের সম্মুখে রহিয়াছে, সেখানেও যদি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভুলের পথেই যাত্রা করি তাহা হইলে তাহা সমীচীন হইবে না। প্রকৃত উপদেশের অভাবে আমাদের দেশের অ্যামেচারগণ দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রথমত—তাহারা শিক্ষার জন্য কোন্ ক্যামেরা কিনিবে তাহা বুঝিতে পারে না, দ্বিতীয়ত—ক্যামেরা কিনিবার পর কোন্ রীতি অনুসরণ করিলে অল্পদিনের মধ্যে ছবি তুলিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিবে সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই দোকানদারের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ দোকানদারের অজ্ঞতা এ বিষয়ে এতই গভীর যে তাহাদের নিকট হইতে উপদেশ লওয়া আদৌ নিরাপদ নহে।

অনেক দোকানে অ্যামেচারদের জন্য ডেভেলপিং প্রিন্টিং করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে অজ্ঞ কারিকরের সংখ্যাই বেশি এবং তাহাদের অজ্ঞতার দরুন বহু আয়াসে তোলা ছবি উপযুক্ত প্রক্রিয়াপ্রাপ্ত না হওয়ায় নষ্ট হইয়া যায়। কাহার দোষে ছবি খারাপ হইতেছে প্রথম শিক্ষার্থী তাহা বুঝিতে পারে না। এদিকে দোকানদার কৈফিয়ৎ দেওয়াতে পাকা। যে ফিল্মখানি তিন মিনিট ডেভেলপ করিতে হইবে তাহা হয়ত এক মিনিটেই শেষ করিয়া ফেলে। অনেক অর্ডার, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে হইবে, ডার্ক-রুমে লোক কম, কাজেই দোকানদার দায়িত্বজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। জানে একটা কৈফিয়ৎ দিলে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। অজ্ঞতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যুক্ত হইলে যাহা হয় তাহা আর যাহাই হউক, নির্ভরযোগ্য নহে। সুতরাং নূতন শিক্ষার্থী যেন দেশীয় দোকানদারের উপর ডেভেলপিং প্রিন্টিংএর ভার দিয়া নিজের সফলতা বিফলতা বা উন্নতি অবনতি বিচার না করেন। দোকানদার অ্যামেচারকে কি ভাবে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে তাহার একটি নমুনা দেখাইতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মতলার একটা দোকানে একটা রোল-ফিল্ম ডেভেলপ করিতে দিতে বাধ্য হই। দোকান আমার অপরিচিত। যখন ফিল্মটি আনিতে গেলাম, তখন দেখি আমার অর্দ্ধেক ছবি ফিল্ম হইতে গলিয়া উঠিয়া গিয়াছে! বলিলাম, গরমের জন্য যাহা ব্যবস্থা তাহা অবলম্বন কর নাই কেন?

দোকানদার বলিল, নিশ্চয়ই করিয়াছি, দুই আনার বরফ খরচ করা হইয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হার্ডেনিং বাথ দিয়াছিলে? উত্তর পাইলাম, হার্ডেনিং বাথ দিলে ফিল্ম ফাটিয়া যায়। বলিলাম, আমার ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহা জানি না, তুমি এত সহজে তাহা জানিলে কি উপায়ে? দোকানদার কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না, বরং আমাকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে তাহার কথাই ঠিক।

অভিজ্ঞতার দোহাই দিলেও যেখানে ফল হয় না, সেখানে প্রথমশিক্ষার্থীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময় ডেভেলপিং খারাপ করিয়া দিলে আবার ছবি তুলিবার জন্য নূতন ফিল্ম বিক্রয় করা যাইবে এরূপ আশাও যে দোকান-দারের মনে না থাকে তাহা বলা যায় না। সুতরাং অ্যামেচার-গণের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি? নিজের ঘরে যদি ডেভেলপিং প্রিন্টিং করা অসুবিধা হয় তাহা হইলে দোকানে যাইতেই হইবে, অথচ কোথায় ভাল কাজ হয় কোথায় খারাপ কাজ হয় তাহা জানিবার উপায় কি? এ বিষয়ে অ্যামেচারদিগকে একটি কথা মনে রাখিতে বলি। যেখানে সর্ব্বদা সমমাত্রার উত্তাপে ট্যাঙ্ক ডেভেলপিংএর বন্দোবস্ত নাই, যেখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কারিকর দ্বারা অনির্দ্দিষ্টসংখ্যক অর্ডার গ্রহণ করা হয় সেখানে নিখুঁৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। এরূপ জায়গায় প্লেট বা ফিল্ম ডেভেলপ করিতে দিলে তাহা কিছুতেই উপযুক্ত প্রক্রিয়াপ্রাপ্ত হইবে না। নেগেটিব কম ডেভেলপ হইতে পারে, অতিরিক্ত ডেভেলপ হইতে পারে, ছবিতে হাতের দাগ আঁচড় প্রভৃতি লাগিতে পারে, ছবি গলিয়া যাইতে পারে, মোট কথা সব রকম বিপদই ঘটিতে

পারে। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে কোনো কাগজে আজ পর্য্যন্ত একটি আলোচনাও প্রকাশিত হয় নাই, অথচ ক্যামেরার ব্যবহার দেশে অসম্ভব বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থের এরূপ অপচয় নিবারণের জন্যও অন্তত এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। শিক্ষিত এবং সভ্যসমাজ ফোটোগ্রাফি ছাড়া চলিতে পারে না, তা সে দেশ যত দরিদ্রই হউক। সুতরাং যাঁহারা বাজে সখ না মিটাইয়া ভাল ছবি তোলা শিখিতে চান তাঁহাদের অন্তত ডেভেলপিং নিজেদের শেখা উচিত। উপদেশ-বহির প্রত্যেকটি কথা নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে সফলতা লাভ সুনিশ্চিত। তবে প্রথম হইতেই বই পড়িয়া শিক্ষা লাভ করা কঠিন। প্রথমত দুইচারি দিন ক্যামেরার ব্যবহার এবং ডেভেলপিংএর রীতি কোনো অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইতে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোডাক কম্পানির ম্যানেজার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের নবনির্ম্মিত ডার্ক-রুমের কার্য্যপদ্ধতি দেখিতে গিয়াছিলাম। ডার্ককম কিরূপ হওয়া উচিত তাহা দেখিলাম। এখানে ডেভেলপিং ফিক্সিং এবং ধুইবার জলের উত্তাপ সর্ব্বদা ৬৫ ডিগ্রীতে রাখিবার বন্দোবস্ত আছে, ডেভেলপিং ট্যাঙ্কে হয় এবং নেগেটিভে হাত লাগিতে পারে না। নেগেটিব শুকাইবার সময় ধূলা লাগিতেও পারে না কারণ উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে শুকানো হয়। সুতরাং কোডাক-ডার্করুম হইতে ডেভেলপিং করানো যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সে কথা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু শিক্ষার্থীকে তথাকার কর্ম্মচারীগণ সাগ্রহে উপদেশ দিয়া থাকেন, যে উপদেশ দেশী দোকানে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি নিখুঁৎ ডেভেলপিং প্রার্থনীয় হয় তাহা হইলে মূল্য একটু বেশি হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ নির্ভর-যোগ্য স্থানেই যাওয়া উচিত। এক্সপোজারের গুরুতর ভুল হইলে অবশ্য ছবি ভাল হইতে পারে না, কিন্তু ডেভেলপিং যদি নির্ভুল হয় তাহা হইলে সত্যসত্যই এক্সপোজারের ভুল হইল কি না সেখানে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে।

পরবর্ত্তী সমস্যা, প্রথমশিক্ষার্থী কত দামের এবং কি ক্যামেরা কিনিবেন। অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে ক্যামেরা যতই দামী হইবে ছবিও ততই ভাল হইবে। এই ধারণায় প্রথমেই বেশি দামের ক্যামেরা কিনিয়া কত অ্যামেচারকে পরে অনুতাপ করিতে দেখিয়াছি। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্নপ্রকার ক্যামেরা, ইহা ছাড়া রুচিও বিভিন্ন। নূতন শিক্ষার্থী যাঁহার নির্ভুল এক্সপোজার দিবার শিক্ষাই প্রথম প্রয়োজন তাঁহার পক্ষে দামী ক্যামেরার প্রয়োজন নাই; সাঁতার শিখিবার জন্য কেহ কলিকাতা হইতে পুরী কিংবা মান্দ্রাজ গিয়া সমুদ্রে নামে না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে শিক্ষার্থী নিজেই স্থির করিতে পারিবেন তাঁহার পক্ষে কোন জাতীয় ক্যামেরা প্রশস্ত। নিজের অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্য্যন্ত অনুমান এবং অপরের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোনো কাজ করা ঠিক নহে। দামী ক্যামেরায় যে শিক্ষা হয় না তাহা নহে, কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগে, অনেক প্রকার জটিলতার মধ্যে ঢুকিয়া দিশাহারা হইয়া
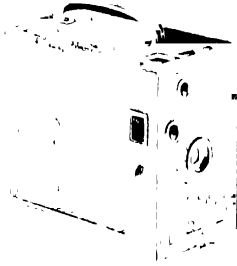
বক্স ক্যামেরা : বাক্সের মত দেখিতে বলিয়া নাম বক্স ক্যামেরা।
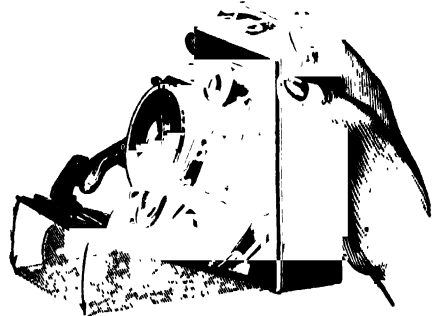
ফোল্ডিং ক্যামেরা : ভাঁজ করা যায় বলিয়া নাম ফোল্ডিং ক্যামেরা।

পড়িতে হয়। ইহার প্রয়োজন কি? প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্রাউনি ক্যামেরা উৎকৃষ্ট। অল্পদিন হইল আগফা কম্পানি চারি টাকা দামের একটি ক্যামেরা বিক্রয় করিতেছেন। ইহাও ভাল। কোডাক এবং আগফা সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী, ইঁহাদের প্রস্তুত ক্যামেরা নির্ভয়ে কেনা যাইতে পারে। আগফারও ডার্করুম আছে, তবে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। নানা কাগজে কিছুদিন হইল আরো কম দামের একটি বক্স-ক্যামেরার বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। বিজ্ঞাপনদাতা তাঁহার দোকানের ঠিকানা দেন নাই, বিজ্ঞাপনে পোষ্ট বক্স নম্বর দিয়াছেন, সুতরাং ক্যামেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তদুপরি বক্স ক্যামেরার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে উৎকৃষ্ট ফোল্ডিং ক্যামেরার ছবি দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা সেই ছবি দেখিয়া ঐ ক্যামেরা কিনিবেন তাঁহারা প্রতারিত হইবেন। যাঁহারা বিজ্ঞাপন ছাপিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন না যে তাঁহারা প্রকারান্তরে ক্রেতাদিগকে ঠকিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, আগামীবারে আমরা বক্স-ক্যামেরায় কি কি ছবি তোলা যায় এবং কত সহজে তোলা যায় তাহার আলোচনা করিব।

দিবা-রাত্রির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোককে নামিয়ে এনে স্নানাহার করতে করতে বৃষ্টি থেমে গেল। হেরম্ব বিদায় নিলে। বলে গেল, বিকালে যদি পারে একবার আসবে, সুপ্রিয়াকে যে সব যায়গা দেখিয়ে আনবে কথা আছে দেখিয়ে আনবে।

'যদি পারি কেন?'

'না পারলে কি করে আসব, সুপ্রিয়া?'

'চারটের মধ্যে যদি না আসেন তা হলে ধরে নেব, আপনি আর এলেন না।'

'যদি আসি চারটের মধ্যেই আসব।'

বাগানে ঢুকতেই আনন্দের দেখা পাওয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'এত দেরী করলে! মা এদিকে ক্ষেপে গেছে।'

আনন্দ সংবাদটা এমন ভাবে দিলে যে, হেরম্ব বুঝে নিল মালতীর ক্ষেপবার কারণ সুপ্রিয়ার সঙ্গে গিয়ে তার ফিরতে দেরী করা। সে রুক্ষস্বরে বললে, 'ক্ষেপলে আমি কি করব?'

আনন্দ বললে, 'মন্দির থেকে বাড়ীতে এসে মা যেই দেখল বাবা নেই, বাবার কম্বল বই খাতা এসবও নেই, মা ঠিক যেন পাগল হয়ে গেল।'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বললে,'মাষ্টারমশায় গেলেন কোথায়?'

'বাবা চলে গেছে।'

'কোথায় চলে গেছেন?'

আনন্দের চোখ ছল ছল করে এল।

'তা জানিনে তো। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিলাম, তখন কিছু বললেন না। তোমরা চলে যাবার পর বাবা আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন, আমি যাচ্ছি আনন্দ, তোর মাকে বলিস না, গোল করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ বাবা, কবে ফিরবে? বাবা জবাবে শুধু বললেন, সে সব কিছু ঠিক নেই। আমি বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলাম।'

বলে আনন্দ চোখ মুছতে লাগল। হেরম্ব তাকে একটি সান্ত্বনার কথা বলতে পারলে না। বাতাসের নাড়া খেয়ে গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে, আনন্দ প্রায় ভিজে গিয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে হেরম্ব ঘরে গেল। ঘরের জানালা কেউ বন্ধ করে নি। বৃষ্টির জলে মেঝে ভেসে গিয়েছে। হেরম্বের বিছানাও ভিজেছে। বিছানাটা উল্টে নিয়ে হেরম্ব তোষকের নীচে পাতা সতরঞ্চিতে বসলে। বলার অপেক্ষা না রেখে আনন্দও তার গা ঘেঁসে বসে পড়ল। সে অল্প অল্প কাঁপছিল, জলে ভিজে কিনা বলবার উপায় নেই। হেরম্বের মনে হল, সান্ত্বনার জন্য যত নয় নির্ভরতা জন্যই আনন্দ ব্যাকুল হয়েছে বেশী। এরকম মনে হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ভেবে না পেয়ে হেরম্ব তাকে সান্ত্বনাও দিলে না, নির্ভরতাও দিলে না। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে এরকম অবস্থায় ঠিক মত না বুঝে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।

আনন্দ বললে, 'মা কি করেছে জান? বাবাকে টাকা দিয়েছি বলে আমাকে মেরেছে।' হেরম্বের দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাপড় সে সরিয়ে দিলে, 'ত্থাপ, কি রকম করে মেরেছে। এখনো ব্যথা কমেনি। ঘমা লেগে জ্বালা করে বলে জামা গায়ে দিতে পারিনি, শীত করছে, তবু। কি দিয়ে মেরেছে জান? বাবার ভাঙ্গা ছড়িটা দিয়ে।'

তার সমস্ত পিঠ জুড়ে সত্যই ছড়ির মোটা মোটা দাগ লাল হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিঃশ্বাস রোধ করে বললে, 'তোমায় এমন করে মেরেছে!'

আনন্দ পিঠ ঢেকে দিয়ে বললে, 'আরও মারত, পালিয়ে গেলাম বলে পারে নি। বিষ্টির সময় মন্দিরে বসে ছিলাম। তুমি যত আসছিলে না, আমি একেবারে মরে যাচ্ছিলাম। তিনি বুঝি আসতে দেন নি, যার সঙ্গে গেলে?'

'হ্যাঁ, তার স্বামী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। পিঠে হাত বুলিয়ে দেব আনন্দ?'

'না, জ্বালা করবে।'

হেরম্ব ব্যাকুল হয়ে বললে, 'একটা কিছু করতে হবে তো! নইলে জ্বালা কমবে কেন? আচ্ছা, সেঁক দিলে হয় না?' বলে হেরম্ব নিজেই আবার বললে, 'তাতে কি হবে!'

'এখন জ্বালা কমেছে।'

'টের পাচ্ছ না। তোমার পিঠ অসাড় হয়ে গেছে। বরফ ঘষে দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত।'

'তা হত। কিন্তু বরফ তো নেই। তুমি বরং আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েই দাও।'

'বস, বরফ নিয়ে আসছি।'

আনন্দের প্রতিবাদ কানে না তুলে হেরম্ব চলে গেল। সহর পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে হল। বরফ কিনে সে ফিরে এল গাড়ীতে। আনন্দ ইতিমধ্যে মেঝের জল মুছে ভিজে বিছানা বদলে ফেলেছে। সে যে সোনার পুতুল নয় এই তার প্রমাণ।

এত কষ্ট করে বরফ সংগ্রহ করে এনেও এক ঘণ্টার বেশী আনন্দের পিঠে ঘষে দেওয়া গেল না। বরফ বড় ঠাণ্ডা। আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে হেরম্ব আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

মেঘ কেটে গিয়ে এখন আবার কড়া রোদ উঠেছে। পৃথিবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি এখনো সিক্ত এবং নম্র। আনন্দকে শুয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে হেরম্ব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে।

মালতী কখন বারান্দায় এসে বসেছিল। হেরম্বকে সে কাছে ডাকলে। হেরম্ব ফিরেও তাকালে না। মালতী টলতে টলতে কাছে এল। বেশ বোঝা যায়, মাত্রা রেখে আজ সে কারণ পান করেনি। কিন্তু নেশায় তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হল না।

'সাড়া দাও না যে!'

'কারণ আছে বৈকি।'

মালতী বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সেই খানে থুপ করে বসলে।—'শুনি, কারণটা শুনি।'

'সেটুকু বুঝবার শক্তি আপনার আছে, মালতী বৌদি।'

হ্যাঁ আছে। মালতী তাই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। গলা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললে, 'আর মালতী বৌদি কেন হেরম্ব?—কেমন খারাপ শোনায়। ভাবছি আজকালের মধ্যেই তোমাদের কণ্ঠিবদলটা সেরে দেব, আর দেরী করে লাভ কি? কণ্ঠিবদলে তোমার আপত্তি নেই তো? আপত্তি কর না, হেরম্ব। আমরা বৈষ্ণব, তোমার মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমারো কণ্ঠিবদল হয়েছিল। তোমাদেরও তাই হোক, তারপর তুমি তোমার তিন আইন চার আইন যা খুসী কর, আমার দায়িত্ব নেই, ধর্ম্মের কাছে আমি খালাস।'

সুপ্রিয়া যত দিন পুরীতে উপস্থিত ততদিন এসব কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সুপ্রিয়ার কাছে এখনো সে সেই ছমাসের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, তার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাওয়া দরকার। আনন্দকে চোখে দেখে গিয়েও সুপ্রিয়া তাকে রেহাই দেয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায় সেকালের নবাব-বাদশার মত সে যদি সুন্দরীদের একটি হারেম রাখে, সুপ্রিয়া গ্রাহ্য করবে না, তার ভালবাসা পেলেই হল। এমন একদিন হয়ত ছিল যখন দেখা হওয়া মাত্র হেরম্ব সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার সেই ছমাসের চুক্তি বাতিল করে দিতে পারত। এখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে তার সময় লাগে। কণ্ঠি-বদল কিছুদিন স্থগিত রাখতে হবে।

শুনে মালতী সন্দিগ্ধ হয়ে কারণ জানতে চাইলে। হেরম্ব সোজাসুজি মিথ্যা বললে। বললে যে, পূর্ণিমা আসুক, আগামী পূর্ণিমায় যা হয় হবে। ইতিমধ্যে অনাথ ফিরে আসতে পারে। অনাথের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা সঙ্গত নয় কি?

মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি মনে হয় হেরম্ব ও আর ফিরবে?'

'ফিরতে পারেন বৈকি।'

মালতী বিশ্বাস করলে না। 'না, সে আর ফিরছে না, হেরম্ব। মিন্‌সে জন্মের মত গেছে।'

হেরম্ব তাকে একটু খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। বললে, 'নাও যেতে পারেন, হয়ত কালকেই তিনি ফিরে আসবেন। আনন্দকে মিছামিছি মেরেছেন।'

মালতী অল্প একটু গরম হয়ে বললে, 'মিছামিছি! ওর বাবার ভাগ্যি কাল ওকে খুন করিনি। কে জানত পেটের মেয়ে এমন শত্তুর হবে!' দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে মালতী সঙ্গে সঙ্গে একটু নরম হয়ে গেল, 'অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব? আজ আমার জন্মদিন, জালাভন করব, তাই পালিয়ে গেল।' মালতীর গাল আর চিবুকের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে আসছিল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। 'একেবারে পাগল হেরম্ব, উন্মাদ! গেছে যাক, আজ দেখব কাল দেখব, তারপর ঘরদোরে আমিও আগুন ধরিয়ে দেব। ওলো সর্ব্বোনাশী ছুঁড়ি, উঁকি মেরে দেখিস কোন্ লজ্জায়? আয়, ইদিক আয়, হতভাগি!'

আনন্দ আসে না। হেরম্ব তাকে ডেকে বললে, 'এস, আনন্দ।'

আনন্দ কুণ্ঠিত পদে কাছে এলে মালতী খপ করে তার হাত ধরে ফেললে। কাছে বসিয়ে পিঠের কাপড় সরিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে বললে, 'তোরও কি মাথা খারাপ হয়েছিল, আনন্দ? লক্ষীছাড়া মেয়ে, তুই পালিয়ে যেতে পারলি না?'

আনন্দ মুখ গোঁজ করে বললে, 'গেলাম তো পালিয়ে।'

'পালিয়ে গেলি তো এমন করে তোকে মারল কে শুনি?' মালতীর গলা হতাশায় ভেঙ্গে এল, 'গোঁয়ার, হেরম্ব, যেমন গোঁয়ার বাপ তেমনি গোঁয়ার মেয়ে। ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। যত বলি যা আনন্দ, চোখের সমুখ থেকে সরে যা, মেয়ে তত এগিয়ে এসে মার খায়।'

মাতা ও কন্যার মিলন হল এইভাবে। হেরম্বের না হল আনন্দ, না হল স্বস্তি। নূতন ধরণের যে বিষাদ তার এসেছে তাতে সব মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

তারপর মালতী জিজ্ঞাসা করলে, 'পিঠে নারকেল তেল দিতে পারিস নি একটু?'

বরফ দেওয়ার কথাটা কেউ উল্লেখ করলে না। হেরম্বকে দিয়ে তেলের শিশি আনিয়ে মালতী মেয়ের পিঠে মাখিয়ে দিতে আরম্ভ করলে।

আনন্দকে প্রহার করেই মালতী শান্ত হয়ে যাবে হেরম্ব সে আশা করেনি। অনাথ যে সত্য সত্যই চিরদিনের মত চলে গেছে তাতে সেও সন্দেহ করে না। মৃত্যুর চেয়ে এভাবে প্রিয়জনকে হারানো বেশী শোকাবহ। এই শোক মালতীর মধ্যে ঠিক কি ধরণের উন্মত্ততায় অভিব্যক্ত হবে তাই ভেবে হেরম্ব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মালতীর শান্ত ভাবটা সে ঠিক বুঝতে পারলে না। কারণের প্রভাব হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ওদিকে সুপ্রিয়ার সমস্যা আছে। চারটের মধ্যে সুপ্রিয়ার কাছে তার হাজির হবার কথা। ঘড়ি দেখে বোঝা গেল এখন আর তা সম্ভব নয়, চারটে বাজে। কিন্তু গিয়ে উপস্থিত হলে দেরী করে যাওয়ার অপরাধ সুপ্রিয়া ধরবে না। যেতেই হেরম্বের ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

তাকে সামনে পেলে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নবজাগ্রত আশায় উৎফুল্ল হয়, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথায় মলিন হয়ে যায়। হেরম্বের চোখের দৃষ্টিতে মুখের কথায় আজও সে অদম্য আগ্রহে অনুসন্ধান করে প্রেম, নিজেরই সুদীর্ঘ তপস্যার অন্ধ শক্তিতে পলে পলে হতাশাকে জয় করে চলে। তার কাছে হেরম্বকে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত সাবধান হয়ে থাকতে হয়। ক্রমাগত সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নাভিমুখী করার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তার ভ্রান্তি জন্মে যায়, সুপ্রিয়ার প্রেমকে হত্যা করার বদলে সে বুঝি প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। হেরম্বের সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে এই যে, আনন্দের সংশ্রবে এসে তার মন এমন দুর্ব্বল অথবা বিশ্ব-প্রেমিক হয়ে উঠেছে যে, কারো প্রতি কল্যাণকর নিষ্ঠুরতা দেখাবার শক্তি তার নেই। রূপাইকুড়ায় গভীর রাত্রে সুপ্রিয়া যেমন সোজাসুজি তার দাবী জানিয়েছিল, আজও যদি সে তেমনি ভাবে স্পষ্টভাষায় তাকে প্রার্থনা করে, জীবন থেকে তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হেরম্বর পক্ষে হয়ত সহজ হয়। কিন্তু সুপ্রিয়া তাদের সেই ছমাসের চুক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে আজকাল কেবল নিজের এবং একান্ত নিজস্ব যে, তার সুখদুঃখের কথা ভাবার মত সঙ্গত স্বার্থপরতা হেরম্বের কাছে হয়ে উঠেছে লজ্জাকর। সুপ্রিয়া যদি দুদণ্ড তার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পায়, তার দীর্ঘকালব্যাপী জীবন দেওয়া ভালবাসার কথা স্মরণ করে, তাকে বঞ্চিত করার অধিকার নিজের আছে বলে হেরম্ব ভাবতে পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করে হেরম্ব নিজেকে যেন চিনতে পারে না। সে ছিল কঠিন, মানুষের ছোট বড় সুখদুঃখের কোন মূল্য তার কাছে ছিল না, কারো হৃদয়কে সে কোনদিন খাতির করে চলেনি। আজ শুধু কোমল হওয়া নয় গলিত বরফের মত সে তরল হয়ে গেছে, যে যেখানে তৃষার্ত্ত আছে তারই অঞ্জলিতে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে চায়।

ঘরে বসে উদ্বেগ ও অশান্তিতে হেরম্ব কাতর হয়ে পড়ে। আবার তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। জীবন যখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে তখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে লাভ কি? সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হওয়া মাত্র তার যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে?

যে তেজ, যে প্রচণ্ড গতির অবসান হয়ে গেছে তার জন্য হেরম্বের মন হাহাকার করে। একদিন যা দিয়ে সে মানুষের বুকও ভেঙ্গেছে ঘরও ভেঙ্গেছে, আজ সে শক্তি থাকলে সে মহামানবের মত ভাঙ্গা বুক জোড়া দিতে পারত, ভাঙ্গা ঘর গড়ে তুলতে পারত। মনে জোর থাকলে জীবনে সমস্যা কোথায়? মালতী, সুপ্রিয়া ও আনন্দকে নিয়ে বিপুল

পৃথিবীর এককোণে ঠাই বেছে নেওয়া কঠিন নয়, জীবনের দুটি প্রান্তে সুপ্রিয়া ও আনন্দকেও এমন ভাবে রেখে দেওয়া অসম্ভব নয়, যাতে নিজস্ব সীমা তাদের কোনদিন চোখে পড়বে না, খণ্ডিত হেরম্বকে দিয়েও জীবনের পূর্ণতা সাধিত হওয়ায় কোনদিন তারা অনুভব করবে না নিজেকে দুভাগে ভাগ করে দুজনকেই সে ঠকিয়েছে। একদিন হেরম্বের পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল। আজ এ শুধু কল্পনা, অক্ষমের দিবাস্বপ্ন।

সত্যই কল্পনা। আজ সারাদিন, বিশেষভাবে আনন্দের পিঠে বরফ ঘষে দেবার সময়, এই দিবাস্বপ্নই সে দেখেছে। সুপ্রিয়া থাকে জনপদের একটি দ্বিতল গৃহে, তার ছবির মত সাজানো ঘরে সারাদিন হেরম্ব গৃহস্থ সংসারী, সন্ধ্যায় সে ফিরে যায় আনন্দের স্বহস্তে রোপিত ফুলগাছে সাজানো বাগানে, শান্ত নির্জ্জন কুটিরে। সুপ্রিয়া তাকে বেঁধে খাওয়ায়, আনন্দ তাকে দেখায় চন্দ্রকলা নাচ। তার মধ্যে যে ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট দেবতা আছেন হেরম্ব তাকে এমনি সব উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার নৈবেদ্য নিবেদন করে। নিবেদন করে সসঙ্কোচে। প্রায় সজল চোখে। তার কি বুঝতে বাকী আছে যে, এই ভ্রান্ত আত্মপূজা তার বার্দ্ধক্যের পরিচয়, এই সব রঙীন কল্পনা তার কৈশোরের ফিরে আসার লক্ষণ নয়, যৌবন-অপরাহ্নের মৃত্যু-উৎসব।

মালতী আজ হেরম্বকে বেদখল করেছে। দশ মিনিটের বেশী একা থাকতে দেয় না।

মালতী বলে, 'মিন্‌সে যদি আর একটা দিন থেকে যেত, আমার জন্মদিনের উৎসবটা হতে পারত। যাক্, কি আর হবে, গেছেই যখন মরুকগে' যাক। তারও শান্তি, আমারও শান্তি।'

'শান্তিই মানুষের সব।' হেরম্ব সংক্ষেপে বলে।

মালতী হেসে বলে, 'খুব একটা মস্ত কথা বললে তো ; আসল কথাটা জান, হেরম্ব? আমায় আর দেখতে পারত না। ওসব যোগটোগ মিছে কথা, ভণ্ডামি। একজনকে দেখতে না পারলেই মানুষের ওসব ভণ্ডামি আসে। কই, সংসারে বিরাগ না এলে সন্ন্যেসী হতে দেখলাম না তো কাউকে! ভোগ ভাল না লাগলে তখন তোমাদের ধর্ম্মে মতি হয়। তোমরা পুরুষ মানুষেরা হলে কি বলে গিয়ে সুখের পায়রা। যখন যাতে মজা লাগে তাই তোমাদের ধর্ম্ম। ঘেন্নার জাত বাপু তোমরা।'

শেষ পর্য্যন্ত মালতীকে সহ্য করতে না পেরেই হেরম্ব পথে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি বুঝি তাঁর বাড়ী যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তুমি বারণ করলে যাব না।'

'বারণ করব কেন?'

'সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব, আনন্দ।'

আনন্দ ম্লান মুখে বললে, 'এস, আমার আজ বড় মন কেমন করছে।'

হেরম্ব ইতস্ততঃ করে বললে, 'তবে না হয় নাই গেলাম, আনন্দ। চল, আমরা সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

আনন্দ বললে, 'না, আমি মার কাছে থাকব।'

হেরম্ব আর দ্বিধা করলে না। 'থাক্, আমি যাব না, আনন্দ। একবার যেতে বলেছিল, কাল গেলেই হবে।'

কিন্তু আনন্দ তাকে মত পরিবর্ত্তন করতে দিলে না। বললে, 'না, যাও। না গেলে তিনি আবার এসে হাজির হবেন তো! এখন দেখা করে এস, সন্ধ্যার পরে তুমি আর কোথাও যেও না, আমার কাছে থেক।'

হেরম্ব জানত সুপ্রিয়া তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। দেরী দেখে হয়ত মাঝে মাঝে পথের দিকেও তাকাবে। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি পৌছানো মাত্র সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবে হেরম্ব তা ভাবতে পারেনি। সুপ্রিয়ার পক্ষে এতখানি অধীরতা কল্পনা করা কঠিন।

সুপ্রিয়া নিজে থেকে কৈফিয়ৎ দিল।

'ওঁর দাদা বৌদি এসে পড়েছে। চলুন আমরা পালাই।'

'পালাই? পালাই কিবে?'

সুপ্রিয়া ব্যাকুল হয়ে বললে, 'সবে চলুন এখান থেকে, কেউ দেখতে পাবে। হেঁয়ালি বুঝবার সময় পাবেন।'

সে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। মূঢ়ের মত তাকে অনুসরণ করা ছাড়া হেরম্বের আর উপায় রইল না। সমুদ্রের ধারে পৌছানোর আগে পর্য্যন্ত সুপ্রিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তার গতিবেগ শ্লথ করলে না। সে যেন চুরি করে পালাচ্ছে। বঙ্গনারীর এই অস্বাভাবিক জোর চলনে পথের লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে লক্ষ্য করে হেরম্বের লজ্জা করতে লাগল। সুপ্রিয়ার পায়ে জুতো নেই, পরণের সাধারণ সাড়ীখানা ময়লা, তার

আলগা খোঁপা খুলে গেছে। বয়সও তার কম হয় নি, চার বছর আগে একবার সে মা হয়েছিল।

তবু সমুদ্রতীর অবধি হেরম্ব চুপ করে রইল। সেখানে সুপ্রিয়া দাঁড়াতে সে মৃদু ও কড়া সুরে বললে, 'রাস্তার লোক হাসালি, সুপ্রিয়া।'

'হাসুক। মাগো, এইটুকু জোরে হেঁটে হাঁপ ধরে গেছে!'

বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে সে নিশ্বাস নেয়। সমুদ্রের বাতাসে তার আলগা চুল ও অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে। হেরম্ব সভয়ে স্মরণ করে সুপ্রিয়ার এ রূপ প্রায় পাঁচ বছরের পুরোনো, যখন ছেলেমানুষ পেয়ে আনন্দের বয়সী সুপ্রিয়াকে সে ভুলিয়ে বিয়ে দিয়েছিল বলে রূপাইকুড়ায় সুপ্রিয়া অভিযোগ করেছে।

'দাঁড়াবেন না, চলুন।' বলে সমুদ্রের ঢেউ যেখানে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যায় সেখান দিয়ে সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল। রোদের তেজ এখনো কমেনি কিন্তু জোরালো বাতাস রোদের তাপ গায়ে মাখতে না মাখতে মুছে নিয়ে যাচ্ছে। হেরম্ব বললে, 'ব্যাপার কি বল্‌তো, সুপ্রিয়া?'

'ব্যাপার কঠিন কিছু নয়। বাড়ীতে ভিড় জমেছে, নিরিবিলি কথা বলার জন্য সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলাম—শুধু এই।'

'ফিরে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দিবি?'

'তার দরকার হবে না।'

নীরবে দুজনে এগিয়ে চলল। সমুদ্রতীর পথ নয় কিন্তু হেঁটে বড় আরাম। পাশে অনন্ত সমুদ্রের গা ঘেঁষে সমুদ্রতীরও কোথায় কতদূর চলে গেছে, শেষ নেই। সঙ্গী নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটবার সুবিধাও এইখানে, সমুদ্রের কলরব নীরবতাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, পীড়ন করতে দেয় না।

অনেক দূর গিয়ে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, 'চিঠিতে ওই মেয়েটার কথা লেখেন নি কেন?'

'লিখিনি? ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

'আমি খবর পেয়েছিলাম। ও সাক্ষী দিতে এসেছিল। গিয়ে বললে আপনি এক তান্ত্রিকের আড্ডায় ডুবতে বসেছেন।'

'তান্ত্রিক নয়, বৈষ্ণব।'

'মেয়েটাকে দেখেই আমার ভাল লাগেনি। ওর মা-টা আরও খারাপ।'

হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বললে, 'তুই বুঝি ভুলে গেছিস, সুপ্রিয়া, কতকগুলি কথা আছে মুখে বলতে নেই?'

সুপ্রিয়া কলহের সুরে বললে, 'চুপ করে থাকব, না? আমি তা পারব না। আমি মেয়েমানুষ, অত উদার আমি হতে চাই না। পারলে ওই রাক্ষসীকে আমি বিষ খাইয়ে গলা টিপে মেরে ফেলব, এই আপনাকে আমি স্পষ্ট বলে রাখলাম।'

হেরম্ব অনাথের মত অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'তুই যে ক্রমেই মালতী-বৌদি হয়ে উঠছিস, সুপ্রিয়া!'

'মালতী-বৌদি কে? ওই মা-টা বুঝি? হুঁ, ডাকের দেখি বাহার আছে!'

'চেহারার বাহারও আছে, সুপ্রিয়া।'

'তা আছে। দুজনেরি।'

খোঁচা খেয়ে হেরম্ব একটু বিরক্ত হল। সুপ্রিয়ার এবারকার পদ্ধতিটা ভাল নয়। রূপাইকুড়ায় সে তাদের বাহ্য সম্পর্ককে প্রাণপণে ঠেলে তুলতে চেয়েছিল সেই স্তরে, যেখানে বাস্তব-ধর্ম্মী মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন বিছানো থাকে, যেখানে রস ও মাধুর্য্যের সমাবেশ। সাধারণ যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে তুচ্ছ করে দেবার প্রবৃত্তি হেরম্ব যাতে দমন করতে না চায়, রূপাইকুড়ায় তাই ছিল সুপ্রিয়ার প্রাণপণ চেষ্টা। এবার সুপ্রিয়া তার সমস্ত নেশা টুটিয়ে দিতে চায়, সে যে প্রায় ভুলে যেতে বসেছে, সে রক্ত-মাংসের মানুষ, তার এই ভ্রান্তিকে সে টিঁকতে দেবে না। আত্মবিস্মৃত পাখীর মত নিঃসীম আকাশে পাখা মেলে অনন্ত যাত্রায় তাকে প্রস্তুত হতে দেখে এই নীড়-লুব্ধা বিহঙ্গমী তার কাছে পৃথিবীর আকর্ষণ টেনে এনেছে, তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই। হেরম্ব ধীরে ধীরে হাঁটে। সুপ্রিয়ার ইঙ্গিত মিথ্যা নয়, রূপের বাহার ছাড়া আনন্দের আর কিছুই নেই। আনন্দের ভিতর ও বাহির সুন্দর। অপার্থিব, অব্যবহার্য্য সৌন্দর্য্যে তার দেহমন মণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে: সে রঙীন কালিতে ছাপানো অনবদ্য কবিতার মত। অথবা সে আকাশের মত, তার মধ্যে ডুবে গিয়েও পাখীকে নিজের পাখায় ভর করে থাকতে হয়, পাখা অবশ হলে পৃথিবীতে পতন অনিবার্য্য। আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কোন পূজায় পাওয়া যায় না, প্রেমের শেষ অবশ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে হারিয়ে

যাবে। সুপ্রিয়ার কাছে অভ্যস্ত বিরক্তি ও মমতার অবাধ অর্থহীন লীলায় বিস্ময়কর স্বস্তি বোধ করে হেরম্ব কি এখন বুঝতে পারছে না, আনন্দের সান্নিধ্য তাকে অনির্ব্বচনীয় সুতীব্র সুখের সঙ্গে কি অসহ্য যন্ত্রণা দেয়? তার অর্দ্ধেক হৃদয় ভালবাসার যে পুলক সংগ্রহ করে, অপরার্দ্ধ মরণাধিক কষ্ট সয়ে তার মূল্য দেয়। সুপ্রিয়ার কাছে সে উন্মাদনা পাবার সম্ভাবনা যেমন নেই, সে অকথ্য দুঃখও সে দেয় না।

তবু মাতালের মদই চাই। জলে তার তৃষ্ণা মেটে না। মদ খেয়ে মরাই তার ভাল।

'চল ফিরি।'

'চলুন আর একটু। নির্জ্জনতা গভীর হয়ে আসছে।'

'জলে ভিজে অশোকের কিছু হয় নি ত?'

হঠাৎ অশোকের কথা ওঠায় সুপ্রিয়া একটু বিস্মিত হয়ে হেরম্বের মুখের দিকে তাকালে।

'হু হু করে জর এসেছে।'

'তুই যে চলে এলি?'

'ছোটলোক ভাবছেন, না? সেবা করার লোক না থাকলে আসতাম না। দাদা বৌদি ভাইঝি সবাই ঘিরে আছে, তারা আপনার জন। আমি তো পর!'

'তোর কি হয়েছে বল্‌তো?'

'বুঝতে পারেন নি? আমার মন আগাগোড়া বদলে গেছে। আজকাল সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকি।'

হেরম্বের কাছে এটা সুপ্রিয়ার অনাবশ্যক আত্মনিন্দার মত শোনাল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হতে পারলেও সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকা সুপ্রিয়ার পক্ষে অসম্ভব। তার এ কথা হেরম্ব বিশ্বাস করলে না।

'তুই ইচ্ছা করলেই অশোককে সুখী করতে পারতিস্‌, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়ালে।

'যদি কথা তুললেন, তা হলে বলি। আমি তা পারতাম না। কেউ পারে না। ছেলেখেলা হলে পারতাম, চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা ছেলেখেলা নয়। ও বিনাদোষে মারা গেল, কিন্তু উপায় কি, সংসারে অমন অনেকে যায়। ওর সত্যি কোন উপায় নেই। আজকাল কি প্রার্থনা করি জানেন?'

সুপ্রিয়া আঁজলা করে সমুদ্রের জল তুলে বিবর্ণ সীঁথি ঘসে ঘসে ধুয়ে ফেললে। বাঁ হাতের আঙুল থেকে আংটি ও কব্জি থেকে লোহা ও শাঁখা খুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'আমি যখন বেরিয়ে আসি, ওর একশ পাঁচ ডিগ্রি জর। ও মরেই যাক্‌। শান্তি পাবে।'

দূর দিগন্তে চোখ রেখে হেরম্ব বললে, 'অশোক মরলে তোর যদি কোন সুবিধা না থাকত তাহলে তোকে প্রশংসা করতাম, সুপ্রিয়া।'

'কথাটা ভেবে বললেন?'

'ভেবেই বললাম। মনকে তুই একেবারে উন্মুক্ত করে দিলি, কিছু ঢাকবার চেষ্টা করলি না। সত্যকে সহ্য করবার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিস বলেই অপ্রিয় কথাটা বললাম। বিচলিত হলে চলবে কেন? তুই নিজে যা বললি তার চেয়ে আমার কথাটা নিশ্চয় ভয়ানক নয়?'

'মিথ্যে বলে আপনার কথা ভয়ানক।'

'কেন মিথ্যে বুঝিয়ে দে। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব।'

সুপ্রিয়া রুক্ষস্বরে বললে, 'মিথ্যা নয়? আপনার কথার মানে হয়? ওর বাঁচা-মরার সঙ্গে আমার সুবিধা-অসুবিধার সম্পর্ক কি? ওর বাঁচাকে আমি গ্রাহ্য করি? রূপাইকুড়াতেও আপনি আমাকে এসব বলে অপমান করতেন। আপনার ভুল হয়েছে, স্বামী আমার সমস্যা নয়, আপনিই তাকে শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া করে রেখে আমার সঙ্গে লড়াই করছেন।'

এবার হেরম্বের চুপ করে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তর্কে হার মানা হেরম্বের স্বভাব নয়।

'আমার কথাটা সেই জন্যই হয়ত মিথ্যা নয়, সুপ্রিয়া। অশোককে আমি যদি শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া করে না রাখি, তাতে তোর সুবিধা আছে বৈকি।'

সুপ্রিয়া ক্রন্দনবিমুখ আহত শিশুর মত মুখ করে বললে, 'ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করার জন্য একথা যদি বলতেন, ফিরে গিয়ে এখুনি আমি বিষ খেতাম।'

হেরম্ব সাগ্রহে সায় দিয়ে বললে, 'ফিরে গিয়ে আমরা দুজনেই তাই খাই চল্‌, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া অতি কষ্টে বললে, 'তার চেয়ে এখানে একটু বসা ভাল।'

জলের ধার থেকে খানিক সরে শুকনো বালিতে তারা নীরবে বসে থাকে। হেরম্ব বুঝতে পারে রূপাইকুড়ায় তাদের যে ছমাসের চুক্তি হয়েছিল সুপ্রিয়া এখনো তা অখণ্ডনীয় ধরে রেখেছে। এখন যে তাদের অন্তরঙ্গতা বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের সম্বন্ধে যে আলোচনা তাদের হয়ে গেল পরস্পরের কাছে দাম কমে যাবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলে এ আলোচনা তাদের এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না। উঠলেও এত সহজে সমাপ্তি লাভ না করে তাদের এমন কলহ হয়ে যেত যে, আগামী কাল পর্য্যন্ত পরস্পরকে তারা ঘৃণা করত। যাদের মধ্যে চেনা নেই, শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পর্য্যন্ত তারা ক্লেশ দেয়; বলে এই ত্যাখ, পাপ। তোমার পাপ, তোমার মহৎ চিত্তের মহাব্যাধি! অশোকের মধ্যস্থতাতেই কি সে আর সুপ্রিয়া পরিচয়ের এই নিম্নতর স্তর অতিক্রম করে এল? মুহূর্ত্তের তেজী হিংসার বশে সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়ে অশোক কি তার আর সুপ্রিয়ার মধ্যে চরম সহিষ্ণুতা এনে দিয়েছে?

তাই যদি না হয়, সুপ্রিয়ার প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে হেরম্ব মনে মনে তার এই চিন্তাকে ভাষায় উচ্চারণ করে, সুপ্রিয়ার মুখের আলো নিভে যাবার কথা। তার শেষ কথায় সুপ্রিয়া তো কাঁদত।

হেরম্বের সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হয় সুপ্রিয়ার দীর্ঘ নীরবতায়। নিরিবিলিতে কথা বলতে এসে তার কথা যেন ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গিয়েছে। বেলা শেষ হয়ে আসে, তবু সুপ্রিয়া কিছু বলে না। এই নীরবতা যে রাগ অথবা অভিমানের লক্ষণ নয় তাও সহজেই বোঝা যায়, সুপ্রিয়ার মুখে কোন অভিব্যঞ্জনা নেই বলে শুধু নয়, সরে সরে অতি নিকটে এসে তার আধ অন্যমনস্ক বসবার ভঙ্গিতে। খোলা চুল সে আর বাঁধেনি, আঁচল জড়িয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে, অনাবৃত মাথায় শুধু কয়েকটি আলগা চুল বাতাসে উড়ছে। হেরম্বের জামার যেটুকু ঝুল বালিতে বিছানো হয়ে আছে তাতে সে পেতেছে হাত, সেই হাতে দেহের উর্দ্ধাংশের ভর রেখে হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে বসেছে। সে যেন হেরম্বকে উঠতে দেবে না, জামা ধরে বসিয়ে রাখবে। অথবা বৃন্তচ্যুত ফুলের মত হেরম্বের কোলে ঝরে পড়ার জন্য সে শুধু হাতটির অবশ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

এখন একটু চেষ্টা করলেই হেরম্ব আনন্দকে ভুলে যেতে পারে। ফেননন্দিতা সাগরকূলে জনহীন দিবাবসানের বৈরাগ্যকে একটু প্রশ্রয় দেওয়া, সবল মনে একবার স্মরণ করা পার্শ্ববর্ত্তিনীর জীবনেতিহাস। সে তো কঠিন নয়। কত দিনের কত ক্ষুধা ও পিপাসা, কত স্বপ্ন ও সঙ্কল্প সঞ্চয় করে সুপ্রিয়া আজ এমন শিথিল ভঙ্গিতে এত কাছে বসেছে সে ছাড়া আর কার তা স্মরণীয়? নিজেকে হেরম্বের দুর্ব্বল ও অসহায় মনে হয়।

সুপ্রিয়া হঠাৎ মৃদু হেসে বললে, 'বাড়ীতে এখন আমার খোঁজ পড়েছে।'

হেরম্ব বললে, 'এবার ওঠা যাক।'

'এখনি? আগে সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তখন যদি উঠি তো উঠব।'

'যদি?'

'হ্যাঁ। সারা রাত নাও উঠতে পারি, কিছু ঠিক নেই। বেশ বালির বিছানা পাতা আছে। বসতে কষ্ট হলে আপনি শুতে পারবেন। বৃষ্টি নামলে কষ্ট হবে।'

হেরম্ব অভিভূত হয়ে বললে, 'তারপর কাল কি হবে?'

'এখান থেকে ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীতে উঠব। আপনার অনেক দিন কলেজ খুলে গেছে। আর বেশী কামাই করলে চাকরী যাবে।'

হেরম্ব কথা বলতে পারল না।

সুপ্রিয়া বললে, 'চাকরী গেলে চলবে না, আমাদের টাকার দরকার হবে। ছোট বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। সাত আটখানা ঘর আর খুব বড় খোলা ছাদ থাকা চাই।'

ছমাসের চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। সুপ্রিয়ার এই অন্তিম আবেদন।

ভীরু হেরম্ব পকেট হাতড়ে চুরুট বার করল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুরুট ধরিয়ে বললে, 'টিকিটের টাকা আনতে একবার কিন্তু আশ্রমে যেতে হবে, সুপ্রিয়া।'

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে পরদিন সকালে তাদের কলকাতা চলে যাবার মত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে টিকিটের টাকার জন্য চিন্তিত হওয়া এত বেশী তুচ্ছ যে, হেরম্ব ভাবতে পারলে না, সুপ্রিয়া বুঝবে না, এ শুধু সময়োচিত গম্ভীর পরিহাস, সুপ্রিয়ার প্রস্তাবকে এমনি ভাবে দুর্ব্বল হেরম্বের হেসে উড়িয়ে দেওয়া। সুপ্রিয়া সত্য সত্যই তার এই কথাকে স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিলে।

'তার দরকার নেই, আমার গায়ে গয়না আছে।'

একটু চিন্তা করে হেরম্ব বক্তব্য স্থির করে নিলে।

'শোন্ সুপ্রিয়া। তোর বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও কিনে দিইনি; আর আজ তোর গয়না বিক্রির টাকায় কলকাতা যাব? এমন কথা তুই ভাবতে পারলি! একবার তোর ভয় হল না, লজ্জায় ঘৃণায় আমি তা হলে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব?'

সুপ্রিয়ার হাত এতক্ষণে হয়ত অবশ হয়ে এসেছিল, হাত মুচড়ে তার শরীরের আশ্রয়চ্যুত উর্দ্ধভাগ হেরম্বের কোলে হুমড়ি দিয়ে পড়লে অস্বাভাবিক হত না। সে সোজা হয়ে বসলে। স্তব্ধ, নিশ্চল, কাঠের মূর্ত্তির মত। রূপাইকুড়ায় হেরম্বের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে সে এমনি ভাবে বসেছিল। হেরম্বের মনে আছে। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা হয়েছিল। আজ সূর্য্যাস্তের সূচনা মাত্র হয়েছে। ছোট একটি মেঘ এত জোরে ছুটে আসছে যে, সূর্য্যাস্তের আগেই সূর্য্যকে ঢেকে ফেলবে। সুপ্রিয়ার মুখ থেকে আকাশে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হেরম্বের মুখও বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল। দুহাতে ভর দিয়ে সে বসেছে। দুই করতলে সূক্ষ্ম শীতল বালির স্পর্শ অনুভব করে তার মনে হল, যে-পৃথিবীর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত হওয়ার কথা, তার আগাগোড়া মরুভূমি হয়ে গেছে। [ক্রমশঃ

আমাদের জাতীয় প্রগতি ও সাহিত্যের রূপান্তর

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাঙ্গালীর নবজাগ্রত মনের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা হইতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম। প্রধানত রস-বোধের পরিতৃপ্তির জন্যই বাঙ্গালী লেখক ও পাঠক বাংলা-সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রথম মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্য তখন সম্মুখে ছিল না এবং কোনও বিশেষ লক্ষ্যের উপযোগী হইয়া উঠিবার চেষ্টাও সেজন্য ছিল না। কিন্তু, এই ক্ষেত্রেই দুই একখানি বই যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমশ্রেণীর পুস্তকগুলির সমকক্ষ হইতে লাগিল বলিয়া রসগ্রাহী শিক্ষিত পাঠকেরা মনে করিতে লাগিলেন, এবং বাংলা ও ভারতের বাহিরে তাঁহাদের এই ধারণা কিছু সমর্থন পাইতে লাগিল, তখন হইতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে নূতন আশার সঞ্চার হইল এবং বাঙ্গালী পাঠকের মনে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাতৃভাষার প্রতি এই অনুরাগ ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোককে সাহিত্যসেবার দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল এবং এই প্রীতিই, বহু সাহিত্য-সেবককে, অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ দৈন্য দূরীভূত করিবার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করায় বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে কিছু কিছু পুস্তক লিখিত হইতে আরম্ভ হইল।

বাংলা সাহিত্য, কিছু প্রতিষ্ঠা পাইবার পর হইতে শুধু মাত্র রসবোধ-পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। যদিও শিক্ষা, রাজকার্য্য প্রভৃতি প্রয়োজনের মুখ্য ক্ষেত্রে দেশের ভাষা প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না, (এবং আজিও পারে নাই) তবুও প্রয়োজনের গৌণক্ষেত্রে ক্রমেই বর্দ্ধিত পরিমাণে ইহার ব্যবহার হইতে লাগিল। পরাধীনতার জন্য, নিজেরা নিকৃষ্ট এই বোধজাত মানসিক জটিলতা যদি আমাদের মধ্যে দেখা না দিত, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের প্রসার এবং সমৃদ্ধি অনেক বাড়িয়া যাইত। রাজকার্য্যে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার ব্যবহার অনেক গুণ অধিক হইতে পারিত এবং দেশের শিক্ষার ও অন্যান্য কাজ চালাইবার পক্ষে ইহার উপযোগিতা অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা যতটুকু স্থান পাইয়াছে, তাহাতে ইহার ব্যবহারিক উপযোগিতা বাড়িবার পক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা হয় নাই। বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানে যতটুকু সৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারই কিছু চর্চ্চার ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের প্রসার এবং আদর বাড়িলেও, বাংলা সাহিত্যের শিক্ষাপ্রদ বিভাগগুলি গড়িয়া উঠে নাই। শিক্ষার নিম্ন ও উচ্চ বিভাগে যদি বাংলাভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় সকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে সকল দিক দিয়া সকল প্রয়োজন মিটাইবার মত শক্তি ইহা এতদিনে লাভ করিত।

যাহা হউক, মুখ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও, নানা দিক দিয়া ইহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে, সমাজে, আর্থিক ব্যবস্থায়, শিল্পে, বাণিজ্যে সর্ব্বত্র যে উদ্যম ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল, তাহার জন্য ইংরেজী অনভিজ্ঞ জনসাধারণের সংযোগ ও সহযোগিতা অপরিহার্য্য হইল। তাহার ফল হইল যে, দেশের রাজকার্য্যে যদিও দেশের ভাষার স্থান হইল না, তবুও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে, সভাসমিতিতে, রাজনীতিক আলোচনা ও বক্তৃতায় এবং মতপ্রচারের জন্য পুস্তক, পত্রিকা সংবাদপত্র প্রভৃতিতে, বাংলা ব্যবহার না করিবার উপায় থাকিল না। রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া দেশের মধ্যে যে গণজীবন গড়িয়া উঠিল এবং তাহার ফলে যে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, তীব্রতা ও দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে এবং কখনও মৃদু, কখনও প্রবল আকারে জাতিকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল, আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার ও আত্ম-প্রকাশের জন্য তাহাকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইল।

অবশ্য আজও যেসকল লোক আমাদের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছেন, কর্ম্মের সমগ্র পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, যাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও ভাষার প্রভাবও জনসাধারণকে অলক্ষিতে তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট করে, তাঁহারা ইংরেজীকেই প্রধান বাহনরূপে ব্যবহার করেন বা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

যখন ইংরেজীশিক্ষিত একটা সংকীর্ণ দল, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও মানসিক বিলাসের জন্যই মাত্র রাষ্ট্রনীতিকে ব্যবহার করিতেন, তখন শুধুমাত্র ইংরেজীর সাহায্যেই এই সকল কার্য্য চলিত। কিন্তু এই আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে যতই সত্য হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বাংলা সাহিত্যের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ স্তরে ইংরেজীর ব্যবহার হইলেও, তাহার ঠিক পর হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সকল স্থলেই বাংলা ব্যবহৃত হইতেছে।

অবশ্য এই প্রয়োজনের তাগিদ ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও, ক্রমেই অধিক পরিমাণে বাংলা ব্যবহারের অন্য কারণটিও বর্ত্তমান ছিল। আমাদের একদল লোক যেমন তাঁহাদের সকল কার্য্যে ইংরেজী ব্যবহার করিতে পারাকে শ্লাঘার ও গৌরবের বলিয়া মনে করিতেন, তেমনই মাতৃভাষার হীনাবস্থার জন্য অপর একদল লোকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাঁহাদের এই আত্ম-সম্মানবোধ বাংলা ভাষার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ফিরাইল এবং তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বাংলা ব্যবহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাংলা সাহিত্যের উপর, এই নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া উঠিবার ক্রমবর্দ্ধিত চাপ পড়িতে লাগিল।

রাষ্ট্রে যেমন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তেমনই অনুরূপ কারণে বাংলা সাহিত্যের ডাক পড়িল। যখনই কোন নূতন চিন্তা, নূতন ভাব কতকগুলি লোককে কোন নূতন কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তখনই তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দল গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তর্ক-বিতর্ক ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার কতক অংশ ইংরেজীতে চলিলেও, প্রধানত বাংলার সাহায্যেই কাজকর্ম্ম চলিয়াছে। এ সকল উপলক্ষে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে, অনেক বিষয় ভাবিতে হইয়াছে এবং অনেক জটিল চিন্তা যথাযথ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ইহার সকল কাজের ভিতর দিয়াই, আমাদের বহু প্রয়োজনসমন্বিত জাতীয় জীবনের উপযোগী হইয়া উঠিবার তাগিদ ভাষার উপর অবিরত আসিয়াছে।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা, চেষ্টা এবং আংশিক সাফল্য শিক্ষার দিক দিয়াও কম আসে নাই। শিক্ষার মুখ্য ক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষার স্থান ছিল না বা নাই, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু, ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা মনোরাজ্যে যে জগতের সম্মুখীন হইলাম সে জগৎ আমাদের চিরপরিচিত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতে এবং এই নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনের যে উদ্বোধন হইল, মন যে নূতন গতি ও শক্তি পাইল, তাহা আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজিতে লাগিল। প্রথম প্রথম অবশ্য ইংরেজীর মধ্য দিয়াই এই চেষ্টা চলিল। কিন্তু একথা আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হইল না যে, দুই একজন লোকের পক্ষে সম্ভব হইলেও, বিদেশী ভাষায় সাহিত্যরচনা সহজসাধ্য এবং সম্ভবযোগ্য ব্যাপার নহে। তাহার পর কথা হইল, তরুণ বঙ্গের যে মর্ম্মবাণী, ইংরেজীতে লিখিয়া তাহা কাহাকে শুনান যাইবে? ইংরেজের নিকট হইতে শেখা কথা ইংরেজকে শুনাইয়া বিশেষ মূল্য বা সম্মান পাইবার আশা ছিল না। আবার যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা স্বল্পমাত্র ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করিয়া, অথবা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে চিন্তার যোগাযোগ সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে চাহিল না। কাজেই দেশের লোককে এই সকল কথা শুনাইবার জন্য বাংলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। আত্মাভিমান ও মাতৃভাষাপ্রীতি এই কার্য্যকে সমধিক অগ্রসর করিয়া দিল।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া শিক্ষা ও জ্ঞানের একটা নূতন পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীদের একটি প্রভাবশালী দল প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার এই ইচ্ছা সাহিত্যের সকল বিভাগ ও উপবিভাগে দেখা যাইতে লাগিল; ইহার ক্রিয়াশীলতা এখনও পূর্ণ গতিতে চলিয়াছে। নানাবিষয়ক ছোট বড় নানা পুস্তক, সাময়িক পত্রিকাদিতে বহুবিধ রচনা এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। সর্ব্বশেষোক্ত ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কারণ বাংলা সাহিত্যের এখনও গড়িয়া উঠিবার অবস্থা, ইহার পাঠকগোষ্ঠী সীমাবদ্ধ এবং প্রচারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সাহিত্য আরও একটু পরিণত অবস্থায় না পৌঁছিলে, পাঠকসংখ্যা আরও না বাড়িলে, প্রচারের ক্ষেত্র বিস্তৃততর না হইলে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশের ভাষা উপযুক্ত স্থান ও প্রতিষ্ঠা না পাইলে, সাহিত্যের শিক্ষাপ্রদ বিভাগগুলিতে আশানুরূপ পুস্তকাদির প্রকাশ সম্ভব হইবে না।

তাহা হইলেও সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মূল্য কম নহে, অথবা তাহা অবহেলা করিবার মত নহে। এই সাহিত্যে চিরস্থায়ী, বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য লেখা বাহির হইতেছে কিনা, উৎকর্ষে এবং পাণ্ডিত্যে এই সকল লেখার বিশেষ মূল্য আছে কিনা, অন্যান্য দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলির তুলনায় ইহাদের স্থান কোথায় প্রভৃতি কথার দ্বারা ইহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইবে না। আমাদের চিন্তা ও কল্পনার উপর, ইহার যে প্রভাব তাহা দিয়াই ইহার উপর আমাদের দাবী কতটা এবং কতটা সেই দাবী ইহাকে পুরাইতে হইতেছে, তাহা বিচার করিতে হইবে।

আমাদের জাতীয় জাগরণের সহিত আমাদের কর্ম্মের ও চিন্তার যে প্রসার ঘটিয়াছে, সেই বিস্তৃত কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেও সকল প্রয়োজনে আমরা বাংলাই ব্যবহার করিতেছি। আমাদের শিক্ষিত পাঠক সমাজের এক বৃহৎ অংশ যদিও ইংরেজী সংবাদপত্রের পাঠক, তবুও আর একটু গুরু বিষয়, সুচিন্তিত মতামত, এবং মৌলিক চিন্তার দিক দিয়া বাংলার প্রথম শ্রেণীর মাসিকগুলি বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকের প্রধান অবলম্বন। বর্ত্তমানে বাংলা সংবাদপত্রের উন্নতি হওয়ায় সংবাদপত্রের পাঠকদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালী পাঠকেরা, মানসিক পুষ্টির জন্য এবং দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য, ক্রমেই অধিক পরিমাণে বাংলার উপর নির্ভর করিতে থাকায়, এই সকল পাঠকের মনের ক্ষুধা পূরণ করিবার দায়িত্ব বাংলার সাময়িক সাহিত্যকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরেজীতে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদিগকে মনের দাবী মিটাইবার জন্য বাংলা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিতে হয়। কারণ, আমাদের মাতৃভাষার সহিত সকল সম্পর্ক বর্জ্জিত, ইংরেজীর ন্যায় বিদেশীভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ; অনেক ছাত্রের পক্ষেই তাহা সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া, যে বয়সের ছাত্রদের, যে প্রকার কৌতূহল ও বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিবার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা পূরণ করিবার জন্য যে সকল ইংরেজী বই পড়িবার প্রয়োজন হয়, সে সকল বই পড়িবার মত ইংরেজী বিদ্যালাভ সেই বয়সের ছাত্রদের ঘটে না। কাজেই কৌতূহল ও বুদ্ধিকে উপযুক্ত সুযোগ দানের জন্য কৌতূহলী এবং মানসিক উদ্যমশীল ছাত্রেরা বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন এবং বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি তাঁহাদের এই আকর্ষণকে দৃঢ় করিয়া তুলে। আবার পাঠকের মনের দাবী সাহিত্যকে প্রয়োজনের উপযোগী হইয়া উঠিবার জন্য যে পরোক্ষ তাগিদ দিতে থাকে, এদিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের উপর তাহা অবিরত আসিয়াছে এবং তাহাই ইহাকে উৎকর্ষের দিকে দ্রুত লইয়া চলিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষার পাশে, বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া এইরূপে শিক্ষার যে দ্বিতীয় পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিল তাহাতে তরুণ বাংলার বিশিষ্ট মনের, তাহার বুদ্ধির ঝোঁকের, তাহার কল্পনার প্রিয় বিষয়ের, জগৎকে দেখিবার নিজস্ব ভঙ্গীর, তাহার বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য মানসিক চাঞ্চল্যের, তাহার রসোপলব্ধি ও সৌন্দর্য্যবোধের, তাহার সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার সুরের ছাপ মুদ্রিত হইল ; অর্থাৎ এইরূপে বাংলা সাহিত্য বাংলার নবসৃষ্ট কৃষ্টির একমাত্র বাহন হইল। আবার বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর কৃষ্টির বাহন হইল বলিয়া, কৃষ্টিকে বহন করিবার মত পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিবার চাপ সাহিত্যের উপর পড়িয়াছে।

এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের মনের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা, জাতীয় জীবনের নানাবিধ সমস্যার চাপ দেশে যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দাবী, আমাদের স্বাজাত্যাভিমান, আমাদের শিক্ষার পক্ষে ইহার অপরিহার্য্য আবশ্যকতা এবং বাংলার বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিবার চেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকে সম্ভব করিয়াছে।

আমাদের মনের রসবোধ পরিতৃপ্তির জন্য নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা হইতে এবং মানুষের মনে সৃষ্টির জন্য যে সহজ প্রেরণা থাকে তাহা হইতে জন্ম লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানের বহু সমস্যাকীর্ণ জাতীয় জীবনের বহুবিধ জটিল প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়াছে।

মানুষের মনে মানুষের জীবন-রহস্য জানিবার কৌতূহল অপরিসীম ; সেইজন্য গল্প শুনিবার এবং গল্প বলিবার ইচ্ছাও মানুষের চিরন্তন। এই ইচ্ছা এবং বাঙ্গালীর মনের উপর সুরের প্রভাব, গল্প উপন্যাস এবং কাব্য ও সাহিত্য রচনায় বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এখানে তাহার শক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাই ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া প্রয়োজনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিল।

বাংলা সাহিত্য এইরূপে আমাদের মনের প্রথম জাগরণ হইতে উদ্ভূত হইয়া জাতীয় প্রগতিকে সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সফল করিয়া তুলিয়াছে। বাংলার রচনারীতিতে যে একটা নির্দ্দিষ্ট মানের অভাব দেখা যাইতেছে, বাংলা সাহিত্য সর্ব্ব বিষয়ে যে অবিরত রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ, ক্রমাগতই ইহা বিস্তৃততর ক্ষেত্রের সম্মুখীন হইতেছে এবং এই নবতন দাবী মিটাইবার জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা ইহাকে করিতে হইতেছে। *

* পাঁজিয়া (যশোহর) সারস্বত পরিষদে পঠিত।

গ্রাম্য কথা ও গাথা ইত্যাদি

—শ্রীকিরণকুমার রায়

চীনপরিব্রাজক হিউ-এনথ-সঙ্গ যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আসেন, তখন কান্যকুব্জ নগরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বহু জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও ভিক্ষু সমবেত হন। প্রকাণ্ড একটি অস্থায়ী সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। সভা হইতে অনতিদূরে একশত ফুট উচ্চ একটি উৎসব-গৃহে মানব-প্রমাণ বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে

নদিয়া : জয়দুর্গার মন্দির।

২ শে তারিখ পর্য্যন্ত এই উৎসবের অধিবেশন হইয়াছিল। উৎসবক্ষেত্রে নৃত্য-গীতাদির বিপুল আয়োজন ছিল। প্রতিদিন সমারোহের সহিত উৎসব সূচিত হইত। মহারাজ স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণবুদ্ধ স্কন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইয়া ঐ মূর্ত্তি উৎসব-গৃহে আনয়ন করিতেন। পুষ্পধূপাদি গন্ধদ্রব্যে চৈত্রমাসিক এই বৌদ্ধ বাসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

এই উৎসব-ক্ষেত্রের সুবৃহৎ মণ্ডপে ঈর্ষ্যান্বিত ব্রাহ্মণগণ একদিন অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে দোলযাত্রা উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে, নেড়া পোড়া (কোন কোন স্থানে মেড়া-পোড়া বলা হয়) নামে যে অগ্ন্যুৎসব কোথাও কোথাও হইয়া থাকে, সার্দ্ধদ্বিহস্র বৎসর পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই নেড়া-(বৌদ্ধ ভিক্ষু)-দহনের ব্যঙ্গোৎসব বলিয়া তাহা অনুমিত হইয়াছে। একদিন যাহা সমগ্র ভারতের রাজানুষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ হিসাবে ঘটিয়াছিল আজ তাহা একটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ কয়েকটি পল্লী-বালকের আচরণীয় বিরক্তিকর অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মনে হয়, সকল দেশের লোক-উৎসবের ইতিহাসই এই রকম। প্রাচীন গীত, উৎসব, জনপ্রবাদ প্রভৃতির আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রবলের ধর্ম্ম, দেশের উচ্চবর্ণের মহাসমারোহের উৎসব—কালক্রমে অতি দুর্ব্বলের ধর্ম্ম হিসাবে অত্যন্ত অন্ত্যজ বর্ণের হাস্যকর ক্রিয়ানুষ্ঠানের আকার গ্রহণ করে।

রাখীবন্ধন আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন সাহিত্যে ইহার বহু উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমানে এ প্রথা কয়েকজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা পালিত হইতে দেখি নাই। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় ইহার পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি মানুষের মমত্ববোধ স্বাভাবিক। জাতীয় জাগরণের সহিত এই রীতিনীতির সম্বন্ধে নূতন করিয়া শ্রদ্ধাবোধের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক দেখা যায়। সাহিত্যেও তাহার প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে দেশবাসীর সাগ্রহ ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে এ বিষয়ে কিছু গবেষণা ও অনুসন্ধান হইয়াছিল। এখানে ওখানে দুই একটি পরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক মূল্যবান প্রাচীন পুথি, কুলজী গ্রন্থের সঙ্কলন হইয়াছিল। হরিদাস পালিত প্রণীত মূল্যবান গ্রন্থ আ দ্যে র গ ম্ভী রা-র প্রণয়ন কাল ঐ

সময়েই। ইহার ভূমিকায় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "চারিদিকে প্রচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রচীন গীত, উৎসব

নদিয়া : মেয়েদের ব্রত-নৃত্য।

ও জনপ্রবাদ প্রভৃতির সঙ্কলন ও সমালোচন আবদ্ধ হইয়াছে।... এই গ্রন্থে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অনেক তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের ধারাবাহিক জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই শ্রেণীর উপকরণ ও তথ্য প্রকাশিত হইতে থাকিলে আমরা কি প্রকার উন্নতিশীল জাতীয় লোকের উত্তরাধিকারী, তাহা জানিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাইব এবং ক্রমে দেশের সমগ্র ইতিহাস মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।...বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার পল্লীজীবন যতই ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে আলোচিত হইতে থাকিবে, ততই আমাদের জাতীয় গৌরবের একটা নূতন দিক অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত হইবে।"

নদিয়া : হরি ঠাকুরের বাটির সিংহাসন।

তাহার পর প্রায় ২৫ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল। তদবধি এই ধরণের গবেষণা কিছু কিছু হইয়াছে সত্য, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। মাসিক পত্রিকাদিতে এই বিষয়ে মাঝে মাঝে ছড়ানো প্রবন্ধ ব্যতীত এই দিক হইতে কোন গঠনমূলক প্রচেষ্টার সংবাদ আমাদের জানা নাই। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে এই প্রকার ঔদাসীন্য একেবারে অসম্ভব হইত।

১৮৭৮ সালে লণ্ডন সহরে প্রথম 'ফোকলোর সোসাইটি' (Folklore Society) স্থাপিত হয়। তৎপরে উহা আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালি, সুইজার্ল্যাণ্ড, বিশেষ করিয়া জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে এই সকল সোসাইটির কাজের নমুনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুনিয়াছি, দক্ষিণ ভারতে এই রূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সকল ফোকলোর সোসাইটির কাজের ফলে উহাদের দেশে এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী এই সকল গ্রাম্য গাথা ইত্যাদির একটি শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। মূলতঃ ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে : [১] সংস্কারমূলক ; [২] জনপ্রবাদমূলক ; এবং [৩] শিল্পমূলক। সংস্কারমূলক যাহা, তাহার একাংশ অন্ধবিশ্বাসগত ; যেমন জড়বস্তু ও নৈসর্গিক ঘটনায় দেবত্ব আরোপ ; বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো, ডাইনী, হাতুড়ে, ইন্দ্রজাল, ইত্যাদির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস। অপরাংশ ঐতিহ্যগত ; যেমন ব্রত, পূজা, পালা-পার্ব্বণ, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ উপলক্ষে পালিত আচারানুষ্ঠান, খেলাধুলা,

বিবিধ স্থানীয় রীতিনীতি ইত্যাদি। জনপ্রবাদমূলক বলিতে গাথা, গল্প, উপকথা, ছেলেভুলান ছড়া, পুরাকাহিনী, ঠাকুর-

নলিয়া : হরিঠাকুরের বাড়ী।

দেবতার কথা, স্থানমাহাত্ম্যসূচক ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। শিল্প-মূলকের দুই ভাগ, প্রথম সঙ্গীত; দ্বিতীয় নাট্য। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই আমাদের কথকতা, বহুরূপী, বেহুলার ভাসান, পুতুল-নাচ, আউল-বাউল, গাজন, গম্ভীরা, নীলা সমস্ত অন্তর্ভুক্ত।

এই শ্রেণীবিভাগের একটির সহিত অপরের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও এতদনুযায়ী গবেষণা বেশ চলিতে পারে। মনে হয়, বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের দেশে এই সব বিষয়ে যে অনুসন্ধান হয়, তাহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা থাকিলে কাজেরও সুবিধা, উদ্দেশ্যও অনেকাংশে সার্থক হয়। তাহা না হইলে, যাঁহারা এ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা এখানে এই ধরণের অনুসন্ধানের দুইটি পরিচয় উপস্থিত করিলাম। একটি, ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রাম ও সন্নিহিত কয়েকটি স্থান-সংশ্লিষ্ট। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল মথুরাপুরের দেউল বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্য ১৩৪০ সনের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত রচনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মথুরাপুর ছাড়াও তাঁহারা আরও যে কয়েকটি স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে সংগৃহীত গানগুলি এবং গৃহীত আলোকচিত্র সকল এখানে প্রকাশিত হইল। সংগ্রাহক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা এজন্য ঋণী।

অপরটি পাবনা জেলার রাজনারায়ণপুর পল্লীসমিতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পাঠাইয়াছেন।

নলিয়া-অঞ্চলে সংগৃহীত

বাউল-গান

আমি কেন বা ভবে বেঁচে রলাম সই
আমার মরণ হ'ল না
বন্ধু আমায় অনাথ করে গেছে চলে
সই আরত ফিরে এল না।
অক্রুর মণির রথে চড়ে, শ্যাম গিয়েছে মথুরাতে গো
ওই রথের চাকার নীচে পড়ে
জীবন কেন গেল না।
ব্রজপুরী আঁধার করে, শ্যাম গিয়েছে মথুরাতে গো
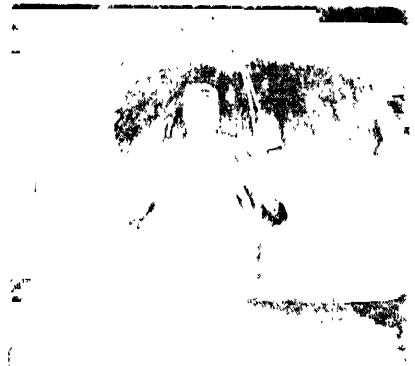
বাউল।

কি যেন কি অপরাধে
সই রে আমায় সাথে নিল না।
কতক ঘুরে যেয়ে ওই শ্যাম, আমার দিকে চেয়ে র'ল গো

কি যেন কি বলতে ছিল কথা, বলাই দাদা সাথে ছিল
আর বলতে পারল না।
বন পোড়ে তা সবাই দেখে
মন পোড়ে তা কেউ না দেখে গো
আমার ভিতরে লেগেছে আগুন
বাহিরে জল ঢেল না।

হয়ে কেন মলে না বাপ
না লইতাম কোলেরে।
সন্নোসী না হইওরে বাপ, বৈরাগী না হইও
ঘরে বসে কৃষ্ণ নামটী মায়েরে শুনাইও,
ভাগবত পড়রে নিমাই
চণ্ডী আরও পড়

চাষার গান

আমার জাত গেল বাইদানীর সাথে।
আমার জাত গেল, কুল গেল, রইল কুলের খোটা
রজনী প্রভাতের কালেরে আমার বাইদানীর সাথে দেখা
নিল রাই রাই।
তোমরা তো বাইদানীর জাত, মাঠে ফেলাও টোল
ওরে ঝড়ি বৃষ্টি অন্দোকারি, বইসে বাজাও ঢোলরে
নিল রাই রাই!
খাটো খোটো বাইদার মেয়ে, লম্বা মাথার কেশ
হারে তারে দেইখা আমার প্রাণ ছাড়ল নিজ দেশরে
নিল রাই রাই।
তুমিতো গেরস্তের ছেলে থালে খাও ভাত
আমার সাথে গেলে পরে, কাটতে হবে পাতরে
নিল রাই রাই।
তুমিতো গেরস্তের ছেলে শুয়ে থাক খাটে
আমার সাথে গেলে পরে ঘুরতে হবে মাঠেরে
নিল রাই রাই।

টহল

জাগো জাগো নগরবাসী
নিশি অবসান রে
গৌর গোবিন্দ বলে, উঠরে কুতুহলে
শীতল হবে মন প্রাণরে।
কত নিদ্রে যাওরে রাধে
কালমাণিকের কোলে
রাই জাগে কি শ্যাম জাগে
শুক সারী বলেরে।

মথুরাপুরের দেউল : সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের প্রথমভাগে নির্ম্মিত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প উল্লেখযোগ্য। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। ভিত্তিভূমিতে বাহিরের ব্যাস ৩৪´ ১১ , দেওয়াল ১১´ পুরু।

নিমাই-সন্ন্যাস

অলপ বয়সের নিমাইরে আমার
তোরে যোগী সাজাল কেরে
তোরে বেহাল পরাল কে?
যে সময় নিমাই জন্ম নিলে
নিমতরু তলে

সবাইকে বুঝাইতে পার বাপ
তুমি জননী কেন ছাড়।
দেখ দেখ লোকজন, দেখগো চাহিয়া
নিমাইচান্দ সন্ন্যাসে যায়, ও তার জননী ছাড়িয়া
এত যদি ছিলরে নিমাই যাবারে ছাড়িয়ে
তবে কেন বিষ্ণুপ্রিয়ে করেছিলে বিয়ে

ঘরে বধ বিষ্ণুপ্রিয়ে জ্বলন্ত অগিনী
আর কতকাল রাখব আমি বাপ
তারে দিয়ে প্রবোধবাণী
রাম যায় বনবাসে সঙ্গে লয়ে সীতে
তুমিও সন্ন্যাসে যাও বাপ
লয়ে যাও বিষ্ণুপ্রিয়েরে।

দৃষ্টি দিয়ে পার্ব্বতী বসেন একদিকে
ক্রোধ করি মহাদেবী কহেন অম্বিকে
তুমি ত ভাঙ্গ খাও, সদা বেড়াও শ্মশানে
কোন গুণে ডাকে তোমায় লঙ্কার রাবণে
দিবা রাত্রে কোচ পাড়াতে কর আনাগোনা
আমি মেয়ে তাই সয়ে আছি এত দীনা

বিবাহ করিতে, দেবতা সঙ্গেতে,
যেদিন গেলে আপনি
আপনি যেমন, ঘটক তেমন,
নিয়েছিলে শূলপাণি
তোমার বলদ, ঢেঁকিতে নারদ,
সঙ্গেতে দানবগণ
তুমি যেমন গুরু, তোমার তেমন চেলা,
পেযেছ হে পঞ্চানন
কহিতে লাজ তোমার কাজ,
আমি কহিতে লজ্জা ছাড়ি
তুমি ল্যাংটা হয়ে করিলে রঙ্গ,
সম্মুখে শাশুড়ী

(শিবের উত্তর)

স্থির করি মন কহেন পঞ্চানন
চক্ষু হইল রাঙা
টলমল করে শিবের মস্তকেতে
জটাজাল গঙ্গা
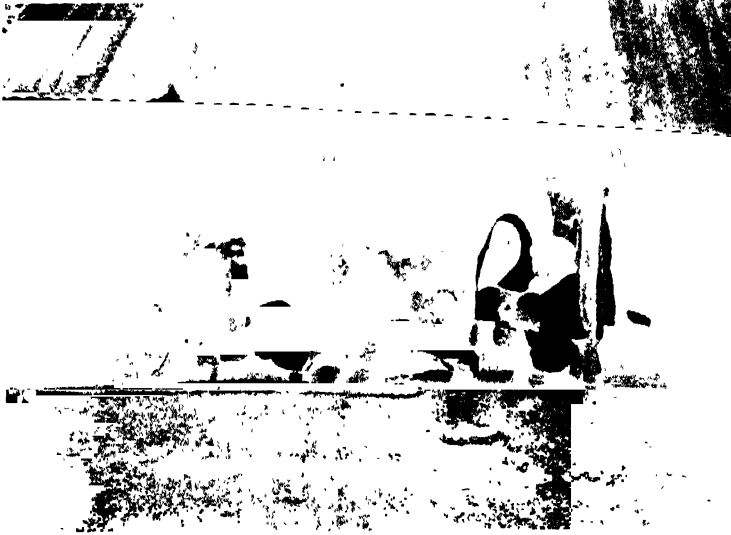
বাউলগান সংগ্রহ : সংগ্রাহক শ্রীগুরুসদয় দত্ত।

দেহতত্ত্ব

কাঁচ কাঞ্চন একই দরে চিনে নেওয়া হ'ল ভার, হ'ল ভার।
কোন ঘরেতে ফণা ধরে অজাগর।
এলে এলে সাধুরে ভাই, এলে ব্যাপার করিতে
যেওনারে যেও না ভাই ফণার ঘরে মরিতে
নাম শুনেছ কাঞ্চনপুর
কাঞ্চনের ঘর বহুদূর
ও তার দ্বারে বাঁধা অসুর
ধরলে করবে কারাকার কারাকার।
যাবি যদি কাঞ্চনপুরে, চেতন গুরুর সঙ্গ ধর
চতুর্দ্দলে কুণ্ডলিনী তারে আগে সাধন কর
আছে দ্বিদল আর শতদলে
দেখলি না নয়ন খুলে
আছে রত্নময় সহস্রদলে
যেখানেতে প্রেমবাজার প্রেমবাজার।

রামায়ণগান

(পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শিবকে রাবণের মৃত্যুতে তিরস্কার)

কেন হর দিলে বর লঙ্কারই রাবণে
বর দিয়ে বরপুত্র বধ কি কারণে ?

দেবতা সঙ্গেতে অসুর বধিতে যেদিন গেলে আপনি
দেখিতে রণ, যায় দেবগণ, তাহাতে গেলাম আমি
শূন্য পথে রণ দেখিতে অমরগণ, সব আসে
তুমি ল্যাংটা বেশে, হয়ে এলোকেশে, দেখে দেবগণ সব হাসে
কোন দেবতার পতি, পড়েছে পত্নীর পদতলে
কোন দেবতার পত্নী পদ দেয় পতির বক্ষস্থলে
আপন দোষে মরে বেটা লঙ্কার অধিকারী
আমি কি বলেছিলাম, রামের সীতা করগে চুরি।

জালের বারশে (বারমাসী)

জালের মাথায জাল দড়িরে
আমার মাথায রে ডালি
ওরে কেমনে বেচিব মাছরে
ঐ না গৃহস্থের বাড়ীরে
নচিব এই ছিল।
কি খেনে জল আনতে গেলাম রে
উজোন নদীর ঘাটে
ওরে সেইখানে পুড়িল কপালরে
ওই না হলকা জালের সাথে রে
নচিব এই ছিল।

সাত ভাইয়ের বুন আমিরে
পরমা সুন্দরী
ওরে ছোট ভাই বৌদি দিছলো গালিরে
জ্বালিয়ে ভাতারিরে
নছিব এই ছিল।

মায়ে দিল ডাল চালয়ে
বাপে দিলরে হাঁড়ী
ওই যে রসুই করে খাওগে তুমিরে
হলকা জালের বাড়ীরে
নছিব এই ছিল।

আগে যদি জানতাম আমিরে
প্রেমের এত রে জ্বালা
ওরে ঘর পাতিতাম নদীর চরেরে
আমি থাকিতাম একেলা রে
নছিব এই ছিল।

কাব্য হিসাবে এই সকল সংগৃহীত গানের মূল্য খুব বেশী নয়, এবং এই ধরণের সকল গানের যে একঘেয়েমি, এগুলিতেও তাহা সুস্পষ্ট। মধ্যে মধ্যে অর্থহীন। কিন্তু সুর তান লয় ও নাচের সহিত গীত হইলে এই সকল গানেরই রূপ অপূর্ব্ব হইয়া উঠে। যেমন অজিত-বাবুর বর্ণনায় জানিতে পারি, উপরের রামায়ণ গানের অংশ গাওয়া হইলেই দলপতি মাদলে শব্দ করিয়া গান ধবেন, 'রণ মাদল বাজিল রে, ধাধা ধ্রিনি ধা, বাজে ধাকিনা ধাকিনা ধ্রিনা ধা রণ মাদল বে।"

অধিকাংশ পল্লীগাথাই এইরূপ। ছাপার অক্ষরে পড়িয়া উহাদের সম্যক রূপ বুঝা যাইবে না।

নিম্নে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। ইহার মতের সহিত আমাদের মতের অধিকাংশ স্থলেই মিল থাকাতে প্রবন্ধটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত হইল।

ছড়ায় ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।" বাঙ্গলার "বারমাসীয়া"র করুণ গীতি বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী প্রচারিত করিয়া এখনও জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে। বাঙ্গলার "ময়নামতী", "গোপীচাঁদের গান" প্রভৃতি এখনও বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গলার পল্লী-কবি তাঁহাদের সমসাময়িক ইতিহাস, উপকথার আকারে ঢালিয়া জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করিয়াছেন। কালের ধ্বংসপ্রবণতায় তাহার অনেক কথাই বিলুপ্ত হইয়া

রামায়ণ গান।

গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাতে এখনও প্রাচীন বাঙ্গলার ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাবনা জেলার রাজনারায়ণপুর গ্রামের পল্লীসমিতি পাঠাগারের সভ্যগণ অনেক পল্লীগীতি, ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি ছড়ায় পাবনা জেলার সময়বিশেষের ইতিহাস পাওয়া যায়। সেই ছড়াগুলি আমরা যতদূর সম্ভব ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু এরূপ সঙ্কলন করা বড় কঠিন। "কোনটির কোন কালে কোন রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজও রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্রবৎসর পূর্ব্বে

রচিত হইলেও নূতন।" যাহা হউক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাদের স্থান সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে মগের উৎপাত কোনও দিনই ভুলিবার নয়। কত নরনারীকে ধরিয়া নিয়া যে ইহারা আরাকানে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, কত কুলকামিনীর যে ইহারা চিরকালের মত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত নিরীহ বাঙ্গালীর রক্তে যে পৃথিবী সিক্ত করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রাজা তখন দুর্ব্বল, প্রজা নিজ্জীব। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের এক মাসেই নাকি ইহারা দক্ষিণবঙ্গ হইতে ১০০০ লোক ধরিয়া লইয়া যায়। বহু পল্লীকবিতায় এখনও ইহাদের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত গ্রাম্য কবিতাটি দেশের এই দুঃসময়ের পরিচায়ক। মগেরা এক কুলবধূকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

মগ রাজা লইয়া যায় বিদেশী মাঝির নায।
আরে কইও কইও থপরডা শশুরের পায়॥
দেহেতে পরাণ আমি রাখিব নারে।
আমারে যান্ তালাস করে গাঙ্গের ধারে ধারে॥
আরে এই থপরডা দিও আমার শাশুরীরে।
কোলের ছাওয়াল শুইয়্যা রইছে পিঁড়ার১ উপরে॥
আর নিচ্ছুবে২ এই কথাডা কইও আমার সোয়ামীরে।
পালের বলদ বেইচ্যা যেন আর এক বিয়া করে॥
মারে কোন জনমের মহাপাপের ফলেতেরে।
মগরাজার হাতে পড়্যা পরাণ গ্যালোরে॥

১। পিঁড়া=বারান্দা; ২। নিচ্ছুবে—গোপনে, চুপিচুপি।

দেহতত্ত্ব গান।

কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়া এক সময়ে অক্ষম বাঙ্গালীকে কাল কাটাইতে হইয়াছে!

কোম্পানী বাহাদুর তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা রাজস্ব গ্রহণ করেন কিন্তু দেশশাসনের ভার নবাবের উপর। এই দ্বৈত নীতির ফলে দেশ ক্রমে শ্মশান হইয়া উঠিল। রেজা খাঁ ও দেবীসিংহের অত্যাচার ও তৎপরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। ইংরেজরাজ দেশে রেল লাইন ও নানারূপ অফিস নির্ম্মাণ করিলেন। নীচের ছড়াতে ইহার ইতিহাস পাওয়া যায়। শুনা যায় এই কবিতার রচয়িতার নাম রামপ্রসাদ মৈত্র। রামপ্রসাদ পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাংশে জীবিত ছিলেন এবং কবিতায় সমসাময়িক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন (পঞ্চপুষ্প—ভাদ্র, ১৩৩৮)।

কোম্পানীর ইংরাজেরা বড়ই চতুরা।
নবাবের ফৌজ দিয়া কেল্লা দিল ম্যারা॥
ইংরাজ বলবো কি?
কোম্পানীর শাসন ভারি ছাড়ে না কড়ি কাণা।
ট্যাকার ব্যালায় ছোট বড়োর গালে ছায় চোনা॥
ইংরাজ বলবো কি?
কোম্পানীর রাজ্য জুড়্যা হলো অনাটন।
সগর্গল মনিষ্যি মর্য্যা তখন যমের বাড়ী যান॥
ইংরাজ বলবো কি?
কোম্পানীর গোমস্তাগুল্যা খাজনা আদায় করে।
(ওরে) এক দণ্ডের দেরী হলো ঘাড় প্যার্যা ধরে॥
ইংরাজ বলবো কি?
কোম্পানীর ইংরাজ বলবো কি তোরে।
যত রাজ্যের লাইন আস্যা রাস্তা বান্ধালে॥
ইংরাজ বলবো কি?
কোম্পানীর বুদ্ধি বড়ো করলো আপিসখানা।
যত মান্সি চাকরী নিব্যার করে আনাগোনা॥
ইংরাজ বলবো কি?

ভারতবর্ষে ঠগী কাহিনী কখনও ভুলিবার নয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও ঠগীদের উৎপাত হইয়াছিল। পাবনা জেলায় ইহারা "গামছা-মোড়ার দল"

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই জেলায় শিবপুর গ্রামের লক্ষ্মীচন্দ্র মৈত্র ও জগৎচন্দ্র মৈত্র এই গামছা-মোড়া দলের নেতা ছিলেন। যখন ইংরেজ-রাজ ঠগী দলন করেন, তখন লক্ষ্মীচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও জগৎচন্দ্রের ফাঁসী হয়। নীচের ছড়ায় ইহাদের দলবলের পরিচয় পাওয়া যায়।

বক্সা চাঁড়াল তামাক সাজে।
উদ্ধা নাপিত দাড়ি চাঁছে॥
মোনা ছুতার বানায় নল।
বাহবা গামছা মোড়ার দল॥

পাবনা জেলার আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রজাবিদ্রোহ অন্যতম। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নানাকারণে প্রজাগণ জমিদারের খাজানা বন্ধ করে ও চতুর্দ্দিকে লুটতরাজ করিতে থাকে। ঈশানচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি ইহাদের নায়ক ছিলেন। ইহাদের অত্যাচারে জনসাধারণের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল "পলো"(১) এবং ছোট একখানা লাঠি। এইজন্য এই ঘটনা "পলোবিদ্রোহ" নামে কথিত হয়। শুনা যায় এই ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন এবং প্রজাস্বত্ব আইন লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে অনেক ছড়া এখনও পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি দিলাম—

ও বাবা বিদ্রোহীদের কথা কবো কি।
নূতন আইন, নূতন দেওয়ান কালু পালের ব্যাটা।
সকলের আগে চলে মাথায় বাঁধ্যা ফ্যাটা॥
লাঠি হাতে পলো কাঁধে চলো সারি সারি।
সকলের পরথমে যায্যা লুটলো বিনির কাছারি॥

আর একটি ছড়া এইরূপ—

গোপাল নগরের মজুমদারেরা তারা কাঁন্দ্যা মলো।
ডেমরা হইতে বাজু সরকার বাড়ী লুট্যা নিলো॥
কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাহার খুড়ি।
গোলামের ব্যাটা বিদ্রুক আস্যা লুটলো সকল বাড়ী॥
বিদ্রুক আস্যা লুট্যা নিলো গাছে নাই পাতা।
জঙ্গলের মধ্যে পলায়্যা থাক্যা ফুচকি পাড়ে মাথা॥

নীচের গানটি পূজার সময় দল বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী গান করিত। "জারীর" সুরে গানটি শুনিতে বড়ই মধুর।

কি বিদ্রোহী পরিত্রাহি বাপরে ও বাপ মলেম মলেম।
কি তামাসা সকল চাষা, ভেবেছিলো রাজা হলেম॥
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি, লোটে যত ঘটি বাটি।
মাংনা খাবো রাজার মাটী ভয়ে ভীরু অবাক হলেম॥
দেশের যত বামুন ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্র।
বিদ্রোহীদের দেখা মাত্র নজর আর বাজার সেলাম॥

১। বাঁশ দ্বারা তৈয়ারী মাছ ধরিবার যন্ত্র।

ইতিহাস "পাথুরে" প্রমাণ না পাইলে কোনও কথা বিশ্বাস করে না। এই জন্য অনেক নিরক্ষর পল্লীকবির রচিত ছড়া ও গাথাগুলিকে কবিকল্পনা বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালী জাতির আত্মতৃপ্ত স্বভাবের পরিচয় মাত্র। কারণ তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে বিঘোষিত নৃপতিগণের ইতিহাসই যে একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস
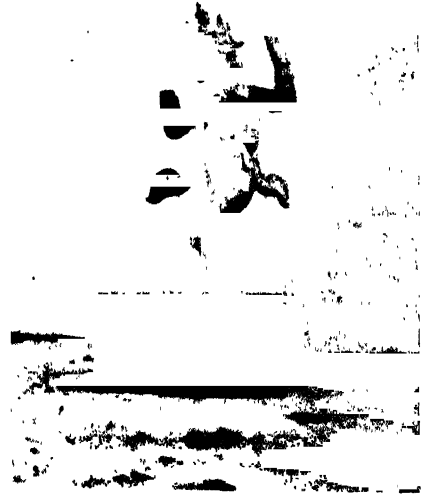
সরস্বতী।

তাহা নহে; একটা জাতির যাহা হৃদস্পন্দন, যাহাদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের উপর দেশে রাজার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। যুগধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলার নিরক্ষর পল্লীবাসী—বাঙ্গালার রামধন মোবারকের উপর কিরূপ ক্রিয়া করিত—যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রামধন মোবারকের অবস্থা কিরূপ হইত—তাহার ইতিহাসই বাঙ্গালার ইতিহাস। এই জন্য বাঙ্গালার পল্লীকবিতাগুলিকে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহা হইতে জাতির হৃদস্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত ইহা সরলস্বভাব পল্লীকবি কর্ত্তৃক রচিত হওয়ায় ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব একেবারেই নাই। এই জন্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নিকট জাতিকে চিনিবার সময় পল্লী-কবিতাগুলিও একেবারে মূল্যহীন নহে।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সর্প-বিষের রোগ-নিরাময় ক্ষমতা

মারাত্মক সাপের বিষের সাহায্যে রোগ আরোগ্য করিবার নূতন চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছুকাল হইতেই বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। সাদা অথবা ঈষৎ হলদে রং-এর গোখুরা সাপের বিষ, মোকাসিন (Moccasin) নামে একপ্রকার জলচর সাপের উজ্জ্বল হলদে রং-এর বিষ, টেক্সাস্ প্রদেশের র‍্যাটেল সাপের গলিত মাখনের মত বিষ, মানুষের বিবিধ

ভয়ানক প্রকৃতির বিষধর মাম্বা।

রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার, রক্তস্রাব যক্ষ্মা এবং সন্ন্যাস প্রভৃতিরোগের চিকিৎসায় সর্প-বিষের আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক সহরের ডাঃ সামুয়েল পেক (Dr. Samuel M. Peck) মোকাসিন সাপের বিষ, উগ্রতা কমাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত পাত্লা করিয়া শরীরে প্রবেশ করাইয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একভাগ বিষ ৩০০০ ভাগ লবণ-জলে মিশ্রিত করিয়া একবারে সেই মিশ্রিত পদার্থ চা-চামচের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র পিচ্কারীর শলাকা সাহায্যে চামড়ার নীচে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। রোগীর শরীরের যে স্থলে সূচ ফুটান হয় সে স্থলে কতকটা কাল এবং নীল রং-এর দাগ ছাড়া আর কোনই অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয় না। বিষের মধ্যস্থিত কোন অজ্ঞাত পদার্থ রক্তকণিকার জমাট বাঁধিবার শক্তি বাড়াইয়া দিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া দেয়।

১৯৩০ খৃঃ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ডাঃ পেক এই উপায়ে ১৫০ রোগীর চিকিৎসা করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। 'হেমোফেলিয়া' (Hemophelia) নামে এক প্রকার গুরুতর ব্যাধি দেখা যায়। ইহাতে শরীরের রক্তকণিকার কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ঘটে। তাহার ফলে খুব সামান্য একটু ক্ষত এমন কি একটু আঁচড় লাগিলেই রক্তপাত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মারাত্মক ব্যাধিও এই বিষ প্রয়োগের ফলে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। অন্যান্য সাপের বিষ অপেক্ষা মোকাসিনের বিষই এই ব্যাধিতে অধিকতর ফলদায়ক। সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই লবণমিশ্রিত বিষ প্রয়োগে রক্তসঞ্চালনের উপর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ডাঃ পেক অপেক্ষা ডাঃ মনেলেসার-(Dr. Monealesser)-এর পরীক্ষার ফল আরও কৌতূহলোদ্দীপক। ডাঃ মনেলেসার নিউ ইয়র্কের 'রিকনষ্ট্রাকসন হাসপাতালের' অন্যতম স্থাপয়িতা। পূর্ব্বে তিনি আমেরিকা রেড-ক্রশ-এর সার্জ্জেন জেনারেল (Surgeon General) ছিলেন। তিনি এই সর্প-বিষ চিকিৎসার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং গোখুরা সাপের বিষের উগ্রতা কমাইয়া ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি যখন সৈন্য-দলের ডাক্তার হিসাবে কাজ করিতেছিলেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার গোচরীভূত হয়। কোন এক কুষ্ঠরোগীকে টেরেণ্টুলা জাতীয় মাকড়সায় কামড়ায়। এই জাতীয় মাকড়সারা ভয়ানক বিষাক্ত। অনেক সময় ইহাদের দংশন মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ ইহাদের কামড়ে রোগীর এক-প্রকার অঙ্গ-বিক্ষোভ ঘটে। ইহাই 'টেরেণ্টুলা-নৃত্য' (Tarantula Dance) নামে পরিচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাকড়সার দংশনে কুষ্ঠরোগীর শরীরে বিষক্রিয়ার পরিবর্ত্তে সেই রোগ আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং রোগী ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়াই ডাঃ মনেলেসার বিভিন্ন সাপের বিষ অতি অল্প মাত্রায় মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সর্প-বিষে ক্যান্সার রোগ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

গলায় ক্যান্সার হইয়াছে এরূপ একটি রোগীর উপর তিনি সর্ব্বপ্রথম সর্প-বিষপ্রয়োগ করেন। রোগদুষ্ট স্থানকে বিষপ্রয়োগে অসাড় করিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথম শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন।

'ইন্‌জেকসন্' দিবার কিছুক্ষণ বাদেই যন্ত্রণার উপশম হইল, কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্যান্সারের ক্ষতটি ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। যে রোগী এতদিন তরল খাদ্য ছাড়া কিছুই গিলিতে পারিত না এবং খাড়া চেয়ার ছাড়া ঘুমাইতে পারিত না, এখন সে শক্ত খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে লাগিল এবং সহজভাবে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি দেশ বিদেশের অস্ত্র চিকিৎসকদের সহায়তায় তাঁহার এই চিকিৎসা-প্রণালী চালাইতে লাগিলেন। ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অব মেডিসিন (French Academy of Medicine) ২০০ শত এমন রোগীর খবর দিয়াছেন যেসব ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগের পর যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে এবং ক্যান্সার ক্ষতে অস্ত্রোপচার করিবার পর পিচকারীর সাহায্যে বিষ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার ফলে আর নূতন করিয়া ক্ষত উৎপন্ন হইতেছে না। প্রত্যেক তৃতীয় অথবা পঞ্চম সপ্তাহে ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া বিষপ্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কানাডার মনট্রিল হাসপাতাল হইতে হেনরী গ্রে (Henry Gray) প্রচার করিয়াছেন যে, ক্যান্সার রোগে অল্পমাত্রায় গোখুরা সাপের বিষ প্রয়োগে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল—ল্যান্সেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ 'স্নেক-পার্কের' ডিরেক্টর ফিৎ সাইমন্স (F. W. Fitz Simons) বহু দিন যাবৎ মনুষ্যদেহের উপর বিভিন্ন সর্প-বিষের মিশ্রণ প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসাই তাঁহার পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—কয়েক প্রকার বিষের সংমিশ্রণে প্রস্তুত 'ভেনিন' (venene) নামে পরিচিত জিনিষের মৃগী অথবা সন্ন্যাস রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যমান। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায়শঃই এই জিনিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ডাঃ মেনার্টো (Dr. F. Mehnarto) লণ্ডন সহরে কণ্ট্রাটক্সিন (Contratoxin) নামক এক প্রকার সর্প-বিষের মিশ্রণ মনুষ্যদেহের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল—এই মিশ্রিত বিষের কোন কোন জীবাণু গলাইয়া ফেলিবার শক্তি আছে। পরে পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বিষের যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগ আরোগ্য করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা রহিয়াছে।

সর্প-বিষ রক্ত অথবা স্নায়ুর মধ্য দিয়া বিষ-ক্রিয়া সঞ্চালন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলচর মোকাসিন, র‍্যাটেল্ অথবা কার ডি ল্যান্স প্রভৃতির বিষ রক্তকণিকা নষ্ট করিয়া দেয়, বলিতে গেলে, রক্তকে একেবারে জল করিয়া ফেলে। কোব্রা অথবা কোবেল সাপের বিষ স্নায়ুমণ্ডলী আক্রমণ করিয়া মাংসপেশীকে অসাড় করিয়া ফেলে। ফলে শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাটেল সাপ এক রকম সাদা রং-এর বিষ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। (উত্তর আমেরিকার র‍্যাটেল সাপের বিষ আবার ভিন্ন রকমের। তাহাদের বিষের রং হলদে'।) এই বিষ এমন মারাত্মক যে, একই সময়ে ইহা রক্তকণিকা ও স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। যে অ্যান্টিভেনম (Antivenom) প্রয়োগে দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাটেল সাপের বিষ নষ্ট হয়, তদ্দ্বারা উত্তর আমেরিকার র‍্যাটেলের বিষও নষ্ট হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাপের বিষও ইহার সাহায্যে বিনষ্ট হয়; কিন্তু যে 'সিরাম' প্রয়োগ করিয়া উত্তর আমেরিকার র‍্যাটেল বিষ নষ্ট করা যায় তদ্দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাটেল সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচানো যায়না।

দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাটেলের দংশনের প্রধান লক্ষণ এই যে, কামড় দিবার পরই রোগী হাত মোচড়াইতে থাকে। পরক্ষণেই চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে—তখন রোগী সটান শুইয়া পড়ে। এই সময়ে কখনও কখনও

গোখুরা।
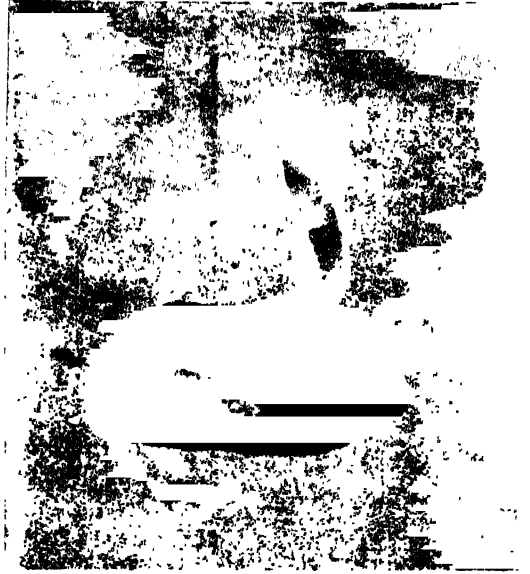
শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। ঘাড়ের মাংসপেশী অসাড় হইয়া পড়ে এবং ঘাড়টা যেন বোঁটার ফলের মত এদিক-ওদিক ঝুলিতে থাকে। এই ব্যাপার হইতেই সাধারণ লোকের ধারণা হইয়াছে যে, এই সাপের কামড়ে রোগীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

বিভিন্ন সাপের কামড়ে বিভিন্ন রকমের অসুস্থতা ও অঙ্গ-বিক্ষোভ দেখা যায়। ফার ডি ল্যান্সের ঈষৎ সবুজ রং-এর বিষে রোগীর চক্ষুর পাতা হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। গলিত সীসা ঢালিয়া দিলে পুড়িয়া গিয়া যেরূপ অবস্থা হয় শরীরের যেস্থানে টেক্সাস র‍্যাটেল দংশন করে সেস্থানের মাংসতন্তুও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিষের প্রতিক্রিয়ায় কেমন করিয়া এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থা ঘটে তাহা আজও জানা যায় নাই। এই সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ডিটমার্স্ সাহেব (Raymond L. Ditmars) সর্পবিষ বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত বিষাক্ত জিনিষের কোন সন্ধান পান নাই। ডাঃ মনেলেসার-এর সঙ্গে একযোগে এই

সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া ডিটমাস দেখিতে পান যে, সর্প-বিষ জল অপেক্ষা সামান্য ভারী। সর্প বিষের মধ্যে শ্লেষ্মিক ঝিল্লী হইতে নির্গত শ্লেষ্মা, অঙ্গার (carbon) গন্ধক, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, চর্বি বা মেদ জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ফস্ফেট প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। তথাপি এই সাধারণ নির্দ্দোষ পদার্থগুলি বিশেষ বিশেষ ভাগে একত্র মিশ্রিত হইয়া 'ষ্ট্রীক্‌নিন' প্রভৃতি হইতেও মারাত্মক বিষ ক্রিয়া প্রদর্শন করে।

বিষ তুলিয়া লইবার জন্য কিভাবে সাপকে ধরা হয়—নীচের ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। নীচে সাপের বিষদাঁত ও বিষের থলির সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।
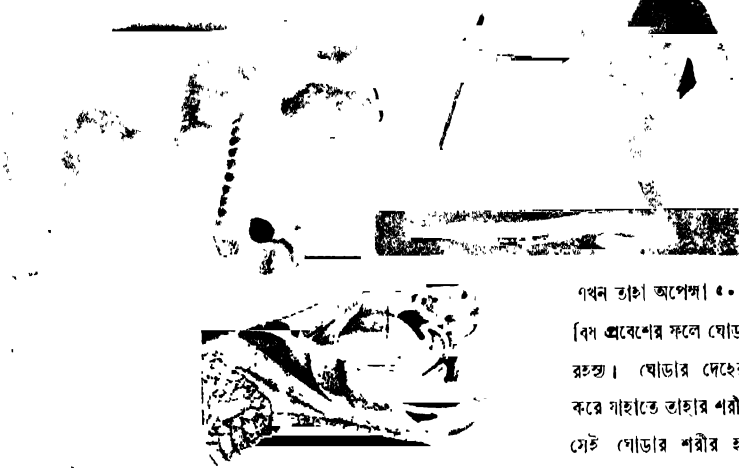
ডিটমাস চিকিৎসাবিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হাজার হাজার সাপ হইতে স্বহস্তে বিষ বাহির করিয়া থাকেন। অ্যান্টিভেনম তৈয়ারী করিবার জন্য তিনি উত্তর আমেরিকার র‍্যাটেল সাপের মুখ হইতে গ্যালন খানেক বিষ নিজের হাতে বাহির করিয়াছিলেন। একখানি লাঠির মাথায় আড়াআড়িভাবে কয়েক ইঞ্চি লম্বা আর এক টুক্‌রা কাঠ জুড়িয়া তাহার সাহায্যে তিনি সাপকে প্রথম চাপিয়া ধরেন, পরে তারের জাল ঢাকা এক প্রকার কাচের পাত্রের উপর হাত দিয়া মুখটাকে চাপিয়া ধরিয়া বিষদাঁত দুইটি জালের ফাঁকের মধ্যে ঢুকাইয়া মাথার উপর চাপ দিয়া—সমস্ত বিষ বাহির করিয়া লন।

ফ্রান্সের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে সর্ব্বপ্রথম ডাঃ ক্যালমিট (Dr. Albert Calmette) সর্ব্ববিষঘ্ন অ্যান্টিভেনম তৈয়ারী করেন। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে অ্যান্টিভেনম তৈয়ারী হইতেছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন বিষধর সাপের বিষক্রিয়া-প্রতিরোধক অ্যান্টিভেনম সিরাম (Antivenomous Serum) তৈয়ারী হইতেছে এবং মারাত্মক সর্প-বিষ নিবারণে ইহার অসাধারণ কার্য্যকারিতার ফলে 'সিরামের' ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কসৌলীর সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গত কয়েক বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯২৫ সালে ২৪০৭ শিশি (এক এক শিশিতে ৪০ সি, সি, ধরে), ২৬ সালে ২৬৬৭ শিশি, ২৭ সালে ২৭৬৮ শিশি, ২৮ সালে ৩৩১০ শিশি এবং ১৯২৯ সালে ৩৪০৪ শিশি 'সিরাম' তৈয়ারী হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ সর্পাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রেজিল দেশে আইন আছে, কেহ বিষধর সর্প ধরিলেই তাহা সাও পাউলো (Sao Paulo), সর্পাগারে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এই সাপ পাঠাইতে কোনই মাশুল লাগে না।

অ্যান্টিভেনম তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়া খুব বেশী জটিল বা আয়াসসাধ্য নহে। সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে প্রায় ৩০০০ ভাগ লবণ-জল মিশ্রিত করিয়া সুস্থ ঘোড়ার ঘাড়ের চামড়ার নীচে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, এরূপে ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া বিষ প্রবেশ করা হইতে থাকে। ছয় মাস পরে ঘোড়ার দেহ এমন ভাবে বিষ সহনোপযোগী হয় যে, সাধারণ অবস্থায় যতটুকু বিষে তাহার জীবনান্ত হইত এখন তাহা অপেক্ষা ৫০ গুণ বেশী বিষ দিলেও তাহার কিছুই হয় না। এই বিষ প্রবেশের ফলে ঘোড়ার শরীরের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা আর এক রহস্য। ঘোড়ার দেহের রক্তকণিকা হয়ত ক্রমশঃ এমন একটা জিনিষ সৃষ্টি করে যাহাতে তাহার শরীরের উপর বিষ-ক্রিয়া ঘটিতে পারে না। ছয় মাস পরে, সেই ঘোড়ার শরীর হইতে কোনরূপ যন্ত্রণা না দিয়া প্রায় ৮ কোয়ার্ট রক্ত বাহির করিয়া বীজাণুবর্জ্জিত পাত্রে রাখা হয়। এই রক্তই জমাট বাঁধিয়া কালচে রং-এর 'সিরাম' তৈয়ারী হয়। এই 'সিরাম' উত্তমরূপে বীজাণুশূন্য করিয়া ঘনীভূত করা হয় এবং কাচের টিউবে করিয়া বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহা প্রায় ৫ বছর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। হাইপোডার্মিক নীডল (Hypodermic Needle)-এর সাহায্যে অ্যান্টিভেনম রোগীর পেটের চামড়ার নীচে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। শুষ্ক অবস্থায় সর্প-বিষ প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিতে দেখা গিয়াছে। আলোতে রাখিলে শুষ্কবিষের উগ্রতা দ্রুত গতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

সাপের বিষ লইয়া বিবিধ প্রকারের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আফ্রিকা, জুলুল্যাণ্ড ও অন্যান্য সর্পসঙ্কুল প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর অগণিত 'পাফ অ্যাডার' মাম্বা, গোখুরা, ডেজিপেলটিস্ প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প পরীক্ষাগারে প্রেরিত হইতেছে।

পেরিস্কোপ-ক্যামেরা

সমুদ্রতলে চলচ্চিত্রের ছবি অথবা ফটোগ্রাফ তুলিতে অনেক প্রকার তোড়জোড় প্রয়োজন হয়। জল-প্রবেশ-শূন্য কুঠুরীতে অবস্থান করিয়া ফটোগ্রাফারকে জলতলে নিমজ্জিত হইয়া ছবি তুলিতে হয়। ইহাতে যেমন বিপুল অর্থব্যয় তেমনই ঝঞ্ঝাট। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে সম্প্রতি এক

প্রকার পেরিস্কোপ-ক্যামেরা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে জাহাজের ডেকের উপর অবস্থান করিয়াই জলতলের ফটোগ্রাফ বা চলচ্চিত্রের ছবি তোলা যাইবে। একটি লম্বা পেরিস্কোপের নলের শেষ প্রান্তে একটি জল-প্রবেশশূন্য কুঠুরী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের একটি ক্যামেরা বসান থাকে। পেরিস্কোপের নলের সাহায্যে ক্যামেরাটিকে গভীর জলের নীচে নামাইয়া দিয়া যে কোন ভাবে রাখিয়া ছবি তুলিতে পারা যায়। কতকগুলি ছোট ছোট নলের সমবায়ে পেরিস্কোপটি নির্ম্মিত, কাজেই ইচ্ছামত একটিকে আর একটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া নলটিকে ছোট বড় করা যাইতে পারে। নলের মধ্য দিয়া এমন ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে, যাহার ফলে ডেকের উপর হইতেই চাবি ঘুরানো, বা আলোক-ছাপ (exposure) দেওয়া প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। পেরিস্কোপে দেখিয়া উপর হইতেই ফোকাস করা যায়। আবদ্ধ থাকায় ক্যামেরার লেন্সের উপর জলীয় বাষ্প না জমিতে পারে তজ্জন্য ঐ নলের মধ্য দিয়াই বায়ু-চলাচলের পথ রাখা হইয়াছে।

পেরিস্কোপ ক্যামেরা ও তাহার ছবি।

নূতন ধরণের ইলেকট্রিক লাইট

ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক কোম্পানী সম্প্রতি এক নূতন ধরণের ইলেকট্রিক লাইট তৈয়ারী করিয়াছেন। সাধারণতঃ ইলেট্রিক বাতির মত

নূতন ধরণের ফিলামেন্টশূন্য ইলেকট্রিক লাইট।

ইহার ফিলামেন্ট নাই। একটি কাচের টিউবের ভিতর আরেকটি টিউব বসানো আছে। ভিতরের টিউবটির দুই দিকে স্থাপিত দুইটি তড়িৎ প্রান্তের মধ্যে দেশলাইয়ের কাঠির মাথার বারুদের মত সামান্য পরিমাণ পারদ থাকে। সুইচ্ টিপিলে তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইবামাত্রই পারদ বাষ্পে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্প দিনের আলোর মত উজ্জ্বল নীলাভ সাদা আলো বিকীরণ করিতে থাকে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষ

মেক্সিকোর ওযাক্সাকা রাজ্যের সান্টা মেরিয়া ডেল টিউল নামক গ্রামের

পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষ।

গীর্জ্জাপ্রাঙ্গণে সাইপ্রেস জাতীয় একটি বিশাল বৃক্ষ আছে। অনুসন্ধানের ফলে ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এইটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিত বৃক্ষ। বৃক্ষটির পরিধি ১৭৫ ফুট। বৃক্ষটির বয়স কমপক্ষে ৫০০০ বৎসর

জলের নীচে ইলেকট্রিক লাইট।

এবং ঊর্দ্ধে ১০,০০০ বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। বৃক্ষটি এখনও বছরে প্রায় এক ইঞ্চির ১/৮ অংশ করিয়া বাড়িতেছে। উচ্চতায় গাছটি ২০০ ফুটের বেশী নহে। আশে-পাশের অন্যান্য গাছপালা হইতে অনেক ছোট কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট ডালপালায় আচ্ছন্ন। ইহার বিপুল আয়তন সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

জলের নীচে ইলেকট্রিক লাইট

গভীর জলে কোন জিনিষ পড়িয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র জিনিষ হইলে তো খুঁজিবারে আশাও পরিত্যাগ করিতে হয়। উপর হইতে জলের তলা দেখিতে পাওয়া গেলে হারানো জিনিস উদ্ধার করিতে তত বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু জলের তলা দেখা যায় কি উপায়ে? তারে জ্বালাইয়া 'ইলেকট্রিক' লাইট জলে ডুবাইয়া দিতে পারিলে জলের তলা পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইত বটে, কিন্তু জল তড়িৎ-পরিচালক বলিয়া বাতি জলে ডুবাইবা মাত্রই সর্ট-সার্কিট' হইয়া 'ফিউজ' পুড়িয়া যাইবে। সাধারণ ইলেকট্রিক লাইট ছাড়াও সর্ব্বসাধারণে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ব্যবহার করিতে পারে—সহজেই এরূপ ব্যবস্থা করা যায়। একটা ছোট্ট টর্চ্চ-লাইট—যাহা আজকাল অনেকেরই নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে—জ্বালাইয়া রাখিয়া একটা মোটা শিশিতে উল্টা করিয়া বসাইয়া শিশিটাকে কর্ক দিয়া উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে—যেন জল না ঢুকিতে পারে। তার পর দড়ি বাঁধিয়া শিশিটাকে জলের নীচে নামাইয়া দিলে জলের তলায় কোথায় কি জিনিষ আছে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইবে। হারানো জিনিস দেখিতে পাইলে বিশেষভাবে তৈয়ারী আঁকশীর সাহায্যে অনায়াসে তুলিয়া আনা যাইতে পারে।

সামুদ্রিক সর্প

বহুকাল হইতেই বিরাটকায় সর্পাকৃতি সামুদ্রিক জানোয়ার সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অদ্ভুত ভীতিপূর্ণ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। মাঝে মাঝে বিরাট আকৃতির কোন কোন অদ্ভুত সামুদ্রিক জন্তুর দেহের কিয়দংশ সমুদ্রগামী নাবিকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার ফলে সামুদ্রিক দানব সম্বন্ধে বিস্ময়কর ধারণা আরও দৃঢ়তর হইয়া গিয়াছে। তবে অনেকদিন পর্য্যন্ত
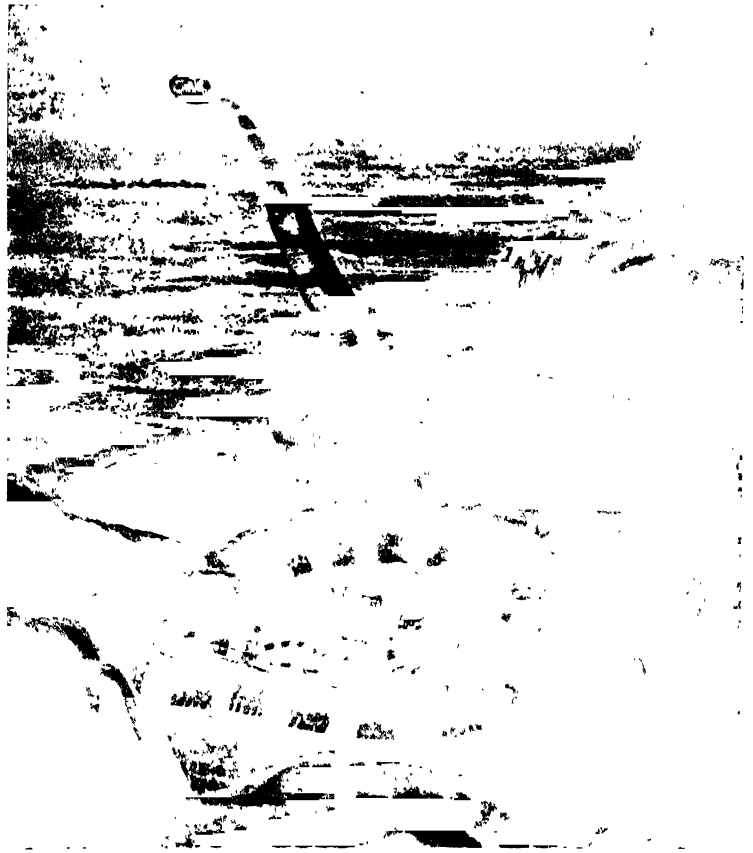
বাচ্চা সহ Platurus fasclatus নামক সামুদ্রিক সর্প।

এই সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা বর্ত্তমান যুগে এরূপ কোন অজানা সামুদ্রিক
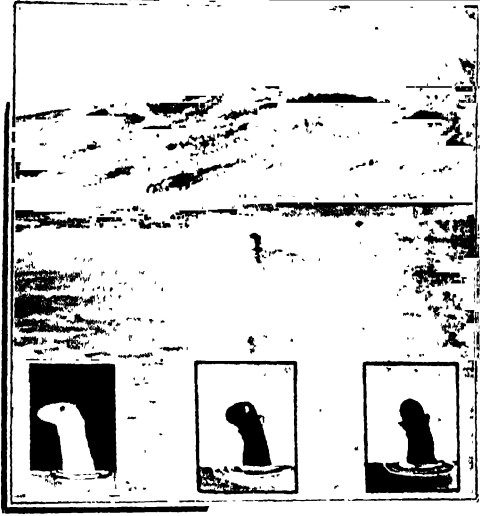
লথনেস্ দানবের বিভিন্ন দৃশ্য।

দানবের অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করেন না। সম্প্রতি লথনেসের অতিকায় দানব-এই সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক দানব।

একজন দুইজন নয়, অন্ততঃ পক্ষে দুইশত লোক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লথনেস হ্রদের মধ্যে কোন একটা অদ্ভুত জানোয়ার প্রত্যক্ষ করিয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। যে যে রকম দেখিয়াছে অনেকেই তাহার নক্সা আঁকিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শক কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই ছবিগুলি মিলাইয়া দেখিলে বেশ একটা সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বৈজ্ঞানিকেরা লথনেস দানবকে একটা শিকারী তিমি জাতীয় জানোয়ার বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক মহলে এই অতিকায় সামুদ্রিক সর্পাকার দানব সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সামুদ্রিক সর্প বা সামুদ্রিক দৈত্য সম্বন্ধে যত প্রকার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়—সাপ যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া ফণা তুলিয়া থাকে এই অজ্ঞাত জলজন্তু গুলিকেও ঠিক সেই ভাবেই জলের উপর গলা বাড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। সময়ে সময়ে পৃষ্ঠদেশে বিরাট কুঁজের মত কোন একটা জিনিষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অনেক সময়

ভালহালা জাহাজ হইতে ১৯০৫ খৃঃ এই বিরাট সামুদ্রিক সাপটি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে—এক লাইনে কতকগুলি শুশুক সাঁতার কাটিয়া যাওয়ার সময় অনেকে তাহাকে সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভুল করিয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাটকায় সর্পাকৃতি সামুদ্রিক মাছকেও কেহ কেহ সমুদ্র-দানব মনে করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে এমন বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার কথা শোনা যায় যে, বৈজ্ঞানিকেরাও তাহার যৌক্তিকতার উপর সন্দিহান নহেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভিমতও পোষণ করেন যে—এরূপ কোন অদ্ভুত জানোয়ারের অস্তিত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে। সামুদ্রিক সর্প বা ঐ জাতীয় বিপুলকায় কোন জানোয়ারের সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে যেসব অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে Plesiosaurus Victor শ্রেণীর মধ্যে সেই শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিরাটকায় সাধারণ সামুদ্রিক সর্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। Platurus Fasciatus শ্রেণীর এরূপ একটি বিরাটকায় সামুদ্রিক সর্পকে তাহার ২০টি বাচ্চা সহ একবার সমুদ্রোপকূলে

নিমজ্জিত প্রস্তরখণ্ড সমূহের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এস্থলে সর্পটির প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল। ১৯০৫ সালে ব্রেজিল হইতে

কল্পিত সামুদ্রিক দানব।

কিছুদূরে 'ভ্যালহ্যালা' নামক ছোট্ট জাহাজ হইতে এরূপ একটি সর্পাকৃতি জানোয়ার দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

মরিটেনিয়া জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাহাদের 'লগ বুকে' লিখিয়াছেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করিবার সময় তাঁহারা একটি বিরাটকায় সামুদ্রিক দানব দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের ভ্যাঙ্কুবারের কাছে বহু লোক একরূপ একটি অতিকায় জানোয়ার দেখিতে পাইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এণ্ড্রু ও জর্জ্জসন নামে দুই যুবক বন্ধু স্পেওয়ার দ্বীপে হংস-শিকারে গিয়াছিলেন। গুলি খাইয়া একটা পাখী সমুদ্রের জলে পড়িবামাত্র তাঁহারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ঘোড়ার মুখের মত একটা অদ্ভুত মুখ জল হইতে গলা বাড়াইয়া পাখীটাকে কামড়াইয়া ধরিল এবং যেন একটা বিরাট সর্পাকৃতি দেহের সাহায্যে জল কাটিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গভীর জলে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহারা যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করেন—জন্তুটার দেহটা প্রায় দুইফুট মোটা হইবে আর প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত গায়ের রংটা ছিল মলিন পিঙ্গলবর্ণের। এক সপ্তাহ পরে একটা জাহাজ হইতে আরও তিনজন লোক এই অদ্ভুত সর্পাকৃতি জানোয়ারটাকে দেখিতে পায়। তখন সেটাকে কতকগুলি সামুদ্রিক পাখী তাড়া করিয়া আসিতেছিল। পরে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য আরোহীবর্গও ইহাকে দেখিয়াছিল। ক্যানাডা গবর্ণমেণ্টের কয়েকজন কর্ম্মচারীও এই বিরাটকায় সর্পাকৃতি জানোয়ারটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বলেন—জানোয়ারটার গায়ের রং নীলাভ সবুজ।

উত্তর মহাসাগরেও এরূপ অতিকায় সর্পাকৃতি দানব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মরিটেনিয়া জাহাজের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ক্যারিবিয়া সাগরে এরূপ একটি সামুদ্রিক দানব দেখিতে পান। জাহাজের তৃতীয় কর্ম্মচারীও ঐই জন্তুটাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন—সমুদ্রের নীল জলের উপর কৃষ্ণবর্ণের একটা বিরাট সর্পাকৃতি দেহ ভাসিয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহটা প্রায় ছয় ফুট মোটা এবং প্রায় ৬০ ফুট লম্বা, কিন্তু মাথাটা দুই ফুটের বেশী চওড়া নয়।

১৯৩৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অন্ধকার রাত্রিতে একখানি জাহাজ মেক্সিকো উপসাগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জলের মধ্যে যেন একটা ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল, জাহাজখানা দুলিয়া উঠিল। জাহাজের আড়কাঠী চেঁচাইয়া উঠিল—ক্যাপ্টেন! জাহাজের সামনে কি যেন একটা আটকাইয়া গিয়াছে। ক্যাপ্টেন বেকার ও অন্যান্য লোকজন সন্ধানী-আলোর সাহায্যে দেখিতে পাইলেন—গায়ে চক্রাকার দাগ বিশিষ্ট পিঙ্গল বর্ণের একটা ভীষণদর্শন সর্পাকার জানোয়ার সত্য সত্যই জাহাজের সম্মুখ ভাগে আটকাইয়া গিয়াছে। জন্তুটা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা এবং ৫।৬ ফুট মোটা ছিল। জাহাজখানাকে তখন পিছনের দিকে চালান হইলে জানোয়ারটা জলে পড়িয়া আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেল। এটা যে কি জানোয়ার তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অনেক সময় দৃষ্টিভ্রমও ঘটে, তাহার ফলে লোকে এক জিনিষকে আর এক জিনিষ বলিয়া ভুল করে। এই সম্বন্ধে নিউইয়র্ক একোয়ারিয়ামের ডাঃ টাউন্সেণ্ড বলেন—আমি একবার এ্যালবেট্রস জাহাজে মেক্সিকোর সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছিলাম। একদিন জাহাজের লোকেরা বলে যে, একটা বিরাটাকৃতি সামুদ্রিক সর্প দেখা যাইতেছে। দেখিলাম জলের
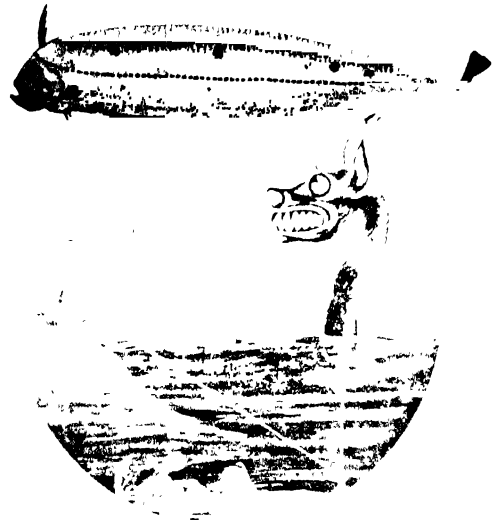
উপরে রিবন মাছ। নীচে লেক জর্জ্জের সামুদ্রিক দানব। কি ভাবে এই দৃশ্য দেখাইয়া লোকের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল তাহা দেখান হইয়াছে।

উপর একটা অতিকায় জানোয়ার জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। জাহাজের কর্ম্মচারীরা বলিলেন—এটা নিশ্চয়ই এক প্রকার সামুদ্রিক সর্প। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা সর্প ছিল না। একটা বিরাটকায় তিমি তাহার

ডানা নাড়িয়া জল তোলপাড় করিতেছিল। কিন্তু এরূপ ভুল যে সর্ব্বদা ঘটে না তাহারও প্রমাণ দেখা গিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ ও ব্রিটিশ নৌবিভাগের বহু পদস্থ কর্ম্মচারীর ও অন্যান্য লোকের সামুদ্রিক দানব সম্বন্ধে

দাঁড়-মাছ: ইহাকে অনেকে সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল।

চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিশ্বাসযোগ্য বহু ঘটনার বিবরণ জানা গিয়াছে। এই সকল বিবরণ শুনিয়া সামুদ্রিক সর্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা জন্মে। "U-28" নামক সাবমেরিণের প্রধান কর্ম্মচারী ব্যারণ ভন ফর্ষ্টনার তাঁহার 'লগ-বুকে' লিখিয়াছেন—১৯১৫ সালের ৩০শে জুলাই উত্তর সমুদ্রে আমি একখানি ব্রিটিশ জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ডুবাইয়া দেই। জাহাজখানি জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছিল—জাহাজের তলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়া ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়। জল একটা বিরাট ফোয়ারার মত উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যেই দেখিলাম—কুমীরের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা বিরাট জানোয়ার জল হইতে প্রায় ৫০ ফুট উর্দ্ধে ছিট্‌কাইয়া উঠিল। ইহার পাখনার মত জোড়া পা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। জন্তুটা যেন যন্ত্রণায় মোড়ামুড়ি দিয়া মোচড় খাইতেছিল। জন্তুটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভীষণ শব্দে জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সাবমেরিণের ডেকের উপর হইতে আরও ছয় ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিল।

অনেক দিন আগে নিউইয়র্কের লেক জর্জ্জের মধ্যে এক অদ্ভুত ভীতি-উৎপাদক দৃশ্য লোকের নয়নগোচর হয়। তখন গ্রাম্য-কাল। একদিন দেখা গেল একটা বিরাট আকৃতির অদ্ভুত জানোয়ার জল হইতে মাথা তুলিয়া জল কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। জানোয়ারটা মুখটাকে হাঁ করিয়াছিল- লম্বা কান, বড় বড় দাঁত ও জ্বলজ্বলে চোখ দুইটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সকলেই জানোয়ারটাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছিল। অনেক দিন পরে জানিতে পারা গেল যে, উহা একটা কৌতুকমাত্র। বড় একটা কাঠের গুঁড়ি খোদাই করিয়া তাহার উপর রং করিয়া এরূপ ভীতি-উৎপাদক চেহারা তৈয়ারী করা হইয়াছিল এবং সেটাকে জলের নীচে অদৃশ্যভাবে দড়ি দিয়া টানিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু এসব ঘটনা সত্ত্বেও সামুদ্রিক সর্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা যায় না, এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ সামুদ্রিক সর্প পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সামুদ্রিক সর্পগুলি সাধারণতঃ উগ্র বিষধর। কালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকোর নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোফিনি শ্রেণীর উগ্র বিষধর সর্পকে প্রায়ই সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ ৭৷৮ ফুট লম্বা হইয়া থাকে এবং দলে দলে বিচরণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রেও ওরিনকো নদীর মধ্যে এক প্রকার ভয়ানক বিষধর সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ২০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই সকল সামুদ্রিক সর্প সম্বন্ধে অনেক লোমহর্ষণ কাহিনী শোনা যায়। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় গভীর সমুদ্রবাসী একপ্রকার দাঁড় মাছকে দেখিয়া অনেকেই সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভুল করিয়া থাকে। এই দাঁড় মাছগুলি এক প্রকার সামুদ্রিক ফিতা মাছের সমশ্রেণীভুক্ত। অনেকে ইহাদিগকেও সামুদ্রিক দানব বলিয়া ভুল করিয়াছে এরূপ ঘটনার কথা শোনা যায়। 'কঙ্গার ইল' নামক এক শ্রেণীর সামুদ্রিক বাইন মাছ অসম্ভব রকমের লম্বা হয়। ইহাদিগকে সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নহে। লথ্‌নেস হ্রদের কাছে একবার এরূপ একটি বিরাট 'বাইন-মাছ' পাওয়া গিয়াছিল।

লথ্‌নেসের কাছে প্রাপ্ত "কঙ্গার ইল" নামক বিরাট বাইন মাছ।

মান

—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তনীয়া 'মান' গাহিতেছিল :

রাধার মান-সাগর-ভবার্ণবে
নীলকমল আজ ভেসে যায়॥

আসরের সামনে উপবিষ্ট বৃদ্ধদের ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। চিকের মধ্যস্থিত বর্ষিয়সী মহিলারা সাংসারিক কথাবার্ত্তার নিম্নগুঞ্জনের ফাঁকে ফাঁকে বারবার চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। কেবল রেণু স্থির হইয়া শুনিতেছিল। কীর্ত্তনের এই জায়গাটা তাহার সত্যই বড় ভাল লাগিয়াছিল।

ইহার কারণ ছিল।

রেণুর এই মাত্র একুশ বৎসর বয়স। ষোল বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর নাম উমানাথ। উমানাথ ছেলে মন্দ নয়। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, স্বল্পরকমের জোতজমি চাষ-আবাদ আছে। তাহার উপরে সে ইংরেজীশিক্ষিত এবং কলিকাতার কোন মার্চ্চেন্ট-আপিসে ষাট টাকা মাহিনার চাকুরী করে।

রেণুদের অবস্থার তুলনায় রেণু যে বেশ ভাল ঘরে পড়িয়াছে এ বিষয়ে সকলেই একমত। রেণুও সে কথা মানিয়া লইয়াছে। তাই বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও অন্তরে তাহার একটা সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদ আছে। অনেক সময়ে নির্জ্জন মুহূর্ত্তে কথা বলিবার মত স্পষ্ট করিয়া সে নিজের মনে মনে বলে—তাহার মত ভাগ্য কয়টা মেয়ের! তাহার বাপের বাড়ীর পরিচিত অন্যান্য মেয়েদের সে একটু কৃপার চক্ষে দেখে, একটু করুণা করে, নিজের সৌভাগ্যে সে একটু স্ফীত। রেণু তাই সকল ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ, ব্যবহারে উচ্ছ্বসিত, অমায়িক এবং উদার।

কিছুদিন আগে উমানাথ বাড়ী আসিয়াছিল। মাত্র দুইদিনের ছুটি। উমানাথ ভাবিয়াছিল এই দুইটা দিন রেণুর সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে কাটাইবে। কিন্তু উমানাথের সে আশা ফলবতী হইল না। ছুটির দ্বিতীয় দিনে কি একটা সামান্য কথায় স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হইয়া গেল। ঝগড়া একটু হইলেও উমানাথ শেষ পর্য্যন্ত রেণুকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল। শেষে তাহার একখানা হাত ধরিয়া নিজের দিকে একটু টানিতেই রেণু ঝট্‌কা মারিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—তুমি আমায় ছুঁয়ো না।

উমানাথ হাসিয়া বলিল—কেন, আমি কি মুচি না চামার যে ছুঁলে তোমার জাত যাবে।

রেণু যদি বুদ্ধিমান মেয়ে হইত এইখানেই ঝগড়া মিটিয়া যাইত। একজনকে গরম হইতে দেখিলে যদি আর একজন পরিহাস করে তবে অনেক কিছু অপ্রিয় ঘটনা পৃথিবীতে ঘটিবার আগেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইল না, ক্রুদ্ধ রেণু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মুচি-মেথরেই করে, ভদ্রলোক করে না।

ইহাতে উমানাথও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং একটা কড়া রকমের জবাব দিল—বেশ, মুচি-মেথরের সঙ্গে যখন সম্বন্ধই নেই তখন বেশ সভ্য ভদ্র কাউকে খুঁজে নাও। বলিয়াই উমানাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রেণুও বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সে রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে আর কোন কথা হইল না। অশ্রু-অভিমানের যোজনবিস্তৃত দূরত্বকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া দুজনে একই বিছানার অংশ গ্রহণ করিল। সীমারেখাহীন অন্তর্বেদনার নিগূঢ় আন্দোলনে পরস্পর অভিমুখী দুইটি ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত প্রাণী সমস্ত রাত্রি আধ-লজ্জায়, আধ সঙ্কোচে, প্রবলতম আক্ষেপে ও গভীরতম উপেক্ষায় পাশাপাশি শুইয়া রহিল—অল্প একটু হাসি, তুচ্ছ একটি কথা, সামান্য একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। কিন্তু সে হাসি, সে কথা, সে ইঙ্গিত অতি বড় প্রয়োজনে অতি বড় নির্দ্দয়ের মতই তাহাদের পরিহার করিয়া থাকিল।

নিঃশব্দে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। উমানাথের বহু-আকাঙ্ক্ষিত ছুটির শেষের রাতটি অভিমান, অনাদর আর অবহেলার মধ্যে অতিবাহিত হইল।

উমানাথ সকালের ট্রেনে কলিকাতা চলিয়া গেল।

...কীর্ত্তনীয়ার গানে রেণুর মনে পড়িল তাহাদের দাম্পত্য-জীবনে কিছুদিন আগে এই যে ঝড় উঠিয়াছিল সেই কথা। তাহার মিলনোৎসুক জীবনে অকস্মাৎ যে অসম্পূর্ণতার দীর্ঘ রেখাপাত ঘটিয়াছিল তাহার বিষণ্ণ কাহিনী।

কীর্ত্তনীয়া তখন সুর করিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া সমের পর ধুয়া ধরিয়াছে—

শুনলো রাজার ঝি, কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধনে বধিলি পরাণে,
এ কাজ করিলি কি?

কৃষ্ণ অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া রাধার মান ভাঙ্গাইতে না পারিয়া চলিয়া যাইতেছেন আর পিছু ফিরিয়া চাহিতেছেন, কৃষ্ণের চোখ ছল ছল করিতেছে, মুখখানি শুকাইয়া গেছে, কিন্তু উপায় কিছু নাই—যাইতেই হইবে।

কীর্ত্তনীয়া বলিতে লাগিল, 'ওদিকে ভোর হয়ে আসচে, নিষ্ফল মনোবেদনা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে কুঞ্জ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। যাবার সময় শেষবার পিছন ফিরে রাধাকে দেখে নিলেন। অসীম বিরহের অশ্রান্ত হাহাকারের মধ্যে রাধার দুর্জ্জয় মানের ঘন কল্লোল শুধু অহঙ্কারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই সৃষ্টি করলে, সুযোগ অবহেলায় বিসর্জ্জিত হল, বড় আনন্দের পরিপূর্ণ মিলন-পাত্র অনাস্বাদিত পড়ে রইল।'

কীর্ত্তনীয়া এবারে সখীদের কথা সুরু করিয়াছে। তাহারা আসিয়া রাধাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে :

মান করে মান হারালি রাই
এ মান নিয়ে করবি কি?

অকস্মাৎ রেণুর চোখ দুইটা ছলছল করিয়া উঠিল। শুনিতে শুনিতে কখন যে রেণুর উমানাথকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত আদর করিয়া, সহানুভূতি দিয়া মৃদুতম হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে রেণু উমানাথকে ভাবিল। তারপর কোন্ এক সময়ে হঠাৎ রেণুর মনে পড়িল, আত্মবিস্মৃত হইয়া সে, কতক্ষণ জানে না, শুধু উমানাথকেই চিন্তা করিয়াছে, কীর্ত্তনের এক বিন্দুও তাহার কানে ঢুকে নাই।

কীর্ত্তনীয়ার সুরে যে যুগ-যুগান্তরের বিরহের অপরিসীম বেদনার প্রস্তরীভূত অশ্রু নিখিলের হতাশা আর ক্রন্দনের মধ্যে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে যেন তাহারি জীবনের, তাহারি একান্ত আপনার জীবনের গোপন অশ্রুটুকু; সে যেন তাহারি কথা। সেই বিরহ, সেই বিশাল গম্ভীর বিরহ, সেই সাগরের মত স্তম্ভিত আত্মসমাহিত বিরহ—সে যেন তাহারি হৃদয়ের কোন গোপন গুহার অধিবাসী, আজ এই মাত্র তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনায় অসহ্য সহানুভূতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গেলে রেণু আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। চলিতে চলিতে অনুভব করিল, তাহার শরীরে যেন ভার নাই, সে যেন এক সূক্ষ্ম রেণু, যে শুধু ভালই বাসিয়াছে,—আঘাতই সহিয়াছে, মিলনের বাঞ্ছিত সুযোগ অভিমানে আর অনাদরে হারাইয়া আসিয়াছে। সে আর এ জগতের নয়। তাহার পিপাসু সত্তা বর্ত্তমান বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া এক অভিনব লোকাতীত জগতের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে ছেদহীন বিরহ আর শ্রান্তিহীন মিলনের মহাযাত্রাপথে সে রাধা—চির-অভিসারিকা।

মান করে মান হারালি রাই
এ মান নিয়ে করবি কি?

বাড়ী আসিয়া রেণু দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কঠিন স্থূল সীমাবদ্ধ শয্যায় তাহার আশ্রয় নয়—সে ভাসিয়া চলিল। নবজাগ্রত চেতনার সাতরঙা বায়বীয় অন্তরালের আড়ালে আড়ালে রেণু আত্মগোপন করিয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে কখন যেন তারার মত একে একে অন্য কথা, অন্য ভাব তলাইয়া গিয়া সেই সাতরঙা রাজত্বে রহিল সে আর উমানাথ,—বিষণ্ণ, ম্লান উমানাথ। অন্ধকারে ভাল করিয়া উমানাথের মুখ সে রাত্রিতে রেণু দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, সে রাত্রে সে উমানাথের মুখ দেখিতে পাইয়াছিল। নিজের সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল শুধু মুখই দেখে নাই, সে-মুখের অন্তরালে কি কথা ব্যক্ত হইয়াছে—কি গম্ভীর, অভিমানক্ষুব্ধ অশ্রু বিসর্জ্জিত হইয়াছে, উৎপীড়িত চিত্তের সব আক্ষেপটুকু কত না নিঃশব্দে নীরবে অন্তরে পরিপাক লাভ করিয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছে। সে উমানাথ এক নূতন উমানাথ, বর্ণে গন্ধে শোভায় সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় উমানাথ, অভিমানে বিরহে বেদনায় অশ্রুসজল তাহার স্বামী উমানাথ—তাহার প্রতি সে অন্যায় করিয়াছে, অবিচার করিয়াছে।

মান করে মান হারালি রাই
এ মানের তোর গরব কি?

কি আশ্চর্য্য! দ্বিতীয় চরণটা রেণু এইমাত্র রচনা করিল। আশ্চর্য্য!

ভালবাসার শুভ্র সুনির্ম্মল গঙ্গাজলে শুদ্ধ শান্ত রেণু এই মাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছে। রেণুর সর্ব্বাঙ্গ এখন

বিকশিত উচ্ছল ; লজ্জায় সম্ভ্রমে প্রেমে আধ-শিহরিত বিরহ-বেদনায়, নিঃশব্দ ক্রন্দনে রেণুর অশ্রুম্লান নয়ন-পল্লব দুইটি ভারাক্রান্ত।

রেণুর বুকের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত ব্যথা শারীরিক কষ্টের মত টনটন করিয়া উঠিল। মনে হইল, গলার মধ্যে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে। রেণু কি আজই প্রথম উমানাথকে ভালবাসিল? বিরহের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে হৃদয়ের গাঢ়তা আর চোখের জলে এই বোধ হয় প্রথম নিবিড় করিয়া উমানাথকে সে অনুভব করিল। আর যতই তাহাকে সে অনুভব করিল ততই তাহার সামীপ্যকামনা একান্ত অনিবার্য্য হইয়া রেণুর সমস্ত সত্তাকে এক পরিপূর্ণ নিবেদনের মত উমানাথের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিল।

রেণুর মনে হইল, তাহার প্রেমই বা কম কিসে? যত বড় বড় প্রেমের কাহিনী শোনা যায়, নিষ্ঠায় ত্যাগে সাধনায় তাহাদের হইতে রেণুর প্রেমই বা ছোট কিসে?

হঠাৎ রেণু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কাগজ কলম লইয়া উমানাথকে চিঠি লিখিতে বসিল:

…তোমার আসার বিশেষ দরকার আছে, যেমন করিয়া হউক তোমাকে একবার আসিতেই হইবে। আমার অপরাধ হইয়াছিল, তাই বলিয়া শাস্তি না দিয়া তুমি যে এত বড় শাস্তি আমাকে দিবে ইহা আমি সহিব কেমন করিয়া?…

চিঠিখানি সে ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে পুরিয়া বন্ধ করিল। মনে মনে ঠিক করিল, চিঠিখানা আজই ফেলিতে হইবে, আগামী কাল পর্য্যন্ত তাহার সবুর সহিবে না। গ্রামের পোষ্ট-বক্স তাহাদেরি বাহিরের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া। রেণু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাত কত? একটু বেশী রাত হইলে পাড়াগাঁয়ে বলা কঠিন। রেণু তাড়াতাড়ি চিঠি ফেলিয়া ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। তারপর কেমন একটা সূক্ষ্ম পুলক-কম্পনের মধ্যে রেণু কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন অনেক বেলায় রেণুর ঘুম ভাঙ্গিল। মাথার মধ্যে তখনও যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। শরীরটা কেমন একটা শান্ত অবসন্নতায় ঈষৎ শ্লথ, একটু দুর্ব্বল, একটু ক্লান্ত। সারা রাত যেন একটা প্রবল ঝড় রেণুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে— হাঁ, ঝড়ই বটে। সে ঝড়ের বিরুদ্ধে রেণু লড়াই করে নাই, সকল শক্তি দিয়া সেই ঝড়ের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছিল। প্রবল উত্তেজনা প্রবল জ্বরের মত প্রবল উত্তাপে রেণুকে বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রেণুর মনে হইল, কাল রাত্রে সে একটুও ঘুমায় নাই, সারারাত ধরিয়া হিজিবিজি স্বপ্ন দেখিয়াছে।

স্বপ্নই বটে! সুন্দর স্বপ্ন, মধুর স্বপ্ন, আবেগে পুলকে শিহরণে গভীর পরিতৃপ্তিতে সমাপ্ত সুখ-স্বপ্ন, বিরহে বেদনায় অভিমানে অশ্রু-সমাকীর্ণ, পরিম্লান স্বপ্ন।

রেণু মাথা তুলিতে সম্মুখেই দেখিল টেবিলে মুখ-খোলা দোয়াতটার পাশে চিঠি লেখার খাতা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন নয়, সত্য। রেণুই চিঠি লিখিয়াছে এবং সে চিঠি সে নিজেই পোষ্টবক্সে ফেলিয়া দিয়াছে। জলজ্বল-করা চিঠির লেখাগুলা রেণুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মাগো, কি ঘেন্না। সেই চিঠি সে কেমন করিয়া লিখিল, আবার শুধু লেখাই নয় নিজে হাতে সেই নিশুতি রাত্রে ডাকবাক্সে ফেলিয়া আসিয়াছে, সকাল হইবার অপেক্ষাও সে রাখে নাই। রেণু এক দৌড়ে বাহিরে গেল, যদি পিওন এখনও ডাক না লইয়া গিয়া থাকে। হয়ত এখনও সময় আছে; চেনা পিওন, বলিয়া কহিয়া হয়ত এখনো সে চিঠিখানা ফেরৎ পাইতে পারে। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লম্বা একটা ঝুলিতে আরও শত খানেক চিঠির সঙ্গে রেণুর সেই অপরাধী চিঠিটাও রানারের কাঁধে চাপিয়া চলিয়াছে… ঝম্ ঝম্ ঝম্।

লজ্জা, লজ্জা, অপরিসীম লজ্জা। কেন রেণু এই চিঠি লিখিল? কি ভাবিবে উমানাথ, এই চিঠি যখন তাহার হাতে গিয়া পড়িবে! আসিবে কি? যদি আসে তাহাকে সে কি বলিবে? অকারণে অনর্থক পয়সাকড়ি খরচ করিয়া সে যদি আসে, কি তাহাকে বলিবে, কি করিয়া জানাইবে তাহাকে কি দরকার! কিন্তু যদি না আসে, ছেলেমানুষী বলিয়া যদি উড়াইয়া দেয়…না, না, সে মস্ত অপমান, সে তাহা সহিতে পারিবে না। দুর্ম্মতি না হইলে মানুষে কি এমন চিঠি লেখে! মাগো, কি নাটুকেপনা। ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় রেণুর মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। ইচ্ছা

করিল, আর যেন কোন দিনই উমানাথের সামনে তাহাকে না বাহির হইতে হয়।

তারপর দিন দুইতিন রেণু ভারি লজ্জায় লজ্জায় ভয়ে ভয়ে কাটাইল, কবে না জানি উমানাথ আসিয়া পড়ে। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যে উমানাথ আসিয়া পৌঁছাইল না। আস্তে আস্তে একটা ভার রেণুর মন নামিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে রেণু নিজের কাছে সহজ ও সরল হইয়া উঠিল। হাস্তে, গল্পে, কথাবার্ত্তায়, কাজকর্ম্মে রেণু এই কিছুদিন আগেকার লজ্জাকর ঘটনাটা প্রায় ভুলিতে চলিল।

এদিকে উমানাথ মেসের রান্না খাইয়া রীতিমত আপিসের কাজে লাগিয়া গিয়াছিল। দশটা পাঁচটা অফিস করে। সকাল-বেলাটা চা খাইয়া মেসের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে নানা রকম খোস-গল্প করে। পাঁচটার পর আপিস-ফেরতা গড়ের মাঠে খানিকটা হাওয়া খাইয়া মেসে ফেরে, তারপর খাটের উপর বিছানাটা পাতিয়া গুড়গুড়ির নলটা মুখে দিয়া শুইয়া পড়িয়া যোগেশদার সঙ্গে নিম্নস্বরে আধ্যাত্মিক সাধনা, ফুটবল ম্যাচ, আলুর দর প্রভৃতি সব রকমের গুরু ও লঘু আলোচনা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়ে।

রেণুর সঙ্গে কলহের একটা স্বাভাবিক নিষ্পত্তি হয়ত ছুটি না ফুরাইয়া গেলে উমানাথের কপালে ঘটিত কিন্তু তাহার সময় ছিল না। উমানাথ মনের মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিল। তারপর নানা রকম কাজকর্ম্মের মধ্যে ঘটনাটির উত্তাপ ক্রমশই হ্রাস হইতে হইতে প্রায় নিশ্চিহ্নতার সীমাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন আর উমানাথের বিশেষ ক্ষোভ নাই, তাহার ছুটির নিষ্ফলতা লইয়া আর কোন অনুযোগ মনে আসে না। একদিন কেবল যোগেশদাকে বলিয়াছিল, মনটা তেমন ভাল নেই। যোগেশদা বিজ্ঞের মত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সেদিন বাড়ী থেকে ফিরলে এর মধ্যেই মন খারাপ।

উমানাথ উত্তর দিলে,—না দাদা, আসবার দিন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি।

দাদা আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—ভায়া, ঝগড়া করলে ত করলে, একেবারে শেষদিনটাতে করলে! ছুটীর পিণ্ডিটাই চটকে দিলে। তা যখন করেই ফেলেছ তখন, গোঁ ছেড়ো না, তিন দিনে টীট হয়ে যাবে, নইলে বড্ড আস্কারা পেয়ে যাবে। গোখরো সাপের বিষদাঁতটা না ভেঙে দিলে চলে কি? থাক না দুদিন চুপ করে, দু'এক শনিবার বাড়ী যেও না, দেখবে কোথাকার তেজ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বল কি? সারারাতের মধ্যে তোমার সঙ্গে একবার কথাও বললে না! আর তুমিও যেমন, হতাম আমি…

সুতরাং উমানাথ শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিল সে কিছুদিন চুপচাপ বসিয়া থাকিবে, সময়েই সব ঠিক হইয়া যাইবে। তারপর অনেকদিন পরে পুনরায় যেদিন উহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে—আজিকার গ্লানি সেদিনের মনোহারিত্ব খর্ব্ব করিতে আর টিকিয়া থাকিবে না, নির্ভর নিঃসঙ্কোচ দুইটি উৎসুক প্রাণী ঠিক আগেকার মত পরস্পরের কাছে আসিয়া ধরা দিবে, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে। এই রকম মনে মনে ঠিক করিয়া উমানাথ নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজেকে মেস-জীবনে সমর্পণ করিল।

আর দূরে, অনেক দূরে রেণু—গ্রাম্য রেণু, সন্তপ্ত রেণু, লজ্জিত রেণু সংসারের কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে অনুশোচনায় বিদ্ধ করিয়া চলিল—কেন সে অমন চিঠি লিখিল। সামান্য এক মোহের মধ্যে, হ্যাঁ মোহ, মোহই ত—সে রাত্রির সবটাই মোহ, সবটাই উত্তেজনা—সেই মোহে পড়িয়া এমন নিদারুণ ভাবে নিজেকে সে প্রকাশ করিল, এ যে অতিশয় অশোভনীয়, নিরতিশয় লজ্জা।

এমন সময় এক সন্ধ্যায় উমানাথ রেণুর চিঠি পাইল—হৃদয়াতিশয্যে ছলছল চিঠি। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এরকম চিঠি রেণুর কাছ হইতে এই প্রথম। উমানাথ একবার, দুইবার, তিনবার সেই লাইন কয়টি পড়িল, পড়িতে পড়িতে প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তারপর যোগেশদাকে চুপি চুপি ডাকিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

যোগেশদা চিঠি পড়িয়া বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া গূঢ় হাসি হাসিয়া প্রথমে বলিলেন, হুঁ। তারপর আরম্ভ করিলেন, তাঁহার জীবন-সমুদ্র মন্থন-করা অভিজ্ঞতার রত্নরাজি—ভায়া, তখনি বলেছিলাম না, থাক কিছু দিন চুপচাপ।

দেখ দিকিনি ওষুদ কেমন ধরেছে। তিন দিনও যায়নি, নাকে কান্না সুরু হয়েছে। তখনই যদি দেহি পদ শতদল বলে ছুটে শ্রীচরণে আছড়ে পড়তে, তবে পেতে এমন চিঠি! শিখে রেখে দাও ভাই একটা কথা, মেয়েদের জাতই এমন। মনে মনে যাই থাক না, সাম্‌নে কখনও প্রকাশ করবে না—খবরদার, খবরদার, ও কাজ কখনও করবে না—করলেই গেছ; একদম মাথায় চেপে বসেছে। মেয়েদের তেজ আর সাপের বিষ, জানলে ভায়া, ও একই বস্তু। তোমার যোগেশদা সে কথা হাড়ে হাড়ে জানে।

তারপর পরামর্শে ঠিক হইল উমানাথ বাড়ী যাইবে। ছুটি লইয়া যাইবার ইচ্ছা উমানাথ প্রকাশ করায় যোগেশ বাধা দিয়া বলিলেন—না হে না, ছুটি-ফুটি নেওয়া-টেওয়া ওসব কর না। দুচার দিনের দেরীতে বিশেষ কিছু এসে যাবে না। এই সেদিন তুমি সাতদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছলে। বরঞ্চ এ কটা দিন চোখ কান বুঁজে কাটিয়ে দিয়ে, আসছে শনিবার বাড়ী চলে যাও। মাঝখানে রবিবার পাবে, মন্দ হবে না।

উমানাথের এ প্রস্তাব মন্দ লাগিল না। যোগেশদা লোক বড় খাঁটি। না, সে শনিবারেই যাইবে। একদিন দুইদিন দেরীতে কি আর আসিয়া যাইবে। কিন্তু রেণুকে কি আর চিঠি দিবে, চিঠি দিয়া জানাইবে?—উত্তর হিসাবেও বটে, যাইবার তারিখটা জানান হিসাবেও বটে—কিন্তু কি লিখিবে? এরকম চিঠির কি জবাব দিবে সে! না, জবাব-টবাব ওসব কিছু নয়, একেবারে শনিবারে গিয়া সটান উঠিবে। সে মন্দ হইবে না, রেণু চিঠি লিখিয়া আমায় অবাক করিয়াছে, আমিও অপ্রত্যাশিত গিয়া তাহাকে অবাক করিয়া দিব। গাড়ীটা একটু দেরীতে পৌছাইবে। প্রায় এগারটা হইবে, তা হোক, তখনও অনেকটা রাত থাকিবে। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা রেণুকে কিছু করিতে দিবে না, রাণাঘাট হইতে যা হোক রাতের মত কিছু খাইয়া লইবে।

…রেণু উমানাথকে প্রশ্ন করিল—বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এলে যে? উমানাথ রেণুর দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল—এ হাসি সে যোগেশদার কাছে শিখিয়াছে—বলিল, —তাত বলবেই, চিঠি লিখে আসতে বলেছিল কে?

চিঠি! সেই চিঠি, যে-চিঠিকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রেণু ভুলিতে চাহিয়াছিল। সেত ভুলিয়াই গিয়াছিল। বিশ্বের লজ্জায় বিছানার মধ্যে রেণু কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গলার স্বরকে আদ্র করিয়া উমানাথ বলিয়া উঠিল—কথা বলছ না যে? এসে কি খুব অন্যায় করলাম?

রেণুর কানে তখন কীর্ত্তনীয়ার গানের সেই দুই কলি ফিরিয়া ফিরিয়া গুঞ্জন করিতেছে—

মান করে মান হারালি রাই।

সেদিনের নিবিড় অনুভূতির স্বাদ, সেদিনের সেই মুক্তপক্ষ প্রেরণার উর্দ্ধগ অভিযানের করুণ কাকুতিটুকু হয়ত আজ নিরুদ্ধ; চির-পিপাসিত বিরহী আত্মার চির-অভিসার, যে হয়ত চিরদিনই মানুষের চোখের সামনে রংএর নব নব ইন্দ্রধনু রচনা করিয়া চলিবে, কিন্তু আজ তাহার স্থান কোথায়?

রেণু অনুভব করিল, উমানাথের একখানি হাত তাহার কাঁধে স্থাপিত হইয়াছে। বিতৃষ্ণায় তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রেণু, তোমার লজ্জা নাই। সেদিনের সে স্বপ্ন, সে অনুভূতি—সেও সত্যকারের—সে তোমার নিজেরই অন্তরস্বপ্ন, কোন্ এক সুযোগে তোমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু আজিকার এও মিথ্যা নয়। আমাদের ছোট খেলা-ঘরের হাসিখেলায় আমাদের স্বল্প মনের পরিমিত আশা কামনায় ইহার দাম আছে বৈ কি!

বনস্পতি [শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সমাজের নিম্নস্তর থেকে জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন

১। মুচী ও মুচীর ছেলেরা

১

জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন, যাঁদের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, তাঁদের অধিকাংশই জন্মগ্রহণ করেছেন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে, লালিত-পালিত হয়েছেন নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে ; শুধু প্রতিভায় নয়, শুধু দৈব-কৃপায় নয়, পাথর-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, পদে পদে পথের পাথর ঠেলে ফেলে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন সবার সামনে।

দুঃখ-দারিদ্র্য নানা রকমের আছে। অর্থের অভাব একমাত্র বাধা নয়, যদিও সেটা মস্ত বড় বাধা। দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করা এক ব্যাপার, "ছোট জাতে"র ঘরে জন্মগ্রহণ করা আর এক রকম ব্যাপার। ব্যাধের ছেলে একলব্য ব্রাহ্মণ দ্রোণকে গুরু পায় নি—সূতপুত্র কর্ণের চরম সৌভাগ্য যে, তিনি দুর্যোধনকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। সমাজের উচ্চ-স্তরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দরিদ্র হলেও, সমাজের মধ্যে থাকেন। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সমাজের বাইরে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র তো তাঁরা বটেই, তা ছাড়া তাঁরা অভিশপ্ত।

শুধু আমাদের দেশে নয়, গ্রীস, রোম, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, সব দেশেই সমাজের নিম্নস্তরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সমাজের অবজ্ঞার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, গরু-ছাগলের মত এই সব নিম্নস্তরের মানুষদের বেচাকেনা করা হত। বর্ত্তমান আমেরিকায় নিগ্রোদের দুর্দ্দশার কথা আমরা সবাই জানি। এই সেদিনও পর্য্যন্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে য়ুরোপের সুসভ্য জাতিরা যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, তা এখনও রক্তের অক্ষরে জ্বলজ্বল্ করছে। য়ুরোপে যে এই সামাজিক বাধা এখন একেবারে উঠে গিয়েছে তা নয়, তবে সেখানে ধীরে ধীরে এই বাধা কমে আসছে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই, এই সব-রকমের বাধা-বিপত্তি ঠেলেও মানুষের মত মানুষ ছোট জাতের মধ্যে জেগে উঠেছে। জগতের সর্ব্বোচ্চ আসনে যাঁরা বিরাজ করছেন, তাঁদের অনেকের শৈশবের দিকে ফিরে চাইলে দেখতে পাই, কেউ কামারের ঘরে, কেউ কুমোরের ঘরে, কেউ চাষীর ঘরে, কেউ ক্রীতদাসের ঘরে, কেউ বা মুচীর ঘরে খেলা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে এসেছে বড় বড় কবি, জগৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পী, জাতির শিক্ষাদাতা, ধর্ম্ম-গুরু, যুদ্ধের নেতা; জগতের ইতিহাসে তাঁরা সবাই অক্ষয় স্বর্ণাসনে বসে রয়েছেন। যারা ছোট জাতের ছেলেদের আজও সমাজের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তারাই দেখি, এই সব কৃতী ছোট জাতের

উইলিয়াম কেরী।

ছেলেদের প্রতিমূর্ত্তির সামনে স্তব করছে। সেই স্তব সার্থক হবে শুধু তখনই, যখন মানুষ সমাজ থেকে এই জন্মগত অভিশাপের চিহ্নকে একেবারে মুছে ফেলতে পারবে। আজ কয়েকজন মুচীর ছেলের গল্প বলব। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, the cobbler should stick to his last, কিন্তু জগতের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে কয়েক জন মুচীর ছেলে এই প্রবাদ-বাক্যকে মানতে পারেন নি।

২

আমাদের বাংলা দেশ, আমাদের বাংলা সাহিত্য, যাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাঁরই কাহিনী প্রথমে আরম্ভ করি। উইলিয়াম কেরীর নাম আজ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে। বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তিনি একজন আদি-প্রবর্ত্তক এবং জনক।

তাঁরই প্রেরণায় এবং সাধনায় বাংলা গদ্য সাহিত্য নব-রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহাসের ভূমিকায় বলেছেন, কেরী এবং তাঁর সহকর্ম্মী মিশনারীরা আমাদের নমস্য।

উইলিয়াম কেরী অবশ্য মুচীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে মুচী হয়েছিলেন। নর্দাম্‌প্টনশায়ারের পলাবসপারি গ্রামে এক দরিদ্র সংসারে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে একটি ছোট্ট পাঠশালা ছিল—তাঁর বাবা সেই পাঠশালায় গুরুগিরি করতেন। তাতে করে অতি কষ্টে তাঁদের সংসার চলত। ছেলেবেলায় গ্রামের ছেলেরা যতটুকু শিক্ষা পেতে পারে কেরীর বাবা তাঁকে তা শিখিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে একটু বড় হতেই তিনি দেখলেন যে, ছেলেকে আর পড়াবার সামর্থ্য তাঁর নেই। তার চেয়ে ছেলে যদি কোন রকমে দু'এক পয়সা আনতে পারে, তাহলে সংসারের কিছু সুবিধে হয়। এই চিন্তা করে তিনি কেরীকে এক মুচীর সঙ্গে জুটিয়ে দিলেন। তাঁদের গ্রামের পাশে হ্যাক্‌ল্‌টন বলে আর একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন মুচী ছিলেন। তাঁরই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেরী মুচীর কাজ করে বেড়াতে লাগলেন। তখন কি কেউ কল্পনাও করতে পারত, সেই হ্যাক্‌ল্‌টন গ্রামের ছোট মুচীটির সঙ্গে বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিক্ষার একদিন এত ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠবে? যে-লোক বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের আবির্ভাবলগ্নকে সফল করে তুলেছিলেন, সেই লোক একদিন দূর হ্যাক্‌ল্‌টন গ্রামে লোকের ছেঁড়া জুতো সারিয়ে বেড়াতেন। ভাবতেও বিস্ময় লাগে কোন্‌খান থেকে কি ভাবে কখন এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির বন্ধন গড়ে উঠে!

পরের জুতো সেলাই করে দু'পয়সা রোজগার করেই কিন্তু বালক কেরীর মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। তিনি পড়া-শোনা ছাড়লেন না। লেখাপড়া শেখবার এক দুর্ব্বার বাসনা তাঁর অন্তরে সদা-সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল এবং তার জন্যে যে কোনও পরিশ্রম করতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হতেন না।

তিনি স্থির করলেন যে, গ্রীকভাষায় যে-বাইবেল লেখা আছে, যার থেকে ইংরেজী বাইবেল অনূদিত হয়েছে, সেই গ্রীক-বাইবেল তিনি পড়বেন। তিনি গ্রীকভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক-ভাষা শিখে, তিনি গ্রীক-বাইবেল পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন যে, বাইবেল প্রথমে লেখা হয়েছিল হিব্রু ভাষায়, সেই মূল গ্রন্থ পড়তে হবে। তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। কিছু কাল পরে তিনি হিব্রুভাষায় আদ্যন্ত বাইবেল পড়ে ফেললেন।

এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়ে, খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি জীবন-উৎসর্গ করলেন। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি মিশন গড়ে তোলেন। সেই মিশনের প্রতিনিধিস্বরূপ আর একজন মিশনারীকে সঙ্গে নিয়ে ১৭৯৩ সালের শেষে তিনি বাংলাদেশে এসে পৌছন।

অনেকের ধারণা যে বৃটিশ-সরকার-প্রেরিত মিশনারী হিসাবে তিনি আমাদের দেশে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। বরঞ্চ সেই সময়কার বিবরণ থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বৃটীশ-সরকারের অজ্ঞাতসারে এবং অমতে, শুধু নিজের অন্তরের প্রেরণায় কেরী বাংলা দেশে এসেছিলেন। ১৮৩৪ সালের ১১ই জুনের 'সমাচার দর্পণে' (*) ডাঃ কেরীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁর যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখা রয়েছে, "ডাঃ কেরী সাহেব কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও ডেন্মার্কীয় এক জাহাজ আরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন। ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আপনাদের ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম চলন বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন।"

এই থেকে বোঝা যায় যে, কেরী একান্ত নিজের প্রেরণাতেই জ্ঞান-বিতরণের মহৎ-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে, লুকিয়ে ডেনমার্ক-দেশের এক জাহাজে বাংলায় আসেন। এবং এখানে পৌছিয়ে যাতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কোন রকমে জানতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে টাকির কাছে এক জঙ্গলে চাষ-আবাদ করে জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

* সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৭ পৃঃ

অতি কষ্টে এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে সংগোপনে সেই জঙ্গলে তাঁকে বাস করতে হয়েছিল। সেই সময় অডনি বলে একজন সাহেব মালদহের কাছাকাছি এক জায়গায় নতুন নীলকুঠী স্থাপন করছিলেন। কেরী এই অডনী সাহেবের কাছে তাঁর দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করাতে তিনি তাঁকে তাঁর নীলকুঠীর ম্যানেজার করে দেন এবং অডনী সাহেবই চেষ্টা-চরিত্র করে বৃটীশ-ভাবতে থেকে প্রচারকার্য্য করার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়ে দেন।

এই সময়ের পর থেকে বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে ডাঃ কেরীর নাম অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে থাকে। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামপুরে এসে তিনি বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সালে যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ডাঃ কেরী সেই কলেজের বাংলা, সংস্কৃত এবং মহারাষ্ট্র ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে তিনি বাংলার অন্যতম আদি-সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' বার করলেন। বাংলা গদ্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির বই লিখতে আরম্ভ করলেন। আগেই বলেছি যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং জনক। তাঁরই উদ্যোগে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আশ্রয়ে আমাদের গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠে। ডাঃ কেরীর সঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যের কি যোগ, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের লেখা "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" (যা ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল) পড়ে অংশতঃ বোঝা যায়। এক কথায় আজ আমরা সবাই বলি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডাঃ কেরীর মাহাত্ম্য এবং কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একদিন যে তাঁকে পরের জুতো সেলাই করে বেড়াতে হয়েছিল, সে স্মৃতিতে তিনি লজ্জিত হতেন না। তিনি জানতেন, অপরের ক্ষতিকর এবং অন্যায় না হলে, যে-কোনও কাজ সমান মর্য্যাদার। যখন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে, তখন এক সভায় এক উদ্ধত রাজ-কর্ম্মচারী তাঁকে শুনিয়ে জনান্তিকে বলেছিল—লোকটা জুতো তৈরী করত শুনতে পাই! কথাটা শুনতে পেয়ে কেরী বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, আজ্ঞে না, আপনি একটু ভুল শুনেছিলেন, আমি জুতো তৈরী করতাম না, আমি জুতো মেরামত করতাম, মাত্র একজন মুচী!

৩

কেরী যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার প্রায় দেড়শ বছর আগে ইংলণ্ডেই আর একজন মুচী জগৎ-ব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করে যান। তাঁর নাম হল জর্জ্জ ফক্স্। ধর্ম্ম-সংস্কার এবং সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে জর্জ্জ ফক্সের নাম শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাসে নয়, সমগ্র য়ুরোপের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সেদিন অমানুষিক কষ্ট এবং নির্য্যাতন সহ্য করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, আজ সেই প্রতিষ্ঠান জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিশ্বের আর্ত্তসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। য়ুরোপের ইতিহাস পড়তে গেলেই, কোয়েকার (Quaker) বলে একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এই কোয়েকারদের অনুষ্ঠানের বর্ত্তমান নাম হল, সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ (Society of Friends). এই নাম থেকেই এই অনুষ্ঠানের আদর্শ বোঝা যায়। এঁরা সকল দেশে, সকল জাতির দুঃস্থ লোককে আপনার লোক মনে করেন। রুষ হ'ক, জার্ম্মাণ হ'ক, নিগ্রো হ'ক দুঃস্থ মানব মাত্রেই একই দেশের লোক। তাঁরা ধর্ম্মের বাইরের আড়ম্বর এবং ভড়ঙ মানেন না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেকের ধর্ম্ম তার অন্তরের নিভৃততম সাধনার জিনিষ। একমাত্র বাইরের অনুষ্ঠান হল—যদি ধার্ম্মিক হও, জাতি-নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত লোকের সেবা কর, কুসংস্কার দূর কর, মিথ্যাচার দূর কর এবং এই কাজে প্রত্যেক লোকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, প্রচলিত ধর্ম্মের বন্ধন থেকে. দেশ-গত রাজনৈতিক বন্ধন থেকে। আজ কোয়েকাররা জগতের দূর দূরান্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁদের বান্ধব-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন—জগতের বড় বড় আন্তর্জাতিক বিপদে তাঁরা অকাতরে সাহায্য করেন, কিন্তু যে-ব্যক্তি এই আদর্শ এবং অনুষ্ঠান য়ুরোপে প্রচার করে গিয়েছিলেন, সেই জর্জ্জ ফক্স্ সেদিন তাঁর এই আত্ম-প্রকাশের জন্য ভয়াবহভাবে নির্য্যাতিত হয়েছিলেন। গির্জ্জার যারা পুরোহিত ফক্সের কথা তাঁদের মনঃপূত হল না—কারণ ফক্স্ তাঁদের অনুষ্ঠানের আর বাহ্য-আড়ম্বরের অসারতা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। জনতা কখনও তাঁকে বুঝেছে, কখনও তাঁকে প্রহার করেছে, রাষ্ট্র এক কারাগার থেকে আর

এক কারাগারে তাঁকে রেখেছে, কিন্তু তবুও এই অশান্ত চল্লিশ বছর ধরে সকল রকম নির্য্যাতন সহ্য করে, মানব-ধর্ম্মের কথা জগতের দেশে-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। এবং তাঁরই আবির্ভাবের ফলে সেদিন সমগ্র য়ুরোপের চিন্তা-ধারা একটা নতুন অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্ম যখন বাইরের আচার-অনুষ্ঠানের বিড়ম্বনায় তার সার মর্ম্মের কথা ভুলে যেতে বসেছিল সেই সময় জর্জ্জ ফক্‌স্ তাকে সেই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার নতুন প্রেরণা দিয়ে যান।

পায়ের জুতা-মোজা খুলে জর্জ্জ ফক্‌স্ পথে প্রচার-কার্য্যে ব্যস্ত।

কিন্তু তিনিও ছিলেন একজন মুচী। তাঁর বাবা ছিলেন তাঁতী। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে লিষ্টোরশায়ারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি সামান্য লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন। সেটুকু লেখাপড়ায় এত বড় একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চালান যায় না। কিন্তু তাঁর মনে ছিল অগাধ বিশ্বাস আর শক্তি। তাঁর ধারণা ছিল যে, কোন দৈব-শক্তি তাঁকে সাক্ষাৎভাবে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন তিনি উন্মাদের মত লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, পায়ের জুতোমোজা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিতেন, নগ্নপদে পথে পথে জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য বাণী প্রচার করে বেড়াতেন, ধর্ম্মের নামে যারা ভণ্ডামী করে, জীবনের নামে যারা জীবিতকে অপমান করে, তাদের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত বাণী এইভাবে তিনি সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তখন তিনিই ছিলেন তাঁর দলের একমাত্র নেতা এবং একমাত্র শিষ্য। কোন দল ছিল না তাঁর, তিনি ছিলেন একা। একা এই ভাবে চল্লিশ বছর ধরে য়ুরোপের সমস্ত দেশে, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র, আমেরিকায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, যেখানে দরিদ্র লোকদের সমবেত দেখতে পেয়েছেন, সেইখানেই তাঁর মনের কথা প্রচার করেছেন। এক গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে আর এক গ্রামে এসেছেন, এক কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আর এক কারাগারে এসেছেন। কিন্তু কোনও দিন, কোন কিছুরই ভয়ে তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। অনেক সময় পাগল বলে গ্রামের লোকেরা ঢিল মেরে মেরে তাঁকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর অসামান্য চরিত্র-বল এবং নির্ভীকতা দেখে ক্রমশঃ দেশে দেশে এক শ্রেণীর লোক প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠতে লাগল। তারাও নিজেদের কোয়েকার বলে পরিচয় দিতে লাগল এবং দেখতে দেখতে সেদিন ফক্‌সের প্রেরণায় মহাসাগরের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্য্যন্ত দেশে দেশে এক নতুন শ্রেণীর লোক মাথা তুলে উঠল—তারা অন্তরের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলে ঘোষণা করল—আর্ত্তসেবাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলে মেনে নিল। প্রচলিত আইন ফক্‌সের মত তাঁর অনুচরদেরও নানা ভাবে নির্য্যাতিত করতে লাগল। ফক্‌সের জীবদ্দশায় একবার প্রায় একই সময় বিভিন্ন দেশের কারাগারে প্রায় হাজার জন কোয়েকার কারারুদ্ধ ছিলেন।

ফক্স্ যখন কারাগারে অবরুদ্ধ থাকতেন, সেই সময় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখতেন। সমালোচকদের মত হচ্ছে যে, তাঁর এই আত্মচরিতখানি জগতের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি আত্মচরিতের মধ্যে স্থান পায়।

ফক্সের কথার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের আর একজন বড় ধর্ম্মপ্রচারকের কথা আপনা থেকে মনে পড়ে। তিনি হলেন জার্ম্মানীর মার্টিন লুথার। ফক্সের পূর্ব্বে তিনিই য়ুরোপে বজ্র-নির্ঘোষে তাঁর বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন। সমস্ত য়ুরোপকে তিনি সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নব-আন্দোলনে একজন কবি তাঁকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন—তিনি হলেন তাঁর বন্ধু হান্স্ শ্যাক্স্ (Hans Sachs)। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর নুরেমবার্গ প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এগার বছর আগে মার্টিন লুথার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য মার্টিন লুথারের মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর পর্যান্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। মার্টিন লুথার যে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করেছিলেন, শ্যাক্স্ তাঁর সঙ্গীত এবং কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাকে জার্ম্মানীর সামান্যতম চাষীর কাছে পৌঁছে দেন। সেই সময়কার জার্ম্মানীর তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সঙ্গীত-রচয়িতা। সেই জন্য সমালোচকগণ বলেন যে—"Sachs preached Martin Luther better than Martin Luther preached himself." অর্থাৎ মার্টিন লুথার নিজের কথা যতখানি না প্রচার করতে পেরেছিলেন, শ্যাক্স্ তার চেয়ে ঢের বেশী প্রচার করেছিলেন মার্টিন লুথারের কথা।

জার্ম্মানীর এই জাতীয় কবি, তিনিও ছিলেন মুচী। নিজের গ্রামে মুচীর কাজ শেখার পর তিনি স্থির করলেন যে, তিনি জুতো তৈরী করা ভাল করে শিখবেন। সমস্ত জার্ম্মানী তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—কোথায় কোন্ ভাল মুচী আছে, তার কাছে গিয়ে কাজ আদায় করে আবার অন্যত্র চলে যান। এই ভাবে জার্ম্মানীর অন্তরের সঙ্গে প্রথম যৌবনেই তাঁর একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। যখন তিনি নুরেমবার্গে ফিরে এসে জুতোর দোকান খুললেন, সেই সময়ই তাঁর মনে এক অপরূপ সঙ্গীত জেগে উঠে। মার্টিন লুথারের প্রদীপ্ত বাণী সে সুরকে জাগিয়ে তুলল। শ্যাক্স্ সঙ্গীতে কাব্যে সেই বাণীকে জাতির দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

জগতের আর এক মহাপুরুষ মুচীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে কাব্য-কলার ক্ষেত্রে অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। তিনি হলেন কৃষ্টফার মার্লো, শেক্স্পীয়ারের বন্ধু, সহকর্ম্মী এবং ইংলণ্ডের নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের অন্যতম আদি প্রাণ-দাতা। তিনি ক্যান্টারব্যারীর এক মুচীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কোনও দিন তাঁকে পরের জুতো সেলাই করতে হয় নি। সোজাসুজি তিনি ক্যামব্রিজে পড়তে যান এবং সেখান থেকে সসম্মানে, বি-এ ডিগ্রী পান।

যৌবনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তারই মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সমালোচকরা বলেন, যাদুর মত একবার ছুঁয়েই তিনি ইংলণ্ডের নাটক এবং রঙ্গমঞ্চকে নতুন জীবন দিয়ে যান। তাঁর আসবার
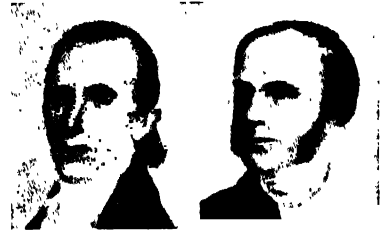
রবার্ট ব্লুমফিল্ড। জেমস্ ল্যাকিংটন।

আগে, ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে যেসব নাটক অভিনীত হত, তার কথাবার্ত্তা যেমন কুৎসিৎ ছিল, তেমনি তার মধ্যে কোন নাটকের লক্ষণ ছিল না। মার্লো এসে সর্ব্বপ্রথম ভাল নাটক লিখে সেই অভাব দূর করলেন এবং সেই সময় তাঁর এতদূর প্রতিষ্ঠা হয় যে, শেকস্পীয়ারও তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

৪

যখন বার্ক আর পিট্-এর বক্তৃতায় সমস্ত য়ুরোপ মুহুর্মুহু সচকিত হয়ে উঠছিল, সেই সময় এক আধ-অন্ধকার কুঠরীতে বসে একটি ছেলে জুতো সেলাই করতে করতে তার অপর চারজন নিরক্ষর সঙ্গীকে সেই সব বক্তৃতা পড়িয়ে শোনাত। সব সময় বালক সব কথা বুঝতে পারত না। অনেক কথারই মানে তখন সে জানত না। পরামর্শ করে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে একখানা অভিধান কেনা হল। অভিধান-সংগ্রহের পর সেই মুচীর আড্ডায় অবসরকালে পুরাদমে আবার বক্তৃতা শোনার পালা চলতে লাগল।

ছেলেটির নাম রবার্ট ব্লুমফিল্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন যশস্বী কবি। ব্লুমফিল্ডের নাম অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যের বড় বড় কবিদের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না—কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। গ্রাম্য জীবনের চিত্র তিনি সুন্দর এবং মধুর রূপে আঁকতে পারতেন। তাঁর কাব্যের নায়ক শুধু চেয়েছিল,

শভেল। স্যাভেজ।

To plough and sow and reap and mow
And be a farmer's boy.

ব্লুমফিল্ডের বাবা দর্জ্জীর কাজ করতেন। তাতে কোন রকমে কায়-ক্লেশে তাঁদের সংসার চলত। ব্লুমফিল্ড জন্মাবার এক বছর পরেই তাঁর বাবা পরলোকগমন করেন। সেই নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে তাঁর এক কাকা তাঁকে সেই মুচীর আড্ডায় ঢুকিয়ে দেন। সেইখানে যে-চারজন সঙ্গী তিনি পেয়েছিলেন, তারা তাঁর ব্যবহার এবং বুদ্ধিতে এতদূর মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, যত রকমে পারত তারা বালককে সাহায্য করতে চেষ্টা করত। এই ভাবে বালক চারজন মুচীর সহৃদয়তায় জুতো সেলাই করতে করতে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে। রোজ সন্ধ্যাবেলা কাগজ থেকে নানারকমের কবিতা সে তাদের পড়িয়ে শোনাত।

একদিন গোপনে বালক নিজেই একটি কবিতা লিখে এক কাগজের অফিসে দিয়ে এল। বালক সবিস্ময়ে দেখে যে, পরের সংখ্যাতেই তার সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছে। সেদিন সেই মুচীর আড্ডায় কি উল্লাস! সেইদিন থেকে ব্লুমফিল্ডের জীবনে এক নতুন ধারা এসে পড়ল। তাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডের কবিমহল থেকে তাঁর বিদায়-স্মৃতি উপলক্ষে বহু কবিতা লেখা হয়েছিল এবং সেদিন তাঁরা আশা করেছিলেন, "While **fields shall bloom thy name shall live.**"

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে আর একজন মুচী ছিলেন। তাঁর নাম আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় স্পষ্টভাবে রয়ে গিয়েছে। তবে তার জন্যে তিনি বা তাঁর প্রতিভা বিশেষ দায়ী নয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড স্যাভেজ বলে একজন লোক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলতেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা খুব সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁকে জুতো সেলাই করেই দিন চালাতে হত। সেই সময় ইংলণ্ডে ডাঃ জনসনও জন্মগ্রহণ করেছেন। যখন জনসনেরও খুব দুরবস্থা তখন তাঁর সঙ্গে স্যাভেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। ডাঃ জনসনের চেষ্টাতেই পরে স্যাভেজ সেই সময়কার একজন মস্ত বড় সাংবাদিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত হীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের কুৎসা বার করে তিনি টাকা রোজগার করতেন। এ সব সত্ত্বেও তাঁর লেখবার শক্তির জন্য সেই সময়কার অধিকাংশ বড়লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। যখন তিনি মারা যান তখন ডাঃ জনসন **Life of Savage** নাম দিয়ে তাঁর একটি ছোট জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। জীবন-চরিত লেখার একটা বিশেষ রীতি আছে। যে-লোকের জীবন লেখা হয়েছে, তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কোন জীবনীর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যে-ভাবে সেই জীবনী খানি লেখা হয়েছে, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা মূল্য আছে। এই বইখানি সংক্ষেপে জীবন-চরিত লেখার রীতির একটা অতি সুন্দর নিদর্শন এবং সেইজন্য ডাঃ জনসনের নামের সঙ্গে রিচার্ড স্যাভেজের নামও আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে।

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে একজন কবিকে যুক্ত-রাষ্ট্রের লোকেরা আজও বৎসরে বৎসরে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তিনি হলেন কবি জন গ্রিনলিফ্ হুইটিয়ার (**John Greenleaf Whittier**)। যখন নবীন উদ্যমে তাঁরা যুক্ত-রাষ্ট্রকে গড়ে তুলছিলেন, সেই সময় এই কবি তাঁর সহজ, সুন্দর কাব্যের মধ্যে দিয়ে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, যা কিছু কল্যাণকর, তারই বাণী প্রচার করে, সেই সব নব-মহাদেশ স্রষ্টাদের মনে এক মহৎ কর্ম্ম-প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন। আজও পর্য্যন্ত তাঁর কাব্য স্বচ্ছ, পরিষ্কার চিন্তাধারায় এবং মানব-কল্যাণ-ধর্ম্মে রসবন্ত হয়ে আছে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—"His verses at times sound like the measured steps of Cromwell's old veterans."

কবি হুইটিয়ার।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র চাষীর ঘরে হুইটিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে মুচীর কাজ শেখান। গ্রামের চাষীদের বুট সেলাই করে তিনি রোজগার করতেন। সেই সময় থেকে হুইটিয়ার গোপনে কবিতা লিখতেন। সেই সময় উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন (William Lloyd Garrison)-এর নাম য়ুরোপ এবং আমেরিকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। নিগ্রোদের ক্রীতদাস প্রথা থেকে মুক্ত করে দেবার জন্য গ্যারিসন জীবন উৎসর্গ করেন এবং এই আন্দোলন চালাবার জন্যে দেশে দেশে তিনি খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। হুইটিয়ার সোজা গ্যারিসনের কাছে একটি কবিতা পাঠিয়ে দিলেন। সেই কবিতা পড়ে গ্যারিসন স্বয়ং খুঁজতে বেরুলেন, কোথায় আছে সেই ছদ্মবেশী প্রতিভা। খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখেন যে, তাঁর কবি হ্যাভারহিল্ গ্রামে এক গাছতলায় বসে ভারী ভারী বুট মেরামত করছেন।

হুইটিয়ারের বার্দ্ধক্যে জগতের বুধমণ্ডলী সমবেত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁর কিশোর কালের কথা ভুলে যান নি। তাই বৃদ্ধ বয়সে, যাদের কাছে জীবনের কর্ম্মের প্রথম দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাদেরই স্মরণ করে এক অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করলেন, কবিতাটির নাম হল, The Anthem of the Gentle Craft of Leather.

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আর এক জন মুচীর নাম জর্জ্জ ওয়াসিংটনের নামের পাশে আজও অমলিন হয়ে বিরাজ করছে। তাঁর নাম হল রোজার শারমান্ (Roger Sherman)। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম চিরকালের জন্য সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের বিখ্যাত স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রে (Declaration of Independence) জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরের সঙ্গে রোজার শারমানের স্বাক্ষরও অমলিন ভাবে বিরাজ করছে। রোজার শারমান বাইশ বছর পর্য্যন্ত মুচীগিরি করে সংসার চালিয়েছিলেন, এবং সেই কাজের অবসরে লেখাপড়া শিখে তিনি ওকালতী পাশ করে যুক্ত-রাষ্ট্রের কংগ্রেসের সভ্য হন। যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন শারমান আমেরিকার পক্ষে যোগদান

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের ডানদিকে দাঁড়িয়ে রোজার শারমান।

করেন এবং সেই সংগ্রামের তিনি একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন।

কর্ণেল জন হিউসন্ রাজা চার্লসের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিলেন (ব্যঙ্গ চিত্র)।

ইংলণ্ডের যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাসে আমরা একজন বিখ্যাত নৌ-সেনাপতির পরিচয় পাই—যিনি যৌবন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে পরের ছেঁড়া জুতো সেলাই করে বেড়িয়েছিলেন। আজ তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতী-সন্তানদের সঙ্গে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবের সমাধি-প্রাঙ্গণে সমাহিত হয়ে আছেন। তাঁর নাম হল স্যার ক্লাউডিস্‌লে শভেল্। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে নরফোক-অঞ্চলের এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্যার জন্ নারবোরোর সুনজরে আসার দরুণ তিনি যুদ্ধের জাহাজে চাকরী পান। সেখান থেকে একটার পর একটা অসমসাহসিক কাজের ফলে তিনি গ্রেট বৃটেনের নৌসেনার রিয়ার-আডমিরাল হয়েছিলেন। একদিন সমুদ্র-পথে সিসিলি দ্বীপের কাছে কুয়াসার মধ্যে পথ হারিয়ে তাঁর জাহাজ এক পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। দু'হাজার লোক সমেত শভেল সমুদ্রে ডুবে যান। তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া গেলে, মহাগৌরবে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

ক্রমওয়েলের ইংলণ্ডে একজন মুচী নিজের শক্তিতে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসেছিলেন। তাঁর নাম হল কর্ণেল জন হিউসন। যখন ইংলণ্ড অত্যাচারী রাজা চার্লস ষ্টুয়ার্টকে বিতাড়িত করবার সংগ্রামে মেতে উঠেছিল, সেই সময় হিউসন ক্রমওয়েলের সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং ব্যক্তিগত শৌর্য্যের বলে তিনি ক্রমওয়েলের রাজত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি হয়েছিলেন। রাজা ষ্টুয়ার্টের ফাঁসীর হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন। যখন রেষ্টোরেশন ফিরে আসে, তখন তিনি ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে যান। সেই সময় রাজার দলের লোকেরা তাঁর ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়ে রাস্তায় বিলি করেছিল—একদিকে মুচী, অন্যদিকে সৈনিক, একহাতে মুচীর লাস্, অন্যহাতে তরবারি।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে খ্যাতনামা আরও কয়েকজন মুচী আছেন—তাঁদের নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। কবি টমাস কুপার; উইলিয়াম গিফোর্ড—যখন ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছিল, সেই সময় গিফোর্ড খবরের কাগজের মারফত ইংলণ্ডের জনমত গড়ে তোলেন; জেমস ল্যাকিংটন, ইংলণ্ডের প্রাচীন পুস্তক-প্রকাশকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বশেষে আর একজন মুচীর কাহিনী বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি কোনও কাব্য রচনা করেন নি, কোনও যুদ্ধ জয় করেন নি, কোনও রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা নেই। তিনি তাঁর নিঃশব্দ জীবনে দরিদ্র পথের ছেলেদের কুড়িয়ে, তাদের শিক্ষা দিয়ে জাতির উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতেন। তাঁর সেই সাধনা থেকে আজ

মাসট কুপার। উইলিয়ম গিফোর্ড।

দরিদ্র অনাথ ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্যাফ্‌টসবেরি সোসাইটি (Shaftesbury Society) গড়ে উঠেছে। তাঁর নাম হল জন পাউণ্ড। তিনি ত্রিশ বছরের নিঃশব্দ সাধনায় যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁর

মৃত্যুর পর লর্ড স্যাফ্‌টসবারি তাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। সেইজন্য তাঁরই নাম অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আজ নাম হয়েছে স্যাফ্‌টস্‌বেরি সোসাইটি। লর্ড স্যাফ্‌টস্‌ব্যারি গর্ব্ব করে বলতেন,—আমি জন পাউণ্ডেরই শিষ্য!

যখন তাঁর পনেরো বছর বয়স, সেই সময় পড়ে গিয়ে তাঁর একটা পা ভেঙ্গে যায়। সেই পা একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই জন্যে লোকে তাকে খোঁড়া জন পাউণ্ড বলে ডাকত। একটা পা চলে যাওয়ার দরুণ পাউণ্ড মহাবিপদে পড়লেন। কি করে রোজগার করবেন? তিনি মুচীর কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন। ৩৭ বছর পর্য্যন্ত অন্য মুচীর সঙ্গে কাজ করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করার পর, তিনি স্থির করলেন যে, তিনি আলাদা একটা মুচীর দোকান খুলবেন। একটা ছোট্ট কাঠের ঘর ভাড়া নিলেন। কিন্তু একজন লোক তো চাই, সাহায্য করবার জন্যে। তাঁর একজন ভাইপো ছিল, সে-ও খোঁড়া। নিজে খোঁড়া বলে, সেই বালকটির প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক করুণা ছিল। সেই ছেলেটিকে নিয়ে তিনি মুচীর দোকান খুললেন।

তিনি নিজে বিবাহ করেন নি, সমস্ত অপত্য-স্নেহ সেই ছেলেটির উপর গিয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল—ছেলেটিকে তিনি লেখাপড়া শিখাবেন। কিন্তু সঙ্গী বা সহপাঠী না পেলে হয়ত তার পড়ায় মন বসবে না, এই ভেবে তিনি স্থির করলেন যে, এর দু'এক জন সহপাঠী যোগাড় করতে হবে। কিন্তু সেই মুচীর আড্ডায় কে ছেলে পাঠাবে? তখন জন পাউণ্ড স্থির করলেন যে, পথে পথে কত অনাথ বালক ঘুরে বেড়ায়, ছিন্নবাসে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাদের নিয়ে এসে তো তিনি লেখা পড়া শেখাতে পারেন। এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি বেরুলেন রাস্তায়, অনাথ বালকের খোঁজে। কিন্তু তারা পড়তে আসতে চায় না। তখন তিনি এক উপায় ঠিক করলেন। পকেটে খাবার নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। খাবারের লোভ দেখিয়ে একে একে তাদের জোটাতে লাগলেন। যা কিছু বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেইগুলি আর রাস্তার হ্যাণ্ডবিল কুড়িয়ে তিনি তাঁর স্কুল খুললেন। স্কুলে চল্লিশটি ছাত্র হল।

খোঁড়া জন পাউণ্ডের স্কুল।

প্রত্যেক ছেলেকে পড়তে শুনতে এবং কাজ চালাবার মত অঙ্ক শিখিয়ে তিনি ছেড়ে দিতেন এবং প্রত্যেককে তিনি যে কাজ জানতেন অর্থাৎ মুচীর কাজ, তাই শেখাতেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং যে-সব ছেলে একদিন খেতে না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, তারা লেখাপড়া শিখে বাইরে গিয়ে ভদ্রভাবে রোজগার করতে আরম্ভ করল। এই ভাবে ত্রিশ বছর পরে জন পাউণ্ড মুচীর কাজ করতে করতে, সেই ভাঙ্গা ঘরে বসে জাতির সব চেয়ে বড় একটা কল্যাণ-অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীমুখে বাঙ্গালার কথা

এই সময়ে কোন কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এ দেশে আসিয়াছিলেন। লুডি ভিকোডি ভার্থেমা নামে একজন ইতালীয় ভ্রমণকারী এ সময়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় এত অধিক পরিমাণে শস্য, মাংস, চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত যে, পৃথিবীব অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যাইত না। ভার্থেমা বলেন যে, এ দেশে অনেক ধনশালী বণিক আসিতেন। প্রতি বৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রে বোঝাই হইয়া সিরিয়া, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে যাইত, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক জহরত-ব্যবসায়ীও এ দেশে আসিতেন।

রাল্‌ফ ফিচ্ নামে একজন ইংরেজ এ সময়ে বাঙ্গালায় আসেন। তিনিই ইংরেজদিগের মধ্যে এ দেশের প্রথম ভ্রমণকারী। ফিচ্ বাঙ্গালার অনেক স্থানের বেশম ও কার্পাস বস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। টাঁড়া, কোচবিহার, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর, সোণার গাঁ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বস্ত্র ও রেশমের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়। সোণার গাঁয়ের কার্পাস বস্ত্রের কথা তিনি বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই ঢাকার প্রসিদ্ধ মসলিন। ফিচ্ বলিয়াছেন যে, হিজলীর এক প্রকার তৃণ হইতে রেশমী বস্ত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাঁহার বিবরণ হইতে এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, চাউল উৎপন্ন হওয়ার কথা ও নানাপ্রকার বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। সপ্তগ্রাম প্রভৃতির বাজারে অনেক প্রকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর কথাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সে সময়ে অনেক স্থানে পশুপক্ষীর সেবার জন্য পিঁজরাপুলের ব্যবস্থা ছিল। ফিচ্ এ দেশের লোকদিগকে সাধারণতঃ নিরামিষাহারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা যথেষ্ট ধনী হইলেও বিলাসিতা বর্জ্জন করিত। পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রে তাহারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিত।

ফর্ণাণ্ডেস প্রভৃতি কয়েকজন খৃষ্টান পাদরীও এ সময়ে বাঙ্গালা দেশে আসেন। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ইংরেজ ছিলেন না। পর্ত্তুগীজদের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল। এই পাদরীগণ হুগলী, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, কাঠারব, চান্দেকানরা, সাগরদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সাগরদ্বীপ, চট্টগ্রাম ও হুগলীর নিকট ব্যাণ্ডেলে তাঁহাদের চেষ্টায় গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। পাদরীরা প্রধান প্রধান ভুঁইয়াদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা সুন্দরবনের মধ্য দিয়াই গমনাগমন করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের নানাপ্রকার বৃক্ষ, বানব প্রভৃতি জন্তু, বহুসংখ্যক নদ নদী এবং বনের মধ্যে মধ্যে মাঠে ধান্য, ইক্ষু প্রভৃতি চাষের কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচার

ব্রহ্ম দেশের আরাকানের অধিবাসীদিগকে যে মগ বলিত ও পর্ত্তুগীজদিগকে যে ফিরিঙ্গী বলিত সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। আরাকান চট্টগ্রামের দক্ষিণে। পূর্ব্বে, ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এক্ষণে তাহা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। এখন সমস্ত ব্রহ্মদেশের লোককেই মগ বলিয়া থাকে। আর সমস্ত ইউরোপের লোককেই ফিরিঙ্গী বলে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে আরাকানের লোকদিগকে মগ ও পর্ত্তুগালের লোকদিগকে ফিরিঙ্গী বলিয়াই এ দেশের লোকে জানিত। আমরা সেই মগ ও ফিরিঙ্গীর কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা জানিয়াছ, এই মগ ও ফিরিঙ্গীরা এ দেশে অত্যন্ত অত্যাচার করিত। কিরূপ অত্যাচার সেই কথাই এখন বলিব। আমরা বলিয়াছি আরাকান একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজারা বাঙ্গালা দেশ অধিকারের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠান রাজত্ব শেষ হইলে, মোগলেরা যখন এ দেশে ভাল করিয়া রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, সেই সময়েই আরা-কাণের রাজারা এ দেশ আক্রমণের চেষ্টা করেন। তাঁহারা কিছুকাল চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন। এই আক্রমণ উপলক্ষে মগেরা এদেশে আসিয়া নানারূপ

অত্যাচার করিত। যুদ্ধের সময় ভিন্ন অন্যান্য সময়ও দস্যুতা করিয়া তাহারা এ দেশের লোককে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিয়া তুলিত।

পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গীরাও তাহাদের সহিত যোগ দিত। আরাকানের রাজারা তাঁহাদের রাজ্যেও পর্তুগীজদিগকে স্থান দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তাহাদের আড্ডা ছিল। পর্তুগীজেরা প্রথমে এদেশে বাণিজ্য করিতেই আসে। বাণিজ্যে সুবিধা না হওয়ায় ইহারা এদেশের রাজাদের অধীনে সৈনিকের কার্য্য ও ক্রমে ক্রমে দস্যুতা অবলম্বন করে। পর্তুগীজেরা সাধারণতঃ জলপথেই দস্যুতা করিত। এই জলদস্যুগণকে বোম্বেটে বলা হইত। ইহা একটি পর্তুগীজ শব্দের বিকৃতি। অর্থ, জাহাজ হইতে যে কামান ছোড়ে। এই সময়ে গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গী নামে একজন বোম্বেটে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। গঞ্জালেশ প্রথমে একজন সৈনিক ছিল, পরে ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। তাহাতে সেরূপ সুবিধা না হওয়ায় সে ক্রমে ক্রমে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে। ক্রমে তাহার সন্দ্বীপ অধিকারের ইচ্ছা হয়। সে জন্য সে বাঙ্গালার রাজা রামচন্দ্র রায়ের সাহায্য লয়। সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া গঞ্জালেশ তাহার সাহায্যকারী বাকলা রাজার কোন কোন স্থানও অধিকার করে। তাহার পর আরাকান-রাজ সেলিমসার সহিত তাহার বিবাদ আরম্ভ হয়। আরাকান-রাজার কুব্যবহারে তাঁহার ভ্রাতা অনুপরাম পলাইয়া আসিয়া গঞ্জালেশের আশ্রয় লন। গঞ্জালেশ তাঁহার এক ভগ্নীকে বিবাহ করে। আরাকান-রাজ গঞ্জালেশের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার তাহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। গঞ্জালেশ ও তাঁহার অনুচরগণ অবশেষে আরাকান-রাজের নিকট পরাজিত হইয়া সন্দ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করে।

এই মগ ও ফিরিঙ্গীরা কখনও মিলিতভাবে, কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালা দেশে নানারূপ অত্যাচার করিত। তাহারা নগর গ্রাম, হাট বাজার সমস্তই লুণ্ঠন করিত। গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের বাড়ীঘর আক্রমণ করিয়া যাহা পাইত লুটিয়া লইত এবং ঘরদুয়ারে আগুন লাগাইয়া দিত। কেবল ইহাই নহে, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যারপরনাই অত্যাচার করিত। বন্দীগণের হাতের তলা ছেঁদা করিয়া সরু বেত পুরিয়া দিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় হালি গাঁথিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে ফেলিয়া রাখিত ও প্রত্যহ সামান্য কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য তাহাদের মধ্যে ছিটাইয়া দিত। দস্যুরা এই সকল লোকদিগকে লইয়া গিয়া নানাস্থানে বিক্রয় করিত। এ বিষয়ে পর্তুগীজদিগের অত্যাচারই বেশী ছিল। এই মগ ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবনে যে সকল গ্রাম বা নগর ছিল ইহাদের অত্যাচারে সে সকল ধ্বংস হইয়া যায়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ অত্যাচার বাঙ্গালায় আর কখনও ঘটে নাই।

অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের আগমন

পর্তুগীজদিগকে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতে দেখিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণও ক্রমে বাঙ্গালায় আসেন। পর্তুগীজদের পরে ওলন্দাজেরা এদেশে উপস্থিত হন। এই ওলন্দাজেরা ইউরোপের হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী। তাঁহারা পূর্ব্ব অঞ্চলে নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে করিতে ক্রমে বাঙ্গালায় চলিয়া আসেন। তখন পর্তুগীজগণের সেরূপ বাণিজ্যের সুবিধা ছিল না। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়া, বরাহনগর, মুর্শিদাবাদের কালিকাপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আপনাদের কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্যকার্য্য চালাইতে থাকেন। ওলন্দাজদিগের পরে আমরা ইংরেজদিগের বাঙ্গলায় আসিতে দেখি। ইংরেজেরা যে ইংলণ্ডের অধিবাসী তাহা অবশ্যই তোমরা জান। প্রথমে হুগলীতে, পরে রাজমহল, কাশীমবাজার, মালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের কুঠী স্থাপিত হয়।

ইংরেজদের পরে ফরাসী ও দিনেমারেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। ফরাসীরা ফ্রান্স দেশের ও দিনেমারেরা ডেনমার্ক দেশের অধিবাসী। ফরাসীরা প্রথমে চন্দননগর ফরাসডাঙ্গায় এবং দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে আপনাদের কুঠী স্থাপন করেন। ফরাসীরা ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ, ফরাসডাঙ্গায় ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপের আরও কোন কোন দেশের বণিকগণও এ দেশে বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিলেন। এশিয়ার আরমেনিয়া, পারস্য ও অন্যান্য স্থানের লোকেরাও

এদেশে ব্যবসায়াদি করিতেন। এই বণিকগণের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এ দেশের মুসলমান রাজগণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এই বণিকগণের রাজ্যস্থাপনের ইচ্ছা জন্মে। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদও বাধিয়া যায়। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদই অনেক দিন চলিয়াছিল। ক্রমে ইংরেজেরা ভারতবর্ষের রাজা হন। এক্ষণে ভারতবর্ষে যে তাহাদের রাজত্ব তাহা অবশ্য তোমরা জানিতে পারিতেছ। ফরাসীদের অধীন বাঙ্গালায় চন্দননগর ও দক্ষিণ ভারতে পণ্ডীচেরি প্রভৃতি দু একটি স্থান এখনও আছে। দক্ষিণ ভারতের গোয়া প্রভৃতি দু'একটি স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধীনে রহিয়াছে। অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির অধিকারে এদেশে এক্ষণে আর কোন স্থান নাই।

ইংরেজ কোম্পানী

এইবার তোমাদিগকে ইংরেজ কোম্পানার কথা ভাল করিয়া বলিব। যাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতের রাজা হইয়াছিলেন তাঁহাদের কথা ভাল করিয়াই জানা উচিত। তোমরা শুনিয়াছ যে ওলন্দাজদিগের পরে ইংরেজেরা বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসেন। কিরূপে তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই বলিতেছি। প্রথমে রাল্ফ ফিচ্ যে এদেশে আসেন সে কথা বলিয়াছি। তিনি কেবল ভ্রমণ করিতে আসেন নাই। এ দেশে বাণিজ্য করারও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি এদেশের দ্রব্যাদির সংবাদ ভাল করিয়াই লইয়াছিলেন। স্যার টমাস রো নামে ইংলণ্ডের রাজদূত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইংরেজদিগের বাঙ্গালায় বাণিজ্য করার জন্য আদেশপত্র প্রাপ্ত হন। সেই আদেশপত্রের বলেই ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের পৌত্র শাসুজা সে সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই সময়ে বৈটিন নামে ইংরেজ ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করিলে ইংরেজেরা হুগলীতে আপনাদের কুঠী স্থাপন করেন। হুগলীর অধীনে ক্রমে ক্রমে কাশীমবাজার, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের এক একটি বাণিজ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে এ সকল বাণিজ্যালয় কুঠীতেও পরিণত হইয়াছিল। শাসুজার নিকট হইতে ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন। পরে কিন্তু তাঁহাদিগকে বাণিজ্যের জন্য কর দিতে হইত। তাহা হইলেও অন্যান্য বণিকদের অপেক্ষা তাঁহাদের কর অনেক অল্প ছিল।

এরূপ সুবিধা হওয়ায় ইংরেজেরা এদেশে বাণিজ্যে বিশেষরূপ লাভবান হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইংরেজ কুঠী সকল প্রথমে মান্দ্রাজের অধীন ছিল। পরে স্বতন্ত্র হওয়ারই ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালার কুঠী সমূহের অধ্যক্ষ হুগলীতেই থাকিতেন। যিনি প্রথমে ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম উইলিয়ম হেজেস। ইংরেজদিগের বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্যস্থান পরে হুগলী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে কথা তোমরা পরে জানিতে পারিবে। বাণিজ্যকার্য্যে তাঁহাদের নানারূপ সুবিধা হওয়ায় ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে প্রভূত ধনশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। এই ইংরেজ কোম্পানীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলিত। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ক্রমে এদেশে রাজ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও ইংরেজ কোম্পানীর সহিত তাঁহারা পারিয়া উঠেন নাই। ইংরেজ কোম্পানী আপনাদের অর্থ, ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে তাঁহাদের রাজা ও রাজ্যের ব্যবসায় গড়িয়া ওঠে। তাঁহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং তাঁহারা অস্ত্র বিনিময় আরম্ভ করিয়া আপনাদের সুবিধা করিয়া লন। কবির কণ্ঠে তাই তোমাদিগকে বলিতেছি—

> "সামান্য বণিক এই ইংরেজেরা নয়,
> দেখিবে তাদের হায়,
> রাজা রাজ্য ব্যবসায়
> বিপণি সমরক্ষেত্র অস্ত্র-বিনিময়।"

শাজাদার বিদ্রোহ

তোমরা তাজমহলের কথা শুনিয়াছ কিনা জানিনা। এই তাজমহল ভারতবর্ষের, এমন কি পৃথিবীর মধ্যেও একটি আশ্চর্য্য দর্শনীয় ভবন। দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার

মহিষী মমতাজ বেগমের যে অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহারই নাম তাজমহল। এই শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধি-মন্দির আগরা নগরীতে অবস্থিত। যিনি এই সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত বাঙ্গালার কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল এক্ষণে তোমাদিগকে সে কথা বলিতেছি।

তোমরা যে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নাম শুনিয়াছ শাহজাহান তাঁহারই পুত্র। তাঁহার নাম ছিল খুরম। পরে তিনি শাহজাহান উপাধি লাভ করেন। শাহজাহান বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে যখন শাহজাদা বা যুবরাজ ছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। বিমাতা নুরজাহান বেগমের সহিত তাঁহার বনিবনাও ছিল না এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে তিনি বাদশাহ হইতে পারিবেন না বলিয়া শাহজাদা শাহজাহান পিতার জীবিত অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি সে বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভও করিয়াছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই বিদ্রোহী পুত্রকে দমনের জন্য অগ্রসর হন। শাহজাহান বাদশাহী সৈন্যগণের নিকট পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তথা হইতে তিনি উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়া তাহা অধিকার করিয়া লন।

উড়িষ্যা হইতে শাহজাহান বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমে বর্দ্ধমান নগর অবরোধ করেন। এই সময়ে হুগলীর পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ মাইকেল রডারিগো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, শাহজাহান তাঁহাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। রডারিগো তাহাতে সম্মত হন নাই। শাহজাহান বাদশাহ হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। এদিকে বাঙ্গালার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ শাহজাদাকে বাধা দিবার জন্য ঢাকা হইতে রাজমহলে উপস্থিত হন। শাহজাহান তখন নৌকাযোগে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অনেক ধনরত্ন অধিকার করেন। জমীদার ও অন্যান্য লোকেরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। যুদ্ধে ও জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ত ব্যাপারে সুন্দরলাল নামে একজন বাঙ্গালী শাহজাহানকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

বাঙ্গালায় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শাহজাহান বাঙ্গালা হইতে বিহারে চলিয়া যান। বিহারের রাজধানী পাটনা অধিকার করিয়া তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বাদশাহী সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি আবার পাটনার দিকে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের দিকে পলায়ন করেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গী-দলন

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিলেন। তিনি কাশীম খাঁ জবানীকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গী ও তাহার অনুচরগণ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইলে পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে থাকে। এই সময়ে হুগলীতে তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। অবশ্য তাহারা বাণিজ্যকার্য্য চালাইত বটে, কিন্তু হুগলীকে সুদৃঢ় করিয়া তাহারা এদেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। সে জন্য এদেশবাসীকে অনেক প্রকার অত্যাচার ভোগ করিতে হইত। হুগলীর নিকট দিয়া যে নৌকা বা জাহাজ যাইত পর্ত্তুগীজেরা তাহার শুল্ক আদায় করিয়া লইত। তাহাতে বন্দর সপ্তগ্রামের খুব ক্ষতি হইতেছিল। আর স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা ধরিয়া বিদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা প্রভৃতি তাহাদের সেই চিরকালের অভ্যাস এখানেও সম্পূর্ণ ভাবেই চলিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গেও মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করা তখনও পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা অল্পবিস্তর ঘটিতেছিল।

কাশীম খাঁ এই সকল বিষয় বাদশাহ শাহজাহানকে লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহার বাঙ্গালায় অবস্থানকালে পর্ত্তুগীজেরা যে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। আর তিনি সে সময়ে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারের কথাও কতক-কতক শুনিয়াছিলেন। সেই জন্য বাদশাহ ফিরিঙ্গীদিগকে দমন, এমন কি বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সুবেদারের উপর আদেশ দিলেন। আদেশ-পত্র পাইয়া কাশীম খাঁ ফিরিঙ্গী-দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাহাদুর কম্বু, তাঁহার নিজ পুত্র ইনায়েৎ আলি ও খাজাশেৎ নামে তিনজন

সেনাপতির অধীন তিনদল সৈন্য হুগলী অধিকার করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিয়া হুগলী অবরোধ করেন।

পর্ত্তুগীজেরা তিনমাস পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা কামান-বন্দুক চালাইতে বিশেষরূপই দক্ষ ছিল, তজ্জন্য মোগলেরা সহসা তাহাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে মোগলেরা সুড়ঙ্গের মধ্যে বারুদ পুরিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া পর্ত্তুগীজদিগের দুর্গ উড়াইয়া দেয়। ইহাতে বহুসংখ্যক ফিরিঙ্গী নিহত হয়। তাহাদের জাহাজ সকল পালাইবার চেষ্টা করিলে মোগলেরা সে সকল আক্রমণ করে। তখন তাহারা আপনাদের জাহাজে আগুন ধরাইয়া দেয়। দু'একখানা কোনরূপে পালাইয়া যায়। পর্ত্তুগীজদের পরিত্যক্ত সমস্ত দ্রব্যাদি মোগলেরা অধিকার করে। অনেক ফিরিঙ্গী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে বন্দী করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের অনেককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। পাদরীদিগকেও মুসলমান করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁহারা কোনরূপে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজগণের সহিত গোয়ায় চলিয়া যান।

সেই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্য-বিস্তার ও আধিপত্য-স্থাপন একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং অন্যান্য ইউরোপীয়গণ আপনাদের সুবিধা করিয়া লন। মোগলেরা হুগলী অধিকার করিয়া সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে তাহাকেই প্রধান বন্দর করিয়া তুলে। সেই সময় হইতে সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হয়। ক্রমে তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় এক্ষণে তাহার নাম মাত্রই রহিয়াছে।

শাহসুজা

শাহজাহান বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজা অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালার সুবেদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সদয় ব্যবহার ও ন্যায়বিচারে তিনি এদেশের অধিবাসীগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ যারপরনাই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুজার সময়েই ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তোমরা রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের কথা শুনিয়াছ। শাহসুজার সময়ে আর একবার বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। তিনি তোডরমল্লের বন্দোবস্ত সংশোধন করিয়া সংশোধিত 'জমাতুমার' প্রস্তুত করেন। সুজার সময়ে কতকগুলি স্থান বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত হয়। তাহাদিগকে কতকগুলি সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করিয়া তাহাদের জমা এবং তোডরমল্লের বন্দোবস্তের উপর কতক জমা বৃদ্ধি করিয়া সুজা বাঙ্গালাদেশকে ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত করেন এবং তাহার ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা জমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালাদেশের নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়া শাহসুজা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত এদেশে রাজত্ব করিতেন। সুলতান সুজা ঢাকা হইতে আবার রাজমহলে রাজধানী লইয়া যান। সেখানে নূতন প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি রাজমহলকে দিল্লী ও আগ্রার সমতুল্য করার চেষ্টা করেন। তাঁহার পিতা বাদশাহ শাহজাহান অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। সুজাও তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালা দেশ সে সময়ে সকল প্রকারে সমৃদ্ধ হওয়ায় সুজা ঐ সকল অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সুজার এ সৌভাগ্যের কিন্তু শীঘ্রই অবসান ঘটিয়া আসিল। বাদশাহ শাহজাহান এ সময়ে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় তাঁহার জীবনের আশা না থাকায় তাঁহার পুত্রদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ নামে শাহজাহানের চারিপুত্র ছিলেন। পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সুজা দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের ইচ্ছায় বাঙ্গালা হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা দিল্লী হইতে সসৈন্যে বাহির হইয়া সুজাকে বাধা দিবার জন্য পুত্র সোলেমানকে পাঠাইয়া দেন। সোলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সুজা আবার বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি মুঙ্গের পর্য্যন্ত পঁহুছিলে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ দারাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব পিতা শাহজাহানকেও বন্দী করিয়াছিলেন। সুজা প্রথমে আওরঙ্গজেবের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আওরঙ্গজেবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইয়া পাটনায় চলিয়া আসেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ ও সেনাপতি মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হন। সুজা প্রথমে মুঙ্গেরে পরে রাজমহলে

পঁহুছিয়াছিলেন। বাদশাহী সৈন্যেরা রাজমহল অবরোধ করিলে সুজা টাঁড়ায় পলাইয়া যান।

এই সময়ে এক ব্যাপার উপস্থিত হইল। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সহিত সুজার কন্যা আয়েসার বিবাহের কথা হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে খুড়তুত, জেঠতুত ভাই ভগ্নীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় গঙ্গা পার হওয়া কঠিন বিবেচনায় মহম্মদ নিজ সৈন্যদিগকে লইয়া রাজমহলের নিকট থাকিতে বাধ্য হন। টাঁড়া রাজমহলের পরপারে অবস্থিত। আয়েসা সেই সময়ে মহম্মদকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে তাঁহার পিতার ও নিজের দুর্দ্দশার কথা লিখিত ছিল। পূর্ব্ব হইতে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা থাকায়, মহম্মদ সেই পত্র পাইয়া টাঁড়ায় চলিয়া আসেন। আয়েসার সহিত তাঁহার বিবাহও হয়। সেনাপতি মীরজুমলা অন্য দিক দিয়া বাঙ্গালায় আসিতেছিল। তিনি এই সংবাদ পাইয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহী সৈন্যদিগকে সমবেত করিয়া গঙ্গা পার হইয়া টাঁড়ার দিকে চলিলেন। তখন সুজার সহিত মীরজুমলার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে সুজা পরাস্ত ও মহম্মদ বন্দী হইয়াছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই অবাধ্যতার জন্য মহম্মদকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সুজা ঢাকার দিকে পলায়ন করেন। সেখান হইতে ত্রিপুরা হইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম হইতে তিনি মুসলমানদের প্রধান তীর্থ মক্কা বা মদিনায় গিয়া আপনার জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে কোন জাহাজ দেখিতে না পাইয়া সুজা আরাকানে চলিয়া যান। আরাকানের রাজা প্রথমে তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরে বিরক্ত হইয়া সুজাকে বন্দী করিয়া জলে ডুবাইয়া মারেন। সুজার সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী বেগম পিয়ারীবাণু আত্মহত্যা করেন। দুইটি কন্যা বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন দেন, একটি কন্যাকে আরাকানের রাজা জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারও মৃত্যু ঘটে। সুজার দুইটি পুত্রকেও জলে ডুবাইয়া মারা হয়। এইরূপে সুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের অবসান ঘটে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

দাশরথি রায়

"বঙ্গশ্রীর" গত শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সেকালের যাত্রা" নামক প্রবন্ধের স্থলবিশেষে লিখিয়াছেন, "সেকালে নবীন ডাক্তারের দল, সাঁতরার দল, দাশরথি রায়ের দল প্রভৃতি আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট যাত্রার দল ছিল। দাশরথী রায় চন্দননগরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহার আখড়া বা কার্য্যালয় চন্দননগরে ছিল।"

লেখকের এই দুই উক্তিই ভ্রমাত্মক। তাঁহার প্রথম ভুল হইয়াছে দাশরথি রায়কে যাত্রাওয়ালাদের দলভুক্ত করা। দাশরথি কোনও দিন যাত্রার দল করেন নাই—তাঁহার ছিল পাঁচালীর দল। "দাশুরায়ের পাঁচালী" —এই কথাই বাংলাদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। দাশরথি সর্ব্বসমেত ৬০টি পালা রচনা করেন এবং এই ৬০টি পালাই আজও মুদ্রিত হইতেছে। ইহাদের এক খানিও যাত্রার পালা নহে, সবগুলিই পাঁচালী। যাত্রা ও পাঁচালী পালা রচনা ও গাহিবার দিক হইতে—দুই সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।

যোগেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় ভুল হইয়াছে দাশরথির সহিত চন্দননগরের সম্পর্কের উল্লেখ। দাশরথি আমাদের (পীলার প্রাচীন জমীদার বংশের) বংশের দৌহিত্র সন্তান ; তিনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামেই বাস করেন এবং তাঁহার বাসগৃহ ও প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দুইটি আজও আমাদের গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, দাশরথির আখড়া বা কার্য্যালয় আমাদের গ্রামেই ছিল। পীলা গ্রামটি বর্দ্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার অন্তর্গত এবং ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। আমাদের গ্রামে যাইতে হইলে ই. আই. রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে নবদ্বীপের পরবর্ত্তী ষ্টেশন পূর্ব্বস্থলীর পরেই পাটুলী ষ্টেশনে নামিতে হয়।

পাটুলী ষ্টেশনের কিয়দংশ পীলার সীমানার মধ্যেই। হাওড়া হইতে পাটুলীর দূরত্ব ৭৯ মাইল এবং হাওড়া হইতে চন্দননগরের দূরত্ব ২১ মাইল। যাঁহাদের লইয়া দাশরথির পাঁচালীর দল গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই পীলার আশ-পাশ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কুটুম্বিতাসূত্রেও চন্দননগরের সহিত দাশরথির কোনই সম্বন্ধ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে রেলওয়ের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে চন্দননগর হইতে ৫৮ মাইল দূরত্বের অধিবাসী হইয়া দাশরথির পক্ষে চন্দননগরে আখড়া খুলিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দাশরথির মৃত্যুর (১২৬৪ সাল, ১লা কার্ত্তিক) পর তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৮০ সালে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত প্রকাশিত করেন। আমার নিকট এই গ্রন্থের দুইখানি কপি আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রামরাম বসুর লিখিত "প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত্র" গ্রন্থের পরে চন্দ্রনাথ বাবুর এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় জীবন-চরিত। চন্দননগরে দাশরথির আখড়া থাকিবার কথা এই গ্রন্থেও কুত্রাপি নাই। এই ঘটনা সত্য হইলে চন্দ্রনাথ বাবু নিশ্চিত তাহার উল্লেখ করিতেন। যোগেন্দ্র বাবু এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন তাহা জ্ঞাত করিলে দাশরথির সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিতেছি তদ্বিষয়ে সাহায্য করা হইবে।

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অগ্নির আত্মপ্রকাশ

—শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে সেই দেশ তত উন্নত যে-দেশ যে-পরিমাণে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিকে নিজেদের প্রয়োজনে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। যে সকল অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছে, ঐ সকল অবস্থাই মানুষের প্রাকৃতিক সুপ্তশক্তিকে নিজের বুদ্ধিবলে জাগরিত করিয়া কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

অগ্নি প্রকৃতির অতি প্রয়োজনীয় শক্তির মধ্যে অন্যতম। অগ্নিশক্তির জাগরণেই প্রথমে ধাতুযুগ (metal age) ও পরে যন্ত্রযুগের সৃষ্টি। অগ্নিশক্তির বিকাশ মানুষকে অতি দ্রুতগতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। এই সুপ্তশক্তি কি ভাবে ধীরে ধীরে জাগরিত হইয়া মানুষের কাজে লাগিয়াছে তাহার বিবৃতি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে অগ্নিসাধনার কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান। সাগ্নিকগৃহে চব্বিশ প্রহর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। কোন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াদিতে হোমাগ্নি না করিলে সে ক্রিয়া আরব্ধ হয় না। অগ্নিকে যে পাশ্চাত্যে প্রাচীন কাল হইতেই কত মূল্যবান ধরা হইত তাহা তাহাদের প্রমিথিয়ূস্-(Prometheus)-এর দেবতাদের আবাস হইতে অগ্নি-অপহরণের উপাখ্যান হইতে অনুমিত হইবে। দেবতাদের গৃহ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মর্ত্ত্যে মানবের হিতে দান করিয়া প্রমিথিয়ূস তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইউরোপে উত্তর-প্রদেশে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহাদের অগ্নিদেবতা হিম্ ডাল্ (Heim Dall) অতীব সুপুরুষ ও তাহার জন্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে। এই দেবতা হিম্ ডাল্ একদিন যুবকের ছদ্মবেশ ধরিয়া নরলোকে নামিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল মানুষকে সভ্যতা দান করিবার জন্য।

পুরাণ ও উপাখ্যানের কথা ছাড়িয়া দিলে মনে হয়, আগুনের প্রথম সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ হইতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসভ্য আদিমনিবাসীদের মধ্যে দেখা যাইত যে, তাহারা দুইখানি কাষ্ঠখণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে; কখনও বা একখণ্ড কাঠে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে অপর একটি কাঠের ফলক প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আগুন বাহির করিত। ঐ গর্ত্তে সহজদাহ্য বৃক্ষ-পত্রাদি রাখিয়া অগ্নিশিখাকে নিজেদের কাজে লাগাইত। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা ভিন্ন উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিত। তাহাদের প্রণালী ছিল অনেকটা যে-ভাবে ছুতার মিস্ত্রিরা তুরপুন দিয়া স্ক্রুর জন্য ছিদ্র করে, সেই ভাবে। প্রথমে কাঠের একটি টুকরাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া তাহার দুই প্রান্তে দড়ি দিয়া আবদ্ধ করিত, তাহার পর ঐ ধনুকের ছিলা বা রজ্জু অপর একটি কাঠের ফলকের মাঝখানে পাক দিয়া ঘুরাইত ও অল্প সময়ের ভিতর এইরূপে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কাঠ হইতে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইত; পরে শুষ্ক ডাল দ্বারা আগুনকে স্থায়ী করিয়া রাখা হইত। অনেকে আবার এক টুকরা কাঠ আর এক টুকরার উপর এড়োএড়ি (across) রাখিয়া উপর হইতে নীচে বারংবার করাতের মত ঘর্ষণ করিয়া প্রথমে ধোঁয়া ও পরে আগুনের ফুল্‌কি বাহির করিত।

প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশে আগুনের ফুল্‌কি বাহির করিবার জন্য অপর একটি প্রণালী ব্যবহৃত হইত। গাছের একটি ছোট ডাল বা কাঠের টুকরাকে অপর দুইটি শুষ্ক কাঠের টুকরার মধ্যে রাখিয়া ঘর্ষণ করিলে অতি অল্পকাল পরে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইত। এইভাবে নির্গত আগুনকে রাব্-ফায়ার (rub-fire) বলা হইত। এই রাব্-ফায়ার প্রণালীতে অগ্ন্যুৎপাদন বহু প্রাচীন, ও ধর্ম্মাচারের সহিত সংশ্লিষ্ট; কারণ এখনও অনেক গির্জ্জাতে কোন কোন আচার পালনের জন্য এই ভাবে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়। পুরাকালে পাশ্চাত্য দেশে কৃষক ও অশিক্ষিতদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, এই ভাবে অগ্নি উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিলে রোগ, কুহক ইত্যাদির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অগ্নি উৎপাদনের আর একটি প্রাচীন প্রণালীর ব্যবহারের কথা এখনও পাশ্চাত্য দেশে স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রণালীকে ফায়ার-ষ্ট্রাইকার (fire striker) বলে। ইহা আমাদের 'চকমকির' অনুরূপ।

ভারতবর্ষে বহু পুরাকাল হইতে চকমকির ব্যবহার আছে। এমন কি, এখনও পর্য্যন্ত বহুদূর পল্লীগ্রামে, যে স্থানে দেয়াশলাইয়ের বিশেষ প্রচলন নাই, সেখানে চকমকির সাহায্যে আগুনের ফুল্‌কি বাহির করা হয়। দুইখানি পাথরের টুকরা পরস্পরের সহিত ঠুকিলে যে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয় তাহা বহুকাল পূর্ব্বে জানা ছিল। এই ভাবে উৎপাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা সহজদাহ্য পদার্থে অগ্নিশিখা সঞ্চার করা হইত। এইরূপ দেখা যাইত যে, সকল প্রকার পাথর হইতেই ঘর্ষণে সমভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয় না। Flint বা চকমকি শ্রেণীর পাথর হইতে অতি সহজে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়। পাইরাইটিস্ (pyrities) শ্রেণীর পাথর এই প্রয়োজনে অধিকতর উপযোগী। পাইরাইট্ পাথর সাধারণতঃ গন্ধক ও লোহার যৌগিক পদার্থ (রসায়ন শাস্ত্রে ফেরাস সাল্‌ফাইড বলিয়া পরিচিত)। পাইরাইট্ শব্দটি গ্রীক ভাষার 'অগ্নি' হইতে গৃহীত ও ইংরেজি pyre (চিতা, জলন্ত চুল্লী) শব্দের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এইরূপ শ্রুতি আছে যে, প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্ব্বে বেলজিয়ামে প্রতি ঘরে ঘরে পাইরাইট পাওয়া যাইত। ইহা হইতে মনে হয় যে, উক্ত প্রদেশে ঐ সময়কার অধিবাসীরা পাইরাইট হইতে অগ্নি নির্গম করিতে জানিত। প্রস্তর (Stone Age) ও ব্রোঞ্জ যুগে (Bronze Age) পাথরে পাথরে ঠুকিয়া আগুন বাহির করিবার কৌশল জানা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সুইডেনের অন্তর্গত গুলরুন্ (Gullrun) নগরে একটি বাসগৃহে কয়েকখানি পাইরাইট পাথর পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ গৃহখানিকে প্রস্তরযুগে নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক আবিষ্কৃত আবাস-গৃহে পাইরাইট প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

লোহা আবিষ্কারের পর (Iron Age) দুই টুকরা পাইরাইট-এর পরিবর্ত্তে এক টুকরা পাইরাইট ও এক খণ্ড ইস্পাত অগ্নিনিষ্কাষণে ব্যবহৃত হইত। লোহা ও ফ্লিণ্টের সাহায্যে অগ্ন্যুৎপাদন সমস্ত সভ্য জগতে অতি অল্পদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। লোহা ও ফ্লিণ্টের এইরূপ ব্যবহারের জন্য উভয়কে ফায়ার-ষ্টোন (fire stone) বলা হইত।

* কঠিন প্রস্তর যখন একখণ্ড ইস্পাত বা পাইরাইটের সহিত ঘর্ষিত হয় তখন পাইরাইটের কিয়দংশ (flake) বিচ্যুত হয় ও ঘাতপ্রসূত তাপের দ্বারা ঐ বিচ্যুত অংশ বহ্নিমান হইয়া উঠে। এই হেতু পাইরাইট অপেক্ষা ইস্পাত বা লৌহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত, কারণ ধাতুর টুকরা জলন্ত হইলে বায়ুর অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে ঐ টুকরার অগ্নিময় বা জলন্ত অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে এবং অক্সিজেন গ্যাস লৌহকণার জলন্ত অবস্থা স্থায়ী করার দরুণ রাসায়নিক ক্রিয়া হেতু (oxidation) তাপও উদ্গত হয়। এ কথা কিন্তু পাইরাইটের পক্ষেও প্রযুজ্য। যখন আঘাত দ্বারা উত্তপ্ত হয় তখন ইহার অঙ্গীভূত অর্দ্ধেক পরিমাণ গন্ধক মুক্ত অবস্থায় নির্গত হয় ও মুক্ত গন্ধক বায়ুর সাহায্যে জ্বলিতে থাকে এবং অপরার্দ্ধ যৌগিক "লৌহ-গন্ধক" (ferric sulphide) অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে দগ্ধ হইয়া অক্সিডাইস্‌ড(oxidised) হীরাকষে (ferrous sulphate) পরিণত হয়। এই জলন্ত কণাগুলি শুষ্ক ঘাস, খড় বা সহজদাহ্য কাষ্ঠখণ্ডের (tinder) উপর নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি-শিখার উৎপত্তি হয়। অনেক সময় কাগজ বা কাপড়ের টুকরা এইভাবে অগ্নি উৎপাদনে ব্যবহৃত হইত ও এইরূপে জলন্ত কাপড় বা অপর বস্তু হইতে অন্যান্য পদার্থে অগ্নি সঞ্চার করা হইত।

অগ্নি উৎপাদনে উক্ত প্রণালীগুলি শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ও ঘনঘন অগ্ন্যুৎপাদন এইভাবে কষ্টসাধ্য বলিয়া অনেকে চব্বিশ ঘণ্টা গৃহে অগ্নি জলন্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিত।

অধুনা আবিষ্কৃত সিগার-লাইটার (cigar-lighter) ও প্রাচীন ফায়ার-ষ্ট্রাইকার (fire-striker) প্রায় অনুরূপ। যে দেশে দেয়াশলাই-এর দাম শুল্ক হেতু মহার্ঘ্য, সেই দেশে ইহার বহুল প্রচলন দেখা যায়। সিগার-লাইটার-এর প্রস্তুত-প্রণালী অতি সরল। এই সরল চুরুট-পাবক একখণ্ড ক্ষুদ্র সীরিয়ম(cerium) ধাতু মিশ্রিত লৌহে নির্ম্মিত। সীরিয়াম মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ধাতু। এই সীরিয়মযুক্ত লৌহখণ্ডটি একটি ডালাসহ আধারে রক্ষিত থাকে। অসরল একখানি চাক্তির দ্বারা যদি ঐ সীরিয়ম-মিশ্রিত লৌহখণ্ডটিকে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে সহজেই উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া উক্ত আধারের কাছে রক্ষিত পলিতায় অগ্নি সমর্পণ করিবে। সাধারণত পলিতাটি পেট্রল বা এইরূপ খুব সহজদাহ্য

পদার্থে ভিজাইয়া রাখা হয়, যাহাতে অতি শীঘ্র ইহা জ্বলিতে পারে। চুরুট-পাবকের গর্ভে ধাতু, চাক্তি ও পলিতা এরূপ সুনিপুণভাবে সমাবিষ্ট থাকে যে, অগ্নি উৎপাদনে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।

এই প্রকার সীরিয়ম-লাইটার (cerium-lighter) গ্যাস ও পেট্রোল-এর বাতি জ্বালিতে ব্যবহার হয়। ছেলেদের খেলনার জন্য বাজারে যে রঙীন আলোক বিচ্ছুরিত এক রকম চকমকির চাকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও সীরিয়ম ব্যবহার করা হয়। ঐ খেলনায় এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, চাকার বিভিন্ন স্থানে সীরিয়ম ধাতুর গুঁড়া আঁটিয়া দেওয়া হয় ও মধ্যভাগে একখানি ক্ষুদ্র ফ্লিন্ট পাথর এরূপ ভাবে রাখা থাকে যে, চাকাটি যখন হাতলের সাহায্যে ঘুরান হয়, তখন সীরিয়ম-যুক্ত স্থানগুলি চকমকি বা ফ্লিন্টের আঘাতে ঘর্ষিত হয় ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। অগ্নি-নির্গমের স্থানগুলির উপর বিভিন্ন রং-এর কাঁচ বা অভ্র আঁটিয়া দেওয়া হয় বলিয়া বাহির হইতে নানা বর্ণের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন গ্যাস-এর আবিষ্কারের পর ইহাকে অগ্নি-উৎপাদক হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল। একটি ঘণ্টাকৃতি কাঁচের আধারে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া ঐ আধারটির মুখ একটি নলের সহিত যোগ করিয়া ঐ নলের মুখে একটি টিপকল আঁটিয়া দেওয়া হইত। ঐ টিপকল একটু আল্গা করিলে কাঁচের আধার হইতে গ্যাসের স্রোত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতে থাকে। এখন যদি এই হাইড্রোজেন গ্যাসের স্রোতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ যন্ত্র সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে একেবারে উপযোগী নয়, পরন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও বিপজ্জনক।

অগ্নি উৎপাদনের জন্য আর এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা নিউম্যাটিক্ টিন্ডার-বক্স (pneumatic tinder box) নামে পরিচিত। একটি দুই-দিক-খোলা কাঁচের নলের ভিতরে একটি ছোট পিষ্টন (piston) লাগান থাকে ও পিষ্টনটির সহিত একটি সরু হাতল যুক্ত থাকে, যাহাতে পিষ্টনটি নলের ভিতরে সুবিধামত সহজে চালান যাইতে পারে। পিষ্টনটির অধোভাগ সর্ব্বদা তৈলসিক্ত করিয়া রাখা হয়। হাতলের সাহায্যে পিষ্টনটিকে নলের নিম্নভাগে ঘনঘন জোরের সহিত উপর-নীচ গতিতে চালাইলে নলের ভিতরকার বায়ু সমধিক সঙ্কুচিত হয় ও এই স্থান সঙ্কোচনের ফলে সমুচিত উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এখন পিষ্টনের নিম্নভাগে যদি এক টুকরা কাপড় বা অপর কোন সহজদাহ্য বস্তু রাখা হয়, তাহা হইলে পিষ্টনটি কয়েকবার চালাইলেই দাহ্যবস্তু সহজেই জ্বলিয়া উঠে ও আগুনের শিখা গন্ধকযুক্ত কাঠির সাহায্যে সহজেই স্থানান্তরিত করা চলে। এখনও এইরূপ টিনডার-বক্স পদার্থ-বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্রদের বায়ুর সহিত তাপের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে কয়েকটি প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটি সাধারণের ব্যবহারোপযোগী মোটেই নয়। সাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক চান্‌সেল (Chancel) কেমিক্যাল লাইটার (chemical lighter) নামে একটি অগ্নি উৎপাদনের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চানসেল-এর প্রণালীর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর। ক্লোরেট অফ পটাস (potassium chlorate) সালফিউরিক এসিডের (sulphuric acid) সহিত মিশাইলে ক্লোরাস এসিড (chlorous acid) নামক একপ্রকার বিস্ফোরণশীল এসিডের অম্ল উৎপন্ন হয়। এই এসিড দ্বারা সহজে অন্য বস্তুতে অক্সিজেন গ্যাসের ক্রিয়া সম্ভব। ক্লোরাস এসিড অতি সহজেই কয়লার গুঁড়া, গন্ধক, চিনি প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের জ্বালাইতে সমর্থ হয়। চানসেল-এর প্রণালী কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে প্রথমে পাতলা কাঠের কাঠি প্রস্তুত করিয়া তাহার এক প্রান্তভাগে পোটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনির গুঁড়া ও গন্ধক আঠার সাহায্যে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পোটাসিয়াম ক্লোরেট ও চিনির গুঁড়ার মিশ্রণ পাবক (ignitor) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যবহারের জন্য অ্যাসবেস্টস্-(asbestos)-যুক্ত একটি আধারে রক্ষিত সাল-ফিউরিক এসিডে কাঠির মাথার বারুদ ডুবাইতে হয়। বারুদ-যুক্ত কাঠিটি সালফিউরিক এসিডের সংস্পর্শে আসিলে প্রথমে চিনি জ্বলিয়া উঠে ও পরে আগুন চিনি হইতে গন্ধকে সঞ্চারিত হয় ও সমুচিত উত্তাপের সৃষ্টি হইলে কাঠিটি জ্বলিয়া উঠে। ইহাই হইল আধুনিক দেয়াশলাইয়ের প্রথম সূত্রপাত। এই প্রকার দেয়াশলাই অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা সহরে ট্রিভেন্নি (Trevenny) নামে একজন বৈজ্ঞানিক অপর এক প্রকার দেয়াশলাই প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রাণালীতে প্রস্তুত দেয়াশলাই কনগ্রিভের ষ্ট্রাইকার-ষ্টিক (Congreve's striker stick) বলিয়া অভিহিত হইত। এই দেয়াশলাইয়ের কাঠির অগ্রভাগ প্রথমে গন্ধকের প্রলেপ দিয়া তাহার উপর পটেসিয়াম ক্লোরেট ও মোমছাল (antimony sulphide) মিশ্রিত করিয়া দাহকরূপে গঁদের সাহায্যে উহাতে অনুলেপন করা হইত। এই প্রকার বারুদযুক্ত কাষ্ঠশলাকা শিরীষ কাগজের (sand paper) উপর ঘর্ষিত হইলে সহজেই জ্বলিয়া উঠিত। এইপ্রকার দেয়াশলাইয়ের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, শিরীষ কাগজের উপর ঘষিবার সময় কাঠির মুড়াটি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যাইত; এবং এই হেতু এইপ্রকার দেয়াশলাইয়ের স্থান অধুনা-ব্যবহৃত ফস্‌ফরাস-(phosphorus)-যুক্ত দেয়াশলাই অধিকার করিয়াছে।

জার্ম্মানীর হামবুর্গ নগরে ব্রাণ্ড (Brand) নামক একজন ব্যবসায়ী ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা-কালীন ফস্‌ফরাস আবিষ্কার করেন। তাহার আবিষ্কারের সংবাদ তিনি একেবারে গোপনে রাখেন। পরীক্ষাকালে ব্রাণ্ড বক-যন্ত্রের(retort) ভিতর হরিদ্রাভ একপ্রকার ঘোলাটে অৰ্দ্ধ-স্বচ্ছ পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত দ্রব্য দেখিতে পান। এই দ্রব্য অন্ধকারে জোনাকি পোকার মত জ্বলিতে থাকে। এই কারণে ব্রাণ্ড এই বস্তুর ফস্‌ফরাস লাইট-বিয়ারার (Phosphorus light-bearer) নামকরণ করেন। ফস্‌ফরাস শুষ্ক অবস্থায় আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে ও ইহা হইতে ধূসর বর্ণের গাঢ় ধূম নির্গত হইতে থাকে। ফস্‌ফরাসের আবিষ্কারের সংবাদ প্রচার হইলে এই পদার্থ মহার্ঘ্যমূল্যে বিক্রয় হইতে থাকে। এই উপায়ে ব্রাণ্ড প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ব্রাণ্ডের আবিষ্কারের পর অবিরাম চেষ্টার ফলে অপরাপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ইঁহাদের মধ্যে কুন্‌কেল [Kunkel, (১৬৭৬ খ্রীঃ)] লর্ড রবার্ট বয়েল্‌ [Lord Robert Boyle, (১৬৮১ খ্রীঃ)] ও ঘান [Ghan, (১৭৭৯ খ্রীঃ)] ইত্যাদি কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। পরে জানিতে পারা যায় যে, প্রাণীর তন্তু ও অস্থে ফস্‌ফরাস্‌ বর্ত্তমান আছে। ব্রাণ্ড মূত্র হইতে ও ঘান্‌ প্রাণীর অস্থি হইতে ফস্‌ফরাস্‌ আবিষ্কার করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে Schele (শেলে) দগ্ধ অস্থিভস্ম হইতে ফস্‌ফরাস্‌ প্রস্তুতের একটি প্রণালী আবিষ্কার করেন ও শেলের প্রণালী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ফস্‌ফরাস্‌ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। অস্থিভস্মে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট্‌ (calcium phosphate) বর্ত্তমান আছে। শেলে এই অস্থি-ভস্ম সালফিউরিক এসিডের দ্বারা জারিত (treated) করিয়া এসিড ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটে (acid calcium phosphate) পরিণত করেন। শেষোক্ত পদার্থ যখন কয়লার গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বকযন্ত্রে উত্তপ্ত করা হয়, তখন ফস্‌ফরাস্‌ বাষ্পের আকারে বকযন্ত্রের নল হইতে নির্গত হইয়া শীতল জলের সংস্পর্শে জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়।

ফস্‌ফরাস্‌ যখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন ইহাকে দেয়াশলাই নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহার করিবার চেষ্টা সুরু হইল। প্রথমে ফস্‌ফরাস্‌কে শোধিত অবস্থায় পাইতে অল্লাধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে এই অসুবিধা দূর করিতে বৈজ্ঞানিকগণ সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফস্‌ফরাস্‌যুক্ত দেয়াশলাই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে প্রস্তুত করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডেরোস্যু (Derosue)। পরে এই দেয়াশলাই-শিল্প লুড্‌ভিগ্‌সবুর্গ (Ludwigsburg) নগরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বৃহদায়তনে আরম্ভ করেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ক্রামারার (Krammerer)। প্রায় একই সময়ে ইংলণ্ডে জন ওয়েকার (John Waker) নামে জনৈক চিকিৎসক দেয়াশলাই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে দেয়াশলাই কাঠির অগ্রভাগে পটাসিয়াম ক্লোরেট বা ফস্‌ফরাস্‌ গঁদের সাহায্যে লাগান হইত। পরে দেখা যায় যে, এইরূপ শলাকা ব্যবহারের সময় অত্যন্ত শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দু গায়ে পড়িতে থাকে। জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দুর নির্গমন নিবারণকল্পে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বোয়েটিগার (Boettiger) কাঠির মাথায় পটাসিয়াম ক্লোরেট ও লেড্‌ নাইট্রাইটের (lead nitrite) মিশ্রণ ব্যবহার করেন। ক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর উপযোগী প্রণালীর উদ্ভব হইতে থাকে। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক বোয়েলার (Woehler), যিনি জৈব রসায়নের (organic chemistry) জন্মদাতা বলিয়া খ্যাত, দেয়াশলাই নির্ম্মাণের কয়েকটি প্রণালী বাহির করেন।

ফস্‌ফরাস্‌যুক্ত দেয়াশলাই-শলাকা অনেক বিষয়ে উপযোগী ও সুফলপ্রদ হইলেও ইহার কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেয়াশলাই-শিল্প ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ফস্‌ফরাস্‌ ব্যবহারের যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান অসুবিধা এই যে, ফস্‌ফরাস্‌ অতি শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায় ও ইহা হইতে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে। ইহা ব্যবহারের আর একটি মস্ত অসুবিধা এই যে ইহার জন্য অনেক সময় দেহে বিষের সঞ্চার হয় ও দেয়াশলাই-কারখানার কারিগরগণ ফস্‌ফরাস্‌ নেক্রোসিস্‌ (phosphorus necrosis) নামক রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে প্রথমে চোয়ালের অস্থি ও দাঁতের মাড়ি আক্রান্ত হয়।

ফস্‌ফরাসের বিষ দূর করিয়া দেয়াশলাই-শিল্পকে নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক শ্রোটেন (Schrotten)। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্রাভ ফস্‌ফরাসকে (yellow phosphorus) বন্ধ কাঁচের আধারে ২৬০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া স্ক্রোটেন ফস্‌ফরাসের বর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। এই প্রণালীতে যে কেবল ফস্‌ফরাসের বর্ণ হরিদ্রাভ হইতে লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফস্‌ফরাসের বিষ সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ ফস্‌ফরাসে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তবে ইহাও দেখা যায় যে, লোহিত ফস্‌ফরাস্‌ হরিদ্রাভ ফস্‌ফরাস্‌ হইতে অনেক গুণ কম জোরাল ও খুব সত্বর ইহা জ্বলিয়া উঠে না।

দেখা যাইতেছে যে, দেয়াশলাই শিল্পের ক্রমবিকাশ ফস্‌ফরাসের গুণ-গবেষণার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিষাক্ত দোষ বর্জ্জিত লোহিত ফস্‌ফরাসের আবিষ্কারের পর ইহাকে দেয়াশলাই-শিল্পের জন্য কার্য্যোপযোগী করার চেষ্টা হয়। লোহিত ফস্‌ফরাস্‌ হরিদ্রাভ ফস্‌ফরাস্‌ হইতে স্বল্পদাহ্যগুণসম্পন্ন বলিয়া পটাসিয়ম ক্লোরেটের সহিত মিশ্রিত করিয়া শলাকার অগ্রভাগে ব্যবহার করার যথেষ্ট অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় ও সত্বর ঘর্ষণে ইহা জ্বলিয়া উঠে না। এই বাধা দূর করেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট নিবাসী বোয়েটগার নামে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বোয়েটগার লোহিত ফস্‌ফরাসকে শলাকামুণ্ডে ব্যবহার না করিয়া দেয়াশলাইয়ের বাক্সের পার্শ্বদেশে (যেখানে শলাকা ঘর্ষিত হয়) প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করেন। বোয়েটিগারের বিধানমতে দেয়াশলাই-শলাকার মুণ্ডভাগ পটাসিয়ম ক্লোরেট ও অ্যান্টিমনি সালফাইড-এর মিশ্রণ গুড়েতে চর্চ্চিত হইত ও বাক্সের দুই পার্শ্বে রেড ফস্‌ফরাস ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশ্র চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দেওয়া হইত। এই প্রকার দেয়াশলাইকে নিরাপদ বা সেফটি ম্যাচ (safety match) বলা হয়।

অধুনা সাবেকমতে প্রস্তুত দেয়াশলাইয়ের ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে অনেকে ঘষা দেয়াশালাই (friction match) বেশী পছন্দ করেন এই কারণে যে, উক্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি যে-কোন বন্ধুর স্থানে ঘষিয়া জ্বালাইতে পারা যায়। ঘষা দেয়াশলাইয়ের মত যাহাতে ফস্‌ফরাস্‌ দেয়াশলাইয়ের কাঠি যে-কোন স্থানে ঘষিয়া জ্বালাইতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে ফস্‌ফরাস্‌যুক্ত দেয়াশলাইয়ের প্রস্তুত-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হয়। ফস্‌ফরাস্‌ দেয়াশলাইকে ঐরূপে উপযোগী করিতে হইলে শলাকামুণ্ডে ফস্‌ফরাসের পরিবর্ত্তে ফসফরাস, সালফাইড, পটাসিয়ম্‌ ক্লোরেট ও অ্যান্টিমনি সালফাইড ব্যবহৃত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত দেয়াশলাই অনেকাংশে নিরাপদ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন-এ সেভেনে (Sevene) ও কাহেন (Cahen) বেলজিয়মে এই প্রণালী আবিষ্কার করেন এই প্রণালীতে প্রস্তুত দেয়াশলাইয়ে বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

সুইডেনে দেয়াশলাই-শিল্প অতি প্রয়োজনীয় শিল্প বলিয়া গণ্য হয়। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সুইডেন এই ব্যবসায়-জগতে প্রায় একচেটিয়া করিয়াছে। ইহার মূলে ছিলেন দেয়াশলাই-শিল্পের সম্রাট ক্রুগার (Krueger), যাঁহার আত্মহত্যার-কাহিনী অল্পদিন পূর্ব্বে সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শিল্পের কাঁচামাল (raw material) বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াও সুইডেন এই ব্যবসায়ে অন্যান্য দেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। এমন কি ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে কারখানা স্থাপন করিয়া দেয়াশলাইয়ের ব্যবসায় চালাইতেছে। সুইডেনের দেয়াশলাই-ব্যবসায়ীগণ দেয়াশলাইয়ের কাঠি ও

বাক্সের জন্য রুসিয়া হইতে এ্যাসপেন (aspen) কাঠ ও জার্ম্মানী হইতে পটাসিয়ম ক্লোরেট আমদানী করে। তবে অল্প দিন হইল পটাস ক্লোরেট সুইডেনে প্রস্তুত হইতেছে।

দেয়াশলাই-শিল্প যে কেবল সুইডেন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা নহে। এ বিষয়ে জাপানও সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ও অপর দেশ হইতে অনেক অল্পমূল্যে দেয়াশলাই বিক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশেও দেয়াশলাই শিল্প অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে ও দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সেফটি-ম্যাচ বা নিরাপদ দেয়াশলাইয়ের কথা বলা হইয়াছে, অধুনা ক্রমে ক্রমে তাহার আরো উন্নতি সাধিত হইতেছে। যাহাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ভালভাবে ও অধিকক্ষণ জ্বলিতে পারে তাহার জন্য শলাকাগুলিকে উত্তপ্ত প্লেটের উপর রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয় ও পরে কাঠির উপর মোমের (paraffin) প্রলেপ পরে শলাকামুণ্ডে বারুদ লাগান হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত কাঠি সহজে নির্ব্বাপিত হয় না বা মুণ্ড সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। সাধারণত শলাকার বারুদের জন্য এই কয়টি বস্তুর মিশ্রচূর্ণ ব্যবহৃত হয়, যথা— পটাসিয়াম ক্লোরেট, এ্যান্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়ম বাই ক্রোমেট ও ম্যাঙ্গ্যানিজ ডাইঅক্সাইড। এই সকলের চূর্ণের সংমিশ্রণ গঁদের সাহায্যে কাঠির মাথায় লাগান হয়। কখনও বা রেড লেড (red lead) কয়লার গুঁড়া অথবা গন্ধক ব্যবহৃত হয়। বাক্সের পার্শ্বদেশে রেড ফস্‌ফরাস্ ও অ্যান্টিমনি সালফাইড, মধ্যে মধ্যে কাঁচের গুঁড়া ও আইরণ সালফাইডের (ঘর্ষণে সাহায্যের জন্য) প্রলেপ দেওয়া হয়।

সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, দেয়াশলাই জ্বলিলে জ্বলন্ত মুণ্ডটি খসিয়া গায়ে পড়ে অথবা পরিধেয় বস্ত্রাদির উপর পড়িয়া অগ্ন্যুৎপাত করে। ইহা নিবারণের জন্য কাঠিগুলিকে ফিটকিরি (alum), ম্যাগনেসিয়ম্, সোডিয়ম ফস্‌ফেট্ বা অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, ইহাদের যে কোন একটি পদার্থকে জলে দ্রব করিয়া, তাহাতে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তুত কাঠিগুলির দহনশক্তি কমিয়া যায়। বারুদ জ্বলিলেও কাঠিগুলি একেবারে পুড়িতে কিছু বেশী সময় লয় ও কাঠির মুণ্ডভাগ সত্বর খসিয়া পড়ে না। কাঠিগুলি দগ্ধ হইলেও অঙ্গারীভূত শলাকা ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এই প্রণালীতে কাঠিগুলি উক্তপ্রকার লবণের জলে ভিজিয়া দ্রবীভূত হয়। এই প্রণালীকে ইমপ্রেগ্‌নেশন্ (impregnation) বলে ও এই প্রকার দেয়াশলাইকে ইমপ্রেগ্‌নেটেড ম্যাচ (impregnated match) বলা হয়।

এই প্রবন্ধে কি ভাবে ক্রমে ক্রমে নিজের ইচ্ছামত অগ্নি উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেয়াশলাইয়ের জন্মকথা ও ক্রমোন্নতি আলোচিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে অগ্নি ও উত্তাপ কতভাবে ও কতরূপে যন্ত্রজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিবৃতি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবযুগ আসে বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকৃত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলচে, এখনও তার শেষ হয়নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে আমরা স্বাধীনতা পাব না, কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্য বস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলচেন যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সঙ্কোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ ব'লে দেখতে না পারার মতো এত বড় সর্ব্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে-মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক্, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য ক'রে গ্রহণ করতে পারি।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়ের কয়েকখানি উড-কাটের প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হইল। শিল্পীর বয়ঃক্রম মাত্র তেইশ। এই তরুণ বয়সেই তিনি শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট (কলিকাতা) হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করিয়া এন্‌গ্রেভিং-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তাঁহার উড-কাটের প্রশংসা বহু সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভাইসরয় তাঁহার রঙিন উড-কাটের প্রতিলিপি দেখিয়া প্রশংসালিপি পাঠাইয়াছেন।

আমরা এই তরুণ শিল্পীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।]

শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়।
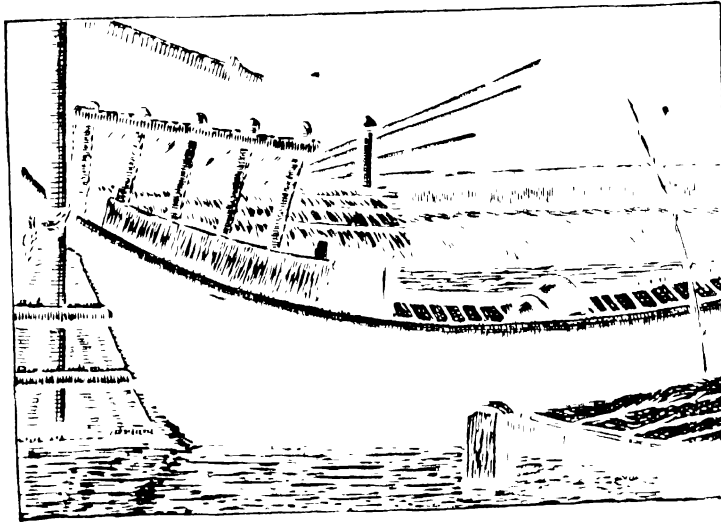
খেয়া-নৌকা।

ইডেন গার্ডেন হইতে কলিকাতা হাইকোর্ট।

বিশ্রাম।

বন্দী স্বপ্ন।

বিকাশ।

সম্পাদকীয়

দেশের কথার আলোচনায় বিপত্তি ও আমাদের লক্ষ্য

আমাদের "বঙ্গশ্রী"র বয়স ১ বৎসর ১১ মাস। দেশের কথা বলিবার জন্য "বঙ্গশ্রী"র সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ-কাল আমরা বস্তুতঃ দেশের কথা ছাড়া অনেক কিছুই বলিয়াছি ; দেশের কথাই বলিতে পারি নাই।

বর্ত্তমানে দেশের কথা বলিতে গেলে অনেক বিপদ বরণ করিতে হইতে পারে, আমাদের এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। দেশের সকলে মিলিত হইয়া একমাত্র দেশকে লক্ষ্য করিয়া, দেশের কোনও অভাব আছে কি না, থাকিলে কি অভাব আছে, অভাবের কারণ কি, কি করিলে অভাব দূর হয়, অভাব দূর করিবার মত কাজ করিবার সামর্থ্য কিসে অর্জ্জন করা যায়, এই ধরণের চিন্তার স্রোত দেশে প্রবাহমান থাকিলে দেশের কথায় কোন বিপত্তি থাকে না।

আমাদের মনে হয়, দেশের অবস্থা যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন চিন্তায় আমাদের ঐক্য নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের শতকরা ৯৩ জন লোক কোন চিন্তার ধার ধারে না ; অথচ তাহারা অর্দ্ধাশন ও অর্দ্ধবসন-ক্লিষ্ট। কাজেই বলিতে হয়, দেশের কোনও চিন্তায়, আমাদের পূরা দেশকে পাইবার আশা নাই। খুব বেশী হইলে একশত ভাগের সাত ভাগ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ভিতরেও নানা রকমের দলাদলি এবং দলের সংখ্যাও বহু।

সম্প্রতি কার্য্যতঃ আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দল হইয়া দাঁড়াইয়াছে গভর্ণমেণ্টের। গভর্ণমেণ্টের বিরোধী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের দল যে কয়টি তাহা বলা বড় শক্ত। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের বিরোধ। গভর্ণমেণ্টের কথার তবু কতক মূল মনোবৃত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, যথা, দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখ, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন কর, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম কর, ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্টের বিরোধী দলের কাহার কথার যে কি মূলনীতি তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ যখন এত প্রকট, তখন দেশের কথা বলিতে যাওয়ার অর্থ—কোন না কোন দলের অপ্রিয় হওয়া। উপরোক্ত যুক্তিতে দেশের সম্বন্ধে কিছু না বলাই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

অথচ আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের বেকার অবস্থা, আইন-ব্যবসায়ীগণের ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণের অর্থকৃচ্ছ্রতা, আমাদের কৃষকগণের চাষের উপর আস্থাহীনতা, ক্রেতাগণের দারিদ্র্যের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী দুরবস্থা ইত্যাদির কথা মনে আসিলে চুপ করিয়া থাকাও অসম্ভব। কাজেই, অবস্থা অনুসারে চুপ করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হইলেও, কার্য্যতঃ চুপ করিয়া থাকা যায় না।

গভর্ণমেণ্টের কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া, তাহার আলোচনা করিলে, দেশের লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, আবার গভর্ণমেণ্টের বিরোধী কথার সমর্থন করিলে, গভর্ণমেণ্টের অপ্রিয় হইতে হয়। গভর্ণমেণ্টের বিরোধী কথাও আবার এক রকম নহে—গভর্ণমেণ্টের বিরোধী কথা যত রকম আছে, তাহার প্রত্যেক রকমের অনুসরণকারীও অল্পাধিক আছেন।

দেশের অধিক সংখ্যক লোকের দলান্তর্ভুক্ত হইতে হইলে, বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের দলের সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ বর্ত্তমানে দেখিতেছি গভর্ণমেণ্টের দলই সংখ্যায় বড়। কিন্তু তাহা করিবার বিপত্তি সাধারণের অপ্রিয় হওয়া, ইহা আগেই বলিয়াছি। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমানে দেশের কথা বলিবার প্রকৃষ্ট উপায় (১) দেশীয় লোকের দলাদলি বন্ধ করিবার প্রচেষ্টায় এবং (২) গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে দেশীয় লোকের দলাদলি বন্ধ করিবার প্রচেষ্টায়, অথবা, এক কথায় বলিতে গেলে দেশীয় লোকের সর্ব্বতোভাবে মিলনোপায় সম্বন্ধীয় আলোচনায়। আমাদের দেশ সম্বন্ধীয় আলোচনার বিষয় ইহাই হইবে।

বস্তুতঃ 'জাতি' শব্দটি মিলনাত্মক বিশেষ্য (collective noun)। আমরা যে একটি জাতির অংশভুক্ত তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, মিলনকে মূল মন্ত্র করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে কি? আমাদের মুখে 'মিলনে'র কথা

থাকিলেও কার্য্যতঃ 'মিলন' না ঘটিয়া যদি দলাদলি ঘটে, তাহা হইলে, আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নাই কি ?

সর্ব্বতোভাবে 'মিলনে'র কথা কহিতে গেলে, 'মিলন' কেন হয় না, তাহার বিচারের প্রয়োজন হয়। হয়ত তাহাতে কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ সমালোচনা আসিয়া পড়িবে। আমরা কাহাকেও অযথা ছোট প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন কথা কহিব না। যদি কোন বিরুদ্ধ কথা আসিয়া পড়ে, তাহার মূলে থাকিবে 'অমিলনে'র কারণ নির্ণয় ও 'মিলনে'র উপায় নির্দ্ধারণ। কাজেই, গভর্ণমেণ্ট হউন অথবা দেশীয় লোক হউন, কাহারও পক্ষে, আমাদের কথা অপ্রিয় হইলে, আমরা ক্ষমার্হ।

গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় লোকের দলাদলি বন্ধের প্রচেষ্টা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সকলের প্রীতিকর হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঐ সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যের চেষ্টায় নূতন দল সৃষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। মিলনের চেষ্টায় নূতন অমিল অথবা দলাদলির সংখ্যা বাড়াইয়া তোলা অসঙ্গত এবং তাহা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। অথচ আমরা যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকে মিলিত হইয়া একটি "ভারতবাসী জাতি" গঠিত করিতে হইলে এবং এই নাম সার্থক করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলনের প্রয়োজন আছে। আমাদের মতে গভর্ণমেণ্টের সহিত ঝগড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হইলে আমাদের নিজেদের ভিতর মিলন দৃঢ়মূল হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস আংশিকরূপে এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে কংগ্রেসের নীতি অনুসরণকারীগণের মধ্যে মতের পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কাজেই আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইব। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলনের কথায় নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে এবং আমরা দেশীয় লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইতেছি তাহা হইলে আমরা আমাদের আলোচনার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিব।

ভারতবাসীর মিলন হয় না কেন ?

আমাদের কংগ্রেসের বয়স হইয়াছে উনপঞ্চাশ বৎসর। আমরা আমাদের গভর্ণমেণ্ট অথবা জগতের সামনে সমস্ত ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নানারূপ দাবীর কথা উপস্থিত করিয়াছি; কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশীয় ভাষায় সমস্ত ভারতবাসীর জাতিবাচক কোন একটি শব্দের বহুল প্রচলন হয় নাই। ইংলণ্ডে "ইংরেজ জাতি", জার্ম্মানীতে "জার্ম্মান জাতি", ফ্রান্সে "ফরাসী জাতি" প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের যেরূপ প্রচলন আছে, ভারতবর্ষে "ভারতবাসী জাতি" এই রূপ কোন শব্দের প্রচলন তাদৃশ হয় নাই।

জাতীয়তার প্রধান উপকরণ 'মিলন'। "ভারতবাসী জাতি" শব্দ সার্থক করিতে হইলে সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর পরস্পরের 'মিলনে'র চেষ্টা অপরিহার্য্য—এই বাস্তব সত্য আমাদের মনে স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত হইলে প্রথমেই বিচার করিবার প্রয়োজন হয়, আমাদের 'মিলন' হয় না কেন, অথবা আমরা নিজেদের মধ্যে নানা রকমে ঝগড়া করি কেন।

মিলন কেন হয় না তাহা সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে মিলন সম্বন্ধে প্রকৃতির খেলা কি তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হয়; এবং তাহার পর দেখিতে হয় আমাদের অমিলনের চেহারায় মূলতঃ কি আছে।

'প্রকৃতির খেলা'র মূলেই যদি 'অমিলন' থাকে তাহা হইলে মিলনের চেষ্টার অপর নাম হয় প্রকৃতির বিরোধিতা করা এবং তাহা না করাই কর্ত্তব্য, কারণ প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া কখনও কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না। রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তারের মূল সূত্র প্রকৃতির সহায়তা করা, এঞ্জিনিয়ার তাহার যাবতীয় কার্য্যে প্রকৃতির বিরোধিতা করিতে ভয় পান। যে কোন কার্য্য-পন্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রকৃতির সহায়তা করিয়া চলার কার্য্য সহজ ও সরল হয় এবং তাহাতে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে। আর জটিল ও বিশৃঙ্খল কার্য্যের মূলে প্রকৃতির সহিত বিরোধিতার নিদর্শন বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই 'মিলন' প্রকৃতির খেলার বিরোধী হইলে মিলনোপায়ের চিন্তা ও কথা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

এখন দেখা যাউক, আমরা প্রকৃতির খেলায় মিলন কি অমিলন দেখিতে পাই। 'প্রকৃতি' বলিতে আমরা বুঝি জগতের যাবতীয় জিনিষের প্রসবিতা অযুগ্ম উপাদান (element)। আমরা যত কিছু জিনিষ দেখিতে পাই সমস্তই যুগ্ম (compound)। যুগ্ম জিনিষ থাকিলেই তাহার ভিতর অযুগ্ম কিছু আছে অনুমান করার যৌক্তিকতা পাওয়া যায়।

আমাদের চোখে যখন সমস্ত জিনিষই যুগ্ম, তখন মূল প্রকৃতির স্বভাব অপরের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহার পর মানুষের জীবনটা কি তাহা মোটামুটি পরীক্ষা করিতে বসিলে দেখা যায়, মানুষ মরিয়া গেলে মানুষের অবয়ব ঠিকই পড়িয়া থাকে, অথচ এমন একটা কিছু তাহার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়, যাহার সহিত তাহার অবয়বের মিলনের জন্য মানুষের জীবন, অথবা মানুষের জীবিতাবস্থা।

মানুষের জন্ম—তাহা স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফল। মানুষের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য—তাহাও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত আর একটা কিছুর মিলনের ফল। আমার চোখ আছে, চোখের সামনে একটা কিছু জিনিষ আসিল, অথচ কি আসিল তাহা দেখা হইল না; আমাকে আমার শিক্ষক মহাশয় একটা কিছু উপদেশ দিলেন, আমার কান শুনিয়াও শুনিল না, এই-রূপ ঘটনা আমাদের জীবনে নিতান্ত বিরল নহে। কেন এইরূপ হয়, তাহার জবাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সহিত অপর একটা কিছুর মিলনের অভাব ছাড়া আর কিছু বলিবার উপায় নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মানুষের প্রকৃতির খেলা মিলনে, মানুষের জন্ম মিলনে, মানুষের জীবনের অস্তিত্ব মিলনে, মানুষের অভিব্যক্তি মিলনে। এবং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, 'মিলন' প্রকৃতিবিরুদ্ধ ত নহেই, পরন্তু মিলন ব্যতীত মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না এবং তাহার কোন খেলা সম্ভব নহে। এবং প্রকৃতি তাহাকে মিলনাত্মক জীবন দিয়াছেন। মানুষে মানুষে যে অমিলন ঘটে এবং মানুষের জীবনে যে বিশৃঙ্খলা আসে তাহার মূলে মানুষের কোন ত্রুটি আছে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাক:

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অমিলনের পরিস্ফুট চেহারা কোথায়?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অমিলনের পরিস্ফুট চেহারা কোথায় তাহা দেখিতে হইলে আমাদের বড় বড় দলাদলিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়।

আমাদের দলাদলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

১। হিন্দুর আপনার ভিতর দলাদলি।

হিন্দুর নিজের ভিতর দলাদলি অসংখ্য। তাহার ৩৬ জাতি এবং ১০৮টি সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। আমরা চলতি কথা ব্যবহার করিলাম। গণনায় বোধহয় জাতি ও সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৪৪টি হইতে বেশী ছাড়া কম হইবে না।

২। মুসলমানের আপনার ভিতর দলাদলি।

ভিতরে ভিতরে দলের সংখ্যা দুই একটি থাকিলেও তাহা সাধারণতঃ তত প্রকট নহে। চোখে দেখিতে পাই "আল্লাহো আকবর" উচ্চারণে সকলেই মিলিত।

৩। খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের আপন আপন দলাদলি।

ইহাও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের মত। ভিতরে ভিতরে কি আছে তাহা আমরা জানি না। চোখে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর দলাদলির কোন অস্তিত্ব অনুভূত নহে।

৪। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের দলাদলি।

গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতামতে তাঁহাদের ভিতর পার্থক্যের অস্তিত্ব আছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীগণের কোন দলাদলি আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

৫। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের দলাদলি।

খুব প্রকট, তাহা বাস্তব সত্য।

৬। হিন্দুর সঙ্গে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী-গণের দলাদলি।

সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে দলাদলির বিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও বর্ণাশ্রমী হিন্দুগণের সহিত ইঁহাদের দলাদলি প্রকট।

৭। হিন্দুর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দলাদলি।

খুব প্রকট। বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ।

৮। মুসলমানের সঙ্গে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বীগণের দলাদলি।

এই সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের মুসলমান এবং খৃষ্টানে আভ্যন্তরীণ কোন দলাদলি থাকিলেও তাহা প্রকট নহে।

৯। মুসলমানের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দলাদলি।

হিন্দুকে লইয়া সামান্য সামান্য মতপার্থক্য থাকিলেও

বস্তুতঃ মুসলমানের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন বিরাট দলাদলির নিদর্শন আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না।

১০। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীগণের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের দলাদলি।

ইঁহাদের দলাদলিরও কোন নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে নাই।

১১। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগের সম্মিলিত (যেমন communistদের) দলাদলি।

এই দলাদলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। ইহার বিশ্লেষণ আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে করিব না।

১২। ধনিকের সহিত শ্রমিকের দলাদলি।

ইহাও ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। ইহার আলোচনাও আমরা এই প্রসঙ্গে করিব না।

ভারতবর্ষের দলাদলি সম্বন্ধে উপরোক্ত বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি চিন্তা করিয়া পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দলাদলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রকট হিন্দুর নিজের ভিতর এবং হিন্দুর অপরের সঙ্গে ব্যবহারে।

উপরোক্ত বিবৃতি হইতে আরও প্রকাশ পায় যে, "ভারত-বাসী জাতি" এই শব্দটি সার্থক করিতে হইলে এবং তাহার মূল উপাদান 'মিলন' ইহা হৃদয়াভ্যন্তরে গ্রথিত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন হয়, "হিন্দুর আপনার ভিতর মিলনের চেষ্টা" অথবা "হিন্দুর আপন দলাদলি বন্ধ করিবার চেষ্টা"।

হিন্দুর ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া, কেহ কেহ চলতি ধর্ম্মোপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য, কেহ কেহ হিন্দুর ধর্ম্মোপদেশকে নিখুঁত মোক্ষপন্থা মনে করিয়া তাহার উপদেশ কার্য্যকরী করিবার জন্য, হিন্দুজাতির নব-অভ্যুদয়ের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার নিদর্শন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অসংখ্য বার পাওয়া যায়। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের প্রত্যেক চেষ্টাতেই নূতন নূতন দলের উদ্ভব হইয়াছে এবং হিন্দুজাতি নূতন নূতন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

কাজেই হিন্দুর অভ্যুত্থান অথবা মিলনের চেষ্টা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া কোন কর্ম্মে সফল হয় না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কোন এক শ্রেণীর লোককে মিলিত করিবার চিন্তায় অথবা কর্ম্মে এমন কিছু থাকার প্রয়োজন, যাহাতে উপরোক্ত লোকগুলির প্রত্যেকে কোন রূপে আঘাত প্রাপ্ত না হন এবং প্রত্যেকে পরিতৃপ্তি অনুভব করেন।

হিন্দুর মিলনে এবং হিন্দুজাতি গঠনে, বর্ণাশ্রমীকে প্রয়োজন, উদারচেতা হিন্দুর প্রয়োজন, অস্পৃশ্য জাতিগুলির প্রয়োজন, শৈবের প্রয়োজন, শাক্তের প্রয়োজন, বৈষ্ণবের প্রয়োজন, যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রয়োজন। আবার "ভারতবাসী জাতি" গঠন করিতে হইলে হিন্দুর প্রয়োজন, মুসলমানের প্রয়োজন, শিখের প্রয়োজন, খৃষ্টানের প্রয়োজন, বৌদ্ধের প্রয়োজন, পার্শীর প্রয়োজন, এবং অপর সমস্ত ভারতীয় জাতির প্রয়োজন।

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত গুণসম্বলিত হউন আর নাই হউন, হিন্দু জাতির ভিতর "বর্ণাশ্রমী" আছেন, তাঁহারা মানুষের ভিতর পৃথকত্ব ছাড়া ছোটত্ব বড়ত্ব দেখেন, "অস্পৃশ্যতা" তাঁহাদের বিবেচনায় ধর্ম্মের অংশসম্ভূত। বর্ণাশ্রমী আমাদের প্রিয় হউন অথবা অপ্রিয় হউন, তাঁহারা হিন্দুজাতির একটা অংশ। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুজাতি গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নহে।

অথচ মানুষে মানুষে অস্পৃশ্যতা অস্বাভাবিক এবং মানুষের প্রকৃতির বিরোধী, তাহাও দার্শনিক সত্য। অস্পৃশ্যতার জীবন্ত অস্তিত্বকে অনুমোদন করা—মানুষের প্রকৃতির বিরোধিতামূলক একটা ঘোর নির্য্যাতনকে অনুমোদন করার অন্য নাম এবং তাহাতে জাতিকে তাহার একটা প্রকাণ্ড অংশ হইতে বিচ্যুত করিয়া আংশিক জাতিরূপে পরিবর্ত্তিত করা হয়, তাহাও বাস্তব সত্য।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু "অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন"কে মূল বিষয় করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেই, "বর্ণাশ্রমী"র বিদ্রোহ করা স্বাভাবিক এবং তাঁহাদিগকে বাদ দিলে হিন্দুজাতি অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

অধিকন্তু, দেশের কৃষ্টির তারতম্যানুসারে লোকের পৃথকত্ব থাকিবেই এবং আছে এবং বর্ণাশ্রমী দলের পরিপুষ্টি সাধনের লোকসংখ্যারও অভাব হইতেছে না এবং হইবে না। এ জাতীয় আন্দোলনে ঝগড়া ও দলাদলির বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই সমস্ত লোককে মিলিত করিয়া একটা জাতিগঠনের চিন্তায় ও কর্ম্মে যে এমন কিছু থাকার প্রয়োজন, যাহাতে উপরোক্ত লোকগুলির প্রত্যেকে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হন এবং প্রত্যেকে পরিতৃপ্তি অনুভব করেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই এমন 'কিছুটা' কি যাহাতে কাহারও প্রতি আঘাত না আসে এবং প্রত্যেকে পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির নাম করিতে পারা যায়:—

১। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা।

২। ঝগড়ার প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া এবং সর্ব্বতোভাবে সকলের সহিত মিলন-পন্থা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা।

৩। ভারতবর্ষের প্রত্যেক পিতামাতার নিকট প্রত্যেক বালক এবং প্রত্যেক শিক্ষালয়ে প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে "মানুষের প্রকৃতি কি", "মানুষের তারতম্য হয় কেন", "মানুষের বুদ্ধি কাহাকে বলে", "মানুষের বুদ্ধি কি করিয়া বাড়াইতে হয়" তদ্বিষয়ে শিক্ষা তাহাদের নিজ নিজ বয়সের সমঞ্জসীভূত পরিমাণে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম ভাগে "জনৈক অর্থনীতির ছাত্র" লিখিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি আমাদের পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে "প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ন সংস্থানের চেষ্টা" প্রভৃতি উপরোক্ত তিনটি কার্য্য সম্বন্ধীয় চিন্তা-যোগ্য কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। এই চিন্তাগুলি কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহাও উক্ত মূল প্রবন্ধের আলোচনায় সন্নিবেশিত হইবে।

উপসংহারে আমরা মহাত্মা গান্ধীর মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি। মহাত্মার চিন্তায় কি কি আছে তাহা আমরা ঠিক জানি না; তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতির সহিত আমাদের চিন্তাপ্রসূত কার্য্য-পদ্ধতির পার্থক্য আছে তাহা সত্য। কিন্তু আমরা তাঁহার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান নই। ভারতবর্ষে আজ তাঁহার মত বিরাট পুরুষ আমাদের চোখে আর একজনও নাই। তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হওয়া ভারতবর্ষের সৌভাগ্যের নিদর্শন। বর্ত্তমানে তাঁহার পরিচালনা বিহনে ভারতবর্ষের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিতে শিহরিয়া উঠি।

মস্তিষ্ক-শক্তির উৎকর্ষের জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট আজ ইংরেজ-কর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে আমাদের তাহা বাস্তব সত্য।

মানুষ সঙ্ঘ-বদ্ধ না হইলে দেশের কোন উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় না, দেশীয় লোকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ছেলেদের শিক্ষা, পশু-স্বভাবসম্পন্ন মানুষের হাত হইতে আত্মরক্ষা, নিজ নিজ স্বত্ব রক্ষা, কৃষির সম্পূর্ণ উন্নতি, বাণিজ্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ গঠন, বৈদেশিকের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক যে কোন কার্য্য ধরা যাউক, মানুষের একক চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন হয় না। মানুষের সঙ্ঘ-বদ্ধ হইবার প্রয়োজন হয়। দেশের উপরোক্ত সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান জগতে সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট নামে প্রচলিত।

আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্ট আছে। আমাদের রাজপুরুষগণও ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট (Government of India), প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট (Government of Bengal) বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট (Government of Bombay) ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকেন।

আমাদের ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও যথাশীঘ্রসম্ভব বহু ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আমাদের আবশ্যকীয় ব্যবস্থাগুলির জন্য যখন গভর্ণমেণ্ট একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যখন দেখা যাইতেছে গভর্ণমেণ্টও একটি আছে এবং ইংরেজ রাজপুরুষগণও তাহাকে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এই আখ্যা দিতেছেন, তখন ঐ গভর্ণমেণ্টকেই কায়মনোবাক্যে আমাদের নিজ গভর্ণমেণ্টরূপে ব্যবহার করিবার দাবী আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সমস্ত ভারতবাসীর অস্তিত্ব-সংরক্ষণমূলক কোন দাবী যদ্যপি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতি আখ্যা অর্থহীন।

কাজেই আমাদের মহাত্মা যদি আমাদের গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমরা আশা

করিতে পারি, আবার আমরা একটা ভারতবাসী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব।

আমাদের পাঠকদের কাছে নিবেদন—আমাদের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তায় আমাদের জাতিগঠনের জন্য যে কার্য্যের প্রয়োজন বলিয়া মনে হইয়াছে, আমরা তাহাই লিখিয়াছি। আমরা আমাদের বিচারে কোন ভুল দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি থাকিতে পাবে না তাহা মনে করি না। আমরা চাই জাতিগঠনের চেষ্টা যাহাতে সচল এবং সজীব থাকে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে এবং তাহার চিন্তায় দেশের বুদ্ধিমান লোকদিগকে সজাগ থাকিবার সহায়তা করিতে। আমাদের উপর বিরক্ত না হইয়া আমাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

বাঙ্গালাব কৃষিবিষয়ক উন্নতির প্রচেষ্টা

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষিব গবেষণার জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুব করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট যে বাঙ্গালার কৃষির উন্নতি ও কৃষকের উন্নতির দিকে নজর দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদেব মনে হয়, কৃষির উন্নতিমূলক গবেষণার ফলে কতগুলি মূল্যবান সার (manure) অথবা নানারকম বৈজ্ঞানিক কর্ষণ-যন্ত্রের বহুল প্রচলন হইলে বস্তুতঃ কৃষকের কোন উপকার হইবে না। কৃষির উন্নতির লক্ষ্য হওয়া চাই, এমন একটা কিছুর আবিষ্কার করা, যাহাতে কৃষক শুধু ভগবানের দেওয়া হস্ত-পদাদির পরিশ্রম দ্বারা তাহার বাৎসরিক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। যদি কৃষির খরচার পড়তায় কৃষকের পরিশ্রম ও বীজধান ব্যতীত অন্য কোন বড় খরচার সংযোগ হয়, তাহা হইলে কৃষির দ্বারা কৃষকের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ একটা কিছু বিজ্ঞান ছিল, যাহা ভারতীয় কৃষকের কৃষিপন্থা হইতে অনুমান করা যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বিজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে তাহা বাস্তব সত্য। তাহাই পুনরুদ্ধার করিবার জন্য কৃষির উন্নতিমূলক গবেষণায় জমির উপর স্বভাবের নিয়ম পঠনশীল ছাত্রের প্রয়োজন। পদার্থবিজ্ঞানের প্রৌঢ়বয়স্ক ছাত্র (বিশেষজ্ঞ হইলে চলিবে না), অথচ কৃষককে ঘৃণা না করেন, জমির উপর যাইয়া রৌদ্রজলে ক্লান্তি অনুভব না করেন, এইরূপ কেহ, আমাদের কৃষি-গবেষণাব দায়িত্ব লইলে আমাদের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা। আমাদের পরামর্শ, উপরোক্ত গুণ-বিশিষ্ট ছাত্র আমাদের দেশে না পাইলে বিদেশ হইতে আনীত হওয়া উচিত।

পাটের চাষ সঙ্কোচন

আমাদের মনে হয়, আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাটের চাষের সঙ্কোচন করিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা সমীচীন নহে। গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা-পদ্ধতিতে বিরক্ত প্রজার সংখ্যা যে কম নহে তাহা গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত নহে। এ সময় গভর্ণমেণ্ট যে কোন কার্য্যে হাত দিবেন তাহা সুচিন্তিত হইয়া ফলপ্রসবের সম্ভাবনাযুক্ত না হইলে গভর্ণমেণ্ট হাস্যাস্পদ হইবেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব লঘু হইয়া যাইবে।

একমাত্র চাষের সঙ্কোচনেই পাটের দাম কিছু বাড়িয়া যাইতে পারে—তাহাই কি সত্য? কেবলমাত্র সরবরাহ (supply) কমিয়া গেলেই কি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পায়? বাজারের টান থাকিবার প্রয়োজন হয় না কি? পাটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বাস্তব টান কতটুকু? উপরোক্ত বিষয়গুলি খুব গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

পাটের চাষের সঙ্কোচনে যদি পাটের দাম বাড়িয়াও যায়। তাহা হইলে কতটুকু দাম বাড়িতে পারে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তদপেক্ষা বেশী মূল্য কৃষক পাইয়াছে কি না, পাইয়া থাকিলে তখন কৃষকের অবস্থার কোন তারতম্য ঘটিয়া ছিল কি না, এই সমস্ত চিন্তার বিষয়।

আমাদের মনে হয়, এবম্বিধ সঙ্কোচনে কৃষকের অবস্থার কোন তারতম্য হইবে না, অথচ যাঁহারা পাট শিল্পের জন্য ব্যবহার করেন তাঁহাদের কার্য্যে নিরর্থক জটিলতা আসিবে এবং গভর্ণমেণ্টের প্রজাহিতকর সংগঠন কার্য্যে লঘু চিন্তার নিদর্শন আর একটি বাড়িয়া যাইবে।

বীমার কাজ

জীবন-বীমার কাজ এদেশে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাহাতে ইহাকে আর অবহেলা করা উচিত হইবে না। বীমাকারীর সংখ্যার অনুপাতে একটা দেশের উন্নতি অবনতি বিচার করা চলে। এত বড় বিস্তীর্ণ দেশের পক্ষে বীমা সম্যকরূপে বিস্তারলাভ করে নাই। ইহার জন্য সুশিক্ষিত বহু এজেণ্ট চাই। কিন্তু বীমাবিক্রয়বিদ্যা

শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে কোনো চেষ্টা হয় নাই। আমরা যতদূর জানি অল্প দিন হইল কলিকাতায় একটি প্রাইভেট ইনষ্টিট্যুশন হইয়াছে, সেখানে বীমাবিক্রয় সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন অনেক এজেণ্ট কোম্পানীকে উপযুক্তরূপে প্রচার না করিয়া বরঞ্চ তাহার ক্ষতিই করে। যে কোন বীমা-কোম্পানী সম্বন্ধে সত্য কথা বলিলে যে কাজ হয়, তাহার চেয়ে বেশী কাজ হইবে আশায় কোনো কোনো এজেণ্ট মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে শুধু কোম্পানির ক্ষতি হয় তাহা নহে দেশেরও ক্ষতি হয়। সেই জন্য শিক্ষিত এজেণ্টের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

বীমার কাজে প্রতারণা

বীমার কাজে প্রতারণা সকল দেশেই অল্পবিস্তর হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণ বীমাকারীর কোনো ক্ষতি না হইয়া অনেক সময় কোম্পানিরই আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ প্রতারণার কোনো মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই লোকে বীমার উপরে আস্থা হারায়। সুতরাং এজেণ্ট কিংবা ডাক্তার নিয়োগ সম্বন্ধে কোম্পানির বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বীমীবিক্রয় শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে প্রতারণা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতা

স্বাস্থ্যলাভের জন্য মেয়েরা যে কোনো ব্যায়াম করিবে ইহা ভাল। তবে মেয়েদের এবং পুরুষদের জন্য একই প্রকার ব্যায়াম উপযোগী কি না বিশেষজ্ঞরা তাহা স্থির করিবেন। য়ুরোপ আমেরিকায় মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চ্চা কোথায়ও অবহেলিত নহে। তাঁহাদের স্বাস্থ্যচর্চ্চা প্রণালী হইতে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করিতে পারি।

কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চ্চা এবং কসরৎ দেখানো দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস। আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং কসরৎ দেখাইবার স্পৃহা অতি উগ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তরুণী যুবতী মেয়েদের মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া জয়লাভের চেষ্টা এবং নানারূপ কসরৎ-এর একজিবীশন—ইহার মধ্যে না আছে কোনো সৌন্দর্য্য, না আছে কোনো সার্থকতা। উগ্র প্রতিযোগিতা না হইলে, সর্ব্বসাধারণের হাততালি এবং বাহবা প্রাপ্তি না ঘটিলে ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যচর্চ্চা চলিবে না, ইহা ঠিক নহে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা অর্থোপার্জ্জনের একটা ফন্দী হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের যাঁহারা এইরূপে জলে ভাসাইতেছেন, তাঁহারা ইহার সার্থকতাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

ভারতবর্ষের লোক কতজন কি ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করে :

	(শতকরা)
শিল্প	১ "
সরকারী কার্য্যে	২ "
যান বাহন প্রভৃতি	২ "
ব্যবসায়	৬ "
কৃষি	৮০ "
বিবিধ	৯ "

দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জন লোকের উপজীবিকা কৃষি। ধান্যই প্রধান কৃষি। ধান্য ফসল উৎপাদনের শক্তি কোন দেশের জমিতে কত—তুলনা করা যাক্।

এক একর জমিতে ধান ফলায়

স্পেন	৫৭০০ পাউণ্ড
ইটালী	৩৩০০ "
জাপান	২১০০ "
ভারতবর্ষ	৮৯০ পাউণ্ড মাত্র।

আমাদের জনপ্রতি আয় বিষয়ে অভিমত

	বৎসর	জনপ্রতি আয় (টাকায়)
দাদাভাই নৌরজী	১৮৭০	২০
লর্ড ক্রোমার	১৮৮১	২৭
বারিং বার্বোর	১৮৮২	২৭
ডিগবী	১৮৯৮-৯৯	১৮৸৵০
লর্ড কার্জ্জন	১৯০০	৩০
মিঃ ফিণ্ডলে শিরাস্	১৯১১	৫০
মাননীয় বি. এন. শর্ম্মা	১৯১১	৮৬
প্রোঃ টি. কে. সাহা	১৯২১-২২	৪৬
সাইমন কমিশন	১৯২৮	১১০
স্যর এম. বিশ্বেসারিয়া	১৯৩০	৬০

এই বিভিন্ন তালিকা হইতে একটা সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে মাঝামাঝি একটা আয় দাঁড়ায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনপ্রতি টাকায় বার্ষিক আয়

যুক্ত রাষ্ট্রে ১০৮০, গ্রেট ব্রিটেন ৭৫০, ক্যানাডা ৭৫০, ফ্রান্স ৫৭০, জার্ম্মেনী ৪৫০, ভারতবর্ষ ৪৫ টাকা।

—সোনার বাংলা

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মজুর
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

[চিত্রাধিকারী—মাদ্রাজ মেল

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা প্রথমেই কোনও সমস্যা পূরণ করিতে হইলে সাধারণতঃ কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছি। তাহার পর, কোনও দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি, তৎ-সম্বন্ধীয় চিন্তা আরম্ভ করিয়াছি।

কোনও দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইলে কি কি চিন্তার প্রয়োজন হয়, সেই প্রসঙ্গে চারিটি কথা উঠিয়াছে —

১। জাতি বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

২। দেশ বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি ?

৩। জাতিসংগঠনের প্রয়োজন ও উপায়।

৪। জাতীয় সমস্যা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্ভব হয় কেন ?

জাতি বলিতে কি বুঝায়—তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে, মূলতঃ জাতি বলিতে যাহাই বুঝা যাক না কেন, বাস্তব জগতে জাতি বলিতে, প্রত্যেক দেশের সমগ্র লোক-গণের সমষ্টি বুঝায়। আরও দেখা গিয়াছে যে, মানুষের সমষ্টিবদ্ধ হইবার প্রধান কেন্দ্র 'মনুষ্যত্ব' এবং তাহার পরই 'দেশ'। মানুষের মনুষ্যত্ব কি তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে বলিতে হয়—মনুষ্যত্ব এমন একটা কিছু, যাহা সকল মানুষের মধ্যে আছে এবং যাহা তাহাকে পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীব হইতে স্বাতন্ত্র্য দিয়া থাকে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মূল প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্ব এক নহে; মূল প্রকৃতি সমস্ত জীবের ভিতরেই আছেন এবং বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। মনুষ্যাকারে তাঁহার অন্যতম প্রকাশ। মানুষের মনুষ্যত্ব এক হইলেও বিভিন্ন মানুষের গুণের বিভিন্নতার জন্য মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও কোনও একজন মানুষ অপর একজন মানুষ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট এইরূপ মনে করিবার পক্ষে কোনও সারগর্ভ যুক্তি নাই।

মানুষের আচার-ব্যবহার তাহার প্রকৃতি-বিরোধী না হইয়া প্রকৃতির অনুরূপ হওয়া উচিত, এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, মূলে মানুষের পরস্পর পার্থক্যের কোনও কারণ থাকিত না এবং মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করিয়া জগতের যাবতীয় মানুষ এক জাতি রূপে পরিগণিত হইতে পারিত।

অথচ দেখিতে পাই, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে ছোট-বড় কল্পনা প্রচলিত আছে এবং তাহার ফলে প্রায় সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে মানুষে মানুষে অমিলন ঘটিয়া বসিয়াছে; সুতরাং 'মনুষ্যত্ব'কে কেন্দ্র করিয়া জাতিগঠনের চেষ্টা একেবারেই হয় নাই। জাতিগঠনের বাস্তব কেন্দ্র হইয়াছে 'দেশ'। যে দেশে দলাদলি যত কম সেই দেশের জাতি তত উৎকৃষ্ট; দলাদলির সংখ্যা ও পরিমাণ যে দেশে যত বেশী সেই দেশের জাতিও তত নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেশ বলিতে কি বুঝায়—তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, দেশ বলিতে জমি, জীব এবং জলহাওয়ার (atmosphere) সমষ্টি, এবং যে দেশে জমি, জীব, জল-হাওয়া যত উন্নত সে দেশও তত উন্নত। কাজেই দেশ কি তাহা বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, জমি, জীব ও জলহাওয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন।

মানুষ যাহা যাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং অন্যান্য যাহা কিছু ব্যবহার করে অথবা খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য

যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করে সেই সমস্তেরই মূলে যে জমি ও জলহাওয়া, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও আমাদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে। জমি ও জলহাওয়াবিষয়ক তত্ত্বান্বেষণে আরও দেখা গিয়াছে যে, জমির চাষ উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিয়া মানুষ যে শৃঙ্খলার সহিত তাহার ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত জীবন যাপন করিতে পারে, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিকে উপজীবিকা করিয়া তাহা করা সম্ভব নহে। জমিজাত দ্রব্য ব্যতীত কোনও শিল্প বা বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব এবং কৃষকের জীবনযাত্রা সহজ ও সরল না করিতে পারিলে প্রচুর পরিমাণে জমিজাত দ্রব্য উৎপাদন করাও সম্ভব হয় না। কৃষকের সামর্থ্যের সহিত সামঞ্জসীভূত কৃষিবিষয়ক বিজ্ঞান প্রচলিত এবং জমিজাত দ্রব্যের আদানপ্রদানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে কৃষকের জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মানুষ জন্মিয়াই কি কি পাইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা কি কি করা সম্ভব—এই জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তবেই কৃষকের সামর্থ্যের পরিমাণ করা সম্ভব হয়। দেশকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলেও জীব সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। যত রকম জীবের আলোচনা দেশের আলোচনা করিতে গেলে করিতে হয় তন্মধ্যে মানুষেরই প্রাধান্য বেশী। কাজেই মানুষ বলিতে কি বুঝায় এবং মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও রূপ কি—এই সকল জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে।

একজন মানুষ অপর সকল মনুষ্যের কাছে যত প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, অথবা বহির্জগতের অভিব্যক্তি নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—

১। মানুষ কার্য্য করে—অর্থাৎ, দেখে, শোনে, গন্ধ লয়, আস্বাদ লয়, স্পর্শ করে, কথা বলে, হাতের ব্যবহার করে, পায়ের ব্যবহার করে; মলমূত্র ত্যাগ করে, অনুরাগ বা বিরাগ অনুভব করে।

২। মানুষ তাহার কার্য্যসম্বন্ধে তৌল করিয়া থাকে—অর্থাৎ, কোন্‌টা করিব, কোন্‌টা করিব না, এইটাই করিব, এইটা কিছুতেই করিব না—এবংবিধ 'কোন্' প্রশ্নসম্বলিত চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া থাকে।

৩। মানুষ তাহার কার্য্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে—অর্থাৎ, কেন করিব, কেন করিব না, কেন দ্রব্যবিশেষকে সুন্দর বলিব, কেন সুন্দর বলিব না; সৌন্দর্য্যের কারণ কি, সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসে এই প্রকার 'কেন', 'কোথা হইতে' প্রশ্নসম্বলিত বিবেচনা ও বিচার করিয়া থাকে।

৪। মানুষ দেখা, শোনা, গন্ধ লওয়া, আস্বাদ লওয়া ইত্যাদি কার্য্য করিতে বসিয়া (১নং) 'কেন' 'কোথা হইতে' প্রশ্নসম্বলিত বিশ্লেষণপ্রচেষ্টার (৩নং) ফলে যখন তাহার কার্য্য করিবার নিজস্ব যন্ত্রগুলির দ্বারা কোনও বিষয়ের বিশ্লেষণ সমাপ্ত করিতে পারে না, তখন তাহার নিজস্ব যন্ত্রগুলি কেন বিশ্লেষণ করিতে পারিতেছে না, যন্ত্রগুলির কার্য্যশক্তির উৎস কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এবং নিজের ভিতরে সেই শক্তি কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করে, এবং যে মুহূর্ত্তে সেই শক্তির সন্ধান পায় সেই মুহূর্ত্তেই সেই শক্তিই কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ মানুষ তাহার কার্য্য করা, কার্য্য সম্বন্ধে তৌল করা এবং কার্য্যবিষয়ক বিশ্লেষণ করার নিজস্ব যন্ত্রগুলির নিদান খুঁজিয়া বাহির করে এবং উপরোক্ত নিদানের নিদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে।

ভারতীয় ঋষিগণ মানুষের কার্য্য করিবার নিজস্ব যন্ত্রগুলির 'ইন্দ্রিয়' আখ্যা দিয়াছেন; কার্য্য সম্বন্ধে তৌল করিবার যন্ত্রটির নাম দিয়াছেন 'মন'; কার্য্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিবার যন্ত্রটির নাম দিয়াছেন 'বুদ্ধি' এবং 'ইন্দ্রিয়', 'মন' ও 'বুদ্ধি'র নিদানের নাম দিয়াছেন 'আত্মা'।

[ভারতীয় ঋষিগণ উপরোক্ত যন্ত্রগুলির নাম ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা দিয়াছেন, এই কথায় সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতগণ কোনও বিরোধ উপস্থিত করিতে পারেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে এখানে কিছু মন্তব্য করিতেছি। এই প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত ধীর ভাবে অনুধাবন করিলে আমরা এই প্রসঙ্গ কেন উত্থাপন করিয়াছি পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহার সঠিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সুতরাং আমাদের কথার সহিত তাঁহাদের কথার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে দর্শনের সংখ্যা ছয়টি আমরা এইরূপ শুনিয়া থাকি। ভারতীয় ঋষিগণের সমস্ত রচনা পাঠ করিবার এবং সমস্ত বক্তব্য বিষয় জানিবার ও চিন্তা করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে দর্শন কয়খানি, কি কি বিষয়ে দর্শন তাহা বলিতে আমরা অপারগ। পণ্ডিতগণের টীকার সহায়তায় ঋষিগণের দর্শনের সম্বন্ধে জানিতে গিয়া আমাদের নজরে পড়িয়াছে যে, একাধিক পণ্ডিত একই দর্শনের টীকা করিয়াছেন এবং তাহাতে একই দর্শন বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সকল পৃথক ব্যাখ্যায় দর্শনের মূল বক্তব্য বিষয় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে মনে হয় –

১। হয়, ঋষিগণের মূল ভাষার তাৎপর্য্য টীকাকারগণ সঠিক অবগত নহেন।

২। না হয়, ভাষার তাৎপর্য্য টীকাকারগণ সঠিকই গ্রহণ করিয়াছেন, ঋষিগণের মূল বক্তব্য বিষয়েই জটিলতা থাকার দরুণ টীকায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এই দুইয়ের একটা গলদ যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, গলদ না থাকিলে বিভিন্ন টীকায় একই বস্তুর বিভিন্ন অর্থ চলিতে পারিত না। গণিতশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বর্ত্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞানসমূহে এইরূপ গোলযোগ পরিলক্ষিত হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার বাক্যার্থ গ্রহণের প্রণালী একই ধরণের বলিয়া আমাদের নজরে পড়িয়াছে। কেবল 'ধাতু' ও 'প্রাতিপদিক' শব্দগুলির অর্থ ধরিবার সময় বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পাণিনির শব্দানুশাসন সম্বন্ধীয় আলোচনা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে তাহাতে, ১। কি কি অবস্থাভেদে মানুষের ভিতরে বিভিন্ন স্বরের উচ্চারণ, ২। কি কি অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ, ৩। কি কি অবস্থাভেদে বিভিন্ন স্বরের সহিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সংযোগে অথবা বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সহিত বিভিন্ন স্বরের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন 'ধাতু' ও 'প্রাতিপদিক' গঠিত হয়, এই সকল আলোচনা আছে। 'অবস্থাভেদে উচ্চারণের পার্থক্য হয়' ইহা যদি সত্য হয় এবং অবস্থাভেদে উচ্চারণের বিভিন্নতা অনুভব করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র উচ্চারণের (বর্ণের) স্বতন্ত্র অর্থ আছে তাহা মানিয়া লইতে হয়। আবার অবস্থা-বৈষম্যানুযায়ী বিভিন্ন উচ্চারণের পরস্পর মিশ্রণের দ্বারা শব্দ (ধাতু ও প্রাতিপদিক) গঠিত হয়, ইহাও যদি আমরা অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে মানিয়া লইতে হয় যে, প্রত্যেক শব্দের অর্থ শব্দান্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের অর্থের সমষ্টি মাত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণের পরস্পর মিশ্রণের সহিত সমঞ্জসীভূত। সুতরাং বলিতে পারা যায়, উচ্চারণতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব গভীর ভাবে আলোচিত হইলে, ভাষার প্রত্যেক বর্ণ অর্থসংযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক বর্ণের অর্থানুসারে এবং বর্ণসংযোগের প্রকারভেদে শব্দের অর্থ হয়। এইরূপ হইলে প্রত্যেক শব্দ স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির মত 'বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা' প্রণয়নের অথবা অভিধান রচনার প্রয়োজন হয় না। শব্দগুলির পরিস্ফুট অর্থ শব্দের বর্ণসমষ্টির এবং বর্ণসংযোগের ভিতরেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ বর্ণগুলির অর্থবোধ হইলেই বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির অর্থবোধ হয় এবং বিভিন্ন বর্ণের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া শব্দসংজ্ঞা প্রণয়ন করিলে বাস্তবতার ভিত্তি হারাইয়া বিজ্ঞান কল্পনাশ্রয়ী হইয়া পড়ে।

"আমরা ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধে যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে ইহা মনে করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে ব্যাস, কপিল, গৌতম ও কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ যে সমস্ত শব্দ (ধাতু ও প্রাতিপদিক) ব্যবহার করিয়াছেন, উপরি উল্লিখিত বর্ণ ও বর্ণসংযোগের নিয়মে সেগুলির অর্থ সুপরিস্ফুট।

বর্ত্তমান শব্দতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু বাক্-ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা শব্দ কিরূপে উচ্চারিত হয়, মানুষের ভাববৈষম্যে জিহ্বার কম্পনবৈষম্য, জিহ্বার কম্পন-বৈষম্যানুযায়ী বিভিন্ন শব্দ কি ভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করে, বিভিন্ন শব্দের দ্বারা মানুষের অবস্থার তারতম্য নির্ণয় করা কি ভাবে সম্ভব এই সকল বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা বর্ত্তমান শব্দতত্ত্ববিচারে হইতেছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। পাণিনিতে শব্দ সম্বন্ধে উপরোক্ত জাতীয় আলোচনা আছে এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে কি না

শব্দতাত্ত্বিকগণকে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে বলি। আমাদের মনে হয়, 'শব্দ' সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়া ভারতীয় ঋষিগণ তৎকাল-প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই ভাবেই 'সংস্কৃত ভাষা'র উদ্ভব হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষার ভিত্তি শব্দসম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং এই জ্ঞান মীমাংসা-দর্শন ও পাণিনি প্রণীত শব্দানুশাসন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক ধাতু ও প্রাতিপদিকের (শব্দের) অর্থ যে তাহার বর্ণ ও বর্ণসংযোগের উপর নির্ভরশীল তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন পণ্ডিতগণের টীকায় ধাতু ও প্রাতিপদিকের অর্থ নির্ণয়ে বহু প্রাচীন কাল হইতেই উপরোক্ত শব্দ-বিজ্ঞানের রীতি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমানে একই সূত্রের বহুবিধ অর্থ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, প্রাচীন দর্শনাদি গ্রন্থের যে যে অর্থ এখন প্রচলিত তাহার কোনটাই হয়তো ঠিক না হইতে পারে।

আমাদের ঋষিগণ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মার সাহায্যে জগতের যাবতীয় বস্তুর সামান্য কারণটিকে বুঝিতে পারিয়া এবং সামান্য কারণটির কারণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ সেই বাণীগুলিকেই আমরা 'দর্শন' আখ্যা দিয়া থাকি। এই কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয়, দর্শনগুলি জগতের যাবতীয় বস্তু, যাবতীয় বস্তুর গুণ এবং কার্য্য বুঝিবার সহায়ক এবং আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারে এইগুলির প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অর্থাৎ দর্শনের জ্ঞান মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের ও অবস্থা গঠনের সহায়ক।

অথচ বাস্তব জগতে দেখিতে পাই, বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন সংগ্রহের সহায়তা করা দূরে থাক, ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা নিজেদের অবস্থাটাকে পর্য্যন্ত লোভনীয় করিয়া তুলিতে পারেন না। বর্ত্তমানে কোনও জাতির সঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনাতেও ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত জ্ঞানের প্রয়োগও দেখা যায় না। যে সকল জ্ঞানের সহায়তায় বর্ত্তমান জগতের প্রতিষ্ঠাবান জাতিগুলির এতদূর প্রতিষ্ঠা, সেই সকল জ্ঞানের সহিত ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানকে সম্বন্ধ-যুক্তও করা চলে না। কাজেই বলিতে হয়, ভারতীয় দর্শনের বর্ত্তমান জ্ঞান কোনও ব্যক্তির অথবা জাতির প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতেছে না।

ব্যক্তির জ্ঞানের তারতম্যে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার তারতম্য এবং জাতির জ্ঞানের তারতম্যে জাতির প্রতিষ্ঠার তারতম্য ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। এক এক জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ও চীনদেশের ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত—কবে, কত শতাব্দী পূর্ব্বে এই দুই জাতির অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হয় নাই। এই দুইটি জাতিকে বাদ দিলে, অপর যে সমস্ত জাতির অভ্যুত্থান ও পতন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে গ্রীকদের প্রভুত্ব-কালই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে তাহার পরিমাণ খৃঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ অর্থাৎ মাত্র ৬৩০ বৎসর। ৬৩০ বৎসরের আধিপত্যকে খুব দীর্ঘ বলা যায় না। জ্ঞানের যথার্থ অভাব না থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় অবনতি হওয়া সম্ভব নহে।

প্রকৃতিকে জানিবার ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞানের তারতম্য হয়—ইহা স্বীকার করিয়া লইলে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান যে কত অল্প তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জগতের পদার্থ-বিজ্ঞানে, রসায়ন-বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সকল বিজ্ঞানেই প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় বেশী নাই। কিন্তু ভারতীয় ঋষি-প্রণীত দর্শনে সমস্ত বস্তুর মূল প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বহু পরিচয় যে বর্ত্তমান তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ভারতীয় কৃষ্টির মূল অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যে জাতি ভারতবর্ষকে যত অধিক বুঝিয়াছিল সেই জাতিই তত অধিক উন্নত হইয়াছিল ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রভুত্বের ইহাই কারণ হইতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় ঋষিগণের দর্শনগুলিতে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানের যে পরিচয় আছে, তাহা তখনই পরিস্ফুট হইবে যখন সংস্কৃত ভাষায় ধাতু ও প্রাতিপদিকগুলির

অর্থ বিশুদ্ধ ভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। পাণিনির শব্দানুশাসন ও সংজ্ঞাপ্রকরণ অধ্যায় সম্যকরূপে আলোচিত ও অধীত হইলে ধাতু ও প্রাতিপদিক সম্বন্ধীয় এই বিশুদ্ধ জ্ঞান পুনরায় প্রচলিত হইতে পারে।

কাহাকেও হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অথবা ভিন্ন একটা দার্শনিক সম্প্রদায় গঠনোদ্দেশ্যে অথবা নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ উপরোক্ত কথাগুলির অবতারণা করি নাই। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তিগুলি যে একেবারে অকাট্য অথবা সম্পূর্ণ অলীক এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইলে বিরাট সাধনার প্রয়োজন। এই কার্য্যের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিয়াই আমরা পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই সাধনা এক মাত্র বিজ্ঞানচর্চ্চাপটু, সক্ষম ইন্দ্রিয়সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণেরই সাধ্য। পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রের মত যদি তাঁহারা প্রচলিত দার্শনিক সংস্কারগুলিকে পরীক্ষা করিতে চেষ্টিত হন তবেই একদা সত্যজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।]

মানুষ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই চারিটি যন্ত্রের সমষ্টি এবং এই যন্ত্রগুলির কার্য্য দ্বারাই মানুষের অভিব্যক্তি। মানুষ হয়, কোনও না কোনও কার্য্য করে, নয়, কোন্ কার্য্য করিব, এবং কোন্ কার্য্য করিব না এইরূপ চিন্তা করে, অথবা, কেন কোনও কার্য্য করিব এবং কেন কোনও কার্য্য করিব না, এই প্রকার বিশ্লেষণ করে; নতুবা, তাহার ইন্দ্রিয় কেন কার্য্য করিবার শক্তি পায়, মন কেন চিন্তা করিবার শক্তি পায় এবং বুদ্ধি কেন বিশ্লেষণ করিবার শক্তি পায় তাহার অন্বেষণ করে। মানুষ সকল সময়ে বাক্যে ও চিন্তায় 'আমি' শব্দ ব্যবহার করে। আমি 'সর্ব্বনাম'। সর্ব্বনামের অন্তরালে কোনও বিশেষ্য থাকিবেই। পূর্ব্বকথিত চতুর্থ অভিব্যক্তিতে কার্য্য করিবার, কার্য্য সম্বন্ধে তৌল করিবার ও বিশ্লেষণ করিবার নিজস্ব যন্ত্রগুলির যে নিদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে 'আমি' সর্ব্বনামের বিশেষ্য তাহাই। এই বিশেষ্য মানুষের নিজের ভিতরেই আছে। মানুষ এই বিশেষ্যের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে; অবশ্য তাহা সাধনাসাপেক্ষ। জগতের সম্মুখে তাহার অভিব্যক্তিতে কোনও কাজ করা, অথবা কোন্টা করিব এবং কেন করিব এই দুইটি প্রশ্ন করা —সর্ব্বসমেত এই তিন জাতীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নাই।

মানুষের ইন্দ্রিয় দশটি। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক এবং বাক্, পাণি, পদ, পায়ু ও উপস্থ। ইন্দ্রিয়ের দুই অবস্থা, সচল এবং অচল (অর্থাৎ আবয়বিক)। জীবিত মানুষের ইন্দ্রিয় সচল, মৃত মানুষের ইন্দ্রিয় অচল। সচল ইন্দ্রিয়ের মূলে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের আবয়বিক অবস্থা মিলিত হইলে ইন্দ্রিয় কার্য্যকরী হয় অর্থাৎ তখনই মানুষ ইন্দ্রিয়ের খেলা খেলিতে পারে।

একটি জিনিষ চোখের সম্মুখে আসিল, তৎক্ষণাৎ বিনা তৌলে অথবা বিনা বিশ্লেষণে সেটিকে সুন্দর অথবা কুৎসিত বলিয়া ধরিয়া লইলাম। এবং সুন্দর মনে হইলে তাহার সহিত কায়িক মিলনের আকাঙ্ক্ষা করিলাম অথবা কুৎসিত মনে হইলে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম— ইন্দ্রিয়ের স্বভাববশতই এরূপ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের ব্যস্ততা শুধু জিনিষটি লইয়া, তাহার গুণাগুণ অথবা কর্ম্মশক্তি পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য ইন্দ্রিয়ের নাই।

মানুষের মন অপর একটি যন্ত্র। পিতামাতা, বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন ও অধীত গ্রন্থ ইত্যাদির সহিত সংসর্গের (heredity ও environment) ফলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন কতকগুলি ছাপ গ্রহণ করে। চলতি ভাষায় এই ছাপকে সংস্কার বলা হয়। জিনিষের সহিত কায়িক সংস্রব করিব কি করিব না, অমুক জিনিষটিকে অমুক আখ্যা দিব কি দিব না, কোন্ আখ্যা দিব অথবা কোন্ আখ্যা দিব না এই প্রকার প্রশ্ন করা মনের স্বভাব। মনের কার্য্যের মূলে থাকে সংস্কার; জিনিষ, জিনিষের গুণাগুণ এবং কর্ম্ম, এই তিনটি লইয়া মনের ব্যস্ততা।

মানুষের বুদ্ধি আর একটি যন্ত্র। বুদ্ধির স্বভাব, বিশ্লেষণ করা। মন যখন একটা কিছু স্থির করিতে চাহে, তখন অপর একটা কিছু স্থিরীকৃত হইবে না কেন এবং এইটাই বা স্থিরীকৃত হইবে কেন এই প্রকার 'কেন' প্রশ্নকরা বুদ্ধির কার্য্য। মন যে সকল বস্তু লইয়া ব্যস্ত, বুদ্ধির ব্যস্ততার পিছনেও সেই সকল বস্তু থাকে।

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির উপরোক্ত স্বভাব ধারণা করিতে পারিলে মানুষ কি এবং তাহার অভিব্যক্তির মূলে কি আছে তাহা বলা যায়। কিন্তু মানুষে মানুষে তারতম্য হয় কেন তাহা বলিতে হইলে এবং মানুষের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের সহিত সূত্র বজায় রাখিবার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা আমাদের মূল বক্তব্যের অনুসরণ করিতেছি।

মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা

সংসারে বহু রকমের মানুষ আছে, প্রত্যেক রকমের মানুষই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চায় এবং এই আরামটুকুর জন্য বহুপ্রকারের কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং বহু প্রকার বস্তু পাইবার ইচ্ছা করে। কিন্তু এমন বহু জিনিষ আছে যাহা মানুষ তাহার আরামের জন্য পাইতে চাহে এবং এমন বহু কার্য্যপদ্ধতি আছে যাহা সে এই আরাম অনুসন্ধানে অবলম্বন করে, যে সকল বস্তু সংগৃহীত ও পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও আরাম পাওয়া তো দূরের কথা, এগুলি মানুষের দুঃখের কারণ হয়। আবার এমন বহু জিনিষ ও কার্য্যপদ্ধতি আছে যাহা সংগৃহীত বা অবলম্বিত না হইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা অথবা আরাম উপভোগ করা সম্ভব হয় না।

'চাওয়া' ব্যাপারটিকে 'মানুষের আকাঙ্ক্ষা' এবং যে জিনিষ ও কার্য্যপদ্ধতি না হইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা ও আরাম পাওয়া অসম্ভব সেই জিনিষ ও কার্য্যপদ্ধতিগুলিকে আমরা 'মানুষের প্রয়োজন' বলিব।

মানুষের প্রকারভেদে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার মানুষের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা কি কি তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষ কত প্রকারের হয়, বিভিন্ন প্রকার মানুষের চালচলনের পার্থক্য ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। আবার, মানুষের প্রয়োজন কি কি তাহা জানিতে হইলে, মানুষ কি হইলে আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারে তাহাও জানিতে হয়। কারণ, আদর্শ মানুষ কখনও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ আকাঙ্ক্ষা করেন না।

মানুষ কি করিয়া আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারে তাহা জানিতে হইলে, মানুষে মানুষে পার্থক্য হয় কেন, কোন্ চালচলনের মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম, কোন্ শ্রেণীর মানুষ সকলের আদর্শ এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানুষ কি করিয়া নিজেকে আদর্শ মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, এগুলি জানিবারও প্রয়োজন হয়।

উপরের মন্তব্যগুলি হইতে আমরা বলিতে পারি যে, মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা যথাযথ নির্দ্ধারিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিতে হইবে—

১। মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ।

২। বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণী বিভাগ।

৩। চালচলন অনুযায়ী মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায়।

৪। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম।

৫। কোন্ শ্রেণীর মানুষ সকলের আদর্শ।

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কেমন করিয়া নিজদিগকে আদর্শ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারে।

৭। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন।

মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে আমাদিগকে আবার মানুষের কার্য্য করিবার যন্ত্রগুলির কথা স্মরণ করিতে হইবে।

আমরা মানুষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহার মূল কথা এই যে, মানুষের অভিব্যক্তি তাহার কার্য্যের সমষ্টিতে এবং তাহার কার্য্যের যন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা। ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের যন্ত্র এবং অপর সকল মানুষ এই ইন্দ্রিয়গুলির জন্য কোনও একজন মানুষকে দেখিতে পায়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মন, বুদ্ধি ও আত্মা আভ্যন্তরীণ যন্ত্র। মন ও বুদ্ধির কার্য্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। মন ও বুদ্ধির কার্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তায় বুদ্ধি-যন্ত্রটির ব্যবহার করিতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি সুন্দরী রমণীর ছবির কথা ধরা যাউক। ছবিখানিতে আছে—(১) চিত্রকরের হাতের কাজ অর্থাৎ রমণীর একটা চেহারা ও নানারকম রঙ; (২) চিত্রকরের মনের কাজ—অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গুলির কিরূপ সমাবেশ হইলে রমণীকে সুন্দর দেখায় এবং যত সুন্দরী রমণী চিত্রকর দেখিয়াছেন কল্পনায় তাহাদের চেহারা দর্শন; এবং (৩) চিত্রকরের বুদ্ধির কাজ—অর্থাৎ কেন অমুক রমণীর চক্ষু দুটিকে সুন্দর বলিব ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা আদর্শ সৌন্দর্য্য নির্দ্ধারণ।

চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা কেবলমাত্র একটি রমণীর চেহারা এবং নানা রকম রঙ মাত্র দেখিতে পারি, কিন্তু ছবিখানিতে আদর্শ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না তাহা দেখিতে হইলে মন-যন্ত্রের সহায়তায় বুদ্ধি-যন্ত্রের ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই।

আত্মার খেলা ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। একমাত্র আত্মা-যন্ত্রটি বুদ্ধির সহায়তায় আত্মার খেলা উপলব্ধি করিতে পারে, আমাদের এইরূপ ধারণা।

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট কার্য্যপটু হইলে এবং মনঃসংযোগ দ্বারা জাগতিক ব্যাপারগুলি পর্য্যবেক্ষিত হইলে বুদ্ধি কার্য্যপটু হয় এবং তখনই সমস্ত জিনিষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা জন্মে। বুদ্ধি তখন প্রত্যেক বস্তুর বিশ্লেষণ সুরু করে, এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। বস্তুর অযুগ্ম উপাদান নির্ণয় করাই বুদ্ধির লক্ষ্য হয় কিন্তু কার্য্যপটু ইন্দ্রিয় দ্বারা যতই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, বস্তুর অযুগ্ম কারণ কিছুতেই নির্ণীত হয় না। অথচ যুগ্ম যখন আছে তখন অযুগ্ম যে নিশ্চয়ই আছে এই প্রতীতি জন্মে। এই অবস্থায় মানুষের নিজ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং কি করিয়া এই যন্ত্রগুলির কার্য্যের শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এই কার্য্যশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ কোথা হইতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যশক্তি পাইতেছে তাহার অনুসন্ধান করে এবং এই অনুসন্ধানের ফলে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির নিদান খুঁজিয়া বাহির করে। এই নিদানের নাম ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় 'আত্মা' এবং আত্মার কার্য্য যে আত্মার নিদান খুঁজিয়া বাহির করা ও তাহার ব্যবহার করা তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় বিন্দুমাত্র অপটু অথবা অলস হইলে মন ও বুদ্ধি-যন্ত্র সম্যক পরিস্ফুট হয় না এবং মন ও বুদ্ধি অপটু অথবা অলস হইলে আত্মার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে।

আত্মার খেলা বুঝিতে পারিলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ব্যবহারে একটা স্বাস্থ্য আসে। মানুষ তখন বুঝিতে পারে যে, তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির রসদ আসিতেছে তাহার আত্মার নিকট হইতে এবং তাহার আত্মা অনবরত নিকটবর্ত্তী জলহাওয়া হইতে রসদ সংগ্রহ করিতেছে। এবং এই ধারণাও তাহার জন্মে যে, নিকটবর্ত্তী জলহাওয়া দূরবর্ত্তী জলহাওয়া অর্থাৎ চরাচর-বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের মনে হয়, মানুষ তখন এমন ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে যে সে তাহার আবশ্যকমত ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির রসদ নিয়মিত করিতে পারে এবং নিজের বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া দিতে সক্ষম হয়।

মানুষ তাহার আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা তাহার বড় প্রমাণ তাহার জীবন ও যৌবনের দৈর্ঘ্য। সমাজ অথবা রাষ্ট্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে মানুষের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ দ্বারাও মানুষের আত্মার উপলব্ধি হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা হইতে পারে। একথা কেন বলিতেছি তাহা পরে পরিস্ফুট হইবে।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা মানুষ জন্মাবধি পাইয়া থাকে; জঙ্গল যেমন পরিষ্কৃত না হইলেও বজায় থাকিতে পারে এবং জীবের কতক প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, সেইরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কৃষ্টি সাধিত না হইলেও এইগুলি কতক দূর পর্য্যন্ত নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। কৃষ্টির তারতম্য অনুসারে উপরোক্ত যন্ত্রগুলির কার্য্যপটুতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং মানুষের কার্য্যের ও মানুষের শ্রেণীর তারতম্য হয়।

আমাদের পাঠকদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কার্য্যের প্রকারভেদের জন্য মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয় বটে, কোনো গুণবিশেষের জন্য একজন মানুষ আর একজন মানুষ অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে বটে, এবং সেই কারণে একজন মানুষ কোন কার্য্যবিশেষের পরিচালনায় আর একজনকে আদেশ করিতেও পারে বটে, এবং একজন মানুষের অপরকে শ্রেষ্ঠতর মনে করিবার প্রয়োজনও হয় বটে, কিন্তু কোনো মানুষ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-

গুণসম্পন্ন হয় না; সুতরাং তাহার নিজেকে সর্ব্বতোভাবে উচ্চতর মনে করিবার কোনো কারণ থাকে না। পরন্তু যে মানুষ যে গুণের অর্জ্জনের জন্য অপরের চোখে উচ্চতর হয়, সে এই গুণের পূর্ণতার কতখানি প্রয়োজন ও নিজের মধ্যে কতখানি অভাব তাহা দেখিতে পায় এবং অপরে তাহাকে উচ্চতর মনে করিলেও সে নিজেকে উচ্চতর মনে করিতে পারে না। বরং গুণের অভাবের কথাই তাহার মনে জাগরূক থাকে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির খেলার তারতম্যানুসারে মানুষের কার্য্যের ও মানুষের তারতম্য কিরূপ হয় এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েকটি বিভিন্ন মানুষের কয়েকটি বিভিন্ন কার্য্যের বিশ্লেষণ করিতেছি।

১। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ বিষয়ক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের কার্য্য—

(ক) কেহ হয় তো, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছি এখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতেই হইবে, এবং এই এই বিষয় লইলে সহজেই পাশ করিতে পারিব, এইটুক মাত্র ভাবিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়েন।

(খ) কেহ কেহ ভাবেন, পাশ ত করিয়াছি, কলেজে পড়িতেও হইবে কিন্তু কলেজ হইতে পাশ করিয়া কি কি করা সম্ভব তাহার অনুসন্ধান না করিয়াই অথবা অনুপযুক্ত স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ঠিক করিয়া লন—অর্থনীতিতে বি-এটা পর্য্যন্ত পাশ করিয়া জীবন-বীমা সম্বন্ধে কিছু শিক্ষানবিশী করিতে পারিলেই একটা ভাল চাকুরী পাওয়া যাইবে। এবং এই চিন্তানুযায়ী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়েন।

(গ) কেহ কেহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াই ভবিষ্যতে জীবন-বীমার কাজ করিব এইরূপ স্থির করিয়াই খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন (১) জীবনবীমার কাজে কোন্ কোন্ জ্ঞানের প্রয়োজন, (২) যতরকম জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সে সমস্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া কোন্ কোন্ জীবনবীমা-কোম্পানী কাজ করিবার খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, (৩) এইরূপ খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানীগুলির খ্যাতি দৃঢ়মূল কিনা তাহার পরীক্ষার উপায় কি, (৪) যে কোম্পানীতে সমস্ত রকম জ্ঞানবান লোক আছেন, সেই কোম্পানীর কোন্ কার্য্যে কি কি জ্ঞানসম্পন্ন লোক নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহাদের বেতন কি, (৫) ভাল বেতনের চাকুরীগুলি লাভ করিতে হইলে প্রথমে কোন্ চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হয় এবং কোন্ চাকুরীর পর কোন্ চাকুরীতে উন্নীত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করা যায়, (৬) সর্ব্বোচ্চ চাকুরীতে কি কি জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সর্ব্বনিম্ন চাকুরীতেই বা কি কি জ্ঞানের প্রয়োজন এবং মধ্যবর্ত্তী চাকুরীগুলিতেই বা কোন্ কোন্ জ্ঞানের প্রয়োজন, (৭) ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পাশ করিয়া জীবনবীমার কাজে শিক্ষানবিশী করিলে ওই সমস্ত জ্ঞানলাভের বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না, বন্দোবস্ত না হইলে কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন্ কোন্ জ্ঞানলাভের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত এবং আমি সে সমস্ত জ্ঞানলাভের উপযুক্ত কি না, (৮) যদি উপযুক্ত হই, প্রচলিত জীবনবীমা কোম্পানীগুলি যে পরিমাণ লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বেতন দিয়া থাকে তদপেক্ষা বেশী লাভ করিয়া বেশী হারে বেতন দিবার প্রয়োজন হইলে জীবনবীমা-পরিচালকের কি কি উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োজন এবং পাঠ্য-জীবনে তাহার কতখানি লাভ করা সম্ভব এবং তজ্জন্য কি কি বন্দোবস্তের প্রয়োজন—ইত্যাদি সকল অনুসন্ধান শেষ করিয়া নিজেকে উপযুক্ত মনে করিলে জীবনবীমা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়েন।

এখানে দেখা যাইতেছে একই উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে তিন রকম মানুষ (ছাত্র) তিন রকমের কার্য্য করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ চিন্তা ছাত্রদের হইয়া সচরাচর অভিভাবকেরাই করিয়া থাকেন।

২। পড়াশোনা শেষ হইবার পর জীবিকা-অন্বেষণের কার্য্য—

(ক) কেহ কেহ পড়াশোনা শেষ হইবামাত্র কোন্ কোন্ আপিসে তাঁহার কে কে মুরুব্বি আছেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় অথবা মুরুব্বি না থাকিলে অপর কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে চাকুরীর জন্য দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিতে থাকেন।

(খ) কেহ কেহ বা পড়াশোনা করিয়া তিনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন তদ্দ্বারা কি কি চাকরী হওয়া সম্ভব এবং সেই সমস্ত চাকুরী কোন্ কোন্ আপিসে আছে এবং সেই সেই চাকুরীতে কি কি জ্ঞানের ও কার্য্যশক্তির প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান করেন এবং সেই সেই জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি তাঁহার

নিজের আছে কিনা তৎসম্বন্ধীয় আত্মপরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির অভাব দেখিলে তাহা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া চাকুরীর দরখাস্ত করেন।

গ। কেহ কেহ বা প্রচলিত জীবিকার্জ্জনের পন্থাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থকরী পন্থা কোন্‌টি, তাহাতে কি কি জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন এবং সেগুলি অর্জ্জন করিবার প্রচলিত উপায় কি এবং কোন্ উপায়ে তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করেন এবং সেই জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া সেই অর্থকরী পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন।

এখানে একই জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা অন্বেষণে তিন প্রকারের মানুষ তিন প্রকারের কার্য্য করিতেছেন।

৩। চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিবার কার্য্য—

ক। কেহ কেহ হয় ত মনে করেন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করাই একমাত্র কার্য্য এবং তাহা মনে করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকেন এবং আদেশ পাইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া উন্নতিলাভের চেষ্টা করেন।

খ। কেহ কেহ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ প্রতিপালন ছাড়াও কি করিয়া আপিসের উন্নতি হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং আপিসের উন্নতি বলিতে কি বুঝায় এবং উন্নতি-বিধানের উপায় কি তৎসম্বন্ধীয় সংস্কারানুযায়ী কার্য্যবিধি অবলম্বিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করেন এবং সেই প্রকার কার্য্যবিধি অবলম্বিত না হইলে আপিসের সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া নিজের উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন।

গ। কেহ কেহ আপিসের উন্নতি বলিতে সাধারণ সংস্কারানুসারে যাহা বুঝায় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপিস ও আপিস সংক্রান্ত যত কিছু জানিবার থাকে তাহার প্রত্যেকটি ভাল করিয়া জানিয়া, ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের অবস্থানুসারে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং আপিসের উন্নতির নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা করেন।

এখানে চাকুরীতে উন্নতি লাভ করা রূপ একই কার্য্যে তিন প্রকারের মানুষ তিন প্রকার চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন।

৪। সাহিত্য-রচনার কার্য্য—

ক। কেহ কেহ হয় ত মনে যাহা আসে কাগজ কলমের সাহায্যে তাহাই প্রকাশ করিয়া তাহা শুনিতে শ্রুতিমধুর হইয়াছে কিনা তাহা দেখেন। এবং লেখা কানের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে ভাবিতে পারিলেই তাহাকে সাহিত্য আখ্যা দিয়া থাকেন।

খ। কেহ কেহ শুধু কানের প্রীতিতেই তৃপ্ত না হইয়া পারিপার্শ্বিক সংস্কারের ফলে একটা কিছু মনের ভিতর লইয়া তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে কি না এবং চিন্তিত ঘটনাগুলি সংস্কারানুযায়ী হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা করিয়া তাঁহার রচনাকে সাহিত্য মনে করিয়া থাকেন।

গ। কেহ কেহ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কেন লিখিব, যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহাদিগকে কি ভাবে সহায়তা করিব ইত্যাদি চিন্তা করিয়া এবং লিখিবার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, যে ধরণের সহায়তার জন্য লেখা হইতেছে তাহা কোন্ শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন, কি ভাবে লেখা প্রকাশিত হইলে সেই শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে, তজ্জন্য ভাষার ভঙ্গী কিরূপ হওয়া উচিত এবংবিধ চিন্তা করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন এবং লিখিবার সময় চিন্তা ও ভাষা সমঞ্জসীভূত হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকেন। এই সকল সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি যাহা লেখেন তাহাকে সাহিত্য আখ্যা দিয়া থাকেন।

একই সাহিত্য-রচনার কার্য্যে তিন রকম মানুষ এখানে তিন রকমের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন।

এইরূপ, জগতের প্রত্যেক কার্য্যই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতেছে। কার্য্যের সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, মনের কার্য্য ও বুদ্ধির কার্য্য।

আমরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব তাহার প্রত্যেকটিই কতক ইন্দ্রিয়, কতক মন ও কতক বুদ্ধির খেলার সমষ্টি। আমাদের অনেক কার্য্যে মন ও বুদ্ধির খেলার তুলনায় ইন্দ্রিয়ের খেলা অধিক হইয়া পড়ে, অনেক কার্য্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির খেলার তুলনায় মনের খেলা বেশী হইয়া পড়ে; আবার অনেক কার্য্যে

ইন্দ্রিয় ও মনের তুলনায় বুদ্ধির খেলাই বেশী হয়। এখানে পুনরায় বলিতেছি যে, আত্মার খেলা বুঝিবার মত ক্ষমতা-সম্পন্ন মানুষের কার্য্যের অবস্থা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই।

যে কার্য্যে মন ও বুদ্ধির তুলনায় ইন্দ্রিয়ের খেলা বেশী হইয়া পড়ে আমরা তাহাকে 'ইন্দ্রিয়প্রধান' কার্য্য বলিব এবং যে মানুষের জীবনের খেলার মধ্যে ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় তাহাকে 'ইন্দ্রিয়প্রবণ' মানুষ বলিব।

যে কার্য্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির খেলার তুলনায় মনের খেলা বেশী হইয়া পড়ে আমরা তাহাকে 'মনঃপ্রধান' কার্য্য বলিব এবং যে মানুষের জীবনের খেলার মধ্যে মনঃপ্রধান কার্য্য অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় তাহাকে 'মনঃপ্রবণ' মানুষ বলিব।

যে কার্য্যে ইন্দ্রিয় ও মনের খেলার তুলনায় বুদ্ধির খেলা বেশী হয় আমরা তাহাকে 'বুদ্ধিপ্রধান' কার্য্য বলিব এবং যে মানুষের জীবনের খেলার মধ্যে বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় তাহাকে 'বুদ্ধিপ্রবণ' মানুষ বলিব।

ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের মূলে থাকে—কোনও জিনিষ, কোনও গুণ অথবা কোনও কার্য্য, কোনও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আসিলেই সেই জিনিষ, সেই গুণ অথবা সেই কার্য্যটিকে সেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথবা অতৃপ্তিকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া। তৃপ্তিকর বলিয়া ধরা হইলে জিনিষটি, গুণটি অথবা কার্য্যটি যে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ধরা হয় যাহাতে সেই ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত থাকে তজ্জন্য ইচ্ছা হয়। অতৃপ্তিকর বলিয়া ধরা হইলে জিনিষটি গুণটি অথবা কার্য্যটি যে ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর বলিয়া ধরা হয় পাছে সেই ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া পড়ে তজ্জন্য দ্বেষ উপস্থিত হয়।

ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের চিহ্ন—চিন্তাহীনতা, অধীরতা, শৃঙ্খলার অভাব এবং প্রকট অভিমান।

ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যে সাফল্য আসিতেও পারে এবং নাও আসিতে পারে, সাফল্য আসিলে অতৃপ্তি সুনিশ্চিত। ইন্দ্রিয়-প্রধান কার্য্যের পন্থা সংস্কারানুসারে স্থিরীকৃত হয় এবং সংস্কারের মূলে বুদ্ধিকুশল লোকের সংসর্গ থাকিলে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে।

মনঃপ্রধান কার্য্যের মূলে থাকে কোনও জিনিষ, অথবা কোনও গুণ অথবা কোনও কার্য্য কোনও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথবা অতৃপ্তিকর মনে হইলে তৎক্ষণাৎ বিচার করা এটা তৃপ্তি-কর না অতৃপ্তিকর। পরক্ষণেই জ্ঞাতভাবে অথবা অজ্ঞাত-ভাবে সংস্কারের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া সংস্কারানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়। অথবা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কারানুসারে তৃপ্তিকর অথবা অতৃপ্তিকর মনে হইলে পুনরায় বিচার আসে, এটাকে তৃপ্তিকর অথবা অতৃপ্তিকর মনে করিব কেন? কিন্তু আবার সংস্কারের সহিত মিলাইয়াই জবাব স্থির করা হয় এবং সংস্কারানুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়।

মনঃপ্রধান কার্য্যের চিহ্ন—চিন্তাযুক্ততা, ধীরতা, অনুকরণ-প্রিয়তা, নজিরস্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাক্‌পটুতা, আংশিক শৃঙ্খলা কিন্তু পূর্ণ শৃঙ্খলার অভাব এবং প্রচ্ছন্ন অভি-মান।

মনঃপ্রধান কার্য্য সফলও হইতে পারে এবং বিফলও হইতে পারে; সাফল্যে তৃপ্তি আসিতে পারে এবং নাও পারে। সংস্কারের মূলে যাহার অথবা যাহাদের সংসর্গ থাকে সে অথবা তাহারা বুদ্ধিপ্রবণ হইলে এবং তাহার অথবা তাহাদের বুদ্ধিপ্রবণ কার্য্য উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য ঘটিলে সাফল্য ও তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা হয়।

বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের মূলে থাকে কোনও জিনিষ, কোনও গুণ অথবা কোনও কার্য্য কাহারও কোনও প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্ধীয় বিচার। তৃপ্তি অথবা অতৃপ্তির কোনও কথা বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যে থাকে না। তাহার-পর আসে 'কেন' প্রশ্ন। পরক্ষণেই সংস্কারের সহিত মিলাইয়া দেখা আরম্ভ হয় বটে এবং সংস্কারানুসারে জবাবও আসে বটে কিন্তু সংস্কারানুসারে কার্য্য আরম্ভ হয় না। সংস্কারগুলির পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং উপলব্ধি দ্বারা কোনও কার্য্যবিধি প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইলে তাহাই অব-লম্বিত হয়। ক্রমে ক্রমে একটি জিনিষে কতখানি জিনিষ, কতগুলি গুণ এবং কতপ্রকার কার্য্যশক্তি; একটি গুণ কত-গুলি জিনিষে আছে; একটি গুণ হইতে কতগুলি গুণ উৎপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে এবংবিধ পরীক্ষার আরম্ভ হয়। একটি জিনিষ হইতে কতগুলি জিনিষ উৎপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে এবংবিধ বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার ফলে জিনিষগুলির অযুগ্ম কারণ সন্ধানের চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে সমস্ত জিনিষের

মূল প্রকৃতি ও যে নিয়মানুযায়ী এই প্রকৃতি চলে তাহাও বাহির করা সম্ভব হয়।

বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের চিহ্ন—স্বাধীন চিন্তাশীলতা, পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, বিশ্লেষণশীলতা, অভিমানহীনতা, কার্য্যকুশলতা, নিরুদ্বিগ্নতা, পূর্ণ শৃঙ্খলা ইত্যাদি।

বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য কখনও অসফল হয় না।

চালচলন অনুসারে মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায়

মানুষের চালচলনে ইন্দ্রিয়ের খেলা, মনের খেলা ও বুদ্ধির খেলা এত বিশৃঙ্খলভাবে বিজড়িত থাকে যে, কোন্ কার্য্য ইন্দ্রিয়প্রধান, কোন্ কার্য্য মনঃপ্রধান, কোন্ কার্য্য বুদ্ধিপ্রধান অথবা কোন্ মানুষ ইন্দ্রিয়প্রবণ অথবা মনঃপ্রবণ অথবা বুদ্ধি-প্রবণ তাহা স্থির করা সুকঠিন।

অথচ আমি ইন্দ্রিয়প্রবণ অথবা মনঃপ্রবণ অথবা বুদ্ধিপ্রবণ ইহা স্থির করিতে না পারিলে আমার কি প্রয়োজন, স্থির করিতে পারিব না। আমি হয়ত আমার ইন্দ্রিয়-প্রবণতার জন্য একটি বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি উহা আমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুতঃ উহা হস্তগত হইলে আমার উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী সাধিত হইবে। সুতরাং সুকঠিন হইলেও আমাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা স্থির করিবার পূর্ব্বে আত্মপরীক্ষা দ্বারা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ইন্দ্রিয়প্রবণ অথবা মনঃপ্রবণ অথবা বুদ্ধিপ্রবণ এবং আমরা যাহাদের মধ্যে চলাফেরা করি তাহারা কে কি তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা অর্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ইন্দ্রিয়প্রবণতা প্রভৃতি কিরূপ বিজড়িত ভাবে মানুষের চালচলনে বজায় থাকে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা রাম, শ্যাম ও যদু নামীয় তিনজন ব্যক্তিকে লইয়া একটি ঘটনার বর্ণনা করিতেছি।

রাম, শ্যাম ও যদু তিনজন সমবয়স্ক যুবক বন্ধু। এক ছাত্রাবাসে তাহারা একত্রে বাস করে। এক সঙ্গীতবাদ্যের জলসায় একদা তাহারা তিনজনই নিমন্ত্রিত হইল। মাঝে মাঝে অবসরবিনোদনের জন্য সঙ্গীত-বাদ্যের আসরে ইহারা যোগদান করিলে ইহাদের অভিভাবকদের কেহই আপত্তি করিতেন না। পরীক্ষাতে তিনজনেরই ফল ভাল হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে এই কারণে তাহাদের খ্যাতি আছে।

জলসায় যোগদান করার কথা উঠিতেই—

রাম ভাবিল—

১। জলসায় যাইব কি যাইব না।

২। না গেলে শ্যাম ও যদু আমাকে অহঙ্কারী মনে করিবে, বন্ধুবিচ্ছেদও হইতে পারে।

৩। জলসায় কি ব্যাপার হয় তাহা দেখাই যাক না।

শ্যামও ভাবিল—

১। জলসায় যাইব কি যাইব না।

২। বাবা, কাকা, দেশের বড় বড় লোক সকলেই ত জলসায় যান।

৩। জলসায় যাওয়া যাক।

যদুর কোনও ভাবনাই আসিল না। সে শুনিয়াছে এই ধরণের জলসায় নানা আমোদপ্রমোদ হইয়া থাকে। আমোদপ্রমোদ তাহার ভাল লাগে। সে পরিপাটি বেশ-বিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইল।

তিনজনেই জলসায় উপস্থিত হইল। সঙ্গীতাদি পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। গায়ক-গায়িকা দুই-ই আছে। গায়িকাদের মধ্যে মিস নিরুপমা বসু ও মিস নিভাননী চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য, ইঁহারা উভয়েই রাম শ্যাম যদুর পরিচিত, সমস্ত ছাত্রমহলেই ইঁহাদের নামডাক শোনা যায়। শুধু গানবাজনার জন্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় ইঁহারা উভয়েই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। রাম, শ্যাম, যদুও লেখাপড়ায় খ্যাতনামা। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের জলসায় তাহাদের খ্যাতির একটু ঘটা করিয়াই হইল। তিন জনে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল।

গানের পর গান শেষ হইতেছে, করতালি-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখর, চায়ের পেয়ালা, সিঙ্গারা কচুরী সন্দেশের সরা ও পানের ট্রে হাতে ভলান্টিয়ারগণ ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছে, সবাই উৎসুক চঞ্চল। সবাই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এদিকে-ওদিকে দেখিতেছে, কানাকানি, হাসাহাসি ও অস্ফুট গুঞ্জন শ্রুত হইতেছে। বসিয়া বসিয়া রাম চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গানে তাহার

কান আছে কিন্তু তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও নিশ্চেষ্ট নয়। সে দেখিল—

১। ঘরটি কি আয়তনের, দেখিতে কিরূপ, জলসার জন্য কি ভাবে ঘরটি সজ্জিত হইয়াছে, বাদ্যকরেরা কোথায় বসিয়াছে, গায়ক গায়িকারাও কোথায় উপবিষ্ট—অর্থাৎ ঘরটি সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু দেখিবার আছে এবং ভিতরের ও বাহিরের বন্দোবস্ত সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সম্মিলিত ভাবে দ্রষ্টব্য সব কিছুর একটা ছবি সে মনের মধ্যে আঁকিয়া লইল। নানা 'কেন' প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে জাগিতে লাগিল এবং প্রশ্নগুলির উত্তরও সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল।

২। নিমন্ত্রিত ছাত্রছাত্রীদের বেশভূষা, চালচলনের পার্থক্য অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যত কিছু তাহারও তুলনামূলক একটা ছবি সে মনের মধ্যে আঁকিয়া লইল।

৩। গায়কগায়িকা ও বাদ্যকরদিগের গীতবাদ্যের ভঙ্গী ও তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের একটা পরিমাপ সে করিল।

অর্থাৎ জলসা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য এবং জ্ঞাতব্য যাহা কিছু রাম সমস্তই দেখিয়া ও জানিয়া লইল।

এখানে রামের স্বভাবের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সে তাহার নিজের চালচলনে এবং বন্ধুবর্গের সহিত কথাবার্ত্তায় কখনও অসংযত ও অসংলগ্ন না হইলেও উদাসীন। জলসাতেও সে নিজে কোনও ব্যাপারে উৎসাহ না দেখাইয়া একান্তে বসিয়া জলসার যাবতীয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট অথবা নানা পুস্তকাদিতে এই ধরণের জলসার গীতবাদ্য, সাজসজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে এতকাল যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল সেই হিসাবে এখানকার গীতবাদ্য সাজসজ্জার বিচার করিতে করিতে স্থির করিবার চেষ্টা করিল—কি করিলে এই ধরণের জলসায় সভ্য ও শ্রোতাদিগের পূর্ণ আরাম হওয়া সম্ভব, কিরূপ বেশভূষা এরূপক্ষেত্রে সম্মানকর অথবা অসম্মানকর, গীতবাদ্য কি প্রকারের হইলে সকলের শ্রুতিমধুর অথবা শ্রুতিকটু হয়, এইরূপ সম্মিলিত সভায় গায়কগায়িকা বা উপস্থিত স্ত্রীপুরুষের চালচলনের কিরূপ পার্থক্য হয়, এইরূপ বিচারে রাম নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে লাগিল।

শ্যামও নিশ্চেষ্ট ছিল না, আপাতদৃষ্টিতে জলসা সম্বন্ধে যত কিছু লক্ষ্য করিবার বা শ্রবণ করিবার আছে, শ্যাম সকল কিছুই লক্ষ্য করিল ও শুনিল; গীতবাদ্য সম্বন্ধেও দেখিল শুনিল। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব বা পুস্তকাদি হইতে এবিষয়ে সে যাহা জানিয়াছিল এক্ষেত্রে তাহার পূর্ণসমাবেশ হইয়াছে কি না তাহাও সে তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিল বটে, কিন্তু কি করিলে অথবা কিসের অভাব থাকিলে এইরূপ জলসা পূর্ণাঙ্গ বা অঙ্গহীন হয় সে সম্বন্ধে তাহার চিন্তা না থাকাতে তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইল না। সে নিজের চালচলনে এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত বাক্যালাপে সংযত ও সংলগ্ন। ভদ্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় সংস্কার তাহার সদাজাগ্রত। সুতরাং এই জলসায় তাহার নিজ ব্যবহারে যাহাতে কোনও ব্যভিচার না ঘটে সে সম্বন্ধে সে সতর্ক হইয়া কাজ করিতে লাগিল।

যদুর দেখাশোনার বিচারবিতর্কের বালাই নাই, সে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে ব্যস্ত। সে স্ফূর্ত্তিবাজ, চিন্তার ধার ধারে না। উপস্থিত অনেকের সহিত তাহার আলাপ হইল, অনেককে সে মোটে পছন্দ করিল না। এই দ্রুত পরিচয়ের ফলেই সে ডজন খানেক নবপরিচিত বন্ধুর নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করিল; এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় জলসা বা গান-বাজনার দিকে নজর দিবার অবসর তাহার বেশী রহিল না। শ্রোতৃমণ্ডলী যখন সঙ্গীতে অথবা বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া করতালি-ধ্বনি দ্বারা তাহাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করিতে লাগিল সেও করতালি দিয়া আপনার গুণগ্রাহিতা জাহির করিতে দ্বিধা করিল না; গায়ক ও বাদ্যকারগণও তাহার রসবোধে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

বিশেষ করিয়া মিস বসু ও মিস চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বে সকলেই মুগ্ধ হইল। একে তাঁহারা লেখাপড়ায় ভাল, তাহার উপর গীতবাদ্যেও এমন পটু—তাঁহাদের নাম সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল, উপস্থিত অন্যান্য ছাত্রীরা এই দুই জনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইলেন।

জলসা সমাপ্ত হইল। রাম, শ্যাম ও যদু ছাত্রাবাসে ফিরিবার পূর্ব্বে সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেল; মিস বসু ও মিস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাহাদের আলাপ হইল। যদুর সুস্পষ্ট করতালি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, যদুই তাঁহাদের সমধিক প্রীতি লাভ করিল; শ্যামের ভদ্র ব্যবহারেও

তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। রামের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোনও অভিযোগ না থাকিলেও তাহার ঔদাসীন্য বশতঃ সে কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইতে অথবা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না।

তিন বন্ধু মেসে ফিরিল। পড়াশোনায় তিন জনেই ভাল, রাত্রির আহারের পর তিন জনে স্ব স্ব পড়িবার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া জলসায় যাওয়ার দরুণ যে সময়টুকু ব্যয় হইয়াছিল একটু রাত্রি জাগিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে বলিয়া মনস্থ করিল।

রাম পড়িতে বসিয়াই তাহার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। শ্যাম পড়িতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পাঠ্য বিষয়ে তাহার ঠিক মনোযোগ আসিল না। জলসায় কাহার কি ব্যবহার সে লক্ষ্য করিয়াছে, নিজেই বা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ কোথায়, ব্যবহারের আদর্শ সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের সহিত কাহার ব্যবহারের কোথায় গরমিল ইত্যাদি কথা তাহার মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার পড়া ঠিক মত হইল না। যদুও পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিল কিন্তু মিস বসু ও মিস চট্টোপাধ্যায়ের রূপ ও বাক্যভঙ্গী তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। সে পড়িতে পারিল না। সেই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য উসখুস করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে না পারিয়া সে রাম ও শ্যামকে ডাকিয়া মিস বসু ও মিস চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। রাম তখন পাঠ্য পুস্তকে নিবদ্ধমন, যদুর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, যদু, ওদের দুজনকে তোমার অত সুন্দর লাগল কেন বল ত? মেয়েদের সৌন্দর্য্য বলতে তুমি কি বোঝ?

যদুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই শ্যাম বলিয়া উঠিল, তুমি ওকথা কেন বলছ, রাম? তাদের কোনও ত্রুটি কি তোমার নজরে পড়েছে? অবিশ্যি তারা সেকেলে মেয়ে নয় কিন্তু এখন মডার্ণ মেয়েই তো চাই। আমাদের মেয়েরা সবাই যদি তাদের মত হত তাহলে আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকত না। এ বিষয়ে অমুক অমুক লেখক—

রাম আর শুনিতে চাহিল না, বাধা দিয়া বলিল, তার চাইতে এ বইটা কি বলছে জানা আমার বেশী দরকার। আপাতত পরীক্ষাটা পাশ করতে হবে; সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার সময় পরে পাওয়া যাবে।

রাম আর কোনও কথা না বলিয়া পড়িতে লাগিল। শ্যাম আর যদু কিন্তু এই প্রসঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মিস বসু ও মিস চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা চলিল, যদু যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, শ্যাম ততই বড় বড় সৌন্দর্য্যবিদ্‌দের কথার নজির দেখাইতে থাকে, এই নজিরের জোরে সে শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণই করিয়া দিল যে, তাহারা দুইজনেই আদর্শ রমণী। এত কথা শুনিবার মত ধৈর্য্য যদুর ছিল কি না আমাদের জানা নাই কিন্তু এই দুই জনের সহিত আলাপটা ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য সে যে নানা মতলব আঁটিতে লাগিয়া গেল, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার বর্ণনা বিস্তৃততর না করিয়া আমরা এখানে এই ব্যাপারে রাম, শ্যাম ও যদুর পৃথক পৃথক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য হেতু মানুষের শ্রেণীবিভাগে তাহাদিগকে কোন্ কোন্ শ্রেণীতে ফেলিব তাহার বিচার করিব।

এই ঘটনায় তিনটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। (১) জলসায় যোগদান করিবার প্রস্তাবে তিনজনের মনোভাব। (২) জলসায় উপস্থিত হইয়া তিনজনের দেখাশোনার পদ্ধতি ও মনোভাব ও (৩) জলসা হইতে ফিরিবার পর তিন জনের মনোভাব।

রামের ব্যবহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—জলসায় যাওয়ার প্রস্তাবে রামের কার্য্যে মনঃপ্রধানতা দেখা দিলেও জলসা ব্যাপারটা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে সে সেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছে। জলসায় উপস্থিত হইয়া তাহার ব্যবহারেও প্রথমতঃ মনঃপ্রধানতা লক্ষ্য করা যায়, কারণ কতকটা খুঁটাইয়া দেখা মনঃপ্রধান কার্য্যেও সম্ভব এবং মনঃপ্রধান কার্য্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী কতকদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। অমুক ব্যক্তি অমুক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিয়াছেন, অমুক বস্তু অমুক ভাবের হইলে অমুক বড় লোক-দের উপদেশানুযায়ী হইল কিনা এই প্রকারের চিন্তা মনঃপ্রধান কার্য্যেও পরিস্ফুট। বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যেও প্রথম প্রথম উপরোক্ত প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া গেলেও ইহাতেই বুদ্ধিপ্রধান

কার্য্যের সমাপ্তি নয়। যে উদ্দেশ্যে প্রচলিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করিয়া বাহির করা, প্রচলিত উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ফল কি হইতেছে এবং তাহাতে কার্য্যকারীগণের কোনও উন্নতি হইতেছে কিনা এ সকল পরীক্ষা করা বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের বৈশিষ্ট্য। জলসা-ঘর, সমবেত লোক, গীতবাদ্য দেখা-শোনায় রামের মনে এইরূপ বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই রামের মনে বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যও আছে। মেসে ফিরিয়া রাম যে শৃঙ্খলতার সহিত পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল তাহা সাধারণ শৃঙ্খলতা হইতে উন্নত ও বুদ্ধিপ্রধানতার পরিচায়ক।

রামের চিন্তায় কি আছে অথবা নাই, রামের কার্য্যের উদ্দেশ্য কি, সে চেষ্টা করিলে তাহা সহজেই ধরিতে পারে এবং আত্মপরীক্ষা আরম্ভ করিলে সে নিখুঁতভাবে স্থির করিতে পারে যে ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ ও বুদ্ধিপ্রবণ এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সে কোন্ শ্রেণীর।

বাহিরের মানুষের বিচারে দেখা যাইতেছে যে তাহার কার্য্যে ইন্দ্রিয়প্রধানতা নাই—মনঃপ্রধানতা ও বুদ্ধিপ্রধানতা আছে এবং প্রথম প্রথম তাহার চিন্তায় ও কার্য্যে মনঃপ্রধানতার লক্ষণ দেখা গেলেও তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যে বুদ্ধিপ্রধানতা প্রকট। সুতরাং রামকে বুদ্ধিপ্রবণ বলিতে হইবে।

শ্যামের ব্যবহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রথম হইতেই তাহার কাজে মনঃপ্রধানতা প্রকট। জলসায় যাওয়ার প্রস্তাব উঠিবামাত্রই তাহার মনে আসিয়াছে, বাবা, কাকা ও অন্যান্য বড়লোকদিগের মতে জলসায় যাওয়া অসঙ্গত নয়, জলসায় যাওয়ার পর তাহার চিন্তা ও কার্য্য ভদ্রতারক্ষার জন্য সজাগ এবং তাহার ভদ্রতার আদর্শ সংসর্গজ সংস্কারমূলক। শ্যামের কার্য্য ও চিন্তায় মানুষের কল্যাণ সাধন করিয়া ভদ্রশ্রেণীর হইতে হইলে কি কি ভাবিতে হয়, এবং কি কি করিতে হয় এবং তাহার ভদ্রতার আদর্শ তৎসমঞ্জসীভূত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা নাই। মেসে ফিরিবার পরও শ্যামের কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যে সংস্কারপ্রবণতাই বেশী। সুতরাং শ্যামকে সহজেই মনঃপ্রবণ লোক বলা যাইতে পারে।

যদুর চরিত্র বিশ্লেষণের ভার আমাদের পাঠকদিগের উপর রহিল।

চালচলন অনুসারে মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার প্রথম উপায় নিজের কার্য্যগুলি বিশ্লেষণ এবং নিজে কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা স্থির করিবার চেষ্টা। নিজের কার্য্য ও নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত হইলে জগতের সকল মানুষ এবং সকল মানুষের সকল কার্য্য বিশ্লেষণ করিতে পারা এবং সেগুলি আমাদের কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর হইতেছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন নহে। আমাদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে আমাদেরই নিজ নিজ অসঙ্গত কার্য্য এবং কার্য্যগুলির মূল কারণ—ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত আমাদের সংসর্গজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক পাঠদ্বারা অর্জ্জিত সংস্কার।

আমাদের সুখসাচ্ছন্দ্যের মূলেও আমাদের কার্য্য এবং তাহারও কারণ উপরোক্ত জাতীয় সংস্কার। আমরা যাহাদের সংসর্গ করিয়া অথবা যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়া সংস্কার অর্জ্জন করি তাহারা এবং সেগুলি বুদ্ধিপ্রবণ হইলে অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রবণ লোকেদের নিকট হইতে সংস্কার প্রাপ্ত হইলে আমাদের সংস্কারগুলি স্বাস্থ্যকর হইতে পারে এবং আমাদের সুখসাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত হয়। অন্যথা আমাদের সংস্কারগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে এবং আমাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর হওয়ার আশা সুদূরপরাহত হয়।

সুতরাং দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার প্রধান উপকরণ সুসংস্কার এবং তাহা লাভ করিবার উপায়, আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে সংস্কার অর্জ্জন করিয়া থাকি তাঁহারা এবং তাঁহাদের কার্য্য কোন্ শ্রেণীর তাহা পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা লাভ। কাজেই, সুকঠিন হইলেও চালচলন দেখিয়া মানুষের ও মানুষের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর আমরা 'বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম' সম্বন্ধীয় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

রেখাচিত্র [শিল্পী—শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়

তোমরা ও আমরা

—শ্রীমাধুরী মিত্র

বিহঙ্গ-লঘুপাখা মেলিয়া
তোমরা চলিয়া যাও আকাশে,
পশ্চাতে নীড়খানি ফেলিয়া
উড়ে চলো দক্ষিণা বাতাসে।
গগনের নীলিমায় যে মায়া
তোমাদের নয়নেও সে ছায়া ;
অসীমের অখিলের স্বপনে
তোমাদের তনুমন ভুলেছে,
তাইতো মুক্ত নীল গগনে
সোনার পাখীটি পাখা খুলেছে।

২

বিশ্ব-সুষমা সব ভুলানো
তোমরা স্বপন দেখো বধূরে,
অপ্সরা-মেঘ-মায়া বুলানো
বাসর-মিলন ভাসে অদূরে ;
তোমাদের পূর্ণিমা-আলোতে
দীপ্তির ছটা আনে কালোতে ;
দিগ্বধূ জেগে থাকে যামিনী
হাতে নিয়ে অর্ঘ্যের থালিকা,
স্বর্গের সেরা পুর-কামিনী
গলে দেয় মিলনের মালিকা।

৩

উর্ণনাভের জাল বুনিয়া
তোমরা রচনা কর স্বর্গ,
কল্প-তরুর দান গুণিয়া
হাতে পাও সে চতুর্ব্বর্গ।
কল্পনা-কারু-নৈপুণ্যে
তোমরা নিবস' দূর শূন্যে ;
স্নেহাতুর বন্ধনে বাঁধিলে
তোমাদের প্রাণ হয় তিক্ত ;
ধরণীর অঙ্গনে পা দিলে
আপনারে ভাব চির-রিক্ত।

৪

আমরা উড়িতে নারি আকাশে,
কল্পনা অতদূরে যায় না,
আকাশ মোদের চোখে ফাঁকা সে,—
শূন্যেরে প্রাণ কভু চায় না।
আমরা আঁকড়ি থাকি ধরণী
—স্নিগ্ধা শ্যামলা মন-হরণী—
মোরা এই পৃথিবীর কন্যা,
মাটি-মার দুটি পা-ই স্বর্গ ;
মানি নাকো কোনো দেবী অন্যা,
প্রাণভরে তাঁরে দেই অর্ঘ্য।

৫

খুঁজি না কথনো প্রেম-স্বপনে
অপ্সর-কিন্নর-যক্ষ,
চিরশুভ মিলনের লগনে
ধরণীর তরুণেই লক্ষ্য।
সুশ্রী সুঠাম চারু যুবাতে
তনুমন সব চাই ডুবাতে ;
ভালোবেসে এ বিশ্ব ভুলিয়া
সব দিয়ে সঁপে দেই চিত্ত।
তোমরা লইবে বলে তুলিয়া
খুলে রাখি হৃদয়ের বিত্ত।

৬

মাটির দেয়ালে ঘেরা কুটীরে
শীতল নিবিড় ছায়া বিজনে,
বেঁধে রাখি ছোট প্রাণ দুটিরে
সীমানার নিরালায় নিজনে।
মাটির প্রদীপ-শিখা স্তিমিত
জ্যোৎস্না আলোতে হয় মিলিত।
সিগ্ধ প্রেমের শুভবাসনা
দুটি প্রাণ পারে এক করিতে ;—
তোমরা তবু যে ভালবাস না
নীড়ের মায়ায় বাঁধা পড়িতে।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

এবার আমি সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া তাঁহার কবি-কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে আমি তাঁহার প্রতিভা ও কবিমানসের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি—এবার যতদূর সম্ভব কাব্য হইতেই কবি-পরিচয় সংকলন করিব।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন ছিলেন। তাঁহার দুইটি উক্তি ইহার সাক্ষ্য দিবে। 'সবিতা-সুদর্শন' কাব্যের নায়ক তাহার অধ্যাপক-গুরুকে বলিতেছে—

লভিলে জীবনে মুক্তি তব অধ্যাপনে,
রাম নাম না চাই মরণে।
* * *
বিধির বিনোদ বিশ্ব-রচনা যেমন
যদি প্রভু দেখাও আমায়।

—'বিশ্ব-রচনার রহস্য যে জানিয়াছে সেই 'জীবনে মুক্তি' লাভ করিয়াছে; রাম-নামের দ্বারা মুক্তি চাই না।' জীবন ও বাস্তব প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি এই অতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা—ইহাই আমাদের নব্য সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা; এই মানস-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বাঙ্গালার দ্বিতীয় Renaissance-এর মূল প্রবৃত্তি। সুরেন্দ্রনাথ যেন একটু আতিশয্য সহকারে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভট কল্পনার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ জাগিয়াছিল, তিনি কাব্যেও কোনও কাল্পনিক তত্ত্বকে আমোল দিবেন না। যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও তরল sentimentalism সে যুগের কবিগণকে মাতাল করিয়াছিল তাহাকেই যেন ব্যঙ্গ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আর এক স্থানে বলিতেছেন—

হে কবি কল্পনা-মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতী!
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী;
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
ভ্রম গিয়া ছায়াপথে,
—কর ইন্দ্রচাপ বিরচন,
কিম্বা কর পরীসনে চন্দ্রিকা-ভোজন,
আমি না করিব দেবি! তব আবাহন।

বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে দেবি! তব উপাসনা।
তোমার মুকুরপরে
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার কায়া নাই যার;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

বাংলার উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইংরেজী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী আসিয়া কবিকল্পনার উদ্দাম গতি শাসন করিতেছে—এ রহস্য মন্দ নয়! বিশ্ব-রচনা-রহস্যকে কল্পনায় ভেদ না করিয়া, জাগ্রত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুসামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়া দুর্জ্ঞেয় নিয়তিকে বুদ্ধি-সঙ্গত ন্যায়নীতির অধীন রূপে ধারণা করিবার এই প্রবৃত্তি—উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার অনুকূল নয়। তথাপি সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতায় এমন একটা প্রবল স্বাধীনতা আছে—জীবন ও জগৎকে তাহার বাস্তবরূপে বরণ করিবার সরল সবল মুক্ত মানসিকতার আবেগ আছে যে, তাঁহার কাব্যে ইংরেজী অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম বিলাসকলা-কুতূহল নাই; ভাবের মধ্যে যথেষ্ট প্রাণগত উৎকণ্ঠা ও দুঃসাহস আছে, এবং ভাষায় ও ছন্দে অতিরিক্ত ভব্যতা ও মসৃণতার পরিবর্ত্তে অকপট প্রকাশ-ব্যাকুলতা আছে।

এইবার কাব্যপাঠ আরম্ভ করিতেছি। 'সবিতা-সুদর্শন' নামক কাব্যের নায়ক সায়ংসন্ধ্যায় সূর্য্য-বন্দনা করিতেছে—

"জীবন কিরণাকর ভুবন-প্রকাশ!
তুমি আদি সৃষ্টি অনাদির;
সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা আভাস
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির।"

"অনাদি অনন্ত কাল-ভুজঙ্গের কায়
স্বর্ণশরে না কাটিলে তুমি,
বিশাল বেষ্টনে চির রহিত নিদ্রায়
রম্য এ বিপুল বিশ্বভূমি।"

"দীধিতি-নিধান ! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !
পালক জীবন-উষ্ণতার,
বিশ্ব-আত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার।"

"অসীম আকাশ-ক্ষেত্রে বালক-ক্রীড়ায
সদা তব মণ্ডল-ভ্রমণ ;
রাশি হ'তে রাশি পরে ললিতলীলায়
পরশিত কাঞ্চনচরণ।"

"এলোচুলে হেলে দুলে মিলে করে করে
আগে আগে নাচে হোরাগণ,
একচক্র রথ চলে, চলে তার পরে,
পরে পরে ঋতু চয়জন।"

"বিচিত্র নীরদ কেবা বর্ষায দেখায়
কভু নীল-কমল-নীলিমা,
কখন দলিত কৃষ্ণ কজ্জলের প্রায
কভু গুর্ব্বী-কুচের কান্তিমা।"

"পারদ মাথায় কেবা শরদ-শরীরে,
কাশফুল কাননে দোলায,
কুযাসার যবনিকা অন্তরালে ধীরে
হাসো বসি হেমন্ত উষায়।"

"কীলক সমান বলে পণ্ডিতে তোমায
পেয়ে যার আলম্বন-বল,
বেগে বিঘূর্ণিত সবে আপন কক্ষায
ছোট বড় লোক-চক্র দল।"

"হেসে হৈমবতী উষা ডাকিছে তোমায,
হেসে তুমি চলিতেছ তায়,
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়
ছায়া-সতী, সপত্নী ঈর্ষায়।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে যুগ নূতন গদ্যসৃষ্টিব যুগ। সে যুগে কবিতাব ভাষা যমক-অনুপ্রাস-শিঞ্জিত পয়ারের গুঞ্জরবোলে বিগলিত ঈশ্বর গুপ্তেব যুগ তখনও অবসান হয় নাই। তথ্য ও তত্ত্ব, চিন্তা ও ভাবুকতার যে জোয়াব তখন আসিয়াছে, তাহারই প্রকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার নব সাহিত্যিক রূপ গড়িয়া উঠিতেছিল—সেই রূপ গদ্যের ভিতরেই বিকাশ লাভ করিতেছিল। এই রূপ—ভাষার নব-সংস্কৃত রূপ ; ইহা সংস্কৃত শব্দ ও পদযোজনাপদ্ধতির দ্বারা সুসংবদ্ধ ও সুবলয়িত। ভাষার এই নূতন ধ্বনি পুরানো পয়ারকে আশ্রয় করিয়া তাহার ঢং বদলাইয়া দিল। ত্রিপদী, দীর্ঘ-ত্রিপদী ও চৌ-পদীর একঘেয়ে যতিবিন্যাস ও সেই সকল যতির মুখে ঘন-ঘন মিল-রক্ষা বাংলা কবিতাকে ভাব-গদ-গদ ও মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছিল। পয়ার হইতেই মধুসূদন নূতন সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার নব-সংস্কৃতির বলে। হেম ও নবীন এই গদ্য-ধ্বনিকে পদ্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু অমিত্রাক্ষর বা মিত্রাক্ষর, কোনও ছন্দেই সে ভাষাকে কাব্যের উপযুক্ত সুষমা দান করিতে পারেন নাই—ছন্দোময়ী ওজস্বিনী গদ্য-বক্তৃতাই তাঁহাদের কাব্যগুলিতে স্থান পাইয়াছে। হেমচন্দ্র ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী ও চৌপদীকে তাঁহার খণ্ড-কবিতার বাহন করিয়াছেন, অথচ, সেগুলির ভাষা আদৌ সে ছন্দের উপযোগী নয়। বিহারীলাল নূতন গীতিচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক ; তিনি পয়ারকেও গানের সুরে ঢালিয়া গড়িয়াছেন—তাঁহার ভাষা তরল ও সরল। সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন ধ্বনিকে তাহার উপযোগী ছন্দ-রূপ দান করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজী কাব্য হইতে stanzaর ছাঁদটিকে আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। Stanzaও গীতচ্ছন্দ। তথাপি মাইকেল পয়ারকে যে কৌশলে মহাকাব্যের সুরে বাঁধিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের **stanza** রচনায় পয়ারকে সেইরূপ কৌশলে অন্যরূপে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস আছে। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে যে সুর বাজিয়াছে তাহাকে পয়ারের স্তোত্রচ্ছন্দ বলা যাইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা অপেক্ষাও মধুর ও গম্ভীরতর কাব্যবস্তু এইরূপ পয়ারছন্দের চৌপদী stanzaয় যে কত সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে তাহা সেকালের আর কোনও কবির এই ধরণের রচনা হইতে বুঝা যায় না। এই কবিতার ভাবসম্পদ ও ভাষা সর্ব্বত্র সমান নয় ; তথাপি, ছন্দের উপযোগী গাঢ় বাগ্‌বিন্যাসই যে ইহার অন্তর্গূঢ় শক্তি ও সুষমার কারণ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই কবিতার প্রত্যেক চরণে ছন্দোগত যতি ভাবগত সংযমে মনোহর হইয়াছে ; অতি সাধারণ ভাব-চিন্তাও ভাষা এবং ছন্দের নিয়মসংযমে রসধ্বনিময় হইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্র-নাথের হাতে বাংলা ছন্দের এই stanza-রূপ এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এই আদি আভাস লক্ষ্য করিয়াই

আমি এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভাবের দেহ-নির্ম্মাণ, ভাবের উপযোগী ভাষা ও ছন্দ-সৃষ্টি। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, যেখানে ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ হয় ভাব ভাষাকে ত্যাগ করিয়াছে অথবা ভাষা ও ছন্দকৌশল ভাবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে সেখানে ভাষা বা ছন্দ কোনটাই 'সৃষ্টি' হয় নাই; তাহা কোনও জাতির কাব্যসাহিত্যকে একটুকুও সমৃদ্ধ করে না।

ইহার পর আমি কয়েকটি কাব্য-খণ্ড পর পর উদ্ধৃত করিব। মহিলা-কাব্যের অবতরণিকায় কবি বলিতেছেন—

বর্ণিতে না চাই হ্রদ নদ সরোবর
সিন্ধু শৈল বন উপবন।
নির্ম্মল নির্ঝর মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ত্তন।
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!

'হৃদয়ে জেগেছে তান' তার প্রমাণ এই কয় ছত্রেই আছে: 'প্রাণ পুলকে আকুল' কিনা তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রমাণ করিবে।

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার;
যত কাম্য হৃদয়ের
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাব ভাব রমণীর
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার-ফণীর!

এই শ্লোকটির সঙ্গে অপর দুই কবির কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে পাঠক খুসী হইবেন। প্রথম চারি ছত্রের সহিত পাঠ করুন—

তুমি কামনার কাম্য, কিন্তু হৃদি-পদ্মের-পলাশ।
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা!—
রাস রসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা!

শেষ ছত্রের সহিত—

তুমি গায়ত্রী! ঋষি যেই হোক—শয়তান, ভগবান।
পরাণহন্ত্রী মদিরেক্ষণা তুমিই প্রাণেশ্বরী।
তোমারি গন্ধে, জ্যোতি ও ছন্দে, পরমাণু মধুমান—
তুমি আছ তাই গান গেয়ে কাটে সংসার-শর্ব্বরী।

ইহারও শেষ দুই ছত্রই তুলনীয়। তুলনার জন্য উদ্ধৃত প্রথম কবিতাটি আধুনিক কবির রচনা—ভাষা ও উপমা কতকটা ভিন্ন হইলেও মূল ভাবের সাদৃশ্য অতিশয় সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়টি একটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ। সুরেন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই সাদৃশ্যও দেখাইতে হইবে—বিশেষতঃ পরবর্ত্তী খ্যাতনামা কবিগণের কাব্যে সেই সকলের আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য দেখা যায়। ভাবুকতার দিক দিয়া সুরেন্দ্রনাথ যে ইঁহাদের অগ্রবর্ত্তী এবং সে জন্য সেকালের পক্ষে তিনি কত আধুনিক, ইহাই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এখন কবিতা-পাঠ চলুক—

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি-পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু-চরণ-চুম্বিত,
কি সীমান্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয়ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে
ঢল ঢল লাবণ্যের জল!
পাটল কপোল কর-চরণের তল!

*   *   *

পূজিবার তরে ফুল ঝরে' পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা
অশোক লভিল ধরা,
এলোকেশে কে এল রূপসী!—
কোন্ বনফুল, কোন্ কাননের শশী!

শেষ দুইছত্রের ছন্দ-হিল্লোলে খাঁটি লিরিকের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির কানে পয়ারের যে একটি বিশেষ সুর ধরা দিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট আছে।

লতাপর্ণ পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর
রচে নর বাসরের ঘর;
পুষ্পতল্পে কামিনীর ফুল-কলেবর!
ফুলশরে পুরুষ কাতর!
নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী,—
ধরা 'পরে করিল রোপণ
সমাজতরুর বীজ—দম্পতি-মিলন।

* * *

কামিনী-কিরাত রূপ-জাল বিস্তারিয়া
ভক্ষ্যরূপে তনু সমর্পিয়া,
ধরণী-অরণ্যে নর-বানর ধরিয়া,
বান্ধি-তারে প্রেম-ডুরি দিয়া,
বাস ভূষা দিয়া অঙ্গে
নাচাইয়া নানা রঙ্গে
নির্ব্বাহিছে সংসার ব্যাপার ;—
ছেড়ে দিলে ডুরি, বন্য বানর আবার।

এই দুইটি নিতান্ত গদ্যময় পদ্য-স্তবকে যে ভাব-চিন্তা রহিয়াছে তাহাকেই যেন পরবর্ত্তী কালের এক খ্যাতনামা কবি অপূর্ব্ব কাব্যসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন—

নারি,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি কঠোরে কোমল মূর্ত্তি
শুষ্ক জড়জগতের নিত্য নব ছলা,
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা !

তুমি স্বস্তি শান্তিদাত্রী, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী পালয়িত্রী ভবদুখহরা ;
আত্মমধ্যা স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা
মুগ্ধা, আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষ-কাতরা।

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।

তুমি হেসে বসে বামে সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে শিবে! হইতে সুন্দর,
তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর !

[অক্ষয়কুমার বড়াল]

ইহার পর সুরেন্দ্রনাথের আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করি—

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণ-সঞ্চার,
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর :—
পেয়ে হেন রূপ ছবি,
মানব হইল কবি,
বনিতা সবিতা কবিতার !
মর্ত্ত্য ফুঁড়ে বিকশিল কুসুম মন্দার !

* * *

সীমন্তিনী সহবাসে শোধিত শরীর,
সীমন্তিনী-সংশোধিত মন,
অনুসরি' বিচিত্র চরিত্র রমণীর
পেলে নর প্রকৃতি নূতন।
স্বার্থপর শ্মশ্রুধর
স্বভাবের পশু নর,
শিখাইলে শিখে—এই গুণ,
শিক্ষাদাত্রী হরিণাক্ষী আচার্য্য নিপুণ !

উপরিউদ্ধৃত প্রথম স্তবকের প্রথম চারিছত্র ও দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ, অপর এক কবির নিম্নোদ্ধৃত কয়-পংক্তির ভাব-বীজ বহন করিতেছে বলিয়া মনে হয়—

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য – তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায় !
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

[দেবেন্দ্রনাথ সেন]

তারপর—

সংসার পেষণী, নর অধঃশিলা তায়,
রেখে মাত্র আলম্বন যার
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়—
কীল-রন্ধ্রে মিলন দোঁহার !
ভাব-চক্ষে নিরখিয়া
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল !—
রমণী-রমণ-রসে পুরুষ বাতুল !

এই পংক্তিগুলি সুরেন্দ্রনাথের কবি মনের মনস্বিতা—তত্ত্বচিন্তার সহিত রূপক-কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রণের নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এ ধরণের ভাবদৃষ্টি ভারতীয় সংস্কৃতির ফল। তথাপি আধুনিক ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের মূলকথা অতি সংক্ষেপে এখানে একটি মাত্র উপমায় কেমন সূচিত হইয়াছে! কবি অবশ্য সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব হইতে এই উপমাটির প্রেরণা পাইয়াছেন।

ইহার পার্শ্বে বর্ত্তমান লেখক ইংরেজীতে যে দুই কথা নোট করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

—An image in illustration of the Samkhya doctrine, not flattering to man ; a queer sex-symbolism, very original and bold.

ইহারই ব্যাখা করিয়া কবি বলিতেছেন—

মুসা-উক্তি—মানবে মজালে মহিলায়
দিয়া জ্ঞান রস-আস্বাদন ;
সদলে সেহেতু দুঃখ পশিল ধরায়—
জরা, ব্যাধি, রোদন, মরণ।
মিলাইয়া নিজ যুক্তি
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,
নিন্দা নয় ; স্তুতি ললনার—
অমরত্ব ছাড়ে নর প্রেমভরে যার !

সংসার তখন ছিল এখন যেমন,
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আদি-নারী দিয়া তায় সুখ-আস্বাদন,
বিকশিল বোধ-কলি তার।
মুসা মিলে সাংখ্য সনে,
বুঝ বিচারিয়া মনে,
সুখবোধে দুঃখের সন্ধান—
বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত জ্ঞান !

"বিকশিল বোধ-কলি তার"—এই উক্তি ফ্রয়েডীয় যৌন-তত্ত্বেরও পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছে।

ম হি লা-কা ব্যে র 'অবতরণিকা' অংশ হইতে আর দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিব—কল্পনার দৃপ্ত আবেগে এই পংক্তিগুলি কি অপূর্ব্ব—

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-যানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়—
নারী করে প্রসব নূতন।
কোন্ দুখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুনঃ মুসার লিখন
নারী-বীজে হবে ফণিফণার দলন।

* * *

নারীমুখ সংসারের সুষমার সার,
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার—
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন !

নারীবাক্য গীত জানি,
নারীকার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার !
মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার !

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয় এত অল্পে শেষ করা যায় না। আমি জানি তাঁহার সহিত অধিকাংশ পাঠকের এই প্রথম পরিচয়। তাই এবারকার আলোচনায় আমি সুরেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কিছু অধিক উদ্ধৃত করিব, আশা করি তাহা অনাবশ্যক বা অরুচিকর হইবে না। ম হি লা-কা ব্যে র 'জায়া' অংশে কবির 'যৌবন-বন্দনা' এইরূপ—

হেন দুখ মাঝে হেন সুখ কোথা আর,
যথা নর-জন্ম মাঝে যৌবন-সঞ্চার।
মরু মাঝে চারু দ্বীপ শ্যামল যেমন,
ঝটিকা-নিশায় যেন,
ঘন-অবকাশে হেন
ক্ষণিক শশাঙ্কভাতি সংসার-রঞ্জন,
নিঃস্বের জীবনে যেন রাজত্ব-স্বপন !
বাল্যের সারল্য রয়, চাপল্য পলায়,
রয় রূপ কলেবরে, অবলতা যায়।
হৃদে শুভ অনুরাগ আগ্রহ প্রবল,
প্রেম-মৈত্রী-পূর্ণ মনে
হৃদি কাঁদি পর সনে,
নাই প্রৌঢ় স্বার্থাসক্তি কঠিনতা ছল—
কোথা হেন সুশোভন গিরিসন্ধিস্থল !

* * *

তব তরে যৌবন সৃজিত এ সংসার !
তব প্রতি এ সংসার রাখিবার ভার ;
বুদ্ধিবলহীন শিশু বৃদ্ধ দোঁহাকার—
তোমার পালন চায়
তোমায় জীবন পায়,
তুমি ধনী, আর সবে দরিদ্র ধরায়,
যুবজানি যুবার অবনী অধিকার।
অন্তরে বাহিরে হেন দিব্য ভাব কার,
দিব্য চক্ষে হেরি দিব্য মুরতি ধরার !

কি জীবন-মুক্ত হেন ভাবের সঞ্চার !—
সাধি' দেহক্রিয়া চয়
হৃদয় আনন্দময়,
সশরীরে হেন স্বর্গ-ভোগ কোথা আর !—
লীলাবতী-ললনা মুরতি সুধা যার।

হে যৌবন ! তুমি দূরবীক্ষণের প্রায়,
শত-লুপ্ত-শোভা নারী-চন্দ্রে পাই যায় ;
মাংসের পুত্তলী ভাব সাধারণে যার।
প্রপঞ্চ-জগত-সার,
শশী ভব-তমিস্রার,
পরশ-রতন যেন ভিখারী আত্মার—
তুমি বিনা কে প্রচারে এ প্রকৃতি তার !

তারপর নারীদেহে যৌবনের রূপ—

নারীসনে সে যৌবন মিলন কেমন !
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন ?
পুরুষ পাষাণ-কায়
যৌবন মিহির প্রায়—
প্রতিবিম্ব তার তায় বর্ষে কি তেমন—
রমণীর মণি-অঙ্গে ঝলকে যেমন ?

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ?
হবিব পরশভরে কৃশানু যেমন !
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষায়
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্যলহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায় !

ইন্দ্রজালী মোতি করে মাটি-গুটিকায়—
যৌবনে বৰ্দ্ধিত হেন কামিনীর কায় ;
ছদ্মবেশী দেব-বরে
যেন নিজ রূপ ধরে ;
ধূলিচারী তন্তুকীট বালিকা তখন—
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন !

সেদিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণাভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে।
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্রগমন ;
কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধূলাখেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্ম-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ-শাসন !

কোথায় উপমা দিব যুবতী-শোভার ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমার ?
শারদ সরসী বর্ষে পরম শোভার ;
বিমল রসাল-কায়,
মন্দ-আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !

শেষের স্তবকটির সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির যে সাদৃশ্য আছে তাহা যেন কলি ও ফুলের সাদৃশ্য। দেবেন্দ্রনাথের কবিত্ব সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতার উপরে জয়ী হইয়াছে, কিন্তু ভাবের কি প্রতিধ্বনি !—

কেহ বলে পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন ;
সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায় ?
কেহ বলে প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ-বরণ ;
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায় ?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল কমলিনী ;
ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায় কমলে কোথায় ?
কেহ বলে, উষাসম উজ্জ্বল-বরণী ;
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উষায় ?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি, নাহি জানি বর্ণনার ছটা ;
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্ ও মুখ হেরে—সব ভুলে যাই !
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার—
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার।
[দেবেন্দ্রনাথ সেন]

এই তুলনা হইতে—সুরেন্দ্রনাথের পর দেবেন্দ্রনাথ—বাংলার গীতিকবিতার বিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যাইবে। সে পর্য্যন্ত বাংলা কবিতায় খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা আছে। তখনও সহজ ভাবুকতা এবং ভাবুকতা হইতেই রসের উদ্ভব—বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনঃপ্রকৃতি বাংলা কাব্যে প্রবল—আধুনিক লিরিকের subjectivity ও আত্ম-মানস-বিশ্লেষণ দেখা দেয় নাই।

আমি অতঃপর সুরেন্দ্রনাথের উপমা-ভঙ্গি, তাঁহার ভাবুকতা, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী এমন কি দূরবর্ত্তী কবিমানসের সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য ভাবনা-সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কতকগুলি কবিতা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিব।

প্রথমে তাঁহার উপমা-ভঙ্গির পরিচয় দিব।

(১) নগরে স্ত্রীশিক্ষা হয়,
তায় কিবা ফলোদয়!
সৌধশিরে দীপ, কিন্তু ভিতরে আন্ধার!

(২) তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল
বল্গাধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয়দল,
আপনি রমণীরথী, সারথি যৌবন,
মৃদু হাসি বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু-চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন!

[মে ঘ না দ-ব ধ কা ব্যে নারীসেনা সহ প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ বর্ণনা স্মরণীয়।]

(৩) রচনার পূর্ব্বে যথা কবির কল্পনা,
জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী যথা লুব্ধ বিচারণা,
ভোজনের পূর্ব্বে যথা ক্ষুধা উত্তেজন,
যথা বাহু প্রসারণ—
আলিঙ্গন-পূর্ব্বক্ষণ,
নবনীত আহরণে মন্থন যেমন,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি বিদিত তেমন।

(৪) কাষ্ঠে কাষ্ঠ হেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে--দীপশিখা যুগল যোজন।

(৫) একে মরে অন্যে রয় সে হয় কেমন,—
শার্দ্দূল অর্দ্ধেক কায়
দলনে চর্ব্বিয়া খায়
অপরার্দ্ধে রয় যথা বেদন-চেতন।
* * *
লক্ষ জন-মাঝে রয়,
তথাচ সে লক্ষ্য হয়;
কভু না উৎসাহ তার উৎসবে ধরার—
সঙ্কীর্ত্তনে শব যেন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার।

(৬) কাল-ভুজঙ্গিনী হেন লম্বিত রজনী—
শিরোপরে বিধু যেন বিরাজিত মণি!

(৭) মকরন্দ-পূর্ণ অরবিন্দ সুকোমল,
সুকোমল সুরসাল কমলার ফল,
কোমল প্রভাত তারা অমল তরল,
প্রবালের আভাধারী
কোমলা নবীনা নারী,
আরও সুকোমল তার কপোল-যুগল,
এ হ'তে প্রেমীর প্রাণ অধিক কোমল!

(৮) জননীর হৃদি হেন,
ক্ষীরোদ-সাগর যেন;
কালো কেশ আলুলিত
কুচসনে বিজড়িত—
ভাবুকে বাসুকিযুত মন্দার সমান,
দেবরূপী শিশু করে পয়ঃসুধা পান।

আরও উপমার উদাহরণে প্রয়োজন নাই—পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কবিমানসের যে ভঙ্গি উপমায় প্রকাশ পায়, উপমার মূল্য তাহাই। সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতা তাঁহার কবিত্বকে চাপিয়া রাখিয়াছে—উপমাগুলিতে আমরা রস-কল্পনা অপেক্ষা ভাব-কল্পনার প্রাবল্য দেখিতে পাই। এই ধরণের উপমাই সুরেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির একটি প্রধান অঙ্গ। তাঁহার কবিত্ব বিচারকালে এই উপমা-ভঙ্গি লক্ষ্য করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতা ও সুগভীর মনস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব—এই ভাবুকতাই তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

স্মৃতিস্বপ্নময় শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন—

যেন বা প্রবাস-বাসে
দূর হ'তে ভেসে আসে,
দেশ-প্রিয় গীতখণ্ড সন্ধ্যা-সমীরণে!
বৃদ্ধকালে অন্বেষিয়া
পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া
স্বধাম-সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর;
জাতিস্মর হৃদে হেন
প্রথম প্রকাশ যেন
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব প্রেয়সীর!

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ—

কোথা রূপ বসে, কেবা না জানে সংসারে
কারে রূপ বলি কেবা কহিবারে পারে?

তারপর 'রূপ'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হাস;
জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার;
তুমি শীত-গুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,

মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি, বল অবলার !
* * *
হিয়া হিয়া বিয়া করে, দূতী তুমি তার !

নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি কবি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো কভু আমি তোমা ছাড়া নয়।
* * *
প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে,
হেরে তব রক্তমুখ নব জাগরণে !
দ্বার-রন্ধ্রে রবিকর নয়ন আমার ;
অলস কলুষভরে
বসিবে শয্যার পরে,
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার !
* * *
প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্তশিখা প্রকম্পিত তার—
যেন আমি রাগভরে
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার !
নিবিলে জানিবে খেলা কৌতুক আমার !

—রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-কাব্যের 'লুকোচুরী' কবিতাটির সঙ্গে এই পংক্তি কয়টি পড়া যাইতে পারে।

কবির অপর একটি উক্তি যেমন অদ্ভুত তেমনই গভীর বলিয়া মনে হইবে—

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার,
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার ;
জননীর গুরুপ্রেম স্বভাব-বেদন
কলেবরে ব্যথা যথা
স্বতঃ কয় যায় তথা,
তায় না বলিতে পারি ইচ্ছার মনন,
নেত্রপীড়া ভরে যথা সহজ রোদন।

পড়িয়া Schopenhauer-এর একটি উক্তি মনে পড়ে, যদিও কবি মাতৃস্নেহকে ততটা হেয় বলেন নাই। Schopenhauer তাঁহার বিখ্যাত Essay on Woman-এর এক স্থানে বলিতেছেন—

"The first love of a mother, as that of animals and men, is purely instinctive, and consequently ceases when the child is no longer physically helpless. After that, the first love should be reinstated by a love based on habit and reason, but this often does not appear, specially where the mother has not loved the father." (মূলের ইংরাজী অনুবাদ)।

সুরেন্দ্রনাথের উক্তিও এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করিতে পারে।

সেকালের টোলে সংস্কৃত-বিদ্যার্থীর পাঠ-পদ্ধতির course of studies একটি তালিকা কবি যেরূপ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে একালের ছাত্রগণ মুগ্ধ হইবেন কিনা জানি না কিন্তু এমন পাঠ্যতালিকা বোধ হয় কোনও কবি রচনা করেন নাই।

পুরাণ—পাদপচ্ছায়া সর্ব্বতাপহর,
কাব্যফুল বিকশিত তায়,
মাঝে মাঝে ব্যবচ্ছেদ স্মৃতির সুন্দর,
শোভে বনস্পতি সংহিতায়।
কি চারু মণ্ডপচয় শোভে পরে পরে
দর্শনের লতা বিজড়িত,
প্রতি বৃক্ষে শ্রুতি-পাখী গায় শিরোপরে
'তত্ত্বমসি' তত্ত্বমসি"—গীত।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির ভাব বোধ হয় সম্পূর্ণ মৌলিক—

নবচ্ছিদ্র বাঁশরীর স্বরের আলাপ
শুনে মর্ম্ম কে বুঝিবে তার ?—
নয় সে সঙ্গীত শুধু শোকের বিলাপ,
যেতে চায় বংশে আপনার।

'যেতে চায় বংশে আপনার'—বাঁশির সম্বন্ধে এমন ভাব আর কেহ ভাবে নাই। এই ছত্রটিই Mrs Browning-এর বিখ্যাত কবিতা A Musical Instrument স্মরণ করাইয়া দেয়। সে কবিতার সহিত ইহা অবশ্যই তুলনীয় নয়, সেখানে কবি যে-ভাবে ইহা লইয়া একটি রূপক রচনা করিয়াছেন এখানে তাহার আভাস নাই। তথাপি বাংলা কবিতার এই চারি ছন্দে যাহা আছে—ইংরেজী কবিতাটির কল্পনামূলে বীজরূপে তাহাই বিদ্যমান। সুরেন্দ্রনাথের এই কয়ছত্র এতই চমকপ্রদ, যে ইংরাজী কবিতাটির সঙ্গে ইহার যেটুকু ভাবসাদৃশ্য আছে তাহা না দেখাইয়া পারিলাম না। ব্রাউনিং-জায়ার কবিতাটিও 'নবচ্ছিদ্র বাঁশরী'র কথা লইয়া রচিত; কিন্তু আসলে তাহা কবি-

তৈয়ারীর রূপকমাত্র, এবং এই রূপক-রসেই তাহা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি সংক্ষেপে এই। Pan-দেবতা বাঁশী তৈয়ারী করিবার জন্য শরবন হইতে একটি শর ছিঁড়িয়া, নদীর পাড়ে উঠিয়া বসিলেন—

And hacked and hewed as a great god can
With his hard bleak steel at the patient reed,
Till there was not a sign of leaf indeed
To prove it fresh from the river.

He cut it short, did the great god Pan
(How tall it stood in the river !)
Then drew the pith like the heart of man,
Steadily from the outside ring.
And notched the poor dry empty thing
In holes, as he sat by the river.

'This is the way,' laughed the great god Pan
(Laughed while he sat by the river)
'The only way, since gods began
To make sweet music they could succeed.'
Then, dropping his mouth to a hole in the reed,
He blew in power by the river.

ইহাই প্যান দেবতার বাঁশরী-নির্ম্মাণ—এবং বাঁশী হইতে সুমধুর সুরলহরী উৎসারণের ইতিহাস। কবিতার মূল প্রেরণা কিন্তু তাহাই নয়। শরবনের একটি শর বাঁশী হইল বটে, দেবতার মুখ-মারুতের ফুৎকারে সে সুমধুর সংগীত সৃষ্টি করিবার দিব্যশক্তি লাভ করিল বটে—কিন্তু কতখানি বঞ্চিত হইল সে! এমনি করিয়া দেবতারা মানব-সংসার হইতে একটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার সহজ মানবতা হরণ করিয়া, তাহাকে কবি করিয়া তোলেন। কিন্তু—

The true gods sigh for the cost and pain,—
For the reed that grows nevermore again
As a reed with the reeds in the river.

সুরেন্দ্রনাথের 'নবচ্ছিদ্র বাঁশরী'র ব্যথায় এই কবি-ভাষ্যের কোনও ইঙ্গিত নাই, তথাপি বাঁশীর—

"নয় সে সঙ্গীত, শুধু শোকের বিলাপ,
যেতে চায় বংশে আপনার।"

—এই দুই ছত্র পড়িলে চমকিয়া উঠিতে হয়, Mrs. Browing-এর ঐ—'that the reed grows nevermore again as a reed with the reeds in the river'—মনে পড়িয়া যায়। অত্যাশ্চর্য্য হইলেও এইটুকু ভাবসাদৃশ্য দেখিয়া এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই যে, সুরেন্দ্রনাথের কল্পনা মৌলিক নহে। আমি অতঃপর এইরূপ ভাব-সাদৃশ্যের কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দিব—দেশী ও বিদেশী, দূরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কয়েকজন কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিব, সে সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে, এ সাদৃশ্য কবিমানসের; এবং সুরেন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টির মৌলিকতা ও ভাবসম্পদের প্রাচুর্য্য বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইবে।

প্রথমেই আমি Swinburne হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব—

Before the beginning of years
There came to the making of man
Time, with a gift of tears;
Grief, with a glass that ran;
* * *
Strength without hands to smite;
Love that endures for a breath,
Night the shadow of light,
And life, the shadow of death.
* * *
He weaves and is clothed with derision.
Sows, and he shall not reap :
His life is a watch or a vision
Between a sleep and a sleep.

নর ভাগ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথও বলিতেছেন—

এ হেন অভাগাবান্
ধরণী কি আছে জীব কোথাও তোমায়?
জন্ম যার দীনতায়
বুভুক্ষায়, নগ্নকায়,
গ্রাস বাস শ্রমসাধ্য—শক্তিহীন তায়!
আশায় অঙ্কুর যেন—
কার্য্যকালে কীট হেন,
অতিদূরে দৃষ্টি যায়, অতি ক্ষুদ্র কর;
আয়ু বর্ষা ঘনতম,
আশা ক্ষণপ্রভা সম।—
ইন্দ্রধনু-চিত্রলেখা সম্পদ-নিকর,
অশ্রুবৃষ্টি কারণ ভঙ্গুর কলেবর।

উভয় কবিতার ভাব এক স্থানে স্থানে কথাও প্রায় এক; যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কাব্যকলার—ভাষার সঙ্গীত ও ভাবের রসমার্জ্জনার। তথাপি সুইনবার্ণের অনুসরণ বলিয়া মনে হয় না—হওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাব-সম্পদ এত প্রচুর—বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ-

শক্তির পরিচয় তাঁহার কাব্যে এত অধিক পাওয়া যায় যে, এরূপ সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক হইলেও অসম্ভব নহে। তাঁহার ভাবুকতার আর একটি নিদর্শন এইখানে উদ্ধৃত করিব। একস্থানে স্বপ্ন সম্বন্ধে কবি এইরূপ উক্তি করিতেছেন—

স্বপন, অলীক-খ্যাতি অলীক তোমার,
আছে তব পৃথক সংসার,
নাহি জানি সেই হবে ছায়া কি ইহার,
অথবা এ ছায়া বুঝি তার।

* * *

দেখিয়াছি স্বপ্ন থেকে জরায়ু-শয়নে,
দেখিতেছি সংসার-স্বপন,
দেখাবে স্বপন পুনঃ যামিনী-মরণে,
কবে তবে লভিব চেতন।
অজ্ঞান আঁধার রত্নে শরীর-শয্যায়
থেকে জায়া-মায়া আলিঙ্গনে,
বিবেক-নয়ন মুদে মোহের নিদ্রায়,
ভব-স্বপ্নে আছি অচেতনে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি খুব মৌলিক নহে—হিন্দুর সংসার-বৈরাগ্য এইরূপ কল্পনারই অনুকূল। তথাপি এই পংক্তি কয়টির প্রকাশ-ভঙ্গিমায় কবিজনোচিত বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্বের প্রমাণ—অপর এক বিখ্যাত বিদেশীয় কবি প্রায় এমনই ভাব তাঁহার নাটকের নায়ক-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। Caldeoron-এর নাটক Life is a Dream হইতে সেই কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

For in this world of stress and strife
The dream, the only dream, is life ;
And he who lives, it's proved too well,
Dreams till he wakes at fate's loud knell.
—A dream that's broken at a breath
And wakens to the dream of death ?

* * *

What then is life ? A frenzied fit,
A trance that mocks man's puny wit.
A mist, where flickering phantoms gleam,
Where nothing is, but all things seem,
—all but the shadow of a dream.

এরূপ সাদৃশ্য বোধ হয় স্বাভাবিক। ইহাতে প্রমাণ হয়, সকল দেশের সকল ভাবুকের মনে যে ভাবনা বিশ্বজনীন মানবতার সঙ্গে জড়িত তাহার ভঙ্গি একই রূপ হওয়াই বরং স্বাভাবিক। তথাপি স্পেনীয় কবি ও ভারতীয় কবির মনোধর্ম্মে হয় ত' কোথায়ও মিল আছে, হিন্দুর ত' কথাই নাই, স্পেনীয় কবির ভাবনায় প্রাচ্য ভাব-বীজ অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব নহে। সেকালে, সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে Calderon-এর নাটক, ইংরাজী অনুবাদেও, পাঠ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; এমন সন্দেহ করিবার কারণও নাই। এইবার, আমি পরবর্ত্তী যুগের বাংলা কাব্য হইতে এইরূপ ভাব-সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়া এবং সুরেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার একটু বিশেষ আলোচনা করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

ইতিহাস যেদিন হইতে লেখা হইয়াছে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ত্রিশ লক্ষ কোটি লোকের জন্ম হইয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র ৫০০০ লোক ইতিহাসে অমর থাকিবার যোগ্য। এই ৫০০০ মহামানবের মধ্যে ২০০ শতেরও কম নারী। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সকল মানব মানবীর মধ্যে যে পোনেরো জন নারী সর্ব্বজনগ্রাহ্য হিসাবে প্রথমের দিকে তাঁহাদের তালিকা, লিবার্টিতে আলবার্ট এডোয়ার্ড উইগম কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পোনের জনের নাম : (১) মেরি কুইন অব স্কটস্ (২) কুইন এলিজাবেথ (৩) জোয়ান অব আর্ক (৪) মাডাম ডি ষ্টেল (৫) জর্জ্জ সাণ্ড (৬) ক্যাথারিন দি সেকণ্ড (রুশিয়া) (৭) মাডাম ডি সেভিগনে (৮) মাডাম ডি মেন্টেনন (৯) মেরিয়া থেরেসা (১০) জোসেফাইন (১১) মারি আণ্টয়নেট (১২) ক্রিষ্টিনা (সুইডেন) (১৩) ক্লিয়োপাট্রা (১৪) কাথারিন ডি মেডিচি এবং (১৫) কুইন অ্যান্ (ইংলণ্ড)।

অন্তঃপুর

—শ্রীমাণিক গুপ্ত

শিশু-মঙ্গল

পুরাকালে আমাদের দেশে সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে ও পরে জননীসম্পর্কে কোনও প্রকার বিজ্ঞানসম্মত মনোযোগ দানের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন সাহিত্যে একদিকে যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কথা আছে, অপরদিকে তেমনি পঞ্চামৃত দ্বারা গর্ভ-শোধনের ব্যবস্থারও উল্লেখ আছে।* সকল উন্নতিশীল জাতির দৃষ্টি সকল যুগেই জাতির ভবিষ্যৎ হিসাব করিয়া শিশুর প্রতি মনোযোগী থাকে। কোনও জাতির উন্নতিশীলতার একটি পরিচয়, এই মনোযোগ। কেন না, বর্ত্তমান যে-জাতি যত উন্নতই হউক না কেন, তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, অজাত ও নবজাত শিশুর উপর। সুতরাং দূরদর্শী জাতির এদিকে সমধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা খুব অল্পদিন হইল, এবিষয়ে সচেতন হইয়াছে। মাত্র ১৮৯৪ সনে ইংলণ্ডে বৃটিশ চাইল্ড ষ্টাডি এসোসিয়েশন (British Child Study Association) স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের ১৯০৬ সনের রেজিষ্ট্রার-জেনারেলের তালিকায় প্রকাশ, ঐ সনে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের ৭৬টি শহরে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কেবল পেটের অসুখে মৃত্যুর সংখ্যা ১৪,৩০৬। ঐ হিসাবেই দেখিতে পাই, ১৯০৭ সনে হাজার-করা শিশুমৃত্যু ১১৭.৬২। ঐ সনেই ১ মাসের কম বয়স্ক মৃত শিশুর ৭৪৯ জনের মধ্যে, এক শয্যায় পিতামাতা ও শিশুর শয়ন-হেতু অসাবধানতার জন্য শিশুর শ্বাসরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে, মৃত্যুসংখ্যা ৪৭৫।

* দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন॥
—আদিকাণ্ড, কৃত্তিবাসী রামায়ণ

ফ্রান্সের ১৯০৬ সনের তালিকায় দেখিতেছি, প্যারিসে তখনও হাজারকরা শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ১৭৮। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সে শিশুসম্পর্কে যত্ন লওয়া

শ্রীমতী হেলেন রুবেল। কলিকাতার শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে এই মার্কিন মহিলা এ-পর্য্যন্ত প্রায় ষোল হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সূচিত হইয়াছে। ১৯০৪ ও ১৯০৫ সনে ডাক্তার পুপাল্‌তের (Dr. Poupalt of Dieppe) অধীনে ভ্যারেঞ্জভিল্ সুর্ মার-এ (Varengeville-sur-mer) একটি শিশু-পরিচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্ব্বে ৭ বৎসর ধরিয়া ঐ

অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারকরা ১৪৫। কিন্তু এই দুই বৎসরে ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি শিশুরও মৃত্যু হয় নাই। ঐ দুই সালেই অত্যধিক গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। ১৮৯৮ সনে এইরূপ গ্রীষ্মে ঐ অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছিল হাজারকরা ২৮৫।

দেখা যায়, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কাজ সর্ব্বত্র অতি শীঘ্র ফলপ্রসূ হইয়াছে। প্যারিসে ১৯০৬ সনের শিশুমৃত্যুর সংখ্যার আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ঐ সনেই ডাক্তার বুদাঁ (Dr. Budin) কর্ত্তৃক পরিচালিত শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানে (Consultations de Nourrissons) শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা মাত্র ৪৬।

কলিকাতা: রামকৃষ্ণ-মিশন শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান।

অতি অল্পদিন এ বিষয়ে চৈতন্য আসিলেও বর্ত্তমানে ইংলণ্ড কিংবা অপরাপর দেশে এই কাজের উন্নতি প্রচুর হইয়াছে।

১৯২৪ সনের সরকারী হিসাব হইতে নিম্নে একটি অঙ্ক-তালিকা উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, এ বিষয়ে অপরাপর দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের কি অবস্থা।

(এক বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হাজারকরা সংখ্যা)

ভারতবর্ষ	১৮৯.০	অষ্ট্রেলিয়া (কমনওয়েলথ)	৫৭.০৮
ইংলণ্ড ও ওয়েল্স	৭৫.০	নিউজীলাণ্ড	৪০.২৩
স্কটল্যাণ্ড	৯৭.৭	কানাডা (কুইবেক বাদে)	৭৯.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ১৯২২ সনে ভারতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারকরা ১৭৫। ১৯২৩ সনে ঐ সংখ্যা ১৭৬ হয়। ১৯২৪ সনে বাড়িয়া হইয়াছিল ১৮৯। ইহাকে ভয়াবহ অবস্থা বলিতেই হইবে।

প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষে মৃত শিশুর সংখ্যা ২০ লক্ষ! এবং হাজারকরা প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা হইতেছে—

বাংলাদেশে—৫০
মাদ্রাজ— ১৪.৩
ভারতবর্ষ— ২৪.৫
ইংলণ্ড— ৪

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

ইহা তো কেবল সরকারী হিসাব। সত্যকার প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যার হিসাব থাকিলে সে সংখ্যা কিরূপ হইত কে জানে! অথচ এজন্য জাতিহিসাবে আমাদের বিশেষ উদ্বেগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতি-বর্ব্বর জাতির সহিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী, বর্ত্তমান ভারত-বাসী এক্ষেত্রে প্রায় একপর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল-সার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর-জেনারেল স্যর জন মেগ (Sir John Megaw) লিখিয়াছেন,

'In England great concern is expressed because the rate continues to be so high as 4 per mille.' অর্থাৎ হাজারকরা প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা ৪ বলিয়া ইংলণ্ডে বিষম আশঙ্কার কারণ হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতা শহরে এই মৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা ২৫ হইতে ৩০।

শিশুমঙ্গল বিষয়ে আমেরিকা বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী। অন্ততঃ শিশুর মানসিক বৃত্তিসম্পর্কিত

পর্য্যালোচনামূলক পুস্তকের তালিকা হইতে তাহাই অনুমিত হয়। এ ধরণের অধিকাংশ পুস্তকই আমেরিকা হইতে প্রকাশিত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যব্যবস্থাও আছে।

আমরা এখানে যে-প্রতিষ্ঠানটির পরিচয়োদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি, তাহার প্রেরণাও আমেরিকা হইতে পাওয়া। জনৈক মার্কিন মহিলার অসাধারণ সহানুভূতি ও দানশীলতা ব্যতীত এ প্রতিষ্ঠানের জন্মই সম্ভব হইত না। মহিলাটির নাম শ্রীমতী হেলেন রুবেল, আমেরিকার রোড-আইলাণ্ডের প্রভিডেন্সে ইঁহার বাস। প্রভিডেন্সে রামকৃষ্ণ-মিশনের শাখা হিসাবে স্বামী অখিলানন্দ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহিলাটি স্বামী অখিলানন্দের নিকটে বেদান্তের পাঠ অভ্যাস করেন। এই মহিলা সুদূর কলিকাতায় একটি শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দুই বৎসরে ১৫০০০ হাজার মুদ্রারও অধিক দান করিয়াছেন।

এই মহীয়সী মহিলার দান যে সার্থক হইয়াছে, সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া আসিয়া আমরা তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিয়াছি। ব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক হইতে একেবারে ত্রুটি-হীনতা—এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম দর্শনে ইহাতেই বিস্মিত হইতে হয়। সচরাচর আমাদের দেশে সাধারণের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোথাও এরূপ দেখি নাই। ভবানীপুর অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত, কলরব-হীন প্রান্তে স্থাপিত এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির কক্ষ হইতে কক্ষে ঘুরিয়া সেদিন দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও সত্যকার আশা জাগিয়াছিল।

কথায় কথায় প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দকে প্রশ্ন করিলাম, —'আপনি কি সন্ন্যাস লইবার আগে মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট ছিলেন, আপনার এদিকে মন গেল কিরূপে?'

উত্তরে বলিলেন,—'না। ওদেশে যখন ছিলাম তখন নিজের দেশ সম্বন্ধে একটা কিছু করিতে হইবে, এই চিন্তা

কালিফোর্নিয়ার প্রফুল্ল সদাহাস্যময় শিশু (বয়ঃক্রম ২॥০)।

—একটা সেবার ভাব, সদাসর্ব্বদা মনে জাগিত। উহাদের মেটার্নিটি-হোমগুলি দেখিয়া মনে হইল, আমাদের দেশে এরকম কিছু করা যায় কি না।

সেই চিন্তার ফলে এই প্রতিষ্ঠান।

মাত্র ১৯২৬ সনে রামকৃষ্ণ-মিশন হইতে স্বামী দয়ানন্দ প্রচারকার্য্যে আমেরিকায় যান। কালিফোর্নিয়ার পথে সদাহাস্যময়, প্রফুল্ল শিশুর দল দেখিয়া তাঁহার মনে হইত,

শিশু-মঙ্গল : বক্তৃতা-গৃহ। প্রতি রবিবার বৈকালে এখানে শিশু-পরিচর্য্যা বিষয়ক বক্তৃতা হয়।

আমাদের দেশে এইরূপ শিশুর জন্ম সম্ভব কিনা! স্বামী বিবেকানন্দের যে-স্বপ্ন, দেশ-সেবার জন্য যে-সকল গুণবিশিষ্ট সন্তানের দরকার—সেই স্বপ্ন সফল করিতে হইলে সুস্থ সুন্দর শিশু চাই। অর্থসংগ্রহ হইতে বিলম্ব হইল না, কয়েকজন শিক্ষিতা আমেরিকান সেবিকাও ভারতবর্ষে আসিতে স্বীকার করিলেন। ইউরোপ হইয়া, নানাস্থানের শিশুমঙ্গলের কাজ দেখিয়া চার পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া স্বামী দয়ানন্দ এই শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিলেন।

১৯৩২ সনের জুলাই মাসে ভবানীপুর ১০৪ বকুলবাগান রোডে একটি দ্বিতল বাটীতে রামকৃষ্ণ মিশনের আশীর্ব্বাদ লইয়া ইহার সূচনা হইল।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তিনটি :

[১] প্রসূতি-পরিচর্য্যা বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা।

[২] জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে জন্মের পূর্ব্বে, জন্মসময়ে ও জন্মের পরে শিশুর পরিচর্য্যা।

[৩] এই কার্য্যের জন্য উপযোগী করিয়া শুশ্রূষাকারিণী তৈয়ারী করা।

কাজের বিভাগ :

বাটীর নীচের তলায় বাহির হইতে যে সকল সন্তান-সম্ভাবিতা ও সন্তানবতী মাতারা আসেন, তাঁহাদের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বন্দোবস্ত আছে। এই বিভাগ আউটডোর ক্লিনিক (outdoor clinic)। উপরে আসন্নপ্রসবা ও প্রসবান্তর শিশু ও জননীদের জন্য ব্যবস্থা—ইন্‌ডোর হস্পিট্যাল (indoor hospital)।

শিশু-মঙ্গল : নার্সারি (Nursery)। কাঁচের পার্টিশনের অন্তরালে শিশুর পালঙ্ক ও শয্যা দেখা যাইতেছে।

শিশু-মঙ্গল : ক্লিনিক (Clinic)। শিশু-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রীগৌরোদচন্দ্র চৌধুরী উপবিষ্ট।

বিভক্ত—জন্মের পূর্ব্বে, জন্মের সময়ে ও জন্মের পরে।

জন্মের পূর্ব্বে :

(১) প্রচারকার্য্য ; দ্বার হইতে দ্বারে শুশ্রূষাকারিণীগণ প্রসূতি-পরিচর্য্যা বিষয়ে সকল তথ্য জ্ঞাপন করেন। (২) প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বক্তৃতা ইত্যাদি। সন্তানবতী জননীরা প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্যে এখানে আলোচনার সুযোগ পান, এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে বিচক্ষণ পরামর্শ দান করেন।

(৩) রবিবার বৈকালে ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গর্ভস্থ শিশু সম্বন্ধে সবিশেষ পরীক্ষা করা হয়। রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষা ইত্যাদি সকল প্রকার আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বনে প্রসূতির যত্ন লওয়া হয়।

বর্ত্তমানে এই বিভাগে মাত্র ৭টি 'বেড' (bed) আছে। প্রত্যেক জননীকে গড়ে এক সপ্তাহ করিয়া হাসপাতালে রাখিতে হইলে, মাসে মাত্র ২৮টি 'কেসে'র ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সম্ভব হয়। আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে দেশের দানশীল মহাত্মাদের দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানটির উপর পড়িলে—ব্যবস্থা বিস্তৃত হইবে।

শিশু-মঙ্গল : প্রতি বুধবারে ও শনিবারে সন্তানবতী জননীরা শিশু-পরিচর্য্যা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করেন।

বাহিরে ধাত্রী ইত্যাদি পাঠাইয়া গর্ভবতী জননীদের নিয়মিত তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্তও আছে—এক্সটার্নাল মেটার্নিটি (External Maternity)।

এই তিন বিভাগের কার্য্য আবার মোটামুটি তিন ভাগে

নীচে এই দুই বৎসরে প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগের কাজের হিসাব দেওয়া হইল।

	১ম বৎসর	২য় বৎসর
গর্ভবতী জননীর সন্ধানে বাড়ী বাড়ী ঘোরা	২৮৪৫	৫৬৯
চিকিৎসক প্রদত্ত বক্তৃতা	৪২	৫২
বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গর্ভস্থ শিশুর যত্নবিষয়ে ক্লিনিক	৪২	৫২
তালিকাপ্রবিষ্ট জননীর সংখ্যা	২১০	৫৪২
কতজন গর্ভবতী জননী এই কক্ষে আসিয়াছেন	৫০০	১৪৯৩

প্রথম বৎসর হইতে দ্বিতীয় বৎসরে কাজ যথেষ্ট বাড়িয়াছে। বাহিরে প্রচারকার্য্য কমিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে, এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনবোধ জাগিয়াছে। এবং সেই প্রয়োজন মিটাইতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকে জনসাধারণ সমর্থন করিতেছে।

জন্মের সময়ে :

(১) বাহিরে প্রসবকালীন তালিকাপ্রবিষ্ট জননীদের যতদূর সম্ভব এবিষয়ে সাহায্য করা।

(২) আঁতুর-ঘরে অবস্থানকালীন ধাত্রী পাঠাইয়া সদ্য-প্রসূতা জননী ও শিশুর দশদিনের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান। প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা।

(৩) প্রয়োজন হইলে ইন্‌ডোর হস্পিট্যালে ভর্ত্তি করিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থা।

আমরা এই 'ইন্‌ডোর' বিভাগের কাজ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। সদ্যোজাত শিশুর দল নার্সারি-ঘরে (Nursery) প্রত্যেকে স্বতন্ত্র শয্যায় শায়িত আছে। প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বতন্ত্র। কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘরে নিজের নিজের বিছানায় সকল শিশু ঘুমাইয়া আছে। শুনিলাম, প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর ধাত্রী শিশুকে মায়ের কাছে লইয়া স্তন্যপান করাইয়া আবার আনিয়া তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দেন। শুইবামাত্র শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রত্যেক সংসারে ঘরে ঘরে রোরুদ্যমান শিশুর এবং বিরক্ত জননীর কথা ভাবিলে ইহাদের দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

জন্মের পরে :

প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ধারণা যে, জন্মাইবার পর মাসখানেক পর্য্যন্ত শিশু সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধারণা ভুল। সাধারণতঃ ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগকে 'বিপজ্জনক' বলিয়া ধরিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সম্বন্ধে বিশেষ যত্নের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য—এই বিভাগে শিশু-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক তাহার ব্যবস্থা আছে।

স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে আমরা প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিচয় দিলাম। আমাদের মনে হয়, দেশে বর্ত্তমানে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সমধিক প্রয়োজন।

১৯০৭ সনে উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনে সেণ্ট-প্যাংক্রাস স্কুল ফর মাদার্স (St. Pancras School for Mothers) নামে ক্ষুদ্র একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। কিছু দিনের মধ্যে বরো-কাউন্সিলের স্বাস্থ্যবিভাগ এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে অগ্রণী হয়। কিন্তু ইহার আয়ের অধিকাংশ আসিত—জননী ছাত্রীদের নিকট হইতে। তাঁহারা নিজেদের পকেট হইতে পয়সা দিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ করিয়া তুলিলেন। এইখানেই শিশুদের এক বৎসরকাল বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক পরীক্ষার পর বলা হয়—এই শিশু বি-এ পাশ করিয়াছে (graduation)। এই সম্পর্কে শিশুর পিতাদের জন্যও ক্লাস খোলা হইয়াছে। সন্তানের মাতা ও পিতার দায়িত্ব-বোধ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি তাহার সমগ্র ব্যয়ভার পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আমরা যে-প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া আসিলাম, তাহা ক্ষুদ্র। আমাদের দেশে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের মত কত সহস্র এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের যে প্রয়োজন আছে তাহার হিসাব নাই। যদি দেশের লোকের দায়িত্ববোধ না জাগে তবে ইহার সার্থকতা নাই। এ দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি কবে পড়িবে?

জড়ের উপাদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণার ক্রমবিকাশ
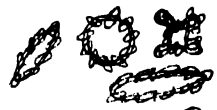
—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেবতা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রের সহিত অগ্নি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য ও পশুকুলের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই অগ্নিকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য মানুষ লালায়িত হইয়া উঠিল। কথিত আছে —প্রোমেথিয়াস স্বর্গ হইতে সেই অগ্নি অপহরণ করিয়া পৃথিবীতে সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন। মনুষ্যেরা তৎপরে অরণি ও চক্‌মকি ঘর্ষণে ইচ্ছানুযায়ী অগ্নি উৎপাদন করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্দ্ধনের উপায় শিক্ষা করিয়াছিল।

মন রূপ পরিগ্রহ করে তখন, যখন মানুষ বিভিন্ন পদার্থের আকৃতি প্রত্যক্ষ করে এবং তাহার স্বপ্ন তখন বাস্তবতায় প্রতিভাত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের মূলীভূত কারণ রূপ বা আকৃতিকে অগ্নি সহজেই রূপান্তরিত করিয়া দেয়। অত্যধিক উত্তাপে কারুকার্য্য-খচিত কঠিন ধাতব পদার্থও রূপান্তর পরিগ্রহ করে। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সময় কাষ্ঠখণ্ডকে একটু শব্দ, ধূম ও অগ্নিশিখা উৎপাদন করিয়া অঙ্গারে পরিণত হইতে দেখিয়া আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা হয়তো বিস্মিত হইয়া যাইতেন। নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডকে অগ্নি কিরূপে বিকৃত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলে? কাঠ এক জাতীয় পদার্থ, অঙ্গার তাহার বিপরীতধর্ম্মী। এক জাতীয় পদার্থ অপর জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারিলে এক ধাতুকে অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না কেন?

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মধ্যযুগের এ্যালকেমিষ্টগণ নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিতে এবং অমৃতের সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের এই অপরিণত রসায়ন-বিদ্যা বা এ্যালকেমি হইতেই ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগের রসায়ন-শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ, মিশর এবং তৎপরে গ্রীস দেশের পণ্ডিতগণ জড়-সংগঠন তত্ত্ব লইয়া বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়া আসিতেছিলেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে হিন্দু দার্শনিকগণ জড়ের উপাদান স্বরূপ অণু, পরমাণুর ধারণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন এক টুক্‌রা পদার্থকে সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটি খণ্ডকে আবার সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায় এবং এই প্রণালীতে বিভাগ-ক্রিয়া চালাইতে থাকিলে সেই পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই বিভাগ-ক্রিয়া কি অনন্তকাল চলিতে পারে, না, এমন অবস্থায় পৌঁছাইতে হয়, যখন আর ভাগ করা সম্ভব হয় না? প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের ধারণা বা কল্পনা-শক্তিরও একটা সীমা আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে হয় যখন আর ভাগ করা

১৭০৪ সালে নিউটনের পরমানুর ধারনা। বিভিন্নআকৃতি বিশিষ্ট শক্তি কণিকা

১৭৫৮ সালে বস্কোভিচের শক্তিকেন্দ্র

১৮১০ সালে নির্দ্দিষ্টগুরুত্ব সম্পন্ন ড্যাল্টনপরমানু

১৮৬৭ সালে কেলভিন ভরটেক্স কুণ্ডলী

১৯১৩ সালে বর-পরমানু

১৯২৫ সালে শ্রোডিংগার পরমানু

জড়ের উপাদান সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ধারণা।

চলে না। ইহা হইতেই প্রাচীন দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগতের মূল পদার্থগুলি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, অসংখ্য অবিভাজ্য কণিকার সমষ্টি মাত্র। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটিই ছিল তাঁহাদের মতে জগতের মূল পদার্থ। এই নির্দ্দিষ্ট মূল পদার্থগুলি বিভিন্ন অনুপাতে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এই দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য প্রকটিত করিয়াছে। এই অবিভাজ্য কণিকাসমূহকে 'এটম' বা পরমাণু নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীক ভাষায় 'এটম' শব্দের অর্থ—যাহাকে খণ্ডিত করা যায় না।

জন ডাল্টন।

পদার্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের সমবায়ে গঠিত—এ ধারণা ডেমোক্রিটাসই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন। তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক লিউসিপাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই অপরিবর্ত্তনীয় অবিভাজ্য পরমাণুসমূহ তাহাদের পরস্পর ব্যবধান-স্থানের মধ্যে অনবরত দ্রুতগতিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। দার্শনিক এপিকিউরাস কর্ত্তৃক তাঁহার এই মতবাদ আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ডেমোক্রিটাস ও তাঁহার সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো উভয়েই বহুদিন মিশরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা খুব সম্ভব জড়ের উপাদান সম্বন্ধে মিশরীয় পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। প্লেটো জড়সংগঠন তত্ত্বের আলোচনায় চিন্তা ও যুক্তিকে প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সুবিখ্যাত শিষ্য এ্যারিষ্টটল ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তিনি এ বিষয়ে চিন্তা-যুক্তি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। এ্যারিষ্টটল অগ্নি, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা এই চারিটি মূল পদার্থের সঙ্গে উষ্ণতা, শুষ্কতা, শৈত্য ও আর্দ্রতা এবং এই সকল গুণ-পরিচালক ইথারের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই চারিটি গুণের দুই দুইটির একত্র সম্মিলনে মূল পদার্থগুলির উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের বিভিন্ন অনুপাতে সংযোগের ফলে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এ্যারিষ্টটলের মতবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল এই মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন। তিনি পরীক্ষামূলক প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইলেন—মূল পদার্থের সংখ্যা কেবল চার বা পাঁচ হইতে পারে না—মূল পদার্থ আরও অনেক আছে। তিনিই জড় পদার্থকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যে সকল পদার্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলেও তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না তাহাদিগের নাম দিলেন মৌলিক পদার্থ আর যেগুলি দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হইতে পারে তাহাদের নাম দিলেন যৌগিক পদার্থ। এইরূপে ক্রমশঃ ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৭০৪ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিশ্রুত মনীষী সার আইজাক নিউটন এই পরমাণুবাদ সমর্থন করেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ নির্ভুল পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিবার উপায় ছিল না—বিশেষতঃ পরীক্ষা-কার্য্যকে অনেকেই হেয় জ্ঞান করিতেন। কাজেই কেবল অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তির উপর নির্ভরশীল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা অপেক্ষাকৃত অবাধ গতিতে প্রধাবিত হইত। নিউটন এই কল্পনাকে কতকটা বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জড়ের মূল উপাদনের স্বরূপ বা অনুকৃতি কল্পনা করেন। তিনি বলিলেন—জলের উপাদান—'এটম' বা পরমাণু সমূহ সকলেই এক প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট নহে। কোনটা বড় বলের মত, আবার কোনটা বা ছোট বলের মত ; কোনটা ত্রিকোণাকার, কোনটা চতুষ্কোণ। সকলগুলিই নীরেট এবং কঠিন—এত কঠিন যে, ইহাদিগকে ভেদ করা দূরে থাক্ কোন রকমে একটু ক্ষয় করাও অসম্ভব। কঠিন পদার্থের সমবায়ে কঠিন পদার্থের উদ্ভব ধারণা করা যায় ; কিন্তু কোমল

বা তরল পদার্থের গঠন কল্পনা করা অসম্ভব। কাজেই নিউটন বলিলেন—পরমাণুসমূহ কঠিন হইলেও তাহাদের বিশেষ সংস্থান এবং পরস্পর আকর্ষণের বিশেষ তারতম্যের ফলেই
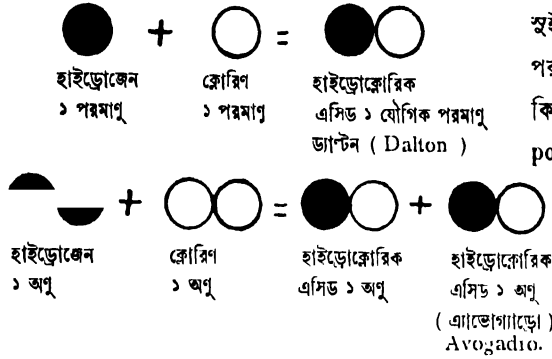
কোমল বা তরল পদার্থের গঠন সম্ভব হইয়াছে। নিউটনের এই জবাবে সকলে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলেও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেহ আর কোন নূতন কথা শুনাইতে পারেন নাই।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে বস্কোভিচ (Boscovich) প্রচার করিলেন যে, জড়ের উপাদান এই পরমাণুসমূহ বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট কঠিন বস্তু হইতেই পারে না। ইহারা গাণিতিক বিন্দু বা শক্তিকেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের না আছে কোন আকার, না আছে কোন গুরুত্ব। পরমাণু সম্বন্ধে বস্কোভিচের এই অভিনব মতবাদ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

১৮০৮ খৃঃ অব্দে জন ড্যাল্টন (Dalton) ডেমোক্রিটাস প্রবর্ত্তিত আণবিক মতবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পদার্থ সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি—ইহা মানিয়া লইয়া তিনি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার মতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে ততগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুও রহিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন—দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি পরস্পর অতি নিকটে অবস্থান করিয়া যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লৌহ ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। লৌহ এবং গন্ধক একত্রে উত্তপ্ত করা হইলে সাল্‌ফাইড অব আয়রণ (Sulphide of Iron) নামে একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তানুযায়ী এস্থলে লৌহ এবং গন্ধক পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে; পরমাণুর ভগ্নাংশের সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব, সুতরাং লৌহের এক, গন্ধকের এক, দুই বা তিন—এই অনুপাতে আণবিক সংমিশ্রণ ঘটিবে। সুইডিস্ দার্শনিক বার্জেলিয়াস (Berzelius) রাসায়নিক পরীক্ষায় ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তকে নির্ভুল প্রতিপাদন করেন। কিন্তু ড্যাল্টন মৌলিক (element) এবং যৌগিক (compound), এই উভয়বিধ পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে মৌলিক এবং যৌগিক পরমাণু নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যৌগিক কণিকা ভাঙ্গিয়া মৌলিক পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিলেও এই বিভিন্ন বস্তুকে তিনি 'পরমাণু'ই বলিয়াছিলেন। (এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, moleculesকে অণু এবং atomকে আমরা পরমাণু নামে অভিহিত করিয়াছি।) ইহার ফলে বায়বীয় পদার্থের পরস্পর সংমিশ্রণ সম্বন্ধীয় গে-লুসাকের (Gay-Lussac) সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে অন্তরায় উপস্থিত হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইটালিয়ান পদার্থবিদ্ এ্যাভোগাড্রো (Avogadro) ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তের একটু রদবদল করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি বলিলেন, যে-কোন বায়বীয় পদার্থ মৌলিকই হউক বা যৌগিকই হউক—কতকগুলি অণুর সমবায়ে গঠিত। এক বা ততোধিক পরমাণুর সমবায়ে এক একটি অণু গঠিত হয়। ব্যবহারিক বিষয়ে সাধারণতঃ অণুর অস্তিত্ব লইয়াই কারবার, পরমাণুর অস্তিত্ব মানসপটে। ইহাতে ড্যাল্টনের

সার উইলিয়াম ক্রুকস্।

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র পার্থক্য দাঁড়াইল যে, মৌলিক পদার্থের অণু এক জাতীয় একাধিক পরমাণু সমবায়ে গঠিত,

পক্ষান্তরে যৌগিক পদার্থের অণু বিভিন্ন জাতীয় একাধিক পরমাণু-সমবায়ে নির্ম্মিত।

ড্যাল্টন সর্ব্বপ্রথম বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব-নির্দ্দেশক তালিকা প্রণয়ন করেন, এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য

জে. জে. টমসন।

যে, এই পরমাণুবাদ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই রিখ্‌টার (Richter) অম্লাত্মক ও ধাতব পদার্থের পরস্পর আনুপাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়াত্মক সংখ্যা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। হাইড্রোজেন-পরমাণুর গুরুত্ব এক ধরিয়া তদনুপাতে অন্যান্য পদার্থের—যেমন অক্সিজেন ৫.৫, গন্ধক ১৪.৪ ইত্যাদি ক্রমে আণবিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এজন্য যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছিল। পাঁচ বছর পরে এই তালিকা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ৩৭টি মৌলিক পদার্থের আণবিক গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হয়। তৎপরে টমসন (Thomson), ওলাষ্টন (Wollaston) এবং বার্জেলিয়াস (Berzelius) এই তালিকা আরও পরিবর্দ্ধিত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় ৩৭টি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব জানা ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে কতকগুলি নূতন ধাতু ও বায়ুমণ্ডলের মধ্য হইতে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বায়বীয় পদার্থের আবিষ্কারের ফলে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৮০র উপর উঠিয়া গেল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই সংখ্যা ৯৩তে দাঁড়াইয়াছে। এডিংটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতে এই সংখ্যা ১৩৬ পর্য্যন্ত উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম প্রাউট (William Prout) নামে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক প্রচার করেন যে, হাইড্রোজেনই জড় পদার্থের চরম পরিণতি। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার মতবাদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, অতি-আধুনিক সিদ্ধান্তের সহিত প্রাউটের মতবাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

যাহা হউক ড্যাল্টন প্রবর্ত্তিত আণবিক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন দিক হইতে এ সম্বন্ধে বহুবিধ মূল্যবান গবেষণা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

দার্শনিকই হউক বা বৈজ্ঞানিকই হউক প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য জাগতিক ব্যাপারে জটিলতার মধ্যে সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করা—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাওয়া। আণবিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছিল সত্য—কিন্তু জড়ের চরম উপাদান সম্বন্ধে জটিলতা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মূল উপাদান সন্ধান করিতে গিয়া পাঁচটি মূল পদার্থের পাঁচ রকম বিভিন্ন পরমাণুর স্থলে ৩৭টি মূল পদার্থ ও তাহাদের ৩৭ রকম পরমাণু আবিষ্কৃত হইল। কিছুদিন পরে বিখ্যাত রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ (Mendeleef) মৌলিক পদার্থ সমূহের 'পিরিয়ডিক ল' বা সাময়িক প্রথা (Periodic Law) প্রচার করেন। হাইড্রোজেন হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুত্ব হিসাবে মৌলিক পদার্থগুলিকে পর পর রাখিয়া তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায়, এক এক শ্রেণীর পদার্থগুলি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রকৃতি হিসাবে আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম, নবম, সপ্তদশ প্রভৃতি স্থানীয় পদার্থগুলির প্রকৃতি অনেকটা এক রকমের। এই জন্যই ইহাকে 'পিরিয়ডিক-ল' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই 'পিরিয়ডিক-ল'-এর সাহায্যে আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের মধ্যবর্ত্তী অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইয়াছিল। পরে সেই পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল 'পিরিয়ডিক-ল'-এর সাহায্যে পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছে। এইরূপে মৌলিক পদার্থের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির

পরমাণু সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। একত্বের সন্ধান করিতে গিয়া বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইল—তফাৎ এই হইল যে, স্থূল বৈচিত্র্যের স্থলে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিল।

লর্ড কেলভিন্।

অঙ্গার, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মূল উপাদান কি—জিজ্ঞাসা করিলে রাসায়নিক হয়তো ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তানুযায়ী বলিবেন—অঙ্গার কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য অঙ্গার-কণিকার সমষ্টি মাত্র। হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের বেলায় সেই একই অবস্থা। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কিন্তু ইহাতেই তৃপ্তি হয় না—সে হয়তো বলিবে—জড়ের উপাদান না হয় বুঝিলাম ৯৩টি মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য কণিকা বা পরমাণু; কিন্তু পরমাণুগুলির উপাদান কি? ইহাদের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? আর ইহাদের আকৃতি বা গঠন-প্রণালী কিরূপ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিউটন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বস্কোভিচ এই প্রশ্নের কতকটা জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

তারপর আসরে অবতীর্ণ হইলেন—বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin)। বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য ইথার নামে এক অদ্ভুত পদার্থের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ইথার যেমন আলোক-তরঙ্গ বহন করে, তেমনি চৌম্বক ও তড়িৎ শক্তির বিকাশ ঘটায়। এই ইথার সর্ব্বব্যাপী। জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে এই ইথার নাই। লর্ড কেলভিন্ বলিলেন, এই ইথারই জড়ের মূল উপাদান। জড়ের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, জড়ের বিনাশ নাই এবং ইহাকে কেহ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। সিগারেটের ধোঁয়া যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে থাকে, বিশ্বব্যাপী ইথারের মধ্যে সেইরূপ কতকগুলি কুণ্ডলী বা ঘূর্ণী আছে। এই ঘূর্ণীর সংখ্যা কমিতেও পারে না, বাড়িতেও পারে না। কারণ ইহাদের বিনাশও নাই, নূতন সৃষ্টিও নাই। এই এক একটি ঘূর্ণীই হইল এক একটি জড়কণা বা পরমাণু। ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর এই আবর্ত্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের। একাধিক আবর্ত্ত বা ঘূর্ণী মিলিয়া একটি অণু গঠিত হয়। ইহার সাহায্যে বায়বীয় পদার্থের গঠন কল্পনা করা যায়। কিন্তু কঠিন বস্তুর উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? একখণ্ড নরম পাতলা কাগজের চাকৃতিকে অসম্ভব বেগে ঘুরাইতে পারিলে তাহাও ইস্পাতের মত দৃঢ় হইয়া উঠে, অতএব ইথারের ঘূর্ণী হইতে কঠিন পদার্থের উৎপত্তি কল্পনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রবর্ত্তিত ইথারের ঘূর্ণী, পরমাণু সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের মীমাংসার পথ সুগম করিয়া দিলেও, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদের ন্যায় কোন কোন বিষয়ে গোলমালের সৃষ্টি করিল। ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলীসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-শক্তির অভাবই ইহার কারণ। এবং এই কারণেই এই মতবাদ শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইল না। যে আলোক-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইথারের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন—আলোক দ্বৈত

ম্যাডাম ক্যুরী।

প্রকৃতি বিশিষ্ট। অবস্থাবিশেষে আলোক-রশ্মি বেগবান সূক্ষ্ম কণিকার আকার ধারণ করে, আবার বিপরীত অবস্থায় গতিশীল তরঙ্গে পরিণত হয়। এক অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময়

পদার্থ হইতে একরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণিকা বিপুল বেগে ছুটিয়া আসিয়া চক্ষু-পর্দ্দায় আঘাত করিলে আলোর জ্ঞান জন্মে। এই কণিকাসমূহকে 'ফটোন' (photon) বলা হয়। আর এক অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অণু পরমাণুগুলি অতি দ্রুত কম্পিত হইতে থাকে। এই কম্পনই আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া শ্বেতবর্ণের আলোক পরিচালিত হইলে উহা বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ত্রিকোণ কাচের পরিবর্ত্তে ঘনসন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 'গ্রেটিং' সমন্বিত
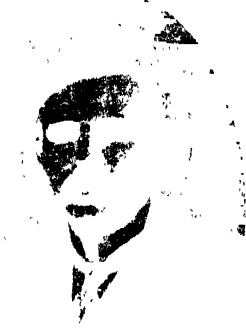
আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড।

কাচের ভিতর দিয়া আলোক পরিচালিত করিলেও উজ্জ্বলবর্ণ ছত্র পাওয়া যায়, অধিকন্তু ইহাতে বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও পরিমাপ করিতে পারা যায়। প্রোফেসর রোল্যাণ্ড এই উদ্ভাবনার কৃতিত্বের অধিকারী, তিনি নবোদ্ভাবিত উপায়ে লৌহের বর্ণছত্র পরীক্ষা করিয়া লৌহপরমাণুর বিবিধ জটিলতা দেখিতে পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে এক্স রে আবিষ্কারের ফলে এই জটিলতার মধ্যে যে একটি সুশৃঙ্খলিত নিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৮৯০ খৃঃ অব্দে রন্‌জেন্ রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। বায়ুশূন্য কাচের গোলকের মধ্যে উচ্চ চাপের তড়িৎস্রোত চালাইলে দেখা যায়, কাচগোলকের এক তড়িৎপ্রান্ত হইতে অপর তড়িৎ-প্রান্তে ক্যাথোডরশ্মি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। যে স্থলে তড়িৎস্রোত আছাড় খাইয়া পড়ে সেস্থল হইতেই এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি উৎপন্ন হয়, এই রশ্মি আলোর মত কম্পন-সংখ্যাবিশিষ্ট কিন্তু সেই কম্পনসংখ্যা অতি উচ্চ সেই জন্য ইহা সাধারণ আলোকরশ্মি হইতে বিপরীতধর্ম্মী। সাধারণ আলোর পক্ষে দুর্ভেদ্য জিনিষ এই অদৃশ্য রশ্মি অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। প্রশ্ন উঠিল তবে এই রশ্মিটি কি? সাধারণ আলোকরশ্মির কাছে চুম্বক লইয়া গেলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না; কিন্তু এই রশ্মির কাছে চুম্বক ধরিলে তাহার পথ বাঁকিয়া যায়, তড়িৎপ্রবাহের কাছে চুম্বক ধরিলেও তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। তবে কি এই রশ্মি তড়িৎপ্রবাহ মাত্র? কিন্তু বায়ুশূন্য কাচগোলকের মধ্যে তড়িৎ-পরিচালক কোন বস্তু না থাকা সত্ত্বেও প্রবাহ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হয় কেমন করিয়া? পরীক্ষায় দেখা গেল, কাচগোলকের মধ্যে যে সামান্য বায়ু অবশিষ্ট থাকে, তাহারই অণু পরমাণু অবলম্বন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হইয়া থাকে। কাচগোলকের মধ্যে যে কয়েকটি বায়ুকণিকা বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন করে তাহাদের প্রত্যেকটি কতটুকু বিদ্যুৎ বহন করে—তাহাদের ওজন কত—প্রকৃতিই বা কিরূপ—ইহা জানিবার জন্য জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক প্লুকার (Plucker) পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপরে হিটর্ফ (Hittorf), গোল্ডষ্টিন (Goldstein), সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স (Sir William Crookes) এই বিষয়ে পরীক্ষায় ব্যাপৃত হন। অবশেষে অনেক ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের পর ১৮৯৭ সালে সার জে. জে. টমসনের (Sir J. J. Thomson) পরীক্ষার ফলে এক অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল বিদ্যুৎবাহী বায়ু-কণিকার অধিকাংশই সাধারণ অণু পরমাণু মাত্র; কিন্তু আরও এমন কতকগুলি কণার সন্ধান পাওয়া গেল, যাহাদের ওজন সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা হাইড্রোজেন-পরমাণুর দুই হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এটম বা পরমাণু হইতে ক্ষুদ্রতর জড়কণা হইতেই পারে না—বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন নিশ্চিন্ত মনে ইহাই ধারণা করিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু টমসনের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ক্রুক্‌স বলিয়াছিলেন, এই সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি অতি-দ্রুত গতিশীল ঋণ-তড়িতাবেশযুক্ত জড়কণা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু টমসন দেখাইলেন, যে এগুলি পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ঋণ-তড়িৎ কণিকা—ইহারা মোটেই জড়-কণিকা

নহে। ইহাদের নাম দেওয়া হইল—'ইলেকট্রন', সাধারণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ এই 'ইলেকট্রণে'র স্রোত মাত্র। জড় পদার্থের মত ইহাদের ওজনও বাস্তব নহে। গতিবেগের উপর ইহাদের ওজন নির্ভর করে। গতিবেগ থাকিলে ইহা-

নীল্‌স বর।
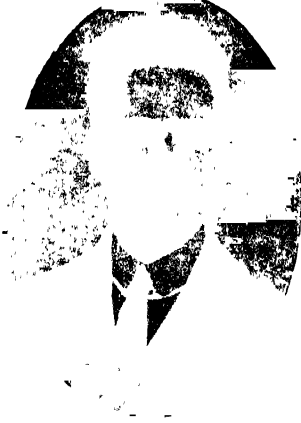
দের ওজন পরিস্ফুট হয়, গতিবেগ না থাকিলে ওজন কিছুই থাকে না। জড়ের যেমন অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম পরমাণু—বিদ্যুতেরও সেরূপ বিদ্যুতাণু। ইহাদের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০,০০০ মাইল হইতে ১০০,০০০ মাইল।

জড়ের উপাদানস্বরূপ পরমাণুবাদ এই প্রকারে কতকটা নিরূপিত হইল বটে, কিন্তু এই আবিষ্কারের পর হইতে পরমাণু প্রকৃতই অবিভাজ্য কি না এ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। বৈজ্ঞানিকেরা প্রশ্ন তুলিলেন—ওই ঋণ-বিদ্যুতাণু-গুলিই জড়ের আসল উপাদান কি না? সার জে. জে. টমসন পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন বিবিধ পরীক্ষার ফলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া—বিদ্যুতাণুই যে জড়ের চরম উপাদান এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। ক্রমে এমন সব যুক্তি, প্রমাণ উপস্থিত হইতে লাগিল যে, পরমাণুকে আর ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য জড়কণা বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ইহা যে বিভিন্ন শক্তিসমবায়ে সৃষ্ট মিশ্র পদার্থ, ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র রহিল না।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বেকারেল (Henry Becquerel) তাঁহার এক অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন। তিনি দেখিতে পাইলেন—ইউরেনিয়াম নামক ধাতব পদার্থ হইতে এক প্রকার অদ্ভুত রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি রন্‌জেন-রশ্মির ন্যায় সাধারণ আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ জিনিষ অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এবং ফটো-প্লেটের উপরও ক্রিয়া করে। ইহার পর ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ম্যাডাম কুরী ও তাঁহার স্বামী পিরী কুরী ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী বিখ্যাত রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। এই অদ্ভুত পদার্থ হইতে স্বতঃই অনবরত এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। এই স্বতঃবিকীরণকারী রশ্মি চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার সময় তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ 'আয়ন (Ion) সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-অপরিচালক বায়ু এই 'আয়ন' উৎপত্তির ফলে পরিচালক হইয়া পড়ে। থোরিয়াম-ঘটিত পদার্থের এই রশ্মি বিকীরণ দেখা যায়। রেডিয়াম আবিষ্কারের পর রাদারফোর্ড, সডি (Soddy) প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থনিঃসৃত রশ্মি আল্‌ফা, বিটা, গামা নামক বিভিন্ন প্রকৃতির রশ্মি সমবায়ে গঠিত। আল্‌ফা-রশ্মি ধন-তড়িৎযুক্ত গতিশীল জড়কণা সদৃশ; বিটা-রশ্মি ইলেকট্রণ প্রবাহ মাত্র এবং গামা-রশ্মি রন্‌জেনরশ্মির প্রকৃতিবিশিষ্ট। আলফা-রশ্মির কণিকাগুলি বিটা-রশ্মির ইলেকট্রনের মত অত সূক্ষ্ম নহে। ইহারা সাধারণ জড়কণার মত আয়তন বিশিষ্ট। গামা ও বিটা-রশ্মি যেরূপ পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে আলফা-কণিকা সেরূপ পারে না। রেডিয়াম

সংঘর্ষণের ফলে হিলিয়াম পরমাণু হইতে নির্গত আলফা কণিকার পথ। (উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে পরিদৃশ্যমান পথের আলোক চিত্র)।

প্রভৃতি স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থসমূহের পরমাণুর গঠন জটিল প্রকৃতির। এই বিশেষত্বের জন্যই ইহাদের পরমাণু-গুলি অনবরত ভাঙ্গিতেছে। রেডিয়ামের প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ হইতে আলফাকণা (এক জোড়া প্রোটন লইয়া

একটি আলফাকণা গঠিত) ও ইলেকট্রণ বাহির হইয়া যাইতেছে। রেডিয়াম-পরমাণু হইতে আলফা-কণা বাহির হইয়া 'রেডিয়াম ইমানেসন' নামক গ্যাস জন্মলাভ করে। প্রত্যেক আলফাকণায় দুই 'ইউনিট' বা মাত্রা তড়িৎ সংশ্লিষ্ট আছে। এই আলফাকণাগুলি কোন রকমে তড়িৎশক্তিবিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে সেগুলি আবার হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। রেডিয়াম হইতে আলফাকণা ও ইলেকট্রন খসিয়া গেলে সেটা আর রেডিয়াম থাকে না। রেডিয়াম-পরমাণুগুলি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষ পর্য্যন্ত সীসাতে পরিণত হয়। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে দুই হাজার বছরেরও বেশী
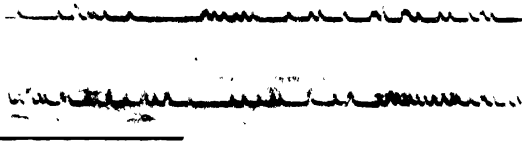
গাইজার কাউণ্টারে পরমাণুর সংখ্যানির্দ্দেশের উপায়, প্রত্যেকটি ঢেউএর শীর্ষ-বিন্দু এক একটি হিলিয়াম পরমাণুর গাইজার কাউণ্টারে প্রবেশ নির্দ্দেশ করে। (গাইজার-রাদারফোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত)।

সময় লাগিয়া থাকে। পদার্থের এরূপ ভাঙ্গাগড়া—বিশেষতঃ এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া অন্য পরমাণুর উৎপত্তি দেখিয়া পরমাণু যে অবিভাজ্য নহে তাহা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাপানী অধ্যাপক নাগাওকা, কেম্ব্রিজের অধ্যাপক আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের অভ্রান্ত পরীক্ষার ফলে—জড় পরমাণু যে সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য কণিকা নহে—এই মতবাদ আরও সুপ্রতিষ্ঠ হয়। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে কোপেনহাগেনের অধ্যাপক নীল বরও বিবিধ পরীক্ষার ফলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং জড় পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে বিস্ময়কর অভিনব তথ্যাবলীর সন্ধান প্রদান করেন। বর ও রাদারফোর্ড পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের যে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহার মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিতেছি। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও হাল্কা হাইড্রোজেন-পরমাণুর কথাই ধরা যাউক। কারণ ইহার গঠন-প্রণালী অতিশয় সরল। হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি ধন-তড়িতাবেশযুক্ত এবং একটি ঋণ-তড়িতাবেশ যুক্ত তড়িৎকণিকার সমবায়ে গঠিত। সৌর-জগতের মধ্যে পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে সেইরূপ হাইড্রোজেন-পরমাণুর মধ্যে ধন-কণিকাটি ঠিক মধ্য স্থলে আছে—আর ঋণ-কণিকাটি তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঠিক বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। কেন্দ্রীয় ধন-কণিকাটির নাম 'প্রোটন', আর কক্ষস্থিত ঘূর্ণায়মান ঋণ-কণিকাটির নাম 'ইলেকট্রন'। 'ইলেকট্রোলাইসিস্' (Electrolysis) প্রক্রিয়াতে দ্রবণের মধ্যে যৌগিক বস্তুর কতকগুলি অণু ভাঙ্গিয়া তড়িতাবেশযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হয়। এই সকল তড়িতাবেশযুক্ত কণিকাকে 'আয়ন' (Ion) বলা হয়। একটি কণিকার সহিত যে পরিমাণ তড়িতাবেশ থাকে তাহাকে কোয়ানটাম (Quantum) বা এক তড়িৎ মাত্রা বলা হয়। একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুকে ১৮০০ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের সহিত ঋণাত্মক এক তড়িৎ মাত্রা বা কোয়ানটাম যুক্ত থাকে। ইহাকেই 'ইলেকট্রন' বলা হয়। বর ও রাদার-ফোর্ড বলেন—মাঝের প্রোটন বা ধনাত্মক বিদ্যুৎকণিকাটি কক্ষস্থিত ঋণাত্মক কণিকা বা ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় ২০০০ গুণ ভারী বলিয়া কেন্দ্রে স্থির থাকে আর ইলেকট্রন একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। সকল প্রকার পরমাণুর গঠন একই ধরণের ; তবে যে সকল পরমাণুর গুরুত্ব বা ওজন বেশী তাহাদের আভ্যন্তরীণ গঠন অপেক্ষাকৃত বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। সকলেরই কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন থাকে এবং এক বা একাধিক ইলেকট্রন তাহাদিগকে বিভিন্ন কক্ষে প্রদক্ষিণ করে। বিভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণুগুলিকে গুরুত্ব হিসাবে পর পর সাজাইলে বরের মতানুসারে দেখা যায়, হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন ও কক্ষে একটি ইলেকট্রন, হিলিয়ামের কেন্দ্রে চারটি প্রোটন ও বাহিরের বিভিন্ন কক্ষে দুইটি ইলেকট্রন, লিথিয়ামের কেন্দ্রে ছয়টি প্রোটন ও তিনটি ইলেকট্রন এবং বাহিরের বিভিন্ন কক্ষে তিনটি ইলেকট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ স্থলে কোয়ানটাম থিওরি (Quantum Theory) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। জড়ের যেরূপ পরমাণু আছে—শক্তিরও সেরূপ পরমাণু কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ শক্তি পরমাণুকে 'কোয়ানটাম' বলা হয়। তাপ-বিকীরণের সময় উত্তপ্ত বস্তু হইতে যে শক্তি ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন বা একটানা নহে। অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে দফায় দফায় এই ক্ষয় ঘটিয়া

থাকে। উত্তপ্ত পদার্থ হইতে এক এক দফায় যতটুকু শক্তি বাহির হইয়া যায়, ততটুকু শক্তিকে এক 'ইউনিট' বা এক মাত্রা বলা হয়। এই 'ইউনিট' শক্তিই কোয়ানটাম। কোয়ানটাম বাদ প্রয়োগে বর সাহেব পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণন-কক্ষের ব্যাস নিরূপণ করেন। উহার ব্যাস এমন হওয়া দরকার যাহাতে আবর্ত্তন-উদ্ভূত শক্তি কোয়ানটামের অখণ্ড গুণিতক (whole number of multiples) হয়। এই ভাবে কক্ষ নিরূপণ করিতে হইলে একাধিক কক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যখন যখন আবর্ত্তন-উদ্ভূত শক্তি এক কোয়ানটামের সমান হয়, তখন ইলেকট্রনের আলোর বেগের ১৪০ ভাগের এক ভাগ হয়। আবার যখন এই শক্তি দুই, তিন বা চার কোয়ানটামের সমান হয় তখন নূতন কক্ষের ব্যাসার্দ্ধ চার, নয় বা ষোল গুণ বড় হইয়া যাইবে। আইনষ্টীনের আলোক কোয়ানটাম অনুযায়ী হিসাবে দেখা যায় - যখন পরমাণু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়, তখন আলোকরূপে শক্তি বিকীরণ করে। কোন পাত্রে হাইড্রোজেন ভরিয়া— বিদ্যুৎপ্রবাহ সাহায্যে তাহাকে উত্তেজিত করিলে হাইড্রোজেন-পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে দূরে অবস্থিত সম্ভাব্য কক্ষান্তরে লাফালাফি করিতে থাকে। এই সময়ে নানা প্রকার রং-এর আলোর খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে বর সাহেবের সিদ্ধান্তে কোন কোন বিষয়ে একটু অমিল হইয়া পড়িত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে ১৯১৫ খৃঃ অব্দে সোমারফেল্ড (Sommerfeld) বর সাহেবের পরমাণু-গঠনতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করেন। কোপার্নিকাস সৌরজগতের গ্রহগুলির গতিবিধির বৃত্তাকার কক্ষ কল্পনা করিয়াছিলেন—কিছুদিন পরে তাহাতে হিসাবের গরমিল দেখা যাইতে থাকে। অবশেষে কেপ্‌লার কক্ষপথকে বৃত্তের পরিবর্ত্তে বৃত্তাভাষ (ellipse) ধরিয়া গ্রহ-সমূহের গতিবিধির নিখুঁৎ হিসাব মিলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ সোমারফেল্ডও ইলেকট্রনের কক্ষপথকে বৃত্ত না ধরিয়া বৃত্তাভাষ বলিয়া প্রচার করেন। ইহার ফলে খুটীনাটী দোষ-ত্রুটী অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে।

আগে পরমাণুগুলিকে নিরেট কণিকা বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল—সৌরজগতের গ্রহ-গুলি মাধ্যাকর্ষণের টানে যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে—পরমাণুগুলিও সেরূপ এক একটি ক্ষুদ্রতম সৌরজগত বিশেষ। পরমাণুর গঠন যদি সৌরজগতের মতই হইয়া থাকে তবে ইহার ভিতরের বাঁধন আল্‌গা হইবারই কথা। তাহা হইলে পরমাণুর ঝাঁকের মধ্যে যদি তদনুরূপ ক্ষুদ্র ঢিল মারিতে পারা যায়, তবে তো তাহা হইতে দুই একটা 'ইলেকট্রন' বা 'প্রোটন'কে স্থান ভ্রষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঢিল কোথায় মিলিবে? পূর্ব্বে স্বতঃবিকীরণকারী পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থ হইতে অনবরত এক এক জোড়া প্রোটন বা আলফা-কণা ভীমবেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহারা এক একটি জড়পরমাণু হইতে অনেক

ডাঃ ডি. এম. বোস।

ছোট। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগকেই ঢিলরূপে ব্যবহার করিয়া অণু-পরমাণু ভাঙ্গিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া এই ঢিল ছোঁড়ার উপায় নাই। পরমাণুর ঝাঁকের মধ্যে লাখে লাখে আলফাকণা ছুঁড়িয়া দিলে দুই একটাতে লাগিয়া যায়, আবার কোন কোনটা ঠিক মত না লাগিয়া কেন্দ্রীয় পদার্থের একটু গা ঘেঁষিয়া গেলে তাহার আকর্ষণের ফলে আলফাকণার গতিপথ বাঁকিয়া যাইতে পারে। এই গুলি নিছক কল্পনার বিষয় নহে। নিখুঁৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে এই সকল মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অণুপরমাণুর সংখ্যা নির্দ্দেশক 'গাইজার কাউণ্টার', মিলিকানের তৈলবিন্দু পরীক্ষা, এবং পরমাণু সংঘর্ষের আলোকচিত্র গ্রহণোপযোগী উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠের (cloud chamber) পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের পালিত-অধ্যাপক ডাঃ

ডি. এম. বসুও পরমাণুর সংঘর্ষ-বিষয়ে অনেক পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন।

আলফাকণিকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া যখন পরমাণুকে ভাঙ্গা সম্ভব হইল, তখন প্রায় কাছাকাছি এক প্রকার গঠনের পরমাণুর একটাকে অন্য জাতীয় পরমাণুতে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না কেন? মধ্যযুগের স্বপ্ন কি তবে সফল হইবে? দেখা যায়, পারদ ও স্বর্ণের পরমাণুর গঠন কতকটা এক প্রকারের, স্বর্ণের পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থে যতগুলি 'ইলেকট্রণ' আছে তাহা অপেক্ষা ৭৯টি প্রোটন বেশী আছে, কিন্তু পারদের পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রোটনের সংখ্যা
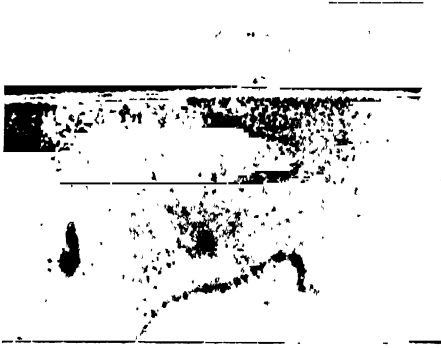
আলফা ও বিটা-কণিকার পথ (উইলসন কর্তৃক গৃহীত)।

৮০টি বেশী। মোটের উপর একটি প্রোটনে যতটুকু বৈদ্যুতিক আবেশ থাকিতে পারে পারদের পরমাণুতে স্বর্ণ অপেক্ষা মাত্র ততটুকু বৈদ্যুতিক আবেশ বেশী আছে। যদি কোন উপায়ে পারদের পরমাণুর এই একটি প্রোটন কমান যায় তবে পারদ স্বর্ণে পরিণত হইবে। এইরূপ সীসার পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ হইতে তিনটি প্রোটন এবং বহিরাবরণ হইতে তিনটি ইলেকট্রন সরাইতে পারিলে সীসাকেও স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব। পরমাণুর সঙ্গে আলফাকণার সংঘর্ষ বাধাইয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় কিনা—বৈজ্ঞানিকেরা তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক নাকি এ বিষয়ে পরীক্ষায় সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার মত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন, এলুমেনিয়াম প্রভৃতি লঘু পদার্থের সঙ্গে আলফা-কণিকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া উহাদের পরমাণুর কেন্দ্রিণ হইতে হাইড্রোজেনের পরমাণু বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণার ফলে ইলেকট্রন ও প্রোটন ব্যতীত আরও দুইটি নূতন কণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহারাও জড় পরমাণুর উপাদান বলিয়া স্থির হইয়াছে। উহাদের একটি ডাঃ চাডউইক (Dr. Chadwick) আবিষ্কৃত 'নিউট্রন', অপরটী অ্যান্ডারসন (Anderson) আবিষ্কৃত পজিট্রন। নিউট্রনের গুরুত্ব প্রায় প্রোটনের গুরুত্বের সমান কিন্তু ইহাতে কোন তড়িতাবেশ নাই। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের উভয়েরই গুরুত্ব সমান—তফাৎ কেবল ইলেকট্রন ঋণ-তড়িতাবেশযুক্ত এবং পজিট্রন ধন-তড়িতাবেশ সমন্বিত। কুরী-জলিয়টের মতে একটি প্রোটন ভাঙ্গিয়া তাহা একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রনে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যায়, প্রোটন একটি মৌলিক তড়িৎকণিকা নহে। এই সকল ব্যাপার হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, সকল পদার্থের পরমাণু যখন একই উপাদান অর্থাৎ তড়িৎ-কণিকা দ্বারা গঠিত তখন বিভিন্ন পদার্থের মূলে কোন তফাৎ নাই, শুধু পরমাণু গঠনে তড়িৎ-কণিকার সংখ্যার তারতম্য মাত্র। যাবতীয় জড় পদার্থ তড়িতেরই রূপান্তর।

বর-পরমাণু সম্বন্ধে আমরা মোটামুটী আলোচনা করিলাম। কিন্তু যে আকর্ষণশক্তির অভাবে লর্ড কেলভিনের 'ভরটেক্স' মতবাদ (Vortex Theory) প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় নাই, বর-পরমাণুর সে শক্তি আছে কি? না, বর-পরমাণুর আকর্ষণ-শক্তি থাকিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আইনষ্টাইনের মতবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আকর্ষণ-শক্তি পদার্থের একটা অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। আইনষ্টাইন দেখাইলেন আকর্ষণ-শক্তি দেশ বা স্থানের (space) ধর্ম্ম। পদার্থ গঠনবৈশিষ্ট্যের ফলে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে না—তাহার চতুর্দ্দিকে যে স্থান বা দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহারই বিশেষ ধর্ম্মের ফলে ওই শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে পরমাণু মাত্রেই একই প্রকৃতির। বর-পরমাণুবাদে একটি বিশেষ ত্রুটী এই যে, ইহাতে তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত তথ্যের কতকগুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার কয়েকটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার স্থলে আর একটি নূতন মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এই অভিনব

মতবাদকে স্রোডিংগারের (Schroedinger) পরমাণু-তরঙ্গবাদ বলা যাইতে পারে।

রেডিয়াম হইতে নির্গত হিলিয়াম পরমাণুর পথ (উইলসন কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র)।

সর্ব্ব প্রথম ডি ব্রগ্‌লি (Prince Luis de Broglie) এই পরমাণু-তরঙ্গবাদ প্রচার করেন। অবশেষে ১৯২৫ খৃঃ অব্দে স্রোডিংগার এই মতবাদকে বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করেন। বর-পরমাণু ও স্রোডিংগার-পরমাণুর পার্থক্য—তড়িতাবেশের ব্যাপ্তি ও অবস্থান লইয়া যদিও বর-পরমাণুবাদের সাহায্যে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুমীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল তথাপি স্রোডিংগারের তরঙ্গবাদের আবির্ভাবে ইহা অনেকাংশেই অলৌকিক প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর-পরমাণুর কেন্দ্রিণে ধন-তড়িতাবেশ এবং ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনে ঋণ-তড়িতাবেশ থাকে এবং এই তড়িতাবেশ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকে, কিন্তু স্রোডিংগার পরমাণুতে এই বিদ্যুতাবেশ পরমাণুর ক্ষুদ্র আয়তন জুড়িয়া বিস্তৃত। বর-পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলি তাহাদের কক্ষপথে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পক্ষান্তরে স্রোডিংগার-পরমাণুর তড়িতাবেশ নিশ্চল। কিন্তু ওই ক্ষুদ্রায়তনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থাভেদে তড়িতাবেশের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এই তড়িতাবেশের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধির ফলেই চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে আলোক-তরঙ্গের উন্মেষ ঘটে। বর-পরমাণুবাদের সাহায্যে যে সকল তথ্য মীমাংসা করা যায়, স্রোডিংগার-পরমাণু সাহায্যেও সেই সেই তথ্য ব্যাখ্যা করা যায়, অধিকন্তু বর-এর পরমাণুবাদে যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত তড়িৎ তথ্য উপেক্ষিত হয় স্রোডিংগারের মতবাদে সেরূপ হয় না—সকল তথ্যের সঙ্গেই ইহার সামঞ্জস্য আছে।

কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আলোচনা করিলেই এবিষয়ে দ্রুত ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইবে। কেলভিনের মতে ইথারের মধ্যে ধোঁয়ার আকার ঘূর্ণীই এক একটি পরমাণু। টমসন বলেন—পরমাণু হইল জেলির মত আঠালো পদার্থের সূক্ষ্মতম পিণ্ডমাত্র। রাদারফোর্ড প্রচার করিলেন—এক একটি পরমাণু এক একটি ক্ষুদ্রতম সৌরজগৎ বিশেষ। বর-সোমারফেল্ড এই সৌরজগতের কেন্দ্র ও কক্ষ নিরূপণ এবং কক্ষস্থিত গ্রহগণের ঘূর্ণনের খবর প্রদান করেন। লুইস-ল্যাংমুর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, পরমাণু ছয়টি পার্শ্ববিশিষ্ট নিরেট কণিকামাত্র। কিন্তু ল্যাণ্ডি বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, পরমাণু চতুস্ত্রিভুজবেষ্টিত ঘনক্ষেত্রমাত্র অর্থাৎ চারিটি ত্রিকোণাকার পার্শ্ববিশিষ্ট নিরেট কণিকা। স্রোডিংগার বলিলেন, তাহা হইতেই পারে না—কেন্দ্রীয় পদার্থ ও তাহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত তড়িতাবেশ লইয়া পরমাণু গঠিত। অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত কেন্দ্রীয় পদার্থের চতুর্দ্দিকে পরমাণুর আয়তনবিশিষ্ট তড়িৎ-মণ্ডল রহিয়াছে। হাইসেনবার্গ বলিলেন, কেবল তড়িতাবেশ বা তড়িন্মণ্ডল বলিলেই চলিবে না। ইলেকট্রন এখন এখানে এবং পরক্ষণেই অন্যত্থানে ছুটাছুটি করিয়া এই তড়িন্মণ্ডল গঠন করিয়াছে। এইরূপে পরমাণু সম্বন্ধে ৫৭টি বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, জড়ের উপাদান সম্বন্ধীয় গবেষণায় বৈজ্ঞানিকেরা কোথায় যাইয়া পড়িতেছেন। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই জড় ও শক্তি বিভিন্ন কিন্তু উভয়েই ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। একটা আর একটাকে ছাড়িয়া আছে—এরূপ কল্পনা করা দুষ্কর, এখন দেখা যাইতেছে, জড় শক্তিতে অথবা শক্তি জড়ে রূপান্তরিত হইতে পারে, শক্তি যেন জমাট বাঁধিয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে। জড়ের উপাদান জড়কণিকা হইতে শক্তি এবং শক্তি হইতে শক্তিকণিকায় দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু ইহাতেই সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি ? হয়তো আবার দেখা যাইবে, বৈজ্ঞানিকেরা

নাইট্রোজেন পরমাণুর সহিত আলফা কণিকার সংঘর্ষণের ফলে হাইড্রোজেন কেন্দ্রিণ ছুটিয়া বাহির হইতেছে। (ব্ল্যাকেট)।
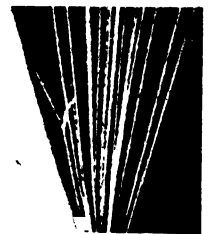
শক্তির উৎস সন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই 'নেতি' 'নেতির' অবসান আছে কি না কে জানে।

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

তের

আবার পল তার নিজের বাড়ীর সিঁড়ির ধাপে উঠছে। যাক, বিপদ তা হলে কেটে গেল, অন্ততঃ বিপদের ভয়, যা তাকে এত ভীষণ ভাবে চঞ্চল করেছিল, তা ত' কেটে গেল।

তবুও আবার সে তার মার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালে, অ্যাগনিসের সঙ্গে দেখার ফলে, সে যে তাকে গির্জ্জেয় সকলের সামনে সব গোপন কথা বলে দেবে ভয় দেখিয়েছে, সেটা তার মাকে জানানো উচিত বলে তার মনে হল। কিন্তু তাঁর সহজ ঘুমের নিঃশ্বাস পড়ছে শুনে সে সেখান থেকে চলে গেল। তার মা খুব শান্ত ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেননা, এখন থেকে তিনি জানেন যে, তাঁর ছেলে সকল অমঙ্গল থেকে এখন নিরাপদ, তার সম্বন্ধে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত।

নিরাপদ! ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, যেন একটা দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে, এই সবে সে ফিরে এল নিজের ঘরে। সব জিনিস পরিষ্কার, গোছান, সব শান্তিভরা। পোষাক ছাড়বার সময় আস্তে আস্তে পায়ের উপরে ভর দিয়ে নড়াচড়া করতে লাগল, পাছে শান্তি, নিস্তব্ধতাটা ভেঙে যায়, পাছে কিছু আগোছাল হয়ে পড়ে। তার পোষাক ঝুলছে পেরেকে, দেয়ালের ছায়ার চেয়েও ঘন কাল, তার উপরে তার মাথার টুপি, একটা কাঠের গোঁজায় আটকান তার ক্যাসকের হাতাগুলো ঝুলে পড়েছে, যেন তারা অতি ক্লান্ত। সব জিনিষই যেন কি রকম অন্ধকারে ঢাকা, কার যেন ছায়া, রক্তমাংসহীন একটা বাদুড়ের মত ডানার হাওয়ায় ভয়কে তুলছে জাগিয়ে। যে পাপ থেকে পল নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এল, এ যেন সেই পাপেরই কাল ছায়া, দাঁড়িয়ে আছে তারই জন্যে, কাল সকালে সে যখন আবার জগতের কাজে ব্যস্ত হবে, সেই পাপ ছায়া আবার তার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

এক মুহূর্ত্ত পরেই ভয়ের শিহরণ সে বুঝতে পারলে। সে রাত্রের স্বপ্নের ভূত এখনও যেন তাকে পেয়ে বসে আছে। এখনও ত সে নিরাপদ নয়। এখন যে আর একটা রাত তাকে কাটাতে হবে। ভীষণ তুফানওয়ালা সমুদ্রের মাঝখানে যেমন গভীর অমারাতে যাত্রীরা শেষ-ঝড় কাটাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে তার অবস্থা ঠিক তেমনি। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার চোখের পাতা ভারি হয়ে ক্লান্তির অবসাদে ঢুলে পড়ছে। কিন্তু কি এক অসহ্য রকমের উৎকণ্ঠা তাকে বিছানায় শুতে যেতে এখনও তেমনি বাধা দিচ্ছে। চেয়ারেও বসতে পাচ্ছে না, কোন রকমে শুয়ে বসেও যেন কিছু শান্তি আসতে দিচ্ছে না। ঘরের ভেতর এটা-সেটা নেড়ে-চেড়ে রাখতে গেল; দরকার নেই, তবু দেরাজের টানাগুলো আস্তে আস্তে টেনে দেখতে লাগল, তার ভেতরে কোথাও কিছু আছে কি না। কোন দরকার নেই, তবুও সে এমনি করে অস্বাভাবিক ভাবে ঘুরে দেখতে লাগল।

আরসীর সামনে দিয়ে যেতে, তাতে সে নিজের ছায়া দেখলে। মুখ যেন তামাটে হয়ে গেছে, ঠোঁট বেগুনী রঙ, চোখ গর্ত্তের ভেতর বসা। সেই ছায়াকে সে বলতে লাগল—"ভাল করে একবার নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখ পল।" তারপর আবার একটু এগিয়ে গেল, যাতে ল্যাম্পের আলো তার মুখের ওপর খুব ভাল করে পড়ে। আরসীর ছায়ামূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে গেল, যেন তার চোখের কাছ থেকে ছায়াটা পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, চোখের তারা বড় হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত কথা তার মনে জেগে উঠল যে, সত্যি যে পল, সে ওই আরসীর ভিতরে, সে পল কখনও মিছে কথা বলেনি, কখনও মিছে ভাবেনি, কিন্তু সেও ওই তার মুখের ফ্যাকাশে রঙ দিয়ে, তার কাল সকালের মহা আশঙ্কাকে বেশ করে জানিয়ে দিচ্ছে।

তখন নিঃশব্দে পল একটা প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে—'কি করে তুমি নিজেকে এমন ছলনা করে ভোলাচ্ছ, যখন তুমি জানছ যে, কিছুতেই তুমি নিরাপদ নয়?' 'সে যেমন আমায় আদেশ করেছে, তাই উচিত, আজ রাত্রে এ গ্রাম ত্যাগ করেই আমার যাওয়া উচিত।'

সেই দৃঢ়তা মনে এনেই, শান্ত হ'য়ে সে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। এই রকমে চোখ বুজে, আর মুখখানা বালিসে গুঁজে সে মনে করলে, তার যে বিবেক, তাকে আরো ভাল করে সে খুঁজে পাবে।

"হ্যাঁ, আজ রাত্রেই আমি চলে যাব। ঈশা নিজে আমাদের বলেছেন, কোন খারাপ জিনিষ নিয়ে ঘোঁট করা ঠিক উচিত নয়। তার চেয়ে মাকে ডেকে জাগানই উচিত, তাঁকে সব খুলে বলা উচিত। হয়ত তাহ'লে আমরা দুজনেই চলে যেতে পারব। মা আবার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যেমন নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার একটা নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারব।"

কিন্তু তার বোধ হল যে, এ সবই তার মনের বাসনকে উজ্জ্বল রঙে এঁকে দেখা। যা সে মনে করছে, কাজে পরিণত করার কোন সাহসই তার একেবারে নেই। আর তাই বা সে কেন করতে যাবে? তার মনে এইটে নিশ্চয় হয়ে রইল যে, অ্যাগনিস যে ভয় দেখিয়েছে, সে কখনও কাজে তা করবে না, তবে কেনই বা সে এখান থেকে চলে যাবে? অ্যাগনিসের কাছে ফিরে গিয়ে, তার বাড়ীতে তার সামনে মুখোমুখীও আর তাকে হতে হচ্ছে না, আর সে ফিরে পাপে পড়ছে না। এখন ত' তার শেষ পরীক্ষা হয়ে গেছে, কামনার মোহ ও প্রলোভনকে জয় করেছে।

আবার সেই বাসনার উজ্জ্বল রঙে মন রঙিন হয়ে গেল।

"যত যাই বল পল, তোমাকে যেতেই হবে, এটা নিশ্চিত জেন। তোমার মাকে জাগাও, দুজনে একসঙ্গে চলে যাও। তুমি জান না যে কে তোমার

সঙ্গে কথা কইছে? আমি অ্যাগনিস। তুমি সত্যি মনে কর যে, আমি তোমায় যে ভয় দেখিয়েছি তা কাজে করব না, বটে? হয়ত নাও করতে পারি, কিন্তু আমি তোমাকে ভাল উপদেশ দিচ্ছি যে, গ্রাম ছেড়ে এখনি চলে যাও, বুঝলে, ও একই কথা। তুমি ভেবেছ যে, আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছ, না? তবুও আমি এখন তোমার প্রাণের ভিতরে রয়েছি, যা কিছু মন্দ, সেই শক্তি আমি তোমার জীবনের। যদি তুমি এখানে থাক, আমি এক লহমা তোমাকে ত্যাগ করব না, কখন তোমাকে একলা হতে দেব না, মনে রেখ। তোমার পায়ের তলায় ছায়া হয়ে লেপটে থাকব, তুমি আর তোমার মায়ের মাঝখানে পাহাড়ের আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি আর তোমার আত্মার মাঝখানে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব। যাও। এখুনি যাও।" তারপর সে যেন অ্যাগনিসকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে, আসলে সে তার নিজের বিবেকের যাতনাকেই শান্ত করতে চায়।

"হ্যাঁ, আমি ত যাচ্ছি, আমি বলছি তোমায়। আমি ত যাচ্ছি মা আর আমি একসঙ্গে যাব। আমার ভেতরে যে তুমি, সে আমার আমির চেয়েও জীবন্ত। শান্ত হও, থাম, আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না, আর আমাকে ভয় দেখাতে হবে না। আমরা ত এক হয়ে আছি, এক পথেরই যাত্রী, এক সঙ্গেই চলেছি, কালের বিচিত্র পাখায় চড়ে উড়ে চলেছি অনন্ত কালের পথে। তফাৎ হয়েছি সেই কালে, যখন প্রথম সেই আমাদের আঁখি এক হয়, প্রথম চোখে চোখ পড়ে, প্রথম আমাদের ঠোঁট এক হয়; এখনি ত শুধু আমাদের সত্যি মিলন আরম্ভ হল। তোমার ওই অন্তিম ঘৃণার মাঝে আমার এই অসীম ধৈর্য্যের মাঝে, আর আমার এই সর্বস্বত্যাগে।"

তারপর ক্লান্তি তাকে ক্রমে ধীরে ধীরে কাবু করে দিলে। বাইরে থেকে একটা অবিরাম ধ্বনি উঠছে, চাপা শব্দ, ঠিক যেন একটা পায়রা আর একটা পায়রার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গুমরে গুমরে উঠছে। সেই ব্যথার চীৎকার, যেন রাত্রির নিজের বুকের ব্যথা। সে রাত্রি চাঁদের আলোয় পাণ্ডুর মুখ, ঘোমটায় ঢাকা আলোর মত। আকাশ সেই সঙ্গে ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা সাদা মেঘে ভরা, যেন কতকগুলো সাদা বকের পালক ভাসছে। তার মনে হল, সে জানতে পারলে, এ গোমরানি তারই নিজের বুকের ভিতর গুমরে উঠেছে। ঘুম একটু একটু করে তাকে ঘিরে আসছে, তার সব ইন্দ্রিয়কে শান্ত, অবশ করে আনছে। ভয়, দুঃখ, দুঃখের মত স্মৃতি সব যেন ছায়ার ভিতর মিলিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখলে যে, সে সত্যিই কোথায় ভ্রমণে চলেছে, পাহাড়ে রাস্তায় ঘোড়ায় চলেছে, সেই উপত্যকার পথে। সব বেশ শান্ত ও পরিষ্কার; বড় বড় হলদে গাছের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসের জমি বিস্তৃত রয়েছে, সবুজ শীতল রঙ, যাতে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর পাহাড়ের উপরে সূর্য্যের আলোর দিকে অচল হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ঈগল পাখীরা।

হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল সেই রক্ষক, তাকে কুর্নীশ করে একখানা খোলা বই খাড়া করে ধরলে। সে পড়তে আরম্ভ করলে, 'কোরিন্থিয়ানদের প্রতি সেন্ট পলের চিঠি', ঠিক সেই জায়গাটা, যে জায়গাটায় পল গত রাত্রে পড়তে পড়তে রেখেছিল, যেখানে আছে, "ভগবানই শুধু জানেন, বিজ্ঞদের চিন্তা ও চিন্তার ধারা, কিন্তু সে সবই বৃথা।"

অন্য দিনের চেয়ে রবিবারে ধর্ম্ম-উপদেশ গির্জ্জেয় একটু দেরী হয়। কিন্তু পল খুব সকাল সকালই গির্জ্জেয় যায়, মেয়েদের পাপদেশনা শুনতে। সেই জন্যে তার মা পলকে ঠিক সময়েই তুলে দিয়েছেন।

সে কয়েক ঘণ্টা বেশ ঘুমিয়েছে। ভারি ঘুম, তার মধ্যে কোন স্বপ্ন ছিল না। যখন সে উঠল, তার স্মৃতি একেবারে সাদা কাগজের মত—সবটাই ফাঁক। তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল, এখুনি গিয়ে আর খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়। কিন্তু তার দরজায় ধাক্কা থামল না। কেবল দরজায় শব্দ হতে লাগল। তারপর তার সব মনে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তার হাত পা সব ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"অ্যাগনিস সকালে গির্জ্জেয় আসবে আর সবার সামনে, সকলের কাছে আমাকে আমার সব গোপন কথা ও কাজ প্রকাশ করে বলে আমাকে অপমানিত করাবে।" এই এক ভাবনা শুধু তার ভীষণ হল।

কেন তা সে জানে না, কিন্তু যখন সে ঘুমুচ্ছিল তখন থেকে তার মনে একেবারে স্থির ভাবে গেঁথে গেছে যে, অ্যাগনিস তাকে যে ভয় দেখিয়েছে, সে তা কাজেও করবে। এ যেন তার বিবেকও বলছে, আর তার বুকের ভিতর কাঁটার মত শক্ত হয়ে বিঁধে রয়েছে।

সে চেয়ারে বসে পড়ল, তার হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, সে যেন একেবারে সকল রকমে অসহায় হয়ে পড়েছে। মন তার নানা রঙের মেঘে ভরে গেছে, আবার সব রঙই জেবড়ে গেছে। সে তখন ভাবতে লাগল, এখনও কি কোন উপায় নাই যাতে এই কেলেঙ্কারীটাকে বন্ধ করা যায়—যদি সে আজ সকালে অসুখের ভাণ করে শুয়ে থেকে, আজকের ধর্ম্ম-উপদেশ দেওয়া বন্ধ রাখে। তাতে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে, সময় পেলে হয়ত অ্যাগনিসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করা যাবে। কিন্তু গোড়া থেকে আবার এই সব নতুন করে আরম্ভ করার ভাবনায়, আবার দ্বিতীয় বার সেই অসহ যাতনা সহ্য করার যে দুঃখ আগের দিন হয়েছে, তা মনে করে তার মনের অস্বস্তি ও যাতনা বেড়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথাটা যেন জানালার কাঁচের ভিতর থেকে আকাশে মাথা ঠেকাবার মত দেখালে। যাতনায় তার রক্ত জমাট করে হাত পা সব অবশ করে ফেললে, এই অবসাদকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য জোর করে সে মাটীতে পা ঠুকতে লাগল। তারপর পোষাক পরলে, তার চামড়া, কোমরবন্ধ বেশ কসে কোমরে বাঁধলে। পাহাড়ে যাবার আগে শিকারীরা যেমন তাদের গায়ের ক্লোককে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে তার উপরে তাদের কার্ত্তুজের চামড়ার বাঁধুনিটা জড়ায়, তেমনি করে পল তার ক্লোকটা জড়িয়ে নিলে। সে জানালাটা খুলে ফেলে দিয়ে ঝুঁকে বাইরের দিকে দেখলে। সারারাত্রির ভুতুড়ে কাণ্ডের পর এই সবে দিনের আলোয় তার চোখ জেগে উঠল। শুধু তখুনি সে তার নিজের মনের কারাগার থেকে বের হয়ে বাইরের জগতের কাজের সঙ্গে সন্ধি করবার

পথ পেলে। কিন্তু এ ত' সন্ধি নয়, শান্তি নয়, এ ত' জোর করে আনা, তার ভিতর ত' একেবারে তিক্ত বিষের জ্বালা-মাখা ঘৃণায় ভরা। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা টাটকা হাওয়া তার মাথায় লাগল, প্রাণভরে সে হাওয়া টেনে নিলে, তবু কিন্তু ঘরের ভিতরের সেই সুগন্ধি বাতাস, তার চারিদিকের ভাব আবার তাকে তার সেই পুরোনো নিজের ভিতর টেনে নিয়ে গেল, আবার সেই হাড়-কাঁপনি ভয় তাকে তেমনি ঘোরাল ভাবেই জড়িয়ে ধরলে।

তাই সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে পালিয়ে গেল, এই ভেবে যে, তার মায়ের কাছে গিয়ে সকল কথা খুলে বলাই বোধ হয় ভাল।

সে শুনতে পেলে যে, মা তার করুণ স্বরে রান্নাঘর থেকে মুরগীর ছানা গুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা যখন উড়ে পালায়, তাদের ডানার কট্ কট্ শব্দ সে শুনতে পেলে। গরম কফির গন্ধ নাকে এল, সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ভিতর থেকে মধুর ফুলের গন্ধ আসছে। পাহাড়ের উঁচু জমির পাশের গলি দিয়ে ছাগল চরাতে যাচ্ছে, তাদের গলার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলো টুনটুন করে বাজছে। গির্জ্জেয় অ্যান্টিয়োকাস ঘণ্টা বাজিয়ে গ্রামের লোকদের জাগিয়ে ঘুম থেকে তুলছে। তাদের ডাকছে ধর্ম্ম-উপাসনায় যোগ দেবার জন্যে। সেই এক সুরের ঘণ্টার ধ্বনি, আর দূরে পাহাড়ের পথে ছাগলের গলার ছোট ঘণ্টায় তারি যেন ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠছে।

চারিদিকে সবই যেন কেমন মধুর শান্তিতে ভরা, ভোরের সেই গোলাপী রঙের আলোয় সব যেন স্নান করেছে। পল আবার তার স্বপ্ন মনে করতে লাগল।

এখন আর বাইরে যাওয়ায় তাকে কিছুই বাধা দেবে না,- গির্জ্জেয় যেতে, আর প্রতিদিনের যে সাদামাটা সংসারের কাজ তা আরম্ভ করতে। তবু আবার তার সেই ভয় ফিরে ফিরে তার কাছে আসতে লাগল। সামনে এগিয়ে যেতেও যেমন ভয় হচ্ছে, পিছিয়ে যেতেও ঠিক তেমনি ভয়। খোলা দরজার কাছে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে তার বোধ হল, যেন একটা খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দাঁড়িয়ে, তার উপরের উঁচুতে ওঠা একেবারে অসম্ভব, আর নীচে অতল অন্ধকার, গহন গহ্বর। তাই সেখানে অব্যক্ত ভাবের মুহূর্ত্তে সে রইল দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে তার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করতে লাগল। সত্যিই যেন সে সেই অতল গর্ত্তের ভিতর পড়ে যাচ্ছে, গর্ত্তের ভিতর পড়ে ভীষণ ছটফট করছে। যেন এক অন্ধকার, মধুর সমুদ্রের এক ধারের গর্ত্তের মধ্যে, চারিদিকে ফেনায় ভরা জল, আবর্ত্তনের মত সে খুব পাক খাচ্ছে। সে ঘূর্ণীকে কিছুতেই কাটিয়ে যেতে পারছে না। বৃথা, শুধু শুধু সেই জলধারাকে আঘাত করছে, সে কিন্তু তাকে ছিন্ন-ভিন্ন-করা খরস্রোতের পাক খাওয়ার ভিতরই নিয়ে চলল।

এ হল তার নিজেরই হৃদয়, যে এই জীবনের অন্ধকার ঘূর্ণীর ভিতর অসহায় ভাবে ঘুরছে; ঘুরছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না সে ঘোর থেকে কেটে বেরুতে। দরজ বন্ধ করে সে আবার বাড়ী ফিরে গেল। সিঁড়ির ধাপের উপর গিয়ে বসল, যেখানে গত রাত্রে তার মা বসে ছিলেন। এ ভীষণ প্রশ্নের মীমাংসা করার হাল ছেড়ে দিয়ে সহজ ভাবে সে বসে রইল এই আশায় যে, কেউ এসে তাকে সাহায্য করে এই ঘূর্ণী থেকে বার করে নিয়ে বাঁচিয়ে দেবে।

সেই খানে তার মা তাকে দেখতে পেলেন। মাকে দেখেই পল তখুনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কোন রকমে তার যেন খানিকটা স্বস্তি এল, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সেই অপমানের ভারও যেন ভারী হয়ে উঠল। তার অন্তর যেন বলে উঠল, এইবার সে নিশ্চয় ঠিক উপদেশ পাবে, তার মা তাকে ঠিক রাস্তায় চলবার উপায় নিশ্চয়ই বলে দিতে পারবেন।

কিন্তু পলের চেহারা দেখে মার সেই কাতর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল।

মা পলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"পল এখানে বসে কি করছ?" তোমার কি অসুখ করেছে?"

"মা" আবার ঘরে না ঢুকেই সদর দরজার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে পল বললে—"মা! কাল রাত্রে তোমাকে আমি জাগিয়ে তুলিনি, ডাকিনি, অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, দেখ, আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, আমি সেখানে, হ্যাঁ আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

মা তখন নিজেকে সামলে নিয়ে, স্থির হয়ে ছেলের মুখের পানে চেয়েছিলেন। তাদের উভয়ের কথার পর যে সামান্য সময়টুকু তারা চুপ করে ছিল, তার ভিতরে তারা গির্জ্জের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, খুব তাড়াতাড়ি বাজছে, অবিরাম, ঠিক যেন তাদের বাড়ীর মাথার উপরেই।

পল বলে যেতে লাগল, "সে বেশ ভাল আছে, তার কিছুই হয় নি। কিন্তু এমন উত্তেজিত হয়েছে যে, সে জেদ করে বলছে, এখুনি আমি যেন গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাই, এখুনি না হ'লে সে ভয় দেখিয়েছে যে, গির্জ্জেয় এসে ধর্ম্ম-উপাসনার সময় সকল গ্রামের লোকের সামনে, তাদের ডেকে আমার এ সব গোপন কথা বলে ভীষণ একটা কেলেঙ্কারী করবে।"

মা একেবারে চুপ। কিন্তু তার পাশে মা এসে দাঁড়িয়েছেন। দৃঢ়, সোজা হয়ে তাকে ধরেছেন, ঠিক তেমনি করে ধরেছেন, শিশুকালে যখন নতুন চলতে চলতে পা টলে পড়ে যেত, তখন যেমন ধরতেন ঠিক তেমনি করে মা এসে ধরেছেন। আর ভয় নেই।

পল বললে, "সে চায় যে, এই রাত্রেই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। আর সে বলেছে...যদি আমি না যাই, সে নিশ্চয়ই আজ সকালে গির্জ্জেয় আসবে। ...মা! আমি আর তাতে ভয় পাই নে। আর তা ছাড়া, আমি একেবারেই বিশ্বাস করিনে, সে আসবে।"

পল সদর দরজাটা খুললে। সেই অন্ধকার জুলি-পথটা সকালের সোনার আলোয় প্লাবিত হয়ে গেল, যেন তাকে আর তার মাকে, সেই সোনার আলো দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। পল না ফিরে একেবারে গির্জ্জের দিকে চলে গেল। মা দরজার কাছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির ভাবে পলের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলেন।

মা যেন কি বলতে গিয়ে ঠোঁট খুললেন। কিন্তু হঠাৎ কি একটা কাঁপুনি এল। অনেক চেষ্টা করে তবে মা সেই ভিতরের কাঁপুনিকে থামিয়ে বাইরে স্থির ভাব রাখলেন। তখুনি তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে, তাড়াতাড়ি

গির্জ্জেয় যাবার পোষাক পরলেম। তিনিও যাচ্ছেন, তিনিও যাচ্ছেন; তাঁর কোমরবন্ধটা তেমনি কসে নিয়ে সোজা হয়ে দৃঢভাবে পা ফেলে চলেছেন। বাড়ীতে বেরুবার আগে, তিনি সেই মুরগীর ছানাগুলোকে রান্নাঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যেতে ভুললেন না। আগুনের কাছে কফির পাত্রটা সরিয়ে রেখে গেলেন। তারপর ওড়নাটা দিয়ে মাথা ঢেকে, থুঁতিটা চাপা দিয়ে জড়িয়ে নিলেন। তবু এ অসম্ভব কাঁপুনি থামে না, যত চেষ্টা করতে লাগলেন, বাইরে যেন প্রকাশ না হয়, কিন্তু কিছুতেই তাকে চাপা দিতে পারলেন না।

গ্রাম থেকে যারা আসছিল পথে, সে সব মেয়ে সকলে তাঁকে অভিবাদন জানালে, তিনি শুধু চোখের ভঙ্গীতেই তার উত্তর দিলেন। মা চললেন গির্জ্জের পথে। গ্রামের বুড়োরা গির্জ্জের চৌমাথার পাঁচিলের ধারে সকালের রোদে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসেছে। তাদের কাল কাল কোণ-বারকরা টুপী, গোলাপী আভার ভোরের আকাশের গায়ে, সোজা মোটা মোটা রেখার মত দেখাচ্ছে।

পল এর ভিতরে গির্জ্জেয় চলে গেছে।

জনকয়েক অনুতাপী আগ্রহের সঙ্গে পাপদেশনার বেদীর কাছে অপেক্ষা করছে। যে স্ত্রীলোকটি সবার আগে এসেছে সে সেই রেলিংএর ধারে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, অন্যান্য যারা, তারা পাশের বেঞ্চিতে এসে অপেক্ষা করছে।

নিনা মাসিয়া মাটীতে হাঁটু গেড়ে রয়েছে, সেই পবিত্র জলের পাত্রের ধারে। দেখাচ্ছে যেন, তার ছোট মাথায় করে সে সেই পাত্রটা ধরে রেখেছে। আর কতকগুলো ছোট ছেলের দল, খুব সকালে উঠেছে, যারা সেই মেয়েটাকে গোল হয়ে ঘিরে আছে। নিজের চিন্তার জ্বালায় ছটফট করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পল গির্জ্জের বেদীর কাছে যেতে গিয়ে তাদের ঘাড়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়ল। সে সেই মেয়েটাকে চিনতে পেরে একেবারে আগুনের মত জ্বলে উঠল। মেয়েটা ভাব করেছে কি। সেইখানে বেশ করে সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছে, যাতে সকলের চোখ তার উপর পড়ে। পলের মনে হতে লাগল যে, এই মেয়েটা তার স্বাভাবিক চলার পথে একদিকে দিচ্ছে বাধা, আর একদিকে তার দৈন্যকে করছে তিরস্কার, আর দিচ্ছে ধিক্কার।

'যাও সব এখান থেকে সরে' চীৎকার করে পল বললে তাদের। এত জোরে চেঁচিয়ে বললে, সমস্ত গির্জ্জে ঘরটা একেবারে কেঁপে উঠল, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখলে। ছেলের দল সেখান থেকে সরে গেল, কিন্তু এমন গোল হয়ে ঘিরে তাকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে সব জটলা করে দাঁড়াল যে, গির্জ্জের সকল জায়গা থেকেই তাদের আরো ভাল করেই দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েরা সবাই তার দিকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল। যদিও গির্জ্জের প্রার্থনায় তাদের কোন বাধা বিশেষ হল না। মেয়েটা যেন একটা কোন অসভ্য দেশের পুতুলের দেবতা, এই ছোট গির্জ্জেয় এনে বসান হয়েছে। গায়ে তার চষা মাটীর উগ্র গন্ধ মুখের উপর পড়েছে তার সূর্য্যের সকালের গোলাপী আভার রোদের আলো।

পল সোজা একেবারে বেদীর কাছে গেল, মনের ভিতর লুকানো যত ক্ষোভ ও যাতনা ক্রমেই ফুলে ফুলে উঠছে। সে যখন যায়, যে জায়গায় অ্যাগনিস এসে বসে, সেই জায়গাটায় তার গায়ের ক্যাসক লেগে খস্ খস্ করে উঠল। সে জায়গাটা হল বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারদের বসবার আলাদা জায়গা, খুব বাহার করে কারুকার্য্য করা। পল চোখ দিয়ে সেই জায়গাটা আর বেদীর দূরত্বটা এক রকম মনে মনে পরিমাপ করে নিলে।

'যদি আমি লক্ষ্য রাখি তবে যে মুহূর্ত্তে সে এই জায়গা থেকে উঠে, তার সেই মারাত্মক কথা বলবার জন্যে বেদীর কাছে উঠে আসবে, তার ভিতরে আমি নিশ্চয় সময় পাব, আমার ঘরে চলে যাবার'—এই হল তার শেষ ঠিকানা।

অ্যান্টিওকাস তাড়াতাড়ি নেমে এল ঘণ্টা বাজাবার জায়গা থেকে, পলের পোষাক পরানর ব্যবস্থা করে দিতে। খোলা দেরাজের সামনে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পল যেন সাদা হয়ে গেছে, মুখে রক্ত নেই, একটা কি দুর্ঘটনার ছায়া তার মুখে খেলা করছে। যেন ভবিষ্যতের জীবন-যাত্রার আভাস তার ভিতরে দেখা দিয়েছে। যা গত রাত্রের দুঃখ ও যাতনার ভিতর স্থির হয়ে গেছে।

কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য ক্ষণিকের। ঝলকে মুখের ওপর একটা চকিতের মত হাসি খেলে গেল। খোলা হাওয়ায় ধাক্কা-খাওয়া ঘণ্টা বাজাবার উঁচু জায়গাটা থেকে বালক যেন তাজা হয়ে এসেছে। আনন্দে তার চোখের পাতার ভেতর ঝলক দিয়ে উঠেছে। বড্ড বেশী হাসি হাসছে দেখে, সে থেকে থেকে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। তার সেই নতুন ফুলের মত মন, চারিদিকের ভোরের আলোর চকচকানিতে আনন্দে উপচে পড়া চারিদিকের ভাবের ভিতর; তার যেন একটা নতুন আবেগ হচ্ছে। তারপর তার চোখ হঠাৎ ঘোর হয়ে এল, যখন সে দেখলে পাদরী সাহেবের পোষাকের ভাঁজ ঠিক করে সাজিয়ে দিতে দিতে যে, তাঁর হাত কাঁপছে, তাঁর সেই স্নেহভরা মুখ কিসের যাতনায় টুক্‌রো হয়ে দুমড়ে যাচ্ছে।

'আপনার কি অসুখ করেছে?'

পল অসুখ বোধ ত নিশ্চয়ই করছে, তবু সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, কিছু হয় নি।' তার মনে হল তার মুখের ভেতর এক মুখ রক্ত উঠেছে। তবুও তার সেই যাতনার ভেতর একটু একটু ক্ষীণ আশার বীজও যেন রয়েছে।

'নাঃ এইবার আমি পড়ে যাব, আমার হৃদপিণ্ডটা ফেটে দুখানা হয়ে যাবে, আর আঃ তারপর, তারপর, সব বেশ শেষ হয়ে যাবে।'

আবার সে গির্জ্জেয় বেদীর কাছে এল, মেয়েদের পাপদেশনা শুনতে। সেখান থেকে দেখতে পেলে যে তার মা দরজার কাছে, বেদীর নীচেই বসে আছেন। অচল, অটল, হয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছেন, কিন্তু কে কোথায় গির্জ্জেয় আসছে সব লক্ষ্য করে দেখছেন। সমস্ত গির্জ্জেটার উপরই লক্ষ্য রয়েছে, প্রস্তুত হয়ে আছেন, নিজেকে ধরে রাখবার জন্য, দৃঢ় হয়ে। যদি সমস্ত গির্জ্জেটাই আজ তাঁর মাথায় উপর ভেঙে পড়ে তা হলেও তাকে মাথায় ধরে রাখবেন, এমনি ভাবে রয়েছেন, প্রস্তুত হয়ে।

কিন্তু পলের অবস্থা অন্যরূপ। তার এককণা সাহসও আর তাতে নেই। শুধু আশা একটা ক্ষীণ তুচ্ছ বীজের কণার মত জেগে আছে, একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। ক্রমে তার নিশ্বাস যেন রোধ হয়ে এল, এবার সব বুঝি ভেঙে পড়ে যায়।

যখন সেই পাপদেশনার ছোট বেদীর কাছে বসলে, তখন যেন নিজেকে একটু শান্ত মনে হতে লাগল। সেও যেন কবরের ভিতর বসে থাকা, অন্ততঃ লোকের দৃষ্টির পথ থেকে নিজেকে আড়ালে রাখা, আর তার মুখের ভয়ের সেই বিষণ্ণ ভাব দেখতে না দেওয়া। রেলিঙের বাইরে মেয়েদের চাপা চুপি-চুপি কথার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের শব্দ, সে নিঃশ্বাসে একটা গরম ভাব; ঠিক যেন পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে গোসাপের বনে যাওয়ার মত খস্ খস্ করে উঠছে। আর অ্যাগনিসও সেখানে বসে, সেই তার বাহার-করা বসবার যায়গায় ঠিক তেমনি বসে আছে। যুবতী মেয়েদের মৃদু নিঃশ্বাস, তাদের মাথার চুলের সুগন্ধ, তাদের সেই বাহারে পোষাক, সব একেবারে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে ভরে আছে।

পল পাপদেশনা শুনে, সকলের পাপের স্খালন করে ক্ষমা করলে। যাদের যা কিছু পাপ ছিল, তা থেকে তাদের মুক্ত করে দিলে। হয়ত, এই ভেবে যে খুব বেশী দিন লাগবে না, যখন সে নিজেই তাদের কাছে তাদের করুণার, তাদের দয়ার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে।

তারপর তার ভয়ানক ইচ্ছা হল, সে বাইরে গিয়ে দেখে, অ্যাগনিস সেখানে এসেছে কিনা, কিন্তু দেখলে তার জায়গায় কেউ নেই, একেবারে খালি।

তা হলে হয়ত সে একেবারে এলই না। কিন্তু তা নয়, অ্যাগনিস হয়ত গির্জ্জের বেদীর নীচে রয়েছে, তার চেয়ারের কাছে নতজানু হয়ে - সে-চেয়ার তার দাসী তাকে অনেক সময় এনে দেয়। পল খুঁজে দেখবার জন্যে চারিদিক দেখলে, কেউ নেই, শুধু তার মাকে দেখতে পেলে, দৃঢ় শান্ত মূর্ত্তি। যখন সে বেদীর কাছে নতজানু হয়ে, ধর্ম্ম-উপাসনা আরম্ভ করলে, তার মনে হল, তার মার আত্মা যেন ভগবানের কাছে নত হয়ে রয়েছে। সে যেমন তার সাদা পাদরীর পোষাক পা অবধি ঝোলান পড়ে আছে, তার মা তেমনি তাঁর অনন্ত দুঃখের পোষাক পরে নত হয়ে আছেন।

তখন সে মনে স্থির করলে, আর সে পিছনের দিকে তাকাবে না। আর যখন ফিরে আশীর্ব্বাদ দেবে তখন চোখ বুঝে থাকবে। তার বোধ হল সে যেন সোজা উপরে উঠছে, একটা পাথরের ক্রুশের উপর। তার মাথা ঘুরছে। তারপর সে চোখ বুজ্‌লে, যেন ভয়ানক এক অন্ধকার গর্ত্ত তার পায়ের তলায় তাকে গ্রাস করবে বলে হাঁ করে আছে। তাকে চোখ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তবু তার সেই অন্ধকার ভেদ করে সে দেখতে পেলে সেই কারুকার্য্য-করা চেয়ার, আর অ্যাগনিসের মূর্ত্তি, গির্জ্জের দেয়ালের ধূসর বর্ণের উপর তার কাল পোষাক-পরা মূর্ত্তি,— যেন দেয়ালের গায়ে উঁচু করে খোদাই করা হয়েছে।

অ্যাগনিস সত্যই সেখানে রয়েছে। কাল পোষাক পরা, তার হাতির দাঁতের মত সাদামুখের উপর কাল ওড়না দিয়ে ঢাকা। তার প্রার্থনার বইয়ের সোনা-মোড়া হাতলটা ঝকমক্ করছে। কিন্তু সে একখানা পৃষ্ঠাও উল্টায় নি। দাসীটা বেদীর আর একধারের বেঞ্চির পাশে হাঁটু গেড়ে রয়েছে। আর যখন তখন চোখ তুলে বিশ্বাসী কুকুরের মত দেখছে, তার মনিব ঠাকরুণের মুখের পানে ; যেন তার মনের ভিতর যে সব দুঃখ যাতনা হচ্ছে, তার জন্যে তাঁকে নীরবে সহানুভূতি জানাতে চায়।

বেদীর কাছ থেকে সে সবই দেখলে। তার যা কিছু আশা এতক্ষণ হয়েছিল, সব একেবারে মরে গেল। শুধু তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিজেকে ভরসা দিয়ে বলতে লাগলে, "অসম্ভব! অ্যাগনিস কখন এই পাগলের মত কাজ করতে পারে না। বাইবেলের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল, কিন্তু তার কাঁপা কাঁপা স্বরে কথাগুলো ঠিক সহজ ভাবে উচ্চারণ করতে পারলে না। ভয়ে তার কপাল ঘেমে উঠল, তখন বাইবেল কেতাবখানা জোর করে করে সে চেপে ধরলে, পাছে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়, পাছে মূর্চ্ছা যায়।

এক মূহূর্ত্তে পল নিজেকে খাড়া করে নিলে। অ্যান্টিযোকাস তার পাশে দাঁড়িয়ে পাদরী সায়েবের এই মুখের ভাবের ভয়ানক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে। যেন তাঁর মুখখানা একটা মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেছে। সে পাদরী সায়েবের কাছে-কাছে রইল, যদি পড়ে যান তবে তাঁকে সাহায্য করবে। মাঝে মাঝে দূরে বুড়োলোকদের মুখের পানে চেয়ে দেখলে, তারা পাদরী সায়েবের অবস্থা লক্ষ্য করছে কি না। কিন্তু কেউত সে দিকে লক্ষ্যই করে নি—এমন কি তাঁর মাও তাঁর নিজের জায়গায় চুপ করে রয়েছেন, প্রার্থনা করছেন, সেই খানেই অপেক্ষা করছেন, তাঁর ছেলের যে হঠাৎ কিছু শারীরিক গোলমাল হয়েছে, তা কিছুই লক্ষ্য করছেন না। তখন অ্যাণ্টিয়োকাস পাদরী সায়েবের আরো কাছে ঘেঁসে এসে, তাঁকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে এল। তাতে পল চমকে ঘুরে দেখলে। বালক তার দিকে উজ্জ্বল চাহনিতে চেয়ে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বললে :—

"আমি এখানে আছি, ভয় কি, সব ঠিক চলছে, আমি আছি। আপনি বলে যান—"

আবার, আবার, তার মনে হল, সেই সোজা খাড়া পাথরের ক্রুশের উপর সে উঠছে, রক্ত যেন তার হৃদপিণ্ডে ফিরে এল, তার সমস্ত স্নায়ু যেন তখন একটু সুস্থ হল। কিন্তু সে সুস্থতা হল নিরাশায় এলিয়ে পড়া, বিপদের পাথারে একেবারে গা ভাসিয়ে দেওয়া, যেন জলে ডুবে গেছে যে লোক, তার শান্ত নিবিড় ভাব, যার ঢেউয়ের সঙ্গে আর যুদ্ধ করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে গেছে, তেমনি শান্ত। যখন সে উপাসনার জন্য গির্জ্জের লোকের দিকে ফিরলে, তখন আবার চোখ বুজল। এবার বললে—"ভগবান তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।"

অ্যাগনিস তখন তার নিজের জায়গায় বসে ছিল, প্রার্থনা-কেতাবের দিকে চোখ নীচু করে, তার পৃষ্ঠা সে সত্যই ওল্টায় নি। অস্পষ্ট আলোর

তার সেই সোনালী হাতলটা ঝকমক করছে। দাসীটা তার পায়ের কাছে রয়েছে। অন্য সব স্ত্রীলোকের মধ্যে তার মাও তাদের সঙ্গে সেই গির্জ্জের বেদীর নীচের দিকে, মাটীতে জুতোর গোড়ালি রেখে বসে আছেন। যেই পাদরী সায়েব বইখানা নাড়বেন, অমনি যাতে তখনি নতজানু হতে পারে এমনি করে সব বসে আছেন।

পল তখন বাইবেল খানা রেখে দিয়ে, প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলে, —উপাসনার যে সব ভঙ্গী আছে সেই ভাবে ধীরে ধীরে হাত নেড়ে। তার সেই ঘন,অন্ধ নিরাশার ভিতর একটা শান্ত, স্তব্ধ, নমতার ভাব এল, এই ভেবে যে, আাগনিস তার সঙ্গে চলেছে ওই ক্রুশের পথে, যেমন মারি ম্যাগদালিন ঈশার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এখনি সে এই বেদীর কাছে এসে তার পাশে দাঁড়াবে, তাদের এই পাপকে মুছে ফেলবে। যেমন ভাবে দুজনে একসঙ্গে এ পাপ করেছে, তেমনি ভাবে এ পাপ থেকে দুজনে এক সঙ্গে মুক্ত হবে। তবে কি করে পল তাকে আর ঘৃণা করতে পারে, সে যদি তার পাপের শাস্তি নিজেই নিতে আসে। যদি তার এই ঘৃণা লুকোনো প্রেমেরই ছদ্মবেশ হয়।

তারপর এল ধর্ম্ম-উপদেশ, ও পবিত্র সাধনার পানপাত্র। কয়েক বিন্দু সুরা তার কলিজার ভিতর গিয়ে যেমন পড়ল, তখনি যেন রক্ত সচল হয়ে উঠল। তার শরীরে বল এল ফিরে, যেন নতুন জীবন এল। তার হৃদয় যেন ভগবানের সান্নিধ্য পেয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

যখন সে নেমে মেয়েদের দিকে গেল, আাগনিসের মূর্ত্তি সেই মাথা-নত করা জনতার মধ্যে সবার চেয়ে জোরাল ভাবে দাঁড়াল। হয়ত তার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য যতখানি সাহসের দরকার সেই সাহসকে সে আবাহন করে আনছে। হঠাৎ পলের মনে তার জন্য একটা অনন্ত করুণা, এক অসীম সহানুভূতি জেগে উঠল। তার ইচ্ছা হল সে আাগনিসের কাছে নীচে গিয়ে তার পাপক্ষালন করে দেয়, যেমন আসন্ন মৃতের কাছে ধর্ম্ম-উপাসনা ও আরাধনা করে, তেমনি করে। পলও তার সমস্ত সাহসকে আবাহন করে নিয়ে এল। কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল। পাতলা মৌচাকের গড়নের বিদ্‌কিট স্ত্রীলোকদের কাছে তুলে ধরলে। হাত কাঁপতে লাগল।

যেই ধর্ম্ম-আরাধনা ও পূজা শেষ হয়ে গেল, একজন বুড়ো চাষা শুরু করে ভগবানের নামে স্তোত্র-পাঠ আরম্ভ করলে। সমস্ত লোক তার সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় সেই স্তোত্র সুরে বলতে লাগল, আর সেই স্তোত্রের শেষ চরণ তারা দুবার করে জোরে জোরে বলতে লাগল। স্তোত্রটা পৌরাণিক কালের, একঘেয়ে। বনে জঙ্গলে মানুষ প্রথম যখন ভগবানকে স্তোত্র বলে আরাধনা করত, এ যেন ঠিক তেমনি। সে বনে মানুষ এখন কদাচিৎ বাস করে। পুরোণো একঘেয়ে সুর, যেন একটা নির্জ্জন সমুদ্রতীরে ঢেউগুলো একই রকমে এসে পড়ছে পাড় ভাঙছে তারই শব্দের মত সুর।

তবুও সেই শান্ত গানের মধ্যে আবার আাগনিসের চিন্তা তাকে ঘিরে ফেললে, সে চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে দিলে। যেন সে কোন গহন বনের মধ্যে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটেছে, সেই বনের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—সমুদ্রের তীরে চারিদিকে বালি, বালি, আর বালির পাহাড়, তার গায়ে গায়ে মিষ্টি গন্ধ ভরা ফুল ফুটে রয়েছে, আর ভোরের আলোয় সব সোনার মত ঝলমলে দেখাচ্ছে।

আাগনিসের প্রাণে কি যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা অদ্ভুত ভাব এসে তার গলা চেপে ধরল। তার যেন মনে হল, তার চারপাশে পৃথিবী বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, সে যেন মাথাটা নীচু করে চলেছে, তারই সঙ্গে ঘুরছে। এই, এখন এতক্ষণে সে তার সহজ অবস্থায় ফিরে এল।

এ যেন তার সমস্ত অতীত কালের ব্যাপার। যে অতীত ঢেউয়ের মত অতল থেকে উপরে এসেছে, সে যেন এত দিন তাকে ধরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে গানের সঙ্গে, সেই বুড়োদের স্তোত্রপাঠের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে, তার সেই শিশুকালের ধাত্রীর গান, তার দাসদাসী তাকে ঘুম-পাড়ানোর গান শুনিয়েছে। যে সব নর নারী প্রাণপাত করে তার এত বড় বাড়ী গেঁথে তুলেছে, তার ঘরদোর এমন করে সাজিয়েছে, যারা তার ক্ষেত-খামার তৈরী করে, ধনধান্যে তার ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে, তার জন্য শিশুকাল থেকে তার কাপড় বুনেছে, তাকে এমন করে সাজিয়ে দিয়েছে, তারাই যে তার এই অতীত—তাদের সে কি করে ফেলে দেয়।

কেমন করে সে, সেই আাগনিস গ্রামের এই সমস্ত লোকের সামনে, নিজে তার এই পাপের কথার আভাস দিয়ে বিচারের জন্যে খাড়া হবে?—এরা যে তাকে তাদের সর্ব্বময় মনিবঠাকরুণ বলে জানে, ওই যে বেদীর উপর যে দাঁড়িয়ে পাদরী সায়েব, তার চেয়েও যে পবিত্র বলে মনে করে? সেও তখন মনে করলে, ভগবান তার সম্মুখে, তার আশ-পাশে, তার অন্তরে বাইরে, এমন কি তার যে এই কামনা, সে কামনার ভিতরও তিনিই রয়েছেন।

সে ত বেশ জানে যে, যে শাস্তি সে আজ ওই মানুষটিকে দেবার জন্যে এত ক্ষোভ ও রাগ করে এসেছে, যার সঙ্গে সে এ পাপ করেছে, সে 'শাস্তি' ত শুধু তার নয়, এ শাস্তি যে তারই নিজের। তবে? আজ এখন সেই দয়ার আধার ভগবান, এই সব নর-নারী, এই সব ছেলেবুড়ো, এই সব ফুলের মত শুদ্ধ শিশুর ভিতর দিয়েই তার সঙ্গে কথা বলছেন, তাকে আদেশ করছেন, তার নিজের কাছে আমায় জেনে নিতে, তাকে উপদেশ দিচ্ছেন, ওই পাপ থেকে তার মুক্তি খুঁজে নিতে।

যখন এই সব লোকেরা তাকে ঘিরে, মধুর সুরে এই স্তোত্র গান করছিল, তাতে তার নিঃসঙ্গ জীবনের সব দিনগুলো যেন গড়িয়ে তার অন্তরের ভেতরের যে বড়, তার আভাস দৃষ্টির কাছে এনে দিলে। তার মনে হল সে যেন সেই ছোট মেয়েটি তারপর সেই মেয়েটি বড় হল। তারপর যুবতী স্ত্রীলোক, এই গির্জ্জেরই আশ্রয়ে, ওই সেই একই জায়গায় বসে, যেখানে তার পূর্ব্বপুরুষেরা ওই কারুকার্য্যভরা চেয়ার বসে বসে ক্ষইয়ে দিয়েছে। এ গির্জ্জে ত' তার পরিবারের তার বংশেরই এই গির্জ্জে। তার একজন

পূর্ব্বপুরুষই এই গির্জ্জে তৈরী করে গেছেন। লোকে বলে আসছে ওই যেখানে গির্জ্জের ঈশার মার মূর্ত্তি আনা রয়েছে, ও তারই পূর্ব্বপুরুষ বর্ব্বর দস্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, এই গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই গির্জ্জেরই ভিতর।

এই সমস্ত ইতিহাস আর সেই ইতিহাসের ভিতর তার জন্ম, এই ধারার ভিতর দিয়ে সে আজ এত বড় হয়েছে। সহজ, সরল– অথচ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ভিতরে তাকে গড়ে তুলে এই যে এয়ার গ্রামের সরল গরীব লোকেদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে, অথচ তাদের মধ্যেই ত সে আছে, তাদের ভিতরই বাস করছে, যেন ঝিনুকের দুখানা এবড়ো-খেবড়ো ডালায় বন্ধ, পরিষ্কার উজ্জ্বল একটা মুক্তা।

তবে কি করে সে নিজেকে এই সব আপনার লোকের কাছে পাপের বিচারের জন্ম বলতে পারে? কিন্তু এই যে ভাব, যে, এই পবিত্র বাড়ীর এই গির্জ্জের সে মালিক, এই যে মমত্ববোধ, তাকে অসহ্য যাতনায় ভরে দিলে, আর সেই লোকের সামনে, যে তার এই লুকোনো পাপের সঙ্গী, যে ওই বেদীর কাছে একটা দেবতার মুখোস পরে দাঁড়িয়ে, পবিত্র ধর্ম্মের পানপাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে—দীর্ঘাকার অতি দৃঢ় মনোরম দেখতে। সে যখন নতজানু হয়ে তার পায়ের তলায়, সে তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সে পাপী, কিসের জন্যে? সে স্ত্রীলোক হয়ে, ওই পুরুষকে ভালবেসেছে এই ত তার পাপ?

আবার রাগে দুঃখে তার বক্ষ ফুলে ফুলে উঠল,…যেমন ওই স্তোত্রের ধ্বনি উঠছে আর নামছে, তার চারিদিকে যেন সুরের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে। যেন কোন ঘোর অন্ধকার অতল থেকে প্রার্থনার মত উঠছে, চায় সাহায্য, চায় ন্যায়বিচার। সে যেন ভগবানের বাণী শুনতে পেলে। রূঢ় রৌদ্রের মত, সে বাণী তাকে বলছে, তাকে আদেশ করছে, এই তার অনুপযুক্ত, পূজারীকে, তাঁর মন্দির থেকে দাও দূর করে, দাও দূর করে।

তাকে যেন মরণের হাওয়ায় এসে ঘিরলে, সে যেন মড়ার মতন হয়ে গেল, গা দিয়ে হিমের মত ঘাম পড়তে লাগল। বসবার জায়গার পাশে তার হাঁটু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তবু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে সে পাদরী সায়েব বেদীর কাছে কি ভাবে নড়া-চড়া করছে তা লক্ষ্য করতে লাগল। মনে হল, যেন একটা মন্দ হাওয়া অ্যাগনিসের কাছ থেকে, তার নিঃশ্বাস থেকে উঠে পাদরীর দিকে যাচ্ছে, তাকে একেবারে অবশ, পঙ্গু করে দিচ্ছে, যে হিমের মত হাত অ্যাগনিসকে ধরেছে, ওই হিম হাত পাদরী সায়েবকেও যেন সেই ভাবেই ধরেছে চেপে।

আর পল, সেও। তারও বোধ হল যে ওই অ্যাগনিসের মনের ইচ্ছার ভিতর থেকে মরণ-হাওয়া আসছে, ঠিক যেমন ভয়ানক শীতের ভোরে। অন্ধকার কুয়াসার ভিতর দিয়ে সেই হিম হাওয়া, তার হাতের আঙুল জমে গেছে, মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, সে কাঁপুনিকে আর কিছুতেই দমান যাচ্ছে না। যখন পল আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে হাত তুললে, দেখতে পেলে অ্যাগনিস একেবার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। বিদ্যুতের চকিত ঝলকের মত তাদের চোখে চোখে মিল হয়ে গেল। আবার সেই জলে ডোবা লোকের মত, তার মনে পড়ে গেল, সেই এক মুহূর্ত্তের ভিতরেই, তার জীবনের সকল আনন্দ। যে-আনন্দ শুধু সেই তারই প্রেমের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে, শুধু তারই ভালবাসার আনন্দ, তার চোখের প্রথম চাহনি থেকে, তার অধরের প্রথম চুম্বন থেকে।

তারপর দেখলে, অ্যাগনিস বই হাতে করে তার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল।

"হে ভগবান! তোমারই ইচ্ছা তবে পূর্ণ হোক্!" নতজানু হয়ে পল তোতলার মত কাঁপতে কাঁপতে বললে। তার বোধ হল সে যেন সেই ঈশার মত জলপাইয়ের বাগানে সেই অখণ্ড নিষ্করুণ নিয়তির ছায়াকে দেখতে পাচ্ছে।

সে জোরে প্রার্থনা করতে লাগল, আবার অপেক্ষা করলে। সেই গির্জ্জের জনতার একসঙ্গে প্রার্থনার যে জড়তামাখা শব্দ, তার ভিতরেও, সে কান দিয়ে শুনতে পাচ্ছে অ্যাগনিসের পা ফেলা। ওই যে সে বেদীর দিকে আসছে।

"ওই! ওই! অ্যাগনিস আসছে,— তার বসবার জায়গা থেকে উঠল, ওই…বেদী ও তার বসবার জায়গার মাঝখানে এল। সে এগিয়ে আসছে… ওই সে এখানে— ওই সবাই অবাক হয়ে অ্যাগনিসের দিকে তাকাচ্ছে। ওই যে আমার পাশে।"

এই ভাবটা যেন ভূতের মত তাকে পেয়ে বসল, এত জোরে যে, সে কথা বলতে গেল, কিন্তু ঠোঁট পারলে না। পল দেখলে, অ্যান্টিয়োকাস বেদীর বাতি নিভিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ ফিরে দেখলে, আবার চারিদিক চেয়ে, নিশ্চয়ই অ্যাগনিস সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছ ঘেঁষে, ওই যে বেদী, পূবদিকে রেলিঙের ধারে।

পল উঠে দাঁড়াল। বোধ হল গির্জ্জের ছাদ চুড়ো ভেঙ্গে তার মাথার উপরে পড়ল, মাথাটা ভেঙে হাড় গুঁড়িয়ে গেল। তারপর আর তাকে খাড়া করে রাখতে পাচ্ছে না কিন্তু হঠাৎ জোর করে সে আবার বেদীতে উঠল, পবিত্র পাত্রটাকে ধরে ফেললে। যেমন সে ফিরে ভাঁড়ারের দিকে যাবে, সে দেখতে পেলে অ্যাগনিস তার জায়গা থেকে এগিয়ে আসছে, রেলিঙের দিকে…ওই যে এইবার সিঁড়ির ধাপে পা দিলে, ওই উঠে আসছে।

"হে ভগবান! আমার মরণ দাও, মরণ দাও না কেন?" পল তার মাথাটা নুইয়ে সেই রূপোর পবিত্র পাত্রটার ধারে রাখলে, যেন যে তলোয়ার উঠেছে তাকে ছেদন করবার জন্য, সে তাকে আড়াল করে নিচ্ছে। আবার যেই সে ভাঁড়ারের দরজার কাছে গেল, তখনও তাকিয়ে দেখলে অ্যাগনিস বেদীর সামনে নতজানু হয়ে মাথা নীচু করে রয়েছে, একেবারে শেষ নীচের ধাপে।

রেলিঙের বাইরে সেই নীচের ধাপে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছে। যেন

তার সামনে একটা পাঁচিল হঠাৎ খাড়া হয়েছে, সে সেইখানেই হাঁটু গেড়ে পড়ে গেছে। একটা গাঢ় কুয়াসায় তার চোখ যেন ঝাপসা করে দিলে, আর সে একেবারেই এগুতে পারলে না।

তখনি তার সে ঝাপসা কুয়াসা কেটে গেল। সে দেখতে পেলে, সিঁড়ির ধাপ, বেদীর সম্মুখে হলদে কার্পেট পাতা, টেবিলের উপর ফুলদানিতে ফুল, আর জ্বলন্ত বাতি। কিন্তু পাদরী তখন অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে, আর তার জায়গায় ভোরের সূর্য্যের আলোর রেখা গির্জ্জের ধূসর ঘন বাতাসের ভিতর দিয়ে এসে পড়েছে সেই হলদে কার্পেটে, দেখাচ্ছে যেন এক ঝলক সোনা সেখানে ঢেলে দিয়েছে।

সে তখন নিজের বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ণ করলে, উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দাসীও তার পিছনে পিছনে গেল। বুড়োরা, মেয়েরা, ছেলেরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তাদের মুখ হাসিতে ভরা। তাদের তাকানি দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল। সে যে তাদের গাঁয়ের কর্ত্রী, তাদের সৌন্দর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি তাদের বিশ্বাসের পরম রূপ। যদিও এত দূরে রয়েছে, তবুও যেন তাদেরই ভিতরের একজন, তাদের এই দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝে ঠিক এক আগাছার ঝোপের মাঝখানে একটা সুগন্ধভরা বুনো গোলাপ ফুল।

দরজার কাছে দাসী তাকে পবিত্র জল স্পর্শ করতে দিলে, তার আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁইয়ে। তার পোষাকের গায়ে নীচের দিকে যে ধুলো লেগেছিল, সে হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলে। যেই দাসীটা মুখ তুললে, অমনি দেখতে পেলে, আ্যাগনিসের মুখ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। কোণের দিকে যেখানে পাদরী সায়েবের মা রয়েছেন, সেই দিকে আ্যাগনিস তার সাদাপানা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে, যেখানে মা সমস্ত ক্ষণই নতজানু হয়ে রয়েছেন, যতক্ষণ এই ধর্ম্ম উপাসনা চলছিল। তারপর দেখলে মা মাটিতে অচল হয়ে বসে পড়েছেন, তাঁর মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর কাঁধ যেন দেয়ালের গায়ে লেপটে গেছে, মনে হচ্ছে, তিনি যেন সেই গির্জ্জে বাড়ীটা পাছে ভেঙে পড়ে, তাই কাঁধ দিয়ে তার চরম বলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ধরে রেখেছেন। আ্যাগনিস ও তার দাসীর পাদরীসায়েবের মার দিকে অমন স্থির ভাবে তাকান দেখে আর একটি স্ত্রীলোক সেই দিকে লক্ষ্য করলে। ছুটে পাদরী সায়েবের মায়ের কাছে এসে, তার পাশে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে তাঁকে কি বললে, তারপর হাত দিয়ে তাঁর মুখখানি তুলে ধরলে।

মার চোখ তখন আধ-বোজা, কাঁচের উপর জলের মত টলটল করছে, চোখের তারা উল্টে গেছে, হাত থেকে জপের মালা পড়ে গেছে, মাথাটা কাঁধের এক ধারে ঢলে পড়েছে। যে স্ত্রীলোকটি তাঁকে ধরে রেখেছে, তার কাঁধে যেন ঝুলে পড়েছেন।

স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

"মা মারা গেছেন।"

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জনতা উঠে দাঁড়াল, সবাই সেই বেদীর কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে পল, আ্যান্টিয়োকাসের সঙ্গে ভাঁড়ারঘরে চলে গেছে, সে বাইবেল সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভিতরে। পল ঠক ঠক করে কাঁপছে, শীতে আবার খানিকটা ভয় থেকে স্বস্তি পেয়ে। সে সত্যি সত্যি মনে করলে, যেন এখুনি সে মহাসমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে ডুবে মরছিল, কোন রকমে বেঁচে গেল। তার মনে হল সে নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে নিতে চায়। একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে শরীরটা গরম করে নিতে চায়। আর মনে মনে বিশ্বাস করাতে চায়, এই যে সব হয়ে গেল, এ শুধুমাত্র একটা রাতের দুঃস্বপন, আর কিছুই নয়।

তারপর একটা কি রকম গোল উঠল গির্জ্জের ভিতর। প্রথম খুব আস্তে, তারপর ক্রমেই জোরে জোরে গোল বাড়তে লাগল। আ্যান্টিয়োকাস ভাঁড়ারের দরজা থেকে মুখখানা বাড়িয়ে দেখলে, সব লোক বেদীর পাশে নীচের দিকে জড়ো হয়ে কি দেখছে। যেন ঢোকবার রাস্তায় কিসের বাধা পেয়েছে। একজন বুড়ো লোক, এর মধ্যে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে আসছে, একটা কি রকম ভাবে কি বলছে:

সে বললে "তাঁর মার বড় অসুখ, হঠাৎ হয়েছে।"

পল তখনও তার সেই পাদরীর পোষাকপরা, এক লাফে সেখানে ছুটে এসে মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, যাতে মার মুখ ভাল করে দেখতে পায়। মা তখন মাটীতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন, তাঁর মাথাটা একটা স্ত্রীলোকের কোলে। আর চারিদিকে সব লোক ভিড় করে ঘিরে আছে।

"মা! মা! মা!"

মুখ তেমনি শান্ত, শক্ত। চোখ তেমনি আধবোজা, দাঁতে দাঁত চাপা, যেন ভিতরের কান্নাকে জোর করে চেপে রেখেছেন!

তখনি পল বুঝতে পারলে যে, তার মা সেই একই কেলেঙ্কারীর দুঃখের অপমানের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে, প্রাণ দিয়েছেন, সেই একই ভয়, যে ভয়কে পল বহু যাতনার ভিতর দিয়ে জয় করেছে।

আর তখন পলও, তার দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রইল, যেন তার কান্না না বেরোয়। যখন মুখ তুললে, চারিদিকে সেই ঢেউয়ের মত লোকের ভিড়, তার ভিতর থেকে ওই যে আ্যাগনিস! তার চোখের উপর আ্যাগনিস খর-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। [সমাপ্ত

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন

গত দশ বৎসরে প্যালেষ্টাইনের বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে—এত বেশী পরিবর্ত্তন হয়েছে যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের পর থেকে এ সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তা হয় নি।
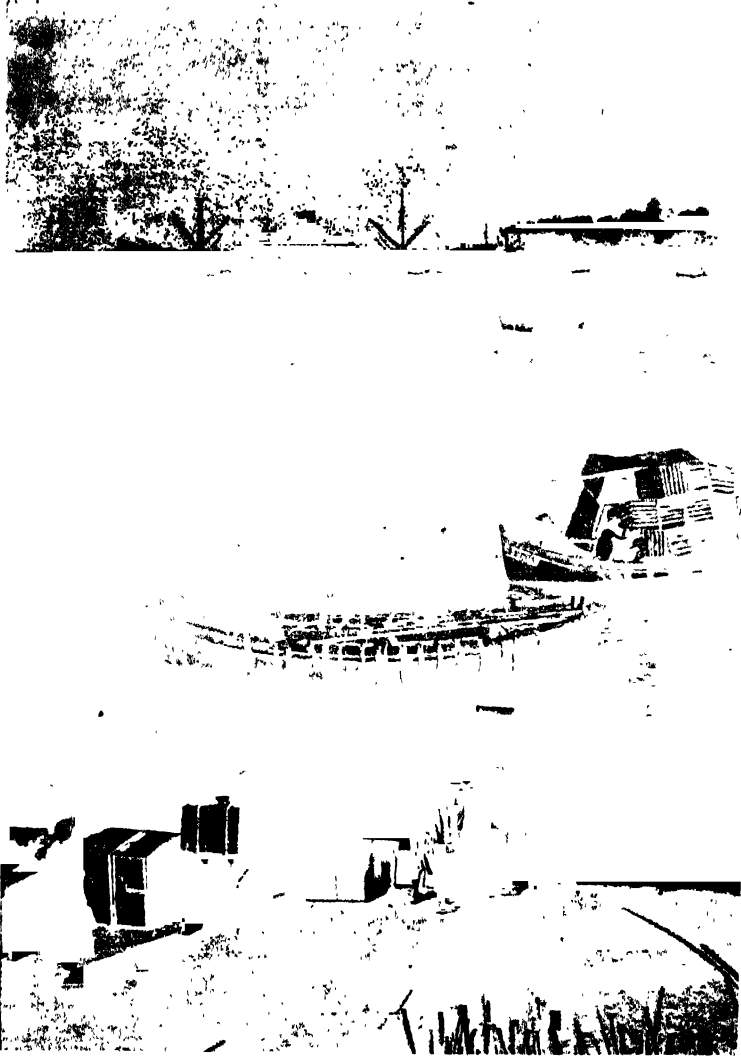
প্যালেষ্টাইন : জাফা বন্দর। উত্থিত পর্ব্বত-চূড়াসমূহ ব্রেকওয়াটারের কাজ করে।

খৃষ্টানদের পরম পবিত্র তীর্থ প্যালেষ্টাইন, এই নামের সঙ্গে বাইবেলোক্ত কত প্রাচীন কাহিনীর যোগ রয়েছে, কত সাধু-মহাত্মার পুণ্যপদরেণুস্পর্শে ধন্য হয়েছে এই দেশ! এখনও কি এখানে মেষপালকের বেশে সজ্জিত হয়ে ডেভিড মেষদল মাঠে নিয়ে যান!

এখন প্যালেষ্টাইন আধুনিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে—সভ্য হয়েছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, পরস্পরের মিলন-ভূমি হয়ে উঠেছে।

যে গিরিগুহায় রাজা সল এণ্ডরের ডাইনি বুড়ীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তার নীচে দিয়েই ছ'শো সাতাশ মাইল লম্বা পাইপ-লাইন ইরাকের খনিজ তেল বহন করে নিয়ে মরুভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করে চলেছে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে।

জোসেফ যে-পথে উটের পিঠে ইজিপ্টে গিয়েছিলেন এখন সেখানে হালফ্যাসানের বড় বড় মোটরগাড়ী ছোটে।

পবিত্র জর্ডান নদীর জলে কলকব্জা বসিয়ে যে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়, শারনের বাই-বেল-প্রসিদ্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বড় বড় লোহার খুঁটী সেই তড়িৎ শক্তি কত ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাচ্ছে, আগে যেসব ঘরে জল-পাইয়ের তেলে প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কাজেই মাউণ্ট কার-মেলের পাদদেশে হাইফা বলে জায়গায় নতুন একটি বন্দর খুলতে হয়েছে। হাইফা একটি ছোট সহর, একর উপসাগরের

দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, প্যালেষ্টাইনের সারা উপকূলের মধ্যে এই একমাত্র প্রকৃতি-নির্ম্মিত উপসাগর। জাফা প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন বন্দর, কিন্তু সেটা বড় সমুদ্রের মুখে, বহির্সমুদ্রের

চক্রবালসীমায় উষ্ট্রবাহিনী পুরাতন প্যালেষ্টাইনের নিদর্শন। সম্মুখে পাইপলাইন বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইনের পরিচয়। অধুনা এ দুইটিই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে ছোট ছোট জাহাজের বাঁচাবার উপায় নেই সেখানে। প্যালেষ্টাইনে উৎপন্ন কমলালেবু পূর্ব্বে জাফা থেকে রপ্তানী হত, এখন হয় হাইফা থেকে।

হাইফা উত্তর শাসন-বিভাগের হেড-কোয়ার্টার। এই বিভাগ সিরিয়া দেশের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রাচীন ফিনিসিয়া, গ্যালিলি ও সামারিয়ার খানিকটা অংশ এর মধ্যে পড়ে। হেজাজ রেলওয়ে হাইফা বন্দরকে সিরিয়া ও

পোষাকে সুসজ্জিতা সুন্দরী ইহুদী তরুণী সেখানে মধ্যযুগের দীর্ঘ ও ঢিলাঢালা পোষাক পরিহিতা গ্রাম্য মেয়েদের গা ঘেঁসে একই পথে চলে।

কৃষিকার্য্যের অবস্থা কিন্তু সমানই আছে। আরব চাষীরা কাঠের লাঙলে বলদ, উট অথবা গাধা জুড়ে চাষ আজও করে—এশিয়ার সর্ব্বত্র যে ভাবে করা হয়, তেমনি। এদেশের প্রধান শস্য যব, গম, জনার ও তিল। প্রত্যেকের বাড়ীতে দুটো দশটা জলপাইয়ের গাছ আছে—আমাদের দেশে যেমন আম কাঁঠালের গাছ থাকে। জলপাই গাছ এদেশে একটা সম্পত্তি। জলপাই ফলের সময় গরীব লোকে জলপাই খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। গৃহপালিত পশুর অবস্থা সমানই খারাপ। কোনোরকম পশুর খাদ্যের চাষ করার চলন নেই, যেমন প্রাচ্যদেশের কোথাও বড় নেই। ফলে দুর্ব্বল পশু দিয়ে চাষের কাজ যেমন হবার তেমনি হয়।

প্যালেষ্টাইনে জার্ম্মানদের দু একটা বড় বড় কৃষিক্ষেত্র আছে, এই সব কৃষিক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট থেকে আধুনিক পদ্ধতির চাষ প্রচলন করবার চেষ্টা চলছে। আরব চাষীরা সম্প্রতি এদিকে মন দিয়েছে। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের লোকে চাষীদের জমিতে গিয়ে এই সব পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয় ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করে।

এখানে লোকে যা করবে তা দলবদ্ধ হয়ে করবে। কিছু

হাইফা: প্যালেষ্টাইনের আধুনিক বন্দর। (১৯৩৩ সনে নির্ম্মিত)

ইউরোপের সঙ্গে এবং প্যালেষ্টাইন রেলওয়ে একে জেরুজালেম, জাফা ও ইজিপ্টের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

বাইবেল-প্রসিদ্ধ বেথ্‌লেহেম এখনও আছে, তবে মধ্য-ইউরোপের বুলভার্সমূহ থেকে সদ্য-প্রত্যাগতা, আধুনিকতম

করতে হলে গ্রাম্য মসজিদে সবাইকে ডেকে এনে সভা করে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা হয়। এতে ফল হয় ভালই, ছোট ছোট গ্রামেও আজকাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে—তা থেকে ভাল বীজ বিতরণ করা হয়, পশুর রোগ হলে

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়, টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় চাষ কাজের সুবিধার জন্যে।

বহু শতাব্দী ধরে ইজিপ্ট, সিরিয়া, এশিয়ামাইনর, মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক রয়েছে—বণিকেরা উটের পিঠে পণ্য বোঝাই দিয়ে প্যালেষ্টাইনের পথ দিয়েই যাতায়াত করে। অথচ এই পথ চলে গিয়েছে দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে, যে-পথে পুলিশ নেই, পাহারা নেই; আইনের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত দস্যুদল পথিকদের উপর অত্যাচার না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। যখন এ-অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন রোমানরা এটা বুঝেছিল এবং সীমানাকে সুরক্ষিত রাখবার উদ্দেশ্যে জর্ডান নদীর ওপারে বহুদূর ব্যেপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল।
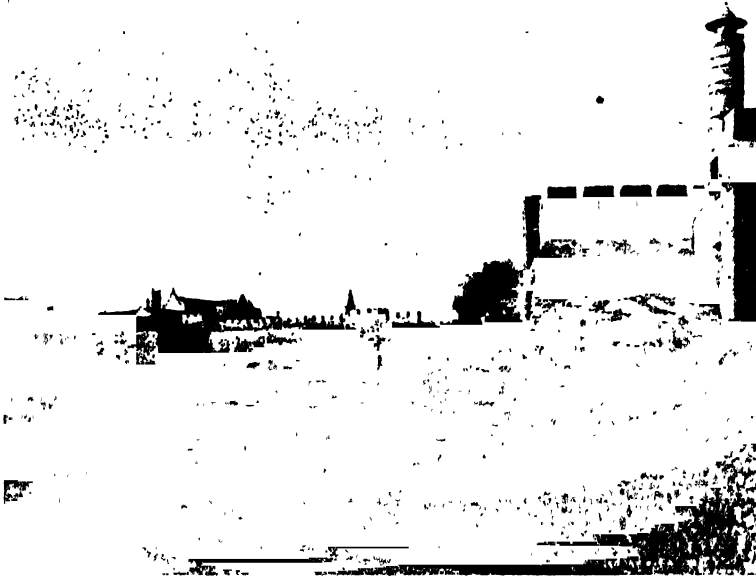
জেরুসালেম : মোটরবাসের টার্মিনাস।

বাইবেলোক্ত নাজারেথ : বর্ত্তমানে লাঙ্গলের সাহায্যে চাষের বন্দোবস্ত হইতেছে।

পামিরা থেকে জেরাশ ও পেট্রা পর্য্যন্ত পথের মধ্যে প্রাচীন যুগের সামরিক ঘাঁটির এই সব ধ্বংসাবশেষ রোমান শাসন-পদ্ধতির দূরদর্শিতার নীরব সাক্ষ্য প্রদান করছে।
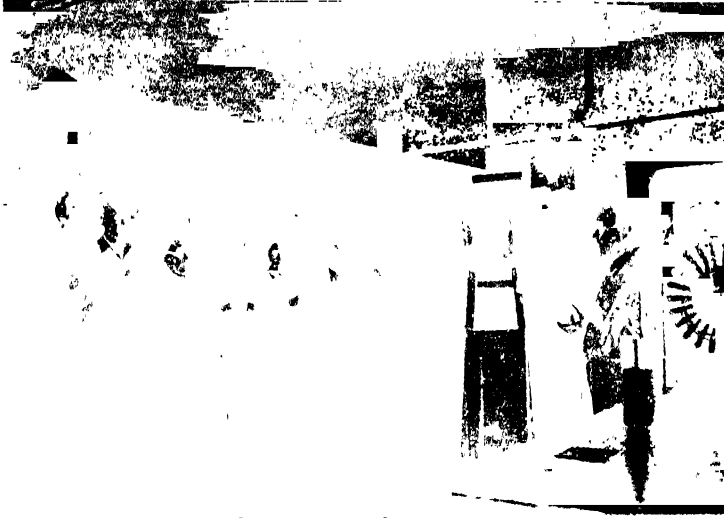
প্রাচীন প্যালেষ্টাইনে আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলিতেছে।

রোমানদের এই নিয়ম তুর্কীদের সময়ে ছিল না। তখন পথের ধারের বড় বড় গঞ্জ বা গ্রাম পথিকদের কাছ থেকে কিছু কিছু কর নিয়ে তার বদলে তাদের দস্যুদলের হাত থেকে রক্ষা করার ভার নিত। এ ব্যবস্থাতে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার অনেক লাঘব হয়েছিল সন্দেহ নেই, কাজও হত ভাল। যে গ্রামের শাসন-সীমানার মধ্যে ডাকাতি, লুটপাট বা খুন হয়েছে, পুলিশের লোকে সেই গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষকে ডাকাতির জন্য দায়ী করত।

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইনে আধুনিক নিয়মের পুলিশদল গড়ে উঠেছে—ইংরেজ ও সে-দেশের কনষ্টেবল দুই-ই আছে পুলিশ-দলে। তারা বড় বড় আরবী ঘোড়ায় চেপে সহরের পথে ট্রাফিক-পুলিশের কাজ করে, কিংবা পাহাড়ের উপরে ডিউটিতে যায়। আজকাল পথে-ঘাটে তেমন অত্যাচার নেই এবং কৃষকেরা বাজারে তাদের জিনিষপত্র বেচতে নিয়ে যেতে পারে অনেকটা নিরাপদেই। তবুও মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে এখনও দস্যুরা কখনো কখনো দেখা দেয় ও শাসন বিভাগ, প্রজাবর্গ ও পুলিশকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। যতদিন পর্য্যন্ত তাদের উচ্ছেদসাধন না ঘটবে ততদিন পর্য্যন্ত এ দুর্ভোগ চলবে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে মোটর-চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তখন সমগ্র প্যালেষ্টাইনে মোটরগাড়ী ছিল মাত্র একখানি। বর্ত্তমানে উপলসঙ্কুল নদীখাত ও শিলাস্তৃত পর্ব্বতপথের পরিবর্ত্তে প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র সিরিয়া থেকে ইজিপ্টের সীমানা পর্য্যন্ত, ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদী পর্য্যন্ত, ওদিকে সিনাই উপদ্বীপ ও বাগদাদ পর্য্যন্ত আধুনিক ধরণের রাস্তা তৈরী হয়েছে, মোটর যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই।

এ পর্য্যন্ত চার হাজার মোটরগাড়ী রেজিষ্ট্রী হয়েছে পুলিশ আপিসে—তার মধ্যে মোটরবাসই বেশী—এগুলি মোটর-লরির ফ্রেমের উপরে কাঠের ঘর বসানো

প্যালেষ্টাইন: কমলালেবুর বাগান।

মাত্র। কিন্তু এরা ঘোড়ায় টানা দেশী গাড়ীগুলো তাড়িয়েছে, এখন মোটরবাসে সবাই যায়, প্রাচ্য সম্ভ্রান্ত লোক থেকে বোরখাপরা মুসলমান মহিলা, আপিসের কেরাণী থেকে বৈদেশিক ভ্রমণকারী পর্য্যন্ত।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের একমাত্র রেলপথ ছিল ফরাসীদের নির্ম্মিত জাফা থেকে জেরুজালেম পর্য্যন্ত একটা ছোট রেল লাইন—হাইফা থেকে এরই শাখা পূর্ব্বদিকে জর্ডান নদী পার হয়ে ডামস্কাস মদিনা রেলপথের সঙ্গে মিশেছিল। যুদ্ধের সময় সুয়েজ থেকে সিনাই উপদ্বীপের উপর দিয়ে, গাজা ও লিড্ডা—এই দুই প্রাচীন সহর পথে রেখে হাইফা পর্য্যন্ত একটা নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে যাত্রীরা প্রাতর্ভোজন ও বৈকালিক চা-পানের মধ্যে গোটা সিনাই উপদ্বীপ ও প্যালেষ্টাইন পার হয়ে যেতে পারে যা পার হতে মোজেসের লেগেছিল চল্লিশ বছর।

এরোপ্লেনেরও অভাব নেই—বরং এই মরুপর্ব্বতসঙ্কুল দেশে এরোপ্লেনে যাওয়াই সুবিধা। গ্যালিলি সাগরে (আসলে একটা হ্রদ) এখন আকাশ থেকে উড়ো জাহাজ নেমে প্রাচীন ধীবরদের বিস্মিত করে দেয়, কারণ গ্যালিলি এখন ইউরোপ থেকে পূর্ব্ব-এশিয়াগামী উড়োজাহাজের পেট্রোল ভর্ত্তি করবার জায়গা।

গ্যালিলি ও গাজা সহর থেকে এখন হালফ্যাসানের সৌখীন সাজসজ্জাযুক্ত উড়োজাহাজ মাল ও যাত্রী নিয়ে পূর্ব্ব-এশিয়ার দিকে রওনা হয়—এই সব উড়োজাহাজে মালসমেত কুড়িজন যাত্রী বহন করতে পারে—চার ইঞ্জিনযুক্ত, ঘণ্টায় বেগ গড়ে ১২০ মাইল। রেলে এবং আকাশপথে তিনদিনে প্যালেষ্টাইন থেকে লণ্ডনে যাওয়া যায়।

মহাযুদ্ধের শেষে প্যালেষ্টাইনের একজন বৃদ্ধ ইহুদী জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—'ঘরে আমাদের রাত্রে আলো জলে না কেন, জিগ্যেস করছেন? আজ্ঞে, হুজুর, জলপাই তেলের প্রদীপ মিট্‌মিটে আলো দেয়, তাতে তো কোনো কাজ হয় না, তাই আমরা সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।'

কমলালেবু বস্তা বোঝাই হইয়া ইউরোপ ইংলণ্ড ও ইজিপ্টে চালান হইতেছে।

এখন জর্ডান নদীতে কল-কব্জা বসিয়ে যে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়, জর্ডান থেকে হাইফা পর্য্যন্ত, ওদিকে টেল্ আভিভ ও জাফা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বড় বড় লোহার খুঁটী ও তারের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎ পাঠানো চলছে।

ডেড্ সি বাল্যকাল থেকে প্রত্যেকেরই পরিচিত। নামে সমুদ্র যদিও, আসলে এটাও গ্যালিলি সমুদ্রের মত একটা হ্রদ। এই হ্রদে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ নেই, থাকা সম্ভব নয়—জলে পটাশ ও ব্রোমিন এত বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। এখানে চোলাইয়ের কল বসিয়ে হ্রদের জল থেকে পটাশ ও ব্রোমিন বার করে নিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। শীঘ্রই উভয় দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ বছরে ১০০,০০০টন দাঁড়াবে।

যাঁরা ভাবেন যে কলার চাষ ট্রপিক্‌স্ ভিন্ন সম্ভব হয় না—তাঁরা ডেড্ সি থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে জেরিকো সহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত কলাবাগান দেখে বিস্মিত হবেন। কাটা খালের সাহায্যে এই কলার ক্ষেতে জল সেচন করা হয়—তবে বাৎসরিক বৃষ্টি পতনের পরিমাণ এসব মরুদেশে এত সামান্য যে, বর্ষণধারামুখর ট্রপিক্‌সের মত অত বড় গাছও

এখানে হয় না বা ফলও ও-ধরণের হয় না। স্থানীয় বাজারে আদৃত হলেও অন্যদেশে সে কলা রপ্তানী করার যোগ্য নয়।

গ্যালিলি হ্রদের উত্তরে একটা ছোট হ্রদ আছে—এখানকার জলে জলজ ঘাস, শেওলা, দাম অত্যন্ত বেশী। এখান থেকে ম্যালেরিয়া-বীজাণুবাহী মশা উৎপন্ন হয়ে সারা প্যালেষ্টাইনে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে দিত। গবর্ণমেন্ট ও ধনী ইহুদী ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই হ্রদের জল বড় বড় খাল কেটে নানা দিকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, ঘাস ও শেওলা পরিষ্কার করা হয়েছে—ফলে প্যালেষ্টাইনে এখন ম্যালেরিয়া অনেক কম। বিখ্যাত রকফেলার ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্ট্ এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য না করলে বোধ হয় এত সত্বর সাফল্য লাভ সম্ভবপর হত না।

৫২ বছর আগে ব্যারণ এডমণ্ড রথচাইল্ড রিশন ল্য জিয়ন নামক স্থানে একটা ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করেন—এবং ব্যবসায় নিমিত্ত দ্রাক্ষার চাষ সেখানে প্রথম সুরু হয়। আঙুর থেকে সুরা তৈরী করবার কলকব্জা বসানো হয়—মদের গুদাম ও কারখানা গড়ে ওঠে। কয়েকটি খৃষ্টীয় মঠেও ভাল মদ প্রস্তুত হয়।

কমলালেবুর ক্ষেত। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহার চাষ হয়। ব্যবসায় হিসাবে ইহা খুব লাভজনক।

কিন্তু লেবু জাতীয় ফলই প্যালেষ্টাইনের প্রধান পণ্য। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও জাফার কমলালেবু ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। কমলালেবুর ফসলের সময়ে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বাক্স কমলালেবু বিদেশে রপ্তানী হত।

এদেশের লেবুফলের চাষ বহু পুরাতন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে এর সুরু—ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় লেবুজাতীয় ফলের চাষ আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে। এসিয়ার দূরতম প্রদেশসমূহ থেকে এই প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়েই ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী সব স্থানে লেবুর চাষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন কালের খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের বিবরণে ও ক্রুজেডের সামরিক ইতিহাস-লেখকদের গ্রন্থে মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে কমলালেবু, গোঁড়ালেবু, মুসাম্বির, লাইম প্রভৃতি লেবু জাতীয় ফলের বিস্তৃত বাগানের উল্লেখ আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানকার কমলালেবু ইউরোপে রপ্তানী করবার রেওয়াজ প্রচলিত হয়। বর্ত্তমানে লেবু রপ্তানীর ব্যবসা প্যালেষ্টাইনের অন্য সব ব্যবসাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং লেবু জাতীয় ফলই এখানকার সর্ব্বপ্রধান কৃষিসম্পদ। ১৯৩৩ সালে এক জাফা বন্দর থেকে ৪,০০০,০০০ বাক্স ফল বিদেশে চালান গিয়েছিল।

অধিকাংশ দেশে ইতিহাস লেখা থাকে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে, আচার-ব্যবহারে ও প্রাচীন মুদ্রায়। প্যালেষ্টাইনে সে সব ছাড়া আর একটা জিনিষে বহুশতাব্দীব্যাপী নানা বৈদেশিক অধিকার ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস লিখিত আছে—মাথার টুপিতে।

জেরুজালেমের পথে কত ধরণের টুপি দেখা যাবে লোকের মাথায়,—খৃষ্টান, ইহুদী, ও মুসলমান, ধর্ম্ম ও জীবনযাত্রা-

প্রণালীর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অনুসারে লোকের মাথার টুপির গড়ন, রং, আকৃতি সব ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র। দরবেশদের দীর্ঘ ও ধূসর রঙের টারবুশ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের লালটুপি, আরব ভদ্রলোকের টকটকে লাল টারবুশ, আর্মেনিয়ানদের দীর্ঘ কালো টুপি, উপরের দিকটা পবিত্র আরারাট পর্ব্বতের মত দেখতে। ইহুদী সাইনডের প্রধান রাব্বিদের পশম বসানো গোল টুপি, ক্যাথলিক পাদ্রিদের টুপি, জর্জ্জিয়ান্ ও পারসী ইহুদীদের টুপি, কপ্ট্, আবিসিনীয় ও তুর্কীদের টুপি, প্যারিসের আধুনিকতম ফ্যাসানের তৈরী মেয়েদের টুপি সব পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে।

গ্যালিলি হ্রদ : হ্রদমধ্যস্থ বিমানপোতের ঘাঁটি দেখা যাইতেছে।

নবনির্ম্মিত হাইফা বন্দরের ঠিক পিছনেই কারমেল পাহাড়, সেখান থেকে চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর—পৃথিবীর মধ্যে খুব বেশী বন্দরে অত সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে না। সামনেই কারমেলের সানুদেশে ঘন সবুজ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের পাইন, তারপর চাষীদের মাটীর ঘর, তারপর পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে হাইফা সহর, তার পরই প্রহরে প্রহরে পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্র, এই ধূসর, এই ঘন নীল, এই আবার অন্য রকম—কারমেলের পূব দিকে বহুদূরব্যাপী খর্জ্জুরকুঞ্জ, তারপর ধূসর বালুময় এস্‌ড্রিলনের মরুভূমি থাকে থাকে উঠেছে কারণ ওদিকটা পাহাড়। তার পরেই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে জীর্ণকায়া নার্-এল্-মুকাত্তা নদী বয়ে চলেছে।

যার উপরের দিকটা মোচার অগ্রভাগের মত সরু, এখনও বেথলেহেমের মেয়েদের মাথায় দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্রুজেডের সময় ইউরোপ থেকে এই গড়নের টুপি এদেশে এসেছিল, তার পাশেই দেখা যাবে ফ্রান্সিস্‌কান্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের গোল টুপি, এও ইউরোপ থেকে মধ্যযুগে আমদানী, এখন এখানকার কৃষকেরা ব্যবহার করে। তারপর আছে গরীব আরবদের ছাগলের লোমে নির্ম্মিত 'আগল', সৌখীন নগরবাসী

চন্দ্রাবতী

বোধ হয় কৃত্তিবাসের পর বাঙ্গালা রামায়ণ রচনায় পূর্ব্ববঙ্গের কবি চন্দ্রাবতীর নাম প্রসিদ্ধ। তিনিই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মহিলা কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের এক প্রান্ত এই মহিলা-কবির দানের গৌরবে উদ্ভাসিত হইতেছে। বাঙ্গালার সরল অশিক্ষিত পল্লীবাসীগণ এখনও তাঁহাকে শ্রদ্ধায় অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। আজও ময়মনসিংহের গ্রাম্য কৃষকগণ মনের সুখে মাঠের পথে চন্দ্রাবতীর রচিত গান গায়, আজও পল্লী-বধূগণ পূজাপার্ব্বণে চন্দ্রাবতীর গান গাহিয়া মনে একটা অব্যক্ত আনন্দ পায়। ময়মনসিংহের পল্লীগ্রামের বিবাহে বর-কনের স্নানের 'জলভরা', "ক্ষৌরকার্য্য", "ফুলশয্যা" ইত্যাদি সময়ে তাঁহার রচিত গান গাহিয়া থাকে। চন্দ্রাবতীর কীর্ত্তি—মনসা দেবীর গান ও রামায়ণ গান।

চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাতুয়ারী একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। চন্দ্রাবতী প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি বংশীদাসের একমাত্র কন্যা। তাঁহার শুধু প্রতিভা ছিল না—তিনি রূপসী ছিলেন।

তাঁহার রচিত "রামায়ণ" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। দুঃখের বিষয় এগুলি উদ্ধারের চেষ্টা আজো তেমন ভাবে হয় নাই। কিন্তু এই সব গাথা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়া থাকে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সংস্কৃতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং গ্রাম্য ভাবসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। তাঁহার কবিত্বসুষমা নির্ঝরগতিতে ছুটিয়াছে, পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। রামায়ণের সর্ব্বত্র করুণ রসের একটা মধুর ঝঙ্কার আছে। সীতার দুঃখে সেই রস উথলিয়া উঠিয়াছে। নিজ জীবনের দারুণ ব্যথায় কবির লেখনী দুঃখার্দ্র হইয়াছে। এখনও সূর্য্যব্রতকালে ময়মনসিংহের মহিলাগণ ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রামায়ণের গীত গাহিয়া থাকেন।

—সৌরভ

টহলদার

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

টহলদার রামদাস বাউল দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়াছিল। কার্ত্তিক মাসের শেষরাত্রি অবসানপ্রায়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ম্লান হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর বুক ঘেঁষিয়া চারিদিকে ক্ষীণ কুয়াসা জাগিয়া উঠিতেছিল। হিমকণাবাহী বায়ুস্পর্শে রামদাসের নাক দিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। রামদাসের আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পাশের সমৃদ্ধিশালী গ্রামখানিতে সে টহল দিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই টহল দেওয়া শেষ করাই নিয়ম। কিন্তু আজ বোধ হয় তা হয় না। মাথার নামাবলীর পাগড়ীটা আরও একটু টানিয়া কান দুইটি ঢাকিয়া লইয়া সে পদক্ষেপের গতি আরও একটু দ্রুততর করিল। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের লাল কাঁকড়ের রাস্তাখানি বিসর্পিত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। রামদাসের সম্মুখেই প্রকাণ্ড দল্‌দলির জলাটা আসিয়া পড়িল। এই দল্‌দলির সাঁকোটা পার হইয়া সম্মুখেই অনতিদূরে চণ্ডীদেবীর মন্দির ও আশ্রম।

ওইখান হইতেই রামনগরের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। রামদাস গুন্ গুন্ করিয়া আজিকার জন্য বাছা গানখানি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দল্‌দলির সাঁকোর পরেই খানিকটা চড়াই। দুপাশে এখানকার আদি বড়লোক পরামাণিকদের বহুকালের প্রাচীন আমবাগান। অযত্নে বাগানখানা এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বাউল এইবার আঙ্গুলে করতালের দড়ি জড়াইতে সুরু করিল। জঙ্গলটা পার হইয়াই রামদাস চমকিয়া বলিয়া উঠিল—কে?

সম্মুখে হাত তিনেক দূরেই একটা লোক একটা বোঝাই বস্তা মাথায় করিয়া হন হন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। মানুষের সাড়া পাইয়া লোকটাও চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তেই সে মাথার বস্তাটা সজোরে রামদাসকে লক্ষ্য করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। রামদাস তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তাটা সশব্দে তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া ফাটিয়া গিয়া একরাশি ধান চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অল্প একটু হাসিয়া রামদাস বলিল—শশী, না কে রে?

শশী ডোম এ অঞ্চলের পাকা ধানচোর। শশী তখন পাশের আমবনের ঘনান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। বস্তাটার দিকে আর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বাউল আকাশের দিকে চাহিল। তারপর আপন মনেই বলিল—শশীর ত' ভুল হবার কথা নয়। তাইত, তবে কি আমারই ভুল না কি? হুঁ, রাত ত' মনে হচ্ছে এখনও খানিক রয়েছে।

আবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—কই পাখী ত' একবারও ডাকল না। ভুক্কোতারা যে এই উঠছে! ওঃ, কাকজ্যোৎস্না করেছে দেখছি।

আপন মনেই সে আবার একটু হাসিল। এমন ভ্রম তাহার মধ্যে মধ্যে হইয়া যায়। সে দিন সে চণ্ডীদেবীর দরবারে গিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। আজও সে পাকারাস্তা ছাড়িয়া দেবী-মন্দিরের দিকে পথ ধরিল।

পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের হাতের করতাল বাজিয়া উঠিল। গ্রামের পথে পথে মোটা ভরাট গলায় প্রভাতীসুরে গান ধ্বনিয়া উঠিল—

> 'নিশি হ'ল ভোর,
> উঠরে মাখন চোর।
> বলাই রতন ডা—কে, নিশি হ'ল ভো-র।'

গ্রাম তখনও সুপ্ত। পথচারী কুকুরগুলা শেষরাত্রির শীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া গৃহস্থবাড়ীর দুয়ারে পড়িয়া আছে। টহলদারকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করে না। তাহাদের সহিত বাউলের পরিচয় হইয়া গেছে। বাঁড়ুজ্জেদের দুর্গাবাড়ীর সম্মুখে বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর পিসিমাতার সহিত দেখা হইল। প্রৌঢ়া জলের ঘটিটা হাতে নিয়মমত দুর্গাদেবীর দুয়ার মার্জ্জনা করিতেছিলেন। আরও খানিকটা ছাড়াইয়া সরকার-পাড়ায় সরকার-বাড়ীর দৌহিত্র বৃদ্ধ হরিপদ মুখুজ্জের সহিত দেখা হয়। মুখুজ্জে কানে পৈতা জড়াইয়া, কোঁচার খুঁটটি গায়ে, গাড়ু হাতে চলিয়াছিলেন। বড়বাবুদের খোট্টা চাপড়াশীটার নাকের ডাক এই ভোরবেলাতেই প্রগাঢ় হইয়া উঠে। বারান্দার খিলানে খিলানে পায়রাগুলি কূজন সুরু করিয়া

দিয়াছে। নিত্যকার মত সহায়-স্বজনহীনা বেনেবুড়ী ডোবার ঘাটে বসিয়া ভগবানের চোখের মাথা খাইতেছিল। ছয় আনীর মুখুজ্জেদের শঙ্কর ভোরে গলা সাধিতেছিল—আ-আ-আ-আরে হা। ছেলেটির কণ্ঠস্বর ভাল। টোলের ছাত্রদের কয়জন চীৎকার করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, অস্তি-অস্তি, কশ্চিৎ-কশ্চিৎ। ছোট ছেলেটির উৎসাহ বেশী—তাহারই কণ্ঠস্বর সকলের চেয়ে উচ্চ। সে পড়িতেছিল 'ব্যাকরণ কৌমুদী'—দধি-দধিনী-দধীনি। বাবুদের ঠাকুর বাড়ীতে মঙ্গলারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল ঝন্-ঝন্-ঝন্—ঢং-ঢং।

* * *

রামদাস বাবাজীরা রামনগরের পুরুষানুক্রমিক টহলদার। রামদাস নিজে অকৃতদার বাউল। তাহার অন্তে তাহার পদ পাইবে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই টহলদারীতেই রামদাসের চলিয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীতে মাসিক একটা করিয়া সিধার বন্দোবস্ত আছে। পাঁচ পাই অর্থাৎ আড়াইসের চাল, পোয়াটাক ডাল, কিছু তরকারী কিছু মসলা—তাই অকৃতদার বাউলের পক্ষে যথেষ্ট। সমস্ত দিন সে ঘরে বসিয়া আপন আখড়াটির পরিচর্য্যা করে। বেড়া বাঁধে, ফুলের গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়ে, জল দেয়। দর্জ্জির দোকানের ছিটের টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া আল-খাল্লার গায়ে বসাইয়া সেটিকে বিচিত্রিত করিয়া তোলে।

আজ রামদাস একতারাটি মেরামত করিতে বসিয়াছিল। পুরাতন যন্ত্রটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বংশদণ্ডটির মাথার গাঁটটিতেই একটি ফাট ধরিয়াছে—সেই ফাটটিতে সে সরু সুতা দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধন দিতেছিল। বাহিরে বেড়ার ধারে খুট্‌খাট শব্দ শুনিয়া বাউল সেই দিকে চাহিল। কে একটা লোক যেন বেড়ার ওপাশে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হইল। রামদাস প্রশ্ন করিল—কে? ইতস্তত করিয়া লোকটি বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি। বাউল হাসিয়া বলিল—সবাই ত আমি, বাবা! কে তুমি? এবার বাহিরের আগড় ঠেলিয়া লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—আমি শশী গো বাবাজী!

বলিয়া ভক্তিসহকারে এক প্রণাম করিয়া শশী সম্মুখে উবু হইয়া বসিল।

বাউল হাসিয়া বলিল—কি খবর রে শশী?

শশী কোন কথা কহিল না। নত মস্তকে নীরবে সে শুধু আঙ্গুল দিয়া মাটীতে দাগ টানিতেছিল।

রামদাস বলিল—বস্তাটা যদি চাপা পড়তাম শশী, তা' হলে......ছাড়, ছাড়, পা ছাড়—পা ছাড়।

শশী উপুড় হইয়া পড়িয়া বাবাজীর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে বলিল—এই বারকার মত—হেই বাবাজী—এইবার শুধু, আর যদি কখুনও দেখতে পাও কি ধরতে পার—এই আমি কান মলছি—এমন অসাবধান হয়ে......

বাউল হাসিয়া বলিল—তবু তুই বলবি না যে আর চুরী করব না!

সঙ্গে সঙ্গে শশী উত্তর দিল—চুরী ত আমি আর করি না।

রামদাস বিরক্ত হইয়া কহিল—কাল সেটা তবে কি শুনি?

মাথা চুলকাইয়া শশী বলিল—উ-টো কাল কেমন হয়ে গেল গো! একবেটা কাবলের কাছে একখান কাপড় নিয়েছিলাম উ বছর। আরবছর বেটাকে দেখাই দিই নাই। ই বছর বেটা আর কিছুতেই ছাড়ছে না কি না—তাই বলি—

কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই শশী নীরব হইল। বাউল কোন কথা কহিল না। সে নীরবে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর শশী এ নীরবতা ভঙ্গ করিল; মৃদুস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল—হাতে টাকাকড়িও ছিল না, ধারও কোথাও পেলাম না। রামদাস এ-কথারও কোন জবাব দিল না। শশী আবার আরম্ভ করিল—কাবলেদের কাছে জিনিষ লেয়—ছি-ছি-ছি! বেটারা যা-তা ব'লে গাল দেয় গো। বাড়ীতে বসে আর ওঠে না।

রামদাস বলিল—কেনে মিছে কথাগুলো বলছিস শশী? এখন ত কাবলেদের টাকা আদায়ের সময় নয়। টাকা আদায় করে মাঘ মাসে।

শশী বলিল—ই যি উ বছরের টাকা গো! আর বছর যে বেটাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম।

তারপর হাত দুইটি জোড় করিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া সে বলিল—মা চণ্ডীর দিব্যি—।

—থাম থাম, আর দিব্যি করিস না বাপু। রামদাস তাহাকে থামাইয়া দিয়া আর একটা নূতন সুতা লইয়া বাঁধন দিতে আরম্ভ করিল। সুতার প্রান্তটি ধরিয়া টান দিতে দিতে

সে আক্ষেপের স্বরে বলিল—হেঁঃ, মা চণ্ডীর ধানের গোলাই তুই ফাঁক করে দিলি, তা…।

তাহাকে বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল,—মাইরী বলছি, কালীর দিব্যি, শালগেরাম ছুঁয়ে আমি বলতে পারি বাবাজী, সে আমি নই। তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল—এই দেখ বাবাজী। সি তোমার ওই গোঁসাই বেটার কাজ। রেতে রেতে গাড়ীতে করে ধান বোঝাই করে আমুদপুরে বেচে এসেছে। আমি গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়েছি। বলত—গোঁসাই-এর সঙ্গে মোকাবিলে করে দিতে পারি। আমাকে বেটা একটা পয়সাও দেয় নাই।

রামদাস অবাক হইয়া শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শশী বলিল, ওগো মাছ খায় সব পাখীতেই, নাম হয় কেবল মাছরাঙ্গার। বাউল তাহার মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, এতক্ষণে সে বলিল—তুই মহাপাষণ্ড শশী, সাধু সন্নেসীর নামে অপবাদ দিতেও তোর লজ্জা হয় না!

শশী এবার ধীরে ধীরে বলিল,—আমি চোর, আমার কথা কেউ বিশ্বেস করে না, কিন্তুক আমি মিছে কথা বলি নাই বাবাজী। তাহার কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ একটা সবিনয় আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল। রামদাস এবার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে নতমুখে আপনার কাজই করিয়া গেল। শশীও নতমুখে বসিয়া ছিল, পূর্ব্বের কণ্ঠস্বরেই সে আবার বলিল—আমার একটি বেটা বাবাজী, যদি মিছে কথা বলে থাকি বাবাজী—

বাধা দিয়া বাবাজী মিষ্ট স্বরে বলিল—থাক শশী, দিব্যি করিস নে, থাক।

শশী নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। বাঁধন পরাইতে পরাইতে এক সময় মুখ তুলিয়া রামদাস ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিল, তুই কাঁদছিস শশী! না না কাঁদিস না, কাঁদিস না। আমি ত তোকে কিছু বলি নাই।

শশী মুখ তুলিল। তাহার চোখে জল ছিল না, বরং একটু হাসিয়াই বলিল—না বাবাজী, কেঁদে আর কি করব বল? কান্না আমার আর আসে না, কিন্তুক দুঃখ হয়। যেখানে যত চুরী হবে সব যাবে এই শশের ঘাড় দিয়ে। কিন্তুক বল দেখি বাবাজী, চোর কি এ চাকলায় শশে ছাড়া কেউ নাই?

এ কথার উত্তর বাউল দিতে পারিল না, তাহার হাতের কাজও বন্ধ হইয়া গেল। অকারণে সে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আক্ষেপপূর্ণ স্বরে শশী বলিল—চুরী করি বাবাজী, স্বভাবে করি, স্বভাবে হয় কি জান, থমথমে নিসুত রাতে চেতন হলেই কে যেন ঘাড়ে ধরে টেনে বার করে নিয়ে যায়। কিন্তুক সে আর ক'দিন। অভাবেই চুরী করতে হয় বেশী। কোথাও চুরী হলেই আমাকে নিয়ে যায় ধরে। তারপর উকীল, মোক্তার, মামলা-খরচ এ আসে কোথা থেকে বল দেখি? ভিক্ষে করলে জোটে না, মজুর খেটেও কুলোয় না।

বাউল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হতবাক হইয়া বসিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে শশী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তামুক-টামুক থাকে ত দাও কেনে বাবাজী, একবার সাজি।

রামদাস এবার যেন সজাগ সহজ হইয়া উঠিল, বলিল—সাজ ত সাজ ত বাবা। ওই দেখ ওই কুলুঙ্গীতে তামাক আছে, ওই কোণে বাঁশের চোঙায় চকমকি শোলা কয়লা সব পাবি। কল্কে, কল্কেটা আবার কোথা গেল? এই দিকে এই দিকের কুলুঙ্গীটে দেখ্ দেখি! হাঁ—।

পাওয়া গেল সবই। শশী তামাক সাজিয়া কয়টান টানিয়া কল্কেটি বাবাজীর নিকটে নামাইয়া দিল। পাশের ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকা বাহির করিয়া রামদাস কল্কেটি তুলিয়া লইল। উভয়েই নীরব। গাছের মাথায় বসিয়া একটা কাক কল্ কল্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ডালে ঠোঁট ঘষিতেছিল। একান্ত অকারণে শশী সেটাকে তাড়না করিয়া বলিল—হুস্—ধাঃ!

কাকটা উড়িয়া গেল। হাতের ঢেলাটা লইয়া শশী আবার নতমুখে মাটীতে ঠুঁকিতে লাগিল।

বাবাজী বলিল—শশী!

নত মুখেই শশী বলিল—উঁ!

—কিছু বল্ছিস্ আমাকে? কিছু ভয় নাইরে তোর, আমি নিজে হ'তে কাউকে কিছু বলব না।

জোড় হাতে শশী বলিল—না বাবাজী—জিজ্ঞেসা করলেও এবারকার মত—হেই বাবাজী, রক্ষে তোমাকে করতেই হবে।

বাবাজী চিন্তায় পড়িল। হতভাগ্যের উপর করুণাও তাহার হইতেছিল, কিন্তু মিথ্যা সে কেমন করিয়া বলিবে! বাবাজী শুষ্ককণ্ঠে কহিল—তা' কেমন করে হবে শশী—মিছে কথা—। বাধা দিয়া শশী বলিল—মিছে কথা বলতে ত' বলছি না আমি। আমি চুরী করি নাই। ই-কথা তুমি কেনে বলবে! তুমি বলবে আমি কিছু জানি না।

রামদাস যুক্তি শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। শশী ম্লানমুখে মিনতি করিয়া বলিল—জেল হ'লে মেয়েছেলেগুলোর দুর্দ্দশার আর সীমে থাকে না বাবাজী। রোগা ছেলেটা হয়ত এবার মরেই যাবে!

বাবাজী বহুক্ষণ পর শশীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—ভাবিস না শশী—তোর কোন ভয় নাই।

শশী এইবার মুখর হইয়া উঠিল, বলিল—আর এমন কম্ম—এই দেখ কান মলছি আমি।

বাউল হাসিতে লাগিল। শশী বলিল—দেখো তুমি, আর যদি কখুনও দেখতে পাও—তখন বল।

বাহির হইতে কে সাড়া দিল—বাবাজী রৈছ না কি?

শশী আর দাঁড়াইল না, একটি প্রণাম করিয়া ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল।

গোঁসাইদের বাড়ীর ছেলে চুলওয়ালা যতীন ভিতরে আসিয়া বলিল—ও বেটা কি করতে এসেছিল, বাবাজী? ও বেটা চোরের সঙ্গে আবার কেন?

বাবাজী হাসিয়া বলিল—গিয়েছিল কোথা, তাই পথে এখানে ঢুকে বলে, একটান তামুক খাব।

তারপর কল্কেটি আগাইয়া দিয়া বলিল—লাও তামুক খাও।

যতীন বলিল—একটি কাজে এসেছিলাম বাবাজী। আমাদের যাত্রার দলের বায়না আছে দু-রাত। গাইয়ে বেটা কোথা কোন দলে চ'লে গেইছে। ঠিকের লোক ত! তা' তোমাকে খানকতক গান গেয়ে দিতে হবে বাপু। তোমার নিজের জানা গান, যা' হয়।

যতীন গ্রামের যাত্রার দলের পাণ্ডা। বাবাজী হাসিয়া বলিল—তা' দোব। কিন্তু ভাই ফিরে আসা চলবে ত? আমার আবার টহল আছে।

* * *

দিন আট নয় পর।

রামদাস উঠানে ব'সিয়া সুর করিয়া 'চরিতামৃত' পড়িতেছিল।

'চৈতন্য চরিতামৃত সুধাব্ধি সমান,
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান!'

শশী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। তাহার হাতে একটি নূতন একতারা। বাবাজী হাসিয়া বলিল—কি সংবাদ, শশীভূষণ?

শশী যন্ত্রটি সম্মুখে নামাইয়া দিল। যন্ত্রটি তুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বাউল সপ্রশংস স্বরে বলিল—বা—বা—বা, এযে চমৎকার হয়েছে রে, এঁ্যা! বাঃ কে করলে? তুই?

হাসিতে শশীর মুখ ভরিয়া গেল, সে বলিল—হঁ্যা লাউ-এর খোলাটা বাড়ীতেই ছিল, তাই বলি—ফেললাম তৈরী ক'রে। বাঁশের কাজ করেছি আমি। আর লাউ-এর খোলায় উ সব করেছে আমার পরিবার।

বাবাজী তখনও যন্ত্রটি দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতেই সে বলিল—এঁ্যা, এযে খাসা লতাপাতার ছক কাটা হয়েছে রে! বাঁশের গায়েও ত ছক কাটা! বাঃ এযে ভারী সুন্দর হয়েছে রে!

শশী বলিল—তোমার লেগে এনেছি বাবাজী!

যন্ত্রের তারে একটি আঘাত দিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া বাউল বলিল—আওয়াজও হয়েছে ভারী মিঠে! বাঃ!

শশী হাসিমুখে বলিল—তামুক সাজি একবার।

বাবাজী যন্ত্রটি হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। শশী কল্কে আনিয়া দেখিল বাবাজী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শশী দেখিল দেখিবার বস্তু কোথাও কিছু নাই। সে ডাকিল—তামুক খাও বাবাজী। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাবাজী বলিল—শশী, কি দাম নিবি বল দেখি?

হাসিয়া শশী বলিল—দাম কিসের গো? তোমার লেগেই যে তৈরী ক'রেছি আমি।

নতমুখে বাবাজী বলিল—তা ত' আমি নিতে পারব না শশী।

শশী চমকিয়া উঠিল, অতি-ব্যগ্র কাকুতিভরা স্বরে সে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বাবাজী নতমুখেই উত্তর দিল—সে আমার ঘুষ নেওয়া হয় শশী। তোর পাপের ভাগ ত' আমি নিতে পারব না।

শশার মুখের হাসি পূর্ব্বেই মিলাইয়া গিয়াছিল, এখন সে মুখে ম্লান বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সে মাথাটি নত করিয়া বসিয়া রহিল। রামদাসও সেই নতমুখে বসিয়া ছিল। কল্কের তামাকটা নিঃশব্দে পুড়িতেছে। ক্ষীণ একটি ধোঁয়ার শিখা কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল। কতক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ শশী নিঃশব্দে এক-তারাটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বাবাজী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দুয়ারে গিয়া ডাকিল—শশী, শশী!

শশী বেশী দূর যায় নাই, সে ফিরিল। বাবাজী হাসিয়া বলিল—দিয়ে যা শশী, নিলাম ওটা আমি।

শশীর মুখে হাসি দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে কয় ফোঁটা জল।

*　　　*　　　*

যন্ত্রটি লইয়া কিন্তু সমস্ত দিন রামদাসের মনে অশান্তির সীমা রহিল না। বারবার মনে হইল, শশীকে ফিরাইয়া দিলেই সে ভাল করিত। হয় ত' দুঃখ তাহার হইত, কিন্তু দুই চারিদিনেই সে তাহা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার পক্ষে এযে ভয়ানক বস্তু। পাপ দেহে প্রবেশ করিলে কি আর রক্ষা আছে! এ যন্ত্রটি লওয়াতে যে শশীর সে দিনের পাপের অংশ লওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনে মনে সে স্থির করিল, অপরাহ্ণে গিয়া শশীকে ওটি ফিরাইয়া দিয়া আসিবে। একবার সে যন্ত্রটির তারে আঘাত দিল। বড় মধুর সুরে যন্ত্রটি সাড়া দিয়া উঠিল। আবার সে ঝঙ্কার তুলিল—আবার—আবার। দেখিতে দেখিতে বাউলের আখড়ায় দ্বিপ্রহরে গোষ্ঠবিহারের গান জমিয়া উঠিল। গানের সুরের আকর্ষণে আখড়ায় লোক জমিয়া গিয়াছিল। গান শেষ হইলে যতীন বলিল—ভারী চমৎকার যন্ত্রটা হৈছে ত বাবাজী! দেখি—দেখি! এযে আবার লতপত-কাটা রৈছে গো! বলেহার—বলেহার।

ছুতারদের ভূপতি যতীনের হাত হইতে যন্ত্রটি লইয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ওস্তাদ কারিগরের হাতের জিনিষ! ইয়ের ওপরে বার্ণিশ যদি দেয়া হয়, বুঝলে কি না কি করবে তোমার দামী সেতার!

যতীন প্রশ্ন করিল—ই-কোথা থেকে পেলে বাবাজী?

রামদাস উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—রাজারা মাণিক কোথা পায় হে? যাও, যাও, এখন সব বাড়ী যাও দেখি। আমার কাজকর্ম্ম ঢের বাকী।

ভূপতির হাত ধরিয়া টানিয়া যতীন বলিল—আয়রে আয়। বলে-'মাগ্ নাই ছেলে কাঁদে, তার দুঃখে গগন ফাটে' সেই বিত্তান্ত। কাজের ত আর পরিসীমে নাই।

রামদাস উঠিয়া যন্ত্রটি ঘরে রাখিতে গিয়া আর একবার সেটিতে আঘাত দিল। সত্যই আওয়াজটি বড় মিঠা! সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—মিস্ত্রী—তোমাকে ভাই একটুকু বার্ণিশ আমাকে দিতে হবে।

কেহ কোন উত্তর দিল না। বাবাজী বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—মিস্ত্রী, ভূপতি!

জনশূন্য অঙ্গন, ভূপতি চলিয়া গিয়াছে।

*　　　*　　　*

যন্ত্রটি আর রামদাসের ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ফিরাইয়া দিবার সংকল্প সে কয়েকবারই করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার সময় মনে হইয়াছে, আহা শশী বেচারী মনে দারুণ আঘাত পাইবে। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে শশীর ম্লান মুখ সত্যই ভাসিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মন বলিয়াছে, এটুকু তাহার মিথ্যা অজুহাত, এ তাহার লোভ।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই সেদিন ভূপতি মিস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয়ের মত হর্ষ প্রকাশ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—কই বাবাজী, বার কর তোমার একতারা, বার্ণিশ লাগিয়ে দেই।

ছোট একটি মাটির ভাঁড় বাহির করিয়া সে চাপিয়া বসিল। বাউল পরমানন্দে যন্ত্রটি বাহির করিয়া দিয়া পাশে বসিয়া বার্ণিশ দেওয়া দেখিতে লাগিল। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রটি বার্ণিশের প্রলেপে সুমনোহর, সুচিক্কণ হইয়া উঠিতেছিল। রামদাস মুগ্ধ হইয়া গেল. বলিল, বলিহারীর জিনিষ ভাই মিস্ত্রী! বা—বা—বা।

অহঙ্কারস্ফীত কণ্ঠে ভূপতি বলিল—হুঁ হুঁ! ভাল কাঠে বেশ পালিশ করে যদি লাগান যায়—বুঝলে কি না—ত' আয়নার মুখ দেখা যায়।

রামদাস অবিশ্বাস করিল না। নীরবে মুগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া লইল। ভূপতি বলিল—এ সব জিনিষ এখানে—বুঝলে কি না—পাবে কোথা? কাল ডাক ছিল বড়বাবুদের বাড়ীতে। বাবুদের কাঠের জিনিষ সব রং হ'চ্ছে। রং করতে করতে মনে হ'ল তোমার কথা—বুঝলে কি না। ভাবলাম, বলি নিয়ে যাই এক টুকুন, বাবাজী সে দিন বলেছিল। তা'—বুঝলে কি না—নিয়ে আসা আবার এক হাঙ্গামা। গায়ে কাপড় ঢেকে কোন রকমে—বুঝলে কি না! সে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

বাউলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—চুরী করে?

ভূপতি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর বলিল—নেহাৎ অল্পপ্রাণী তুমি! ইয়েকে আবার চুরী করা বলে নাকি?

রামদাস বিবর্ণ মুখেই বসিয়া রহিল, কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। ভূপতি বলিল, ইয়ের দাম আর কত—বড় জোর একটা পয়সা। এক পয়সা আবার চুরী করা হয় না কি? আমরা ত' তা হলে ডাকাত। এই দেখ সামান্ত জিনিষ, বড়লোকের পড়ে নষ্ট হবে—বুঝলে কি না—কিন্তু চাইতে যাও দেখি, কখুনও বেটারা দেবে না। সে নেব না ত' কি?

ভূপতি চলিয়া গেল। বার্নিশটা বেশ শুকাইয়া গেলে রামদাস সযত্নে যন্ত্রটিকে তুলিয়া রাখিল। বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু শশীকে ফিরাইয়া দেওয়া এখন আর অসম্ভব। রং দিবার পর ফিরাইয়া দিতে যাইবেই বা সে কি বলিয়া! আর দোষই বা কি? সে ত' তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল।

* * *

সহসা বাউলকে যেন কেমন ভূতে পাইয়া বসিল। প্রত্যূষের বহু পূর্ব্বেই প্রায় তাহার এখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সেও টহল দিতে বাহির হইয়া পড়ে। ভ্রম বুঝিতে পারিলেও সে আর দেবী-মন্দিরে অপেক্ষা করে না। সে যেন তাহার ভাল লাগে না। শীতের রাত্রে গাঢ় সুপ্তিময় গ্রামখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এদিক-ওদিক ঘুরিয়া, কোথাও খানিকটা বসিয়া সে রাত্রিটুকু কাটাইয়া দেয়। নির্জ্জন গাঢ় রাত্রির একটা মোহ যেন তাহাকে আকর্ষণ করে। এক একবার অকস্মাৎ কেমন চমক ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সে গাঢ়তর অন্ধকারে একটা গলির দিকে অগ্রসর হইয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলে—এবার একবার শশীর দেখা পেলে হয়, এবার কিন্তু আর ক্ষমা করব না।

সেদিন একটি অন্ধকার রাত্রি। শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন অস্ত গিয়াছে। আকাশের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে সবে শুকতারা দেখা দিয়াছে। পূর্ণ জ্যোতি এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। রাত্রি যত শেষ হইয়া আসিবে তত সেটি উজ্জল ভাস্বর হইয়া উঠিবে। আবার প্রত্যূষের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত মিলাইয়া যাইবে। রামদাস গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চাটুজ্জেদের খিড়কীর ঘাটে সে পা ধুইতে নামিল। ধুইতে ধুইতে তাহার কি খেয়াল হইল কে জানে, ঘাটময় সে পা বুলাইয়া ফিরিল। হঠাৎ হেঁট হইয়া হাতে করিয়া তুলিল একটা মাটির ভাঁড়। ঘৃণায়, বিরক্তিতে সেটা ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। আপন মনেই সে বলিল—ধ্যেৎ—আমি বলি ঘাটে কে গেলাস-টেলাস—ধ্যেৎ! চাটুজ্জেদের গলিটা শেষ হইয়াছে গ্রামের 'কুলি'-পথে। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এই পথের দুই পাশে সারি সারি ভদ্রগৃহস্থদের বাড়ী। মুখুজ্জেদের বাড়ী পার হইয়া আঁতুর-গড়ে। তাহার পরই পাশাপাশি বাঁড়ুজ্জেদের দুই তরফের বৈঠকখানা। বড় তরফের বৈঠকখানাটার দুই পাশে দুইটা বাঁধান খোলা বারান্দা, মধ্যস্থলে চওড়া সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। খোলা বারান্দার উপরে কতকগুলা কুকুর উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া কলহ করিতেছিল। বাউল থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি, বৈঠকখানার দরজাও যে খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে! গোটা দুই সিঁড়ি উপরে উঠিয়া বাউল বুঝিল, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ হইয়াছে। চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ মনে হইল, বাবুদের মজলিসে কি একটা আধটা বিড়িও পড়িয়া নাই! একটু ইতস্তত করিয়া সে উপরে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ফরাসের উপরে তখনও একটা লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। ধোঁয়ায় লণ্ঠনের চিম্‌নীটা কাল হইয়া

আসিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের আলোকশিখাটাকে রক্তাভ দেখাইতেছিল। ম্লান আলোকে ফরাসখানা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উর্দ্ধদিকে অস্পষ্ট আলোক ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া প্রগাঢ় অন্ধকার। ফরাসের উপর এক প্যাকেট তাস ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। ওদিকে একটা পাশার ছক, মধ্যস্থলে একটা গড়গড়া, এক কোণে একটা হারমোনিয়ম তাহারই পাশে একটা কাল রং-এর বাক্স পড়িয়া। রামদাস চিনিল, ওটা বেহালার বাক্স। নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে বেহালাটাকে একবার তাহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। ধীরে ধীরে সে গিয়া বেহালাটাকে বাহির করিয়া বসিল। অপরিস্ফুট আলোকসম্পাতেও যন্ত্রটির বার্ণিশ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বাউলের হাতের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তাহার মধ্যে কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ রামদাস উঠিয়া রশ্মিটুকুকে নিভাইয়া দিল। নির্জ্জন ঘরখানার সব কিছু এক মুহূর্ত্তে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়া গেল। সে অন্ধকারের মধ্যে রামদাস নিজেকেও দেখিতে পাইতেছিল না।

* * *

বৈঠকখানার কার্ণিশে কয়টা পারাবাত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বাউল দ্রুত বৈঠকখানা হইতে নামিয়া আসিল। অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠকখানার শেষ সিঁড়িতে নামিয়াই বাউল চমকিয়া বলিয়া উঠিল—কে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলখাল্লার ভিতর হইতে বেহালাটা পাকা সিঁড়ির উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। রাস্তাটার ওপাশের বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁসিয়া কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল। রামদাস ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। লোকটি কোন উত্তর দিল না—তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রামদাস আবার কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কে?

সে উত্তর দিল না। বাউল কয়পদ আগাইয়া আসিতেই লোকটিও নড়িল, শুধু নড়িল নয়—দীর্ঘ মানুষটি আকারে যেন ছোট হইয়া আসিল।

রামদাস এতক্ষণে বুঝিল এ তাহারই ছায়া।

পূর্ব্ব গগনে শুকতারা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। রামদাস ছুটিয়া পলাইল। চোর—চোর, সে চোর! সদর রাস্তা দিয়া চলিতে আর তাহার সাহস ছিল না। পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বাউল আবার চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কে?

কেহ উত্তর দিল না। রামদাস দেখিল এ তাহারই সেই ছায়া।

আর একদিক

বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের সম্বন্ধে ই. ভি. লুকাস তাঁহার সণ্টারার্স রিওয়ার্ডস্ (Saunterer's Rewards) পুস্তকে লিখিতেছেন : তিনি যেখানে যাইতেন সঙ্গে কম্পাস লইয়া যাইতেন। শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যা কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে পাতা আছে দেখিতেন। যদি পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাতা থাকিত, তবে তিনি উহার দিক পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর-দক্ষিণ করিয়া লইতেন। তারপর কম্পাসের দিকে চাহিয়া, তাঁহার মাথা যাহাতে ঠিক সোজা উত্তর দিকে থাকে, বালিশ তেমন করিয়া লইতেন। কেননা, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবহাওয়ায় যে চৌম্বক শক্তি আছে, তাহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়, এবং ইহা মস্তিষ্ক শক্তিকে বর্দ্ধিত করে। এইজন্য শয়নকালে মাথা হইতে পা এমন অবস্থায় রাখা প্রয়োজন, যাহাতে চৌম্বকশক্তি অতি সহজে মস্তিষ্ক-শক্তির কাজে আসে। সুতরাং কম্পাস তাঁহার অপরিহার্য্য সঙ্গী ছিল।

দিবা-রাত্রির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধীর মন্থর পদে হেরম্ব আশ্রমে ফিরে এল। অন্ধকার বাগান পার হয়ে বাড়ীর রুদ্ধ দরজায় সে আস্তে করাঘাত করলে। তারপর আনন্দের নাম ধরে ডাকলে। অভিশপ্ত দেবদূতের মত মর্ত্ত্যের প্রবাস সাঙ্গ করে সে যেন স্বর্গের প্রবেশপথে সসঙ্কোচে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খোলার জোরালো দাবী জানাবার সাহস নেই।

আনন্দ আলো হাতে এসে দরজা খুলে নীরবে পাশে সরে দাঁড়াল। হেরম্ব মৃদুস্বরে বললে, 'দেরী করে ফেলেছি, না?'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে মন্দিরে গিয়েছিলাম।'

'তার বাড়ী যাওনি—সকালে যিনি এসেছিলেন?'

'গিয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলেন। তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে দেখি ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের সামনে এসে হাজির হয়েছি। মন্দিরে উঠে একটু বসলাম। মনটা ভাল ছিল না, আনন্দ।'

'কেন?'

'তিনি বললেন, আমায় তিনি ভালবাসেন। আমি ভালবাসি না বলায় মনে খুব ব্যথা পেলেন। কারো মনে ব্যথা দিলে মন খারাপ হয়ে যায় না?'

দরজা বন্ধ করার জন্য আনন্দ হেরম্বের দিকে পিছন ফিরল। হেরম্বের মনে হল, এই ছুতায় সে বুঝি মুখের ভাব গোপন করছে। দরজায় খিল দিয়ে আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে বোঝা গেল, হেরম্বের অনুমান সত্য নয়। আনন্দ কখনো কিছু গোপন করে না।

'তিনি অনেক দিন থেকে তোমায় ভালবাসেন, না?'

'তাই বললেন।'

দুজনে তারা হেরম্বের ঘরে গেল। মালতীর কোন সাড়াশব্দ নেই। সবগুলি আলো আজ জ্বালা হয়নি, বাড়ীতে আজ অন্ধকার বেশী, স্তব্ধতা নিবিড়। আলগোছে মেঝেতে আলোটা নামিয়ে রেখে আনন্দ বললে, 'আমার ভালবাসা দু'দিনের!'

হেরম্ব অনুযোগ দিয়ে বললে, 'তুমি দিনের হিসাব করছ?'

কথাগুলি হঠাৎ যেন আক্রমণ করার মত শোনাল। আনন্দ থতমত খেয়ে বললে, 'না, তা করিনি। এমনি কথার কথা বললাম।'

হেরম্ব সবিষাদে মাথা নাড়লে। 'কথার কথা কেউ বলে না, আনন্দ। আজ পর্য্যন্ত কারো মুখে আমি অর্থহীন কথা শুনিনি। তোমার ঈর্ষ্যা হয়েছে।'

হেরম্বকে আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করে আনন্দ একথা স্বীকার করলে, 'কেন তা হয়? আমার খুব ছোট মন ব'লে?'

'ঈর্ষ্যা খুব স্বাভাবিক আনন্দ, সকলের হয়।'

'সকলের হোক, আমার কেন হবে?'

প্রশ্নটা হেরম্ব ঠিক বুঝতে পারলে না। এ যদি আনন্দের অহঙ্কার হয় তবে কোন কথা নেই। আর সে যদি সরলভাবে বিশ্বাস করে থাকে, তার অসাধারণ প্রেমে ঈর্ষ্যার স্থান নেই, তাহলে হয়ত হেরম্বকে অনেকক্ষণ বকতে হবে। বলতে হবে, তোমার খিদে পায় না, আনন্দ? মাঝে মাঝে প্রকৃতি তোমাকে শাসন করে না? হিংসাকে তেমনি প্রকৃতির নিয়ম বলে জেনো।

হেরম্ব কথা বললে না দেখে আনন্দ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই মেঝেতে বসল। তাকে চৌকীতে উঠে বসতে বলার মত মনের জোর হেরম্ব আজ খুঁজে পেল না। সমুদ্রতীরের কলরব থেকে দূরে চলে আসার পর তার মনে যে স্তব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনো একটা ভারি আবরণের মত তা তার মনকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সুপ্রিয়ার সেই হাতে ভর দিয়ে শিথিল বসবার ভঙ্গী মনে পড়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়ার নির্ব্বাক গৃহপ্রবেশের পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের অমৃত-পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল, মাটির মানুষ হেরম্বকে এখনো তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার দেহ শোকে অবসন্ন, মৃত্তিকার কীটদংশনে বিপন্ন তার মন।

'আমার আজ কি হয়েছে জান?'

হেরম্ব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'বল, শুনছি।'

'সকাল থেকে নিজেকে আমার অশুচি মনে হয়েছে। কেবলি ছোট কথা মনে হয়েছে, হীন অশুদ্ধ ভাব মনে এসেছে। রাগে হিংসায় ঘেন্নাতে অস্থির হয়ে পড়েছি। ঠিক যেন নরকে বাস করেছি সারাটা দিন। এমন কষ্ট পেয়েছি আমি!' পনের দিন আগে যে ছিল অবোধ নিষ্পাপ শিশু, আজ সে আত্মজ পাপে মাথা হেঁট করল, 'তাই তোমাকে বলেছিলাম সন্ধ্যার পর আমার কাছে থেক, কোথাও যেও না। আমি নীচে নেমে গেছি, আমাকে তুমি তুলে নিতে পার?'

প্রথম দিন পূর্ণিমা রাত্রে নাচ শেষ না করে আনন্দ যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিল এখন তার নতমুখে তেমনি একটা যন্ত্রণার আভাস দেখে হেরম্ব ভয় পেলে।

'এসব কি বলছ, আনন্দ?'

'মুখ দেখে বুঝতে পারছ না এখনো আমার মন নোংরা হয়ে আছে? একটা ভাল কথা ভাবতে পারছি না। আমার মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই।'

হেরম্ব নির্ব্বোধের মত কথা খুঁজে খুঁজে বললে, 'ঈর্ষ্যায় এরকম হয় না, আনন্দ।'

আনন্দ বিরস কণ্ঠে বললে, 'কে বলেছে ঈর্ষ্যা? শুধু ঈর্ষ্যা হলে তো বাঁচতাম, আমি সবদিক দিয়ে খারাপ হয়ে গেছি। একটু আগে কি ভাবছিলাম জান?'

'কি ভাবছিলে?'

'দেখ, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'ফাটবে না, বল।'

আনন্দ আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বললে, 'বলা আমার উচিত নয়। অন্য মেয়ে হয় তো বলত না। তুমি তো জান আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে বেশী মিশিনি, বলে অন্যায় করলে রাগ কর না, আমায় ক্ষমা কর। দেখ, আমি এত ছোট হয়ে গেছি, একটু আগে তোমাকে খারাপ লোক মনে করছিলাম।'

আনন্দ যে তার ঠিক কি ধরণের মানসিক অপরাধের কথা স্বীকার করছে হেরম্ব বুঝতে পারলে না। তার মনে হল আনন্দের কথায় সুপ্রিয়া-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত আছে। আনন্দ না বুঝুক তার ঈর্ষ্যারই হয়ত এটা এক শোচনীয় রূপ। তবু কথাটা স্পষ্টভাবে না বুঝে সে কিছু বলতে সাহস পেলে না। একটু উদ্বেগের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন তা ভাবলে?'

'তা জানি না। আমার মনে হল আমাকে দেখে তোমার লোভ হয়েছিল তাই আমাকে ভুলিয়েছ।'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'তোমায় দেখে কার লোভ হবে না, আনন্দ? আমারও হয়েছিল। সেজন্য আমি খারাপ লোক হব কেন?'

'লোভ হয়েছিল বলে নয়, শুধু লোভ হয়েছিল বলে। আমায় দেখে তোমার শুধু-লোভ হয়েছিল, আর কিছু হয়নি।'

'অর্থাৎ আমার ভালবাসা-টাসা সব মিছে?'

আনন্দ মুখ তুলে তিরস্কার করে বললে, 'রাগ করবে না বলে রাগ করছ যে?'

'রাগ করব না, এমন কথা আমি কখনো বলিনি।'

আনন্দের চোখ ছল ছল করে এল। সে আবার মাথা নীচু করে বললে, 'ঝগড়া করার সুযোগ পেয়ে তুমি ছাড়তে চাইছ না। আমি গোড়াতেই বলিনি আমি ছোটলোক হয়ে গেছি? আমার একটা খারাপ ব্যারাম হলে তুমি এমনি করে ঝগড়া করবে?'

হেরম্বের কথা সত্য সত্যই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। সে গলা নরম করে বললে, 'ঝগড়া করিনি, আনন্দ। তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভেবেছ তাতেও আমি রাগ করিনি। তুমি নিজেকে কি যেন একটা ঠাউরে নিয়েছ, আমার রাগের কারণ তাই। তুমি কি ভাব তুমি মানুষ নও, স্বর্গের দেবী? কখনো খারাপ চিন্তা তোমার মনে আসবে না? মানুষের মনে হীনতা আসে, মানুষ সেজন্য আত্মগ্লানি ভোগ করে, কিন্তু এই তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপারে তোমার মত বিচলিত কেউ হয় না।'

আনন্দ বিবর্ণ মুখে বললে, 'আমার কি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে যদি জানতে—'

'জানি। হওয়া কিন্তু উচিত নয়। আজ তুমি একবার বললে তোমার ভয় হচ্ছে, আমাদের ভালবাসা বুঝি মরেই গেল।—এখন বলছ আমি তোমাকে শুধু লোভ করেছি, ভালবাসিনি? এ সব চিত্তচাঞ্চল্য আনন্দ, বিচলিত হয়ে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

আনন্দ আবার মুখ তুলেছিল, তার তাকাবার ভঙ্গী দেখে হেরম্বের মন উদ্বেগে ভরে গেল। আনন্দ যেন তাকে চিনছে,

তার দামী দামী ভুল ভেঙে যাচ্ছে, তার বিস্ময়ের সীমা নেই। হেরম্ব নিজের ভুল বুঝে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ কথা তার স্মরণ নেই যে, তার মত আনন্দ আজ বাইরের পৃথিবীতে বেড়াতে যায় নি, পরম সহিষ্ণুতায় আলো ও অন্ধকারের যে সমন্বয় নিজের মধ্যে করে নিয়ে পৃথিবীর মানুষ ধৈর্য্য ধরে থাকে আনন্দের কাছে সে সহিষ্ণুতার নাম পরাজয়। সুপ্রিয়ার আবির্ভাবের আগে সে নিজে কি মন নিয়ে এখানে দিন কাটাচ্ছিল হেরম্বের সে কথা মনে পড়ে। এখানে আসবার আগে মনের সেই উদাত্ত উর্দ্ধগ অবস্থা তার কল্পনাতীত ছিল। কি সেই বিপুল একক পিপাসা, —প্রশান্ত, নিবিড়, অনির্ব্বচনীয়। এইখানে গৃহকোণে বসে সমগ্র অভিজাত মনোধর্ম্মের বিরাট সমন্বয়ে চেতনার সেই অনাবিল নিরবিচ্ছিন্ন পুলক-স্পন্দন, বিশ্বের একপ্রান্তের ভাঙ্গা কুটির থেকে অন্য প্রান্তের রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হৃদয়ে নিখিল-হৃদয়ের জীবনোৎসব, অনন্ত, উদার উপলব্ধির মেলা! সেই মনে ছোট স্নেহ, ছোট মমতাকে কে খুঁজে পেয়েছে? সে মনের আলো ছিল দিন, অন্ধকার ছিল রাত্রি,—অঙ্গনে বিছানো এক টুকরা রোদ আর তরুতলের ক্ষীণ ছায়ার সন্ধান পাওয়া যেত না। সুপ্রিয়াকে মনে করতে হলে সেই মন নিয়ে হেরম্বকে সহরের ধূলিভরা পথে পথে বেড়াতে হত। আর আজ সুপ্রিয়ার কাছ থেকে পরিবর্ত্তিত, ছোট মমতার ছোট সুখদুঃখে উদ্বেলিত মন নিয়ে এসে সে কি বলে এত সহজে আনন্দের মনের বিচার করে রায় দিচ্ছে?

হেরম্বের অনুশোচনার সীমা রইল না। তাই আনন্দ যখন বললে, তোমার আজ কি হয়েছে, তুমি কিছুই বুঝতে চাইছ না কেন?'—তখন সে বিহ্বলের মত আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারলে না।

আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললে, 'দেখ, তুমি প্রথম যেদিন এলে সে দিন থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। জেগে ঘুমিয়ে আমি যেন স্বপ্ন দেখতাম। সব সময় একটা আশ্চর্য্য সুর শুনছি, নানা রকম রঙীন আলো দেখছি, একটা কিসের ঢেউয়ে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছি—' আনন্দ বিস্ফারিত চোখে হেরম্বের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লে 'বলতে পারছি না যে? আমি যে সব ভুলে গেছি!'

তার ভুলে যাওয়ার অপরাধ যেন হেরম্বের, এমনি তীব্রস্বরে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন ভুলে গেলাম? কেন বলতে পারছি না!'

হেরম্ব অস্ফুট স্বরে বললে, 'ভোলনি আনন্দ। ওসব কথা বলা যায় না।'

কিন্তু আনন্দ একান্ত অবুঝ।—'কেন বলা যাবে না? না বললে তুমি যে কিছু বুঝবে না। সব কি রকম স্পষ্ট ছিল জান? আমার এক এক সময় নিশ্বাস ফেলতে ভয় হত, পাছে সব শেষ হয়ে যায়।'

হেরম্ব কথা বলে না। উত্তেজিত আনন্দও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত হয়।

'আমার আশে-পাশে কি ঘটত ভাল জ্ঞান ছিল না। কলের মত নড়া-চড়া করতাম। তারপর যেদিন থেকে মনে হল আমাদের ভালবাসা মরে যাচ্ছে সেদিন থেকে কি কষ্ট যে পাচ্ছি! আচ্ছা শোন, তোমার কি খুব গরম লাগছে? ঘাম হচ্ছে?'

'না, আজ তো গরম নেই।'

আনন্দ উঠে এসে বললে, 'দেখ, আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমার কি হয়েছে?'

হেরম্ব গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বললে, 'বস। তোমার জ্বর হয়েছে।'

ধীরে ধীরে রাত্রি বেড়ে চলে। আশে-পাশে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। আনন্দকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেবার দুঃসাধ্য প্রয়াস একবার প্রাণপণে করে দেখবার জন্য হেরম্বের ঝিমানো মন মাঝে মাঝে সতেজে সচেতন হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আজ কোথায় সেই উদ্ধত উৎসাহ, অদম্য প্রাণশক্তি! চিন্তা কষ্টকর, জিহ্বা আড়ষ্ট, কথা সীসার মত ভারী। মুখ গুঁজে সর্ব্বনাশকে বরণ করা ছাড়া আর যেন উপায় নেই। স্বর্গ চারদিকে ভেঙ্গে পড়ুক। মোহে অন্ধ রক্তমাংসের মানুষের অমৃতের পুত্র হবার স্পর্দ্ধা ধূলায় লুটিয়ে যাক।

প্রেম? মানুষের নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম্ম? সে সৃষ্টি করেছে। এবার যে পারে বাঁচিয়ে রাখুক। তার আর ক্ষমতা নেই।

আনন্দ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেছিল, 'তুমিও আমায় ভাসিয়ে দিলে?

হেরম্ব শ্রান্তস্বরে বলেছিল, 'কাল সব ঠিক হয়ে যাবে, আনন্দ।'

এ স্পষ্ট প্রতারণা। কিন্তু উপায় কি?

আজ রান্না হয় নি। কিন্তু সেজন্য হেরম্বের আহারের কোন ত্রুটি হল না। ফল, দুধ এবং বাসি মিষ্টির অভাব আশ্রমে কখনো হয় না, ভাতের চেয়ে এ সব আহার্য্যের মর্য্যাদাই এখানে বেশী, মালতীর স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে। আনন্দ প্রথমে কিছু খেতে চাইলে না। কিন্তু হেরম্ব তার ক্ষুধার সঙ্গে তার মানসিক বিপর্য্যয়ের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করায় রাগ করে একরাশ খাবার নিয়ে সে খেতে বসল।

হেরম্ব বললে, 'সব খাবে?'

'খাব।'

'তোমার সুমতি দেখে খুসী হলাম, আনন্দ।'

সে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বোজা মাত্র আনন্দ সব খাবার নিয়ে বাইরে ফেলে মুখ হাত ধুয়ে এল। হেরম্বের বালিশের পাশে এলাচ লবঙ্গ ছিল, একটি এলাচ ভেঙ্গে অর্দ্ধেক দানা সে হেরম্বের মুখে গুঁজে দিল। বাকীগুলি নিজের মুখে দিয়ে বললে, 'আমি শুতে যাই?'

হেরম্ব চোখ মেলে বললে, 'যাও'।

যেতে চাওয়া এবং যেতে বলা তাদের আজ উচ্চারিত শব্দ-গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

হেরম্ব ভেবেছিল আজ বুঝি তার সহজে ঘুম আসবে। দেহ-মনের শিথিল অবসন্নতা অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর তন্দ্রায় ডুবে যাবে। কিন্তু কোথায় ঘুম? কোথায় এই সকাতর জাগরণের অবসান? ঘরের কমানো আলোর মত স্তিমিত চেতনা একভাবে বজায় থেকে যায়, বাড়েও না কমেও না। হেরম্ব উঠে বাইরে গেল। মালতী আজ তার নিজের ঘর ছেড়ে অনাথের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, মালতীর ঘরে শিকল তোলা। আনন্দই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় এ ঘরে একটি প্রদীপ জেলে দিয়েছিল, জানালা দিয়ে হেরম্ব দেখতে পেলে তেল নিঃশেষ হয়ে প্রদীপের বুকে দপ দপ করে সলতে পুড়ছে। নিজের ঘর থেকে লণ্ঠন এনে হেরম্ব চোরের মত শিকল খুলে মালতীর ঘরে ঢুকল। আলমারিতে মালতীর কারণের ভাণ্ডার, সবই সে প্রায় অনাথের ঘরে সঙ্গে নিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে কাশীর একটি কাজকরা ছোট কালো রঙের মাটির পাত্রে হেরম্ব অল্প একটু কারণ পেল। তাই সে একনিঃশ্বাসে পান করে আবার চুপি চুপি ঘরের শিকল তুলে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু মালতীর কারণে নেশা আছে, নিদ্রা নেই। হেরম্বের অবসাদ একটু কমল, ঘুম এল না। বিছানায় বসে জানালা দিয়া সে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় শোনা গেল মালতীর ডাক। হেরম্ব এবং আনন্দ দুজনের নাম ধরে সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে।

দুজনে তারা প্রায় একসঙ্গেই মালতীর ঘরে গেল। অনাথের প্রায়-আসবাবশূন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানা মালতী একবেলাতেই নোংরা করে ফেলেছে। সমস্ত মেঝেতে কাদামাখা পায়ের শুকনো ছাপ, এককোণে অভুক্ত আহার্য্য, এখানে ওখানে ফলের খোসা ও আমের আঁটি। একটি মাটির পাত্র ভেঙ্গে কারণের স্রোত নর্দ্দমা পর্য্যন্ত গিয়েছিল, এখনো সেখানে খানিকটা জমা হয়ে আছে। ঘরে তীব্র গন্ধ।

কিন্তু মালতীকে দেখেই বোঝা গেল বেশী কারণ সে খায় নি। তার দৃষ্টি অনেকটা স্বাভাবিক, কথাও স্পষ্ট।

মালতী বললে, একা একা তার ভয় করছে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলে, 'কিসের ভয়?'

মালতী বললে, 'তা জানিনে হেরম্ব, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছিল। তোমরা এ ঘরে শোও।'

হেরম্ব অবাক হয়ে বললে, 'তার মানে?'

মালতী বললে, 'মানে আবার কি, মানে? বলছি আমার ভয় করছে, একা থাকতে পারব না, আবার মানে কিসের? ঝাঁটা এনে ঘরটা একটু ঝাঁট দিয়ে বিছানা পাত আনন্দ।'

হেরম্ব বললে, 'আনন্দ আপনার কাছে থাক, আমার থাকবার দরকার নেই।'

মালতী বললে, 'না বাপু না, আনন্দ থাকলে হবে না। ও ছেলেমানুষ, আমার ভয় করবে।'

হেরম্ব আনন্দের মুখের দিকে তাকালে। আনন্দের নির্ব্বিকার মুখ থেকে কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। হেরম্ব বললে, 'তা'হলে সবাই মিলে অন্য ঘরে চলুন। এ ঘরে শোয়া যাবে না।'

মালতী রেগে বললে, 'তুমি বড় বাজে বক, হেরম্ব। বাহাদুরি

না করে যা বলছি তাই কর দিকি। যা আনন্দ, ঝাঁটা নিয়ে আয়।'

ঝাঁটা এনে আনন্দ ঘর ঝাঁট দিলে। মালতীর নির্দ্দেশ মত মন্দিরের দিকের জানালা ঘেঁষে হেরম্বের বিছানা হল। মার অবাধ্য হয়ে মালতীর বিছানা থেকে যতটা পারে দূরে সরিয়ে শুধু একটি মাদুর পেতে আনন্দ নিজের বিছানা করলে। মালতীর অনুযোগের জবাবে রুক্ষস্বরে বললে, 'আমি কারো কাছে শুতে পারি নে।'

যে যার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মালতী বললে, 'সজাগ থেকে ঘুমিও হেরম্ব, ডাকলে যেন সাড়া পাই।'

হেরম্ব বললে, 'সজাগও থাকব, ডাকলে সাড়াও পাবেন, এ রকম ঘুম ঘুমোব কি করে? তার চেয়ে আমি উঠে বসে থাকি।'

মালতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ইয়ার্কি দিও না হেরম্ব। আমার এদিকে মাথার ঠিক নেই, উনি ঠাট্টা করছেন!'

সজাগ হেরম্ব বিনা চেষ্টাতেই হয়ে রইল। দুটি নারীকে এভাবে পাহারা দিয়ে ঘুমানোর চেয়ে জেগে থাকাই সহজ।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। আনন্দ নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়েছে, লণ্ঠনের আলো দেয়ালে তার যে ছায়া ফেলেছে তাকে মানুষের ছায়া বলে চেনা যায় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরে কে ঘুমিয়েছে কে জেগে আছে টের পাওয়া যায় না।

মালতী আস্তে আস্তে হেরম্বের সাড়া নেয়।

'হেরম্ব?'

'ভয় নেই। জেগেই আছি।'

'আচ্ছা, বল দিকি একটা কথা। একটা মানুষকে খুঁজে বার করতে হলে কি করা উচিত?'

'খুঁজতে বার হওয়া উচিত।'

'যাবে হেরম্ব? কদিন দেখ না একটু খোঁজ-টোজ করে। খরচ যা লাগে আমি দেব।'

হেরম্ব নির্ম্মম হয়ে বললে, 'মাষ্টার মশায় কি ছোট ছেলে যে খুঁজে পেলে ধরে আনা যাবে? আপনি তো চেনেন তাঁকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো যায়?'

মালতী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

'হেরম্ব?'

'অ্যাঁ?'

'আচ্ছা, এরকম তো হতে পারে চলে গিয়ে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়েছে, লজ্জায় আসতে পারছে না? ক্ষ্যাপা মানুষ, ঝোঁকের মাথায় চলে গিয়ে হয় ত আপশোষ করছে হেরম্ব। কেউ গিয়ে ডাকলেই আসবে।'

হেরম্ব এবারও নির্ম্মম হয়ে বললে, 'এমনি যদিও বা আসেন, খোঁজাখুঁজি করে বিরক্ত করলে একেবারেই আসবেন না।'

মালতীর কণ্ঠে হেরম্ব কান্নার আভাস পেলে।

'তোমার মুখে পোকা পড়ুক হেরম্ব, পোকা পড়ুক। তুমিই শনি হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকেছ। তুমি যেই এলে ওমনি একটা লোক গৃহত্যাগী হল। কই আগে ত যায় নি।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আনন্দ মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোও না, মা।

মালতী তাকে ধমক দিয়ে বলে, 'তুই জেগে আছিস? আমাদের পরামর্শ শুনছিস?'

'তোমাদের পরামর্শের চোটেই যে ঘুম আসছে না।'

আনন্দের এ-কথার জবাবে স্বাভাবিক কড়া কথার বদলে মালতী হঠাৎ মিনতির সুরে যা বলল শুনে হেরম্বের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'আনন্দ, আয় না মা, আমার কাছে এসে একটু শো। আয়।'

হেরম্ব আরও বিস্মিত হল আনন্দের নিষ্ঠুরতায়।

'রাত দুপুরে পাগলামি না করে ঘুমোও তো।'

হেরম্বের অভিজ্ঞতায় মালতী আজ প্রথম ধমক খেয়ে চুপ করে রইল। এতক্ষণে হেরম্বের মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। এ আশ্রম অভিশপ্ত, মালতীর যুগব্যাপী অন্ধ অতৃপ্ত ক্ষুধায় এখানকার বাতাসও বিষাক্ত হয়ে আছে। গভীর নিশীথে এখানে মালতীর সঙ্গে একঘরে জেগে থাকলে দুদিনে মানুষ পাগল হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মালতী ডাকলে, 'আনন্দ, ঘুমলি?' আনন্দ সাড়া দিলে না।

মালতী উঠে বসল।

'হেরম্ব?'

'জেগেই আছি।'

'আমার বুকে আগুন জ্বলছে হেরম্ব। আমি এখানে নিশ্বাস নিতে পারছি না। দম আটকে আটকে আসছে।'

'একটু ধৈর্য্য না ধরলে—'

মালতী বাধা দিয়ে বললে, 'কিছু বল না হেরম্ব। একবার ওঠ দিকি। শব্দ কর না বাপু, মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিও না।'

মালতী উঠে দাঁড়াল। আনন্দের কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। হেরম্ব উঠে এলে ফিস ফিস করে বললে, 'দেখ, মুখ ঢেকে ঘুমিয়েছে। ওকে না জাগিয়ে মুখ থেকে কাপড়টা সরাতে পার হেরম্ব? একবার মুখখানা দেখি।'

হেরম্ব সন্তর্পণে আনন্দের মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিল। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের মুখ দেখে হাত দিয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে মালতী চুমো খেল। তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

থামল সে একেবারে বাড়ীর বাইরে বাগানে। হেরম্ব নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করেছে, কোন প্রশ্ন করে নি।

মালতী আঁচল থেকে চাবি খুলে হেরম্বের হাতে দিলে।

'আমি চললাম হেরম্ব।'

হেরম্ব শান্তকণ্ঠে বললে, 'চলুন, আমি যাচ্ছি।'

মালতী বললে, 'তুমিও ক্ষেপলে নাকি? আনন্দ একা রইল, তুমিও যাচ্ছ! আনন্দের চেয়ে আমার জন্যই তোমার মায়া উথলে উঠল নাকি?'

হেরম্ব বললে, 'আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব আছে। রাতদুপুরে আপনাকে আমি একা যেতে দিতে পারি না।'

মালতী বললে, 'পাগলামি কর না হেরম্ব। প্রথম বয়সে একবার রাতদুপুরে ঘর ছেড়েছিলাম, মা বাবা ভাই বোন কেউ ঠেকাতে পারে নি। পোড় খেয়ে খেয়ে এখন তো পেকে গেছি, তুমি আমাকে আটকাবে? শুধু যে নিজের জ্বালায় চলে যাচ্ছি তা ভেব না হেরম্ব। আমার মত মা কাছে থাকলে আনন্দ শান্তি পাবে না। আমি মদ খাই, আমার মাথা খারাপ, আমার স্বভাব বড় মন্দ হেরম্ব। তোমার মাষ্টার মশায় আমাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে ছুটে চলেছে। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ডাক শোনা যায়।

'আনন্দকে দেখ হেরম্ব। তোমার মাষ্টার মশায়ের হাতে আমার যে দুর্দ্দশা হয়েছে ওর যেন সে রকম না হয়। টাকা পয়সা যা রোজগার করেছি সব রেখে গেলাম। আমার ঘরে যে কাঠের সিন্দুক আছে, তাতে সোনার গয়না আর রূপার বাসন-কোসন আছে। সবচেয়ে বড় চাবিটা সিন্দুকের তালার। মন্দিরে ঠাকুরের আসনের পিছনে একটা ঘটিতে সতেরোটা মোহর আছে, ঘরে নিয়ে রেখ। এখানে বেশী দেরী না করে তোমরা কলকাতায় চলে যেও। ঠাকুরের জন্য ভেব না, আমি পূজার ব্যবস্থা করব।'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

মালতী বললে, 'আনন্দকে বল আমি তার বাবাকে খুঁজতে গেছি। আর তোমার মাষ্টার মশায় যদি কোন দিন ফেরে, তাকে বল আমি গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে আছি, দেখা করতে গেলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

মালতী হাঁটতে আরম্ভ করলে। বাগানের গেটের কাছে গিয়ে মালতী বললে, 'তুমি ঘরে যাও হেরম্ব। আর শোন হেরম্ব, আনন্দকে তুমি বিয়ে করবে তো?'

'করব।'

'কর, তাতে দোষ নেই। আনন্দ জন্মাবার আগেই আমাদের বৈরিগী মতে বিয়ে হয়েছিল হেরম্ব—সাক্ষী আছে। একদিন কেমন খেয়াল হল, দশ জন বৈষ্ণব ডেকে অনুষ্ঠানটা করে ফেললাম। আনন্দকে তুমি যদি সমাজে দশজনের মধ্যে তুলে নিতে পার হেরম্ব—' অন্ধকারে মালতী ব্যাকুল দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করলে, 'ভদ্রলোকের সংসর্গই আলাদা।'

হেরম্ব মৃদুস্বরে বললে, 'তাই নেব মালতী বৌদি।'

রাস্তায় নেমে মালতী সহরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলে।

ঘরে ফিরে গিয়ে হেরম্ব দেখলে, আনন্দ বিছানায় উঠে বসে আছে।

হেরম্বও বসলে।

'তোমার মা মাষ্টার মশায়কে খুঁজতে গেছেন আনন্দ।'

আনন্দ বললে, 'জানি।'

'তুমি জেগে ছিলে নাকি?'

'এ বাড়ীতে মানুষ ঘুমতে পারে? এ ত' পাগলা-গারদ।'

আনন্দের কথার সুরে হেরম্ব বিস্মিত হল। সে ভেবেছিল মালতী চলে গেছে শুনলে আনন্দ একটু কাঁদবে। মালতীকে এত রাত্রে এভাবে চলে যেতে দেওয়ার জন্য তাকে সহজে ক্ষমা করবে না। কিন্তু আনন্দের চোখে সে জলের আভাসটুকু দেখতে পেলে না। বরং মনে হল, কোমল উপাদানে মাথা রেখে ওর যে দুটি চোখের এখন নিদ্রায় নিমীলিত হয়ে থাকার কথা, তাতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দিয়েছে।

হেরম্ব বললে, 'আমি আটকাবার কত চেষ্টা করলাম, সঙ্গে যেতে চাইলাম—'

'কেন ভোলাচ্ছ আমাকে? আমি সব জানি। আমিও উঠে গিয়েছিলাম।'

হেরম্ব আনন্দের দিকে তাকাতে পারলে না। আনন্দকে একটু মমতা জানাবার সাধও সে চেপে গেল। সে বড় বেমানান হবে। কাল হয়ত সে আনন্দের চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে, আনন্দের চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবে, আনন্দের বিবর্ণ কপোলে দিতে পারবে সস্নেহ চুম্বন। আজ স্নেহের চেয়ে, সহানুভূতির চেয়ে বেখাপ্পা কিছু নেই। যতক্ষণ পারা যায় এমনি চুপচাপ বসে থেকে, বাকী রাতটুকু আজ তাদের ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে। আজ রাত্রি প্রভাত হলে সে আর একটা দিনও এই অভিশপ্ত গৃহের বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাস করবে না। আনন্দের হাত ধরে যেখানে খুসী চলে যাবে।

আনন্দ কথা বললে।

'আমি কি ভাবছি জান?'

'কি ভাবছ আনন্দ?'

'ভাবছি, আমারও যদি একদিন মার মত দশা হয়।'

হেরম্ব সভয়ে বললে, 'ওসব ভেব না আনন্দ।'

আনন্দ তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লে। রুদ্ধ উত্তেজনায় তার দুচোখ জল জল করছে, তার পাণ্ডুর কপোলে অকস্মাৎ অতিরিক্ত রক্ত এসে সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

'মানুষের ভাগ্যে আমার আর বিশ্বাস নেই। তোমার সঙ্গে আমার কদিনের পরিচয়, এর মধ্যে আমার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দুদিন পরে কি হবে!'

'শান্তি ফিরে আসবে আনন্দ।'

আনন্দ বিশ্বাস করলে না, 'আসবে কিন্তু টিঁকবে কিনা কে জানে! হয়ত আমিও একদিন তোমার দুচোখের বিষ হয়ে দাঁড়াব। প্রথম দিন তুমি আর আমি কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম, স্বর্গের কিনারায়। আজ কোথায় নেমে এসেছি!'

'আমরা নামিনি আনন্দ, সবাই মিলে আমাদের টেনে নামিয়েছে। আমরা আবার উঠব। লোকালয়ের বাইরে আমরা ঘর বাঁধব, কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।'

আনন্দ বললে, 'বিরক্ত আমরা নিজেদের নিজেরাই করব। আমরা মানুষ যে!'

আনন্দ কি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে? স্বপ্ন ক্ষুণ্ণ হবার অপরাধে মানুষকে কি সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলে? জেনে নিলে, বৃহত্তর জীবনে মানুষের অধিকার নেই? বিগত-যৌবন প্রেমিকের কাছে প্রতারিত হয়ে তাই যদি আনন্দ জেনে থাকে, তবে তার অপরাধ নেই, কিন্তু এই সাংঘাতিক জ্ঞান বহন করে সে দিন কাটাবে কি করে? হেরম্বের বুক হিম হয়ে আসে—কোথায় সেই প্রেম? পূর্ণিমা তিথির এক সন্ধ্যায় সে যা সৃষ্টি করেছিল? আজ রাত্রিটুকুর জন্য অপার্থিব চেতনা যদি সে ফিরে পেত! হয়ত কোন এক আগামী সন্ধ্যায় সেই পূর্ণিমার সন্ধ্যাকে সে ফিরে পাবে। আজ সে আনন্দকে সান্ত্বনা দেবে কি দিয়ে?

হেরম্বের মুখের দিকে খানিকক্ষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আনন্দ চোখ বুজলে।

'ঘুমবে?'

আনন্দ বললে, 'না।'

হেরম্ব বললে, 'না যদি ঘুমও আনন্দ, তবে আমাকে নাচ দেখাও। তোমার নাচের মধ্যে আমাদের পুনর্জ্জন্ম হক।'

আনন্দ চোখ মেলে বললে, 'নাচব?'

চোখের পলকে রক্তের আবির্ভাবে আনন্দের মুখের বিবর্ণতা ঘুচে গেছে। হেরম্ব তা লক্ষ্য করলে। তার বুকেও ক্ষীণ একটা উৎসাহের সাড়া উঠল।

'তাই কর আনন্দ, নাচ। আমরা একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছি, না? আমাদের জড়তা কেটে যাক।'

আনন্দ উঠে দাঁড়ালে। বললে, 'তাই ভাল। নাচই ভাল। উঃ, ভাগ্যে তুমি বললে! নাচতে পেলে আমার মনের সব ময়লা কেটে যাবে, সব কষ্ট দূর হবে।'

আনন্দ টান দিয়ে আলগা খোঁপা খুলে ফেললে।—'চল উঠোনে যাই। আজ তোমাকে এমন নাচ দেখাব তুমি যা জীবনে কখনো দেখনি। দেখ, তোমার রক্ত টগবগ করে ফুটবে। এই দেখ, আমার পা চঞ্চল হয়ে উঠেছে!'

আনন্দের এই সংক্রামক উন্মাদনা আনন্দের নৃত্যাপিপাসু চরণের মত হেরম্বের বুকের রক্ত চঞ্চল করে দিলে। শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে তারা খোলা উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালে। সকালে ঝড়বৃষ্টির পর যে রোদ উঠেছিল তাতে উঠোন শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু উঠোনভরা বর্ষাকালের বড় বড় তৃণের স্পর্শ সিক্ত ও শীতল। আনন্দের নাচের জন্যই যেন নিশীথ আকাশের নীচে এই সরস কোমল গালিচা বিছানো আছে।

'কি নাচ নাচবে আনন্দ? চন্দ্রকলা?'

'দূর! সে তো পূর্ণিমার নাচ। আজ অন্য নাচ নাচব।'

'নাচের নাম নেই?'

'আছে বৈ কি। পরীনৃত্য। আকাশের পরীরা এই নাচ নাচে। কিন্তু আলো চাই যে?'

'আলো জ্বালছি আনন্দ।'

ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করে হেরম্ব তিনটি লণ্ঠন আর একটি ডিবরি নিয়ে এল। আলোগুলি জেলে সে ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিলে।

আনন্দ বললে, 'এ আলোতে হবে না। আরো আলো চাই। তুমি এক কাজ কর, রান্নাঘরে কাঠ আছে, কাঠ এনে একটা ধুনি জেলে দাও।'

'ধুনি আনন্দ?'

আনন্দ অধীর হয়ে বললে, 'কেন দেরী করছ? কথা কইতে আমার ভাল লাগছে না। ঝোঁক চলে গেলে কি করে নাচব?'

আনন্দ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল। তার মুখ দেখে হেরম্বের একটু ভয় হল। কদিন থেকে যে বিষণ্ণতা আনন্দের মুখে আশ্রয় করেছিল তার চিহ্নও নেই, প্রাণের ও পুলকের উচ্ছ্বাস তার চোখ মুখ ফুটে বার হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আনন্দকে দেখবার সাহস হেরম্বের হল না। রান্নাঘর থেকে সে এক বোঝা কাঠ নিয়ে এল।

আনন্দ বললে, 'আরো আনো, যত আছে সব।'

'আর কি হবে?'

'নিয়ে এস, আরো লাগবে। যত আলো হবে নাচ তত জমবে যে। পরী কি অন্ধকারে নাচে?'

রান্নাঘরে যত কাঠ ছিল বয়ে এনে হেরম্ব উঠোনে জমা করলে। আনন্দের মুখে আজ মিনতি নেই, অনুরোধ নেই, সে আদেশ দিচ্ছে। মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেও প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হেরম্ব দমন করলে। আনন্দ যা বললে নীরবে সে তাই পালন করে গেল। মালতীর ঘর থেকে এক টিন ঘি এনে কাঠের স্তূপে ঢেলে দিয়ে সে চুপ করে থাকতে পারলে না।

'ভয়ানক আগুন হবে, আনন্দ।'

আনন্দ সংক্ষেপে বললে, 'হোক।'

'বাড়ীতে আগুন লেগেছে ভেবে লোক হয়ত ছুটে আসবে।'

'এদিকে লোক কোথায়? আর আসে তো আসবে। দাও এবার জ্বেলে দাও।'

আগুন ধরিয়ে হেরম্ব আনন্দের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট যজ্ঞানলের মত ঘৃতসিক্ত কাঠের স্তূপ হু হু করে জ্বলে উঠল। সমস্ত উঠোন সোনালি আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'এই না হলে আলো!'

ওদিকের প্রাচীর, এদিকের বাড়ী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ঘি-পোড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে কতদূরে গিয়ে পৌছল কেউ জানে না। হেরম্ব আনন্দের একটা হাত চেপে ধরলে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আনন্দ বললে, 'তুমি সিঁড়িতে বসে নাচ দেখ। আমায় ডেক না, আমার সঙ্গে কথা বল না।'

হেরম্ব সিঁড়িতে গিয়ে বসলে। আনন্দ আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হেরম্বের মনে হল আগুনের সে এত কাছে দাঁড়িয়েছে যে, তার চোখের সামনে সে বুঝি ঝলসে পুড়ে যাবে। কিন্তু নৃত্যের বিপুল আয়োজন, আনন্দের উন্মত্ত

উল্লাস তাকে মূক করে দিয়েছে। আগুনের তাপে আনন্দের কষ্ট হচ্ছে বুঝেও সে কাঠের পুতুলের মত বসে রইল।

খানিকক্ষণ আগুনের সান্নিধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে কাপড়জামা খুলে আনন্দ অর্ঘ্যের মত আগুনে সমর্পণ করে দিলে। তার গলায় সোনার হারে তাবিজ ছিল, বাহুতে তুলসীর মালা ছিল, হাতে ছিল সোনার চুড়ি। একে একে খুলে তাও সে আগুনে ফেলে দিলে। নিরাবরণ ও নিরাভরণ হয়ে সে যে কি নৃত্য আজ দেখাবে হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারলে না।

আনন্দ ধীরে ধীরে আগুনকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করলে। অতি মৃদু তার গতি, কিন্তু চোখের পলকে ছন্দ চোখে পড়ে। এইও সেই চন্দ্রকলা নাচেরই ছন্দ। সে নাচে তিল তিল করে আনন্দের দেহে জীবনের সঞ্চার হয়েছিল, আজ তেমনি ক্রমপদ্ধতিতে সে গতি সঞ্চয় করছে। গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলা-চাঞ্চল্যের সমন্বয়, যার জন্ম চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় সমগ্র নৃত্যের রূপ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। প্রথমে আনন্দের দুটি হাত দেহের সঙ্গে মিশে ছিল, হাত দুটি যখন আগুনের কম্পিত আলোয় তরঙ্গ তুলে তুলে দুই দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল, তখন আনন্দের পরিক্রমা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। এখন যে তার নৃত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই নৃত্যকে যে না চেনে তারও তা বোঝা কঠিন নয়। হেরম্ব বড় আরাম বোধ করলে। তার অশান্তি ও উদ্বেগ, শ্রান্তি ও জড়তা মিলিয়ে গিয়ে পরিতৃপ্তিতে সে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আনন্দের প্রথম নৃত্যের শেষে মন্দিরের সামনে সে প্রথম যে অলৌকিক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিল, আবার তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় হেরম্বের দেহ হাল্কা, মন প্রশান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এবারও আনন্দের নাচ হঠাৎ থেমে গেল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর টলে পড়ে গেল। হেরম্ব যখন তাকে তুলে সরিয়ে আনল আগুনের তাপে তার চুল অল্প অল্প ঝলসে গিয়েছে। আনন্দ আর্তনাদ করে উঠল, 'জ্বলে গেলাম, ছেড়ে দাও আমাকে।'

সবলে হেরম্বের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। বাগানেও সে দাঁড়াল না। বাগানের সামনের রাস্তা অতিক্রম করে খোলা মাঠের উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল।

হেরম্ব ছুটতে ছুটতে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ আনন্দ?'

আনন্দ ছুটতে ছুটতে জবাব দিলে, 'আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে, সমুদ্রে স্নান করব।'

'ফিরে এস আনন্দ। পুকুরে স্নান করবে। ঘরের মেঝেতে জল ঢেলে তোমার জন্যে আমি পুকুর তৈরী করে দেব। ফিরে এস।'

আনন্দ দাঁড়াল না।—'আমি সমুদ্রেই স্নান করব।'

'দাঁড়াও, আমিও আসছি আনন্দ। অত জোরে ছুট না।'

কিন্তু আনন্দ সাড়াও দিল না, দাঁড়ালও না।

হেরম্ব অক্ষম। সব দিক দিয়ে অক্ষম। দৌড়ের প্রতিযোগিতাতেও আনন্দ যে তাকে হার মানাবে তা কে জানত? হেরম্বের অনেক আগে নিজের হাল্কা শরীর নিয়ে আনন্দ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে। সমুদ্র তেমনি কলরব করছে। সমুদ্রের ঢেউ তেমনি ভাবে তীরে আছড়ে পড়ছে। বিকালে সুপ্রিয়ার কাছে বসে হেরম্ব যেমন কলরব শুনেছিল, যেমন ঢেউ দেখেছিল।

ব্রেকার পার হয়ে যেখানে ঢেউ শুধু দোলায়, সেইখানে হেরম্ব আনন্দের নাগাল পেল।

'এমন করে পালিয়ে আসে? চল আনন্দ, এবার ফিরে যাই।'

'তুমি ফিরে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। কেন বিরক্ত করতে এলে?'

হেরম্ব আনন্দকে ধরবার চেষ্টা করল। আনন্দ ডুব দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যে আবার ভেসে উঠল অন্ধকার উত্তাল সমুদ্রের বুকে হেরম্ব আর সন্ধান করে উঠতে পারল না। (সমাপ্ত)

———

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৪৮]

অন্যান্য চৈতন্য-জীবনীকাব্য হইতে জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে র[১] কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। জয়ানন্দের কাব্য বিশেষ করিয়া জনসাধারণের রুচির উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছিল ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কারণেই শিক্ষিত, ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট কাব্যটি কোন আদর না পাওয়ায় লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাপর চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে কেবল লোচনের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে র সহিত জয়ানন্দের কাব্যের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় কাব্যেই কোন পরিচ্ছেদ-বিভাগ নাই, উভয় কাব্যেরই মঙ্গলাচরণে দেবদেবীর বন্দনা আছে, এবং উভয় কাব্যই একান্ত ভাবে গান করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছিল। তবে লোচনের কাব্য বিদগ্ধের কৃতি, আর জয়ানন্দের কাব্য অবিদগ্ধের লেখনীপ্রসূত। জয়ানন্দের কাব্যে কোনরূপ বাঁধুনী বা পারিপাট্যের প্রয়াস একেবারেই লক্ষিত হয় না, অথচ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মত কোন ভাবাবেশও দেখা যায় না। এই সব কারণেই জয়ানন্দের কাব্যের প্রসার ও স্থায়ী আদর হয় নাই। জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে র প্রায় সমস্ত পুঁথিই বাঁকুড়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, কাব্যটি বিশেষ করিয়া বাঁকুড়া অঞ্চলেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

জয়ানন্দের কাব্য নয়টি খণ্ডে বিভক্ত ; আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। ইহাতে এই রাগরাগিণীগুলির উল্লেখ আছে ; পঠমঞ্জরী, শ্রী, করুণাশ্রী, পাহিড়া, ধানশী, মায়ুর ধানশী, সুহই, সুহই সিন্ধুড়া, সিন্ধুড়া, কামোদ, মঙ্গল, মঙ্গল গুজ্জরী, গুজ্জরী, বরাড়ী, বিভাস, ভাটিয়ারী, কেদার, মল্লার, মারহাটি, বেলোয়ার এবং তুড়ী।

জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে শ্রীচৈতন্যের চরিতকথা যেন অনেকটা অসংলগ্ন ও বিপর্যস্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নবদ্বীপ-লীলার বর্ণনায় তবু কিছু সঙ্গতি আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ণনায় ধারাবাহিকতার ও সঙ্গতির বড়ই অভাব। তাহা ছাড়া এই অংশের মধ্যে ধ্রুবচরিত্র, জড়ভরতের আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নচরিত, অজামীলের উপাখ্যান ইত্যাদি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দের কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথির অপেক্ষা এই পৌরাণিক কাহিনীঘটিত খণ্ডাংশগুলি অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে, কাব্যটির মূলীভূত বিষয়বস্তু অপেক্ষা এই পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনাগুলির আদর বেশী ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে র ঐতিহাসিকতায় সবিশেষ আস্থাবান। ইঁহারা কিন্তু কেহই জয়ানন্দের উক্তির যথার্থতা বিচার করিয়া দেখেন নাই। যে হেতু ইহাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের উল্লেখ আছে, সেই হেতু ইহার সব উক্তিই তুল্যরূপে যথার্থ, এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা জয়ানন্দের কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অথচ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিষয়ে জয়ানন্দ এমন অনেক কথাই বলিয়াছেন যাহা স্পষ্টতই ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান আলোচনায় জয়ানন্দের তাবৎ ভ্রান্ত উক্তির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া দুই চারিটি মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

অদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতা শচীদেবীর মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ জয়ানন্দ বলিতেছেন :—

আই ঠাকুরাণী বন্দো চৈতন্যের মাতা।
পণ্ডিত গোসাঞি জাঁর দীক্ষামন্ত্রদাতা ॥[২]

শ্রীচৈতন্য চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং তীর্থ-ভ্রমণাদি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চিদধিক তেইশ বৎসর

১। জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩১২ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকটিতে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ আছে : একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

২। পৃঃ ২। এখানে 'আচার্য্য গোসাঞি' পাঠ কল্পনা করিলে কোনই অসঙ্গতি থাকে না, হয়ত মূলে উহাই পাঠ ছিল।

কাল নীলাচলে অবস্থিতি করেন, ইহাও অবিসংবাদিত। জয়ানন্দ কিন্তু বলেন -

চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড শুন এক চিত্তে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সন্ন্যাস যে মতে॥
বয়েস অল্প গৌরচন্দ্র বিংশতি বৎসর। মহা বৈরাগ্য শুদ্ধহেমকলেবর॥১

মহানদী পার হঞা গেলা নীলাচল।
নীলাচলে রহিলা অষ্টবিংশতি বৎসর॥২

গয়াতে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের কদাপি সাক্ষাৎ হয় নাই; শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কিংবা অত্যল্পকাল পরেই মাধবেন্দ্রের তিরোধান ঘটে। জয়ানন্দ এখানে ঈশ্বর পুরী এবং তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

গুরু বর্ণ মুনীন্দ্র হইল কল্প সাধি।
গৌরাঙ্গ দেখিয়া মুনীন্দ্রের ভাঙ্গিল সমাধি॥৩
বুঢ়ী বলে আমা উদ্ধারিলা পাদোদকে।
মাধবেন্দ্রপুরী তুমা ষড়্‌ভুজ দেখে॥৬
পাপজ্বর খণ্ডাইল বিপ্রপাদোদকে।
মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরী মঠে ষড়্‌ভুজ দেখে॥৪

সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন, এ বিষয়ে অপর সকল জীবনীকার একমত, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্রও হেতু নাই। অতএব জয়ানন্দের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানতাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুমি আগে রহ গিঞা জগন্নাথ ক্ষেত্রে।
আমি সর্ব্বপরিষদে যাব তোমার পত্রে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীরামদাস সঙ্গে।
পরমেশ্বর সুন্দরানন্দ গেলা নিজ রঙ্গে॥
জগন্নাথের আজ্ঞায় রহিলা সমুদ্রকূলে।
খেনে মণিকোটাএ খেনে জগন্নাথ দেউলে॥৫
বক্রেশ্বর যাইতে পুন নিবর্ত্ত হইল।
দ্বাদশ দিবস শান্তিপুরেতে রহিল॥
নিত্যানন্দ আগে পলাইলা নীলাচলে।
নিভৃতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে॥৬

১। পৃঃ ৮৪। ২। পৃঃ ১৩৭। ৩। পৃঃ ৩৪। ৪। পৃঃ ১৪৬।
৫। পৃঃ। ৯০। ৬। পৃঃ ১৪৮।

[৪৯]

কাব্যের উপক্রমণিকাভাগে জয়ানন্দ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও চৈতন্য-জীবনীকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবি-তালিকাটি একেবারে মূল্যহীন নহে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে। গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দ পুরী গোসাঞী মহাশয়। সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দবিজয়॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। বৃন্দাবনদাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গবিজয়গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীতপ্রবন্ধে। চৈতন্যমঙ্গল তাঁহার চামরবিছন্দে॥
হবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গায় শেষে॥৭

তালিকাটিতে মুরারি গুপ্তের এবং কবিকর্ণপূরের নাম নাই, ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। পরমানন্দ পুরী রচিত শ্লোকপ্রবন্ধে [অর্থাৎ সংস্কৃতে] অথবা পাঁচালীপ্রবন্ধে রচিত কোন গো বি ন্দ বি জ য় গ্রন্থ অথবা পদ ইত্যাদি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। গোপাল বসুর সম্বন্ধেও তাহাই। গৌরীদাস পণ্ডিত এবং পরমানন্দ গুপ্ত রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে। অবশ্য জয়ানন্দের এই সকল উক্তি শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর; এমন হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। জয়ানন্দ বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু চৈ ত ন্য ভা গ ব তে র সহিত তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ছিল, এমন বিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই। শোনা কথার উপর এবং নিজের কল্পনার উপর যে জয়ানন্দ অতিমাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইতেছি।

একদিন নবদ্বীপে শচী ঠাকুরাণী। গদাধর জগদানন্দ কোলে করি আনি॥৮
গদাধর জগদানন্দ গৌরাঙ্গ মন্দিরে। প্রতিদিন গৌরাঙ্গের সঙ্গ সেবা করে॥৮

বৈষ্ণবসমাজে গদাধর শ্রীরাধা এবং রুক্মিণীর আর জগদানন্দ সত্যভামার অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, ইহা

৭। পৃঃ ৩। ৮। পৃঃ ২৭।

হইতেই বোধ হয় উপরি উদ্ধৃত উক্তির উৎপত্তি। জগদানন্দের কথা বলিতে পারি না, গদাধর মহাপ্রভুর সমবয়স্ক ছিলেন।

রাজার শতেক স্ত্রী নাম চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলার দিব্যমালা ॥১

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রবিষয়ে জয়ানন্দের ধারণা অত্যন্ত প্রাকৃতজনোচিত ছিল, নতুবা তিনি চৈতন্য-মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য এমন কাহিনীর অবতারণা করিতেন না।

জয়ানন্দের মতে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য "কাচমণি বেতড়া ডাহিনে থুইয়া" কুলীনগ্রাম হইয়া নীলাচলে পৌঁছিয়াছিলেন। কুলীনগ্রামে তখন হরিদাস ঠাকুর ছিলেন।[২] অথচ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে রহিয়া গেলেন। কুলীনগ্রামে তিনি হঠাৎ আসেন কি করিয়া! স্পষ্টতই জয়ানন্দ এখানে জনপ্রবাদের অনুসরণ করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। বস্তুত মহাপ্রভু যে কুলীনগ্রামে একবার আগমন করিয়াছিলেন এরূপ একটা জনশ্রুতি ছিল। চৈতন্যভাগবতের তথাকথিত অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভুর কুলীনগ্রামে আগমন উপলক্ষ্যে গুণরাজখানের পুত্র মহোৎসব করিয়াছিলেন; অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ে আছে, মহাপ্রভু অনন্ত মিশ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে মহাপ্রভুর কুলীনগ্রাম গমন বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই। আর প্রথমবারে মহাপ্রভু ছত্রভোগপথে নীলাচল গিয়াছিলেন ইহাও সুপ্রসিদ্ধ।

প্রথমবার বৃন্দাবন যাইবার পথে শ্রীচৈতন্য কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিয়া শান্তিপুরে আসেন। এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভু বর্দ্ধমান হইয়া আমাইপুরা গ্রামে কবির পিতৃগৃহে বিশ্রাম করিয়া শান্তিপুরে পৌছান।[৩] কানাই নাটশালা হইতে শান্তিপুর ফিরিবার সোজা রাস্তা হইতেছে গঙ্গাবক্ষ বা গঙ্গাতীরপথ। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীতে সেই পথের কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে কবি কি আত্মমর্য্যাদাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুকে আমাইপুরা ঘুরাইয়া শান্তিপুরে লইয়া গিয়াছেন? আর সম্ভবত এই কারণেই গোবিন্দ দাসের কড়চা-রচয়িতা সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যকে শান্তিপুর হইতে বর্দ্ধমানের পথে নীলাচলে লইয়া গিয়াছেন।

১। পৃঃ ১০৩। ২। পৃঃ ৯৫। ৩। পৃঃ ১৪০।

[৫০]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা আছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন সংবাদও ইহাতে আছে।

পিতামহ জনার্দ্দন মিশ্র মহাশয়। প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয় ॥
দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তার পিতা বিরূপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ ॥
তাঁর পিতা ক্ষীরচন্দ্র সে অভিনব ব্যাস। দিব্য রথে আইলা সভে
দেখিতে সন্ন্যাস ॥৪

চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ
আছিলা জাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পালাঞা গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে ॥৫

সেকালের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন কথা জয়ানন্দের কাব্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বৈদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এবং বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিধান একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। জগাই মাধাই মসনবি আবৃত্তি করিত।

মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে ॥৬

কলিকালের আচারবর্ণনার মধ্যে আছে—

ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে। মোজা পায় নড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥
মসনবি[৭] আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর। ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥৮

[৫১]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কবিত্বের বালাই বড় বেশী কিছু নাই। তবুও প্রকাশভঙ্গি মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর। কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

গলায়ে বাবলা পিঠে পাটের থোপনি। হামাগুড়ি দিঞা বুলে দ্বিজ শিরোমণি।
কুন্দকলিকা দুটি দন্ত উঠিল। পাকা তেলাকুচা যেন অধরে ফুটিল ॥
টাড় মগর হার চরণে মগরা। রাঙা লাঠি সোনার কাঁঠি রূপের পসরা ॥

৪। পৃঃ ৮৭-৮৮। ৫। পৃঃ ৯৬।

৬। পৃঃ ৫৩: মুদ্রিত পুস্তকে প্রথম ছত্রের পাঠ এইরূপ আছে—
মনসরিয়া বৃত্তি করে থাকে নল বনে।

৭। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ 'মনসরি'; ইহা 'মসনবি' হইবে; 'মসনবি' হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে 'মনসবি' হইয়াছে। ৮। পৃঃ ১৩৯।

দেখিঞা মোহনছান্দ চান্দ রহি চাহে। মদন লাখকোটিরূপে মূর্চ্ছা জাএ॥
দেখি মিশ্রপুরন্দর আনমনে নাঞি। থাইতে শুইতে ডাকে বাপুরে নিমাঞি॥
খণে করে করতালি হাসি হাসি নাচে। কাকুর চুম্বন লৈয়া মা বাপেরে জাচে॥
খণে গড়ি দিঞা কান্দে ধূলায় ধূসর। দেখিঞা আনন্দ শচী মিশ্রপুরন্দর॥
মায়ের পরাণধন বাপের গোসাঞি। ঘরের ঠাকুর মোর বাপুরে নিমাঞি॥
নদীয়ার জত লোক তার তুমি আঁথি। এবোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাক্ষী॥১

পতিত পাবন তোমার নামগানি জাগে।
পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে॥২

সম্পদ বিপদ যত সব কর্ম্মফল। আম গাছে নাহি লাগে গানের বাকল॥
এক তরু হৈতে ভিন৩ ফল নাহি ধরে। আন তরু আন ফল ধরিতে না পারে॥
কালসূত্রে বদ্ধ জীব কর্ম্ম করায়ে কালে। অগাধ জলের মৎস্য বন্দী হয়ে জালে॥

... ...

শিশু সব ক্রীড়া করে সতত ধূলায়। খেলা দোলা ভাঙ্গিঞা মন্দিরে চলি জায়॥
পুনরপি সেই শিশু ধূলাক্রীড়া করে। ধূলার মন্দির ভাঙ্গি চলিলা মন্দিরে॥
এই মত কত কত জনম মরণ। অসার্থক যাতায়াত জীবের সাধন॥
সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ যারে কৃপা করে। সে জন কৃষ্ণের হিয়ে কর্ম্মদেহ ধরে॥৪

[৫২]

জয়ানন্দ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা এইরূপ—

জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞি।
পরমভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥৫

শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জন্ম হইল সে দিবসে॥
গুহিআ নাম ছিল মায়ের মড়াছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে॥
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী। জার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥
খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি। মহা পাষণ্ড তবো ধরে মহাশক্তি॥
বাণীনাথ মিশ্র ষট্‌রাত্রি উপবাসে। দুর্ব্বাসা ভারতি বাস জগত প্রকাশে॥
জার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতি। অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥
জেঠা বৈষ্ণব মিশ্র সর্ব্বতীর্থপূত। ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত॥
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ উপাসক। তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভারক॥৬

শ্রীচৈতন্য যখন সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আগমন করেন তখন তিনি সুবুদ্ধি মিশ্রের শিশুপুত্রের 'গুইয়া' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন।

বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সে সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞির পূর্ব্বশিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম॥

তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদনী রান্ধিল তায় লঞা।
রোদনী ভোজন করি চলিলা নদীয়াপুরী
বায়ড়ায় উত্তরিল গিঞা॥৭

উদ্ধৃত অংশের ভাষা দেখিলে মনে হয় ইহাতে যথেষ্ট পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে।

মহাপ্রভুর শাখার মধ্যে এক সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। জয়ানন্দের পিতা ইনিই কিনা বলা যায় না। 'চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব। আনন্দে নদীয়াখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥' ইত্যাদি পুষ্পিকা হইতে মনে হয় যে, জয়ানন্দের পিতা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাভুক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সুবুদ্ধি মিশ্রের সম্বন্ধে 'পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য,'[৮] 'গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য'[৯] বলা হইয়াছে। এখানে 'গোসাঞি' সম্ভবত শ্রীচৈতন্যকে না বুঝাইয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে 'গোসাঞি' অভিধার প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। 'পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য' স্থলে 'পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য' পাঠ কল্পনা করা যাইতে পারে। কবি যে স্বয়ং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন—

বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচারি॥১০
অভিরাম গোসাঞির পাদোদক-প্রসাদে।
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য আশীর্ব্বাদে॥
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হইল চৈতন্যমঙ্গলে॥১১

কবি এক স্থলে নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলিয়াছেন।[১২] ইনিই জয়ানন্দের দীক্ষাগুরু ছিলেন?

জয়ানন্দ বীরভদ্র গোস্বামীর প্রসাদমালা পাইয়াছিলেন। তখন বীরভদ্র গোস্বামীর সন্তানসন্ততি হইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥১৩

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতকের শেষ পাদের কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

১। পৃঃ ১৪-১৫। ২। পৃঃ ৫৭-৫৮। ৩। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ 'ভিন'। ৪। পৃঃ ৬০। ৫। পৃঃ ৩। ৬। পৃঃ ৮৪।

৭। পৃঃ ১৪০। ৮। পৃঃ ৩। ৯। পৃঃ ১৪০। ১০। পৃঃ ৩। ১১। পৃঃ ৮৪। ১২। পৃঃ ৮৯। ১৩। পৃঃ ১৫১

[৫৩]

গো বি ন্দ দা সে র ক র চা নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েক বর্ষের একখানি প্রামাণ্য জীবনী বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থকে। শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতবংশাবতংস জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থটি সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ প্রকাশিত করেন।[১] হইবামাত্রই গ্রন্থটি লইয়া বৈষ্ণব ও পুরাতন বাঙ্গালাসাহিত্যরসিকদিগের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই মতভেদ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এক পক্ষ বলেন যে, গ্রন্থখানি যথার্থই মহাপ্রভুর অনুচর গোবিন্দ কর্ম্মকারের লেখা, অপর পক্ষ বলেন বইখানি জাল, অর্থাৎ মহাপ্রভুর কোন অনুচরের লেখা নহে।

পূর্ব্বপক্ষ স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন যে, জয়গোপাল গোস্বামী পুস্তকটিতে সম্পাদক হিসাবে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, গ্রন্থটির প্রথম অংশ (পৃঃ ২২ পর্য্যন্ত) সম্পাদনকালে মূল পুঁথির অনুলিপি হারাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এই অংশে তাঁহার হস্তক্ষেপ কিছু গাঢ়তর।[২] কিন্তু একটা কথা এখানে জিজ্ঞাস্য আছে। গোস্বামী মহাশয় যদি "অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন," তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে কীটদষ্ট ছত্রাংশ রাখিয়া দিয়াছেন কেন?[৩] এই ছত্রাংশগুলিকে তো সহজেই পূরণ করা যাইত!

গো বি ন্দ দা সে র ক র চা র ভাষা বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শুধুই যে কতকগুলি কীটদষ্ট ছত্র পূরণ এবং দুই একটি প্রাচীন শব্দে অদল-বদল হইয়াছে তাহা নহে, গ্রন্থটির ভাষা (অবশ্য গ্রন্থটি যদি সত্য সত্যই প্রাচীন হয়) এরূপ আমূল ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, উহার মধ্যে প্রাচীনত্ব বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে তথাকথিত "প্রাচীনত্বের" যে চেষ্টা আছে তাহা যাঁহারা পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই ধরিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি— পেখিয়া (পৃঃ ৩), পোকুর (পৃঃ ৭), লহি (পৃঃ ৩০), মুহি, পিয়ে পিয়ে খাই পানা (পৃঃ ৩২) ইত্যাদি।

ভাষার আধুনিকত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপক উদাহরণ দিতেছি। এগুলি যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে।

একই জেলের মুখে পরিচয় পাইয়া।
একে একে সকলেরে লইনু চিনিয়া ॥ [পৃঃ ৩] ॥
অধমের নামটি গোবিন্দদাস হয়। [পৃঃ ৪] ॥
প্রভুর বিয়োগ উহু কেমনে সহিব ॥ [পৃঃ ৬] ॥
বৈষ্ণবগণের আচা উড়িল পরাণী ॥ [ঐ] ॥
কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া।
থাকিতে পারি না আর কাঁপে মোর হিয়া ॥ [পৃঃ ৮] ॥
এমন কেশের শোভা দেখিনি নয়নে ॥ [পৃঃ ১১] ॥
নারীগণ বলে নাপিত একাজ করো না।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না ॥ [ঐ] ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিকারী ॥ [পৃ ২৬] ॥
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত। [পৃঃ ৩০] ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁশি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে ॥ [পৃঃ ৩৪] ॥
মায়া-বিটি খেলিতেছে যেন বাজীকর ॥ [পৃঃ ৩৬] ॥
পর্ব্বতসমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥ [পৃঃ ৪২] ॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে ॥ [পৃঃ ৪৪] ॥
ফিরে না চাইল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি। [পৃঃ ৪৮] ॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা ॥ [পৃঃ ৫০] ॥
কৃষ্ণ বিনা আর প্রাণে সহে না যাতনা ॥ [পৃঃ ৫৩] ॥
ভিক্ষা করি ফিরিলাম অধিক বেলায় ॥ [পৃঃ ৫৮] ॥
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল ॥ [ঐ] ॥
দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে। [পৃঃ ৬৩] ॥
আহা মরি ভগ্নশেষ রয়েছে পড়িয়া। [পৃঃ ৬৮] ॥
সাগরের খাড়ি পাই চারি দিন পরে।
পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে ॥ [পৃঃ ৭৩]

১। গো বি ন্দ দা সে র ক র চা র এক দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে দীনেশ বাবু এক প্রকাণ্ড ভূমিকা যোগ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই অবলম্বিত হইয়াছে।

২। ভূমিকা, পৃঃ ১০, ২২, ২৯, ৩৩, ৭৫।

৩। পৃঃ ৬, ১২, ১৫, ২৮ ইত্যাদি।

যাহোক মাথায় মোর দেহ পদ তুলি।
ভুলাইতে না পারিবে আর নাহি ভুলি॥ [পৃঃ ৭৬]॥
দেখা যাইতেছে তাঁর শরীরে পঞ্জর॥ [পৃঃ ৭৯]॥
আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহা বলে।
কিছু দিন পরে মুহি যাব নীলাচলে॥ [পৃঃ ৮১]॥

ইত্যাদি।

[৫৪]

গো বি ন্দ দা সে র ক র চা র কথাবস্তুর আলোচনার পূর্ব্বে 'গ্রন্থকার' গোবিন্দদাসের পরিচয় কি পাওয়া যায় এবং তাহা কতদূর বিচারসহ তাহা দেখা যাউক। গোবিন্দের পিতার নাম শ্যামাদাস, মাতার নাম মাধবী এবং পত্নীর নাম শশিমুখী। ইহাঁরা জাতিতে "অস্ত্রহাতা বেড়ি"-গড়া কামার, বাসস্থান বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে। একদিন পত্নীর সহিত বিবাদে "নির্গুণে মুরখ" বলিয়া গালি খাইয়া পরদিন (?) ভোর বেলায় অভিমানে গৃহত্যাগ করিলেন।[১] গোবিন্দদাস স্বভাব-ঐতিহাসিক, ইংরেজীতে যাহাকে বলে born historian তাই। সুতরাং গৃহত্যাগের সনটি দিয়াছেন "চৌদ্দশ ত্রিশ শক", তবে মাস এবং তারিখটি চাপিয়া গিয়াছেন। ইহার পর অন্য অনেক ক্ষেত্রে মাস ও তারিখ দিয়াছেন কিন্তু সনের উল্লেখ আর কুত্রাপি করেন নাই। সম্ভবতঃ গৃহত্যাগটাই তাঁহার কাছে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, সেই জন্য এইটির সনের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

বস্তুতঃ যদিও গোবিন্দদাস বলিয়াছেন "অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার" এবং যদিও শশিমুখী তাঁহাকে "নির্গুণে মুরখ" বলিয়া গালি দিয়াছিলেন তথাপি গ্রন্থটি পাঠ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দদাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।[২] পুরাতন কালে সকলই হইত, সুতরাং ইহাও সম্ভবপর ঘটনা বলিয়া আমাদের হজম করিতে হইবে!

যাহা হউক গোবিন্দদাস কাটোয়ায় পৌছিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়া নবদ্বীপে ছুটিয়া গিয়া প্রভুর ভৃত্য হইলেন। তাহার পর প্রভুর সহিত নীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুর সহিত দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভু তাঁহার হাতে পত্র দিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার পর গ্রন্থ খণ্ডিত। মহাপ্রভুর ভৃত্য হওয়ার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি গোবিন্দদাস এই করচা আকারে লিপি-বদ্ধ করেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি যৎসামান্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করাই গোবিন্দদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যদিও প্রথম হইতেই গোবিন্দদাস বলিতেছেন—"করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে।[৩] এটি বড়ই সন্দেহজনক ব্যাপার।

গো বি ন্দ দা সে র ক র চা পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, প্রথম হইতেই গোবিন্দদাসের ভাবনা ছিল যে, তাঁহাকে ঐতি-হাসিকের কাজ করিতে হইবে এবং প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের ভ্রমনিরাস করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িবে। এই জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—

যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে। করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে॥[৪]
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে। করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥[৫]

এখন দেখা যাউক এই গোবিন্দদাসের অন্যত্র কোন উল্লেখ আছে কিনা। শ্রীচৈতন্যের জীবনের মধ্যে এক জয়ানন্দের চৈ ত ন্য ম ঙ্গ লে ই গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। জয়ানন্দ বলিয়াছেন—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার। মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার॥[৬]

এখানে দুইটি আপত্তি আছে, প্রথমতঃ মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, সুতরাং আবার বৈদ্য বলিবার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মকার অর্থে ভৃত্য বা ভৃত্যস্থানীয় ব্যক্তিও বুঝায়। গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ও নীলাচল গমনের সঙ্গী ছিলেন। অর্দ্ধ হরীতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। এখানে এই গোবিন্দ ঘোষকে যে উল্লেখ করা হইতেছে না তাহা কে বলিল? জয়ানন্দ ইহাঁকে 'গোবিন্দানন্দ' বলিয়াছেন [পৃঃ ৮৭]। গোবিন্দঘোষের পুরানাম গোবিন্দানন্দ।

১। পৃঃ ১। ২। শ্রীচৈতন্যের মুখে বড় বড় বেদান্তাদির তত্ত্বকথা গোবিন্দদাস আমাদের শুনাইয়াছেন। তাহার মধ্যে 'প্রমেয়', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', 'অবয়বী' ইত্যাদি শব্দের অসদ্ভাব নাই। কৌতূহলী পাঠককে মূল গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

৩। পৃঃ ৮। ৪। পৃঃ ৮। ৫। পৃঃ ৬২। ৬। পৃঃ ৮৩।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত 'বলরাম' ভণিতায় একটি পদে আছে—

> নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
> দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।

ইহা হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বলরাম নামে পাঁচ ছয়টি পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। পদটি যে আদি বলরামদাসের তাহার প্রমাণ কি?

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীর একটি পুঁথি হইতে একটি পয়ার উদ্ধৃত করিয়া[১] দীনেশবাবু বলিতেছেন ইহাতে "লিখিত আছে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাস নামে এক ব্যক্তি শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন।…তৎপরে শিবানন্দসেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাগমন করেন।"[২] দীনেশ বাবুর contextটুকু—অর্থাৎ গোবিন্দদাসের পুরী হইতে বঙ্গদেশে আগমন এবং প্রত্যাগমন—সম্পূর্ণরূপে স্বকপোলকল্পিত এবং মিথ্যা। এ বিষয়ে চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

> এই মত ভক্তগণ রহে নীলাচলে। গৌড়ের বৈষ্ণব সব সোৎকণ্ঠ-অন্তরে॥
> গুণ্ডিচা যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল। নীলাচল যাইতে সবেই মনঃ কৈল॥
> হেনকালে বৈষ্ণব গোবিন্দদাস নাম। উত্তর রাঢ়েতে হৈতে গেলা খণ্ড গ্রাম॥
> নরহরিদাস আদি যত ভক্তগণ। তেহোঁ আসি তা সভার বন্দিল চরণ॥
> নরহরি তাঁহারে করিয়া আলিঙ্গন। জিজ্ঞাসিল কোথা বাড়ী কি কার্য্যে গমন॥
> গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তর রাঢ়েতে। ইচ্ছা হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে॥
> প্রতি বর্ষে তোমরা চলহ নীলগিরি। তোমা সবা সঙ্গে যাব এই চিত্তে করি॥
> নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার। নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার॥
> কিন্তু তুমি শান্তিপুরে চল পুরঃসর। যেথানে আছেন শ্রীল অদ্বৈত ঈশ্বর॥
> গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে। শিবানন্দ সেন পথে সমাধান করে॥
> দেখ যাঞা তা সভার কতেক বিলম্ব। পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ॥
> শুনি শ্রীগোবিন্দদাস আনন্দিত হইয়া। অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥

ইত্যাদি।[৩]

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীর মূল যে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক তাহাতেও এই কথাই আছে, তবে নামটি নাই, শুধু বৈদেশিক বলা হইয়াছে। যথা—

১। নামপৃষ্ঠার পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পয়ারটি এই—
"শুনি শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হঞা। অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥"

২। ভূমিকা, পৃঃ ৭২-৭৩। কৌতূহলী পাঠককে সমস্ত অনুচ্ছেদটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। ৩। পৃঃ ৩৩১-৩৩২।

> গন্ধর্ব্বনামা।—ত্বং কুতোঽসি।
> বৈদেশিকঃ।—অহমুত্তররাঢ়াতঃ।
> গন্ধর্ব্বনামা।—কথমেকাকী।
> বৈদেশিকঃ।—নরহরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।
> গন্ধর্ব্বনামা।—কিমর্থম্।
> বৈদেশিকঃ।—কদাসৌ পুরুষোত্তমং গন্তেতি জ্ঞাতুম্।[৪]

[৫৫]

উপরের আলোচনা হইতে এই ফল দাঁড়াইতেছে। (১) ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে গোবিন্দদাসের করচার রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের ঊর্দ্ধে যাইতে পারে না। (২) বস্তু ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচরের রচনা হইতে পারে না। গ্রন্থটির মধ্যে ছোট বড় নানা ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আছে। সে সকল কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।[৫] গ্রন্থকারের নিকট চৈতন্যচরিতামৃত যে অপরিচিত ছিল না এবং গ্রন্থকার যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের সহিত ঐক্য বাঁচাইয়া চলিতেছেন তাহাতে ত কোন ভুল নাই।[৬]

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, 'গোবিন্দদাস' "করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে" এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ছাড়া অন্যত্র করচা-সুলভ নিখুঁত বর্ণনা কিছুই দেন নাই। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুর গমন, তথা হইতে নীলাচল গমন এবং

৪। দশম অঙ্ক, বিষ্কম্ভক। নির্ণয়সাগর সংস্করণ, পৃঃ ১৮০-১৮১।

৫। যে নাপিত মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসের কালে মুণ্ডন করিয়াছিল তাহার নাম বলা হইয়াছে 'দেবা' [পৃঃ ১১], অথচ জয়ানন্দের মতে তাহার নাম 'কলাধর' [পৃঃ ৮৯]। আর বাসুদেব ঘোষ এবং রসিকানন্দের মধ্যে নাপিতের নাম 'মধুশীল!' [গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৬৯, ৩৭১]॥ এইটি উদাহরণস্বরূপ দিলাম। আর একটি উদাহরণ বলিতে পারি মহাপ্রভুকে বর্দ্ধমানে পথে নীলাচলে লইয়া যাওয়া। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য। খঞ্জ ভগবানাচার্য্যকে গ্রন্থকার বরাবরই খঞ্জন আচার্য্য বলিয়াছেন। কোন কড়চাকারের পক্ষে এ ভুল মার্জ্জনীয় নহে।

৬। দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর।
সঙ্গে যা'ক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণঠাকুর॥ [পৃঃ ২১]॥
প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহু দূর।
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ ওই ত বিচার। [পৃঃ ৪৭]॥
তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা।
যায় তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা॥ [পৃঃ ৮৫]॥ ইত্যাদি।

তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি ইহাও কোন্ তুচ্ছ ব্যাপার? এ বিষয়ে গোবিন্দদাস ডায়েরিতে ফাঁক দিয়াছিলেন কেন? ইহার উত্তরে এই কথাই বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণনাই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাক, এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মৌলিকত্ব কোথায়।

গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের একটা মোটামুটি সঙ্গত ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। বিশেষত্ব হইতেছে তীর্থযাত্রী শ্রীচৈতন্যের চরিত্রচিত্রণে। করচা হইতে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য প্রচারকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; যে শ্রীচৈতন্য বিষয়ী এবং নারী হইতে সুদূরে থাকিতেন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজাদিগের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন এবং বারনারীদের বৈষ্ণবী করিতেছেন। ইহার রহস্য কি?

গোবিন্দদাসের করচার রচয়িতা যিনিই হউন এবং গ্রন্থখানি যে শতাব্দীতে লেখা হউক, করচাটিতে সরল কবিত্বপূর্ণ মনোগ্রাহী বর্ণনা অনেক আছে। নিম্নে সামান্য কিছু উদাহরণ দিতেছি।

বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া। যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া॥
যুবতীর আর্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া। সেইরূপ আর্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া॥
একারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি। পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি॥
আত্মারামের জন্য যার আর্ত্তি হয়। তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয়॥
আলোর নিয়ড়ে যথা তম নাহি রয়। কৃষ্ণের সমীপে তথা কামভস্ম হয়॥
কেবল প্রেমের আর্ত্তি থাকে বিদ্যমান। এই ত বলিয়া দিনু প্রেমের সন্ধান।
এখন প্রেমের লাগি কর হানাপানা। কৃতার্থ হইতে যাবে সংসার বাসনা॥
[পৃঃ ১০]॥

[৫৬]

ষোড়শ শতাব্দীতে বিরচিত অন্ততঃ দুইখানি চৈতন্য-পরিষদের জীবনীকাব্য বর্ত্তমান আছে। দুইখানিই অদ্বৈত প্রভুর জীবনী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নিত্যানন্দ প্রভুর কোন জীবনীকাব্য পাওয়া যায় নাই, ইহা আপাতবিস্ময়ের কারণ বটে। কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি চৈতন্য-জীবনীতে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে প্রায় সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই উপযুক্তভাবে বর্ণিত আছে, সেই হেতু স্বতন্ত্র নিত্যানন্দজীবনীর আবশ্যক হয় নাই। আরও একটা কথা আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর তাবৎ প্রচেষ্টা মহাপ্রভুর কীর্ত্তিকলাপের সহিত অঙ্গীভূত ছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধেও বলা চলে। তবে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভুর প্রায় পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ বয়স হইয়াছিল। এই সময়ের ইতিহাস চৈতন্যজীবনীর বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং বিশেষ করিয়া এই কারণেই অদ্বৈত জীবনীর প্রয়োজন ছিল।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় ধামে ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ঈশান নাগরের বয়স যখন পাঁচ (অর্থাৎ ১৪১৯ শকাব্দে) তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে উপনীত হন। সেদিন আচার্য্যের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে-খড়ির উৎসব। তাহার পর মাতাপুত্র অদ্বৈত প্রভুর গৃহেই রহিয়া গেলেন। তিরোধানের কিছুকাল পূর্ব্বে অদ্বৈতপ্রভু স্বীয় জন্মস্থান লাউড়ে গৌরাঙ্গের নাম প্রচার করিবার জন্য ঈশানকে অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পর সীতাঠাকুরাণী ঈশানকে লাউড়ে গিয়া বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। ঈশানও জগদানন্দের সহিত পূর্ব্বদেশে আসিয়া বিবাহাদি করেন এবং তথায়ই অদ্বৈতজীবনী কাব্যটি রচনা করেন। ঈশান এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

যেই দিনে শ্রীঅচ্যুত বিদ্যারম্ভ কৈলা। সেই দিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈতপদে আসি লইয়া শরণ। পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তথন॥
প্রভু দয়া করি মায়ে দিলা কৃষ্ণমন্ত্র। মোরে হরিনাম দিঞা করিলা পবিত্র॥
মোরে পাঞা সীতাদেবী স্নেহ প্রকাশিলা। আপন তনয় সম পোষণ করিলা॥
শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা ছিলা মোর মাতা। কিছু কিছু মোর মনে পড়ে সেই কথা॥১
একদিন প্রভু মোরে কহে সংগোপনে। গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ আর না সহে পরাণে॥
. . . .
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে। গৌরনাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥২
তবে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সীতাঠাকুরাণী। কি ভাবি এই আদেশিলা কিছু নাহি জানি॥
অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ। মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ॥
মুঞি কহিলাঙ মাতা বুঝি আজ্ঞা কর। এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর॥
সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ক্রম। ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ॥
মাতা কহে কৃষ্ণ সদা ভক্তবাঞ্ছা পূরে। তেঞি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরে॥
পূর্ব্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে। বিয়া করাইবে ইহোঁ করিয়া যতনে॥
. . . .
শিরে ধরি এই সীতামাতার আদেশ। জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ॥
বংশরক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে। ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউড়ে॥
ইহাঁ রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন। গুরু-আজ্ঞা মাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥৩
চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥ (দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৫৮)

অদ্বৈতপ্রকাশ বৃহৎ গ্রন্থ নহে। ইহা বাইশটি নাতিক্ষুদ্র অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বৃহৎ গ্রন্থ না হইলেও প্রামাণিকতায় ইহা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির অপেক্ষা কোন অংশে খাটতো নহেই, পরন্তু লোচন জয়ানন্দাদির গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট। তাবৎ চৈতন্যজীবন ও চৈতন্যপারিষদ জীবনীগ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশের একাধিক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থেই রচনার তারিখ অবিসন্দিগ্ধভাবে দেওয়া আছে, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালায় যাঁহারা মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তের

১। অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস, প্রথম সংস্করণ; একাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১১৩। ২। দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৫৮। ৩। অ. বা. পত্রিকা সংস্করণ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৫৯-২৬০।

জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক ঈশান নাগর ব্যতিরেকে আর কেহই যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গসুখ অনুভব ও তাঁহার লীলাবলী চাক্ষুষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। এই কারণে অ দ্বৈ ত-প্র কা শ কে চৈতন্যজীবনীগুলির অন্যতম বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে এমন কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা অন্যত্র নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতই ঈশান নাগরের সজাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল। যে সকল লীলা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাহার নিকট শ্রুত তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি নিজে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরীরাজের গুণ লীলা সাগরের সম
শ্রীমুখে অদ্বৈত প্রভু করিলা বর্ণন ॥১
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্বের কিঞ্চিত আভাস।
দয়া করি মাতা যাহা করিলা প্রকাশ ॥২
শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান।
তার সূত্র লব মাত্র করিনু ব্যাখ্যান ॥৩
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাব্জনিঃসৃত।
এই লীলারসামৃত পিয়া হৈনু পূত ॥৪
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে। পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিল মোকে ॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু গ্রন্থন ॥৫

[৫৭]

অ দ্বৈ ত প্র কা শে র মধ্যে পাণ্ডিত্য-প্রয়াস অথবা কবিত্ব-প্রচেষ্টা বা কবিসুলভ আড়ম্বর কিছুই নাই। ভাষাও অলঙ্কারবর্জ্জিত, সরল। কিন্তু ঈশান ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; কি তত্ত্বকথায়, কি সাধারণ বর্ণনায় সর্ব্বত্রই অ দ্বৈ ত প্র কা শে র ভাষায় বিশিষ্টতা ও মাধুর্য্য বিদ্যমান। নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ঈশানের লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ফুলিয়াতে হরিদাস যখন হরিনামকীর্ত্তনে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার হিন্দুয়ানির প্রতি তত্রস্থ কাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হরিদাসকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য অনুচরদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হয়।

তবে হরিদাস ধরি নিগ্রহ করিঞা। দরবারে আনিলেক হাতে দড়ি দিঞা ॥
হরিদাসে দেখি কহে যবনের পতি। কাহে হিন্দুয়ানি কর হঞা উত্তম জাতি ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া সে করে মহাযোগ। দেহান্তে নিশ্চয় তার হইব দোযোগ ॥
যদি ভেস্তপ্রাপ্তিবাঞ্ছা থাকে তোর মনে। কলমা পড়িয়া কর পাপের দমনে ॥
শুনি হরিদাস কহে সুগম্ভীর স্বরে। যুক্তিমূলক যেই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ কহি তারে ॥
যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র অনুগামী যেই হয়। সর্ব্ববর্ণে সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
যবনের শাস্ত্র হয় যুক্তিবিরুদ্ধাভাস। সেই শাস্ত্রচরী যবন রূপেতে প্রকাশ ॥
... ...
সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদিবিগ্রহ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ ॥
যে শাস্ত্রে তাঁহারে কহে নিরাকার নিরীহ। তেন শাস্ত্র পঠনে বাড়য়ে মায়ামোহ ॥
বস্তুতত্ত্বে ঈশ্বরে জীবেতে নাহি ভেদ। অগ্নির সত্তা যৈছে সর্ব্ব দীপেতে অভেদ ॥
তথাপি মূল অগ্নির যৈছে হয় প্রাধান্যতা। তৈছে সর্ব্বেশ্বর হরি সকলের ধাতা ॥
হরিকে ভজিলে জীবের মায়া লোপ হয়।
সেই লোভে মুঞি কৈলোঁ হরিপদাশ্রয় ॥৬

নীলাচলে ঈশান একদিন মহাপ্রভুর পাদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ঈশান শ্রীচৈতন্যের নিকট কিছু উপদেশ লাভ করেন।

তবে মুঞি কীট হর্ষে কহিনু চৈতন্যে। দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে ॥
সহাস্যে মধুরভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা। শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা ॥
সাধুস্থানে করিবে সদ্ধর্ম্মের শিক্ষণ। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
তপ জপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর। নাম লৈলে সর্ব্ব অপরাধ যায় দূর ॥
প্রকৃতিসম্ভাষা উদাসীনের ধর্ম্ম নাশ। নানা দেবসেবীর কৃষ্ণে না হয় বিশ্বাস ॥৭

মহাপ্রভুর তিরোধান অন্তরে অনুভব করিয়া প্রায় শত বর্ষবয়স্ক সুবৃদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর মনে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঈশান অতি স্বল্পাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাৎসল্য রসের করুণতা সরলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হেথা মোর প্রভু অলোকিক ভাবাবেশে। মহাপ্রভুর অপ্রকট বুঝিলা মানসে ॥
দিব্যোন্মাদ হৈল প্রভুর নাহি বাহ্যজ্ঞান। নিমাঞি নিমাঞি বুলি করয়ে আহ্বান ॥
ক্ষণে কহে আয়রে নিমাই পুস্তক লইয়া। গৃহকৃত্য আছে ঝাট যাও পড়াইয়া ॥
ক্ষণে কহে তোর জারি জুরি মুঞি জানি।
কার ভাবে গৌর হৈলি কহ দেখি শুনি ॥
ক্ষণে কহে নিমাঞি তুহুঁ রহ মোর ঘরে।
শচীমায়ের দুঃখ হৈব গেলে দেশান্তরে ॥৮

ঈশান নাগরের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা দেখি তাহা লিখি না বুঝিনু মর্ম্ম।
যৈছে শুক গীত গায় শিক্ষণের ধর্ম্ম ॥৯
সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অব্দ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥
সে লীলা অমিয়সিন্ধু দুর্গম্য দুষ্পার। অনন্ত না পায় অন্ত মুঞি কোন ছার ॥
আত্মশোধিবারে এই দুঃসাহস কৈলুঁ। লীলাসিন্ধুর একবিন্দু ছুঁইতে নারিনু ॥
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিনু ধরম তার সাখী ॥১০
মুঞি অতি বৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্য পদে গ্রন্থ কৈনু সম্প্রদান ॥১১

১। পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৪৮। ২। অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ৮০। ৩। ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৩৬। ৪। পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৬৩। ৫। দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৫৮।
৬। নবম অধ্যায়, পৃঃ ৮৮-৮৯। ৭। অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২০৫। ৮। একবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৮। ৯। একবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৪। ১০। দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২৫৮। ১১। দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ৬০।

উপহাস

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কলকাতা সহরের শীতের কুয়াশা—কুয়াশা তাকে বলা চলে না, কয়লার ধোঁয়ার সঙ্গে শীতের বাতাস মিশে গিয়ে একটা জমাট বাষ্পস্তর। সেই বাষ্পস্তর ভেদ করে এসেছে সকালের রৌদ্র, কলতলা এবং চৌবাচ্চার পাশে এসে পড়েছে কোনো রকমে—একটা চতুষ্কোণ পরিমাণ স্থানকে একটু চিত্রিত করে তুলেছে পিঙ্গল শোকাচ্ছন্ন হাসিতে। সেই স্থান-টুকুতে বসে তোলা উনুন পরিষ্কার করতে করতে প্রসন্নময়ী তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ডাকছিলেন, 'নিরঞ্জন, এখনো উঠলি নে রে, বাজার যাবার জন্তে এত খোসামুদী, আপিসের বেলা হলে ত তোর কিছু আসবে যাবে না—তুই ত খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবি, না হয় একখানা কেতাব নিয়ে বসবি—বলি ও নিরঞ্জন আটটা বেজে গেল যে, উঠবি কখন আর?'

শেষ দিকটায় প্রসন্নময়ীর কণ্ঠস্বর সানুনাসিক, নিরঞ্জন যে উঠবে না এই নিশ্চিত নৈরাশ্যে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন।

যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো তীরের মত নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সেই নিরঞ্জন তখনো একখানা চাদর আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। তখনো হয় ত আটটা বাজে নি, কিন্তু প্রসন্নময়ীর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। যাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, একটু আগে থেকে তাকে তাগিদ দেওয়া দরকার—এই জ্ঞান এবং আরও অনেক জ্ঞান প্রসন্নময়ীর আছে বলেই সংসার এখনো তাঁকে খাতির করে চলে।

উনুন পরিষ্কার করা শেষ করে প্রসন্নময়ী একবার উপরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তাই ত বলি, এমন না হলে আর বৌ বলেছে কেন? আজকাল ত সব বিবি-বৌ? তাই ত বলি, ছোট বৌ আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে।'

'কি বললেন দিদি, আমাকে বলছেন ত, না, আর কাউকে?'—একটা মধুর তীব্র কণ্ঠস্বর বারান্দার পাশ দিয়ে যেন এক ঝলক রৌদ্ররশ্মির মতই এসে কলতলায় পড়ল।

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি ভাই, বলছি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি—সেই কোন্ ভোরে উঠেছ, আমারও আগে—এমন না হলে আর বৌ!'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক দিদি, সকালে উঠেই শুনলাম নিজের প্রশংসা—আমার আজ সৌভাগ্যের সীমা নেই দেখছি।'

'সৌভাগ্য এখন থাক ভাই—তোমার আদরের দেওরটিকে যদি উঠিয়ে দিতে পার, তবেই বাজার হবে, নৈলে কর্ত্তাদের আজ আপিস যাওয়া বন্ধ।'

'ওমা, সে কি? নিরঞ্জন এখনো ওঠে নি?'—বলে ছোট-বৌ বোধ হয় বারান্দা দিয়ে পাশের ছোট একটি ঘরের দিকে চলে গেলেন। নিরঞ্জন তখন চাদর জড়িয়ে চৌকীর উপর উঠে বসেছে। ঘুম যে তার ভাল হয় নি এ কথা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

'এই যে উঠে বসেছ দেখছি, এত ডাকাডাকি—' বলে ছোট-বৌ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। 'সুপ্রভাত বৌদি ঠাকুরাণী, দেরী করে উঠেছি বলেই না সকালেই দর্শন পেলাম। এই অকর্ম্মা লোকটাকে দেখছি আপনারা কিছুতেই রেহাই দেবেন না!'

'আচ্ছা, রাখ ভাই তোমার বক্তৃতা—এখন বাজারে যাবে এস ত।'

হাস্যমুখে নিরঞ্জন বলল, 'তাই বলুন, আমি বলি ছোট-বৌদির আবির্ভাব—একি বৃথা হয়? একটা না একটা কাজ আমাকে করতেই হবে, কি বলেন?'

কৃত্রিম দৃঢ় কণ্ঠে ছোট-বৌদি বললেন—'একশ বার। কাজ না করলে চলে? এই যে এত বড় জগৎ—এ ত কাজ নিয়েই।'

হাত জোড় করে নিরঞ্জন বলল, 'দোহাই বৌদি, আপনার দর্শন রাখুন। আমি বাজারে যাচ্ছি এখুনি—কি কি আনতে হবে বলুন।'

একরাশ আপিসের কাগজ-পত্র নিয়ে ছোট বধূর স্বামী মহিমারঞ্জন টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ছেন। ছোট-বৌ ঘরে আসতেই কাগজ-পত্র থেকে মুখ তুলে তিনি বললেন,

'কি গো, ছোট বাবু গেলেন বাজারে? কাব্য করেই ছোক্‌রা মাটি হয়ে গেল—'

'হ্যাঁ, গিয়েছে! হাঁগো, কাব্য করে কি কেউ মাটি হয়?'—ছোট-বৌ সকরুণ প্রশ্ন করলেন স্বামীকে।

'মাটি হয় না? দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে—মাটি হতে আর বাকি কি?'

'তা ঘুমোক, বয়স আর কতই বা? তোমরা কি সবাই ও-বয়সে চাকরী করতে না কি?'

'চাকরী না করি, চাকরীর চেষ্টাও ত ছিল,—ওর ত তাও নেই। তোমার আবার বাড়াবাড়ি আছে কি না। তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ মনে হচ্ছে ছোট-বৌ। কেবল ঘরে বসে বসে কবিতা আওড়ালেই কি চলবে? যা দিনকাল পড়েছে—'

জানালাটা খুলে দিয়ে ছোট-বৌ বিছানা তুলতে তুলতে বললেন, 'এই রে, এইবার আসল কথা আরম্ভ করলে দেখছি —এক্ষুনি হয়ত টাকার কথা তুলবে,—যা বোঝে করুক বাপু, সময় যখন আসবে, আপনিই টাকার দিকে ওর মন যাবে।' —তারপর যেন আপন মনেই তিনি বলতে লাগলেন, যেন সম্মুখে কেউ নেই, 'টাকার দিকে মন গেলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে? সে অমানুষ হয়ে যায়।'

মহিমারঞ্জন স্ত্রীর অন্যমনস্ক কথার সুর ধরতে পেরে বললেন, 'তাই বটে গো, তাই বটে—আমরা সবাই অমানুষ, কি বল?'

তোষকটা উল্‌টে ফেলে বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে ছোট-বৌ বললেন, 'না আমি সে কথা বলছি নে, কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন হয়। কাব্য ত তুমিও করতে একদিন, মনে পড়ে না কি?'—জীবনের সেই বাসন্তী দিনগুলো ছোটবধূর মনের মধ্যে ছবির মত ভেসে উঠল।

একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে মহিমারঞ্জন বললেন, 'আর কাব্য ছোট-বৌ, জগৎটা যে কত কঠিন, তা তুমি ঘরের কোণে থেকে বুঝতে পারছ না।'

প্রভাতের আলোর মতই একটা স্নিগ্ধ স্বচ্ছ হাসি ছোট-বৌ-এর মুখের উপর উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'বুঝতে চাইনে আমি, এই বেশ আছি।'

মহিমারঞ্জন আপিসের কাগজগুলো লাল ফিতে দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুমি ত বুঝতে চাও না, বুঝেছে বড়-বৌ, যেদিন থেকে সে বুঝেছে, সেদিন থেকে তার মুখে কথা নেই—দেখেছ কি?'

'কেন, বড়দির মুখে ত বেশ কথা আছে, মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয় কথার চোটে, তুমি বলছ কথা নেই—এ আবার কি?'

একটা কাংস্যকণ্ঠের ঝঙ্কার শোনা গেল বাইরে, 'ঠাকুর-পো, নীচে দুজন ভদ্রলোক এসে বসে রয়েছেন, কতক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছি, তা তোমাদের গল্প চলেছে ত চলেইছে—'

'এই যে, যাই বৌদি'—বলে মহিমারঞ্জন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর দিকে একটা সকোপ কটাক্ষ হেনে নীচে চলে গেলেন।

'কি বাজার করে এনেছ, ছাই বাজার—' বলে তরকারি আনবার থলিটা টান মেরে কলতলার দিকে ফেলে দিয়ে বড়-বৌ দুম দুম করে রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ছড়ানো তরকারিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রসন্নময়ী আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত মুখ করে বলতে লাগলেন, 'রাগটা তোমাদের বড্ড সহজেই হয় বড়-বৌ—কেন, বাজার কি এত খারাপ হয়েছে বাপু যে, টান মেরে ফেলে দিতে হবে আঁস্তাকুড়ের দিকে, অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের।' আরও কত কথা তিনি বলে যেতে লাগলেন। তাঁর সুদীর্ঘ বৈধব্যজীবন পিত্রালয়ে কাটিয়ে দিতে দিতে এমন কত দৃশ্য তিনি দেখেছেন, কত দারিদ্র্য, কত শোক—তারই একটা সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'ছোট-বৌ, তরকারিগুলো কুটে ফেল ত ভাই, বাবুদের আপিস যে আছে, একথা কত সহজে বড়-বৌ ভুলে গেল।'

নিঃশব্দ পদে ছোট-বৌ এসে তরকারি কুটতে আরম্ভ করলেন।

বড়-বৌ কিন্তু থেমে থাকবার পাত্র নন: সমান সুরে রান্নাঘরের মধ্য থেকে বলে যেতে লাগলেন, 'ভুলে আমি যাই, সহজেই ভুলি, বুঝলে ঠাকুরঝি, না ভুললে যেমন চলছে, তেমন চলত না, বুঝলে?'

শেষদিককার কথাগুলোর মধ্যে ঝাঁঝ কিছু বেশী। তারই উত্তাপ এসে লাগল প্রসন্নময়ীর মনে; তুবড়িতে আগুন দিলে যেমন হয়, তাই হল—বাক্যের অগ্নিস্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর মুখ দিয়ে, থামায় কার সাধ্য।

মহিমারঞ্জন এলেন, বড় ভাই মনোরঞ্জন এলেন। আপিসের দোহাই দিয়ে, বাইরের দুজন ভদ্রলোকের দোহাই দিয়ে কোনরকমে সে বেলার মত বিসম্বাদের অন্ত হল।

কিন্তু বাজার যে করেছে, তার দেখা নেই। সে বাজারটি নামিয়ে দিয়েই ঘরের মধ্যে গিয়ে দরোজায় খিল দিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছে। জানালার কাছে বসে প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে সে অতি দ্রুত তার পাতা উল্‌টে যাচ্ছে, বাইরের কলরব যেন কানে না আসে হে ভগবান—এই ধরণের প্রার্থনা তার মনের মধ্যে। কিন্তু দরোজারও ছিদ্রপথ আছে, তা ছাড়া, প্রসন্নময়ী এবং বড়-বৌ—দুজনের কণ্ঠস্বর-ই সমান মাত্রায় প্রতিযোগিতা করে। অতএব ঘরে খিল বন্ধ করেও নিরঞ্জনের উদ্ধার নেই।

বাড়ীতে কোন একটা গেলমাল হলেই তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। তার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দ্রুততালে স্পন্দিত হতে থাকে—স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটা ভয়ার্ত্ত কম্পন সুরু হয়। এত দুর্ব্বল নিরঞ্জন। আজ তাব মনে হচ্ছে; সে সংসারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এত দুর্ব্বল ও ভীরু মন [illegible] কোলাহলময়ী ধবণীব বুকের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই শক্ত। ঘূর্ণ্যমান এই পৃথিবী, কুটিল তার গতিবিধি— সরীসৃপ আর মানুষে যেখানে তফাৎ বেশী কিছু নেই, সেখানে সে কি করে সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ধীবে ধীরে গোলমাল যখন থামল, তখন বই-এর পাতায় মন বসাবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করছে নিরঞ্জন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখল, বারোটা বেজে গেছে। এমন সময়ে দরোজার বাইরে মৃদু করাঘাত হতেই সে উৎকর্ণ হয়ে রইল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে ডাকছে, 'ঠাকুরপো, বেলা হয়ে গেছে, স্নান করে নাও।'

'এই যে যাই বৌদিদি ঠাকুরুণ,—' বলে নিরঞ্জন দরোজা খুলে দিল। এই একটি স্থানেই তার আশ্রয়, তার নির্ভরতা।

'কি করছিলে ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে?'—বলে ছোটবধূ হাসতে লাগলেন।

নিরঞ্জন অতি সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'এই যে বইখানা পড়ছিলাম। যা গোলমাল আপনাদের বাড়ীতে—!'

'নাও এখন বই থাক, এস স্নান করবে।'

'আর একটু বেলা হলে স্নান করা যাবে। আমার ত আপিস নেই বৌদি!'

ছোটবধূ কৃত্রিম ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, 'আপিস নেই বলে এই যে বেলা করে খাওয়া-দাওয়া—এতে শরীর খারাপ হয় না ভাবছ?'—তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপিস ত একদিন হবে, তার জন্যে তৈরী হয়ে নাও এখন থেকে।'

নিরঞ্জন নিরুপায় হয়ে বই রেখে স্নানের জন্যে উঠে পড়ল। ছোট-বৌদির কথা এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। বই রাখতে রাখতে সে বলল, 'আপনার কথা, কথা নয় ত আদেশ—না শুনলে রক্ষে নেই।'

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে হঠাৎ বড় বধূর সঙ্গে দেখা। মুখের সেই কুটিল চক্ররেখা, সর্ব্বদা তাতে যেন একটা অসন্তোষের ভাব আঁকা রয়েছে। এই সংসারের কিছুই যেন তাঁর ভাল লাগে না—এই রকম একটা ভাব। নিরঞ্জনের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না, আজ হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হতেই বললেন, 'কি গো, ছোট বাবু যে, এতক্ষণে নাইবার সময় হল?'—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের রেখা ফুটে উঠল মুখে যে, তা নিরঞ্জনের মত উদাসীনের দৃষ্টিও এড়িয়ে গেল না। তাই, যথাসম্ভব সহজে উত্তর দেবার চেষ্টা করে নিরঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ হল বৌদি! না হলে কি ছোট-বৌদি ছাড়তেন সহজে?'

মুখখানি অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। ভ্রূকুঞ্চিত করে সংক্ষেপে, 'হ্যাঁ, তা ত হবেই বলে বড় বধূ আর অপেক্ষা মাত্র না করে তর-তর করে উপরে উঠে গেলেন।

নীচে রান্নাঘরে প্রসন্নময়ীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, 'এদিকে এঁদের ত হল, ছোটবাবুর দেখা নেই

এখনো। আমার কপালে ভাল কাজ কিছু কি আর আছে বা হবে? ভেবেছিলাম, আজ একবার কালীঘাট যাব রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হলে—তা ঐ হতভাগা কুড়ের বেহদ্দ, ওর জন্যে আমার আর কিছু হবার জো নেই।'

নিরঞ্জন হাসিমুখে রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে এসেছি দিদি—একটু তেল-টেল যা হয় কিছু দাও।'

প্রসন্নময়ীর কণ্ঠস্বর আরও তীব্র হয়ে উঠল, 'হতভাগা বাঁদর, তোর কি লজ্জা হবে না কোনকালে!'

'কিসের লজ্জা দিদি?'—নিরঞ্জন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

'হাসছিস কি দাঁত বার করে? শেষকালে বিপদে যখন পড়বি, তখন আমার কথা মনে করিস।'

'কিসের বিপদ দিদি?'—নিরঞ্জনের তখনো হাসিমুখ। প্রসন্নময়ীর কি যেন মনে হল—

তাঁর মনে হল, মার মৃত্যুর কথা. ছোট ছেলেটিকে এই বিধবা কন্যার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ওর ঐ একই ভাব, সত্যই ত, বিপদের আর ও কি জানে! এই কথা মনে হতেই তিনি বললেন, 'না কিছু না, যা, স্নান সেরে আয়—তোকে খেতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

২

সন্ধ্যার একটু আগে মনোরঞ্জন বাইরের ঘরে এসে বসলেন। মনটা তাঁর ভাল নেই। বড়-বৌকে তিনি ভালরকমই জানেন। একটি বিষাক্ত হাওয়ার ঘূর্ণী সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনোরঞ্জন সহস্র চেষ্টাতেও তাকে আর প্রতিরোধ করতে পারেন না। মহিমা, নিরো—এদের ত তিনিই মানুষ করেছেন। সেদিনকার সেই সংসারের করুণ ছবিটি তাঁর মনে পড়ছে। শুধু বিধবা প্রসন্ন আর তিনি নিজে—কত দুঃখ, কত ঝড়—এই দুই ভাই বোনের মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, সেই দিনগুলির একটা সংহত রূপ তাঁর মনের মধ্যে উদিত হয়ে চোখ দুটিকে অশ্রু-সজল করে তুলল। তারপরে এসেছে বড়-বৌ, সংসারের গতি ধীরে ধীরে অন্যদিকে ফিরছে, তারপরে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন—বাইরের ঘরে বসে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে মনোরঞ্জন স্থির হয়ে বসে বসে ভাবছেন।

এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। মহিমারঞ্জন আপিস থেকে ফিরছেন। মনোরঞ্জন বাইরের ঘর থেকে বললেন, 'কে, মহিমা? জামাজুতো ছেড়ে একবার বাইরের ঘরে আসবে?'

মনোরঞ্জনের ভাবনা-সূত্রকে ছিন্ন করে মহিমা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন। খুব সন্তর্পণে চৌকীর একপ্রান্ত ঝেড়ে দিয়ে মনোরঞ্জন বললেন, 'বস এইখানে, কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

মহিমা সেখানে বসে পড়ে বললেন, 'বলুন।'

'বলছিলাম নিরোর কথা, ও ত একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল, ওর সম্বন্ধে কিছু ভাবছ-টাবছ কি? কেবল দিনরাত-বই-এর মধ্যে ডুবে আছে, সেটা ত আমাদের দরিদ্র সংসারের পক্ষে মোটেই ভাল নয়—কি বল?'

মহিমারঞ্জন একটু পরে উত্তর দিলেন, 'তাইত, আমিও ত ওকে সে কথা প্রায়ই বলে থাকি। বয়সও ত বেশ হয়েছে, চাকরী-বাকরীর চেষ্টা এখন থেকে না করলে আর কবেই বা করবে?'

মনোরঞ্জন হাসতে হাসতে বললেন 'দেখ মহিমা, চাকরী-বাকরীর প্রয়োজন যার হয় না, সে ওদিকে বড় একটা যেতে চায় না। আমি নিরোর বিয়ে দিতে চাই, তোমার এ সম্বন্ধে কি মতামত?'

মহিমারঞ্জন গম্ভীর মুখে বললেন, 'আরও কিছুদিন যাক, বিয়ের বয়েস হতে এখনো কিছু দেরী আছে বলে মনে হয় আমার।'

মনোরঞ্জন বললেন, 'দেরী আর কি? [illegible] দিলে, এর পরে আর ও বিয়ে করতে চাইবে মনে [illegible]'

'কেন চাইবে না?'

'সে কথা তোমাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে? কি দিনকাল পড়েছে বুঝতে পারছ না কি? যেদিন ও সংসারের আসল রূপটা বুঝতে পারবে, সেদিন ও বুঝবে যে দুনিয়াটা শুধু কাব্য নয়, দুনিয়া সোজাসুজি গোলাকার না হয়ে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা—সে দিন সংসার ওর কাছে মহা ভার বলে মনে হবে।'—বলে মনোরঞ্জন হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই তিনি একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'তৎপূর্ব্বেই আমি ওর বিয়ে দিতে চাই, বুঝলে মহিমা?'

'আপনি যদি নিতান্তই বিয়ে দেন, সে আলাদা কথা। কিন্তু নিরোকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষা যেমনই হোক, সে তা পেয়েছে; কাজেই তার নিজের জীবন-সম্বন্ধে, সংসার-সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ই ভাবে, কিন্তু খোলাখুলি ভাবে আমরা কোনদিন তাকে ত এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি। আমার মতে তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।'

'উত্তম কথা, তাকে এখনই ডেকে নিয়ে এস। আমি এ-বিষয়ে একটা মীমাংসা করে ফেলতে চাই—' মনোরঞ্জন আর দেরী করবেন না। নিরঞ্জনের ক্রমবর্দ্ধমান আলস্য এবং ঔদাসীন্য যেন তাঁর সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে।

যাকে প্রয়োজন, তাকে ডেকে আনার দরকার হল না। দেখা গেল, নিরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। দেখতে পেয়েই মহিমা ডাকলেন, 'নিরো, বড়দা ডাকছেন, তুমি একবার বাইরের ঘরে এস।'

নিরঞ্জন সচকিত হয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। মনোরঞ্জন বললেন, 'বস নিরো।'

ঘরের মধ্যে আলো নেই। চৌকীর উপরে দুজনে বসে আছেন। নিরঞ্জন সেই প্রতীক্ষমান স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দে চৌকীতে এসে বসল। তার মনে হতে লাগল বড়দা হঠাৎ তাকে এমন অসময়ে ডাকলেন কেন? কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটবে না ত? সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে নিরঞ্জনের প্রতীক্ষা ক্রমশ শ্বাসরোধকর হয়ে উঠতে লাগল।

মনোরঞ্জন সেই স্তব্ধতা ভেঙে গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেখ নিরো, তুমি যে ভাবে দিন কাটাচ্ছ, তা একেবারেই আমাদের অনভিপ্রেত। কবিদের কাব্য, তাদের সমালোচনা এবং বাংলা সাহিত্য দীর্ঘজীবী হোক, কিন্তু সেই সব সাহিত্যের ভূত যদি আমার ঘাড়ে চেপে বসে আমাকে আমার সহজ কর্ত্তব্যগুলো করতে না দেয়, তা হলে আমি তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করে বিদায় দিই।'

মহিমারঞ্জন বললেন, 'কথা খুবই সত্যি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাহিত্যের চেয়ে নিরঞ্জনের উদাসীনতাই বেশী দায়ী।'

নিরঞ্জন খুব ধীরভাবে বলল, 'বড়দা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, আপনি আমাকে কি করতে হবে স্পষ্ট করে বলুন।'

মনোরঞ্জন তীব্রকণ্ঠে বললেন, 'না বুঝবার মত কথা আমি বলিনি নিরো। শুধু এককথাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, তুমি এখন আর নাবালক নও, বয়েস তোমাকে সাবালক করে তুলছে, আরও স্পষ্ট কথা এই যে, স্বাবলম্বন কথাটি শুধু পুঁথির পাতায় আবদ্ধ না রেখে তাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সফল করে তোলা তোমার মত শিক্ষিত লোকের খুবই উচিত।'

বড়দার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় নিরঞ্জনের হৃৎ-কম্পন যেন বেড়ে গেল। এমন স্পষ্ট করে কেউ কোনদিন তাকে এ-কথা বলেনি। তথাপি ক্ষীণকণ্ঠে নিরঞ্জন বলল, 'বড় দা, আমি তা জানি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কি করি বলতে পারেন? আমি যে মোটেই তা ভাবি না, এমন নয়। কিন্তু বিশেষ কোনো পথ ত আমার চোখে পড়ে না, সবই গতানুগতিক বলে মনে হয়।'

মনোরঞ্জন সমান ভাবে বলে চললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে বেকার-সমস্যার আলোচনা করতে বসি নি। অতি সহজ কথা এই যে, আমার কষ্টে উপার্জ্জিত বহু অর্থ তোমাকে শিক্ষিত করবার জন্যে আমি ব্যয় করেছি। সে দিক দিয়ে তুমি আমার কাছে ঋণী—এই কথা মনে করে তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।'

কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, সারবান এবং মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালন যে কি ভাবে করতে পারা যায়, এ উপদেশ ত কেউ দেয় না—নিরঞ্জন ভাবতে লাগল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হল না। মনোরঞ্জন আর বেশী কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মহিমা নিরঞ্জনের স্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে বললেন, 'যাও, যেখানে যাচ্ছিলে যাও, দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?'—বলে তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই রাত্রে নিরঞ্জন বহুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। তার মনে হল সে অপরাধী। এতদিন সে যে ভাবে জগৎ-টাকে দেখত, তার সেই দেখার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁকি ছিল। আজ তার সেই ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—তাই তার ভাবনার যেন আর অন্ত নেই। তার মনে হল, তার নিজের সমস্যা যেখানে, সেখানে সে বড় একা। দুর্ব্বল, ভীরুহৃদয় নিরঞ্জন রাত্রির দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকারের

মধ্যে ভাবতে লাগল, ছোট বয়স থেকে এ-পর্য্যন্ত আশ্রয়ের অভাব ত তার হয় নি, কিন্তু আজ সেই আশ্রয়ের ভিত্তি যেন টলে উঠেছে, আর আশ্রয় তাকে যারা এতদিন দিয়েছে, তারা সেই নির্দ্দেশহীন পথপ্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা প্রাণ গেলেও বলবে না যে, 'নিরঞ্জন, এই পথ তোমার পথ।'

একাকীত্বের এই নিবিড় অনুভূতির অসহ ভার নিরঞ্জন যেন আর সহ্য করতে পারে না।

নিজেকে এমন পৃথক করে স্বতন্ত্র করে নিরঞ্জন কোন দিন ভাবে নি। সে ভেবেছিল, তার দিন এমনি চলে যাবে—সংসারের একপাশে কাব্য আর সাহিত্যচর্চ্চা নিয়ে। গতানুগতিক জীবনকে নিরঞ্জন ঘৃণা করে, কিন্তু আজ বড়দার কথায় তার চৈতন্য ফিরে এল, গতানুগতিকতা যেমনই হোক, তার মধ্যে আত্মসম্মান আছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আছে: কিন্তু এই চলমান জগতের কোন্ প্রান্তে সেই স্বাতন্ত্র্যকে সে লাভ করবে, কি উপায়ে তা সম্ভব—নিরঞ্জন সহস্র চেষ্টাতেও সে পথ আবিষ্কার করতে পারল না।

এই দিক দিয়ে ভাবতে ভাবতে নিরঞ্জন তার বড়দার সম্বন্ধে একটা গভীর শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করতে লাগল। তিনি একাকী সংগ্রাম করেছেন, তাঁর সংগ্রাম যে দিন থেকে আরম্ভ হয়েছে, সে দিন তাদের সংসারের বড় দুর্দ্দিন। দুটি ছোট ছোট ভাই আর একটি বিধবা ভগ্নীর ভার নিয়ে তিনি তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন। সেই স্বাবলম্বী মানুষ কেমন করে তাঁর চোখের সম্মুখে দেখবেন যে, তাঁরই সহোদর নিশ্চিন্ত আলস্যে কাব্য আর সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে!

রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জানালার বাইরে কলকাতা সহরের ধূমাচ্ছন্ন আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না। বাড়ীতে আর কেউ জেগে নেই। নিরঞ্জন তার ছোটদার সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। ছোটদাও বুঝেছেন জীবন-সংগ্রামের মর্য্যাদা। সংগ্রামই সত্য, তা সে যেমনই হোক! একটি ছোট কীট থেকে আরম্ভ করে জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী আত্মপ্রাণরক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে, এই সত্যটি নিরঞ্জন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে লাগল। আর তার নিজের কোনো সংগ্রাম নেই, কোনো সমস্যা নেই, এমন কি চিন্তা পর্য্যন্ত নেই! বড়দার কাছে, সংসারের কাছে, এমন কি জগতের কাছে নিরঞ্জন নিজেকে অপরাধী বলে মনে করতে লাগল।

কত রাত হয়ে গেছে, নিরঞ্জনের সে খেয়ালই নেই। একটি বন্দী বিশালকায় অজগরের মত প্রকাণ্ড কলকাতার শহর তখনো গর্জ্জন করছে। এই রক্তচক্ষু দানবীয় শহরটার যেন চোখে ঘুম নেই। নিরঞ্জন আজ যেন দিব্যচক্ষু পেয়েছে, সে যেন স্পষ্টই দেখতে পেল কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য মানুষ ঘোরাঘুরি করেছে, অন্ধকার সুড়ঙ্গপথের মত রাস্তা—আলো আসে কি না আসে এই রকম অবস্থা; আর সেই স্বল্পান্ধকার পথপ্রান্তে মানুষগুলোর মধ্যে বেধেছে হানাহানি, একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত। হিংসা তাদের ভ্রূকুটির মধ্যে জাজ্বল্যমান—যেন পাতালপুরীর তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে কতকগুলো নরপিশাচ সদ্য নর-রক্ত পান করবার জন্যে পৃথিবীতে উঠে এসেছে!

এই রকম নিদ্রাহীন অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়ে নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ জানালার বাইরে খুট করে একটা শব্দ হল—নিরঞ্জন চেয়ে দেখল ছোট বৌদি দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। নিরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছোট বধূ বললেন, 'ঠাকুরপো তুমি এখনো ঘুমোওনি; ঘরে আলো জ্বলছে দেখে আমি ভাবলাম, দেখি গিয়ে ব্যাপারটা কি? তোমার হয়েছে কি বলতে পার ঠাকুরপো? এমনি করে কি শরীর খারাপ করবে নাকি?' ছোট বধূর কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সস্নেহ আশঙ্কা।

নিরঞ্জনের সমস্ত অভিমান যেন তার বুকের মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে উঠল। সে শুধু বলল, 'আমায় একটু একা থাকতে দিন বৌদি—আজ আর নাই ঘুমোলাম।'

'ঘুমোবে না,. আচ্ছা। আমি তা হলে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব বলে দিচ্ছি এই শীতে। যতক্ষণ না শোবে, ততক্ষণ এই দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'আচ্ছা, আমি শুচ্ছি বৌদি, আপনি যান—' বলে নিরঞ্জন তার বিছানায় এসে বসল।

'শুধু শুধু রাত জেগে শরীর খারাপ কর না'—বলে ছোটবধূ জানালার পাশ থেকে সরে গেলেন।

নিরঞ্জন আপন মনেই হেসে উঠল। তবু ত তার একটা আশ্রয় আছে বলে মনে হয়। সেদিন সে কাগজে দেখছিল

একটি ছেলে পটাসিয়াম্ সায়েনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। হতভাগার জন্যে বোধ হয় তিলার্দ্ধ স্নেহও জোটে নি! তবু ত তার ছোট-বৌদি আছেন।

অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিরঞ্জন চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। তার মনে হতে লাগল, তার ঔদাসীন্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। নিজের স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করবার জন্যে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার নাম তাদের দলে নেই। সংসারকে তার আজো জানা হয়নি—ছোট থেকে সে ত অভাব কাকে বলে জানে না। যদি সেই সংসারকে জানতেই হয়, তাহলে এই অবস্থায় থাকলে চলবে না। সংসারের আসল রূপটা বুঝে নিয়ে যারা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, অজস্র অভাব পূরণ করে, নিত্য যারা সংগ্রামশীল, তাদের সেই বিপুল উদ্যমের প্রেরণা নিরঞ্জন নিজের মধ্যে অনুভব করতে লাগল।

এইরকম ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখছে; চারিদিকে রাশি রাশি গ্রন্থ—ভাবনা-কুঞ্চিতললাট পৃথিবীর অগণ্য মনস্বীদেব ছবি—একটা সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে, নিরঞ্জন সেই নীলাভ ধূপকুণ্ডলীর দিকে চেয়ে আছে। গ্রন্থের যেন জীবন আছে, ছবিরাও যেন সজীব—তারা যেন নিরঞ্জনকে বাক্যহীন সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, নিরঞ্জন, এই তোমার পথ, এই তোমার লক্ষ্য। বাইরের ঘন নীল রাত্রির আকাশে দপ-দপ করে একটা তারা জ্বলছে—তার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি নিরঞ্জনকে সংসার ভুলিয়ে দিচ্ছে, অন্তরের প্রদাহ দূর করছে। নিরঞ্জন সেই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে দেখল একটা সীমাহীন পথ-রেখা। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সেই আঁকা-বাকা শুভ্র পথ-রেখা কত সুন্দর, কত সুস্পষ্ট!

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই নিরঞ্জনের মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল। কোথায় সেই জগৎ—সেই ছায়ালোক, সেই শ্রেণীবদ্ধ স্তব্ধ ধ্যানমূর্ত্তি! বাইরের এই রৌদ্রদীপ্ত, কোলাহলময় অতি স্পষ্ট, অতি প্রত্যক্ষ সংসার তার কাছে কত শ্রীহীন!

সকালের নির্ম্মল আলোয় নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল—রাত্রির সেই স্বপ্নালোকের জগৎই তার জীবনের লক্ষ্য হবে। বাকি সমস্তই তার কাছে মিথ্যা, অর্থহীন। সংগ্রাম যদি করতে হয়, সেই জীবনকে লক্ষ্য করেই সে সংগ্রাম করবে। তাতে তার যা হবার হোক। সঙ্কল্পের শেষ অবধি নিরঞ্জন ভেবে নিল—কিন্তু উপায় নেই; যা সে সত্য বলে উপলব্ধি করছে, তার কাছে আত্মবিসর্জ্জন করতেই হবে। কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়ত হবে, কিন্তু উপায় নেই। এমনি ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন বাইরে চলে গেল।

বহুদিনের অনাদৃত বইগুলোর উপর ধুলো এসে জমেছে। নিরঞ্জন আজ কি মনে করে বইগুলো নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে টেবিলের উপরে রেখে দিচ্ছে আর আপন মনেই গুঞ্জন করছে—

দক্ষিণ সমুদ্র-পারে তোমার প্রাসাদ-দ্বারে
হে জাগ্রত রাণী,
বাজে নাকি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী?

এমন সময় ছোট বধূ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে একটা পাণ্ডুর, বিষণ্ণ ছায়া। হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ পড়তেই নিরঞ্জন বলে উঠল, 'কি হয়েছে বৌদি, অসুখ?'

একটু হেসে ছোটবধূ বললেন, 'কৈ না, কিছুই হয়নি ত।'

'অসুখের মতই ত মনে হয়, কি হয়েছে বলুন ত।'

'না কিছুই হয় নি, তুমি কি কবিতা পড়ছ শুনতে এলাম, পড় শুনি।'

'শুনবেন? আচ্ছা।'—বলে নিরঞ্জন পরম উৎসাহে কবিতা পড়তে লাগল—

নিরঞ্জন স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণে কবিতা পড়ে যাচ্ছে—আর ছোটবধূ তন্ময় হয়ে শুনছেন। কবিতার সুরের সঙ্গে তাঁর যেন কোথায় যোগ আছে! তাঁর মনের মধ্যে নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর যেন ক্রমাগত ঝঙ্কার তুলছে, তিনি মুগ্ধ হয়ে নিরঞ্জনের আবৃত্তি শুনে যাচ্ছেন। কবিতার এক-একটি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠছে এক একটি ছবি—দক্ষিণ সমুদ্রপারের অজ্ঞাত দেশের চিরজাগ্রত রাণী—আকাশ ভরা তারা—আর, গহন অরণ্যের নিশ্ছেদ শাখান্তরালে অসংখ্য পাখীর নিদ্রাহীন কলকণ্ঠ—এমনি কত স্পষ্ট, অস্পষ্ট

চিত্রমালা! তার চোখের পল্লব গভীর সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে আসছে।

কি আশ্চর্য্য সুন্দর লেখা—এ যেন আকর্ষণ করে, একটি মোহিনীমায়ায় সমস্ত সত্তাকে ঘিরে রাখে। নিরঞ্জন যে কেন কথাবিমুখ, কেন সে যে আবিষ্ট হয়ে থাকে, তার অর্থ যেন তাঁর কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

পড়া শেষ করে নিরঞ্জন তার ছোট-বৌদির দিকে চেয়ে রইল। তিনি স্নিগ্ধহাস্যে বললেন, 'বেশ সুন্দর।' কবিতা পড়ার সময়ে নিরঞ্জনের উৎসাহ, আগ্রহ আর আনন্দ লক্ষ্য করে ছোটবধূ বিস্মিত হয়েছেন। কৈ, এমন উৎসাহ ত নিরঞ্জনের অন্য বিষয়ে নেই। সংসারের একপাশে অতি সংকীর্ণ স্থান নিয়ে এই প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর যে উদাসীনভাবে কিসের ধ্যান করে, এতদিন পরে এই কবিতার আবৃত্তি শুনে ছোটবধূর মনে আর সে সম্বন্ধে সংশয় মাত্র রইল না। নিরঞ্জনের উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, এই সব নিয়েই তুমি বেশ খুসী থাক, না?'

নিরঞ্জন কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য নিয়ে এসে বলল, 'খুসী আর থাকতে দিচ্ছেন কৈ আপনারা? এই সব নিয়ে থাকতে পেলে ত বেঁচে যেতাম। আমি খুসী হলে আপনারা যদি খুসী হতেন, তাহলে ত কোন কথাই ছিল না।'

'কেন তোমার খুসী থাকার বাধা কি?'

নিরঞ্জন স্মিতহাস্যে বলল, 'এই জীবনটাই একটা বাধা। কাব্য ভাল লাগা, সাহিত্য ভাল লাগা, দরিদ্র সংসারে এ সব মনোবৃত্তি ত ব্যাধি বৌদি—আর, ব্যাধি মাত্রই বাধা।'

'ভুল বলছ তুমি ঠাকুরপো, তোমার ভাল লাগাটাই ত সত্যি। সংসার দরিদ্র হোক আর ধনীই হোক তোমার যা ভাল লাগে, যাতে তুমি সত্যি সত্যি আনন্দ পাও, তা তুমি কেন করবে না?'

'কথাটি ঠিক হল না বৌদি। আমার ত অনেক জিনিষ ভাল লাগতে পারে, কিন্তু তা বলে যা কিছু আমার ভাল লাগবে, তাতেই যে সংসারের মঙ্গল হবে—এর মধ্যে সত্য কোথায়?'

'আমি ও-সব বুঝি নে। সংসারের মঙ্গল যে কোনদিক দিয়ে হয়, তার তুমি কি জান? যাতে নিন্দে নেই অথচ যা করলে তোমার আনন্দ হয়, যা তোমার নিজের উন্নতির জিনিষ, তা তুমি একশবার করবে। সেইখানেই ত তোমার পৌরুষ!'

'কি জানি বৌদি—ঠিক বুঝতে পারি নে। মনে করুন, এখন টাকা আনতে পারলে সংসারের মঙ্গল হয়। আমার কি কর্ত্তব্য হবে টাকা আনবার চেষ্টা করা, না কবিতা আবৃত্তি?'

'টাকার কথা আমার কাছে তুলো না ঠাকুর পো! ও সব তোমার দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার বিষয়। তবে এটুকু আমি জানি যে, সাহিত্যচর্চ্চা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ত উপোস করেন নি। এক রকম করে চলে যায় দিন, কি বল?'

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল—'তা যেতে পারে। তবে, আমার নিজের দিক দিয়ে আমি মোটেই স্থিরনিশ্চয় নই।'

'তা হলে তুমি কি করবে? একটা কিছু ত করতে হবে।'

'তাই ত রাতদিন ভাবছি বৌদি। ওকালতির কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। কোনো আপিসের কেরাণীগিরি, না হয় ত নিদেনপক্ষে একটা স্কুলমাষ্টারি জোগাড় করে নিতে হবে। সাহিত্যের দিক দিয়ে কিছু করা যায় কি না তাই ভাবি মাঝে মাঝে—'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে ত পার—' খুব উৎসাহের সঙ্গে ছোটবধূ বললেন।

'কি কাজ?'

'কোনো মাসিক পত্রিকা বার করতে পার ত!'

'মাসিক পত্রিকা? অত টাকা কোথায় পাব বৌদি? যদিও কাজটি আমার মনের মত, কিন্তু সাহায্য করবে কে?'

ছোটবধূ এক মুহূর্ত্ত স্থির থেকে বললেন, 'আচ্ছা, আমি সাহায্য করব।'

নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিরঞ্জন তার ছোট-বৌদির স্নেহদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছোট-বৌদি একি বলছেন! উপহাস নয় ত—!

'তাই কি হয় বৌদি। আপনি? আপনি কি করে সাহায্য করবেন?'

'যেমন করেই হোক, আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি, তুমি পত্রিকা বার করতে পার কি?'

'তা কেন পারব না? তবে আপনি কি করে আমাকে সাহায্য করবেন, আমি ত তা' ভেবে পাই নে।'

'যেমন করেই হোক, আমি তা পারব। তুমি এখন কি করে কাজ আরম্ভ করবে, আমাকে তার হিসেব দাও ত দেখি।'

নিরঞ্জনের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সে বলল, 'আপনাকে প্রণাম বৌদি—আপনি আমাকে বড় স্নেহ করেন, কিন্তু আপনার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই নে।'

'না, তা হতেই পারে না ঠাকুরপো। তোমাকে যে এঁরা কেবল অপমান করবেন, তা আমার সহ্য হয় না। আমি নিজে থেকে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি কাগজ বের কর—নিজের কাজ করে যাও তুমি। দরিদ্র-সংসারে জন্মেছ বলেই যে তুমি অপরাধ করেছ, এমন ত নয়!'

নিরঞ্জন আর বেশী ভাবল না। সরল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে তার ছোট-বৌদিকে প্রণাম করে বলল, 'তাই হবে বৌদি, আমি তা হলে প্রস্তুত হই!'

পরদিন রাত্রে মহিমারঞ্জন আর ছোটবধূর চোখে ঘুম এল না। মহিমারঞ্জন কিছুতেই তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে পারেন না যে, নিরঞ্জনকে কয়েক হাজার টাকা দেওয়া আর টাকাগুলো নিয়ে জলে ফেলে দেওয়া একই কথা।

'তোমার নিজের টাকা আছে বলেই সেগুলো যে আমার চোখের সম্মুখে এমন করে অপব্যয় করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে।'

'সহ্য করতে না পার, তোমরা ওর দাদা, কি ও করতে চায় বা কি করবে এ সম্বন্ধে ওকে কখনো কি জিজ্ঞাসা করেছ? শুধু শুধু তোমরা ওকে নির্য্যাতন কর—সেটা কি ভাল?' 'নির্য্যাতন আর কিসের? ওর চেয়ে ঢের বেশী নির্য্যাতন আমি সহ্য করেছি। উপার্জ্জন করার কথাটা একটু জোর দিয়ে বললেই বুঝি নির্য্যাতন হল? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?'

'যেই দিক, কাজ ভাল হচ্ছে না। ওর প্রকৃতি তোমাদের মত অত কঠিন নয়; কি ও করতে চায় বা কি করতে পারে, তাই ওকে করতে দাও না কেন?'

'ও সব কিছু নয়, আমরা যে গরীব, আমাদের উঠতে বসতে পরের খোসামোদ করে চলতে হয়, কত ঝঞ্ঝাট, কত বিপদ-আপদ সহ্য করতে হয়, কত গ্লানি মাথা পেতে নিতে হয়—নিরঞ্জনকে এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে পার না? সাহিত্য, সাহিত্য! সাহিত্য নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? কটি লোক সাহিত্য বোঝে বা পড়ে?'

'তোমরা যা বোঝ কর গিয়ে! আমি যা বুঝি, তাই করব।'

'উত্তম কথা। তাহলে আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসা না করলেও পারতে। আর বেশী বিরক্ত কর না আমাকে। তোমার দেবর লক্ষ্মণটিকে আর বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না—তার নিজের হাত-পা আছে, লেখাপড়া শিখেছে—যেমন করে পারে কিছু আনুক সংসারে। তোমার এত মাথাব্যথা কেন?' ছোটবধূ দেখলেন মহিমারঞ্জন তাঁর নিজের মত থেকে তিল-মাত্র বিচলিত হবার লোক নন। সুতরাং আর বেশী কথা না বলে তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর সম্বন্ধ শুধু নামে। লেখাপড়া শিখেছে অতএব সে যেমন করে পারুক, কিছু নিয়ে আসুক। তা সে চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক! সরিষা-তৈলস্নিগ্ধ মসৃণ সংসারের বিপুলায়তন দেহের খোরাক জোটাতে হবে—হায় রে সংসার! নিরঞ্জন ঠিকই বুঝেছে। 'আপনাকে আমি বিপদে ফেলতে চাই নে বৌদি!' সে বলেছিল। কথা খুবই সত্যি। তাঁর নিজের যে স্বাতন্ত্র্য নেই, স্বাধীন মতামতের কোনো মূল্য নেই—নৈলে, নিরঞ্জন কি আর ঘরে বসে থাকবার ছেলে?—এমনি কত কথা ছোটবধূ ভাবতে লাগলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর আর ঘুম এল না।

সকালে মনোরঞ্জন বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। প্রসন্নময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে চায়ের কাপটা টি-পয়ের উপর রেখে দিয়ে চলে যাবেন, এমন সময় মনোরঞ্জন খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'প্রসন্ন, নিরো উঠেছে

বলতে পার? যদি উঠে থাকে, তাকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও।'

প্রসন্ন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'নিরো? নিরো এত সকালে উঠবে?'

'বড় খারাপ অভ্যেস প্রসন্ন। তোমার আমার ত দেরী হয় না উঠতে। তার মানে কি? মানে আর কিছুই নয়—আমরা দুই ভাইবোনে জানি, অভাব কাকে বলে। সকালে না উঠলে মনে হয়, দিনটা বুঝি ছোট হয়ে গেছে।'

প্রসন্নময়ী আপন মনেই বকতে বকতে বাইরে চলে গেলেন। বাইরে থেকে নিরঞ্জনের নাম ধরে ক্রমাগত ডাকতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহিমা চায়ের বাটি হাতে করে বাইরের ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর, অপ্রসন্ন।

উভয় ভ্রাতা নিঃশব্দে চা পান করে যাচ্ছেন। যেন দুটি অগ্নিগিরি উৎপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের চরম প্রান্তে এসে স্তব্ধ হয়ে আছে।

স্তব্ধতা ভেঙে চায়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে মহিমা বললেন, 'বিষম সমস্যা দাদা, ছোটবৌ নিরোকে টাকা দিতে চাইছেন!'

মনোরঞ্জনের মুখাকৃতির শান্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবিধ কুটিল রেখায় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। উৎক্ষিপ্ত মনোরঞ্জন ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'বল কি?'

ঘাড় নেড়ে মহিমা সংক্ষেপে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই!'

'আজ আর আমার আপিস যাওয়া হল না দেখতে পাচ্ছি। এ ত' বড় অন্যায় দেখতে পাচ্ছি! কৈ, প্রসন্ন, নিরো হতভাগা উঠেছে বিছানা ছেড়ে?'

ভিতর থেকে প্রসন্ন চীৎকার করে বললেন, 'হ্যাঁ, উঠেছে—যাচ্ছে বাইরে।'

কিছুক্ষণ পরে ভীতচকিতদৃষ্টি পাংশুমুখ নিরঞ্জন বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখলে হঠাৎ সপ্তমে স্বর চড়িয়ে কিছু বলা যায় না। মনোরঞ্জন অতি ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হঠাৎ টাকার তোমার কিসের দরকার হল নিরো? আর, সে কথা আমাদের না বলে তুমি ছোট-বৌমার কাছে গিয়েছ টাকা চাইতে?'

নিরঞ্জনের বুদ্ধি এই আকস্মিক প্রশ্নে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে শীঘ্র কথা বার হতে চায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে নিরঞ্জন বলল, 'টাকার আমার দরকার নেই, আমি ছোট বৌদির কাছে টাকা চাই নি।'

মহিমা রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'টাকা তুমি না চাইলে, ছোট-বৌ কি স্বেচ্ছায় টাকা দিতে চেয়েছে তোমাকে—আহাম্মক!'

মনোরঞ্জন শান্তকণ্ঠে বললেন, 'উঁহু, বিরক্ত হয়ো না মহিম! কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

নিরঞ্জন বলল, 'ব্যাপার কিছুই নয়। এমনি কথা হতে হতে ছোট বৌদি বললেন, চুপ করে বসে না থেকে একখানা মাসিকপত্র বার কর, টাকার জন্যে ভেব না, আমি তোমাকে টাকা দেব!'

মনোরঞ্জন ঘাড় নেড়ে বললেন 'হুঁ' এতদূর? মহিম বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হল সংসারে। এর প্রতিকার একটা কিছু হওয়া দরকার!'—বলেই মনোরঞ্জন তাঁর কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'আর তোমাকে বলি নিরঞ্জন, এখনো তোমার জ্ঞান হওয়া দরকার। ছোট-বৌমা তোমাকে অর্থ-সাহায্য করবেন, আর, তুমি সেই অর্থ দিয়ে মাসিকপত্র চালাবে—খুব গৌরবের কথা বটে। একটু লজ্জাও কি হয় না তোমার নিরো? এর পরে, এ বাড়ীতে তুমি থাকবে কি করে। আমি হলে ত, এতদিন বেরিয়ে পড়তাম যে দিকে দুচক্ষু যায়।'—নিরঞ্জন মাথা নত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মহিম কণ্ঠস্বরে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'একেবারে চরম হয়ে উঠল, আমারই ইচ্ছে করছে যে দিকে দু চক্ষু যায়, বেরিয়ে পড়তে।'

মনোরঞ্জন পুনরায় শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না, তার দরকার নেই। ছোট-বৌমাকে বুঝিয়ে দাও, নিরঞ্জনকে যেন তিনি আর এ ভাবে প্রশ্রয় না দেন। তার মাথার উপরে আমরা রয়েছি, তিনি কেন তাকে বিদ্রোহী করে তুলছেন? তার হিতাহিত মঙ্গলামঙ্গলের ভার আমাদের, তাঁর নয়।'—মহিম বললেন, 'আমি কোনো কথা বলতে বাকি রাখি নি। তবে আমাদের মনে হয় নিরোকে আর কালবিলম্ব না করে আপনি আপনার আপিসে নিয়ে যান। মঙ্গলামঙ্গলের ভার আমাদের, কিন্তু অমঙ্গলটাই যদি বেশী দেখা যায়, তা হলে কে স্থির থাকতে পারে—বলুন!'

মনোরঞ্জন বললেন, 'সে ত সত্যি কথাই। দেখি কি কতদূর করতে পারি! কিন্তু আপিসে নিয়ে যাব কাকে?

ও কি একটা মানুষ ? সাত চড়ে যার মুখে রা নেই, সে কাজ করবে কি করে ?

নিরঞ্জন আর স্থির থাকতে পারল না, মাথা তুলে বলল, 'না, না—আপিসে যাওয়ার দরকার নেই, আমি শীগ্‌গির না হয় একটা কিছু করব, আপনারা আর বেশী ভাববেন না।' একটি অদ্ভুত বক্রহাসি হেসে মনোরঞ্জন বললেন, 'বেশ ত, বেশ ত, অতি উত্তম কথা, কিন্তু তুমি তা করবে কি ? শেষ-কালে ছোট-বৌমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি বড় হতে চাও ! নিজেকে ধিক্কার দাও—' বলে মুখের রেখাগুলোকে যতদূর সম্ভব কুটিল করে মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন, 'আপিসের বেলা হল রে প্রসন্ন, দেখে শুনে হতজ্ঞান হলাম। এরই নাম শিক্ষা।'—বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহিমাও আপিসের নাম শুনে ধীরে ধীরে বাইরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে চৌকীর একপাশে বসে রইল। সে তার সরল সহজ বুদ্ধিতে ঘটনা যে এতদূর আসতে পারে, তা অনুমান করে নি। দুঃখে ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ করে জল ঝরে পড়তে লাগল। এই বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও তার থাকবার ইচ্ছে নেই। চারিদিক থেকে শুধু বিষাক্ত তীর এসে তার বুকে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করেছে। আজ যা হয় একটা তাকে করতেই হবে।

গভীর রাত্রে বাড়ী যখন নিঃস্তব্ধ, তখন নিরঞ্জন একটা ছোট সুটকেসে খানকতক বই আর কিছু কাপড়-জামা বোঝাই করছে।

হঠাৎ একটা আর্ত্ত তীব্র চীৎকারে তার মন সচকিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে মহিম একটা আলো নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে যাচ্ছেন। নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়েই মহিম বললেন, 'নিরো, মহাবিপদ, তোমার ছোট-বৌদির ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আমি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে। তুমি যাবে ? আচ্ছা, তুমিই যাও—আমি দেখি, এদিকে দাদাকে ডেকে তুলে নিয়ে আসি। তুমি যাও শীগ্‌গির—'

নিরঞ্জন যখন ডাক্তার নিয়ে বাড়ী এল, তখন বাড়ীতে একটা মহা সোরগোল পড়ে গেছে। মনোরঞ্জন চীৎকার করছেন—'নিরো এখনো এল না ডাক্তার নিয়ে ?'

প্রসন্নময়ী আলো নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিরঞ্জনকে দেখে বললেন 'এই যে এসেছে !' ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দেখে বড়-বৌদি ছোট-বৌদির মাথায় হাওয়া করছেন আর মহিমা তাঁর চোখেমুখে জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছেন।

ডাক্তার ঘরের মধ্যে আসতেই সকলে একটু সরে বসলেন। বাক্স থেকে ওষুধ বার করে খাওয়ানো এবং আর-ও অন্যান্য ব্যবস্থা শেষ করে ডাক্তার যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'কোন মানসিক উত্তেজনায় আর উদ্বেগে এ-রকমটি হয়েছে, বিশেষ কেনো ভয়ের করণ নেই, একটু পরেই জ্ঞান হবে।'

নিরঞ্জন দেখল, তার ছোট বৌদির দেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে, হঠাৎ দেখলে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর, বাড়ীর সকলের মুখে একটা উদ্বেগ আর আশঙ্কার ছায়া। বড়-বৌদির মুখ থেকে উৎকট ঘৃণার রেখাটা দূর হয়ে গিয়েছে—দাদাদের উভয়েই নিস্পন্দ, স্থির, প্রসন্নময়ীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর হয়েছে নীরব। একটা আসন্ন বিপদের পরম মুহূর্ত্তে সকলের মন থেকে বিষাক্ত হাওয়াটি দূর হয়েছে। নিরঞ্জন ধীরে ধীরে তার ছোট-বৌদির মাথার কাছে গিয়ে বসল। মনোরঞ্জন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড়-বৌ, দেখ ত, বৌমার দাঁতি-লাগাটা ছেড়েছে কি না ?'

বড় বধু ঘাড় নেড়ে জানালেন, ছেড়েছে।

মনোরঞ্জন বললেন, 'তবে আর ভয় নেই মহিম—এস আমরা যাই।'

এই কথার কিছুক্ষণ পরেই ছোট বধূ চোখ মেলে চাইলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মনোরঞ্জন বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না বৌমা, যেমন শুয়ে আছ, অমনি থাক।'

ছোটবধূ বালিশের উপরে মাথা রেখে আবার চোখ মুদ্রিত করলেন। প্রসন্নময়ী একবাটী গরম দুধ নিয়ে এলেন—তখন মনোরঞ্জন এবং মহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

বড়-বৌ নিরঞ্জনকে বললেন, 'নিরো, তুমিও যাও ঘর থেকে, ওর কাপড়-জামা সব বদ্‌লাতে হবে। খানিকটা পরে আবার এস।'

নিরঞ্জন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে চলে গেল। তার মনে হতে লাগল, ছোট-বৌদির ফিট সংসারে আবার শান্তি নিয়ে এল। কিন্তু এ হয় ত সাময়িক, আবার রাত্রি শেষ হলেই দেখা যাবে সেই গোলমাল, সেই অশান্তি, সেই টাকা-টাকা রব! নিরঞ্জন তার নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানার আশ্রয় নিল, আজ আর তার সুটকেস গোছানো হল না।

পরদিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জনের কি মনে হল, ছোট-বৌদির ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ছোট বধূর দুর্ব্বলতা এখনো যায় নি। খাটের বিছানার একপাশে তিনি শুয়ে আছেন। নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে আসতেই তিনি বললেন, 'এসেছ ঠাকুরপো, বস। তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছি। মাসিক-পত্রের কথাটি না তুললেই বোধ হয় ভাল হত।'

নিরঞ্জন খাটের একপ্রান্তে চুপ করে বসে রইল।

ছোটবধূ বলে যেতে লাগলেন—'ছোট থেকে কারো কষ্ট আমি সহ্য করতে পারিনে মোটেই। তোমাকে ওঁরা বারে বারে অপমান করেন, সেই জন্যেই ও-কথা আমি বলেছিলাম। দেখলাম, বলা আমার ঠিক হয় নি—শেষ পর্য্যন্ত আমারই ফিট হল।'

নিরঞ্জন অল্প একটু হেসে বলল, 'ভুলে যান বৌদি, ভুলে থাকাই ভাল। আমি ত আর ভাবি নে কিছুর জন্যে। আপনি বেশী ভাবেন, তাই কষ্ট পান বেশী।'

'তাই দেখছি ভাই,—ভুলে যাওয়া ভাল, না কষ্ট পাওয়া ভাল, কোন্‌টি ভাল ঠিক বুঝতে পারছি নে। যাই হোক, ফিটের ব্যাপারটা নিতান্ত মন্দ লাগল না, এইসব ব্যাপারে মানুষ চেনা যায়। যিনি ভুলেও আমার ঘরের দিকে আসেন নি কোনোদিন, সেই বড়দিই সকলের আগে এসে আমার মাথা কোলে তুলে নিলেন, আশ্চর্য্য!' ছোটবধূর বড় বড় চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

নিরঞ্জন কোনো কথা বলতে পারল না, জীবনের বিভিন্ন পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে একই দৃশ্যকে হয় ত নানান্ আকারে দেখা যায়! তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আবার হয়ত লক্ষ্য করলে এখুনি দেখা যাবে বড়-বৌদির মুখে সেই চিরপরিচিত ঘৃণা আর বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে। এই বৈচিত্র্যকে কোন গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় না—তাই, ছোট-বৌদি বড়বধূর যে-টুকু ছবিতে আনন্দ পেয়েছেন, তাকে আর যুক্তির আঘাতে ভাঙবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের হল না।

'শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে আপনার ছোট-বৌদি?'

'খুব ভাল নয় ভাই, ভারি দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। মাথার দিককার জানালাটি খুলে দেবে ভাই?'

জানালা খুলে দিল নিরঞ্জন। আকাশ-ভরা তারা; কলকাতার আকাশ যে এত স্বচ্ছ হতে পারে, নিরঞ্জন তা ধারণাতেও আনতে পারে না।

জানালা খুলে দিয়ে নিরঞ্জন বলল, 'আমি তা হলে যাই ছোট-বৌদি! আপনার এখন বেশী কথা বলা ঠিক নয়।'

'যাই বলতে নাই ভাই, বল 'আসি'।'

'আচ্ছা আসি বৌদি' বলে নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকের সংসারটাকে নিরঞ্জনের কেমন যেন খাপছাড়া বলে মনে হতে লাগল। এত সহানুভূতি, এত দরদ—কৈ, নিরঞ্জন ত আগে লক্ষ্য করে নি। সংসারের কঠিন রুক্ষতার অন্তরালে যে গোপন ফল্গুধারা আছে, তার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। তাই আজকের এই সংসারের নূতন রূপ তার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারায় এসে আঘাত করতে লাগল। খেতে বসে সে লক্ষ্য করে দেখল, বড়বধূ আজ তাকে, আজ একটু যেন বিশেষ যত্ন করছেন—'মাছের মুড়োটা খাও ভাই। শ্বশুরবাড়ী গেলে কত যত্ন করে খাওয়াবে তারা।'

প্রসন্নময়ী যেন দূর থেকে বলছেন, 'ঐ টুকু ছেলে, ওর আবার বিয়ে!'

নিরঞ্জনের কেমন যেন লাগল আজ। দিদি যে শুভসংবাদ দিলেন, সেইটাই সত্য নাকি? খাওয়ার পর মহিমা এবং মনোরঞ্জন উভয়ে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন বাইরে—তার মধ্যে নিরঞ্জন তার নিজের নামটা উচ্চারিত হতে শুনল বারকতক। সেখানে আর না দাঁড়িয়ে সে সোজা তার নিজের ঘরে চলে এল।

তার কেবলি মনে হতে লাগল, আর দেরী করা নয়।

সংসারের গতি যে দিকে ফিরছে, সেদিকটা মোটেই তার বাঞ্ছনীয় নয়। মনের নিভৃত কোণে এমন একটা রসের স্পর্শ সে পেয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে তার একলার জীবন বেশ চলে যেতে পারে। সংসারের এই নিত্য ভাবান্তর, এই সচলতা—এ যেন তার মোটেই মানায় না। সে বেশ করে ভেবে দেখেছে, তার স্থান সংসারের বাইরে। শিল্পী, কবি,—মুক্ত একাগ্র উপাসক সে। সেই নির্ম্মল আনন্দ, সেই নিভৃত নির্জ্জনবাস, হৃদয়ের সেই মুক্তস্বচ্ছ সরলতা—এর কাছে কামনার আর তার কিছু নেই। সংগ্রাম করতে হয়, এই-গুলোর জন্যে সে সংগ্রাম করবে, আর অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত নয়। সেই যে তার স্বপ্নে-দেখা সাধনার আসন—সেই সজীব গ্রন্থরাশি, মনস্বীদের ভাবনা-কুঞ্চিত ললাট, চিত্তের গভীর অনুরাগের মত নীলাভ ধূপ-ধূম —এই ধ্যানাসন-ই তার চিরকালের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সংসারের কোথাও আর তার কিছু বন্ধন নেই—রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তবিসারী সেই বঙ্কিম শুভ্র পথ-রেখা, স্বপ্নের সেই পথ যেন তাকে অদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করছে।

নিরঞ্জন ভাবল; আর দেরী করার কোনো প্রয়োজন নেই। সংসারের প্রয়োজন তার নেই এবং তার প্রয়োজনও সংসারের নেই, অতএব এই সীমাহীন মুক্তির মধ্যে জগতের রূপটাকে একবার দেখে আসা দরকার।

খুব ভোরে নিরঞ্জন উঠল। সুটকেশটা হাতে করে নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। একদিকে অজানা পথের আহ্বান, অপর দিকে আসন্ন বন্ধনচ্ছেদনের মুহূর্ত্তে প্রথমে ছোট-বৌদির বিমর্ষ পাণ্ডুর মুখ; তারপরে দিদির, তারপরে দাদাদের এবং সবশেষে বড়-বৌদির যত্ন করে খাওয়ানোর স্মৃতি তার মনের একদিকে ক্ষতস্থানের মত টন-টন করে উঠল। মনে মনে সে বলল, 'দাদা, আজ আপনাকে নিষ্কৃতি দিলাম। আমার ভবিষ্যতের ভাবনা আর আপনাকে ভাবতে হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। বুকের ভেতর থেকে যেন একটা উত্তপ্ত অভিমান অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে চায়!

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেই সে দেখল, প্রসন্নময়ী দালানটা ঝাঁট দিচ্ছেন। প্রতিদিন খুব ভোরে ওঠা তাঁর অভ্যাস। আজও যথাসময়ে তিনি উঠেছেন—কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের জানা ছিল না। জুতোর শব্দ শুনেই তিনি মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন—নিরঞ্জন সুটকেশ নিয়ে সদর দরোজার দিকে দ্রুত-বেগে অগ্রসর হচ্ছে। তিনিও দ্রুতপদে তার অনুসরণ করে একেবারে দরোজার কাছে এসে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকলেন, 'নিরো!'

নিরঞ্জন ফিরে দাঁড়াল। দিদির চোখের দিকে চাওয়া যায় না। সুটকেশটি হাতে নিয়ে নিতান্ত নির্ব্বোধের মত নিরঞ্জন মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'কোথায় যাচ্ছিস এই ভোরে?'—বলেই তিনি তার হাত থেকে সুটকেশটা কেড়ে নিলেন।

'কোথায় যাচ্ছিস্ হতভাগা এই সুটকেশ নিয়ে?'

কোনো উত্তর নাই।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিস বুঝি! ভেবেছিস পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবি? ওরে হতভাগা, যেখানে যাবি, সেখানেই যে টাকা চাই—এ কথাটা তুই এত বড় হয়েছিস, আজো বুঝলি নে? অভিমান কার উপর করবি, নিজেই ঠকবি যে! তোর জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে নিরো! যা আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? বড়দা এখনো ওঠেন নি, যা ঘরে চলে যা—এখনো রাত আছে।'

ঘর এবং বাইরের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ভাবতে লাগল, তার ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে সেই অদৃশ্য দেবতা একি নিষ্ঠুর উপহাস আরম্ভ করলেন!

একটি মুখ

শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

কালীতত্ত্ব

—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সকল পদার্থের, বিশেষতঃ পারমার্থিক বস্তুর, তত্ত্ব বা স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ও অনির্ব্বাচ্য। পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় করা মানুষের অসাধ্য; কিন্তু তাহা হইলেও সে প্রাণের অশান্ত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া অনির্দ্দেশ্য বস্তুকেও তাহার ক্ষীণ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে চিরদিনই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহাতে মানুষের আত্মচিত্তবিনোদন ভিন্ন আর কি ফল হইয়াছে তাহা যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানেন। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই প্রসারিত হউক না কেন, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বোধ হয় চিরকালই তাহার নিকট অবিদিত থাকিবে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা মানুষের চিরন্তন স্বভাব এবং স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ইহা ক্ষমার যোগ্য।

আমরা আজ যে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাও অনির্ব্বচনীয়—"অবাঙ্‌মনসগোচর"। তবে পুরাণ-তন্ত্র-পরিপ্লাবিত ভারতবর্ষে শক্তিতত্ত্বের আলোচনা কখনও নূতন বা অপ্রীতিকর বলিয়া পরিগণিত হইবে না, ইহা সত্য। কালী-মূর্ত্তি শক্তিতত্ত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি; ইহাতে সৃষ্টি ও সংহারের কত রহস্য যে জড়িত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালীর মূর্ত্তি, ধ্যান এবং পূজাপ্রণালী অনেকেরই দৃষ্টি বা শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। অনেক স্থানে কালিকার মৃন্ময়ী বা পাষাণ-ময়ী প্রতিমার নিত্য পূজার ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। কালীর ধ্যানগম্য মূর্ত্তি ও তাহার তাৎপর্য্যসম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্থূল চোখে দূরের কথা, একবার মানসনেত্রেও যাঁহার রূপ কল্পনা করিবার উপযুক্ত সাধনাবল আমাদের নাই—সেই ভুবনমোহিনী জগদীশ্বরীর রূপের কথা কেমন করিয়া বলিব? যাঁহার রূপে জগতের রূপ, যাঁহার কমনীয় দীপ্তিতে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি সকল উজ্জ্বল, তাঁহার রূপ মানুষের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অরূপই তাঁহার প্রকৃত রূপ[১]। উপনিষদের ঋষিগণ পরতত্ত্বকে অরূপ বা রূপাতীত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু সাধক সাধনার পথে অরূপেরও রূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এই রূপের উপাসনা করিয়াই চরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন[২]। সিদ্ধ পুরুষগণের দৃষ্ট বা ধ্যেয় দেবমূর্ত্তিসকল যে অলীক কিংবা শুধু মনঃকল্পিত নয় তাহা আমরা পরে বলিব। তবে আমরা এখানে কি বলিব? কালীতন্ত্র-স্বতন্ত্রতন্ত্র-কালিকা-পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকার যে রূপ বর্ণিত বা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই এখানে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব-মাত্র।

পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আমরা সাধারণতঃ দক্ষিণা-ভদ্র-গুহ্য প্রভৃতি ভেদে আট প্রকার কালীমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাই[৩]। ইহার মধ্যে দক্ষিণা-কালিকাই আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে পূজিত ও আরাধিত হইয়া আসিতেছেন। দশ মহাবিদ্যার মধ্যেও কালীর নামই প্রথম শ্রুত হয়[৪]। তন্ত্রশাস্ত্র কালীকেই "আদ্যা শক্তি" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন[৫]। যিনি সকলের আদিভূত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি মহাসত্তা বা মহাশক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন তিনিই কালী। সকল শক্তির বীজস্বরূপ বলিয়া ইহাকে বলা হয় "আদ্যা শক্তি" বা "পরা শক্তি"। কালী নিত্য ও অদ্বিতীয়[৬]; তাঁহার উৎপত্তি-বিনাশ বা উদয়াস্ত নাই। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, দেবী নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত হইলেও দেবগণের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি রূপবিশেষ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন[৭]। এই ভাবে অবতীর্ণ হইয়া মহামায়া দক্ষকন্যা-পার্ব্বতী-প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছেন। কালী যে বিশ্বের প্রসূতি এবং জীবজগতের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী তাহা অধিকাংশ হিন্দুগণই শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কালী অতি প্রাচীন দেবতা। প্রামাণিক

১। অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।—কুলার্ণবতন্ত্র

২। অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।—কুলার্ণবতন্ত্র

৩। আকাশাদি ভেদে শিবেরও অষ্টমূর্ত্তি আছে।

৪। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, মহামায়া দক্ষযজ্ঞে গমন করিবার প্রাক্‌কালে মহাদেবের বিস্ময়োৎপাদনের জন্য কালী-তারাদি দশটি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। কালম্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র

৬। একৈবাহং জগৎ কৃৎস্নং দ্বিতীয়া কা মমাপরা।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

৭। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

উপনিষদেও কালীর নাম এবং তাঁহার করাল মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১]। মহাশক্তি যে কখন কি ভাবে কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন পুরাণে তাহার একাধিক বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষযজ্ঞে গমনব্যপদেশে ভগবতী কালী-তারা প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাদেবকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। আবার শুনিতে পাওয়া যায় যে, শুম্ভ নামক দৈত্যকে বধ করিবার সময় মহামায়ার শরীরকোষ হইতে কৌষিকী দেবী বিনির্গত হইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবী কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কালিকাখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

"তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

অম্বিকার ললাট-ফলক হইতে কালিকার আবির্ভাবেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

কালিকাপুরাণেও প্রায় এই ভাবের বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে।

"বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়তস্তদা।
ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূৎ গৌরী ক্ষণাদপি ॥
কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া।"

কালীতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমেই কালের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। কালীর সহিত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই কাল শুধু কাল নয়—ইহা মহাকাল। মহাকাল ও মহাকালী নিত্যযুক্ত। আকাশতত্ত্বের সহিত কালতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগই তন্ত্রে শিব-শক্তির রমণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাই শিবশক্তিতত্ত্ব। কালী সংহারের মূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহার সহিত সর্ব্বোচ্ছেদকারী কালের এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ। অথবা কালী ও কাল উভয়ই মূলতঃ এক। আগমিকগণ উভয়ের অভেদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শিব ও শক্তি ভিন্নাকার হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অভিন্ন[২]। এই অভেদ কি প্রকার? অগ্নির যেমন উষ্ণতা, সূর্য্যের যেমন কিরণ এবং চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না, শিবের পক্ষেও শক্তি সে প্রকার[৩]।

এখন প্রশ্ন হইবে যে, কাল বলিতে আমরা কি বুঝি। যাহা সকল পদার্থের কলন বা বিনাশ সাধন করে তাহাই কাল (কলনাৎ সর্ব্বভূতানাম্)। কেহ বলিয়াছেন,—যাহার দ্বারা দ্রব্যের উপচয় এবং অপচয় সংঘটিত হয় তাহাই কালশব্দ-বাচ্য[৪]। অথর্ব্ব-বেদে কথিত হইয়াছে যে, "কাল সকলের ঈশ্বর এবং কালেই ব্রহ্ম সমাহিত আছেন। কালের সাতটি চক্র আছে যাহার ঘূর্ণনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিষ্পেষিত হইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই কালের রূপ। কাল সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে; স্বয়ম্ভু-কশ্যপ প্রভৃতি সকলই কাল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কালেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে"[৫]। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, এই কালই কালীর চরণতলে পতিত মহাকাল বা শিব। কালীর করাল মূর্ত্তি এবং কালের রুদ্র মূর্ত্তি উভয়ই মহাপ্রলয়ের সূচনা করে। "কালো হ সর্ব্বস্যেশ্বরঃ" ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কালরূপী শিব ও ঈশ্বর একই তত্ত্ব। কাল ও কালীর সংযোগ যে পরতত্ত্বের প্রতিবিম্ব তাহা এখন আমরা ধারণা করিতে পারিব।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে কাল যে কি পদার্থ তাহার একটু আভাস পাওয়া গেল। কালকে বলা হইয়াছে —"যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ" অর্থাৎ কাল প্রজাপতিরও উৎপাদক। কাল নিত্য এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান[৬]। দিনরাত্রি প্রভৃতি বিভাগ মানুষের কল্পনামাত্র। সাধারণতঃ আমরা আদিত্যগতির সাহায্যে কালের বিভাগ করিয়া থাকি।

এখন আমরা শক্তির দিক্ দিয়া কালতত্ত্বকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, যাহাকে আমরা "কাল" বলি তাহা মহাশক্তির রাজ্যে শক্তিবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। শক্তিতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,

---

১। কালী করালী চ মনোজবা চ—মুণ্ডকোপনিষৎ

২। উমাশঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ ॥- লিঙ্গপুরাণ

৩। পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং ভাস্করস্যেব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা শিবা ॥

৪। "যেন মূর্ত্তীনামুপচয়াশ্চাপচয়াশ্চ লক্ষ্যন্তে তং কালমাহুঃ"—মহাভাষ্য

৫। অথর্ব্ববেদ, ১৯।৫৩—৫৪।

৬। সাংখ্যমতে আকাশতত্ত্ব হইতে কালের উৎপত্তি। নৈয়ায়িকসিদ্ধান্তে কাল নিত্য পদার্থ। বেদান্তের মতে আকাশাদি সকলই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।"

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই শক্তির উদ্ভূত রূপ; শক্তিমাত্রা হইতেই সকলের উৎপত্তি[১]। শক্তিই জগতের চরম উপাদান। সংহারের ভৈরবী মূর্ত্তিই কালের রূপ। কালের করাল কটাহে জীব জগৎ নিরন্তর নিষ্পেষিত হইতেছে। কালগর্ভ হইতে সকল ভূত পদার্থের উৎপত্তি এবং কালগর্ভেই সকলের লয় হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে :—

"কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ"।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালের কবলে নিপতিত; কালশক্তিকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। এখন জিজ্ঞাস্য— কালী কি? কালী কোন তত্ত্বের প্রতীক? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যিনি কালের উপরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কালশক্তির অনধীন এবং নিত্যসিদ্ধা মহাশক্তি তিনিই কালী। যে কাল জগতের আধার (কালো হি জগদাধারঃ) কালী হইলেন তাহার আশ্রয়। রুদ্ররূপী মহাকাল সকলকে গ্রাস করেন, আর সর্ব্বসংহারিণী কালী মহাকালকেও বিনাশ করেন।

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী ॥"

সাধারণ দৃষ্টিতে কাল সকলের আধার হইলেও অদ্বৈত ভূমিতে তাহার পৃথক্ সত্তা থাকেনা; সেখানে কালশক্তি পরা শক্তিতে লয়প্রাপ্ত হয়। এই মহাশক্তিকেই উপনিষদে বলা হইয়াছে "সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠা।" দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিগণও এই পরম তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা"

বিশ্বের যে-দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই শক্তির বিচিত্র খেলা দেখিতে পাই। আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র সর্ব্বত্রই শক্তির অপূর্ব্ব লীলা। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বের সমস্ত শক্তি একই শক্তিসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। কালী অনন্তশক্তির আশ্রয়। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মিজাল বিকীর্ণ হয়, মহাশক্তি কালী হইতেও তেমন অনন্ত শক্তিকণা উদ্ভূত হয়। মায়া, দিক্ ও কাল সমস্তই তাঁহার শক্তি। শক্তিসমূহ তাহা হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়[২]। শক্তির সংখ্যা অগণিত। প্রত্যেক দ্রব্যই শক্তির মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে বিচার করিয়া দেখিলে মায়াশক্তি ও কালশক্তিকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়। আমরা এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযোগী বলিয়া কালশক্তির কথাই বলিতেছি। অন্যান্য শক্তি কাল-শক্তির পরতন্ত্র[৩]। ঘটের দ্বারা জলাহরণ করা হয়; কিন্তু জল'হরণ ক্রিয়াত্মিকা ঘটশক্তি কালশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কালবিশেষেই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়[৪]। কালশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই মহাশক্তির "অব্যাহত কলা সমূহ" জন্মাদি ছয়টি বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যিনি শক্তিমান্ তিনি ও তাঁহার শক্তিতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহাই শক্তি-বাদিগণের সিদ্ধান্ত। পর তত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া শক্তিরাশিকে অব্যাহত বা নিত্য বলা হইয়া থাকে। কালেই সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপচয় ও নাশ হয়। উল্লিখিত বিকারগুলির কারণান্তর থাকিলেও কালই সকলের সহকারী কারণ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমমাত্র। কালের বিশাল উদরে সকল বস্তুর পরিপাক হয়। কাল যে শক্তিবিশেষ এবং সর্ব্বপ্রকার বিকারের হেতু তাহা পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন :—

"অব্যাহতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ।
জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষট্ ভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥"—বাক্যপদীয়

কালশক্তি কি? ইহার উত্তরে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,— পরব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপে অবস্থিতিই কালশক্তি। এই কালশক্তিই লৌকিক ব্যবহারে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ-প্রভৃতি নানারূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

"একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ ॥"—বাক্যপদীয়

অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখিলে কালশক্তি পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পুণ্যরাজ "সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং চানির্ব্বাচ্যা শক্তিরূপা" এই প্রকার

১। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—"শক্তিমাত্রাসমূহস্য বিশ্বস্যানেকধর্ম্মণঃ।— বাক্যপদীয়।

২। শক্তিভ্যো ব্রহ্মণোঽপৃক্‌ত্বেঽপি আরোপিতঃ পৃথক্ত্বাবভাসঃ।— পুণ্যরাজ।

৩। কালাখ্যেন স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বাঃ পরতন্ত্রা জন্মাদিমত্যঃ শক্তয়ঃ—পুণ্যরাজ।

৪। কার্য্যমাত্রের প্রতি বিশিষ্ট দেশ, কাল ও নিমিত্তের প্রয়োজন হয়। "বিশিষ্টদেশকালনিমিত্তোপাদানাৎ"—শাঙ্করভাষ্য।

ব্যাখ্যা করিয়া কালশক্তি যে মায়াশক্তিরই নামান্তরমাত্র তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মকে "পরিপূর্ণশক্তি", "অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত" এবং "সর্ব্বশক্তি" প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১]। চেতন ব্রহ্ম যখন জগতের কারণ, তখন তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মেরই সমন্বয় হইতে পারে (সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ)।

শাঙ্কর বেদান্তের ন্যায় শাক্তাগম ও শৈবাগমও অদ্বৈত-বাদী। শাক্তগণ শক্তিকে অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। চিন্ময়ী অগণিত শক্তির আকর; চিদেকঘনা মহামায়া হইতেই সকল শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। কাল, দিক্ ও মায়া সকলই তাঁহার শক্তি। আমরা যাঁহার রূপবর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি সেই কালী শক্তিরই প্রতিমূর্ত্তি এবং তিনিই সকল বস্তুতে শক্তিরূপে বিরাজিত।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

এইভাবে শক্তিতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে কালকে শক্তি-বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। কালীকে "কাল-শক্তির আশ্রয়" বলিয়া আমরা বুঝিলাম যে, কালী কালপরতন্ত্র নহেন অর্থাৎ তিনি কালকৃত উপাধিবর্জ্জিত। কালশক্তি অন্যত্র অব্যাহত হইলেও মহাশক্তির নিকট উহা অত্যন্ত বিকল। কালাতীত বস্তু মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। মানুষের সকল জ্ঞানবিজ্ঞান কালিক বা কালবিশেষের দ্বারা নিয়মিত। এই জন্যই আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে কালীতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়াছি।

যোগদর্শনও ঈশ্বরকে কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছে[২]। যিনি ক্লেশকর্ম্মাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা তিনি কেমন করিয়া কালের অধীন হইবেন? কাল বা অন্য কোন পদার্থের পরতন্ত্র হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই থাকিতে পারে না। যে মহা-শক্তির প্রেরণায় অগ্নি-সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ ভীতিবিহ্বল অবস্থায় স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনি কেন তুচ্ছ কালের বশতাপন্ন হইবেন[৩]? ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! মহাশক্তি-রূপিণী কালীর নিকট কাল যে অতি তুচ্ছ ও নিষ্ক্রিয় তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই মহাকাল শবরূপে দেবীর শ্রীচরণ-তলে নিপতিত রহিয়াছেন।

কালের অপর নাম রুদ্র বা সদাশিব। রুদ্র বা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলকে বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার অন্বর্থ নাম রুদ্র। কালতত্ত্বের আলোচনায় আমরা ইহার তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছি। পুরাণাদিতে কালকে সর্ব্বান্তকৃৎ যম বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ"।

কালীমূর্ত্তিতে যে সংহারের সকলপ্রকার বিভীষিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্মশান, শব, শিবা, জ্বলন্ত চিতা, নরমুণ্ড, রুধির প্রভৃতি ভীতিপ্রদ সকল পদার্থই কালিকার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ যে প্রলয়ের ভৈরবী মূর্ত্তি! ধ্বংসের ভীষণ চিত্র! দেবীর মূর্ত্তি প্রলয়কালীন মেঘমালার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং) এবং বিশ্বগ্রাসোদ্যত তদীয় বদনমণ্ডল অতীব ভীষণ (করালবদনাং ঘোরাম্)। তাঁহার মুক্ত কেশদাম, লোল রসনা, এবং বিকট রব সকলই আতঙ্ককারী। নৃমুণ্ডগলিত-রুধিরধারায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত (কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্)। শবকর-নির্ম্মিত কাঞ্চীর দ্বারা তাঁহার কটিদেশ আবদ্ধ। একে রমণীমূর্ত্তি তাহাতে আবার দিগম্বরী! এই মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও চিত্তে ভয় না হইয়া পারে কি? মহাশক্তির আবাসভূমি হইল শ্মশান। ইহা খুব উপযুক্ত হইয়াছে। যাঁহার পদতলে সর্ব্বান্তকারী মহাকাল এবং যাঁহার হস্তে খড়্গ ও নৃমুণ্ড তাঁহার বসতিযোগ্য স্থান শ্মশান ভিন্ন আর কি হইবে? জগদীশ্বরীর নাম "শ্মশানালয়বাসিনী"।[৪] এই নাম যে সার্থক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১। বেদান্তসূত্র, ২।১।১৪ ; ২।২।৩৭। ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আচার্য্যপাদ শঙ্কর সর্ব্বত্রই "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্বশক্তি" এই দুইটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২) পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"—যোগসূত্র, ১।২৬

(৩) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ—কঠোপনিষৎ, ২।৬।৩
ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(৪) শাক্ত সম্প্রদায় মনে করেন যে, কৈলাসের নিকটবর্ত্তী কোন একটি স্থান "শ্মশান" বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে; সেখানে বিহার করেন বলিয়া মহা-মায়ার নাম "শ্মশানালয়বাসিনী"। এই জন্যই "শ্মশানকালী" বলিয়া কালীর একটি ভিন্ন মূর্ত্তি থাকিলেও দক্ষিণকালিকার ধ্যানেও আমরা "এবং সংচিন্তয়েদ্দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্" পাঠ দেখিতে পাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাকাল শবরূপ ধারণ করিয়া মহাশক্তির চরণতলে নিপতিত রহিয়াছেন। এই নিমিত্ত ধ্যানে মহামায়াকে বলা হইয়াছে "শবাসনা" বা "শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতা"। এখানেও একটি গুরুতর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি "জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ" সেই শিব যে কেন শবের আকার ধারণ করিয়া জগদম্বার চরণতলে নিপতিত হইলেন তাহার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করা কঠিন ব্যাপার। সাধক-ভক্ত বলিয়াছেন:—

"নিপতিত পতি শবরূপে পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়।"

এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শিব নিষ্ক্রিয় পুরুষ[১] সুতরাং তাঁহার শবের আকার; আর কালী হইলেন নিয়ত ক্রিয়াশীলা আদ্যা প্রকৃতি বা আদ্যা শক্তি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রবৃত্তির শেষ নাই। আচার্য্যপাদ শঙ্কর তদীয় প্রপঞ্চসার তন্ত্রে এই মহাপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন "শাশ্বতী বিশ্বযোনিঃ"। ভগবতী আপনার ভাবে বিভোর হইয়া ক্রিয়াসক্ত বালকের ন্যায় অনন্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করিতেছেন। আনন্দময়ীর ক্রীড়া বা লীলার বিরাম নাই; ইহা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিতেছে। পুরুষরূপী সদাশিব চরণতলে থাকিয়া দেবীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সংহারলীলা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। শিবের এই নিষ্ক্রিয় বা নির্লিপ্তাবস্থা আমরা অন্য ভাবেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মহাশক্তি চিন্ময়ী। জীবজগৎ তাঁহার চিৎকণা লাভ করিয়াই সচেতন বা সজীব হয়। চৈতন্য বা শক্তিশূন্য হইলে জীবে ও জড়ে কোন প্রভেদ থাকে না। প্রলয়কালে চিদেক-ঘনা মহামায়া যখন বিশ্বের সমস্ত চৈতন্যশক্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহৃত করিয়া অব্যক্ততত্ত্বে লীন হন, তখন জগৎ শব বা শিব। কালীমূর্ত্তি এই সংহারতত্ত্বেরই জ্বলন্ত প্রতীক।

কালী কাল হইলেন কেন? চন্দ্রসূর্য্য যাঁহার চক্ষুস্বরূপ এবং যাঁহার দীপ্তিতে জগৎ উজ্জ্বল (যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি) তাঁহার রূপ কেন প্রলয়কালীন মহামেঘের ন্যায় মসীবর্ণ? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, কালীতে সকল রূপের শেষ হইয়াছে বলিয়াই কালী কৃষ্ণবর্ণ। যেখানে সকল বর্ণ অস্তমিত হয় তাহাই কাল; যেখানে রূপ অরূপে লীন হয় তাহাই কাল। রূপ ও বর্ণহীন আকাশ আমাদের নিকট কাল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। যেখানে দিক্ ও কাল অন্তর্হিত, রূপ ও বর্ণ নিঃশেষিত, সেখানে সবই কাল—কাল ভিন্ন সেখানে আর অন্য রূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বচরাচর অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে"। এই অন্ধকারই (eternal darkness) কালীর যথার্থ রূপ। যখন "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্" তখন সকলই ছিল কাল। কালই জগতের আদি রূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে আদ্যা শক্তি ভিন্ন আর কোন পদার্থের সত্তা ছিল না, কাজেই কালীর রূপ হইয়াছে কাল। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত বস্তুটীরও রূপ কাল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণধারণ করিয়া দ্বাপরে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন (ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ)[২]। কাল-রূপ উপেক্ষার সামগ্রী নয়। যাঁহারা সাধক ও ভক্ত তাঁহারা কাল রূপের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কাল রূপের উপাসক তাঁহাদের আর অন্য রূপ ভাল লাগে না। রামপ্রসাদ সত্য সত্যই বলিয়াছেন:—

"যে হেরেছে কাল রূপ, তার অন্য রূপ লাগে না ভাল।"

কৃষ্ণ ও কালীতে যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। এ অভেদ কেবল বর্ণে বা রূপে নয়, স্বভাবের দিক্ দিয়া দেখিলেও উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বীজমন্ত্রও উভয়ের এক। উভয়ের রূপগত এমন সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোধ হয় শ্রীমতীর লজ্জা-নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এত সহজে কালিকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

বস্তুমাত্রই দিক্ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহা পদার্থের চিরন্তন ধর্ম্ম। কিন্তু কালীতত্ত্ব স্বতন্ত্র। কালী যে কালশক্তির

(১) শিবতত্ত্ব নিষ্ক্রিয়। শিব শক্তির অধীন। কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে—"তদধীনস্তু শঙ্করঃ"। শক্তিবিরহিত শিব যে কিছুই করিতে পারেন না তাহা শঙ্করাচার্য্য তদীয় সৌন্দর্য্যলহরী স্তোত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি"।

২। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥—ভাগবত

দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালশক্তির অনধীন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আমরা দেখিতে পাইব যে, তিনি দিক্‌শক্তিরও অতীত বস্তু। ধ্যানে মহাশক্তি "দিগম্বরী" বা "দিগংশুকা" বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সর্ব্বব্যাপিকা মহাসত্তা (শক্ত্যা ব্যাপ্তমিদং জগৎ) তিনি কখনও দিক্ বা দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না। চিন্ময়ী সর্ব্বত্র বিরাজমানা; তাঁহার সত্তাকে দিক্ বা কাল কোনক্রমে নিয়মিত করিতে পারে না। যিনি মায়ার অতীত মহামায়া তিনি কোন প্রকার কালিক বা দৈশিক বন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না,—ইহা পরম সত্য। মহাশক্তি সর্ব্বপ্রকার আবরণ হইতে মুক্ত। অদ্বয়-তত্ত্ব যে অসীম এবং পূর্ব্বাপরাদি দিগ্‌বিভাগবিবর্জ্জিত তাহা নন্দনন্দন বাল-গোপালকে বন্ধন করিবার সময় শ্রীমতী যশোদাদেবী বেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরবহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥ ভাগবত, ১০।৯

সাধারণতঃ আমরা কালিকার গলদেশে নরমুণ্ডমালা বিলম্বিত দেখিতে পাই। ধ্যানেও আছে—"মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্"। শ্মশান যাঁহার নিবাসস্থল এবং প্রমথনাথ যাঁহার পতি, তাঁহার গলায় নৃমুণ্ডমালা না থাকিয়া হীরকের বা মণিমুক্তার মালা থাকিলে কি শোভা পায়? শ্মশানবাসিনীর ইহাই যোগ্য ভূষণ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ভ্রান্ত। কালিকার মূর্ত্তি যখন নিত্য ও অনাদি, তখন তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডমালা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বেও যাঁহার নিত্য সিদ্ধরূপ বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে অবরকালীন উৎপন্ন মানুষের মুণ্ড কখনই সংযুক্ত হইতে পারে না। যাঁহার মূর্ত্তি নিত্য[১] তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষণ বাহন সকলই নিত্য। নিত্য পদার্থে কখনও অনিত্য বস্তুর সংযোগ দেখা যায় না। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদও এই যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন :—

"সংসার ছিলনা যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?"

দেবীর গলদেশে আমরা যাহা দেখিতে পাই উহা প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চাশৎ বর্ণমালা। এই বর্ণমালার কথা তন্ত্রোক্ত বাগ্দেবতার ধ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে[২]। ইহা শুধু বর্ণ নয় মাতৃকাবর্ণ। ইহাদের মধ্যে মাতৃকাশক্তি নিহিত আছে। ইহারা ক্ষয়রহিত অক্ষরতত্ত্ব। সাধনার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেকটি বর্ণই জীবন্ত ও শক্তিবিশেষের বাচক। সাধকের নিকট বীজাত্মক বর্ণরাশি মহাশক্তিসম্পন্ন। বাচ্য-বাচকভাবে ইহাদের সহিত দেবতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে[৩]। আগমশাস্ত্র-নিষ্ণাত-বুদ্ধি পতঞ্জলি বর্ণমালার মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতির জ্বলন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন[৪]। সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির গলদেশে শক্ত্যাত্মক বর্ণসমূহ মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অর্থই বোধহয় তত্ত্বার্থদর্শীর প্রীতিপ্রদ হইবে।

এখন আমরা কালীমূর্ত্তিকে একটু অন্য ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিব। কালিকার রূপ দর্শন করিলে বা চিন্তা করিলে প্রথমেই মনে ধ্বংসের বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু এই ভয়ের মধ্যেও আনন্দের অভয়বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না কি? ভীতি ও প্রীতি এক মূর্ত্তিতেই প্রকাশমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে ভক্তগণ পাশমুক্তির জন্য এই ভৈরবী মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া প্রাণে বিপুলানন্দ লাভ করিতে পারিত না। সাধক, তুমি তোমার মনের মন্দিরে প্রলয়ের রৌদ্র রূপ আঁকিয়া উঠিতে পার কি? মসীবর্ণ মেঘমালার ভীষণ গর্জ্জন, বিদ্যুৎপুঞ্জের সচকিত খেলা, গ্রহনক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি এবং চতুর্দ্দিকে সংহারের তাণ্ডব নৃত্য কল্পনা করিতে পার কি? যদি পার, তবে ইহার মধ্যে চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবা। সংহারের বিভীষিকা হইতে আনন্দের অভিব্যক্তি বড়ই মনোরম! এক রূপ হইতে যুগপৎ ভীতি ও প্রীতি উৎপন্ন হয়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কালীমূর্ত্তি ভিন্ন অন্যত্র ভয় ও আনন্দের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ জগতে আর কোথায়ও দেখা যায় না। সর্ব্বসংহারিণী যে কেমন করিয়া আনন্দময়ী হইলেন তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কালী "বরাভয়করা"। তাঁহার দুই হস্ত যেমন অসি ও নৃমুণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তেমন অপর দুই হস্ত বর ও অভয় দান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। কালী-

১। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" মার্কণ্ডেয়পুরাণ
২। পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত...ইত্যাদি
৩। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—যোগসূত্র
৪। সোঽয়ং বাক্‌সমাম্নায়ো বর্ণসমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ—মহাভাষ্য

মূর্ত্তিতে বিনাশ ও কারুণ্য একত্র মিলিত হইয়াছে! সকলকে সংহার করেন বলিয়া তাঁহাতে দয়া বা করুণা নাই ইহা কখনই মনে করা যায় না। জগদম্বা সর্ব্বদাই জীবদুঃখ-কাতরা; সন্তানের দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া তাহাকে আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে লইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই করপ্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন।

"দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

যিনি শক্তিমন্ত্রের উপাসক এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ মাতৃভাবে দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কালীমূর্ত্তি সদানন্দময়ী; ইহাতে ভীতি বা বিস্ময়ের লেশও নাই। তাঁহার ইষ্টদেবতা করুণার্দ্রচিত্তা এবং জীবের দুঃখার্ত্তিহারিণী। যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি তিনি সেই ভাবেই জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন। কাহারও কাছে তিনি ভৈরবী—প্রলয়বিষাণনাদিনী—আবার কাহারও কাছে তিনি আনন্দদায়িনী। শুকদেব গোস্বামী অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেমন করিয়া একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট এক সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। কংসবধোদ্যত গোবিন্দই ইহার দৃষ্টান্ত[১]। যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কংস সাক্ষাৎ যম বলিয়া ভীত হইতেছে, সে মূর্ত্তিই গোপিনীগণ প্রাণবল্লভরূপে দর্শন করিয়া মাধুর্য্যরসে আপ্লুত হইতেছে। এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ ভগবানে ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে না। পরম তত্ত্বেই সকল বিরোধের পরিহার হয়।

হিন্দুগণ যে সকল দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান বা পূজা করিয়া থাকেন তাহা শুধু কল্পনার সৃষ্টি নয়, কিন্তু বাস্তব। মন্ত্রপরিপূত বিগ্রহে যে দেবতার আবির্ভাব হয় তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। যাহা সত্য তাহার অপলাপ করা যায় কি? মুনিঋষিরা ধ্যানযোগে যে ভাবের দেবমূর্ত্তিসকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই তত্তদ্দেবতার ধ্যানে প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্যানগুলি মনঃকল্পিত নয়; কিন্তু ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ফল। সিদ্ধপুরুষগণ সমাধিস্থ অবস্থায় বিশুদ্ধ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করিতে পারেন। কালিকার ধ্যানোক্ত যে মূর্ত্তির কথা আমরা বলিতেছিলাম তাহাও সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপ[২]। স্মরণাতীত কাল হইতে এই রূপ সাধক-মণ্ডলীর নয়নগোচর হইয়া আসিতেছে। এই রূপ ধ্রুব সত্য। যাঁহারা মায়িক জগতের উপরিতন ভূমিতে আরোহণ করিতে পারেন তাঁহাদের অলৌকিক বস্তু সকল প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অপ্রামাণিক নয় তাহা শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। কালী অতি প্রাচীন দেবতা। বহুকাল হইতেই হিন্দুগণ এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছেন। কালীর করাল মূর্ত্তির বিবরণ আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।"
—মুণ্ডকোপনিষৎ

সাধনার দিক্ দিয়া দেখিলে কালীতত্ত্বকে বলা যায় সাধনার চরম স্তর বা শেষ অবস্থা। সর্ব্বপ্রকার বিকার-রহিত বা উপাধিমুক্ত হইলে সাধকের এই অবস্থা উপস্থিত হয়। দশ মহাবিদ্যাতত্ত্বকে যাঁহারা সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে কমলা হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপর্য্যন্ত দশটি অবস্থা জীবের ভোগবাসনার এক একটি মূর্ত্তি। সাধক আপনার সাধন বলে ভোগৈশ্বর্য্যকামনার গণ্ডী ছাড়িয়া গুরূপদিষ্টমার্গে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ স্তরে অধিরোহণ করিতে থাকে এবং এক একটি করিয়া বিকারগ্রন্থি ছিন্ন হইলে শেষে কালীতত্ত্বে পৌঁছিয়া পরম নিবৃত্তি বা বেদান্তের ভাষায় "অপুনরাবৃত্তি" লাভ করে। সাধনার যে ভূমিতে পদার্পণ করিলে ক্ষুত্তৃষ্ণা-জরামরণ প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়, সকল কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়, তাহাই কালীতত্ত্ব বা পরম পদ। প্রবৃত্তিনিবহের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইলে জীবকোটি

১। মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত

২। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষই কালিকার রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। বাংলার মেহার অঞ্চলে সাধকপ্রবর সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ তিনবৃক্ষতলে জগজ্জননী কালিকার দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত স্তবই ইহার সাক্ষী—"ময়া মেহারে সা ভুবনজননী দর্শনমিতা।" বাংলার রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস যে জগদম্বার রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় অনেকেই বিশ্বাস করিবেন।

যখন ঈশ্বরকোটিতে প্রবেশ করে, তখনই কালীতত্ত্বের আভাস ফুটিয়া উঠে। চিত্তবৃত্তির লয় বা বাসনাক্ষয় না হইলে যে দিক্-কালাতীত চিন্ময় ভূমিতে গমন করা যায় না তাহা বুঝাইবার ছলেই কালিকা সংহারের ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

যাহারা পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুদিগকে অযথা নিন্দা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা সগর্ব্বে বলিব যে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ কখনও অচেতন গাছ পাথরের অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমার অর্চ্চনা করেন না। যথোক্তবিধানানুসারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে সচেতন করিয়া তুলিবার কৌশল জানেন। সাধনার বলে তাঁহারা প্রাণের দেবতাকে বিগ্রহে আনিয়া স্থাপন করেন[১]। ভক্তের অভীষ্টপূরণের জন্য জগদীশ্বরীও মূর্ত্তির মধ্যে আসিয়া আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করাই মূর্ত্তিপূজার চরম উদ্দেশ্য। গাভীর সকল শরীরে দুগ্ধ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা যেমন এক-মাত্র স্তনবন্ধ্রদ্বার দিয়াই নির্গত হয়, তেমন পরমদেবতা সর্ব্বব্যাপক হইলেও প্রতিমাদিতেই তাঁহার বিকাশ বা স্ফুরণ হইয়া থাকে :—

"গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥"—কুলার্ণবতন্ত্র।

এখন উপসংহার। কালীতত্ত্বের এই সামান্য আলোচনার দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম—কালীমূর্ত্তিতে কাল ও আকাশতত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। কালীর রূপে ত্রিভুবনের রূপ লুক্কায়িত আছে। সকল রূপের এখানে নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই কালিকার রূপ কাল। ভগবান্ গোবিন্দের যে-বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কালিকার মূর্ত্তি সেই বিশ্বরূপের জ্বলন্ত প্রতীক। কালীতত্ত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি এবং কালীতত্ত্বেই জগতের লয়। এই রূপেই বিশ্বের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি। কালীমূর্ত্তিতে যুগপৎ ভীতি ও প্রীতি মিশ্রিত। অসুরমর্দ্দিনী হইলেও জগদীশ্বরী বরাভয়করা। প্রসিদ্ধ শিল্পী র‍্যাফেলের (Raphael) তুলিকায় যে কমনীয় মাতৃমূর্ত্তি (Madona) ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কালিকার মূর্ত্তি কোনও প্রকারে—কি মাতৃত্বের নিদর্শনে, কি বাৎসল্যের অভিব্যক্তিতে অপকৃষ্ট নহে। ভক্তের নিকট এই মূর্ত্তি সদানন্দময়ী। কালিকার মূর্ত্তি শুধু কল্পনার সৃষ্টি নয়, কিন্তু সিদ্ধপুরুষগণের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। মহাশক্তির এই রূপই সাধকের ধ্যেয় এবং অভীষ্টদায়ক। কালীতত্ত্ব সাধনার শেষ সীমা। সর্ব্বপ্রকার বিকারগ্রন্থি ছিন্ন হইলে, বিশুদ্ধ চৈতন্যের উদয় হইলে সাধকের হৃদয়ে কালীতত্ত্বের নির্ম্মল আভাস ফুটিয়া উঠে। কালীতত্ত্ব সাধনার নিরঞ্জন ভূমি। এই চিন্ময় রাজ্যে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তির ভয় থাকে না। পরমতত্ত্ব বা পরদেবতার জ্বলন্ত প্রতীক বলিয়াই হিন্দুগণ কালিকার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

১। আচার্য্যপাদ শঙ্কর প্রতিমা বা শালগ্রামশিলায় যে বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে অধ্যাস বা অধ্যারোপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মবুদ্ধিতে নামের উপাসনা কিংবা অক্ষর ও উদ্গীথে অভেদ-চিন্তাও এই প্রকার অধ্যাস (ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৯—শাঙ্করভাষ্য)। হিন্দুগণ প্রতিমায় দৈবত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করেন। ইহাতে তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালী নিষ্ফল হয় না। এই ভাবের প্রতীকোপাসনা স্মরণাতীত কাল হইতে অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান অসম্ভব বলিয়াই প্রতিমাদি কল্পিত হইয়াছে। বিকারদ্বারে ব্রহ্মের উপাসনা শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন—"বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২৫)।

আর এক দিক

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজনসমাদৃত গল্পলেখক ও. হেন্‌রির সত্যকার নাম উইলিয়ম সিড্‌নি পোর্টার। ও. হেন্‌রি তাঁহার ছদ্মনাম। কর্ণেল লাম্ব অভিহিত জনৈক লেখক তাঁহার সদ্যোপ্রকাশিত পুস্তক "দি ইনক্যুরেবল্ ফিলিবুষ্টার (The Incurable Filibuster)"-এ সিড্‌নি পোর্টারের এই নাম গ্রহণের একটি আনুমানিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী রেড হেন্‌রির সহিত পোর্টারকে এক সময়ে একগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে, 'ক্যাবেজেস্ এণ্ড কিংস্ (Cabbages and Kings)' পুস্তকের অনেক কাহিনী ও. হেন্‌রি রেড হেন্‌রি-র নিকট সংগ্রহ করেন। রেড হেন্‌রি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতেন। যেসব মজুর তাঁহার অধীনে খাটিত, তাহারা সকলেই মিনিটখানেক অন্তর-অন্তর 'ও হেন্‌রি, ও হেন্‌রি' বলিয়া হাঁক ছাড়িত।

এই হইতেই "ও হেন্‌রি"র সৃষ্টি।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অদৃশ্য ধূলিকণার সাহায্যে বোমাবর্ষণকারী এরোপ্লেনের গতিরোধের পরিকল্পনা

বর্ত্তমান যুগের সমরোপকরণের মধ্যে বোমাবর্ষণকারী এরোপ্লেন একটা ভয়ানক অস্ত্র। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ একঝাঁক এরোপ্লেন উড়িয়া আসিয়া একটা শহরকে শহর বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া গেল। রাত্রিবেলার তো কথাই নাই, দিনের বেলায়ও ইহাদের অকস্মাৎ আবির্ভাব প্রতিরোধ করা দুষ্কর। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের গায়ে এমন দৃষ্টিবিভ্রমকারী রং দেওয়া থাকে যাহাতে ইহাদিগকে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেন-বিভীষিকা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla) শূন্যপথে এরোপ্লেনের গতিরোধ করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি এমন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব শক্তি রশ্মি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা ১০০ মাইল খাড়াই পর্দ্দা বা দেওয়ালের মত উর্দ্ধাধঃ ভাবে লম্বমান থাকিবে। এক একটি দেশের সীমানা বরাবর ২০০ মাইল অন্তর এক একটি রশ্মি-উৎপাদনকারী যন্ত্র স্থাপিত হইবে। যে-কোন রকমের এরোপ্লেন বা উড়ো-জাহাজই হউক না কেন, এই রশ্মি পর্দ্দা ভেদ করিয়া সেই দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এরোপ্লেন এই অদৃশ্য পর্দ্দার আওতায় আসিবামাত্রই তাহার ইঞ্জিন বিকল হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতিরোধ না হইলেও আগুন লাগিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আবিষ্কারকের মতে এই শক্তি-রশ্মি অতি উচ্চ চাপের তড়িৎশক্তি-পরিচালিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন এক প্রকার ধূলিকণার সমবায়ে উৎপন্ন হইবে। ৫০,০০০,০০০ ভোল্ট তড়িৎশক্তি সাহায্যে এই কণিকাগুলি অভাবনীয় বেগে ছুটিয়া এরোপ্লেন-গতিরোধক পর্দ্দা সৃষ্টি করিবে। এই রশ্মি-পর্দ্দা, তড়িৎ-উৎপাদনকারী যন্ত্রের উভয় পার্শ্বে ১০০ মাইল স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। পরীক্ষার ফলে তড়িৎশক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য ধূলিকণানির্ম্মিত এরোপ্লেন-প্রতিরোধকারী পর্দ্দার কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ণবেগে ছুটিয়া কয়েকখানা এরোপ্লেন এই তাড়িতিক অদৃশ্য পর্দ্দার সংস্পর্শে আসিবা-মাত্রই ইঞ্জিন বিকল হইয়া নামিতে বাধ্য হইয়াছে। ইঞ্জিনের মধ্যে এই তড়িৎশক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য কণিকা ঢুকিয়া গেলে ইঞ্জিন চিরতরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পর্দ্দার কাছাকাছি আসিলে ইঞ্জিন বিকল হইবার লক্ষণ টের পাওয়া মাত্রই এরোপ্লেনের গতিবেগ সংযত করিতে না পারিলে ইঞ্জিন তো বিকল হইবেই, অধিকন্তু এরোপ্লেনে আগুন ধরিয়া যাইবে।
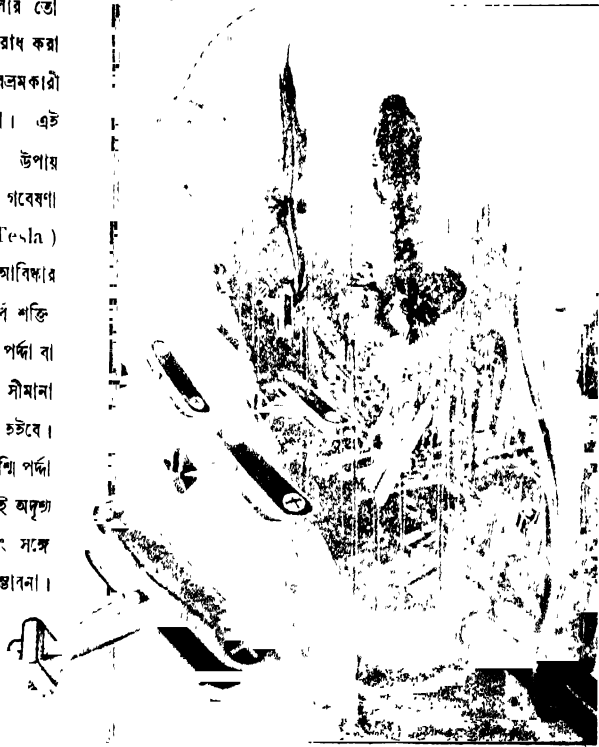
উপরে—বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেন-প্রতিরোধক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক পর্দ্দা। নীচে—দেশের সীমানা বরাবর বৈদ্যুতিক পর্দ্দা সংস্থানের ব্যবস্থা।

"প্যাডেল"শূন্য বাইসাইকেল

চিকাগো সহরের দুইজন ভদ্রলোক নূতন ধরণের এক প্রকার বাইসাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বাইসাইকেলের 'প্যাডেল' নাই। উভয় চাকার মধ্যস্থিত চওড়া পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া চালক তাহার শরীরের ঝাঁকুনি দিলেই গাড়ী চলিতে থাকে। এই চওড়া পা-দানটি স্প্রিং-এর মত উপরে নীচে দুলিতে পারে। গাড়ীর পিছনের চাকাটি উৎকেন্দ্রিক অর্থাৎ

চাকার কেন্দ্রীয় অবলম্বন-দণ্ডটি ঠিক মধ্যস্থলে না থাকিয়া এক পাশে সরিয়া আছে। চড়িবার পূর্ব্বে গাড়ীখানিকে একটু ধাক্কা দিয়া চালাইয়া লইতে হয়।

"প্যাডেল"-শূন্য বাইসাইকেল।

একটু চলিতে আরম্ভ করিলে পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া পা দিয়া ঝাঁকুনি দিলেই চাকার কেন্দ্রটি নীচের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। কাজেই চাকাটি সম্মুখের দিকে ঘুরিয়া আসে এবং গতিবেগের ফলে আরও খানিকটা ঘুরিয়া

অগ্নি-নির্ব্বাপকদিগের 'য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌'-নির্ম্মিত পোষাক ও ছাতা।
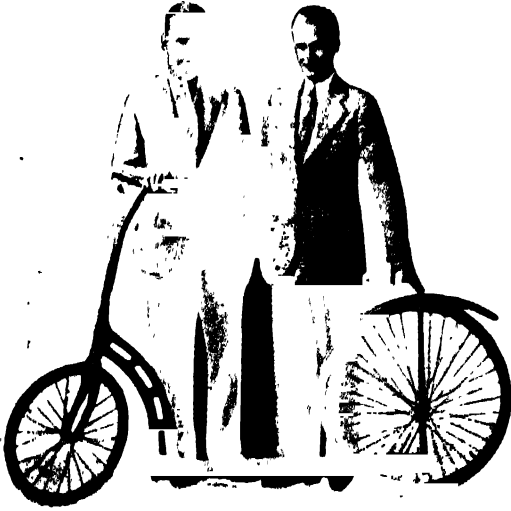
যায়, সুতরাং কেন্দ্রটি উপরের দিকে উঠিয়া আসে। চাকাটি উৎকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং পা-দান স্প্রিং-এর মত দুলিবার ফলে এবং তালে তালে শরীরের একটু দোল পাইয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে থাকে। একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই পাদানের দোলনের সঙ্গে শরীরের দোল দেওয়া অভ্যাস হইয়া যায়। আবিষ্কারকদ্বয় বলেন—একটু অভ্যাস হইয়া গেলেই এই ভাবে গাড়ীখানাকে ঘণ্টায় অন্ততঃ ১৫ মাইল বেগে চালান যাইতে পারে।

অগ্নি-নির্ব্বাপকের 'য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌' পোষাক

আগুন লাগিলে 'ফায়ার-ব্রিগেডে'র লোকেরা 'হোস্‌-পাইপ' ধরিয়া দমকলের সাহায্যে দূর হইতে জল ছিটাইয়া আগুন নিভাইয়া থাকে, কারণ,

মৎস্যাকৃতি ক্ষুদ্রতম ডুবো-জাহাজ।

অত্যধিক উত্তাপের জন্য কাছে ঘেঁসিতে পারে না। লণ্ডনের অগ্নিনির্ব্বাপক সংঘ সম্প্রতি 'য়্যাস্‌বেস্‌টস্‌'-নির্ম্মিত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনোপযোগী এক প্রকার পোষাক ও ছাতার প্রচলন করিয়াছেন। 'য়্যাস্‌বেস্‌টসে' আগুন ধরে না এবং উত্তাপও সহজে পরিচালিত হয় না। এই অগ্নি-প্রতিরোধকারী বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং ছাতা হাতে লইয়া অগ্নি-নির্ব্বাপকেরা অগ্নিশিখার মধ্য দিয়াও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষিপ্রতার সহিত আগুনকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে।

ক্ষুদ্রকায় ডুবো-জাহাজ

সম্প্রতি চিকাগো সহরের নিকট এক হ্রদের মধ্যে মাত্র ১০ ফুট লম্বা একখানি ক্ষুদ্রকায় ডুবো-জাহাজের পরীক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। জাহাজখানি দেখিতে একটি প্রকাণ্ড ধাতুনির্ম্মিত মৎস্যের মত এবং ওজনে মাত্র সাড়ে বারো মণ। ইহা ১১ হাত জলের নীচে ডুবিয়া ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে ছুটিতে পারে। একজন মাত্র লোক ইহার মধ্যে বসিতে পারে। ছবিতে দেখা যাইতেছে—এই ডুবো-জাহাজের উদ্ভাবক নিজেই ইহাকে

চালাইয়া গতিবেগ পরীক্ষা করিয়েছেন। পরীক্ষায় খুব সন্তোষজনক ফললাভ হইয়াছে।
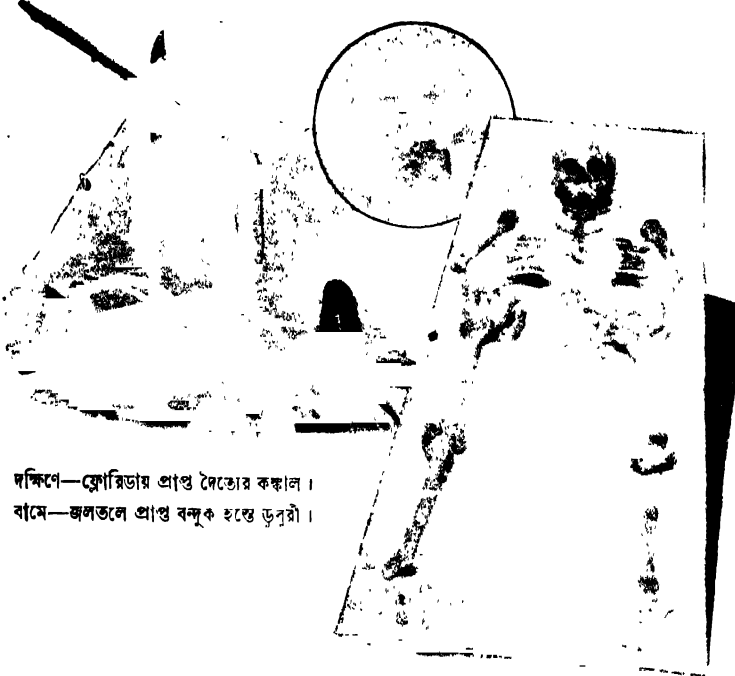
দক্ষিণে—ফ্লোরিডায় প্রাপ্ত দৈত্যের কঙ্কাল।
বামে—জলতলে প্রাপ্ত বন্দুক হস্তে ডুবুরী।

দৈত্যের হাড়

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল-অনুসন্ধানকারী অভিযাত্রীদল কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্লোরিডার ওকালার নিকটবর্ত্তী 'সিলভার স্প্রিংস্'-এর তলদেশে

অভিনব চশমা।

অধুনালুপ্ত ম্যাষ্টোডন নামক হস্তীর কঙ্কাল অনুসন্ধান করিবার জন্য ডুবুরী নামাইয়াছিলেন। সেই 'স্প্রিংস্'-এর তলদেশ হইতে ডুবুরীরা প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার বহু হাড়, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অনেক প্রকার অলঙ্কার-পত্র উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে তাহারা আর একটি অদ্ভুত জিনিষ উত্তোলন করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য জিনিষটি অতি প্রাচীন যুগের এক শবাধার। এই শবাধারের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য মনুষ্য-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই কঙ্কালটি এত বৃহৎ যে, ইহাকে একটি নররূপী দৈত্যের কঙ্কাল বলিয়াই অনুমিত হয়। এইরূপ বৃহৎ মনুষ্য আধুনিক যুগে তো নাই ই, অতীত যুগেও যে ছিল, এইটি ছাড়া তাহার আর দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। এই কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীন যুগে কোন কোন জাতীয় মানুষ কম পক্ষেও ৭ ফুট লম্বা হইত। (কিছুদিন হয় এদেশেও নাকি এরূপ একটি বৃহৎ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে)। আমেরিকার এই বিরাট কঙ্কাল লইয়া নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নানা প্রকার গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই 'সিলভার স্প্রিংস'-এর তলদেশ হইতে কতগুলি প্রাচীন মৃৎপাত্র, মৃণ্ময় পুতুল, হাড়ের সূচ, প্রস্তরনির্ম্মিত তীরের ফলা এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত একটি লম্বা নলের বন্দুকও উত্তোলিত হইয়াছে। বন্দুকটি বোধ হয় স্পেনীয় অভিযানকারীর, কোনক্রমে ইহা জলতলে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

অভিনব চশমা

ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্য কোন খেলোয়াড় এবং কুস্তীগীরদিগের মধ্যে যাহারা অনবরত চশমা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, খেলার সময় বল লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে আঘাতের ফলে চশমার কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহাদের চক্ষু

দক্ষিণে—টেলিভিসন মোটর গাড়ী হতে ছবি তোলা হইতেছে। বামে—টেলিভিসন যন্ত্র হইতে ছবি দূরতর স্থানে প্রেরিত হইতেছে। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। অনেক সময় এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। এইরূপ দুর্ঘটনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে কুস্তীগীর ও খেলোয়াড়দিগের

ব্যবহারের নিমিত্ত লণ্ডনে সম্প্রতি এক প্রকার চশমার আমদানী হইয়াছে। এই চশমায় আঘাত লাগিলেও কাঁচ ভাঙ্গিয়া ছিটকাইয়া পড়িবার আশঙ্কা

নাই। এই কাঁচে খুব জোরে আঘাত লাগিলে তাহা ফাটিয়া যায় বটে, কিন্তু টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

টেলিভিসনের অগ্রগতি

টেলিভিসনকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য জার্ম্মেনীতে এক অভিনব প্রচেষ্টা চলিতেছে। সিনেমা-ক্যামেরা ও টেলিভিসনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত, বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক প্রকার গাড়ী, ঘোড়-দৌড়, ফুটবল খেলার মাঠ বা গানবাজনার স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবাক চিত্রের সিনেমা-ফিল্ম তুলিয়া রেডিও-সাহায্যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করে। সবাক চিত্রের ফিল্ম তুলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই 'ডেভেলপ্' করা হয়। পরে সেই ফিল্মখানাকে টেলিভিসনের 'স্ক্যানিং-ডিস্ক্'-এর সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়। আলোকরশ্মি ফিল্মের মধ্য দিয়া 'স্ক্যানিং-ডিস্কের' সাহায্যে বহু সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 'ফটো ইলেকট্রীক সেলের' উপর পড়ে এবং তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই তড়িৎ শক্তিকে অদৃশ্য রেডিও-তরঙ্গরূপে সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হয়। মোটের উপর টেলিভিসনের এই অভিনব ব্যবস্থায় কোন একটা ঘটনা ঘটিবার পর প্রায় ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই দূরদেশে অবস্থিত লোকেরা টেলিভিসনের গ্রাহক-যন্ত্রসাহায্যে সেই ঘটনাটি হুবহু দেখিতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কথাবার্ত্তাও শুনিতে পাইয়া থাকে। রেডিও-যন্ত্রসাহায্যে সচরাচর যে প্রকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে গানবাজনা প্রেরিত হয়, এই রেডিও-টেলিভিসনেও সেই প্রকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ছবি ও গানবাজনা প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রাহক-যন্ত্রে ছবি ও কথাবার্ত্তার শব্দ-তরঙ্গ সংগ্রহ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'এরিয়েল' বা আকাশ-তারের প্রয়োজন হয় না। একটি 'এরিয়েলের' সাহায্যেই দুই প্রকার তরঙ্গ যন্ত্রমধ্যে পরিচালিত হয় এবং পরিবর্দ্ধক-যন্ত্র (amplifier) সাহায্যে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংগ্রাহক-যন্ত্রে (detector) উপস্থিত হয়। সেখান হইতে বিশেষভাবে নির্ম্মিত যন্ত্রসাহায্যে আবার পৃথকীভূত হয়। কাজেই শব্দ ও দৃশ্য-তরঙ্গ একত্র ধরিবার ফলে একটি মাত্র সুর-নিয়ন্ত্রণ-(tuning control)-যন্ত্রেই কাজ চলে। ইহাতে সুর ও দৃশ্যের কোনরূপ অমিল বা বিশৃঙ্খলা ঘটে না। সুর-নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রটিকে এক দিকে একটু ঘুরাইয়া দিলে শুধু শব্দই শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না ; আবার আর এক-দিকে একটু ঘুরাইয়া দিলে শুধু দৃশ্যই দেখা যায়, শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। মাঝামাঝি এক স্থানে দৃশ্য ও শব্দ উভয়ই এক সঙ্গে পাওয়া যায়।

উপরে—টেলিভিসন-ছবি প্রতিফলিত হইবার বিরাটাকৃতি "ক্যাথোড়-রে টিউব"। নীচে—চলচ্চিত্র পাঠাইবার টেলিভিসন যন্ত্র।

উভয়মুখী টেলিভিসনের সাহায্যে পরস্পর দেখাশুনার ব্যবস্থা।

অদৃশ্য তড়িৎ-তরঙ্গ-বিশেষজ্ঞ একজন জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার এক প্রকার বিরাটাকৃতি 'ক্যাথোড্-রে টিউব' (Cathode-Ray tube) নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। এই 'ক্যাথোড্-রে' টিউবে ৭ × ৯। ইঞ্চি ছবি প্রতিফলিত হইতে পারে। উল্লিখিত রেডিও-টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে এই নূতন ধরণের
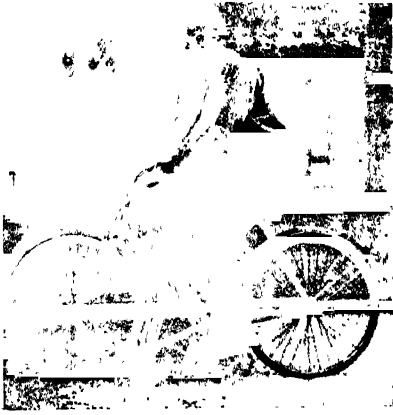
অভিনব দ্বি-চক্রযান।

'ক্যাথোড্-রে' টিউব সংযোগ করা হইয়াছে। 'বার্লিন ব্রড্‌কাষ্টিং' প্রথায় উৎপাদিত তড়িৎ তরঙ্গের সাহায্যে শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এই গ্রাহক-যন্ত্রের 'ক্যাথড্-রে' টিউব 'রেক্‌টিফায়ারের' (rectifier) কাজও করে। কাজেই শক্তিক্ষয় অনেক কম ; বিশেষতঃ এই ব্যবস্থায় ছবিও অনেক পরিষ্কার দেখা যায়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় টেলিভিসন-মোটর হইতে প্রেরিত ছবি ১২০ মাইল দূর হইতেও ধরিতে পারা যায়। এই পাল্লা আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। অবশ্য নির্দ্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে 'রিলে' ষ্টেসন (relay-station) স্থাপন করিলে সহজেই পাল্লা বাড়ান যাইতে পারে, রেডিও-গ্রাহক-যন্ত্রে যেমন একাধিক 'লাউড-স্পীকার' সংযোগ করা সম্ভব, সেইরূপ টেলিভিসন-ক্যাথোড্-রে টিউব হইতেও একাধিক টিউব সংযোগ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দৃশ্য প্রতিফলিত করিবার 'ক্যাথোড্-রে টিউব' এবং 'লাউড-স্পীকার'সহ টেলিভিসন-গ্রাহক-যন্ত্রটি 'রেডিও-রিসিভারের' মত মাঝারি বাক্সের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং প্রায় ২০০ ডলায় বা ৬০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

টেলিফোনে কথা বলিবার সময় পরস্পর দুই জনকে দেখিতে পাইবার জন্য টেলিভিসনের কোন সহজ ব্যবস্থা আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। আমেরিকার 'বেল টেলিফোন কোম্পানী' কিছুদিন পূর্ব্বেই টেলিফোন টেলিভিসনকে একযোগে কার্য্যকরী করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন আবিষ্কারকগণের চেষ্টার ফলে এই উভয়মুখী টেলিভিসনের অধিকতর উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। আবিষ্কারকেরা আশা

ডানা-শূন্য এরোপ্লেন।
(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
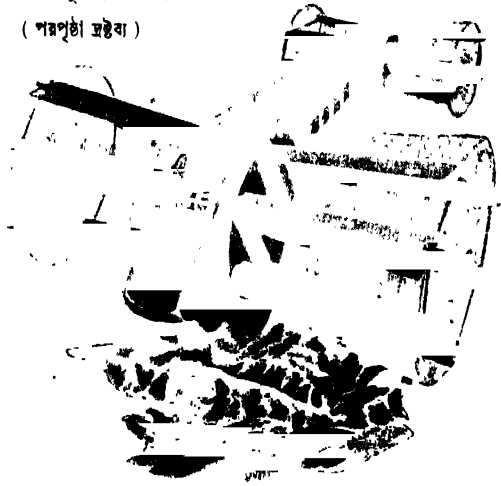
করেন—শীঘ্রই এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, যাহার সাহায্যে অতি অল্প খরচে বহুদূরে অবস্থিত থাকিয়াও পরস্পর দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা চলিতে পারিবে।
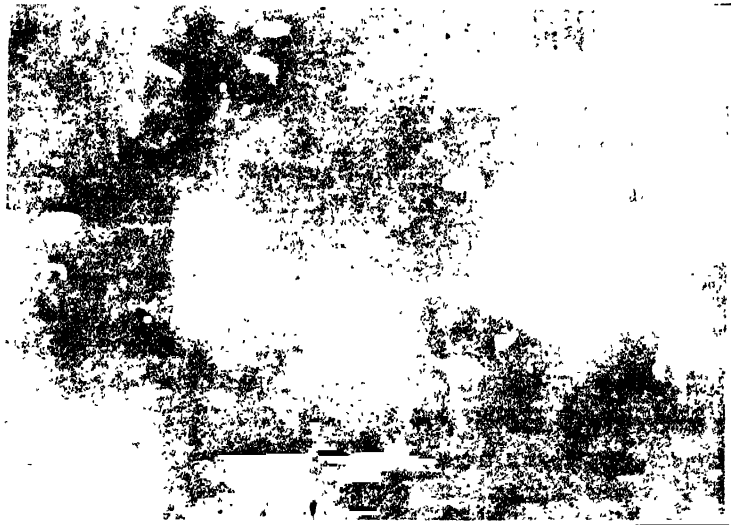
একখানা এরোপ্লেন হইতে ২৫ জন লোক 'প্যারাশুটে' নামিতেছে। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অভিনব দ্বি-চক্রযান

সময়, পরিশ্রম ও অর্থ বাঁচাইবার জন্য বাইসাইকেল সর্ব্বত্র একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কারের পর হইতে,

বাইসাইকেল এ পর্য্যন্ত বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার একটি প্রধান অসুবিধা আজিও দূরীভূত হয় নাই। প্রথম-শিক্ষার্থীকে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে 'ব্যালান্স' করিয়া সাইকেল চালনা শিক্ষা করিতে হয়, ইহাতে বিপদের আশঙ্কা কম নয়, তারপর চলিতে চলিতে কোনস্থানে থাকিবার প্রয়োজন হইলে গাড়ী না চালাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। এই জন্য যানবাহনপূর্ণ জনাকীর্ণ স্থানে সাইকেল-আরোহীর প্রায়ই বিপদ ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি জার্ম্মানীতে এক প্রকার নূতন ধরণের সাইকেল নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ একটি সাইকেলের সম্মুখের চাকার পিছনে ত্রিভুজাকৃতি একটি ফ্রেমের সঙ্গে খুব ছোট দুইটি চাক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হাতলের কাছে একটী ছোট 'লিভারের' সঙ্গে এই ছোট্ট চাকা দুইখানির যোগ আছে, গাড়ী চলিবার সময় এই 'লিভার'টিকে একটু চাপ দিলেই ওই চাকা দুইখানি উপরে উঠিয়া যায়, আবার গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে 'লিভারে' চাপ দিলে উহারা ভূমির উপর নামিয়া পড়ে, তখন গাড়ী থামিয়া থাকিলেও কাৎ হইয়া পড়ে না। প্রথম-শিক্ষার্থীকেও এই গাড়ী চড়া শিখিতে কোন কসরৎ করিতে হয় না।

'প্যাডেল-হুইল' পরিচালিত ভেলাকৃতি নৌকা।

ডানাশূন্য এরোপ্লেন

সম্প্রতি আমেরিকার ওয়াশিংটন ইউ-নিভার্সিটির একজন বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত ধরণের একপ্রকার এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই এরোপ্লেনের 'প্রোপেলার' ও ডানার পরিবর্ত্তে পাখার 'ব্লেডের' মত একটু বাঁকান ভাবে স্থাপিত ৬ খানা চওড়া ব্লেডের সাহায্যে নির্ম্মিত দুই পাশে দুইটি 'প্যাডেল-হুইল' আছে। মোটরের সাহায্যে এই 'প্যাডেল-হুইল' ঘুরিয়া এরোপ্লেনকে সম্মুখের দিকে পরিচালিত করিবে। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, ইহা যে কোন গতিতে সোজাসুজি উপরে-নীচে উঠা-নামা করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে উড্ডীয়মান অবস্থায় এক-স্থানে থাকিতে পারে। হালের পরিবর্ত্তে লেজের দিকেও আর একটি ছোট ৪ ব্লেডের 'প্যাডেল হুইল' আছে। ইহার সাহায্যে এরোপ্লেনকে যে কোন দিকে ঘুরান-ফিরান যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এই এরোপ্লেন নাকি যুদ্ধের সময় বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।

এরোপ্লেন হইতে প্যারাশূট লইয়া একযোগে পঁচিশ জনের অবতরণ

এরোপ্লেন হইতে 'প্যারাশূট' লইয়া কত সহজে অক্ষত শরীরে ভূমিতে অবতরণ করা যায় তাহার একটি পরীক্ষা দেখাইয়া স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত করিবার জন্য সম্প্রতি মস্কৌতে এক অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছিল। মস্কৌর নিকটে টুসিনো এরোড্রোম হইতে একখানি বিশালকায় এরোপ্লেন ২৫ জন লোক লইয়া অনেক উচুতে উঠিবার সময় অতি দ্রুতগতিতে পর পর ২৫ জন লোকই 'প্যারাশূট' লইয়া লাফাইয়া পড়ে। এক সঙ্গে ২৫টি 'প্যারাশূট' ভূমিতে অবতরণ করিবার সময় এক অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। একসঙ্গে একাধিক লোকের 'প্যারাশূটে' অবতরণের পরীক্ষা ইতিপূর্ব্বেও অনেক দেশেই হইয়াছে। কিন্তু একখানি এরোপ্লেন হইতে এতগুলি লোকের এক সঙ্গে অবতরণ এই প্রথম। ইহাতে একটি লোকও কোন প্রকারে আহত হয় নাই।
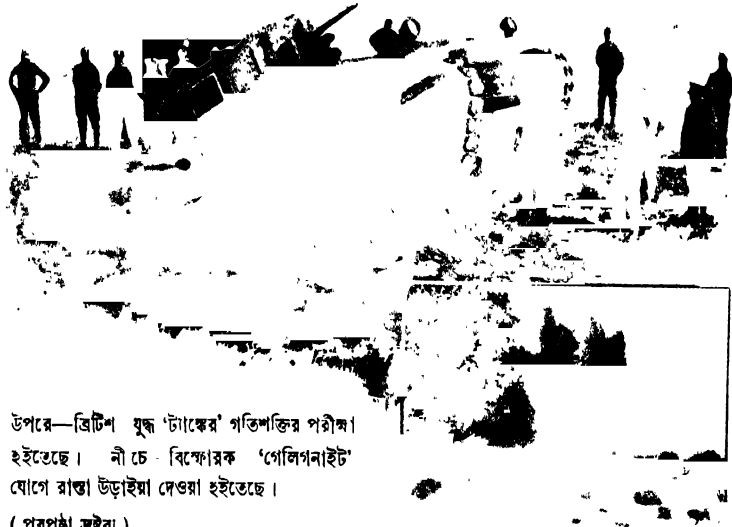
উপরে—ব্রিটিশ যুদ্ধ 'ট্যাঙ্কের' গতিশক্তির পরীক্ষা হইতেছে। নীচে বিস্ফোরক 'গেলিগনাইট' যোগে রাস্তা উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পদ-চালিত নৌকা

সম্প্রতি আমেরিকার সেণ্ট লুই লেগুনস্ নামক হ্রদে বাইসাইকেল-'প্যাডেল'-

চালিত ভেলার মত এক প্রকার নৌকার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে অনেকে অল্পায়াসেই এ ধরণের নৌকা তৈয়ারী করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে এস্থলে ইহার ছবি দেওয়া হইল। টর্পেডোর আকৃতিবিশিষ্ট ছোট ছোট দুইটি ফাঁপা নৌকার উপর ভেলার মত পাশাপাশি তক্তা গাঁথিয়া একখানি প্ল্যাটফর্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর দুই পাশে দুইটি 'সাইকেল ফ্রেম' বসান হইয়াছে। লম্বা ও কয়েক ইঞ্চি চওড়া তক্তা নির্ম্মিত একটি 'প্যাডেল-হুইল' পিছনে বসাইয়া সাইকেলের 'প্যাডেলের' সঙ্গে চেন দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দুইজনে একসঙ্গে 'প্যাডেল' ঘুরাইলেই নৌকা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি "গ্লাইডার"। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

'যুদ্ধের ট্যাঙ্ক'

ব্রিটিশ যুদ্ধোপকরণের ভয়াবহ বিকটাকৃতি 'ট্যাঙ্কে'র কার্য্যকারিতা পরীক্ষার জন্য রয়েল ইঞ্জিনীয়ারগণ ইংল্যাণ্ডের অ্যাল্‌ডারশট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী 'রিইনফোর্সড্‌ কংক্রিট' ও 'ম্যাকাডাম' নির্ম্মিত শক্ত রাস্তাগুলিকে 'গেলিগনাইট' প্রভৃতি ভীষণ শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে রাস্তা উড়িয়া গিয়া স্থানে স্থানে বিশাল গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। এই গভীর অগভীর, শক্ত ও আল্‌গা স্থানের উপর দিয়া 'ট্যাঙ্ক' চালনা করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্ফোরক পদার্থ নির্ম্মিত বিরাটাকৃতি গোলাগুলির আঘাতের ফলে কোথাও যানবাহন চলিবার মত সমতল রাস্তার অস্তিত্ব থাকে না। এরূপ স্থানেই এই দুর্দ্দমনীয় 'ট্যাঙ্কের' ব্যবহার হইয়া থাকে। 'ট্যাঙ্কের' আরোহীরা অক্ষত তো থাকেই অধিকন্তু তাহাদিগকে শত্রুপক্ষের অজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা এমন ভাবে সুদৃঢ় লৌহবর্ম্মাবৃত থাকে যে, সহজে কোন বিস্ফোরক গোলাগুলি

ক্ষুদ্রকায় ইলেকট্রাক পাখা। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইহার কিছুই করিতে পারে না। 'ট্যাঙ্ক' চলিবার জন্য স্থান-অস্থান নাই। এমন কি চলিবার পথে 'ট্রেঞ্চ' পড়িলেও মাটী চিরিয়া, কাঠের বা লোহার খুঁটা,

পেন্সিলের মধ্যে রেডিওগ্রাহক যন্ত্র। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তারের বেড়া উল্টাইয়া সমস্ত তছনছ্‌ করিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। গর্ত্ত বা উচু নীচু জায়গা ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। নবনির্ম্মিত 'ট্যাঙ্কের' এই কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্যই রাস্তা উড়াইয়া দিবার

প্রয়োজন হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় রাস্তার দৃঢ়তা অনুযায়ী বিস্ফোরক পদার্থের ক্ষমতাও পরীক্ষিত হইয়াছে।

হাল্কা এবং ভারী কাঠের নমুনা।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি 'গ্লাইডার'

রাশিয়ার ককটিবেল নামক স্থানে এক প্রকার নূতন ধরণের উড়ন-যন্ত্র বা 'গ্লাইডারের' উড্ডয়ন-শক্তির পরীক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। নবনির্ম্মিত এই 'গ্লাইডারের' বিশেষত্ব এই যে, ইহার লেজ নাই, খুব মোটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একখানি বিরাট ডানা আছে মাত্র। ডানার উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে চালকের বসিবার স্থান। লেজের পরিবর্ত্তে এই অর্দ্ধ-গোলাকৃতি ডানার পিছনের দিকে সরল-রেখা-ক্রমে বরাবর একখানি চওড়া ফালি সংযোগ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যেই 'গ্লাইডার' খানাকে প্রয়োজন-মত উচু-নীচু করা যাইতে পারে। সোভিয়েট সরকারের 'গ্লাইডারের' আড্ডায় এই অভিনব 'গ্লাইডারের' পুনর্ব্বার পরীক্ষা হইবে।

টর্চ্চ-লাইট ব্যাটারীচালিত ক্ষুদ্রকার পাখা

সম্প্রতি এক নূতন ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি পাখা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাখা যেখানে-সেখানে পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। টর্চ্চ-লাইটের ব্যাটারীর সাহায্যেই ইহা অতি দ্রুত গতিতে ঘুরিতে পারে, ব্যাটারীর খাপের অগ্রভাগে সুতার কাটিমের মত খুব ছোট্ট একটি মোটর আছে ; তাহার সঙ্গেই এই দুই ব্লেডের পাখা সংযুক্ত। বোতাম টিপিলেই পাখা ঘুরিতে থাকে ; পকেটে রাখিবার সময় 'ব্লেড' দুইখানি খাপের সঙ্গে মুড়িয়া রাখা যায়।

পেন্সিলের মধ্যে রেডিও

লিখিবার পেন্সিলের মধ্যে সম্প্রতি একপ্রকার ক্ষুদ্রতম রেডিও-গ্রাহক-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্রকায় রেডিও-যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আর নির্ম্মিত হয় নাই। পেন্সিলের মাথায় ঘষিবার রবার আটকাইবার ধাতব আবরণীর মধ্যে অদৃশ্য রেডিও তরঙ্গ-সংগ্রাহক 'কৃষ্টাল' বসান আছে ; তাহার সঙ্গে পিনের মত সূক্ষ্ম তারের 'এরিয়েল' পেন্সিলের ভিতর দিয়া শীষের মত বাহির হইয়া রহিয়াছে। সুর-নিয়ন্ত্রণকারী তারকুণ্ডলী (tuning coil) পেন্সিলের গায়ে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যবহার করিবার সময় মাত্র 'হেড-ফোনের' সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হয়। অনেক দূর হইতে প্রেরিত গানবাজনা এই যন্ত্রযোগে পরিষ্কার শোনা যায়।

হাল্কা এবং ভারী কাঠ

কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকায় এক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জাতীয় কাঠের গুরুত্ব ও সহনশীলতা দেখান হইয়াছিল। এই ছবিতে মেয়েটি দুই হাতে দুই প্রকার কাঠের নমুনা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ডান হাতে যে প্রকাণ্ড কড়িটি দেখা যাইতেছে উহা 'বাল্‌সা' নামক কাঠ হইতে নির্ম্মিত আর বাঁ হাতেরটি 'কিংস্ উড' নামক গাছের কর্ত্তিত অংশ। 'কিংস্ উডের' টুক্‌রাটি 'বাল্‌সার' প্রকাণ্ড কড়ি হইতে ওজনে অনেক ভারী। এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ বা জলে ভাসিবার মত কোন জিনিষ তৈয়ারী করিতে এই 'বাল্‌সা' কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'কিংস্ উড'কে সময়ে সময়ে বেগুনে কাঠও বলা হইয়া থাকে। ইহা ঘরের মূল্যবান আসবাব-পত্র নির্ম্মাণ করিতে ব্যবহৃত হয়।

পতঙ্গাকৃতি এরোপ্লেন

একজন ইংরেজ আবিষ্কারক নূতন ধরণের এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গাকৃতি এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা পতঙ্গের মতই ডানা নাড়িয়া বাতাসে উড়িবে এবং সম্মুখেও অগ্রসর হইবে। এই এরোপ্লেনের গঠনও সাধারণ এরোপ্লেন হইতে ভিন্ন রকমের। ইহা দেখিতে অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি চালা-ঘরের মত। শরীরের উভয় পার্শ্বে সমকোণে স্থাপিত তিন খানা করিয়া 'ব্লেড' বা পাখা আছে। মোটরের সাহায্যে পাখা ঘুরিলেই এরোপ্লেন চলিতে থাকে।
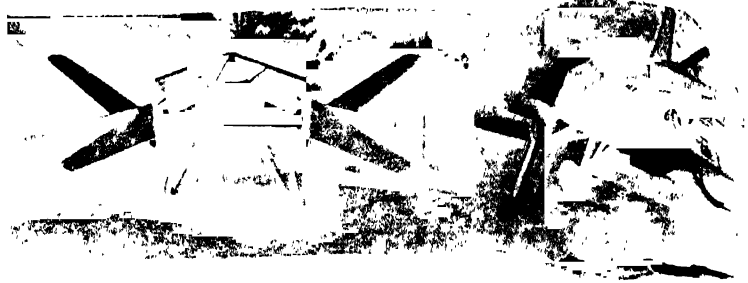
পতঙ্গের মত ডানা নাড়িয়া উড়িতে সক্ষম এরোপ্লেন।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সমাজের নিম্নস্তর থেকে যাঁরা জগতে বড় হয়েছেন

(২) জগতের কৃতী ক্রীতদাস

১

ছেলেবেলায় যারা পরের জুতো সেলাই করে বেড়িয়েছে, কেমন করে তারা বড় হয়ে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেতে পেরেছে, তার কাহিনী গতবারে বলেছি। ক্রীতদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে, যারা সমাজের বাধা-নিষেধকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, মানুষের সমাজে শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়েছেন, আজ তাঁদেরই কয়েকজনের কাহিনী বলব।

ঈশপের জীবন এর-আগে চতুষ্পাঠীতে আলোচনা করেছি। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা করব না। আজ ঈশপের নাম প্রত্যেক সভ্যজাতির ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে—প্রত্যেক সভ্য জাতির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়, ঈশপের গল্প পড়া থেকে। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। মানব-চরিত্রকে তিনি ভিতর থেকে দেখতে শিখেছিলেন এবং ক্রীতদাস-জীবনের নানা লাঞ্ছনার মধ্যে থেকে নানা প্রকৃতির মানুষ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর বাসনা হল—তাঁর সেই সব অভিজ্ঞতার কথা জগৎকে শোনাবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের মুখে মনিবদের চরিত্র-সমালোচনা মনিবরা সহ্য করবেন কেন? সেই জন্য ঈশপ গল্প বলার এক নতুন কায়দা আবিষ্কার করলেন। সেই সব গল্পের মধ্যে কোথাও একটি মনুষ্য-চরিত্রের উল্লেখ নেই। তাঁর গল্পের নায়ক, পশু, পাখী ইত্যাদি বন্য জন্তুরা। কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে এবং তাদের গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি মানব-চরিত্রের কাহিনী বলতে লাগলেন। বিচিত্র বলে সেই সব গল্প শুনতে গ্রীসের লোকদের ভাল লাগত। তারা ঈশপকে ঘিরে সেই সব গল্প শুনত। এমন কি গ্রীক সুন্দরীরাও তাঁর গল্প বিমুগ্ধ হয়ে শুনত।

লিডিয়ার রাজা ক্রইসাস ঈশপের প্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিনে নিয়ে স্বাধীন করে দেন। কিন্তু একবার এক ঝগড়া মেটাতে গিয়ে ঈশপ গ্রীকদের রোষে প্রাণ হারান।
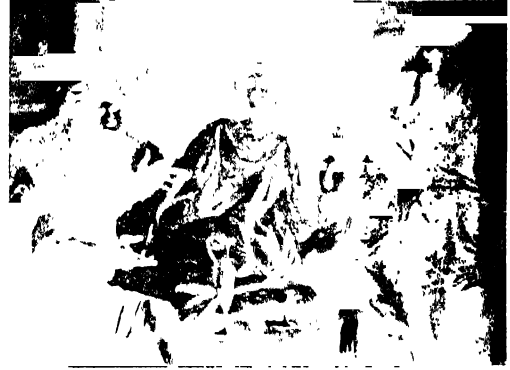
ঈশপ গল্প বলছেন।

কথিত আছে যে, খৃঃ পূঃ ৫৬১ অব্দে তাঁকে এক পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

২

প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে যে সব জগজ্জয়ী পণ্ডিত এবং দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এপিক্‌টেটাস (Epictetus) হলেন তাঁদের একজন। সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের নামের সঙ্গে আজও তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাসের ক্রীতদাস। তাঁর যিনি মনিব ছিলেন, তিনি ছিলেন মহারাজ নীরোর ক্রীতদাস। তাঁর নাম ছিল এপাফ্রোডিটাস (Epaphroditus)। নীরো সন্তুষ্ট হয়ে এপাফ্রোডিটাসকে স্বাধীন করে দেন।

ক্রীতদাস এপাফ্রোডিটাস নিজে স্বাধীন হয়ে এপিক্‌টেটাসকে ক্রীতদাস রাখলেন এবং ক্রীতদাস থাকার সময় তিনি যে-সব লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তার শতগুণ লাঞ্ছনা তাঁর নিজের ক্রীতদাসকে দিতে লাগলেন। একদিন খেলাচ্ছলে তিনি এপিক্‌টেটাসের একটা পা নিয়ে একটা কাঠের উপর দোমড়াচ্ছিলেন—মাটির পুতুলের আঘাত লাগতে পারে না, ক্রীতদাসেরও লাগা উচিত নয়। যখন চাপ খুব বেশী পড়েছে তখন একান্ত স্বাভাবিকভাবে শান্ত-

কণ্ঠে এপিক্‌টেটাস একবার বললেন—আর একটু চাপ দিলেই ভেঙ্গে যাবে !

সঙ্গে সঙ্গেই জোরে চাপ পড়ল এবং পা ভেঙ্গে গেল। হাসতে হাসতে এপিক্‌টেটাস বলে উঠলেন, আগেই বলেছিলাম, ভেঙ্গে যাবে !

এপিক্‌টেটাস প্রকাশ্য ভাবে তাঁর বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন ...।

মধ্যযুগে বড়লোকেরা যেমন তাঁদের সঙ্গে একজন করে "ভাঁড়" রাখতেন, সেকালে প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা সেই রকম একজন করে দার্শনিক পুষতেন। প্রাচীন গ্রীসের বড়লোকদের সেই ছিল বিলাসিতা। তাঁরা যেখানে থাকতেন বা যেখানে যেতেন, আসর জমাবার জন্য একজন মাইনে করা দার্শনিক নিয়ে যেতেন। এপাফ্রোডিটাসেরও সখ গেল যে, তিনি তাঁর সঙ্গে একজন দার্শনিক রাখবেন।

এপিক্‌টেটাসের প্রকৃতি এবং বুদ্ধি দেখে তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর ক্রীতদাসকেই তিনি দার্শনিক রূপে গড়ে তুলবেন। তাঁর এই সদিচ্ছার জন্য এপিক্‌টেটাসের পা-ভাঙ্গার অপরাধ জগৎ আজ ভুলে যেতে পারে।

সেই সময় রুফাস বলে একজন গ্রীক দার্শনিকের কাছে এপিক্‌টেটাস মানব-চরিত্র এবং দর্শনবিদ্যায় শিক্ষালাভ করলেন। তাঁর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হল। দিনের পর দিন গভীরতম আত্ম-চিন্তার পর এপিক্‌টেটাস পরম-জ্ঞান লাভ করলেন। এই সময় তিনি অর্থ দিয়ে নিজের স্বাধীনতা ক্রয় করেন।

স্বাধীন হয়ে তিনি তাঁর মনের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের জীবনকে উন্নত করবার জন্য, ভ্রান্ত-পথ পথিককে পথ দেখাবার জন্য, দেশে-দেশে জ্ঞানী গুণী তপস্বীরা যে-সব কথা প্রচার করে গিয়েছেন, এপিক্‌টেটাসের বাণীও সেই সব অমর উক্তির অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রচার করলেন যে, জীবনের সহজ এবং অনাবিল আনন্দ থেকে নিজেকে জোর করে সরিয়ে এনে, নিজের অন্ধকার ঘরের কোণে নিজেকে আটক রেখে মানুষ আত্মোন্নতিকে খর্ব্ব করে। নাবিক যেমন তীরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনে, কখন সমুদ্রের ওপার থেকে জাহাজ আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে, তেমনি এই পৃথিবীতে থেকে, পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্যে, মানুষ যেন সেই সাগরতীরের নাবিকের মত উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কখন আসবে জীবনাতীতের আহ্বান। তিনি প্রচার করলেন যে, এই মর্ত্ত্য-জীবনে মানুষের সব চেয়ে বড়

সম্পদ হল, সদা-জ্ঞান-তৃষ্ণা, সত্যকে জানবার জন্ম নিত্য আকুতি।

কিন্তু রোমের যিনি শাসক ছিলেন, তিনি এই সব কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। একধার থেকে তিনি দার্শনিকদের রোম থেকে নির্ব্বাসিত করতে লাগলেন এবং কালক্রমে এপিক্‌টেটাসও রোম থেকে চির-নির্ব্বাসিত হলেন।

রোম থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে তিনি গ্রীসে এলেন। প্রথম-জীবনে মনিবের কৃপায় তিনি খঞ্জ হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীসে এসে নগরের বাইরে এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে অতি দরিদ্র ভাবে তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। তাঁর ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তরুণ ছাত্রেরা এসে সেই কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে তাঁর বাণী শুনে যেত।

কিন্তু তাঁর সেই একক জীবনের একটি সাথী ছিল। তাকে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। সেকালে গ্রীসে গরীব গৃহস্থের সংসারে যখন ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব বেড়ে যেত, তখন কোন কোন নিষ্ঠুর লোক নিজেদের নব-জাত শিশুকে একটা মাটীর পাত্রতে রেখে মাঠে ফেলে যেত। এপিক্‌টেটাস এই রকম একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে মানুষ করেন। কুঁড়েঘরে সেই ছিল তাঁর একক জীবনের সাথী।

তাঁর মৃত্যুর পর যখন রোমে এ্যাণ্টনিয়াস সম্রাট হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "এই ক্রীতদাসের বাণী অনুসরণ করে নিজেকে সম্মান করতে শিখেছি, দেশকে ভালবাসতে শিখেছি এবং কোন দিন এই দু'য়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব অনুভব করিনি।"

৩

শুধু সম্রাট এ্যাণ্টনিয়াস কেন, জগতের কত লোক, কত বন্ধুহীন আর্ত্তদিনে এই মহাপুরুষের বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, ক্লান্ত চরণে আবার তাদের চলবার শক্তি এসেছে। তাঁরা যে সব বীজ ছড়িয়ে যান, কোথায় কখন যে তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে, তা কেউ বলতে পারে না। প্রায় দু'হাজার বছর আগে ক্রীতদাস আমাসিস আপনার মনে নানা রকমের পাত্রের গায়ে প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক জীবনের নানা অপরূপ চিত্র এঁকে গিয়েছিলেন। দু'হাজার বছরের বিস্মৃতির ব্যবধান এড়িয়ে তারই কয়েকটা টুকরো সহসা আর এক দূর দেশের তরুণ কবির চিত্তে এমন এক অপূর্ব্ব প্রেরণা এনে দিল, যার ফলে সেই দেশের সাহিত্য অপূর্ব্ব কবিতায় শ্রীমন্ত হয়ে উঠল। কোথায় ইংরাজ কবি কীট্‌স আর কোথায় প্রাচীন গ্রীসের ক্রীতদাস আমাসিস! এক জনের আলো এমনি করেই আর একজনের প্রদীপ জ্বালিয়া তোলে। তাই মানব-সভ্যতার দেয়ালী অনির্ব্বাণ ভাবে আজও জ্বলছে।

৪

প্রাচীন গ্রীস থেকে য়ুরোপের মধ্যযুগে আসা যাক। ষোড়শ শতাব্দী। তখনও ক্রীতদাস প্রথার রাজত্ব চলছে।

সার্ভেণ্টিস্ ঘানি টানছেন।

সেই সময় য়ুরোপে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হল সার্ভেণ্টিস্, (Miguel de Cervantes)—ডন্ কুইক্‌জোট কাহিনীর অমর স্রষ্টা। সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, দুর্ভাগ্যবশত তাঁকেও ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হয়।

যখন স্পেন গৌরবের সর্ব্বোচ্চশিখরে সমাসীন, সেই সময় স্পেনে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সার্ভেণ্টিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। যৌবনপ্রারম্ভেই সার্ভেণ্টিস্ সৈনিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং স্পেন ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর কাল তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। পাঁচ বছর ঘর-ছাড়া হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কেটেছে। ঘরের জন্ম মন কাতর হয়ে উঠল। সেনাপতির কাছে ছুটির জন্ম আবেদন করায়, তিনি তাঁর

বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী যাবার ছুটি দিলেন। একটা নৌকা নিয়ে তিনি স্পেনের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে জল-দস্যুরা তাঁর নৌকা আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করল। আফ্রিকার আল্‌জিয়ারস শহরে তখন ক্রীতদাস বেচা-কেনার একটা মস্ত বড় ঘাঁটি ছিল। সমুদ্র-পথ-যাত্রী খৃষ্টানদের বন্দী করে জলদস্যুরা ক্রীতদাস হিসেবে তাদের আলজিয়ার্‌স্‌-এ বিক্রী করত। সার্ভেন্টিস্‌কেও তারা আলজিয়ার্সে এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে গেল।

সেই দাস-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে হাসান নামে একটি লোক সার্ভেন্টিস্‌কে কিনে বাড়ী নিয়ে গেল। সে অঞ্চলে ক্রীতদাসরা হাসানের নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠত, এমনি নিষ্ঠুর ছিল সে। কিন্তু সেই হাসান নতুন ক্রীতদাসটিকে কঠোর শাস্তি দিলেও, শত-অপরাধেও গুরুতর কোন আঘাত করত না। সারাদিন-রাত ঘানি টানানো, বা খেতে না দেওয়া, বা এক সপ্তাহ ধরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা হাসানের কাছে দয়ার সামিল ছিল। বহু ক্রীতদাসকে সে ফাঁসী দিয়েছে—কথায় কথায় বহু ক্রীতদাসের যে কোনও অঙ্গচ্ছেদ করেছে। বারো বার সার্ভেন্টিস্ লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, বারো বারই তিনি ধরা পড়েছেন। স্পেনের সৌভাগ্য যে হাসান সার্ভেন্টিস্‌কে মেরে ফেলে নি। এই দুরন্ত ক্রীতদাসটির জীবনহানি বা অঙ্গচ্ছেদ করতে হাসানের কোথায় যেন বাধতো। একবার সার্ভেন্টিসের শাস্তি হল, দু'হাজার কোড়ার প্রহার। কিন্তু সেবারও হাসান দয়া দেখিয়ে পাঁচ মাস শুধু তাঁকে অন্ধকার ঘরে কারারুদ্ধ করে রেখে দিল। এই ভাবে পাঁচটি বছর কেটে গেল।

ওধারে স্পেনে তাঁর দরিদ্র পিতা সন্তানের জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পুত্র আলজিয়ার্সে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছেন। এক সদাশয় সন্ন্যাসী সার্ভেন্টিসের পিতার অবস্থা দেখে তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার ভার নিলেন। সার্ভেন্টিসের বাবা সর্ব্বস্ব বেচে সেই সন্ন্যাসীর হাতে তিনশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাঁকে আলজিয়ার্সে পাঠালেন। কিন্তু হাসানের মন তাতে টললো না। পাঁচশো স্বর্ণ-মুদ্রার কমে সার্ভেন্টিস্‌কে সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাইল না। সন্ন্যাসী হাসানের হাতে-পায়ে ধরল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—পাঁচশো স্বর্ণ-মুদ্রা চাই-ই।

নিরুপায় হয়ে তিনি আফ্রিকার উপকূলে যে-সব য়ুরোপীয় বণিক আসা-যাওয়া করত, তাদের কাছে ভিক্ষা করতে লাগলেন। বহুদিন এইভাবে ভিক্ষার পর, আর দু'শো স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে, মুক্তি-মূল্য দিয়ে তিনি সার্ভেন্টিস্‌কে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন।

সার্ভেন্টিসের অবশিষ্ট জীবন ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ফিরে এসে তিনি একটা চাকরী জোগাড় করলেন বটে, কিন্তু তার মাইনে হল বছরে ত্রিশ পাউণ্ড। তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সেদিকেও ভাগ্যদোষে তিনি এক প্রবল বাধা পেলেন। সেই সময় স্পেনের নাট্য-সাহিত্যের জন্মদাতা লোপ্ দ্য ভেগা, Lope de Vega—(এঁর চেয়ে বেশী নাটক জগতের কোনও নাট্যকার লিখতে পারেন নি, তিনি প্রায় দু'হাজার নাটক লিখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৪০০ এখনও প্রচলিত আছে)—স্পেনের সাহিত্য-জগতে একাধিপত্য করছিলেন। সার্ভেন্টিসের সমস্ত নাট্য-রচনা-প্রচেষ্টাকে তিনি বাধা দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ ভেগা প্রকাশ্যভাবে তাঁর শত্রুতা করতে লাগলেন। সার্ভে-ন্টিস্ দরিদ্র, অবজ্ঞাত, ক্রীতদাসের চাবুকের দাগ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। তিনি সাহিত্য-সমাজেও স্থান পেলেন না।

যখন আমরা ডন কুইক্‌জোট আর স্যাঙ্কো-পাঞ্জার হাস্যকর কাহিনী পড়ি, তখন যেন স্মরণে রাখি যে, এই সুতীক্ষ্ণ দারিদ্র্য এবং সুনিবিড় নৈরাশ্যের মধ্যে থেকে সেদিন সার্ভেন্টিস্ হাসতে পেরেছিলেন, লোককে হাসাতে পেরেছিলেন। পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি এই অমর কাহিনী রচনা করেন, কিন্তু সেদিন স্পেনে কেউ-ই এই লেখার জন্যে সর্ভেন্টিস্‌কে অভিনন্দিত করে নি—বিক্রীও হয় নি। ভেগার দল থেকে, তাঁকে ব্যঙ্গ করে, এক অতি কুৎসিত বই প্রকাশিত হয়। আজ বাইবেল ছাড়া ডন কুইক্‌জোটের কাহিনী জগতের যত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এমন আর কোনও বই হয়নি। যে-কলম্বাস স্পেনের হাতে একটা মহাদেশ তুলে দিয়েছিলেন, স্পেন সেদিন তাঁকে কারারুদ্ধ করে সম্মান দেখিয়েছিল; যে-সার্ভেন্টিস সাহিত্য-জগতে স্পেনকে অমর করে গেলেন, তাঁর জীবদ্দশায় স্পেনের একটি সম্ভ্রান্ত লোকও তাঁর কোনো খবর নেয়নি।

সেদিনকার রণ-মত্ত স্পেন ডন্ কুইকজোটের গ্রন্থকারকে জানত না।

ডন্ কুইক্জোট লেখার কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান। মৃত্যুশয্যায় ওষুধ বা পথ্যের জন্য একটিও পয়সা তাঁর ছিল না। একজন লোক দয়াপরবশ হয়ে কিছু দান করে যায়। সেই অজ্ঞাতনামা লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেই মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি একখানি চিঠি লেখেন। সেই তাঁর শেষ-রচনা।

এবং আজও পর্য্যন্ত স্পেন জানে না কোথায় তাঁর দেহ সমাহিত হয়েছিল। এ রকম অবজ্ঞাত ভাবে বোধ হয় জগতের আর কোনও প্রতিভাকে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়নি।

তাঁর জীবনের এই নিদারুণ নৈরাশ্যের সঙ্গে ডন্ কুইক্-জোটের বিদ্বেষহীন, তিক্ততাহীন অট্টহাসি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সার্ভেন্টিসের বিশেষ গৌরব কোথায়।

৫

এ পর্য্যন্ত যাঁদের কাহিনী বললাম, তাঁরা ছিলেন খৃষ্টান ক্রীতদাস। কিন্তু সার্ভেন্টিস্ যে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শতাব্দী থেকেই খৃষ্টান-জগৎ আফ্রিকার কালো নিগ্রোদের নিয়ে তিন শতাব্দী ধরে যে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ক্রীতদাস-ব্যবসায় চালিয়ে এসেছে, সঙ্ঘবদ্ধ নিষ্ঠুরতার ব্যাপকতার দিক থেকে, তার তুলনা জগতের ইতিহাসে নেই। তিন শতাব্দী ধরে, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং হলাণ্ড নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে যে অমানুষিক বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়েছিল, তার কলঙ্ক-কালিমা কোনও দিন মুছে যাবে না।

স্পেনই প্রথম এই নির্ম্মম কাজে য়ুরোপকে পথ দেখায়। স্পেনের অত্যাচারে যখন পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম রেড-ইণ্ডিয়ানরা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন সেই বিজয়োন্মত্ত জাতির পরিচালকদের মাথায় হঠাৎ একটা নতুন বুদ্ধি এল—তাঁরা স্থির করলেন যে, আফ্রিকার নিগ্রোরা রেড-ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে ঢের বলিষ্ঠ, অতএব নিগ্রোদের ধরে ক্রীতদাস করে রাখা যাক।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজার হুকুমে পঞ্চাশ জন নিগ্রোকে ধরে আনা এল। দূর হায়তী-দ্বীপে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়েছে—সেইখানে তাদের কুলীর কাজ করতে হবে। এই হল সূত্রপাত।

এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে একজন ইংরাজ আফ্রিকা থেকে ৩০০ হতভাগ্য নিগ্রোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম-ভারত দ্বীপপুঞ্জে স্পেনিয়ার্ডদের কাছে বিক্রী করে। তাতে তার প্রচুর লাভ হয়। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই হলেন প্রথম ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। তাঁর নাম জন হকিন্স্। রাজ্ঞী এলিজাবেথ জন হকিন্স্কে "নাইট" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৬১৯ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের একটি জাহাজ ভার্জিনিয়ার জেম্স্টাউন বন্দরে এসে উপস্থিত হয়। জাহাজের ক্যাপটেন সেখানকার নতুন উপনিবেশকারীদের ডেকে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর জাহাজে বিক্রীর জন্য "জ্যান্ত মাল" সব আছে। জাহাজের খোলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কুড়িজন "নেগার" পড়ে আছে। তারাই হল ক্যাপটেনের "জ্যান্ত মাল"। সেই সময় নতুন উপনিবেশকারীদের লোকজনেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁরা সাগ্রহে তাদের কিনে নিলেন। সেই দিন থেকে আমেরিকায় নিগ্রো-নির্য্যাতনের অতি শোচনীয় পর্য্যায় সুরু হল।

আফ্রিকার গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে, য়ুরোপীয় বণিকরা আমেরিকার বন্দরে বন্দরে মানুষ বিক্রী করে, দু'পকেট পয়সা ভরিয়ে নিয়ে চলে যেত। সে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী আজ আর এখানে বলতে চাই না। শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মাত্র লিভারপুল, ব্রিষ্টল এবং লণ্ডন, এই তিন বন্দরে তিনশো আশীখানি জাহাজ শুধু মানুষ বিক্রী করার কাজেই ব্যবহৃত হত। এবং তখন য়ুরোপের বন্দরে বন্দরে জাহাজী-জিনিষের যে-সব দোকান ছিল, তাতে ঢুকলেই সর্ব্ব-প্রথম দেখা যেত, চারিদিকে ঝুলছে লোহার শৃঙ্খল, হাত-কড়া, পায়ে-লাগাবার বেড়ী, লোহা-বাঁধানো নানা ডিজাইনের কোড়া—দাস-শাসনের এই সব যন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সভ্য-জাতিদের ঘরে ক্রীতদাসদের সংখ্যা দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়,

আমেরিকায় তখন,	৪,০০০,০০০	জন ক্রীতদাস ছিল।
বৃটীশ উপনিবেশ	৮০০,০০০	,, ,, ,,
ফরাসী উপনিবেশ	২৫০,০০০	,, ,, ,,

ডাচ্ উপনিবেশে ২৭,০০০ জন ক্রীতদাস ছিল।
স্পেন এবং পর্ত্তুগীজ উপনিবেশে ,,
৬০০,০০০ ,, ,, ,,
ব্রেজিলে ২,০০০,০০০ ,, ,, ,,

এই সব লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হত, তার কথা বিস্তৃতভাবে এখানে বলার কোন প্রয়োজন নেই। যে সব মহাত্মারা এই জঘন্যতম পাপ থেকে বর্ত্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করে গিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটা সুস্থ-সবল, ধর্ম্ম-প্রবণ, কষ্ট-সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল চরিত্রবান বিরাট জাতিকে শোচনীয় অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের কাহিনী বারান্তরে বলব। সেই সব অবজ্ঞাত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে থেকে, সমস্ত সভ্য জগতের অবজ্ঞা, অপমান এবং আঘাত সহ্য করে, যে সব মহাপুরুষ স্বজাতির কল্যাণে, মানুষ্যত্বের কল্যাণে, সভ্যতার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করে বিমুখ পৃথিবীতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের কাহিনী বলে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করব।

৬

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মেরীল্যাণ্ড প্রদেশে এক ক্রীতদাসীর গর্ভে ফ্রেডারিক ডগলাস (Frederick

ফ্রেডারিক ডগলাস্।

Douglas) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন নিগ্রো ক্রীতদাসী। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বর্ব্বর শ্বেতাঙ্গ ক্রীত-দাস-প্রভু।

একদিন মনিবদের কথাবার্ত্তা লুকিয়ে শুনতে গিয়ে ডগলাস বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সতেরো বছর বয়স হয়েছে। কার কত বয়স তা-ও তারা জানত না। নির্য্যাতন অসহ্য হওয়ায় ফ্রেডারিক একদিন লুকিয়ে পালিয়ে যায়।

সেই সময় আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে একদল লোক এই নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। স্পষ্টত দুটি ভাগে তখন আমেরিকা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—একদল যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে, আর একদল যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথাকে চালাতে চান। শেষোক্ত দলই তখন সংখ্যায় এবং শক্তিতে প্রবল ছিল। যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সেদিন আন্দোলন করতেন, তাঁরা ভয়াবহভাবে নির্য্যাতিত হতেন। কত মহাপুরুষকে এই জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে।

ফ্রেডারিক পালিয়ে গিয়ে সৌভাগ্যবশত এই দলের একজন মহাপুরুষের আশ্রয় পান এবং তাঁর কাছেই তিনি লেখা-পড়া শেখেন। লেখা-পড়া শিখে তাঁর অন্তরের এক-মাত্র বাসনা হল, ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদে যদি প্রয়োজন হয় জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

সমগ্র আমেরিকা পায়ে হেঁটে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আমেরিকায় আজও পর্য্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ বক্তা জন্ম-গ্রহণ করেছেন, ফ্রেডারিক তাঁদের মধ্যে একজন। অসাধারণ ছিল তাঁর বাগ্মিতা। ক্রমশ তিনি বিরুদ্ধ দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। একে নিগ্রো, তাতে আবার ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করছেন—যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু-সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

একদিন এক তুমুল ঝড়ের রাতে পালিয়ে গিয়ে এক জাহাজে উঠলেন। জাহাজের কেবিন সব বন্ধ। জাহাজের এক কেবিনে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ থাকবার আইন ছিল না। সেই শীতের রাত্রিতে তুমুল ঝড়-জলের মধ্যে ফ্রেডারিক ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেই জাহাজের যিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন, তিনি অন্তরে দাস-প্রথার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করতেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি প্রকাশ্যভাবে সে মত জাহির করতেন না। ফ্রেডারিকের সেই দুরবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে, আইন রক্ষা করে কি করে তাঁকে কেবিনে আনা যায়, সে কথাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। অসভ্য রেড-ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এক কেবিনে যেতে পারে কিন্তু নিগ্রোরা নয়! সেই জন্যে কায়দা করে তিনি প্রশ্ন করলেন,

—তুমি তো রেড্-ইণ্ডিয়ান হে?

ক্যাপ্টেন আশা করেছিলেন, বিপন্ন নিগ্রো তাঁর এই প্রশ্নের সুবিধা গ্রহণ করবে।

সেই ঝড়ের মধ্যে মাথা তুলে ফ্রেডারিক উত্তর দিলেন, আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি নিগ্রো।

ক্রমশঃ আমেরিকায় এই ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধলো। সেই যুদ্ধের আয়োজনে এবং যুদ্ধে ফ্রেডারিক জন ব্রাউন এবং আব্রাহাম লিন্‌কলনের সব চেয়ে বড় সহায় হয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতায় অসাধারণ প্রতিভা এবং চরিত্র-বল দেখে আব্রাহাম লিন্‌কলন্ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। দাস-প্রথা-উচ্ছেদের ইতিহাসে ফ্রেডারিকের নাম, লিন্‌কলন্, গ্যারিসন্, জন ব্রাউন, উইলবারফোর্স প্রভৃতির সঙ্গে একস্বরে উচ্চারিত হতে পারে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যেদিন আব্রাহাম লিন্‌কলন্ ঘোষণা করলেন, অতঃপর আমেরিকায় আর কেউ ক্রীতদাস থাকবে না, সেদিন ফ্রেডারিক তাঁরই পাশে। কিন্তু আইনত এই প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেলেও, তখনও অনেক কাজ বাকী ছিল। ফ্রেডারিক বুঝলেন যে, সেইদিন থেকে নতুন কাজ সবে সুরু হল মাত্র। কারণ, এতদিন পর্য্যন্ত যারা এইভাবে নিষ্পেষিত হয়েছিল, তাদের নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তাদের এই নতুন জগতের উপযুক্ত করে সকল দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে—নতুবা শুধু ক্রীতদাস হওয়া থেকে আইনত মুক্তি পেলেই, এই বিরাট জাতি বাঁচার মতন করে বেঁচে থাকতে পারতে না। অবশিষ্ট জীবন ফ্রেডারিক সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনে বিনিয়োগ করলেন।

আমেরিকার নতুন রাষ্ট্র ফ্রেডারিকের অসামান্য প্রতিভাকে যোগ্য মর্য্যাদা দিল। নতুন রাষ্ট্রের বহু উচ্চপদে তিনি ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হায়তী উপনিবেশের আমেরিকান মন্ত্রী এবং কন্‌সাল-জেনারেল হন।

সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে এলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ—তাঁর বয়স আটাত্তর বৎসর। নিগ্রোদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তিনি প্রবলভাবে আন্দোলন সুরু করলেন। একদিন এক বক্তৃতা সভা থেকে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে এল। বাড়ীর দরজায় ঢুকতেই তাঁর অবশ দেহ কেঁপে পড়ে গেল। সেখান থেকে আর তিনি উঠতে পারেন নি। সেই ক্ষণেই মৃত্যু এসে তাঁর মহৎ জীবনের যবনিকা টেনে দেয়।

৭

ফ্রেডারিক যে-আদর্শ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে-গেলেন, আর একজন নিগ্রো এসে তাকে সার্থক করে তুললেন।

বুকার টি. ওয়াশিংটনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

সেই মহাপুরুষের নাম বুকার টি. ওয়াশিংটন। শুধু নিগ্রোদের মধ্যে নয়, আমেরিকার নাগরিকদের মধ্যে এত বড় মানুষ গুটি দুই তিন জন্মগ্রহণ করেছেন মাত্র। ক্রীতদাস হয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেমন করে ক্রীতদাস-জীবনের লাঞ্ছনার মধ্যে থেকে তিনি নিজের এবং স্বজাতির উন্নতির জন্য জীবনব্যাপী সাধনায় সার্থকতা লাভ করেছিলেন, তার অপরূপ কাহিনী তিনি তাঁর জগৎ-খ্যাত আত্মচরিতে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আপ ফ্রম স্লেভারি [Up from Slavery] প্রত্যেক ছাত্রের পড়া উচিত। যে অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল, তার কাহিনী বলার স্থান এখানে নেই। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী পাবার পর, তিনি স্থির করলেন যে, এই নিরক্ষর

জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অসাধ্য-সাধনের পর তিনি নিগ্রো ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিখ্যাত হ্যাম্পটন ইন্‌ষ্টিটিউট এবং টাসকাজী ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেন। টাসকাজী ইন্‌ষ্টিটিউট আজ একটা বিরাট জাতির মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া

টাসকাজী শিক্ষায়তন।

বহু বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিগ্রোদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সমস্ত জগৎ থেকে তিনি একটা স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত এই অর্থ-ভাণ্ডার থেকে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য চার হাজার শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে এবং সেই বিরাট কীর্ত্তির মূলে ছিল, এই একটি লোকের অনন্যসাধারণ সাধনা ও প্রতিভা। আজ এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে নিগ্রোদের মধ্যে বড় বড় ডাক্তার, উকীল, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আবিষ্কারক জন্মগ্রহণ করেছেন। কয়েক বছর আগে যাদের পিতা-মাতারা নিজেদের বয়স পর্য্যন্ত বলতে পারতেন না, আজ তাদের মধ্যে প্রায় দুশো সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পোরীর সঙ্গে উত্তর-মেরুতে যারা প্রথম পৌঁছেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন দুঃসাহসী নিগ্রো আবিষ্কারক ছিলেন। তাঁর নাম হল ম্যাট হেন্‌সন। আল জন্‌সন্, এলা শেফার্ড প্রভৃতি জগৎ-খ্যাত নিগ্রো গায়ক-দের সঙ্গীতে আজও য়ুরোপ মুখরিত।

৮

এই জাগরণ-উন্মুখ জাতির মধ্যে আজ যে সব কবি ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করছেন, তাঁদের মধ্যে উইলী ড্যু'বয়ের নাম সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ তাঁর নাম পরিগণিত। তাঁর জগৎ-খ্যাত গ্রন্থ "দি সোল অব এ ব্ল্যাক-ফোক" "The Soul of a Black-Folk" সমস্ত য়ুরোপ এবং আমেরিকাকে সচকিত করে তোলে। স্বজাতির অন্তর-বেদনাকে এমন ভাবে আর কেউ রূপ দিতে পারে নি। সেই বেদনার অপূর্ব্ব ভাষা তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে—

"Straining at the armposts of thy throne, we raise our shackled hands and charge thee, O God, by the bones of our stolen fathers, by the tears of our dead mothers—surely Thou, too, art not white, o Lord, a pale, bloodless, heartless Thing !"

—তোমার সিংহাসনের স্পর্শলাভের জন্য, হে প্রভু, এই আমাদের শৃঙ্খলিত বাহু আজ উত্তোলন করেছি। অপহৃত পিতৃ-পিতামহদের বিলুপ্ত অস্থির দোহাই, জননীদের বিস্মৃত অশ্রুর দোহাই, হে বিশ্ব-প্রভু, আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমিও কি শ্বেত-বর্ণের? তুমিও কি এদের মত এমনি শ্বেতাভ, হৃদয়হীন, করুণাহীন ?

সমস্ত নিগ্রো জাতির অন্তরের এই একমাত্র করুণ জিজ্ঞাসা আজও ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে সমুত্থিত হচ্ছে।

নিগ্রো জাতিদের সম্মিলিত কংগ্রেসে ড্যু'বয় অবহেলিত জাতিকে আহ্বান করে সেদিন বলেছিলেন, "what you are, I was, what I am you may become !"

—"তোমরা আজ যা আছ, একদিন আমিও তাই ছিলাম। আমি আজ যা হয়েছি, তোমরাও একদিন তাই হতে পার !"

এই চরম আশ্বাস-বাণীর পিছনে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিফল জীবনের নিঃশব্দ আবেদন রয়েছে।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

মগে-মোগলে

সুলতান সুজার পরই মীরজুমলা বাঙ্গালার সুবেদার হইয়াছিলেন। তিনি আবার ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। মীরজুমলা কোচবিহার ও আসাম আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাহার পর নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। সায়েস্তা খাঁ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মাতুল ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় রাজা শিবাজী সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিয়া আহত করায় তাঁহার বাঙ্গালায় আসিতে কিছুদিন বিলম্ব ঘটিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিলেন যে, মগেরা বাঙ্গালায় আবার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। শাহসুজার প্রতি অত্যাচার করিয়া আরাকানের রাজা আপনাকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মনে করিতেছিলেন। আর মীরজুমলার কোচবিহার ও আসাম আক্রমণে সেরূপ ফললাভ না হওয়ায়, মগ সৈন্যেরা মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোন কোন স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে এবং লোক-জনের প্রতি সেইরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। ঢাকার অধিবাসিগণ ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া মগদিগকে দমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন মগে-মোগলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়।

সায়েস্তা খাঁর আদেশে মোগল সেনাপতি হোসেন বেগ রণতরীসকল লইয়া জলপথে ও সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজরগ ওমেদ খাঁ পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। হোসেন বেগ মগদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া সন্দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন। সন্দ্বীপ অবরোধ করিয়া তিনি মগদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই সময়ে হোসেন বেগ চট্টগ্রাম-পর্ত্তুগীজদিগকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বলিলে তাহারা সম্মত হয়। চট্টগ্রাম সে সময়ে আরাকান-রাজেরই অধীন ছিল। পর্ত্তুগীজেরাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। আরাকান-রাজ কিন্তু এ সংবাদ জানিতে পারেন। তখন পর্ত্তুগীজেরা তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হয়। হোসেন বেগ তাহাদের কতককে ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়া কতককে নিজ সৈন্যমধ্যে গ্রহণ করেন। ওমেদ খাঁর সৈন্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে হোসেন বেগ চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। মধ্যে মধ্যে মগদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহারা চট্টগ্রামে আসিয়া পঁহুছেন। তাহার পর চট্টগ্রাম অবরোধের পর মগদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লন। সেই সময় হইতে চট্টগ্রামের ইসলামাবাদ নাম সুপ্রচারিত হয়। এইরূপে মগদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়।

টাকায় আট মণ চাউল

সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলা হইতে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যান। তাহার পরে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পালিত ভ্রাতা কেসাই খাঁ ও আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম সুবেদার হইয়া আসেন। তাঁহারা অল্পদিনই সুবেদারী করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরে সায়েস্তা খাঁ আবার বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য জাতির উপর যে জিজিয়া বা মাথা গুনিয়া কর স্থাপন করেন, সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলায়ও তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আর আওরঙ্গজেব যেমন অনেক হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস সাধন করেন, সায়েস্তা খাঁও বাঙ্গালায় সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে বাদশাহ ও সুবেদার বাঙ্গালার লোকের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ একটি ব্যাপারের জন্য এ দেশের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারটি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইত। বাঙ্গালা দেশের চাউল ভারতবর্ষের নানা স্থানে সিংহল, আরাকান, মলাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে জাহাজ বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত। সেই জন্য দেশে চাউলের মূল্য সময়ে সময়ে মহার্ঘ্য হইয়া পড়িত। সায়েস্তা খাঁ যাহাতে এ দেশে

সস্তা দরে চাউল বিক্রয় হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আদেশে এক দামরিতে এক সের, এক পয়সায় পাঁচ সের ও এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। সায়েস্তা খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিবার সময় দুর্গের পশ্চিম তোরণ-দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে এইরূপ লিখিয়া যান যে, যদি কেহ কখনও তাঁহার ন্যায় এক দামরিতে এক সের চাউল বিক্রয় করাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এই দ্বার খুলিয়া দিবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দীন খাঁর সময়ে ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রায় টাকায় আট মণের অধিক এক সের চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া উক্ত দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, সে সময়ে লোকে কিরূপ সুখে সাচ্ছন্দ্যে থাকিত। এখনকার ন্যায় তাহাদিগকে অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হইত না। সে সময়ে তোমরা পয়সায় পাঁচ সের চাউলের কথা শুনিলে, সেকালে ও একালে কত প্রভেদ তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ।

ঢাকাই মস্‌লিন

এইবার তোমাদিগকে সেকালের এক আশ্চর্য্য জিনিসের কথা বলিব। তাহার নাম ঢাকাই মস্‌লিন। অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বা তুলার কাপড়কে মস্‌লিন বলে। মস্‌লিন অনেক স্থানেই হইত। কিন্তু ঢাকাই মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। তোমরা যে সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁয়ের কথা শুনিয়াছ এই সোনার গাঁয়ে এই মস্‌লিন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইত। বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু রাজাদের সময়ও এই মস্‌লিন প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়। সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল, এখানকার মস্‌লিন গ্রীস ও রোম দেশীয় বণিকেরা ইউরোপে লইয়া যাইতেন। সেখানকার সম্ভ্রান্ত নরনারীরা এই মস্‌লিন ব্যবহার করিতেন। রোম দেশের লোকের নিকট ইহা নীহারিকা বা সূক্ষ্ম বাষ্পলহরী নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে মস্‌লিনের এক এক প্রকারের এক এক নাম দেওয়া হইত। আবরোঁয়া বা জলপ্রবাহ নামে যে মস্‌লিন ছিল তাহা জলে ভিজিলে তাহার সুতা আর দেখা যাইত না, তাহাকে জলস্রোতের মতই বোধ হইত। বফ্‌ত্‌ হাওয়া বা বোনা বাতাস নামে মসলিনকে বাতাসে উড়াইয়া দিলে তাহাকে সাদা মেঘের মতই লাগিত। সাবনাম বা সান্ধ্যশিশির নামে মস্‌লিনকে ভূমিতে ফেলিয়া দিলে শিশিরের সহিত তাহার প্রভেদ বুঝা যাইত না। তাঞ্জের বা দেহের অলঙ্কার মস্‌লিন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিত; বিদেশীরা ইহাকে বাতাসের বস্ত্র, মাকড়সার জাল ইত্যাদি নাম দিয়াছিলেন।

এই মস্‌লিন এরূপ সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত হইত যে, ত্রিগজ দীর্ঘ ও এক গজ প্রস্থ একখণ্ড মসলিন একটি অঙ্গুরীয় মধ্য দিয়া এধার হইতে ওধারে লইয়া যাইতে পারা যাইত। এক সময়ে পারস্য দেশের এক রাজদূত নারিকেলের খোলের মধ্যে পুরিয়া ত্রিশ গজ লম্বা একটি মস্‌লিনের পাগড়ী তাঁহার রাজার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। মস্‌লিনের ওজন এরূপ অল্প ছিল যে, ১৫ গজ দীর্ঘ ও এক গজ বহরের ভাল মস্‌লিনের ওজন চার তোলার অধিক হইত না। ইহার সূতা কাটিতে ও বুনিতে অনেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হইত বলিয়া ইহার মূল্য অধিক ছিল। এক গজ লম্বা ও এক গজ বহর একখণ্ড ভাল মস্‌লিন বা মলমলের মূল্য দশ টাকা ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় দশ হাত লম্বা ও দুই গজ বহরের একখণ্ড আবরোঁয়া ওজনে ৫ তোলা মাত্র ৪০০৲ টাকায় বিক্রয় হইত। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের জন্য প্রস্তুত একখণ্ড জামদানী বা ফুলদার মস্‌লিনের মূল্য ২৫০৲ টাকা হইয়াছিল। তাহার পরেও ঢাকায় প্রস্তুত উৎকৃষ্ট জামদানী মস্‌লিনের মূল্য ৪০০৲ টাকা বলিয়া জানা গিয়াছে। কাশিদা মস্‌লিনের উপর স্ত্রীলোকেরা সুন্দর সুন্দর বুটা তুলিত। কোন কোন বৎসরে ১২ লক্ষ খণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৮ কোটি টাকার কাশিদা মস্‌লিন ঢাকা হইতে রপ্তানি হইত। একা ইউরোপেই বৎসরে কোটি টাকার ঢাকাই মস্‌লিন বিক্রয়ের কথা শুনা যায়।

এই মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে হইলে টাকুয়াতে খুব মিহি সূতা কাটিতে হইত। চরকায় সেরূপ সূতা কাটা যাইত না। চরকাতে পরিধেয় বস্ত্রের সূতা কাটা হইত। তাই সেকালে চরকা সকলের লজ্জানিবারণের ব্যবস্থা করিত। সকালে ও বিকালে মস্‌লিনের সূতা কাটা হইত। রৌদ্রের সময় সূতা কাটা ভাল হইত না। আর ঢাকার কার্পাসও উৎকৃষ্ট ছিল। এ সকল কারণে ঢাকাই মস্‌লিন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। ঢাকার ধামরাই নামক স্থানে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপে সূতাকাটা ও মস্‌লিন প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার একেবারে লোপ

হইয়াছে। মস্‌লিনের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করায় এবং কলের সূতা ও কলের কাপড় আমাদের দেশের এই বিস্ময়কর শিল্পকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। যদিও এখন আবার চরকা ও খদ্দরের প্রচলন হইয়াছে কিন্তু সে সূতা ও কাপড় অত্যন্ত মোটা। তাহা হইলেও স্বদেশের জিনিস বলিয়া তোমাদের সকলের তাহার আদর করা উচিত। ঢাকাই মস্‌লিন নষ্ট হইলেও এখনও ঢাকাই কাপড়ের যথেষ্ট আদর আছে। মস্‌লিনের সূতা ও কাপড় আর কখনও এদেশে হইবে কিনা বা কতদিনে হইবে তাহা এক্ষণে বলিতে পারা যায় না।

শান্তিপুরের মস্‌লিনও বিখ্যাত ছিল। শান্তিপুরে অনেক প্রকার ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইত। ইহার ডুরে শাড়ী বিশেষরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইংরেজেরা ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা শান্তিপুর হইতে অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন।

সেকালের বাঙ্গালা

সেকালের বাঙ্গালার কথা তোমরা কতক কতক শুনিয়াছ। এইবার তোমাদিগকে সে কথাটা ভাল করিয়াই বলিতেছি। সেকালের বাঙ্গালা স্বাস্থ্যে, সম্পদে, বিলাসহীনতায়, সরলতায় ও আনন্দে প্রকৃত সোনার বাঙ্গালাই ছিল। তখনকার পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্য বিরাজ করিত। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বর তখন এদেশে দেখা দেয় নাই। পল্লীর গৃহে গৃহে হৃষ্টপুষ্ট শিশুসন্তান আনন্দে খেলিয়া বেড়াইত। তাহারা যেসব খেলা খেলিত তাহাতে তাহাদের শরীরে বলসঞ্চয় হইত। যাঁহাদের একটু বয়স হইত, তাঁহারা লাঠি, তরবারি ও কুস্তী অভ্যাস করিতেন। অনেকে বন্দুক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। কামানও ছাড়িতে পারিতেন। তাই সেকালের বাঙ্গালীরা মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গীদিগের সহিত রীতিমত রণক্রীড়া করিয়া আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন। এ সকল কথা তোমরা শুনিয়াছ। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া তোমরা মনে রাখিবে, বাঙ্গালী কাপুরুষের জাতি নহে।

তখন পল্লীই স্বাস্থ্যের আগার ছিল। কেবল তাহা বলিয়া নহে। এই পল্লীতে তখন নানাপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইত। সেকালে এত সহরের পত্তন হয় নাই। দুই চারিটি ভিন্ন প্রায় সমস্তই পল্লী ছিল। এখনও সহর অপেক্ষা পল্লীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই পল্লীগ্রামে তখন ধান্য, গম, কলাই, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কার্পাস ও তুঁত-বৃক্ষের চাষ অধিক পরিমাণে হইত। তখনকার সহিত এখনকার তুলনাই হয় না। নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলে ও সুগন্ধ ফুলে পল্লী পরিপূর্ণ থাকিত। আম, কাঁঠাল, নারিকেল কলা প্রভৃতি ত ছিলই, তদ্ভিন্ন এ সময়ে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে বিদেশ হইতে অনেক ফল ফুলের আমদানী করিয়াছিলেন। আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা, আতা, চীনে বাদাম, রাঙ্গা আলু, গাঁদা ফুল, তামাক প্রভৃতি পর্ত্তুগীজেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এ দেশে লইয়া আসেন। তখন কেবল যে, সমস্ত জমিতেই কৃষিকার্য্য হইত তাহা নহে। গোচারণের জন্য প্রত্যেক গ্রামে মাঠের ব্যবস্থা থাকিত। পশুপক্ষীদিগের সেবা ও চিকিৎসার জন্য পিঁজরাপুলেরও ব্যবস্থা ছিল। তাই হৃষ্টপুষ্ট গাভীসকল অপরিমিত দুগ্ধ প্রদান করিয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করিত। ঘৃত, মাখন, দধি, ছানা লোকে ইচ্ছামত আহার করিতে পারিত এবং তাহাতে শরীরের পুষ্টি-সাধন করিত। সেই জন্য কোন প্রকার পীড়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। যে দেশে টাকায় আট মণ চাউল ও অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যাইত, সে দেশের লোকে যে কত সুখে জীবন যাপন করিত, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তখন এদেশে মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্রও প্রস্তুত হইত। সাধারণ লোকের ব্যবহারের বস্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত। তাঁতী, যুগী, জোলা এবং আরও কোন কোন জাতি-তন্তুবায় এই সকল বস্ত্র বুনিত। রেশমী বস্ত্রও যথেষ্ট প্রস্তুত হইত। তোমরা শুনিয়াছ যে, জাহাজ বোঝাই হইয়া এই সকল কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বিদেশে যাইত। এদেশের লোকের পরিধান ব্যবস্থা করিয়া তবে সেই সকল বস্ত্র বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইত। এ দেশের চাউলও যে বিদেশে যাইত তাহা তোমরা বিদেশীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ হইতে জানিয়াছ। এখন আমরা লবণের জন্য বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকি, তখন কিন্তু এ দেশের লোকেরাই লবণ প্রস্তুত করিত এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া বিদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাইত।

কেবল সন্দ্বীপ হইতে প্রতি বৎসর তিনশত জাহাজ লবণে বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইত। এদেশের লোকে তখন বড় বড় জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণ করিতে পারিত। সেই সকল জাহাজ দেশবিদেশে যাইত এবং এ দেশে যুদ্ধের জন্যও অনেক নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার হইত। বাঙ্গালার সুবেদারদের অনেক রণতরী ছিল।

প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি উঁহাদেরও বহুসংখ্যক রণতরী থাকার কথা জানা যায়। রণতরীসমূহে কামান সজ্জিত থাকিত। কোশা, ঘুবার, জালিয়া ইত্যাদি রণতরীর নাম ছিল। তদ্ভিন্ন বালাম, পালোয়ারী, বেপারী প্রভৃতি বাণিজ্য-কার্য্যের ও পিয়ারী, মহলগিরি প্রভৃতি নৌকা সম্ভ্রান্ত লোক-দিগের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইত। কোম্পানীর আমলে এই সকল জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা জাহাজ বা ঐ প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার কবিয়াছিলেন। এইরূপে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সেকালের লোকে অর্থসঞ্চয় করিত। কৃষিকার্য্যে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে সেকালের লোকেরা বিশেষরূপ অভ্যস্ত ছিল। তখন কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি আপন আপন জাতীয় ব্যবসায় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। সে জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইত না।

তখনকার লোকেরা যে অর্থ সঞ্চয় করিত তাহারা তাহার অপব্যয় করিত না। তোমরা বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ হইতে জানিয়াছ, তাহারা ক্ষুদ্রবস্ত্রেই আপনাদের অঙ্গ আচ্ছাদন করিত। নিরামিষ আহারই তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। আহারে, পরিধানে তাহাদেব কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। উহাতে অপব্যয় না করিয়া তাহারা সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিত। সেকালের লোকেরা পুষ্করিণী ও কূপ খনন, মন্দির ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, পূজা, ব্রত, উৎসবাদি করিয়া আপনাদের অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছে। তখন গৃহস্থদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল। এক পরিবারের সকলেই এক অন্নে থাকিত। তাহাতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিত না। কারণ সকলের মনে তখন সরলতা বিরাজ কবিত।

এ দেশে তখন কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, কিন্তু পল্লীব লোকেবা শান্তভাবেই কাটাইয়া গিয়াছে। তখন টোলে বসিয়া পণ্ডিতেরা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। ব্যাকরণ, কাব্য, জ্যোতিষ, রঘুনাথ শিরোমণির নব্য-ন্যায় ও রঘুনন্দনের নব্য-স্মৃতি—প্রধানতঃ তাঁহারা আলোচনা করিতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট বালকেরা পাঠ অভ্যাস করিত। সাধারণ লোকে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীকাব্য পাঠ করিত। বৈষ্ণব পদাবলী গান ও কীর্ত্তনেরও অনুষ্ঠান হইত। কীর্ত্তন বাহির হইলে সকলেই আপন আপন গৃহের দ্বার মাঙ্গলিক দ্রব্যে সাজাইয়া রাখিত।

"কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আমসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরমসুন্দর।
দধি, দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥"

তখন দোল ও দুর্গোৎসবের বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত। এই দুর্গোৎসবে গ্রামের সকল লোককে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হইত। ভিখারীদিগের মধ্যেও অন্নবস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নব বস্ত্রে ভূষিত হইত।

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ, মহিষ, মেষ দিয়া বলিদানে॥
উজ্জ্বল বসনে বেশ পরয়ে বণিতা।"

সে সময়ের লোকেরা নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের জীবন পবিত্র করিয়া তুলিতেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় ও অন্যান্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেকালের লোকে আপনাদিগের জীবন ধন্য করিতেন। সমাজের দোষসকলও তাঁহারা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। পল্লীর প্রধান ব্যক্তিরা তাহার ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে বিবাদ তাঁহারাই মিটাইতেন। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কর্ম্ম ও সন্তান পালন করিয়া শান্তিতেই জীবন কাটাইতেন। বালিকারা পবিত্র দেবীমূর্ত্তির ন্যায় গৃহদেবতার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতে ও গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিত। তাহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিত। সেকালের পল্লীতে হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া ভাই ভাইয়ের মত থাকিত। যুদ্ধক্ষেত্রেও উভয়ে মিলিয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিত। এইরূপে তখনকার বাঙ্গালা সকল বিষয়ে শান্তিময় হইয়া প্রকৃত সোনার বাঙ্গালা হইয়া উঠিয়াছিল।* (ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই পুস্তকখানি এইস্থান পর্য্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন, স্থানে স্থানে সংশোধন-সংযোজনও করিয়াছেন।
- বং সং।

আলোচনা

কামরূপ শাসনাবলী

১৩৪০ সনের ভাদ্রমাসের "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার আলোচনাংশে মদীয় "কামরূপ শাসনাবলী" বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, অনুবাদ ও পাদটীকায় আমার সঙ্গে তাঁহার কোন কোন স্থলে মতানৈক্য রহিয়াছে, তৎ-প্রদশনার্থই তিনি প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমার কোনও কোনও কথায় প্রতিবাদকল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরব ও আহ্লাদেরই বিষয়। বলা আবশ্যক যে, গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে (২১৪ পৃষ্ঠায়) আমি ঈদৃশ সংশোধন যে প্রত্যাশিত, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছি, ফলতঃ কোনও গ্রন্থের উৎকর্ষ-মাত্র খ্যাপন করা অপেক্ষা উহাতে লক্ষিত ভুলভ্রান্তি প্রদর্শনই লেখকের তথা পাঠক সাধারণের সমধিক কল্যাণাবহ -- সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

পরন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদের কোনও স্থলের ভুলভ্রান্তি তিনি প্রদর্শন করেন নাই। এবং পাদটীকার যে দুইটিমাত্র স্থলে মতানৈক্য বিবৃত করিয়াছেন তাহাও আমি অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রথম স্থলটি এই :—"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানি ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠান-সমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, রাঢ়ীয় বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায যে পঞ্চগোত্রের কথা আছে, ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্কর বর্ম্মার শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।" (শাসনাবলী ৯ম পৃষ্ঠা)। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, † তাঁহারা প্রায় একবাক্যে বলিযাছেন যে, কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা কুলপঞ্জিকার উক্তি প্রামাণ্য মনে করেন না। কোনও প্রস্তরলিপি তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থে আদিশূরের কিংবা তাঁহার ঐ কীর্ত্তির কথা পাওয়া যাইতেছে না।

উপরি উদ্ধৃত আমার টীকায় আমি যাহা বলিয়াছি সাংখ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার অপেক্ষা একটু বেশী মনে করিয়া লিখিয়াছেন, "ভট্টাচায্য মহাশয় মনে করেন যে আদিশূর নামে কোনও নৃপতি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিলেও ভাস্কর বর্ম্মার তাম্র শাসনে উল্লিখিত স্বামীদের সন্তানগণের মধ্য হইতেই কয়েক জনকে নেওয়াইয়া থাকিবেন, কান্যকুব্জ হইতে নহে"। †

ইহা বলিয়া তিনি আমার উক্তির বিচারার্থ দুইটি ইশু ধায্য করিয়াছেন—(১) ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনের ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ-সম্পাদন-যোগ্যতা ছিল কি না এবং (২) যজ্ঞ-সম্পাদন-যোগ্যতা থাকিলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহারা হইতে পারেন কি না।

প্রথম ইশু বিষয়ে সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাস্করের শাসনোল্লেখিত দান-প্রাপক ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান-সামর্থ্য ছিল না ; কেন না, শাসনখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তিনি তাঁহাদের কাহারও বেদজ্ঞতাসূচক বা যজ্ঞ-সম্পাদকতাসূচক এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি বা ষট্‌কর্ম্মপরায়ণতাসূচক কোনও বিশেষণ পান নাই—অথচ অন্যান্য শাসনগুলিতে সর্ব্বত্রই দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা আছে। পরন্তু তিনি এই মোটা কথাটা প্রণিধান করেন নাই যে, অন্যান্য শাসনে দানগ্রহীতা একজন মাত্র, তাই তাঁহার পরিচয়-দান ও গুণবর্ণনা তিন চারিটি শ্লোকে করা হইয়াছে. কিন্তু ভাস্কর বর্ম্মার শাসনের দান-প্রাপক ব্রাহ্মণের সংখ্যা (যতটা পাওয়া গিয়াছে) তাহাতে ২০৫ দাঁড়াইয়াছে ; একখানি ফলক পাওয়া যায় নাই—তাহাতে আরও ৮০।৮৫ জন ব্রাহ্মণের নাম থাকিবার কথা। অতএব কিঞ্চিদূন তিন শত ব্রাহ্মণের (প্রত্যেকের ৩।৪টি শ্লোক দ্বারা) বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচিত হইয়া যাইত—তাম্রশাসনে ঐরূপটা অসাধ্য ও অসম্ভব। * তবে ভাস্কর বর্ম্মার শাসনোক্ত ব্রাহ্মণেরা যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শাসনেই রহিয়াছে। শাসনের প্রথম শ্লোকেই (তৃতীয় পাদে) ব্রাহ্মণগণের একটি সাধারণ বিশেষণ রহিয়াছে (বিভূতয়ে)ভূতিমতাং দ্বিজন্মনাম্—ভূতিমান্ ব্রাহ্মণগণের (সম্পন্নিমিত্তে) †† ভূতি—ঐশ্বয্য, ব্রাহ্মণের ঐশ্বয্য তপঃ, বিদ্যা ইত্যাদিই। তারপর

* এস্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে পুনা হইতে প্রকাশিত Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Vol xiv Part I—II pp 157—160). পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহোদয় "কামরূপ শাসনাবলী"র দু একটি ভুল প্রদর্শন করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন—তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য, শাসনাবলীর ১০১ পৃষ্ঠে (৫) সংখ্যক পাদটীকায় 'প্রাকাম্য' শব্দের ব্যাখ্যায় ঐশ্বর্য্যের নাম-নির্দ্দেশক যে শ্লোক উদ্ধৃত হইযাছে -তাহাতে আটটি ঐশ্বর্য্যেরই নাম রহিয়াছে কিন্তু উপরে আছে "প্রাকাম্য ষড়ৈশ্বর্য্যের একতম ; ষড়ৈশ্বর্য্য যথা"।—

† যথা, স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ; অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক, ইত্যাদি। ডাঃ বসাক কর্ত্তৃক আলোচিত ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথদেবের তাম্রশাসন-লিপিতে বর্ণিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ভারতের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল নিবাসীই ছিলেন এবং তাঁহারা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব ভাস্কর শাসনে বর্ণিত ব্রাহ্মণগণের প্রায় একই সময়ের ও অঞ্চলের লোক ছিলেন। ইহাঁদের বিষয়ে আলোচনা উপলক্ষে ডাঃ বসাক লিখিয়াছেন :—These facts go some way to disprove the theory of those scholars who think that the half-mythical king of Bengal named Adisura flourished before the Pala kings and that he imported orthodox Brahmans from Kanoj into Bengal, as there was death of such Brahmans there P 305 Epigraphia Indica (Vol XV—article no 19.).

† প্রকৃত পক্ষে আমি ঠিক অতটা মনে করি নাই। ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-সমাজ ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই উক্ত পাদটীকা লিখিয়াছিলাম। (শাসনাবলী ৯ম পৃষ্ঠা ১২শ পঙ্‌ক্তিতে ঐ টীকার মূল দ্রষ্টব্য)। তবে পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহা মোটেই অসঙ্গত বলা যায় না। তাই তাঁহারই বিচারধারার অনুবর্ত্তন করা হইল।

* বস্তুতঃ যে সকল শাসনে দানগ্রহীতার সংখ্যা অনেক সেই সকলে তাঁহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা কুত্রাপি দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে (পাদটীকা বিশেষ) উল্লেখিত লোকনাথদেবের তাম্রশাসন।

†† সমগ্র শ্লোক বা তদনুবাদ, কৌতূহলী পাঠক "কামরূপ শাসনাবলী"তেই দেখিবেন -এখানে সমস্ত কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়িবে - তাই প্রয়োজনীয় শব্দগুলি মাত্র উদ্ধৃত ও অনূদিত হইল।

প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গে 'স্বামী' উপাধি রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সূচিত হইতেছে। অপিচ ব্রাহ্মণদের কেহ বাজসনেয়ী, কেহ বাহ্‌বৃচ, কেহ সামগ এইরূপ পরিচয় রহিয়াছে; আজকাল অবশ্যই ঈদৃশ বেদ-পরিচয় নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে, কেন না বেদাধ্যয়ন লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু তদানীং—তেরশত বৎসর পূর্ব্বে—ঐরূপ বিশেষণ 'সার্থক' ছিল। সকলেই স্ব স্ব বেদের শাখাবিশেষে পটুতা লাভ করিতেন। ভাস্কর বর্ম্মা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়োনচোয়াং লিখিয়াছেন—His majesty was a lover of learning and his subjects followed his examples; men of abilities came from far lands to study there. ভিন্নদেশ হইতে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরাও তদানীং কামরূপে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপন ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা করিতেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা ভাস্কর বর্ম্মা কর্ত্তৃক শাসনদ্বারা সম্মানিত ব্রাহ্মণগণ তৎপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণসমাজে অবশ্যই বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ছিলেন। এতদবস্থায় শাসনোক্ত ব্রাহ্মণদিগকে অ-বেদজ্ঞ অতএব যজ্ঞ-কর্ম্মে অপটু মনে করা যাইতে পারে কি?

দ্বিতীয় ইন্দ্রবিষয়ে পণ্ডিত সাংখ্যার্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, ইঁহারা রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না; কেননা রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পঞ্চগোত্র মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ব্রাহ্মণেরা সামবেদীয়,—ভাস্করের শাসনোক্ত শাণ্ডিল্যগোত্রীয়েরা সকলেই বাজসনেয়ী অর্থাৎ যজুর্বেদীয়। ইহার উত্তর "কামরূপ শাসনাবলী" গ্রন্থেই রহিয়াছে। ৯ম পৃষ্ঠার (১) সংখ্যক পাদটীকায় আছে, "গোত্র অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও বেদ-পরিবর্ত্তন অসম্ভাব্য কিছুই নহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। তাই একই পিতার সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত শাণ্ডিল্যগোত্রজ রাঢ়ীয়গণ সামবেদীয়, কিন্তু ঐ গোত্রজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদীয় পাওয়া যাইতেছে।" অধুনা বেদাধ্যয়ন বিলুপ্তপ্রায়, তাই বেদ ও শাখার নামগ্রহণ মাত্র আছে এবং পুরুষপরম্পরায় একই নাম বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন বেদাধ্যয়ন সুপ্রচলিত ছিল—ব্রহ্মচারী গুরুর নিকট গিয়া বেদশিক্ষা করিতেন—তখন, কখনও কখনও ভিন্নবেদীয় বা ভিন্নশাখার কোনও সুবিখ্যাত গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী পৈতৃক বেদের বা শাখার পরিবর্ত্তে গুরুর বেদ বা শাখা অবলম্বন করিতেন।

পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের প্রতিবাদের দ্বিতীয় বিষয়টি এই:—ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনদ্বারা যাঁহাকে ভূমিদান করা হইয়াছিল সেই ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল শ্রাবস্তির অন্তর্গত ক্রোসঞ্জ গ্রাম; আমি শ্রাবস্তিকে কামরূপের অন্তর্গত জনপদ বলিয়াছি। তিনি বলেন এই শ্রাবস্তি উত্তর কোশলের সেই প্রাচীন শ্রাবস্তী। এ স্থলে আমার একটা ভুল স্বীকার করিতেছি, গ্রামের নামটি "ক্রোসঞ্জ" নহে—"ক্রোড়াঞ্জ" হইবে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছেন। * "হরিচরিত" নামে (নেপালে প্রাপ্ত) একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে "করঞ্জ" নামে একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণধুষিত গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়. তাহা বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত, তাই ক্রোড়াঞ্জ সম্ভবতঃ এই 'করঞ্জ'ই হইবে। এই নামে আজিও একটি বড়গ্রাম দিনাজপুর সহরের ১৪।১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রহিয়াছে।

অতএব শ্রাবস্তির অবস্থান কামরূপে না হইয়া তৎসংলগ্ন বরেন্দ্রভূমিতেই হইবার কথা। প্রাচীন শ্রাবস্তী হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকই যে স্থানের নামটি শ্রাবস্তি রাখা হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * অপিচ শিলিমপুর লিপিতে শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামের কথা আছে। তাহা বালগ্রাম হইতে মাত্র সকটি (গ্রাম) দ্বারা অন্তরিত। † অতএব তর্কারি বালগ্রামের নিকটেই ছিল,—এবং এই বালগ্রাম আজিও 'বোলগ্রাম' নামে বগুড়া জেলায় বিদ্যমান। শিলিমপুর লিপিতে তর্কারির বর্ণনায় হোমধূম সম্বন্ধে 'ব্যভ্রাজন্ত' এই অতীত কালসূচক প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা তর্কারি ছাড়িয়া বালগ্রামে চলিয়া যাওয়াতেই সেখানে আর যজ্ঞ হইত না। অতএব শ্রাবস্তি খোদ কামরূপের না হইলেও তৎসংলগ্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বা বারেন্দ্র বা গৌড়) ভূমিতে অবস্থিত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ††

শ্রীযুত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে যেসব কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে দুইটির সমালোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

(১) রাঢ়ীয় বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকামতে কনৌজ হইতে এদেশে ব্রাহ্মণ আগমনের তারিখ বেদবানাঙ্ক (অর্থাৎ ৬৫৪ শক)=৭৩২ খৃষ্টাব্দ। পরন্তু এই তারিখের পাঠান্তরও আছে "বেদবাণাঙ্ক" (৯৫৪ শক=১০৩২ খৃষ্টাব্দ ‡।) কামরূপের সালস্তম্ভ বংশীয়েরা খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; তদ্বংশীয় বনমাল ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে স্পষ্টতঃ যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়।

(২) অষ্টম শতাব্দীতে শ্রাবস্তী হইতে ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদিগকে কান্যকুব্জের অধিবাসী বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছিলেন। সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের এই কল্পনাও সমীচীন বলিতে পারি না। তাঁহারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়া শ্রাবস্তীর পরিচয় দিতে পারিলেন, আর প্রায় সমদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে গিয়া কান্যকুব্জের বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? শ্রাবস্তী কান্যকুব্জ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং প্রসিদ্ধতর, এ অবস্থায় ইহা সমগ্র ভারতে সুপরিচিতই ছিল; তাই বঙ্গে গিয়া শ্রাবস্তীর বিপ্রগণের কান্যকুব্জের বলিয়া পরিচয় দিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। অযোধ্যার এখন রাজধানী প্রয়াগ (এলাহাবাদ), অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদের প্রয়াগের পরিচয় দেওয়া ভারতের কুত্রাপি প্রয়োজন হইবে না। পরিশেষে পুনরপি পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শাসনাবলীর মুখবন্ধে (।০ পৃষ্ঠা) আমি বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমার এই গ্রন্থখানি পড়িবেন, প্রধানতঃ এইজন্য আমি ইহা ইংরাজিতে না লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সাংখ্যার্ণব মহাশয়—যে, ইহা সম্যক পাঠ করিয়াছেন ইহাতে আমার এই গ্রন্থ সংকলন সার্থক হইয়াছে মনে করিতেছি।**

—শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য)

---

* প্রাচীন লিপিতে 'ডা' ও 'স' প্রায় একই রূপ দেখা যায়। অপিচ নামবাচক শব্দ প্রায়শঃ অবোধার্থক হওয়াতে অনেক সময় ঠিক ঠিক পড়া কঠিন হইয়া পড়ে। (মূল শাসনখানি দীক্ষিত মহাশয়ের নিকট হইতেই কয়েক দিনের নিমিত্ত পাইয়াছিলাম—তাড়াতাড়ি পাঠাদি কার্য্য সমাপনান্তে পুনশ্চ তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।)

* ধর্ম্মপালের সময়ে উত্তর কোশলে শ্রাবস্তীর অস্তিত্ব কতটা ছিল তাহা বলা যায় না, সাতশত বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান্ এদেশে আসিয়া যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান বিধ্বস্তপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রাবস্তী একতম।

† বালগ্রাম বিষয়ক (শিলিমপুর লিপির) শ্লোকটি বোধহয় সাংখ্যার্ণব মহাশয় প্রণিধান করেন নাই। তাহা এই—

তৎ (তর্কারি) প্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটি ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ॥ সকটি ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি গাঞিরূপে আজিও সুবিদিত।

†† মৎস্যপুরাণে (১২।৩০ শ্লোকে) এবং কূর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বভাগ ২০।১৯ শ্লোকে) গৌড়ে শ্রাবস্তীর অবস্থানের নির্দ্দেশ আছে।

‡ এই পাঠান্তর দ্বারাও ব্যাপারের সন্দিগ্ধতাই সূচিত হয়।

** কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার এই অভিপ্রায় শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "নও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে আপনার পুস্তক কখনও পড়িবেন এ আপনার বৃথা আকাঙ্ক্ষা।" এরূপ কথা যে অলীক উক্তিমাত্র পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব দ্বারাই সুষ্ঠু প্রমাণিত হইল।

সম্পাদকীয়

ভারতের আইন-সমষ্টি-সংস্কার সম্পর্কে জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

গত ২২শে নবেম্বর তারিখে ভারতের আইন-সমষ্টি-(Constitution) সংস্কার সম্পর্কীয় জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টখানি দুইখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডটি দুই অংশে বিভক্ত—প্রথম, রিপোর্ট-অংশ—৪২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; দ্বিতীয়, প্রসিডিংস-অংশ—৬৫৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ডটি রেকর্ড-অংশ, ইহা ৪৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সর্ব্ব-সমেত প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় সমস্ত রিপোর্টটি সমাপ্ত।

এই রিপোর্টে সভ্যগণের কঠোর শ্রমলব্ধ চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে, এবং আমরা তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। সভ্য-গণের পরিশ্রমের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, ১৯৩৩ সালের ১১ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া রিপোর্ট সমাপ্ত হওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত কমিটির সভ্যগণ ১৫৯টি সভার অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ১২০ জন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্য-সমূহ, ব্রিটিশ ভারত ও ব্রহ্মদেশ হইতে নির্ব্বাচিত দেশীয় সভ্যগণও ন্যূনাধিক সত্তরটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মোটের উপর, বহু লোকের বহু অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার ফলস্বরূপ এই সুবৃহৎ রিপোর্টখানি আমাদের চিন্তার খোরাক যোগাইবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়া অবধি দেশীয় ও বিদেশীয় সকল সংবাদ-পত্রে ইহার আলোচনা চলিতেছে; বেতার-যন্ত্র ও সংবাদপত্র মারফৎ বৃটিশ, আমেরিকান ও ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যশস্বী ব্যক্তিদের এ বিষয়ক মতামতও আমরা শুনিতে পাইতেছি। ইহাদের কোনটিতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত মূলনীতি ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রিপোর্টটির বিচার-বিশ্লেষণের কোনও চেষ্টা আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। সরাসরি এটা ভাল অথবা মন্দ, ইহা গ্রাহ্য অথবা বর্জ্জনীয়, ভারতের অথবা ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর অথবা লাভজনক ইত্যাদি নানা ধরণের একতরফা মন্তব্যই আমরা শুনিতেছি। নানা বিরুদ্ধ মতের সংঘাতে আমাদের মন আশা ও আশঙ্কায় আন্দোলিত হইতেছে। রিপোর্টটির আসল মূল্য কি তাহা আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝাইবার কোনও প্রচেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না।

আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত আমরাও এই রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি। রাজ্য-শাসনের মূল নীতি ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় আইন-সমষ্টির (Constitution) সংস্কার সম্পর্কীয় জয়েণ্ট কমিটির মন্তব্য যথাযথ বুঝিতে হইলে প্রথমেই Constitution বলিতে কি বুঝায় তাহার বিচারের প্রয়োজন হয়; তৎপর ভারতের Constitution ও তাহার সংস্কার বলিতে কি বুঝায় তাহাও জানিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে জানিবার প্রয়োজন হয়, জয়েণ্ট কমিটির সৃষ্টি কেন হইয়াছিল।

প্রাচীন রোমানদিগের রাজত্বের সময় হইতে 'কনষ্টিটিউ-শন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা এই শব্দটি দ্বারা সম্রাট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ কতকগুলি আইনের সমষ্টি বুঝিতেন। বর্ত্তমানে আমরা 'কনষ্টিটিউশন' অর্থে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনের সমষ্টি বুঝি। এই অর্থে Indian Constitutional Reform বলিতে বুঝিতে হইবে—'গবর্ণ-মেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় আইন-সমষ্টি সম্পর্কিত সংস্কার।'

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইন সমষ্টির সংস্কার যথাযথ ভাবে হইতেছে কিনা তাহার বিচার করিতে বসিলে 'গবর্ণ-মেণ্ট' ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট বলিতে কি বুঝায়, গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব কি বিষয়ে কতখানি, আইন বলিতে কি বুঝায় এবং কি কি বিষয়ের আইনের সমষ্টি লইয়া কনষ্টিটিউশন স্থিরীকৃত হয়, এগুলি জানিতে হয়।

গবর্ণমেণ্ট কথাটির শব্দগত অর্থ—শাসন করিবার কার্য্য। রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থাদিতে এই শব্দটি আরও তিন অর্থে ব্যব-হৃত হয়, যথা—

১। শাসন-ক্ষমতা (ruling power)।

২। শাসন-পদ্ধতি (system of governing)।

৩। শাসনক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্র (territory over which ruling power extends)।

'শাসন-ক্ষমতা' (অর্থাৎ যাঁহাদের ক্ষমতা দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত হয়), 'শাসন-পদ্ধতি' অনুসারে 'শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে' শাসন কার্য্য করেন—(ruling power rules according to the system of governing in the territory over which it extends)—এই বাক্যটি দ্বারা 'গবর্ণমেণ্ট' শব্দটি অনেকাংশে বোধ্য হইয়া আসে। কিন্তু 'শাসন-ক্ষমতা' কি উদ্দেশ্যে 'শাসন-কার্য্য' করেন, এই সঙ্গে তাহারও পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে যে ক্ষেত্রে 'শাসন-কার্য্য' পরিচালিত হয় সেই ক্ষেত্রের (territory) অধিবাসী জীবগুলির পক্ষে 'শাসন-কার্য্য' আবশ্যক অথবা অনাবশ্যক, উপকারী অথবা অপকারী এবং 'শাসন-পদ্ধতি' উপযুক্ত কি অনপযুক্ত তাহা স্থির করা যায় না।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, যে-কার্য্যের উদ্দেশ্য পরিষ্কৃত রূপে নির্দ্ধারিত থাকে না, সেই কার্য্য করিবার পদ্ধতিতেও অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রম উপস্থিত হয় এবং কার্য্যফল নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সকলের মনোমত হয় না, অথবা নিজের ও পারিপার্শ্বিক সকলের অপ্রীতিকর হয়। নীতিবিদ্‌গণ আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়া থাকেন যে, কোনও কার্য্য করিবার প্রারম্ভেই তাহার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সেই উদ্দেশ্যের সমঞ্জসীভূত কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে হয় এবং মূল উদ্দেশ্যের সমঞ্জসীভূত কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে সাফল্য সুনিশ্চিত ও কার্য্যকর্ত্তার কার্য্যবিষয়ক অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হয়। এই নীতি অনুসৃত না হইলে কার্য্যের সাফল্য ও কার্য্যবিষয়ে কার্য্য-কর্ত্তার স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয় না। সুতরাং শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্য ঠিক মত নির্দ্ধারণ করা যে শাসন-ক্ষমতার পরিচালকদিগের একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

শাসন-ক্ষেত্রের অধিবাসীগণ শাসন-ক্ষমতা-পরিচালকগণের 'প্রজা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাসন-ক্ষমতার পরিচালকগণ প্রজাগণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন, প্রজাগণ ইহা বুঝিতে না পারিলে শাসন-ক্ষমতার পরিচালকগণ (সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে রাজপুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে) এবং শাসন-ক্ষমতার পরিচালনার কার্য্য —এই উভয়ই প্রজাগণের অপ্রিয় হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ প্রজাগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, প্রজাগণ যদি বুঝিতে পারে যে, রাজপুরুষগণ কেবলমাত্র প্রজাগণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহা হইলে প্রজা ও শাসন-ক্ষমতা-পরিচালকদিগের (গবর্ণমেণ্ট) মধ্যে পরস্পর সহায়ক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং শাসন-ক্ষমতা (গবর্ণমেণ্ট) চিরস্থায়ী হইতে পারে।

সুতরাং প্রজার হিতসাধনই শাসন-কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

প্রজার হিতসাধন করিতে হইলে কি কি করা কর্ত্তব্য শাসন-ক্ষমতা পরিচালকগণের তাহা সযত্ন-অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। বহু পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি, সঙ্ঘ ও বিষয় লইয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হয়। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রথমেই তাঁহাদের নজরে পড়ে যে, সমস্ত প্রজা একই শ্রেণীর বস্তু ও কার্য্য লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হন না; একজন যে বস্তু ও কার্য্য পাইলে সন্তুষ্ট হন, অপর একজন ঠিক সেই বস্তু ও কার্য্য পাইলে বিরক্ত হন। মানুষের কার্য্য করিবার, তৌল করিবার এবং বিশ্লেষণ করিবার যন্ত্রগুলির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার যে তারতম্য হয়—এই সত্য শাসন-ক্ষমতা-পরিচালকগণের জানা থাকা প্রয়োজন। এই তারতম্যের জন্য মানুষ কখনও বা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিফল হয়, কখনও বা প্রয়োজনবিরুদ্ধ বস্তু অকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করে। প্রজার হিতকর কার্য্য কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শাসন-ক্ষমতা-পরিচালকগণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জ্ঞান অপরিহার্য্য।

১। মানুষ বলিতে কি বুঝায়।

২। মানুষের তারতম্য হয় কেন।

৩। মানুষ মূলতঃ কয় শ্রেণীর।

৪। কোন্ শ্রেণীর মানুষের আকাঙ্ক্ষা কিরূপ এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য ও জিনিষ কি কি।

৫। সমস্ত মানুষের সাধারণ প্রয়োজনীয় কার্য্য ও জিনিষ কি কি।

মানুষ সম্বন্ধে উপরোক্ত জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের তারতম্যের কারণ নির্ণীত হইলে কি করিয়া যাবতীয় মানুষকে আদর্শ শ্রেণীর মানুষে পরিণত করা যায় তাহারও জ্ঞান জন্মে এবং তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে মানুষের নিষ্প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষার কারণগুলিও দূরীভূত হয়। মানুষের হিতকারী এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা শাসন-ক্ষমতার পরিচালকগণকে করিতে হইবে।

কিন্তু কেবলমাত্র তাহাতেই সমস্ত মানুষের সর্ব্বপ্রকারের হিত সাধিত হইবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন, তাহাদের সামর্থ্য এবং সেই সামর্থ্যের দ্বারা তাহারা কি করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জ্জন করিতে পারে তাহাদিগকে সেই জ্ঞানও দিতে হইবে। এই জ্ঞানদানের ব্যবস্থাতেই শাসন-ক্ষমতা-পরিচালকগণের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। এমন ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে যাহাতে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য্য করিয়া প্রজাগণ তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

এইভাবে শাসন-কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে শাসন-কার্য্য-পরিচালকগণের নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যগুলি নির্দ্ধারিত হয়—

১। প্রজা যাহাতে নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষের আকাঙ্ক্ষা না করে তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা।

২। সমস্ত প্রজার প্রয়োজনীয় জিনিষ কি কি তাহার নির্দ্ধারণ এবং প্রজা তাহা কি করিয়া নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে লাভ করিতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

৩। প্রজার সামর্থ্য যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা।

৪। প্রজারা যাহাতে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী স্ব স্ব প্রয়োজন অর্জ্জন করিতে পারে এবং নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার আয়োজন করা এবং সেই আয়োজনগুলি যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

৫। প্রজার হিতকল্পে উপরোক্ত নির্দ্ধারণ, আয়োজন ও ব্যবস্থার জন্য যে সকল বিধি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিতে হয় সেগুলির বিঘ্নকারীর দণ্ডের ব্যবস্থা।

বর্ত্তমানে প্রভুত্বসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টগুলির শাসনকার্য্য পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য আমরা এই সংক্রান্ত প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই। আরিষ্টটল, ব্ল্যাকষ্টোন, ডিলোল্‌ম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্ট স্পেনসার, হব্‌স, লক এবং রুসো প্রভৃতি প্রতিভাশালী সমস্ত লেখকগণ—গবর্ণমেণ্ট কত রকমের হইতে পারে, কোন্ রকমের গবর্ণমেণ্ট ভাল, গবর্ণমেণ্ট থাকিবার প্রয়োজন কি, শাসন-পদ্ধতি কত রকমের হইতে পারে, কোন্ শাসন-পদ্ধতি ভাল ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্য লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যই যে গবর্ণমেণ্টকে চিরস্থায়ী করিবার উপায়, তাহার বিচার ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে আলোচনা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এই সকল গ্রন্থকারদিগের রচনায় আমরা পাই নাই।

ব্রিটিশ কনষ্টিটিউশনের ইতিহাসগুলিতে বারংবার 'অলিখিত নিয়ম' (unwritten law) শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই অলিখিত নিয়মের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্য এবং তদনুরূপ শাসন-পদ্ধতির কথা লুক্কায়িত আছে কি না জানি না। নামেই বুঝিতেছি, এই 'নিয়মগুলি' লিখিত হয় নাই। ইংলণ্ডে বসবাস করিয়া ব্রিটিশদিগের আচারপদ্ধতি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিলে হয় তো এই 'অলিখিত নিয়মে'র মধ্যে অনেক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিতাম। সে সৌভাগ্য যখন আমাদের হয় নাই, দূর হইতে সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা যতটুকু বুঝিতে পারি তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, ওই 'অলিখিত নিয়মগুলি'র মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহার সাহায্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরায়ুসম্পন্ন হইতে পারে। কারণ যে নিয়ম গবর্ণমেণ্টের চিরায়ু সাধন করিতে সমর্থ সে নিয়ম নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেও সক্ষম। অথচ দেখিতেছি, সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার পরই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধারণা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে; ব্রিটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় চিন্তাশীল লেখকদিগের লেখায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপদের আভাস আছে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমাদের সম্মুখে জগতের প্রায় ২৮০০ শত বৎসরের ইতিহাস উপস্থিত করিয়াছেন; সমস্ত জাতির ইতিহাস যে তাঁহাদের লেখায় সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নহে। এই ২৮০০ শত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেই দেখিতেছি, কেবল মাত্র গ্রীস, রোম, স্পেন এবং পর্টুগালের উত্থান এবং পতনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত জাতির ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত তাহাদের অভ্যুত্থান এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্বের ইতিহাস। এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্ব আজিও চলিতেছে, এবং এখন পর্য্যন্ত কাহারও সমৃদ্ধ রাজত্বকাল দুই শত বৎসরের অধিক হয় নাই। অথচ ইহারই মধ্যে প্রত্যেক জাতি নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়া আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে চারিটি জাতির উত্থান এবং পতনের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গ্রীকগণই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিয়াছিলেন। এই প্রভুত্ব-কালের পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও ইহা যে ৬৩০ বৎসর অপেক্ষা দীর্ঘ নহে তাহা বলিতে পারা যায়।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি, কি উদ্দেশ্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী হইতে পারে ইউরোপীয় দর্শনে তাহার আলোচনা নাই এবং এই কারণেই ইউরোপের ইতিহাসে কোনও জাতির ৬৩০ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্বের পরিচয় নাই।

জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্টকে আমরা এই পদ্ধতিতেই বিচার করিব। কি উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্য করেন, কি উদ্দেশ্যে শাসনকার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী হইতে পারেন, এমন কোনও চিন্তার এবং যে উদ্দেশ্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী হইতে পারেন, তাহার সহিত সমঞ্জসীভূত কার্য্যপদ্ধতি (System of Administration) ও কার্য্যের নিয়ম (Laws of Legislation, Judicature and Administration) নির্দ্ধারণ করিবার পরিচয় এই রিপোর্টে পাওয়া যায় কি না, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিচার্য্য।

জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্টে আমরা যত কিছু কথা পাইয়াছি তন্মধ্যে, প্রজাদের হিতকর কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন তাহার কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কোন্ কোন্ কার্য্যপদ্ধতি প্রজার কোন্ কোন্ হিতসাধন করিতে সমর্থ তাহা বুঝাইবার কোনও ব্যাকুলতা এই রিপোর্টের কুত্রাপি প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে আছে কতকগুলি মাত্র আইনের ব্যবস্থা, তাহাও যে মূলতঃ প্রজারই প্রয়োজন সংগ্রহের উপায়ের সহিত সমঞ্জসীভূত তাহাও স্পষ্টভাবে দেখান হয় নাই।

সমস্ত রিপোর্টখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে গবর্ণমেণ্টের শাসনের মূল নীতি সম্বন্ধে দুইটি মাত্র কথা পাওয়া যায়—

১। আইন এবং শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা (enforcement of law & order and the maintenance of an upright administration)।

২। ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিবার ব্যবস্থা।

Enforcement of law and order and the maintenance of an upright administration—এই বাক্যের মর্ম্ম আমরা ঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। আমরা যাহা বুঝিয়াছি, মাতৃভাষায় তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—'আইন এবং শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা'। আমাদের গৃহীত অর্থই যদি সমীচীন অর্থ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ শাসনের মূলনীতি হইবে, আইন এবং শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসনপদ্ধতি সংরক্ষণ। এই আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য যে কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রজার কোন্ কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা যখন দেখান হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে প্রজার প্রয়োজন-সাধন প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির মুখ্য লক্ষ্য নহে।

এবিষয়ে কমিটির সভ্যগণ যতই ভুল করিয়া থাকুন, গবর্ণমেণ্টকে চিরস্থায়ী করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, তাঁহাদের এই লক্ষ্য ছিল, তবে ব্যবস্থা প্রজার প্রয়োজন-সাধনের সমঞ্জসীভূত হইতেছে কি না তাহার বিচার তাঁহারা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাঁহারা

ভাবিয়াছেন যে, প্রজার প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য না থাকিলেও বিধিবদ্ধ আইনগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রচলিত হইলেই গবর্ণমেণ্ট বজায় থাকে।

শাসনকার্য্যের মূল উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে অবহিত না হইয়া ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিলেই যে গবর্ণমেণ্ট অব্যাহত থাকিবে এইরূপ মনে করিবার যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভারতীয় প্রজাগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও জ্ঞান, সংগ্রহ ও আহরণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে সে বিষয়ে ইংরেজ জাতি অথবা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিশ্চয়ই উদাসীন নহেন, কারণ ভারতবর্ষের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদের মঙ্গলও যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এজ্ঞান এতদিনে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হইয়াছে। ইংলণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসে সমৃদ্ধির কোনও পরিচয় না থাকিলেও তাঁহাদের জাতিগত যে অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় এই দুই শতাব্দীর ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় আমাদের মনে হয় তাহার ফলেই এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার বিধাতা কর্ত্তৃক তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই গুরু দায়িত্বের মর্য্যাদা উনবিংশ শতাব্দীতেও তাঁহারা বজায় রাখিয়া জগতের জাতিসমূহের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ভুল যদি কিছু হইয়া থাকে, আমাদের মনে হয়, সতর্ক হইবার সময়ও ইংরেজের আছে। ভারতীয় প্রজাগণ সম্বন্ধে জয়েণ্ট কমিটির এই ঔদাসীন্যের ভুল, আশা করি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নজরে পড়িবে।

ইংরেজ বর্ত্তমানে প্রভুত্বশালী হইলেও আমরা জানি গবর্ণমেণ্ট আমাদেরই, সুতরাং এই গবর্ণমেণ্টের পরিচালনায় যাবতীয় বিশৃঙ্খলারও আমরা বিরোধী। গবর্ণমেণ্ট চিরকাল শৃঙ্খলার সহিত বজায় থাকে ইহা আমাদের কাম্য। আমরা জানি, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্ব স্ব সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদের দেশের পরিচালনার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন পর্য্যন্ত অপর জাতির সাহায্য আমাদিগকে লইতে হইবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট-পরিচালক সেই জাতির আদেশ পালন করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। নিজেরা সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কালচক্রে ইংরেজ অপসারিত হইলেও অন্যজাতির প্রভুত্ব আমাদিগকে মানিতে হইবে এবং অন্য কোনও জাতির প্রভুত্ব যে ইংরেজের প্রভুত্ব অপেক্ষা মধুর হইবে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

জয়েণ্ট কমিটির গোড়াতেই যে প্রকাণ্ড গলদ আছে আমরা এবারে তাহাই কেবল দেখাইলাম। আগামীবারে রিপোর্টের অন্যান্য অংশ আলোচিত হইবে।

আইন ও শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন
(Enforcement of Law & Order)

জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মূলনীতি যে, আইন ও শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনপদ্ধতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা (enforcement of law and order and maintenance of upright administration) হইবে তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে শৃঙ্খলা বলিতে আমরা কিসের শৃঙ্খলা বুঝিব ? গবর্ণমেণ্ট যখন শৃঙ্খলার কথা বলিতেছেন, তখন গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারেরই শৃঙ্খলার কথা বলা হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে দেশের লোকের সংশ্রব ও সম্পর্কের কথা এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। এই সম্পর্কের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে আমাদের আশঙ্কা হয়। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার সম্পর্ক যে কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্পষ্টভাবে সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিলেই দেশের লোকের চোখে 'কো-অপারেটর' রূপে প্রতিভাত হইবার আশঙ্কা আছে। এইজন্য পূর্ব্বাহ্নেই আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, 'কো-অপারেটর' এবং 'নন-কো-অপারেটর' এই উভয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেশে বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা দুইয়ের কোনও সম্প্রদায় ভুক্ত নহি। দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানই এমন নিখুঁত নহে নিশ্চিন্ত চিত্তে যাহার সহিত কো-অপারেশন সম্ভব। ন্যায়-নিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও তাহাদের কার্য্যের সহিত 'কো-অপারেশনে' আমাদের আপত্তি নাই এবং তদ্বিপরীত প্রতিষ্ঠান, ও ব্যক্তির কার্য্যের আমরা বিরোধী। অবশ্য কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ কি না আমাদের নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে তাহার বিচার করিয়া থাকি। এই বিচারে ভুল হইতেও পারে।

কোনও দেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত সেই দেশের লোকের ওতপ্রোত সম্বন্ধ। দেশের লোকের শিক্ষাসংক্রান্ত অথবা জীবিকানির্ব্বাহ সংক্রান্ত এমন কোনও কাজ নাই যাহা ব্যক্তি-গতভাবে প্রত্যেকে কিছুদূর পর্য্যন্ত না করিতে পারে অথবা গবর্ণমেণ্টের বিনা সহায়তায় পুরাপুরি করিতে পারে।

শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তনকেই যখন গবর্ণমেণ্ট মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিতেছেন তখন কি আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই দাবী করিতে পারি না, যে, অদূরভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে যতকিছু বিশৃঙ্খলা আছে তাহা গবর্ণমেণ্ট দূর করিবেন?

আমাদের ভিতরে যত প্রকারের বিশৃঙ্খলা আছে তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে বসিলে তালিকাখানি যে সুদীর্ঘ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই। সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুতের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া আপাত-দৃষ্টিতে যে যে বিশৃঙ্খলা আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহারই দুই একটির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিশৃঙ্খলার জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। যদি প্রমাণিত হয় যে, ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব আছে তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে অর্থাৎ অনতিবিলম্বে যাহাতে এই সকল বিশৃঙ্খলা না থাকে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হইবেন।

১। শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার-অবস্থা—

শিক্ষিত বিশেষণটি আমরা ব্যবহার করিতেছি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করিয়া। 'শিক্ষা'র যথার্থ সংজ্ঞা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, শিক্ষিত লোক অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম, তাহা না হইলে শিক্ষার কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শিক্ষা জ্ঞানলাভের সহায়ক এবং যে জ্ঞান কার্য্যক্ষমতা দান করে না সে জ্ঞান যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাহা বলাই বাহুল্য। বেকার শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যাধিক্য দেখিলে স্বতঃই এই ধারণা হয় যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ অধিকতর কার্য্যক্ষম লোকগুলি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, উপার্জ্জন করিতে চাহিলেও উপার্জ্জন করিতে পারে না এবং অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম কার্য্যক্ষম লোকগুলি হাজারে হাজারে টাকা অর্জ্জন করে। এইরূপ বিসদৃশ অবস্থা নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। গবর্ণমেণ্ট স্ব-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ যে সমস্ত লোককে শিক্ষিত অর্থাৎ কার্য্যক্ষম এই ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহাদের অপেক্ষা এই ছাপ যাহারা পায় নাই তাহারা অধিক উপার্জ্জনশীল অর্থাৎ কার্য্যক্ষম, ইহা মানিয়া লইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-দেওয়া-কার্য্যে যে বিশৃঙ্খলা আছে তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

ছাত্রকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া এবং সে কার্য্যক্ষম হইতেছে কি না তাহার নির্দ্ধারণের জন্য পরীক্ষাকার্য্য যেরূপ হওয়া উচিত সেই মত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে সার্টিফিকেট দিলে এবং সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ছাত্রগণের উপযুক্ত উপার্জ্জন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলে এই বিশৃঙ্খলা দূর হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

২। উচ্চশিক্ষিত লোকদিগের তুলনায় অশিক্ষিত লোকের অধিকতর উপার্জ্জন—

শিক্ষার তারতম্য অনুসারে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হইলে তবেই শিক্ষার অর্থ হয়। যখন দেখা যায়, কোনও দেশের শিক্ষিত লোকের তুলনায় অশিক্ষিত লোকের উপার্জ্জন অধিকাংশ স্থলেই অধিক হইতেছে তখন বলিতে হইবে, সে দেশে হয়, উপার্জ্জন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থায় কোনও গলদ আছে, না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের কোনই অর্থ নাই। আমাদের দেশে এই বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণ-মেণ্ট কি ইহার জন্য দায়ী নন?

৩। গবর্ণমেণ্টের শাসনব্যাপারে কর্ম্ম-কর্তৃত্ব—

এই আলোচনায় মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা গবর্ণ-মেণ্টের কার্য্যপদ্ধতির বিচার করিতেছি। কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট বলিতে, আমরা শুধু ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকেই বুঝি না।

গবর্ণমেণ্টের শাসন ব্যাপারের কর্ম্মকর্তৃত্বে বিশৃঙ্খলা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদের কথা ধরা যাক। শিল্প ও বাণিজ্যবিভাগের কর্তৃত্ব করিতে হইলে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই

জ্ঞান অনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সে জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতা একটু আধটু হইলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্টকে যখন আমরা আমাদের সকল ব্যাপারেই মানিয়া থাকি তখন শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির জ্ঞান দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক না হইলেও তাহার কাছাকাছি হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ পক্ষে, গবর্ণমেণ্ট এই পদগুলিরই সমষ্টি। কর্ম্মকর্ত্তারা ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্য-ক্ষমতার অল্পতাহেতু অশ্রদ্ধার পাত্র হইলে গবর্ণমেণ্টেরও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়া অস্বাভাবিক নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রজার শ্রদ্ধার পাত্র না হইয়া যদি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়েন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচনে বিশৃঙ্খলা আছে বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এমন কার্য্য করেন যদ্দারা গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজার অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে এই বিশৃঙ্খলার জন্যও গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করিব।

জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে প্রাদেশিক মন্ত্রী-নিয়োগের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকর্তৃত্ব যাহাতে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত লোকের হাতে পড়ে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অথচ ইহা গবর্ণমেণ্ট পরি-চালনার একটি মূল বিষয়। মূল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া কামান-বন্দুক দ্বারা শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে গিয়া ৩০ কোটি লোককে কাপুরুষ অথবা অমানুষ করিয়া তুলিলে যে দেশের ইষ্টসাধন করা হয় না, আশা করি গবর্ণমেণ্টকে সে কথা বুঝাইতে হইবে না। দেশ গবর্ণমেণ্টের সুতরাং দেশীয় লোক হীন হইয়া পড়িলে গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষতি।

অবশ্য এ বিষয়ে শুধু গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলেই চলিবে না। নির্ব্বাচিত মন্ত্রীত্ব দেশীয় লোকেরাই চাহিয়াছিলেন।

৪। দেশের লোকের সকলের আর্থিক অবস্থার বৈষম্য—

(ক) অর্থসঞ্চয় করিবার সৌভাগ্য আমাদের সকলের ঘটে না, যাহাদের ঘটে তাহাদের মধ্যেও সকলে প্রতি বৎসরের শেষে হিসাব করিয়া নিজ নিজ অবস্থার পরীক্ষা করেন না। যাঁহারা বৎসরে বৎসরে যথারীতি হিসাব রাখিয়া থাকেন এবং বৎসরের শেষে নিজ নিজ অবস্থার পরীক্ষা করেন, দুই একটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমার গোলায় গত বৎসরের শেষে ৫০০ মণ ধান ছিল। ধান তখন ১৲ মণ হিসাবে বিক্রীত হইত। অর্থাৎ গত বৎসরে আমি ৫০০ টাকার মানুষ ছিলাম।

এ বৎসরের শেষে দেখিতেছি, সেই একই প্রকারের ধান আমার গোলায় আছে এবং তাহার পরিমাণও ৫০০ মণ। এ বৎসরে ধানের মণ ॥০ আনা, কাজেই এ বৎসরে আমি ২৫০ টাকার মানুষ হইয়া গেলাম।

এই অবস্থাবিপর্য্যয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। আমি দুই বৎসরই ৫০০ মণ করিয়া ধান রক্ষা করিতে পারিয়াছি অথচ দুই বৎসর আমার অবস্থার বৈষম্য হইল। ইহা কি বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক নহে, এবং ইহার জন্য কি গবর্ণমেণ্ট দায়ী নন?

(খ) অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখিতে পাই, তাহাতে বলা হইয়াছে, টাকার উদ্দেশ্য বিনিময়ের সহায়তা করা।

আজ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ সাল। আজিকার দর হিসাবে টাকায় ১০ সের চাল আর ৮ সের পাট। অর্থাৎ আজ ১০ সের চালের বিনিময়ে ৮ সের পাট পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ১০ সের চাল ৮ সের পাটের সমান। কিছুদিন পরেই হয় ত দেখিব, ১০ সের চাল ২ সের পাটের সমান। ধান ও পাটের কোনও অপরাধ নাই। দুই সময়েই ধানের ও পাটের রকম একই থাকিতেছে। আমারও কোন অপরাধ নাই, অথচ অবস্থার বৈষম্য হইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। অর্থনীতিবিজ্ঞানের ইহা টাকা বিষয়ে অবৈজ্ঞা-নিকতার পরিচয় দিতেছে। এই অবস্থার জন্য কে দায়ী, গবর্ণমেণ্ট নন কি?

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, শৃঙ্খলা আমাদের কাম্য হইলেও আমরা যে-সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ বিশৃঙ্খলাময়।

যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার করিলে এই সকলের দায়িত্ব চাপাইতে হয় আমাদের জ্ঞানের উপর। প্রত্যক্ষভাবে কোন মানুষকে অথবা কোন কর্ম্মকর্ত্তাকে দায়ী করা যায় না। কর্ম্মকর্ত্তাদের দোষ এই যে, তাঁহারা আমাদের কর্ত্তা হইয়াও জানেন না যে, তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার অপূর্ণ এবং তাঁহারা যে জানেন না, এই জ্ঞানও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বৃথা তাঁহাদের কৃপাপেক্ষী নিরীহ প্রজাদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন।

শৃঙ্খলার প্রতীক—প্রকৃতি। প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এবং বুঝিতে পারিলে, শৃঙ্খলা কি বস্তু এবং তাহার ক্ষমতা কতখানি ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া এবং কতক পরিমাণে না বুঝিয়া "শৃঙ্খলা"র কথা বলিয়া এক্ষেত্রে আত্মপ্রতারণা করা হইয়াছে। এবং আত্মপ্রতারণার পরিণাম বিষময়।

আমাদের মতে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের যে অবস্থা তাহাতে শৃঙ্খলা কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত "তথাকথিত শৃঙ্খলার" প্রবর্ত্তন, মূলনীতি না করাই সমীচীন। ইহাতে শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ইংরেজ কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের ও বৈজ্ঞানিক বন্ধুদিগের কর্ম্মকুশলতা কতখানি তাহা আমরা অবগত আছি।

তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যই এই কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু কোনও জিনিষকে সম্যক ভাবে বুঝিতে হইলে, যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার তুলনায় তাঁহাদের জ্ঞান কতখানি, আত্মপরীক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

আগামী ১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) বুধবার হইতে ১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায় টাউন-হলে অনুষ্ঠিত হইবে। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ভারতের দূর দূর দেশ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী সুধীগণ নানাবিভাগের সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য আগমন করিবেন। কাশীর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য; সিংহলের শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাশগুপ্ত, ধনবিজ্ঞান; দিল্লীর রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন, দর্শন; পাটনার শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার, শিক্ষাবিজ্ঞান; মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, শিল্প; মীরাটের শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস; দিল্লীর শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেন, মহিলা-বিভাগ; মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী দে, বিজ্ঞান; ইন্দোরের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু, বৃহত্তর বঙ্গ; কাশীর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু, সঙ্গীত-বিভাগের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীদের সহিত বঙ্গের মনীষিগণের পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রত্যেক বিভাগে বাংলার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও মনীষীগণের উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞান; স্যর যদুনাথ সরকার, ইতিহাস; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, সাহিত্য; স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শিক্ষাবিজ্ঞান; ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনবিজ্ঞান; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বৃহত্তর বঙ্গ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দর্শন; শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, সঙ্গীত; মৌঃ মুজিবর রহমান, সংবাদ-পত্র ও লেডি অবলা বসু মহোদয়া, মহিলা-বিভাগের উদ্বোধন করিবেন।

২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে সাহিত্য, শিক্ষা ও শিল্প-সম্বন্ধীয় একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহার উদ্বোধন করিবেন।

সম্মিলনীর শেষ দিবস ৩০শে ডিসেম্বর প্রবাসী ও বঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের মিলন-বাসর ও মজলিস হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মিলন-বাসরে নেতৃত্ব করিবেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা-সমিতি প্রতিনিধিদিগের সর্ব্বপ্রকার যত্ন, অভ্যর্থনা ও আবাসের সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যায় '**বঙ্গশ্রী**'র দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইল। আমাদের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও বঙ্গশ্রী যে এই অল্পকালের মধ্যেই দেশের পাঠক-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছি। আমরা যাহাতে এই মনোযোগের সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি, ভবিষ্যতে ইহার জন্য আরও সচেষ্ট হইব।

আশা করি, এই দুই বৎসর গ্রাহক থাকিয়া যাঁহারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহারা আগামী বৎসরেও গ্রাহক থাকিবেন।

বর্ত্তমান পৌষ সংখ্যায় যাঁহাদের বার্ষিক কি ষান্মাসিক মূল্য শেষ হইল, তাঁহাদিগকে তৃতীয় বৎসরের মূল্য ৪৲ টাকা ৸০ আনা মণিঅর্ডার যোগে যথাসত্বর পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। ভিঃ-পিঃতে পত্রিকা পাঠাইলে অযথা বেশী মূল্য লাগে।

যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ২০শে পৌষের মধ্যে পত্র লিখিয়া উহা আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নিবেদক—

কর্ম্মকর্ত্তা—'বঙ্গশ্রী'।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।